আমি সুভাষ বলছি

শৈলেশ দে

আমি সুভাষ বলছি

[তিন খণ্ড একত্রে অখণ্ড সংস্করণ]

আমি সুভাষ বলছি

[তিন খণ্ড একত্রে অখণ্ড সংস্করণ]

শৈলেশ দে

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ঃ কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ : অগ্রহায়ণ ১৩৭৫
প্রথম (বি) সংস্করণ : 'রথযাত্রা', ১৩৯২
দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৩৯৩
তৃতীয় সংস্করণ : ১৩৯৪
চতুর্থ সংস্করণ : ১৩৯৫
পঞ্চম সংস্করণ : ১৩৯৬
ষষ্ঠ সংস্করণ : ১৩৯৭
সপ্তম সংস্করণ : ১৩৯৮

প্রকাশক :
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১-বি, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলকাতা-৭০০ ০০৯

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ :
শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

মুদ্রণ :
হরাইজন প্রিন্টার্স
১৪৮৮ পাতৌদি হাউস
দরিয়াগঞ্জ
নিউ দিল্লী ১১০ ০০২

200 টাকা

অঙ্কন বরুন সাহা

গ্রন্থকারের নিবেদন

'আমি সুভাষ বলছি' তিনখণ্ড একত্র অখণ্ডাকারে প্রকাশিত হল। উৎসাহী পাঠকবৃন্দ ও বিশ্ববাণী প্রকাশনীকে এ জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি রাজনীতির ছাত্র নই কোনদিনও। কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না। আজও নেই। তবু যে এই দুস্তর সাগর পাড়ি দিতে সাহস করছি তার মূলে রয়েছে অগ্নিযুগের বিভিন্ন দলের বিপ্লবীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা। তাঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এ ব্যাপারে প্রখ্যাত বিপ্লবী নায়ক ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়ের নাম আমি বিশেষভাবে স্মরণ করছি। তাঁর দৈনন্দিন উপদেশ, উৎসাহ ও প্রেরণা ছিল আমার বিশেষ সম্বল। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

অনুরূপভাবে কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই 'মার্কসবাদ-ই শেষ কথা নয়' ও 'বিপ্লব ও বিপ্লবী' গ্রন্থের রচয়িতা 'বি.ভি.'-র বিশিষ্ট সদস্য শ্রীযুক্ত অমলেন্দু ঘোষের (মুকুলবাবু) কাছেও। বইটি আগাগোড়া সংশোধন করে দিয়ে এবং বহু মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে তিনি আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। এই অখণ্ড সংস্করণের ভূমিকাটি লিখে দিয়েও তিনি আমাকে সম্মানিত করেছেন।

আজাদ হিন্দ্ সরকারের উপদেষ্টা ও নেতাজীর ঘনিষ্ট সহকর্মী প্রয়াত দেবনাথ দাসের সহযোগিতার কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সহযোগিতা ও সাহায্যের ক্ষেত্রে আরো যাঁদের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে তাঁরা হলেন নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর ডাঃ শিশির কুমার বসু, সুলেখক শঙ্কু মহারাজ, 'রাখাল বেণু' সম্পাদক শ্রীসত্যেন চৌধুরী, শ্রীপার্থসারথি বসু। স্থানাভাবে আরো যাঁদের নাম উল্লেখ করা গেল না তাঁদের সংখ্যাও একেবারে নগন্য নয়। তাঁদের সবার প্রতিই আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সর্বোপরি কৃতজ্ঞতা আমার নেতাজী অনুরাগী অগণিত পাঠক সাধারণের প্রতি। তাঁদের ঐকান্তিক নেতাজী প্রীতির ফলশ্রুতি-ই 'আমি সুভাষ বলছি'-র এই অখণ্ড সংস্করণ।

২১ বি, ফার্ণ রোড,
কলিকাতা-১৯

বিনয়াবনত
গ্রন্থকার

অখণ্ড সংস্করণের ভূমিকা

বাঁধাধরা পথে স্কুল-কলেজের ভাল ছেলে বলে পরিচিত হবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য (!) জীবনে কোনদিনই শৈলেশবাবুর হয়নি। কঠোর জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়েই জীবনকে জেনেছেন তিনি।

প্রথম জীবনে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গীত শিল্পী রূপে। পরে অন্যান্য কেন্দ্রেও গেয়েছেন তিনি। সঙ্গীত শিক্ষকতা ছিল তখন তাঁর পেশা।

দেশ বিভাগের পর খুবই বিপদাপন্ন অবস্থায় তিনি চলে এসেছিলেন কলকাতায়। জীবিকার জন্য সেদিন অনেক কিছুই করতে হয়েছিল তাঁকে। ছোটখাট ব্যবসা বা দোকানদারীও বাদ যায়নি।

এ সবের মাধ্যমে জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর সঞ্চিত হল প্রচুর। কিন্তু শুধু এতেই তিনি আবদ্ধ রইলেন না। সঙ্গীত শিল্পী পরিচয় অবশ্য ক্রমে ক্রমে তাঁর মুছে গেল; কিন্তু 'বাগ দেবী'র 'বীণা'-টির পরিবর্তে এবার তাঁর 'কলম'-টি তিনি আস্তে আস্তে তুলে নিলেন।

শুরু হল নতুন পথে নতুনতর পথ পরিক্রমা। রকমারী গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা ইত্যাদি স্বনামে ও বিশেষ একটি ছদ্মনামে অনেক কিছুই ক্রমে ক্রমে লিখলেন তিনি। বেশ কতকগুলি বইও তাঁর চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়ে গেল। শুধু বাংলায় নয়, ভারতের বিভিন্ন ভাষাতেই যাত্রা ও পাবলিক স্টেজএ- তাঁর কাহিনী অভিনীত হল সগৌরবে।

'তবু ভরিল না চিত্ত'। কৈশোরে টেনিস্ খেলারত ঢাকা মিটফোর্ড স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র বিনয় বসুকে একবার তিনি দেখেছিলেন। দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আলাপ-ও করেছিলেন এক আধটুকু। সেই মুগ্ধতাই তাঁর জীবনে একটি গভীর ছাপ ফেলেছিল, যেদিন তিনি দেখলেন, তাঁর সেই স্বপ্নের 'রাজপুত্র' তখনকার দিনে পুলিশের বাঘা আই.জি. লোম্যান হত্যার নায়ক রূপে শাসক ইংরেজের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন। সেই 'রাজপুত্র'-ই যখন আবার একদিন বাদল ও দীনেশকে নিয়ে কলকাতার রাইটার্স-এ ঝড় তুলে আত্মদান করলেন, তখন সে ছাপ আরো গভীরতর হল।

১৯৩০ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে পবিত্র বিষ্ণু-পাদ-পদ্মের মত মনের গহনে এই ছাপটি তিনি অতি সঙ্গোপনে লালন করে গেছেন। শেষটায় 'রক্ত দিয়ে গড়া' নামে একটি বই-ই লিখে ফেললেন বিনয়, বাদল ও দীনেশের আত্মদানকে কেন্দ্র করে।

বইটি নিয়ে খুব সম্ভব ১৯৬৫ সালের কোন একদিন (আমার উপস্থিতিতেই) তিনি হাজির হলেন শহীদত্রয় যে বিপ্লবী দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, সেই বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বা 'বি.ভি.' দলের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা ভূতপূর্ব 'বেণু' সম্পাদক সুসাহিত্যিক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের কাছে। এখানেই শুরু হল শৈলেশবাবুর বিপ্লবী ইতিহাসের পাঠ গ্রহণ। একান্ত নিষ্ঠাবান ছাত্র হিসেবে ১৯৬৫ থেকে আজ পর্যন্ত এই দীর্ঘ বিশ বছর ধরে এই পাঠ গ্রহণ কার্যটি তাঁর অব্যাহত-ই আছে। কোথাও কোন ফাঁকি দেননি তিনি।

১৯৭২ সালে ভূপেন্দ্রকিশোরের পরলোক গমনের পরও 'বি.ভি.' দলতো বটেই, অন্যান্য বিপ্লবী দলেরও প্রায় সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গেই শৈলেশবাবু ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করেছেন এবং তাঁদের বাস্তব-অভিজ্ঞতার কথা ও বিভিন্ন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ইত্যাদি শুনে নিজের সঞ্চয়ের ঝুলি বাড়িয়ে নিয়েছেন। এ সব কিছুর ফলশ্রুতি-ই হল বিপ্লববাদের পটভূমিকায় লেখা তাঁর 'ক্ষমা-নাই', 'বিনয়-বাদল-দীনেশ', 'ফাঁসির মঞ্চ থেকে', 'রক্তের অক্ষরে', 'ওরা আকাশে জাগাতো ঝড়', 'মৃত্যুর চেয়ে বড়' প্রভৃতি পুস্তক ও তিন খণ্ডে সমাপ্ত 'আমি সুভাষ বলছি'-র মত মহাভারত, যা জনপ্রিয়তার দিক থেকে এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

শৈলেশবাবুর তিন খণ্ডে সমাপ্ত এই মহাগ্রন্থ 'আমি সুভাষ বলছি' এবারে অখণ্ড আকারে প্রকাশিত হল। বাংলা ভাষায় রচিত পুস্তকের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এটি একটি শুভ পদক্ষেপ।

শৈলেশবাবুর রচনার বৈশিষ্ট্য হল যে তিনি সংগ্রামী সুভাষচন্দ্রের জীবন কাহিনী শুধু তাঁর একক জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি। ভারতে অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপী সশস্ত্র বিপ্লবের যে ধারা চলে এসেছে তারই পটভূমিকায়, সেই সর্বত্যাগী বিপ্লবীদের উত্তর সাধক হিসেবে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে তিনি এখানে উপস্থাপিত করেছেন। শুধু 'ক্ষুদিরাম' এই একটি মাত্র নাম উচ্চারণেই আমাদের ভাবজগতে আজও যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়ে থাকে শৈলেশবাবুর তা অজানা নয়। 'আমি সুভাষ বলছি' গ্রন্থে তাই শুধু নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কথাই নেই—দেশ মাতৃকার চরণে সর্বস্ব নিবেদিত গোটা বিপ্লবী সমাজ তাঁদের অসাধারণ প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার সব মর্মস্পর্শী কাহিনী সহ এখানে সুভাষচন্দ্রের কর্মযজ্ঞের চতুর্দিকে দীপ্যমান। বইটির অদ্ভুত জনপ্রিয়তার এটাই হল secret।

এ ছাড়া, গল্পের আঙ্গিকে লেখা হলেও শৈলেশবাবুর সব রচনাই তথ্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ ইতিহাস নির্ভর। সব ঘটনাই যাকে বলে well documented। বইটির জনপ্রিয়তার এও অন্যতম কারণ আর এ জন্যই 'আমি সুভাষ বলছি' শুধু পড়া বা জানার আনন্দই দেয় না—reference বই হিসেবেও ব্যবহার করা চলে।

'আমি সুভাষ বলছি'র তিন খণ্ডই সম্প্রতি 'ম্যাঁয় সুভাষ বোল রঁহা হুঁ' নামে হিন্দীতে অনুবাদিত হয়ে এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ওড়িয়া ভাষায়ও 'মুঁ সুভাষ কহুছি' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়ে গেছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ চলছে। অখণ্ড 'আমি সুভাষ বলছি'-র আগ্রহী পাঠকদের এই উৎসাহব্যঞ্জক খবরটি দিয়ে এখানেই আমি আমার কর্তব্য শেষ করছি।

আমি বিপ্লবী দলমুক্ত হলেও শৈলেশবাবুর এ পুস্তকের ভূমিকা লিখবার মত নামী লোক নই। তবে তাঁর এ সব লেখালেখির ব্যাপারে গত ২০ বছর ধরে শৈলেশবাবুর সঙ্গে আমার যে ঘনিষ্ট যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে তাতে তাঁর কোন অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই বাধ্য হয়েই একান্ত সঙ্কোচের সঙ্গে নেতাজীর পূণ্য নামাঙ্কিত শৈলেশবাবুর এই মহৎ গ্রন্থের অখণ্ড সংস্করণের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে সম্মানিত বোধ করছি।

আমি আশা করি যে বর্তমানে গোটা জাতি হিসেবেই আমরা যে চরিত্র সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার তা থেকে আমাদের উদ্ধারের কিছুটা অন্ততঃ পথ দেখাবে।

বর্তমানে কাগজের মূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে এই অখণ্ড সংস্করণের প্রকাশক বিশ্ববাণী যে ঝুঁকি নিয়েছেন তা প্রশংসনীয়।

কুষ্টিয়া সরকারী আবাসন
ফ্ল্যাট নং আই./জে.-৩
কলিকাতা-৭০০ ০৩৯

অমলেন্দু ঘোষ
'রথযাত্রা'

আমি সুভাষ বলছি

(প্রথম খণ্ড)

সুভাষচন্দ্র,

'বাঙালী কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশ-নায়কের পদে বরণ করি। গীতায় বলেন, সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয়, তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক।

বহুকাল পূর্বে একদিন আর এক সভায় আমি বাঙালী সমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশে বাণীদূত পাঠিয়েছিলুম। তার বহু বৎসর পরে আজ আর এক অবকাশে বাংলাদেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ করছি।...'

রবীন্দ্রনাথ—

সেই দুর্গম পথযাত্রীর উদ্দেশে......

অষ্টম সংস্করণের ভূমিকা

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে 'আমি সুভাষ বলছি' (১ম খণ্ড)-র অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হল।

সুভাষ বিপ্লবের প্রদীপ্ত সূর্য। সুভাষ অসম্ভবের নায়ক। আজ দেশের এই চরম সঙ্কটের দিনে তরুণ-তরুণীরা তাঁর অবিস্মরণীয় সংগ্রামের কাহিনী থেকে নতুন করে দেশপ্রেমের শিক্ষা নিক, এই আমার একমাত্র কামনা।

কাগজ দুষ্প্রাপ্য। বাঁধাই এবং মুদ্রণ-ব্যয় আকাশ-ছোঁয়া। তবুও প্রকাশকের ইচ্ছা ছিল না এ গ্রন্থের মূল্য বাড়ানোর। একান্ত নিরুপায়ে কিঞ্চিৎ মূল্য বৃদ্ধি করায় পাঠক-পাঠিকারা বিরূপ হবেন না আশা করি।

যাঁদের স্নেহচ্ছায়ায় বসে একদিন এ কাহিনী লিখতে শুরু করেছিলাম তাঁদের অনেকেই আজ পরলোকগত। তাঁদের পুণ্যস্মৃতির প্রতি প্রণাম জানাচ্ছি।

কলিকাতা-৭০০ ০১৯ বিনয়াবনত—
২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৮২ গ্রন্থকার

ষষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকা

'আমি সুভাষ বলছি' (১ম খণ্ড) ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হল। কাগজ দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য, তদুপরি ভয়াবহ লোডশেডিং ও বিদ্যুৎ-রেশনিং। তা সত্ত্বেও এ সংস্করণের ছাপা, বাঁধাই বা অন্য কোন ব্যাপারে কোন হের-ফের করা হয়নি। এই কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে প্রকাশক শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের।

নেতাজীর ইতিহাস জাতীয়তাবাদের ইতিহাস। তাঁর কাহিনী সবাইকে নতুন করে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করুক, এই আমার একমাত্র কামনা।

কলিকাতা-১৯ বিনয়াবনত—
২১.৮.৭৪ গ্রন্থকার

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

'আমি সুভাষ বলছি' (১ম খণ্ড) পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হল। এই নতুন সংস্করণে এমন একটি দুষ্প্রাপ্য ছবি যোগ করা হল, যা ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। মাস্টারদার ছায়াসঙ্গী শহীদ নির্মল সেনের এই ছবিটি পরিবেশন করেছেন বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থার সদস্যবৃন্দ। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা-১৯ বিনয়াবনত—
৯.৫.৭১ গ্রন্থকার

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'আমি সুভাষ বলছি' (১ম খণ্ড) তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল।

দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত 'আমি সুভাষ' ও মেজর সত্য গুপ্তের ছবি দুটি পেয়েছিলাম প্রখ্যাত বিপ্লবী সুপতি রায়ের কাছ থেকে। আজ আর তিনি বেঁচে নেই। তাঁর আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক—এই কামনা করি।

কলিকাতা-১৯ বিনয়াবনত—

২১.৩.৬৯ গ্রন্থকার

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

'আমি সুভাষ বলছি' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল। বইটি দেখলে সব চাইতে বেশি খুশি হতেন জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু প্রসাদ সিংহ। আজ তিনি সবার নাগালের বাইরে।

আমি রাজনীতির ছাত্র নই। কোনদিনও কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলাম না। আজও তাই রয়েছি। ফলে, একদিকে যেমন দল-মতের প্রভাব এড়িয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণকে সজাগ রাখা সম্ভব হয়েছে, তেমনি আবার রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কহীনতার জন্য সেকালের দ্রুত ধাবমান অগ্নিগর্ভ ইতিহাসকে পর্যালোচনা করতে গিয়ে অনেক সময় দুর্বোধ্য পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।

আত্মত্যাগের চরম দৃষ্টান্ত ও অভূতপূর্ব তেজস্বী চরিত্রের মুখোমুখি পড়ে গিয়ে এক এক সময় বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়েছি। কোন্ ভাষায়, কি শব্দ-যোজনায় সেই অতুলনীয় চরিত্রের বর্ণনা করব, অনেক সময়ই তা ভেবে উঠতে পারিনি।

তবু যে এই দুস্তর সাগর পাড়ি দিতে সাহস করেছি, তার মূলে রয়েছে অগ্নিযুগের বিভিন্ন দলের বিপ্লবীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা। উৎসাহ, পরামর্শ ও নানাবিধ মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করে যেভাবে ও'রা আমাকে প্রেরণা জুগিয়ে এসেছেন, তা ও'দের পক্ষেই বুঝি সম্ভব। এ ব্যাপারে ও'দের তুলনা বুঝি একমাত্র ও'রাই।

প্রখ্যাত বিপ্লবী-নায়ক শ্রদ্ধেয় ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায় দিনের পর দিন আমাকে প্রাঞ্জলভাবে সব কিছু বুঝিয়ে দিয়েছেন। জিজ্ঞাসু মন নিয়ে মুগ্ধ হয়ে শুনেছি। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বিরক্ত করেছি। কিন্তু বিরক্ত হননি। বরং সহজভাবে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বিবৃত করেছেন, কার্যকারণের পারম্পর্য বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। শুনতে শুনতে নিজের অজ্ঞাতেই কখন আমি সেই বিস্মৃতপ্রায় অতীতে চলে গিয়েছি। সেকালের ঘটনাবলীর চলমান ছবি এক এক সময়ে আমাকে অভিভূত করে ফেলেছে।

বিপ্লবী নেতা শ্রদ্ধেয় নলিনীকিশোর গুহ, গণেশ ঘোষ, যতীশ ভৌমিক, শ্রীমতী শান্তি দাস, বীণা ভৌমিক, কমলা দাশগুপ্তা, বিনোদবিহারী দত্ত, হরিপদ ভট্টাচার্য, কামাখ্যা রায়, অমলেন্দু ঘোষ (মুকুল), বিপ্লবী-বন্ধু লোকেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ও সুলেখক শঙ্কু মহারাজের কথাও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরাও আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন গ্রন্থ-রচনা ব্যাপারে।

চট্টগ্রাম অধ্যায়ের অধিকাংশ ছবি পরিবেশন করেছেন যুব-বিদ্রোহের অন্যতম সৈনিক শ্রদ্ধেয় অর্ধেন্দুশেখর গুহ। ফাঁসির কয়েক ঘণ্টা পূর্বে মাস্টারদা-প্রেরিত অন্তিমবাণীটিও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তাঁরই সৌজন্যে।

কবিগুরুর রচনাবলী থেকে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করার অনুমতি দিয়ে বিশ্বভারতী আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন। এ ঋণ অপরিশোধ্য। এই প্রসঙ্গে 'রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র' গ্রন্থের রচয়িতা শ্রদ্ধেয় নেপাল মজুমদারের সহৃদয়তার কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থ-রচনার ব্যাপারে প্রচুর সহযোগিতা আমি পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে।

প্রায়ই একটা অভিযোগ শুনতে পাই যে, একালের ছেলেমেয়েরা নাকি সেদিনের ইতিহাস জানতে চায় না। কথাটা ঠিক নয়। 'উল্টোরথ' পত্রিকায় 'আমি সুভাষ বলছি' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার সময়ে শত শত চিঠি পেয়ে আমি বুঝেছি যে, এ অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন।

ধন্যবাদ জানাই 'উল্টোরথ' পত্রিকার কর্মীবৃন্দকে। তাঁদের ঘন ঘন তাগিদ না পেলে এ কাহিনী হয়তো আদপেই কোনদিন লেখা সম্ভব হত না। এই সঙ্গে স্মরণ করি কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাঠাগার বালীগঞ্জ ইন্স্টিটিউটের কথা। বইটি লিখতে গিয়ে স্বভাবতঃই আমাকে বিস্তর পত্র-পত্রিকার সহায়তা নিতে হয়েছে। কিন্তু পাঠাগারের তরুণ-বন্ধুদের অকৃপণ সহযোগিতার ফলে কোনদিনই আমাকে সেদিক থেকে এতটুকুও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি।

সবশেষে ধন্যবাদ জানাই তরুণ প্রকাশক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে। বইটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য যেভাবে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম ও অকাতর অর্থব্যয় করেছেন, তাতে একথাই আর একবার নতুন করে প্রমাণিত হল যে, অপপ্রচার ও অপচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলা ও বাঙালীর শৌর্যময় অতীতকে কোনদিনই ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা যাবে না।

প্রতিষ্ঠানের নিরলস কর্মী শ্রীপরিতোষ চক্রবর্তী ও শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকারের কাছেও আমার ঋণ কম নয়। তাঁদের সাধুবাদ জানাই।

বিনয়াবনত—
গ্রন্থকার

২১বি, ফার্ণ রোড,
কলিকাতা-১৯

২১শে অক্টোবর, আজাদ হিন্দ্ সরকার
(রজত জয়ন্তী) প্রতিষ্ঠা দিবস. ১৯৬৮ সাল।

স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

আমি সুভাষ বলছি : ২য় খণ্ড

আমি সুভাষ বলছি : ৩য় খণ্ড

ফাঁসি মঞ্চ থেকে

মৃত্যুর চেয়ে বড়

বিনয়-বাদল-দীনেশ

ক্ষমা নেই

রক্ত দিয়ে গড়া

শপথ নিলাম

রক্তের অক্ষরে
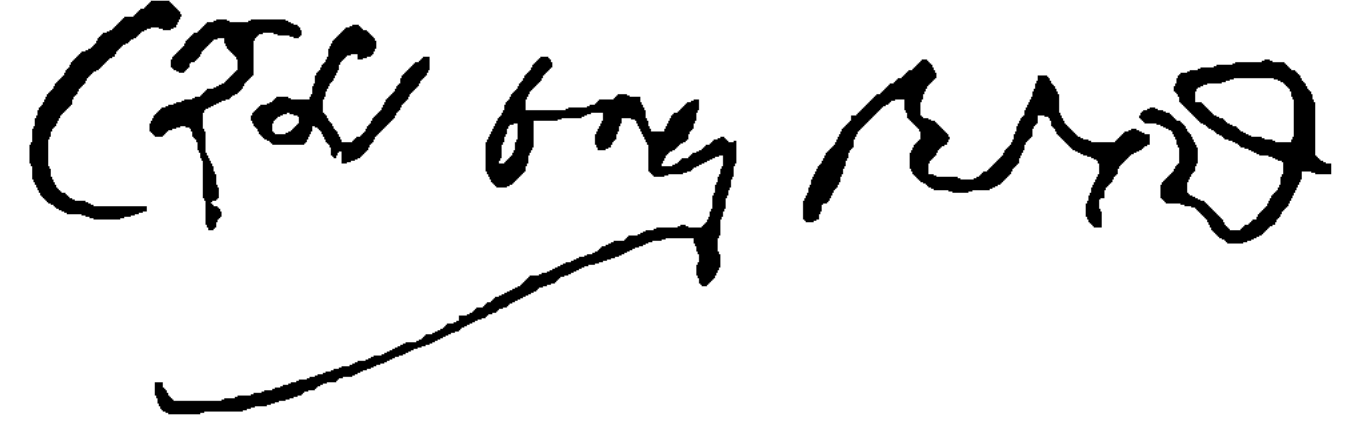
যেন ভুলে না যাই

॥ বিশিষ্ট বিপ্লবীদের অভিমত ॥

'আমি সুভাষ বলছি' তথ্যের দিক হইতে প্রামাণিক হইয়াছে। দরদের দিক হইতে এত হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে যে—যে কোন মানুষের মনকে উহা স্পর্শ করিবে।

আমি এই পুস্তকের বহুল-প্রচার কামনা করি। ইতি—

'...পূজা মণ্ডপের নিওন লাইটের দিকেই আমাদের নজর, কিন্তু মায়ের পাদমূলে মাটির প্রদীপটি জ্বলছে কিনা সেদিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে না। অথচ এই প্রদীপটিই ভক্তির নিদর্শন।

আপনার 'আমি সুভাষ বলছি' পড়ে আমরা সত্যিই মুগ্ধ, আনন্দিত। ভাবীকালের ছেলে-মেয়েদের জন্য সত্যিই আপনি একটি শাশ্বত সত্যকে পরিবেশন করেছেন। বিশেষ করে তখন, যখন সেই সত্যের অপলাপ করবার প্রয়াস চলছে দিকে দিকে।

ইতিহাসকে আজ ডাস্টবিনের জঞ্জালে ফেলে দেবার চক্রান্ত চলছে। আপনি সেই জঞ্জাল থেকে যেভাবে ইতিহাসের উপকরণ আহরণ করে ভবিষ্যৎকে দিয়ে যাচ্ছেন, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যৎ এজন্য আপনাকে চিরদিনের জন্য স্মরণ করবে।

আপনার এই প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হোক, এই কামনা করি। জয়হিন্দ্‌!'

জেনারেল সেক্রেটারী, ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স লীগ, পূর্ব এশিয়া ; মন্ত্রী, আজাদ হিন্দ্‌ সরকার।

'...আমাদের সময়ে হলে এ কাহিনী ছেলে-মেয়েদের পাগল করে দিতে পারত। ...বর্তমানের ছেলে-মেয়েদের বুঝবার মতো ভাষায়, তাদেরই মনের মানুষ হয়ে তিনি যা বলে যাচ্ছেন, তার মূল্য দ্বিবিধ।

প্রথমতঃ, তাঁর লেখা কাল্পনিক-কাহিনী-বর্জিত। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর লেখা— অতীতের কথা শুনতে চায় না যে শত-সহস্রের দল, তাদেরকেও উৎসাহী করে তোলার রচনা-কৌশলে আকর্ষণীয়।

'আমি আশ্চর্য হয়েছি শৈলেশবাবুর সহজাত লিখন-কুশলতা দেখে যত নয়, ততোধিক তাঁর বিপ্লববাদের বোধ ও বিপ্লবী চরিত্র বুঝবার ক্ষমতা দেখে। তাঁর লেখা পড়ে অনেকেরই মনে হবে যে, তিনি বুঝি দীর্ঘকাল বিপ্লবীদলে মানুষ হয়েছেন। কিন্তু তা নয়। তাঁর কোনকালে কোন গুপ্ত সমিতির সঙ্গেই যুক্ত হবার সুযোগ হয়নি। তবে তাঁর পক্ষে কি করে সম্ভব হল এমন প্রত্যক্ষ দর্শন ও প্রত্যক্ষ অনুভূতি নিয়ে লেখা?...'

শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত

'...স্বাধীনতা সংগ্রামে একদিন যাঁরা হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছেন, নিঃশব্দে অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করেছেন, অগ্নিযুগের সেই সব বিপ্লবীদের সম্বন্ধে আপনি যে কি গভীর শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করেন, বহুবার, বহুভাবেই আমি তা প্রত্যক্ষ করেছি। এজন্য বয়ঃ-কনিষ্ঠ হলেও আপনি আমার শ্রদ্ধার পাত্র।

দরদী মন নিয়ে লেখা আপনার 'আমি সুভাষ বলছি' বর্তমান কালের ছেলে-মেয়েদের চরিত্র গঠনের পক্ষে খুবই সহায়ক বলে আমি মনে করি।'

'চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের একজন সৈনিক হিসেবে আমি আপনাকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীকে। যে অপরিসীম নিষ্ঠা ও অকৃত্রিম দরদ দিয়ে আপনি অগ্নিযুগের কাহিনী বর্ণনা করেছেন, সত্যিই তা অতুলনীয়।

'আমি সুভাষ বলছি' কাহিনীর মাধ্যমে বাংলা ও বাঙালীকে পুনরায় দেশপ্রেম, চরিত্রবল, ত্যাগ ও আত্মশুদ্ধির অমোঘ মন্ত্র স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিঃসন্দেহে আপনি জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।'

আজ কায়েমী স্বার্থ অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের মহান্ ঐতিহ্যকে মসীমণ্ডিত করতে বদ্ধপরিকর। সেদিক থেকে শৈলেশবাবু তাঁর 'আমি সুভাষ বলছি' কাহিনীর মাধ্যমে অগ্নিযুগের ইতিহাসকে যেভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন নিঃসন্দেহে তা একটি মূল্যবান প্রচেষ্টা।

দেশ-উন্নয়নের কাজে আজ একান্ত প্রয়োজন বিপ্লবী অনুপ্রেরণা ও দেশাত্মবোধ—যা বর্তমানে দেশ থেকে মুছে যাচ্ছে। এই বই থেকে দেশের তরুণ-তরুণীগণ অগ্নিহোত্রীদের কথা স্মরণ করে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করার প্রেরণা পাবে।'

হরিপদ ভট্টাচার্য

'আমি সুভাষ বলছি' আমার ভাল লাগিয়াছে। আমার তো ভাল লাগিবেই—কারণ, আমি সেই যুগের মানুষ, যে যুগে ভারতবর্ষ শহীদ সৃষ্টি করিয়াছে, অরবিন্দ-নেতাজীর জন্ম দিয়াছে। আজ ছিয়াশি বৎসরের প্রান্তে বসিয়াও আমার চতুষ্পার্শ্বে টাঙ্গান শহীদদের ছবিগুলিকেই আমি সম্বল করিয়াছি. শহীদ ও কর্মনেতাদিগের কাহিনীই আমার অবশ্যপাঠ্য ধর্মগ্রন্থ হইয়াছে।

'আমি সুভাষ বলছি' তাই আমার সংগৃহীত সামান্য কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থের অন্যতম হইয়া রহিল—

আশীর্বাদক

৪-১০-৬৮
বিষ্ণুপুর
চব্বিশ পরগনা

[signature]

॥ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের অভিমত ॥

'খুবই আনন্দ পেলাম শৈলেশ দে-র 'আমি সুভাষ বলছি' বইটি পড়ে। পড়তে পড়তে আমার বহু বছরের জমানো স্মৃতি আলোড়িত হয়ে উঠল। মনে পড়ে গেল—কিভাবে ভারতের তথাকথিত মহানায়কেরা সেদিন সুভাষের ন্যায্য প্রাপ্য ও দাবীর পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিলেন. কিভাবে তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে অকথিত বাধা সৃষ্টি করেছিলেন—কিভাবে তাঁর মত মহাপ্রাণ অকৃত্রিম দেশসেবককে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত করেছিলেন। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দু'চারজন মহানায়কও এই অন্যায় ও অপবাদের হাত থেকে রেহাই পাবেন না। ভারতের ললাটে সেদিন যাঁরা এই কলঙ্ক-তিলক অঙ্কিত করেছিলেন. ইতিহাস তাঁদের নিশ্চয়ই স্মরণ রাখবে।

বিলেতে থাকতেই সুভাষের সঙ্গে আমার পরিচয়। পরে আমার লক্ষ্ণৌ-এর বাড়িতে দুবার আমি তাঁকে নিবিড় সান্নিধ্যে পেয়েছিলাম। সেই দীপ্তোজ্জ্বল সৌম্যমূর্তি. সেই অকুণ্ঠ পরিশ্রম. অকৃত্রিম দেশপ্রেম ও নির্ভীক স্বাধীন চিন্তা

আজো আমার হৃদয়ে অম্লান, অক্ষয় হয়ে আছে।....বইটি আমি সবাইকে পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। সুভাষকে জানতে হলে এ বই অপরিহার্য।'..

অধ্যাপক বি. এন. দাশগুপ্ত

[উপাচার্য : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়]

'স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা আগুন-ঝরা এক জীবনালেখ্য 'আমি সুভাষ বলছি'। এই বই পড়তে পড়তে শহীদদের চলা রক্তরাঙা পথকে দেখতে পাই আমরা; ফাঁসির মঞ্চ থেকে ভেসে-আসা জীবনের জয়গান শুনতে পাই।'

ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

জয়পুরিয়া কলেজ

'অনেক দিন ধরে প্রতীক্ষা করছিলাম বইটির জন্য। প্রতীক্ষা সার্থক হয়েছে। এমন দীপ্ত ভাষায়, এমন নতুন আঙ্গিকে এ ধরনের বই এর আগে কেউ লিখেছেন বলে আমার জানা নেই। সেদিক থেকে 'আমি সুভাষ বলছি' সত্যই একটি অমূল্য সম্পদ। আমি দেশের প্রতিটি তরুণ-তরুণীকে বইটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করছি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সত্যিকার ইতিহাস জানতে হলে এ বই অপরিহার্য।'

ডঃ পি. কে. দে, এম. এস্-সি., পি. এইচ. ডি (লণ্ডন)

[প্রাক্তন অধ্যক্ষ : ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কলেজ অফ এগ্রিকালচার]

'শ্রীশৈলেশ দে-র 'আমি সুভাষ বলছি' গ্রন্থখানি আমার মন হরণ করেছে। লেখক যেন লেখার জাদু জানেন। খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলিকে তিনি এমন সুকৌশলে বেঁধেছেন, যা কেবল প্রথম সারির লেখকদের পক্ষে সম্ভব।'

অধ্যাপক পি. আচার্য

হেরম্বচন্দ্র কলেজ

'আন্তরিক অভিনন্দন জানাই আপনাকে। আমাদের সমাজ জীবন আজ বিপর্যস্ত। 'আমি সুভাষ বলছি' দেশের বিভ্রান্ত জনসাধারণকে পথ দেখাবে সন্দেহ নেই।..'

অধ্যাপক জি. সি. সেনগুপ্ত

হুগলী মহসীন কলেজ

'দেশ ও সমাজ যখন আত্মকেন্দ্রিকতার আত্মঘাতী নীতিতে বিহ্বল ও বিপর্যস্ত, তখন ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবীদের মহান আত্মত্যাগে সমৃদ্ধ দিনগুলির কয়েকটি মূল্যবান অধ্যায় নতুন আঙ্গিকে পরিবেশন করে আপনি প্রকৃতপক্ষে সার্থক দেশসেবকের কর্তব্য পালন করেছেন।'

ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যক্ষ : সংগীত ও কলাবিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

।। বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের অভিমত ।।

'আমি সুভাষ বলছি' পড়লুম। বেশ ভাল লাগল। আপনাকে ধন্যবাদ দিই। এ কেবল একা সুভাষচন্দ্রের জীবনী নয়, তাঁর ভাবে ও ভাবনায় অনুপ্রাণিত শৌর্যবীর্য দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের ইতিহাস। বিশেষ করে এই বাংলাদেশের ছেলেমেয়ে, যারা পরাধীনতার শৃংখল ছেঁড়ার জন্য অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করেও হাসিমুখে তাদের বুকের রক্ত দিয়েছিল একদিন স্বাধীনতার জন্যে, তাদের ভোলা যায় না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এ এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় সন্দেহ নেই।'

সুমথনাথ ঘোষ
১২.৩.৬৯

"আমি সুভাষ বলছি"

'বর্তমান শতাব্দীর মানুষের ইতিহাসে যে কয়জন মুষ্টিমেয় ক্ষণজন্মা পৃথিবীর সর্বদেশে এবং সর্ব-সমাজে অপরিসীম ঔৎসুক্য ও কৌতূহলের সঞ্চার করেছেন, তাঁদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বোধহয় সর্বাগ্রগণ্য। তাঁর রাজনীতিক জীবনের প্রারম্ভকাল থেকে তাঁর সর্বশেষ আত্মবিলুপ্তির বিস্ময়কর নাটকীয় কাহিনী— সমস্তটাই যেন অনবদ্য এক রূপকথার মতো চিত্তাকর্ষক। শ্রীযুক্ত শৈলেশ দে মহাশয় সম্ভবত ওই কথাগুলিই স্মরণে রেখে এক কুশলী শিল্পীর মতো সুভাষচন্দ্রের সমগ্র জীবনটিকে এক বিশাল পটভূমির উপর চিত্রিত করেছেন। তাঁর চরিত্র বর্ণনার দক্ষতায় মৃত্যুঞ্জয়ী সুভাষচন্দ্র যেন নব নব অঙ্গসজ্জায় রূপায়িত হয়েছেন। বইখানির আদ্যোপান্ত বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি।'—

প্রবোধকুমার সান্যাল
১৪.৩.৬৯

প্রীতিভাজনেষু

ভাই শৈলেশবাবু,

কদাচিত এমন বই হাতে পড়ে—যা শুধু সুখপাঠ্য নয়—কাজেও আসে। অনেক কাজের বই পাই অনেকটা ডাক্তার-উপদিষ্ট সুপথ্যের মতো—গুণ হয়তো অনেক আছে, স্বাদ নেই বিন্দুমাত্রও, আবার যা পড়তে ভাল লাগে তার স্মৃতি হয়ত ঐ পড়ার সময়টুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তারপর আর সে বইয়ের একটি লাইনও মনে থাকে না। আপনার বই 'আমি সুভাষ বলছি'—এ দুই পর্যায়ের কোনটাতেই পড়ে না—উভয় শ্রেণীর বাইরে। স্বাদ ও গুণের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে এতে। আহার-ঔষধ দুই-ই। বইটা হাতে পেয়ে এক নিঃশ্বাসে তো পড়েছিই—তার পরও হাতছাড়া করতে পারিনি—পড়ার টেবিলের ঠিক পাশটিতে

রেখে দিয়েছি, মধ্যে মধ্যেই যাতে উল্‌টে দেখতে পারি। এর থেকে বেশি বলা নিষ্প্রয়োজন—নয় কি? আপনি এই বইতে কেল্লা মেরে দিয়েছেন।

১৩.৩.৬৯

প্রীতি নমস্কারান্তে
গজেন্দ্রকুমার মিত্র

'আমি সুভাষ বলছি'—বহু অভিনন্দিত গ্রন্থ। বইখানি পড়বার সময়ে স্মৃতির জানালা দিয়ে গৌরবোজ্জ্বল যুগের চিত্র চোখে পড়ে—যে যুগের শিখরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র দণ্ডায়মান। অবিস্মরণীয় যুগের অবিস্মরণীয় চিত্রালেখ্য।

৩১.৭.৬৯

প্রমথনাথ বিশী

॥ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদদের অভিমত ॥

আপনার লেখা 'আমি সুভাষ বলছি' বইটি পড়ে খুবই ভাল লেগেছে। বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সত্যিকারের ইতিহাস, যার সার্থক অভিব্যক্তি ভারত-ইতিহাসের পুরাণ-পুরুষ সুভাষচন্দ্রের জীবনের মধ্য দিয়ে, তা আপনি আপনার অননুকরণীয় প্রকাশ-শৈলী ও রচনা-কৌশলের দ্বারা ফুটিয়ে তুলেছেন। বক্তব্যের বিষয়বস্তু নাটকীয় উৎকণ্ঠার মত পাঠককে কৌতূহলী করে তোলে, জানা বিষয়কেও নূতন করে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং আরও কি বলবেন পরবর্তী খণ্ডে তা জানার তীব্র অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলে। লেখকের সবচেয়ে বড় সাফল্য তো এইখানে।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদ ও বীর সৈনিকদের অপরিসীম ত্যাগ বীরত্ব শৌর্য মৃত্যুঞ্জয়ী পণ ও অবিস্মরণীয় দেশপ্রেমের কাহিনী গল্প বলার মতন করে, অথচ ঐতিহাসিক তথ্যগুলিকে বিন্দুমাত্র খর্ব না করে পাঠকের কাছে পরিবেশন করার রচনা-কৌশল সত্যি সত্যি অভিনবত্ব দাবী করে। ধার-করা ইজমের মোহে যখন গোটা বাংলাদেশ আচ্ছন্ন, তখন আপনার এই বই-এর বিপুল সমাদর দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নূতন বিশ্বাস ও উৎসাহ উদ্রেক করে। বইটির জন্য সত্যি সত্যি সমস্ত অন্তর থেকে আমার গভীর ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রকাশককে, কেননা, তিনি একটি মস্ত দেশপ্রেমিক কর্তব্য পালন করেছেন।

প্রীত্যন্তে, জয়হিন্দ
কাশীকান্ত মৈত্র
এম. এল. এ.

২৪.১২.৬৯

'আমি সুভাষ বলছি' এক অভাবনীয় সৃষ্টি। অবিস্মরণীয়ও বটে। অনবদ্য এই রচনা-সম্ভারের সাহিত্য মূল্য অপরিসীম। কথাশিল্পের মুন্সীয়ানায় অপূর্ব এই ঐতিহাসিক গ্রন্থনা লেখককে প্রতিষ্ঠার শিখরে পৌঁছে দিয়েছে।....

আলোচ্য বৈপ্লবিক গাথায় বিপ্লবীগোষ্ঠী ফিরে পেয়েছে হৃত গৌরব ও ন্যায্য মর্যাদার রোশনি। ত্যাগব্রতী বিপ্লবীরা এখানে স্বমহিমায় প্রোজ্জ্বল। এখানে 'নেতার' কথা বলতে গিয়ে কোথাও নিজের কথা প্রকট হয়ে ওঠেনি।....

রাজনীতিবিদ না হয়েও লেখক হিসাবে আপনি মহানায়ক সুভাষচন্দ্রকে সর্বজনগ্রাহ্য ও বরণীয় করে তুলেছেন। গণমানসে বইখানি দারুণ উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে। বইখানির অসাধারণ সাফল্য ও জনপ্রিয়তা দেশপ্রেম ও জাতীয়তার ভিত্তি সুদৃঢ় করুক, এই প্রার্থনা।

'আমি সুভাষ বলছি' ভারত, তথা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে যুবক ও ছাত্র, শিশু ও প্রৌঢ়, আপামর জনসাধারণকে উদ্দীপিত করে আত্ম-বিশ্বাস জাগিয়ে তুলুক। ভারত ও বিশ্বের মুক্তিকামী জনসাধারণ মুক্তির এই নিশানা তুলে নিক, এই আমাদের কাম্য।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রতীক্ষায় রইলাম। জয়হিন্দ! নেতাজী জিন্দাবাদ!

অমরপ্রসাদ চক্রবর্তী
প্রাক্তন আইনমন্ত্রী

'আজকের দিনে আমাদের বহু তরুণ-তরুণী আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অতীব গৌরবজ্জ্বল অধ্যায়ের অনেক কিছুই জানেন না এবং জানবার যথাযথ সুযোগও পান না। অপরিসীম ত্যাগ, অতুলনীয় বীরত্ব এবং অকৃত্রিম নিষ্ঠায় উজ্জ্বল আমাদের দেশের সেই অতীত যুগের ঘটনাসমূহ বর্তমান কালের তরুণ-তরুণীদের পথ দেখাবে।

শৈলেশবাবু সেই কাহিনীসমূহ বলবার উদ্যোগ নিয়ে সত্যি সত্যিই একটি দেশপ্রেমিক দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশের অগণিত জনসাধারণের সাথে আমিও তাঁর কাছে এই ঋণ স্বীকার করছি এবং তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

[signature]

উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী

॥ আট ॥

॥ নয় ॥

॥ দশ ॥

॥ এগারো ॥

॥ বারো ॥

'আজাদ হিন্দ্ রেডিও, বার্লিন। আমি সুভাষ বলছি...'

কে ! কে ! চমকে উঠল গোটা ভারতবর্ষ। কে কথা বলছে ? কার কণ্ঠ ভেসে আসছে ইথার-তরঙ্গে ?

'আমি সুভাষ বলছি...'

সুভাষ ! সুভাষ ! সাড়া পড়ে গেল সর্বত্র। আমাদের সুভাষ ! সেই পরিচিত কণ্ঠ ! সেই তেজোদ্দীপ্ত ভঙ্গি ! বলো সুভাষ, বলো ! আমরা কান পেতে শুনছি তোমার কথা। তুমি বলো !

'এতকাল আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য বিষয় শোনানোর কোন সুযোগ ছিল না। শত্রুপক্ষ যে অপবাদই দিক, আমি জানি আপনারা তা বিশ্বাস করেন না। আমি আমার কাজ করে চলে যাব. কে কি বলে, না বলে তাতে আমার কিছু আসে যায় না।

অক্ষশক্তির আক্রমণ থেকে নিজেদের সাম্রাজ্য রক্ষা করার জন্য যদি ব্রিটেন আজ আমেরিকার দ্বারস্থ হতে লজ্জা না পায়, তাহলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অপর কোন জাতির সাহায্যপ্রার্থী হওয়া আমার পক্ষে অন্যায়ও নয়, অপরাধও হতে পারে না।

আপনারা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে প্রস্তুত থাকুন। আমি যেভাবে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে বিভ্রান্ত করে ভারতবর্ষ থেকে চলে এসেছি, ঠিক তেমনি করেই যথাসময়ে আপনাদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হব।

যে সুযোগ আসছে সেটা সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হবে। সেজন্য নিজেরা জাতি ও ধর্মনির্বিশেষে অবিলম্বে সঙ্ঘবদ্ধ হোন। চাই ঐক্য ও একাগ্রতা।'

সুভাষের পরে বললেন বিখ্যাত সাংবাদিক ডঃ গিরিজা মুখার্জী। সবশেষে মিঃ শর্মা। বক্তব্য সেই একই। প্রস্তুত হও। দিন আগত ঐ।

একে একে সবার বক্তব্য শেষ হল, তবু গুঞ্জন শেষ হল না। সবার মুখে একই প্রশ্ন। সবার মনে একই সুর। কি করে এটা সম্ভব হল !

সুভাষ অন্তর্ধান করেছিলেন ১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারি। আজ ৭ই ডিসেম্বর।

পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধ চলছে। এ সময়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বেড়াজাল ডিঙিয়ে কি করে তাঁর পক্ষে সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে সুদূর বার্লিনে গিয়ে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হল !

এ যে অবিশ্বাস্য ! অকল্পনীয় ! অভাবনীয় !

সত্যিই অবিশ্বাস্য। প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ রাজত্বের ইতিহাসে এমন অসম্ভব কথা চিন্তাও বুঝি করা যায় না। বিশেষ করে যুদ্ধের সময়ে। তবু তা সম্ভব হয়েছিল। সম্ভব হয়েছিল অনেক পরিশ্রম, অশেষ নির্যাতন ও প্রচুর অধ্যবসায়ের বিনিময়ে।

এ ইতিহাসের অলিখিত অংশটাই বেশি। কতটুকু আর লেখাজোখা হয়েছে! তবু দীর্ঘদিনব্যাপী অনুসন্ধানের ফলে যেসব মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, আজ সে কাহিনী একে একে তোমাকে শুনিয়ে যাব, মল্লিকা।

মনে রেখ, শুধু একজন নন, এই ঐতিহাসিক যাত্রার পেছনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছেন অসংখ্য নামী-অনামী দেশপ্রেমিক মানুষ, যাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা না পেলে এই দুঃসাহসিক অভিযান কোনদিনই হয়তো সার্থক হয়ে উঠতে পারত না।

তোড়জোড় শুরু হয়েছিল ১৯৪০ সালের মাঝামাঝি সময় থেকেই।

সুভাষ তখন স্থিরপ্রতিজ্ঞ। বাইরে যেতে হবে। হিটলারের হাতে মার খেয়ে ইংরেজ এখন নিজের ঘর সামলাতে ব্যস্ত। এই অপূর্ব সুযোগটিকে কাজে লাগাতে হবে। প্রচণ্ড আঘাত হেনে ওদের ঐ সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে হবে।

এখানে থেকে তা সম্ভব নয়। হয়তো বা কিছুটা সম্ভব হত, যদি এ ব্যাপারে কংগ্রেসের সহযোগিতা পাওয়া যেত।

কিন্তু সে আশা সুদূরপরাহত। এখনো তাঁরা সেই চিরন্তন আবেদন-নিবেদনের বন্ধ্যানীতিতে আস্থাবান। এখনো তাঁদের ধারণা, এই আবেদন-নিবেদনের ফলেই একদিন স্বাধীনতা নামক বস্তুটি তাঁদের হাতের মুঠোয় এসে যাবে।

এ অবস্থায় কে তাঁদের বোঝাবে যে, সাপ মারতে হলে লাঠির দরকার, মনসা পুজোয় কোনদিনও সাপ মরে না। কে বোঝাবে যে, সশস্ত্র উত্থান ব্যতীত ব্রিটিশ-সিংহকে ভারতের মাটি থেকে একচুলও নড়ানো সম্ভব নয়।

অবশ্য কংগ্রেসের সহযোগিতা না পাওয়া গেলেও অন্যান্য দলগুলোর আনুগত্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না। ফরোয়ার্ড ব্লক, বাংলার বৈপ্লবিক সংস্থা বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স (বি. ভি.), অনুশীলন সমিতি, পূর্ণ দাসের দল, অনিল রায় ও লীলা রায়ের শ্রীসংঘ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন দলগুলোর সমর্থন সব সময়েই তাঁর পেছনে রয়েছে।

সাহসে, শৌর্যে, বীর্যে ও আত্মত্যাগে তাঁদের তুলনা নেই। সত্যিকার সৈনিকের যা থাকা প্রয়োজন, সব কিছুই তাঁদের আছে।

তবু তা-ই যথেষ্ট নয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে মুখোমুখি সংগ্রাম চালাতে হলে আরো কিছু চাই।

চাই আধুনিক অস্ত্র-সম্ভার। চাই সুদক্ষ সেনাবাহিনী। চাই আরও অনেক কিছুই।

এই মুহূর্তে এখানে থেকে তা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাই আঘাত হানতে হবে বাইরে থেকেই। ভারত এখন অগ্নিগর্ভ। বাইরে থেকে যথাযথ-ভাবে আঘাত হানতে পারলে ভেতরে মহাবিপ্লবের আবির্ভাব সুনিশ্চিত। সুতরাং সর্বাগ্রে দরকার বাইরে যাওয়া।

ফরোয়ার্ড ব্লকের অন্যতম নেতা সর্দার নিরঞ্জন সিং তালিবকে কথাটা একদিন খুলেই বললেন সুভাষ।

আমি বাইরে যেতে চাই সর্দারজী। এ ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা প্রয়োজন। বলুন, কি করা যায় এখন!

মনে মনে হাসলেন সর্দারজী। সুভাষবাবু যখন মনস্থির করেছেন, তখন তাঁকে রুখনেওয়ালা দুনিয়াতে কোই নেই হ্যায়। ঠিক আছে, ভেবে দেখি কি করা যায়!

ভাবতে ভাবতে একসময়ে বিশেষ একটি মানুষের কথা মনে পড়ে গেল সর্দারজীর।

বলদেব সিং। জামসেদপুরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বলদেব সিং। শক্ত মানুষ। বিশ্বাসীও বটে। তাঁকে একবার বলে দেখলে কেমন হয়! হয়তো কিছুটা কাজ হলেও বা হতে পারে।

শুনতে শুনতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল বলদেব সিংয়ের মুখ। অপূর্ব! অপূর্ব প্রস্তাব! এরূপ দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা একমাত্র সুভাষবাবুর মতো লোকের পক্ষেই বুঝি সম্ভব। সত্যিই অপূর্ব!

কিন্তু কাজটা শক্ত। বিপজ্জনকও বটে। সুভাষবাবুর সম্বন্ধে পুলিশ কর্তৃপক্ষ সব সময়েই অত্যন্ত সজাগ। বিশেষ করে এখন যুদ্ধের সময় তো কথাই নেই।

হয়তো আড়াল থেকে প্রতিমুহূর্তেই তারা তাঁকে সতর্কভাবে লক্ষ্য করে চলেছে। এ অবস্থায় তাদের নজর এড়িয়ে তাঁর পক্ষে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে কি?

তাছাড়া হাঁটা-পথে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে দুর্ধর্ষ উপজাতীয় এলাকা পেরিয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করা মুখের কথা নয়। এ-পথ যেমন দুর্গম, তেমনি বিপদসঙ্কুল।

সুভাষবাবু সমতল ভূমির লোক। তিনি কি পারবেন ঐ দুর্গম গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করে নির্বিঘ্নে ওপারে পৌঁছে যেতে?

অবশ্য তা বলে পিছিয়ে গেলে চলবে না। ঝুঁকি এক্ষেত্রে কিছুটা নিতেই হবে।

তার জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন একজন অতি বিশ্বস্ত কর্মী, যিনি এ ব্যাপারে পুরোপুরি দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম। কোথায় পাওয়া যাবে তেমন লোক?

আরে! কি আশ্চর্য! সহসা কি একটা কথা মনে পড়ে গেল বলদেব সিংয়ের।

লোকের অভাব কি! 'পাঞ্জাবের কীর্তি কিষাণ পার্টি'র বিশ্বস্ত কর্মী কমরেড অচ্ছর সিং তো এখন পলাতক অবস্থায় তাঁর গৃহেই আত্মগোপন করে রয়েছেন। তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখলেই তো হয়।

শুনে সানন্দে রাজী হলেন অচ্ছর সিং। এ তো বহুত খুশিকা বাত হ্যায়। আমার দ্বারা যদ্দূর সম্ভব নিশ্চয় করব। কথা দিলাম!

তক্ষুনি খবর চলে গেল পাঞ্জাবের কীর্তি কিষাণ পার্টির কাছে। সুভাষবাবুর জন্যে এ কাজের ভার নিতেই হবে। বলো, তোমরা রাজী আছ কিনা!

রাজী। যথাসময়ে উত্তর এল কীর্তি কিষাণ পার্টি থেকে। এ ব্যাপারে সবাই আমরা একমত। কমরেড রামকিষণের ওপর যাবতীয় ভার দেওয়া হল। সে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

দিন-কয়েক বাদেই অচ্ছর সিং ও কমরেড রামকিষণ—দুজনে পাড়ি দিলেন পেশোয়ারের মর্দান জেলার 'খেল্লা ডের' নামক গাঁয়ের উদ্দেশ্যে। ওখানকার কমরেড ভগৎরামের সঙ্গে একবার যোগাযোগ করা দরকার।

ভগৎরাম শুধু কীর্তি কিষাণ পার্টির সভ্যই নন, ফরোয়ার্ড ব্লকেরও একজন অতি উৎসাহী কর্মী। পাহাড়ী এলাকার সব কিছু তাঁর নখদর্পণে। আফ্রিদি, মোমান্দ প্রভৃতি উপজাতীয়দের সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট হৃদ্যতা। প্রায়ই তাঁকে ঘোরাঘুরি করতে হয় ঐসব উপজাতীয় অঞ্চলে। একমাত্র তিনিই পারেন সুভাষবাবুকে নিরাপদে সীমান্তের ওপারে পৌঁছে দিতে।

সুভাষবাবু! খবর শুনেই উৎসাহে লাফিয়ে উঠলেন ভগৎরাম। ইয়া! ইয়া! এই তো শেরকা বাচ্চার মতো কথা। আমি তৈয়ার। সুভাষবাবুর জন্যে আমি সব কিছু করতে রাজী। জান কবুল!

দুরন্ত দুঃসাহসী কর্মী এই ভগৎরাম। বড়ভাই হরিকিষেণ পাঞ্জাব-গভর্ণর হত্যা চেষ্টার মামলায় ফাঁসির রজ্জুতে প্রাণ দিয়েছেন, তবু তিনি সমান বেপরোয়া। তাঁর একমাত্র প্রতিজ্ঞা, এর বদ্‌লা নিতে হবে। যারা তাঁর বড়ভাইকে খুন করেছে, তাদের খুনে হাত রাঙাতে হবে।

দায়িত্ব বুঝে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠলেন ভগৎরাম। সুভাষবাবু শেরকা বাচ্চা। যে করে হোক, তাঁকে সীমান্তের ওপারে পৌঁছে দিতে হবে। তাঁর স্বপ্ন সার্থক হোক। ভারত স্বাধীন হোক।

কাজ এগিয়ে চলল অবিশ্বাস্য গতিতে। প্রস্তুতি-পর্ব প্রায় শেষ। হঠাৎ বিপর্যয় নেমে এল বিশেষ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

হলওয়েল মনুমেণ্ট আন্দোলনের তারিখ ধার্য করা হয়েছিল জুলাই মাসের (১৯৪০) ৩রা তারিখে। তার আগের দিনই সুভাষকে গ্রেপ্তার করে পাঠানো হল লৌহ-কারার অন্তরালে। ফলে, গোটা ব্যাপরাটাই চাপা পড়ে গেল সাময়িকভাবে।

সুভাষকে রাখা হল প্রেসিডেন্সি জেলে। ফল কিন্তু ভালই হল। সহবন্দী হিসেবে সেখানে তিনি পেয়ে গেলেন হেমচন্দ্র ঘোষ, সত্য বক্সী, মণীন্দ্রকিশোর রায় প্রমুখ বি. ভি.-র অন্যতম বিপ্লবী নায়কগণকে। ফলে, আবার মন্ত্রণা শুরু হল নতুন করে।

কি করা যায় এখন! এতদূর এগিয়ে এসে সব কিছুই কি পন্ড হবে এমনি করে?

অসম্ভব। তা হতে পারে না। এমন সুযোগ জীবনে আর কোনদিনই পাওয়া যাবে না। যে করে হোক, যে কোন মূল্যে হোক, তাকে সার্থক করে তুলতেই হবে।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব! সে যে বিনা বিচারে আটক বন্দী! ইচ্ছা করলেই তো আর ইংরেজের কারাগার থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায় না।

হ্যাঁ, তাও যায়। ইচ্ছা করলেই যায়। আগে জানা না থাকলেও এখন

আর সে রহস্যটুকু অজানা নেই সুভাষের। তাই গোপনে তিনি তাঁর দাদা শ্রদ্ধেয় শরৎ বোসের কাছে খবর পাঠালেন—'অবিলম্বে বি. ভি.-র যতীশ গুহর মাধ্যমে পরেশ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে সব কিছু জেনে নিন।'

যতীশ গুহ বি. ভি.-র অন্যতম নায়ক। দলের প্রায় সবার কাছেই তিনি সুপরিচিত। কিন্তু পরেশ রায়! তিনি কে? কি তাঁর পরিচয়?

অগ্নিযুগের ইতিহাসে এই পরেশ রায়ের মতো এমন একটি বিচিত্র চরিত্র আর কোথাও তুমি খুঁজে পাবে না, মল্লিকা।

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবার কাছে তিনি অবজ্ঞার পাত্র। সবাই জানে, তিনি একজন স্পাই বা গুপ্তচর। দেশদ্রোহিতাই তাঁর একমাত্র পেশা।

পরেশ রায় নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। তাছাড়া উপায় কি! অর্থের বিনিময়ে যে লোক দেশদ্রোহিতা করতে পারে, মুখ তুলে কথা বলার মতো সাহস তার কোথায়? বিশেষ করে সেই যুগে?

কিন্তু সত্যিই কি তাই? সত্যিই কি তিনি গুপ্তচর?

ভুল মল্লিকা, একেবারেই ভুল। দলীয় স্বার্থের প্রয়োজনে নিজেকে সন্দেহ-মুক্ত রাখার জন্য সারা পৃথিবীর ঘৃণা আর অবহেলা কুড়িয়ে এই পরেশ রায় যে দিনের পর দিন কি অসাধ্য সাধন করে চলেছেন, তা জানতেন শুধু বি. ভি.-র নেতৃস্থানীয় দু-একটি মাত্র লোক। আর কারো পক্ষেই তা জানা সম্ভব ছিল না।

সত্যিই অসাধ্য সাধন করেছিলেন এই পরেশ রায়। পুলিশ বিভাগের একজন শ্বেতাঙ্গ আই. সি. এস. অফিসারকে তিনি এমনভাবে কায়দা করে ফেলেছিলেন যে, বেচারার আর কোনদিকে এতটুকুও নড়বার জো ছিল না।

অফিসারটি ছিল ভয়ানক মদ্যপ। মাইনের পুরো টাকাটাই তার চলে যেত মদের দোকানে। ফলে, মাসের সাতদিন যেতে না-যেতেই পকেট গড়ের মাঠ। তাই নিয়ে সংসারে খিটিমিটি।

ঝোপ বুঝে কোপ মারতেন পরেশ রায়। খাও বাবা, খাও! পেট ভরে খাও। না খেলে শরীর টিকবে কি করে! টাকা! না না, এই গরীব থাকতে টাকার জন্য তুমি ভেবো না। তুমি শুধু খেয়ে যাও!

তবে আমি বাপু নগদ কারবারের কারবারী, তাই বিদেয়টাও হাতে হাতেই চাই। বিশেষ কিছুই নয়, শুধু মাঝে মাঝে দু-একটা করে ফাইল নিয়ে যাব।

না না, ভয়ের কিছু নেই। কাকপক্ষীতেও টের পাবে না। দু-একদিন বাদেই আবার যেখানকার মাল সেখানে ঠিক-ঠাক সাজিয়ে রেখে যাব। বলো, রাজী?

রাজী না হয়ে উপায় কি! একদিকে মদের দোকানের বিল, অন্যদিকে সংসার। সোজা খরচ তো আর নয়!

ফলে, পুলিশ বিভাগের প্রতিটি ব্যাপার ছিল সেদিন বি. ভি.-র কর্ম-কর্তাদের নখদর্পণে। এমন কি কবে-কোথায়-কাকে কিভাবে গ্রেপ্তার করা হবে, সে খবরও তাঁরা জানতে পারতেন আগে থেকেই।

প্রথমটাতে বিশ্বাসই করতে পারেননি সুভাষ। পুলিশ দপ্তর থেকে

গোপনে ফাইল পাচার করে আনা—এ যে অবিশ্বাস্য কথা! তাও কিনা একজন শ্বেতাঙ্গ আই. সি. এস. অফিসারের হাত দিয়ে! অসম্ভব! এ হতেই পারে না।

মনে মনে সেদিন হেসেছিলেন অন্তরঙ্গ সুহৃদ বিপ্লবী নায়ক সত্য বক্সী। তারপরই একদিন একটা ফাইল তিনি তুলে দিয়েছিলেন সুভাষের হাতে।

এবার! এবার বিশ্বাস হল তো!

একি! সুভাষ স্তম্ভিত! এ যে তাঁর নিজের সম্বন্ধে পুলিশের গোপন রিপোর্ট! এ ফাইল এখানে এল কি করে! কে নিয়ে এল?

কে আবার! এনেছেন পরেশ রায়। তিনি ছাড়া এতবড় বুকের পাটা কার আছে! সংসারে পরেশ রায়দের জাতই আলাদা।

খুশি হয়ে সেদিন প্রচুর টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন সুভাষ! এটা চালু রাখতে হবে। গোয়েন্দার ওপর গোয়েন্দাগিরি চালিয়ে যেতে হবে। এটা দরকার।

সত্যিই দরকার। দরকার বলেই এই জরুরী মুহূর্তে সুভাষ স্মরণ করলেন সবার উপেক্ষিত সেই পরেশ রায়কে। জেল থেকে তিনি নির্দেশ পাঠালেন—'পরেশ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।'

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে পরেশ রায় গিয়ে হাজির হলেন সেই হুজুরের দরবারে। কেমন আছ সাহেব? ইস্! শুকিয়ে একেবারে আধখানা হয়ে গেছ দেখছি! কথায় বলে, আগে শরীর, তারপর অন্য কথা। শরীর যদি গেল তো আর রইল কি! যাক, একটা কাজের কথা বলি।

শুরু হল ধস্তাধস্তি। হাজার হোক, ইংরেজ। তার ওপর খাঁটি আই. সি. এস. অফিসার। এ ব্যাপারে কিছুতেই সে মুখ খুলতে রাজী নয়।

পরেশ রায়ও নাছোড়বান্দা। মুখ খুলিয়ে তিনি ছাড়বেনই। না খুলে যাবে কোথায়! মাইনের টাকা তো এরই মধ্যে ফুঁকে বসে আছে। তখন তো আবার হাত পাততে হবে এই পরেশ রায়ের কাছেই।

তা বাপু হাত যখন পাততেই হবে, তখন লজ্জা না করে এখন পাতলেই তো হয়। মোটা রকম কিছু না খসিয়ে যে ছাড়বে না সে তো বুঝতেই পারছি।

অবশেষে এক মজার রিপোর্ট পাওয়া গেল পরেশ রায়ের দিক থেকে। সুভাষবাবুকে অসুস্থ হতে বলুন। আর শরৎবাবুকে বলুন দু-একদিন বাদে তাঁর মুক্তির জন্য আবেদন জানাতে। ব্যস্, ওতেই হবে।

খবর চলে গেল কারা-প্রাচীরের অন্তরালে। তোমাকে অসুস্থ হতে হবে সুভাষ। তারপর যা করার বাইরে থেকে আমরাই করব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

ইতিমধ্যে সুভাষ জেল থেকেই কেন্দ্রীয় আইনসভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন অক্টোবর মাসের ২৮ তারিখে। তার একমাস বাদে, নভেম্বর মাসের ২৯ তারিখে ঘুম থেকে উঠেই সারা দেশ স্তম্ভিত হয়ে গেল অভাবনীয় একটি খবর শুনে।

মুক্তির দাবীতে সুভাষ অনশন শুরু করেছেন। আমৃত্যু অনশন।

প্রতিবাদ শোনা গেল দেশের এখানে-ওখানে সর্বত্র। সুভাষকে বিনা বিচারে আটক রাখা চলবে না। অবিলম্বে তাঁর মুক্তি চাই।

সে দাবী আরো জোরদার হয়ে দেখা দিল শ্রদ্ধেয় শরৎবাবুর কণ্ঠে। সুভাষকে মুক্তি দেওয়া হোক। এভাবে তাকে আটকে রাখা বে-আইনী।

মুক্তি দেওয়া হল ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখে।

প্রায় একই সময়ে আরো একজনকে মুক্তি দেওয়া হল ভগ্নস্বাস্থ্যের অজুহাতে। তিনি হলেন বি. ভি.-র অন্যতম নায়ক শ্রীযুক্ত সত্য বক্সী। যাকে বলে মণি-কাঞ্চন যোগ।

এবার শুরু হল সুভাষের জীবনের এক নতুন অধ্যায়। কারো সংগে দেখা নয়। এমন কি অন্তরঙ্গ সহচরদের সংগেও নয়। রুদ্ধদ্বার-কক্ষে সাধন-ভজন আর ধর্ম-চর্চার মধ্যেই তিনি নিমগ্ন হয়ে রইলেন সর্বক্ষণ।

ভেতরে ভেতরে কিন্তু তখনো সেই আগুন জ্বলছে। যেতে হবে। অনেক দূরে যেতে হবে। এ সুযোগ হারালে চলবে না।

কিন্তু আগেকার সেই যোগাযোগ এতদিনে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কোথায় সেই দুরন্ত দুঃসাহসী কর্মী ভগৎরাম? বিরাট এই ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে কোথায় এখন খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁকে?

না, কোন উপায় নেই। নতুন করেই আবার চেষ্টা করতে হবে।

যোগাযোগ করা হল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিশিষ্ট ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা পেশোয়ারের আকবর শার সংগে। সেই একই বক্তব্য। একই দাবী।

একজন বিশ্বস্ত লোক চাই। চাই এমন একজন দুঃসাহসী মানুষ, যে সব কিছু তুচ্ছ করে তাঁকে সীমান্ত পার করে দিতে পারবে।

অনেক খুঁজে খুঁজে অবশেষে পাওয়া গেল একজনকে।

দেখে খুশিই হলেন আকবর শা। হ্যাঁ, সাচ্চা আদমী। যাকে বলে উপযুক্ত লোক।

মল্লিকা, খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত অকবর শা যে উপযুক্ত লোকটিকে নির্বাচিত করলেন, তিনি কিন্তু আসলে সেই দুরন্ত দুঃসাহসী কর্মী স্বয়ং ভগবৎরাম ছাড়া আর কেউ নন। কি অদ্ভুত যোগাযোগ।

সেই একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেল ভগৎরামের কণ্ঠে। হাতীকা দাঁত, আর মরদকী বাত। সুভাষবাবু শেরকা বাচ্চা। জবান দিচ্ছি, আমি নিজে তাঁকে কাবুল পর্যন্ত পেঁৗছে দিয়ে আসব। জান কবুল!

আবার তোড়জোড় শুরু হল নতুন করে। ভগৎরামের মাধ্যমে আবার এগিয়ে এল পাঞ্জাবের সেই কীর্তি কিষাণ পার্টি। এ ব্যাপারে সব রকম সহযোগিতা করতে তারা প্রস্তুত।

তোড়জোড় শুরু হল বাংলা দেশেও। বিশেষ করে সত্যবাবুর তো কথাই নেই। দেহ অপটু, তাই নিয়ে তিনি একটানা খেটে চলেছেন নিরলসভাবে। শুধু কাজ আর কাজ। নিরবচ্ছিন্ন কাজ। সময় অল্প। তার আগেই যাবতীয় কাজ শেষ করে ফেলতে হবে।

ওদিক থেকেও তৎপরতার অন্ত নেই। ইতিমধ্যেই কীর্তি কিষাণ পার্টির তিনজন সদস্য চলে এসেছেন কলকাতায়। আশ্রয় নিয়েছেন মট লেনের একটা

পাঞ্জাবী হোটেলের চার নম্বর ঘরে। উদ্দেশ্য—এ ব্যাপারে সামনাসামনি কিছুটা আলাপ-আলোচনা করা।

সঙ্গে সঙ্গে সত্যবাবু সেখানে পাঠিয়ে দিলেন বি. ভি.-র অতি বিশ্বস্ত নেতৃস্থানীয় কর্মী বিনয় সেনগুপ্তকে। যাও, কথাবার্তা বলে এস। শুরুতেই আমাদের কোড-ওয়ার্ডটা উচ্চারণ করতে ভুলো না যেন! ফিরে এসে যা হয় আমাকে জানিও।

যথাসময়ে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে হাজির হলেন বিনয়বাবু। হিসেবে কোথাও এতটুকু ভুল নেই। ভেতরে তিনজন লোকই রয়েছে। সবাই পাঞ্জাবী।

—কি চাই? প্রশ্ন করলেন একজন।

—ব্লক ফরোয়ার্ড। প্রথমেই কোড-ওয়ার্ড উচ্চারণ করলেন বিনয়বাবু।

—আইয়ে জী, আইয়ে! তিনজনেই সাগ্রহে আহ্বান জানালেন, ভিতর মে আইয়ে! আমরা আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

অনেক কিছুই আলাপ-আলোচনা হল রুদ্ধদ্বার-কক্ষে। সবশেষে ঠিক হল—দিন সাতেক বাদে এখান থেকে একজনকে যেতে হবে লাহোরে। তার মারফতই ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে সব কিছু জানিয়ে দেওয়া হবে বিস্তারিতভাবে।

নির্দিষ্ট দিনে দলের একজন বিশ্বস্ত কর্মী চলে গেলেন লাহোরে। গেলেন ছদ্মবেশে। ছদ্মনামে। ছদ্ম পরিচয়ে। সে কি তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদের ঘটা! যেন কোন উঁচু মহলের রইস্ মুসলমান আদমী আর কী!

আশ্রয় নিলেন ওখানকার একটা সাধারণ মুসলমানী হোটেলে। নিতেই হবে। খাঁটি মুসলমান যে! কি লাভ অন্য কোন হোটেলে আশ্রয় নিয়ে অহেতুক সন্দেহের সৃষ্টি করে!

বিপদ হল খাবার টেবিলে। হায় ভগবান! এ যে রুটি আর নিষিদ্ধ মাংস! এখন উপায়!

এক মুহূর্তের দ্বিধা, তারপরই তিনি অম্লানবদনে কাছে টেনে নিলেন মাংসের প্লেটটা। স্বাধীনতার চাইতে সংস্কার বড় নয়। সুতরাং নিষিদ্ধ মাংসই সই। নইলে সন্দেহের সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়।

দিন-তিনেক বাদেই কর্মীটি ফিরে এলেন যাবতীয় আলাপ-আলোচনা শেষ করে। খবর শুভ। কলকাতা থেকে কাবুল পর্যন্ত যাবার সমস্ত প্ল্যান প্রস্তুত। এমন কি দিন-তারিখও স্থির হয়ে গেছে।

কীর্তি কিষাণ পার্টির সভ্যদের মধ্যে কে, কবে, কোথায় সুভাষকে রিসিভ করে কাবুল সীমান্ত পর্যন্ত পেঁৗছে দেবেন, তাও একদম পাকা। এখন শুধু অপেক্ষা মাত্র।

এবার এক সমস্যা দেখা দিল সত্যবাবুর সামনে। সবচাইতে বড় সমস্যা। টাকা চাই! অনেক টাকা! নানা দিকে যোগাযোগ রাখা, প্রতিটি ঘাঁটি সুরক্ষিত করা ইত্যাদি ব্যাপারে প্রচুর টাকার প্রয়োজন। কোথা থেকে আসবে এত টাকা!

যতীশ গুহ, বিনয় সেনগুপ্ত, কামাখ্যা রায় প্রমুখ বি. ভি.-র নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা তখনো জেলের বাইরে ছিলেন, তাঁদের সবাইকে ডেকে এনে সমস্যার কথাটা বুঝিয়ে বললেন সত্যবাবু।

টাকা চাই। একদিন অন্তর একদিন, কম করে হলেও পাঁচশো করে টাকা। যে করে হোক, এর ব্যবস্থা করতেই হবে।

মহা সমস্যা! আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সবাই স্বল্প বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। কোথায় পাওয়া যাবে এত টাকা! এ তো আর দু-শ টাকার ব্যাপার নয়। দলের মেয়েদের একবার জিজ্ঞেস করে দেখলে কেমন হয়!

অনেক ভেবে-চিন্তে শেষপর্যন্ত বিপ্লবী নায়িকা উজ্জ্বলা মজুমদারের কাছে গিয়ে হাজির হলেন বিনয়বাবু। যে করে হোক, কিছু টাকার ব্যবস্থা তোমাকে করে দিতেই হবে, ভাই!

স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে নারীর অবদান তুচ্ছ নয়! কত মা, কত বৌদি, কত স্নেহময়ী দিদি যে বাংলাদেশের এই দুরন্ত দামাল ছেলেগুলোকে সেদিন ধৈর্য দিয়ে, সহানুভূতি দিয়ে, সব রকম বিপদ থেকে আগলে রেখে-ছিলেন, ইতিহাসও বোধ করি তার সঠিক হিসেব দিতে পারবে না। ঘরছাড়া, কুলহারা এই ছেলেগুলোর জন্যে তাঁদের শুধু বুকই ফেটেছে, কিন্তু মুখ ফোটেনি কোনদিনও।

এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বলা মজুমদার তৎপর হয়ে উঠলেন সুবালা সেন, ঊষা সেন প্রমুখ দলের অন্যান্য নারী-কর্মীদের নিয়ে। টাকা চাই! অনেক টাকা!

পাওয়া গেল বেশ কিছু অলঙ্কার। নারীর সবচাইতে প্রিয় জিনিস অলঙ্কার। একান্ত প্রিয় সেই অলঙ্কারগুলোই তাঁরা স্বেচ্ছায় তুলে দিলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাকে সুগম করে তুলতে। হে মহান বিপ্লবী, তোমার যাত্রাপথ নির্বিঘ্ন হোক! তোমার সাধনা জয়যুক্ত হোক!

উজ্জ্বলা মজুমদার! নামটা চেনা চেনা ঠেকছে, তাই না মল্লিকা! হ্যাঁ, ঠিকই অনুমান করেছ তুমি। এই উজ্জ্বলা মজুমদারই একদিন বাংলার গভর্ণর এন্ডারসনকে গুলী করার মামলায় দণ্ডিত হয়েছিলেন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে। বর্তমানে ইনি উজ্জ্বলা রক্ষিত।

বি. ভি.-র বিশিষ্ট নায়ক কমেট দাশগুপ্ত তখন কাজ করতেন নাথ ব্যাঙ্কে। তাঁর সাহায্যে অলঙ্কারগুলো ওখানে গচ্ছিত রেখে পাওয়া গেল বেশ কিছু টাকা।

তবু সমস্যার কোন স্থায়ী সুরাহা হল না। এ টাকা আর ক'দিন! এ তো দেখতে দেখতেই ফুরিয়ে যাবে। তারপর কাজ চলবে কি করে!

হঠাৎ একটি বিশেষ মানুষের কথা মনে পড়ে গেল বিনয়বাবুর।

পণ্ডাবাবু। জামসেদপুরের বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার পণ্ডাবাবু। মনে মনে তিনি সুভাষবাবুর অত্যন্ত ভক্ত। শ্রদ্ধাও করেন যথেষ্ট। কথাবার্তার মধ্য দিয়েই তাঁর প্রমাণ পাওয়া গেছে বার বার। তাঁর কাছে একবার গেলে হয় না! দেখাই যাক না!

যে কথা, সেই কাজ। সঙ্গে সঙ্গে জামসেদপুর ছুটে গিয়ে পণ্ডাবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন বিনয়বাবু। টাকা চাই! একদিন অন্তর একদিন পাঁচশো করে টাকা। কেন, কি বৃত্তান্ত, কিছুই বলতে পারব না। সময় হলে

নিজেই জানতে পারবেন। শুধু একটু মনে রাখবেন যে, এর ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। বলুন, রাজী ?

রাজী ! রাজী ! রাজী ! সানন্দে হাতে হাত মেলালেন পণ্ডাবাবু।

পাঁচশো টাকা এখুনি নিয়ে যান। বাকি টাকার জন্যে আর এখানে আসতে হবে না। ওটা ঘরে বসেই পেয়ে যাবেন।

পণ্ডাবাবু তাঁর প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে রেখেছিলেন, মল্লিকা। নিষেধ না করা পর্যন্ত যথানিয়মেই তিনি পাঁচশো করে টাকা পৌঁছে দিয়েছিলেন পূর্ব-নির্দিষ্ট ঠিকানা অনুযায়ী। এ ব্যাপারে কোনদিনও তাঁর দিক থেকে একটুও ভুলচুক হয়নি। বর্তমানে তিনি রৌরকেল্লা স্টীল প্ল্যাণ্টের সঙ্গে যুক্ত। ভাল নাম শৈলেশচরণ দাশগুপ্ত হলেও পণ্ডাবাবু নামেই তিনি সর্বত্র পরিচিত।

এদিকে নেপথ্য-নায়কদের মধ্যে ততদিনে সাড়া পড়ে গেছে নতুন করে। আর ভাবনা নেই। অর্থের কিছুটা সুরাহা হয়ে গেছে। এবার এগিয়ে চলো !

পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও সেই একই রব। আর সময় নেই। এগিয়ে চলো ! এগিয়ে চলো !

হাঁক শোনা গেল ভগৎরামের কণ্ঠে। হুঁশিয়ার ভাই সব, হুঁশিয়ার ! তৈয়ার হো যাও ! টাইম আ গিয়া !

লোকচক্ষুর আড়ালে নিজেকে সরিয়ে রাখলেও সুভাষ কিন্তু সেদিনও লৌহ-কপাটের অন্তরালে অবস্থিত তাঁর বিপ্লবী সতীর্থদের কথা ভুলে যাননি। বড়দিন উপলক্ষে একগাদা কেক্ তিনি পাঠিয়ে দিলেন তাঁদের কথা স্মরণ করে।

বিদায় বন্ধুগণ বিদায় ! আবার কবে দেখা হবে কে জানে ! ভবিষ্যতে আর কোনদিনও দেখা হবে কিনা তাই বা কে বলতে পারে ! তবু তোমাদের কথা আমি ভুলব না। কোনদিনও না।

অবশেষে এল সেই ১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারি। স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের সেই অবিস্মরণীয় দিন।

সুভাষ প্রস্তুত। প্রস্তুত কমরেড ভগৎরাম।

প্রস্তুত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা পেশোয়ারের আকবর শা। প্রস্তুত কীর্তি কিষাণ পার্টির ভারপ্রাপ্ত কর্মীর দল।

প্রস্তুত সত্য বক্সী, যতীশ গুহ, বিনয় সেনগুপ্ত প্রমুখ বি. ভি.-র অন্যতম নেতৃবৃন্দ। লগ্ন আসন্ন। এবার যাত্রা-শুরুর পালা।

রাত তখন একটা বেজে পঁচিশ মিনিট। গোটা এলগিন রোড সুপ্ত, নিস্তব্ধ। আলো নেই। জনমানব নেই। নেই কোলাহল। শুধু দূর আকাশে তারা জ্বলছে মিটিমিটি করে।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন সুভাষ। এবার বেরিয়ে পড়তে হবে। আর সময় নেই।

কিন্তু এ কোন্ সুভাষ ! বিরাট বলিষ্ঠকায় এক পাঠান যুবকের আড়ালে এত দিনকার চেনা সুভাষ যেন নিঃশেষে হারিয়ে গেছেন। মনে হয়, এ যেন কোন ভিন্ন সত্তা। চেনাই যায় না।

এবার যেতে হবে সুভাষকে। এই বাড়ির এই মৃত্তিকা তাঁর কত প্রিয়। কত দিবারাত্রির স্মৃতি জড়ানো এই ঘর। জীবনের মধুগন্ধে ভরা দিনগুলি যেখানে কেটেছে, তাকে ছেড়ে আজ তাঁকে চলে যেতে হবে বৃহত্তম কর্ত্তব্যের প্রেরণায়। এ যে নিশির ডাক! এ ডাক যে একবার শুনেছে, সাড়া যে তাকে দিতেই হবে।

বুঝি একলহমার ব্যাপার, তারপরই সুভাষ নিঃশব্দে নিচে নেমে গেলেন; কোনদিকে দৃক্‌পাত না করে। পেছনে তাকাবার সময় এখন নয়। সামনে কঠিন কঠোর সংগ্রামের দিন। সেই সংগ্রামই এখন তাঁর জীবনে একমাত্র সত্য। একমাত্র লক্ষ্য।

রাত্রির নিস্তব্ধতা কাটিয়ে সহসা একটা প্রাইভেট গাড়ি তীব্রবেগে ছুটে বেরিয়ে গেল এলগিন রোডের বাড়ি থেকে। একটু একটু করে ছোট হতে হতে গাড়িটা একসময়ে মিলিয়ে গেল কুয়াশাচ্ছন্ন গাঢ় অন্ধকারের আড়ালে। আর তাকে দেখা গেল না।

রাত একটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট।

পথ-ঘাট জনমানবশূন্য। প্রাণের কোন স্পন্দনই নজরে পড়ে না আশে-পাশে। শুধু দূরে অক্টোরলনী মনুমেণ্টটা প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে নিস্পন্দ হয়ে।

মাত্র দুটি লোক গাড়িতে। গাড়ির চালক আর সুভাষ।

দুজনেই নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। সব কথা, সব উত্তরই বুঝি হারিয়ে গেছে মৌন রাতের অন্ধকারে।

হাওড়া...বেলুড়...বালি...উত্তরপাড়া...চন্দননগর...

শক্ত হাতে স্টিয়ারিং চেপে বসে আছেন গাড়ির চালকটি।

মাথার ওপর কর্তব্যের গুরুভার। সুভাষ শুধু তাঁর 'রাঙাকাকু'ই নন, ভারতের লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের আশা ও ভরসার একমাত্র প্রতীক। পুলিশের নজর এড়িয়ে, যে করে হোক, তাঁকে নির্দিষ্ট স্থানে পেঁৗছে দিতে হবে।

ভেতরে সুভাষ। আধ-বোজা চোখের কিনারে ঢেউ খেলে যায় ছবির পর ছবি। স্বপ্নের পর স্বপ্ন। ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের এক উজ্জ্বল স্বপ্ন।

লেফ্‌ট্‌ রাইট্‌—লেফ্‌ট্‌ রাইট্‌—লেফ্‌ট—

তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে ভারতের নিজস্ব সেনাবাহিনী। এগিয়ে চলেছে হাজার হাজার মুক্তিকামী তরুণবৃন্দ। চলেছে নারী বাহিনী।

কণ্ঠে তাদের শেকলভাঙার গান। স্বাধীনতায় আমাদের জন্মগত অধিকার। আমরা স্বাধীনতা চাই-ই!

বু-বুম্‌—বুম্‌ম্‌ম্‌ম্‌! বু-ম্‌-ম্‌ম্‌ম্‌ম্‌।

বিস্ফোরণের সংগে সংগে এক এক করে ভেঙে পড়ছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শক্ত ঘাঁটিগুলি। ধ্বসে পড়ছে তাদের দম্ভ ও স্পর্ধার প্রতীক ইউনিয়ন জ্যাক। তার পরিবর্তে লালকেল্লার শীর্ষে পত্‌ পত্‌ করে উড়ছে স্বাধীন ভারতের তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা।

অজ্ঞাতেই বুঝি এক জ্যোতির্ময় পুরুষের ছবি ভেসে ওঠে চোখের সমস্ত দৃষ্টি জুড়ে। বিবেকানন্দ। বীরেশ্বর বিবেকানন্দ।

শক্তি দাও স্বামীজী, শক্তি দাও। এই গুরুদায়িত্ব হাসিমুখে বইবার শক্তি দাও। আশীর্বাদ কর।

চুঁচুড়া-ব্যাণ্ডেল-শক্তিগড়-বর্ধমান-আসানসোল-বরাকর ব্রীজ...

সহসা কি দেখে সজাগ হয়ে উঠলেন গাড়ির চালকটি। সঙ্গে সঙ্গে স্পীডোমিটারের কাঁটাটা কেঁপে উঠল থর থর করে। শুধু স্পীড আর স্পীড!

পূব আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে। অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে একটু একটু করে। আর দেরি নয়। ভোর হবার আগেই নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছতে হবে।

যতই পাঠানের ছদ্মবেশে থাকুন না কেন, সুভাষ সুভাষই। অসাধারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব। অতুলনীয় তাঁর রূপ। ঐ ভুবন-ভোলানো রূপ কি শুধুমাত্র গোঁফ-দাড়ি দিয়ে ঢাকা যায়! না কি তা সম্ভব!

অবশেষে গাড়ি এসে থামল ধানবাদের কাছাকাছি একটা বাংলো-বাড়ির সামনে। আজকের মতো যাত্রা-বিরতি। আবার যাত্রা শুরু হবে সূর্য অস্ত যাবার পরে।

সুভাষের ঠাঁই হল বাইরের ঘরে। এমন কি খাবার-দাবারের ব্যবস্থাও ঐ একই ঘরে।

উপায় কি! হলই বা ইনসিওরেন্স কোম্পানির একজন শিক্ষিত এজেণ্ট, তবু আসলে সে অচেনা অজানা একজন তরুণ পাঠান। জেনে-শুনে তাকে তো আর অন্দর-মহলে ঠাঁই দেওয়া যায় না!

সত্যিই পাঠান। যাকে বলে একেবারে খাঁটি পাঠান। বাংলা কথা না পারেন বলতে, না পারেন বুঝতে। তাই কথাবার্তা যা কিছু হল সবই প্রায় ইংরেজীতে। বেশির ভাগই ইনসিওরেন্স সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে।

বাংলো-ভর্তি বয়-বাবুর্চির দল। কার মনে কি আছে কে বলতে পারে! সুতরাং সাবধানতা দরকার আছে বৈকি!

গোমো জংশন। একপাশে উঁচু পাহাড়ের সারি। নিচ দিয়ে এঁকে-বেঁকে রেললাইন চলে গেছে বহুদূর পর্যন্ত।

রাত তখন অনেক। গোটা পৃথিবী অন্ধকারে আবৃত। মাঝে মাঝে দু-একটা পাখির ডাক ছাড়া আর কোথাও কোনরকম সাড়া-শব্দ নেই।

বেশ খানিকটা দূরে অন্ধকারে আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে আছে একটা প্রাইভেট গাড়ি। ভেতরে মোট চারজন যাত্রী। তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা।

হাওড়া থেকে আগত দিল্লী-কালকা মেলের তখনো অনেকটা দেরি। মনে হয় আরও ঘণ্টা-খানেক অপেক্ষা করতে হবে।

ঘুমন্ত গোমো জংশনটা জেগে উঠল মধ্যরাত্রিতে।

সিগন্যাল ডাউন। গাড়ির সময় হয়েছে। এর মধ্যেই ইঞ্জিনের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে গোটা স্টেশন-অঞ্চলটা।

আস্তে আস্তে প্রাইভেট গাড়িটা এবার এগিয়ে গেল স্টেশনের দিকে। লগ্ন আসন্ন। এবার সুভাষকে বিদায় নিতে হবে। বিদায় দিতে হবে।

নিমেষে প্রস্তুত হয়ে নিলেন সুভাষ। এদিক-ওদিক ভাল করে দেখে নিয়ে পরক্ষণেই তিনি গাড়ি থেকে নেমে প্ল্যাটফরমের দিকে এগিয়ে গেলেন দৃঢ় পদক্ষেপে। বিদায়! এবার তোমরা ফিরে যাও।

রাত্রির অন্ধকারে তিনটি প্রাণী অসাড়, নিস্পন্দ হয়ে তাকিয়ে রইলেন দূরে অপসৃয়মান সুভাষের বলিষ্ঠ দেহটার দিকে।

সুভাষ চলে যাচ্ছেন। কত গ্রীষ্ম, কত বসন্তবেলা, কত কান্না-হাসির মালা গাঁথা দিন, সব পেছনে ফেলে সুভাষ আজ চলে যাচ্ছেন ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করে তুলতে।

ঐ যে গাড়িটা অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে সুভাষকে নিয়ে। ঐ যে তার পেছনের লাল আলোটা ক্রমশ ছোট হতে হতে হারিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে।

হে সর্বত্যাগী রুদ্র সন্ন্যাসী, এ সময়ে চোখের জল ফেলে তোমার যাত্রাপথকে আমরা পিচ্ছিল করে তুলব না।

তুমি যাও। তোমার যাত্রাপথ শুভ হোক।

আবার তুমি ফিরে এসো ব্রত সাঙ্গ হলে। ফিরে এসো স্বাধীন ভারতে। ফিরে এসো বিজয়ীর বেশে। ততদিন আসমুদ্রহিমাচল তোমার পথ চেয়ে থাকবে।

সুভাষের রহস্যময় অন্তর্ধান সম্বন্ধে এ পর্যন্ত তোমাকে যা কিছু বলেছি, তার কোনটাই আমার মনগড়া কথা নয়, মল্লিকা। সুভাষকে তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ নিশ্চয় দেখেছ। দেখেছ ছাত্রনেতা, মেয়র, রাষ্ট্রপতি, ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা—এমন বিভিন্ন সব ভূমিকায়।

কিন্তু দেখেছ কি কোনদিন অনমনীয় বিপ্লবী সুভাষকে?

দেখনি নিশ্চয়ই। শুধু তুমি কেন, অন্তরঙ্গ সহচর বলে যাঁরা চিহ্নিত, তাঁদের মধ্যেই বা ক'জন তাঁর বৈপ্লবিক কর্মধারাকে স্বচক্ষে দেখার মতো সুযোগ পেয়েছেন, বলো?

দেখেছিলেন ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ), রবি সেন, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, অরুণ গুহ, পূর্ণ দাস, অনিল রায় ও লীলা রায় প্রমুখ তখনকার দিনের বিভিন্ন দলের প্রথমশ্রেণীর বিপ্লবী নায়কবৃন্দ—বিশেষ করে হেমচন্দ্র ঘোষ, সত্যরঞ্জন বক্সী, মেজর সত্য গুপ্ত, মণীন্দ্রকিশোর রায় প্রমুখ বি. ভি.-র কর্মকর্তাগণ।

এই বি. ভি.-ই সেদিন তাঁর সেই অন্তর্ধানের ব্যাপারে জড়িত ছিল ওতপ্রোতভাবে। মূল্যও তার জন্য দিতে হয়েছিল যথেষ্ট। দিতে হয়েছিল অফুরন্ত প্রাণ-সম্পদে ভরপুর কয়েকটি অমূল্য জীবন।

সুভাষের রহস্যময় অন্তর্ধান সম্বন্ধে আজ তোমাকে যা কিছু বলছি, তার সবটাই গড়ে উঠেছে সেদিন যাঁরা এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁদের দেওয়া সেই ঐতিহাসিক রিপোর্টকে ভিত্তি করে, কোন কাল্পনিক কাহিনীকে আশ্রয় করে নয়। যাক, পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

গোমো জংশন। ভারাক্রান্ত মনে তিনজন ফিরে এলেন সুভাষকে বিদায় দিয়ে। ফিরে এলেন শূন্য ঘরে। শূন্য মনে। তাঁদের কর্তব্য শেষ। ভগবানের অশেষ করুণা যে, এ ব্যাপারে তাঁদের কোন বড় রকম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়নি।

কে এই তিনজন ?

কে সেদিন মোটরে এত দূর-পথ পাড়ি দিয়েছিলেন সুভাষকে নিয়ে ?

কি তাঁর পরিচয় ?

শিশির বোস। সুভাষের ভাইপো ডাঃ শিশির বোস। তিনিই ছিলেন সেদিন সুভাষের সারথি।

এ সম্বন্ধে শিশিরবাবু পরবর্তী কালে যে বক্তব্য রেখেছিলেন, এখানে তা হুবহু তুলে দিচ্ছি ঃ

'অনশন অবলম্বনের পর নেতাজীকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তিলাভের পর তাঁহার যাত্রার আয়োজন চলিতে থাকে। ১৯৪১ সালের ১৬ই জানুয়ারি রাত্রি ১টা ২৫ মিনিটে আমরা একখানি মোটরযোগে সত্য সত্যই যাত্রা শুরু করিতে সমর্থ হই। আমি ও নেতাজী, মাত্র এই দুইজনেই ঐ গাড়ির আরোহী। নেতাজী পশ্চিমী মুসলমানের পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া একটি সুটকেস, বিছানা ও একটি অ্যাটাচি কেস সঙ্গে লইয়াছিলেন।

এলগিন রোড হইতে যাত্রা শুরু করিয়া কলিকাতা শহর ছাড়াইয়া গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া তীব্রবেগে আমাদের গাড়ি চলিল। সমস্ত রাত্রি চলিবার পর প্রত্যুষে আমরা একস্থানে আত্মগোপন করিলাম।

সন্ধ্যায় আবার যাত্রা শুরু হইল। অধিক রাত্রিতে আমরা কলিকাতা হইতে আনুমানিক ২১০ মাইল দূরবর্তী গোমোতে পৌঁছিলাম। এই দিনটি ছিল ১৯৪১ সালের ১৮ই জানুয়ারি।

শেষরাত্রিতে নেতাজী ট্রেনে উত্তর-ভারত অভিমুখে রওনা হইয়া যান। স্টেশনেই তাঁহার নিকট হইতে আমি বিদায় লইলাম।'

শিশিরবাবুর বক্তব্য এখানেই শেষ। তবু একটা প্রশ্ন রয়ে গেল। তিনি বলেছেন—'প্রত্যুষে আমরা একস্থানে আত্মগোপন করিলাম।'

জায়গাটা কোথায় ? কার বাড়িতে ?

গোমো জংশনে তাঁর সঙ্গে যে আরো দুজন লোক দেখা গিয়েছিল, তাঁরাই বা কে ?

এ প্রশ্নের জবাব রয়েছে পরবর্তী বিবৃতিটির মধ্যে। এ বিবৃতি দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র বোসের বড় ছেলে শ্রীযুক্ত অশোক বোস। তিনি বলেছেন :

'On the 18th January, 1941, at about 5 O'clock in the morning as my wife and I was preparing to sit down for breakfast (at Bararee, Dhanbad), we found my brother Dr. Sisir Bose, driving into the bunglow in one of my father's cars. He told me that, he brought Netaji in disguise out of Calcutta.

In the evening he (dressed as a Pathan) apparently took leave of us and left the bunglow on foot ostensibly to catch a taxi at the nearest stand. The three of us, my brother, my wife and myself, then set out in the car after half an hour's interval and picked him up on the way. We drove along the Grand Trunk Road towards Gomoh.

Near about Gomoh, we stopped on the lonely roadside for an hour or so—as the train was not due to arrive at Gomoh before midnight—for a quite homely chat.

As the time of arrival of the (Delhi-Kalka Mail) train was drawing near, we started for station and on arrival there quickly put him down and drove half a mile or so away from the station and waited for another half an hour after the departure of the train. Having satisfied ourselves that he had boarded the train safely, we then drove back to Dhanbad..'

[১৯৪১ সালের ১৮ই জানুয়ারি সকাল ৫টায় আমি ও আমার স্ত্রী যখন প্রাতরাশের জন্য তৈরি হচ্ছিলাম, তখন আমার ভাই ডাঃ শিশির বোস আমার পিতার একখানা গাড়ি নিয়ে আমাদের বাংলোতে এসে ঢুকলেন এবং আমাদের জানালেন যে, তিনি কলকাতা থেকে ছদ্মবেশী নেতাজীকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন।

সন্ধ্যার দিকে পাঠানের বেশে সজ্জিত হয়ে তিনি আমাদের কাছ থেকে লোক-দেখানো ভাবে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। পায়ে হেঁটেই গেলেন। ভাবটা এই যে, পথে নিকটস্থ ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে নেবেন। আধঘণ্টা বাদে আমরা তিনজন—আমি, আমার ভাই ও স্ত্রী, আমাদের গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম এবং পথ থেকে তাঁকে তুলে নিলাম। তারপর গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড় ধরে গাড়ি চালিয়ে দিলাম গোমোর দিকে।

গোমোর কাছাকাছি গিয়ে আমরা একটা নির্জন পথের ধারে প্রায় ঘণ্টা-খানেক অপেক্ষা করলাম, কারণ, মাঝরাতের আগে ট্রেন আসার কথা ছিল না। এ সময়টা আমরা অল্প-স্বল্প পারিবারিক আলাপ-আলোচনায় কাটিয়ে দিলাম।

ট্রেনের সময় হতেই আমরা স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেলাম এবং তাড়াতাড়ি তাঁকে নামিয়ে দিয়ে প্রায় আধ মাইল দূরে গাড়ি নিয়ে সরে এলাম। ট্রেন ছেড়ে যাবার পরেও প্রায় আধঘণ্টা আমরা সেখানে অপেক্ষা করলাম। তারপর এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে গাড়ি করে ধানবাদ ফিরে এলাম।]

হু-হু করে ট্রেনটা ছুটে চলেছে ব্যাকুল মনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। পেছনে ছুটে যাচ্ছে একের পর এক গ্রাম, শহর, নগর আর অন্ধকারে ঢাকা ছোট ছোট পাহাড়ের সবুজ উপত্যকা।

ভেতরে নিজের আসনে স্তব্ধ হয়ে বসে সুভাষ। সারা মুখে তাঁর দৃঢ় সংকল্পের রেখা। সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। স্বাধীনতার সংগ্রাম।

আর পেছনে তাকাবার সময় নেই। হিসেব-নিকেশেরও ফুরসত নেই। এই মরণপণ সংগ্রামই এখন তাঁকে চালিয়ে যেতে হবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

হয় কূল, নয়তো অতল সমাধি। এ ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই তাঁর চোখের সামনে।

ভিক্ষায় কোনদিনও স্বাধীনতা আসে না। তার জন্য যথাযোগ্য মূল্য দিতে হয়।

এমন কতজনই তো মূল্য দিয়েছেন। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাই-লাল, সত্যেন বোস, চারু বোস, বীরেন দত্তগুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয়, ভগৎ সিং, নীরেন, মনোরঞ্জন, গোপীনাথ, প্রমোদ, অনন্তহরি, বিনয়, বাদল, দীনেশ, আসফাকউল্লা, প্রদ্যোৎ, রামকৃষ্ণ, সূর্য সেন, তারকেশ্বর, প্রীতিলতা, অনাথ, মৃগেন, নির্মল, নবজীবন, রামকৃষ্ণ রায়, ব্রজকিশোর, দীনেশ মজুমদার, ভবানী, কালীপদ, মতি মল্লিক—এমনি আরো কতজন।

জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাঁকেও যদি তেমনি করে মূল্য দিতে হয়, তো তার জন্য তিনি প্রস্তুত। তবু এবারের যুদ্ধে স্বাধীনতা-প্রাপ্তির যে অপূর্ব সুযোগ নিয়ে এসেছে, তাকে তিনি কোনমতেই হেলায় হারাতে রাজী নন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল এমনি করেই।

সুভাষ স্থির, অচঞ্চল। ঘুম আসে না। চোখ বুজে আসে, তবু ঘুম আসে না। আসে রাশি রাশি ভাবনা।

কলকাতার খবর কি, কে জানে! খবরটা পুলিশের কানে গেছে কিনা তাই বা কে বলতে পারে!

না গেলেও এ খবর বেশিদিন তাদের অজানা থাকবে না। তার আগেই তাঁকে বেড়াজাল ডিঙিয়ে চলে যেতে হবে অনেক দূরে, তাদের নাগালের বাইরে।

সহসা কি দেখে অলস দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে সুভাষের। কি একটা স্টেশনে গাড়ি থেমেছে। একজন চেকার এদিকেই যেন এগিয়ে আসছে একটু একটু করে। আরো কাছে।

নিমেষে হাতের খবরের কাগজটা দিয়ে নিজেকে আড়াল করে বসলেন সুভাষ। এ-পথ অতি কঠিন, কঠোর। জীবন ও মৃত্যুর এখানে পাশাপাশি বাস। বাঁকে বাঁকে ওত পেতে আছে ধ্বংস আর সর্বনাশ। বাঁচতে হলে এখন যুঝতে হবে প্রতি মুহূর্তে।

অবশ্য মৃত্যুভয়ে তিনি ভীত নন। মরণ তো বৈশাখী ঝড়। কখন কোন্

দিক থেকে উড়ে আসবে, কেউ তা বলতে পারে না। তা বলে ভীরুর মতো মরতে তিনি রাজী নন। সর্বাগ্রে দেশের মুক্তি, তারপর অন্য কথা।

চেকার সরে যেতেই আবার মুখ থেকে খবরের কাগজটা সরিয়ে নিলেন সুভাষ। যাক, আপাতত নিশ্চিন্ত। তবে প্রতি মুহূর্তে সজাগ থাকতে হবে। চারিদিকে হিংস্র, ক্ষুধার্ত হায়েনার দল। এ অবস্থায় সর্বক্ষণ চোখ-কান খোলা রাখা দরকার।

আবার বাধা। এবার কামরায় ঢুকলেন একজন সম্ভ্রান্ত শিখ ভদ্রলোক। তিনিও অনেক দূরের যাত্রী।

সুভাষের দু চোখে নিবিড় সংশয়। একেবারে মুখোমুখি এসে আসন গ্রহণ করেছেন ভদ্রলোক। ছদ্মবেশটা ধরা পড়ে যাবে না তো ওঁর চোখে?

কিন্তু না, আশঙ্কা অমূলক। চিনতে পারেননি। কোনরকম সন্দেহও করেননি। করা সম্ভবও নয়। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, কোন পাকা ডিটেক্টিভের পক্ষেও এখন সুভাষকে দেখে কোনরকম সন্দেহ করা সম্ভব নয়। কারণ, এ সুভাষ সে সুভাষ নয়।

পরনে শেরওয়ানী ও আঁটো-সাঁটো পায়জামা। মাথায় ফেজ। সারামুখে একদঙ্গল দাড়ি। দেখে মনে হয় ঠিক যেন কোন খাঁটি মৌলবী সাহেব।

—আপনি কোথায় যাবেন সাহেব? সহজ অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন শিখ ভদ্রলোক।

—আমি! বিশুদ্ধ উর্দুতে জবাব দিলেন সুভাষ, আমি যাব রাওয়াল-পিণ্ডি।

—ওখানেই থাকেন বুঝি?

—না, দেশ আমার লক্ষ্ণৌতে। পেশায় ইনসিওরেন্স অর্গানাইজার। তাই মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে যেতে হয় ব্যবসায়িক প্রয়োজনে।

—আপনার নাম?

—জিয়াউদ্দিন। মৌলবী জিয়াউদ্দিন।

এমনি অনেক কথা। অনেক প্রশ্ন। প্রায় সারাদিন ধরে। তবে নিছক কথাই। একমাত্র সহজ সরল আন্তরিকতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না তার পেছনে। সামান্য ইঙ্গিতও না।

ওদিকে ততক্ষণে সাড়া পড়ে গেছে পাঞ্জাবের কীর্তি কিষাণ পার্টির সভ্যদের মধ্যে। সুভাষবাবু রওনা দিয়েছেন। সবাই সতর্ক থাক। দেখো, হিসেবে যেন কোথাও গরমিল না হয়।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা পেশোয়ারের আকবর শারও সেদিন ব্যস্ততার সীমা নেই। সুভাষবাবু আসছেন। লাইন ক্লিয়ার কর। দুশমনদের ওপর নজর রাখ। সব ঝুঠ-ঝামেলা হটিয়ে দাও।

আর সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী কমরেড ভগৎরামের তো কথাই নেই। উপজাতীয় এলাকায় মুহুর্মুহুঃ তাঁর হাঁক শোনা যেতে লাগল, হুঁশিয়ার ভাইসব হুঁশিয়ার! শেরকা বাচ্চা আ গিয়া। হাতিয়ার লেকে সব তৈয়ার হো যাও। জান কবুল!

পেশোয়ার সিটি স্টেশন। গাড়ি আসার সময় হয়েছে। সিগন্যাল ডাউন।

প্ল্যাটফরমের এক কোণে নিজেকে যথাসম্ভব আড়াল করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা আকবর শা। এ গাড়িতে সুভাষবাবু আসছেন। বাংলার শের সুভাষ বোস।

বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও ভেতরে ভেতরে কিন্তু আকবর শার মনে তখন ঝড় বইছে। দুরন্ত ঝড়।

জোর লড়াই চলছে এখন গোটা ইয়োরোপ জুড়ে। স্বভাবতই ফ্রণ্টিয়ার এখন অত্যন্ত সুরক্ষিত, অত্যন্ত সজাগ। তাদের নজর এড়িয়ে কি সুভাষবাবুকে এখান থেকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে?

খোদা মেহেরবান! কি আছে তাঁর মনে, কে জানে!

দেখতে দেখতেই কোলাহলে মুখর হয়ে উঠল গোটা স্টেশন-অঞ্চলটা। গাড়ি ইন করেছে। শুরু হয়েছে যাত্রীদের ওঠা-নামার পালা।

টুক্ করে সামনের একটা কামরায় উঠে পড়লেন আকবর শা। সুভাষবাবু এখানে নামবেন না। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁকে নামানো হবে পরবর্তী স্টেশন পেশোয়ার ক্যাণ্টনমেণ্টে।

তিনি কোথায়, কোন শ্রেণীতে, কত নম্বর কামরায় রয়েছেন খুঁজে দেখবার কোন প্রয়োজন নেই ; ইতিমধ্যেই তাঁর কাছে সে-সব রিপোর্ট এসে গেছে। সুতরাং অহেতুক ব্যস্ততার কোন কারণ নেই।

দেখতে দেখতেই এসে গেল পেশোয়ার ক্যাণ্টনমেণ্ট। দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার পরে এবার যাত্রা-বিরতি।

সর্বাগ্রে নেমে গেলেন আকবর শা। তারপর তিনি সোজা গেটের দিকে হাঁটতে শুরু করে দিলেন দিব্যি ভালমানুষটির মতো।

কি দরকার অকারণ ব্যস্ততা দেখিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি করে! সুভাষবাবু ঠিক চলে আসবেন তাঁর পেছনে পেছনে। তা-ই ব্যবস্থা হয়ে আছে আগে থেকে।

গেট দিয়ে বেরিয়ে এবার একেবারে সোজা রাস্তায় গিয়ে পা দিলেন আকবর শা।

এখানে-ওখানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে কয়েকটি তরুণ পাঠান। আকবর শাকে দেখেই সহসা কিসের একটা ইঙ্গিত খেলে গেল তাদের চোখের তারায়। হুঁশিয়ার! বাঙ্গাল-কা শের সুভাষবাবু আজ আমাদের সম্মানিত অতিথি। তাঁর ভাল-মন্দ কিছু হলে সে লজ্জা শুধু তোমার-আমার নয় গোটা পাঠান মুলুকের। সুতরাং হুঁশিয়ার! হাতিয়ার তৈয়ার রাখ।

হিসেবে ভুল হল না। পেছনে পেছনে পাঠান-বেশী সুভাষ দিব্যি বেরিয়ে এলেন পাঠানের মতোই বুক-টান করে। তারপর সামনের একটা টাঙ্গায় সোজা চেপে বসলেন কোনদিকে দৃক্‌পাত না করে।

বুঝি একলহমার ব্যাপার, পরক্ষণেই টাঙ্গা গাড়িটা সুভাষকে নিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল ঝড়ের গতিতে। কোন কিছু প্রশ্নেরও প্রয়োজন হল না। কোথায় যেতে হবে টাঙ্গাওয়ালা তা ভাল করেই জানে।

পেছনে পেছনে অন্য একটা টাঙ্গা নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করে চললেন

আকবর শা। সারা মনে তাঁর কূলপ্লাবী আনন্দ। একটা বিপুল পরিতৃপ্তি।

খোদা সত্যিই মেহেরবান। এবারের মতো বিপদ কেটে গেছে। খোদার মর্জিতে এখন বাকি কাজগুলো যদি এমনি করে হাসিল করা যায়, তো ভাবনার আর কোন কারণ নেই।

টাঙ্গা থামল তাজমহল হোটেলের সামনে গিয়ে। এবার নামতে হবে। আপাতত এখানেই সুভাষের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

টাঙ্গা থেকে নেমে অত্যন্ত পরিচিত ভঙ্গিতে সুভাষ ঢুকে গেলেন হোটেলের অভ্যন্তরে। কোথায়, কোন্ কামরা, কোন কিছু জিজ্ঞেস করারও প্রয়োজন হল না। সব কিছুই তাঁর কণ্ঠস্থ।

আকবর শা কিন্তু নামলেন না। টাঙ্গা নিয়েই সোজা তিনি চলে গেলেন বিশেষ একটি আস্তানার উদ্দেশ্যে। সুভাষবাবু নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেছেন। খবরটা তাদের জানিয়ে দেওয়া দরকার।

বোধহয় ঘণ্টাখানেকও হয়নি। সহসা বাইরে কার মৃদু, সতর্ক করাঘাত শোনা গেল—ঠক্-ঠক্—ঠক্-ঠক্!

দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকলেন একটি বলিষ্ঠ পাঠান। দীর্ঘদেহী সুদর্শন যুবক। দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় বুদ্ধির পরিচয় সুপরিস্ফুট।

সুভাষের চোখে-মুখে সপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা। কে এই যুবকটি? কি ওর পরিচয়?

—আমার নাম আব্দুল মজিদ খাঁ। হাসলেন যুবকটি, আমার বড়ভাই আব্দুল কাউম খাঁকে হয়তো আপনি চিনে থাকবেন। তিনি এখানকার মুসলিম লীগ নেতা।

মুসলিম লীগ! নিমেষে দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল সুভাষের। কি ব্যাপার! কি বলতে চায় ও?

—তবে আমি আকবর শার পার্টির লোক। তেমনি করেই হাসলেন যুবকটি, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার কাছে। বলে দিয়েছেন—সব ঠিক আছে। কাল ভোরেই আপনাকে এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে। আপনি প্রস্তুত থাকবেন। আমি এখন যাচ্ছি। ফিরে গিয়ে আকবর শার কাছে আবার রিপোর্ট দিতে হবে। আদাব!

কথামতো পরদিন ভোরেই হোটেল থেকে সুভাষকে সরিয়ে নেওয়া হল একটা গোপন আস্তানায়।

কিন্তু তাঁকে কাবুল পর্যন্ত পৌঁছে দেবার সমস্ত দায়িত্ব যিনি স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নিয়েছেন, সেই দুরন্ত দুঃসাহসী কর্মী কমরেড ভগৎরাম কোথায়? তাঁর সঙ্গে যে একবার দেখা হওয়া প্রয়োজন।

দেখা হল ২১শে জানুয়ারি বিকেল চারটেয়। সে কি আনন্দ ভগৎরামের! ইয়া! ইয়া! এই তো শেরকা বাচ্চা আ গিয়া! সব তৈয়ার। এখন শুধু হুকুমের অপেক্ষামাত্র। জান কবুল!

তবু দেরি হল। দেরি হল বেশ কয়েক দিন।

তার কারণও ছিল। ইতিমধ্যে কীর্তি কিষাণ পার্টির তরফ থেকে তাদের পূর্বেকার প্রোগ্রামের কিছু অদল-বদল করা হয়েছে। ঠিক হয়েছে—আগেকার

পথের পরিবর্তে সুভাষকে যেতে হবে অন্য একটি নতুন পথ দিয়ে।

এ পথ যেমন দুর্গম, তেমনি বিপদসংকুল। তবু কোন উপায় নেই। খাজুরি ময়দান হয়ে আফ্রিদি এলাকার ভেতর দিয়ে 'শিনওয়ারি' অতিক্রম করে যেতে পারলে দূরত্ব অনেকটা কম পড়বে। সুতরাং সব দিক বিবেচনা করে এটুকু ঝুঁকি তাঁকে নিতেই হবে।

ফলে, মুশকিল হয়েছে ভগৎরামের। আগেকার রাস্তার প্রতিটি খুঁটি-নাটি ব্যপার ছিল তাঁর নখদর্পণে। কিন্তু এই পথ সম্বন্ধে তিনি ততটা ওয়াকিবহাল নন। সুতরাং সর্বাগ্রে দরকার একজন ভাল গাইড। গাইড ছাড়া এই অচেনা অজানা দুর্গম পথে এক পা-ও এগুনো সম্ভব নয়।

মনটা সায় দেয় না সুভাষের। ইতিমধ্যে তাঁর অন্তর্ধানের খবর পুলিশ জেনে ফেলেছে কিনা কে জানে! না জানলেও দু-একদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই জানবে। সে অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গেই যে তাঁর গতিরোধ করার জন্য তারা তৎ-পর হয়ে উঠবে, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং দেরি করা কোনরকমেই সংগত নয়।

এমনি একদিনের কথা। রাত তখন অনেক। হঠাৎ কি শুনে দারুণভাবে চমকে উঠলেন সুভাষ। কাদের যেন দূরাগত কণ্ঠ ভেসে আসছে—পাকড়ো! পাকড়ো!

শুনে সঙ্গে সঙ্গেই সুভাষ ছুটতে শুরু করে দিলেন কোনদিকে দৃক্-পাত না করে। এ সময়ে কোনমতেই তাঁর ধরা দেওয়া চলবে না। ধরা দেওয়া মানেই তো স্বাধীনতা-সংগ্রামকে পিছিয়ে দেওয়া। প্রাণ থাকতে তা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

তবু রেহাই নেই। পেছনে পেছনে সমানে তেড়ে আসছে সেই হিংস্র হায়েনার দল। মুখে তাদের সেই একই রব—পাকড়ো! পাকড়ো! ঐ যে পালাচ্ছে! ধরো ওকে!

আচমকা ঘুম ভেঙে গেল বিরাট একটা ঝাঁকুনি খেয়ে। স্বপ্ন! ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছিলেন এতক্ষণ।

কিন্তু যদি স্বপ্ন না হত! যদি তাঁর সন্ধান পেয়ে সত্যি সত্যিই পুলিশ আজ এখানে এসে হানা দিত!

না, আর দেরি নয়। যেভাবে হোক, যে কোন মূল্যে হোক, বিশ্বস্ত একজন গাইড সংগ্রহ করা চাই। অবিলম্বেই চাই। এভাবে আর ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না।

গাইড পাওয়া গেল ১৯৪১ সালের ২৫শে জানুয়ারি বিকেলে। সঙ্গে সঙ্গে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল সর্বত্র। আর দেরি নয়। আজ ২৫শে জানুয়ারি। যাত্রা শুরু হবে আগামী কাল ভোররাত্রে। স্বাধীনতা দিবসের পুণ্যলগ্নে।

১৯৪১ সাল। ২৬শে জানুয়ারি।

ভারতের দিকে দিকে সেদিন নবজীবনের সাড়া। সবার কণ্ঠে নতুন শপথ। আজ স্বাধীনতা দিবস। আমরা স্বাধীনতা চাই।

কি আশ্চর্য যোগাযোগ! পেশোয়ার ত্যাগ করে সুভাষ দুর্গম গিরিপথে পা বাড়ালেন কিনা সেই স্বাধীনতা দিবসেরই পুণ্যলগ্নে।

সামনে দুর্ধর্ষ উপজাতীয় এলাকা। জীবন ও মৃত্যুর সেখানে পাশাপাশি বাস। যে কোন মুহূর্তে কিছু একটা বিপদ ঘটে যাওয়াও বিচিত্র নয়। তবু এ ব্যাপারে তিনি স্থির, দৃঢ়সংকল্প।

স্বাধীনতা শিশুর হাতের খেলনা নয়। চাইলেই তাকে পাওয়া যায় না। তার জন্য চাই শক্তি। চাই সংগ্রাম। চাই ব্যাপক প্রস্তুতি। সেই প্রস্তুতির জন্যই আজ তাঁর বাইরে যাওয়া প্রয়োজন।

তখনো রাতের অন্ধকার কাটেনি। সবেমাত্র পূব আকাশটা ফর্সা হতে শুরু করেছে একটু একটু করে।

শুরু হল ঐতিহাসিক যাত্রা।

মোট পাঁচজন যাত্রী গাড়িতে। সুভাষ, কমরেড ভগৎরাম, গাইড, আবাদ খাঁ ও ড্রাইভার।

পেশোয়ার মিলিটারী ক্যাম্পের গা-ঘেঁষে গাড়িটা ক্রমশ এগিয়ে গেল শহরের সীমানা পেরিয়ে অনেক দূরে। লক্ষ্য—১১ মাইল দূরবর্তী 'খাজুরি ময়দান'।

চারিদিকে ঢেউ-খেলানো উপত্যকা। মাঝ দিয়ে এঁকে-বেঁকে চলে গেছে পাহাড়ী পথ।

পথের দু ধারে নানা জাতীয় বুনো ঘাস। কোথাও বা এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে আছে বড় বড় পাথরের চাঁই।

বহু দূর-দূর আকাশের বুক ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক-একটা ছায়া-ছায়া পাহাড়। তখনো তাদের ঘুম ভাঙেনি।

পূব আকাশে নতুন দিনের নতুন সূর্য ওঠে। মনে হয়, প্রকৃতির বুকে কে যেন রঙ ছড়িয়ে দিয়েছে মুঠি মুঠি।

গাড়ি এসে থামল খাজুরি ময়দানে। ড্রাইভার ও আবাদ খাঁকে এখান থেকেই বিদায় নিতে হবে। তারপর শুরু হবে পদযাত্রা।

সামনেই গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে দুটি খাড়া পাহাড়। তারই মাঝের ঢালু জায়গাটা দিয়ে চলে গেছে উঁচু-নিচু পায়ে-চলা পথ।

গাইডের নির্দেশে সেই গিরিপথ ধরেই সুভাষ এবার এগিয়ে চললেন ভগৎরামকে সঙ্গে নিয়ে। বিদায় বন্ধুগণ, বিদায়! তোমরা এবার গাড়ি নিয়ে পেশোয়ার ফিরে যাও। আকবর শাকে আমার কথা বোল। অনেক ধন্যবাদ তাঁকে।

শুরু হল উঁচু-নিচুর লুকোচুরি খেলা। পথ কখনো উঠছে, কখনো নামছে। দু পাশে প্রায় নিরেট পাথরের প্রাচীর। তারই মাঝ দিয়ে চলে গেছে দুর্গম পাহাড়ী পথ।

সবার আগে গাইড। মাঝখানে সুভাষ। ঠিক পেছনেই অতন্দ্র প্রহরী কমরেড ভগৎরাম।

দুর্ধর্ষ উপজাতীয় অঞ্চল। কখন যে অলক্ষ্য থেকে চোরাগোপ্তা রাইফেলের গুলী ছুটে এসে কণ্ঠকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেবে, কেউ তা বলতে পারে

না। এ সময়ে সুভাষকে এক মুহূর্তও তিনি তাঁর চোখের আড়াল হতে দিতে রাজী নন।

সুভাষের চোখের তারায় অজ্ঞাতলোকের স্বপ্ন। আরণ্যক পৃথিবীর এ কি ভয়ংকর রূপ! শহরের কোলাহল থেকে অনেক দূরে এ যেন এক স্বতন্ত্র জগৎ। বহু দিনের চেনা পৃথিবীর সঙ্গে কোথাও যেন এর এতটুকু মিল নেই।

দেখতে দেখতে প্রকৃতির চেহারাটাই পাল্‌টে গেল। শুধু পাথর আর পাথর! রুক্ষ ধূসর পাথর। শক্ত পাথরের ওপর পাথর উঠে গিয়ে নীল আকাশের বুকে মিশে গেছে।

পথ বলেও কিছু নেই। এখানে-ওখানে পাথরের ফাটলের ফাঁকে ফাঁকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় বনস্পতির দল। তাদের শাখায় শাখায় জড়াজড়ি। ডালে ডালে জাল বোনা।

মাঝে মাঝে লতাগুলি পরস্পর জড়াজড়ি করে পথকে করে তুলেছে দুর্ভেদ্য। কোথাও নিচু হয়ে, কোথাও বা হামাগুড়ি দিয়ে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।

এখানে-ওখানে ছড়ানো পাথরের চাঁইগুলো রীতিমত বিপজ্জনক। কখন যে পায়ের চাপে হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়বে, কারো পক্ষেই তা বলা সম্ভব নয়।

তাছাড়া যেমন আর্দ্র, তেমনি পিচ্ছিল। প্রায় সর্বত্রই পাথরের গায়ে শ্যাওলা জমেছে। অসম্ভব শ্যাওলা।

তবু সবার সঙ্গে সমান তালে সুভাষ এগিয়ে চললেন চড়াই-উৎরাই ভেঙে।

স্বাধীনতা তাঁর জীবন-স্বপ্ন। সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে করে হোক, সীমান্তের ওপারে তাঁকে যেতেই হবে।

বলা সহজ, কিন্তু কাজটা মোটেই সহজ নয়, মল্লিকা।

ভগৎরাম এবং গাইড, দুজনেই এ পরিবেশে পথ চলতে অভ্যস্ত। পাহাড়ী কামনা আর বাসনা নিয়েই তাঁরা এই অবারিত নীল আকাশের বুকে বড় হয়ে উঠেছেন একটু একটু করে। তাই চলার পথে কোথাও তাঁদের এত-টুকু আড়ষ্টতা নেই। জড়তা নেই। স্রোতস্বিনীর মতোই সহজ, সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ তাঁদের গতি।

কিন্তু সুভাষ সম্বন্ধে সেকথা খাটে না। সমতল ভূমির সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের স্নিগ্ধ ছায়ায় তিনি মানুষ। এ-পথের ভয়ংকরতা সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ ধারণাও তাঁর নেই। এ অবস্থায় এই দীর্ঘ বন্ধুর পথ পাড়ি দেওয়া যে কি কষ্টকর, তা একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কারো পক্ষে কল্পনা করাও বুঝি সম্ভব নয়।

তবু সুভাষের পথ চলার বিরাম নেই। ক্লান্তিতে সর্বাঙ্গ ছেয়ে আসছে, আসুক। দেহ টলছে, পা কাঁপছে অসহ্য যন্ত্রণায়, বোবা বুকটা ফেটে পড়তে চাইছে,—যাক। তবু যেতে হবে।

এ আর কতটুকু পথ! এখনো দুস্তর পথ তাঁকে পাড়ি দিতে হবে। শুধু ভাগ্যদেবতাই জানেন, পথের শেষে তাঁর জন্য কি অপেক্ষা করে আছে। আশীর্বাদ, না অভিশাপ!

দুপুরের রোদ চনচনে হয়ে আসে। দিগন্তজোড়া আরণ্যক ভূমি খাঁ-খাঁ করছে অসীম শূন্যতায়।

সামনেই উঠে গেছে একটা খাড়া পাহাড়। পাহাড়টা কত উঁচু অনুমান করা শক্ত। কারণ, তার শৃঙ্গটা ঢাকা পড়ে গেছে সাদা বরফের অন্তরালে।

সবাই এসে থামলেন এই পাহাড়ের নিচে। বড্ড ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে। একটু বিশ্রাম দরকার।

কিন্তু এ পর্যন্ত কতটা পথ আসা হয়েছে খাজুরি ময়দান থেকে?

মাত্র দেড় মাইল।

দেড় মাইল! কেমন যেন একটা হতাশার সুর বেজে ওঠে সুভাষের কণ্ঠে, মাত্র দেড় মাইল। বর্ডার পার হতে এখনো তাহলে অনেকটা বাকি?

বর্ডার! ভগৎরাম অবাক। বর্ডার তো কখন পেরিয়ে এসেছি!

পেরিয়ে এসেছি! এতক্ষণে সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত অবসাদ যেন নিমেষে দূর হয়ে গেল সুভাষের। জয় বীরেশ্বর বিবেকানন্দ! অশেষ করুণা তোমার। বিপদ কেটে গেছে।

আলু-সিদ্ধ ও ডিম সহযোগে ভোজন-পর্ব সেরে নেওয়া হল এখানে। তারপর বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম।

বিশ্রাম করার মতো জায়গাই বটে। চারিদিক অসম্ভব ধরনের নির্জনতা। সবটা মিলিয়ে বিরাজ করছে এক অপার্থিব ধরনের স্তব্ধতা।

এমন কি পাখির কলবর পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে গেছে। তদুপরি নিবিড় অন্ধকার। মাথার ওপর আকাশ দেখা যায় না। পাহাড়ে পাহাড়ে সব আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

কিছুক্ষণ পরেই আবার শুরু হল এগিয়ে যাবার পালা। অনেকটা পথ যেতে হবে আজ, তবেই রাত কাটানোর মতো আস্তানা মিলবে। নয়তো পথই একমাত্র ভরসা।

শীতের অপরাহ্ণ। দেখতে দেখতে ধোঁয়ার নিবিড় আস্তরণের মতো ঘন কুয়াশা নেমে এল পাহাড়ের ঢাল গড়িয়ে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে চললেন তিনজন। রুক্ষ উঁচু-নিচু বন্ধুর পথ। একটু অসতর্ক হলেই বিপদ। সামান্য এদিক-ওদিক হলে মারাত্মক কিছু দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

সূর্য ঢলে পড়েছে উঁচু পাহাড়ের আড়ালে। আলো-আঁধারির খেলা শুরু হয়েছে পাহাড়ের মাথায় মাথায় আর চড়াই-উৎরাইয়ের ভাঁজে ভাঁজে। একটু পরেই দিশাহীন প্রান্তরের বুকে নেমে আসবে সন্ধ্যার ম্লান ছায়া।

ঊর্ধ্বশ্বাসে তিনজন এগিয়ে চললেন বড় বড় পা ফেলে। আরো জোরে। আরো! সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। এখনো অনেকটা পথ বাকি। কুইক মার্চ!

দেখতে দেখতে আকাশ থেকে সূর্যাস্তের শেষ রঙটুকু মুছে গেল। প্রান্তরের দিক থেকে নেমে এল অন্ধকারের কালো যবনিকা।

সহসা কি দেখে নিবিড় সংশয় ঘনিয়ে এল ভগৎরামের চোখের তারায়। ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। মনে হয় ঝড় উঠবে। মেঘের কুণ্ডলীতে যেন তারই আভাস।

অনুমান মিথ্যে হল না।

শুরু হল উন্মত্ত হাওয়ার মাতামাতি। গাছ-পালা সব দুলে দুলে সারা। হাওয়ার বেগে বড় বড় গাছগুলো এক-একবার মাটিতে নুয়ে পড়ে পর-ক্ষণেই আবার মাথা তুলে উঠতে লাগল আকাশের দিকে। বিদ্যুৎ চমকে উঠল আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। ঘূর্ণি হাওয়ায় ঘুরপাক খেতে লাগল রাশি রাশি ঝরা পাতা।

পাহাড়ের বুকে মসীকৃষ্ণ অন্ধকার। দু হাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যায় না।

তদুপরি ধূলি-ঝঞ্ঝা। উদ্দাম বাতাসের ঝাপ্‌টায় ছোট ছোট নুড়িগুলো ছিট্‌কে এসে দৃষ্টিকে অন্ধ করে দেয় যেন।

পাহাড়ী এলাকায় ঝড় উঠেছে। দুরন্ত ঝড়।

শুধু পাহাড়ী এলাকায় নয়, কলকাতার বুকেও কিন্তু সেদিন কম ঝড় ওঠেনি, মল্লিকা।

পর পর কয়েকটা মামলা ঝুলছে সুভাষের নামে। অবিলম্বে কোর্টে হাজির না হলেই নয়।

কিন্তু কোথায় সুভাষ! আশ্চর্য, কোথাও তিনি নেই! তন্ন-তন্ন করে সর্বত্র খোঁজা হয়েছে, কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান মেলেনি।

একটা বিস্মিত আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা ভারতবর্ষ। সুভাষ নিখোঁজ! কি করে এটা সম্ভব হল!

সাদা পোশাকে মোট বাষট্টি জন গোয়েন্দা কর্মচারীকে নিযুক্ত রাখা হয়েছিল তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য। তাদের নজর এড়িয়ে কি করে তাঁর পক্ষে অন্যত্র চলে যাওয়া সম্ভব হল! এ যে অভাবনীয়! অকল্পনীয়! অবিশ্বাস্য!

খবর শুনে সঙ্গে সঙ্গে তার পাঠালেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। তার পাঠালেন গান্ধীজী। কোথায় গেল সুভাষ? চিন্তিত আছি। সত্বর তার খবর জানাও।

কি জবাব দেবেন মেজদা শরৎবাবু? বলার আছেই বা কি?

সুবি যে তাঁর বড় আদরের। বড় গর্বের। ব্যথা-বেদনায় বুকটা ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে চাইলেও যে আজ তাঁকে মুখের হাসি জিইয়ে রাখতে হবে সর্বক্ষণ। তাই সব কিছু জেনেও বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে তাঁকে বলতে হল অন্য কথা।

সাধুসঙ্গের আকর্ষণে গৃহত্যাগ করা সুবির পক্ষে নতুন কিছু নয়। এবারও তেমনি কিছুই একটা হবে হয়তো।

একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেল ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা পাঞ্জাবের সর্দার

শার্দুল সিং কবি শের-এর মুখে। সুভাষবাবু নিশ্চয়ই কোন উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে গৃহত্যাগ করেছেন। এমনি একটা আভাসই তিনি আমাকে দিয়েছিলেন কিছুদিন আগে।

ভবী ভোলবার নয়, তাই সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল আহত সিংহের অন্তিম আর্তনাদ। শুরু হল ক্ষণে ক্ষণে সতর্ক নির্দেশ।

হ্যালো নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার, হ্যালো পেশোয়ার মিলিটারী ক্যাম্প হ্যালো সুর্মাভ্যালি লাইট হর্স রাইফেলস, হ্যালো ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস, সরকার বাহাদুরের পয়লা নম্বর শত্রু সুভাষ বোস পালিয়েছে। প্রতিটি ঘাঁটির ওপর কড়া নজর রাখো। কোনরকমেই যেন সে বর্ডার পেরিয়ে যেতে না পারে।

হ্যালো দিল্লী, বম্বে, করাচী, মাদ্রাজ, রেঙ্গুন, হংকং, মালয়, সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্ট, প্রতিটি যাত্রীকে ভাল করে ওয়াচ্ কর। প্রতিটি পাশপোর্ট নতুন করে পরীক্ষা কর। কোনরকম সন্দেহ হলেই আটক করবে।

হ্যালো কোচিন, ভাইজাগ, মাদ্রাজ, ক্যালকাটা, বম্বে, করাচী পোর্ট, প্রতিটি বিদেশী জাহাজ তন্ন-তন্ন করে অনুসন্ধান কর। প্রতিটি নৌকার ওপর নজর রাখো। যে করে হোক, সুভাষ বোসকে ধরা চাই-ই।

সব বৃথা। কোথায় সুভাষ বোস! মাত্র ঘণ্টাখানেক আগেই পাখি শিক্‌লি কেটে পালিয়ে গেছে সীমান্তের ওপারে। হাজার হাঁক-ডাক করলেও আর কোনদিনই তাঁর নাগাল পাওয়া যাবে না।

সামান্য একপশলা বৃষ্টির পরেই অসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ল বর্ষণস্নাত আরণ্যক ভূমি। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে উঁকি দিল একফালি বাঁকা চাঁদ।

আবার শুরু হল যাত্রা।

চন্দ্রালোকে রহস্যময় বনপথ। দু পাশে বৃষ্টি-ধোয়া গাছের সারি। মাঝে মাঝে পাতা থেকে জল ঝরছে টুপ্ টুপ্ করে।

যাত্রাবিরতি ঘটল রাত ঠিক বারোটায়। গাঁয়ের নাম 'পিশকান ময়না'। সুভাষ তখন রীতিমত ক্লান্ত। একে পথ-পরিক্রমার ক্লান্তি, তদুপরি অসহ্য শীত। সর্বাঙ্গে সূচের মতো বেঁধে যেন।

সামনেই একটা মসজিদ।

এগিয়ে গিয়ে ভগৎরাম এবার তার বন্ধ দরজার গায়ে সন্তর্পণে আঘাত করলেন—ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্!

কিছুক্ষণ বাদেই কে একজন দরজা খুলে দিল ঘুম-ঘুম চোখে।

ভেতরে জন-পঁচিশেক লোক। প্রায় সবাই ঘুমে অচেতন মেঝেতে শয্যা পেতে। মাত্র দু-একজন তখনো জেগে রয়েছে প্রচণ্ড শীতের সঙ্গে লড়াই করে।

—আমরা পথিক। পুস্তু ভাষায় জানালেন ভগৎরাম, পেশোয়ার থেকে আসছি। আজকের রাতটা এখানেই থাকব বলে মনস্থ করেছি। কিন্তু বড় ক্ষুধার্ত। কিছু খাবারের ব্যবস্থা হয় না দোস্ত!

শহর থেকে অনেক দূরে বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে এ যেন এক আলাদা পৃথিবী।

লোক-সংখ্যার বেশির ভাগই উপজাতীয়। জাগতিক সুখ-দুঃখের হিসেব-নিকেশ নিয়ে কোনদিনই তারা বড় একটা মাথা ঘামায় না।

সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম, তারপরই একটি পরিপূর্ণ নিটোল ঘুম। এর চাইতে বড় কাম্য বুঝি তাদের কাছে আর কিছুই নেই।

তবুও ভগৎরামের কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গেই তারা কিছু 'মেজ'-এর রুটি ও চায়ের ব্যবস্থা করে দিল ক্ষুধার্ত অতিথিদের জন্য। স্বাধীনতাপ্রিয় উপজাতীয়দের কাছে অতিথি সব সময়েই আপন জন।

খাওয়া শেষ। এবার শোবার পালা। দেখতে দেখতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল একে একে।

ঘুম নেই শুধু সুভাষের চোখে। আসা সম্ভবও নয়।

ঘরে একটা মাত্র দরজা, তাও ভেতর থেকে বন্ধ। জানালারও কোন বালাই নেই।

এদিকে শীতের জন্য একপাশে আগুন জ্বলছে গন্‌গন্‌ করে। অসহ্য ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসে। চোখ জ্বালা করে। বুক ফেটে যেতে চায়।

বাইরে হাড়-কাঁপানো শীত। বৃষ্টিধারার মতো তুষারপাত চলছে ঝুর ঝুর করে।

সঙ্গী ভগবৎরামকে নিয়ে আস্তে আস্তে একসময়ে বেরিয়ে এলেন সুভাষ। তারপর সেই তুষারপাতের মধ্যেই বড় একটা আলগা পাথরের ওপর চুপচাপ বসে রইলেন বহুক্ষণ পর্যন্ত। ভেতরের ঐ অসহ্য অবস্থার চাইতে বাইরের তুষারপাত অনেক ভাল। অনেক আরামের।

প্রহরের পর প্রহর কেটে গেল এমনি করেই।

পাহাড়ের বুকে নিবিড় কালো মসীকৃষ্ণ অন্ধকার। চারপাশে কেমন যেন অপার্থিব নিস্তব্ধতা। বাতাস স্তব্ধ। প্রাণের সাড়াশব্দও নেই আশে-পাশে।

তদুপরি বড় বড় গাছগুলি অতিকায় দৈত্যের মতো জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে ভয়াল মূর্তিতে। অজ্ঞাতেই যেন বুকটা ছম্‌ছম্‌ করে ওঠে।

সুভাষ তেমনি নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। দৃষ্টি তাঁর সুদূরে সীমাবদ্ধ। কেমন যেন ধ্যান-মৌন বলে মনে হয় দূরের ঐ ছায়া-ছায়া পাহাড়টাকে।

দূর-দিগন্তের সীমারেখায় সে যেন কালের প্রহরী। মানবসভ্যতার ক্রম-বিবর্তনের সঙ্গে কোথাও বুঝি তার এতটুকু যোগাযোগ নেই।

মনটা সায় দেয় না ভগৎরামের। সুভাষবাবু এখন আর সুভাষবাবু নন, একজন খাঁটি পাঠান। পাঠানকে পাঠানের রীতিনীতিতেই অভ্যস্ত হতে হবে, নইলে সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং তাঁর ঘরে ফিরে যাওয়া উচিত।

যুক্তিটাকে অস্বীকার করতে পারলেন না সুভাষ। তাই আবার তিনি ফিরে গেলেন সেই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে। ভেতরে সেই দম বন্ধ করা নিবিড় ধোঁয়ার আস্তরণ। সেই অসহ্য গুমোট। কিন্তু উপায় কি!

ঘণ্টাখানেক বাদেই আবার সুভাষ অতি সন্তর্পণে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন বাইরের খোলা হাওয়ায়। এমনি করে বেশ কয়েকবার।

অসহ্য! অসহ্য! কি যেন একটা নীরব ধ্বংস আর নিষ্ক্রিয় প্রাণহীনতা মুখ বুজে অপেক্ষা করছে ঐ বন্ধ ঘরটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। অনভ্যস্ত জীবনে বেশিক্ষণ তাকে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

এমনি করে বার বার ঘর-বার করতে করতেই একসময়ে অন্ধকার তরল হয়ে এল একটু একটু করে। পূব আকাশে দেখা দিল প্রত্যূষের রক্তরাঙা ইশারা।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন সুভাষ। তবু ভাগ্যি যে, কারো মনে কোনরকম সন্দেহের উদ্রেক না করে রাতটা কেটে গেছে। এখন ভালোয় ভালোয় পথে পা দিতে পারলেই হয়।

চা ও পরোটা সহযোগে ব্রেকফাস্ট-পর্ব শেষ হল। এবার যাত্রা শুরু।

কার্যত কিন্তু তা হল না। বরফে পথ-ঘাট, গাছ-পালা সব কিছু আচ্ছন্ন হয়ে আছে। যত দূর চোখ যায় শুধু বরফ আর বরফ। আদিগন্ত বরফ।

তদুপরি সেই রক্ত-হিম-করা প্রচণ্ড শীত। এ অবস্থায় বাইরে পা বাড়ানো অসম্ভব।

—তোমরা কোথায় যাবে দোস্ত? প্রশ্ন করল জনৈক উপজাতীয়।

—আমরা! আগ বাড়িয়ে জবাব দিলেন ভগৎরাম, আমরা যাব পাশের গাঁয়ে। ওখানকার লতিফ খাঁ নতুন বাড়ি তুলবেন কিনা!

—কি কাজ কর তোমরা?

—আমরা রাজমিস্ত্রী। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ভগৎরাম, চলি এবার! অনেক বেলা হয়ে গেছে! দেরি হলে আজকের রোজগারটাই হয়তো মারা যাবে।

শুরু হল পথ চলার পালা।

কিন্তু কোথায় পথ! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের চাঁই একটার ওপর একটা সাজানো। তা থেকে চুইয়ে চুইয়ে জল ঝরছে টপ্ টপ্ করে। সরু সরু অসংখ্য বরফের কাঠি রাস্তার দু ধারের দেওয়াল থেকে ঝুলছে। উজ্জ্বল সূর্যালোকে ঝক ঝক করছে আয়নার মতো। চোখ ধাঁধিয়ে দেয় যেন।

সবার আগে গাইড। মাঝে সুভাষ। ঠিক পেছনেই ভগৎরাম।

স্বভাবতই গতি অনেকটা মন্থর। চারিদিকে তুষারের পাঁচিল। এই তুষার-পাঁচিলের ওপর নানা আকারের বিরাট বিরাট সব বরফের চাঁই বিক্ষিপ্ত-ভাবে আলগা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। মনে হয় একটু নাড়া দিলেই সব নেমে আসবে হুড়মুড় করে।

হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার! ক্ষণে ক্ষণে গাইডের সতর্ক নির্দেশ শোনা যায়।

এ পথ অতি ভয়ংকর পথ। প্রকৃতি যেন মানুষের জন্য এখানে মরণ-ফাঁদ পেতে রেখেছে। হাতের লাঠি দিয়ে ঠুকে ঠুকে বরফের স্তর পরীক্ষা করে তবেই সাবধানে পা ফেলতে হয়।

কোথায় কোন্ চোরা ফাটল রয়েছে কে জানে! একটু ভুলচুক হলেই তুষার ফাটলের অতল গহবরে তলিয়ে যেতে হবে।

এমনি করে পা টিপে টিপে পাশের গাঁয়ে যেতেই বেলা সেই বারোটা।

সুভাষের অবস্থা তখন দস্তুরমত কাহিল। গাইড বা ভগৎরামের কথা আলাদা। তাঁরা এ-পথে চলতে অভ্যস্ত।

কিন্তু বিপদ হয়েছে সুভাষের। একে অসহ্য শীত, তদুপরি পথ-ঘাটের এই ভয়ংকর দুরবস্থার ফলে এক পা এগুনোও তাঁর পক্ষে রীতিমত কষ্টকর। তাই অনেক ভেবে-চিন্তে এখান থেকে আফগান-সীমান্ত পর্যন্ত পেঁৗছে দেবার জন্য একটা খচ্চরের ব্যবস্থা করা হল। ভাড়া মাত্র আট টাকা।

ফলে, যাত্রীসংখ্যা দাঁড়াল মোট চারজন। সুভাষ, গাইড, ভগৎরাম ও খচ্চরওয়ালা। খচ্চরের পিঠে শুকনো ঘাসের বস্তা। তার ওপরে সুভাষ। এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত।

তবু শেষরক্ষা হল না। বরফ-গলা দুর্গম পিচ্ছিল পথ। যেমন জল, তেমনি প্যাচপেচে কাদা। যে কোন সময়ে পা পিছলে যাওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

অনুমান মিথ্যে হল না। প্রথমেই পা হড়কে পড়ে গেলেন অভিজ্ঞ পথ-যাত্রী ভগৎরাম। পরক্ষণে নিজে থেকেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন সারামুখে একগাল হাসি নিয়ে। যেন এ একটা মস্তবড় খেলা আর কি!

পরবর্তী পালা খচ্চরওয়ালার। ফল হল মারাত্মক। হাতের দড়িতে টান পড়তেই হঠাৎ খচ্চরটা লাফিয়ে উঠল তীব্র একটা ঝাঁকুনি খেয়ে। ফলে, অপ্রস্তুত সুভাষ সঙ্গে সঙ্গেই ছিট্‌কে পড়লেন শক্ত মাটির বুকে।

উন্মত্তের মতো ছুটে এসে সুভাষকে তুলে ধরলেন সঙ্গী ভগৎরাম। চোখ-মুখে তাঁর নিবিড় শংকা। যেন আঘাতটা তাঁর গায়েই সব চাইতে বেশি লেগেছে।

না না, কিছু হয়নি আমার। হাসলেন সুভাষ। সামনে দীর্ঘ বিসর্পিত বন্ধুর পথ। এই পথই তো এখন একমাত্র সত্য। ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার কথা চিন্তা করার মতো অবকাশ এখন কোথায়!

ছত্রিশ ঘণ্টা। দীর্ঘ ছত্রিশ ঘণ্টা এই দুর্গম পথের চড়াই-উৎরাই ভেঙে অবশেষে পরদিন রাত একটায় সবাই গিয়ে হাজির হলেন আফগান রাজ্যের অভ্যন্তরে একটা গাঁয়ে। সেখানে 'শিনওয়ারি' নামক পার্বত্য উপজাতীয়দের বাস।

আশ্রয় মিলল গাইডের পরিচিত একটি লোকের বাড়িতে।

রাত একটা। স্বভাবতই সবাই তখন ঘুমে অচেতন। তবু ডাকাডাকি শুনে এগিয়ে এসে অতিথিদের তারা আহ্বান জানাল পরম সমাদরে। খাবার-দাবারেরও কিছুটা ব্যবস্থা হল সঙ্গে সঙ্গেই।

দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার ফলে সুভাষ তখন রীতিমত অবসন্ন। সারাদেহে অসহ্য যন্ত্রণা। মনে হয় কে যেন দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু চুষে নিংড়ে নিঃশেষ করে দিয়েছে। এখন সর্বাগ্রে দরকার একটু পরিপূর্ণ বিশ্রাম। একটি নিটোল ঘুম।

কোথায় বিশ্রাম! কোথায় ঘুম!

সব কিছু ত্যাগ করতে হল খচ্চরওয়ালাটির মুখে একটি অভাবনীয় প্রস্তাব শুনে। হুজুর রাজী থাকলে সে তাঁকে পেশোয়ার-কাবুল রাস্তার

সীমানা-বরাবর 'গাড়ডি' গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। ভাড়া মাত্র তেরো টাকা।

তবে একটা শর্তে। এখুনি রওনা দিতে হবে। তার পক্ষে দেরি করা সম্ভব নয়।

সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন ভগৎরাম। অত্যন্ত লোভনীয় প্রস্তাব। আর্থিক দিক থেকেও সুবিধেজনক। অবশ্য সুভাষবাবুর খুবই কষ্ট হবে। কিন্তু উপায় কি! এ সুযোগ পরে নাও মিলতে পারে।

পেশোয়ার থেকে আনীত গাইডকে এখান থেকেই ছুটি দিলেন কমরেড ভগৎরাম। বিদায় কমরেড, বিদায়! এবার তুমি পেশোয়ার ফিরে যাও। কমরেড আবাদ খাঁকে আমার এই চিঠিটা দিও। বোল যে, সব ঠিক আছে। চিন্তার কোন কারণ নেই।

বিশ্রামের আশা ত্যাগ করে আবার খচ্চরের পিঠে আশ্রয় নিলেন সুভাষ। আগে কাজ, তারপর অন্য কথা। এ সময়ে সুখ-সুবিধার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

'গাড়ডি' গ্রাম পাওয়া গেল পরদিন সকাল ঠিক দশটায়। দুর্গম পথের এখানেই শেষ। আর মাত্র খানিকটা যেতে পারলেই পেশোয়ার-কাবুল যাতায়াত-কারী সড়ক।

এবার বিদায় নিল খচ্চরওয়ালা। বাকি রইলেন মাত্র দুজন। ভগৎরাম আর সুভাষ।

কিন্তু না, আর ভগৎরাম নয়। সুভাষও নয়। নতুন দেশ। নতুন পরিবেশ। তাই নামটাও নতুন হওয়া দরকার। সুতরাং ভগৎরামের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল এক পাঠান যুবক—'রহমত খাঁ'। আর সুভাষ হলেন তাঁর চাচা—'জিয়াউদ্দীন'।

কথাবার্তা এখন থেকে যা কিছু বলা দরকার, সবই বলবেন রহমত খাঁ। কারণ, চাচা জিয়াউদ্দীন শুধু অসুস্থই নন, একাধারে তিনি মূক ও বধির দুই-ই।

খচ্চরওয়ালাকে বিদায় দিয়ে এবার পেশোয়ার-কাবুল সড়ক ধরে দুজনে হাঁটা দিলেন জালালাবাদের দিকে।

এ রাস্তায় মাঝে মাঝে মাল-বোঝাই ট্রাক যাতায়াত করে থাকে। বাসও দু-একটা যায় ক্বচিত কখনো। যা হোক একটা কিছু ধরতে পারলেই এবারের মতো নিশ্চিন্ত।

যেতে যেতে অজ্ঞাতেই কখন সুভাষের মুখ থেকে বেরিয়ে এল ছোট্ট একটি উক্তি—অপূর্ব! সত্যিই অপূর্ব এই দেশ!

—অপূর্ব! ভগৎরাম অবাক। থাকার মধ্যে তো এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে রুক্ষ ধূসর কতকগুলো ন্যাড়া পাহাড়। এ দেখে অমন মুগ্ধ হবার মতো কি আছে?

—তা হোক। রাশি রাশি স্বপ্ন এসে ভিড় করে সুভাষের চোখের তারায়, তবু এ যে স্বাধীন দেশ। স্বাধীন দেশের সব কিছু সুন্দর। তার ধূলি-কণাটুকুও পবিত্র।

সুভাষের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখে বুঝি আর পলক পড়ে না

ভগৎরামের। যাঁর সমস্ত অস্থি-মজ্জায়, দেহের প্রতিটি রক্ত-কণিকায় মিশে রয়েছে এই অকৃত্রিম, অনাবিল, পবিত্র স্বাধীনতার স্বপ্ন, সংসারে কার সাধ্য তাঁর অগ্রগতি রুদ্ধ করে!

না, কেউ তা পারবে না। আজ হোক, কাল হোক, তাঁর স্বপ্ন সার্থক হবেই। সুভাষবাবু জিন্দাবাদ!

ঘণ্টাখানেক চলার পর এল ছোট গ্রাম 'হারজানাও'। অনেকটা পথ হাঁটা হয়েছে। এবার পথপ্রান্তে বসে একটু বিশ্রাম করা যাক।

কোথায় বিশ্রাম! তার আগেই তাঁদের দেখে পাহাড় বেয়ে নেমে এল এক বিশালকায় পাঠান। কে ভাই তোমরা? কোথায় যাবে?

—আমরা মুসাফির। জবাব দিলেন ভগৎরাম, আর উনি আমার চাচা। কথা বলতে পারেন না। তাই আড্ডাশরীফ যাচ্ছি খোদার কাছে দোয়া চাইবার জন্য। বহুত ভারি বোখার কিনা!

—বহুত আপসোস কী বাত! পাঠানের কণ্ঠে সমবেদনার সুর, তা এসব রোগের কিছুটা ভাল দাওয়াই আমারও জানা আছে। দেখি তো ওর জিভটা!

কি আর করা! বাধ্য হয়েই ভগৎরাম মুখটা হাঁ করে তুলে ধরলেন সুভাষের. আর সেই অবসরে পাঠান তার নোংরা আঙুলটি দিয়ে জিভটা টিপে টিপে দেখতে লাগল পাকা হেকিমের মতো।

—হ্যাঁ, বহুত ভারি বোখার। তবে ভাবনার কোন কারণ নেই। দাওয়াই বাত্‌লে দিচ্ছি। সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রেসক্রিপ্‌সন্‌ জেনে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই দুজনে পা চালিয়ে দিলেন সামনের দিকে। মানে মানে সরে পড়াই ভাল। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কখন যে সাপ বেরিয়ে পড়বে, তার ঠিক কি!

ঘণ্টাখানেক চলার পরে এল 'ধাসোল' গ্রাম। এবার ট্রাক পাওয়া গেল। প্যাকিং-করা চায়ের বাক্স বোঝাই করা ট্রাক। লক্ষ্য তার জালালাবাদ।

ইঙ্গিত করতেই ট্রাকটা থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দুজনে উঠে বসলেন প্যাকিং-করা বাক্সগুলোর ওপরে। এবার কিছুটা নিশ্চিন্ত।

খোলা ট্রাক। তুষার-ছোঁয়া হাওয়া বইছে হু-হু করে। তবু আরাম। তবু নিশ্চিন্ত।

দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় শরীর-মন দুই-ই ক্লান্ত। এবার সব কিছুর ইতি। আর দুর্গম চড়াই-উৎরাই ভাঙতে হবে না পা দুটোকে ক্ষত-বিক্ষত করে। জালালাবাদ এল বলে! আর দেরি নেই।

তবু দেরি হল। স্বয়ং জেলা-অফিসার জালালাবাদ যাবেন, কিন্তু তিনি প্রস্তুত নন। সুতরাং ততক্ষণ পর্যন্ত ট্রাক-চালককে অপেক্ষা করতেই হবে। হাজার হোক জেলা-অফিসার! তাঁর মর্জি না মেনে উপায় কি!

হুজুর এসে ড্রাইভারের পাশে আসন গ্রহণ করলেন পুরো দু ঘণ্টা বাদে। ফলে, জালালাবাদ যেতে রাত দশটা।

পরদিন ভোরেই দুজনে সরাইখানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন আড্ডাশরীফ মসজিদ দর্শন করার জন্য। সেখান থেকে 'লালমা' গাঁয়ে।

ওখানকার হাজি মহম্মদ আমিন ভগৎরামের পূর্ব-পরিচিত লোক। তাঁর

সংগে এ ব্যাপারে একটু পরামর্শ করা দরকার।

অবশ্য সুভাষের আসল পরিচয় হাজিসাহেবকে দেওয়া হল না। দেওয়া হল, পলাতক একজন বিপ্লবী কর্মী বলে। উদ্দেশ্য—রুশ দেশে পালিয়ে যাওয়া। এ ব্যাপারে হাজিসাহেবের বুদ্ধি-পরামর্শ প্রয়োজন।

শুনে খুশিই হলেন হাজিসাহেব। যেতে চায় তো যেতে পারে। তবে কাবুলের তেরো মাইল আগে 'বুদখাক' চেক-পোস্টটি সম্বন্ধে খুব হুঁশিয়ার! ওটা পেরিয়ে যেতে পারলে আর কোন ভাবনার কারণ নেই।

আড্ডাশরীফ থেকে 'লালপুরা'। ভিস্তিওয়ালার সাহায্যে কাবুল নদী পেরিয়ে আবার শুরু হল এগিয়ে যাবার পালা।

এবার আর হেঁটে নয়, টাঙ্গাতে। লক্ষ্য—'সুলতানপুর'। ওখানে গিয়ে কাবুল-গামী বাস বা ট্রাক ধরতে পারলেই ব্যস্!

কোথায় বাস! কোথায় ট্রাক!

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, তবু বাস বা ট্রাক কোনটারই দেখা নেই। ক্রমশ সুলতানপুর ছাড়িয়ে তাঁরা আরো অনেকটা দূরে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু ফল দাঁড়াল একই।

অগত্যা একপ্রস্থ চা খেয়ে নিয়ে আবার শুরু হল সেই পদযাত্রা।

ক্ষুধা-তৃষ্ণায় দুজনেই তখন কাতর। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। পা যেন আর চলতে চাইছে না; তবু এগিয়ে চলার বিরাম নেই। যেতেই যে হবে!

সারাদিন একটানা হাঁটার পর বিকেল পাঁচটা নাগাদ এল 'মিমলা' গ্রাম।

দুজনেই তখন মৃতপ্রায়। পেট জ্বলে যাচ্ছে ক্ষুধার তাড়নায়। মনে হয় সমস্ত অনুভূতি, সমস্ত চেতনা বুঝি তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

অবশেষে দুজনেই পথের একপাশে বসে পড়লেন অপরিসীম ক্লান্তিতে। একটু ক্ষীণ আশা, যদি কোন বাস বা ট্রাক এসে যায়।

এমনি করে কেটে গেল প্রহরের পর প্রহর।

দু'চোখে অন্তহীন প্রতীক্ষা নিয়ে ঠায় বসে আছেন দুজন। এরই মধ্যে কখন একসময়ে নিঝুম ঘুম নেমে এল সুভাষের চোখের পাতায়। অনন্ত নির্ভরতায়। নিশ্চিন্ত আরামে।

এভাবে সুভাষকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখে অজ্ঞাতেই কখন মনটা কানায় কানায় ভরে ওঠে ভগৎরামের।

বিপ্লবের পথ কোনদিনই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এ-পথ চিরদিনই দুর্গম ও ক্ষুরধার। এ-পথে যারা এসেছে, তাদেরই সর্বাংগে বয়ে গেছে রক্তের বসুধারা। পদে পদে তারাই হয়েছে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও জর্জরিত।

সুভাষবাবুও তার ব্যতিক্রম নন। শিক্ষা, দীক্ষা, সম্মান, চরিত্র, প্রাচুর্য, কিসের অভাব ছিল তাঁর! কি পাননি তিনি জীবনে!

সারা হিন্দুস্থানের মধ্যে এই একটি মাত্র মানুষ, যাঁর অনমনীয় দৃঢ়তা ও আপসহীন মনোভাবের কাছে শুধু ইংরেজ সরকার নয়, গান্ধীজীর মতো অমন বিরাট ব্যক্তিত্বকেও থমকে দাঁড়াতে হয়েছে বার বার।

অসীম উপেক্ষায় সব কিছু পেছনে ফেলে এসে আজ সেই মানুষটি কত

অসহায়ভাবেই না ঘুমিয়ে পড়েছেন ধূলি-ধূসর এই অচেনা পথের প্রান্তে।

ভারত চিরদিন পরাধীন থাকবে না। একদিন না একদিন স্বাধীনতা সে অর্জন করবেই। সেদিন সুভাষবাবুর এই দুঃসাহসিক একক প্রচেষ্টাকে কোন্ রঙে চিত্রিত করা হবে, তা ঐতিহাসিকরাই বলতে পারেন।

তবে সবার অজ্ঞাত, অখ্যাত এই গরীব বান্দা ভগৎরাম বেইমান নয়। দেশের লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য সুভাষবাবুর আজকের এই ভয়াবহ কৃচ্ছ্রসাধনের কথা তাঁর অন্তরে রক্তের অক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল।

সহসা কল্পনার জগৎ থেকে মাটির পৃথিবীতে নেমে এলেন ভগৎরাম। খাবার চাই। যে করে হোক, কিছু খাবার সংগ্রহ করতে হবে।

সামনে কঠিন, কঠোর সংগ্রামের দিন। সুভাষবাবুকেই নিতে হবে সেই মহাযজ্ঞের পৌরোহিত্যের দায়িত্ব।

সেই দুরন্ত সংগ্রামে সিংহের মতো রুখে দাঁড়াতে হলে দেহকে সুস্থ ও সমর্থ রাখা একান্তভাবেই দরকার। সুতরাং নিজের জন্য না হলেও অন্তত সুভাষবাবুর জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

বেশি দূর যেতে হল না। দু-পা এগুতেই পাওয়া গেল ছোট্ট একটি সরাইখানা। চাইতেই সেখানে খাবার মিলে গেল দুজনের মতো।

খাবার! ডাক শুনে ধড়মড় করে উঠে বসলেন সুভাষ। তারপরই ভগৎ-রামের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন অসীম ব্যগ্রতায়। সারাদিন অভুক্ত অবস্থায় কেটেছে। এ সময়ে এই শুকনো রুটি যে অমৃতের চাইতেও মধুর!

হাতের খাবার হাতেই রয়ে গেল। তার আগেই সহসা কি দেখে সুভাষ চমকে উঠলেন দারুণভাবে।

একি! দূর থেকে ওটা কি এগিয়ে আসছে অজস্র ধূলি উড়েয়ে ট্রাক! ট্রাক! বহু-আকাঙ্ক্ষিত কাবুলগামী ট্রাক!

নিমেষে প্রস্তুত হয়ে নিলেন দুজন। থাক পড়ে খাবার। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ট্রাক পাওয়া গেছে। এ সুযোগ হারালে চলবে না।

একটানা অনেকক্ষণ চলার পর ট্রাকটা 'গনডামক' গিয়ে থামল রাত ন'টায়। ওখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে আবার শুরু হল যাত্রা।

রাত দশটায় 'কাবুল মৎ'। আবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম। সবশেষে ট্রাকটা যখন তার শেষ গন্তব্যস্থল সেই 'বুদখাক' চেক-পোস্টের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, তখন ভোর হতে আর খুব একটা বেশি দেরি নেই।

প্ল্যান মতো ভগৎরাম একাই এগিয়ে গেলেন চেক-পোস্ট অফিসের দিকে। আর এই সুযোগে সুভাষ ড্রাইভারের পেছনে পেছনে দিব্যি চলতে শুরু করে দিলেন হোটেলের উদ্দেশ্যে। যেন ড্রাইভারেরই কোন পার্টনার আর কি।

কোথায় চেক-পোস্ট! কোথায় কি! সবাই ঘুমে অচেতন। কেউ জেগে নেই কাছে-কিনারে। এমন কি কোন পাহারাদার পর্যন্ত নেই।

হাসতে হাসতে ভগৎরাম এবার ফিরে চললেন নির্দিষ্ট সেই হোটেলের দিকে। যাক, বাঁচা গেল। এত সহজে যে চেক-পোস্টের ঝামেলা এড়ানো যাবে, তা কে ভাবতে পেরেছিল!

হোটেলে গিয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়ে আবার দুজনে টাঙগায় চেপে বসলেন সকাল ঠিক ন'টায়। এবারের লক্ষ্য কাবুল শহর। দূরত্ব মাত্র তেরো মাইল।

খুশি ও তৃপ্তির প্রসন্নতায় দুজনেই তখন ভরপুর। পেশোয়ার থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল ২৬শে জানুয়ারি, স্বাধীনতা দিবসের পুণ্যলগ্নে। আজ ৩১শে জানুয়ারি। দুরন্ত দুর্গম পথের আজই পরিসমাপ্তি। আর বিশেষ বাকি নেই। কাবুল এল বলে।

যেতে যেতে কি ভেবে সুভাষের হাত থেকে ঘড়িটা খুলে নিয়ে নিজের হাতে বেঁধে নিলেন ভগৎরাম।

চাচাজী একে কালা, তার ওপর আবার বোখারী আদমী। তাঁর হাতে এই মূল্যবান ঘড়ি বড্ড বেমানান। তার চাইতে ওটা ভাতিজা রহমত খাঁর হাতেই থাক। জোয়ান ছেলে। মানাবে ভাল।

কেটে গেল আরো কিছুক্ষণ। তারপর একসময়ে একটা বাঁক ঘুরতেই সহসা কি দেখে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন ভগৎরাম।

আ গিয়া! আ গিয়া! ওই যে কাবুল দেখা যাচ্ছে! আমরা এসে গেছি।

'শহীদ হরিকিষণ জিন্দাবাদ! তোমাকে আমি ভুলিনি ভাই। কোন-দিনও ভুলব না।'

সুভাষকে নিয়ে কাবুলের মাটিতে পা দিতে দিতে অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে মনের মণিকোঠা জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে ভগৎরামের। মনে পড়ে সেই পুরনো দিনের কথা। পুরনো জীবনের ছন্দ।

তারিখটা ছিল ১৯৩০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর।

লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব। পাঞ্জাবের গভর্ণর কুখ্যাত মোরেন্সি এসেছেন সেখানে ভাষণ দিতে। সহসা হরিকিষণের হাতের পিস্তল আগুন ছড়াল—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

সংগে সংগে আহত হয়ে লুটিয়ে পড়লেন মোরেন্সি। লুটিয়ে পড়লেন একজন পুলিশ ইনস্পেক্টর, একজন সাব-ইনস্পেক্টর ও দুজন মহিলা। হরিকিষণের অব্যর্থ লক্ষ্য সেদিন কাউকেই রেহাই দেয়নি। সবাইকে রক্ত দিয়ে সেদিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল একে একে।

তারপর একদিন শুরু হল বিচারের প্রহসন। যা আশংকা করা গিয়ে-ছিল কাজেও তাই হল। ইংরেজ বিচারক আদেশ দিলেন—প্রাণদণ্ড, এবং সে আদেশ কার্যকরী হল যথাসময়েই।

মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দীর অন্তিম বাসনা পূর্ণ করা যে কোন সভ্য রাষ্ট্রের রীতি। হরিকিষণের বেলায় তা-ও হয়নি। এমন কি প্রচলিত ধর্মমত উপেক্ষা করে মুসলমানদের কবরখানায় তাঁর মৃতদেহ সৎকার করতেও সেদিন এত-টুকু বাধেনি সুসভ্য ইংরেজ সরকারের। প্রমাণ তখনকার সময়ের সংবাদপত্র ঃ

হরিকিষণের অন্তিম অভিলাষ

"আবার ভারতে জন্মগ্রহণ করিতে চাই"

'মিয়ানওয়ালী, ১০ই জুন। হরিকিষণের আত্মীয়গণের সহিত তাহার শেষ-সাক্ষাতের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, গত ৮ই জুন প্রাতে হরিকিষণের আত্মীয়বর্গ মিয়ানওয়ালীতে আসিয়া উপস্থিত হন।...

বেলা ১১টা ১০ মিনিটের সময় হরিকিষণের আত্মীয়বর্গকে তাহার সহিত শেষ-সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। সাক্ষাতের সময় জেল-দারোগা এবং অন্যান্য জেল-কর্মচারীরা তথায় উপস্থিত ছিল।

হরিকিষণকে সমস্ত সময় স্ফূর্তিযুক্ত ও আনন্দিত দেখাইতেছিল। আত্মীয়গণের সহিত কিছুক্ষণ পারিবারিক কথাবার্তা চলিবার পর তাহার শেষ ইচ্ছা সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে কিনা জানিতে চাওয়া হয়।

প্রকাশ, এই প্রশ্নের উত্তরে হরিকিষণ বলেঃ মাতৃভূমির শৃঙ্খল-বন্ধন মোচন করিবার জন্য যেন পুনরায় ভারতে জন্মগ্রহণ করি, এই আমার ইচ্ছা। আমি দেশের দীন সেবক মাত্র। যদি আপনাদিগকে আমার মৃতদেহ সমর্পণ করা হয়, তবে শতদ্রু নদীর তীরে যে স্থানে ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে, সেইস্থানে আমারও যেন অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।'

মৃতদেহ সৎকার

'হরিকিষণের মৃতদেহ সৎকার সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, মিয়ানওয়ালী জেলের পাশেই যে স্থানে বেওয়ারিশ মুসলমান কয়েদীগণকে কবর দেওয়া হয়, সেইস্থানে গভীর রাত্রিতে কড়া পুলিশ পাহারায় হরিকিষণের মৃতদেহ সৎকার করা হইয়াছে।'

[আনন্দবাজার, ১৫ই জুন, ১৯৩১]

বড়ভাই হরিকিষণকে হারিয়ে সেদিন একটি মাত্র শপথ-বাক্যই বেরিয়ে এসেছিল ভগৎরামের মুখ থেকে। আমি এর বদ্‌লা নেব। এমন বদলা নেব, যা ঐ দুশমন ইংরেজ জীবনে কোনদিনও ভুলতে পারবে না।

দীর্ঘ এগারো বছর পরে আজ তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে। সুভাষবাবুকে ওদের উদ্যত থাবার নাগাল থেকে ছিনিয়ে এনে আজ সেই ভ্রাতৃ-হত্যার তিনি উপযুক্ত বদ্‌লা নিয়েছেন।

প্রথম পর্ব শেষ। এবার সুভাষবাবু কোনরকমে একবার ইয়োরোপের মাটিতে পা দিতে পারলেই, ব্যস্‌! তারপরই শুরু হবে সেয়ানে সেয়ানে লড়াই। সুভাষবাবু শেরকা বাচ্চা। কি করে জবাব দিতে হয়, তিনি তা ভাল করেই জানেন।

কিন্তু সর্বাগ্রে সুভাষবাবুর জন্য কিছু শীতবস্ত্র কেনা দরকার। প্রচণ্ড শীত পড়েছে। ঐ সামান্য জামাকাপড় নিয়ে এই দুঃসহ শীতের সঙ্গে লড়াই

করা সম্ভব নয়।

বাজার থেকে দুটো রেজাই (লেপ) কিনে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার দুজনে ফিরে এলেন লাহোরী গেটে অবস্থিত তাঁদের সেই নির্দিষ্ট সরাইখানায়।

নামেই সরাইখানা, আসলে দূরাগত উট-ব্যবসায়ীদের রাত কাটানোর মতো সাময়িক একটা আস্তানা মাত্র। যেমন নোংরা, তেমনি দুর্গন্ধময়। দেখলেও গা ঘিন্ ঘিন্ করে। গা গুলিয়ে ওঠে।

আর খাওয়া! সেদিনের সেই ভয়াবহ কৃচ্ছ্রসাধনের কথা সুভাষের নিজের ভাষাতেই শোন ঃ

'বাইরে কন্‌কনে ঠাণ্ডা। দরজা খুলে রাখা গেল না। ঘরের মধ্যে এত ধোঁয়া যে, নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। গোটা কতক শুকনো কাঠ যোগাড় করে আমরা আগুন পোহাবার ব্যবস্থা করলাম। ঠাণ্ডায় আমাদের সমস্ত শরীর জমে গিয়েছিল। সন্ধ্যাবেলায় ভগৎরাম বাজার থেকে কয়েকটা মোমবাতি আর সেই সঙ্গে কিছু শুকনো রুটি আর কাবাব কিনে আনল। আমি রুটি খেতে পারছি না দেখে ভগৎরাম আমাকে এককাপ চা এনে দিল। চায়ে রুটি ডুবিয়ে ডুবিয়ে আমি খেতে লাগলাম।' [হিন্দুস্থান টাইম্‌স্ ঃ ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭ সাল ঃ উত্তমচাঁদ লিখিত ধারাবাহিক রচনা]

কোনরকমে রাতটা কাটিয়ে পরদিনই সুভাষ রুশ দূতাবাসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন ভগৎরামকে সঙ্গে নিয়ে। যে করে হোক ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবার মস্কো যাবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রথমেই বাধা এল সদর ফটকে অবস্থিত সশস্ত্র প্রহরীদের কাছ থেকে। ইয়োরোপে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। এ সময়ে অনুমতি-পত্র ছাড়া কাউকেই ভেতরে ঢুকতে দেওয়া সম্ভব নয়।

নিরুপায় দেখে ভেতরে যাতায়াতকারী প্রতিটি গাড়িকে মাঝপথে থামিয়ে নিজের বক্তব্য বোঝাতে চেষ্টা করলেন ভগৎরাম, কিন্তু তাতেও কিছু সুবিধা হল না। কাবুলে ফার্সী ভাষার প্রচলনটাই সর্বাধিক। ভগৎরামের পুস্তু ভাষা সেখানে কোন কাজেই এল না।

এবার চরম পন্থা অবলম্বন করলেন ভগৎরাম। খোদ এজেণ্টকেই তিনি ধরে বসলেন রাস্তার মাঝে তাঁর গাড়ি দাঁড় করিয়ে। নিজের বক্তব্যও বোঝাতে চেষ্টা করলেন কিছুটা। কিন্তু ফল দাঁড়াল একই। প্রত্যুত্তরে দুর্বোধ্য ভাষায় কি একটা কথা বলে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলেন নিজের গন্তব্যপথে। আর ফিরেও তাকালেন না।

তবু হার মানলেন না ভগৎরাম। পর পর তিনদিন তিনি এজেন্সি অফিস, এ্যামবাসী অফিস, বিভিন্ন রাশিয়ান অফিসার এবং সবশেষে স্বয়ং রাশিয়ান এ্যাম্‌বাসাডরের সঙ্গে আলাপ করলেন, তবু কোনদিক থেকে এতটুকু আশার আলো দেখা গেল না। অবস্থা যেমন ছিল, তেমনি রয়ে গেল।

মনে মনে বেশ একটু আহত হলেন সুভাষ। তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল, আর কেউ না হলেও অন্ততঃ রুশ-সরকারের কাছ থেকে সবরকম

সহযোগিতা তিনি পাবেনই, কার্যত দেখা গেল ঠিক তার বিপরীত। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এ ব্যাপারে তারা এতটুকুও উৎসাহী নয়।

কি করা যেতে পারে এখন!

যুদ্ধের আগুনে সারা ইয়োরোপ এখন জ্বলছে। স্বভাবতই বিভিন্ন রাষ্ট্রের গুপ্তচরদের কাছে খোলা শহর কাবুল এখন স্বর্গভূমি। এ অবস্থায় এখানে বেশিদিন অপেক্ষা করাও যে বিপজ্জনক! কখন কি ঘটে যাবে কে বলতে পারে!

তাছাড়া আফগানিস্তান দুর্বল রাষ্ট্র। তেমন কিছু হলে চাপে পড়ে তারা যে তখন তাঁকে ইংরেজের হাতে তুলে দেবে না, তারই বা নিশ্চয়তা কি!

ভগৎরামের ধারণা কিন্তু অন্যরকম। হাজার চাপ দেওয়া সত্ত্বেও যে আফগানিস্তান ইতিপূর্বে বাবা ঈশ্বর সিং, বাবা পৃথ্বী সিং, প্রমুখ পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হয়নি, সুভাষবাবুর মতো একজন সর্ব-ভারতীয় নেতার বেলায় তারা এতটা অবিবেচক হবে বলে মনে হয় না।

তবু সাবধানের মার নেই। অন্য কথা বাদ দিলেও এ-রাজ্যে তারা অনধিকার-প্রবেশকারী। কোন উপযুক্ত ছাড়পত্রও তাঁদের নেই। সেদিক থেকেই বা বিপদ আসতে কতক্ষণ!

আশংকা মিথ্যে হল না। পঞ্চম দিনেই পেছনে লাগল একটি আফগান গোয়েন্দা-পুলিশ। কে এই লোক দুটি? আজ ক'দিন ধরে ওরা এই সরাইখানায় কেন? কি মতলব ওদের? ঠিক হ্যায়, চলিয়ে থানামে।

—সেকি সিপাইজী! বোঝাতে চেষ্টা করলেন ভগৎরাম, আমরা কি চোর, না ডাকাত, যে থানায় যাব! দেখতেই তো পাচ্ছ যে, নেহাত দেহাতী আদমী আমরা। অসুস্থ বোবা কালা চাচাজীকে এখানে নিয়ে এসেছি হাসপাতালে ভর্তি করব বলে।

কে কার কথা শোনে! সেই একই কথা সে পুনরাবৃত্তি করতে লাগল বার বার। চলিয়ে থানামে। অবশ্য না গেলেও চলে, যদি—

সুতরাং ছাড়তেই হল ভগৎরামকে দুটি টাকা। নাও, বিদেয় হও। আর যেন জ্বালাতে এসো না এখানে।

কথায় বলে পুলিশ! একবার যখন পয়সার স্বাদ পেয়েছে, তখন এ সুযোগ সে ছাড়বে কেন? তাই পরদিনই আবার সে এসে হাজির। চলিয়ে থানামে। দারোগাবাবুর হুকুম।

—ধন্যন্তরি তোর দারোগাবাবুর নিকুচি করেছি! কোনরকমেই নিরস্ত করতে না পেরে এবার রুষ্ট বাঘের মতো গর্জে উঠলেন ভগৎরাম, ঠিক হ্যায়, চল। তবে আমি একা যাব। অসুস্থ চাচাজীকে আমি কিছুতেই নিয়ে যেতে দেব না। জান কবুল!

এই দেখ! নিমেষেই চেহারা পাল্‌টে গেল পুলিশটির, শুধু শুধু রাগ করছ কেন দোস্ত? আমি কি তাই বলেছি? নেহাত তোমরা গাঁওকা আদমী, তাই মাঝে মাঝে একটু আসি সুখ-দুঃখের কথা বলতে।

—না, তোমাকে দয়া করে আর আসতে হবে না। অপ্রসন্ন মুখে দশ টাকার একটা নোট এগিয়ে দিলেন ভগৎরাম, এই নাও, বিদেয় হও। ফের যদি

কোনদিন এখানে দেখতে পাই তো ঠ্যাং ভেঙে দেব, তা মনে রেখ!

—ছিঃ! ছিঃ! লজ্জায় জিভ কাটল আফগান পুলিশটি, হাজার হোক, তোমরা দোস্ত! তোমাদের কাছ থেকে কি এসব নিতে পারি! তবে যদি নেহাত দিতে চাও তো এমন কিছু স্মৃতি-চিহ্ন দাও, যা দেখে চিরকাল আমি তোমাদের কথা মনে রাখতে পারি।

তীব্র জিজ্ঞাসায় ভ্রূ দুটো কুঁচকে ওঠে ভগৎরামের। ওর হাসি ও কটাক্ষ ক্রমেই সর্বনাশের পথ ধরে এগিয়ে আসছে যেন। কি চায় ও!

—চাই তোমার হাতের ঘড়িটা।

ঘড়িটা! ভগৎরাম অসাড়, নিস্পন্দ। বলে কি! পিতৃ-স্মৃতি বিজড়িত এই সোনার ঘড়িটা যে আসলে সুভাষবাবুর। আর তারই দিকে নজর পড়েছে কিনা এই অর্থ-পিশাচ, লোভী জানোয়ারটার! এখন উপায়!

সুভাষ নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। কি বলবেন! বলার আছেই বা কি! তিনি যে মূক ও বধির দুই-ই। কিছু বলতে চাইলেই বা বলার সাধ্য তাঁর কোথায়!

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাত থেকে ঘড়িটা খুলে দিলেন ভগৎরাম। সারামুখে তাঁর অপরাধ বোধের গ্লানি। দোষ তাঁরই। সাবধানতা হিসেবে আগে থেকে ট্যাঁকে গুঁজে রাখলে সুভাষবাবুকে আজ এমন করে মূল্যবান ঘড়িটা হারাতে হত না। এ দুঃখ যে জীবনেও যাবার নয়!

রাশিয়ার আশা ত্যাগ করে পরদিনই আবার জার্মান দূতাবাসের দিকে পা বাড়ালেন সুভাষ।

সঙ্গে সেই ভগৎরাম। যা হোক কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। এতদূর এগিয়ে এসে কোনমতেই পিছিয়ে গেলে চলবে না।

ভগৎরামকে রাস্তায় অপেক্ষা করতে বলে এবার সুভাষ নিজেই ভেতরে ঢুকে গেলেন গট গট করে। কোনদিক থেকেই কোনরকম বাধা এল না। চেষ্টাও করল না কেউ।

দেখা হল খোদ জার্মান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে। কথাবার্তাও হল। প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গেল যথেষ্ট। তবে এই মুহূর্তে কোন কিছু করা সম্ভব নয়। সর্বাগ্রে বার্লিন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে সিমেন্স কোম্পানির কাবুল রিপ্রেজেণ্টেটিভ হের টমাসের কাছে গিয়ে মাঝে মাঝে খোঁজ করলেই সব কিছু জানা যাবে।

বাইরে দাঁড়িয়ে অতন্দ্র প্রহরী ভগৎরাম। সহসা কি দেখে সন্দেহের একটা কালোছায়া দুলে উঠল তাঁর চোখের তারায়।

কে যেন একটা লোক তাঁকে লক্ষ্য করছে অদূরে দাঁড়িয়ে। দু চোখে তার হিংস্র হায়েনার দৃষ্টি। কি ব্যাপার!

একটা খণ্ডিত মুহূর্ত। তারপরই কি ভেবে সোজা বাজারের দিকে হাঁটতে শুরু করে দিলেন ভগৎরাম।

সুভাষবাবু ভেতরে রয়েছেন। এখুনি হয়তো বেরিয়ে এসে তিনি ওর মুখোমুখি পড়ে যাবেন। তার আগেই টোপ ফেলে ওকে এখান থেকে সরিয়ে

নেওয়া প্রয়োজন।

চালে ভুল হল না। সঙ্গে সঙ্গে লোকটাও এবার এগিয়ে গেল ভগৎরামকে অনুসরণ করে।

কিন্তু সব বৃথা। কোথায় ভগৎরাম! মাঝ-পথেই তিনি হাওয়া।

এদিকে জার্মান দূতাবাস থেকে বেরিয়ে এসে সুভাষ অবাক। একি! ভগৎরাম কোথায়!

নিশ্চয় কিছু একটা ঘটেছে। নইলে এখানেই তো তাঁর অপেক্ষা করবার কথা ছিল! সরাইখানায় ফিরে যাননি তো?

একটা চাপা উদ্বেগ বুকে নিয়ে তাড়াতাড়ি সরাইখানায় ফিরে এলেন সুভাষ। কিন্তু কোথায় ভগৎরাম!

না. এখানেও তিনি নেই। ঘর বাইরে থেকে তালাবন্ধ। চাবি ভগৎরামের কাছে। সুতরাং ভেতরে যাবারও কোন উপায় নেই।

অনুসরণকারী লোকটাকে ফাঁকি দিয়ে এ-গলি ও-গলি ঘুরে ভগৎরাম ফিরে এলেন আরো কিছুক্ষণ বাদে। তবু এড়ানো গেল না। একজনকে এড়াতে না এড়াতেই এসে হাজির হল আর একজন। সেই আফগান পুলিশ।

—আবার এসেছ কেন? দেখেই ফুঁসে উঠলেন ভগৎরাম, ঘড়িটা নিয়েও বুঝি তোমার ক্ষুধা মিটল না?

—ও তো দারোগাবাবু লে লিয়া। ক্ষোভে-দুঃখে চোখে প্রায় জল এসে গেল পুলিশটির. সবই নসীব। নইলে এত কষ্ট করে আমি নিয়ে গেলাম, আর ও কিনা আমার হাত থেকে ওটা ছিনিয়ে নিলে! যাক পাঁচটা টাকা ধার দাও দেখি দোস্ত। আমি কালই এসে ফেরত দিয়ে যাব।

লোকটাকে বিদায় করে দিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপচাপ বসে রইলেন ভগৎরাম। ভাবনার পর ভাবনা এসে জমতে লাগল মনের কোঠায়। অস্থির চঞ্চল সব ভাবনা।

ওকে আর এভাবে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। হাজার হোক পুলিশ। পয়সার লোভে আবার ও আসবে। বার বার আসবে।

এদিকে রেডিও ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে সুভাষবাবুর অন্তর্ধানের কথা আজ আর এখানে কারোরই অজানা নেই।

এ অবস্থায় এসব লোককে কাছে ঘেঁষতে দেওয়া অনুচিত। একবার সন্দেহ হলে বিপদ ঘটতে কতক্ষণ!

না, এভাবে আর ঝুঁকি নেওয়াটা ঠিক হবে না। যে করে হোক, এ স্থান ত্যাগ করে অন্য একটা নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়! কার কাছে!

একই ভাবনা ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে থাকে সুভাষের মনে। এ জায়গাটা মোটেই নিরাপদ নয়। কোথায় যাওয়া যায় এখন! কার কাছে!

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা পরিচিত মানুষের কথা মনে পড়ে গেল ভগৎরামের।

উত্তমচাঁদ। পেশোয়ারের উত্তমচাঁদ। এককালে তিনি নওজোয়ান সভার একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। জেল-টেলও খেটেছিলেন কিছুদিন। বর্তমানে

তিনি কাবুলেই বসবাস করছেন স্থায়িভাবে। তাঁর কাছে একবার গেলে কেমন হয়!

অবশ্য কাজটা শক্ত। দীর্ঘকাল দেখা-শোনা নেই। কাবুল শহরের কোথায় তিনি রয়েছেন, তা-ই বা কে জানে! তবু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি! দেখাই যাক না!

১৩ই ফেব্রুয়ারি। সে কি বিশ্রী দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সেদিন সমগ্র কাবুল জুড়ে! শুধু বরফ আর বরফ! সকাল থেকে ঝুর ঝুর করে ঝরছে তো ঝরছেই। মুহূর্তও বুঝি বিরাম নেই তার।

সব কিছু উপেক্ষা করে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছেন ভগৎরাম। দৃষ্টি তাঁর দু পাশের দোকানগুলোর দিকে সীমাবদ্ধ।

উত্তমচাঁদকে খুঁজে বের করতে হবে। জানা গেছে শহরের কোথায় নাকি তাঁর রেডিওর দোকান অবস্থিত। পর পর দুদিন খোঁজ করেও তাঁর কোন হদিস মেলেনি। আজ যে করে হোক, তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে। সুভাষ-বাবুর নিরাপত্তার জন্য সর্বাগ্রে তাঁর সহযোগিতার প্রয়োজন।

বেলা তখন প্রায় দশটা। সহসা কি দেখে থমকে দাঁড়ালেন ভগৎরাম। ঐ তো একটা রেডিওর দোকান! উত্তমচাঁদের নয় তো?

হ্যাঁ, তাই তো! ঐ তো তাঁকে ভেতরে দেখা যাচ্ছে! কত যুগ পরে দেখা, তবু একনজরেই বেশ চেনা যায়।

কিন্তু উত্তমচাঁদ যদি তাঁকে চিনতে না পারেন? যদি আস্থা স্থাপন করতে না পারেন তাঁর কথায়? যদি সব কথা শুনে তাঁকে ফিরিয়ে দেন?

না, তা বলে পিছিয়ে গেলে চলবে না। দেখাই যাক না চেষ্টা করে!

—নমস্তে ভাই সাহেব! পায়ে পায়ে দোকানে ঢুকলেন ভগৎরাম।

—নমস্তে! মুখ তুলে তাকালেন উত্তমচাঁদ। চোখে-মুখে তাঁর সপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা। কে এই আগন্তুক!

—আমর নাম ভগৎরাম।

—ভগৎরাম! সন্দেহের দোলায় দুলতে লাগলেন উত্তমচাঁদ। চেনা মুখ। খুবই চেনা। কিন্তু ঠিক যেন স্মরণ হচ্ছে না।

—শহীদ হরিকিষণকে আপনার মনে আছে কি?

—হরিকিষণ! নিমেষে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন উত্তমচাঁদ, পাঞ্জাবের গভর্ণর মোরেন্সিকে গুলী করার মামলায় যাঁর ফাঁসি হয়েছিল...

—হ্যাঁ, তাঁর কথাই বলছি। আমি তাঁর ছোট ভাই—ভগৎরাম।

—ভগৎরাম! সানন্দে অভ্যর্থনা জানালেন উত্তমচাঁদ, হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার মনে পড়ছে। কি আশ্চর্য! আগে বলতে হয় তো! তারপর, কি খবর বলুন!

ভগৎরাম বিব্রত। দ্বিধা ও কুণ্ঠায় জড়-সড়। সামনেই দাঁড়িয়ে একটি অপরিচিত লোক। তার সামনে এসব কথা বলা সম্ভব নয়।

—দু কাপ চা নিয়ে এসো তো অমরনাথ। অবস্থাটা বুঝে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই দোকানের বয়টিকে অন্যত্র সরিয়ে দিলেন উত্তমচাঁদ, নিন, এবার বলুন!

—সুভাষবাবুর অন্তর্ধানের কথা শুনেছেন কি?

—কেন শুনব না? কাবুলে এমন একজন ভারতীয়ও বোধকরি খুঁজে পাবেন না, যিনি এ খবর শোনেননি। কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন? কি ব্যাপার?

একে একে সব কথাই খুলে বললেন ভগৎরাম। সুভাষবাবু এখানেই রয়েছেন। তিনি আপনার সাহায্যপ্রার্থী। যে করে হোক, তাঁর জন্য একটা নিরাপদ আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

উত্তমচাঁদ স্তম্ভিত। উত্তরের আশায় ভগৎরাম তাঁর দিকে চেয়ে আছেন. কিন্তু কি উত্তর দেবেন তিনি! তার আগে চাই একটু আড়াল। চাই নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হিসেব-নিকেশ করার মতো একটু সময়।

শব্দহীন মন্থরতায় কেটে গেল মুহূর্তের পর মুহূর্ত।

দুজনেই নিঃশব্দ। দুজনেই চুপচাপ। শুধু দোকানের দেওয়াল-ঘড়িটা একটানা বেজে চলেছে টিক্ টিক্ করে।

—কি ঠিক করলেন উত্তমচাঁদজী? হঠাৎ একসময়ে প্রশ্ন করলেন ভগৎরাম।

—আমাকে একটু সময় দিন ভাইসাহেব। যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠলেন উত্তমচাঁদ, আপনি বিকেল ঠিক চারটের সময় একবার আসুন। আমি ততক্ষণে ভেবে দেখি, কি করা যায়!

ভগৎরাম বিদায় নেবার পরে বহুক্ষণ পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন উত্তমচাঁদ। ভাবনার পর ভাবনা। ঢেউয়ের পর ঢেউ। কি করা যায় এখন!

ভাবতে ভাবতে একে একে অনেক প্রশ্নের জটলা এসে ভিড় করে দাঁড়াল উত্তমচাঁদের মনে।

গোটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যাঁর সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাঁকে আশ্রয় দেওয়ার অর্থই হল জেনে-শুনে মস্তবড় একটা বিপদের ঝুঁকি নেওয়া। তাই বলে নওজোয়ান সভার সদস্য হিসেবে একাজে তাঁকে পিছিয়ে গেলে চলবে না।

জীবিকার প্রয়োজনে ভারতের বাইরে বসবাস করলেও ভারতবাসী হিসেবে তার স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারে তাঁর নিজেরও একটা দায়িত্ব রয়েছে বৈকি!

কিন্তু তাঁর বর্তমান বাসস্থান মহল্লা হিন্দু গুজর অঞ্চলটা পরিবেশের দিক থেকে মোটেই আশানুরূপ নয়। যেমন ঘিঞ্জি, তেমনি অস্বাস্থ্যকর। সুভাষবাবুর মতো লোককে সেখানে রাখা অসম্ভব।

বন্ধু হাজিসাহেবকে একবার বলে দেখলে কেমন হয়!

লোক হিসেবে বরাবরই তিনি ইংরেজ-বিদ্বেষী। তাছাড়া তাঁর বাড়িটাও বেশ বড় এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সেখানে অনায়াসেই তাঁকে রাখা যেতে পারে।

হাজিসাহেব কিন্তু রাজী হলেন না। গেঞ্জী ও মোজার ব্যবসায়ী হিসেবে কাবুলের সর্বত্র তিনি সুপরিচিত। কারখানা নিজের বাড়িতেই। বিস্তর লোকের সেখানে আনাগোনা।

এ অবস্থায় সুভাষবাবুর মতো লোককে তাঁর কাছে রাখা দস্তুরমত

বিপজ্জনক। কখন কি ঘটে যাবে, কে বলতে পারে!

তবে অন্যান্য ব্যাপারে সুভাষবাবুর জন্য যতটুকু করা সম্ভব, তা তিনি করবেন বৈকি! তিনিও যে ভারতবাসী!

আবার নতুন করে চিন্তার জালে ধরা দিলেন উত্তমচাঁদ। কি করা যায় এখন!

কোথায় রাখা যায় সুভাষবাবুকে! কার কাছে?

শীতের অপরাহ্ণ। প্রচণ্ড তুষার-ঝঞ্ঝা চলছে বাইরে। এমন কি নদীর জল পর্যন্ত জমে বরফ হয়ে গেছে।

পথ-ঘাট প্রায় জনমানবশূন্য। খুব একটা প্রয়োজন না থাকলে কে আর সখ করে এই দুর্যোগের মধ্যে বেরুতে চায়! যা তুষারপাত চলছে বাইরে! সর্বাঙ্গে সূচের মতো বেঁধে যেন।

—নমস্তে উত্তমচাঁদজী! ঠিক কাঁটায় কাঁটায় চারটের সময় দোকানে এসে পা দিলেন ভগৎরাম।

—একাই এসেছেন নাকি? মুখ তুলে তাকালেন উত্তমচাঁদ।

—না, সুভাষবাবুও এসেছেন। ঐ যে উনি নদীর ধারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন।

কাছে গিয়ে উত্তমচাঁদ অবাক। একি! এ কোন্ সুভাষবাবু! মুখে একগাল দাড়ি। পরনে নোংরা শার্ট ও সালোয়ার। গলায় ততোধিক নোংরা একটা চাদর। বিশ্বাসই যেন হয় না।

অবশ্য ভগৎরামের মুখ থেকে ইতিপূর্বে সব কিছুই তিনি শুনেছিলেন। তবু দেশের মুক্তির জন্য সুভাষবাবুর এই ভয়াবহ কৃচ্ছ্রসাধনের কথা তাঁর স্বপ্নেরও বুঝি অগোচর ছিল।

—আমার পেছনে পেছনে আসুন! নিমেষে মনস্থির করে নিয়ে বললেন উত্তমচাঁদ, তবে একসঙ্গে নয়। একের পর এক আসুন। নইলে সন্দেহ হতে পারে।

কোনরকমে নিজের বক্তব্য শেষ করে সঙ্গে সঙ্গেই সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করে দিলেন উত্তমচাঁদ।

নিরাপদ দূরত্বের ব্যবধান রেখে এবার তাঁকে অনুসরণ করলেন ভগৎরাম। সবশেষে সুভাষ।

একটানা বহুক্ষণ বরফের ওপর দাঁড়িয়ে থাকার ফলে ইতিমধ্যে কখন যে পা দুটো অসাড় হয়ে গেছে, টেরই পাননি সুভাষ। টের পেলেন সামনের পা বাড়াতে গিয়ে। ফলে, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ভারসাম্য হারিয়ে ছিট্‌কে পড়লেন শক্ত বরফের ওপর।

আবার উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন, আবার পড়ে গেলেন। এমনি করে বার বার।

হাত-পা ক্ষতবিক্ষত। ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত ঝরছে অজস্র ধারায়। তবু চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। সঙ্গীরা সবাই এগিয়ে গেছেন। তাঁর পিছিয়ে

পড়লে চলবে কেন?

এমনি করে উত্তমচাঁদের বাড়ি।

সুভাষ তখন রীতিমত টলছেন। চোখের সামনে চাপ চাপ অন্ধকার। পরিচিত জগৎটা কেমন যেন একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছে, গুলিয়ে যাচ্ছে, মিলে-মিশে সব একাকার হয়ে যাচ্ছে।

ফিরে তাকিয়ে সুভাষের এই শোচনীয় অবস্থা দেখে সঙ্গে সঙ্গে দুজনে তাঁকে ধরে নিয়ে গেলেন দোতলায়। ঠাণ্ডায় সর্বাঙ্গ জমে গেছে। গা থেকে ভেজা জামাকাপড় খুলে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ গরম জলের সেঁক দেওয়া দরকার।

উপযুক্ত সেবা-শুশ্রূষার ফলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আবার সুস্থ হয়ে উঠলেন সুভাষ। এবার চাই একটু পরিপূর্ণ বিশ্রাম।

কিন্তু কোথায় বিশ্রাম!

হঠাৎ পরিস্থিতি জটিল হয়ে দেখা দিল ছোট্ট একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

রাত তখন প্রায় দশটা।

শিয়রের কাছে রেডিওটা বেজে চলেছে একটানা। বাংলা গান। কলকাতা স্টেশন থেকে কে যেন বাংলা গান গাইছে ভারি মিষ্টি গলায়।

শুনতে শুনতে অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে মনটা কানায় কানায় ভরে ওঠে সুভাষের। বাংলা গান! বাংলা ভাষা! সংসারে কোথাও বুঝি তার তুলনা নেই।

ঘটনাটা ঘটল ঠিক তখনই।

হঠাৎ কি একটা কারণে একতলার ভাড়াটে রোশনলাল একেবারে বিনা নোটিশে ঘরের মধ্যে এসে হাজির। এদিক-ওদিক তাকাতে গিয়ে সহসা কি দেখে সারা দেহ তার কেঁপে উঠল থরথর করে।

কে! কে! কে ওখানে বসে রয়েছে অমন করে! এ চেহারা তো কারো ভুল হবার কথা নয়!

একটা বিমূঢ়, নিশ্চল পরিস্থিতি। ঘরের প্রতিটি প্রাণী নির্বাক। সবার চোখে-মুখে নিবিড় সংশয়। এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাব যেন সবাইকে টেনে নিয়ে চলেছে ভয়াবহ এক নির্মম পরিণতির দিকে।

এখুনি কিছু একটা ব্যবস্থা করা দরকার। রোশনলালকে কিছু বলা দরকার। বোঝানো দরকার।

সব বৃথা। তার আগেই কাউকে কোনরকম প্রস্তুত হবার সুযোগ না দিয়ে রোশনলাল একলাফে বেরিয়ে গিয়ে সোজা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল তরতর করে। আর ফিরে তাকাল না।

দুশ্চিন্তায় কালো হয়ে উঠল উত্তমচাঁদের মুখ। রাত এখন অনেক. সুতরাং ভয়ের তেমন কোন কারণ নেই। তবে কাল ভোরে ঘুম থেকে উঠেই সর্বাগ্রে গিয়ে ধরতে হবে রোশনলালকে। যে করে হোক. ওর মুখ বন্ধ করা চাই-ই!

কোথায় রোশনলাল!

পরদিন ঘুম থেকে উঠে উত্তমচাঁদ অবাক। আশ্চর্য, রোশনলাল নেই! কাউকে কিছু না বলে রাতারাতি সে স্ত্রী-পুত্র সবাইকে নিয়ে কোথায় সরে পড়েছে।

বিপদের যেন সুস্পষ্ট পদধ্বনি শুনতে পেলেন উত্তমচাঁদ। না, আর দেরি নয়। বোসবাবুকে যত শীগ্‌গির সম্ভব এখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। রোশনলালের অবিমৃশ্যকারিতার জন্য বিপদ ঘটে যেতে কতক্ষণ!

ফলে, পরদিনই আবার সুভাষকে পথে পা বাড়াতে হল দুর্দিনের সঙ্গী ভগৎরামকে সঙ্গে নিয়ে।

তবে এবার আর আগেকার সেই লাহোরী গেটের সরাইখানায় নয়, উত্তমচাঁদের পরিচিত অন্য একটা আস্তানায়।

কলকাতা থেকে পেশোয়ার। তারপর পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে কাবুল। এই সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে গিয়ে কম ঝড়-ঝঞ্ঝা অতিক্রম করতে হয়নি সুভাষকে। কম মূল্য দিতে হয়নি। তবু সুভাষ সুভাষই। তাই সব কিছু উপেক্ষা করে দিনের পর দিন তিনি এগিয়ে গেছেন অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে।

এবার আর কিন্তু তা সম্ভব হল না। হাজার হোক, মানুষের দেহ! কত সহ্য হয়!

ফলে, চার দিন যেতে না যেতেই আবার ভগৎরামকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতে হল উত্তমচাঁদের কাছে। বোসবাবু অত্যন্ত অসুস্থ। জ্বর এবং আমাশয় দুটোই চলছে একসঙ্গে। কি করা যায় এখন!

অনেক ভেবে-চিন্তে আবার সুভাষকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন উত্তমচাঁদ। রোশনলালের দিক থেকে ভয়ের তেমন কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। তাহলে এদ্দিনে হুলস্থূল কান্ড বেধে যেত এখানে।

তা যখন হয়নি, তখন বুঝতে হবে, ভয় পেয়েই হোক, বা যে কারণেই হোক, রোশনলাল এ সম্বন্ধে কাউকেই কিছু বলেনি।

তবু কোন স্থায়ী সুরাহা হল না। এবার বাদ সাধলেন উত্তমচাঁদ-গৃহিণী স্বয়ং।

কে এই লোক দুটি?

কেন ওরা এখানে রয়েছে?

কি মতলব ওদের?

—ওরা তেমন লোক নয়। সাফাই গাইতে চেষ্টা করলেন উত্তমচাঁদ, নেহাত দেহাতী লোক। কেনাকাটার জন্য শহরে এসেছে। দুদিন বাদেই আবার চলে যাবে।

—আমাকে কচি খুকি পেয়েছ নাকি! শুনেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন উত্তমচাঁদ-গৃহিণী, তাই যদি হবে, তবে রাতদিন ওদের সঙ্গে অত ফিস্ ফিস্ গুজ গুজ কেন? তাছাড়া সবসময়ে ওদের ঘরের দরজায় বাইরে থেকে শেকল টানা থাকে কেন? নিশ্চয় ওরা কোন ফেরারী আসামী।

—চুপ! চুপ! কাকে কি বলছ? বেগতিক দেখে সব কথাই খুলে বললেন উত্তমচাঁদ, জানো উনি কে? সুভাষ বসুর নাম নিশ্চয়ই শুনেছ! উনিই সেই সুভাষ বসু!

সুভাষ বসু! উত্তম-জায়া অসাড়, নিস্পন্দ।

রাষ্ট্রপতি সুভাষ বসু। আজন্ম-বিপ্লবী সুভাষ বসু। ভারতের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, পুরুষসিংহ সুভাষ বসু কিনা আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের এই সামান্য পর্ণকুটিরে! এ আনন্দ, এ গৌরব তিনি রাখবেন কোথায়!

না, আর কোথাও তিনি যেতে দেবেন না সুভাষবাবুকে। যতদিন কাবুলে থাকবেন, ততদিন কষ্ট হলেও এখানেই তাঁকে থাকতে হবে। কিছুতেই তাঁর অন্যত্র যাওয়া চলবে না।

উপযুক্ত চিকিৎসা ও সেবা-যত্নের ফলে দেখতে দেখতেই সুভাষ আবার সুস্থ হয়ে উঠলেন আগেকার মতো।

এ ব্যাপারে মাকেও বুঝি ছাপিয়ে গেল তাঁর শিশুকন্যাটি। ক্ষণে ক্ষণে সে কি তার সতর্ক শাসন! তোমাকে সবটা খেতে হবে। কিছু ফেলে রাখলে চলবে না।

—কিন্তু আর যে আমি পারছিনে মা-মণি! কাতরতা ঝরে পড়ে সুভাষের কথায়।

—ওমা! বলে কি গো! তোমাকে নিয়ে আর পারিনে বাপু। শীগ্গির খেয়ে নাও বলছি! নইলে আমি কিন্তু ভীষণ রাগ করব।

বাধ্য হয়েই এই স্নেহের আবদারটুকু মেনে নিতে হয় সুভাষকে। উপায় কি! সংসারে মায়েদের চেহারা সর্বত্রই যে এক। এড়াতে চাইলেই কি এত সহজে তাদের এড়ানো যায়!

শীতের শেষ। কাবুল-উপত্যকায় বরফ গলতে শুরু করেছে একটু একটু করে।

সুভাষ চিন্তিত। ফেব্রুয়ারি শেষ হয়ে মার্চ এসে গেল, কিন্তু কোথায় কি! কোনদিক থেকেই যেন এতটুকু আশার আলো দেখা যাচ্ছে না।

ইতিমধ্যে জার্মান রাষ্ট্রদূতের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের সেই চিহ্নিত ব্যক্তি সিমেন্স কোম্পানির হের টমাসের কাছে বার বার খোঁজ নেওয়া হয়েছে, কিন্তু জবাব পাওয়া গেছে সেই একই। বার্লিন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এখনো পর্যন্ত কোন খবর আসেনি। অপেক্ষা করুন।

কিন্তু এভাবে আর কতদিন অপেক্ষা করা যায়?

কবে নির্দেশ আসবে কে জানে! আদৌ আসবে কিনা, তা-ই বা কে বলতে পারে!

না, আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। এবার নিজে থেকেই যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু কি করা যায়?

ভাবতে ভাবতে অবশেষে একটা স্থির সিদ্ধান্তের বিন্দুতে এসে দাঁড়ালেন সুভাষ।

অদূরে রুশ-সীমান্ত। যে করে হোক, ঐ সীমান্ত অতিক্রম করে তাঁকে রুশ দেশে ঢুকে পড়তে হবে। তার জন্য প্রয়োজন এমন একজন লোক, যে

তাঁকে এ ব্যাপারে সহায়তা করতে সক্ষম।

লোকের সন্ধান দিলেন উত্তমচাঁদ। পেশোয়ারের ইয়াকুব খাঁ একজন ফেরারী খুনী আসামী। অনেকদিন ধরেই সে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে কাবুলে।

এসব ব্যাপারে আরো বেশি গুণী লোক হল তার শ্যালক। সে শুধু খুনীই নয়, একাধারে খুনী ও ডাকাত দুই-ই। রুশ-সীমান্তের ধারেই তার বাস। বোসবাবুর সম্মতি পেলে ঐ মানিকজোড়ের সঙ্গে তিনি একবার কথা বলে দেখতে পারেন।

সম্মতি দিলেন সুভাষ। স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড় কারো অবদানই তুচ্ছ নয়।

শহরের ডাকসাইটে সিঁদেল চোর গগনের সামান্য অবদানই কি একদিন চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের সর্বাধিনায়ক মাস্টারদার কাছে অসামান্য হয়ে দেখা দেয়নি? সুতরাং বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে এ ক্ষেত্রেও সম্মতি না দেবার মতো কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

সঙ্গে সঙ্গেই ইয়াকুব খাঁ রাজী। সে-ই সুভাষ ও ভগৎরামকে নিয়ে যাবে রুশ-সীমান্ত পর্যন্ত। পরের দায়িত্ব তার সেই গুণী শ্যালকের। পারিশ্রমিক মোট সাত শো আফগান মুদ্রা। তার মধ্যে চার শো দিতে হবে অগ্রিম। আর সেই সঙ্গে শ্যালকবাবুর জন্য লুঙ্গি, গেঞ্জি ইত্যাদি সামান্য দু-একটা উপহারসামগ্রী।

দিন ধার্য হল ১৯৪১ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি।

এবার যাত্রী-সংখ্যা মোট তিনজন। সুভাষ, ইয়াকুব খাঁ ও ভগৎরাম। খানাবাদ পর্যন্ত যেতে হবে বাসে। তারপরই পদযাত্রা।

আগের দিন সকাল থেকেই খাটা-খাটুনি শুরু হল ভগৎরামের।

চুক্তিমতো আজই ইয়াকুব খাঁকে চার শো টাকা বুঝিয়ে দিতে হবে। বাসের টিকেটও কেটে রাখতে হবে আগে থেকেই।

সবশেষে নিজেদের জন্যও কিছু টুকিটাকি জিনিসপত্র কেনা দরকার। সেই সঙ্গে ইয়াকুব খাঁর সেই গুণী শ্যালকের জন্য লুঙ্গি, গেঞ্জি ইত্যাদি উপহারসামগ্রী।

যাবতীয় কাজকর্ম শেষ করে ডেরায় ফেরার পথে সহসা কি ভেবে সেই হের টমাসের দোকানে ঢুকে পড়লেন ভগৎরাম। দেখা যাক কোন খবর-টবর আছে কিনা!

অবশ্য গিয়ে কোন লাভ নেই। রোজই তো সেই এক কথা, 'বার্লিন থেকে কোন খবর আসেনি।' তবু দেখাই যাক না!

কথাবার্তা শেষ করে একরকম ছুটতে ছুটতেই ডেরায় ফিরে এলেন ভগৎরাম।

—খবর আ গিয়া বোসবাবু, খবর আ গিয়া! এক্ষুণি আপনাকে একবার ইতালীয়ান এ্যাম্ব্যাসীতে যেতে হবে। ওঁদের রাষ্ট্রদূত অ্যালবার্ট কোরানীর সঙ্গে অবিলম্বে আপনার দেখা হওয়া দরকার। রাত সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করবেন আপনার জন্য।

ভগৎরাম-সহ ইতালীয়ান এ্যাম্‌ব্যাসীতে যেতেই সাদর সম্ভাষণ জানালেন রাষ্ট্রদূত অ্যালবার্ট কোরানী। বার্লিন থেকে খবর এসেছে। সিনর বোসের ব্যাপারে তাঁরা সবরকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

গোল বেধেছে রুশ সরকারের সিদ্ধান্ত নিয়ে। সিনর বোসকে তাঁরা কোনরকম ভিসা দিতে রাজী নন। কারণ, এ নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কোনরকম ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হোক, এটা তাঁদের কাম্য নয়।

অবশ্য এ ব্যাপারে রুশ সরকারের ওপর যথেষ্ট চাপ দেওয়া হচ্ছে। মনে হয় শীগ্‌গিরই এর একটা মীমাংসা হয়ে যাবে। সুতরাং সিনর বোসকে কষ্ট করে আরো কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে। আর হ্যাঁ, এ ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্ব এখন থেকে ইতালীয়ান এ্যাম্‌ব্যাসীর, জার্মান এ্যাম্‌ব্যাসী বা অন্য কারোরই নয়।

কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনার জন্য সে-রাতটা ওখানেই থাকতে হল সুভাষকে। ভগৎরাম ফিরে এলেন একা। ওদিকে উত্তমচাঁদ পথ চেয়ে আছেন। ফিরে গিয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করা দরকার।

পরদিন ভোরেই আবার পড়ি কি মরি করে বেরিয়ে পড়লেন ভগৎরাম।

হাতে বিস্তর কাজ। প্রথমেই যেতে হবে ইয়াকুব খাঁর কাছে। আশ্বাস যখন পাওয়া গেছে, তখন আপাতত রুশ-সীমান্ত অতিক্রম করার প্রশ্নই ওঠে না। টাকা গেছে যাক, তবু খবরটা ইয়াকুব খাঁকে জানিয়ে দেওয়া দরকার।

ওখান থেকে যেতে হবে শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে 'ডারুল আমন' বলে একটা জায়গায়।

ইতালীয়ান এ্যাম্‌ব্যাসীর সেকেণ্ড সেক্রেটারীর সঙ্গে বোসবাবু ওখানেই এসে অপেক্ষা করবেন বলে ঠিক হয়ে আছে। তাঁকে নিয়ে আসতে হবে।

'ডারুল আমন' থেকে পায়ে হেঁটে দুজন যখন ফিরে এলেন, তখন বরফে বরফে গোটা শহরটাই বুঝি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তদুপরি কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার। দুহাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যায় না। তবু আশা ও আনন্দে দুজনেরই মন সেদিন ভরপুর। এতদিন পরে এ ব্যাপারে একটু আশার আলো দেখা দিয়েছে। দেখা যাক, এবার কি হয়!

আবার শুরু হল সেই প্রতীক্ষা। সেই ক্লান্তিকর প্রহর গোনার দিন।

আর কতদিন? কবে খবর পাওয়া যাবে ইতালীয়ান এ্যাম্‌ব্যাসী থেকে? কবে?

খবর পাওয়া গেল ১২ই মার্চ দুপুরবেলায়।

হঠাৎ সেদিন ইতালীয়ান রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী মিসেস কোরানী উত্তমচাঁদের দোকানে এসে হাজির। খবর শুভ। রুশ সরকারের অনুমতি মিলেছে। সিনর বোসকে দু-চার দিনের মধ্যেই পাসপোর্ট ছবি ও পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি করে নিতে হবে।

কঠিন সমস্যা। পোশাক-পরিচ্ছদ বলতে সামান্য যা দু-একটা আছে, সবই তো চাচা জিয়াউদ্দিনের গায়ের। এই অল্প সময়ের মধ্যে পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি করে নেওয়া সম্ভব হবে কি?

—নিশ্চয় সম্ভব। দায়িত্ব নিলেন উত্তমচাঁদের বন্ধু সেই গেঞ্জি ও মোজা-

ব্যবসায়ী হাজিসাহেব ও তাঁর জার্মান স্ত্রী, হোক না সময় অল্প, তবু যে করে হোক বোসবাবুর জন্য এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে হবে।

এবার ফটো তোলার পালা। কিন্তু এ চেহারা তো চলবে না। এ যে চাচা জিয়াউদ্দিন। সুভাষ বোস কোথায়? সুতরাং দীর্ঘদিন বাদে বাধ্য হয়েই আবার সুভাষকে আত্মপ্রকাশ করতে হল জিয়াউদ্দিনের খোলস ত্যাগ করে।

দেখে দেখে আশা যেন আর মেটে না ভগৎরামের। হ্যাঁ, এই তো আসল সুভাস বোস! বাঙ্গাল-কা শের সুভাষ বোস! এই না হলে কি বোসবাবুকে মানায়!

শুরু হল সাজ-সাজ রব। সবাই ব্যস্ত। সবাই চঞ্চল। আর দেরি নেই। সময় হয়ে এসেছে।

এই কর্মব্যস্ততার মধ্যেও কিন্তু সুভাষ চুপচাপ বসে নেই। এরই মধ্যেই তিনি ইংরেজিতে দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ ও একটি চিঠি লিখে ফেললেন ফরোয়ার্ড ব্লকের অ্যাক্‌টিং প্রেসিডেন্ট পাঞ্জাবের সর্দার শার্দুল সিং কবি শের-এর উদ্দেশে।

প্রবন্ধ দুটি হল 'Gandhism in the Light of Hegelian Dialectic' ও 'A Message to My Countrymen.' প্রথমটা পেন্সিলের, পরেরটা কালিতে লেখা।

আর বাংলায় একটা চিঠি লিখলেন মেজদা শরৎবাবুর উদ্দেশে। 'চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি ঠিক আছি।'

১৫ই মার্চ। সুভাষ ও ভগৎরাম সেদিন দুপুরে হাজিসাহেবের বাড়ি নিমন্ত্রিত।

হাজিসাহেব ও তাঁর জার্মান স্ত্রীর একান্ত অনুরোধ, বোসবাবুকে তাঁদের গরীবখানায় একবার পদধূলি দিতে হবে। তাছাড়া কয়েকজন পলাতক বিপ্লবী সেখানে সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন বোসবাবুর সঙ্গে পরিচিত হবেন বলে।

খাওয়া-দাওয়ার পরে শুরু হল আলোচনা-সভা।

শুনতে শুনতে সবাই চঞ্চল। সবাই উদ্দীপ্ত। আমরা আছি। বোসবাবুর এই মহৎ প্রচেষ্টার পেছনে সবাই আমরা আছি। কেউ পিছিয়ে থাকব না আসন্ন সেই মহাসংগ্রামের দিনে।

হঠাৎ সেখানে ঝড়ের বেগে প্রবেশ করলেন উত্তমচাঁদ।

—আ গিয়া! আ গিয়া! ফাইনাল খবর আ গিয়া! কাল বোসবাবুর সুটকেসটা দোকানে নিয়ে রেখে দিতে হবে। বেলা ঠিক দুটোর সময় এ্যাম্‌ব্যাসী থেকে লোক এসে ওটা তুলে নিয়ে যাবে তাদের জিম্মায়।

পরশুদিন বিকালে বোসবাবুকে যেতে হবে ইতালীয়ান বন্ধু ক্রেশিনির বাড়িতে। ওখান থেকে তাঁকে ভোর-রাত্রে পাড়ি দিতে হবে যুদ্ধরত ইয়োরোপের উদ্দেশ্যে।

উত্তেজনায় কেঁপে উঠলেন উপস্থিত প্রতিটি প্রাণী। সবার মনে একই কথার গুঞ্জন। বোসবাবুর এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা সার্থক হোক! বোসবাবু জিন্দাবাদ!

১৭ই মার্চ। লগ্ন আসন্ন। এবার সুভাষকে বিদায় নিতে হবে উত্তমচাঁদের বাড়ি থেকে।

এক অকথিত ব্যথায় বাড়ির প্রতিটি প্রাণী সেদিন গম্ভীর, করুণ ও স্বল্পবাক্। বোসবাবু চলে যাচ্ছেন। মন সায় দেয় না, তবু তাঁকে যেতে দিতে হবে। মায়ের স্নেহাঞ্চল পর্যন্ত যাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি, তাঁকে ধরে রাখবার মতো সাধ্য তাঁদের কোথায়!

—আবার কবে ফিরে আসবে, বলো? চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে উত্তমচাঁদের সেই ছোট্ট মেয়েটির।

—কাজ শেষ হলেই ফিরে আসব মা-মণি। আদর করে তাকে কাছে টেনে নিলেন সুভাষ।

উত্তমচাঁদের বাড়ি থেকে হাজিসাহেবের বাড়ি। কাবুল-প্রবাসী এই ভারতীয়দের ঋণ যে কোনদিনই পরিশোধ করা সম্ভব নয়। আজ সবার কাছ থেকে তাঁর সকৃতজ্ঞ বিদায় নেওয়া প্রয়োজন।

সন্ধ্যায় ইতালীয়ান বন্ধু ক্রেশিনির বাড়ি। সংগে সেই ভগৎরাম।

নিমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উত্তমচাঁদ এসে হাজির হলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই. তবে বেশিক্ষণ রইলেন না। আহারাদি সেরেই আবার তিনি ফিরে গেলেন নিজের আস্তানায়।

রইলেন শুধু ভগৎরাম। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে একটু পরেই আলোচনা-সভা বসবে। সেখানে তাঁর উপস্থিত থাকা প্রয়োজন।

শুরু হল আলোচনা-সভা। একথা-সেকথার পরে এক এক করে অনেক কিছুই জানতে চাইলেন ইতালীয়ান বন্ধু ক্রেশিনি। সিনর বোস চলে যাবার পরে ইতালীয়ান এ্যাম্ব্যাসীর মাধ্যমে কে ভারতের পক্ষ হয়ে তাঁর সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন?

কে এখানে থাকবেন তাঁর প্রতিনিধিরূপে?

কার সংগে ইতালীয়ান এ্যাম্ব্যাসী এ সম্বন্ধে কথাবার্তা বলবেন?

প্রশ্ন অনেক, কিন্তু উত্তর একটাই।

ভগৎরাম! ভগৎরাম! ভগৎরাম!

তাছাড়া আসন্ন সংগ্রামের জন্য দুর্ধর্ষ উপজাতীয় সর্দারদের সংগেও এখন থেকে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন এই দুরন্ত দুঃসাহসী সৈনিক ভগৎরাম। ভগৎরাম একাই একশো।

ক্রেশিনির গেস্ট-হাউসেই সেই রাত্রিতে শোবার ব্যবস্থা হল দুজনের।

দেখতে দেখতে সুভাষ একসময় ঘুমিয়ে পড়লেন নিঝুম ঘুমের অতলান্তে। ঘুম নেই ভগৎরামের চোখে। রাত্রির বুক চিরে কোথা থেকে ভেসে আসছে একটা করুণ সুর! পাহাড়ের পর পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে সেই সুর মিলিয়ে যাচ্ছে দূর-দিগন্তের বুকে।

মনে পড়ে কত কথা। পেশোয়ার থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল ২৬শে জানুয়ারি ভোর-রাত্রিতে। তারপর একসংগে কত দিন, কত মুহূর্ত, কত দুঃখ, কত আনন্দ-বেদনা, কত সীমাহীন রাত্রি তাঁদের কেটে গেছে একে অন্যকে আশ্রয় করে।

আজ সব কিছুর ইতি। সব কিছুর পরিসমাপ্তি। আবার কোনদিন তাঁরা এমনি করে একই ধারায় এসে মিলতে পারবেন কিনা কে জানে! একমাত্র অনাগত ভবিষ্যৎই তার জবাব দিতে সক্ষম।

তখনো ভাল করে সূর্য ওঠেনি। আলো-আঁধারিতে পথ-ঘাট, গাছ-পালা, পাহাড়-নদী সব কিছুই রহস্যময়।

ঠিক তখনই ইতালীয়ান এ্যাম্‌ব্যাসী থেকে একটা গাড়ি এসে থামল ক্রেশিনির বাড়ির সামনে।

মোট চারজন যাত্রী গাড়িতে। ডাঃ ওয়েলগার, একজন জার্মান, একজন ইতালীয়ান ডাক-হরকরা ও ইয়োরোপীয়ান ড্রাইভার নিজে।

বাকি আর মাত্র একজন। সুভাষ নয়। জিয়াউদ্দিনও নয়। সিনর অরল্যাণ্ডো ম্যাজোট্টা। সুভাষের নতুন ইতালীয়ান নাম। পাসপোর্টেও তাই রয়েছে।

সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে সিনর অরল্যাণ্ডো ম্যাজোট্টা-বেশী সুভাষ এবার গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলেন বড় বড় পা ফেলে। বিদায় বন্ধুগণ, বিদায়! আবার দেখা হবে। দেখা হবে স্বাধীন ভারতে।

শেষ পর্যন্ত ভগৎরাম একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন দূরে অপসৃয়মাণ গাড়িটার দিকে। বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা। মুখে তারই প্রতিচ্ছায়া।

বোসবাবু চলে যাচ্ছেন। শূন্যতার ব্যথা নিয়ে পড়ে রইলেন তিনি একা। কেউ নেই তাঁকে সান্ত্বনা দেবার। কেউ নেই।

বুঝি একলহমার ব্যাপার. তারপরই আবার নিজেকে শক্ত করে তুললেন ভগৎরাম।

না, কোন দুঃখ নয়। কিসের দুঃখ! এই তো চাই। এই তো হওয়া উচিত। তুমি তো সাধারণ লোক নও! স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত তুচ্ছ হৃদয়-বৃত্তির অবকাশ তোমার কোথায়!

তাই হোক। তাই হোক। তোমার স্বপ্ন সার্থক হোক। ভারত স্বাধীন হোক। হে, স্বাধীনতার অগ্রদূত, তোমাকে শতকোটি নমস্কার!

১৯৪১ সাল। ১৮ই মার্চ।

সবেমাত্র ভোর হয়েছে। রাস্তায় লোক-চলাচল শুরু হয়েছে একটি-দুটি করে।

পায়ে পায়ে হেঁটে চলেছেন ভগৎরাম। ধীর মন্থর গতি। নীড়-ভাঙা বিহঙ্গের মতো ছন্নছাড়া ভাব।

সব যেমন ছিল তেমনই আছে। কোথাও কোন পরিবর্তন নেই। সব ঠিক থাকবে। সব চলবে অপরিবর্তনীয় নিয়মের নির্দেশে। নেই শুধু সুভাষবাবু।

প্রায় দেড় মাসাধিক কাল কাবুলে কাটিয়ে একটু আগেই তিনি পাড়ি দিয়েছেন যুদ্ধরত ইয়োরোপের উদ্দেশ্যে। আবার কোনদিন দেখা হবে কিনা কে জানে! আদৌ হবে কিনা তা-ই বা কে বলতে পারে!

উত্তমচাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পরদিনই ভগৎরাম পা বাড়ালেন হিন্দুস্থানের দিকে।

সুভাষ চলে গেলেন। আপাতত কিছুদিন তার ছুটি। এই ফাঁকে তাঁর নির্দেশমত বাকি কাজগুলো সেরে ফেলা যাক।

প্রথমেই গেলেন লাহোর। ফরোয়ার্ড ব্লকের অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট সর্দার শার্দুল সিং কবি-শের এখন ওখানেই রয়েছেন। সুভাষবাবুর লেখা জরুরী চিঠিখানি তাঁকে পেঁাছে দেওয়া দরকার।

২৮শে মার্চ লাহোর থেকে কলকাতা। উদ্দেশ্য, মেজদা শৎরবাবুর সঙ্গে দেখা করা। সুভাষবাবুর লেখা চিঠি ও মূল্যবান প্রবন্ধ দুটি তাঁকে পেঁাছে দিতে হবে।

তবে এবার আর একা নন। সঙ্গে এলেন বন্ধু হরমহিন্দর সিং। সুভাষের অন্তর্ধান-পর্বের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক না থাকলেও কীর্তি কিষাণ পার্টির তিনি একজন বিশ্বস্ত কর্মী।

ভগৎরামের মুখ থেকে খুঁটিনাটি সমস্ত বিবরণ শুনতে শুনতে আনন্দে, আবেগে, গর্বে বার বার চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে শরৎবাবুর।

অজ্ঞাতেই বুকের মধ্যে সেই ছোট্ট নামটি গুন্‌গুনিয়ে ওঠে মিষ্টি সংগীতের মতো। সুবি! সুবি! সুবি!

তাঁর বড় আদরের, বড় গর্বের সুবি। অর্ধেক পৃথিবীর অধীশ্বর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তিকে পর্যুদস্ত করে সে তার আপন লক্ষ্যে পেঁাছে গেছে। এবার শুরু হবে তার আসল সংগ্রাম। দিন আগত ঐ।

—একটা কথা! কুণ্ঠিতভাবে প্রশ্ন করলেন শরৎবাবু, তোমার কি টাকা-পয়সার কিছু দরকার আছে ভাই?

—পেলে ভালই হত। হেসে জবাব দিলেন ভগৎরাম, দুদিন বাদেই তো বোসবাবুর নির্দেশমত আবার আমাকে ছুটতে হবে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে। আমার অবসর কোথায়, বলুন!

—ঠিক আছে, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। হাসতে হাসতে বললেন শরৎবাবু, আশ্চর্য, কথাটা আমার মনেই হয়নি। ওর বৌদিই আমাকে মনে করিয়ে দিলেন। সুবির কথা আমার চাইতে ওর বৌদিই ভাল বোঝেন কিনা।

—আমি জানি। ভগৎরামের চোখে-মুখে মুগ্ধ সম্ভ্রমের বিহ্বলতা, কথায় কথায় বোসবাবু নিজেই একদিন আমাকে বলেছিলেন যে, আমার যা কিছু আবদার, সবই বৌদির কাছে। তিনি আমার দ্বিতীয় জননী।

শরৎবাবুর নির্দেশে বন্ধু হরমহিন্দর সিংকে নিয়ে এবার ভগৎরাম দেখা করলেন সুভাষের অন্তর্ধান-পর্বের অন্যতম নায়ক বি. ভি.-র দায়িত্বশীল নেতা শ্রদ্ধেয় সত্য বক্সীর সঙ্গে।

সেখানেও সেই একই দৃশ্যের অবতারণা। সেই একই ব্যাকুলতা। সুভাষ ভাল আছে তো? পথে তার কোন কষ্ট হয়নি তো?

—কষ্ট! বড় দুঃখের এক মর্মরাঙা হাসি ফুটে উঠল ভগৎরামের চোখে-মুখে, হাঁটা-পথে পেশোয়ার থেকে কাবুলের রাস্তা যে কি দুর্গম, কি বিপদসঙ্কুল, তা আপনাকে বোঝাতে পারব না বক্সীবাবু। অবাক হয়ে

ভাবি যে, কি করে এটা বোসবাবুর পক্ষে সম্ভব হল! নেহাত ভগবানের আশীর্বাদ না থাকলে অনভ্যস্ত মানুষের পক্ষে এ-পথ পাড়ি দেবার কথা চিন্তাও বুঝি করা যায় না। ঈশ্বরের অশেষ করুণা যে, কষ্ট হলেও বোসবাবু এ-পথ নির্বিঘ্নেই পেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

—পরবর্তী প্রোগ্রাম কি? জানতে চাইলেন সত্যবাবু।

—কাবুল ফিরে যাওয়া। বার্লিন থেকে বোসবাবুর কোন মেসেজ এলে তা রিসিভ করতে হবে। আর, আপনাকে একজন বিশ্বস্ত লোক দিতে হবে আমার সংগে। তাঁর কাজ হবে কাবুল গিয়ে আসন্ন সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসেবে ইতালীয়ান লীগেশন থেকে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ পরিচালনা করার মতো উপযুক্ত ট্রেনিং নেওয়া। বোসবাবুর নির্দেশ তা-ই।

—কবে নাগাদ ফিরে যেতে চাও সেখানে?

—খুব শীগ্‌গিরই।

—ঠিক আছে, তুমি ফিরে যাও। আমি শীগ্‌গিরই লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। পেশোয়ারে তোমার সংগে সে মিট্ করবে।

সে সময়ে বি. ভি.-র গোপন কার্যাবলী পরিচালনার ভার ছিল শ্রদ্ধেয় যতীশ গুহর ওপর।

অনতিবিলম্বে তাঁর সংগে যোগাযোগ করে সুভাষের পরিকল্পনার কথা বুঝিয়ে বললেন সত্যবাবু। কাবুল যাবার জন্য একজন বিশ্বস্ত ছেলে চাই। কাকে পাঠানো যায়!

সহকর্মী কামাখ্যা রায়, বিনয় সেনগুপ্ত, চন্দ্রশেখর সেন, কমেট দাশগুপ্ত প্রমুখ সবাইকে নিয়ে শুরু হল মন্ত্রণা-সভা।

কাকে পাঠানো যায় এ কাজের ভার দিয়ে? অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ। বেশ মজবুত ছেলে চাই।

—শান্তিময় গাঙ্গুলীকে পাঠালে কেমন হয়?

—শান্তিময় গাঙ্গুলী! তার মানে—আমাদের চঞ্চল? গুড সিলেকশন! যেমন কর্মঠ, তেমনি বুদ্ধিমান ছেলে। হ্যাঁ, এ কাজের জন্য অনায়াসেই ওর ওপর নির্ভর করা চলে। তাহলে ওকেই পাঠানো যাক।

৪ঠা এপ্রিল তারিখে ভগৎরাম লাহোর ফিরে গেলেন বন্ধু সোদী হরমহিন্দর সিংকে সঙ্গে নিয়ে। সেখান থেকে একাই চলে গেলেন পেশোয়ার।

আগে থেকে একটা নিরাপদ আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা রাখা দরকার। নইলে সংগীরা গিয়ে আশ্রয় নেবেন কোথায়?

আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিলেন সীমান্ত প্রদেশের ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা সেই আকবর শা, যিনি সুভাষের এই অন্তর্ধান-পর্বের সংগে বিশেষভাবে জড়িত। সেখানেই আপাতত আশ্রয় নিলেন ভগৎরাম। এবার সংগীরা এসে গেলেই হয়!

খুব একটা দেরি করতে হল না সংগীদের জন্য। ১৭ই এপ্রিল তারিখে লাহোর থেকে এসে গেলেন বন্ধু সোদী হরমহিন্দর সিং। ঠিক তার পরদিনই শান্তিময় গাঙ্গুলী গিয়ে হাজির হলেন পেশোয়ারের সেই গোপন আস্তানায়।

যাত্রা শুরু হল ২১শে এপ্রিল, ঊষালগ্নে।

এবার আর আগেকার পথ ধরে নয়। যেতে হবে 'মালাকান্দ পাস'-এর মধ্য দিয়ে, অনেকটা পথ ঘুরে। সুভাষের পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে এখন থেকেই উপজাতীয় সর্দারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার।

বর্ডার পর্যন্ত যেতে হল টাঙ্গায়।

এ ব্যাপারে সবচাইতে বেশি সহযোগিতা পাওয়া গেল সীমান্ত-গান্ধী আব্দুল গফুর খান সাহেবের বন্ধু সমুন্দর খাঁ ও তার ভাইপো জিয়ারত-গুলের কাছ থেকে।

জিয়ারতগুল সাহেব নিজেই তাঁদের বর্ডার পর্যন্ত পেঁছে দিলেন টাঙ্গাওয়ালার ছদ্মবেশে।

যাত্রী-সংখ্যা মোট চারজন। সমুন্দর খাঁর দেওয়া বিশ্বস্ত গাইড, শান্তিময় গাঙ্গুলী, সোদী হরমহিন্দর সিং ও ভগৎরাম স্বয়ং।

পোশাক-পরিচ্ছদের দিক থেকে সবাই খাঁটি পাঠান। শান্তিবাবুও তাই। কিন্তু দেখে কে বলবে যে, ঐ পোশাক-পরিচ্ছদের আড়ালে যিনি আত্মগোপন করে রয়েছেন, আসলে তিনি একজন আদি ও অকৃত্রিম বাঙালী ছাড়া আর কেউ নন!

বেলা একটা নাগাদ এল 'ডির-চিত্রল' নদী। দড়ির ঝোলায় নদী পার হয়ে আবার শুরু হল দুর্গম পাহাড়ী পথে এগিয়ে চলার পালা। শুধু পথ আর পথ। চড়াই আর উৎরাই।

একটা পাহাড়ী গাঁয়ে রাত কাটিয়ে আবার যাত্রা শুরু হল পরদিন ভোরে। সারাদিন চলার পরে অবশেষে এল 'বারঙ' নামে একটা পাহাড়ী গাঁ।

এ গাঁয়ের আফেন্দি সাহেব হিন্দুস্থানের লোক, তদুপরি ভগৎরামের পূর্ব-পরিচিত বন্ধু। সুতরাং আশ্রয়ের জন্য ভাবনা নেই।

পরদিনই 'চিনগাই'। সঙ্গে এলেন গত রাত্রির আশ্রয়দাতা ভগৎরামের বন্ধু সেই আফেন্দি সাহেব।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে একজন ভারতবাসী হিসেবে তাঁকে পিছিয়ে থাকলে চলবে কেন? সুতরাং আমিও আছি তোমাদের সঙ্গে। চলো, কিছুদূর এগিয়ে দিই তোমাদের।

পেশোয়ার থেকে আনা গাইডকে এখান থেকেই বিদায় দেওয়া হল। এবার তুমি ফিরে যাও ভাই। সমুন্দর খাঁকে আমাদের সেলাম জানিও। অনেক ধন্যবাদ তাঁকে।

আশ্রয় নেওয়া হল সোনাবর হোসেনের আস্তানা 'সোয়ান কিল্লায়'।

সোনাবর সাহেব এ অঞ্চলের মুকুটহীন সম্রাট। ইচ্ছা করলে হাজার হাজার দুর্ধর্ষ পাঠান তরুণকে তিনি দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন চোখের নিমেষে।

সুভাষের পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে সোনাবর সাহেবের মতো উপজাতীয় সর্দারের সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন।

শুনেই লাফিয়ে উঠলেন সোনাবর সাহেব।

ইয়া! ইয়া! এই তো মরদকী বাচ্চার মতো কথা। হ্যাঁ, আমি তৈয়ার।

জবান দিচ্ছি, হুকুম পেলে সঙ্গে সঙ্গে আমি দুশমন ব্রিটিশের খুনে পাহাড়ী মাটি লাল করে দেব। জান কবুল!

দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার পর অবশেষে ২৬শে তারিখে সবাই গিয়ে হাজির হলেন 'সফী ট্রাইবেল' অঞ্চলে। আশ্রয় নিলেন সোনাবর সাহেবের বন্ধু মহম্মদ কামিল সাহেবের আস্তানায়।

২৭শে তারিখে 'লোহারদের গাঁ'। এখানকার অধিবাসীরা যেমন দুর্ধর্ষ, তেমনি স্বাধীনতা-প্রিয়। বিশেষ করে রাইফেল তৈরি করতে এদের জুড়ি নেই বললেই চলে। লক্ষ্যভেদ করতে এমন অসাধারণ দক্ষতা সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না। এ ব্যাপারে এদের কি ছোট, কি বড়, সবাই প্রায় সমান।

হ্যাঁ, আমরাও আছি। এগিয়ে এলেন ওখানকার প্রতিষ্ঠাবান তরুণ আব্দুল রেজাক সাহেব। কেউ সেদিন পিছিয়ে থাকব না। চলো, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি কিছুদূর পর্যন্ত।

পরদিন 'কুদাখিল্য'। এখানকার মিরজান সাহেব অত্যন্ত প্রতাপশালী উপজাতীয় সর্দার। বংশ-পরম্পরায় তিনি ব্রিটিশদ্রোহী। পাহাড়ী এলাকায় কিছু করতে হলে তাঁর মতো লোকের সহযোগিতা অপরিহার্য। তাঁকে চাই-ই!

একই কথা শোনা গেল মিরজান সাহেবের মুখ থেকে, হ্যাঁ, আমি তৈয়ার। শুধু হুকুমের অপেক্ষা মাত্র। হুকুম পেলে সঙ্গে সঙ্গেই—ব্যস্!

এখান থেকেই ফিরে গে[illegible] ভগৎরামের বন্ধু সেই আফেন্দি সাহেব ও লোহারদের গাঁয়ের তরুণ সর্দার আব্দুল রেজাক সাহেব।

বাকি রইলেন মোট চারজন। ভগৎরাম, সোদী হরমহিন্দর সিং, শান্তিময় গাঙ্গুলী আর আফেন্দি সাহেবের দেওয়া একজন নতুন গাইড।

পথে নানা জায়গায় যোগাযোগ স্থাপন করে অবশেষে একদিন হাজির হলেন আফগান সীমান্ত-বরাবর একটা গাঁয়ে।

এবার বিপদ এল শান্তিবাবুর দিক থেকে। এতদিন তারুণ্যের শক্তিতে সব কিছু অগ্রাহ্য করে এলেও এবার আর তিনি কিছুতেই পারলেন না তার অনিবার্য পরিমাণকে ফাঁকি দিতে।

দেখা গেল, দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার ফলে ইতিমধ্যেই তাঁর পা দুটো বিষাক্ত ক্ষতে একেবারে অকেজো হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় পথ-চলা তো দূরের কথা, উঠে দাঁড়ানো পর্যন্ত কষ্টকর।

বাধ্য হয়েই একটি খচ্চর ভাড়া করতে হল শান্তিবাবুকে বহন করার জন্য। তাছাড়া উপায় কি! কাজ তো আর ফেলে রাখলে চলবে না! যে করে হোক, যেতেই তো হবে!

বেলা তিনটে নাগাদ এল কাবুল সড়ক।

নতুন গাইডটিকে এখান থেকেই বিদায় দেওয়া হল। আশ্রয় নেওয়া হল একটা কালভার্টের নিচে, ধূলিশয্যায়। কোন দুঃখ নেই। অত ভাল-মন্দ দেখার মতো অবকাশ তখন কোথায়? যেখানে হোক, আশ্রয় হলেই হল।

পরদিন সকাল আটটায় জালালাবাদ। আর ভয় নেই। দুর্গম পাহাড়ী পথের এখানেই শেষ। এবার কাবুলগামী একটা বাস বা ট্রাক ধরতে পারলেই নিশ্চিন্ত।

—এই সেই জালালাবাদ। বললেন ভগৎরাম, এখানেই বোসবাবু রাত কাটিয়েছিলেন। এই বাড়িতে!

—এই বাড়িতে! মুগ্ধ অপলক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন শান্তিবাবু। মহান বিপ্লবীর পদস্পর্শে ধন্য এ বাড়ি যে তাঁর কাছে তীর্থভূমি! এর ধূলি-কণাটুকুও যে তাঁর কাছে পবিত্র!

জালালাবাদ থেকে টাঙ্গায় সুলতানপুর। সেখান থেকে ট্রাক ধরে ১লা মে তারিখে সোজা কাবুল।

'সরাই জাজিয়ান'-এর একটা আস্তানায় অসুস্থ শান্তিবাবু ও সোদী হরমহিন্দর সিংকে রেখে সঙ্গে সঙ্গে ভগৎরাম পা বাড়ালেন উত্তমচাঁদের বাড়ির দিকে।

অনেকদিন দেখা নেই। সর্বাগ্রে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এখানকার বর্তমান পরিস্থিতিটা একটু যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন।

—আসুন! আসুন! ভগৎরামকে দেখেই সানন্দে অভ্যর্থনা জানালেন উত্তমচাঁদ, কবে ফিরলেন হিন্দুস্থান থেকে?

—আজই. একটু আগে। আসন গ্রহণ করে বললেন ভগৎরাম, তারপর, এখানকার খবরাখবর কি বলুন?

—খবর ভালই। ২৮শে মার্চ তারিখে বোসবাবু নির্বিঘ্নে বার্লিন পেঁছে গেছেন। ওখান থেকে যে-সব ম্যাগাজিন এসেছে, তাতেই এ খবর বেরিয়েছে। ছবিও ছেপেছে। তাছাড়া হাজিসাহেবের বাড়ির ঠিকানায় তাঁর চিঠিও এসেছে। সুতরাং সেদিক থেকে নিশ্চিন্ত! ভাবনার কারণ ঘটেছে অন্যদিক থেকে।

—কি রকম? অলস দৃষ্টিটা তীক্ষ্ন হয়ে উঠল ভগৎরামের।

—ক'দিন আগে একজন উচ্চপদস্থ আফগান গোয়েন্দা কর্মচারী এসে-ছিলেন আমার কাছে খোঁজ-খবর নিতে। তাঁর ধারণা. আমাদের এই মহল্লায় নাকি হিন্দুস্থানের একজন নামকরা বিপ্লবী-নেতা ও তাঁর একজন সংগী কিছুদিন আগে পর্যন্ত আত্মগোপন করে ছিলেন। কোথায়, কোন্ বাড়িতে, কার কাছে—এইসব নানারকম জেরা আর কি!

—আপনি কি বললেন? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন ভগৎরাম।

—স্রেফ অস্বীকার করলাম। কিন্তু কে কার কথা শোনে! ঘুরেফিরে সেই একই কথা। একই প্রশ্ন। পরেও কয়েকবার এসেছিলেন সন্ধান নিতে। তবে সন্দেহ হলেও এখনো পর্যন্ত সঠিক কিছু আঁচ করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

—পলাতক বিপ্লবীটির নাম-ধাম বলেছেন কিছু?

—না, তা বলেননি। ইচ্ছা করেই তাঁর নাম তিনি চেপে গেছেন। তবে সংগীটির নাম বলেছেন।

—কি নাম বলেছেন?

—ভগৎরাম।

—জেনে গেছে তাহলে! সশব্দে হেসে উঠলেন ভগৎরাম, কোই বাত নেহি। যানে দিজিয়ে।

—হাসির কথা নয় ভাইসাহেব। সংশয়ভরে বললেন উত্তমচাঁদ, জানাজানি যখন হয়ে গেছে, তখন একটু হুঁশিয়ার থাকবেন।

—বেশ, তাই থাকব। হাসতে হাসতে জবাব দিলেন ভগৎরাম, তবে নিশ্চিন্ত থাকুন যে, ভগৎরামকে গ্রেপ্তার করার মতো গোয়েন্দা তামাম দুনিয়াতে আজও কেউ জন্মায়নি। কাজেই তার প্রমাণ পাবেন। যাক, আমি এবার চলি ভাইসাহেব। নমস্তে!

এবার ভগৎরাম গিয়ে দেখা করলেন ইতালীয়ান বন্ধু সেই মিঃ ক্রেশিনির সঙ্গে। বোসবাবুর নির্দেশমত কলকাতা থেকে লোক এসে গেছে। পরবর্তী প্রোগ্রাম কি বলুন!

ইতালিয়ান এ্যাম্বাসীর মাধ্যমে সঙ্গে সঙ্গে সে খবর পৌঁছে গেল বার্লিনে অবস্থিত সুভাষের কাছে।

'হ্যালো সিনর বোস...আমি কাবুলের ইতালিয়ান এ্যাম্বাসী থেকে কথা বলছি।...কলকাতা থেকে লোক এসেছে। পরবর্তী নির্দেশ চাই।'

যথাসময়ে বার্লিন থেকে ইথার-তরঙ্গে ভেসে এল সেই তেজোদীপ্ত কণ্ঠস্বর: 'আমি সুভাষ বলছি।'

সিনর বোস! সিনর বোস! সাড়া পড়ে গেল ইতালিয়ান দূতাবাসের সর্বত্র। সিনর বোস কথা বলছেন! কথা বলছেন সুদূর বার্লিন থেকে!

'কলকাতা থেকে যিনি এসেছেন, তাঁর নাম কি? সত্য বক্সী জেলের বাইরে আছেন তো? সত্যবাবুর বন্ধুদের মধ্যে কেউ গ্রেপ্তার হয়েছেন কি? হয়ে থাকলে তাঁদের নাম কি?'

শান্তিবাবুর পায়ের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়, তাই তাঁর পক্ষে ইতালিয়ান এ্যাম্ব্যাসীতে গিয়ে জবাব দেওয়া সম্ভব হল না। জবাব দিলেন তাঁর লিখিত বক্তব্য অনুযায়ী রাষ্ট্রদূত অ্যালবার্ট কেরানী স্বয়ং।

'সত্য বক্সী এখনো ধরা পড়েননি। তাঁর বন্ধুরাও কেউ গ্রেপ্তার হননি। অস্ত্র-শস্ত্র...অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম...এবং কর্ম-নির্দেশ চাই। পার্বত্য এলাকায় কর্মী ও সর্দারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে...সবাই আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে।'

উত্তরে আবার ভেসে এল সুভাষের সেই পৌরুষদীপ্ত কণ্ঠ:

'অক্ষশক্তির সঙ্গে এখনো আমার কোন রাজনৈতিক বোঝাপড়া হয়নি। অবশ্য কোনরকম বোঝাপড়া না করেই তারা আমাকে সব রকম সাহায্য দিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমি তা মেনে নিতে রাজী নই। স্বাধীন ভারতের প্রতিনিধিরূপে আমাকে স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে কোনরকম সাহায্য নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই একটু অপেক্ষা করতে হবে। তবে বার্লিন রেডিও থেকে শীগ্‌গিরই হয়তো আমি দেশ-বাসীকে আমার বক্তব্য শোনাতে পারি।'

মহা গুরুত্বপূর্ণ সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের জবাবে শান্তিবাবুর নির্দেশমত রাষ্ট্রদূত অ্যালবার্ট কেরানী জানালেন:

'আমরা অপেক্ষা করব।...আফগান পার্বত্য অঞ্চলে বিদ্রোহের জমি খুব উর্বর হয়ে আছে। আপনার সফল অন্তর্ধানে প্রচুর আশা ও সম্ভাবনায়

উৎফুল্ল ভারতের জনসাধারণ বিপ্লবানুগ হয়ে উঠেছে।'

শান্তিবাবু একটু সুস্থ হয়ে উঠতেই ইতালিয়ান লীগেশনের তরফ থেকে একটা গোপন বৈঠক ডাকা হল কাবুল থেকে পঁচিশ মাইল দূরবর্তী 'পাঘমন'-এর একটি পার্বত্য স্বাস্থ্য-নিবাসে। রাষ্ট্রদূত অ্যালবার্ট কেরানী, মিসেস কেরানী, আনজোলোটি, শান্তিবাবু, ভগৎরাম প্রমুখ সবাই গিয়ে সেখানে হাজির হলেন একে একে। কেউ বাদ নেই।

পরিচয় করিয়ে দিলেন ভগৎরাম। ইনি শান্তিময় গাঙ্গুলী। বোসবাবুর নির্দেশমত ইনিই সম্প্রতি কাবুলে এসেছেন কলকাতা থেকে।

সবাই খুশি হলেন শান্তিবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে। স্বাস্থ্য ও বুদ্ধির দীপ্তিতে উচ্ছল প্রাণবন্ত যুবক। মনে হয়, ট্রেনিংয়ের কাজটা খুব অল্প দিনের মধ্যেই তিনি আয়ত্ত করে নিতে পারবেন।

আরো কয়েকবার বৈঠক ডাকা হল এমনি করে। কিন্তু কোথায় ট্রেনিং! কোথায় কি! সবাই চুপচাপ। সবার চোখে-মুখেই কেমন যেন একটা সন্ত্রস্ত ভাব।

বেশ বোঝা যায় যে, গুরুতর রকম কিছু একটা ঘটেছে। বাইরে কোন প্রকাশ না থাকলেও তার ভেতরের উত্তাপটা যেন সহজেই অনুমান কর যায়।

কেটে গেল দীর্ঘ একমাস, কিন্তু অবস্থার এতটুকুও পরিবর্তন দেখা গেল না। বরং যুদ্ধ-পরিস্থিতির চাপে কাবুলের ইতালিয়ান ও জার্মান এ্যাম্‌বাসী কেমন যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে লাগল ইয়োরোপ থেকে। সবাই নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। এমন কি সুভাষের দিক থেকেও নতুন আর কোন খবরা-খবর নেই। নেই কোন পথ-নির্দেশের ইঙ্গিত।

কোনদিক থেকে কোনরকম সাড়া-শব্দ না পেয়ে অবশেষে তিনজনেই আবার পাড়ি জমালেন হিন্দুস্থানের দিকে।

ঠিক হল, আপাতত একা উত্তমচাঁদই যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন ইতালিয়ান এ্যাম্‌ব্যাসীর সঙ্গে। তাঁর কাছ থেকে খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গেই সবাই আবার পা বাড়াবেন কাবুল-উপত্যকার দিকে। নইলে তিনটি ভিন্‌ দেশীয় তরুণের পক্ষে দিনের পর দিন কাবুলে অবস্থান করাটা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়।

যুদ্ধ-পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল। তদুপরি কাবুলে বসবাস করার মতো উপযুক্ত ছাড়পত্র বা ভিসাও তাঁদের নেই। এ অবস্থায় কখন যে কোন্‌দিক থেকে বিপদ আসবে, তা কে বলতে পারে!

কেটে গেল আরো কয়েক মাস।

ইতিমধ্যে দু-তিনবার লাহোর গিয়ে ভগৎরামের সঙ্গে দেখা করলেন শান্তিবাবু, কিন্তু ফল দাঁড়াল সেই একই। কোন খবর নেই। কাবুল থেকেও কোন খবর আসেনি।

সন্দেহের দোলায় দুলতে লাগলেন সত্য বক্সী প্রমুখ বি. ভি.-র কর্ম-কর্তাগণ।

কি ব্যাপার! মনে হয়, কোথায় যেন একটা জটিল অঙ্কের প্রশ্ন-উত্তর সব তালগোল পাকিয়ে গেছে। নইলে এমন তো হবার কথা নয়!

অবশেষে বিয়াল্লিশ সালের জানুয়ারি মাসে আবার শান্তিবাবুকে পাঠান হল খবর সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে।

নিশ্চয় কিছু একটা অঘটন ঘটেছে। নইলে এই বেমানান নিঃশব্দতার কারণ কি ? পাঞ্জাবের কীর্তি কিষাণ পার্টিই বা এমন নীরব কেন ?

রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত হল লাহোর গিয়ে। কীর্তি কিষাণ পার্টির নেতৃবৃন্দ এবার খোলাখুলিভাবেই ব্যক্ত করলেন তাঁদের মনের কথা।

জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করেছে, সুতরাং ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির মতে এ যুদ্ধ এখন জনযুদ্ধ। কীর্তি কিষাণ পার্টিও সেই নীতিতে বিশ্বাসী।

এ অবস্থায় ইংরেজের সঙ্গে আর বিরোধ নয়। বরং তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কি করে সেই ফ্যাসিবাদকে উৎখাত করা যায়, এখন থেকে তা-ই হবে তাদের প্রধান কাজ। কাজেই, সুভাষ বোস বা তাঁর কার্যাবলীর সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক রাখা এখন থেকে আর তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

একটা বিস্মিত আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেলেন শান্তিবাবু।

যে কীর্তি কিষাণ পার্টি প্রথম থেকেই সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের ব্যাপারে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল, আজ তাদের এ কি বিচিত্র মনোভাব !

মানলাম যে, জার্মানরা রাশিয়া আক্রমণ করেছে। তা বলে মাত্র গতকালও যে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ছিল আমাদের সবচাইতে ঘৃণ্য শত্রু, আজ রাতারাতি সে আমাদের মিত্র হয়ে গেল কোন্ যুক্তিতে ? ইংরেজের সঙ্গে হাত মেলানোর অর্থ কি সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করা নয় ?

—আপনার কি অভিমত ভাইসাহেব ? ভগৎরামকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন শান্তিবাবু।

—আমাকে মাপ করবেন ভাইসাহেব। একটা প্রচ্ছন্ন মর্মবেদনা ফুটে উঠল ভগৎরামের কণ্ঠে পার্টির নির্দেশ আমাকে মানতেই হবে। তবে ব্যক্তিগতভাবে এসব ব্যাপারের মধ্যে নিজেকে আমি জড়াতে অনিচ্ছুক। যারা আমার ভাইকে ফাঁসি দিয়েছে, তাদের সঙ্গে কিছুতেই আমি হাত মেলাতে পারব না। কোনমতেই না। আমি তাদের দুশমন। দুশমনই থাকব চিরদিন।

সঙ্গে সঙ্গে লাহোর ত্যাগ করে কলকাতার দিকে পাড়ি দিলেন শান্তিবাবু। আর দেরি নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কলকাতা ফিরে গিয়ে পার্টিকে খবরটা জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

তবু কিছুতেই কিছু হল না। কীর্তি কিষাণ পার্টির অসহযোগিতার জন্য হোক, বা যে কারণেই হোক, অনিবার্য দুর্যোগকে এবার আর কিছুতেই এড়ানো গেল না।

ফলে, এতদিন হাজার চেষ্টা করা সত্ত্বেও পুলিশ যে রহস্যের কিনারা করতে পারেনি, এবার আর তাদের কাছে কোন কিছুই অজানা রইল না।

স্পষ্ট তাদের চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠল বি. ভি.-র অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত তরুণদের সেই উন্নত, বেপরোয়া, আগুন-ঝরানো মুখগুলি।

সত্য বক্সী, যতীশ গুহ, কামাখ্যা রায়, সত্যব্রত মজুমদার, বিনয় সেনগুপ্ত, শান্তিময় গাঙ্গুলী, ধীরেন সাহারায়, সুবোধ চক্রবর্তী, রাতুল রায়চৌধুরী, জগদীশ সেন, জিতেন সরকার, নীরেন রায়, সুধীর বক্সী প্রমুখ কেউ-ই

সেই তালিকা থেকে বাদ গেলেন না। একটি প্রাণীও না।

বাদ গেলেন না কাবুলের উত্তমচাঁদ, ভগৎরাম, বি. ভি-র শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রবীণ নেতা চট্টগ্রামের মনিরুজ্জমান ইসলামা বাদি সাহেবের মতো পরিচিত নামগুলিও।

শুধু তাই নয়। উপজাতি এলাকায় প্রস্তুতির কথাও এবার তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল দিবালোকের মতো। ফলে, এতদিনের এত প্রচেষ্টা, এত পরিশ্রম, সব কিছুই গেল বিপর্যস্ত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আকস্মিক আক্রমণে।

প্রথমে আটক করা হল বি. ভি.-র দায়িত্বশীল নেতা সত্য বক্সী ও যতীশ গুহকে।

ওদিকে ধরা পড়লেন কাবুলের উত্তমচাঁদ। সংগে সংগেই তাঁকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হল কাবুল থেকে।

রেডিওর ব্যবসায়ও সেইখানেই শেষ। প্রায় লক্ষাধিক টাকার জিনিসপত্র জলের দামে বিক্রি করে দেওয়া হল নীলাম ডেকে। সর্বস্ব খুইয়ে শেষপর্যন্ত বন্দী-নিবাসে।

একদিন-দুদিন নয়, জীবনের অনেকগুলো বছরই তাঁকে কাটাতে হল নির্জন সেই লৌহ-কপাটের অন্তরালে।

একমাত্র ব্যতিক্রম ভগৎরাম। আশ্চর্য. কোথায় যে তিনি ডুব দিলেন, হাজার চেষ্টা করেও কেউ তাঁর কোন হদিস পেল না। যেন হাওয়ায় মিশে গেলেন মানুষটা !

সত্য বক্সী ও যতীশ গুহর কথা আগেই বলেছি। এবার এগিয়ে এল মিলিটারী বাহিনী। দাবী তাদের খুবই সামান্য। কি করে মানুষকে শায়েস্তা করে পেটের কথা বের করতে হয়, সে-সব কায়দাকানুন পুলিশের চাইতে আমরাই ভাল করে জানি। সুতরাং বন্দীদের আমাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক !

তথাস্তু ! সংগে সংগেই দুজনকে দিল্লীর লালকেল্লায় ঠেলে দেওয়া হল হিংস্র দানবের উদ্যত থাবার সামনে। তারপর যা হল তা সহজেই অনুমেয়।

অহঙ্কার ওদের মিথ্যে নয়। কায়দা-কানুন সত্যিই ওদের অসাধারণ। এমন নির্মম, অমানুষিক নির্যাতন একমাত্র ওদের পক্ষেই বুঝি সম্ভব। কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে তা কল্পনা করাও কঠিন।

চুপ করে রইলে কেন ? ভাল চাও তো এখনো বলো ! বলো সুভাষ বোসকে তোমরা কোথায় পাঠিয়েছ ? বলবে না ? সিপাই, চালাও !

নির্যাতনের যত রকম পন্থা আছে কিছুই আর বাদ গেল না।

ডাণ্ডা পেটাই, কম্বল ধোলাই. আঙুলে পিন ফোটানো মলদ্বারে রুল ঢোকানো সবই প্রয়োগ করা হল একে একে।

তাতেও রেহাই নেই। শুধু চালাও আর চালাও ! যত পার চালাও ! নতুন করে চালাও ! হাত ব্যথা হলে অন্যকে দাও। তবু থামলে চলবে না।

জ্ঞান হারিয়ে ফেললেও রেহাই নেই। কতক্ষণ আর থাকবে এভাবে ? একসময়ে না একসময়ে জ্ঞান ফিরে আসবেই। তারপর আবার চালাও।

জোরসে চাল্যও! আউর জোরসে!

দাঁত কামড়ে নিঃশব্দে পড়ে রইলেন সত্যবাবু। সুভাষ শুধু তাঁর বিপ্লবী সতীর্থই নন, সুভাষ তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু। সুভাষ তাঁর গর্ব। সুতরাং এমন একটি কথাও নয়, যার ফলে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সুভাষের এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা এতটুকু ব্যাহত হতে পারে। প্রাণ যায় যাক, তবু কোন কথা নয়। একটি কথাও নয়।

অসুস্থ সত্যবাবুর পক্ষে কি করে যে সেদিন এই অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করা সম্ভব হয়েছিল, তা ভাবতেও অবাক লাগে। তাও একদিন-দুদিন নয়, দিনের পর দিন। মাসের পর মাস।

সহ্য করতে পারলেন না যতীশবাবু। দিনের পর দিন সেই পৈশাচিক নির্যাতনের ফলে হঠাৎ একদিন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন গুরুতরভাবে।

সঙ্গে সঙ্গে টনক নড়ল পররাজ্যগ্রাসী শাসক-প্রভুদের। তাই তো! কাজটা একটু বাড়াবাড়িই হয়ে গেছে! এখন উপায়! ভাল-মন্দ কিছু হলে শেষে বদনাম কুড়োতে হবে যে! সুতরাং দাও খালাস।

দিলে কি হবে! কোথায় সেই অফুরন্ত প্রাণ-সম্পদে ভরপুর যতীশবাবু! মাত্র কিছুদিন বাদেই বি. ভি.-র এই সার্থক নায়ক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা সৃষ্টি করে।

বাকি রইলেন কামাখ্যা রায়, সত্যব্রত মজুমদার, ধীরেন সাহারায়, শান্তিময় গাঙ্গুলী, বিনয় সেনগুপ্ত প্রমুখ বি. ভি.-র একনিষ্ঠ সহকর্মীর দল।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা গা-ঢাকা দিলেন পরিস্থিতির গুরুত্ব লক্ষ্য করে। কণ্ঠে তাঁদের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সুর। আমরা এখনো মরিনি। স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এ পর্যন্ত অনেক মূল্যই দিতে হয়েছে বি. ভি.-কে। দিতে হয়েছে স্বাস্থ্য ও প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর অসংখ্য তাজা প্রাণ।

প্রয়োজন হলে আমরাও দেব। তবু স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এবারের এই মরণ-পণ সংগ্রামকে দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে কোন রকমেই আমরা ব্যর্থ হতে দেব না। বিপ্লবী নায়ক সুভাষচন্দ্র বসু জিন্দাবাদ! বৈপ্লবিক সংস্থা বি. ভি. জিন্দাবাদ! বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

কি এই বি. ভি.? বি. ভি.-র সংজ্ঞা কি?

কেন সুদূর বার্লিন থেকে বি. ভি.-র খবরের জন্য সুভাষের এই উৎকণ্ঠিত ব্যাকুলতা?

এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদের অনেকগুলো দিন পিছিয়ে যেতে হবে, মল্লিকা। ফিরে যেতে হবে কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত ইতিহাসের এক অতীত অধ্যায়ে।

[ভগৎরাম ও শান্তিময় গাঙ্গুলী প্রদত্ত রিপোর্ট অবলম্বনে লিখিত। ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়ের সৌজন্যে তাঁর 'সবার অলক্ষ্যে' গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগৃহীত।]

ফল্ ইন্ ভলান্টিয়ার্স! লেফ্‌ট্ রাইট্-লেফ্‌ট্ রাইট্-লেফ্‌ট্...

তালে তালে এগিয়ে চলেছে হাজার হাজার তরুণ যুবক। এগিয়ে চলেছে সুসজ্জিত নারী বাহিনী। এগিয়ে চলেছে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে সুভাষের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'।

১৯২৮ সাল। কলকাতা কংগ্রেস। সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। আর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক (G.O.C.) হলেন সুভাষ। তারই প্রস্তুতি চলছে আজ ক'দিন ধরে কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে।

সত্যিই ঐতিহাসিক অধিবেশন। কারণ শুধু কংগ্রেস নয়, বাংলার বিপ্লবীদের পক্ষেও ১৯২৮ সালের এই কংগ্রেস অধিবেশন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কংগ্রেস অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী। অহিংসাই তাদের মূলমন্ত্র। অহিংসাই তাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একমাত্র হাতিয়ার।

ঠিক তার বিপরীত হল অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বিপ্লবী তরুণদল। ওসব আবেদন-নিবেদন বা দর-কষাকষির ব্যাপারে তাদের এতটুকুও আস্থা নেই।

তাদের সাফ কথা—স্বাধীনতা চাই-ই! নিজেদের শক্তি দিয়েই আমরা তা অর্জন করব। তার জন্য এক ঘা দেবে তো পাল্টা দশ ঘা ফিরিয়ে দেব।

দুটি বিপরীত-ধর্মী স্রোতের মাঝে সেতুবন্ধন গড়ে তুলেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

এবার এগিয়ে এলেন সুভাষ। গুরুর আদর্শ অনুসরণ করে তিনিও এবার G.O.C.-রূপে সর্বাগ্রে হাত বাড়িয়ে দিলেন বাংলার এই বৈপ্লবিক সংস্থাগুলির দিকে। তোমরাও এসো ভাই। সব পথই স্বাধীনতার পথ। সুতরাং তোমরাও এই অধিবেশনে যোগ দাও। হাতে হাত মেলাও।

সবাই এসে হাত মেলাল সুভাষের সঙ্গে। অনুশীলন, যুগান্তর, পূর্ণ দাসের দল, হেমচন্দ্র ঘোষের মুক্তিসংঘ, মাস্টারদা সূর্য সেনের দল, উত্তর-বঙ্গের বিভিন্ন শাখা—কেউ বাদ গেল না। হ্যাঁ, আমরাও আছি তোমার সঙ্গে। সবার মিলিত প্রচেষ্টায় কলকাতার এই অধিবেশন স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন পথের সন্ধান দিক।

নিশ্চয়ই তুমি কিছুটা অবাক হয়েছ মল্লিকা। ভাবছ যে, কি করে এটা সম্ভব হল? নীতিগত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও কেন সেদিন বৈপ্লবিক সংস্থাগুলি কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাল?

কংগ্রেসই বা তাদের এভাবে মেনে নিতে গেল কেন? কি এর কারণ?

কারণ আর কিছুই নয়, আসলে এটা হল উভয় তরফেরই একটা কূটনৈতিক চাল।

গান্ধীজী একথা ভাল করেই জানতেন যে, বাঙালীর ইমোশন ব্যতীত কোন আন্দোলনই সফল হতে পারে না। আরো জানতেন যে, বাংলা তথা ভারতের বিপ্লবীদের তাঁর কর্মপথে না পেলে শ্রেষ্ঠ যুবশক্তির অবদান থেকে

তিনি বঞ্চিত থাকবেন। তাছাড়া বাংলার বিপ্লবীদের বাতিল করে কিছুতেই তিনি বাংলার মন জয় করতে সক্ষম হবেন না। সুতরাং যে করে হোক, বাংলার এই বেপরোয়া যুবশক্তিকে তাঁর চাই-ই।

অপরপক্ষে বিপ্লবীদের লক্ষ্য ছিল, এই সুযোগে কংগ্রেসে ঢুকে পড়ে নিজেদের ভাবধারার প্রতি তরুণসমাজকে আরো ব্যাপকভাবে আস্থাবান করে তোলা।

কংগ্রেস সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান। তদুপরি অহিংস নীতিতে আস্থাবান। এ অবস্থায় কংগ্রেসের প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে ভারতের লক্ষ লক্ষ জনগণকে বিপ্লবের উপযোগী করে গড়ে তোলা যত সহজ, কোন গুপ্ত সংস্থার পক্ষে তা সম্ভব নয়। সুতরাং ঢুকে যাও সবাই কংগ্রেসে। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে যাও আপন লক্ষ্যের দিকে।

বলা বাহুল্য যে, বিপ্লবীদের এই কূটনৈতিক চাল ব্যর্থ হয়নি। ফলে সেবারের সেই অধিবেশনে তাঁদেরই সবচাইতে পুরোভাগে দেখা গেল যাঁরা কংগ্রেসের অহিংস নীতিতে কোনদিনই আস্থাবান নন। এককথায়, বাংলার কংগ্রেস তখন তাঁদেরই হাতের মুঠিতে।

বলা বাহুল্য যে, কংগ্রেসের তাতে লাভ বই লোকসান হয়নি। সংগঠনের কাজে বিপ্লবীদের এই অকুণ্ঠ সহযোগিতার ফলে কংগ্রেস যে তখন সব দিক থেকেই অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, ইতিহাসই তার সবচাইতে বড় সাক্ষী।

এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা শ্রদ্ধেয় প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ীর 'পাক-ভারতের রূপরেখা' নিবন্ধ থেকে কয়েকটি লাইন এখানে তুলে দিচ্ছি:

'বিপ্লবী যুগের কর্মীরাই বাংলাদেশে অন্ততঃ কংগ্রেসকে শক্তিশালী করে গড়ার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করেন। চট্টগ্রামে শ্রীসূর্য সেন শ্রীঅম্বিকা চক্রবর্তী প্রমুখরা, মৈমনসিংহে শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও তাঁর দলবল এবং শ্রীজ্ঞান মজুমদার ও তাঁদের দল, ঢাকার শ্রীমদনমোহন ভৌমিক ও তাঁদের দলের বহু কর্মী, কলকাতায় শ্রীবিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, শ্রীঅরুণ গুহ, শ্রীভূপেন দত্ত এবং আরও অনেকে, বরিশালের শ্রীসতীন সেন, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত ও তাঁদের দলের আরও অনেকে এবং রাজসাহীতে শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী ও তাঁর অতীতের সহকর্মী বিপ্লবীদলের বন্ধুরাই সংগ্রামী কংগ্রেসে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশের জেলায় জেলায় খোঁজ করলে এই একই ইতিহাস পাওয়া যাবে।'

যাক, আগের কথায় ফিরে যাই।

ডাক শুনে সেদিন সবাই এসে জড়ো হল সুভাষের পাশে।

এবার শুরু হল সংগঠনের কাজ। একটি সুদক্ষ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী চাই। কারো হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তোলা, কারো গায়ে হাফ-শার্ট বা পাঞ্জাবি, আবার কারো অঙ্গে শুধু একখানি ময়লা খদ্দরের চাদর, এসব পুরনো নিয়ম আর চলবে না। স্বেচ্ছাসেবকদের সামরিক শিক্ষা থাকা চাই। উপযুক্ত ইউনিফর্ম চাই। চাই যথাযোগ্য শৃঙ্খলা-বোধ। এটা না হলেই চলবে না। যে করে হোক, এটা চাই-ই!

কঠিন সমস্যা। সামরিক রীতিনীতি সম্বন্ধে যাদের সামান্যতম ধারণা

পর্যন্ত নেই, এই অল্প সময়ের মধ্যে তাদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা সহজ কথা নয়।

বাংলাদেশে কে এমন শক্তিধর পুরুষ আছেন, যাঁর পক্ষে এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে কার্যকরী করে তোলা সম্ভব?

আমি আছি। বীরদর্পে এগিয়ে এলেন ভলাণ্টিয়ার্স মুভমেণ্টের মুকুটহীন সেনাপতি বিপ্লবী নায়ক মেজর সত্য গুপ্ত। ফল ইন্ ভলাণ্টিয়ার্স! লেফ্‌ট্‌-রাইট্‌, লেফ্‌ট্‌-রাইট্‌, লেফ্‌ট্‌...

সত্যিই অসাধ্য সাধন করলেন দক্ষিণ কলকাতা শাখার এই দুর্ধর্ষ নায়ক মেজর সত্য গুপ্ত।

শুধু মুখে নয়, চলনে-বলনে, ভাবনা-চিন্তায় যাকে বলে একেবারে খাঁটি মেজর। কি নবীন, কি প্রবীণ, কারোরই রেহাই নেই তাঁর হাত থেকে। সকাল থেকে সন্ধ্যে, একটানা শোনা যেতে লাগল তাঁর সেই বজ্রহুঙ্কার. লেফ্‌ট্‌-রাইট্‌, লেফ্‌ট্‌-রাইট্‌, লেফ্‌ট্‌...

মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। কর্ণেল লতিকা বসুর নেতৃত্বে সবাই এসে জড়ো হলেন একে একে। সেখানেও ক্ষণে ক্ষণে সেই বজ্রহুঙ্কার। শুধু লেফ্‌ট্‌-রাইট্‌, লেফ্‌ট্‌...

মল্লিকা. আজ দিন-কাল পাল্টেছে। বদলেছে কর্মব্যস্ত জীবনের ধারা ও রূপ। কিন্তু সেদিন!

মেয়েদের পক্ষে প্রচলিত বিধি-নিষেধের বাইরে পা বাড়ানো সেদিন কিন্তু খুব একটা সহজ ছিল না। তবু কেউ সেদিন পারেননি সুভাষের সেই উদাত্ত আহবানকে উপেক্ষা করে দূরে সরে থাকতে। কেউ রেহাই পাননি কষ্টসাধ্য সামরিক কুচকাওয়াজ আর ক্ষণে ক্ষণে মেজর গুপ্তের সেই বজ্র-হুঙ্কারের হাত থেকে।

কিন্তু শুধু পদাতিক বাহিনী হলেই চলবে না। সংগে অশ্বারোহী বাহিনীও চাই। কোথায় পাওয়া যাবে এত অশ্ব! বাধ্য হয়েই সুভাষ তখন জনসাধারণের কাছে এক আবেদন জানালেন সংবাদপত্রের মাধ্যমে ঃ

'কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জন্য যাঁহারা অশ্বারোহী স্বেচ্ছাসেবক হইতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, ১৪ই তারিখের পরে আর কাহাকেও স্বেচ্ছাসেবক দলে ভর্তি করা হইবে না।

বহু-সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক অশ্বারোহী দলে ভর্তি হইয়াছেন এবং অশ্বারোহণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহাদের অনেকেরই অশ্ব নাই। যাঁহাদের অশ্ব আছে, তাঁহাদিগকে আমাদের অশ্বারোহী দলের জন্য ৫০টি অশ্ব ধার দিতে আমি নিবেদন জনাইতেছি।

১১ই তারিখ হইতে অশ্বারোহী দলের রীতিমত শিক্ষাদান চলিতে থাকিবে। প্রেসিডেণ্টের পৌঁছিবার দিবস যে শোভাযাত্রা বাহির হইবে, তাঁহারা সেই শোভাযাত্রায় যোগদান করিবেন। ইহা ছাড়া ২০শে তারিখ হইতে পাহারা এবং যানবাহন, লোকজনের চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত করিবার কার্যেও তাঁহারা নিযুক্ত থাকিবেন।

অশ্বগুলি প্রত্যহ পার্ক সার্কাসে প্রেরিত হইতে পারে। দৈনন্দিন কার্যের পর সেগুলি আস্তাবলে পাঠান যাইতে পারে, অথবা তিন সপ্তাহের জন্য কংগ্রেস ময়দানস্থ আস্তাবলে সেগুলি রক্ষিত হইতে পারে। অশ্বগুলির বিশেষ যত্ন লওয়া হইবে। আমি আশা করি, যাঁহাদের অশ্ব আছে. তাঁহারা আমাদের এই কার্যে সাহায্য করিবেন।'

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু
জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং

[আনন্দবাজার, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯২৮]

সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত সুভাষের এই ঐতিহাসিক বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স বাহিনী যে সেদিন সারা দেশের মধ্যে কি প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছিল, সংবাদপত্র থেকেই তার কিছু কিছু বিবরণ আমি এখানে তুলে দিচ্ছি, মল্লিকা ঃ

কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ঃ শহরের ভিতর দিয়া রুট মার্চ ঃ অভূতপূর্ব দৃশ্য

'সুশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী এ বৎসরের কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির একটি প্রধান কৃতিত্বের বিষয় হইবে।

কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর আহবানে প্রায় দুই হাজার যুবক এ পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবক দলভুক্ত হইয়াছে। সেনা বিভাগের ভূতপূর্ব সেনানীদের অধীনে বিভিন্ন পার্কে সকালে এবং বিকালে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে।

গতকল্য বুধবার অপরাহ্নকালে এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর দুই দল—একদল শ্রদ্ধানন্দ পার্ক হইতে এবং অপরটি হাজরা পার্ক হইতে বাহির হইয়া বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে শহরের রাজপথ দিয়া কুচকাওয়াজ করে। উভয় দল কলেজ স্কোয়ারে মিলিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মার্চ করিতে করিতে বিডন স্কোয়ারে গমন করে। বিডন স্কোয়ার ঘুরিয়া তাহারা শ্রদ্ধা-নন্দ পার্কে প্রত্যাবর্তন করে।

রাজপথসমূহের উভয়পার্শ্বে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়া অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করে।'

[আনন্দবাজার, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯২৮]

পার্ক সার্কাস ময়দানের নাম হয়েছে তখন দেশবন্ধুনগর। চেনাই যায় না তখন এতকালের দেখা সেই পার্ক সার্কাস ময়দানকে। সংবাদপত্রের ভাষায় ঃ

দেশবন্ধুনগরের সজ্জা ঃ শিবিরসমূহের সামরিক দৃশ্য

'আলাদীনের ঐন্দ্রজালিক প্রদীপের শক্তিতেই যেন চক্ষের নিমেষের মধ্যে দেশবন্ধুনগরের মতো একটি সুন্দর স্থান অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়াছে। বাস্তবিকই দেশবন্ধুনগরের বিরাট ও মনোমুগ্ধকর ব্যবস্থা দেখিয়া এই কথাই মনে হয় যে, নগর পরিকল্পনাকারিগণ এত অল্প সময়ের মধ্যে ঐরূপ একটি

সুন্দর স্থানের সৃষ্টি কি প্রকারে সম্ভব করিয়াছেন?

নগরের নির্মাণ প্রায় শেষ হইয়া আসিল এবং প্রত্যেক ঘণ্টায়ই দৃশ্যের পরিবর্তন দেখা যাইতেছে। কংগ্রেস মণ্ডপ নির্মাণ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির চার হাজার সদস্য ও বিশিষ্ট দর্শকবৃন্দের জন্য বিরাট মঞ্চ নির্মাণ শেষ হইয়া গিয়াছে এবং এক্ষণে খদ্দর দিয়া আচ্ছাদনের কার্য আরম্ভ হইয়াছে। ভারতীয় শিল্পকলা অনুসারে নগরসজ্জার কার্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

নগরীটি এক্ষণে সামরিক শিবিরের আকার ধারণ করিয়াছে এবং উহার প্রতি প্রবেশদ্বারে স্বেচ্ছাসেবকগণ রীতিমত কড়া সামরিক কায়দায় পাহারা দিতেছে।

প্রত্যেক আগন্তুক, তিনি যতই খ্যাতনামা হউন না কেন প্রবেশদ্বারে পরিচয়-পত্র না দিয়া এবং অনুমতি না লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন না— এমন কি, অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান মিঃ জে. এম. সেনগুপ্ত এবং জেনারেল সেক্রেটারী ডাঃ বি. সি. রায়কে পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ করা হইয়াছিল এবং প্রবেশ করিতে দিতে অস্বীকার করা হইয়াছিল।

স্বেচ্ছাসেবকদিগের নিয়মানুবর্তিতা প্রশংসনীয়। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সর্বদা উপস্থিত থাকিয়া তাহাদিগকে জাতির সেবায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছেন, এইজন্য শ্রীযুক্ত বসু ধন্যবাদার্হ।

সায়াহ্নের সঙ্গে সঙ্গে কুচকাওয়াজের মাঠে ঢাক এবং বিউগিল বাজিয়া উঠে, ইহাতে আসন্ন যুদ্ধের একটা উৎসাহজনক ভাব লোকের মনে জাগিয়া উঠে।' [আনন্দবাজার, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯২৮]

উপরোক্ত বিবরণ ১৮ই ডিসেম্বর তারিখের। এবার শোন তার পরের দিনের কথা ঃ

'...প্রত্যহ হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক মার্চ করিতেছে, এবং অশ্বারোহী দলকে শিক্ষিত করা হইতেছে। মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাগণ জয়ঢাক ও বিউগিল বাজাইয়া প্যারেড করিতেছে। দেশবন্ধুনগরের দিকে অবিরাম জনস্রোত বহিতেছে। সেখানে রীতিমত উৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।'

মফঃস্বল হইতে পাঁচ শত স্বেচ্ছাসেবক

'গতকল্য কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চল এবং মফঃস্বল হইতে প্রায় পাঁচ শত স্বেচ্ছাসেবক তাহাদের পোশাক এবং কাপড়-চোপড়সহ দেশবন্ধুনগরে পৌঁছে। তাহাদের সামরিক কেতায় চলাফেরা এবং নিয়মানুবর্তিতা হইতেই পরিচয় পাওয়া যায় যে তাহারা সুন্দররূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে।'

বালিকা স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী

'গতকল্য সন্ধ্যাবেলা প্রায় একশত বালিকা কংগ্রেস ময়দানে ড্রিল করে। এই বালিকারা যখন তাহাদের নেত্রীর অধীনে মার্চ করিতেছিল তখন তাহাদিগকে দেখিয়া বৈদিক যুগের শক্তিকাদের কথাই স্মৃতিতে উদয়

হইতেছিল। ভারতের পুত্রগণই শুধু নহে, কন্যাগণও স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করিবেন, সেদিন অধিক দূরে নহে।'

[আনন্দবাজার, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৮]

এবার সভাপতি বরণ। হাওড়া স্টেশন থেকে ময়দান পর্যন্ত সে কি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা! সবার পুরোভাগে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স। ক্ষণে ক্ষণে সব কিছু ছাপিয়ে শোনা যায় সেই বজ্রহুঙ্কার—লেফ্‌ট-রাইট্‌, লেফ্‌ট-রাইট্‌, লেফ্‌ট্‌...

দেখে বিস্ময়ে মূক হয়ে গেল গোটা মহানগরী। একি অভূতপূর্ব দৃশ্য! পদাতিক বাহিনী, নারী বাহিনী, অশ্বারোহী বাহিনী, মোটর সাইকেল বাহিনী, মেডিকেল কোর বাহিনী—সর্বোপরি জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং-রূপে সুভাষের ঐ তেজোদীপ্ত মূর্তি—এ যে বার বার দেখেও আশা মেটে না!

তাছাড়া কি বিরাট আয়োজন! কি ব্যাপক প্রস্তুতি! কি অদ্ভুত নিয়ম-শৃঙ্খলা!

কেউ মেজর, কেউ কর্ণেল, কেউ বা স্টাফ অফিসার—ঠিক যেন একটি সুশিক্ষিত সামরিক বাহিনী কুচকাওয়াজ করে চলেছে মহানগরীর বুক বেয়ে বেয়ে।

কোথায় ছিল এতদিন বাঙালী তরুণ-তরুণীদের প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা এই বাস্তব রূপ?

কিসের প্রেরণায় ওরা আজ নিজেদের হারানো সত্তাকে ফিরে পেল এমনি করে? কোন্ সোনার কাঠির স্পর্শে?

সেদিনের সেই ঐতিহাসিক শোভাযাত্রা সম্বন্ধে সংবাদপত্রের বিবরণ থেকে কছুটা অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ

কংগ্রেসের নির্বাচিত প্রেসিডেণ্টকে কলিকাতায়
অভূতপূর্ব সংবর্ধনা

'৩৪ অশ্ব-বাহিত যানে পণ্ডিত মতিলাল ঃ সামরিক কেতায় স্বেচ্ছাসেবক দলের মিছিল ঃ শহরের রাজপথে নরনারীর অপূর্ব উৎসাহ প্রবাহ ঃ পুরনারীগণের শঙ্খধ্বনি ও পুষ্পবর্ষণ ঃ

রাষ্ট্রনেতাকে অভ্যর্থনায় শহরের উৎসব-সজ্জা

৪৩-তম ভারতীয় জাতীয় মহাসভার নির্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে গতকল্য সকালে কলিকাতাবাসিগণ রাজসমারোহে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। জাতির শ্রদ্ধাভাজন নেতা জাতির হৃদয় কতটা অধিকার করিয়াছেন, তাহা গতকল্যকার মহানগরীর উৎসব অনুষ্ঠান হইতে অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এরূপ উৎসব, লোকসমূহের এরূপ শৃঙ্খলা সত্যই অপূর্ব।

বাস্তবিক কংগ্রেসের ইতিহাসে সভাপতিকে এরূপ বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করিবার দৃশ্য আর দেখা যায় নাই। এ যেন দেশের বীর সেনানী দিগ্বিজয়

শেষে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন—দেশবাসীরা তাঁহাকে বরিয়া লইল, পুরবাসীরা তাঁহাকে অর্ঘ্য দিল এবং নাগরিকেরা তাঁহাকে আনন্দ ও উত্তেজনার মধ্যে সংবর্ধিত করিল।

সহস্র সহস্র নরনারীর আনন্দদীপ্ত ললাটে প্রভাতের সূর্যকিরণ পড়িয়া যেন মহা ভবিষ্যতের এক হাস্যোজ্জ্বল চিত্রলেখার সৃষ্টি করিয়াছিল। অশ্বারোহী স্বেচ্ছাসেবকদিগের অগ্রগতির পদধ্বনি. পদাতিকদিগের সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ও বীরোচিত পদক্ষেপ, মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাদের প্রভাতী সূর্যকরদীপ্ত গতি-ভঙ্গিমা, পণ্ডিত মতিলালের সুসজ্জিত অশ্বরথ, রণবাদ্যের ধ্বনি এবং সহস্র সহস্র শোভাযাত্রীর প্রবল উৎসাহ যুগপৎ নাগরিকদের মনে আনন্দ, উত্তেজনা এবং স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা দিয়াছিল।

প্রায় ৮টার সময় পণ্ডিত মতিলালের হাওড়া স্টেশনে পৌঁছিবার কথা ছিল। কিন্তু রাজপথের দীপাবলী ভাল করিয়া নির্বাপিত হইবার পূর্বেই সহস্র সহস্র লোক হাওড়া স্টেশনের দিকে ছুটিতে থাকে। তাহারা জানিত যে, স্টেশনের মধ্যে তাহাদের প্রবেশাধিকার নাই, তথাপি তাহাদের শ্রদ্ধাভাজন নেতাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য তাহারা দলে দলে স্টেশনের সম্মুখে সমবেত হইয়াছিল।

নিদারুণ পৌষের ঠাণ্ডা, অতি প্রত্যূষে যানবাহনে দূর হইতে আসিবার কষ্ট কিন্তু তাহারা ভ্রূক্ষেপ করে নাই। বয়স্কা ও বৃদ্ধা মহিলা পর্যন্ত এই অভিনন্দন উৎসবে অপরিসীম অসুবিধা সহ্য করিয়া যোগদান করিয়াছিলেন।

মাঝে মাঝে নগরের সুসজ্জিত তোরণদ্বারে এইরূপ লেখা ছিলঃ 'হে যুবক, দেশের বেদনা কি তুমি সত্য সত্যই উপলব্ধি কর ? এই বেদনায় কি তোমার ক্ষুধা নষ্ট হইয়া গিয়াছে ? তোমার নিদ্রা দূর হইয়াছে ? তোমার স্বপ্ন দুর্ভাবনায় পূর্ণ হইয়াছে ?

'স্বাধীনতা চাই, স্বাধীনতা মানবের জন্মগত অধিকার।'

এই প্রকারের শোভাযাত্রা এবং কলিকাতাবাসীদের অভিনন্দন সর্ব বিষয়ে একটি জাতীয় ভাবের সমাবেশ হইয়াছিল। সর্বোপরি শোভাযাত্রার সামরিক আবহাওয়ার মধ্য দিয়া যে স্বদেশপ্রেম, সৌন্দর্যজ্ঞান ও শৃঙ্খলা-শক্তি আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎকে আশায় ও আনন্দে ভরিয়া তুলিয়াছে।

সভাপতির উপস্থিতি

যথাসময়ে স্পেশাল গাড়িখানি তুমুল বন্দেমাতরম্ ধ্বনির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। স্টেশনে অভ্যর্থনা সমিতি যদিও ব্যবস্থার ত্রুটি করেন নাই, তথাপি স্পেশাল আসিয়া পৌঁছানো মাত্র জনতা প্রেসিডেণ্টকে দর্শন করিবার জন্য বিষম ভিড় করিয়া যখন অগ্রসর হইল, তখন তাহাদিগকে সংযত রাখা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল—সভাপতির গাড়ি আসিয়া পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে বহু তোপধ্বনি করা হয় এবং স্টেশন সমুপস্থিত মহিলাবৃন্দ শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠেন।...

মিছিলের গঠন

সভাপতির এই মিছিল বাস্তবিকই অভূতপূর্ব হইয়াছিল। দুই হাজার সুশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক, পাঁচ শত মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা, অশ্বারোহী দল, পদাতিক দল লইয়া এই মিছিল গঠিত হইয়াছিল। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সামরিক পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া—প্রেসিডেণ্টের গাড়ি ঐস্থানে পৌঁছিবামাত্র তাঁহাকে সামরিক কায়দায় অভিবাদন করেন।

অতঃপর মিছিল চলিতে আরম্ভ করে। প্রথমে খাকি পোশাক পরিহিত মোটর সাইকেলারোহী স্বেচ্ছাসেবক দল যায়। তাহাদের পিছনে ছিল সাইকেলারোহী দল, তৎপরে পতাকাবাহী পদ-প্রদর্শক সওয়ারগণ ও বিউ-গেলারগণ যাইতে থাকে।

ইহাদের পশ্চাতে একখানা মোটরগাড়িতে জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং-এর পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহার হাতে একখানা চামড়া বাঁধান ছড়ি ছিল। তিনি সতর্ক দৃষ্টি সহকারে মিছিলের গতির উপর লক্ষ্য রাখিতেছিলেন।

তাঁহার পশ্চাতে পতাকাবাহী স্বেচ্ছাসেবকগণ, তৎপশ্চাতে ড্রামারগণ, ড্রামারের পিছনে ব্যাণ্ড, ব্যাণ্ডের পিছনে পদাতিক দল, তৎপর অশ্বারোহী দল চলে।

অশ্বারোহী দলের পশ্চাতে প্রেসিডেণ্টের যান আসিতে থাকে। প্রেসিডেণ্টের অশ্ব-চালিত যানের পিছনে একখানা মোটরগাড়িতে মিসেস নেহরু এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পত্নী ছিলেন।

ইহার পর আবার অশ্বারোহী দল, পদাতিক দল সুনিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপে চলিতেছিল। তাহাদের পশ্চাতে ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ, তৎপর পতাকাবাহিগণ এবং সর্বশেষে সাধারণের মোটরগাড়ি সকল চলিতে থাকে। একজন সাইকেলারোহী স্বেচ্ছাসেবক শোভাযাত্রার সর্বাগ্রে গমন করিয়াছিল।...

শোভাযাত্রা যাত্রা করিবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রকার যানবাহনাদির চলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে তখন হাওড়া সেতুর দিকে অগ্রসর হয়। সেতুর দুই ধার দিয়া অসংখ্য লোক শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে দণ্ডায়মান হয়। বহু শ্বেতাঙ্গ ভদ্রমহোদয় ও মহিলা তাঁহাদের বাঙ্গলার ছাদে দাঁড়াইয়া এই অপূর্ব দৃশ্য দর্শন করিতেছিলেন।

হ্যারিসন রোড ও স্ট্র্যাণ্ড রোডের মোড়ে এক বিরাট জনতা সংক্ষুব্ধ মহাসাগরের ন্যায় উৎসুক নেত্রে প্রতীক্ষা করিতেছিল। আশেপাশে বাড়ির ছাদে, বারান্দায়, গাছে, স্তম্ভে, প্রাচীরে, যেদিকে তাকাও—অসংখ্য নরমুণ্ড ব্যতীত আর কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না।

এক স্থানে এক সুদৃশ্য বিজয়তোরণ নির্মিত হইয়াছিল। তোরণ স্তম্ভগায়ে বিভিন্ন প্রসিদ্ধ নেতৃবৃন্দের জ্বালাময়ী বাণীসমূহ শোভা পাইতেছিল—হ্যারিসন রোডের উভয় পার্শ্বস্থ দোকান, বাড়ি ও অট্টালিকা-

সমূহ পত্র পুষ্প মাল্য পতাকায় ও পূর্ণ কদলী বৃক্ষে শোভিত হইয়া অপূর্ব উৎসব বেশ ধারণ করিয়াছিল।

উভয় পার্শ্বের গৃহছাদ ও বারান্দাসমূহে সমবেত নরনারী, বালক-বালিকার বিপুল জনতা শোভাযাত্রীদের উপর অবিরত গোলাপ জল ও পুষ্প-বর্ষণ করিতে থাকে এবং মুহুর্মুহুঃ বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে গগন পবন মুখরিত করিতে থাকে।'......

এবার দেশবন্ধুনগর। প্রথমে ভাষণ দিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। উত্তর দিলেন নির্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। তিনি বললেন ঃ

'অদ্যকার যে অপূর্ব শোভাযাত্রার কথা আপনারা শ্রীযুত সেনগুপ্তের মুখে শ্রবণ করিলেন, তাহাতে বঙ্গে উগ্র জাতীয়তাবাদের বিশেষত্ব এবং বঙ্গের নরনারীর দেশপ্রেম অভিব্যক্ত হইয়াছে।

আমাদের পরলোকগত নেতা দেশবন্ধু দাশের এই শহরে বাসভূমি ছিল। হাওড়ার সেতু হইতে এই চন্দ্রাতপ পর্যন্ত আমি সর্বত্র তাঁহার প্রগাঢ় সেই স্বদেশপ্রেমেরই পরিচয় অদ্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

স্বেচ্ছাসেবক দলের অপূর্ব বিধিব্যবস্থা, অশ্বারোহী ও পদাতিক দলের শৃঙ্খলা ও গঠনের নৈপুণ্য, সর্বোপরি সর্বত্র অধিবাসীদের স্বদেশপ্রেমের যে উদ্বেল লহরীনর্তন লক্ষ্য করিয়াছি. তাহাতে স্বারাজের স্বপ্নই আমার মনে উদিত হইয়াছে।

আমি দেখিলাম, এখানকার প্রত্যেকেই এই অনুষ্ঠানটি সফল করিবার জন্য সাহায্য করিতেছেন। আজ মনে হইতেছে আমরা সত্যই বুঝি স্বাধীন, ভারতভূমি সত্যই বুঝি সুখ ও সম্পদশালিনী হইয়াছেন। আপনারা আজ প্রমাণ করিয়াছেন যে, আপনারা সত্যই দেশবন্ধু দাশের সম্পদের যোগ্য উত্তরাধিকারী—সেই উত্তরাধিকার বলে স্বরাজ নিশ্চয়ই আপনাদের করতলগত হইবে।'

[আনন্দবাজার, ২২শে ডিসেম্বর, ১৯২৮]

সর্বত্র জয়ধ্বনি উঠল সুভাষের নামে। পত্র-পত্রিকাগুলিও বাদ গেল না। ফরোয়ার্ড লিখল ঃ 'তিনি তুরী ভেরীর সঙ্গে জাতির তামসিকতা দূর করেছেন।'

আনন্দবাজারের অভিমত ঃ 'শোভাযাত্রার সামরিক আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে যে স্বদেশপ্রেম সৌন্দর্য-জ্ঞান ও শৃঙ্খলাশক্তি আত্মপ্রকাশ করেছে, তা দেখে বাঙালী জাতির আশাপ্রদ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশ্বাসী হয়ে উঠল, স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি মতিলাল অনুভব করলেন—'ভারত যেন সত্যই স্বাধীন'।'

বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দও প্রশংসায় পঞ্চমুখ। হ্যাঁ, এই তো চাই। এই তো হওয়া উচিত। এমনি নিয়ম-শৃঙ্খলাই তো আজ সবচাইতে বেশি প্রয়োজন। সুভাষ দেখালে বটে!

শুধু খুশি হতে পারলেন না একজন। তিনি হলেন অহিংস মন্ত্রের উপাসক স্বয়ং গান্ধীজী। কেন জানি বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স ও সর্বাধিনায়কের

বেশে সুভাষের ঐ তেজোদীপ্ত চেহারাটাকে এতটুকুও প্রসন্নদৃষ্টিতে দেখতে পারলেন না তিনি। তাই প্রকাশ্য ভাষণে খোলাখুলিভাবেই তিনি রসিকতা করে বললেন—'এ হল পার্ক সার্কাসের সার্কাস।'

আর যায় কোথায়! কথায় বলে—'বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শত গুণ।'

এখানেও তাই হল। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাগুলো পোঁ ধরল—সার্কাস! সার্কাস! পার্ক সার্কাসের সার্কাস! ফিলিপ্স্ সার্কাস্!

কেউ কেউ আবার আরো এক কাঠি ওপরে গেল। সুভাষের জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিং (G. O. C.) পদবীকে তারা ব্যঙ্গ করে লিখল—'গক্ সুভাষ'। কেউ বা উৎসাহের আতিশয্যে লিখল—'খোকা ভগবান'।

বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ অবাক। কেন সুভাষের প্রতি অহিংস মন্ত্রের ঋষি গান্ধীজীর এই অহেতুক উষ্মা?

তবে কি স্বেচ্ছাসৈনিক জীবনে কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলাবোধের কোন প্রয়োজন নেই? বিশৃঙ্খলাই কি হবে তাদের একমাত্র মূলধন?

সুভাষ নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। বুঝি সেই মুহূর্তেই তাঁর মনের অতলে জন্ম নিল বিচিত্র এক অনুভূতি। এক নতুন চেতনা। চোখের তারায় ঘনিয়ে এল অনাগত ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবি।

লেফ্ট্-রাইট্-লেফ্ট্-রাইট্, লেফ্ট্!

তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে জাতীয় বাহিনীর লক্ষ লক্ষ মরণজয়ী সৈনিক। চলেছে নারী বাহিনী। তাদের সবার কণ্ঠে একই সুর! একই সংগীত। জয় হিন্দ্! দিল্লী চল! দিল্লী চল! দিল্লী চল!

কবে আসবে সেই শুভলগ্ন! কবে!

খুব একটা দেরি হয়েছিল কি, মল্লিকা!

১৯২৮ থেকে ১৯৪১। মাঝে ক'বছরই বা! সেদিন এই 'খোকা ভগবানটি'র রণহুঙ্কারে সারা পৃথিবী যখন থরথর করে কেঁপে উঠেছিল তখন সেই তথাকথিত সমালোচকদের মুখের রেখাগুলি যে বিস্ময়ে ও আতঙ্কে কতখানি ঝুলে পড়েছিল, তা আমার ঠিক জানা নেই।

বস্তুত পার্ক সার্কাস ময়দানে নিজের হাতে গড়া এই বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সই হল সুভাষের চিরকালের দেখা স্বপ্নের প্রাথমিক পর্যায়—যা পরবর্তী কালে বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর মধ্য দিয়ে। প্রবীণ বিপ্লবী নেতা শ্রদ্ধেয় ভুপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়ের ভাষায়ঃ

'কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশন বিপ্লবী ভারতের ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কংগ্রেসের এই সেচ্ছাসেবক বাহিনীই হল ১৯২৯ সাল থেকে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের পূর্বকাল পর্যন্ত বিপ্লবকাণ্ডের মূলাধার। সুভাষচন্দ্রের পার্ক সার্কাস ময়দানের কর্ণেল লতিকা বসু পরিচালিত নারী বাহিনীই আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কর্ণেল লক্ষ্মী পরিচালিত 'ঝাঁসি রাণী বাহিনীর অঙ্কুর। সুভাষচন্দ্রের কলিকাতা কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীরূপ বীজেরই রূপান্তর নেতাজীর দুর্জয় 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ'-রূপ মহা-মহীরুহ।'

ঐতিহাসিক কলকাতা কংগ্রেস। সত্যিই ঐতিহাসিক। কারণ, এই কলকাতা অধিবেশনেই নীতিগত দিক থেকে গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষের যে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল, তার ফল হয়েছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। সেকথা পরে আসছে।

অধিবেশন শেষ হল। তা বলে ভলাণ্টিয়ার্স বাহিনী কিন্তু সুভাষ ভেঙে দিলেন না। গান্ধীজীর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সত্ত্বেও না। বরং এতদিন যা ছিল শুধু কলকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এবার তিনি তা ছড়িয়ে দিলেন বাংলাদেশের এখানে-ওখানে সর্বত্র।

ফলে, শহরের সীমানা ছাড়িয়ে এবার সুদূর পল্লীগ্রাম পর্যন্ত দেখা যেতে লাগল সেই একই দৃশ্য। সেই লেফ্‌ট্‌-রাইট্‌, লেফ্‌ট্‌-রাইট্‌, লেফ্‌ট্‌!

সেখানেও সবার পুরোভাগে সেই মেজর সত্য গুপ্ত। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তিনি ছুটে বেড়াতে লাগলেন অশান্ত ঘূর্ণীর মতো। বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে শোনা যেতে লাগল তাঁর সেই বজ্রহুঙ্কার—লেফ্‌ট্‌-রাইট্‌, লেফ্‌ট্‌-রাইট্‌, লেফ্‌ট্‌...

সত্য গুপ্ত ছাড়া যতীন দাস, পঞ্চানন চক্রবর্তী, প্রতুল ভট্টাচার্য, জগদীশ চ্যাটার্জী, বিনোদ চক্রবর্তী, জ্যোতিষ জোয়ারদার, বিনয় বসু, দীনেশ গুপ্ত, ননী চৌধুরী, সৌরিভ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল প্রমুখ বিপ্লবীদের নামও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভলাণ্টিয়ার্স বাহিনী গঠনে এঁদের কারো অবদানই কম নয়।

কূটনীতি হিসেবে কংগ্রেসে যোগ দিলেও আসল ব্যাপারে কিন্তু বৈপ্লবিক সংস্থাগুলি চুপচাপ বসে ছিল না। ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতির কাজ চলছিল অপ্রতিহত গতিতেই।

শক্ত আঘাত হানতে হবে। আঘাতে আঘাতে শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের আগ্রাসী ক্ষুধাটাকে এবার চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে হবে।

প্রবীণ বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের মুক্তিসঙ্ঘেও তৎপরতা কম ছিল না।

বিভিন্ন বিপ্লবী দল বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স মুভমেণ্টকে গ্রহণ করেছিল বিপ্লবের অস্ত্ররূপে। মুক্তিসংঘ এ আন্দোলনকে গ্রহণ করল শুধু অস্ত্ররূপে নয়, বিপ্লবের প্রাণরূপেও।

পরবর্তী কালে এই মুক্তিসংঘই যে কি করে বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্সের সংক্ষিপ্ত নাম বি. ভি.-তে রূপান্তরিত হল, তা বোঝানোর উদ্দেশ্যে ভূপেন-বাবুর লেখা থেকে কয়েকটি লাইন এখানে হুবহু তুলে দিচ্ছি ঃ

'সুভাষচন্দ্র পরিচালিত বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স নামক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। এ বাহিনী বাংলার বিপ্লবীদের কল্পনায় সমুজ্জ্বলময় এক দুর্জয় কর্মপথের সন্ধান দিল। হেমবাবু ও তাঁর বন্ধুগণ বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স মুভমেণ্টকে শুধু মুভমেণ্টের ভূমিকায় রাখলেন না। তাঁরা গভীর নিষ্ঠায় উহাকে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করলেন। এ সম্ভব হয়েছিল সত্য গুপ্তের দক্ষ নেতৃত্বে। তাঁর চমৎকার মিলিটারী মন, মেজাজ ও শিক্ষা ছিল। তাঁর রক্তে ছিল একটি ভয়হীন সেনানীর অস্তিত্ব। তাঁর প্রত্যয় ছিল সুসংযত সেনাধ্যক্ষের।

হেমচন্দ্রের মুক্তিসংঘ আর বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স মুভমেণ্ট সংস্থা কার্যত ভিতরে-বাইরে মিলেমিশে গিয়েছিল কর্মীদেরই ইচ্ছায়। পুলিস এই সূত্রে হেমবাবুর বিপ্লবী সংস্থার নাম দিল 'বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স'—সংক্ষেপে বি. ভি.।'

এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে, বি. ভি. নামের আসল রহস্য কোথায় ? প্রকৃতপক্ষে বি. ভি. ও হেমবাবুর মুক্তিসংঘ এক ও অভিন্ন। এখন থেকে আমিও তাকে বি. ভি. নামেই উল্লেখ করব।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হিসেবে হেমবাবু তখন সর্বত্র সুপরিচিত।

কিন্তু আসল মানুষটিকে চিনতে পেরেছিলেন ক'জন ! বাইরে কংগ্রেস-কর্মী হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন মুক্তিসংঘ বা বাংলার বৈপ্লবিক সংস্থা বি. ভি.-র সর্বাধিনায়ক মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ। একান্ত ঘনিষ্ঠ দু'একজন ছাড়া সে খবর আর কারোরই জানবার অবকাশ ছিল না।

সবার অলক্ষ্যে আরো একটি মানুষ যে সেদিন নিঃশব্দে এগিয়ে চলে-ছিলেন, সে খবরও কিন্তু কারো জানবার অবকাশ ছিল না, মল্লিকা। তিনি হলেন চট্টগ্রামের ছোট-বড় সবার অতি আপন জন—মাস্টারদা—সূর্য সেন।

অঙ্কের মাস্টার, তাই হিসেবে তাঁর এতটুকুও ভুল হয়নি।

হয়নি বলেই কলকাতা কংগ্রেস থেকে ফিরে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কাজে নেমে পড়েছেন গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন, লোকনাথ বল প্রমুখ সুযোগ্য সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে।

সুদক্ষ ভলাণ্টিয়ার্স বাহিনী চাই। চাই ইস্পাতে গড়া মৃত্যুভয়হীন এমন একদল তরুণ—যারা ঝড়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোনমতেই ভেঙে পড়বে না। আর দেরি নয়। এগিয়ে চল সবাই।

উৎসাহ আরো শতগুণ বৃদ্ধি পেল সুভাষকে কাছে পেয়ে।

১৯২৯ সাল। ১১ই মে। চট্টলের যুব-সমাজ সেদিন অধীর, চঞ্চল। জেলা-কংগ্রেস ও যুব-সম্মিলনী উপলক্ষ্যে সুভাষ এসেছেন তাঁদের কাছে। তারুণ্যের মূর্ত প্রতীক সুভাষ।

প্রকাশ্য অধিবেশন শেষ। এবার মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কের একটা গোপন কক্ষে শুরু হল অ-প্রকাশ্য অধিবেশন।

একদিকে চট্টগ্রাম ভলাণ্টিয়ার্স বাহিনীর সর্বাধিনায়ক গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, ত্রিপুরা সেন প্রমুখ বীর বিপ্লবীবৃন্দ, অন্যদিকে সুভাষ। দু'চোখে তাঁর অনন্ত প্রত্যাশা।

অগ্নিযুগের ইতিহাসে চট্টগ্রাম কি আজ গোটা বাংলাকে পথ দেখাবে না ? ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রোশে ফেটে পড়বে না ? চট্টগ্রাম সম্বন্ধে যে তাঁর অনেক আশা !

দুর্ধর্ষ বিপ্লবী অনন্ত সিংহের লেখা থেকেই সেদিনের সেই সাক্ষাৎকারের বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ

'...দুপুর বেলা মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কের গোপন কক্ষে তিনি, গণেশ, ত্রিপুরা সেন ও আমার সঙ্গে অন্যের সম্পূর্ণ অসাক্ষাতে মিলিত হয়ে ভলাণ্টিয়ার্স-

সংগঠন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। যত দূর সম্ভব খোলাখুলি তাঁর সঙ্গে আমরা আলাপ করলাম। তাঁকে খুব ভালভাবে বুঝতে দিয়েছিলাম যে, আমরা মিলিটারী পোশাকে সজ্জিত হয়ে কংগ্রেসের নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ ভলাণ্টিয়ার হয়েই কংগ্রেসের শোভাবর্ধন করব না। সুভাষবাবুকে আমাদের মত জানালাম যে, কংগ্রেসের নন্-ভায়োলেন্স নীতি আমরা কখনই অন্তর দিয়ে সমর্থন করি না। আমরা মাত্র কৌশল হিসেবে নন্-ভায়োলেন্স নীতি সাময়িকভাবে মেনে চলি এবং এই নন্-ভায়োলেন্স নীতির অন্তরালে সশস্ত্র যুব-বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হতে চাই। বলা বাহুল্য, সুভাষবাবু আমাদের দৃঢ় মনোভাবের আভাস বুঝে আমাদের যুব-বিদ্রোহের পরিকল্পনাকে তাঁর নৈতিক সমর্থন জানান।' [অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়ঃ সাপ্তাহিক বসুমতী, ১৪ই জুলাই, ১৯৬৬]

ঠিক তখনই একদিন বাংলার রাজনৈতিক আকাশ মেঘে মেঘে কালো হয়ে উঠল সুভাষ ও দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কেন্দ্র করে।

কে হবে বাংলা কংগ্রেসের সর্বাধিনায়ক ?

কে দেবে বাঙালীকে পথ চলার নির্দেশ ?

কার ইঙ্গিতে মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণ-তরুণীর দল এগিয়ে যাবে আপন লক্ষ্যের দিকে ?

সুভাষ, না সেনগুপ্ত ?

তরুণ সমাজের কাছে সুভাষ তখন হিরো। সুভাষ ছাড়া আর কারো নেতৃত্বই তারা মানতে রাজী নয়। অথচ কংগ্রেসের প্রবীণ দলের ইচ্ছা অন্য রূপ। তাঁরা চান সেনগুপ্তকে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিরোধ। বিরোধ থেকে সংঘর্ষ। বৈপ্লবিক সংস্থাগুলোও তার ব্যতিক্রম নয়।

তাদের মধ্যেও সেই বিরোধ। সেই দলাদলি। কেউ সুভাষের সমর্থক। কেউ বা চান সেনগুপ্তকে।

বিরোধ চরমে উঠল চট্টগ্রামে। সেখানেও সেই একই অবস্থা। মাস্টারদা ও তাঁর সহকর্মিগণ সবাই চান সুভাষকে। অপরপক্ষে অনুশীলন সমিতি হল সেনগুপ্তের সমর্থক।

যদিও জয় হল সুভাষেরই, তবু অবাঞ্ছিত সংকটকে শেষপর্যন্ত আর কোনরকমেই এড়ানো গেল না। ফলে, চরম মূল্য দিতে হল মাস্টারদার দলেরই একজন তরুণ কর্মী, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীসুখেন্দু দত্তকে।

শুধু তাই নয়, বিপ্লবী নেতা নির্মল সেন, এমন কি স্বয়ং মাস্টারদা পর্যন্ত সেদিন রেহাই পেলেন না অবাঞ্ছিত সেই রক্তপাতের হাত থেকে।

এবার গর্জে উঠল চট্টগ্রামের তরুণদল। প্রতিশোধ চাই! চাই রক্তের বদলে রক্ত! এর জবাব আমরা দেবই!

বাধা দিলেন মাস্টারদা। হ্যাঁ, জবাব আমরা দেব। তবে এখানে নয়। দেব আসল জায়গায়। আত্মকলহে শক্তিক্ষয় না করে তার জন্য প্রস্তুত হও।

এদিকে গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিংহ, নির্মল সেন প্রমুখ বিপ্লবীগণ আহত সুখেন্দুকে কলকাতা নিয়ে এসে ভর্তি করে দিলেন কারমাইকেল কলেজ হাসপাতালে। আশা খুবই কম, তবু শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে।

সুখেন্দুর মতো কর্মীকে হারানো যে দলের পক্ষে একটা প্রচণ্ড ক্ষতি!

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সুভাষ ছুটে গেলেন মৃত্যুপথযাত্রী সুখেন্দুর শয্যাপাশে। শুধু একদিন নয়, দিনের পর দিন। তাঁকে জয়যুক্ত করতে গিয়েই সুখেন্দু আজ এমনি করে অকালে প্রাণ দিতে চলেছে। এ দুঃখ যে কোনোদিনই যাবার নয়!

কিছুতেই কিছু হল না। হাজার চেষ্টা করেও শেষপর্যন্ত বাঁচানো গেল না সুখেন্দুকে। দেখতে দেখতে একদিন তার চোখদুটি বুজে এল অনন্ত নির্ভরতায়। নিশ্চিন্ত আরামে। সে ঘুম আর কোনোদিনই ভাঙল না।

শুরু হল শবযাত্রা। সবার পুরোভাগে নগ্নপদে সুভাষ। বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা। মুখে তারই প্রতিচ্ছায়া। সুখেন্দু হারিয়ে গেল। ওর অভাব যে কোনোদিনও পূর্ণ হবার নয়।

এদিকে বি. ভি. চুপচাপ বসে নেই। ভেতরে ভেতরে তার প্রস্তুতি-পর্ব এগিয়ে চলেছে অবিশ্বাস্য গতিতে। আর সময় নেই। প্রস্তুত হও।

সর্বাধিনায়ক হেমবাবু বহুদর্শী লোক। স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, মহানায়ক রাসবিহারী বসু, বাঘা যতীন প্রমুখ সবার সান্নিধ্যই তিনি লাভ করেছেন নিজের ব্যক্তিগত জীবনে। তাঁদের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ও তার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতাই সঞ্চিত হয়ে আছে তাঁর স্মৃতির ভাণ্ডারে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, সংগ্রাম চালাতে হলে চাই উপযুক্ত প্রস্তুতি।

অতীতে সব ক'টি প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে এই উপযুক্ত প্রস্তুতির অভাবে। বি. ভি.-র ক্ষেত্রে কোনরকমেই তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দিতে তিনি রাজী নন।

প্রথমেই ব্যবস্থা করা হয়েছে কতকগুলি সেল্টার বা গোপন আস্তানার। পুলিশ হয়তো কাউকেই সেদিন রেহাই দেবে না। তাই পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় নেবার জন্য কতকগুলি সেল্টার থাকা চাই।

নিজস্ব চিকিৎসা বিভাগও প্রস্তুত। আঘাত করতে গেলে পাল্টা-আঘাত আসবেই। কিছু-সংখ্যক হতাহত হওয়াও বিচিত্র নয়। সে অবস্থায় হাসপাতালে বা বাইরের কোন চিকিৎসকের কাছে যাওয়া মোটেই নিরাপদ হবে না। সুতরাং নিজস্ব কিছু চিকিৎসক চাই, যাঁদের ওপর পুরোপুরিভাবে নির্ভর করা চলে।

সেদিক থেকেও নিশ্চিন্ত। সত্যেন্দ্রকুমার দত্ত, দুর্গাদাস ব্যানার্জী, সুরেন বর্ধন, প্রভাষ ঘোষ, প্রকাশ দত্ত, অরুণ নন্দী, অনিমেষ রায়, জিতেন সেন প্রমুখ অভিজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দ সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে এসেছেন পরম শুভানু-ধ্যায়ী বন্ধুর মতো। এ'দের মধ্যে কেউ কেউ আবার দলীয় সদস্য। সুতরাং সততা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কয়েকজন সুদক্ষ আইনজীবীও চাই। মামলা চালাবার মতো অত সামর্থ্য বিপ্লবীদের কোথায়! কোথায় পাবেন তাঁরা অত টাকা! সুতরাং এমন কয়েকজন আইনজীবীর সহযোগিতা প্রয়োজন, যাঁদের কাছে অর্থের প্রশ্নটাই সবচাইতে বড় নয়।

সেদিক থেকেও অসুবিধার কোন প্রশ্ন নেই। বন্ধুর মতোই হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন খগেন কর. চিন্তাহরণ রায়, বিনয় সেন, পরেশ সাহা প্রমুখ বিচক্ষণ আইনজীবিগণ। তোমরা দেশের জন্য প্রাণ দেবে, আর আমরা কি শুধু নির্বাক দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে থাকব! তা কি হয় কখনো!

দিন-মাস-প্রহরের মালা-গাঁথা ছন্দে কেটে গেল আরো এক বছর। এল ১৯৩০ সাল।

বাংলার দিকে দিকে তখন নবজীবনের সাড়া। নতুন দিনের সংকেত। সর্বত্র এক রব—এগিয়ে চল! এগিয়ে চল! এতকাল আমরা একতরফাই মার খেয়েছি। এবার পাল্টা মার দেবার পালা।

বি. ভি.-র সদস্যদের মধ্যেও সেই একই চঞ্চলতা। আর সময় নেই। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে আর অবকাশ দেওয়া চলবে না। এবার আঘাত হানতে হবে। চারদিক থেকে আঘাত হেনে ওদের যাঁতিকলে পিষে মারতে হবে।

পেছনে তাকাবার সময় নেই। হিসেব-নিকেশেরও ফুরসৎ নেই। এ হল বাঁচার সংগ্রাম। এ সংগ্রামে সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে।

জানি, তার জন্য মূল্য দিতে হবে। দিতে হবে অনেক তাজা প্রাণ। কোন দুঃখ নেই। প্রয়োজন হলে তাও আমরা দেব। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এই মূল্য দেবার পালা আমাদের কোনদিনই শেষ হবে না।

অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত। অ্যাকশন স্কোয়াডও প্রস্তুত। প্রস্তুত বি. ভি.-র মৃত্যুপাগল তরুণবৃন্দ। সংকেত পেলেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দুর্বার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়বেন দুঃসাহসের পাখায় ভর করে। শুধু অপেক্ষা মাত্র।

বিস্ফোরণ ঘটল তার আগেই। মারাত্মক খবর এল বাংলার এক প্রান্তে অবস্থিত সেই চট্টলভূমি থেকে।

সর্বাধিনায়ক মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবীরা এক অভাবনীয় ইতিহাসের সৃষ্টি করেছেন।

চট্টগ্রাম স্বাধীন, মুক্ত। ব্রিটিশ ইউনিয়ন জ্যাকের পরিবর্তে সেখানে এখন পত্ পত্ করে উড়ছে ভারতের তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা!

খবর শুনে সারা দেশ স্তম্ভিত। তারপর বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতেই, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে শোনা গেল বিপুল জয়ধ্বনি।

ধন্য চট্টগ্রাম! ধন্য তার সুসন্তান মাস্টারদা সূর্য সেন!

ধন্য গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন প্রমুখ তাঁর সুযোগ্য সহকর্মিবৃন্দ!

ধন্য তাঁর প্রতিটি সুশিক্ষিত মুক্তিকামী সৈনিক! পরাধীন জাতির

ইতিহাসে তোমরা যে নজির রেখেছ, কোথাও বুঝি তার তুলনা নেই। তোমাদের নমস্কার!

'ওরা দুপায়ে দলে মরণ শংকারে
সবারে ডেকে গেল শিকল ঝঙ্কারে।'

চট্টগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লব।

সেই কবেকার কথা। আজও আবছা আবছা মনে পড়ে। মনের খাতা ওল্টাতে গিয়ে আজও ক্ষণে ক্ষণে বেরিয়ে আসে বিস্মৃতপ্রায় অতীতের সেই ধূসর পাণ্ডুলিপি। অস্পষ্ট, কিন্তু অবিস্মরণীয়।

বিরাট পটভূমিকা। বিরাট প্রস্তুতি। এত বিরাট যে, সামান্য দু-চার কথায় তার গুরুত্ব বোঝানো কোনরকমেই সম্ভব নয়। তাই সে চেষ্টা না করে আমি শুধু তার প্রধান প্রধান ঘটনাগুলোই আজ তোমাকে শোনাব, মল্লিকা।

বিপ্লবী সুভাষকে জানতে হলে তাঁর সমসাময়িক কালের বৈপ্লবিক কর্মধারা সম্বন্ধে তোমার কিছুটা ধারণা থাকা দরকার। এ অধ্যায়ের অবতারণা শুধু তারই প্রয়োজনে।

তবে শুরুতেই বলে রাখছি যে, এর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আমার জানা নেই। আমার কেন, কারোর নেই। কারণ, এই ইতিহাসের নায়কদের সেদিন সবচাইতে বড় কথাই ছিল—'মন্ত্রগুপ্তি'। অর্থাৎ, কোন কথা নয়। কোন প্রশ্ন নয়। শুধু নিঃশব্দ সৈনিকের মতো এগিয়ে যাও। সাবধান, মানুষ তো দূরের কথা, কাক-পক্ষীও যেন কোন কিছু টের না পায়!

বি. ভি.-র সর্বাধিনায়ক শ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র ঘোষের ভাষায়ঃ

'যাঁহারা প্রচণ্ড ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন যথার্থ স্বাধীনতা কাড়িয়া লইবার বীর্যে—তাঁহাদের অমর কর্মকাণ্ডের অধিক অংশ সকলের অবজ্ঞাতে আচরিত হইয়াছে। সভা-সমিতি ডাকিয়া জ্বালাময়ী প্রস্তাব গাঁথিয়া কোন কার্য সাধিত হয় নাই। প্রস্তরফলকে বা তাম্র-রৌপ্য মুদ্রায় কোন কীর্তি-কাহিনী কেহ লিখিয়া রাখিয়া যান নাই। অথবা, কোন সাক্ষীসাবুদ ডাকিয়াও কোন গুপ্ত সমিতির লোকেরা তাঁহাদের কার্যকলাপ সংঘটিত করেন নাই। কাজেই তাঁহাদের কর্ম ইতিহাস-দুর্লভ।'

সত্যিই দুর্লভ। দুর্লভ বলেই সেদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে কোথায় যে কার কতখানি রক্ত ঝরেছিল, তার সঠিক ইতিহাস জানানো কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। জানাতে গেলেও সে ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, কিছু দেখা বা শোনা, আবার কিছুটা অনুমানের পাখায় ভর করে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।

সে হিসেবে এ কাহিনীকে তুমি ইতিহাস না বলে বরং ইতিহাসের ভগ্নাংশ বলে ধরে নিতে পার।

১৯৩০ সাল। ১৮ই এপ্রিল। আইরিশ বিপ্লবের স্মৃতি-বিজড়িত ঐতিহাসিক ১৮ই এপ্রিল।

রাত তখন দশটা।

পরিকল্পনা মতো সবার আগে এগিয়ে গেলেন যুব-বিদ্রোহের দুই দুর্ধর্ষ জেনারেল অনন্ত সিংহ আর গণেশ ঘোষ।

পেছনে আরো চারজন। বিধু ভট্টাচার্য, হরিপদ মহাজন, হিমাংশু সেন আর সরোজ গুহ।

সবার গায়ে সামরিক পোশাক। সবাই সশস্ত্র। সবার মনে একই সংকল্প।

সামনেই পুলিশ লাইন। যে করে হোক, জেলার শক্তিকেন্দ্র এই পুলিশ লাইনের অস্ত্রাগারটি দখল করতে হবে।

তারপর একে একে দখল করতে হবে জেলখানা, ইম্পিরিয়াল ব্যাংক, থানা, কোর্ট-কাছারী ইত্যাদি সব কিছু।

দখল করতে হবে গোটা শহরটাকেই।

অবশ্য শহর দখল করা মানেই বিদেশীর হাত থেকে ভারতভূমি অধিকার-মুক্ত করা নয়। বিরাট এই ভারতবর্ষের মধ্যে চট্টগ্রাম আর কতটুকু!

তবু তারও কিছুটা প্রয়োজন আছে। একতরফা মার খেয়ে জাতির মেরুদণ্ড আজ ভেঙে পড়েছে।

আজ পাল্টা মার দিয়ে শতাব্দীর ঘুম থেকে তাদের জাগিয়ে তুলতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে যে, ইংরেজ অপরাজেয় নয়। সঙ্ঘবদ্ধভাবে আঘাত করতে পারলে তাদের ঐ শক্তির দম্ভকে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়াটা এমন কিছু কষ্টসাধ্য কাজ নয়।

প্রমাণ চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামে যা সম্ভব, অন্যত্র তা সম্ভব হবে না কেন? নিশ্চয়ই সম্ভব। সুতরাং প্রস্তুত হও। সবাই মিলে রুখে দাঁড়াও।

ওদিকে টিলার ওপর দণ্ডায়মান রাইফেলধারী প্রহরী অবাক।

কে ওরা?

কেন ওরা এদিকে এগিয়ে আসছে একটু একটু করে?

কি মতলব ওদের? সামরিক বিভাগের কেউ নয় তো?

প্রশ্ন করার মতো কোন অবকাশ পেল না সশস্ত্র প্রহরীটি।

তার আগেই দুই জেনারেলের হাতের রিভলবার আগুন ছড়াল—

দ্রাম! দ্রাম!

তারপরই একসঙ্গে সবাই জয়ধ্বনি দিল—ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ! বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে অগণিত কণ্ঠে জয়ধ্বনি ভেসে এল—বন্দে মাতরম্‌! ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ! সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক!

কি নিখুঁত পরিকল্পনা! যেন চারদিক থেকে শত-সহস্র আক্রমণকারী এগিয়ে আসছে আর কি!

অথচ আসলে কিন্তু ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জনের বেশি হবে না।

তাইতেই কাজ হল। আচমকা রিভলবার গর্জন, আর সেই সঙ্গে এই জয়ধ্বনি শুনে শত শত পুলিশ প্রহরীর দল যে নিমেষে কোথায় ছুটে পালাল, তার আর কোন হদিশই পাওয়া গেল না।

মাস্টারদা সহ ছোট ছোট দলগুলির সবাই এসে এবার জড়ো হলেন একে একে।

সঙ্গে সঙ্গে একদল গার্ড নিলেন পুলিশ লাইনের চারপাশে। অন্য একদল ছুটে গেলেন ম্যাগাজিন কক্ষের উদ্দেশ্যে। অস্ত্র-শস্ত্র চাই। প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র !

বড় বড় হাতুড়ীর ঘায়ে দেখতে দেখতেই ম্যাগাজিন কক্ষের শক্ত তালা ভেঙে পড়ল ঝন্ ঝন্ করে। তারপর সে কি সবার আনন্দ-উল্লাস !

রাইফেল ! রাইফেল ! রাইফেল ! একটি-দুটি নয়, শত শত পুলিশ মাস্কেট্রি রাইফেল। সেই সঙ্গে অসংখ্য রিভলবার আর কার্তুজ।

সহসা জেনারেল গণেশ ঘোষের হাঁক শোনা গেল—কম্পানি ফল ইন্ !

সঙ্গে সঙ্গে সবাই সোজা হয়ে দাঁড়ালেন সামরিক কায়দায়। কি করে মাস্কেট্রি রাইফেল ব্যবহার করতে হয়, তা হাতে-কলমে বুঝিয়ে দিয়ে এবার জেনারেল ঘোষ হাঁক দিলেন—Load !

সবাই টোটা ভরে নিলেন নিজ নিজ মাস্কেট্রি রাইফেলে।

পরবর্তী আদেশ—Aim !

সবাই লক্ষ্য স্থির করলেন আকাশের দিকে।

এবার শেষ আদেশ—Fire !

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে গোটা শহরটাই বুঝি কেঁপে উঠল থরথর করে। এমনি করে তিনবার।

একই দিনে, একই সময়ে জেনারেল লোকনাথ বল ও যুব-বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক নির্মল সেনের নেতৃত্বে ওদিকে আর এক অধ্যায় তখন শুরু হয়ে গেছে অক্সিলিয়ারী ফোর্স আর্মারীতে।

সেখানেও সেই একই ব্যাপার। রাইফেলধারী প্রহরী প্রথমেই জেনারেল বলকে দেখে স্যালুট জানাল উঁচুদরের কোন মিলিটারী অফিসার মনে করে।

সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি-বর্ষণ—দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম ! সেই সঙ্গে সমবেত কণ্ঠের বজ্রহুঙ্কার—ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ ! সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক !

আর যায় কোথায় ! সঙ্গে সঙ্গে অপ্রস্তুত পাঠান প্রহরীর দল ভোঁ দৌড় ! সাধ করে কে আর প্রাণ দিতে চায় ! আগে তো প্রাণ বাঁচুক, তারপর অন্য কথা।

তবে পুলিশ লাইনের মতো কাজটা কিন্তু এখানে খুব সহজে হল না, মল্লিকা। হতাহতের সংখ্যাও অনেক বেশি। নিহত মোট ছ-জন। সবটাই বিপক্ষের।

প্রথমেই ভারপ্রাপ্ত অফিসার সার্জেণ্ট মেজর ফেরেল ছুটে এলেন উদ্যত রিভলবার হাতে নিয়ে। কৌন হ্যায় ! ক্যায়া মাংতা !

জবাব গেল আগ্নেয়াস্ত্রের মুখ দিয়ে—দ্রাম ! দ্রাম্ ! দ্রাম্।

সঙ্গে সঙ্গেই মেজর ফেরেল লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। তারপর স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন—'ডার্লিং, রিং আপ দি পুলিশ স্টেশন।'

কোথায় ফোন, কোথায় কি ! পরিকল্পনা মতো পাঁচ মিনিট আগেই শহরের যাবতীয় টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে অভিজ্ঞ নেতা অম্বিকা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে। টেলিফোন-ভবনের কোন চিহ্নও নেই সেখানে। সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

যোগাযোগ-ব্যবস্থা বলতেও কিছু নেই। দুদিন আগেই লালমোহন সেন, সুকুমার ভৌমিক, হারান চৌধুরী, সুবোধ মিত্র, উপেন ভট্টাচার্য, শংকর, সুশীল দে, বিজয় আইচ প্রমুখ মুক্তি-সৈনিকগণ যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন শহর থেকে চল্লিশ মাইল দূরে গিয়ে।

এক জায়গায় মালগাড়ি লাইনচ্যুত করে, অন্য জায়গায় টেলিগ্রাফের তার কেটে দিয়ে তাঁদের কর্তব্য তাঁরা পালন করেছেন যথাযথভাবেই।

মেজর ফেরেল শেষ। এবার আর্মারীর দরজা ভাঙার পালা।

পরস্পর দুটো শক্ত মজবুত লোহার দরজা। ভেতরে রয়েছে ৩০৩ বোরের দশ সট্ওয়ালা আর্মি ম্যাগাজিন রাইফেল আর লুইস গান।

পুলিশ লাইনে পাওয়া মাস্কেট্রি রাইফেলে প্রতিবার মাত্র একটি করে গুলী ছোঁড়া যায়। তার পাল্লাও দুশো গজের বেশি নয়।

সেদিক থেকে আর্মি ম্যাগাজিন রাইফেলের গুরুত্ব অনেক বেশি। এগুলো দিয়ে অনায়াসেই একসঙ্গে দশটা করে গুলী ছোঁড়া চলে। সুতরাং এগুলো চাই-ই ! যে করে হোক, এগুলো পেতেই হবে। তাছাড়া লুইস গান তো আছেই।

কোন বাধাই আর বাধা রইল না শেষ পর্যন্ত। প্রথমেই জাহাজ বাঁধা মজবুত দড়ি দিয়ে দরজার হাতল দুটোকে মোটরের সঙ্গে বাঁধা হল শক্ত করে। তারপর ফুলস্পীডে গাড়ি চালিয়ে দিতেই, ব্যস্ ! সঙ্গে সঙ্গে সব খোলা মাঠ।

তারপর সেই একই দৃশ্য। শুধু রাইফেল আর রাইফেল ! রিভলবার আর লুইস গান !

কিন্তু কার্তুজ ! দশ সট্ওয়ালা ম্যাগাজিন রাইফেলের উপযুক্ত কার্তুজ কোথায় ?

আশ্চর্য, কোথাও নেই। তন্ন তন্ন করে সর্বত্র খোঁজ করা হল, তবু কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না।

এখন উপায় ! এত আর্মি রাইফেল, এত স্বয়ংক্রিয় লুইস গান, সবই যে অকেজো হয়ে পড়বে ·৩০৩ বোরের কার্তুজের অভাবে !

একটার পর একটা বাধা। হঠাৎ সার্জেণ্ট ব্লেকবার্ন, মিঃ কলেন ও জাহাজ কোম্পানির জনৈক শ্বেতাঙ্গ অফিসার এসে হাজির। চোখে তাদের অনন্ত বিস্ময়। কে ওরা ? কি মতলব ওদের ?

জবাব গেল গুলীর মুখে—দ্রাম ! দ্রাম ! কলেন সেখানেই পড়ে রইলেন আহত হয়ে। বাদ বাকি সবাই দে ছুট !

এবার সবাইকে ফিরে যেতে হবে হেড কোয়ার্টার্স সেই পুলিশ লাইনে।

অস্ত্র-শস্ত্র যথাসম্ভব সঙ্গে নেওয়া হল। বাদ বাকি সবই ধ্বংস করে ফেলা হল শক্ত হাতুড়ীর ঘায়ে। তারপরই শোনা গেল জেনারেল বলের নতুন আদেশ—'সেট দি আর্মারী অন ফায়ার !'

দেখতে দেখতে গোটা আর্মারীটা জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। সেই সঙ্গে সমবেত জয়ধ্বনি—ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ ! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক !

আবার সেই বাধা। এবার এলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ উইলকিনসন স্বয়ং।

আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে ঢালাও হুকুম—ফায়ার!

মারা পড়ল সঙ্গের আর্দালীটি। ড্রাইভার বীরমন থাপাও রেহাই পেল না। তাকেও লুটিয়ে পড়তে হল শক্ত মাটির বুকে।

একমাত্র রেহাই পেলেন উইলকিনসন। অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হাওয়া।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জেনারেল বল হেড কোয়ার্টার্সে পৌঁছে গেলেন সবাইকে নিয়ে।

ইতিমধ্যে অম্বিকা চক্রবর্তীও তাঁর দলবল নিয়ে এসে গেছেন টেলিফোন-ভবন ধ্বংস করে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, অমরেন্দ্র নন্দী, বীরেন দে, মনোরঞ্জন সেন প্রমুখ দলের সবচাইতে দুঃসাহসী তরুণদের পাঠানো হয়েছিল পাহাড়-তলী ইয়োরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করার জন্য। কিন্তু গুড-ফ্রাইডে উপলক্ষে ক্লাব বন্ধ থাকার দরুন সে পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয়নি।

ইতিমধ্যে তাঁরাও এসে যোগ দিয়েছেন মূল বাহিনীর সঙ্গে। কেউ আর বাদ নেই। একটি প্রাণীও না।

এবার জাতীয় পতাকা উত্তোলন। বিউগল ধ্বনির মধ্যে পতাকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গেই কম্যাণ্ড হল—লোড! এম! ফায়ার!

সঙ্গে সঙ্গে পর পর তিনবার প্রায় পঞ্চাশটি মাস্কেট্রি রাইফেল গর্জে উঠল আকাশের দিকে মুখ করে।

অবশেষে অস্থায়ী সামরিক সরকার গঠন ও সর্বাধিনায়করূপে মাস্টারদাকে গার্ড অফ অনার প্রদর্শন।

সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই রাইফেল গর্জন। সেই সমবেত জয়ধ্বনি—ইনক্লাব জিন্দাবাদ! চট্টগ্রাম রিপাবলিকান আর্মি জিন্দাবাদ! বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

সবাই খুশিতে ভরপুর। তাঁদের এতদিনের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। প্রধান প্রধান সমস্ত ঘাঁটি এখন তাঁদের দখলে। অক্সিলিয়ারী ফোর্স, টেলিফোন-ভবন বিধ্বস্ত। টেলিগ্রাফ লাইন বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। রেলপথও তাই।

এবার জেলখানা, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, বিভিন্ন পুলিশ থানা ইত্যাদি দখল করতেই যা দেরি।

হঠাৎ একি! রাত্রির অন্ধকারে কোথা থেকে ভেসে আসছে লুইস গান থেকে অবিশ্রান্ত গুলী-বর্ষণের শব্দ—ট্যা-ট্যা-ট্যা-ট্যা-ট্যা—

সঙ্গে সঙ্গে লায়িং পোজিশন নিয়ে সব ক'টি মাস্কেট্রি রাইফেল প্রত্যুত্তর দিল সামনের ওয়াটার ওয়ার্কস লক্ষ্য করে। শত্রুপক্ষ ওখানেই রয়েছে। সুতরাং চালিয়ে যাও।

ডবল মুড়িং জেটিতে যে একটা লুইস গান রয়েছে সে খবর তাঁদের

অজানা ছিল না। ওটা দখল করার জন্য প্রস্তাবও করা হয়েছিল কয়েকবার। কিন্তু লোকাভাবের দরুন তা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

ঐ একটা মাত্র লুইস গান নিয়েই যে শত্রুপক্ষ এত শীগ্‌গির তৎপর হয়ে উঠবে, তা কে জানত!

মাত্র কিছুক্ষণ, তারপরই সব চুপচাপ।

এবার একটা কঠিন প্রশ্ন দেখা দিল বিপ্লবী সমর-নায়কদের মনে। স্বয়ংক্রিয় লুইস গানের বিরুদ্ধে মাস্কেট্রি রাইফেল আর কতটুকু! এ অবস্থায় খুব বেশিক্ষণ লড়াই চালানো সম্ভব হবে কি?

হুকুম হল—যত পার অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে নাও, বাদ বাকি সব ধ্বংস কর। তারপর পেট্রোল ঢেলে গোটা পুলিশ লাইনটা জ্বালিয়ে দাও।

তাই করা হল। এ ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্ব ছিল হিমাংশু সেনের ওপর। তিনিই সর্বাগ্রে এগিয়ে গেলেন পেট্রোলের টিন হাতে করে।

বিপর্যয় ঘটে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। কখন যে তাঁর জামা-কাপড়ে বেশ কিছুটা পেট্রোল পড়ে গেছে তা টের পাননি তিনি। টের পেলেন আগুন ধরাতে গিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। সে এক বীভৎস অবস্থা! চোখে পর্যন্ত দেখা যায় না।

কোনরকম পরামর্শের অপেক্ষা না করে সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ তাঁকে মোটরে তুলে নিয়ে ছুটে গেলেন শহরের কোন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে।

সঙ্গে গেলেন আরো দুজন। আনন্দ গুপ্ত ও জীবন ঘোষাল।

ফল হল সুদূরপ্রসারী। সেই যে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন, তারপর হাজার চেষ্টা করেও মূল বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করা আর তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠল না।

এদিকে অপেক্ষা করে করে কেটে গেল দু ঘণ্টা, কিন্তু কোথায় জেনারেল সিংহ? কোথায় গণেশ ঘোষ?

আনন্দ গুপ্ত বা জীবন ঘোষলই বা কোথায়?

তবে কি পুলিশ এরই মধ্যে কোন রি-ইনফোর্সমেণ্টের ব্যবস্থা করেছে?

নিশ্চয়ই তাই। নইলে এখনো ওঁরা ফিরে আসছেন না কেন? হয়তো ওঁরা চারজনই ধরা পড়ে গেছেন পুলিশের হাতে। হয়তো তাঁদের এবার চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলবে সামরিক বাহিনীর সাহায্যে।

না, এ পরিস্থিতিতে শহরের দিকে যাওয়া ঠিক নয়। এখানে থাকাটাও মোটেই নিরাপদ নয়। শত্রুপক্ষ যত বেশি সময় পাবে, তত বেশি সুযোগ নেবে। সুতরাং চল সবাই পাহাড়ের দিকে।

দুর্ভাগ্য! সত্যিই দুর্ভাগ্য, মল্লিকা। কারণ, আসল ঘটনা ছিল ঠিক তার বিপরীত।

প্রকৃতপক্ষে মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোক একটি মাত্র লুইস গান দিয়ে সামান্য বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল মাত্র। তাও তারা স্থির করতে পারেনি যে, পালাবে, না আত্মসমর্পণ করবে!

তাছাড়া শহর ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। এমন কি, ভীত আতঙ্কিত শ্বেতাঙ্গ সমাজের অধিকাংশই সেদিন শহর ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিল কর্ণফুলী নদীতে অবস্থিত জাহাজের অভ্যন্তরে। সৈন্য-সমাগম শুরু হয়েছিল তারও তিনদিন পরে।

বিপ্লবীদের সে খবর জানা ছিল না। আসলে দুই প্রধান সেনানায়কের অনুপস্থিতির ফলেই সেদিন তাঁদের মনে এমনি একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল।

দুর্ভাগ্যের এখানেই শেষ নয়। সবচাইতে বড় দুর্ভাগ্য এই যে, সেই রাত্রেই জেনারেল অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ আবার পুলিশ লাইনে ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু তখন সব ফাঁকা।

আরো দুর্ভাগ্য এই যে, দূর থেকে তাঁদের গাড়ির হেড লাইটের আলো আত্মগোপনকারী মূল বাহিনীর নজর এড়ায়নি। তবু কেউ কোনরকম সাড়া দেননি। ভেবেছিলেন, কোন পুলিশের গাড়ি হবে হয়তো।

১৯শে এপ্রিল সারাদিন কাটল সুলুকবহর পাহাড়ে। তারপরই আবার শুরু হল পথ-পরিক্রমা। শুধু পথ আর পথ! দীর্ঘ-বিসর্পিত বন্ধুর পথ! কোথায় তার শেষ কে জানে!

অবশেষে ফতেয়াবাদ। আহার নেই। নিদ্রা নেই। এমন কি তৃষ্ণার জল-টুকু পর্যন্ত নেই। তৃষ্ণা মেটাতে গিয়ে লুব্রিকেটিং অয়েল পর্যন্ত খেতে দ্বিধা করেননি কেউ কেউ। তদুপরি তিন দিনের কঠোর পরিশ্রম ও দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার ফলে সবাই ক্লান্ত, অবসন্ন।

তবু প্রতিটি তরুণ উৎসাহে ভরপুর। আমরা হার মানব না। সঙ্গে অস্ত্র রয়েছে। সুতরাং ভয় কি! তা বলে দিনের পর দিন এই অনিশ্চিত অবস্থা আমরা মেনে নিতে রাজি নই। আমরা বাস্তবের সম্মুখীন হতে চাই। আগেকার প্ল্যান অনুযায়ী শহর দখল করতে চাই। চাই মুখোমুখি সংগ্রাম!

তাই হোক। তরুণ দলের স্বতঃস্ফূর্ত দাবীকে সানন্দে মেনে নিলেন সর্বাধিনায়ক মাস্টারদা। চল, সবাই ফিরে যাই শহরের দিকে।

রাতের অন্ধকারে আবার শুরু হল পথ চলার পালা। এগিয়ে চল। চড়াই-উৎরাই ভেঙে এগিয়ে চল। ভোর হতে আর দেরি নেই। তার আগেই আমাদের পৌঁছে যেতে হবে শহরের সীমানায়।

সব বৃথা। শহরে পা দেবার আগেই পূব আকাশটা ফর্সা হয়ে এল একটু একটু করে। এতদিনে নিশ্চয়ই সব জানাজানি হয়ে গেছে। এ অবস্থায় দিনের আলোতে একসঙ্গে এতগুলো সামরিক পোশাক-পরা সশস্ত্র তরুণের পথ চলা মোটেই নিরাপদ নয়। সামনেই জালালাবাদ পাহাড়। উঠে যাও সবাই ওখানে এক এক করে।

২২শে এপ্রিল। বিকেল তখন প্রায় পাঁচটা। পশ্চিম আকাশে বিদায়ী সূর্যের অস্তরাগ। মনে হয় কে যেন প্রকৃতির বুকে আবীর ছড়িয়ে দিয়েছে মুঠি মুঠি।

ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে সবাই তখন বিশ্রাম করছেন পাহাড়ের বুকে গা এলিয়ে দিয়ে।

সবার মনে একই প্রশ্ন। কখন আমরা শহর দখল করব! কখন দখল করব ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, জেলখানা, কোর্ট-কাছারী ইত্যাদি সব কিছু!

নাই-বা রইল আমাদের ·৩০৩ বোরের আর্মি রাইফেল বা লুইস গান, তা বলে সাহসে বা শৌর্যে আমরা কারো চাইতে ছোট নই। যা আছে তাই দিয়ে আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। কিছুতেই হার মানব না। কোনোমতেই না।

এক দলে গোল হয়ে বসেছেন সুরেশ দেব, বিনোদ চৌধুরী, জিতেন্দ্র দাশগুপ্ত আর শম্ভু দস্তিদার।

অন্য দলে রয়েছেন কৃষ্ণ চৌধুরী. বিনোদবিহারী দত্ত, সরোজ গুহ, কালী দে, মধুসূদন দত্ত, ননী দেব আর মলিন ঘোষ।

একটু দূরে ক্ষীরোদ ব্যানার্জী, হেমেন্দু দস্তিদার, কালী চক্রবর্তী, অর্ধেন্দু দস্তিদার আর রণধীর দাশগুপ্ত।

খানিকটা নিচে সহায়রাম দাস, মতি কানুনগো, বিধু ভট্টাচার্য, নারায়ণ সেন আর পুলিনবিকাশ ঘোষ।

বেশ খানিকটা দূরে বসেছেন মহেন্দ্র চৌধুরী, নির্মল লালা, বীরেন্দ্র দে, বিজয় সেন আর নিতাইপদ ঘোষ।

অন্য এক জায়গায় অশ্বিনী চৌধুরী, বনবিহারী দত্ত, শশাংক দত্ত আর সুবোধ বল।

আর রয়েছেন ফণীন্দ্র নন্দী, হরিপদ মহাজন, ভবতোষ ভট্টাচার্য, সুধাংশু বোস আর সুবোধ চৌধুরী।

রয়েছেন ব্রিগেডিয়ার ত্রিপুরা সেন, মনোরঞ্জন সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত. হরি বল (টেগরা), রজত সেন আর স্বদেশ রায়।

এই স্বদেশ রায়, যিনি দলীয় সদস্য না হয়েও পুলিশ লাইন আক্রমণ-কালে অযাচিতভাবে এসে যোগ দিয়েছিলেন সবার সঙ্গে।

সর্বোপরি রয়েছেন সর্বাধিনায়ক মাস্টারদা সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন আর জেনারেল লোকনাথ বল।

তাঁদের মনেও গুঞ্জন করে চলেছে সেই একই প্রশ্ন। শহরের বর্তমান পরিস্থিতি কি?

খবর নেবার জন্য ইতিমধ্যে ফকির সেন, দীপ্তিমেধা চৌধুরী, অমরেন্দ্র নন্দী প্রমুখ কয়েকজনকে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে একজনও ফিরে আসেনি।

অনন্ত সিংহ বা গণেশ ঘোষেরই বা খবর কি! কোথায় গেলেন তাঁরা!

হঠাৎ কি দেখে অলস দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল ভারপ্রাপ্ত প্রহরী প্রভাস বলের।

নিচে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এঁকে-বেঁকে রেললাইন চলে গেছে বহু দূর পর্যন্ত। যেতে যেতে হঠাৎ ওখানে একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে গেল কেন?

ওটা তো কোন স্টেশন নয়! তবে!

একি! ট্রেন থেকে মিলিটারী নামছে যে! অসংখ্য মিলিটারী! দেখতে

দেখতে একটা চাপা চঞ্চলতা ছড়িয়ে পড়ল এখানে-ওখানে সর্বত্র।

মিলিটারী! মিলিটারী! মিলিটারী!

ঐ যে গাড়ি থেকে নেমে এদিকেই সব এগিয়ে আসছে একটু একটু করে!

প্রস্তুত হও! সংগ্রাম আসন্ন! সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদী সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে দুর্জয় বিপ্লবী শক্তির। দেখা যাক, আজকের এই ঐতিহাসিক সংগ্রামে কে হারে, কে-ই বা জেতে!

—শোন লোকনাথ, আদেশ দিলেন মাস্টারদা সূর্য সেন, সংগ্রাম আসন্ন। এ সংগ্রামে তোমাকেই আমি আজ সর্বাধিনায়কের পদে বরণ করলাম। তুমিই আজ সবাইকে নির্দেশ দাও।

তাই হবে। সসম্ভ্রমে জবাব দিলেন জেনারেল বল, আশীর্বাদ করুন, আমি যেন আপনার দেওয়া এ সম্মানের যোগ্য হতে পারি। গেট্ রেডি! সব নিজ নিজ সেক্সনে গিয়ে লায়িং পোজিশন নাও। মনে রেখো, জয় আমাদের অনিবার্য। আমরা বিপ্লবী। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে আমরা কোনদিনও মাথা নোয়াইনি, আজও নোয়াব না। যে কোন মূল্যে হোক, জয়ী আমরা হবই।

সবাই পোজিশন নিল নিজ নিজ সেক্সনে ফিরে গিয়ে।

গুরু নির্মল সেন, প্রথম শ্রেণীর নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী, এমন কি রিপাবলিকান আর্মির সর্বাধিনায়ক স্বয়ং মাস্টারদা পর্যন্ত তার ব্যতিক্রম নন।

সংগ্রাম আসন্ন। লোকনাথই সেই সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক। তাঁর আদেশ এখন তিনি মেনে নিতে বাধ্য। এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব। এরই জন্য তিনি চট্টগ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার বড় আপনজন—'মাস্টারদা'।

সংগ্রামী তরুণদল প্রস্তুত।

সবার হাতে গুলী-ভর্তি মাস্কেট্রি রাইফেল। সবাই নিশ্বাস বন্ধ করে আছেন আদেশের প্রতীক্ষায়।

ঐ যে ওরা সঙ্গীন উঁচিয়ে ক্রমশই ওপরে উঠে আসছে পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে!

ঐ যে ওরা এসে পড়েছে ধানক্ষেত-সংলগ্ন খোলা জমিটার মাঝখানে! আর ওদের এগুতে দেওয়া উচিত নয়। এই সুযোগ! কখন জেনারেল বল আদেশ দেবেন! কখন!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জেনারেল বলের বজ্রহুঙ্কার শোনা গেল,—হল্ট!

কিংকর্তব্যবিমূঢ় সেনাবাহিনী কিছু বুঝে ওঠার আগেই শোনা গেল সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত কম্যাণ্ড—ফায়ার! ভলি ফায়ার!

একসঙ্গে সব ক'টি মাস্কেট্রি রাইফেল গর্জে উঠল—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

দৌড়! দৌড়! দৌড়। যাকে বলে পড়ি কি মরি দৌড়! কেউ পালাতে সক্ষম হল, আবার কারো কারো দেহ সঙ্গে সঙ্গে নিচে গড়িয়ে পড়ল ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে।

সে কি জয়োল্লাস তখন জালালাবাদ পাহাড় জুড়ে! ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ! সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক! যুদ্ধ না করে পালাচ্ছিস কেন ভীরুর দল? সাহস থাকে তো এগিয়ে আয় না!

ভাবনায় পড়লেন ক্যাপ্টেন টেট্‌, কর্নেল ডালাস স্মিথ, ডি. আই. জি ফারমার প্রমুখ শ্বেতাঙ্গ সমরবিদগণ। ছত্রভঙ্গ ব্রিটিশ বাহিনীকে পাহাড়ের একটা খাদের আড়ালে জড়ো করে নিয়ে শুরু হল তাঁদের মন্ত্রণা-সভা।

এই খোলা ধানক্ষেতটা অতিক্রম না করা পর্যন্ত কোনমতেই ওদের সামনে এগুনোর উপায় নেই। অথচ সে সুযোগ দিতে ওরা একেবারেই নারাজ। কি করা যায় এখন!

কিছুক্ষণের মধ্যেই সামরিক বাহিনী আবার উঠে দাঁড়াল নতুন পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল তাদের ড্রাম আর বিউগল ধ্বনি।

দৌড়ে গিয়ে বেয়নেট চার্জ করতে হবে। সব ক'টাকে এক এক করে গেঁথে ফেলতে হবে। কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না।

সব বৃথা। সঙ্গীন উঁচিয়ে দু'পা এগুতে না এগুতেই আবার শোনা গেল সেই রণহুঙ্কার—ফ্রেন্ডস্‌! ভলি ফায়ার! লোড! ফায়ার! ফায়ার! ফায়ার!

আবার পলায়ন। আবার সেই খাদের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন।

তবে বেশিক্ষণ নয়। একটু বাদেই হঠাৎ দক্ষিণ-পূর্ব কোণের একটা উঁচু পাহাড় থেকে ভেসে এল ভাইকার মেশিনগানের শব্দ—ট্যা-ট্যা-ট্যা-ট্যা—

সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল বল পাহাড়ের ডানদিকে অবস্থিত তরুণদলকে নির্দেশ দিলেন—ফ্রেন্ডস্‌, এনিমি অন দি সাউথ-ইস্ট হিল—এইম্‌—টেন রাউন্ডস্‌ র‍্যাপিড ফায়ার!

সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব কোণের পাহাড় লক্ষ্য করে মাস্কেট্রি রাইফেল আগুন ছড়াল—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

ট্যা-ট্যা-ট্যা-ট্যা—মুহূর্ত বাদেই আর একটি মেশিনগান বৃষ্টিধারার মতো গুলী-বর্ষণ করতে লাগল উত্তর-পূব কোণের একটা পাহাড়-চূড়া থেকে। গোটা জালালাবাদ পাহাড়টাকে যদি উড়িয়ে দিতে হয় তো সে ভি আচ্ছা, তবু ঐ দুরন্ত ছেলেগুলোকে নিশ্চিহ্ন করা চাই-ই!

ইতিমধ্যে ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। সন্ধ্যা নেমে আসছে পাহাড়ের ঢাল গড়িয়ে।

তবু মেশিনগানের গুলী-বর্ষণের এতটুকু বিরাম নেই। ধুলোয় ধুলোয় চারদিক অন্ধকার। গাছ-পালা সব ভেঙে পড়ছে একে একে। তবু বিভিন্ন দিক থেকে একটানা তার গর্জন চলছে—ট্যা-ট্যা-ট্যা-ট্যা—

একদিকে স্বয়ংক্রিয় মেশিনগান, অন্যদিকে মাস্কেট্রি রাইফেল। ·৩০৩ বোরের আর্মি রাইফেল হলে তবু বরং কথা ছিল। তাতে আর কিছু না হোক, একসঙ্গে দশটা করে গুলী ছোঁড়া যেত। কিন্তু মাস্কেট্রি রাইফেলের ক্ষমতা আর কতটুকু!

তবু তাঁরা মৃত্যুভয়ে ভীত নন। মৃত্যু জীবনে একবারই আসে। সবার

জীবনেই আসে। কেউ তাকে এড়াতে পারে না। তাহলে কি লাভ ভীরুর মতো মৃত্যুবরণ করে!

না, সে মৃত্যু তাঁদের কাম্য নয়। তাঁদের একমাত্র কাম্য—বীরের মৃত্যু।

কেটে গেল আরো কিছুক্ষণ।

সাঁই-সাঁই করে গুলী ছুটছে অবিরাম। কেউ কাউকে ছাড়তে রাজী নয়। কেউ হার মানতে রাজী নয়।

হঠাৎ একটা কঠিন সমস্যা দেখা দিল বিপ্লবী তরুণদলের সামনে। ক্রমাগত গুলী-বর্ষণের ফলে রাইফেলের ব্যারেলগুলো অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এমন কি রুমাল দিয়ে পর্যন্ত চেপে ধরা যাচ্ছে না। তাছাড়া কার্তুজগুলোও চেম্বারে ঠিকমতো ঢোকানো যাচ্ছে না। কি ব্যাপার! কেন এমন হল!

সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব নিলেন স্বয়ং মাস্টারদা ও তাঁর সর্বচিন্তার সংগী নির্মল সেন।

সমানে মেশিনগান চলছে। লায়িং পোজিশন থেকে মাথা তোলার উপায় নেই। তাই হামাগুড়ি দিয়ে বুকে হেঁটে এক এক করে তাঁরা সব ক'টি ফ্রন্টে গিয়ে তাঁদের রাইফেলের ব্যারেলগুলোকে পরিষ্কার করে দিতে লাগলেন লুব্রিকেটিং অয়েল দিয়ে।

নাও, এবার চালাও। মনে রেখ—'কাওয়ার্ডস্ ডাই মেনি টাইমস্ বিফোর দেয়ার ডেথস্! দি ভ্যালিয়াণ্ট নেভার টেস্ট অফ ডেথ বাট ওয়ানস্।'

সত্যিই তাই। প্রথমেই তার প্রমাণ দিলেন জেনারেল বলের ছোট ভাই, ১৪ বছরের কিশোর—টেগরা।

দুরন্ত ছেলে। ভয়-ডর কাকে বলে জানেন না। মাঝে মাঝেই তিনি লায়িং পোজিশন থেকে লাফিয়ে উঠে গুলী চালাতে লাগলেন মেশিনগানের অবস্থিতি লক্ষ্য করে।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু কিছুতেই আর তিনি পারলেন না তাঁর অনিবার্য পরিণামকে ফাঁকি দিতে।

হঠাৎ একঝাঁক গুলী এসে নিমেষেই তাঁর গোটা দেহটাকে দিল ঝাঁঝরা করে।

যাবার আগে শুধু একটিমাত্র কথাই তিনি বলে গেলেন শেষবারের মতো—'সোনাভাই (জেনারেল বল), আমি চললাম। তোমরা কিন্তু থেমো না! চালিয়ে যাও।

বিপ্লবী-জীবন অতি কঠোর। তুচ্ছ হৃদয়-বৃত্তির সেখানে কোন স্থান নেই। প্রমাণ, জেনারেল বলের সেদিনের সেই ঐতিহাসিক উক্তি।

মৃত্যুপথযাত্রী ছোট ভাইয়ের শেষ-কথার জবাবে সেদিন তিনি কি বলেছিলেন জান, মল্লিকা?

বলেছিলেন—'কে সোনাভাই? যুদ্ধক্ষেত্রে সোনাভাই বলে কেউ নেই। আমরা সৈনিক। আমাদের একমাত্র কর্তব্য—'ডু অর ডাই'।'

ডু অর ডাই! নতুন করে শপথ নিলেন প্রতিটি বিপ্লবী তরুণ।

জালালাবাদ যুদ্ধের প্রথম শহীদ টেগরাকে আমরা ভুলব না। তাঁর এই মৃত্যুর প্রতিশোধ আমরা নেবই। ডু অর ডাই!

ট্যা-ট্যা-ট্যা-ট্যা-ট্যা—সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পূব কোণের পাহাড়-চূড়া থেকে আরো একটা ভাইকার মেশিনগান গর্জে উঠল নতুন করে।

এবার ঢলে পড়লেন ব্রিগেডিয়ার ত্রিপুরা সেন। একটু পরেই দলের সর্বকনিষ্ঠ সৈনিক নির্মল লালা। তারপরেই বিধু ভট্টাচার্য।

হাস্যরসিক বিধু ভট্টাচার্য। সারাজীবন তিনি সবাইকে হাসিয়ে গেছেন। যাবার সময়ও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। হাসতে হাসতেই তিনি তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু নরেশ রায়কে লক্ষ্য করে বলে গেলেন—'এবার তুই আয়। আমি তোকে রিসিভ করব।'

বন্ধু-বিচ্ছেদ বেশিক্ষণ আর সহ্য করতে হল না নরেশ রায়কে। দেখতে দেখতে তিনিও একসময়ে বিদায় নিলেন নিজের কর্তব্য শেষ করে।

এবার পড়ে গেলেন বিনোদবিহারী দত্ত। তবু বিশ্রাম নেই। তবু ক্লান্তি নেই। গুরুতরভাবে আহত হওয়া সত্ত্বেও তিনি মাস্কেট্রি থেকে সমানে ফায়ার করতে লাগলেন—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! সংগ্রামই সৈনিকের ধর্ম। সেখানে বিশ্রামের অবকাশ কোথায়!

পরবর্তী পালা অর্ধেন্দু দস্তিদারের।

দুরন্ত বেপরোয়া যুবক। মাত্র কিছুদিন আগে তিনি গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন নিজের তৈরি বোমা বিস্ফোরণের ফলে। ভাল করে ঘা পর্যন্ত শুকোয়নি।

তবু সারা গায়ে ব্যান্ডেজ নিয়ে তিনি চলে এসেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে নিজের ভূমিকা পালন করতে। তোমরা যেখানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে চলেছ, সেখানে আমি কি করে পিছিয়ে থাকব, বলো। না, তা হয় না। আমিও থাকব তোমাদের সঙ্গে।

তারপর একে একে গেলেন শশাঙ্ক দত্ত ও মধুসূদন দত্ত। এমনভাবে তাঁদের দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল যে, দেখে আর চেনার কোন উপায় রইল না।

পরবর্তী পালা যুব বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান নায়ক অম্বিকা চক্রবর্তীর। দেখতে দেখতে রক্তে রক্তে ঢেকে গেল তাঁর নাক-মুখ-চোখ-কান সব কিছু। শুধু রক্ত আর রক্ত!

সব শেষে গেলেন মতি কানুনগো, পুলিনবিকাশ ঘোষ, জিতেন্দ্র দাশগুপ্ত আর প্রভাস বল। সহকর্মী বন্ধুরা সবাই চলে গেছেন একে একে। তাঁরাই বা পিছিয়ে থাকেন কি করে!

হঠাৎ পরিস্থিতি জটিল হয়ে দেখা দিল একনিষ্ঠ সৈনিক বনবিহারী দত্তের সামনে। রাইফেলটা অত্যন্ত গরম হয়ে উঠেছে। এমন কি রুমাল দিয়েও আর চেপে ধরা যাচ্ছে না। তাছাড়া চেম্বার জ্যাম। কিছুতেই কার্তুজ ঢোকানো যাচ্ছে না চেম্বারে।

দূরে থেকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করে নিহত প্রভাস বলের পরিত্যক্ত রাইফেলটা নিয়ে বুকে হেঁটে এগিয়ে এলেন স্বয়ং মাস্টারদা। এই নাও। চালাও এবার।

অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল বনবিহারীর। মাস্টারদা! মাস্টারদা! মাস্টারদা! যুব বিদ্রোহের সর্বাধিনায়ক মাস্টারদা! নিজের হাতে তিনি রাইফেল তুলে দিয়েছেন তাঁর হাতে। এতবড় গৌরব তিনি রাখবেন কোথায়!

কিন্তু না, হল না। এটারও সেই একই অবস্থা। চেম্বার জ্যাম। কিছুতেই কার্তুজ ঢোকানো যাচ্ছে না চেম্বারে। একটু লুব্রিকেটিং অয়েল না হলেই নয়।

হঠাৎ কি দেখে চোখ দুটো ধক ধক করে জ্বলে উঠল বনবিহারীর। না, দরকার নেই। এই তো প্রভাস বলের তাজা রক্ত মাখামাখি হয়ে আছে রাইফেলটার গায়ে। শহীদের এই রক্ত দিয়েই লুব্রিকেটিং অয়েলের কাজটা চালানো যাবে কিছুক্ষণের জন্য।

কাজেও তাই করলেন বনবিহারী। রক্ত দিয়ে চেম্বার পরিষ্কার করে নিয়ে পরক্ষণেই আবার তিনি আগুন ছড়াতে শুরু করলেন নতুন উৎসাহে —দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

এবার রুষ্ট বাঘের মতো গর্জে উঠলেন জেনারেল লোকনাথ বল— 'ফায়ার আন্‌টিল দি এনিমি মেশিনগান ইজ কমপ্লিট্‌লি সাইলেন্সড্‌'! ঐ মেশিনগানকে স্তব্ধ করতেই হবে। একটানা চালিয়ে যাও। কেউ থেমো না। ডু অর ডাই!

শুরু হল তীব্র পাল্টা-আক্রমণ। শুধু দ্রাম দ্রাম দ্রাম—কট্‌াক—দ্রাম! যে করে হোক, যে কোন মূল্য দিয়ে হোক, ঐ মেশিনগানকে স্তব্ধ করতেই হবে। আমরা মরব, তবু ঐ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে মাথা নোয়াব না। কিছুতেই না।

সত্যিই তাই হল। শেষপর্যন্ত মেশিনগানকেই সেদিন হার মানতে হল তুচ্ছ মাস্কেট্রি রাইফেলের প্রচণ্ডতার কাছে।

মানতে বাধ্য। কারণ, ভাড়াটে সৈনিক আর সংগ্রামী তরুণদলের মনোবল এক নয়। কোনদিনও তা হতে পারে না।

ওরা দুর্বার, দুর্জয়, মৃত্যুঞ্জয়ী। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। এই সুযোগে মৃত্যুভয়হীন বেপরোয়া ছেলেগুলো যে কখন মরিয়া হয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে কে জানে! তার চাইতে মানে মানে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করাই সব দিক থেকে নিরাপদ।

অন্ধকার। দেখতে দেখতে রাত্রির ঘন অন্ধকার নেমে এল জালালাবাদ পাহাড়ের বুকে।

সবাই ক্লান্ত। সবাই অবসন্ন। যুদ্ধে তাদের জয় হয়েছে, তবু সবার মনে বয়ে চলেছে একটা চাপা বিষাদের সুর।

সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই বিদায় নিয়েছেন একে একে। আর কোনদিনও তাঁরা ফিরে আসবেন না। কোনদিনও তাঁদের সাড়া মিলবে না। তা বলে থেমে গেলে চলবে না। সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে জীবনের শেষ মুহূর্ত

পর্যন্ত। বিপ্লব কোনদিনও থামতে জানে না। এগিয়ে চলাই তাহার সহজাত ধর্ম।

কিন্তু আর জালালাবাদ নয়। আজ শত্রুপক্ষ ফিরে গেলেও কাল যে আবার অধিকতর শক্তি নিয়ে ফিরে আসবে, তা বলাই বাহুল্য! সুতরাং এখানে থাকা আর কোনমতেই উচিত হবে না।

শুরু হল নিহত বীর সেনানীদের গার্ড অফ অনার দেবার পালা। সব ক'টি দেহকে সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে হঠাৎ একসময়ে জেনারেল বল হাঁক দিলেন ঃ

'Comrades in close column of groups, in single rank, fall in !'

খট্-খট্-খট্-খট্...

সঙ্গে সঙ্গে সবাই শ্রেণীবদ্ধভাবে পোজিশন নিলেন রাইফেলের নল নিচু করে। তারপরই একসঙ্গে সবাই মৃত সহকর্মীদের বিপ্লবী অভিনন্দন জানালেন গোটা জালালাবাদ পাহাড় কাঁপিয়ে।

চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ জিন্দাবাদ! বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক! বিদায় বন্ধুগণ, বিদায়! তোমাদের কথা আমরা কোনদিনও ভুলব না। স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে তোমাদের এই নিঃশেষ আত্মবিসর্জনের কথা সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল।

শুরু হল পথ-পরিক্রমা। শুরু হল চড়াই-উৎরাই ভেঙে এগিয়ে যাবার পালা।

চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। দু হাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যায় না। এই অন্ধকারে পথ চলতে গিয়ে কখন যে জেনারেল বল কয়েকজন সঙ্গীসহ মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন, তা টেরও পাওয়া গেল না।

এই প্রসঙ্গে প্রবীণ বিপ্লবী শ্রদ্ধেয় চারুবিকাশ দত্তের লেখা থেকে কয়েকটি লাইন এখানে তুলে ধরছি ঃ

'আবার নিরুদ্দেশ-যাত্রা শুরু হইল। পশ্চাতে পরমপ্রিয়গণের শবদেহ, সম্মুখে অন্ধকার গহন পথ, হৃদয় টানে পিছনে, কর্তব্যের আহ্বান টানে সম্মুখে।

তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইবার উপক্রম। রণক্লান্ত দেহটিকে যেন প্রত্যেকে অতি কষ্টে টানিয়া নামাইয়া লইতেছে। ভারী যুদ্ধ উপকরণসমূহ দেহের আর পাঁচটা অংশের মতোই অপরিহার্য। ইহার উপর রহিয়াছে বিনোদ চৌধুরী ও বিনোদ দত্তের আহত দেহ স্কন্ধে তুলিয়া অবতরণ করিবার আর এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

পাহাড়ের উচ্চাংশ হইতে খানিকটা অবতরণ করিয়াই আর পথ নাই। তাহার পরেই খাড়া পাহাড়। আবার সমতল।

আর ফিরিবার উপায় নাই। নূতন পথ অনুসন্ধানের সময় নাই, চক্ষু বুজিয়া লম্ফ-প্রদান করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

অনুচ্চ কণ্ঠে পশ্চাৎ হইতে লোকনাথ বলিল—ভয় নাই, লাফিয়ে পড়।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। কোলের কাছের মানুষটিকেও চেনা যায় না। অগত্যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের চার-পাঁচজন একসঙ্গে লাফ দিয়া নিচে পড়িতে লাগিল।

ইহারা সকলেই তখন মিনিট কয়েক দাঁড়াইল, কোন্‌দিকে যাইবে ইহাই এখন আশু প্রশ্ন।

কথাবার্তা ফিস ফিস করিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াও বলা হয় না। কণ্ঠনালী যেন শুষ্ক ও রুদ্ধ। কয়েক ঘণ্টার গোলাগুলীর আওয়াজে কানেও তালা লাগিয়াছে।

পাঁচ-সাত মিনিটের ব্যবধান। অগ্রগামী লোকনাথ বল ও তাঁহার সংগীরা অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। পরবর্তী দলে সূর্য সেন সহ আরও কতিপয় সমতলের পথ ধরিয়াই অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

এই সময় মাস্টারদা প্রশ্ন করিলেন—লোকনাথরা কোন্‌ পথে গেল? লোকনাথদের কোন সন্ধান মিলিল না।

আবার পথচলা শুরু হইল। দুর্গম হইতে দুর্গমে আবার যাত্রা শুরু হইল।

ঠিক পশ্চাতেই নেতা সূর্য সেন ও অন্যতম প্রধান নায়ক নির্মল সেন হাত-ধরাধরি করিয়া চলিয়াছেন।

নিজের বলিষ্ঠ দেহের উপর অপেক্ষাকৃত কৃশ ও শীর্ণ মাস্টারদার লঘুভার লইয়া পথ চলাই নির্মলের উদ্দেশ্য।

দলের প্রতিটি ব্যক্তির সুখ-সুবিধা, যোগ্যতা-অযোগ্যতা, অন্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেদনা ও অনুভূতির সঙ্গে এক গভীর আত্মিক যোগ এই মানুষটিরই ছিল।

সবার অগোচরে, সবার মনের চাওয়ার মতো প্রিয় কাজ করিবার প্রেরণাই যেন নির্মলচন্দ্রের জীবনধর্ম—এই জন্যই দলের মধ্যে সর্বাধিক স্নেহময়, প্রেমময়, সবারই আপন এই আপনভোলা নির্মলদা। এই প্রাণময় মানুষটি মাস্টারদার ক্লান্ত দেহটিকেও কৌশলে বহিয়া চলিয়াছেন।

সারারাত্রি ধরিয়া পথ চলিয়া রাত্রি ভোর হইল, পথ শেষ হইল না। দুর্গম পাহাড়ের অপথে-বিপথে ঘুরিয়া-ফিরিয়া মাত্র অর্ধমাইল দূরের এক পাহাড়ে তাঁহারা আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

এই পাহাড়েরই একটি গুহার মধ্যে আশ্রয় মিলিল। দুইজনকে পাহারায় নিযুক্ত করিয়া ক্লান্ত দেহগুলি গুহার মধ্যে এলাইয়া পড়িল।

ঐ অদূরে জালালাবাদ—মাস্টারদা অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন নিষ্ঠুর ঐ বধ্যভূমির দিকে। রাত্রির দুঃস্বপ্নের মতো বিগত দিনের স্মৃতি তাঁহার দেহের ক্লান্তিকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

এক এক সময় চক্ষু দুইটি অস্বাভাবিকভাবে জ্বলিয়া উঠিতেছে। মনের কূলে ভিড় করিয়াছে পরিত্যক্ত শহীদবৃন্দের সহস্র স্মৃতি, যাহা তাঁহার জীবন-ইতিহাসের পাতায় পাতায় সহস্র গাঁথা রাখিয়া গিয়াছে। অম্বিকা

চক্রবর্তী হইতে টেগরা পর্যন্ত প্রত্যেকের মুখচ্ছবি তাঁহার মানসপটে একটির পর একটি জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল।'

সবাই মৃত বলে ধরে নিলেও অম্বিকা চক্রবর্তী কিন্তু তখনো বেঁচে ছিলেন, মল্লিকা। হঠাৎ তাঁর জ্ঞান ফিরে এল শেষরাত্রির দিকে।

কিন্তু কোথায় মাস্টারদা?

কোথায় আপনভোলা নির্মল সেন?

কোথায় লোকনাথ বল প্রমুখ সহকর্মিবৃন্দ? কেউ নেই তাঁর পাশে। কেউ নেই।

দেহ অবশ। সোজা হয়ে দাঁড়ানোর মতো শক্তিটুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই। তবু তিনি পাহাড় থেকে একটু একটু করে নামতে লাগলেন হামাগুড়ি দিয়ে।

ভোর হবার আগেই সেনা বাহিনী ফিরে এসে চারদিক ছেয়ে ফেলবে। তার আগেই এখান থেকে সরে পড়তে হবে। যে করে হোক, মাস্টারদাকে খুঁজে বের করতে হবে।

অনুমান মিথ্যে হল না। পরদিন ভোর হতে না হতেই সেনা বাহিনী জালালাবাদ পাহাড়কে ঘিরে ফেলল চারদিক থেকে।

এবার সংখ্যায় অনেক বেশি। অস্ত্র-শস্ত্রও প্রচুর। যে করে হোক, বিপ্লবীদের ধরা চাই। ধরা চাই তাদের সর্বাধিনায়ক মাস্টারদা সূর্য সেনকে।

কোথায় সূর্য সেন? কোথায় তাঁর একান্ত অনুগত বিপ্লবী তরুণদল?

কেউ নেই। শুধু এগারোটি কিশোর প্রাণ চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে সারিবদ্ধভাবে। আর আছে হাজার হাজার ব্যবহৃত কার্তুজের খোল। তাছাড়া আর কিছুই নেই।

মতি কানুনগো ও অর্ধেন্দু দস্তিদারের দেহে তখনো কিছুটা প্রাণের সাড়া ছিল।

তবে আর বেশিক্ষণ নয়। একটু বাদেই মতি কানুনগো চোখ বুজলেন তাঁর বিপ্লবী সতীর্থদের পথ অনুসরণ করে।

অর্ধেন্দুকে পাঠানো হল হাসপাতালে। সেখানেই তিনি দেহরক্ষা করলেন নিজের কর্তব্য সুসম্পন্ন করে।

শাসকদের মাথায় তখন দুশ্চিন্তার বোঝা। কি করা যায় এখন এই দেহগুলোকে নিয়ে!

শহরে নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। যুবশক্তিকে ঠেকিয়ে রাখা তখন কষ্টকর হবে। তার চাইতে এখানেই ব্যবস্থা করা যাক।

তাই করা হল। শেষপর্যন্ত সব ক'টি দেহ-ই জ্বালিয়ে দেওয়া হল সারা গায়ে পেট্রোল ঢেলে। জালালাবাদ ধন্য হল।

এই প্রসঙ্গে যুব-বিদ্রোহের অন্যতম সেনানায়ক বিপ্লবী অনন্ত সিংহের লেখা থেকে কয়েকটি লাইন তুলে দিচ্ছি:

'আগুন দেওয়া হল। দেখতে দেখতে এগারোটি চিতা দাউ-দাউ করে

জ্বলে উঠল—আকাশ লাল হয়ে গেল। গুর্খা সৈন্য অ্যাটেনশন হয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। ইংরেজ সমর অধিনায়কেরা তাদের টুপি খুলে হাতে নিল। ভারতীয় অফিসারেরা নতমস্তকে বিপ্লবীদের অভিনন্দন জানাল। কারও চোখ জলে ভরে গেল। দেখতে দেখতে আগুনের তীব্র শিখা তাঁদের নশ্বর দেহ পুড়িয়ে ছাই করে দিল।

জালালাবাদ যুদ্ধ ইংরেজের বিরুদ্ধে একগৌরবময় যুদ্ধ। ভারতবাসী কোনদিনও তা ভুলবে না। অন্তিমবার্তা সন্ধ্যার সময় শহরে ছড়িয়ে পড়ল। চট্টগ্রামবাসী শোকাচ্ছন্ন। কত জননী পুত্র হারালেন, কত ভগ্নী ভাই হারিয়েছেন। ঘরে ঘরে দুঃখের ছায়া, আবার গৌরবের চিহ্ন। প্রিয়জনকে হারাবার শোক, আবার জয়ের গর্ব। চট্টগ্রামের বহু ঘরে সেদিন সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলেনি। রান্নাঘর অন্ধকার—উনোনও ধরানো হয়নি।

২২শে এপ্রিল ১৯৩০ সাল, শহীদদের চিতার অগ্নিশিখা চট্টগ্রামের আকাশে লাল অক্ষরে লিখে দিল—সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক! বিপ্লব দীর্ঘ-জীবী হোক'!'

১৯৩০ সাল। ২২শে এপ্রিল। জালালাবাদ যুদ্ধ শেষ হল। এগারোটি শহীদের চিতার আগুন চট্টগ্রামের আকাশে রক্তের অক্ষরে লিখে দিল—চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ জিন্দাবাদ! সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক!

কিন্তু যুব-বিদ্রোহের অন্যতম সেনানায়ক অনন্ত সিংহ তখন কোথায়?

কোথায় জেনারেল গণেশ ঘোষ?

আনন্দ গুপ্ত বা জীবন ঘোষালই বা কোথায়?

অগ্নিদগ্ধ হিমাংশু সেনকে নিয়ে ১৮ই এপ্রিল তারিখে সেই যে তাঁরা মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, তারপর এ পর্যন্ত তাঁদের আর কোন সন্ধানই পাওয়া যায়নি। কোথায় গেলেন তাঁরা?

খবর পাওয়া গেল সেদিনই রাত আটটায়, চট্টগ্রাম থেকে আট মাইল দূরবর্তী পুটিয়ারী রেল স্টেশনে।

হঠাৎ কি দেখে লোভী মনটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল স্টেশনমাস্টার অশ্বিনী ঘোষের।

কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে একটি সুদর্শন কিশোর। অদূরে আরো তিনজন। দেখে মনে হয় নিরীহ গ্রাম্য লোক।

কিন্তু সত্যিই কি তাই?

চাটগাঁয়ে জোর লড়াইয়ের খবর পাওয়া গেছে। তাদের কেউ নয় তো!

নিশ্চয় তাই!

না, এ সুযোগ ছাড়লে চলবে না। ধরিয়ে দিতে পারলে সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে নিশ্চয়ই একটা মোটা টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে। এমন কি, সঙ্গে একটা খেতাব জুটে যাওয়াও বিচিত্র নয়। চাকুরি-জীবনে এ যে আশাতীত সৌভাগ্য!

গাড়ি ইন করতেই গার্ড ফেরেরার কাছে নিজের সন্দেহের কথাটা জানিয়ে দিলেন অশ্বিনী ঘোষ।

শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে তিনি সীতাকুণ্ড, ফেনী, কুমিল্লা, লাকসাম প্রভৃতি স্টেশনে টেলিগ্রাম করে দিলেন অতি তৎপরতার সঙ্গে। এই নম্বরের টিকিটের যাত্রীদের ওপর নজর রাখুন। ওদের হাব-ভাব দস্তুরমত সন্দেহজনক।

হু হু করে ট্রেন ছুটে চলেছে ব্যাকুল মনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

ভেতরে সেই চারজন নিরীহ গ্রাম্য যাত্রী। লক্ষ্য—কলকাতা।

অনেক চেষ্টা করেও মাস্টারদা বা মূল বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। সে আশাও সুদূরপরাহত।

এদিকে ঢাকা এবং কলকাতা থেকে অসংখ্য সৈন্য এসে পড়েছে।

কি লাভ এখানে থেকে শুধু শুধু ধরা দিয়ে ! সুতরাং চল এবার বৃহত্তম কর্মক্ষেত্র কলকাতায়।

রাত দুটোয় ফেনী। স্টেশনে গাড়ি ইন করতেই সঙ্গে সঙ্গে কামরায় ঢুকল বিরাট এক পুলিশ বাহিনী।

দেখি সবার টিকেট। হ্যাঁ, এই যে সেই চারজন। এরাই পুটিয়ারী থেকে গাড়িতে উঠেছে। চল এবার মাস্টারবাবুর ঘরে।

অনন্ত সিং তখন রূপকথার নায়ক। কত গল্প, কত কাহিনীই না সেদিন প্রচলিত ছিল তাঁকে কেন্দ্র করে। তিনি নাকি শুধু হাত দিয়ে নয়, দরকার হলে হাত পা, চোখ কান, সব কিছু দিয়ে রিভলবার চালাতে পারেন, এমনি অনেক জনশ্রুতি।

কথাটা যে একেবারে অত্যুক্তি নয়, তার প্রমাণ পাওয়া গেল একটু বাদেই। জিনিসপত্র সব কিছুই তল্লাশী করে দেখা হয়েছে। এবার শরীর তল্লাশী করার পালা।

প্রথমেই ডাকা হল জীবন ঘোষালকে। দেখি তোমার কোমরে কি আছে !

ব্যস্, আর যায় কোথায় ! সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত সিংহের রিভলবার গর্জে উঠল—দ্রাম ! দ্রাম !

ইঙ্গিত পেয়ে জীবন ঘোষাল আর আনন্দ গুপ্তও আগুন ছড়ালেন—দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম !

প্রাকৃতিক কারণে একটু আগেই দুজন প্রহরীসহ গণেশ ঘোষ গিয়েছিলেন বাইরে। সিগন্যাল পেয়ে তিনিও সাড়া দিলেন—দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম !

শুরু হল চিৎকার চেঁচামেচি আর হৈ-হল্লা। আরে বাস্‌রে বাস ! দিয়েছে কোমরটা একেবারে শেষ করে ! ঐ যে পালাচ্ছে ! ধর ওদের !

সব বৃথা। কাকে ধরবে ! কেউ কোথাও নেই। নিমেষে সব হাওয়া।

বিপদ এল অন্যদিক থেকে। রাত্রির অন্ধকারে ছুটে পালাতে গিয়ে প্রথমেই দলছাড়া হয়ে পড়লেন অনন্ত সিংহ। তারপরে গণেশ ঘোষ।

অবশ্য কিছুক্ষণ পরেই আনন্দ গুপ্ত ও জীবন ঘোষালের সঙ্গে গণেশ ঘোষের আবার যোগাযোগ হয়েছিল, কিন্তু অনন্ত সিংহ সেই যে বিচ্ছিন্ন

হয়ে পড়লেন, তারপর আর কিছুতেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়ে উঠল না।

যোগাযোগ হল কলকাতায়। অনেক পথ ঘুরে ঘুরে চারজনই আবার এখানে এসে মিলিত হলেন একে একে। আশ্রয়ের ব্যবস্থা হল চন্দননগরে।

এ ব্যাপারে যুগান্তর দলের অন্যতম নেতা ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, কিরণ মুখার্জী, কালীচরণ ঘোষ, সুভাষের মেজদা শরৎ বোস ও বি. ভি.-র অন্যতম নায়ক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়ের ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ ব্যাপারে আরো একজন লোক জড়িত ছিলেন বিশেষভাবে। তিনি হলেন চন্দননগরের গোন্দলপাড়ার বিশিষ্ট বিপ্লবী বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। চন্দননগরে পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দেবার ব্যাপারে তাঁর অবদান ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য।

২৪শে এপ্রিল তারিখে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন অমরেন্দ্র নন্দী।

অমরেন্দ্র নন্দীর কথা তোমাকে আগেই বলেছি। মাস্টারদার নির্দেশ—শহরে গিয়ে কাউকে ওখানকার পরিস্থিতি জেনে আসতে হবে। কাকে পাঠানো যায় এ কাজের ভার দিয়ে? হ্যাঁ, তুমিই যাও অমরেন্দ্র। ফিরে এসে সব কিছু আমার কাছে রিপোর্ট কর।

কিন্তু ফিরে আসা আর হল না, মল্লিকা। তার আগেই তিনি চারদিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেন পুলিশ ও মিলিটারীর বেষ্টনীর মাঝে।

যাকে বলে সপ্তরথী বেষ্টিত বীর বালক অভিমন্যু। একদিকে পুলিশ ও মিলিটারী বাহিনীসহ ক্যাপ্টেন টেট, ডি. আই. জি. ফারমার প্রমুখ সমর-বিদগণ, অন্যদিকে অমরেন্দ্র একা। তবু ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির সৈনিক হয়ে কোনরকমেই তিনি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করতে রাজী নন।

শেষপর্যন্ত আশ্রয় নিলেন একটা কালভার্টের নিচে। দু হাতে দুটি গুলী-ভর্তি রিভলবার। আসুক না পুলিশ বা মিলিটারী, হাতে যখন অস্ত্র রয়েছে, তখন ভয় কি!

—এখনো আত্মসমর্পণ কর। বার বার আবেদন জানাতে লাগল শ্বেতাঙ্গ সমরবিদগণ, কোন ভয় নেই তোমার। অস্ত্র ফেলে দাও। চুপ করে থেকো না। জবাব দাও।

জবাব দিলেন গুলীর মুখে—দ্রাম! দ্রাম! ব্যস্, সব শেষ। আত্মসমর্পণ করার চাইতে শেষপর্যন্ত তিনি ইচ্ছামৃত্যুই বরণ করে নিলেন বীরের মতো, তবু কিছুতেই এতটুকু মাথা নোয়ালেন না সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের কাছে।

মাস্টারদা তখন আশ্রয় নিয়েছেন দলের একান্ত শুভার্থী কোয়েপাড়া নিবাসী বিনয় সেনের বাড়িতে।

যুদ্ধশেষে জালালাবাদ পাহাড় থেকে নিচে নামতে গিয়ে কিছু-সংখ্যক সঙ্গীসহ জেনারেল বল যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, সেকথা তোমাকে আগেই বলেছি। খোঁজ-খবর নিয়ে এবার তাঁরাও এসে আবার মাস্টারদার পাশে জড়ো হলেন একে একে।

শুরু হল মন্ত্রণা-সভা। কি করা যায় এখন? থামলে চলবে না। আঘাতের পর আঘাত হানতে হবে। শক্ত আঘাত।

রজত সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, স্বদেশ রায়, মনোরঞ্জন সেন, সুবোধ চৌধুরী, ফণীন্দ্র প্রমুখ তরুণদল তখন উন্মত্ত, বেপরোয়া। রক্ত চাই! রক্ত দিয়েই আমরা স্মৃতি-তর্পণ করব জালালাবাদ পাহাড়ের সেই শহীদদের উদ্দেশে।

শেষপর্যন্ত তাঁরা ধরে বসলেন যুব-বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক, দলের ছোট-বড় সবার প্রিয় নির্মল সেনকে। মাস্টারদাকে আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন, নির্মলদা! আমরা অনুমতি চাই।

অনুমতি পাওয়া গেল ৫ই মে তারিখে। মাস্টারদা ও নির্মলদাকে প্রণাম করে যথাসময়ে ছয় বন্ধু বেরিয়ে পড়লেন অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে। ইয়োরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করে ওদের রক্ত দিয়েই আজ শহীদদের রক্তের ঋণ শোধ করতে হবে। কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না।

না, সুবিধে হল না। চারিদিকে সশস্ত্র মিলিটারী। কার সাধ্য তাদের ঐ কঠোর বেষ্টনী ভেদ করে এক পা এগিয়ে যায়! সুতরাং আজকের মতো প্রোগ্রাম স্থগিত রাখা ছাড়া কোন উপায় নেই।

কিন্তু সামনেই রজতদের বাড়ি। রজতের মা বিনোদিনী দেবী দলের ছোট-বড় সবার মা। এই সেদিনও তিনি অনন্তদা, গণেশদা ওঁদের বুক দিয়ে আড়াল করে রেখেছিলেন পুলিশ ও মিলিটারীর হিংস্রতার হাত থেকে। এই ফাঁকে ওখানে গিয়ে ঐ চট্টলজননীর পা দুটিতে মাথাটা একবার ঠেকিয়ে আসা যায় না!

—তুই! এতদিন পরে হারানো নিধিকে বুকে পেয়ে আনন্দে ও আবেগে চোখে জল এসে গেল বিনোদিনী দেবীর, আয় বাবা। সবাই বোস এখানে।

—আমার ওপর তুমি রাগ করনি তো মা! প্রণাম করতে গিয়ে আদুরে গলায় বললেন রজত।

—রাগ! চট্টলজননীর সারামুখে মুগ্ধ সম্ভ্রমের বিহ্বলতা, পাগল ছেলে! আমি কি তোদের ওপর রাগ করতে পারি কখনো! তোদের মা বলে আজ আমার কত গর্ব সে শুধু আমিই জানি। শুধু কি আমার? তোরা যে আজ সারা দেশের গর্বের বস্তু বাবা!

—বড্ড খিদে পেয়েছে মা! কিছু খাবারের ব্যবস্থা করে দাও না!

—দিচ্ছি বাবা। তোরা একটু বোস। আমি এখুনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

খাবার প্রস্তুত। দেখে প্রতিটি তরুণ খুশিতে ভরপুর। মায়ের নিজের হাতের তৈরি খাবার। সংসারে কোথাও যে এর তুলনা নেই!

খাওয়া কিন্তু আর হল না, মল্লিকা। তার আগেই বাইরে প্রহরারত রজতের ছোট ভাই এসে জানাল—দাদা, কুইক। পুলিশ আসছে।

পুলিশ! সঙ্গে সঙ্গে সবাই সোজা হয়ে দাঁড়ালেন উদ্যত রিভলবার হাতে নিয়ে। মাকে প্রণাম করে পরক্ষণেই তাঁরা পেছনের দরজা দিয়ে অন্ধকারে মিশে গেলেন একে একে। আর তাঁদের দেখা গেল না।

পুলিশ বাহিনী অবাক। আশ্চর্য, কেউ নেই! কিন্তু খবর তো মিথ্যে নয়! তাহলে গেল কোথায় ওরা?

ওঁরা তখন কর্ণফুলী নদীর মাঝ-বরাবর। লক্ষ্য—ওপারে যাওয়া। সাম্পানে চেপে কোনরকমে একবার ওপারের মাটিতে পা দিতে পারলে আর পায় কে!

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ বাহিনী তৎপর হয়ে উঠল দ্রুতগামী একটা মোটর-লঞ্চ নিয়ে।

চালাও জোরসে! ঐ যে সার্চলাইটের আলোতে ওদের সাম্পান দেখা যাচ্ছে! ফলো কর ওদের। তবে নিরাপদ দূরত্বের ব্যবধান রেখে। ওদের বিশ্বাস নেই। হয়তো ঠাঁই করে একখানা ঝেড়ে দিয়ে কপাল ফুটো করে দেবে। খুব সাবধান!

—সাম্পান থামাও! সার্চলাইট জেবলে বার বার সংকেত জানাতে লাগল পুলিশ বাহিনী, এক্ষুণি, মুখ ফেরাও সাম্পানের।

জবাব না দিয়ে আরো তীব্রগতিতে এবার সাম্পান ছুটে চলল তীরের দিকে। মৃত্যুকে তাঁরা থোড়াই পরোয়া করেন, তা বলে বিনাযুদ্ধে ধরা দিতে কোনরকমেই তাঁরা প্রস্তুত নন।

ওপারে পৌঁছে পুলিশ বাহিনী হতভম্ব। আশ্চর্য, কেউ কোথাও নেই! যেন হাওয়ায় মিশে গেছে ছেলেগুলো।

ইতিমধ্যে অসংখ্য মিলিটারী-সহ সদর থানা ইনচার্জ আজিম খাঁ সাহেব, ডি. এস. পি. আসানুল্লা, পটিয়ার দারোগা, কর্ণেল ডেলাস্মিথ, ডি. আই. জি. ফারমার, ম্যাকডেনাল্ড, হেম দারোগা প্রমুখ সবাই ওপারে পৌঁছে গেছে একে একে।

বিপ্লবীদের হদিশ না পেয়ে এবার শুরু হল সেই চিরাচরিত কূটনৈতিক খেলা। অর্থাৎ, এ অঞ্চলের সহজ সরল মুসলমানদের ডাকো। তাদের বলো যে, তোমাদের গাঁয়ে ডাকাত পড়েছে। ধরিয়ে দিতে পরলে মোটা টাকা পুরস্কার।

কাজেও তাই হল। সঙ্গে সঙ্গেই রব উঠল—ডাকাত! ডাকাত! ঐ যে ওদিকে গেছে! ধর ওদের!

বাধা পেয়ে মুহূর্তে রিভলবার আগুন ছড়াল—দ্রাম! দ্রাম! পথ ছেড়ে দাও, ভাইসব। আমরা ডাকাত নই। তোমাদের কোন ক্ষতি আমরা করব না। আমাদের দুশমণ ইংরেজ, তোমরা নও।

কে কার কথা শোনে! ইতিমধ্যে গুলীর আঘাতে কয়েকজন ধূলিশয্যা নিয়েছে, তবু তাদের মুখে সেই একই কথা—ওরা ডাকাত। ওদের ধরতে পারলে অনেক টাকা পুরস্কার মিলবে।

অচেনা অজানা পরিবেশ। পথ-ঘাট সম্বন্ধেও কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই। তদুপরি চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুহাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যায় না।

সংঘর্ষে আহত হয়ে প্রথমেই ধরা পড়লেন সুবোধ চৌধুরী। তারপরে

ফণীন্দ্র নন্দী। বাকি চারজন জলধা গাঁয়ে ঢুকে পড়লেন গলীর মুখে পথ পরিষ্কার করে।

পূব আকাশে রঙ ধরেছে। অন্ধকার তরল হয়ে আসছে একটু একটু করে।

তিনদিন খাওয়া নেই। তৃষ্ণার জলটুকু পর্যন্ত জোটেনি কোথাও। হাত-পা যেন অবশ হয়ে আসছে ক্রমশ। কিছু খাবার না পেলে আর এক পা-ও এগুনো সম্ভব নয়।

সামনেই একটি মুসলমান গৃহস্থ-বাড়ি। দরজায় দাঁড়িয়ে জনৈকা বৃদ্ধা।

নিরুপায় হয়ে সবাই এবার এগিয়ে গিয়ে আবেদন জানালেন—আমাদের দুটি পান্তাভাত খেতে দেবে মা? আমরা তিনদিন কিছু খাইনি।

মা! অদ্ভুত একটা মমতায় মুখখানি কোমল হয়ে উঠল বৃদ্ধার।

সারারাত ধরে গাঁয়ে গোলাগুলী চলেছে। বলতে গেলে গোটা গাঁ-টাকেই মিলিটারী ঘেরাও করে রেখেছে চারদিক থেকে।

এ অবস্থায় আগন্তুকদের পরিচয় অনুমান করে নিতে মোটেই দেরি হল না তাঁর। তবু সব কিছু জেনেও ঐ 'মা' সম্বোধনটির চিরন্তন দাবীকে কিছুতেই তিনি পারলেন না উপেক্ষা করতে। তাই মায়ের মতো করেই বললেন—আমি এখুনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তবে তোরা আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকিস নে বাপধন। ঐ শরবনে গিয়ে গা-ঢাকা দে। আমি একটু পরেই খাবার নিয়ে আসছি।

এত সাধের খাবার কিন্তু এবারও তেমনি হাতেই ধরা রইল, মল্লিকা। তার আগেই কে একজন বাইরের লোক আত্মগোপনকারীদের দেখে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল—'ঐ যে ওরা ওখানে লুকিয়ে রয়েছে!'

সঙ্গে সঙ্গে এখানে-ওখানে পুলিশের সাঙ্কেতিক বাঁশি একটানা বেজে চলল বহুক্ষণ পর্যন্ত। আসামীদের সন্ধান মিলেছে। সবাই চলে এস এদিকে। প্রস্তুত হও। লড়াই আসন্ন।

বেষ্টনী ছোট হয়ে এল ক্রমশ। রাইফেল আর মেশিনগান-সহ সামরিক বাহিনী বুকে হেঁটে এগুতে লাগল একটু একটু করে। যেন রীতিমত একটা যুদ্ধক্ষেত্র আর কি!

শরবনে আত্মগোপনকারী রজত, স্বদেশ, মনোরঞ্জন ও দেবপ্রসাদ তখন প্রস্তুত। হাতে উদ্যত রিভলবার। প্রাণ যায় যাক, তবু আত্মসমর্পণ করে চট্টলের গৌরবময় ইতিহাসকে তাঁরা কলঙ্কিত হতে দিতে রাজী নন।

ডি. আই. জি. ফারমারের নির্দেশে এবার হেম দারোগা চোঙা মুখে দিয়ে জানাল তার শেষ আদেশ—হাতের অস্ত্র ফেলে দাও। এভাবে যুদ্ধ করার একমাত্র অর্থ মৃত্যু। তার চাইতে আত্মসমর্পণ কর।

কি জবাব এল জান, মল্লিকা? জবাব এল মনোরঞ্জনের কণ্ঠে—'মনোরঞ্জন ডাজ্ নট নো হাউ টু সারেন্ডার। আই ওয়াণ্ট টু বি যতীন মুখার্জী অফ বালাসোর'।

সঙ্গে সঙ্গেই শরবন থেকে শুরু হল গুলী-বৃষ্টি—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

শুরু হল ঐতিহাসিক কালারপোল যুদ্ধ।

সামরিক বাহিনীর বিরাট সমর-সম্ভারের বিরুদ্ধে চারটে রিভলবার আর কতক্ষণ! কিছুক্ষণের মধ্যেই গুলী শেষ। তবে কি আত্মসমর্পণ! না, কিছুতেই নয়।

সহসা শরবন থেকে ভেসে এল একজনের দীপ্ত কণ্ঠস্বর—'প্রাণ থাকতে কিছুতেই আমরা ধরা দেব না। দেবুকে আমি গুলী করছি, তারপর তুই আমাকে গুলী কর রজত। এমনি করে আমরা একে অন্যকে গুলী করে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেব, তবু ঐ ঘৃণিত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে কোনরকমেই আত্মসমর্পণ নয়। রেডি প্লীজ! ওয়ান-টু-থ্রি—'

দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

স্বদেশ, মনোরঞ্জন ও রজত সঙ্গে সঙ্গেই শেষ। দেবপ্রসাদও আর বেশিক্ষণ নয়। তাঁরও সময় আসন্ন।

প্রভুর নির্দেশে দেবপ্রসাদের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল হেম দারোগা—আপনি কি কিছু বলতে চান? বড়সাহেব এখানেই রয়েছেন। ইচ্ছে হলে তাঁকে বলতে পারেন।

আরে বাস্‌রে! যাকে বলে একেবারে আসল কাল-কেউটের বাচ্চা! মৃত্যু-পথযাত্রী দেবপ্রসাদ কি উত্তর দিলেন, শুনবে মল্লিকা?

না, নিজের কোন কথা নয়। বাবা মা ভাই বোন কারো কথাই নয়। বললেন তাঁর একটি মাত্র অন্তিম বাসনার কথা—'কে বড়সাহেব! লোম্যান? হাতটা জখম হয়ে পড়েছে, নইলে এক্ষুণি আমি তাকে গুলী করতাম।'

কি নির্ভীক উক্তি! কল্পনাও বুঝি করা যায় না। তবে দেবপ্রসাদের সেই অন্তিম বাসনা কিন্তু বেশিদিন অপূর্ণ থাকেনি, মল্লিকা। মাস তিনেক বাদেই পুলিশের হর্তা-কর্তা-বিধাতা সেই লোম্যানকে একদিন শেষশয্যা নিতে হয়েছিল এই বাংলাদেশেরই মাটিতে। সেকথা পরে আসছে।

এপ্রিল শেষ। মে-ও যায় যায়।

ইতিমধ্যে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর তৎপরতার ফলে যুব-বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ কেউ ধরা পড়েছেন।

কিন্তু কোথায় সেই মহাবিপ্লবী সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন?

কোথায় তাঁর সর্ব চিন্তা, সর্ব কার্যের সঙ্গী নির্মল সেন?

গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, অম্বিকা চক্রবর্তী, লোকনাথ বল প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই বা কোথায়? তাঁরা বাইরে থাকা পর্যন্ত কোনরকমেই যে সরকার বাহাদুরের নিশ্চিন্ত হবার যো নেই!

অঘটন ঘটল ২৮শে জুন তারিখে।

হঠাৎ সেদিন অনন্ত সিংহ স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করলেন গোয়েন্দা-বিভাগের হেড কোয়ার্টার্স ইলিসিয়াম রো-তে গিয়ে। সঙ্গে সেই লোম্যানকে উদ্দেশ্য করে লেখা একখানি চিঠি। তাতে লেখা রয়েছে ঃ

'প্রিয় মিঃ লোম্যান,

১৯৩০ সালের ২৮শে জুন আমি তোমার সংগে দেখা করব। আমি নিশ্চিন্ত যে, আমাকে গ্রেপ্তার করার সে সুযোগ তুমি হারাবে না। আমি তার জন্য প্রস্তুত। মনে কর না যে, আমি আত্মসমর্পণ করছি। লোকে কখন আত্মসমর্পণ করে ? যখন সে একান্ত অসহায়, বা আত্মরক্ষার কোন পথ পায় না, তখনই সে নত হয়।

আমি কি এখন অসহায় ? না, কখনোই না। আমার আত্মরক্ষার অস্ত্র আছে, খরচ করার মতো প্রচুর অর্থ আছে, সহায়তা করার মতো লোকও আছে। বাংলা, বাংলার বাইরে বা ভারতের বাইরে থাকবার মতো আশ্রয়ও আছে। তবু যে ধরা দিচ্ছি, তার কারণ কি ? তুমি কি ভেবেছ আমার কাজের জন্য আমি অনুতপ্ত ? না, কখনোই না। আমি একবিন্দু দুঃখিত নই। তবে কি উপর থেকে আমার ওপর কোন আদেশ এসেছে ? না, এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং সম্পূর্ণ গোপনীয়।

বিদ্রোহী অনন্তলাল সিংহ।'

খবর শুনে সে কি প্রচণ্ড আলোড়ন সেদিন সারা দেশ জুড়ে! সবার মুখে একই প্রশ্ন। কি ব্যাপার ?

অমরেন্দ্র, রজত, স্বদেশ, মনোরঞ্জন, দেবপ্রসাদের মতো ছেলেরা যেখানে আত্মসমর্পণ করার চাইতে আত্মবিসর্জন দেওয়াটাকেই শ্রেয় বলে মেনে নিয়েছেন, সেখানে অনন্ত সিংহের মতো একজন প্রথম শ্রেণীর নেতা এভাবে স্বেচ্ছায় ধরা দিতে গেলেন কেন ?

এর পেছনে অন্য কোন প্ল্যান নেই তো ?

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সিংহের নিজের লেখনী থেকেই এ প্রশ্নের জবাব মিলেছে, মল্লিকা। তিনি জানিয়েছেন—না, কোন প্ল্যানই সেদিন তাঁর ছিল না। ওটা তাঁর নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার। তার সঙ্গে যুব-বিদ্রোহের কোনই সম্পর্ক নেই। সুতরাং এ প্রসঙ্গ এখানেই থাক।

তবে অন্য দিক থেকে তাঁর এই আত্মসমর্পণের ব্যাপারটা যে খুবই ফল-প্রসূ হয়েছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

ধৃত বন্দীদের মধ্যে কয়েকটি অপরিণত বয়স্ক বালক ইতিমধ্যেই কিছুটা স্বীকারোক্তি করেছিল পুলিশের কাছে। প্রিয় নেতা অনন্তদাকে কাছে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আবার তাদের মুখে শোনা গেল উল্টো সুর।

না, ও স্বীকারোক্তি আমরা স্বেচ্ছায় দিইনি। পুলিশ জোর করে আদায় করে নিয়েছিল আমাদের কাছ থেকে।

নিঃসন্দেহে এ কৃতিত্ব অনন্ত সিংহের। তিনিই যে সেদিন এ অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিলেন, কোনমতেই তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

এবার পাড়ি দিলেন লোকনাথ বল।

মাস্টারদার নির্দেশে প্রথমেই তিনি এলেন কলকাতায়। তারপর চন্দন-নগরের সেই গোপন আস্তানায়।

লোকনাথ বল সম্বন্ধে মাস্টারদার এই সিদ্ধান্তের যথেষ্ট কারণ ছিল, মল্লিকা।

প্রথমত ব্যায়ামবিদ হিসেবে লোকনাথ বল চট্টগ্রামে অত্যন্ত সুপরিচিত। তদুপরি যেমন সুঠাম চেহারা, তেমনি ফুটফুটে গায়ের রঙ। হঠাৎ দেখলে সুভাষ বোস বলে ভুল হয়। এ অবস্থায় দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে থাকা তাঁর পক্ষে সত্যিই কষ্টকর।

তবে বেশিদিন আর থাকতে হল না।

তারিখটা ছিল ১৯৩০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর। হঠাৎ সেদিন শেষরাত্রে কলকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট গোটা বাড়িটাকে ঘিরে ফেললেন কোন এক অজ্ঞাত সূত্র থেকে খবর পেয়ে। তারপরই উভয়পক্ষ থেকে শুরু হল একটানা রিভলবার-গর্জন।

বিরাট পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে সামান্য চারটে রিভলবার আর কতক্ষণ! তাই তীব্র সংঘর্ষের পরে লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, আনন্দ গুপ্ত সবাই ধরা পড়লেন একে একে।

স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করে এতকাল যাঁরা তাঁদের সব কিছু থেকে আড়াল করে রেখেছিলেন, সেই শশধর আচার্য ও সুহাসিনী গাঙ্গুলীও রেহাই পেলেন না।

হারিয়ে গেলেন শুধু একজন। তিনি হলেন জীবন ঘোষাল। বলতে গেলে গোটা দেহটাই তাঁর ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল বুলেটের আঘাতে।

৯ই অক্টোবর ধরা পড়লেন অম্বিকা চক্রবর্তী। তখনো তিনি পুরো-পুরি সুস্থ নন। জালালাবাদ যুদ্ধের সেই গভীর ক্ষতচিহ্ন তখনো মিলিয়ে যায়নি তাঁর দেহ থেকে।

এদিকে মাস্টারদা তখন প্রস্তুত। একটা অত্যন্ত জরুরী খবর পাওয়া গেছে গোপন সূত্র থেকে।

খবরটা হল পুলিশ বিভাগের সর্বময় কর্তা মিঃ ক্রেগের গতিবিধি সম্বন্ধে। যাকে বলে একবারে পাকা খবর। সুতরাং এ সুযোগ হারালে চলবে না।

চট্টগ্রামের জনসাধারণের ওপর যে অমানুষিক নির্যাতন চলছে তার প্রায়শ্চিত্ত এবার তাকে করতেই হবে।

এগিয়ে এলেন দলের অতি দায়িত্বশীল কর্মী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস। এবার আমার পালা। বোমা ফেটে আহত হবার দরুন সেদিন আমি যুব-বিদ্রোহে যোগ দিতে পারিনি। তা বলে এবার আমি পিছিয়ে থাকতে রাজী নই।

যথাসময়ে রামকৃষ্ণ ট্রেনে চেপে বসলেন সহকর্মী কালীপদ চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে। লক্ষ্য—চাঁদপুর। ক্রেগ-এরও লক্ষ্য সেই চাঁদপুর। সুতরাং অসুবিধার কিছু নেই।

১লা ডিসেম্বর। শেষরাত্রি। প্রচণ্ড কুয়াশা পড়েছে বাইরে। দুহাত দূরের জিনিসও ভাল করে নজরে পড়ে না।

গাড়ি চাঁদপুরে ইন করতেই ত্রস্তে দুজন এগিয়ে গেলেন প্রথম শ্রেণীর

কামরার দিকে। এই সুযোগ, এই অপূর্ব সুযোগটিকে কাজে লাগাতে হবে।

কে ওখানে বসে আছে ওভারকোট গায়ে দিয়ে! ক্রেগ না! হ্যাঁ, তাই তো!

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল দুজনের অগ্নি-বর্ষী রিভলবার—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

শুরু হল হৈ-চৈ চিৎকার আর চেঁচামেচি। ঐ যে ছুটে পালাচ্ছে! ধর ওদের! সব বৃথা। দেখা গেল, কেউ কোথাও নেই।

আরো দেখা গেল যে, নিহত ব্যক্তি ক্রেগ নন, রেল ইন্সপেক্টর তারিণী মুখার্জী। তবে হঠাৎ দেখে বোঝা মুশকিল। বেশ সাদৃশ্য রয়েছে দুজনের চেহারায়।

সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে গেল কুমিল্লা, লাকসাম, চট্টগ্রাম ও এখানে-ওখানে সর্বত্র। চারদিকে কড়া নজর রাখ। একটি প্রাণীও যেন পুলিশের বেড়া-জাল থেকে বেরিয়ে যেতে না পারে। সন্দেহজনক কিছু দেখলেই আটক করবে। যে করে হোক, আততায়ীদের ধরা চাই-ই!

পরদিনই সে খবর প্রকাশিত হল সংবাদপত্রের পাতায়ঃ

গুলীর আঘাতে ইন্সপেক্টর নিহত
চাঁদপুর স্টেশনে বিষম ব্যাপার

'চাঁদপুর, ১লা ডিসেম্বর। অদ্য খুব সকালে চাঁদপুর রেলওয়ে স্টেশন প্ল্যাটফর্মে রেলওয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টর বাবু তারিণী মুখোপাধ্যায় গুলীর আঘাতে নিহত হইয়াছেন। ২নং ডাউন সুর্মা মেলের সম্মুখে বাংলা পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ ক্রেগকে অভ্যর্থনা করিতে যাইয়াই তারিণীবাবু নিহত হইয়াছেন। তিনি পুলিশের ইউনিফর্ম পরিহিত ছিলেন এবং ঘটনার অব্যবহিত পরেই আহত অবস্থায় হাসপাতালের দিকে নেওয়া হইলে পথিমধ্যেই তিনি মারা যান।

স্থানীয় পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে। অপরাধীদের সন্ধানের জন্য সমস্ত স্থানে খানাতল্লাস হইতেছে, কিন্তু এ পর্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।' [আনন্দবাজার, ২রা ডিসেম্বর, ১৯৩০]

তৎপরতা ব্যর্থ হল না। পরদিন দুজনেই ধরা পড়লেন পুলিশের হাতে। মৃত্যুর পূর্বে একটি খবর কিন্তু জানিয়ে যেতে ভুল করেননি তারিণী মুখার্জী। আততায়ীদের একজনের গায়ে নীল রঙের আলোয়ান ছিল। এই নীল রঙের আলোয়ানই কাল হয়ে দাঁড়াল শেষপর্যন্ত।

সংবাদপত্র থেকেই সেই গ্রেপ্তারের বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছিঃ

'চাঁদপুর স্টেশনে ইন্সপেক্টর তারিণীনাথ মুখার্জীর হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে গতকল্য অপরাহ্ণ ১ ঘটিকার সময় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় দুইজন বাঙালী যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদের নিকট তিনটি গুলী-ভরা রিভলবার

একটি আস্ত বোমা, কতকগুলি কার্তুজ এবং কয়েকটি বৈদ্যুতিক মশাল পাওয়া গিয়াছে।

তাহাদের গায়ে রঙীন চাদর ছিল এবং তাহারা চাঁদপুর হইতে লাকসামের দিকে আসিতেছিল।

যুবক দুইটির নাম রামকৃষ্ণ বিশ্বাস এবং কালীপদ চক্রবর্তী। তাহারা নাকি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার ফেরারী আসামী। তাহাদের কুমিল্লায় আনয়ন করা হইয়াছে।' [আনন্দবাজার, ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৩০]

বিচারে রামকৃষ্ণের হল প্রাণদণ্ড, আর বয়স কম বলে কালীপদ চক্রবর্তীকে দেওয়া হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

যথাসময়ে রামকৃষ্ণ একদিন জীবন উৎসর্গ করলেন ফাঁসিমঞ্চে, কিন্তু যাবার আগে তাঁর অপূর্ব সংগঠন শক্তির এমন একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেলেন, যা অগ্নিযুগের ইতিহাসে আজও আপন দীপ্তিতে দীপ্যমান হয়ে আছে।

সেই উজ্জ্বল রত্নটি হলেন—প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার।

এই প্রীতিলতাই সেদিন ছোট বোন অমিতা পরিচয়ে রামকৃষ্ণের সংগে দেখা করতেন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে গিয়ে। শুধু একদিন নয়, দিনের পর দিন।

পুলিশ কোনদিন তা জানতে পারেনি। জেনেছিল অনেক পরে। তখন সব শেষ।

রামকৃষ্ণের ফাঁসির পরেই প্রীতিলতা কলকাতার জীবন শেষ করে চট্টগ্রাম ফিরে গেলেন দুর্জয় একটা সংকল্প বুকে নিয়ে। যে করে হোক, মাস্টারদার সংগে একবার পরিচিত হতে হবে। তাঁকে যে বড্ড প্রয়োজন!

বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। যথাসময়ে একদিন তিনি মাস্টারদার পদপ্রান্তে হাজির হয়েছিলেন ছোট্ট একটি দাবী নিয়ে। এবার আমাকে একটা সুযোগ দিন মাস্টারদা! শুধু একটা সুযোগ!

চট্টগ্রামে তখন পুরোপুরি পুলিশ ও মিলিটারীর রাজত্ব চলছে। গাঁয়ে গাঁয়ে কত যে অস্থায়ী ছাউনি গড়ে উঠেছে, তার বোধহয় কোন গোনাগুন্তি নেই।

জনসাধারণ তটস্থ। বিশেষ করে বালক, কিশোর ও যুবকদের তো কথাই নেই। সবার জন্য আলাদা আলাদা পরিচয়-পত্র। এই পরিচয়-পত্র ছাড়া কারো পক্ষে এক পা বাইরে যাবার উপায় নেই। তাও একরকম নয় লাল-নীল-সাদা এমনি বিভিন্ন রকমের পরিচয়-পত্র।

সংবাদপত্র থেকেই তার কিছুটা বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি। এই বিবরণ থেকেই তুমি বুঝতে পারবে যে, চট্টগ্রামবাসীকে সেদিন কিভাবে জীবনযাপন করতে বাধ্য করা হয়েছিল। তাও একদিন দু দিন নয়, বছরের পর বছর ধরে :

'গতকল্য ১৪৪ ধারা জারির পর হইতে বিভিন্ন কেন্দ্রে সামরিক প্রহরী মোতায়েন করা হইয়াছে। গত রাত্রি হইতে বড় বড় রাস্তাগুলি দিয়া সাঁজোয়া গাড়ি টহল দিয়া বেড়াইতেছে।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একখানা আদেশ জারি করিয়া জনসাধারণকে রাত্রি

১০টার পর বিশেষ অনুমতি লইয়া বাড়ির বাহির হইতে নির্দেশ দিয়াছেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অশান্তি নিবারণের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন।' [আনন্দবাজার, ২৫শে এপ্রিল, ১৯৩১]

কঠোর ব্যবস্থার নমুনা পাওয়া গেল মাত্র তিনদিন বাদেই।

চট্টগ্রামে সামরিক সতর্কতা

মোড়ে মোড়ে মেসিন কামান সজ্জা

'...কমিশনারের ভবনে একটি সভা হয়। কর্তৃপক্ষ সে সভায় যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল তাহা মানিয়া লইয়াছেন। ...দায়িত্বসম্পন্ন পুলিশ কর্মচারীরা এখন মোড়ে মোড়ে যে সব পাহারা মোতায়েন আছে, সেই সব স্থানে উপস্থিত থাকেন।

রাস্তার লোকজনের উপর খানাতল্লাস এখনও চলিতেছে এবং লোহার কাঁটা বসান তক্তা দিয়া রাস্তার মাঝে মাঝে এখনও বেড়া দেওয়া আছে, ভীষণ-দর্শন মেসিন কামানসমূহ আন্তাকালী পাহাড়ের উপরিস্থ বাড়িগুলির উপরে এবং পল্টনে বুলফ ব্রাদার্সের বাড়ির উপরে এবং সামরিক হিসাবে গুরুত্ববিশিষ্ট অন্যান্য মোড়ে বসান হইয়াছে।'

[আনন্দবাজার, ২৮শে এপ্রিল, ১৯৩২]

ওদিকে তখন শুরু হয়েছে মামলা। আসামী মোট বত্রিশ জন।

॥ গণেশ ঘোষ ॥ অনন্ত সিংহ ॥ লোকনাথ বল ॥ হেরম্ব বল ॥ আশুতোষ ভট্টাচার্য ॥ সুকুমার ভৌমিক ॥ অর্ধেন্দু গুহ ॥ ফণীন্দ্র নন্দী ॥ সহায়রাম দাস ॥ অশ্বিনীকুমার চৌধুরী ॥ সৌরীন্দ্র দত্ত চৌধুরী ॥ শ্রীপতি চৌধুরী ॥ রণধীর দাশগুপ্ত ॥ ধীরেন্দ্রলাল দস্তিদার ॥ সুখেন্দুবিকাশ দস্তিদার ॥ ননীগোপাল দেব ॥ মলিনবিকাশ ঘোষ ॥ নিতাইপদ ঘোষ ॥ মধুসূদন গুহ ॥ সুবোধচন্দ্র মিত্র ॥ সুবোধ চৌধুরী ॥ সুবোধ বিশ্বাস ॥ সুবোধ বল ॥ সুবোধ রায় ॥ শান্তিভূষণ নান ॥ বিজয়কুমার সেন ॥ অনিলকুমার রক্ষিত ॥ আনন্দ গুপ্ত ॥ নন্দলাল সিংহ ॥

বাকি তিনজন অভিভাবক। কালারপোল সংগ্রামে রজত সেন ও দেবপ্রসাদ গুপ্ত শহীদের মৃত্যু বরণ করলেও তাঁদের অভিভাবকদের রেহাই নেই। তাই তাঁদেরও এনে দাঁড় করানো হয়েছে আসামীর কাঠগড়ায়। অন্যজন অনন্ত সিংহের পিতা গোলাপ সিংহ। তিনিও আসামী তালিকাভুক্ত।

সারা ভারতের দৃষ্টি তখন চট্টগ্রামের দিকে। বন্দীদের ভাগ্যে কি আছে কে জানে! প্রতিশোধ নেবার এমন সুযোগ কি ইংরেজ সরকার এত সহজে ছেড়ে দেবেন?

তবে ভরসার কথা এই যে, শরৎ বসু, বীরেন্দ্র শাসমল, শ্রীশ বসু, অখিল দত্ত, কামিনী দত্ত, এন. আর. দাশগুপ্ত, কালীচরণ ঘোষ, এন. সি.

মুখার্জী, মহিম গুহ, জে. কে. ঘোষাল, সন্তোষ বসু প্রমুখ বাংলার সুদক্ষ আইনজীবিগণ সবাই আসামীপক্ষ সমর্থন করছেন। দেখা যাক কি হয়!

এবার এক নতুন পরিকল্পনায় হাত দিলেন মাস্টারদা। যে করে হোক, বিচারাধীন বন্দীদের মুক্ত করে আনতে হবে।

দুটো পথ খোলা আছে। এক, ডিনামাইট চার্জ করে কোর্টভবন উড়িয়ে দিয়ে সেই ফাঁকে সবাইকে মুক্ত করে আনা। আর জেলখানার দেয়াল উড়িয়ে দিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা।

সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠলেন অন্যতম নায়ক নির্মল সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার, মহেন্দ্র চৌধুরী, শৈলেশ রায়, অর্ধেন্দু গুহ, শ্রীপতি চৌধুরী, দীনেশ চক্রবর্তী ও নিবারণ ঘোষ প্রমুখ কর্মিবৃন্দ। এ সুযোগ হারালে চলবে না। যে করে হোক, এ পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলতেই হবে।

বন্দীদের মধ্যে অর্ধেন্দু গুহ, মধুসূদন গুহ প্রমুখ কয়েকজন তখন জামিনে মুক্ত। যথাসময়ে কোর্টে হাজির হয়ে আবার তাঁরা বাড়ি ফিরে যান কোর্টের কাজ শেষ হবার পরে।

প্রধানত অর্ধেন্দুর সাহায্যেই যোগাযোগ স্থাপিত হল মাস্টারদা ও বিচারাধীন বন্দীদের মধ্যে। কাজও এগিয়ে গেল অনেক দূর। জেলের অভ্যন্তরস্থ সেপাই-সান্ত্রীদেরও হাত করা হল একে একে।

তবু কিছুতেই কিছু হল না। ১৯৩১ সালের ২রা জুন সব কিছুই ফাঁস হয়ে গেল দলের একটি কিশোর কর্মীর আকস্মিক গ্রেপ্তারের ফলে।

শুধু তাই নয়। গর্ত খুঁড়তে গিয়ে জেলের অভ্যন্তরস্থ অস্ত্র-শস্ত্রও একদিন ধরা পড়ে গেল ভেতরে কর্মরত রাজমিস্ত্রীদের হাতে। ফলে, এত-দিনের পরিশ্রম, এত অর্থব্যয়, সব কিছুই গেল বিপর্যস্ত হয়ে।

সংবাদপত্র থেকেই তার বিবরণ এখানে পর পর তুলে দিচ্ছি:

চট্টগ্রাম জেলে মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র

'প্রকাশ যে, স্থানীয় জেলের মধ্যে ট্রাইব্যুনেল মামলার আসামীদের বাসস্থানের নিকটে আজ সকালে কতিপয় মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র পাওয়া গিয়াছে।

এতাবৎ সঠিক সংবাদ জানা যায় নাই। লোকনাথ বলের অসুস্থতায় আজ আর স্পেশাল ট্রাইব্যুনেলের অধিবেশন বসে নাই।'

[আনন্দবাজার, ৬ই মে, ১৯৩১]

চট্টগ্রামে ডিনামাইট আবিষ্কার

আদালতের নিকট ডিনামাইট-পূর্ণ বাক্স

'অদ্য প্রাতঃকালে জনসাধারণ চট্টগ্রামের আদালতের নিকটস্থ ভূগর্ভে ডিনামাইট আবিষ্কারের বিস্ময়কর সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত চমকিত হইয়াছে।

প্রকাশ যে, চারিটি অদ্ভুত রকমের কালো বাক্সে পূর্ণ ডিনামাইট

কালেক্টোরির পশ্চিম দিকের জমির নিচে পাওয়া গিয়াছে এবং এই অদ্ভুত বাক্সগুলি উত্তর ও দক্ষিণ দিক হইতে আদালতের সোপান পর্যন্ত লম্বা তার দিয়া সংযুক্ত করা হইয়াছিল।

বাক্সগুলির চারিদিকেই তার ছিল এবং সেই তারগুলি উত্তর ও দক্ষিণ দিকের লম্বা তারের সহিত যুক্ত করা ছিল। উক্ত কালো বাক্সগুলি আদালত-গৃহের প্রধান প্রাচীরের তলে কয়েক ফুট মাটির নিচে খনন করিয়া পাওয়া গিয়াছে।' [আনন্দবাজার, ৩রা জুন, ১৯৩১]

চট্টগ্রামে সান্ধ্য-আইন জারি

ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে অদ্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ১৬ হইতে ২৬ বৎসর বয়স্ক সমস্ত হিন্দু ভদ্রলোক যুবকদিগকে সন্ধ্যা ৭টা হইতে ভোর ৫টা পর্যন্ত—এই সময়ের মধ্যে গৃহত্যাগ করিতে নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

আগামী ৮ই জুন হইতে এই আদেশ বলবৎ করা হইবে এবং চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটি, জেটি ও পাহাড়তলী অঞ্চলের মধ্যে যে সমস্ত হিন্দু যুবক বসবাস কিংবা অবস্থান করে, তাহাদের উপর এই আদেশ বর্তিবে।'

[আনন্দবাজার, ৬ই জুন, ১৯৩১]

চট্টগ্রামে নিত্য-নূতন আবিষ্কার

'প্রকাশ, অদ্য প্রাতঃকালে দেওয়ান বাজারস্থিত একটি বাড়িতে খানা-তল্লাশীর সময় পুলিশ কতকগুলি তাজা কার্তুজ, দুই বাক্স বিস্ফোরক, এসিড এবং কতকগুলি বৈদ্যুতিক তার পাইয়াছে।

হৃদয় দাস নামক জনৈক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আরো কয়েকটি বাড়িতে খানাতল্লাশী করিয়া তিনজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। তন্মধ্যে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা সম্পর্কে বিচারাধীন আসামী, অধুনা জামিনে মুক্ত অনিল রক্ষিত নামক জনৈক যুবকও আছে।'

[আনন্দবাজার, ১৮ই জুন, ১৯৩১]

চট্টগ্রামে পিটুনী পুলিশ

১৪ দিনের মধ্যে ট্যাক্স দিতে হইবে

'জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস হইতে চট্টগ্রাম জেলার ৫২ খানা গ্রামের অধিবাসীদের উপর পিটুনী পুলিশের ট্যাক্স দিবার জন্য নোটিশ জারি করা হইতেছে। নোটিশ জারি করিবার ১৪ দিনের মধ্যে ট্যাক্স দিতে হইবে।'

[আনন্দবাজার, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩১]

জীবনে সার্থকতা ফেলে কেউ ব্যর্থতা চায় না। তবু তা পেতে হয়। তবু তা মেনে নিতে হয়।

পরাধীনতার নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করার দুর্বার প্রেরণায় সেদিন যাঁরা স্বেচ্ছায় সুখী ও শান্ত জীবন পরিত্যাগ করে কঠিন কঠোর রক্তাক্ত পথকে বেছে নিয়েছিলেন, বাংলাদেশের সেই মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবীরাও সেই সহজ সত্যটাকে মেনে নিয়েছিলেন হাসিমুখেই।

চট্টলসূর্য মাস্টারদাও তার ব্যতিক্রম নন। তাই সাময়িক ব্যর্থতাকে বড় করে না দেখে এবার তিনি বিনোদবিহারী দত্ত, সরোজ গুহ, রমেন ভৌমিক, বিনোদ চৌধুরী প্রমুখ দুঃসাহসী তরুণদের জেলার বাইরে পাঠিয়ে দিলেন নতুন এক দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিয়ে।

যাও, দুঃসাহসের পাখায় ভর করে এগিয়ে যাও। শুধু জেলার মধ্যেই এই বৈপ্লবিক কর্মধারাকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। এবার তাকে ছড়িয়ে দাও বাংলাদেশের এখানে-ওখানে সর্বত্র।

পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ পেল ১৯৩১ সালে ২৮শে অক্টোবর তারিখে। সেদিন ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডুনোকে প্রকাশ্য রাজপথে ধূলিশয্যা নিতে হল যুব-বিদ্রোহের দুই তরুণকর্মী সরোজ গুহ আর রমেন ভৌমিকের অব্যর্থ গুলীতে।

কুমিল্লার কুখ্যাত ডি. এস. পি. এলিসনও রেহাই পেল না। তাকেও একদিন চরম শাস্তি মাথা পেতে নিতে হল দুঃসাহসী তরুণ শৈলেশ রায়ের হাতে। পুলিশ তাঁর কোন হদিসই পেল না।

বাদ গেল না চট্টগ্রামের গোয়েন্দা বিভাগের জাঁদরেল অফিসার আসানুল্লাও। যাকে বলে মহাশয় ব্যক্তি! চট্টলবাসীরা বোধহয় এ হেন মহাপুরুষটির নির্মম অত্যাচারের কথা কোনদিনই ভুলতে পারবে না।

গ্রেপ্তারের পরে অসুস্থ অম্বিকা চক্রবর্তীর ওপর কি পাশবিক নির্যাতনই না করেছিলেন এই আসানুল্লা! প্রহারে প্রহারে জর্জরিত হয়ে অম্বিকা চক্রবর্তী তখন গোঙাতে শুরু করেছেন—জল! একটু জল!

—জল! সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দীর সর্বাঙ্গে মূত্রত্যাগ করে অট্টহাস্যে ভেঙে পড়েছিল আসানুল্লা—এই নে জল! যত খুশি খা!

বিশ্বাস করা শক্ত। রুচিতেও হয়তো বাধবে। তবু একথা দিবালোকের মতো সত্য।

দেশদ্রোহীর ক্ষমা নেই। আজ হোক, কাল হোক, চরম শাস্তি তাকে পেতেই হবে। এবার এল সেই শাস্তি দেবার পালা।

১৯৩১ সাল। ৩০শে আগস্ট। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার খান বাহাদুর আসানুল্লা, সবাই সেদিন চট্টগ্রাম নিজাম পল্টন মাঠে উপস্থিত। আজ ফাইনাল খেলা। খেলার শেষে বিজয়ী দলকে পুরস্কার বিতরণ করা হবে।

চারপাশে পুলিশের কঠোর বেড়াজাল। কারোরই সামনে যাবার উপায় নেই। হঠাৎ শোনা গেল রিভলবার-গর্জন—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! ব্যস্, খানবাহাদুর খতম।

আততায়ী ধরা পড়লেন ঘটনাস্থলেই। নাম—হরিপদ ভট্টাচার্য। কিন্তু

এ কি! এ যে তেরো-চোদ্দ বছরের একটি বালক মাত্র! বিশ্বাস করাও যে শক্ত!

বিপ্লবের পথ কোনদিনই সুখের নয়। অপমান, অত্যাচার, নির্যাতন—এ তো তাঁদের কাছে বলতে গেলে একটা কথার কথা মাত্র! তবু সেই তেরো-চোদ্দ বছরের বালক হরিপদর ওপর সেদিন যে পৈশাচিক নির্যাতন করা হয়েছিল, কোথাও বুঝি তার তুলনা নেই।

প্রথমেই আঙুলে সূঁচ ফুটিয়ে দেওয়া হল স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্যে। তারপর ব্যাটারী-চার্জ। বল, তোমাদের নেতা সূর্য সেন কোথায়? বললে পুরস্কার পাবে! অনেক টাকা পুরস্কার!

গরীব পিতামাতার সন্তান। খুবই গরীব। অতিকষ্টে পড়াশুনা করেন। তাও স্কুলে নয়, টোলে। তবু হরিপদ সেই প্রলোভনের কাছে মাথা নোয়ালেন না। একটি বারের জন্যও না।

জবাব না পেয়ে এবার চোখের সামনে বৃদ্ধ পিতামাতার ওপর নির্যাতন শুরু হল। সেই সঙ্গে আগুন নিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হল বাড়ি-ঘর-দুয়ার সব। দেখ, দু চোখ ভরে তাকিয়ে দেখ! কেমন লাগছে এখন দেখতে! এখনো বল সূর্য সেন কোথায়? কোথায় তার অন্তরঙ্গ সহচর নির্মল সেন? কোথায় তারকেশ্বর দস্তিদার, বিনোদবিহারী দত্ত, মহেন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ দলের অন্যান্য ছেলেরা?

হরিপদ নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। জেরার পর জেরা। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। তবু একটি কথাও কেউ শুনতে পেল না তাঁর মুখ থেকে।

এবার শুরু হল শোভাযাত্রা। চারপাশে পুলিশ বেষ্টনী, মাঝখানে শৃঙ্খলাবদ্ধ হরিপদ। কে কোথায় আছ, তামাসা দেখবে এসো!

লোক জড়ো হলেই অমানুষিক প্রহার। সেই সঙ্গে অকথ্য গালাগাল। চুপ করে থাকলে চলবে না। ভাল চাস্ তো এখনো উত্তর দে! বল, ইংরেজ বাহাদুরের জয়!

হাজার নির্যাতনে যা সম্ভব হয়নি, এবার কিন্তু তা সম্ভব হল, মল্লিকা।

হরিপদ সত্যিই এবার জবাব দিলেন। কি জবাব দিলেন, শুনবে?

প্রহারে প্রহারে জর্জরিত হয়ে হাজার মানুষের সমক্ষে বীর বালক বুক চিতিয়ে জবাব দিলেন—জয়, মাস্টারদার জয়! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক!

একদিন-দুদিন নয়, এমনি করে দিনের পর দিন। প্রহারের চোটে সর্বাঙ্গ দিয়ে অজস্র রক্ত ঝরছে, সঙ্গীনের খোঁচায় চোখ-মুখ সব কিছু অস্বাভাবিকভাবে ফুলে উঠেছে, তবু বালক হরিপদ একটিমাত্র কথাই সেদিন বলে গেছেন বার বার—'মাস্টারদার জয় হোক! সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক!'

হরিপদ ভট্টাচার্য আজো বেঁচে আছেন, মল্লিকা। বয়স কম ছিল বলে ফাঁসির রজ্জু তাঁকে কেড়ে নিতে পারেনি।

কিন্তু আজকের এই স্বাধীন দেশের ক'জন মানুষ তাঁকে চেনে? ক'জন তাঁর নাম শুনেছে?

রাষ্ট্র তাঁকে স্বীকৃতি দিতে না পারে, ইতিহাস তাঁর কৃতিত্বকে বেমালুম অস্বীকার করতে পারে, কিন্তু তোমরা!

হরিপদর মতো অশেষ নির্যাতনভোগী মানুষগুলোকে যদি আজও তোমরা যথাযোগ্য সম্মান দিতে না পার, তবে সে লজ্জা তাঁদের নয় মল্লিকা, তোমাদেরই।

এখানেই শেষ হল না। আরো একটি উৎসাহী দেশদ্রোহীকে নিয়তির অমোঘ নির্দেশ মাথা পেতেই নিতে হল এমনি করেই। তারিখটা ছিল ৩১শে মার্চ।

মাস্টারদা তখন কানুনগো পাড়ার গোপন আস্তানায়। সঙ্গে রয়েছেন সর্বক্ষণের সঙ্গী নির্মল সেন ও গুটিকয়েক বিশ্বস্ত কর্মী।

সেদিন তারকেশ্বর দস্তিদার ও বীরেন দে এসে মিলিত হয়েছেন কানুনগো পাড়ার সেই গোপন আস্তানায়। মাস্টারদার সঙ্গে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে একটু আলাপ-আলোচনা করা দরকার।

অলোচনা শেষ। এবার দুজনকে ফিরে যেতে হবে শহরের সেই নির্দিষ্ট ঠিকানায়।

তারকেশ্বর তখন রীতিমত অসুস্থ। যুব-বিদ্রোহের দিন-কয়েক আগে সর্বাঙ্গ তাঁর দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল বোমা বিস্ফোরণের ফলে। তখনো তার জের মেটেনি। তবু কর্তব্যের প্রেরণায় তিনি এগিয়ে এসেছেন সব কিছু বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে।

মেঘে-রৌদ্রে মেশামেশি বৈরাগী অপরাহ্ণ। মন উদাস করা পরিবেশ।

রাস্তায় পা দিয়েই সহসা কি দেখে দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল তারকেশ্বরের। অদূরে দাঁড়িয়ে একটি নিরীহ গ্রাম্য লোক। এ গাঁয়েরই কেউ হবে হয়তো।

কিন্তু না, একটু নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার। মাস্টারদা আশে-পাশেই রয়েছেন। মাথার দাম তাঁর ধার্য হয়েছে মোট দশ হাজার টাকা। তদুপরি সঙ্গে রয়েছেন নির্মলদা। সুতরাং সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

পরিকল্পনা মতো বেশ জোরে জোরে খানিকটা পথ এগিয়ে গিয়েই আচমকা দুজনে ঘুরে দাঁড়ালেন পেছনের দিকে। দেখা যাক, লোকটি সত্যিই তাঁদের অনুসরণ করে পেছনে পেছনে আসছে কিনা!

যা ভাবা গিয়েছিল, ঠিক তাই। তাঁদের ঘুরে দাঁড়াতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে লোকটি যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে গেল থতমত খেয়ে।

এবার আর চিনতে ভুল হল না তারকেশ্বরের। শশাঙ্ক দারোগা। সাধারণ পোশাকে থাকলেও লোকটি আসলে কুখ্যাত শশাঙ্ক ভট্টাচার্য ছাড়া আর কেউ নয়। কিন্তু ও এখানে কেন? কি মতলব ওর! মাস্টারদার অবস্থিতির কথা ও কিছু জেনে ফেলেনি তো!

না, ক্ষমা নেই। এই অহেতুক কৌতূহলের শাস্তি ওকে পেতেই হবে। সর্বাগ্রে মাস্টারদার নিরাপত্তার প্রশ্ন। সুতরাং কোনরকমেই ওকে ছেড়ে দেওয়া চলবে না।

সামনেই একটা দু-মুখো পথের বাঁক। মনস্থির করে এবার দুজনে

দুদিকে এগিয়ে গেলেন দ্রুত পায়ে। অর্থাৎ—অনুসরণকারী যে পথ ধরেই আসুক না কেন, তার রেহাই নেই। গুলীভর্তি আর্মি রিভলবার দুদিকেই প্রস্তুত।

—বাঁক-বরাবর এসেই বারেকের জন্য থমকে দাঁড়াল শশাংক দারোগা। তাই তো! কোন্ পথে গেল ওরা! তবে কি শিকার ফস্‌কে গেল হাতের মুঠো থেকে!

মুহূর্তমাত্র, পরক্ষণেই কি ভেবে শশাংক দারোগা এগিয়ে গেল বরমা গাঁয়ের মেঠো পথ ধরে। নিশ্চয় ওরা এ পথে গিয়েছে! যে করে হোক, ওদের নাগাল পাওয়া চাই। ধরিয়ে দিতে পারলে অনেক টাকা পুরস্কার! সেই সংগে চাকরিতে পদোন্নতি! না, এ সুযোগ হারালে চলবে না।

একটা খড়ের গাদার আড়ালে দাঁড়িয়ে তারকেশ্বর তখন প্রস্তুত। ঐ যে শশাংক দারোগা এগিয়ে আসছে একটু একটু করে! আর একটু কাছে এলেই হয়! হ্যাঁ, এবার ঠিক হয়েছে।

বুঝি একলহমার ব্যাপার, তারপরই তারকেশ্বরের হাতের আর্মি রিভলবার আগুন ছড়াল—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

সংগে সংগেই দারোগাবাবু শুয়ে পড়লেন গুরুতরভাবে জখম হয়ে। পুরস্কারটা যে এমন হাতে হাতে মিলে যাবে তা কে জানত!

১৯৩২ সালের ১৩ই জুন শুরু হল ঐতিহাসিক ধলঘাট সংঘর্ষ।

মাস্টারদা, নির্মল সেন, প্রীতিলতা, অপূর্ব সেন সবাই সেদিন আত্মগোপন করে ছিলেন ধলঘাট-নিবাসী সাবিত্রীদেবীর আস্তানায়।

হঠাৎ বিরাট এক গুর্খা বাহিনী নিয়ে ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ এসে হাজির। তারপরই উভয়পক্ষ থেকে শুরু হল অগ্নি-বর্ষণ।

প্রথমেই শেষ-শয্যা নিলেন সামরিক বাহিনীর অধিকর্তা ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ। তারপর নির্মল সেন। সবশেষে অপূর্ব সেন।

মাস্টারদা অন্যত্র সরে যেতে সক্ষম হলেন প্রীতিলতাকে নিয়ে। হাজার চেষ্টা করেও তাঁর গতিরোধ করা সম্ভব হল না।

যথাসময়ে সে সংবাদ প্রকাশিত হল সংবাদপত্রের পাতায়ঃ

চট্টগ্রামে সৈন্য ও বিপ্লবীতে সংঘর্ষ

'এইমাত্র সংবাদ আসিয়াছে যে, গতরাত্রে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়ার নিকটে বিপ্লবী ও সৈন্যদের এক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। ফলে, গুর্খা বাহিনীর ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ ও ২জন বিপ্লবী নিহত হইয়াছেন। বিপ্লবীদের নিকট ২টি রিভলবার ও গুলী ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। নিহত বিপ্লবীদের এক-জনকে নির্মল সেন বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে।

[আনন্দবাজারঃ ১৫-৬-৩২]

মানুষের মৃত্যু আছে, কিন্তু ইতিহাসের মৃত্যু নেই।

কোথায় আজ মাস্টারদা! কোথায় প্রীতিলতা বা যুব-বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান নায়ক, ছোট-বড় সবার প্রিয় মহানুভব নির্মল সেন!

কেউ আজ বেঁচে নেই। কিন্তু সেদিনের সেই ঘটনা সম্বন্ধে প্রীতিলতার নিজের হাতের লেখা ডায়েরীর কয়েকটি পাতা আজো অম্লান হয়ে বেঁচে আছে ইতিহাসের একটি মূল্যবান তথ্যরূপে। বিশেষ কয়েকটি লাইন এখানে তুলে দিচ্ছিঃ

'...এইদিন নির্মলদা যে সমস্ত কথা বলে যাচ্ছিলেন, তাতে মনে হয়, নির্মলদা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর যা কিছু বলার আছে সেইদিনই বলে ফেলতে হবে, না হলে হয়তো আর বলা হবে না।

নির্মলদা বললেন—মাস্টারদার শেষ কাজটি এখনো বাকি, সেটি হল ফিমেল অ্যাকশন—মেয়েদের দিয়ে একবার শক্তির খেলা দেখানো।

আমি বললাম—আমার বড্ড মরতে ইচ্ছে করছে।

নির্মলদা বললেন—তুই কিসের জন্য মরবি?

কে জানত যে, কয়েক ঘণ্টা পরেই মৃত্যু এসে হাজির হবে, নির্মলদাকে বেঁধে নিয়ে যাবে, আমাকে স্পর্শও করবে না!

আশ্চর্য! মাস্টারদার সঙ্গে এই দুদিন ধরে বেশি কথা বলিনি, সারা-দিন প্রায় নির্মলদার সঙ্গেই বসে ছিলুম। ইহজীবনের সব কথা যেন একদিনেই শেষ করেছিলাম।

সেদিন সকালবেলা ভোলার (অপূর্ব সেন) জ্বর। এই জ্বর গায়েই সারাদিন কমিক করেছে। এই আনন্দের জীবন্ত নির্ঝরটাকে যতই দেখছিলাম, ততই যেন মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম।

আমি যখন সাগু রান্না করছি ভোলা তখনও গুন্‌গুন্ করে আবৃত্তি করে চলেছে—'পরাণ আমার নাচেরে আজিকে, ময়ূরের মত নাচে রে।' আমার হাতে এ জীবনের শেষ-খাওয়া সে খেয়ে নিল।

ঠিক এই সময় মাস্টারদা নিচ থেকে বিদ্যুৎবেগে ছুটে এসে বললেন—পুলিশ এসেছে।

বুঝলাম, এই মুহূর্তেই সব শেষ হয়ে যাবে। ওঁদের বললাম—আমি আপনাদের সঙ্গেই থাকব।

মাস্টারদা চোখ বড় বড় করে আদেশের স্বরে বললেন—নিচে মেয়েদের মধ্যে চলে যাও, তাদেরই আত্মীয় বলে পরিচয় দিও।

নিচে নেমে গেলাম মই বেয়ে। উপরে ভোলা (অপূর্ব সেন), নির্মলদা ও মাস্টারদা।

ততক্ষণে ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ এসে রিভলবার হস্তে মই বেয়ে উপরে উঠতে আরম্ভ করেছে। নির্মলদা দাঁড়িয়ে গুলী করলেন। ক্যামেরণ গুলীবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

দুদিক থেকেই গুলী চলতে লাগল। মাস্টারদারা উপর থেকে ও পুলিশ বাহিনী নিচে থেকে।

হঠাৎ নির্মলদার আর্তনাদ শুনতে পেলুম। আর স্থির হয়ে থাকতে

পারলুম না। উপরে উঠতে গেলাম, নিচের মেয়েরা তিনজনেই চেপে ধরল আমাকে। ওদিকে নির্মলদার ব্যথা-করুণ কণ্ঠ—রাণী, রাণী! (প্রীতিলতার ডাকনাম ছিল রাণী)

এই অন্তিম সময়েও যদি একটিবার নির্মলদার কাছে যেতে পারতুম, জানি না আমায় কি বলতেন! ভগবান আমাকে একটিবার নির্মলদাকে দেখে আসতে দিলেন না।

এমন সময় মাস্টারদা ও ভোলা নিচে নেমে এলেন দেখে ভারি আনন্দ হল। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল—ওঁরা কেউ আর নেই।

আমি মাস্টারদার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে বললাম—মাস্টারদা, আমাকে ফেলে যাবেন না। আমি আপনার সঙ্গেই যাব। এ সময়ে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, মাস্টারদার সঙ্গ ছাড়ব না।

মাস্টারদার পাশেই তখন ভোলা দাঁড়িয়ে ছিল। চোখের একটি পলকে তাকে আর একবার দেখে নিলাম। কি চমৎকার লেগেছিল, এতবড় বিপর্যয়েও চোখে-মুখে এতটুকু চাঞ্চল্য নেই। রিভলবারের ট্রিগারে আঙুলটি রেখে মাস্টারদার আদেশের অপেক্ষায় আছে।

তিনজনেই রওনা হলাম, ভোলা চলল পথ দেখিয়ে আগে আগে। শুকনো পাতার ওপর পায়ের খস্‌খস্‌ শব্দ হতেই অন্ধকারের বুক চিরে শব্দভেদী গুলী এসে ভোলার বক্ষভেদ করল।

রামকৃষ্ণদা বলেছিলেন ভোলার সাথে আলাপ করতে। আলাপের চূড়ান্ত হয়ে গেল। আজ দুদিন ধরে কেবল ওর হাসি শুনেছিলাম, অবশেষে আমারই দু চোখের সামনে সে মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।'

ইতিমধ্যে কখন যে মেঘে আকাশটা কালো হয়ে উঠেছে কেউ তা লক্ষ্য করেনি। এবার বৃষ্টি নামল। প্রথমে টিপ্‌ টিপ্‌ করে। পরে মুষলধারে।

ঝড়-জল মাথায় নিয়েই প্রীতিলতা-সহ এবার মাস্টারদা গিয়ে আশ্রয় নিলেন জৈষ্টপুরাতে।

শুধু বাইরে নয়, মনেও তখন ঝড় বইছে। উদ্দাম ঝড়। সংগ্রামী জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু, সর্বক্ষণের ছায়াসঙ্গী নির্মল সেন আজ আর তাঁর পাশে নেই। এ জীবনে আর কোনদিনই তাঁর সাড়া পাওয়া যাবে না। এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত!

মাস্টারদার সেদিনের মনোভাব সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় চারুবিকাশ দত্ত রচিত 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' গ্রন্থ থেকে কয়েকটি লাইন এখানে তুলে দিচ্ছি:

'...উপরে উঠিয়া মহেন্দ্র মাস্টারদার বিষন্ন মুখের পানে তাকাইয়া শিহরিয়া উঠিল। চক্ষুদ্বয় কোটর-প্রবিষ্ট, মুখখানি অস্বাভাবিক গম্ভীর ও বিষন্ন। তাঁহার বুক ফাটিয়া একটা কান্নার স্বর বাহির হইয়া আসিতেছিল।

মহেন্দ্র কাছে বসিয়া এই প্রথম দেখিল—মাস্টারদার চক্ষুর কোল বাহিয়া অশ্রুমালা একটির পর একটি ঝরিয়া পড়িতেছে।

বেদনা-বিষণ্ণ কণ্ঠে মাস্টারদা বলিলেন—'আজ আমার বড় দুর্দিন। আজ আমার ডান হাতখানিই ভেঙে গেল। যে সময় নির্মলবাবুর প্রয়োজন সর্বাধিক, ঠিক সেই সময়েই তাঁকে হারালাম।'

আর বলিতে পারিলেন না। কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গেল। দুর্বহ বেদনা-ভারে বিপ্লবী নেতা মাস্টারদা ভাষাহারা হইয়া রহিলেন।

সেদিনের কুটির আশ্রয়ের প্রতিটি বুকে তখন শোকের ছায়া নামিয়াছে। সবাই জানিলেন, তাঁহাদের নির্মলদা নাই, অপূর্ব সেন নাই। দুরন্ত বাতাসে প্রতিধ্বনি উঠিল—নাই, নাই, নাই!'

ওদিকে তখন ঘুম টুটে গেছে মহামান্য ইংরেজ সরকারের। যে করে হোক, সূর্য সেনকে গ্রেপ্তার করা চাই-ই! অন্যথায় কিছুতেই যে নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই! সংবাদপত্র থেকেই তাদের সেই তৎপরতার খবর এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ

সূর্য সেনকে ধরিয়া দিতে পারিলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার

'১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন কার্যে বিপ্লবী দলের নেতা বলিয়া কথিত সূর্য সেনকে যে ধরিয়া দিতে পারিবে, বা এমন সংবাদ দিতে পারিবে যাহাতে সে ধরা পড়ে, তাহাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

গত ১৩ই জুন তারিখে পটিয়ার বিপ্লবীদের সহিত যে সংঘর্ষের ফলে ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ নিহত হইয়াছেন, সূর্য সেনই নাকি সেই সংঘর্ষের পরিচালক।'

[আনন্দবাজার ঃ ৩-৭-৩২]

কিন্তু শুধু সূর্য সেনকে ধরলেই চলবে না। সেই সঙ্গে প্রীতিলতাকেও ধরা চাই। কিন্তু প্রীতিলতা তখন কোথায়! এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে কি লেখা রয়েছে শোন ঃ

চট্টগ্রামের পলাতকা

'চট্টগ্রাম জিলার পটিয়া থানার ধলঘাটের শ্রীমতী প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার গত ৫ই জুলাই, মঙ্গলবার চট্টগ্রাম শহর হইতে অন্তর্ধান করিয়াছেন। তাঁহার বয়স ১৯ বৎসর। পুলিশ তাঁহার সন্ধানের জন্য ব্যস্ত।'

[আনন্দবাজার ঃ ১৩-৭-৩২]

পরবর্তী ঘটনা অগ্নিযুগের ইতিহাসের একটি বিশেষ স্মরণীয় অধ্যায় —বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদারের নেতৃত্বে পাহাড়তলী ইয়োরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ।

সামরিক পোশাকে সুসজ্জিতা প্রীতিলতার সারা মনে সেদিন সে কি কূলপ্লাবী আনন্দ! সে কি বিরাট পরিতৃপ্তি! বুঝি এমন একটা লগ্নের জন্যই তিনি প্রতীক্ষা করে ছিলেন সারা জীবন।

১৯৩২ সাল। ২৪শে সেপ্টেম্বর।

বিদায় নেবার আগে মাস্টারদাকে প্রণাম করে ভাবাবেগে বললেন প্রীতিলতা—মাস্টারদা, জন্মের মতো যাই। আশীর্বাদ করুন, আপনার ইচ্ছার পূর্ণতা সম্পাদনে আমি যেন অযোগ্যা না হই।

—এস বোন। সস্নেহে প্রীতিলতার মাথায় হাত রেখে জবাব দিলেন মাস্টারদা, বিজয়গর্বে দৃপ্তা ভগিনীর গৌরব নিয়ে ফিরে এসো।

—আপনার আশীর্বাদ বিফল হবে না, জানি। হাসলেন প্রীতিলতা, তবে, আমি যাই জন্মের মতন।

নিজের মধ্যেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস গোপন করলেন মাস্টারদা।

চোখের সামনে সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই হারিয়ে গেছেন এক এক করে। হারিয়ে গেছে টেগরা, বিধু, নরেশ, ত্রিপুরা, স্বদেশ, রজত—এমনি আরো কতজন। অন্তরঙ্গ সহচর নির্মলবাবুও হারিয়ে গেছেন নিজের কর্তব্য সুসম্পন্ন করে।

আজ আবার হারাবার পালা। কে বলতে পারে, ওদের মধ্যে কেউ আবার ফিরে আসবে কি না! হয়তো আসবে, হয়তো বা এ-ই জীবনের শেষ দেখা।

কিন্তু প্রীতি! সুযোগ পেলেও সে কি ফিরে আসতে রাজী হবে!

মাস্টারদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যথাসময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় পেঁছে গেলেন প্রীতিলতা।

সঙ্গে মহেন্দ্র চৌধুরী, সুশীল দে, শান্তি চক্রবর্তী, কালী দে, পান্না সেন, বীরেশ্বর রায়, প্রফুল্ল দাস প্রমুখ গুটিকয়েক মৃত্যুভয়হীন তরুণ কর্মী।

সবাই প্রস্তুত। সবাই অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত। এখন শুধু দলনেত্রীর আদেশের অপেক্ষা মাত্র।

প্রথমেই মহেন্দ্র চৌধুরী আর সুশীল দে মুসলমান গাড়োয়ানের ছদ্মবেশে দিব্যি ভেতরে ঢুকে গেলেন প্রহরারত মিলিটারী পুলিশের চোখের ওপর দিয়ে। যেন বাইরে অপেক্ষমাণ গাড়োয়ানদ্বয় কৌতূহলবশে সাহেব-মেমদের একটু নাচ দেখতে চাইছে আর কি!

প্রীতিলতা ও অন্যান্য সবাই ঢুকলেন পেছনের নির্দিষ্ট ছোট্ট একটি দরজা দিয়ে।

রাত দশটা। ভেতরে তখন শতাধিক শ্বেতাঙ্গ নরনারী পানাহার ও নাচ-গান নিয়ে মত্ত।

সহসা গোটা ক্লাব-ঘরটা কেঁপে উঠল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে—বুম্‌ম্‌ম্‌ম্‌! সেই সঙ্গে বেপরোয়া গুলী-বর্ষণ—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

এমনি করেই তোমরা একদিন নিরপরাধ ভারতবাসীর বুকের রক্তে জালিয়ানওয়ালাবাগের মাটি ভিজিয়ে দিয়েছিলে। আজ তাকিয়ে দেখ যে, ভারতবাসী তার প্রতিশোধ নিতে জানে কিনা!

—কম্পানি, ফল ইন! কিছুক্ষণ বাদেই আদেশ শোনা গেল অধিনায়িকা প্রীতিলতার কণ্ঠে—আমাদের কাজ শেষ। এবার ফিরে চল সবাই। রেডি! কুইক মার্চ!

কয়েক পা গিয়েই সহসা কি দেখে থমকে দাঁড়ালেন মহেন্দ্র চৌধুরী।

একি! দলের সবাই রয়েছে, কিন্তু প্রীতিদি কোথায়? তাঁকে দেখা যাচ্ছে না কেন? কোথায় গেলেন তিনি?

উন্মত্তের মতো ছুটে গেলেন মহেন্দ্র চৌধুরী। প্রীতিদি! প্রীতিদি! একি, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কেন প্রীতিদি? ঐ দেখুন মিলিটারী আর্মার্ড করে ছুটে আসছে! আর দেরি করবেন না! চলুন প্রীতিদি!

—না ভাই। হাসলেন প্রীতিলতা, এই রিভলবারটা নিয়ে যাও। এটা মাস্টারদাকে দিও। আর তাঁকে আমার প্রণাম জানিও। আমার আদেশ, আর এক মুহূর্তও এখানে দেরি করো না। এগিয়ে যাও।

দলনেত্রীর নির্দেশে অদম্য কান্না বুকে চেপে মহেন্দ্র চৌধুরী এবার পা বাড়ালেন নিজের গন্তব্যপথের দিকে।

আর প্রীতিলতা! তিনি তখন কোথায়?

ততক্ষণে তিনি পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে সেই অমৃতলোকে চলে গেছেন, যেখানে তাঁর একান্ত প্রিয় রামকৃষ্ণদা ও নির্মলদা অনেক আগেই ঠাঁই নিয়েছেন।

পরদিনই প্রীতিলতার সেই নিঃশেষ আত্মবিসর্জনের খবর প্রকাশিত হল সংবাদপত্রের পাতায়ঃ

বোমা, রিভলবার ও রাইফেল

‘গতকল্য রাত্রি ১১টার সময় বিপ্লবী বলিয়া বর্ণিত একদল লোক পাহাড়তলী ইনষ্টিটিউট নামক আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ইয়োরোপীয়ান ক্লাবে অতিশয় দুঃসাহসিক ভাবে ইয়োরোপীয়ানদের উপর আক্রমণ করে। আক্রমণ-কারীর দলে পুরুষের বেশে সজ্জিতা একজন নারীও ছিল।

আক্রমণকারীরা ঘরের মধ্যে বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল। ইহার ফলে একজন বৃদ্ধা ইয়োরোপীয়ান মহিলা নিহত এবং ইন্সপেক্টর ম্যাকডোন্যাল্ড, সার্জেণ্ট উইলিস্‌ এবং অপর ছয়জন ইয়োরোপীয়ান আহত হন।

একজন স্ত্রীলোক ব্যতীত আক্রমণকারী দলের আর সকলেই পলাইয়া গিয়াছে। পুরুষের পোশাকে সজ্জিতা ২০ বৎসর বয়স্কা এই নারীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তাহার মৃতদেহ ক্লাব ঘর হইতে কিছু দূরে পড়িয়াছিল।...

প্রকাশ যে, এই স্ত্রীলোকটিকে কুমারী প্রতিলতা ওয়াদ্দাদার বি-এ বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে। সে নাকি চট্টগ্রাম শহরের শ্রীযুক্ত জগৎবন্ধু ওয়াদ্দাদারের কন্যা। তাহার পকেটে রিভলবার ও রাইফেলের কতকগুলি কার্তুজ পাওয়া গিয়াছে।'

[আনন্দবাজার ঃ ২৫-৯-৩২]

সবরকম তদন্তকার্য শেষ হবার পরে প্রীতিলতার দেহ ফিরিয়ে দেওয়া হল তাঁর পিতার হাতে। অগ্নিযুগের প্রথম নারী শহীদ বীরাঙ্গনা প্রীতিলতার পুণ্য দেহ অতঃপর ভস্মীভূত হয়ে গেল সবার অগোচরে। ভয়ে কেউ সেদিন তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে আসেনি। সে সাহসও কারো ছিল না।

মৃত্যুর আগের দিন অজ্ঞাতবাস থেকে মাকে লক্ষ্য করে প্রীতিলতা যে চিঠিটা পাঠিয়েছিলেন, তা সত্যিই বড় মর্মস্পর্শী, মল্লিকা। চিঠিটা এখানে তুলে দিলাম ঃ

'মাগো, তুমি আমায় ডাকছিলে ? আমার মনে হলো তুমি আমার শিয়রে বসে কেবলি আমার নাম ধরে ডাকছো, আর তোমার অশ্রু-জলে আমার বক্ষ ভেসে যাচ্ছে। মা, সত্যিই কি তুমি এত কাঁদছো ? আমি তোমার ডাকে সাড়া দিতে পারলাম না—তুমি আমায় ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে গেলে।

স্বপ্নে একবার তোমাকে দেখতে চেয়েছিলাম—তুমি তোমার বড় আবদারের মেয়ের আবদার রক্ষা করতে এসেছিলে ! কিন্তু মা, আমি তোমার সঙ্গে একটি কথাও বললাম না। দুচোখ মেলে কেবল তোমার অশ্রুজলই দেখলাম। তোমার চোখের জল মোছাতে এতটুকু চেষ্টা করলাম না।

মা, আমায় তুমি ক্ষমা করো—তোমায় বড় ব্যথা দিয়ে গেলাম। তোমাকে এতটুকু ব্যথা দিতেও তো চিরদিন আমার বুকে বেজেছে। তোমাকে দুঃখ দেওয়া আমার ইচ্ছা নয়। আমি স্বদেশ-জননীর চোখের জল মোছাবার জন্য বুকের রক্ত দিতে এসেছি। তুমি আমায় আশীর্বাদ কর, নইলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না।

একটিবার তোমাকে দেখে যেতে পারলাম না ! সেজন্য আমার হৃদয়কে ভুল বুঝোনা তুমি। তোমার কথা আমি এক মুহূর্তের জন্য ভুলিনি মা। প্রতিনিয়তই তোমার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

আমার অভাব যে তোমাকে পাগল করে তুলেছে, তা আমি জানি। মাগো, আমি শুনেছি, তুমি ঘরের দরজায় বসে সবাইকে ডেকে ডেকে বলছো —"ওগো তোমরা আমার রাণীশূন্য রাজ্য দেখে যাও।"

তোমার সেই ছবি আমার চোখের ওপর দিনরাত ভাসছে। তোমার এই কথাগুলো আমার হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে কান্নার সুর তোলে।

মাগো, তুমি অমন করে কেঁদোনা ! আমি যে সত্যের জন্য—স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে এসেছি, তুমি কি তাতে আনন্দ পাও না ?

কি করবে মা ? দেশ যে পরাধীন ! দেশবাসী যে বিদেশীর অত্যাচারে জর্জরিত ! দেশমাতৃকা যে শৃঙ্খলভারে অবনতা, লাঞ্ছিতা, অবমানিতা !

তুমি কি সবই নীরবে সহ্য করবে মা ? একটি সন্তানকেও কি তুমি মুক্তির জন্য উৎসর্গ করতে পারবে না ? তুমি কি কেবলই কাঁদবে ?

আর কেঁদোনা মা। যাবার আগে আর একবার তুমি আমায় স্বপ্নে দেখা দিও। আমি তোমার কাছে জানু পেতে ক্ষমা চাইবো।

আমি যে তোমার মনে বড়ই ব্যথা দিয়ে এসেছি মা! ইচ্ছা করে ছুটে গিয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে আসি! তুমি আদর করে আমাকে বুকে টেনে নিতে চাইছো, আমি তোমার হাত ছিনিয়ে চলে এসেছি। খাবারের থালা নিয়ে আমায় কত সাধাসাধিই না করেছো—আমি পেছন ফিরে চলে গেছি।

না, আর পারছি না। ক্ষমা চাওয়া ভিন্ন আর আমার উপায় নেই। আমি তোমাকে দুদিন ধরে সমানে কাঁদিয়েছি। তোমার কাতর ক্রন্দন আমাকে এতটুকু টলাতে পারেনি।

কি আশ্চর্য মা! তোমার রাণী এত নিষ্ঠুর হতে পারলো কি করে? ক্ষমা করো মা ; আমায় তুমি ক্ষমা করো!'

ইতিমধ্যে মামলার রায় বেরিয়ে গেছে।

আইনজীবীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। কাউকে প্রাণদণ্ড দিতে সক্ষম হননি বিচারপতি মিঃ ইউনি।

গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, ফণীন্দ্র নন্দী, সুবোধ চৌধুরী, সুবোধ রায়. আনন্দ গুপ্ত, ফকির সেন, লালমোহন সেন, সুখেন্দু দস্তিদার, রণধীর দাশগুপ্ত, সহায়রাম দাস।

উপরোক্ত ক'জনকে দেওয়া হয়েছে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। নন্দলাল সিংহের দু বছর কারাদণ্ড। অনিলবন্ধু দাসের তিন বছর। বাদ বাকি সবাই খালাস।

অন্য একটি মামলায় সরোজকান্তি গুহকে দেওয়া হয়েছে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। অম্বিকা চক্রবর্তীর প্রাণদণ্ড। তবে সে আদেশ কার্যকর হয়নি। আপীলে দণ্ড হ্রাস করে দেওয়া হয়েছে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। সংবাদপত্র থেকেই তার বিবরণ এখানে আমি তুলে দিচ্ছি ঃ

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার রায়
১২ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

'অদ্য চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার রায় বাহির হইয়াছে ঃ

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইয়াছে ঃ

১। গণেশ ঘোষ, ২। অনন্ত সিংহ, ৩। লোকনাথ বল, ৪। আনন্দ গুপ্ত. ৫। ফণী নন্দী, ৬। সুবোধ চৌধুরী. ৭। সহায়রাম দাস, ৮। ফকির সেন, ৯। লালমোহন সেন, ১০। সুখেন্দু দস্তিদার, ১১। রণধীর দাশগুপ্ত।

কারাদণ্ড

অনিলবন্ধু দাসের তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড, নন্দলাল সিংহের দুই বৎসর কারাদণ্ড।

মুক্তি ও গ্রেপ্তার

অবশিষ্ট ১৬ জন আসামীকে স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল মুক্তিদান করেন। কিন্তু তৎসঙ্গেই তাহাদিগকে অর্ডিন্যান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়।... জেলের ভিতর আসামীদের সমক্ষে রায় প্রদত্ত হয়। আসামীরা উৎফুল্লভাবে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি সহকারে রায় গ্রহণ করে বলিয়া জানা গিয়াছে।

সুদীর্ঘ ১৯ মাস যাবৎ শুনানীর পর অদ্য চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার যবনিকাপাত হইয়াছে। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখে উক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়। জিলা ও দায়রা জজ মিঃ জে. ইউনি., আই. সি. এস. (প্রেসিডেণ্ট), অবসরপ্রাপ্ত জিলা দায়রা জজ মিঃ এন. এন. লাহিড়ী এবং খাঁ বাহাদুর আবদুল হাইকে লইয়া গঠিত ট্রাইবুন্যালে উক্ত মামলার অভিযুক্ত ৩০ জন আসামীর বিচার সমাপ্ত হইল।

যে ১৬ জন আসামীকে মুক্তিদান করা হয় তাহাদিগকে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অনুসারে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিশেষভাবে ভাড়া করা একখানি জাহাজে অন্যান্য দণ্ডিত ১৪ জন আসামীর সঙ্গে তুলিয়া অজ্ঞাত স্থান অভিমুখে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।'

[আনন্দবাজার, ২রা মার্চ, ১৯৩২]

কিন্তু আসল মানুষটি কোথায় ?

কোথায় সেই অগ্নিযুগের সব্যসাচী সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন ?

হাজার চেষ্টা করা সত্ত্বেও যে শাসকদের ঘুম কেড়ে-নেওয়া ঐ মানুষটিকে কোনমতেই ধরা-ছোঁয়া গেল না।

ফলে, সমস্ত আক্রোশ এবার শতধারায় ফেটে পড়ল চট্টগ্রামের অধিবাসীদের ওপর। সংবাদপত্র থেকেই তার খানিকটা বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ

চট্টগ্রামের সমস্ত হিন্দু অধিবাসীর উপর ৮০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ

'২৭শে অক্টোবর তারিখের কলিকাতা গেজেটে নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইয়াছে ঃ—যেহেতু গত দুই বৎসরের যে সমস্ত ঘটনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল তাহা হইতে, ফৌজদারী আদালতের বিচার-ফল হইতে এবং গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত সংবাদ অবগত আছেন তাহা হইতে দেখা যায় যে, ১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে চট্টগ্রামের নিকটস্থ পাহাড়তলীতে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে যে উপদ্রব হইয়াছে তাহা 'ইণ্ডিয়ান

রিপাবলিকান আর্মি, চট্টগ্রাম শাখা' নামক বিপ্লবী সঙ্ঘের সদস্যগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং আরও দেখা যায় যে, চট্টগ্রাম শহর ও জেলার কিছু ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে লোক লইয়া এই সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে।

সেইজন্য সপারিষদ গবর্ণর বাহাদুর ১৯৩২ সালের স্পেশাল পাওয়ার্স অর্ডিন্যান্সের প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে এতদ্দ্বারা সমগ্রভাবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের উপর ৮০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করিতেছেন ঃ

(১) চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটিতে ট্যাক্স দিতে হয়, এরূপ বাসস্থানের মালিক বা বাসিন্দাগণ, (২) পাহাড়তলী রেলওয়ে উপনিবেশের অধিবাসীবৃন্দ এবং পটিয়া, আনোয়ারা, কাননগুপাড়া, সারোয়াতলী, শাকপুরা, কাট্টালি এবং গোমডাণ্ডির অধিবাসীবৃন্দ।'...

[আনন্দবাজার ঃ ২৭-১০-৩২]

চট্টগ্রামে জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা

'চট্টগ্রামের মিউনিসিপ্যাল এলাকাধীন হিন্দু অধিবাসীগণের প্রতি যে জরিমানার আদেশ হইয়াছে, উক্ত জরিমানা আদায়ের জন্য ব্যবস্থা হইতেছে।

প্রকাশ, কয়েকজন সাব-ডেপুটি কলেক্টর কয়েকজন মিউনিসিপ্যাল কর্মচারীর সাহায্যে ঐ ধার্য জরিমানা আদায় করিবেন।'

[আনন্দবাজার ঃ ২১-১১-৩২]

অবশেষে এল সেই ১৯৩৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি।

মাস্টারদা তখন গৈরালা গ্রামে। ইংরেজ সরকার তাঁর মাথার দাম ধার্য করেছেন দশ হাজার টাকা।

গত তিন বছরের মধ্যে একটি লোকও এ ব্যাপারে পুলিশের সঙ্গে কোনোরকম সহযোগিতা করতে এগিয়ে যায়নি। মাস্টারদা যে তাদের বড় আপন জন।

দলের বিশ্বস্ত কর্মী ব্রজেন সেন এ গাঁয়েরই লোক। তিনিই মাস্টারদাকে এখানে নিয়ে এসেছেন তাঁর নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে।

সঙ্গে রয়েছেন শান্তি চক্রবর্তী, কল্পনা দত্ত, সুশীল দাশগুপ্ত, মণি দত্ত প্রমুখ একান্ত অনুগত সহকর্মীর দল।

আশ্রয় দিয়েছেন বিশ্বাস-বাড়ির গৃহবধূ ক্ষিরোদাপ্রভা বিশ্বাস।

মাস্টারদার মতো দুর্ধর্ষ বিপ্লবীকে আশ্রয় দেওয়া মানেই অনিবার্য বিপদকে ডেকে আনা। তবু তিনি নিজের সিদ্ধান্তে স্থির, অবিচল।

বিপদ যদি আসে তো আসুক, তা বলে জেনে-শুনে এই সর্বত্যাগী মানুষটিকে তিনি হিংস্র হায়েনার মুখে ঠেলে দিতে রাজী নন।

বিপদ এল ব্রজেন সেনের দাদা প্রতিবেশী নেত্র সেনের দিক থেকে। স্ত্রী ও ছোট ভাই ব্রজেনের রহস্যময় হাব-ভাব দেখে তিনি অবাক। রাতদিন ওদের দুজনের কিসের এত ফিস্ ফিস্ চাপা গুঞ্জন!

কার জন্য ওরা মাঝে মাঝে বাইরে খাবার নিয়ে যায়! কে সেই লোক!

আসল খবর জানা গেল স্ত্রীর মুখ থেকে।

মাস্টারদা এ গাঁয়েই রয়েছেন।

খাবারগুলো তাঁরই জন্য। অমন লোককে খাওয়ালেও যে পুণ্য হয়!

বটেই তো! শুনেই লাফিয়ে উঠলেন নেত্র সেন। পুণ্য হয় বৈ কি! তা, অমন লোককে তো আর যা-তা খাওয়ানো যায় না! একটু ভাল-মন্দ ব্যবস্থা করতে হয় তো!

যাকে বলে করিৎকর্মা ব্যক্তি! তাই সঙ্গে সঙ্গেই তিনি থলে হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বাজারের উদ্দেশ্যে। এমন সুযোগ কখনো হাতছাড়া করতে আছে! মদ আর জুয়ায় সর্বস্ব যেতে বসেছে। টাকাটা পেলে কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত। সোজা টাকা তো নয়, যাকে বলে কড়কড়ে দশ হাজার টাকা!

সেদিন রাত্রে সহসা কি দেখে ছোট ভাই ব্রজেন সেন চমকে উঠলেন দারুণভাবে।

এ কি! জানালা দিয়ে আলো দেখিয়ে দাদা কাকে সিগন্যাল পাঠাচ্ছেন এমন করে? কি ব্যাপার?

সঙ্গে সঙ্গে ব্রজেন সেন বিদ্যুৎবেগে ছুটে গেলেন বিশ্বাস-বাড়ির দিকে। যে করে হোক মাস্টারদাকে বাঁচাতে হবে। তার জন্য দরকার হলে নিজের প্রাণ দিয়ে দাদার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। মাস্টারদা যে কত বড়! কত মহান!

কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। ক্যাপ্টেন ওয়ামস্‌লীর নেতৃত্বে বিরাট এক গুর্খা বাহিনী বলতে গেলে গোটা বাড়িটাকেই তখন ঘিরে ফেলেছে। মাঝে মাঝে তাদের নিক্ষিপ্ত রকেট বোমার আলোতে সব কিছুই দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পালাবার পথ নেই বললেই চলে।

শুরু হল প্রচণ্ড গুলী-বর্ষণ। হল উভয়পক্ষ থেকেই।

এরই মধ্যে সবাই চেষ্টা করলেন একফাঁকে অন্যত্র সরে যেতে। বাড়ির পেছনে একটা বাঁশের বেড়া। তারপরই ময়লা জল-ভর্তি একটা এঁদো পুকুর। কোনোরকম এ দুটো পেরিয়ে যেতে পারলে এবারের মতো হয়তো রেহাই পাওয়া যেতে পারে।

এগিয়ে গেলেন সুশীল দাশগুপ্ত। প্রথমেই তিনি কোলে করে কল্পনা দত্তকে পৌঁছে দিলেন বেড়ার ওপারে। তারপর আরও দু-একজনকে। এবার মাস্টারদার পালা। কিন্তু কার্যত তা আর হল না। তার আগেই অলক্ষ্য থেকে একটা গুলী এসে সুশীল দাশগুপ্তের হাতটাকেই দিল জখম করে।

এবার নিজেই চেষ্টা করে ওপারে পৌঁছে গেলেন মাস্টারদা, কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলেন না। অন্ধকারে চোখে দেখতে না পেয়ে সহসা তিনি পড়ে গেলেন এক গুর্খা সৈন্যের গায়ের ওপর। ফলে, দীর্ঘদিন বাদে চট্টলসূর্য ধরা পড়লেন স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করে।

পরদিনই সে খবর বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হল সংবাদপত্রের পাতায়ঃ

চট্টগ্রামের সূর্য সেন গ্রেপ্তার

'১৭ই ফেব্রুয়ারি, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্পর্কে ফেরারী সূর্য সেনকে গতরাত্রে পটিয়া হইতে ৫ মাইল দূরে গৈরালা নামক স্থানে—সূর্যকুমার সেন, ওরফে মাস্টারদাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সূর্যকুমার সেনকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার প্রধান ফেরারী আসামী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। গত ১৯৩০ সাল হইতে সূর্যকুমার সেন পলাতক ছিলেন এবং তাঁহাকে ধরাইয়া দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন।'

[আনন্দবাজার ঃ ১৮-২-৩৩]

আর নেত্র সেন ? তাঁর কি হল ? কি হল তাঁর সেই দশ হাজার টাকা পুরস্কারের ? পুরস্কার অবশ্য তিনি ঠিকই পেয়েছিলেন। পেয়েছিলেন কিছুদিন পরেই।

সেদিন রাত্রে সেনমশাই বেশ আয়েস করে খেতে বসেছেন। সারা মুখে তাঁর খুশির ছটা। পুরস্কারের টাকাটা শীগ্‌গিরই পাওয়া যাবে বলে জানা গেছে। আর দেরি নেই !

সত্যিই আর দেরি হল না ! মুহূর্ত বাদেই দেখা গেল যে, তিনি আর তিনি নেই। ভোজালীর এক কোপেই তাঁর মুণ্ডটা ধড় থেকে আলাদা হয়ে ভাতের থালার ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে।

কে সেই দুর্ধর্ষ তরুণ, যিনি সেদিন সেই ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতককে চরম শাস্তি দিয়েছিলেন নিজের হাতে ? কি তার নাম ?

অনেক প্রশ্ন করেও চটুল-বিপ্লবীদের কাছ থেকে এর কোন সদুত্তর এতদিন আমি পাইনি, মল্লিকা। পেয়েছি মাত্র দিন কয়েক আগে। কথায় কথায় ওঁরাই সেদিন সে কাহিনী উজাড় করে দিয়েছিলেন আমার কাছে।

নাম তাঁর—কিরণ সেন। সঙ্গে ছিলেন আরো একজন।

উল্লেখযোগ্য যে, মাস্টারদা তখনও বেঁচে ছিলেন। তিনি জেনে গিয়েছিলেন যে, সেই দেশদ্রোহী নেত্র সেনকে চরম দণ্ড দিতে তাঁর মন্ত্রশিষ্যগণ এতটুকুও ভুল করেনি।

মাস্টারদা বন্দী। কিন্তু কল্পনা দত্ত ! তাঁর কি হল ? সংবাদপত্র থেকেই সে কাহিনী তুমি শোন ঃ

শ্রীমতী কল্পনা দত্ত নিখোঁজ

শ্রীমতী কল্পনা দত্ত এখনও নিখোঁজ। তাঁহাকে খোঁজ করিবার জন্য প্রবল চেষ্টা চলিতেছে। পুলিশ তাঁহার পিতার এবং বাড়ির অন্যান্য সকলের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি আটক করিয়াছে।

[আনন্দবাজার ঃ ৩-২-৩৩]

যুব-বিদ্রোহের কার্য-কলাপ কিন্তু এখানেই শেষ হল না, মল্লিকা।

এবার হাল ধরলেন প্রিয় শিষ্য তারকেশ্বর দস্তিদার। তাঁর প্রথম লক্ষ্য জেল ভেঙে মাস্টারদাকে মুক্ত করে আনা। যে করে হোক, যে কোন মূল্যের বিনিময়ে হোক, মাস্টারদাকে চাই-ই! মাস্টারদার অভাব যে কোনদিনই পূর্ণ হবার নয়!

শুরু হল প্রস্তুতি-পর্ব। প্রথমেই বিচারাধীন বন্দী সুখেন্দু দত্ত আর অমূল্য বিশ্বাস ধীরে ধীরে জাল ছড়াতে লাগলেন জেলের ভেতরে।

চাল ব্যর্থ হয় না। সিপাই, জমাদার, ওয়ার্ডার, ডাক্তার প্রভৃতি অনেকেই সে জালে ধরা দিতে লাগল আস্তে আস্তে। ক্রমশ আটটা রিভলবার, প্রচুর বিস্ফোরক পদার্থ, বিভিন্ন সেল ও ফটকের ডুপ্লিকেট চাবি ইত্যাদি সব কিছুই একে একে গিয়ে জড়ো হল জেলের অভ্যন্তরে।

তবু কিছুতেই কিছু হল না। সেই আগেকার মতো এবারও সব কিছু ফাঁস হয়ে গেল দলের বিশ্বস্ত কর্মী শৈলেশ রায়ের আকস্মিক গ্রেপ্তারের ফলে।

১৯শে মে তারিখে শুরু হল গহিরা-সংঘর্ষ।

তারকেশ্বর দস্তিদার, কল্পনা দত্ত, মনোরঞ্জন দাস প্রমুখ পলাতক বিপ্লবিগণ সবাই সেদিন গহিরা গ্রামের সেই গোপন আড্ডায় উপস্থিত। হঠাৎ রব উঠল—পুলিশ! পুলিশ! তারপরই শুরু হল একটানা গুলী-বর্ষণ—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

বিরাট সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে রিভলবারের শক্তি আর কতটুকু। ফলে, অব্যর্থ গুলীর আঘাতে প্রথমেই লুটিয়ে পড়লেন দলের তরুণকর্মী মনোরঞ্জন দাস। তারপর গৃহস্বামী পূর্ণ তালুকদার আর নিশি তালুকদার।

বাধ্য হয়েই তখন কল্পনা দত্ত, তারকেশ্বর দস্তিদার প্রমুখ সবাইকে ধরা দিতে হল একে একে। তাছাড়া উপায় কি!

এবার নতুন নেতা নির্বাচিত হলেন বিনোদবিহারী দত্ত।

ইতিপূর্বে বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেনকে মৃত্যুদণ্ড দান, কুমিল্লার কুখ্যাত এলিসন হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি বিভিন্ন সংগঠনের ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ওদিকে সবার অলক্ষ্যে শুরু হল বিচারের প্রহসন। আসামী চট্টলসূর্য সূর্য সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত। যে সূর্য সেনের ভয়ে সাম্রাজ্যবাদী সরকার গত তিন বছরের মধ্যে একটি দিনও নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেনি, তাঁকে যে তারা এত সহজে রেহাই দেবে না, তা বলাই বাহুল্য। কাজেও তাই হল। দুজনকেই দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড। কল্পনা দত্তর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

এবার প্রতিশোধ নেবার পালা।

কিন্তু কে নেবে প্রতিশোধ? বলতে গেলে সবাই তখন কারা-প্রাচীরের অন্তরালে। এ অবস্থায় কে নেবে এই গুরুদায়িত্বভার!

'আমরা নেব।'

এগিয়ে এলেন নিত্যগোপাল সেন, হিমাংশু চক্রবর্তী, কৃষ্ণ চৌধুরী,

হরেন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ চট্টলের মৃত্যুভয়হীন বালকবৃন্দ। অগ্নি-ঋষি মাস্টারদার প্রতি এই অন্যায় দণ্ডাদেশ কিছুতেই আমরা মুখ বুজে সহ্য করব না। এর জবাব আমরা দেবই।

জবাব দিলেন ৭ই জানুয়ারি পল্টনের ক্রিকেট খেলার মাঠে।

শ্বেতাঙ্গ সমাজের সবাই সেদিন উপস্থিত। চারপাশে পুলিশ ও মিলিটারীর নিবিড় বেষ্টনী। সুতরাং আশঙ্কার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও অমিতবিক্রমে এগিয়ে গেলেন চট্টলের সেই বীর বালকবৃন্দ। তারপরই কান-ফাটানো আওয়াজ বুম্‌ম্‌ম্! বুম্‌ম্‌ম্! সেই সঙ্গে রিভলবার-গর্জন—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

রক্তে রক্তে স্নান করে উঠলেন পুলিশ সুপার মিঃ ক্রিয়ারী! আহতের সংখ্যাও কম হল না। তারপরই শুরু হল পুলিশ ও মিলিটারীর পাল্টা-আক্রমণ।

যা অনিবার্য তাই হল। নিত্যগোপাল সেন আর হিমাংশু চক্রবর্তী ঘটনাস্থলেই নিহত হলেন। কৃষ্ণ চৌধুরী আর হরেন্দ্র ভট্টাচার্য প্রাণ উৎসর্গ করলেন ফাঁসির রজ্জুতে ৫-৬-৩৪ তারিখে।

তালিকা এখানেই শেষ নয়। এর বাইরেও আরো কয়েকজন তরুণকর্মী বিভিন্ন ঘটনায় প্রাণ দিয়েছেন, যাঁদের কথা এখানে বলা হয়নি। তাঁরা হলেন হিমাংশু সেন, অর্ধেন্দু দস্তিদার, শৈলেশ্বর চক্রবর্তী, ধীরেন দে প্রমুখ শহীদবৃন্দ। চট্টল যুব-বিদ্রোহে এঁদের কারো ভূমিকাই কম উল্লেখযোগ্য নয়।

১৯৩৪ সাল। ১১ই জানুয়ারি। সন্ধ্যা সাতটা।

সহসা একটা চাপা চঞ্চলতা ছড়িয়ে পড়ল চট্টগ্রাম জেলে আবদ্ধ যুব-বিদ্রোহের বন্দীদের মধ্যে। মাস্টারদা! মাস্টারদা! মাস্টারদা!

কন্‌ডেম্‌ড্ সেল থেকে ওয়ার্ডারের সাহায্যে মাস্টারদা গোপনে একটি বাণী পাঠিয়েছেন তাঁর সহকর্মীদের উদ্দেশে। তাঁর শেষ বাণী।

কাগজের দু পাতায় লেখা মাস্টারদার সেই অমূল্য অন্তিম বাণীটি আমি এখানে তুলে দিচ্ছি, মল্লিকা:

'Ideal and Unity is my farewell message. Rope is hanging over my head. Death is knocking at my door. Mind is soaring towards Eternity. This is the time for 'Sadhana', this is the time for preparation to embrace death as a friend and this is the time to recall lights of other days as well.

Sweet remembrance of you all, my dear brothers and sisters, break the monotony of my life and cheer me up. At such a pleasant, at such a grave, at such a solemn moment, what shall I leave behind for you? Only one thing, that is my dream, a golden dream—a dream of free India. How auspicious a moment it was, when I first saw it. Throughout my life most

passionately and untiringly I have pursued it like a lunatic. I know not how far I proceeded towards the fulfilment of my dream. I know not where I am compelled to stop my pursuit today. If icy hands of death give you a touch before the goal is reached, then give the charge of your further pursuit to your followers as I do today. Onward my comrades, onward —never fall back. The day of bondage is disappearing and dawn of freedom is ushered in. Be up and doing. Never be disappointed. Success sure. God bless you.

Never forget the 18th April, 1930, the day of Eastern Rebellion in Chittagong. Keep ever fresh in your memory the fights of Jallalabad, Julda, Chandernagar and Dhalghat. Write in red letters in the core of your hearts the names of all patriots who have sacrificed their lives at the altar of India's freedom.

My earnest appeal to you—there would be no division in our organization. My blessings to you all inside and outside the jail.

Fare you well.

Chittagong Jail — Long live Revolution!
11th Jan., '34. — 'Bandemataram !'
at 7 p. m.

'আমার শেষ বাণী—আদর্শ ও একতা। ফাঁসির রজ্জু আমার মাথার ওপর ঝুলছে। মৃত্যু আমার দরজায় করাঘাত করছে। মন আমার অসীমের পানে ছুটে চলেছে। এই তো আমার সাধনার সময়। এই তো আমার মৃত্যুকে বন্ধুর মতো আলিঙ্গন করার সময়, হারানো দিনগুলোকে নতুন করে স্মরণ করার সময়।

আমার ভাইবোনগণ, তোমাদের সবার উদ্দেশে বলছি—আমার এই বৈচিত্র্যহীন জীবনের একঘেয়েমিকে তোমরা ভেঙে দাও, আমাকে উৎসাহ দাও। এই আনন্দময়, পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমি তোমাদের জন্যে কি রেখে গেলাম? শুধু একটিমাত্র জিনিস, তা হল আমার স্বপ্ন। একটি সোনালী স্বপ্ন। স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন। এক শুভ মুহূর্তে আমি প্রথম এই স্বপ্ন দেখেছিলাম। উৎসাহ ভরে সারাজীবন তার পেছনে উন্মত্তের মতো ছুটেছিলাম। জানি না, এই স্বপ্নকে আমি কতটুকু সফল করতে পেরেছি।

আমার মৃত্যুর শীতল স্পর্শ যদি তোমাদের মনকে এতটুকু স্পর্শ করে, তবে আমার এই সাধনাকে তোমরা তোমাদের অনুগামীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিও—যেমন আমি তোমাদের দিয়েছিলাম। বন্ধুগণ, এগিয়ে চলো। কখনো

পিছিয়ে যেও না। দাসত্বের দিন চলে যাচ্ছে। স্বাধীনতার লগ্ন আসন্ন। ওঠো, জাগো। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিলের চট্টগ্রাম-বিদ্রোহের কথা কোনদিনও ভুলোনা। জালালাবাদ, জুলধা, চন্দননগর ও ধলঘাট-এর সংগ্রামের কথা সব সময়েই মনে রেখো। যে সব বীর সৈনিক স্বাধীনতা-সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের নাম মনের গভীরে রক্তাক্ষরে লিখে রেখো।

আমার একান্ত অনুরোধ, এই সংগঠনকে তোমরা কোনদিনই ভেঙে দিও না। জেলের বাইরে এবং ভেতরে সবার জন্য আমার আশীর্বাদ ও ভালবাসা হইল। বিদায়!'

চট্টগ্রাম জেল,
১১ই জানুয়ারি, ১৯৩৪ — বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!
সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা — বন্দে মাতরম্* !'

নিঝুম, নিশুতিরাত্রি। চারদিক মৌন, অকম্পিত।

কন্‌ডেম্‌ড্‌ সেলের অভ্যন্তরে মাস্টারদা ঘুমে অচেতন। সারা মুখে তাঁর নিরুদ্বেগ জীবনের সুপ্ত প্রশান্তি।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল দরজা খোলার শব্দে। সব প্রস্তুত। এবার যেতে হবে।

সে দৃশ্য ভোলবার নয়। দৃঢ় নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে বধ্য-মঞ্চের দিকে এগিয়ে চলেছেন মাস্টারদা আর তারকেশ্বর দস্তিদার। মুখে তাঁদের সেই একই ধ্বনি। একই মাতৃমন্ত্র—বন্দে মাতরম্ !

বন্দে মাতরম্ ! নিষ্ফল আক্রোশে গরাদে মাথা ঠুকতে লাগলেন জেলে আবদ্ধ শত শত বন্দীর দল। বন্দে মাতরম্ ! বন্দে মাতরম্ ! মাস্টারদা জিন্দাবাদ !

শুরু হল বেপরোয়া লাঠি-চার্জ। শুধু একবার নয়, বলতে গেলে সারারাত ধরেই। না, কোনরকম জয়ধ্বনি দেওয়া চলবে না। একটি কথাও নয়।

কে কার কথা শোনে! হাজার হাজার পুলিশ ও মিলিটারী মেশিনগান দিয়েও যাঁদের পরাভূত করতে পারেনি, তাঁদের স্তব্ধ করা কি এতই সহজ! তাই সব কিছু তুচ্ছ করে একটানা বেজে চলল সেই মাতৃমন্ত্র—বন্দে মাতরম্। মাস্টারদা জিন্দাবাদ!

তাঁদের সঙ্গে সুর মেলাল সাধারণ কয়েদীর দল—মাস্টারদা জিন্দাবাদ! মাস্টারদা জিন্দাবাদ! মাস্টারদা জিন্দাবাদ!

সে সুর মিলিয়ে গেল দূর থেকে দূরান্তরে। সেখানেও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কণ্ঠে রব উঠল—মাস্টারদা জিন্দাবাদ! মাস্টারদা জিন্দাবাদ!

সূর্য অস্ত গেল, কিন্তু মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই আবার নতুন করে

* চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের অন্যতম সৈনিক শ্রদ্ধেয় অর্ধেন্দু গুহর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

আকাশে সূর্য উঠল অমর জ্যোতির লেখায়। সে নতুন আলো বাংলার দিকে দিকে, প্রতিটি ধূলিকণাতে আবার নতুন করে লিখে দিল—'মাস্টারদা জিন্দাবাদ! তোমার মৃত্যু নেই, তুমি অমর, মৃত্যুঞ্জয়ী!'

—'ওরা বীর, ওরা আকাশে জাগাতো ঝড়
ওদের কাহিনী বিদেশীর খুনে
গুলি, বন্দুক, বোমার আগুনে
আজো রোমাঞ্চকর।'

—কবি সুকান্ত

অগ্নিযুগ।

ছোট্ট একটি শব্দ। কিন্তু কি গভীর নিষ্ঠা, কি অপরিসীম আত্মত্যাগ, কি অশেষ নির্যাতনের কাহিনীই না জড়িয়ে আছে ছোট্ট ঐ শব্দটির মধ্যে!

তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। বোধহয় হবেও না কোনোদিন।

শুরু হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। তারপর শুধু ইতিহাস আর ইতিহাস। স্বাধীনতার বেদীমূলে শত সহস্র শহীদের নিঃশেষ আত্ম-বিসর্জনের রক্তরাঙা ইতিহাস।

১৯৩০ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় শেষপর্ব। তার প্রথম সূত্রপাত—চট্টগ্রাম সশস্ত্র বিপ্লব। তারপর এখানে-ওখানে সর্বত্র।

সুভাষ প্রসঙ্গে আমি শুধু তাঁর সমসাময়িক কাল, অর্থাৎ এই তৃতীয় পর্ব থেকেই কিছু কিছু অংশ তোমাকে শোনাতে চেষ্টা করব, মল্লিকা।

চট্টগ্রাম সশস্ত্র বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল।

সুভাষ তখন জেলে। অপরাধ—গত বছরের আগস্ট মাসে নিখিল ভারত লাঞ্ছিত রাজনৈতিক দিবস উপলক্ষে সরকারী নির্দেশ অমান্য করে শোভাযাত্রা পরিচালনা করা। ফলে, মোট ন'মাস সশ্রম কারাদণ্ড।

অসহযোগ আন্দোলনের বন্দীদের ভিড়ে আলিপুর জেল তখন জম-জমাট। সুভাষ ছাড়া অন্যান্য নেতৃবৃন্দও রয়েছেন তাঁদের মধ্যে।

সোরগোল তুলল সাধারণ সত্যাগ্রহী বন্দীর দল। ওসব সি-ক্লাস চোর-গাঁটকাটাদের সঙ্গে থাকতে আমরা রাজী নই। তাছাড়া কয়েদী পোশাক আমরা পরব না।

—পরবে না মানে! গর্জে উঠল জেল-সুপার মেজর সোমদত্, আলবৎ পরতে হবে। তাছাড়া থাকতেও হবে সি-ক্লাসে।

—কক্ষণো না। কিছুতেই না। বলো ভাইসব—বন্দে মাতরম্...

—বটে! সোমদত্-এর নির্দেশে সঙ্গে সঙ্গে পাগলা-ঘণ্টি বেজে উঠল ঢং ঢং করে।

রে-রে করে ছুটে এল পুলিশ, হাবিলদার, ওয়ার্ডার ও সার্জেণ্টের দল। হঠাৎ এই তলব কেন?

—সবাইকে লক্‌আপে বন্ধ কর। আদেশ দিল মেজর সোমদত্, এক্ষুণি! জলদি!

ওদিকে ঘণ্টা শুনে ততক্ষণে ওয়ার্ড ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন

সুভাষ, যতীন্দ্রমোহন, সত্য বক্সী প্রমুখ খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দ। সবার চোখে-মুখে সপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা। কি ব্যাপার! অসময়ে এই পাগলা-ঘণ্টি কেন?

—কাউকে বাইরে থাকতে দেওয়া হবে না। সুভাষ প্রমুখ সবাইকে দেখেই সগর্জনে বলল মেজর সোমদত্, আমার হুকুম, এক্ষুণি সবাইকে যার-যার ওয়ার্ডে ফিরে যেতে হবে। ইমিডিয়েট্‌লী!

গ্রাহ্যও করলেন না কেউ। ওসব পুলিশী হুঙ্কারকে তাঁরা থোড়াই পরোয়া করেন।

—বটে! রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে সোমদত্ এবার আদেশ দিল, চার্জ!

সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র পশুর দল ঝাঁপিয়ে পড়ল সুভাষের বলিষ্ঠ দেহটার ওপর। তারপর শুধু প্রহার আর প্রহার! যাকে বলে অমানুষিক প্রহার!

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সত্য বক্সী, কিরণশঙ্কর রায়, সত্য গুপ্ত, নৃপেন ব্যানার্জী প্রমুখ নেতৃবৃন্দও রেহাই পেলেন না। ঢালাও হুকুম যখন পাওয়া গেছে, তখন ভাবনা কি! সুতরাং পেটাও। সব ক'টাকে পেটাও। আচ্ছা করে পেটাও!

সেকি অট্টহাস্য তখন জেল-সুপার মেজর সোমদত্-এর! এতবড় সাহস তোমাদের! আমাকে সম্মান দেখাবে না! তাহলে দেখ যে, লাঠির জোরে আমি সম্মান আদায় করতে পারি কি না!

দেখতে দেখতে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল মহানগরীর সর্বত্র।

আলিপুর জেলে লাঠি চার্জ। কতকগুলো নিম্নশ্রেণীর পাঠান কয়েদীকে লেলিয়ে দিয়ে জেল-সুপার সোমদত্-এর পৈশাচিক উল্লাস।

সুভাষ গুরুতর আহত। এখনো তাঁর জ্ঞান ফেরেনি। বাঁচবেন কিনা বলা শক্ত!

সেদিনের কলকাতার অবস্থা আজ বোধহয় তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, মল্লিকা।

সেকি তীব্র উত্তেজনা সেদিন সারা শহর জুড়ে! এতবড় স্পর্ধা ঐ পাঞ্জাবী-পুঙ্গব মেজর সোমদত্-এর! এর প্রতিকার চাই! বিচার চাই!

লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাষা রূপ পেল বি. ভি.-র মুখপত্র 'বেণু'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়ের ভাষায়। সম্পাদকীয় স্তম্ভে তিনি লিখলেন—'আমরা বাংলার সেই তারুণ্য শক্তিকে আহবান করি, যে শক্তি গোটা আলিপুর জেল উপড়ে ফেলে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে সরকারের এই অপকর্মের প্রতিবাদ করবে।'

বিপ্লবীর পরিচয় তাঁর কথায় নয়, কাজে। তাই দলীয় নির্দেশে বীরেন ঘোষ ও অন্য একজন বিপ্লবী সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন গুলী-ভরা রিভলবার পকেটে নিয়ে। সোমদত্-এর শির চাই! নিজের রক্ত দিয়েই তাকে সুভাষের এই রক্তের ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

কোথায় সোমদত্! অত কাঁচা লোক সে নয়। বাঙালী যে কি চীজ, তা ইতিমধ্যেই তার জানা হয়ে গেছে। তাই হাজার প্রয়োজনেও সেপাই-সান্ত্রী পরিবৃত আলিপুর জেলের সেই দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে বাইরে পা বাড়াতে আর কোনমতেই সে প্রস্তুত নয়।

শেষপর্যন্ত কেঁদে পড়ল পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের কাছে গিয়ে। ওদের হাত থেকে আপনি আমাকে বাঁচান, পণ্ডিতজী! আপনার পায়ে পড়ি!

—গেট আউট! গর্জে উঠলেন পণ্ডিত মালব্য, এতবড় স্পর্ধা তোমার! কার গায়ে তুমি হাত দিয়েছ জানো! যাও, দূর হও আমার সম্মুখ থেকে। আমি তোমার মুখ-দর্শনও করতে চাইনে।

সঙ্গে সঙ্গে বীর-পুঙ্গব বাংলাদেশ থেকে হাওয়া। কথায় বলে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম! আগে তো প্রাণ বাঁচুক, তারপর অন্য কথা।

শুরু হল নতুন পরিকল্পনা। কি করা যায় এখন! সোমদত্ পলাতক। তা বলে রক্তের অক্ষরে লেখা সংকল্প তো আর মিথ্যে হতে পারে না! জবাব যে একটা কিছু দিতেই হবে, এমন জবাব দিতে হবে, যা জন্মেও যেন কোনদিন ওরা ভুলে না যায়!

কি সেই জবাব! পরে তোমাকে সেকথা বলছি।

১৯৩০ সাল।

ওদিকে চট্টলসূর্য সূর্য সেন তখন ইতিহাসের পর ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠেছে এদিককার বিভিন্ন বৈপ্লবিক সংস্থাগুলি।

আর দেরি নয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে অবকাশ দিলে চলবে না। এবারে এদিক থেকে আঘাত হানতে হবে। চারদিক থেকে আঘাত হেনে ওদের যাঁতিকলে পিষে মারতে হবে।

প্রথমেই আঘাত হানলেন যুগান্তর দলের দুই দুঃসাহসী তরুণ দীনেশ মজুমদার আর অনুজা সেন।

২৫শে আগস্ট। বেলা তখন প্রায় ১১টা।

ডালহৌসী স্কোয়ার ইস্ট-এ দাঁড়িয়ে দীনেশ মজুমদার আর অনুজা সেন। একটু দূরে শৈলেন নিয়োগী, অতুল সেন আর কালীপদ ঘোষ।

বিপ্লব আন্দোলনের পয়লা নম্বরের শত্রু পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্ট রোজই এ সময়ে লালবাজারে গিয়ে থাকেন তাঁর নিজের গাড়িতে করে। আজ আর তাঁর নিস্তার নেই।

সময় হয়ে এল বলে! ঐ যে দূরে তাঁর গাড়িটা বাঁক নিয়েছে। ঐ যে এগিয়ে আসছে একটু একটু করে।

নিমেষে উঁচু হয়ে উঠল দীনেশ মজুমদারের হাতটা। পরক্ষণেই তিনি তীব্র আক্রোশে মারাত্মক টি. এন. টি. বোমাটাকে ছুঁড়ে দিলেন টেগার্টের গাড়ি লক্ষ্য করে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ কেঁপে উঠল গোটা ডালহৌসী স্কোয়ার অঞ্চলটা—বুম্ম্ম্!

ধোঁয়া সরে যেতেই পরিণতি লক্ষ্য করে উত্তেজনায় বলিষ্ঠ দেহটা ফুলে উঠল দীনেশ মজুমদারের।

না, ঠিক মতো লাগেনি। গাড়ির বাঁ-দিকের দরজায় লেগে বাইরে ফেটে পড়েছে। ফলে, ড্রাইভারের ডান হাতটা সামান্য জখম হয়েছে, কিন্তু টেগার্ট সম্পূর্ণ নিরাপদ।

আর অনুজা ? তাঁর কি হল ?

কি দুর্ভাগ্য ! সামান্য দেরি হল তাঁর বোমাটা ছুঁড়ে দিতে, আর সেই মুহূর্তেই বিস্ফোরণের ফলে তাঁর গোটা দেহটা গেল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে।

সে এক ভয়ংকর দৃশ্য ! প্রচণ্ড বিস্ফোরণে অনুজার পেট ফেটে গিয়ে তাঁর সমস্ত নাড়ি-ভুঁড়ি রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে। ছড়িয়ে পড়েছে এখানে-ওখানে সর্বত্র।

প্রাণপণ শক্তিতে দেহটাকে সোজা রেখে ঐ অবস্থার মধ্যেই অনুজা এগিয়ে গেলেন সামনের পার্কটাকে লক্ষ্য করে। তবে আর বেশিক্ষণ নয়। হাত বাড়িয়ে কোনরকমে পার্কের একটা রেলিংকে সজোরে চেপে ধরে পরক্ষণেই তিনি লুটিয়ে পড়লেন জীবনী-শক্তির অভাবে। সংগে সংগে সব শেষ।

দীনেশ মজুমদারও রেহাই পেলেন না। চেষ্টা করলেন নিজের রক্তাক্ত দেহ নিয়ে পলায়নপর জনতার ভিড়ে মিশে যেতে। জোর করে গেলেনও কিছুটা দূর, তারপরই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন শক্ত মাটির বুকে। তারপর আর কিছুই মনে নেই।

অদ্ভুত লোক এই চার্লস টেগার্ট। কেউ কখনো তাঁর হাতের মুঠো থেকে বড় একটা ফস্‌কে যেতে পারেনি। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না।

দলের অন্যতম প্রধান নেতা ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ও কিরণ মুখার্জী আগেই ধরা পড়েছিলেন।

বোমা বিস্ফোরণের পরে প্রথমেই ধরা পড়লেন ডাঃ নারায়ণ রায়। তারপর ডাঃ ভূপাল বসু। অবশেষে যতীশ ভৌমিক, কালীপদ ঘোষ, সুরেন দত্ত, রোহিণী অধিকারী, অদ্বৈত দত্ত, অম্বিকা রায় প্রমুখ সবাই।

মেয়েরাও বাদ গেলেন না। বিপ্লবী দলের বিশিষ্টা সভ্যাদের মধ্যে শোভারাণী দত্ত, কমলা দাস, রেণু সেন প্রমুখ সবাই ধরা পড়লেন একে একে।

বোমা ষড়যন্ত্রের অন্যতম নেপথ্য-নায়ক রসিক দাসও ধরা পড়লেন সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ই তারিখে। সব শেষে ধরা পড়লেন গড়পার লেডিজ হোস্টেলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট কমলা দাশগুপ্তা—বোমা ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে যাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

একমাত্র ব্যতিক্রম মনোরঞ্জন গুপ্ত। তাও বেশিদিন নয়। মাস তিনেক বাদে তিনিও একদিন ধরা পড়ে গেলেন আকস্মিকভাবে। ফলে, দলের স্বাভাবিক গতি স্বভাবতই একটু মন্থর হয়ে পড়ল সাময়িকভাবে।

এবার বিচারের পালা। হাজার চেষ্টা করেও শেষপর্যন্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে মেয়েদের মামলায় জড়ানো সম্ভব হল না। তাই বাধ্য হয়েই তাঁদের ছেড়ে দিতে হল একে একে। কমলা দাশগুপ্তাও একদিন ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে এলেন জেলের বাইরে।

শুরু হল মামলা। একটা নয়, দুটো। প্রথমটা কেবলমাত্র দীনেশ

মজুমদারের বিরুদ্ধে। অন্যটা বাদ বাকি সবার বিরুদ্ধে।

বিচারে কঠোর সাজা দেওয়া হল সবাইকে। দীনেশ মজুমদারকে দেওয়া হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। পরেরটার বিবরণ সংবাদপত্র থেকেই শোন ঃ

কলিকাতা বোমার মামলায় কঠোর দণ্ডাদেশ

'গতকল্য আলিপুর স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে কলিকাতা বোমা ষড়যন্ত্রের মামলার রায় দেওয়া হইয়াছে। ১০ জন আসামীর মধ্যে ৮ জনের উপর ১০ বৎসর হইতে ২০ বৎসর পর্যন্ত দ্বীপান্তরের আদেশ হইয়াছে। আসামী অতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী ও শরৎচন্দ্র দত্ত মুক্তিলাভ করিয়াছেন।'

দণ্ডের বহর

'ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায় এম. বি. কলিকাতা কর্পোরেশনের একজন কাউন্সিলার। ইনি ও ডাঃ ভূপাল বসু এম. বি. উভয়েই বিস্ফোরক আইনের ৪-বি ধারার সহিত পঠিত ১২০-বি ধারানুসারে প্রত্যেকে ২০ বৎসর করিয়া দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ দত্ত ও রসিকলাল দাস বিস্ফোরক আইনের ৪-বি ধারার সহিত পঠিত ১২০-বি ধারানুসারে ১৫ বৎসর করিয়া দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

যতীশচন্দ্র ভৌমিক ও অম্বিকাচরণ রায়, ওরফে নন্দ ও আদিত্যচরণ দত্ত ১২ বৎসর করিয়া দ্বীপান্তর দণ্ডে ও ৩০২ ধারার সহিত পঠিত ১২০-বি ধারানুসারে ৮ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

রোহিণীকান্ত অধিকারী ১০ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

[আনন্দবাজার, ২৮শে নভেম্বর, ১৯৩০]

মামলার রায়ে আরও বলা হল ঃ ৭১নং মির্জাপুর স্ট্রীট ও সরস্বতী প্রেস হচ্ছে মূলকেন্দ্র, যেখান থেকে এই ষড়যন্ত্রের অনুপ্রেরণা এসেছে। এবং যার সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছেন মনোরঞ্জন গুপ্ত, অরুণ গুহ ও ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত প্রমুখ যুগান্তর দলের নেতৃবৃন্দ।

আপীলে কিছুটা হের-ফের হল। সেখানে ডাঃ রায় ও ডাঃ ভূপাল বসুর হল পনেরো বছর। সুরেন দত্তের বারো বছর। যতীশ ভৌমিকের দু বছর।

আর প্রমাণাভাবে মুক্তি দেওয়া হল রসিক দাস, অদ্বৈত দত্ত ও অম্বিকা রায়কে।

তবে এ মুক্তি—মুক্তি নয়। ছাড়া পাবার সঙ্গে সঙ্গে জেলগেটেই আবার তাঁদের গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে আটক করে রাখা হল বছরের পর বছর ধরে।

তবে দীনেশ মজুমদারকে কিন্তু বেশিদিন ধরে রাখা সম্ভব হল না। বছর দুয়েক বাদেই একদিন তিনি উধাও হলেন মেদিনীপুর জেলের আকাশ-ছোঁয়া উঁচু পাঁচিল ডিঙিয়ে। তীব্র সংঘর্ষের ফলে আবার ধরা পড়লেন ১৯৩৩ সালের ২২শে মে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে।

এবার সাজা হল প্রাণদণ্ড। সে আদেশ কার্যকর হল ১৯৩৪ সালের ৯ই জুন তারিখে।

এবার দুর্বার বেগে এগিয়ে এল সেই বি. ভি.। আঘাতের পর আঘাত হেনে দেখতে দেখতেই বি. ভি.-র দুর্ধর্ষ তরুণবৃন্দ ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী দম্ভকে একেবারে মিশিয়ে দিলেন পথের ধুলোতে।

সর্বাধিনায়ক হেমবাবুর কথা তোমাকে আগেই বলেছি। এলোমেলো-ভাবে কাজ করতে কোনদিনই তিনি অভ্যস্ত নন। তাঁর প্রথম কথাই হল—ডু অর ডাই!

লক্ষ্যভেদ না করে কারও ফিরে আসা চলবে না। তার জন্য যদি প্রাণ যায় তো যাক, তবু কার্যোদ্ধার করা চাই-ই। আর আঘাত করতে হবে ব্রিটিশ শাসন-যন্ত্রের স্টিলফ্রেম বাছাইকরা সব শ্বেতাঙ্গ অফিসারদের ওপর, কোন সাধারণ লোককে নয়।

রক্তের অক্ষরে শপথ নিলেন বি. ভি.-র বিপ্লবী তরুণবৃন্দ। তাই হবে। কথা দিলাম যে, কার্যোদ্ধার না করে কোন ক্ষেত্রেই আমরা ফিরে আসব না। একটি প্রাণীও না।

প্রথম টার্গেট—বাংলার ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ মিঃ এফ. জে. লোম্যান।

সেই লোম্যান, যাকে লক্ষ্য করে চট্টগ্রাম কালারপোল সংগ্রামের বীর শহীদ দেবপ্রসাদ গুপ্ত তাঁর অন্তিম মুহূর্তে খেদোক্তি করে বলেছিলেন—'আমার হাতটা অকেজো হয়ে পড়েছে, নইলে লোম্যানকে আমি গুলী করতাম।'

পরিকল্পনা প্রস্তুত। অস্ত্র-শস্ত্রও পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। এখন শুধু সুযোগের অপেক্ষা মাত্র।

সুযোগ পাওয়া গেল ১৯৩০ সালের ২৯শে আগস্ট। ডালহৌসী স্কোয়ারের ঘটনার ঠিক চার দিন বাদে।

সকাল তখন প্রায় ন'টা। হঠাৎ ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতাল প্রাঙ্গণ থেকে ভেসে এল পর পর কয়েকটা রিভলবারের গর্জন—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

সঙ্গে সঙ্গে দুজনকে লুটিয়ে পড়তে হল শক্ত মাটির বুকে। একজন বাংলার ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ স্বয়ং মিঃ এফ. জে. লোম্যান, অন্যজন ঢাকার সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশ কুখ্যাত মিঃ ই. হডসন, ঢাকাতে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বাধাতে যার জুড়ি ছিল না।

পরিকল্পনা ছিল নিখুঁত। জল-পুলিশের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিঃ বার্ট অসুস্থ। চিকিৎসার জন্য তিনি তখন মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুল হাসপাতালে ছিলেন। পুলিশ-সুপার হডসনকে সঙ্গে নিয়ে লোম্যান এসেছিল তাঁকে দেখতে।

বলাই বাহুল্য যে, এ উপলক্ষে সশস্ত্র প্রহরীর ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি ছিল না। সর্বোপরি সাধারণ পোশাক-পরিহিত গুপ্তচরের দল যে কত ছিল, তার বোধহয় গোনাগুনতিই নেই।

তবু কিছুতেই কিছু হল না। ফেরার পথে হাসপাতালের সিঁড়িতে পা দিতেই পাশের দেবদারু গাছের আড়াল থেকে গর্জে উঠল অগ্নিবর্ষী রিভলবার—দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম !

সংগে সংগে উভয়েই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। লোম্যান সম্বন্ধে প্রশ্নই ওঠে না। হডসনও বাঁচবে কিনা বলা শক্ত। কারণ আঘাত গুরুতর। বাঁচলেও তাকে পঙ্গু হয়েই থাকতে হবে আজীবন।

ঘটনাটা যেমন আকস্মিক, তেমনি অস্বাভাবিক। কাছাকাছি প্রতিটি লোক বিভ্রান্ত। প্রতিটি লোক দিশেহারা। কি যে হয়ে গেল, বিশ্বাস করাও যেন শক্ত।

শুধু বিভ্রান্ত হল না সামনেই দাঁড়ানো সরকারী কণ্ট্রাক্টর সতোন সেন। পুরস্কার ও খেতাবের লোভে সংগে সংগেই বাঙালী বীর-পুংগব দুহাতে জাপটে ধরল আততায়ীকে।

না, মশা-মাছি মারবার জন্য আততায়ী তাঁর মূল্যবান গুলীটাকে নষ্ট করতে রাজী হননি। বিনিময়ে দিয়েছেন শুধু একটি মাত্র ঘুষি। ঐ একটি ঘুষিতেই বীর-পুংগবের খেতাবের লোভ ঘুচে গেল জন্মের মতো।

হৈ-চৈ শুনে বাগানের মালী ও ঠাকুর-চাকরদের মধ্যেও ছুটে এসেছিল কেউ কেউ। তবে আততায়ীকে ধরার চাইতে প্রাণ নিয়ে পালানোর ব্যাপারেই যেন তাদের উৎসাহটা বেশি দেখা গেল। ও তো পহেলে নম্বর ডাকু হ্যায় !

এদিকে আততায়ী তখন অদ্ভুত কৌশলে উঠে গেছেন হাসপাতালের একটা উঁচু পাঁচিলের ওপর।

সামনেই একটা গৃহস্থবাড়ির জলের ট্যাংক। নিমেষেই তিনি জলের ট্যাংকের ওপর উঠে একবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তারপরই একলাফে অদৃশ্য হয়ে গেলেন বাড়ির অভ্যন্তরে। আর তাঁকে দেখা গেল না।

খবর শুনে হৈ-চৈ পড়ে গেল চারিদিকে। বলে কি ! এত পুলিশ, এত সেপাই-সান্ত্রী, তার মধ্যে কিনা এই কাণ্ড ! এ যে তাজ্জব ব্যাপার ! নাঃ, দেখালে বটে ! ধন্য ছেলে !

সবাইকে ছাপিয়ে গেলেন মরমী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র। পরদিন বি. ভি.-র অন্যতম নায়ক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়ের মুখের সব কথা শুনে সেকি তাঁর আনন্দ বার বার বলতে লাগলেন একটি মাত্র কথা—ধন্য ছেলে ! বুঝিয়ে দিয়েছে যে, আর আমরা মুখ বুজে সব কিছু সহ্য করতে রাজী নই। প্রয়োজন হলে আমরাও জবাব দিতে জানি। দেখা হলে তাকে আমার আশীর্বাদ জানিও। বলো যে, আমি তাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি।

শহরের সর্বত্র তখন একটা থমথমে ভাব। রাস্তায় লোকজনের চলাচলও তেমন নজরে পড়ে না। এমন কি, ছোট ছোট শিশুরা পর্যন্ত কাঁদতে ভুলে গেছে কি এক অশুভ আশংকায়।

গোয়েন্দা পুলিশের বড়কর্তা নিহত। আঘাতটা যে ব্রিটিশ-সিংহ নিঃশব্দে মেনে নেবে না, তা বলাই বাহুল্য। প্রত্যাঘাতটা এবার কোন্ দিক থেকে আসবে কে জানে !

অনুমান মিথ্যে হল না। শুরু হল অমানুষিক অত্যাচার আর নির্যাতন।

ইঙ্গিত পেয়ে সঙ্গে যোগ দিল শহরের নামী গুন্ডার দল। বাঁশের চাইতে কঞ্চি দড়, সুতরাং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সমাজও বাদ গেল না! যেন তারাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিভূ আর কি!

বিচিত্র এই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সমাজ! ইংরেজ কোনদিনও তাদের স্বজাতি বলে স্বীকার করেনি, আবার নিজ আভিজাত্যের গর্বে ভারতীয়দেরও ওরা আপন জন বলে মেনে নিতে নারাজ। ফলে, ময়ূর-পুচ্ছধারী দাঁড়কাক হয়েই ওরা রইল চিরদিন।

তবে সেদিন কিন্তু ইংরেজ ওদের স্বীকৃতি দিতে এতটুকুও ইতস্ততঃ করল না। তদুপরি সঙ্গে গুন্ডার দল তো আছেই। সুতরাং চালাও এক-তরফা মারপিট, গুন্ডামী আর অত্যাচার! আর লুঠ কর মানুষের যথাসর্বস্ব। মওকা যখন পাওয়া গেছে, তখন এই সুযোগে যত পার হাতিয়ে নাও।

তৎপরতা ব্যর্থ হল না। আততায়ীকে ধরা না গেলেও তদন্তের ফলে তাঁর নাম-ধাম-বিবরণ শেষপর্যন্ত জানতে আর বাকি রইল না শাসকদের।

বিনয় বোস। মেডিকেল স্কুলের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র বিনয় বোস। বিক্রমপুর রাউথভোগ গ্রামের রেবতীমোহন বোসের ছেলে বিনয় বোস। তিনিই এ কান্ডের মহানায়ক। সুতরাং যে করে হোক, বিনয় বোসের শির চাই।

কোথায় বিনয় বোস! বাংলাদেশের প্রতিটি স্থানে তার ছবি টাঙিয়ে দেওয়া হল, পুরস্কারের টাকা পাঁচ থেকে দশ হাজারে গিয়ে দাঁড়াল, তবু তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

ফল হল সুদূরপ্রসারী। বিলেতে অনুষ্ঠিত রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সকে কটাক্ষ করে বেশ একটু শ্লেষভরেই স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু উক্তি করলেন:

'হাফ দি ওয়ার্ক অফ রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স পুট থ্রু, বাই বিনয় বোস।' অর্থাৎ, তোমরা শক্তের ভক্ত নরমের যম। এদ্দিন হাজার বলা সত্ত্বেও আমাদের কথা তোমরা বুঝতে চাওনি। আজ বিনয় বোসের হাতের শক্ত ডান্ডা খেয়ে ঠিক তা বুঝে গেছ।

যাঁকে নিয়ে এত কান্ড সেই বিনয় বোস তখন কোথায়! এবার সেকথাই তোমাকে বলব।

বৃষ্টি! বৃষ্টি! বৃষ্টি!

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। জলে থৈ-থৈ করছে চারদিক। এমন কি, কোন কোন জায়গায় এরই মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত জল জমে গেছে।

ঝড়-জল মাথায় নিয়েই দুটি গ্রাম্য মুসলমান হেঁটে চলেছে শহরের রাজপথ দিয়ে। পরনে ছেঁড়া লুঙ্গী। গায়ে ময়লা গেঞ্জি। হাতে তালিমারা জুতো।

বেশ বোঝা যায় যে, গাঁয়ের কোন গরীব মুসলমান। বোধহয় মামলা করতে শহরে এসেছিল। এবার ঘরের মানুষ ঘরে ফিরে চলেছে।

কে এই লোক দুটি! কি ওদের পরিচয়! অপেক্ষা কর, একটু বাদে নিজেই সব বুঝতে পারবে।

সামনেই দোলাইগঞ্জ স্টেশন। ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ যেতে হলে এটাই ঢাকার পরবর্তী রেলস্টেশন।

আস্তে আস্তে লোক দুটি এবার ঢুকে গেল স্টেশন-এলাকার মধ্যে। সিগন্যাল ডাউন। ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ-গামী গাড়ি আসার সময় হয়েছে।

কিন্তু না, যাত্রীদের আপাতত প্ল্যাটফরমে যাবার হুকুম নেই। আগে প্রতিটি কামরা তন্ন-তন্ন করে সার্চ করা হবে, তারপর তারা যেতে পারবে।

প্রতিটি কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা হল। এমন কি কামরার পায়খানা-গুলোতে পর্যন্ত তল্লাশী চালানো হল। খোলা মালগাড়িগুলোও বাদ গেল না। কিন্তু কোথায় বিনয় বোস! না, এ গাড়িতে সে নেই। এবার যাত্রীরা গাড়িতে উঠতে পারে।

পূর্ণবেগে গাড়িটা ছুটে চলেছে ফতুল্লার দিকে।

কামরার এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে আছে সেই গ্রাম্য লোক দুটি। মুখে নির্বিকার ঔদাসীন্য। চোখে অর্থহীন শূন্যদৃষ্টি। বোধহয় কোর্টে মামলা শেষ করে কতক্ষণে বাড়ি গিয়ে বিবির মুখ দেখতে পাবে, সেই কথাই ভাবছে ওরা মনে মনে।

কামরার অন্য দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদঙ্গল ছেলে। হৈ-চৈ করে বলতে গেলে গোটা কামরাটাকেই ওরা একেবারে মাথায় তুলে রেখেছে। বেশ বোঝা যায় যে, ছুটির পরে মনের আনন্দে ওরা ঘরে ফিরে চলেছে।

আসলে কিন্তু ঐ গ্রাম্য লোক দুটিই সেদিন ওদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, মল্লিকা। যে করে হোক, ওঁদের নিরাপদে নারায়ণগঞ্জে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। দলীয় নির্দেশ ছিল তাই।

চাষাড়া স্টেশন। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। দু'হাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট করে দেখা যায়না। তদুপরি ঝড়-জল-বৃষ্টি তো আছেই।

মাত্র এক মিনিটের বিরতি। গাড়ি আবার আস্তে আস্তে চলতে শুরু করেছে। এর পরের স্টেশনই নারায়ণগঞ্জ।

হঠাৎ একি! বাইরে তীক্ষ্ণ শিস দেবার শব্দ। ডেঞ্জার সিগন্যাল! গেট-আপ্! রেডি! কুইক! নিমেষে গোটা কামরা ফাঁকা।

চোরের ওপর বাটপাড়ি। গোয়েন্দার পেছনে গোয়েন্দা।

ঢাকা থেকে খবর এসেছে, এ গাড়িকে নারায়ণগঞ্জে আবার সার্চ করা হবে। শুধু গাড়িই নয়, প্রতিটি স্টীমার, লঞ্চ, বজরা, পানসী তন্নতন্ন করে তল্লাশী করা হবে।

এ পক্ষের গোয়েন্দা খবরটা ধরে ফেলেছে। সুতরাং গাড়ির পালা এখানেই ইতি। এখান থেকে নারায়ণগঞ্জের দূরত্ব সামান্যই। চল এবার পায়ে হেঁটে।

এখান থেকেই বিদায় নিলেন বঙ্গেশ্বর রায়, বিনয় বসু (জুনিয়ার), বকুল দাশগুপ্ত প্রমুখ ঢাকার বিপ্লবী তরুণবৃন্দ। তাঁদের কর্তব্য শেষ। পরবর্তী দায়িত্ব নারায়ণগঞ্জ গ্রুপের। সুতরাং চল ফিরে এবার ঢাকাতে।

দলীয় সদস্য গিরিজা সেনের বাড়ি রাত কাটিয়ে, পরদিন ভোরে খেয়া পার হয়ে বন্দর।

এপারে নারায়ণগঞ্জ, ওপারে বন্দর। বন্দর আসলে কোন সত্যিকারের বন্দর নয়, জায়গাটার নামই বন্দর। মাঝির লক্ষ্য আপাতত বন্দরের দিকেই।

বন্দর থেকে পায়ে হেঁটে বৈদ্যের বাজার। আবার নৌকো।

তবে এবার আর নকল মাঝি নয়, সত্যিকার মাঝির নৌকো। মেঘনা পাড়ি দিতে হবে।

যাত্রী সেই দুজনই। তবে এরা আলাদা লোক। মিঞাসাহেবদের বদলে এবারে এসেছেন অন্য দুটি প্রাণী। জমিদারবাবু আর ভৃত্য। বোধহয় কোন মহাল বা কাছারী পরিদর্শন করতে চলেছেন।

জমিদারবাবুটি হলেন বি. ভি.-র অ্যাকসন স্কোয়াডের অন্যতম সদস্য সুপতি রায়। আর ভৃত্যটি! নিজেই সেকথা অনুমান করে নাও।

সকাল গড়িয়ে দুপুর, তারপর রাত্রি।

অশান্ত মেঘনা। অবিরাম ঢেউ পড়ছে আর ভাঙছে। অবিরাম সেই ভাঙা-গড়ার শব্দ চলছে। যেন শেষ নেই এই ভাঙা-গড়া মিছিলের।

দেখতে দেখতে এক সময়ে মেঘে মেঘে কালো হয়ে উঠল আকাশটা। শুরু হল ঠাণ্ডা হাওয়া।

শঙ্কায় শুকনো হয়ে উঠল মাঝির মুখ। গতিক সুবিধার নয়। মেঘনা আজ প্রায় সারাদিন ধরেই অশান্ত। বাতাসও ক্ষেপে উঠেছে। মনে হয় বড় রকমের ঝড় উঠবে। মেঘের কুণ্ডলীতে যেন তারই আভাস।

অনুমান মিথ্যে হল না। সহসা ঈশান কোণ থেকে বাতাস ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল উন্মত্তের মতো।

সঙ্গে সঙ্গে উদ্দাম উচ্ছল মেঘনার সেকি বিচিত্র রূপ! সেকি তার নাচের ঘটা!

বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, উৎক্ষিপ্ত দু বাহু আকাশে তুলে দুরন্ত আক্রোশে মুহুর্মুহুঃ সে আঘাত করতে লাগল নৌকোর নড়বড়ে কাঠের খোলটার ওপর। যেন নিজ-রাজ্যে অনধিকার-প্রবেশকারী এই তুচ্ছ প্রাণী ক'টাকে অতল সমাধিতে না পাঠানো পর্যন্ত কোন রকমেই তার শান্তি নেই।

—আর পারলাম না কর্তা। হতাশভাবে বলল মাঝি, বাঁচতে হইলে আবার ঘাটের দিকে নাও ফিরাইতে হইব।

—কি সর্বনাশ! জমিদারবাবুর সারা মুখে চিন্তার কালো রেখা, আমার যে অনেক কাজ পড়ে আছে! যেমন করে হোক, আমাকে পার করে দাও মাঝি। তুমি বরং বেশি পয়সা নিও।

—পয়সা! জানই যদি চইলা যায় তো পয়সা দিয়া কি করুম! এই ঝড়-তুফানের মধ্যে মেঘনা পাড়ি দিতে আমি ক্যান, আমার বাপে আইলেও পারব না।

—তাই তো! চিন্তিত হয়ে পড়লেন জমিদারবাবু, এখন উপায়! কি করা যায় এখন?

—ক্যান, অত চিন্তার কি আছে? মাঝি উপায় বাতলে দিল, অত যখন জরুরী কাম, তখন জাহাজে চইলা যান। সামনেই ফিলেগ ইস্টিশান। কন্ তো ইস্টিশানে তুইলা দিয়া আসি। একটু পরেই জাহাজ আইব।

অগত্যা তাই শেষপর্যন্ত রাজী হয়ে গেলেন জমিদারবাবু। উপায় কি! অনেক টাকা খাজনা বাকি পড়েছে! মহালে গিয়ে টাকাগুলো তুলতে হবে তো!

কোন স্থায়ী স্টেশন নয়, একটা অস্থায়ী ফ্ল্যাগ-স্টেশন মাত্র। তবে আশার কথা এই যে, এখানে পুলিশের কোন সমারোহ নেই। বিনয় বোসের মতো একটা ডেঞ্জারাস ছেলের এখানে আসার কোন কারণ নেই। তাছাড়া পুলিশের বেড়াজাল ডিঙিয়ে আসবেই বা কি করে! সুতরাং পুলিশ রেখে লাভ কি!

স্টীমারটা একটানা ছুটে চলেছে মেঘনার ঢেউ ভেঙে। লক্ষ্য তার ভৈরব।

না, সপারিষদ জমিদারবাবু উধাও হয়েছেন। পরিবর্তে এসেছে আমাদের পূর্বেকার চেনা সেই সহজ সরল গ্রাম্য মুসলমান দুটি।

বিভিন্ন শ্রেণীর যাত্রীর ভিড়। এই প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে জমিদারবাবুটি সেজে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে লাভ নেই। তার চাইতে আগেকার বেশই ভাল।

যথাসময়ে ভৈরব। এবার ট্রেন। স্টেশনে পুলিশ অবশ্য রয়েছে, তা থাক না! দরকার হলে যুঝতে হবে। সমানে সমানে পাল্লা দিতে হবে। আত্মসমর্পণ কোনমতেই নয়। সুতরাং বলতে গেলে পিস্তলের ট্রিগার সর্বক্ষণ মাথা উঁচিয়ে আছে। শুধু নেমে আসার অপেক্ষা মাত্র।

চমক ভাঙল কিশোরগঞ্জ গিয়ে। সর্বনাশ! সারাটা প্ল্যাটফরম জুড়ে লাল-পাগড়ির বেষ্টনী। গাড়ি নাকি সার্চ করা হবে। এখন উপায়! ইতিহাসের শেষপর্বের যে এখনো অনেকটাই বাকি! এরই মধ্যেই কি সব কিছুর ভরাডুবি হবে?

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে একজন রেলওয়ে টি. টি.। একগাল পান চিবোতে চিবোতে কৌতূহলভরে এদিক-ওদিক তাকিয়ে তিনি কি দেখছিলেন কে জানে।

সঙ্গে সঙ্গে দুই মিঞাসাহেব গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে একেবারে ভেঙে পড়ল তাঁর পায়ের কাছে—কর্তা, একটা আকাম কইরা ফালাইছি। এইবারের মতো আমাগো পোলাপানগো মাপ কইরা দেন!

—কি হয়েছে? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন টি. টি.।

—আর কন ক্যান্! তাড়াতাড়ি কইরা গাড়িতে উঠতে গিয়া টিকিট কাটতে পারি নাই! অখন আমাগো ক্ষেমাঘেন্না কইরা দুইখান টিকিটের ব্যবস্থা কইরা দেন। নইলে আমাগো পুলিশে ধইরা লইয়া যাইব। দেখছেন না, কেমন চোখ পাকাইয়া চাইয়া দেখতে আছে!

—দূর পাগল। হেসে বললেন টি. টি., ওসব তোদের জন্য নয়।

—না না, অগো বিশ্বাস নাই। অরা বেবাক পারে। তার থিকা আপনে আমাগো নিজের হাতে দুইখান টিকিট কাইটা দেন। আমরা টাকা দিতে আছি। আপনেরেও কিছু দিমু।

—কোথাকার টিকিট চাই? প্রশ্ন করলেন টি. টি.।

—খাইছে! জাগার নাম তো মনে নাই! মগবুলচাচায় কি যেন কইছিল, বেবাক ভুইলা গেছি। সবুর করেন, মনে কইরা কইতে আছি!—হ—হ, মনে হইছে। কইলকাতা! কইলকাতা! ঐখানে গিয়া আমরা কাপড়ের কলে কাম করুম। নেন, আর দেরি কইরেন না। আপনের চরণ ধরি। লন যাই টিকিট-ঘরে। আমরাও আপনের লগে যাইতে আছি।

মল্লিকা, দিব্যি দুজনে টি. টি.-র পেছনে পেছনে টিকিট-ঘরের দিকে চলে গেলেন ব্রিটিশ পুলিশকে ভাঁওতা দিয়ে। ওরা দেখেও দেখল না। কেনই বা দেখবে! টি. টি.-র হাতে রোজ এমন কত বিনে-টিকিটের যাত্রীই তো ধরা পড়ে! এরাও তাই হবে হয়তো!

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার দুজনে ফিরে এলেন মুখে একগাল হাসি নিয়ে। এদিকে তল্লাশী তখন শেষ, সুতরাং গাড়িতে উঠতে আর কোন বাধা নেই।

মজা হল ময়মনসিং-এ গিয়ে। বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো সহসা তীর-বেগে কামরায় ঢুকলেন একজন দারোগা সাহেব। সঙ্গে জনকয়েক পুলিশ কনস্টেবল।

সঙ্গে সঙ্গে দুজনের অন্য চেহারা। একজন ছেঁড়া কাঁথায় নিজেকে ঢেকে নিমেষে কামরার কাঠের মেঝেতে শুয়ে লম্বমান, অন্যজন দুহাত জোড় করে অদূরে দণ্ডায়মান একান্ত অনুগত ভৃত্য 'কেষ্ট'র মতো।

গাড়ি স্পীড্ নিয়েছে। দারোগা সাহেবও ততক্ষণে বেশ জমিয়ে বসেছেন দলবল নিয়ে। কথাবার্তা থেকে বোঝা গেল, আপাততঃ তিনি জগন্নাথ-ঘাটে চলেছেন মস্তবড় একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে।

তখনকার দিনের দারোগা, সুতরাং দাপট সাংঘাতিক! সিপাইদের লক্ষ্য করে সেকি তাঁর হম্বিতম্বি!

আসুক না বিনয় বোস! আমিও জগন্নাথ-ঘাটে গ্যাঁট হয়ে বসে আছি। চেনে না তো আমাকে! ক্যাঁক্ করে বাছাধনের টুঁটি চেপে ধরব না! এই তেওয়ারী, বন্দুকে সব সময় গুলী ভরে রাখবি। বিশ্বাস নেই বেটাকে। হয়তো ধাঁই করে একখানা মেরে হডসনের মতো কোমর ভেঙে দেবে। আমার আবার 'হার্টে'র ব্যামো! তাই তো এই নতুন মাদুলীটা নিতে হল।

একি! নিমেষে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন দারোগা সাহেব, বন্দুকের নলটা আবার আমার দিকে ধরে রেখেছিস কেন? ওটা একটু ঘুরিয়ে রাখ না বাপু! বলছি আমার হার্টের ব্যামো! এসব ধকল কি আমার সয়!

হঠাৎ ছদ্মবেশী সুপতি রায়কে দেখে চমক ভাঙল দারোগা সাহেবের। তাই তো! এ লোকটা কে? সেই কখন থেকে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেই বা কেন?

—কিরে ! সংগে সংগে নিজের পদমর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন দারোগা সাহেব, অমন ঘোড়ার মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস যে ! ওদিকে বসলেই তা পারিস !

—পোলাপানের মতো কি যে কন হুজুর ! বিনয়ে একেবারে গলে গেলেন সুপতি রায়, আপনে হুকুম না দিলে কি আমরা বইতে পারি ! বেয়াদপী হইব না !

খুশি হলেন দারোগা সাহেব। হ্যাঁ, এই তো চাই। আহা, বিনয় বোসটা যদি এরকম লক্ষ্মীছেলে হত, তাহলে এমন হাটের ব্যামো নিয়ে আর এভাবে দৌড়-ঝাঁপ করতে হত না তাঁকে।

—ঠিক আছে, তুই বোস ওদিকে। নিমেষে উদার হয়ে উঠলেন দারোগা সাহেব, আমি তোকে বসতে হুকুম দিলাম। তা, তোর পায়ের কাছে ওটা আবার কে কাঁথা-মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে ?

—আর কন ক্যান্ হুজুর ! প্রায় কেঁদে ফেললেন সুপতি রায়, আমার চাচাতো ভাই নুরমিঞা। জ্বরে একেবারে বেহুঁশ। গা দিয়া দুই-চারটা গোটাও বাইর হইছে। আল্লার মনে কি আছে কে জানে !

এ্যাঁ ! একে হাটের ব্যামো, তার ওপর আবার বসন্ত !

তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে নিমেষে কামরার অন্যপ্রান্তে সরে গেলেন দারোগা সাহেব। কথায় বলে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম ! এসব ছোঁয়াচে রোগ থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। বিশেষ করে এই হাটের ব্যামো নিয়ে।

জগন্নাথ-ঘাট। এ লাইনে এটাই শেষ স্টেশন। এবার আবার স্টীমার।

নিজের পদমর্যাদা জাহির করে দলবল নিয়ে সর্বাগ্রে নেমে গেলেন দারোগা সাহেব। সবশেষে নামলেন সুপতি রায় তাঁর অসুস্থ চাচাতো ভাই নুরমিঞাকে নিয়ে। ছন্নছাড়া বিহঙ্গের মতো অসহায় ভাব।

হবেই তো ! বেচারা চাচাতো ভাইটির একে জ্বর, তার ওপর আবার বসন্ত ! আল্লার মনে কি আছে কে জানে !

স্টীমারটা সাঁতার কেটে চলেছে জলের ওপর দিয়ে। এবারের লক্ষ্য সিরাজগঞ্জ ঘাট। দূরত্ব সামান্যই।

তিন দিন পেটে কোন আহার পড়েনি। আজও যে পড়বে, তেমন কোন ভরসা নেই।

কষ্ট ! না, কষ্ট কিসের ? পরাধীনতার নাগপাশ যাঁরা ছিন্ন করতে চান, সেইসব ঘরছাড়া হতভাগ্যের দল জানেন যে, এ-পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়।

সুতরাং সামান্য এই ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তাঁদের বিচলিত হবার কথা নয়।

বিচলিত হলেন সুপতি রায়। হলেন বিনয়ের কথা ভেবেই। এ ছেলে সাধারণ ছেলে নয়। অদ্ভুত ওর সাহস। অসাধারণ ওর দক্ষতা। নির্ভুল ওর নিশানা।

অদূরে ভবিষ্যতে এর চাইতেও অনেক বড় সংগ্রামে ওর মূল্যবান অধিনায়কত্বের প্রয়োজন। সেই দুরন্ত সংগ্রামে সিংহের মতো রুখে দাঁড়াতে হলে ওকে সুস্থ ও সমর্থ রাখা একান্তভাবেই দরকার।

সুতরাং নিজের জন্য না হলেও অন্ততঃ ওর জন্য কিছু ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এখনই প্রয়োজন। পরে যে সুযোগ পাওয়া যাবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

স্টীমারে একমাত্র উপায় বাটলার। তবে প্রথম শ্রেণীর সাহেবসুবো নিয়ে তার কারবার। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কথায় সে কি রাজী হবে?

দেখাই যাক না একবার চেষ্টা করে! কনস্টবলকে 'হাবিলদার সাহেব' বলে আপ্যায়ন করলে অনেক ক্ষেত্রেই কাজ পাওয়া যায়। সুতরাং চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি!

—এই যে! একগাল হেসে বাটলারের কেবিনের দরজার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন সুপতি রায়, আপনেই বুঝি এই লাইনের বড় বাটলার সাহেব?

—হ্যাঁ, কেন? বাটলার নিজের পদমর্যাদায় গম্ভীর।

—না, কিছু না। আমাগো সাহেব আপনের কথা অখনো প্যাচাল পারে। কয় যে, জগন্নাথ-ঘাট লাইনের বড় বাটলার সাহেবের হাতে যে খাওয়া একবার খাইছি, তা বিলাতেও কোনদিন খাই নাই। যেন জন্মের শেষ-খাওয়া।

—কোন্ সাহেব? প্রশ্ন করে বাটলার।

—ক্যান, আমাগো চটকলের সাহেব! এই তো গত চৈত্ মাসে আপনের হাতে খাইয়া গেল। আপনের মনে নাই?

সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল বাটলার। কি জানি! হবে হয়তো! এমন কত সাহেবই তো এ লাইনে যাতায়াত করে। তাদের মধ্যে কে যে কোন্ কোম্পানীর সাহেব, তা কে আর মনে রাখতে গেছে!

—তা, কইছিলাম কি, আমাগো দুইজনের কিছু দেন না কেনে! এত যখন নাম, তখন একটু চাইখা দেখি! না না, আপনের কোন ক্ষতি করুম না। পয়সা যা লাগে, দিমু।

আর কোন আপত্তি করল না বাটলার সাহেব। কেনই বা করবে? এই হাবা-গবা লোক দুটোর কাছ থেকে যদি বেশ কিছু হাতিয়ে নেওয়া যায় তো মন্দ কি!

জগন্নাথ-ঘাট থেকে স্টীমারে সিরাজগঞ্জ। সিরাজগঞ্জ থেকে সোজা শিয়ালদা স্টেশন।

কিন্তু না, শিয়ালদা নয়। দমদমেই মিঞাসাহেবরা নেমে গেলেন গাড়ি থেকে। শিয়ালদা অনেক বড় স্টেশন। সংবর্ধনার আয়োজনটাও হয়তো বড় রকমই থাকবে।

কি লাভ! তার চাইতে ছোট স্টেশন দমদমই ঢের ভাল। এবার মগবুলচাচার সেই কাপড়ের কলে একটা কাজ জুটিয়ে নিতে পারলে তার ভাবনা কি!

সাত নম্বর ওয়ালিউল্লা লেন। বাড়ির মালিক সুরেশ মজুমদার।

গোটা একতলাটা জুড়ে রিক্সা ও মোটর গ্যারেজ। জায়গাটা যেমন ঘিঞ্জি, তেমনি অন্ধকার। বারো ঘর এক উঠান। নানাজাতীয় লোকের বাস। পাঞ্জাব থেকে শুরু করে উৎকল পর্যন্ত, কেউ বাদ নেই। হৈ-হল্লা সর্বক্ষণ লেগেই আছে।

দোতলাটা ঠিক তার বিপরীত। ঘরগুলিও বেশ প্রশস্ত ও মোটামুটি সুসজ্জিত। পরিবেশের দিক থেকেও অনেকটা শান্ত।

তখনকার সময়ে পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল হিসেবে বি. ভি.-র বেশ কয়েকটি গুপ্ত ঘাঁটি ছিল। সুরেশবাবুর এই দোতলা বাড়িটাই ছিল তার হেড্‌কোয়ার্টার। বাংলার গভর্ণর অ্যাণ্ডারসন সুটিং মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিতা উজ্জ্বলা মজুমদার তাঁরই মেয়ে।

যথাসময়ে সুপতি রায় এখানে এসে হাজির হলেন বিনয়কে নিয়ে। যে গুরু-দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত হয়েছিল তাতে তিনি ব্যর্থ হননি। এবার নিশ্চিন্ত।

নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না সুরেশবাবু ও বি. ভি.-র কর্মকর্তাগণ। জায়গাটা শহরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। নিচে বহুরকম লোকের আনাগোনা। এ অবস্থায় বিনয়ের মতো ছেলেকে এখানে রাখা কোনদিক থেকে যুক্তিযুক্ত নয়। যত শীগ্‌গির সম্ভব তাঁকে আর কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু কাজটা সহজ নয়। বাংলাদেশের সর্বত্র তাঁর ছবি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সংগে ক্রম-বর্ধমান পুরস্কার ঘোষণা। আগে ছিল পাঁচ হাজার, এখন পুরো দশ। এ পরিস্থিতিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখের ওপর দিয়ে তাঁকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা চাট্টিখানি কথা নয়!

সবচাইতে বড় কথা—টেগার্ট। বিপ্লব-আন্দোলনের সবচাইতে বড় শত্রু চার্লস টেগার্ট।

সত্যিই বিচক্ষণ লোক। মাত্র কিছুদিন আগে ডালহৌসী স্কোয়ারে তাঁর ওপর বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল, কিন্তু লাভ হয়নি কিছুই। এখনো তার জের মেটেনি। ধর-পাকড় সমানেই চলছে। নেকড়ের মতো হিংস্র চোখ নিয়ে তিনি যে এখানেই এসে হানা দেবেন না, তা কে বলতে পারে!

শত্রু হলেও বুদ্ধি, সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য টেগার্টকে প্রশংসা না করে উপায় নেই। ব্রিটিশ রাজত্বের ইতিহাসে এমন ধূর্ত ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন অফিসার আর দ্বিতীয়টি দেখা যায়নি। বিশেষ করে পুলিশ কমিশনার হিসেবে কলকাতার গুণ্ডার বংশকে যেভাবে তিনি নির্বংশ করে ছেড়েছিলেন, তাকে শতমুখে প্রশংসা করতে হয়।

অধুনা ভাবনা তাঁর গুণ্ডাদের নিয়ে নয়, ভাবনা বাংলাদেশের এই মৃত্যু-পাগল ছেলেগুলোকে নিয়ে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ভাবনা-মুক্ত করতে হলে ওদের নির্মমভাবে দমন করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

এহেন টেগার্টের নজর এড়িয়ে বিনয়কে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা সম্ভব হবে কি? দেখা যাক!

সিগন্যাল ডাউন।

কলকাতা থেকে গাড়ি আসার সময় হয়েছে। এরই মধ্যে এঞ্জিনের আলোতে আলোকিত হয়ে উঠেছে গোটা স্টেশন অঞ্চলটা।

ব্যাণ্ডেল জংশনে পাহারারত সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী প্রস্তুত। কঠোর নির্দেশ, কলকাতা থেকে বাইরে যাবার প্রতিটি গাড়ি, প্রতিটি কামরার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। বিনয় বোস কোনরকমেই যেন বাইরে পালিয়ে যেতে না পারে। খুব সাবধান!

কিন্তু একি! সহসা কি দেখে তটস্থ হয়ে উঠল সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। স্বয়ং জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি এদিকেই এগিয়ে আসছে যে! কি ব্যাপার! তবে কি সাহেব এ ট্রেনে বাইরে কোথাও যাচ্ছেন সরকারী কাজে?

না, সাহেব নন, তাঁর কন্‌ফিডেন্সিয়াল ক্লার্ক সরোজ রায়। সঙ্গে রয়েছেন আরো দুজন। একজন যুবক, অন্যজন প্রবীণ। রায়বাবুরই কোন আত্মীয়-টাত্মীয় হবে হয়তো।

—সেলাম বাবুজী! সরোজবাবুকে দেখেই অভিবাদন জানাল সশস্ত্র প্রহরীর দল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সেলাম! হেসে জবাব দিলেন সরোজবাবু, ভাল করে চারদিকে নজর রেখো। দেখো, আসামী যেন কোনমতেই পালিয়ে যেতে না পারে। ধরিয়ে দিতে পারলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার, তা যেন ভুলে যেও না!

আত্মীয় দুজনকে ট্রেনে তুলে দিয়ে একটু বাদেই আবার যথাস্থানে ফিরে গেলেন সরোজ রায়। সেই জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়িতে। সঙ্গে সাহেবের সেই সুপরিচিত উর্দি-পরা ড্রাইভার আর আর্দালি।

মল্লিকা, বিশ্বাস কর আর নাই কর, যুবকটি কিন্তু আসলে স্বয়ং বিনয় বোস ছাড়া আর কেউ নন। আর প্রবীণটি হলেন বি. ভি.-র অ্যাকশন স্কোয়াডের সিনিয়র সদস্য, রডা অস্ত্র-লুণ্ঠনের অন্যতম নায়ক শ্রদ্ধেয় হরিদাস দত্ত।

যাঁকে ধরবার জন্যে এত কাণ্ড, সেই বিনয় বোস যে স্বয়ং জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি করে তাদের নাকের ওপর দিয়ে এমনি করে বাইরে চলে যাবে, তা বোধহয় শাসকদের স্বপ্নেও অগোচর ছিল। এ ব্যাপারে বি. ভি.-র শুভার্থী বন্ধু সরোজ রায়ের ভূমিকা ছিল সত্যিই অসাধারণ। সরকারী কর্মচারী হয়েও যেভাবে তিনি নিজের উপর সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে এ কাজে এগিয়ে এসেছিলেন, সচরাচর তার তুলনা মেলে না।

কলকাতা থেকে কাতরাসগড় কোলিয়ারী। আশ্রয় নিলেন দলীয় বন্ধু অনাথবন্ধু দাসের কোয়ার্টারে। বেশ বড় কোয়ার্টার। সুতরাং অসুবিধের কিছু নেই।

খুশি হতে পারলেন না বিনয়। বুক জুড়ে সর্বক্ষণ কিসের যেন একটা চাপা অস্থিরতা। পুলিশের বড়কর্তা লোম্যানকে তিনি নিজের হাতে শাস্তি দিয়েছেন। এখানেই কি তাঁর কর্তব্য শেষ! আর কিছুই কি তাঁর করণীয় নেই ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে!

কিছুই বুঝতে বাকি রইল না অভিজ্ঞ বিপ্লবী হরিদাসবাবুর। তাই দিনকয়েক বাদেই আবার তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন বিনয়কে নিয়ে।

আশ্রয়ের ব্যবস্থা হল বেলেঘাটায়। সবশেষে দলের একনিষ্ঠ কর্মী মেটিয়াবুরুজের রাজেন গুহর বাড়িতে।

রাজেনবাবু মহাখুশি। বিনয়ের মতো ছেলে তাঁর আশ্রয়ে থাকবে, এ তো ভাগ্যের কথা! এমন ভাগ্য ক'জনের হয়!

বিনয়েরও খুশির অন্ত নেই। লোক হিসেবে রাজেনদার সত্যিই তুলনা নেই। তার চাইতেও বড় কথা—তাঁর ঐ কচি কচি শিশুগুলো। দেখলেই যেন আদর করতে ইচ্ছে করে।

সর্বোপরি বৌদি। বৌদি তো নন ঠিক যেন মা। সংসারে একমাত্র মা ছাড়া আর কারো কাছ থেকেই বুঝি এমন নিঃস্বার্থ অনাবিল স্নেহ পাওয়া সম্ভব নয়।

এবার শুরু হল মন্ত্রণা-সভা। কি করা যায় এখন বিনয়কে নিয়ে? সর্বাগ্রে তাঁর নিরাপত্তার প্রশ্ন। এ ব্যাপারে যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে।

অনেক ভেবে-চিন্তে সুভাষ তাঁর অভিমত জানালেন—বিনয় বিদেশে চলে যাক। চিরদিন কারো পক্ষে পুলিশের দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়। একদিন না-একদিন ধরা তাকে পড়তেই হবে। তার চাইতে আপাততঃ সে তাদের নাগালের বাইরে চলে যাক।

একই অভিমত ব্যক্ত করলেন মেজদা শরৎ বোস, আচার্য পি. সি. রায়, লেডি অবলা বসু প্রমুখ সবাই। হ্যাঁ, বিদেশে চলে যাওয়াই ভাল।

অসাধ্য সাধন করতে হরিদাসবাবুর জুড়ি ছিল না। শুধু রডা কোম্পানির অস্ত্র-লুণ্ঠন নয়, পরবর্তী কালেও তিনি তাঁর প্রমাণ রেখেছিলেন বার বার।

এবারও তাই করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হাত করে ফেললেন মিঃ মিল নামক কিংস জর্জ ডকের একজন পদস্থ কর্মচারীকে। ঠিক হল, পরদিনই ভোর পাঁচটায় তিনি বিনয়কে তুলে দেবেন সমুদ্রগামী এক জাহাজে। তারপর সোজা ইতালী। ব্যস্, আর কি চাই!

সব বৃথা। বেঁকে বসলেন বিনয় নিজেই। কারণ বি. ভি.-র পরবর্তী অভিযান।

সে এক ভয়ানক দুঃসাহসিক পরিকল্পনা। এমন ভয়ঙ্কর কথা সেদিন বোধহয় কারো পক্ষে চিন্তা করাও সম্ভব ছিল না।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের সবচাইতে শক্ত ঘাঁটি রাইটার্স বিল্ডিং। এবার সেই শক্ত ঘাঁটির ওপর আঘাত হানতে হবে। আঘাতে আঘাতে ওদের সমস্ত দম্ভকে একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে হবে।

পরিকল্পনা প্রস্তুত। দলের অন্যতম নেতা প্রফুল্ল দত্ত শুধু অ্যাক্‌শন স্কোয়াডের সদস্যই নন, একজন এঞ্জিনিয়ারও বটে। তাঁর সাহায্যে রাইটার্স

বিল্ডিং-এর কোথায়, কোন্ তলায় কার ঘর তার খুঁটিনাটি সমস্ত কিছুর একটা নক্সাও হাতে এসে গেছে। দিন-তারিখও স্থির হয়ে গেছে। এখন শুধু অপেক্ষা মাত্র।

প্রথম লক্ষ্য—কারা-বিভাগের সর্বময় কর্তা কর্নেল সিম্পসন। অনেক রক্তই সেদিন ঝরেছিল আলিপুর জেলে বন্দী সুভাষের দেহ থেকে। কারা-বিভাগের অধিকর্তা হিসেবে তাকেই এবার নিজের রক্ত দিয়ে সুভাষের সেই রক্তের ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

বিনয় চিরদিনই স্বল্পভাষী। সব শুনে এবারও মাত্র দুটি কথার মধ্য দিয়েই তাঁর অভিমত জানালেন—'আমি যাব।'

সেদিন যাঁরা বি. ভি.-র কার্যকরী সংসদের সদস্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁরা হলেন ছোট বড় সবার একান্ত প্রিয় মেজদা হরিদাস দত্ত, সত্য বক্সী, মেজর সত্য গুপ্ত, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, প্রফুল্ল দত্ত, মণীন্দ্র রায় ও রসময় শূর।

কার্যকরী সংসদের প্রধানদের সহায়ক ছিলেন জ্যোতিষ জোয়ারদার, যতীশ গুহ, তেজোময় ঘোষ, জিতেন সেন, সুধীর নন্দী, অশোক সেন, গোপাল সেন, অনিমেষ রায়, শচীন ভৌমিক, মণি সেন আর নির্মল গুহ।

মহিলা কর্মী সংগঠনের ভার ছিল অধ্যাপিকা মীরা দত্তগুপ্তার ওপর। অস্ত্র-শস্ত্রও তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখা হত কখনো কখনো। পিতা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। সুতরাং সব দিক থেকেই নিরাপদ।

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায় ও মেজর সত্য গুপ্ত বন্দী হবার পর ক্রমশঃ গড়ে উঠেছে একটি অ্যাক্‌শন স্কোয়াড। সেই স্কোয়াড পরিচালনা করতেন মেজদা হরিদাস দত্ত, প্রফুল্ল দত্ত, রসময় শূর, নিকুঞ্জ সেন আর সুপতি রায়।

প্রস্তাব শুনে সবাই সমর্থন জানালেন একবাক্যে। বিনয় নিজেই যখন আগ্রহ প্রকাশ করেছে, তখন তার ওপর আর কোন প্রশ্নই ওঠে না।

ঠিক হল, অভিযান পরিচালনা করবেন বিনয় স্বয়ং। সঙ্গে থাকবেন আরো দুজন মৃত্যুভয়হীন তরুণ বিপ্লবী। দীনেশ গুপ্ত আর বাদল গুপ্ত।

দীনেশ গুপ্ত। বি. ভি.-র দুরন্ত দুঃসাহসী সৈনিক দীনেশ গুপ্ত। চোখে দিগন্ত সীমার মতো উন্মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি। বুকে দুর্বার সাহস। পেশী-বহুল স্বাস্থ্য, আর প্রাণ-প্রাচুর্যে যেন উপচে পড়ছে তাঁর জীবনপাত্র।

শিল্পী, কবি, দার্শনিক প্রতিটি বিশেষণই ছিল তাঁর সম্বন্ধে সমান-ভাবে প্রযোজ্য। সাহিত্যিক হিসেবেও পিছিয়ে ছিলেন না। মাসিক 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁর লেখা গল্প ইতিমধ্যেই খ্যাতি অর্জন করেছিল প্রচুর। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ তো বলতে গেলে তাঁর ধ্যান-জ্ঞান সব কিছু। এমন রবীন্দ্র-ভক্ত সত্যিই বিরল ছিল তখনকার দিনে।

তবে সবার ওপরে ছিল তাঁর অপূর্ব সংগঠন-শক্তি। পরবর্তী কালে যে মেদিনীপুর একদিন অগ্নিযুগের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছিল, তার মূলে ছিলেন এই দীনেশ। তিনিই ছিলেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের মেদিনীপুর শাখার প্রতিষ্ঠাতা।

হঠাৎ নির্দেশ দেওয়া হল—তোমাকে মেদিনীপুর যেতে হবে দীনেশ। ওখানকার ছেলেদের সঙ্ঘবদ্ধ করা দরকার। আশা করি তুমি তা পারবে।

সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা ত্যাগ করে মেদিনীপুর কলেজে গিয়ে ভর্তি হলেন দীনেশ। আমি পারব। পারতেই হবে আমাকে। যত বাধা-বিপত্তিই মাথা উঁচিয়ে আসুক না কেন, সব কিছু পর্যুদস্ত করে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে আপন লক্ষ্যের দিকে।

কাজ, কাজ আর কাজ! নিরবচ্ছিন্ন কাজ। নতুন জীবন, নতুন পরিবেশে দেখতে দেখতে কাজের নেশায় মশ্‌গুল হয়ে গেলেন দীনেশ। কাজ ছাড়া আর সব কিছুই বুঝি চাপা পড়ে গেল মনের অতল গভীরে।

ফল হল আশাতীত। দেখতে দেখতে ঘুমন্ত দৈত্য যেন জেগে উঠল কোন্‌ মায়া-কাঠির স্পর্শ পেয়ে।

শেষপর্যন্ত এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, ছেলেদের ধরে রাখা দায়। উন্মত্ত তরুণ রক্ত যেন অসহ্য আবেগে ফেটে পড়তে চায়। কাজ চাই! কাজ চাই!

হঠাৎ আবার একদিন জরুরী তলব এসে হাজির। অবিলম্বে ঢাকা চলে এস দীনেশ। তোমাকে বড্ড দরকার।

উপযুক্ত সহকর্মীর হাতে মেদিনীপুরের ভার ন্যস্ত করে সঙ্গে সঙ্গে আবার ঢাকাতে। আগে পার্টি, তারপর অন্য কথা। ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার সেখানে কোন প্রশ্নই ওঠে না।

সাত নম্বর ওয়ালিউল্লা লেনের মতো বি. ভি.-র আর একটি গুপ্ত ঘাঁটি ছিল নিউ পার্ক স্ট্রীটের একটি দোতলা বাড়িতে। নিচে দলীয় সদস্য ডাঃ অনিমেষ রায় ও ডাঃ হিমাংশু ব্যানার্জীর চেম্বার।

দোতলায় আত্মগোপনকারী বাঘা-বাঘা সব বিপ্লবী। অ্যাক্‌শন স্কোয়াডের সদস্য নিকুঞ্জ সেন ও সুপতি রায়ও তাঁদের মধ্যে রয়েছেন।

আর রয়েছেন দীনেশ ও বাদল। সতর্কতা হিসেবে আগে থেকেই তাঁদের এখানে এনে রাখা হয়েছে।

৭ই ডিসেম্বর। অভিযানের আর একদিন মাত্র বাকি।

ওদিকে প্রস্তুতি-পর্ব শেষ। আগ্নেয়াস্ত্রগুলো বার বার পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

বহুমূল্য ইয়োরোপীয়ান পোশাক-পরিচ্ছদগুলোও তৈরি হয়ে এসে গেছে। ঐ পোশাকের ঠাট দেখিয়েই কাল তিনজনকে গট গট করে ঢুকে যেতে হবে রাইটার্স বিল্ডিং-এর অভ্যন্তরে। যেন কোন বড় দরের অফিসার আর কি! নইলে দ্বাররক্ষীদের কাছ থেকে বাধা পাওয়া বিচিত্র নয়।

হঠাৎ একটা জরুরী কথা মনে পড়ে গেল নিকুঞ্জবাবুর। নক্সাতে খুঁটিনাটি সব কিছু দেওয়া থাকলেও বিরাট ঐ রাইটার্স বিল্ডিং-এর অলি-গলি সম্বন্ধে কারো কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। কাউকে একবার দেখিয়ে-শুনিয়ে আনলে কেমন হয়!

বিনয় পলাতক, তাঁর সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ওঁদের কাউকে একবার ঘুরিয়ে আনলে ক্ষতি কি!

শেষপর্যন্ত বাদলকে নিয়েই পথে পা দিলেন নিকুঞ্জবাবু। বাদল শুধু

তাঁর স্কুলের ছাত্রই নন, নিজের হাতে গড়া উপযুক্ত শিষ্যও বটে। নিরলস কর্মী বাদলকে তাঁর চাইতে বেশি আর কে জানে!

সন্ধ্যার আগেই আবার তাঁরা ফিরে এলেন যথাস্থানে। পরিচিত লোকের সাহায্যে বাদলকে সব দেখিয়ে-শুনিয়ে দিতে কোন অসুবিধা হয়নি। সুতরাং সব দিক থেকেই নিশ্চিন্ত।

রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' নিয়ে দীনেশ তখন ধ্যানমগ্ন। দেখে মনে হয়, এ যেন এতদিনকার চেনা সেই দীনেশ নন। আমূল পরিবর্তিত কোন ভিন্ন সত্তা। শান্ত স্নিগ্ধ সমাহিত দীনেশের এই রূপ চিন্তাও বুঝি করা যায় না।

অজ্ঞাতেই কখন মনটা কানায় কানায় ভরে ওঠে নিকুঞ্জবাবুর। আজও একান্ত প্রিয় দীনেশ ও বাদল তাঁদের চোখের সামনে রয়েছে।

কিন্তু কাল! শুধু ভাগ্যদেবতাই বলতে পারেন, কাল ওদের অদৃষ্টে কি অপেক্ষা করে আছে! আশীর্বাদ, না অভিশাপ!

—শোন দীনেশ। তন্ময়তা ভেঙে বললেন নিকুঞ্জবাবু, তুমি তো খেতে ভালোবাসো। কাল যাবার আগে কি খেতে চাও, বলো?

—অ্যাঁ! 'বলাকা' রেখে নিমেষে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন দীনেশ, খাওয়াবেন! ঠিক আছে, রাজী আছি। তবে মেনু ঠিক করে দেব আমরা! আর একটা কথা! 'আর না' বলা পর্যন্ত খাইয়ে যেতে হবে। কি বলিস বাদল!

মনে মনে হাসলেন বাদল। খাইয়ে বলে দীনেশদার বরাবরই মনে মনে বেশ একটু গর্ব আছে। দেখা যাবে কাল তাঁর সেই গর্ব কোথায় থাকে! চেনেন না তো বাদল গুপ্তকে!

১৯৩০ সাল। ৮ই ডিসেম্বর। অগ্নিযুগের রক্তরাঙা ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় দিন।

সকাল থেকেই সাজ-সাজ রব পড়ে গেল নিউ পার্ক স্ট্রীটের সেই গুপ্ত কেন্দ্রে। সময় আগত ঐ!

প্রথমেই শুরু হল দীনেশ ও বাদলের সেই ফিস্ট। সে এক দেখার মতো জিনিস বটে! যেমন দীনেশ, তেমনি বাদল। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। দুজনেই সমান। কেউ হার মানতে রাজী নন।

—আর মাংস দেব, দীনেশ? প্রশ্ন করলেন নিকুঞ্জবাবু।

—সেকি! দীনেশ অবাক, এখনো তো শুরুই করিনি!

—তোমাকে দেব, বাদল?

—আপনি দিতে থাকুন! সময় হলে আমিই মানা করব।

—পারবি নে বাদল, পারবি নে! তেড়ে ওঠেন দীনেশ, আমার সংগে টেক্কা দিয়ে কোন লাভ নেই। হেরে ভূত হয়ে যাবি।

নিজের মধ্যেই দীর্ঘশ্বাস গোপন করলেন নিকুঞ্জবাবু। স্বাধীনতার বেদীমূলে আজ ওদের চরম আত্মোৎসর্গের দিন। কেউ ফিরবে না। কেউ কোনদিন আর পৃথিবীর মুখ দেখবে না।

কিন্তু দেখে কে বলবে যে, তার জন্যে ওদের মনে একটুকুও দুর্ভাবনা আছে! মৃত্যু যেন ওদের কাছে একটা খেলা মাত্র।

অথচ কতই বা বয়েস ওদের! বিনয়ের বাইশ, দীনেশের কুড়ি, বাদল আঠারোয় পা দিয়েছে মাত্র। ভাবতেও যেন অবাক লাগে।

খাওয়া শেষ। কিছুই পড়ে নেই। কিছুই অবশিষ্ট নেই।

সব শেষ। জামা-কাপড় পরাও শেষ। এখন শুধু অপেক্ষা মাত্র।

দেখে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন নিকুঞ্জবাবু। একটা ট্যাক্সি ডেকে আনা দরকার। তারপর সোজা খিদিরপুরের পাইপ রোডের মোড়ে। বিনয়কে নিয়ে ওখানেই এসে রসময়বাবু অপেক্ষা করবেন বলে ঠিক হয়ে আছে।

খানিক বাদেই নিকুঞ্জবাবু ফিরে এলেন ট্যাক্সি নিয়ে। আর দেরি নয়। এবার ওদের ডেকে আনলেই হয়।

ডাকতে গিয়েও কিন্তু ডাকতে পারলেন না নিকুঞ্জবাবু। তার আগেই কি শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল তাঁর চলার গতি।

ভেতরে দীনেশ তখন তন্ময় হয়ে আবৃত্তি করে চলেছেন তাঁর একান্ত প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতা থেকে বিশেষ কয়েকটি লাইন ঃ

যে শুনেছে কানে
তাহার আহবান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি ; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সংগীতের মত।'

নিদারুণ শূন্যতায় বুকটা হাহাকার করে ওঠে নিকুঞ্জবাবুর।

দীনেশের আবৃত্তি। শুধু আজই নয়, কত দিন, কত সন্ধ্যায়, কত নিভৃত অবকাশে দীনেশের কণ্ঠ এমনি করে ক্ষণে ক্ষণে মুখর হয়ে উঠেছে।

আজ সব কিছুরই ইতি। সবকিছুর পরিসমাপ্তি। লগ্ন আসন্ন। মন না চাইলেও এবার তাকে বিদায় দিতে হবে। চির বিদায়!

এক মুহূর্তের দ্বিধা। তারপর আস্তে আস্তে ডাকলেন নিকুঞ্জবাবু,
—দীনেশ!

—কে! নিমেষে বাস্তব পৃথিবীতে নেমে এলেন দীনেশ, ও, আপনি! ট্যাক্সি এসে গেছে বুঝি! গেট-আপ বাদল, গেট আপ! কুইক! আমাদের যাত্রা হল শুরু...

ওদিকে মেটিয়াবুরুজের রাজেন গুহর বাড়িতেও তখন সেই একই দৃশ্য।

সকাল থেকে নিঃশ্বাস ফেলবারও বুঝি সময় নেই বৌদি সরযূ দেবীর। ঠাকুরপো কি খেতে ভালবাসে, কোন্‌টা বেশি পছন্দ করে—এই নিয়েই তিনি ব্যস্ত।

শুরু হয়েছে অবশ্য কাল থেকেই, তবে এখনো তার জের মেটেনি। কেবলি মনে হয়, কিছু বুঝি বাদ রয়ে গেল।

সূর্য সেন (মাস্টারদা)
(সর্বাধিনায়ক চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ)

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার
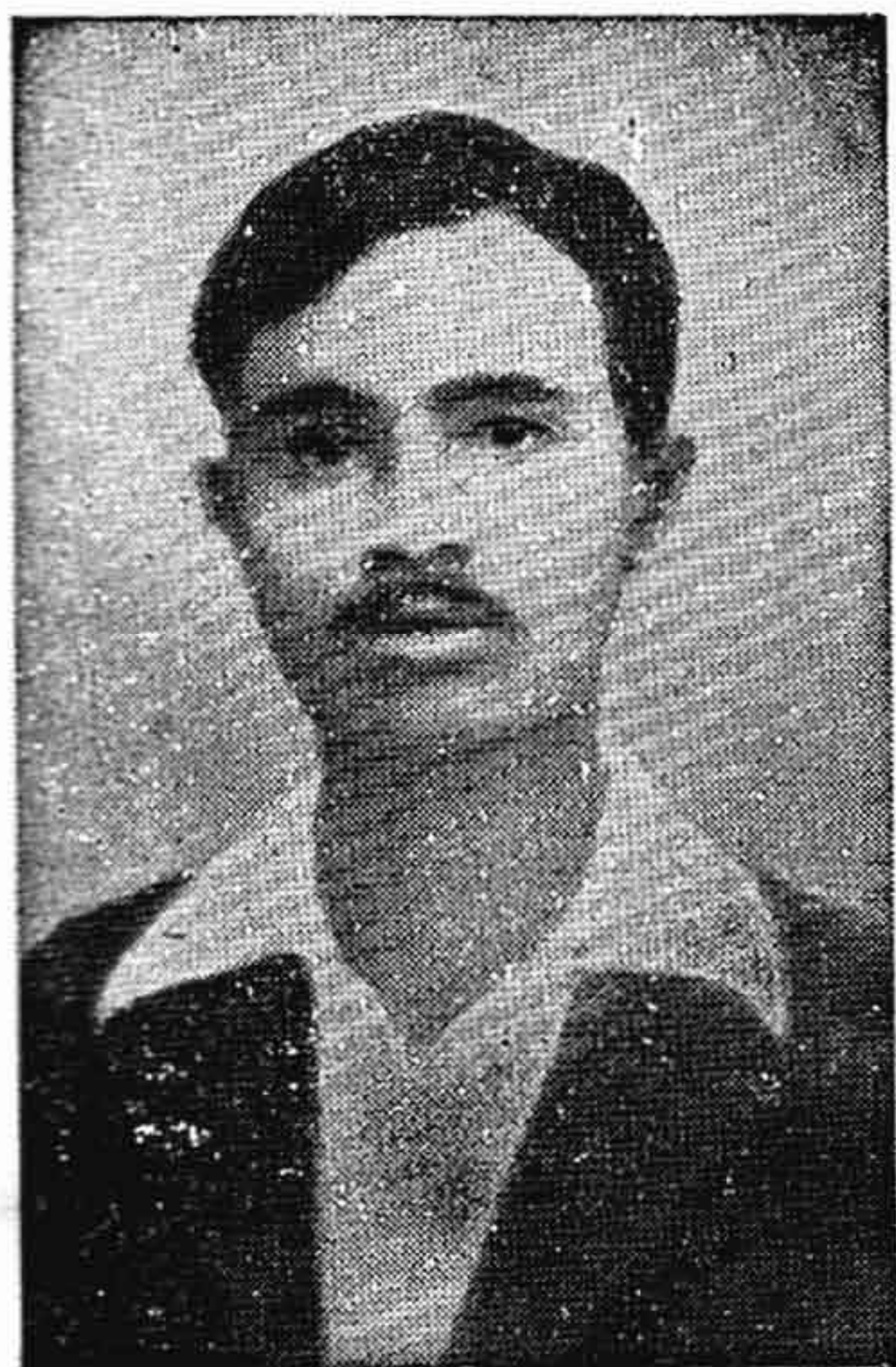
তারকেশ্বর দস্তিদার
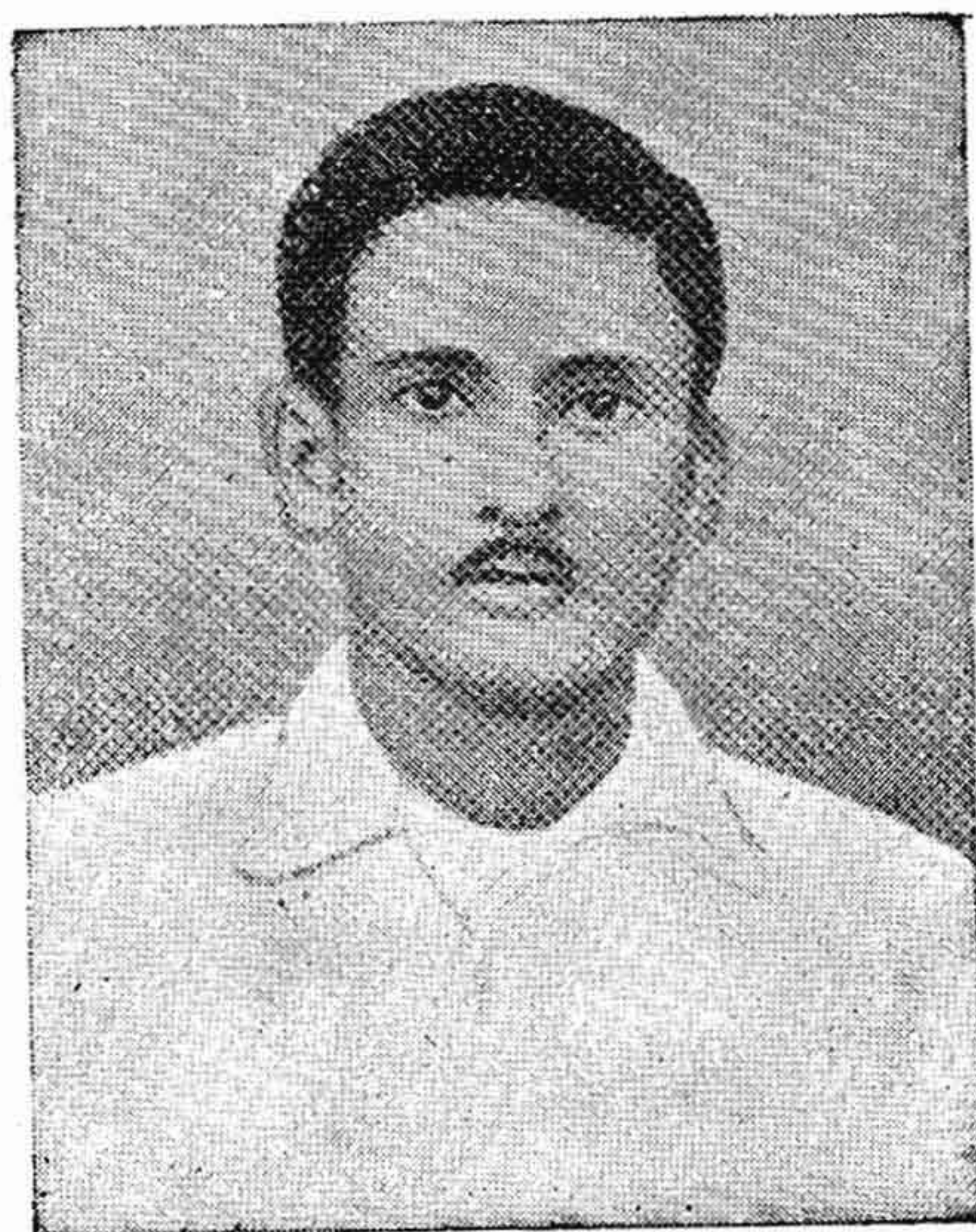
নির্মল সেন

ঐতিহাসিক জালালাবাদ সংগ্রামের শহীদবৃন্দ

নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন ও বিধু ভট্টাচার্য

টেগরা বল ও মতি কানুনগো

প্রভাস বল, শশাঙ্ক দত্ত ও নির্মল লালা

জিতেন দাস, মধু দত্ত ও পুলিনবিকাশ ঘোষ

বি. ভি-র সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ ও অনুশীলন সমিতির নেতা
ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ)

অলিন্দ-যুদ্ধের বীর শহীদ-ত্রয়ী

বিনয়

বাদল

দীনেশ (ফাঁসির পূর্বদিনে গৃহীত ছবি)

প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য
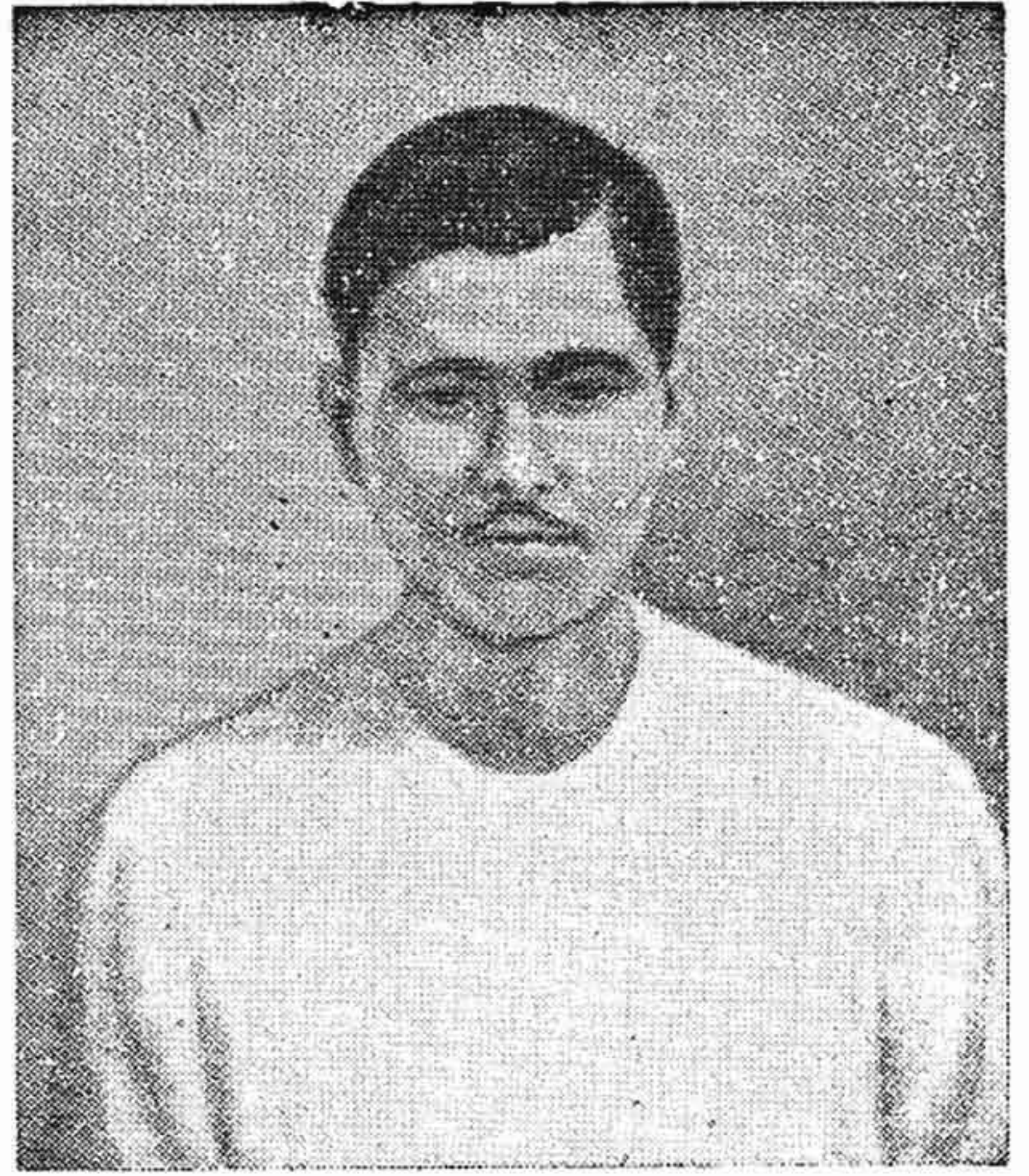
ব্রজকিশোর চক্রবর্তী

নির্মলজীবন ঘোষ
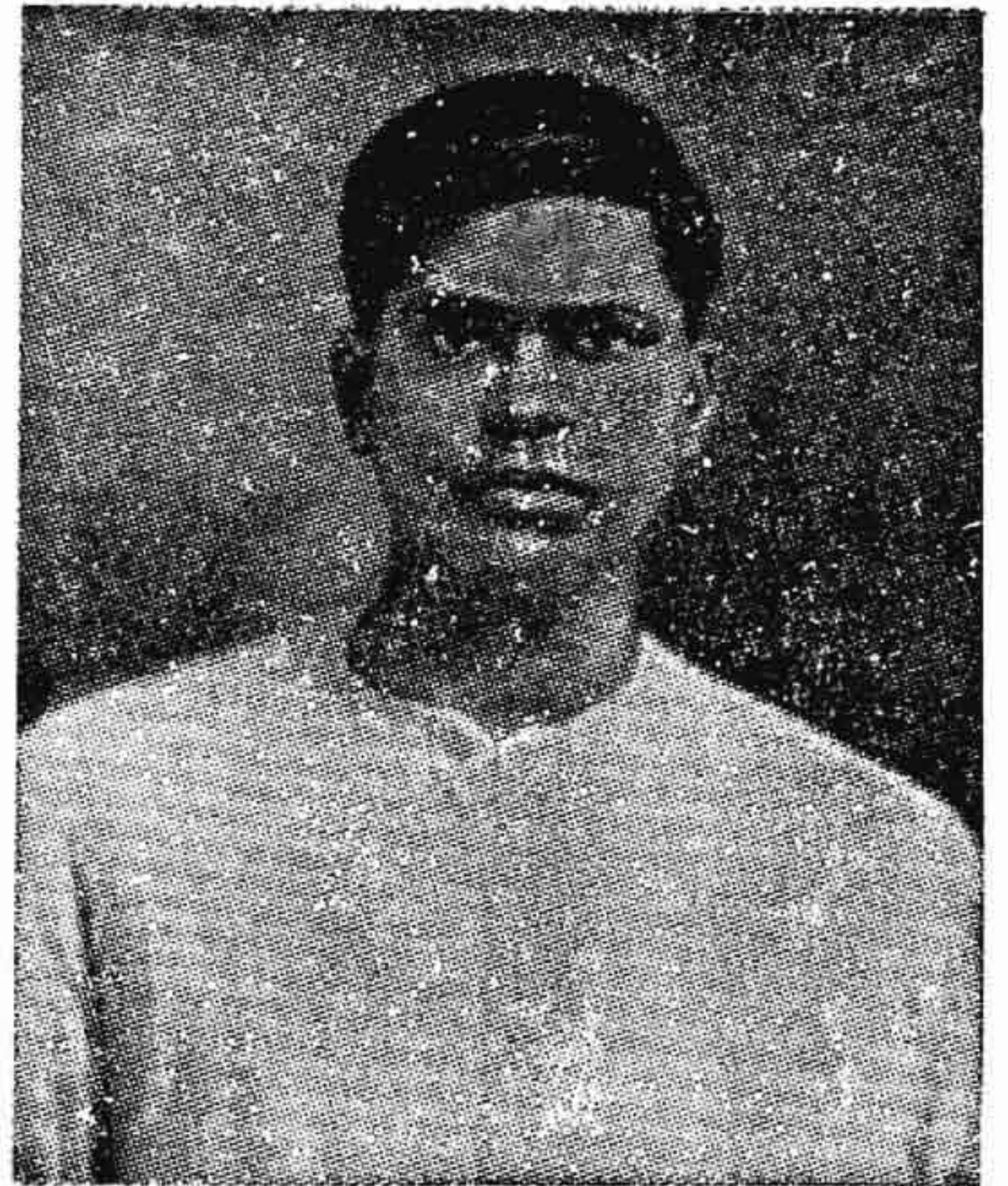
রামকৃষ্ণ রায়

দীনেশ মজুমদার
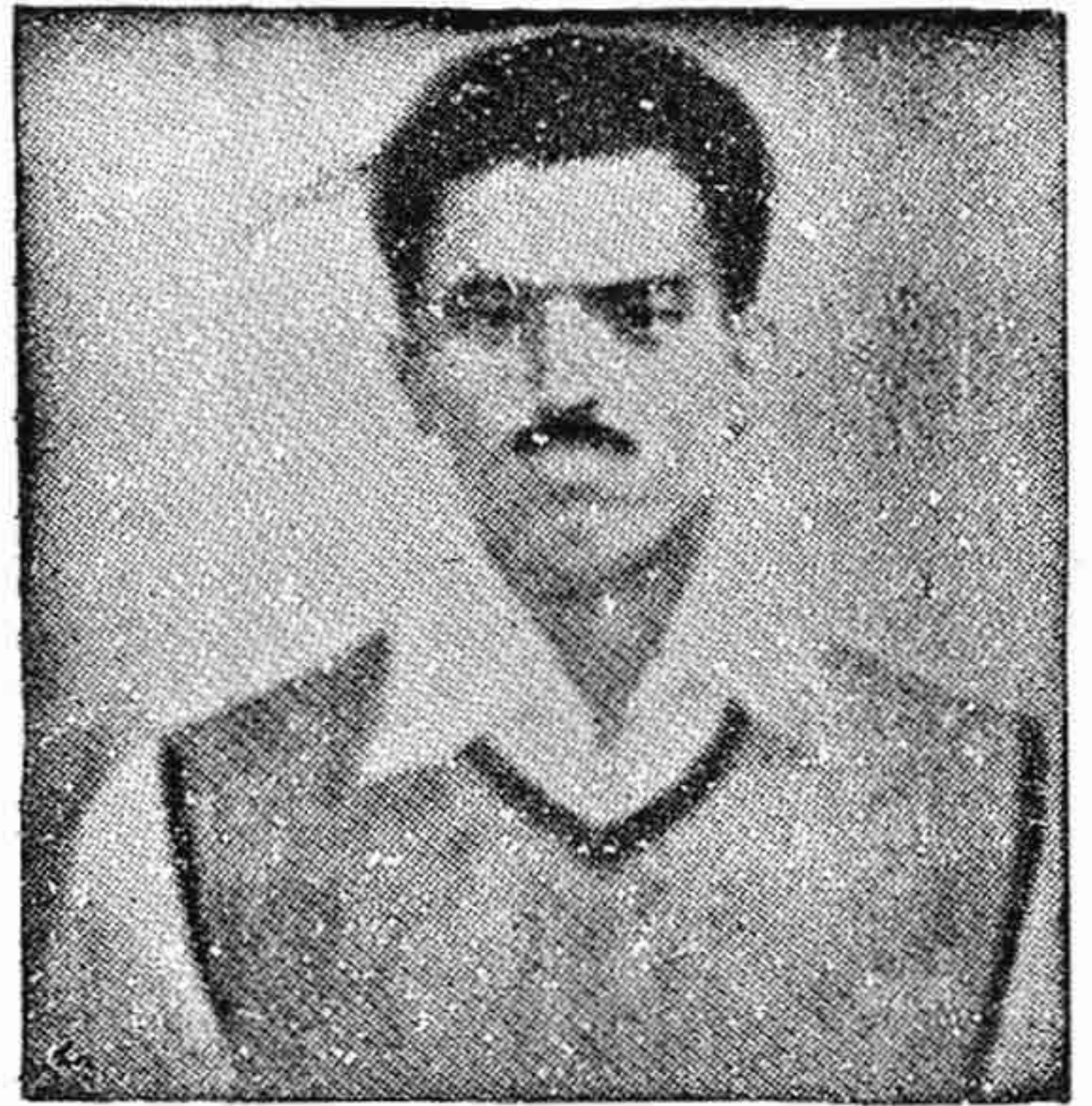
অনুজা সেন

অনিল দাস
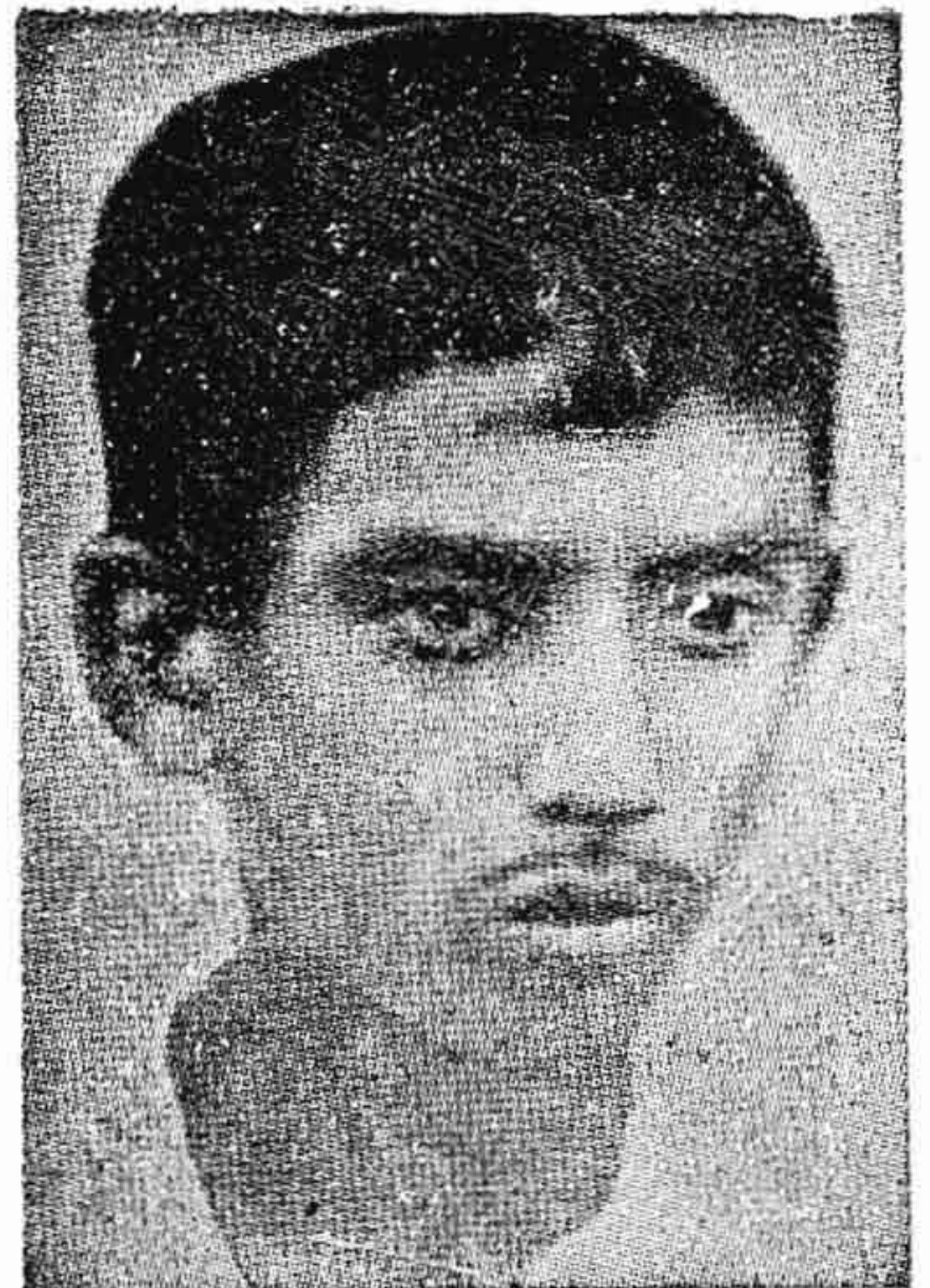
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

অগ্নিযুগের পঞ্চকন্যা—

সুনীতি চৌধুরী (ঘোষ)

শান্তিসুধা ঘোষ (দাস)

কল্পনা দত্ত (যোশী)

বীণা দাস (ভৌমিক)

উজ্জ্বলা মজুমদার (রক্ষিত-রায়)

রবীন্দ্রমোহন সেন

ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত
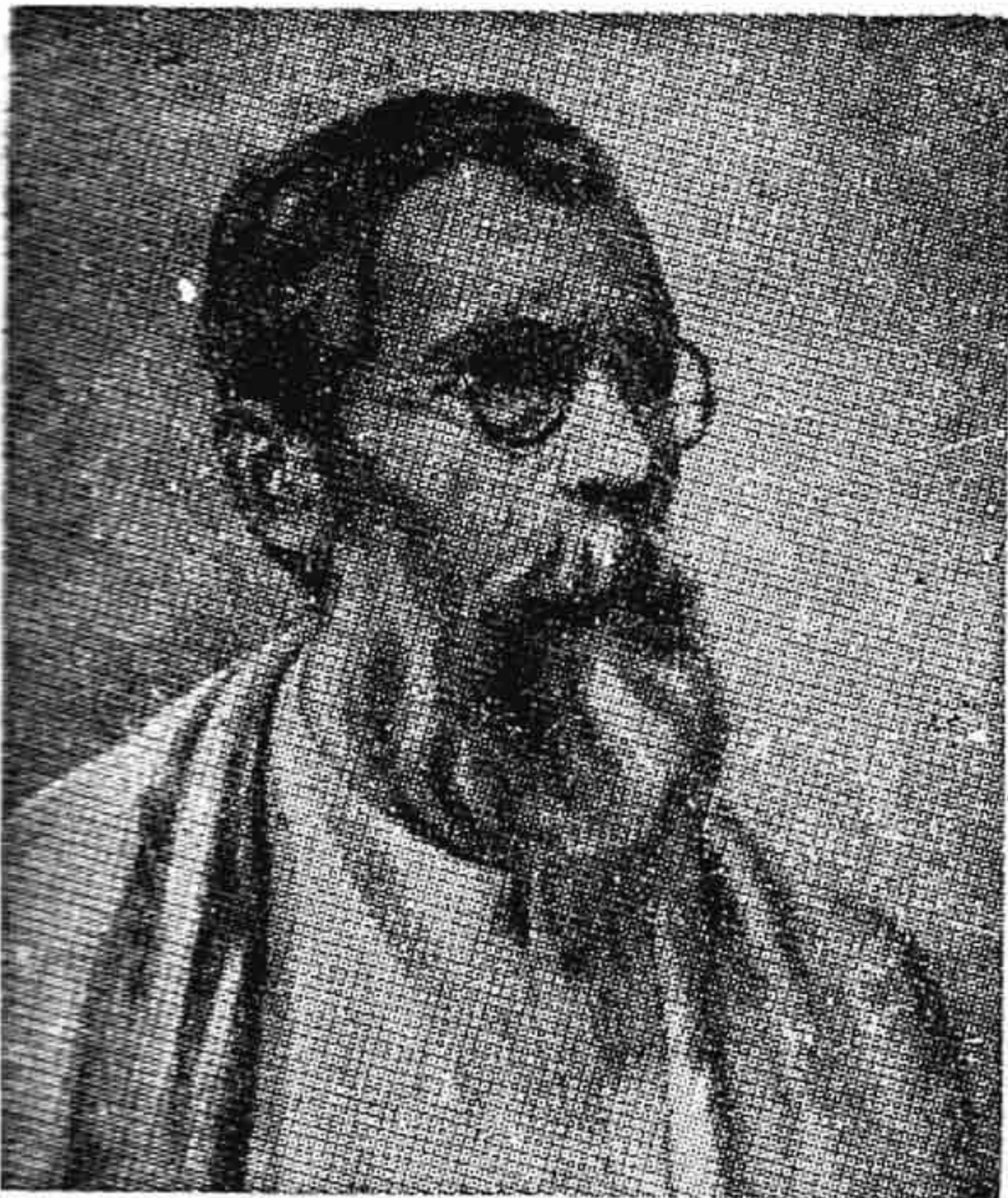
যতীন্দ্রমোহন রায়

ললিত বর্মণ

মেজর সত্য গুপ্ত
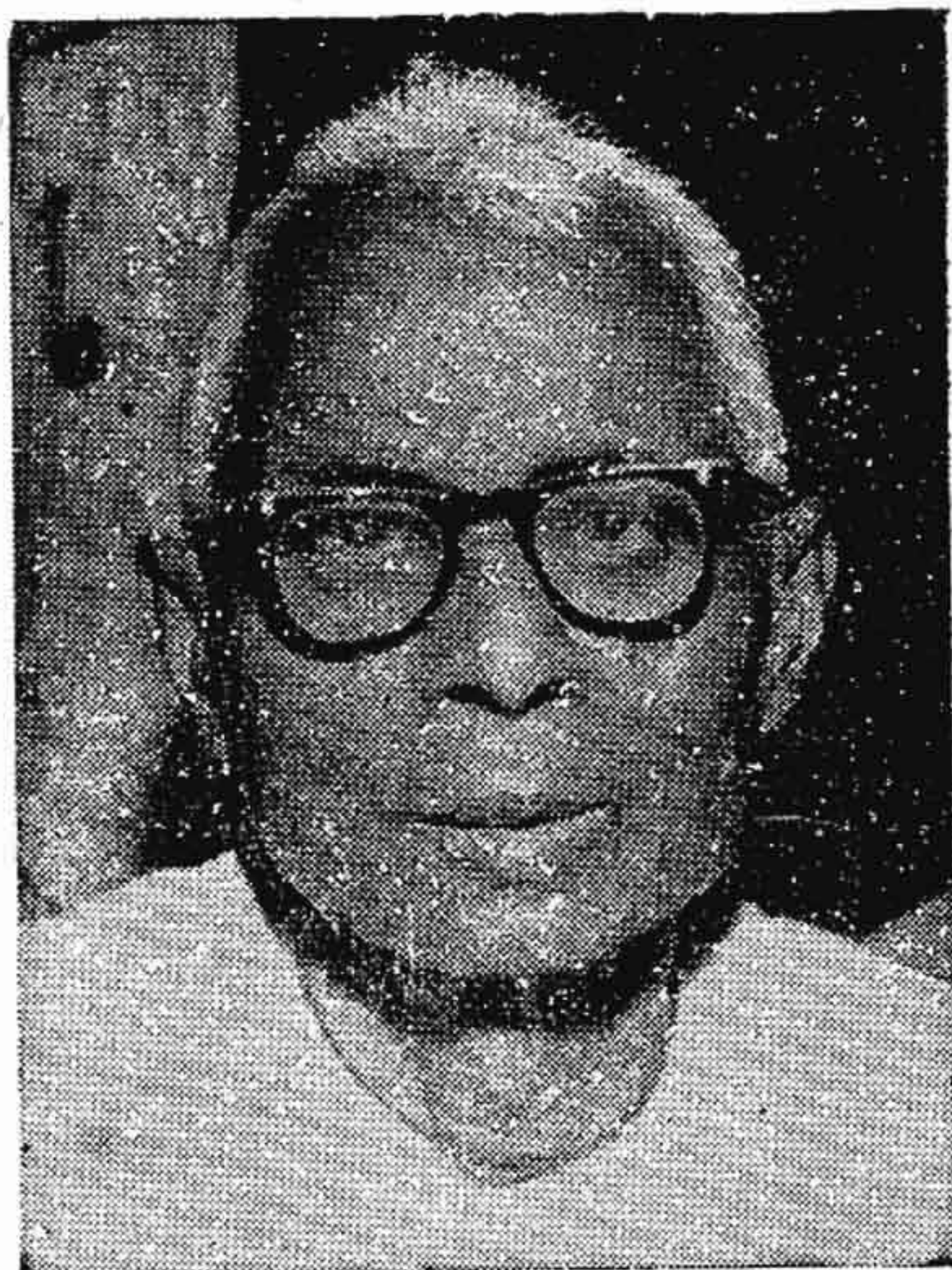
সত্যরঞ্জন বক্সী

অনিল রায়

লীলা রায়
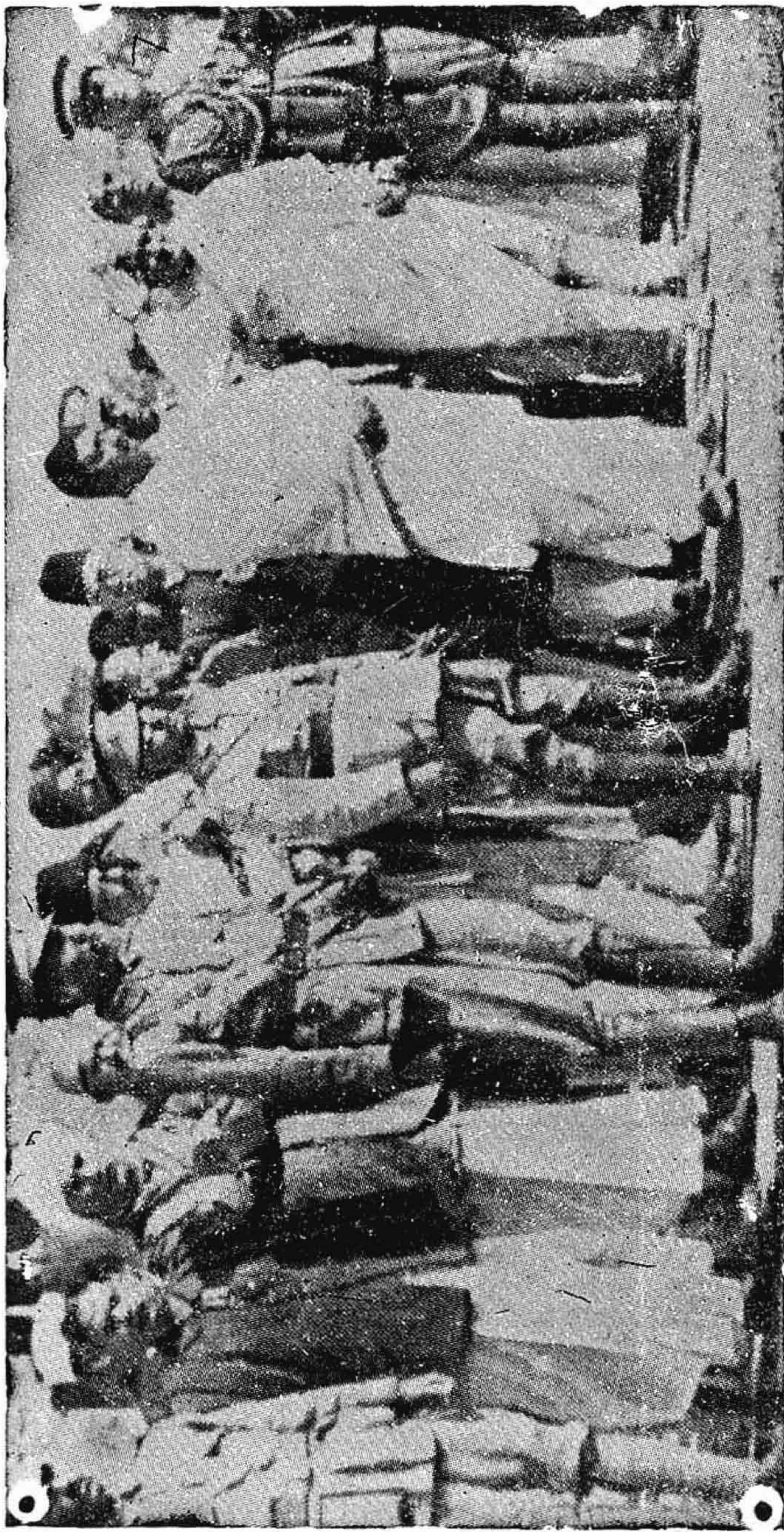
কলকাতা কংগ্রেস

ডানদিক থেকে : G. O. C. সুভাষ, অভিবাদনরত সভাপতি মতিলাল, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, মৌলানা আজাদ, পূর্ণ দাস, হেমন্ত বসু, হরিকুমার চক্রবর্তী, রবীন্দ্রমোহন সেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

লেখক
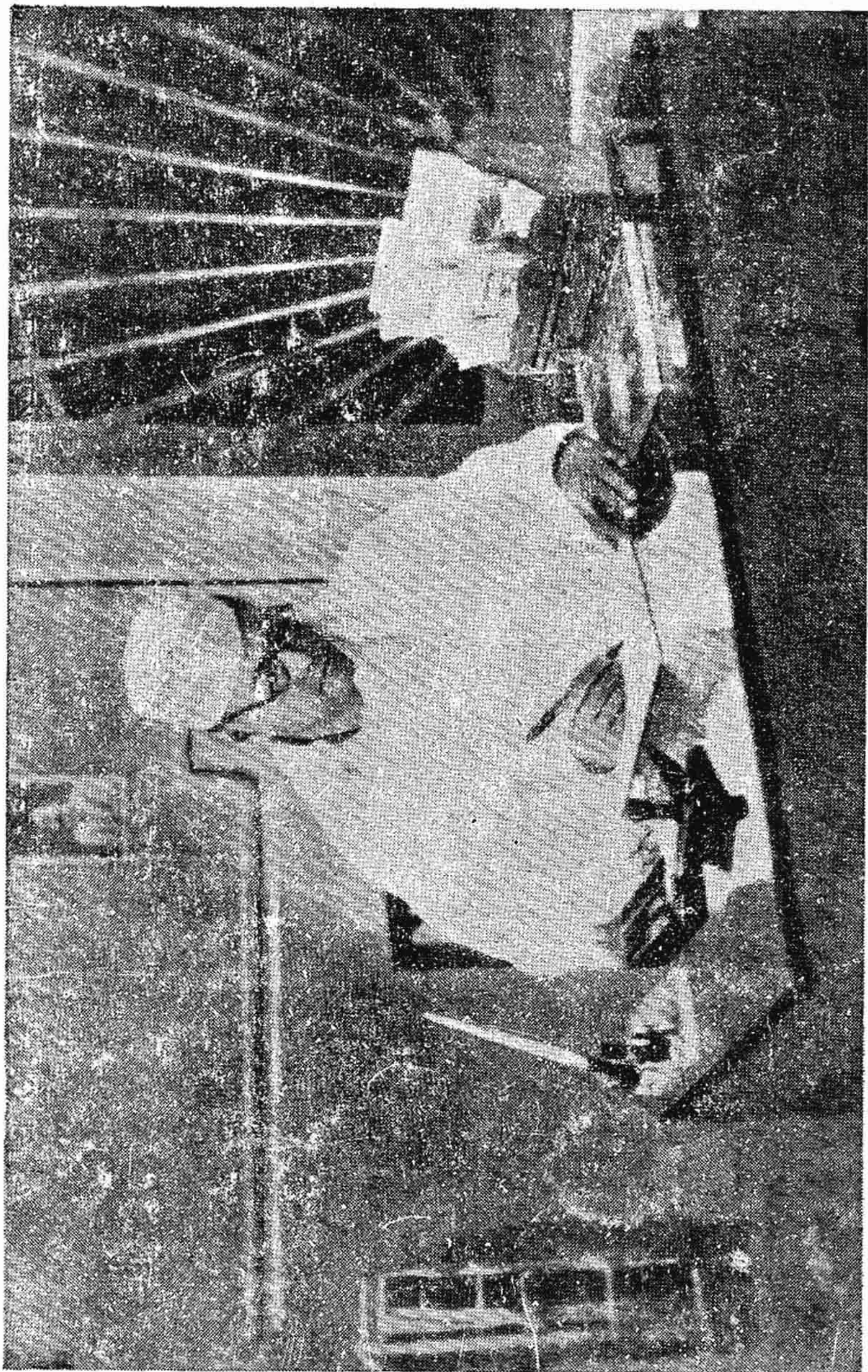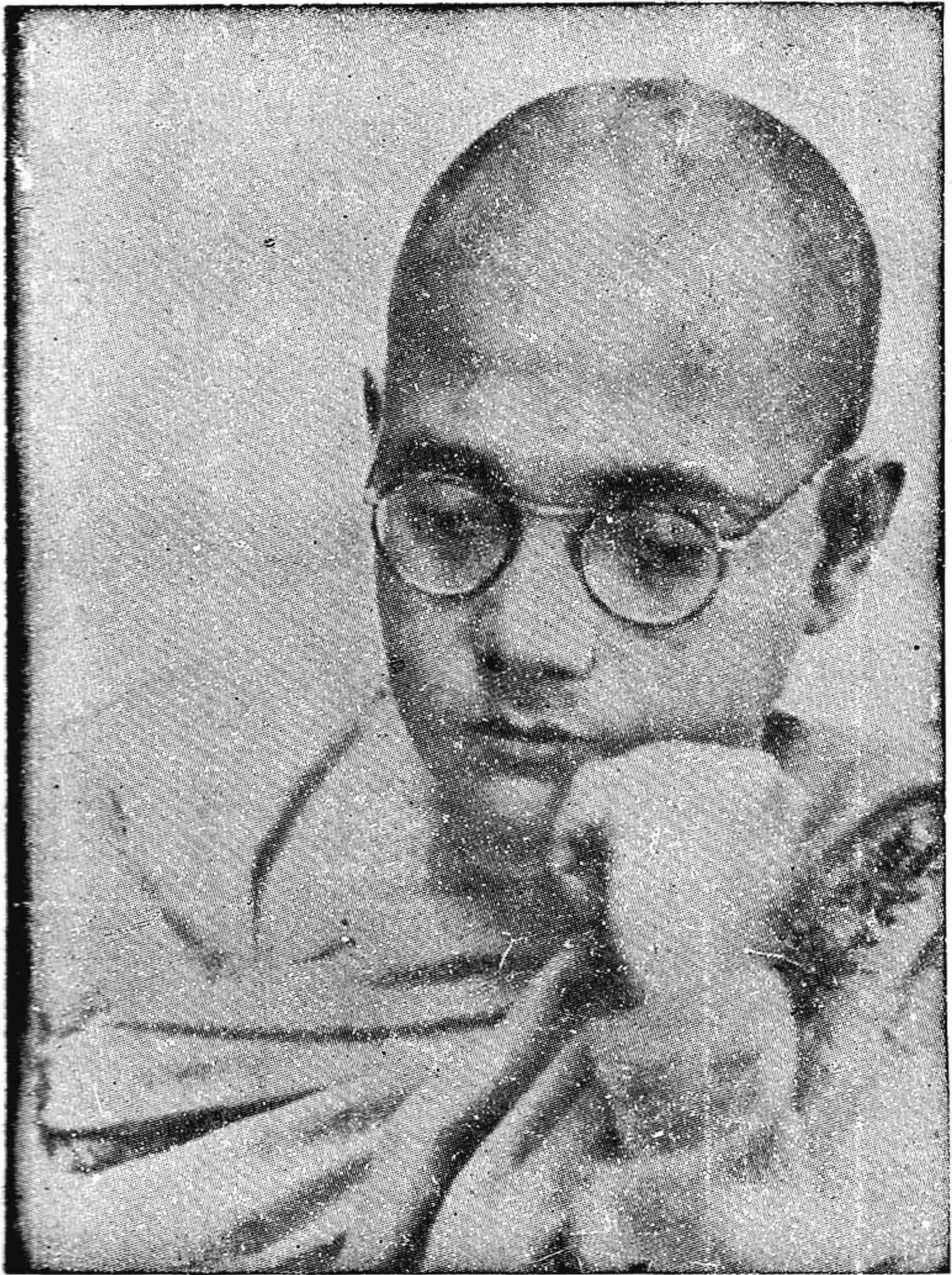
পিতৃ-বিয়োগের পরে—

আমি সুভাষ বলছি—

মাঝে মাঝে দুঃসহ বেদনায় বুকটা হাহাকার করে ওঠে, আবার পরক্ষণেই প্রাণপণ শক্তিতে সামলে নেন নিজেকে।

আজ সব কিছুর পরিসমাপ্তি। স্নেহ-বুভুক্ষু ভাইটি কাল থেকে আর কোনদিনই তাঁর হাতে খেতে আসবে না।

সকাল সাতটা। বিনয় তখনও ঘুমে অচেতন। নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবনের সুগভীর নিদ্রা।

বৌদি বার বার এসে দেখে গেছেন, তবু ইচ্ছে করেই ডাকেননি। কেমন যেন মায়া হয়েছে। আহা ঘুমোক! আর কতক্ষণই বা! এরপর তো হাজার ডাকলেও আর সাড়া মিলবে না।

কিন্তু আর তো দেরি করা যায় না! সওয়া সাতটা হয়ে গেল। সকাল ন'টার মধ্যেই যে ওঁকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিতে হবে!

—ঠাকুরপো! ঠাকুরপো! অসীম মমতা ঝরে পড়ল বৌদির কণ্ঠ থেকে।

ধড়মড় করে উঠে বসলেন বিনয়, ইস্, কত বেলা হয়ে গেছে! আমাকে ডাকোনি কেন বৌদি?

—চা-টা খেয়ে নাও ভাই। যাও, মুখটা ধুয়ে এস।

মুখ ধুয়ে ফিরে এসে বিনয় অবাক, একি! এত মিষ্টি কেউ কখনও খেতে পারে!

—লক্ষ্মী ভাইটি, খেয়ে নাও। বৌদির চোখের তারায় সকরুণ মিনতি।

—তোমার হাতে যখন পড়েছি, তখন আর উপায় কি! খেতে খেতে জবাব দিলেন বিনয়, কিন্তু আর তো বেশিক্ষণ দেরি করা যাবে না বৌদি! ঠিক ন'টার সময় লোক এসে যাবে। তার আগেই আমাকে প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে। আমি বরং এই ফাঁকে স্নানটা সেরে ফেলি।

স্নান করে আসতে না আসতেই আবার খাবার তাগিদ। প্রতিবাদ করা বৃথা, সুতরাং বসতেই হল।

যাকে বলে রাজসূয় যজ্ঞের ব্যাপার। নানারকম মাছ, মাংস, তরকারী, পোলাও, দই, মিষ্টি কিছুই বাদ নেই। একজন কেন, তিনজনের পক্ষেও বুঝি এ খাবার খেয়ে শেষ করা সম্ভব নয়।

—খাও ভাই! বৌদির দু চোখে আসন্ন বর্ষণের ইঙ্গিত, নইলে এ দুঃখ আমার জীবনেও যাবে না। আমি যে তোমার জন্যই এসব করেছি!

—দেখ দেখি! হাসতে হাসতে বললেন বিনয়, এত খাবার কখনও মানুষ খেতে পারে! তাছাড়া তুমি তো সবই জানো, বৌদি। শরীর ভারী হয়ে গেলে লড়ব কি করে? কব্জির জোর দেখাতে হবে তো! ঠিক আছে, তুমি দুঃখ করো না। আমি আস্তে আস্তে খেয়ে নিচ্ছি।

খাবার শেষ। এবার পোশাকের পালা! সাধারণ পোশাক নয়, বহুমূল্য রাজবেশ। দামী স্যুট, দামী নেকটাই, দামী জুতো, সব কিছুই চোখ ঝলসানো ব্যাপার। মাথার হ্যাটটাও তাই। দীনেশ ও বাদলের জন্যও একই ব্যবস্থা।

দলের অন্যতম নেতা রসময় শূর এসে গেছেন। আর দেরি নয়। ওদিকে পাইপ রোডের মোড়ে হয়তো দীনেশ ও বাদল ইতিমধ্যেই এসে গেছে।

অপূর্ব সংযমের বলে এতক্ষণ নিজেকে সংযত করে রাখলেও এবার আর কিন্তু নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না বৌদি। ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদের বেদনায় সহসা তিনি ভেঙে পড়লেন ছোট্ট শিশুর মতো।

—একি! নিমেষে নিজেকে দৃঢ় করে তোলেন বিনয়, যে দেশের মায়েরা যুদ্ধে যাবার আগে সন্তানকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিতেন, সে দেশের মেয়ে হয়ে এ সময়ে তোমার চোখে জল কেন, বৌদি? তাছাড়া তুমিও দলের একজন সহকর্মী। তুমিও বিপ্লবী। এ দুর্বলতা তো তোমার সাজে না বৌদি!

—ঠিক কথা। সায় দিয়ে স্ত্রীর হাতে পোশাকগুলো তুলে দিলেন রাজেন-বাবু, এই তো সত্যিকারের মানুষের কথা। ছেলে তোমার পরাধীন দেশের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করতে যাচ্ছে। এ সময়ে উপযুক্ত মায়ের মতোই তুমি তাকে নিজের হাতে সাজিয়ে দাও। নাও, ধর। এতবড় সৌভাগ্য, এতবড় সুযোগ জীবনে আর কোনদিনও পাবে না। শুরু কর!

আস্তে আস্তে নিজেকে দৃঢ় করলেন বৌদি। তাই তো! এমন ছেলে ক'জনের আছে! সে যে কত বড়! কত মহৎ! বীরের মতো আজ সে নিজেকে উৎসর্গ করতে চলেছে স্বাধীনতার বেদীমূলে। এ সময়ে চোখের জল ফেলা সত্যিই তাঁর সাজে না। তার চাইতে নিজের হাতেই তিনি আজ তাকে সাজিয়ে দেবেন মায়ের মতো করে।

—'যাই বৌদি!' বিদায়ের আগে মাতৃসমা বৌদির পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিলেন বিনয়।

—'এসো ভাই!' একটি মাত্র কথা। আর কিছু বলার মতো শক্তি সত্যিই তখন ছিল না বৌদির।

ইঙ্গিত করতেই পাঞ্জাবী ড্রাইভার গাড়িটা ছেড়ে দিল। লগ্ন আসন্ন। আর দেরি নয়।

অপলক দৃষ্টিতে শেষপর্যন্ত তাকিয়ে রইলেন বৌদি। যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণই তাকিয়ে রইলেন। তারপর এক সময়ে গাড়িটা মিলিয়ে গেল দৃষ্টির আড়ালে। আর তাকে দেখা গেল না।

তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে চোখ দুটোকে মুছে নিলেন বৌদি। শোক করার অবকাশ তাঁর কোথায়!

হয়তো এখুনি প্রতিবেশীদের চোখগুলো কৌতূহলে প্রখর হয়ে উঠবে। হয়তো প্রশ্নের পর প্রশ্নে তারা মুখর হয়ে উঠবে।

না, এ দুঃখ তাঁর একার। এ বেদনার ভাগ দেওয়া চলবে না কাউকেই। বুকটা ব্যথায় ভেঙে গুঁড়িয়ে গেলেও মুখের হাসি তাঁকে জিইয়ে রাখতে হবে সর্বক্ষণ। এছাড়া কোন উপায় নেই।

মল্লিকা, সেদিন শুধু এই বৌদিটিই নন, এমনি কত বৌদি, কত মা, কত স্নেহময়ী দিদি যে বাংলাদেশের এই দামাল ছেলেগুলোকে ধৈর্য দিয়ে, সহানুভূতি দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে সবরকম বিপদ থেকে আগলে রেখে-ছিলেন তার বোধহয় আদি-অন্ত নেই।

প্রতিদানে তাঁরা কি পেয়েছেন, জানো? পেয়েছেন শুধু অপমান আর

অত্যাচার। লাঞ্ছনা আর নির্যাতন। দুঃখ আর দারিদ্র্য। লজ্জা আর ঘৃণা।

মল্লিকা, আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে। হিসেব-নিকেশের পালাও শুরু হয়েছে বেশ ঘটা করেই।

সবারই এক দাবী। অর্থাৎ স্বাধীনতা-আন্দোলনে আমার দানই সর্বাধিক, সুতরাং অন্য সবার চাইতে আমাকে তোমরা একটু বেশি সুবিধা দিতে বাধ্য।

এমন কি, আমাদের দেশের কোটিপতি ব্যবসায়ীরাও তার ব্যতিক্রম নন। তাঁরাও এই বলে তাঁদের ফিরিস্তি দাখিল করেছেন যে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাঁরা যা করেছেন, এমনটি নাকি আর কেউ কোনদিনই করেনি। সুতরাং কিছু সুবিধা তাঁদের অবশ্যই প্রাপ্য।

আজ যখন এসব দেখি, আর শুনি, তখন ঐ সব লক্ষ লক্ষ হতভাগ্যের কথাই মনে পড়ে বার বার। ওঁরা ওঁদের হিসেব মেলাতে পারেননি। সে চেষ্টাও করেননি কোনদিন। তাই দুর্ভাগ্য ওঁদের নিত্য-সঙ্গী হয়েই রইল চিরদিন।

মল্লিকা, তোমরা একালের মেয়ে। পরাধীনতার জ্বালা যে কি তীব্র, সে অনুভূতি তোমাদের নেই।

সে দুঃসহ জ্বালায় ওঁরা জ্বলেছেন চিরদিন। ওঁদের তোমরা শ্রদ্ধা করো। প্রণাম করো। নইলে অকৃতজ্ঞ বলে ইতিহাসে তোমরা মসীলিপ্ত হয়ে থাকবে চিরদিন।

মনে রেখো, আজ সারা দুনিয়ার সামনে স্বাধীন জাতি বলে তোমরা যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছ, সে স্বাধীনতা ওঁদেরই সমাধির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাসে ওঁদের তুলনা নেই।

দুটি বাহু এক হল খিদিরপুর পাইপ রোডের মোড়ে এসে।

এদিক থেকে এলেন বিনয় আর রসময় শূর। ওদিক থেকে দীনেশ, বাদল আর নিকুঞ্জ সেন।

এবার যাত্রা শুরু। ঐতিহাসিক যাত্রা।

ইঙ্গিত করতেই ট্যাক্সিটা এগিয়ে চলল ডালহৌসী স্কোয়ারের দিকে।

স্থির অপলক দৃষ্টিতে শেষপর্যন্ত তাকিয়ে রইলেন রসময় শূর ও নিকুঞ্জ সেন। বিপ্লবী জীবন অতি কঠিন, কঠোর। তুচ্ছ ভাবাবেগে ভেঙে পড়লে তাঁদের চলে না। তবু তাকিয়ে থাকতে থাকতে অজ্ঞাতেই বুঝি চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে বার বার।

ঐ যে ওরা চলে যাচ্ছে। ঐ যে গাড়িটা জনারণ্যের মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে। আর ওরা ফিরে আসবে না। হাজার ডাকলেও ওদের আর সাড়া পাওয়া যাবে না। কোনদিনও না।

বিদায় বন্ধুগণ, বিদায়! বিনয়, বাদল, দীনেশ—তোমাদের এই নিঃশেষ আত্মবিসর্জন ব্যর্থ হবে না। আজ হোক, কাল হোক স্বাধীনতা আমরা অর্জন করবই। সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে তোমাদের এই চরম আত্মবিসর্জনের কাহিনী সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল।

গাড়িটা ছুটে চলেছে ডালহৌসী স্কোয়ারের দিকে। দূরত্ব কমে আসছে ক্রমশঃ।

ভেতরে স্থির অচঞ্চল হয়ে বসে আছেন বিনয়, বাদল আর দীনেশ। বুকে দুর্বার সাহস। চোখে দিগন্ত সীমার মতো উন্মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি।

আঘাত হানতে হবে। চরম আঘাত হানতে হবে আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে। যত বাধাই আসুক না কেন, সব কিছুকে পর্যুদস্ত করে বুকটান করে এগিয়ে যেতে হবে। ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে সব।

তার জন্য চরম মূল্য দিতে তারা প্রস্তুত। দেবেও। ব্রিটিশ-শক্তির সেই দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে ফিরে আসার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সে চেষ্টাও তারা করবে না।

তবে তার আগে দেখিয়ে দিতে হবে যে, স্বাধীনতার সৈনিক মৃত্যুকে কোনদিনও ভয় পায় না। দেখিয়ে দিতে হবে যে, ভিক্ষায় কোনদিনও স্বাধীনতা আসে না। এমনি করেই চরম মূল্য দিয়ে তাকে অর্জন করতে হয়।

আমাদের পালা শেষ। এবার তোমরাও এস আমাদের এই ফেলে-যাওয়া রক্তরেখা অনুসরণ করে।

কাঁটায় কাঁটায় ১২টা। লগ্ন সমাগত। আর দেরি নয়।

সামনেই দুর্ভেদ্য দুর্গ রাইটার্স বিল্ডিং। দুর্গই বটে! কারণ, তখনকার দিনে কারো পক্ষে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ঢোকা এত সহজ ছিল না। বিশেষ করে ১৯৩০-৩৫ সালে তো নয়ই। বাঙালী জুজুর ভয়ে ইংরেজ সেদিন থরথর কম্পমান।

বেলা তখন ১২টা। নিজের অফিসে বসে কতগুলি জরুরী ফাইল নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন কারা-বিভাগের সর্বময় কর্তা কর্নেল সিম্পসন। সামনে দাঁড়িয়ে একান্ত সচিব জ্ঞান গুহ।

সহসা কি শুনে কান দুটো সজাগ হয়ে উঠল সিম্পসনের।

কারা যেন তালে তালে পা ফেলে এদিকেই এগিয়ে আসছে। পা ফেলার ধরন দেখে মনে হয়, কোন মিলিটারী অফিসার হবে হয়তো।

কে! কে! নিমেষে চোখ কপালে উঠে গেল সিম্পসনের। কে ওরা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে? হাতে ওগুলো কি ওদের!

গর্জে উঠলেন অধিনায়ক বিনয় বোস—'প্রে টু গড্ কর্নেল! ইওর লাস্ট আওয়ার ইজ কামিং।'

বলতে না বলতেই পর পর ছ'টা গুলী বেরিয়ে এল তিন-তিনটে রিভলবারের মুখ দিয়ে।

ব্যস, সব শেষ। আর একটি কথাও বলতে হল না কর্নেল সিম্পসনকে।

সংগে সংগে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনজন। এখানকার কাজ শেষ। পরবর্তী লক্ষ্য হোম সেক্রেটারী আলবিয়ান মার। চলো এবার তার ঘরে। ঐ যে দেখা যাচ্ছে!

দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! নিমেষে হোম ডিপার্টমেণ্টের কাঁচের জানালা সব ভেঙে পড়ল ঝন্ ঝন্ করে। কোথায় আলবিয়ান মার! শুট হিম!

কাণ্ড দেখে উদ্যত রিভলবার নিয়ে ছুটে এলেন ইনস্‌পেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ মিঃ ক্রেগ।

ছুটে এলেন ফোর্ড। ছুটে এলেন সহকারী ইনস্‌পেক্টর জেনারেল মিঃ জোনস। গুলীও তাঁরা ছুঁড়লেন কয়েক রাউণ্ড।

কিন্তু সব বৃথা। দীনেশ, বাদল, বিনয় তিনজনেই তখন সমান বেপরোয়া। তাই সমানেই তাঁরা জবাব দিতে লাগলেন তিনটি অগ্নি-বর্ষী রিভলবারের মুখ দিয়ে।

হিসেব অত্যন্ত সোজা। গুলীর বদলে গুলী। রক্তের বদলে রক্ত। এছাড়া অন্য কোন হিসেব বুঝি সেদিন জানা ছিল না তাঁদের।

বাধ্য হয়েই গা-ঢাকা দিলেন শ্বেতাঙ্গ বীরপুরুষের দল। মাই গড! এ যে একেবারে আসল কেউটের বাচ্চা দেখছি! কে যাবে ওদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বেঘোরে প্রাণটা দিতে!

গোটা রাইটার্স বিল্ডিং জুড়ে তখন সে এক বিভীষিকার তাণ্ডব!

চারদিকে ভীত, আতঙ্কিত, পলায়নপর শ্বেতাঙ্গের দল। হৈ-হল্লা, চিৎকার আর চেঁচামেচি। পালাও! পালাও! বাঁচতে চাও তো এক্ষুণি পালাও!

খবর পেয়ে ছুটে এলেন পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট।

ছুটে এলেন ডেপুটি কমিশনার মিঃ গর্ডন। ছুটে এলেন মিঃ বার্ট। সঙ্গে অসংখ্য সশস্ত্র পুলিশ।

কিছুতেই কিছু হল না। হবে কি করে! বেতনভোগী সৈন্যদের দিয়ে স্বার্থসিদ্ধির সংগ্রামের সঙ্গে দেশের মুক্তিকামী সৈনিকদের সংগ্রামের যে অনেক তফাৎ! তাই স্বাভাবিক কারণেই তারা হার মানল সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাৎপসরণ করে।

এদিকে ঘটনা তখন ঘটে চলেছে দুর্বার গতিতে। একটি একটি করে ঘটনা ঘটছে, আর রচিত হচ্ছে ইতিহাস।

পরবর্তী লক্ষ্য পাসপোর্ট অফিস। নিমেষে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল গোটা অফিসটা।

সে এক বিচিত্র দৃশ্য! কেউ হামাগুড়ি দিয়ে পালাচ্ছে। কেউ টেবিলের নিচে আত্মগোপন করছে। কেউ বা কোন কিছু করতে না পেরে চোখ বুজে মেরীমাতার নাম জপ করছে মনে মনে।

মজা করলেন মিশনারী পাদ্রি মিঃ জনসন। কাণ্ড দেখে সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাতীর মতো বিরাট দেহটা নিয়ে নিচে ঝুলে পড়লেন ড্রেন-পাইপ বেয়ে। আগে প্রাণ, তারপর অন্য কথা। ওখানে থেকে বেঘোরে প্রাণ দিতে তিনি রাজী নন।

দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

ঘুরে পড়লেন জুডিসিয়াল সেক্রেটারী মিঃ নেলসন। ঘুরে পড়লেন মিঃ ট্যয়নাম। ঘুরে পড়ল এমনি আরো অনেকেই।

বিনয়, বাদল, দীনেশ তখনও অক্ষয়। সামান্য আঁচড়টিও লাগেনি তাঁদের গায়ে।

উপায়ান্তর না দেখে শেষপর্যন্ত ডাকা হল গুর্খাবাহিনীকে। তারপর শুরু হল সেই ঐতিহাসিক 'অলিন্দ-যুদ্ধ'।

সংঘর্ষ নয়, যুদ্ধ। ইংরেজ মুখপত্র স্টেটস্‌ম্যান পর্যন্ত সেদিন এই মারাত্মক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামকে আখ্যা দিয়েছিল 'বারান্দা ব্যাট্‌ল' বলে।

অবিশ্বাস্য! অভাবনীয়! অকল্পনীয়!

একদিকে হাঁটু মুড়ে পোজিশন নিয়েছে অগণিত গুর্খা ফৌজ, অন্যদিকে লাইং ডাউন পোজিশনে বিনয়, বাদল আর দীনেশ।

একদলের হাতে শক্তিশালী রাইফেল, অন্যদলের হাতে স্বল্পপাল্লার রিভলবার মাত্র।

একদিকে বহু যুদ্ধের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ সমরবিদগণ অন্যদিকে পরাধীন দেশের তিনটি মাত্র স্বাধীনতাকামী সৈনিক।

কতই বা বয়েস তাদের! সবে তো কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দিয়েছেন মাত্র।

কিন্তু কার সাধ্য তাঁদের সামনে এগোয়! উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তাঁরা ছড়িয়ে চলেছেন জ্বলন্ত সীসের গুলী। এর মধ্যে এক পা এগুনো মানেই মৃত্যু।

দেখতে দেখতে বাতাস ভারী হয়ে উঠল ধোঁয়া আর বারুদের গন্ধে। সব অন্ধকার। দুহাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যায় না। গুলির শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনাও যায় না।

বাধ্য হয়েই এবার প্ল্যান পাল্‌টাতে হল শাসকদের। ফলে. রণাঙ্গন এবার বিস্তৃত হয়ে পড়ল বহুদূর পর্যন্ত। কখনো এ বারান্দায়, কখনো ও বারান্দায়। কখনো এপ্রান্তে, কখনো ওপ্রান্তে।

সব কিছু ছাপিয়ে মাঝে মাঝে মেঘ-গর্জনের মতো রব ওঠে—বন্দে মাতরম্‌!

বন্দে মাতরম্‌। ছোট্ট কথা। ছোট্ট শব্দ। কিন্তু এই ছোট্ট শব্দটির যে কি অপরিসীম শক্তি, তা আজ বোধহয় তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, মল্লিকা।

সেদিন অনেক রক্তই ঝরেছিল এই ছোট্ট শব্দটির জন্য। অনেক লাঞ্ছনা। অনেক নির্যাতন। তবু দেশ-বন্দনার এই ছোট্ট শব্দটিকে সবাই প্রাণপণে আঁকড়ে রেখেছিল মূল্যবান ঐশ্বর্যের মতো।

এদিকে যুদ্ধ তখন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে চলেছে। দু পক্ষই সমান। কেউ কম যায় না।

হঠাৎ একটি গুলী এসে লাগল দীনেশের পিঠে। ভ্রূক্ষেপও নেই। পিঠে লেগেছে তো কি হয়েছে! হাত তো ঠিকই আছে! তবে আর ভাবনা কি! ডু অর ডাই! করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে!

এমনি করে কিছুক্ষণ, তারপরই একেবারে চুপ। সেই চিরন্তন সমস্যা। গুলী শেষ। দীনেশ ও বিনয়ের তবু একটা করে অবশিষ্ট আছে, বাদলের তাও নেই।

মুহূর্তে একটা খালি ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন ওঁরা তিনজন। কর্তব্য শেষ। এবার মাটির পৃথিবী থেকে তাঁদের বিদায় নেবার পালা।

শেষবারের মতো বল সবাই—বন্দে মাতরম্!

বন্দে মাতরম্! সমবেত কণ্ঠের বজ্র-নির্ঘোষে বুঝি কেঁপে উঠল গোটা ডালহৌসী স্কোয়ার অঞ্চলটা।

আর দেরি নয়। রেডি প্লীজ! নিমেষে তিনজন মুখে পুরে দিলেন মারাত্মক সায়ানাইডের পুরিয়া। এবার দাঁত দিয়ে কামড়ে কাঁচের অ্যাম্পুলটা ভেঙে দিতে পারলেই, ব্যস্!

দীনেশ আর বিনয় কিন্তু এখানেই থামলেন না। এখনো একটা করে গুলী অবশিষ্ট আছে। ওটা ফেলে রেখে লাভ কি! মনঃস্থির করে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ট্রিগারে টান দিলেন নিজেদের কপালে লক্ষ্যস্থির করে।

দ্রাম! দ্রাম! শেষবারের মতো রিভলবার দুটো গর্জে উঠেই হঠাৎ থেমে গেল। তারপর একসঙ্গে তিনজনের দেহই লুটিয়ে পড়ল শক্ত মাটির বুকে।

ভেতরে বহুক্ষণ পর্যন্ত কোনরকম সাড়াশব্দ না পেয়ে এবার শাসককুল পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল অতি সন্তর্পণে। ওদের বন্দী করতে হবে। কঠিন শাস্তি দিতে হবে।

কোথায় তখন ওঁরা?

বাদল শেষ। দীনেশ ও বিনয় দুজনেই গুরুতর আহত। দীনেশের গলার বাঁ-দিকে গুলী বিদ্ধ হয়েছে। বিনয়ের গুলী বিদ্ধ হয়েছে কপালের দু-দিকেই। সায়ানাইডের পুরিয়া তাঁদের বেলায় কার্যকর হয়নি। গুলী বিদ্ধ হবার দরুন অ্যাম্পুলটা ভাঙবার মতো অবকাশই তাঁরা পাননি।

এবার শুরু হল সরকার বাহাদুরের বীরত্বের পালা।

বাদলের মৃতদেহ সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হল পুলিশের হেপাজতে। অবিলম্বে ওর পরিচয় খুঁজে বের করো।

বিনয় ও দীনেশকে কড়া পাহারায় পাঠানো হল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ওদের সুস্থ করে তুলে বিচারের নামে চরম শাস্তি দিতে হবে। ফাঁসিতে ঝোলাতে হবে।

এদিকে খবর শুনে মহানগরী স্তম্ভিত। চোখে-মুখে তাদের চাপা উল্লাস। ধন্য তোমরা! পরাধীন জাতির ইতিহাসে তোমরা যা দেখালে, কোথাও বুঝি তার তুলনা নেই।

ধন্য বিনয় বোস! মাত্র তিন মাসের মধ্যে দু-দুটো ক্ষেত্রে তুমি যে অসাধ্য সাধন করেছ, তা একমাত্র তোমার পক্ষেই বুঝি সম্ভব। ধন্য তুমি! ধন্য তোমার সুযোগ্য সহকারী দীনেশ আর বাদল!

পরদিনই সে খবর বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হল বিভিন্ন সংবাদপত্রের পাতায়। স্টেটস্ম্যান লিখলেন:

'...Lt. Col. N. S. Simpson was shot dead.

...Mr. J. W. Nelson, judicial Secretary, was wounded in the leg. Another bullet narrowly missed Mr. A. Marr,

Finance member, who on hearing the shots came to the door of his room.

Orderly of the D. P. I. was wounded in leg. Passersby were dumb-founded to see in broad day light, in the heart of the business quarters of Calcutta an incident that had all the elements of a Chicago gunning affair.'

[Statesman : 9th Dec. : 1930]

অমৃতবাজার পত্রিকার বিবরণঃ

'...Between I. G. of Prisons' room and Mr. Nelson's room, many Europeans had hair-breadth and providential escapes. Mr. Towneu, Agricultural and Industrial Secretary had the skirts of his coat and waist-coat shot through without any injury to his person. Mr. Prentice, Home member, escaped unhurt.

Mr. Marr, Finance member, had a providential escape. Mr. Stapleton, D. P. I., along with his P. A. and another European official narrowly escaped.

Holes near the gate of Mr. Nelson's room and another at the ceiling of Mr. Prentice's room were found later on. Holes were of the size of tennis ball.

They dashed into Passport Office and re-loaded their revolvers there. One American Missionary Mr. E. S. Johnson, waiting in that office out of fear made his escape down with the help of a drain-pipe!' [A. B. : 9th Dec. : 1930]

আনন্দবাজার পত্রিকার বিবরণঃ

গুলীর আঘাতে বাংলার কারা-বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল নিহত

'গতকল্য বেলা ১২টার সময় কলিকাতার বুকের ওপর রাইটার্স বিল্ডিংয়ে এক বিষম দুঃসাহসিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। ৩ জন বাঙালী যুবক বাংলার কারাগার-বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্নেল সিম্পসনকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছে।

বেলা ১২-১৫ মিঃ হইতে ১২-৩০ মিনিটের মধ্যে ৩ জন বাঙালী যুবক কারাগার-বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফিসে (রাইটার্স বিল্ডিং) আসিয়া উপস্থিত হয়। কর্নেল সিম্পসন তখন তাঁহার খাসমুন্সির (পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট) সঙ্গে তাঁহার অফিসে বসিয়া কথা বলিতেছিলেন। যুবকত্রয় তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ ব্যক্ত করিলে চাপরাশি তাহাদিগকে উপরোক্ত কারণে অপেক্ষা করিতে বলে এবং কি কাজের জন্য তাহারা

লেখা করিতে চায় তাহা যথারীতি একটুকরা কাগজে লিখিয়া দিতে বলে। কিন্তু যুবকগণ ইহা করিতে অস্বীকৃত হয় এবং তাহাকে একপাশে ঠেলিয়া স্প্রিংয়ের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং দ্রুতগতিতে কর্নেল সিম্পসনের প্রতি ৫-৬ বার গুলী নিক্ষেপ করে। গুলীর আঘাতে কর্নেল সিম্পসন তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কর্নেল সিম্পসনের ঘর হইতে বাহির হইয়া আততায়ীরা বারান্দা দিয়া চলিয়া আসে। দৌড়াইবার সময় তাহারা অফিসগুলির কাঁচের জানালায় এবং সিলিং-এ গুলী করিতে থাকে। রাজস্ব-সচিব মিঃ মারের অফিসের জানালায় গুলীর চিহ্ন রহিয়াছে। মিঃ জে. ডব্লিউ নেলসনের অফিসেও গুলীর চিহ্ন রহিয়াছে।

অতঃপর তাহারা পাসপোর্ট অফিসে প্রবেশ করে এবং একজন আমেরিকানকে গুলী করে, কিন্তু গুলী ব্যর্থ হয়। কোন চাপরাশির গায়ে গুলী লাগে নাই।

অতপরঃ আততায়িগণ নেলসন সাহেবের ঘরে প্রবেশ করে এবং তাহার উরুতে গুলী করে। তাহার আঘাত গুরুতর নহে।

শেষ খবরে জানা যায়, একজন আততায়ী আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে। অপর দুইজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় অবস্থান করিতেছে। একজনকে বিনয়কৃষ্ণ বসু বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে। সে নাকি এই মর্মে এক মৃত্যুকালীন জবানবন্দী দিয়াছে যে, সে-ই বিনয়কৃষ্ণ বসু এবং সে-ই মিঃ লোম্যানকে হত্যা করিয়াছে। আততায়িগণ তিনজনেই ইয়োরোপীয় পোশাকে ভূষিত হইয়াছিল। বারান্দা দিয়া গুলী করিতে করিতে অগ্রসর হইবার সময় উহারা বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করিতেছিল।

[আনন্দবাজার ঃ ৯ই ডিসেম্বর ঃ ১৯৩০]

আরো বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গেল ১১ই তারিখের সংবাদপত্রে ঃ

সিম্পসন হত্যাকাণ্ডের জের। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে পাহারার কড়াকড়ি।

'রাইটার্স বিল্ডিংয়ে যাতায়াত সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছে। পশ্চিমদিকের সিঁড়ি ছাড়া আর সকল সিঁড়িতে সাধারণের যাতায়াত সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছে। যাহাতে কেহ প্রবেশপত্র ছাড়া উপরে যাইতে না পারে, এজন্য প্রত্যেক সিঁড়ি ও লিফটে সার্জেন্ট পাহারা বসান হইয়াছে। নিচতলায় বাহিরের লোকের জন্য চেয়ার-টেবিল রাখা হইয়াছে। যাহারা অবিরত রাইটার্স বিল্ডিংয়ে যাতায়াত করে, তাহাদিগকে একখানা করিয়া প্রবেশপত্র দানের ব্যবস্থা হইবে।...'

তিনজনেই বিষপান করিয়াছিল।

'তদন্তে জানা যায় যে, আততায়িগণ তিনজনেই রাইটার্স বিল্ডিংয়েই বিষপান করিয়াছিল। কিন্তু বিনয় ও দীনেশের পাকস্থলীতে বিষ প্রবেশ

করিবার পূর্বেই তাহারা প্রত্যেকে প্রত্যেককে গুলী করে ও অজ্ঞান হইয়া পড়ে। হাসপাতালে আনীত হইবার পরই উহাদের দেহ হইতে বিষ বাহির করিয়া ফেলা হয়।'

বিনয় ও দীনেশ

'গতকল্য বৈকালে খোঁজ লইয়া জানা যায়, বিনয় বসুর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতেছে। তাহার মাথার মগজের ক্ষতমুখ বাহিয়া এখনও রক্ত চুয়াইয়া পড়িতেছে। বিনয় বসু ও দীনেশ গুপ্ত উভয়ইকেই মঙ্গলবার দিবস রঞ্জন-রশ্মি দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার ফলাফল এখনও জানা যায় নাই। প্রকাশ যে, দীনেশের মাথায় যে গুলী আটকাইয়া রহিয়াছে, উহার উপর অস্ত্রোপচারের ধাক্কা দীনেশ সহিতে পারিবে না, এই আশঙ্কায় আর বাহির করিবার চেষ্টা করা হয় নাই।'

হাসপাতালে পাশাপাশি বেডে বিনয় আর দীনেশ। তখনও পর্যন্ত কারোরই জ্ঞান ফিরে আসেনি। আদৌ আসবে কিনা বলা শক্ত।

অবশ্য চিকিৎসকদের চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। আশা যদিও খুবই কম, তবু শেষপর্যন্ত দেখতে হবে বৈকি!

কিন্তু একি! বিনয়ের ডানহাতের আঙুলগুলোতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কেন? ওখানে তো কোনরকম গুলীর আঘাত লাগেনি! তা হলে কে এজন্য দায়ী?

দায়ী স্বয়ং টেগার্ট। বিনয় তাঁর অহঙ্কারে আঘাত করেছেন। দু-দুটো ক্ষেত্রে তাঁকে অত্যন্ত অপদস্থ হতে হয়েছে বিনয়ের কাছে। তাই এবার তিনি তাঁর সমস্ত জ্বালা মিটিয়ে নিয়েছেন বুটের সাহায্যে অচৈতন্য বীরের হাতের আঙুলগুলো ভেঙে দিয়ে।

এর নাম বীরত্ব!

এই প্রথম নয়। পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের প্রতি এমনি বীরত্ব ওরা দেখিয়েছে অসংখ্যবার।

চট্টগ্রাম-বিপ্লবের সর্বাধিনায়ক সূর্য সেনের কথাই ধরা যাক। গ্রেপ্তারের পরে রুগ্ন, অসুস্থ মাস্টারদার ওপর কি নির্মম অত্যাচারই না করেছিল এই হিংস্র পশুর দল! বিশেষ করে, তাঁর অন্তিম মুহূর্তে ওরা যা করেছিল পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও বুঝি তার নজীর নেই।

ফাঁসি-কাঠে ঝোলাবার পূর্ব মুহূর্তে কখনো কোন বন্দীকে নির্মম-ভাবে প্রহার করা হয়েছে, এমন কথা কোনদিনও শুনেছ কি? ব্রিটিশ শাসকরা কিন্তু সেদিন তাও করেছিল। আঘাতে আঘাতে মাস্টারদার সবগুলো দাঁতই সেদিন ওরা তুলে নিয়েছিল। শেষপর্যন্ত ওরা ফাঁসি দিয়েছিল মাস্টারদাকে নয়, তাঁর রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত অচৈতন্য দেহটাকে।

একই সঙ্গে ফাঁসির বন্দী তারকেশ্বর দস্তিদারের ভাগ্যেও সেদিন জুটেছিল তাই। ফাঁসির পূর্বে নির্মম বুটের আঘাতে সেদিন ওরা তারকেশ্বরের একটা চোখ অন্ধ করে দিয়েছিল।

ভারতে এই হল অত্যাচারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আসল রূপ।
শুধু কি ভারতে! বর্মায় কি করেছিল, শুনবে?
একই সঙ্গে ওরা ফাঁসি দিল বাহাত্তর জন মুক্তি সৈনিককে। তারপর তাঁদের মুণ্ডগুলো আলাদা করে কেটে নিয়ে তার ছবি তুলে ছড়িয়ে দিল বর্মায় সর্বত্র। অর্থাৎ, সাবধান! নইলে তোমার ভাগ্যেও এই জুটবে।
অথচ এর বিপরীত চিত্র দেখ। যে চট্টগ্রাম সশস্ত্র-বিপ্লবকে দমন করার জন্য সেদিন ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচারের সীমা-পরিসীমা ছিল না, ঘটনাটা ঘটেছিল তখনই। কাহিনীর নায়ক বীর বিপ্লবী লোকনাথ বল। এ কাহিনী আমার তাঁর কাছ থেকেই শোনা।
১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল। স্থান চট্টগ্রাম রেলওয়ে অস্ত্রাগার।
রাত ঠিক দশটা। সহকারীদের নিয়ে অধিনায়ক লোকনাথ বল হাজির। যে যেখানে আছ সরে দাঁড়াও। বেঘোরে প্রাণ দিয়ে লাভ নেই। আমাদের কাজ আমরা করবই।
উপস্থিত বাহাত্তর জন সশস্ত্র প্রহরী সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া। কথায় বলে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম! এসব ডাকু ছেলেদের রিভলবারের সামনে দাঁড়ানোর চাইতে গা-ঢাকা দেওয়াই নিরাপদ।
উপদেশে কর্ণপাত না করে রিভলবার খুলে বাধা দিলেন সার্জেণ্ট মেজর ফেরেল। অধিনায়কের আদেশে সঙ্গে সঙ্গে তিনি গুলীর আঘাতে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।
এবার লোকনাথ বলের পায়ের কাছে এসে ভেঙে পড়লেন মিসেস ফেরেল—'আমাকে ও আমার এই শিশুটিকে তুমি বাঁচতে দাও!'
কি উত্তর দিলেন লোকনাথ বল, জানো মল্লিকা? উত্তর দিলেন—'আমি দুঃখিত সিস্টার। এ ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি বা আমার কোন লোক তোমার এতটুকুও অমর্যাদা করবে না।'
সিস্টার! যে ব্রিটিশ শাসক সেদিন আন্দোলনকে দমন করতে গিয়ে নারীর মান সম্ভ্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ করেনি, তাদের দেশেরই একটি মহিলাকে সেদিন সম্মান দেওয়া হল সিস্টারের মর্যাদায়। দিলেন তাঁরাই, ওদের ভাষায় যাঁরা বহু-নিন্দিত 'সন্ত্রাসবাদী' ছাড়া আর কিছু নন।
তাহলে কে বড়, মল্লিকা? সুসভ্য ব্রিটিশ শাসক চার্লস টেগার্ট, না বাংলাদেশের তথাকথিত এই সন্ত্রাসবাদীর দল?

ইতিমধ্যে দুজনের অবস্থাই বেশ ভালর দিকে চলেছে। মনে হয়, চিকিৎসার গুণে এ যাত্রা হয়তো বেঁচে গেলেও বা যেতে পারেন।
কিন্তু একি! সহসা কি দেখে চমকে উঠলেন চিকিৎসকবৃন্দ।
সর্বনাশ! বিনয় বোসের মাথায় ব্যাণ্ডেজ খোলা কেন? ক্ষতস্থানে একটা গভীর গর্তই বা দেখা যাচ্ছে কেন?

কে করেছে এমন কাজ ? কে করেছে ?

কে আবার ! করেছেন বিনয় নিজেই।

ব্রিটিশ তাঁর শত্রু। জীবনে যাদের তিনি সবচাইতে বেশি ঘৃণা করেছেন, তাদের আওতায় থেকে সামান্য সেবা-শুশ্রূষা গ্রহণ করতেও তাঁর আত্মসম্মানে বাধে। অথচ এ অবস্থায় কোন উপায়ও নেই। সুতরাং এই দুঃসহ অবস্থা থেকে রেহাই পাবার একটা উপায় খুঁজে বের করতেই হবে।

খুঁজে পেতে দেরি হয়নি। নিজে তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একজন মেধাবী ছাত্র। এ অবস্থায় কি করলে কি হয়, তা তিনি ভাল করেই জানেন। তাই নিজেকে নিঃশেষ করার জন্য এই অচৈতন্য অবস্থার মধ্যেই কখন তিনি মাথার ক্ষতস্থানের ভেতরে গভীরভাবে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছেন অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে।

ফলে সেপ্‌টিক। ঘা দস্তুরমত বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। বিকারও শুরু হয়েছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

চিকিৎসকদের মুখ গম্ভীর। কখন কি হয় বলা শক্ত। জোর করে কিছু বলা মুশ্‌কিল। তাছাড়া প্রলাপ বকতে শুরু করেছেন। এ অবস্থায় কিছু ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়।

গম্ভীর চার্লস টেগার্টও। তবে কি হাতে এসেও ফস্‌কে যাবে লোকটা ! তাহলে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মান-মর্যাদা আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না !

পাঁচদিন ধরে যমে-মানুষে টানাটানি, কিন্তু অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। বরং জীবনী-শক্তি যেন কমেই আসছে ক্রমশঃ।

ইতিমধ্যে বিনয়ের বাবা ও মা দুজনেই এসে গেছেন। সদাশয় সরকার তাঁদের শেষ দেখা দেখতে অনুমতি দিয়েছেন। স্তব্ধ হয়ে তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানের শিয়রে।

সবশেষে পাদ্রি সাহেব এলেন শান্তির ললিতবাণী শোনাতে। অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত। এ সময়ে যীশুর বাণী শোনাতে পারলে লোকটা ইহকালে না হোক, অন্ততঃ পরকালে গিয়ে হয়তো কথঞ্চিৎ ব্রিটিশ-ভক্ত ভাল ছেলে হতে পারে।

সহসা কি শুনে বিনয়ের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন পাদ্রি সাহেব। বিকারের ঘোরে রোগী কি যেন বলছে বিড়বিড় করে।

কিন্তু একি !

তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে সভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন পাদ্রি সাহেব !

কি সর্বনাশ ! কাকে তিনি শান্তির ললিতবাণী শোনাবেন !

রোগীকে !

মৃত্যুপথযাত্রী রোগী যে উল্টো তাঁকে ভয়ংকর এক শান্তির বাণী শোনাতে শুরু করেছেন বিকারের ঘোরে ! এই সংজ্ঞাহীন অবস্থার মধ্যেও ক্রমাগত তিনি বলে চলেছেন—অ্যাটেনশন প্লীজ ! ফরোয়ার্ড মার্চ ! লেফট্‌... রাইট্‌, লেফট্‌...রাইট্‌, লেফট্‌...চার্জ ! গো ফরোয়ার্ড !

বাইবেল বন্ধ করে পত্রপাঠ বিদায় নিলেন পাদ্রি সাহেব। খুব হয়েছে

বাবা, আর নয়! এমন ছেলের কাছে আর যেন কোনদিনও তাঁর ডাক না পড়ে।

অদূরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন পিতা রেবতীমোহন বোস। না, দুঃখ নয়। নিজে তিনি নাম-করা শিকারী। জীবনে কোনদিনও তাঁর গুলী মিস্ হয়নি।

ছেলেও হয়েছেন তেমনি বাপ কা বেটা। একটা গুলীও তাঁর মিস্ হয়নি। দশজনের কাছে এমন ছেলের বাপ বলে পরিচয় দিয়েও সুখ।

শিয়রে মা। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি যেন। নিশ্চল পাষাণের মতো সেই কখন থেকে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন ছেলের শিয়রে। একটি কথাও বলেননি।

শুধু শেষ মুহূর্তে একবার ঝুঁকে পড়ে ছেলের মাথায় হাত রেখে আস্তে আস্তে ডাকলেন—'আমি এসেছি খোকা। একবার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখ বাবা, আমি যে তোকে দেখবো বলেই এমন করে ছুটে এসেছি!'

আশ্চর্য! গত ক'দিনের মধ্যেও যাঁর চেতনার কোন লক্ষণ দেখা যায়নি, মায়ের এই ডাক শুনে এবার যেন তাঁর দেহটা বারেকের জন্য নড়ে উঠল। সারা মুখে আস্তে আস্তে ফুটে উঠল একঝলক প্রসন্ন হাসি। তারপর একটু একটু করে কখন হাতটা কপালের কাছে উঠে গেল স্যালুটের ভঙ্গিতে।

নিজে তিনি ছিলেন স্বাধীনতার সৈনিক। তাই অন্তিমকালেও নিজের মাকে, জন্মভূমিকে, লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত দেশবাসীকে সামরিক ভঙ্গিতে স্যালুট জানিয়ে গেলেন বীর সেনানীর মতো।

মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানের সঙ্গে পিতামাতার এই শেষ সাক্ষাৎকারের মর্মস্পর্শী বিবরণ পরদিনই প্রকাশিত হল বিভিন্ন সংবাদপত্রের পাতায়ঃ

মৃত্যুশয্যায় বিনয় বসু

জনক-জননীর নিকট হইতে শেষ বিদায়

'গতকল্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তদন্ত করিয়া জানা গিয়াছে যে, বিনয়কৃষ্ণ বসু মরণাপন্ন। সে অচেতন অবস্থায় চক্ষু বুজিয়া রহিয়াছে।

প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি লইয়া গতকল্য বিনয়ের বৃদ্ধ পিতা শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন বসু, বৃদ্ধা মাতা এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু হাসপাতালে বিনয়কে দেখিতে যান। তাঁহারা 'বিনয় বিনয়' বলিয়া বারংবার ডাকিতে থাকেন এবং কাঁদিতে থাকেন।

বিনয় সাড়া দিতে সমর্থ হয় নাই। একবার মাত্র সে তাহার ডান হাতখানি উঠাইয়া কপালে ঠেকাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। বোধহয় জনক-জননীকে শেষ নমস্কার জানাইতেছিল। বৃদ্ধ পিতামাতার নিকট এই দৃশ্য অসহ্য হইল, তাঁহারা সাশ্রুলোচনে হাসপাতাল ত্যাগ করিলেন।

বিনয় ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার রাউথভোগ গ্রামের শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন বসুর পুত্র। সে ঢাকা মেডিকেল স্কুলের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। সে ঢাকা মেডিকেল বোর্ডিং-এ থাকিত। বিনয়ের ছয়টি ভাই আছে।

বিনয়ের পিতামাতা এবং দাদা জামসেদপুরে থাকেন। গতকল্য প্রাতে তাঁহারা বিনয়কে দেখিতে কলিকাতা আসিয়াছেন।'

[আনন্দবাজার : ১২ই ডিসেম্বর : ১৯৩০]

তারপর! তারপর এল সেই কালরাত্রি। সেই কালরাত্রির কথা আজো অম্লান হয়ে আছে সংবাদপত্রের পাতায় :

বিনয় বসুর পরলোকগমন

'শনিবার প্রাতঃ সাড়ে ছয়টার সময় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিনয়কৃষ্ণ বসুকে মৃত দেখা গিয়াছে। রাত্রিতে কখন তাহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহা জানা যায় নাই।

ডেপুটি কমিশনার নয়টার সময় শবটি দিবেন বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দিতে দিতে রাত্রি দশটা হয়।

বিনয়ের পিতা শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন বসু এবং বিনয়ের অন্যান্য কতিপয় আত্মীয়-স্বজন লাশ-ঘরের নিকট প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শবটি তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করা হইলে শবটিকে একখানা সুসজ্জিত খাটিয়ায় রাখা হয়। অতঃপর তাঁহারা খাটিয়াখানি লইয়া নিমতলা ঘাটের দিকে অগ্রসর হন। কতিপয় পুলিশ কর্মচারী এবং কয়েকজন লোক শবানুগমন করে। মাঝে মাঝে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি হইতে থাকে।

নিমতলা ঘাটে শবটি দাহ করা হইবে এ সংবাদ পূর্বেই সান্ধ্য সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবল শীত সত্ত্বেও বহু লোক নিমতলা ঘাটে সমবেত হয়।

শবটি নিমতলা ঘাটে পৌঁছিলে সমবেত জনতা বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিয়া বিনয়ের শবদেহে বহু পুষ্পমাল্য প্রদান করে।

সর্বপাপহারিণী গঙ্গার জলে বিনয়ের দেহটাকে স্নান করান হয় এবং যথা আচারে চিতায় ভস্মীভূত করা হয়। ভস্ম গঙ্গায় দিয়া বিনয়ের আত্মার শান্তি কামনা করিয়া বিনয়ের আত্মীয়স্বজন গৃহে ফিরেন।'

[আনন্দবাজার : ১৫ই ডিসেম্বর : ১৯৩০]

খবর শুনে শ্রদ্ধায় মাথা নোয়াল গোটা বাংলাদেশ। গোটা ভারতবর্ষ। মাথা নোয়াল কোটি কোটি নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষ।

হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি কণ্ঠে জেগে উঠল মহাকবির সেই অমর বাণী—'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।'

বিপ্লবীর মৃত্যু নেই। তাঁর মহান আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই তিনি জাতির ইতিহাসে বেঁচে থাকেন চিরকাল।

বিনয় বোস আজ সেই ইতিহাসের নায়ক। তাঁর মৃত্যু নেই। ক্ষয় নেই।

পরদিন ভোরেই কি দেখে চমকে উঠলেন টেগার্ট। মাত্র ক'দিন আগেই শহরের বুকে বড় বড় পোস্টার পড়েছিল—'রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা।' তারপরই রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ঘটে গেল এই অভাবনীয় রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম।

আশ্চর্য, আজ আবার সেই পোস্টার! রাশি রাশি পোস্টার! লেখা রয়েছে—'Benoy's Blood Beckons For More Blood!'

অথৈ ভাবনা-সাগরে ডুবে গেলেন চার্লস টেগার্ট। আরো রক্ত! কি ভয়ঙ্কর কথা! তবে কি ঝড় থেমে যায়নি! বিনয়ের ঘটনা কি তার সূচনা মাত্র! তাহলে কোথায় এর শেষ! কোথায় সমাপ্তি!

বাদল গত। তারপর একে একে তিনদিন কেটে গেছে, তবু পুলিশ তাঁর মৃতদেহ ছেড়ে দিতে সম্মত নয়। আগে পরিচয় চাই, তারপর অন্য কথা।

অবশ্য একেবারে যে কিছু জানা যায়নি, তা নয়। বাদলের পকেটে বি. এন. দে নামাঙ্কিত একটা কার্ড পাওয়া গেছে।

কে এই বি. এন. দে? কি তার পরিচয়?

রহস্যের অবগুণ্ঠন খুলল দিনকয়েক বাদে। সংবাদপত্র থেকে তার বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ

সিম্পসনের আততায়ী সুধীর গুপ্ত ঃ আততায়ীর প্রকৃত নাম

'রাইটার্স বিল্ডিংয়ে সিম্পসন সাহেবের হত্যাকাণ্ডের পর যে যুবকটি বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল তাহার নাম বি. এন. দে বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

এক্ষণে জানা গিয়াছে যে, তাহার নাম শ্রীমান সুধীর গুপ্ত, ওরফে বাদল। সে ৫৬নং গৌরীবাড়ি লেনের ভবানী ইঞ্জিনীয়ারিং অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানীর শ্রীযুক্ত তরণীকান্ত গুপ্তের ভ্রাতা, শ্রীযুক্ত অবনীকান্ত গুপ্তের পুত্র। অবনীবাবুর বাড়ি ছিল ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিদগাঁও গ্রামে। পদ্মায় বাড়ি ভাঙিয়া যাওয়ায় সম্প্রতি ঢাকা জিলার টঙ্গীবাড়ি থানার অন্তর্গত সিমুলিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন।

তরণীবাবু মৃতদেহ সনাক্ত করিয়াছেন। সুধীরের পিতৃব্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং ধরণী গুপ্ত মুরারীপুকুর বোমার মামলায় দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

সুধীরের আত্মীয়-স্বজন তাহার মৃতদেহ সৎকারের জন্য পুলিশ কমিশনারের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। পুলিশ কমিশনার রাত্রি দশ ঘটিকার পর মৃতদেহ শব-ব্যবচ্ছেদাগার হইতে লইয়া যাইবার অনুমতি প্রদান করেন। তদনুসারে তাহার মৃতদেহ রাত্রি দশ ঘটিকার পর নিমতলা শ্মশানঘাটে লইয়া যাওয়া হয়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশ প্রহরী ও সার্জেণ্ট মোতায়েন করা হইয়াছিল। শবাধার পুষ্পাদি দ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছিল। অনেক মহিলাও অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন।

তথায় রাত্রি পৌনে বারটার সময় বন্দেমাতরম্ ধ্বনির মধ্যে তাহার মৃতদেহে অগ্নি-প্রদান করা হয়।

সিম্পসন হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত বিনয়কৃষ্ণ বসুর বাড়ি ঢাকা জিলার রাউথ-

ভোগ গ্রামে, দীনেশের বাড়ি যশোলং এবং সুধীরের বাড়ি সিমুলিয়া। এই তিনটি গ্রাম পাশাপাশি অবস্থিত।'

[আনন্দবাজারঃ ১৬ই ডিসেম্বরঃ ১৯৩০]

দীনেশের অবস্থা তখন ভালর দিকে।

শুয়ে শুয়ে সবই তিনি দেখলেন অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে। বাদল আগেই চলে গেছে। আজ বিনয়দাও চলে গেলেন। নির্বান্ধব পৃথিবীতে এবার পড়ে রইল সে একা।

কোন দুঃখ নেই। সঙ্গীরা সবাই চলে গেছে একে একে। তাকেও একদিন যেতে হবে এমনি করেই। তার জন্য দুঃখ কিসের ! কিসের ক্ষোভ ! এ তো জানা কথাই !

দুঃখ পেলেন ইংরেজ সরকার। আহা, কি আপসোস ! হাতের নাগালে এসেও কিনা দু-দুজন এমনি করে সটকে পড়ল ! এ দুঃখ যে জীবনেও কোনদিন যাবে না।

যাক, এখনো একজন অবশিষ্ট আছে। ওর ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হবে না। কাউকে দেখতে দেওয়া হবে না। শুধু ডাক্তার আর নার্স।

অতি কষ্টে দেখা করার অনুমতি পেলেন দীনেশের দাদা জ্যোতিষ গুপ্ত। নসু যে তাঁর বড় আদরের ! তার এই অবস্থায় তিনি দূরে থাকবেন কি করে !

দাদাকে দেখেই দীনেশের সারা মুখে ফুটে উঠল একঝলক প্রসন্ন হাসি। মা কেমন আছেন ? আর বৌদি ? খুকুদির খবর কি ? আমার জন্য চিন্তা করতে মানা করবেন। আমি খুব ভাল আছি।

সত্যিই দীনেশ ভাল হয়ে উঠলেন একটু একটু করে। এ ব্যাপারে ডাক্তার ও নার্সদের ভূমিকা ছিল অসাধারণ। ধৈর্য দিয়ে, সহানুভূতি দিয়ে. সাহচর্য দিয়ে সেদিন দীনেশকে সুস্থ করে তোলার ব্যাপারে তাঁদের চেষ্টার এতটুকুও ত্রুটি ছিল না।

এ প্রসঙ্গে একজন বিদেশিনী নার্সের কথা আজো স্মরণীয় হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়।

হোক বিদেশিনী, তবু তিনি নারী। তাই অজ্ঞাতেই বুঝি দুরন্ত দুঃসাহসী এই দামাল ছেলেটির জন্য স্নেহ ও মমতায় মন তাঁর ভরে উঠেছিল কানায় কানায়।

কোন প্রত্যাশা নয়। কোন দাবীও নয়। শুধু দূর থেকে বন্দীকে একপলক চোখের দেখা মাত্র। এইটুকু ছাড়া সেদিন আর কিছুই বুঝি কাম্য ছিল না তাঁর।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে দীনেশ একদিন রহস্য করে বললেনঃ 'Sorry Nurse, I am still breathing !'

'May God grant you long life.' এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে

এগিয়ে এসে চাপা গলায় বললেন বিদেশিনী, 'Why did you take poison and shoot yourself ?'

হেসে দীনেশ উত্তর দিলেন, 'Just to finish myself after the completion of work.'

—'Committing suicide is a crime. No ?'

—'It was nothing of a suicide. It was self-emolation—a voluntary death—a death of fulfiilment, and not despair.'

এক মুহূর্তের দ্বিধা। তারপরই ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করলেন বিদেশিনী, 'Do you hate me ? Do you hate all the Britishers ?'

—'No, I hate those who want to rule over us, directly or indirectly.'

—'Wish you long life. Good night, brave boy !'

কথাটা বলে ত্রস্তে পালিয়ে গেলেন বিদেশিনী। বাইরে যেন কার পায়ের শব্দ। কে যেন এদিকেই আসছে একটু একটু করে। প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর এই রাজদ্রোহীকে প্রকাশ্যে সহানুভূতি জানাবার অধিকার তাঁর কোথায় ! তিনি যে শাসক সম্প্রদায়েরই একজন !

মেডিকেল কলেজ থেকে আলিপুর জেলের কনডেমণ্ড্ সেল। সাধারণত ফাঁসির আসামীদেরই এই কনডেমণ্ড্ সেলে রাখা হয়।

অবশেষে একদিন আলিপুরের সেসন-জজ গার্লিকের সভাপতিত্বে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে শুরু হল তাঁর বিচারের পালা।

এ সম্বন্ধে এতটুকুও উৎসাহ দেখা গেল না দীনেশের দিক থেকে। শুভানুধ্যায়ীদের উদ্দেশে একটি কথাই তিনি জানিয়ে দিলেন বার বার, 'ওসব জেনে আমার কি হবে ? আমি যা ভাল বুঝেছি—করেছি। এবার ওদের বিচার ওরা করুক। তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই।'

দীনেশের মাথাব্যথা না থাকলেও বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষগুলির কিন্তু সেদিন দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না, মল্লিকা।

বিচারের দিনে আদালত-প্রাঙ্গণে উপস্থিত জনতার সেকি বিরাট উত্তেজনা ! সেকি অভাবনীয় চাঞ্চল্য ! সবাই চায় স্বাধীনতার বীর বিপ্লবী দীনেশকে দূর থেকে একবার দেখতে। তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে। দীনেশ যে তাদের বড় গর্বের ধন ! অদৃষ্টে তাঁর জন্য কি অপেক্ষা করে আছে কে জানে !

দীনেশ নির্বিকার। কনডেমণ্ড্ সেলের অভ্যন্তরে জীবন কাটে তাঁর একই তালে। সেখানে একই রঙ নিয়ে আসে ভোরের সূর্য, স্তব্ধ দুপুর আর শান্ত বিকেল। উঁচু পাঁচিল ঘেরা এই বিচিত্র পৃথিবীতে সব কিছুই যেন বর্ণহীন, স্বাদহীন, বৈচিত্র্যহীন।

নিস্তরঙ্গ নদীতে ঢেউ তুললেন সুভাষ।

সেবার এসেছিলেন নিখিল ভারত লাঞ্ছিত রাজনৈতিক দিবস উপলক্ষে দক্ষিণ কলকাতায় শোভাযাত্রা পরিচালনা করার জন্য ন'মাসের কারাদণ্ড মাথায় নিয়ে। এবার আইন অমান্য করে।

আইন-অমান্য আন্দোলনে দণ্ডিত বন্দীদের ভিড়ে আলিপুর জেল তখন জমজমাট। সুভাষ থেকে শুরু করে হেমচন্দ্র ঘোষ, হরিকুমার চক্রবর্তী, বিপিন গাঙ্গুলী, পূর্ণ দাস, নিশি গাঙ্গুলী, জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় কেউ বাদ নেই।

কারাগারে সুভাষের উপস্থিতি মানেই—ঝড়। বলা বাহুল্য যে, এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। দেখতে দেখতেই আবার একদিন ঝড় উঠল নতুন করে। উদ্দাম ঝড়।

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জেলার মিঃ সোয়ান ছুটে এলেন হন্ত-দন্ত হয়ে। জাতে আইরিশ হলেও আপসহীন বিপ্লবী সুভাষের প্রতি মনে মনে তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম।

—বলুন, আপনার জন্য আমি কি করতে পারি? প্রশ্ন করলেন জেলার মিঃ সোয়ান।

—আমি জেলের ভেতরে সরস্বতী পুজো করবো। অবিলম্বে ব্যবস্থা করুন।

—বেশ, তাই হবে। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

—তাই করুন। আর হ্যাঁ, সবাইকে নিয়ে আমি একসঙ্গে মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেব। কাউকে বাদ দিলে চলবে না। দীনেশ গুপ্ত, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ওদেরও আমরা চাই।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন মিঃ সোয়ান। বলে কি! কনডেম্ড্ সেলের আসামীদের তিনি বাইরে আসার সুযোগ দেবেন কি করে?

ইতিপূর্বে বেলফাস্ট জেলে এমন বহু বিপ্লবী তিনি দেখেছেন। কিন্তু এমন অদ্ভুত দাবী এর আগে কোথাও তিনি শোনেননি। এ যে একেবারেই অসম্ভব!

কিন্তু দাবী তুলেছেন স্বয়ং সুভাষ বোস। সোজা লোক তো নন। হয়তো এ নিয়ে একটা তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে বসবেন! কাজ নেই বাপু অত ঝামেলা করে। আমি বিশ্বাস করে তোমার ওপর সব ছেড়ে দিচ্ছি। দেখো বাপু, আর যাই হোক, গরীবের চাকরিটা যেন না যায়!

শুরু হল পুজোর আয়োজন।

কিন্তু একি! কাণ্ড দেখে চোখে পলক ফেলতেও বুঝি ভুলে গেল শ্বেতাঙ্গ শাসক সম্প্রদায়। শেষে কিনা পুজো প্যাণ্ডেলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন! ব্রিটিশ কারাগারে একথা যে চিন্তাও করা যায় না! শীগ্গির মানা কর ওকে।

কে মানা করবে? কে যাবে সাধ করে ঐ জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মুখোমুখি দাঁড়াতে? ঝড়ে উড়ে যেতে হবে না!

এখানেই শেষ নয়। সেদিন আরো কিছু রহস্য অপেক্ষা করে ছিল

উপস্থিত রাজনৈতিক বন্দীদের অদৃষ্টে। সে রহস্যের অবগুণ্ঠন খুলল আরো কিছুক্ষণ পরে।

পুজো শেষ। এবার অঞ্জলি দেবার পালা।

সহসা এক কাণ্ড করে বসলেন সুভাষ। কনডেমড্ সেল থেকে দুজনকে নিয়ে পুজো-মণ্ডপের দিকে যেতে যেতে আচমকা তিনি এক ধাক্কা মেরে দীনেশকে সামনের এক নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকিয়ে দিয়ে একা রামকৃষ্ণকে নিয়েই এগিয়ে চললেন প্যাণ্ডেলের দিকে।

ওখানে ওঁর দলীয় সুনীল সেনগুপ্ত রয়েছেন। এমন সুযোগ আর কখনো মিলবে না। এমন নিভৃত অবসর। কিছু বলার থাকলে এই বেলা বলে নিক!

দীর্ঘদিন বাদে পরিচিত সহকর্মীকে কাছে পেয়ে সেকি আনন্দ তখন দীনেশের।

মুক্তি! মুক্তি! মুক্তি! সাময়িকভাবে হলেও কনডেমড্ সেলের বাইরে এসে আবার যে তিনি কোনদিন প্রিয়জনের সঙ্গে এমনি করে মিলতে পারবেন, তা বুঝি তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

আনন্দে আবেগে সুনীলবাবুকে জড়িয়ে ধরে একটি কথাই দীনেশ বলতে লাগলেন বার বার—'হেমদাকে বলবেন, আমি ঠিকই আছি। আমার জীবনের জীবন্ত আদর্শ হল বাদল আর বিনয়দা। সে আদর্শ আমি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বজায় রাখব।'

দিনের পর রাত্রি। আবার রাত্রি এক সময়ে হারিয়ে যায় নতুন দিনের সমারোহে।

অবশেষে একদিন বিচারপতি গার্লিক তাঁর রায় জানালেন।

মামলার ফলাফল যে কি দাঁড়াবে, সে বিষয়ে অবশ্য কারো মনেই কোন সন্দেহ ছিল না। তবু সেদিন প্রতিটি বাঙালী, প্রতিটি পরাধীন মানুষের একমাত্র কামনা ছিল দীনেশকে যেন চরম সাজা দেওয়া না হয়। বোধহয় এর চাইতে বড় কাম্য সেদিনের মানুষের কাছে আর কিছুই ছিল না।

দেশবাসীর সেই আকুল আবেদনে কোন কানই দিলেন না ইংরেজ সরকার। সুতরাং সাজা হল প্রাণদণ্ড। এবার প্রিভি কাউন্সিল থেকে হুকুমটা এসে গেলেই হয়।

সঙ্গে সঙ্গে ঝড় উঠল গোটা বাংলাদেশে। দুরন্ত ঝড়। এ আদেশ আমরা মানব না। দীনেশ আমাদের জাতীয় বীর। তাঁর প্রতি এই অন্যায় আদেশ আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করব না।

জাতির ভাষা রূপ পেল বিপ্লবী নায়িকা বিমলপ্রতিভা দেবীর কণ্ঠে। পার্কে-পার্কে, সভায়-সমিতিতে, মনুমেণ্টের তলায় প্রকাশ্যেই তিনি আহ্বান জানালেন তরুণ সমাজকে ঃ

'বাংলার তরুণ, ভারতের তরুণ, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের হস্তে তোমাদের মজ্জার মজ্জা, রক্তের রক্ত, ঐ বীর সাধকের মৃত্যু তোমরা ক্লীবের মতো সহ্য

করো না। দুর্বার কণ্ঠে জানাও যে, দীনেশের মৃত্যুদণ্ড আমরা সহ্য করব না। দীনেশ দীর্ঘজীবী হোক!'

সাড়া দিল গোটা বাংলাদেশ। সাড়া দিল লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষ। আমরা সহ্য করব না। দীনেশের মৃত্যুদণ্ড আমরা কিছুতেই সহ্য করব না।

বিশেষভাবে সাড়া দিল দীনেশের হাতে গড়া মেদিনীপুর। তাদের সাফ জবাব, আমরা বদ্‌লা নেব। একেবারে মেদিনীপুর থেকে ঝাড়ে-বংশে নিশ্চিহ্ন করে দেব ঐ রক্ত-চোষা জাতকে।

দীনেশ নিশ্চিন্ত, নির্বিকার। সেলের নির্জন কক্ষে অধিকাংশ সময়ই তাঁর কাটতে লাগল গীতা আর রবীন্দ্র-কাব্য নিয়ে। শুধু পড়া আর পড়া! দুদিন বাদে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে। তার আগে যতটা জ্ঞানার্জন করে নিতে পারা যায়।

মাঝে মাঝে ক্লান্তি আসে। ইচ্ছা করেই তখন তিনি দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দেন বাইরের দিকে। পাঁচিল পেরিয়ে আকাশের দূর দিগন্তে। আর কোন কাজ নেই। কেবল অপেক্ষা! শেষ-বিদায়ের আগে কয়েকটা অলস মন্থর দিন। সেগুলো পার হবার জন্য এক ক্লান্তিকর প্রতীক্ষা।

পৃথিবী কারো মুখ চেয়ে তার চলার গতি বন্ধ করে না। অবশেষে এল সেই ১৯৩১ সালের ৬ই জুলাই।

সকাল থেকে আলিপুর জেলে সেদিন সাজ-সাজ রব। প্রিভি কাউন্সিল দীনেশের দণ্ডাজ্ঞা বহাল রেখেছে। কাল ভোরে তাঁর ফাঁসি। ওপর থেকে নির্দেশ এসে গেছে। আর দেরি নয়। কালই।

প্রস্তুতি পর্ব সমাপ্ত। ম্যানিলা রজ্জুতে মোম মাখানো হয়ে গেছে। দেড়গুণ ওজনের বালির বস্তা ঝুলিয়ে পরীক্ষার পালাও শেষ। এখন শুধু অপেক্ষা মাত্র।

দীনেশ তেমনি নিশ্চিন্ত, নির্বিকার। মৃত্যুকে তিনি বরাবর 'মিত্র'-রূপেই দেখে এসেছেন। তাই এসব উদ্যোগ-আয়োজন তাঁর কাছে একটা ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সন্ধ্যা তখন হয় হয়। পশ্চিম আকাশ লালে লাল। ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে কখন একফালি রশ্মি এসে ছড়িয়ে পড়েছে কন্‌ডেম্‌ড্‌ সেলের অভ্যন্তরে।

অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সহসা দীনেশের সারা মন ভরে উঠল এক অপার্থিব আনন্দের হিল্লোলে। রশ্মিটুকু গায়ে মেখে নিয়ে তারপরই তিনি সুর তুললেন তন্ময় হয়েঃ

'রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার
যাবার আগে,—
আপন রাগে,
গোপন রাগে,
তরুণ হাসির অরুণ রাগে
অশ্রুজলের করুণ রাগে।

যাবার আগে যাও গো আমায়
জাগিয়ে দিয়ে,
রক্তে তোমার চরণদোলা—
লাগিয়ে দিয়ে'

দেখতে দেখতে এক সময় শেষ রশ্মিটুকু মিলিয়ে গেল। কণ্ঠও নীরব হল। কিন্তু তার রেশ জেগে রইল বহুক্ষণ পর্যন্ত।

হে অস্তগামী দিবাকর, তোমাকে শেষ-প্রণাম জানাই। সব যেমন ছিল তেমনই থাকবে। সবই চলবে অপরিবর্তনীয় নিয়মের নির্দেশে। শুধু আমিই থাকব না।

কোন দুঃখ নেই তার জন্য। কোন ক্ষোভ নেই। চাইবারও কিছু নেই। শুধু তোমার ঐ শেষ রশ্মিটুকু আমার সর্বাঙ্গে আরও নিবিড় করে বুলিয়ে দিয়ে যাও। যাবার আগে এইটুকু শুধু আমার শেষ মিনতি।

শব্দহীন মন্থরতায় কেটে গেল মুহূর্তের পর মুহূর্ত।

সহসা কি ভেবে এক তাড়া চিঠির কাগজ টেনে নিলেন দীনেশ। মাকে চিঠি লিখতে হবে। লিখতে হবে বৌদি, মণিদি, খুকুদি প্রভৃতি সবাইকে। আর কতক্ষণই বা! সময় যে ঘনিয়ে এল!

জেল থেকে লেখা দীনেশের সেই চিঠিগুলো আজো বাংলা সাহিত্যে অক্ষয় হয়ে আছে, মল্লিকা। তখনকার দিনে 'বেণু' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত এই চিঠিগুলো পড়ে সেদিন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন বাংলার বিদ্বজ্জন-মণ্ডলী। মাত্র বিশ বছরের একটি যুবকের পক্ষে এতটা পরিণতি কি করে সম্ভব! এ যে অবিশ্বাস্য!

শুধু তাই নয়, মনে রেখো, এই চিঠিগুলো পড়তে পড়তে সেদিন অনেক জলই ঝরেছিল একটি মানুষের দু চোখ দিয়ে।

পড়া শেষ করে রুদ্ধস্বরে মাত্র একটি কথাই তিনি বলতে পেরেছিলেন —'এ তো চিঠি নয়, এ যে মূল্যবান জীবনদর্শন!'

মানুষটি কে জানো? স্বয়ং সুভাষচন্দ্র।

চিঠিগুলো তুমি মন দিয়ে শোন। বার বার শোন। শুনে বিচার কর। তারপর নিজেকেই প্রশ্ন কর যে, সেদিন পরাধীন দেশের একটি বিশ বছরের ছেলে তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে যে বলিষ্ঠ স্বাক্ষর রেখেছিলেন আজকের এই স্বাধীন দেশের তরুণ-তরুণীদের কাছ থেকে তার সামান্য ছিটে-ফোঁটাও আশা করা যায় কি? যাক, কয়েকটি চিঠি আমি তোমার কাছে তুলে ধরছি ঃ

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল
২. ২. ৩১ (রবিবার)

স্নেহের বেল্টু ভাই,

...কিছুদিন আগে একটা গান শুনেছিলাম। আজ তার পদগুলো বারে বারে মনে পড়ছে—

'আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদল সাঁঝে,
গহন মেঘের নিবিড় ধারার মাঝে ॥

কোন দূরের মানুষ যেন এল আজ কাছে,
তিমির আড়ালে নীরবে দাঁড়ায়ে আছে।
বুকে দোলে তার বিরহ ব্যথার মালা
গোপন-মিলন অমৃত গন্ধ ঢালা
মনে হয় তার চরণের ধ্বনি জানি—
হার মানি তার অজানা জনের সাজে॥'

শীতের কুজ্ঝটিকার সঙ্গে সঙ্গে আমার দিনও ফুরিয়ে এল। আমায় ভুলো না ভাই। শীতের পুনরাগমনের সঙ্গে আমিও আবার তোমাদের মধ্যে ফিরে আসব। উত্তুরে বাতাসের পরশ পেলে মনে করো, আমি এসেছি তোমাদের আলিঙ্গন করতে, তোমাদের ভালবাসা কুড়িয়ে নিতে।

—দাদা।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল,
৩০. ৩. ৩১ রবিবার, কলিকাতা।

শ্রীচরণেষু,

বৌদি, গতকল্য তোমার চিঠিখানা পাইলাম। আজ মা ও দাদা আসিয়াছিলেন। দাদার কাছে শুনিলাম, আমার ফাঁসির হুকুমই বহাল রহিয়াছে।

বৌদি, এ জন্মের মত তোমাদের কাছ হইতে বিদায় চাহিতেছি। জানি, বিদায় দিতে তোমাদের বুক ভাঙিয়া যাইবে, কিন্তু কি করিব, বিদায় যে লইতেই হইবে!

অনেক দিনের অনেক কথাই মনে পড়িতেছে। সেই যেদিন তোমাকে আমার বৌদি রূপে পাইলাম, সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত সমস্ত কথাই আমার চোখের সমুখে যেন ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তোমাকে আমার দশ বৎসর বয়স হইতে এই কুড়ি বৎসর বয়স পর্যন্ত অনেক যন্ত্রণাই দিয়া আসিয়াছি। সমস্তই তুমি স্নেহের অত্যাচার রূপে হাসিমুখে সহ্য করিয়া আসিয়াছ, কখনও বিরক্ত হও নাই, কখনও মুখভার করিয়া থাক নাই। চিরকালই অসুখে তোমার হাতের বার্লি, আহারে তোমার হাতের রান্না আমার সবচেয়ে ভাল লাগিয়াছে, তাহা তুমি জান। তুমি আমাকে কেন, আমাদের সকলকেই তোমার একান্ত আন্তরিক ভালবাসা দ্বারা জয় করিয়া লইয়াছিলে। সেদিন পর্যন্ত আমার যদি অনেক টাকা হয় তবে তোমাকে কি কি প্রিয় জিনিস আমি তোমায় উপহার দিব, সেই সম্বন্ধে নানা উদ্ভট কল্পনা মনে মনে করিয়াছি। যাক, ভগবান জন্ম-জন্মান্তরে তোমার মতো বৌদিই যেন আমায় পাওয়াইয়া দেন, এই প্রার্থনা।

কিসে তোমাদের মনে শান্তি আসিতে পারে, তুমি তাহার উপায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমিই কি আর তাহা বলিতে পারি! তবে আমার মনে হয়, মরণকে আমরা বড় ভয় করি, তাই মরণের কাছে আমরা পরাজিত হই। এই ভয় যদি জয় করিতে পারি, তবে মরণ আমাদের কাছে তুচ্ছ হইয়া দাঁড়াইবে। মরণকে আমাদের ভয় না করিয়া নির্ভয়ে প্রশান্ত চিত্তে বরণ করিয়া লইতে হইবে। মরণকে ভয় করিলে ধর্মের প্রধান

সোপানই যে আমরা উত্তীর্ণ হইতে পারিব না। আমরা জানি, মরণ আমাদের হয় না, হয় এই নশ্বর দেহের। আত্মা অবিনশ্বর। সেই আত্মাই আমি—আর সেই আত্মাই ভগবান। মানুষের যখন সেই উপলব্ধি হয়, তখনই সে বলিতে পারে, 'আমিই সে। আগুন আমাকে পোড়াইতে পারে না, জল আমাকে পচাইতে পারে না, বায়ু আমাকে শুষ্ক করিতে পারে না, আমি অজর, অমর, অব্যয়।' গীতা বলিয়াছেন—'শস্ত্র সকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নিতে দহন করিতে পারে না, জলে ভিজাইতে পারে না, বায়ুতে শুষ্ক করিতে পারে না। আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্বব্যাপী।'

তুমি বলিবে, এসব কথা তো আমিও জানি, কিন্তু মন তো শান্তি মানিতে চায় না! মন শান্ত করিবার একমাত্র উপায় ভগবানে আত্মসমর্পণ। ইহা ভিন্ন শান্তি পাইবার আর কোন উপায় নাই। আমরা যতই জপ-তপ করি না কেন, যতই ফোঁটা-তিলক কাটি না কেন, কিন্তু তাঁহাকে আমরা ভালবাসিতে পারি কই? তাঁহাকে যে ভালবাসিতে পারে, মরণ তো তাহার কাছে একটা ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। তাঁহাকে তেমন করিয়া ভালবাসিয়াছিল বাংলার নিমাই, প্রেমাবতার যীশুখ্রীষ্ট, আর আমাদের দেশের সেই সকল ছেলেরা, যাহারা হাসিমুখে মরণকে বরণ করিয়া লইতে পারিয়াছিল।

মনের আবেগে আজ অনেক কথা লিখিয়া ফেলিলাম। তোমাদের কষ্টের কারণ আমি হইয়াছি জানিয়া আমি নিজের মনেও কম ব্যথা পাই নাই। তোমরা আমাকে ক্ষমা করিও।

আমার সংগীটি* এখন বেশ ভালই আছে। অসুখ-বিসুখ আর নাই। আমিও ভালই আছি। ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে।

—স্নেহের ঠাকুরপো।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল কলিকাতা।

মণিদি,

কথা দিয়েও কথা রাখতে পারলাম না। বলেছিলাম রবিবারেই আপনার চিঠির জবাব দেব। কিন্তু দু'দিন পেছিয়ে পড়লাম, যদিও এতে আমার দোষ বিশেষ কিছুই নেই।

নতুন বছর শুরু হয়েছে, 'আটত্রিশ সনের ভেতরে' সাঁইত্রিশ সন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। নতুনের কাছে পুরাতন হার মেনেছে। গাছের জীর্ণ পাতা ঝরে পড়ে নব কিশলয়কে স্থান ছেড়ে দিচ্ছে। প্রকৃতির এই-ই নিয়ম। নিরন্তর ভগবানের চির-নবীন সত্য মূর্তি এর ভেতর দিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে।

কিন্তু আমাদের দেশে আমাদের যত নিয়ম-কানুন সবই উল্টো ; এখানে বুড়োরা সমাজে ও রাষ্ট্রে নিজেদের একেবারে অচল, অনড় করে রেখে দিয়েছে। গদী তো ছাড়বেই না, বরং সময় অসময় চোখ রাঙাবে, আর এঁড়ে

*সঙ্গীটি হলেন পাশের সেলের চটগ্রাম যুব-বিদ্রোহের প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস। ৪ঠা আগষ্ট তিনি প্রাণ উৎসর্গ করেন ফাঁসিমঞ্চে।

গলায় চিৎকার করে একথাই জানিয়ে দেবে যে, বুড়ো হয়ে চোখ-কান আর আত্মসম্মানের মাথা না খাওয়া পর্যন্ত কেউ-ই কোন কাজের যোগ্য হয় না। আমাদের দেশে তরুণরাও সাপের মাথায় ধুলো পড়ার এসব কথা শুনে নিজেদের বল-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে। এটা তারা কিছুতেই বুঝবে না যে, বৃদ্ধ ও তরুণের মত ও পথ চিরকাল ভিন্ন। এদের এক করতে গেলে হয় তরুণকে বৃদ্ধ হতে হবে, নয়তো বৃদ্ধকে তরুণ হতে হবে। এদেশে তরুণই বৃদ্ধ হয়। ভালবাসা জানবেন।

—স্নেহের দীনেশ।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল
১৮ই জুন, ১৯৩১, কলিকাতা।

বৌদি,

তোমার দীর্ঘ পত্র পাইলাম। অসময়ে কাহারও জীবনের পরিসমাপ্তি হইতে পারে না। যাহার যে কাজ করিবার আছে, তাহা শেষ হইলেই ভগবান তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া লন। কাজ শেষ হইবার পূর্বে তিনি কাহাকেও ডাক দেন না।

তোমার মনে থাকিতে পারে, তোমার চুল দিয়া আমি পুতুল নাচাইতাম। পুতুল আসিয়া গান গাহিত—'কেন ডাকাইছ আমায় মোহন ঢুলী!' যেই পুতুলের পার্ট শেষ হইয়া গেল, আর তাহাকে স্টেজে আসিতে হইত না। ভগবানও আমাদের নিয়ে পুতুলনাচ নাচাইতেছেন। আমরা এক-একজন পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে পার্ট করিতে আসিয়াছি। পার্ট করা শেষ হইলে প্রয়োজন ফুরাইয়া যাইবে। তিনি রঙ্গমঞ্চ হইতে আমাদের সরাইয়া লইয়া যাইবেন। ইহাতে আপসোস করিবার কি আছে?

পৃথিবীর যে কোন ধর্মমতকে মানিলেই আত্মার অবিনশ্বরতা বিশ্বাস করিতে হয়। অর্থাৎ—দেহের মৃত্যু হইলেই আমাদের সব শেষ হইয়া যায় না, একথা স্বীকার করিতে হইবে। আমরা হিন্দু, হিন্দুধর্মে এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছে, কিছু কিছু জানি। মুসলমান ধর্মেও বলে, মানুষ যখন মরে, তখন খোদার ফেরেস্তা তাহার রুক্‌বজ্‌ করিতে আসেন। মানুষের আত্মাকে ডাকিয়া বলেন, 'অ্যায় রুহ্‌ নিকল্‌ ইস্‌ কালিব সে চল্‌ খুদাকা জান্নাৎ মে।' অর্থাৎ, তুই দেহ ছাড়িয়া ভগবানের কাছে চল্‌। তাহা হইলে বোঝা গেল, মানুষ মরিলেই তাহার সব শেষ হইয়া যায় না, মুসলমান ধর্মের এ বিশ্বাস আছে।

খ্রীষ্টান ধর্ম বলে, 'Very quickly there will be an end of the here, consider what will become of the next world.' অর্থাৎ, দিন তো তোমাদের ফুরিয়ে এল, পরকালের কথা চিন্তা কর। বোঝা গেল, খ্রীষ্টান ধর্মও বিশ্বাস করে, মানুষের দেহের মৃত্যু হইলেও আত্মা মরে না। এই তিন ধর্মের কোন একটা স্বীকার করিতে হইলেই আমাকে মানিয়া লইতে হইবে যে, আমার মৃত্যু নাই। আমি অমর। আমাকে মারিবার সাধ্য কাহারও নাই।

ভারতবাসী আমরা নাকি বড় ধর্মপ্রবণ। ধর্মের নামে ভক্তিতে আমাদের পণ্ডিতদের টিকি খাড়া হইয়া উঠে। তবে আমাদের মরণের এত ভয় কেন? বলি, ধর্ম কি আছে আমাদের দেশে? যে দেশে দশ বছরের মেয়েকে পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ ধর্মের নামে বিবাহ করিতে পারে, সে দেশে ধর্ম কোথায়? সে দেশের ধর্মের মুখে আগুন।

যে দেশে মানুষকে স্পর্শ করিলে মানুষের ধর্ম নষ্ট হয়, সে দেশের ধর্ম আজই গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত। সবার চাইতে বড় ধর্ম মানুষের বিবেক। সেই বিবেককে উপেক্ষা করিয়া আমরা ধর্মের নামে অধর্মের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছি। একটা তুচ্ছ গরুর জন্য, না হয় একটু ঢাকের বাদ্য শুনিয়া আমরা ভাই-ভাই খুনোখুনি করিয়া মরিতেছি। এতে কি ভগবান আমাদের জন্য বৈকুণ্ঠের দ্বার খুলিয়া রাখিবেন, না খোদা বেহেস্তে আমাদিগকে স্থান দিবেন?

যে দেশকে ইহজন্মের মতো ছাড়িয়া যাইতেছি, যাহার ধূলিকণাটুকু পর্যন্ত আমার কাছে পবিত্র, আজ বড় কষ্টে তাহার সম্বন্ধে এসব বলিতে হইল।

আমরা ভাল আছি; ভালবাসা ও প্রণাম লইবে।

—স্নেহের ছোট ঠাকুরপো।
আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল
৩০শে জুন, ১৯৩১, কলিকাতা।

মা,

যদিও ভাবিতেছি কাল ভোরে তুমি আসিবে, তবু তোমার কাছে না লিখিয়া পারিলাম না।

তুমি হয়তো ভাবিতেছ, ভগবানের কাছে এত প্রার্থনা করিলাম, তবুও তিনি শুনিলেন না! তিনি নিশ্চয় পাষাণ, কাহারও বুক-ভাঙা আর্তনাদ তাঁহার কানে পৌঁছায় না।

ভগবান কি আমি জানি না, তাঁহার স্বরূপ কল্পনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তবু একথাটা বুঝি, তাঁহার সৃষ্টিতে কখনও অবিচার হইতে পারে না। তাঁহার বিচার চলিতেছে। তাঁহার বিচারের উপর অবিশ্বাস করিও না, সন্তুষ্ট চিত্তে সে বিচার মাথা পাতিয়া নিতে চেষ্টা কর। কি দিয়া যে তিনি কি করিতে চান, তাহা আমরা বুঝিব কি করিয়া?

মৃত্যুটাকে আমরা এত বড় করিয়া দেখি বলিয়াই সে আমাদিগকে ভয় দেখাইতে পারে। এ যেন ছোট ছেলের মিথ্যা জুজুবুড়ির ভয়।

যে মরণকে একদিন সকলেরই বরণ করিয়া লইতে হইবে, সে আমাদের হিসাবে দুই দিন আগে আসিল বলিয়াই কি আমাদের এত বিক্ষোভ, এত চাঞ্চল্য?

যে খবর না দিয়া আসিত, সে খবর দিয়া আসিল বলিয়াই কি আমরা তাহাকে পরম শত্রু মনে করিব? ভুল, ভুল—মৃত্যু 'মিত্র' রূপেই আমার কাছে দেখা দিয়াছে। আমার ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে।

—তোমার নসু।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল
৩০. ৬. ৩১. কলিকাতা।

খুকুদি,

তোমার চিঠি পেলাম। মানুষ কোন কাজই করতে পারে না, আনন্দিত মনে যদি না সেই কাজটাকে সে ভালবাসে। সংসারী ব্যক্তি সংসারের জন্য দিনরাত খেটে যাচ্ছে কেন? সংসারকে সে ভালবাসে, তাই। সন্ন্যাসী কেন দুঃখ-কষ্ট সহ্য করছে? সৎকে সে ভালবাসে, তাই সৎকে পাবার জন্য এই প্রচেষ্টা।

ভালবাসা পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় জিনিস।

যে যাকে ভালবাসে, তার জন্য প্রাণ দিতেও কি সে কুণ্ঠিত হয় কখনও? মানুষের বড় বড় কাজ দেখে আমরা অপরিসীম বিস্ময়ে অবাক হয়ে থাকি। ভাবি, এ কাজ সে করল কি করে? কিন্তু মূল খুঁজলে পাওয়া যাবে ভালবাসার প্রস্রবণ। তারই সরস রসে সিঞ্চিত হয়ে মানুষ দিতে পারে হাসিমুখে আত্মবিসর্জন। কঠিন কাজ হয়ে পড়ে অতি সোজা।

ভালবাসা হিসেব জানে না। বে-হিসেবে উছলে পড়াই তার স্বভাব। আপনাকে বিলিয়ে দিতে যে চায়, প্রতিদানে ভিক্ষার কণা পাবার দুর্বুদ্ধি তার নেই। তাই সে সুন্দর, অতুলনীয়। দিয়েই যায় সে, নেয় না কখনও।

আমাদের সবচেয়ে মুশকিল হল কি জান? আমাদের ভালবাসার গণ্ডী বড় সঙ্কীর্ণ, বড়ই অল্প-পরিসর। একে বড় করতে হবে। পারবে না?

ভালবাসার সাধনা করতে হয়। স্বার্থত্যাগ সে সাধনার প্রথম কথা। স্বার্থ আমাদের বড় জড়িয়ে ধরে, তাই কিছু করতে পারি না।

পারব, আমরা সব পারব। যাঁর কাছে গিয়ে ভালবাসা আপন উৎস খুঁজে পায়, তিনি আমাদের হৃদয়ে উৎসারিত ভালবাসা দেবেন—সে ভালবাসা তাঁকেই উৎসর্গ করে ধন্য হয়। ভালবাসা ও প্রণাম জানবে।

—স্নেহের নসু।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল,
৩. ৭. ৩১.

মণিদি,

ভগবানের আশীষ যারা পায় অশেষ দুঃখ জোটে তাদেরই কপালে। সে দুঃখের মালা গলায় পরবার সৌভাগ্য ও শক্তি ক'জনের হয় জানি না, তবে যার হয়, তার জীবন পরম স্বার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ভগবান যাকে আসল কাজের জন্য বেছে নেন, তার সুখ-সম্পদ সব কিছু দেন ধুলোয় লুটিয়ে, করেন তাকে পথের ভিখারী, রিক্ত, কাঙাল। সে মালা কি সহজ?

—'এ তো মালা নয় গো,
এ যে তোমার তরবারী
জ্বলে ওঠে আগুন যেন
বজ্রসম ভারি
এ তো তোমার তরবারী।'

এ জীবনে সুখ পাওয়া বড় কথা হতে পারে, কিন্তু দুঃখ পাওয়া তার চেয়েও বড়। সুখ ভোগ করতে পারে সকলেই, কিন্তু স্বেচ্ছায় দুঃখের বোঝা নিতে পারে ক'জন?

শক্তির উৎস তিনি। যাকে তিনি তাঁর কাজের ভার দেন, সে ভার বহন করবার শক্তিও তাকে অযাচিতভাবে দান করেন তিনিই। নইলে সাধ্য কি তার যে, সে গুরুভার এক মুহূর্তও সে সহ্য করে?

যার প্রাণ আছে, শ্রেয়কে বরণ করবার জন্য যার আছে শ্রদ্ধা—সে কি কখনও তাঁর মহাশঙ্খের আহ্বান শুনে স্থির থাকতে পারে? কি শক্তি আছে সংসারের এই মিথ্যা মোহের যে, তাকে আটকে রাখবে? তাঁর আহ্বানে কি শক্তি আছে জানি না—

'শুধু জানি—যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি ; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত!'

আজ যাই দিদি। এই হয়তো শেষ প্রণাম!

—স্নেহের দীনেশ।

১৯৩১ সাল। ৬ই জুলাই। দিনান্তের রঙ মুছে গেল। কণ্ঠও নীরব হল। তখন দীনেশ যে চিঠি দুটো লিখেছিলেন, এবার তার কথা তোমাকে বলব, মল্লিকা।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল, ৫৷৷টা (সন্ধ্যা)
৬. ৭. ৩১. কলিকাতা।

স্নেহের ভাইটি,

তুমি আমাকে চিঠি লিখিতে বলিয়াছ, কিন্তু লিখিবার সুযোগ করিয়া উঠিতে জীবন-সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

যাবার বেলায় তোমাকে আর কি বলিব? শুধু এইটুকু বলিয়া আজ তোমাকে আশীর্বাদ করিতেছি, তুমি নিঃস্বার্থপর হও, পরের দুঃখে তোমার হৃদয়ে করুণার মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হউক।

আমি আজ তোমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি বলিয়া দুঃখ করিও না ভাই। যুগ যুগ ধরিয়া এই যাওয়া-আসাই বিশ্বকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে, তাহার বুকের প্রাণ-স্পন্দনকে থামিতে দেয় নাই। আর কিছু লিখিবার নাই। আমার অশেষ ভালবাসা ও আশীষ জানিবে।

—তোমার দাদা।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল, ৫৷৷টা (সন্ধ্যা)
৬. ৭. ৩১.

মা,

তোমার সঙ্গে আর দেখা হইবে না। কিন্তু পরলোকে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিব। তোমার কিছুই কোনদিন করিতে পারি নাই। সে না

করা যে আমাকে কতখানি দুঃখ দিতেছে তাহা কেহই বুঝিবে না, বুঝাইতে চাইও না।

আমার যত দোষ, যত অপরাধ, দয়া করিয়া ক্ষমা করিও। আমার ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে।

—তোমার নসু।

১৯৩১ সাল। ৬ই জুলাই। প্রহরে প্রহরে রাত্রি এগিয়ে চলেছে। থমথমে রাত্রি।

এক-দু নম্বর ওয়ার্ডের রাজনৈতিক বন্দী-মহলে সেদিন কেউ ঘুমিয়ে নেই। সবাই জেগে রয়েছে প্রচণ্ড একটা দুর্নিবার জ্বালা বুকে নিয়ে।

সহকর্মী দীনেশ। কবি, শিল্পী, লেখক, দার্শনিক দীনেশ। সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের প্রতিহিংসার বলি হিসেবে শুরু না হতেই তাঁর জীবনের শেষ-প্রহর ঘনিয়ে এল। এমনি করে আরো কতজনকে যেতে হবে কে জানে!

তা বলে এ অন্যায় আমরা কিছুতেই মুখ বুজে সহ্য করব না। ওদের সবাইকে এর জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে নিজের রক্তের বিনিময়ে। দীনেশকে হত্যার প্রতিশোধ আমরা নেবই।

৭ই জুলাই, ১৯৩১ সাল।

পুব আকাশে রঙ ধরেছে। অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে একটু একটু করে।

দীনেশ ঘুমিয়ে আছেন। সারা মুখে তাঁর নিরুদ্বেগ জীবনের সুপ্ত প্রশান্তি। কোথাও তার মধ্যে এতটুকু মালিন্য নেই।

হঠাৎ কি শুনে ঘুম ভেঙে গেল দীনেশের।

তালে তালে পা ফেলে কারা যেন এদিকেই এগিয়ে আসছে একটু একটু করে। স্পষ্ট তাদের পায়ের শব্দ ভেসে আসছে—গট্-গট্-গট্-গট্-গট্-গট্...

দেখতে দেখতে দীনেশের সারা মুখে ফুটে উঠল এক টুকরো রহস্যময় হাসি। এ সময়ে কারা যে অমন করে এগিয়ে আসছে সে-কথা তাঁর অজানা নয়। লগ্ন সমাগত। এবার যেতে হবে।

—গুডমর্ণিং সার্জেন্ট! অগ্রগামী শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্টটিকে লক্ষ্য করে শুভেচ্ছা জানালেন দীনেশ, ওয়ান মিনিট প্লীজ! একটা চিঠি পেয়েছি। তার জবাবটা লিখে রেখে যেতে চাই।

তাড়াতাড়ি একটা কাগজ টেনে নিয়ে সঙ্গে সংগে দীনেশ লিখে চললেন তাঁর জীবনের শেষ চিঠি—

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল,
৭. ৭. ৩১. (প্রত্যূষে) কলিকাতা

বৌদি,

এইমাত্র তোমার চিঠিখানা পাইলাম। আমার জীবন-কাহিনী জানাইবার সুযোগ হইল না। কি-ই বা জানাইব বল তো? আমার সকল কথাই তো

তোমাদের বুকে চিরকাল আঁকা থাকিবে ; তুচ্ছ কালির আঁচড় কি তাহাকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারিবে ? আমার যত অপরাধ ক্ষমা করিবে। এ জন্মের মতো বিদায়! ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে!

—তোমার ঠাকুরপো।

—এই নাও। চিঠিটা সার্জেণ্টের হাতে তুলে দিলেন দীনেশ, প্লীজ, এটা তুমি অফিসে জমা দিয়ে দিও। চল, এবার আমি প্রস্তুত।

কিছুদূরে গিয়েই এক জায়গায় গোল হয়ে দাঁড়াল রক্ষী বাহিনী। সামনেই স্নানের জায়গা। বন্দীকে স্নান করানো হবে। তাই নিয়ম।

—স্নান করতে হবে বুঝি! হাসলেন দীনেশ, কি আশ্চর্য, নতুন পোশাকও রয়েছে দেখছি! ভড়ংটুকু দেখছি ঠিকই আছে! ঠিক আছে, তুমি আমার চশমাটা ধর সার্জেণ্ট, আমি স্নান সেরে নিচ্ছি। না না, কাউকে সাহায্য করতে হবে না। আমি একাই পারব।

মনের আনন্দে গায়ে জল ঢালতে ঢালতে অজ্ঞাতেই কখন সূর্যস্তব মূর্ত হয়ে উঠল দীনেশের কণ্ঠে—

'ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন শ্বেতাঙ্গ সার্জেণ্টটি। ফাঁসির বন্দী জীবনে তিনি কম দেখেননি, কিন্তু এ লোকটি যেন সব দিক থেকেই ব্যতিক্রম।

যে কন্‌ডেম্‌ড্‌ সেলের নাম শুনলে পর্যন্ত কয়েদীরা ভয়ে-আতঙ্কে শুকিয়ে আধখানা হয়ে যায়, দিনের পর দিন সেখানে বাস করেও এ লোকটি কত নিশ্চিন্ত, কত নির্বিকার! বরং এই ক'মাসে তাঁর দেহের ওজন আগেকার তুলনায় অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত! এ বয়সে মৃত্যুকে জয় করার মত এতবড় শক্তি উনি পেলেন কি করে?

—তোমার ভয় করে না ইয়ংম্যান? সার্জেণ্টের সারা মুখে কোমল অনুভূতি।

—ভয়! হা-হা করে হেসে উঠলেন দীনেশ, কিসের ভয়! আমাদের গীতায় কি বলেছে, জানো?

'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা—
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥'

অর্থাৎ, মনুষ্য যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর পরিগ্রহ করে।—তাহলে ভয় কিসের! এ দেহ পরিত্যাগ করে আবার আমি নূতন দেহ ধারণ করে আসব। আবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।

—আমার সঙ্গে দেখা হবে! সার্জেণ্ট অবাক, কোথায় দেখা হবে?

—বোধহয় এখানেই। কে বলতে পারে, হয়তো সেদিনও তোমাকেই এই অপ্রিয় কাজটার ভার নিতে হবে।

কথাটা বলেই হেসে উঠলেন দীনেশ। নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবনের প্রাণ-খোলা হাসি। সে হাসিতে কোন খাদ নেই।

—যাক, আমার হয়ে গেছে। স্নান শেষে পোশাক-পরিচ্ছদ পরে নিয়ে হাসতে হাসতেই বললেন দীনেশ, এবার যাওয়া যেতে পারে। আমি প্রস্তুত। লেটস্ হ্যাভ আওয়ার পার্টিং কিসেস, সার্জেণ্ট!

ধীর বলিষ্ঠ পদে ফাঁসির মঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়ালেন দীনেশ। কোন ক্ষোভ নেই। কোন শঙ্কা নেই। কোন ভয় নেই। কিসের ভয়! শহীদ প্রমোদ চৌধুরী ও অনন্তহরি মিত্রের পদস্পর্শে ধন্য এই ফাঁসি-মঞ্চ তো তাঁর কাছে তীর্থভূমি! তাহলে ভয় কিসের!

—তোমার কিছু বলার আছে বন্দী?

—প্লীজ স্টপ! আমাদের বলার অধিকার যে কারা কেড়ে নিয়েছে, সেকথা তো তোমরা ভাল করেই জানো। তাহলে কি লাভ এসব মিথ্যে ফর্মালিটি দেখিয়ে! ডু ইওর ডিউটি। আই অ্যাম রেডি।

মুখের ওপর জবাবটা ছুঁড়ে দিয়েই দীনেশ সহসা বজ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, বন্দে মাতরম্!

নিমেষে একটা ঝড় বয়ে গেল যেন গোটা জেলখানার ওপর দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে শত শত, হাজার হাজার আটক রাজনৈতিক বন্দী ধ্বনি তুললেন —বন্দে মাতরম্! বন্দে মাতরম্! শহীদ দীনেশ গুপ্ত জিন্দাবাদ!

তাঁদের সঙ্গে সুর মেলাল সাধারণ কয়েদীর দল—দীনেশ গুপ্ত জিন্দাবাদ! দীনেশ গুপ্ত জিন্দাবাদ!

একই ধ্বনি উঠল জেল-গেটের বাইরে অপেক্ষমাণ হাজার হাজার জনতার কণ্ঠে—দীনেশ গুপ্ত জিন্দাবাদ!

সে সুর মিলিয়ে গেল দূরে থেকে দূরান্তরে। সেখানেও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কণ্ঠে রব উঠল—দীনেশ গুপ্ত জিন্দাবাদ!

দেখতে দেখতে বন্ধ হয়ে গেল কোর্ট-কাছারি, অফিস-আদালত, ট্রাম-বাস, স্কুল-কলেজ, দোকান-পাট, সব কিছু। সবার মুখে একই কথা। একই রব। দীনেশ গুপ্ত জিন্দাবাদ!

বিকেলে লক্ষ লক্ষ লোক জমায়েত হল মনুমেণ্টের নীচে। তাদের মুখেও সেই একই শপথ। দীনেশ গুপ্তকে আমরা কোনদিনই ভুলব না। দীনেশ গুপ্ত জিন্দাবাদ!

দীনেশ গুপ্ত জিন্দাবাদ! লক্ষ লক্ষ বাঙালীর ভাষা রূপ পেল 'ডেইলী অ্যাডভান্সের' পাতায়। বড় বড় অক্ষরে তাঁরা শিরোনামা দিলেন—'ডণ্ট্লেস দীনেশ ডাইজ অ্যাট্ ডন্।'

আরো একধাপ এগিয়ে গেল মাসিক 'বেণু' পত্রিকা। নিমেষে তাদের হাজার হাজার কপি 'দীনেশ-সংখ্যা' কোথায় উড়ে গেল কর্পূরের মতো। ফলে রাজ-রোষ। 'দীনেশ-সংখ্যা' চলবে না। ওটা বে-আইনী। অবিলম্বে ওটা বন্ধ করো।

নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন কলকাতা কর্পোরেশন। সরকারী ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেই তাঁরা এক প্রস্তাব পাস করলেন দীনেশ গুপ্তের স্মৃতির

প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সংবাদপত্র থেকেই তার বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি :

দীনেশ গুপ্তের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

কর্পোরেশনের সভা স্থগিত

'স্বীয় আদর্শের অনুসরণে জীবন উৎসর্গকারী দীনেশচন্দ্র গুপ্তের ফাঁসিতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া গতকল্য বুধবার কলিকাতা কর্পোরেশনের একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ কর্পোরেশনের সভা আগামী শুক্রবার পর্যন্ত স্থগিত রহিয়াছে।'...

প্রস্তাবটি সম্পর্কে মেয়র ডাক্তার বিধান রায় বলেন :

...'হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ ব্যাকল্যান্ড রায়ে বলিয়াছেন যে, তাঁহার মতে এই যুবক আত্মস্বার্থ বা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য এই কার্য করে নাই। প্রকৃতপক্ষে বিচারপতি ব্যাকল্যান্ড ইতিহাসের রায়ই লিখিয়াছেন। ইতিহাসে আমরা এমন অনেক কাহিনী পাঠ করিয়াছি, যাহারা এক সময় এরূপ কার্যের জন্য দণ্ডিত হয় পরবর্তী কালে তাহারাই আত্মোৎসর্গকারী বীর বলিয়া পূজা পায়।

সুতরাং এই যুবক তাহার আদর্শের অনুসরণে যে অবিচলিত সাহস দেখাইয়াছে, আসুন, আমরা সকলে তৎপ্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি।' সকলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন।...

'This Corporation records its sense of grief at the execution of Dinesh Chandra Gupta who sacrificed his life in the pursuit of this ideal'.

[The Corporation of Calcutta : 8th July : 1931]

একই দৃষ্টান্ত দেখালেন হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি। তাঁদের প্রস্তাবে বলা হল :

'That this meeting records its deep sense of sorrow at the lamentable execution of Sj. Dinesh Chandra Gupta, and while sharing the profound grief with the members of the bereaved family prays to the Almighty that the soul of the departed Great may rest in everlasting peace.'

[The Howrah Municipal Office : 7th July : 1931]

অত্যন্ত মর্মস্পর্শী একটি রচনা প্রকাশিত হল আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় কলমে। তাতে বলা হল:

'বিশ বছরের বালক দীনেশ ফাঁসি-কাষ্ঠে প্রাণ দিল। কৌতূহলী বালক যেমন নূতন খেলনা ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়া গ্রহণ করিতে লালায়িত হয়, অসীম রহস্যময় মৃত্যুর সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইতে তাহার তেমনি সাধ হইয়াছিল।

মাতাপিতা, স্নেহশীলা ভ্রাতৃজায়া সকলকে সে এই বলিয়া প্রবোধ দিতে

চেষ্টা করিয়াছে—মৃত্যু ভয়ঙ্কর নহে, সে মরণমালা! মরণমালা গলায় পরিয়া মরণজয়ী জীবনের জয়োল্লাসে চলিয়া গেল।...

অনেকে মনে করিয়াছিল, অন্তত প্রাণ ভিক্ষা দিয়া গভর্ণমেণ্ট জনমতের প্রতি কথঞ্চিৎ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন। হাইকোর্টের বিচারপতি ব্যাকল্যাণ্ডের মন্তব্যে এই আশা দৃঢ় হইয়াছিল।

কিন্তু চরম দণ্ডের অন্যথা করিতে গভর্ণমেণ্ট স্বীকৃত হইলেন না। অসহায় জাতি—তদপেক্ষা নিরুপায় মাতার অশ্রু-সিক্ত আবেদন ব্যর্থ হইল। দীনেশ বাঁচিল না—তাহাকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করা গেল না। খেদখিন্ন নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস একটা জাতির পঞ্জর-পিঞ্জর কাঁপাইয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল। কম্পিত অধরোষ্ঠে কি কথা মৌন রহিয়া গেল, বোঝা গেল না। কেহ কি বুঝিবে?'

এবার মেদিনীপুরের পালা। তাদের এক কথা, আমরা প্রতিশোধ নেব। অলিন্দ-যুদ্ধের বীর সেনানী দীনেশ গুপ্তকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেবার চরম প্রতিশোধ আমরা নেব।

প্রতিশোধ তারা সত্যিই নিয়েছিল, মল্লিকা। শাসকদের বুকের রক্তে গোটা মেদিনীপুরটাকেই বুঝি সেদিন তারা লালে লাল করে দিয়েছিল।

তবে শেষ পর্যন্ত কিন্তু তারা দীনেশের ফাঁসি পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে পারেনি। তার আগেই তারা দুর্বার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বৈশাখী ঝড়ের মতো।

প্রথম টার্গেট—পেডি। ব্রিটিশ দম্ভের কুখ্যাত প্রতীক জেলাশাসক জেমস্ পেডি।

কি করেনি সেদিন এই জেমস্ পেডি!

আইন-অমান্য আন্দোলনে ধৃত পুরুষদের বেত্রাঘাতে জর্জরিত করা, মেয়েদের উলঙ্গ করে থুথু দেওয়া, যখন-তখন জেলে ঢুকে বন্দীদের ওপর বেপরোয়া লাঠি-চার্জ করা, কি করতে সে বাকি রেখেছিল!

সেদিনের সেই পৈশাচিক অত্যাচারের কাহিনী শুনলে আজো বোধহয় তোমরা ঘৃণায় শিউরে উঠবে।

জানি, একথা বিশ্বাস করতে তোমার মনে কিছুটা সংশয় জেগেছে। কারণ, ইতিহাসে পড়েছ যে, ইংরেজ বীরের জাত। তদুপরি নারীর সম্মান রাখতে তাদের জুড়ি নেই।

আরো পড়েছ যে, বুড়ি বালামের তীরে নিহত বিপ্লবী বীর বাঘা যতীনকে টুপি খুলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিল স্বয়ং পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট। সুতরাং ইংরেজ বীরের জাত না হয়ে যায় না!

স্রেফ ভণ্ডামি মল্লিকা, স্রেফ ভণ্ডামি। ইংরেজ আর কিছু না জানলেও পাবলিসিটির ভড়ংটুকু বেশ ভাল করেই জানে। তাই ক্ষুব্ধ দেশবাসীর কাছ থেকে বাহবা নেবার জন্য সেদিন এই শো-টুকু দেখানো তার প্রয়োজন ছিল।

নইলে যে চার্লস টেগার্ট সেদিন টুপি খুলে নিহত বাঘা যতীনকে

শ্রদ্ধা জানিয়েছিল, সে-ই আবার চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবীদের আশ্রয় দেবার অপরাধে শ্রদ্ধেয়া সুহাসিনী গাংগুলীকে ক্রমাগত চড় মেরে মেরে জখম করেছিল, এই জ্বলন্ত সত্যকে তো অস্বীকার করার উপায় নেই!

আরো প্রমাণ—বাংলাদেশের প্রথম মহিলা স্টেট্ প্রিজনার ননীবালা দেবী।

স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য সেদিন সুসভ্য ইংরেজ সরকারের পুলিশ এই নিষ্ঠাবতী বিধবা মহিলাকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা করে তাঁর দেহের অভ্যন্তরে লঙ্কা-বাটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

অপরাধ! অপরাধ মারাত্মক!

বিপ্লবী রামচন্দ্র মজুমদার হঠাৎ গ্রেপ্তার হয়ে গেছেন। কি তাঁর রিভলবারটা! কোথায় তিনি লুকিয়ে রেখে গেছেন রিভলবারটাকে! ওটা যে এখুনি চাই!

অসাধ্য সাধন করলেন ননীবালা দেবী। রামবাবুর স্ত্রী সেজে সোজা তিনি জেলে গিয়ে দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে। একফাঁকে সব কিছু জেনে নিয়ে তারপরই তিনি রিভলবারটা তুলে দিলেন তাঁর সহকর্মীদের হাতে।

অবশেষে একদিন ধরা পড়লেন ননীবালা দেবী। তারপরই শুরু হল ঐ অকথ্য নির্যাতন।

এবার তুমিই বলো যে, পৃথিবীর অন্য কোন রাষ্ট্রে এ ধরনের পাশবিকতার কোন নজীর আছে কি?

যে দক্ষিণ আফ্রিকা, পর্তুগীজ বা রোডেশিয়া সরকারের বিরুদ্ধে তোমাদের কণ্ঠ প্রতি মুহূর্তে সোচ্চার হয়ে ওঠে, তাদের পক্ষেও কোনদিন এতখানি কুৎসিত নির্যাতন সম্ভব হয়েছে কি?

ইংরেজের পক্ষে কিন্তু সম্ভব হয়েছিল। বীরের জাত কিনা!

যাক, পেডির কথাতেই ফিরে যাই। অত্যাচারে, উৎপীড়নে, আঘাতে, অপমানে গোটা জেলাটাকে শ্মশানে পরিণত করেই কিন্তু থামল না পেডি। সেই সঙ্গে শোনা গেল তার সদম্ভ চ্যালেঞ্জ। মেদিনীপুরকে এমন শিক্ষা দেব, যা সে কোনদিনই ভুলতে পারবে না।

বটে! সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল দীনেশের নিজের হাতে গড়া বি. ভি.-র মেদিনীপুর শাখার বিপ্লবী তরুণবৃন্দ। আমাদের শিক্ষা দেবে! দেখা যাক, কে কাকে শিক্ষা দেয়! রইল চ্যালেঞ্জ!

সারা বাংলা, সারা ভারত, সারা বিশ্ব এবার তাকিয়ে দেখুক যে, আমরা মেদিনীপুরের ছেলেরা আমাদের দীনেশদার প্রতি চরম দণ্ডাদেশের প্রতিশোধ নিতে পারি কিনা! তাকিয়ে দেখুক যে, আমরা গুরু-প্রণামী দিতে জানি কিনা!

হিসেব আমাদের অত্যন্ত সোজা। লাইফ ফর লাইফ! ব্লাড ফর ব্লাড! এছাড়া অন্য কোন হিসেব আমাদের জানা নেই।

লাইফ ফর লাইফ! প্রমাণ মিলল ১৯৩১ সালের ৭ই এপ্রিল। দীনেশের ফাঁসির তিনমাস আগেই।

সেদিন পেডি এসেছে মেদিনীপুর জেলা-স্কুলে একটি শিক্ষাপ্রদর্শনীর আমন্ত্রণে।

সন্ধ্যা উতরে গেছে। পেডি একটার পর একটা ছবি দেখে চলেছে হ্যারিকেনের স্তিমিত আলোকে। সঙ্গে আরো দুজন পদস্থ রাজপুরুষ।

হঠাৎ গুলীর শব্দ—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! পর পর ছ-বার।

শুরু হল হৈ-চৈ, চেঁচামেচি আর চিৎকার। আশ্চর্য, এত সশস্ত্র প্রহরী, এত লোকজন তার মধ্যে কিনা এই কাণ্ড! ধর শীগ্‌গির, ধর ওদের!

কাকে ধরবে! কোথায় কে! আশ্চর্য, কেউ নেই! কাজ শেষ করে কখন যে মেদিনীপুরের দুই দুর্ধর্ষ তরুণ বিমল দাশগুপ্ত আর যতীজীবন ঘোষ দিব্যি হাওয়ায় মিশে গেলেন, কেউ তা টেরই পেল না।

পরদিনই সে খবর বেশ বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হল সংবাদপত্রের পাতায়।

মেদিনীপুরের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটকে গুলি

স্কুল-গৃহের মধ্যে মিঃ পেডি আহত

'মেদিনীপুর, ৭ই এপ্রিল। মেদিনীপুরের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জেমস্ পেডি, সি. আই. ই.-র উপর অদ্য মেদিনীপুর স্কুল-ভবনের মধ্যে ৬ বার গুলী নিক্ষিপ্ত হয়।

মিঃ পেডি শিকার হইতে অদ্য সন্ধ্যাকালে শহরে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় শিক্ষা-প্রদর্শনী পরিদর্শনের জন্য স্থানীয় স্কুল-ভবনে গমন করেন। ঐ সময় প্রদর্শনী-ঘরের মধ্যে তাঁহার উপর গুলী বর্ষিত হয়।

তিনটি গুলী তাঁহার পৃষ্ঠদেশে বিদ্ধ হয়, দুইটি গুলী তাঁহার বাহুতে বিদ্ধ হইয়াছে। একটি গুলী তাঁহার তলপেট ভেদ করিয়া গিয়াছে।'

[আনন্দবাজার : ৮ই এপ্রিল : ১৯৩১]

এ খবর ৮ই এপ্রিলের। এবার শোন তার পরদিন, অর্থাৎ ৯ই এপ্রিলের খবর :

মেদিনীপুরের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ পেডির মৃত্যু

'মেদিনীপুর, ৮ই এপ্রিল। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জেমস্ পেডি অদ্য অপরাহ্ণকাল পাঁচটা দশ মিনিটের সময় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। গতকল্য সন্ধ্যাকালে তিনি গুলীর আঘাতে জখম হন।

অদ্য দ্বিপ্রহরের পূর্বে তাঁহাকে দ্বিতীয়বার অস্ত্রোপচার করা হয়; তাহার ফলে আরও দুইটি গুলী বাহির করা হয়। কিন্তু অপরাহ্ণকালে তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হইয়া উঠে এবং তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এতৎসম্পর্কে কয়েকটি বাড়িতে খানাতল্লাশি করা হইয়াছে এবং কয়েক-জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।'

[আনন্দবাজার : ৯ই এপ্রিল : ১৯৩১]

যতীজীবন ও বিমল দাশগুপ্ত দুজনেই তখনো পর্যন্ত ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তবে বেশিদিন নয়। তদন্তের ফলে যথাসময়েই একদিন বিমল দাশগুপ্তের নামটা পোঁছে গেল পুলিশের কানে।

কি করে তা সম্ভব হল! সংবাদপত্র থেকেই তার বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি:

বিমলদা সাহেবকে মারিয়াছে

'পেডি সাহেবের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে গোয়েন্দা-বিভাগ একটি গুরুতর সন্ধানের খোঁজ পাইয়াছে।

কলেজিয়েট স্কুলের নিকটস্থ এক বাড়ির এক পরিচারিকার এক অল্প-বয়স্ক পুত্র নাকি স্থানীয় লোকদিগকে বলিয়াছে যে, বিমলদা সাহেবকে মারিয়া পলাইয়া গিয়াছে।

এই যুবকের সন্ধান অজ্ঞাত। খানাতল্লাশিতে অপরাধজনক কিছু পাওয়া যায় নাই।

বিমল দাশগুপ্তের পিতার নাম অক্ষয়কুমার দাশগুপ্ত। তাঁহার বাড়ি বরিশাল। তিনি গত ৩০ বৎসর যাবৎ এখানে কবিরাজী করিতেছেন।'

[আনন্দবাজার: ২৩শে এপ্রিল: ১৯৩১]

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে। বিমলদা! বিমলদা! বিমল দাশগুপ্ত। কবিরাজ অক্ষয়কুমার দাশগুপ্তের ছেলে বিমল দাশগুপ্ত। ওরফে মাখন।

ধরো এবার বিমল দাশগুপ্তকে! যে করে হোক, তার শির চাই।

কিন্তু কোথায় বিমল দাশগুপ্ত! শহরের সুপরিচিত রঘু গয়লার সঙ্গে তার ছেলে সেজে ততক্ষণে তিনি কলকাতা গিয়ে নানা জায়গা ঘুরে পোঁছে গিয়েছেন মেটিয়াবুরুজের সেই রাজেন গুহর বাড়িতে, যেখানে রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের বীর অধিনায়ক বিনয় বোস তাঁর জীবনের শেষ ক'টি দিন কাটিয়েছিলেন পরম আনন্দে।

পিতার স্নেহ ও মায়ের আদর সংসারে আর যার কপালেই থাক না কেন, বিপ্লবীদের জন্য নয়। বিশেষ করে ফাঁসির রজ্জু যাদের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে, সে-সব পলাতক বিপ্লবীদের জন্য তো নয়ই। সে সাহসই বা কোথায়!

সেদিক থেকে অন্তরের ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যময়ী সরযূদেবী ও রাজেনবাবু ছিলেন একটা উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

অগ্নিযুগের কত ঘর-ছাড়া পলাতক বিপ্লবী যে সেদিন তাঁদের স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার বোধহয় কোন গোনাগুনতি ছিল না।

যাক, আগের কথায় ফিরে যাই। বিমল দাশগুপ্ত। নামটা তুমি ভাল করে লক্ষ্য কর, মল্লিকা। নইলে, পরে কিন্তু তোমাকে এ নিয়ে অনেকখানি বিভ্রান্ত হতে হবে। কারণ, এই বিমল দাশগুপ্ত নামটি নিয়ে অনেক মজারই সৃষ্টি হয়েছিল পরবর্তী কালে।

প্রথমে লোম্যান, তারপর সিম্পসন, সবশেষে পেডি। এখানেই কি শেষ!

মোটেই না। সর্বনাশের খেলার এই তো সবে শুরু! এর শেষটাও দেখে নিতে হবে যে!

কিন্তু এবার কার পালা?

কাকে ধরা যায় এবার?

নির্দেশ এল প্রেসিডেন্সি জেলের অভ্যন্তর থেকে—গার্লিককে ধর। ওই তো সেদিন দীনেশ গুপ্তকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছিল। এর আগেও সে এমনি আদেশ দিয়েছিল চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের একনিষ্ঠ কর্মী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের বেলায়। সুতরাং ওকে ছেড়ো না। কিছুতেই যেন ও রেহাই না পায় তোমাদের হাত থেকে।

সত্যিই রেহাই পেলেন না। ১৯৩১ সাল, ২৭শে জুলাই। দীনেশ গুপ্তের ফাঁসির ঠিক কুড়ি দিন পরের কথা।

আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট ও সেসন-জজ মিঃ আর. আর. গার্লিক, আই. সি এস.-এর আদালত।

চারদিকে সশস্ত্র প্রহরী। প্রহরী অবশ্য বরাবরই ছিল, তবে সম্প্রতি তা আরো বাড়ানো হয়েছে। কারণ, ইতিমধ্যে গার্লিক বেশ কয়েকখানি ভীতি-জ্ঞাপক চিঠি পেয়েছেন বিপ্লবীদের তরফ থেকে। তাতে স্পষ্টই জানানো হয়েছে যে, মৃত্যু তাঁর আসন্ন। তারই জন্য এই অতিরিক্ত সতর্কতা।

আদালতের কাজ চলছে। বিচারকের আসনে বসে গার্লিক। কি একটা মামলার তিনি শুনানী শুনছেন মন দিয়ে।

হঠাৎ মাথার ওপর আকাশটা ভেঙে পড়ল শব্দ করে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উন্নত মাথাটা লুটিয়ে পড়ল টেবিলের ওপর।

ঝাঁপিয়ে পড়ল তৎপর প্রহরীর দল। ঝাঁপিয়ে পড়ল সার্জেন্ট, কনস্টেবল ও গোয়েন্দা-বিভাগের একজন দারোগা। আগুন ছুটল উভয়পক্ষ থেকেই। কেউ কাউকে ছাড়তে রাজী নয়।

গোটা আদালত জুড়ে হুলস্থুল কাণ্ড। চারদিকে ছুটোছুটি, দাপাদাপি আর চিৎকার। এই চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে কে শত্রু, আর কে যে মিত্র, বোঝাও মুশকিল। তবু তারই মধ্যে দেখা গেল একজন সশস্ত্র প্রহরী ধূলিশয্যা নিয়েছে।

সংখ্যাধিক্যের বিরুদ্ধে একক সংগ্রামে ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়লেন মুক্তি-সৈনিক। ফলে, শেষপর্যন্ত গুলী ছেড়ে শুরু হল ধস্তাধস্তি।

চারদিকে পুলিশের বেড়াজাল। কোনরকমেই তাদের এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তবু তিনি শাসকদের হাতে আত্মসমর্পণ করতে রাজী নন। শেষপর্যন্ত মুখে পুরে দিলেন সায়ানাইড বিষের পুরিয়া। তারপরই আস্তে আস্তে ঢলে পড়লেন শক্ত মাটির বুকে।

মৃত্যুর পরে তাঁর পকেটে কি পাওয়া গিয়েছিল, জানো? পাওয়া গিয়েছিল ছোট্ট একটি চিঠি। তাতে লেখা ছিল—'ধ্বংস হও, দীনেশ গুপ্তকে অবিচারে ফাঁসি দেবার পুরস্কার লও।' ইতি—

মল্লিকা, ইতির পরে নামটা কি ছিল, জানো?

বিমল দাশগুপ্ত! পেডি-হত্যাকারী সেই বিমল দাশগুপ্ত। এবার বুঝেছ,

কেন আমি তোমাকে বিমল দাশগুপ্ত নামটি বিশেষভাবে মনে রাখতে বলেছিলাম!

কিন্তু সত্যিই কি ইনি বিমল দাশগুপ্ত?

মোটেই না। মৃতদেহ দেখে বিমলের বাবা, মা, দাদা সবাই রায় দিলেন একবাক্যে, ইনি বিমল দাশগুপ্ত নন। এ'র পরিচয় তাঁদের অজ্ঞাত।

পুলিশ বিভ্রান্ত। তাই তো! তাহলে ইনি কে? কি এ'র পরিচয়?

অবশেষে একনাগাড়ে চার মাস ধরে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল বিভিন্ন সংবাদপত্রের' পাতায়ঃ

'A reward is hereby declared, worth Rupees Five hundred to be given to one who can identify the murderer of Mr. Garlik'.

সব বৃথা। হাজার চেষ্টা করেও শেষপর্যন্ত মৃতদেহ সনাক্ত করা সম্ভব হল না পুলিশের পক্ষে। রহস্য যেমন ছিল তেমনিই রয়ে গেল।

তাহলে ইনি কে?

দেশ ও জাতির প্রয়োজনে নিজের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন করে কেন তাঁর এই নিরাসক্ত আত্মবিলুপ্তি?

কি তাঁর নাম?

নাম কানাই ভট্টাচার্য। বিপ্লবী নেতা সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে গড়া কর্মী মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ কানাই ভট্টাচার্য। সাতকড়িবাবুই তাঁকে একাজে পাঠিয়েছিলেন জেলের অভ্যন্তর থেকে নির্দেশ দিয়ে।

কিন্তু কেন? কানাই ভট্টাচার্যের পকেটে কেন বিমল দাশগুপ্ত নামাঙ্কিত চিঠি?

কি এর কারণ?

এর কোন প্রয়োজন ছিল কি?

ছিল বৈকি! এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বিমল দাশগুপ্তকে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করা।

বিমল দাশগুপ্ত পলাতক। পুলিশ তাঁর জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবার তারা জানুক যে, বিমল দাশগুপ্ত আর বেঁচে নেই। তাঁর প্রতি লক্ষ্য রাখা এখন নিরর্থক।

আসল বিমল দাশগুপ্ত তাহলে কোথায় গেলেন? ব্যস্ত হয়ো না। যথাসময়ে তুমি আবার তাঁর দেখা পাবে।

লোম্যান, সিম্পসন, পেডি আগেই গিয়েছে। এবার গেলেন গার্লিক। এসব দেখে-শুনে সেদিন কি ব্রিটিশ সিংহ চুপ করে বসে ছিল?

মোটেই না। একটার পর একটা আঘাতে ক্রমশই তারা হিংস্র থেকে হিংস্রতর হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে, গার্লিক-হত্যার পরে তাদের সেই আক্রোশ যেন সহসা শতধারায় ফেটে পড়ল। পড়ল মেদিনীপুরের বুকেই।

মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর থেকে মাত্র মাইল দুয়েক দূরে অবস্থিত হিজলী বন্দী নিবাস। প্রায় শ' দুয়েকের মতো রাজবন্দীকে সেখানে আটক করে রাখা হয়েছিল বিনা বিচারে।

সেদিন ছিল ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ সাল।

রাত তখন প্রায় সাড়ে আটটা। বন্দীরা কেউ কেউ খাওয়া-দাওয়া সারছেন, কেউ বা গল্প-গুজব করছেন, আবার কেউ বা শুয়ে পড়েছেন এরি মধ্যে।

ঠিক তখনই ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ অফিসার তার হিংস্র প্রহরী দলকে লেলিয়ে দিল বন্দীদের বিরুদ্ধে। এই সুযোগ! ওরা এখন অপ্রস্তুত। এই সময়ে যা পার করে নাও!

শুরু হল নারকীয় হত্যাকাণ্ড। শুরু হল একতরফা নির্মম আক্রমণ। ডাইনে-বাঁয়ে, যেদিকে ইচ্ছা গুলী চালাও। কাউকে রেহাই দিও না। সেদিন গার্লিকের হত্যাকাণ্ডের খবর শুনে ওরা উল্লাসে ফেটে পড়েছিল। আজ তার শোধ তুলে নাও।

সত্যিই সেদিন ওরা শোধ তুলে নিল, মল্লিকা। ফলে, গুলীর আঘাতে নিহত হলেন বন্দী তারকেশ্বর সেনগুপ্ত ও বাপ-মায়ের একমাত্র আদরের দুলাল, সুভাষের সহপাঠী বন্ধু সন্তোষ মিত্র। আর আহত হলেন এক শ'য়ের চাইতেও বেশি। গোবিন্দপদ দত্ত তাঁদের অন্যতম। তাঁর পুরো হাতটাই কেটে বাদ দিতে হল অপারেশন করে।

খবর শুনে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল সারা বিশ্ববাসী। কোন সভ্য গভর্ণমেণ্টের জেলখানায় যে বিনা বিচারে আবদ্ধ অসহায় নিরস্ত্র বন্দীদের ওপর এ ধরনের নির্মম আক্রমণ হতে পারে, তা বোধহয় তাদের ধারণারও বাইরে ছিল।

কিন্তু ইংরেজ সরকারের কথা আলাদা। নিজেদের সাম্রাজ্যলিপ্সাকে বজায় রাখার জন্য সেদিন এমন কোন হীন কাজ ছিল না, যা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

ধিক্কার উঠল শতকণ্ঠে। আসমুদ্র হিমাচল একসঙ্গে সোচ্চার হয়ে উঠল—ধিক তোমাদের, শত ধিক! তোমরা মানুষেরও অধম। মানুষ কখনো অসহায় নিরস্ত্র বন্দীকে এভাবে হত্যা করে না।

মল্লিকা, গত বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজদের প্রচার-মহিমায় বন্দীদের প্রতি হিটলারের কত নৃশংসতার কাহিনীই না আমরা শুনেছি। এমন কি, পাইকারী হারে বন্দীদের হত্যা করার কাহিনীও আমরা শুনেছি এমনি কতবার।

কিন্তু সুসভ্য ইংরেজই কি তার পথ-প্রদর্শক নয়?

পরাধীন ভারতে এমনি অসংখ্যবারই কি তার উদাহরণ দেখা যায়নি?

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সুভাষ, অধ্যাপক নৃপেন্দ্র ব্যানার্জী, যতীন্দ্র-মোহন সেনগুপ্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ছুটে গেলেন হিজলীতে।

ফিরে এলেন পরদিন শহীদদের মৃতদেহ সঙ্গে নিয়ে। হাওড়া স্টেশন থেকে শুরু করে কেওড়াতলা শ্মশানঘাট পর্যন্ত সেকি মর্মস্পর্শী দৃশ্য সেদিন! এমন মর্মস্পর্শী দৃশ্য, এমন সুসংবদ্ধ মিছিল কলকাতাবাসী বোধহয় বহুকাল দেখেনি।

বাংলাদেশের নেতৃত্বের প্রশ্ন নিয়ে এতদিন সুভাষপন্থী আর সেনগুপ্ত-পন্থীদের মধ্যে দলাদলির অন্ত ছিল না। সমস্ত ভুলে গিয়ে, বি. পি. সি. সি. থেকে পদত্যাগ করে সেই রাত্রেই সুভাষ দেশবাসীর কাছে এক আবেদন প্রচার করলেন আবেগময়ী ভাষায়ঃ

'আমি খড়্গপুর হইতে অবর্ণনীয় বেদনা লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। আমাদের বন্ধুদের জেলের মধ্যে কুকুর-বিড়ালের মতো গুলী করিয়া মারিবে, আর আমরা কি এখনো বিবাদ-বিসম্বাদে রত থাকিব! সকল বিভেদ ভুলিয়া আজ আমাদিগকে পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে হইবে, শত্রুর বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে।'

পরদিন ১৯শে সেপ্টেম্বর এক অভাবনীয় দৃশ্য দেখা গেল মনুমেণ্টের নীচে। একই সভামঞ্চে হাত ধরাধরি করে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যতীন্দ্রমোহন আর সুভাষ। সব পথই স্বাধীনতার পথ। সবারই লক্ষ্য এক। সুতরাং আর বিরোধ নয়।

তারপর সভা। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও সেদিন সেই বিরাট জনসভায় দাঁড়িয়ে কে এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে দৃপ্তকণ্ঠে ধিক্কার জানিয়েছিলেন, জানো?

তিনি হলেন বিশ্ব-বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ। সেদিন প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেনঃ

'এত বড় জনসভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, মনের পক্ষে উদ্‌ভ্রান্তিজনক ; কিন্তু যখন ডাক পড়ল থাকতে পারলুম না। ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষক নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতন নিষ্ঠুরতার দ্বারা চিরদিনের মতো নীরব করে দিয়েছে।

যখন দেখা যায়, জনমতকে অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা করে এত অনায়াসে বিভীষিকার বিস্তার সম্ভবপর হয়, তখন ধরে নিতেই হবে যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র বিকৃত হয়েছে এবং এখন থেকে আমাদের ভাগ্যে দুর্দাম দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলবার আশঙ্কা ঘটল।

...এ সভায় আমার আগমনের কারণ আর কিছুই নয়, আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই বলে সতর্ক করতে চাই যে, বিদেশী রাজা যত পরাক্রমশালী হোক না কেন, আত্মসম্মান হারানো তার পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ। এই আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠা ন্যায়পরতায়, ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠায়।

প্রজাকে পীড়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য করা রাজার পক্ষে কঠিন না হতে পারে ; কিন্তু বিধি-দত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে, তখন তাকে নিরস্ত করতে পারে কোন্ শক্তি?

একথা ভুললে চলবে না যে, প্রজাদের অনুকূল বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের পরেই অবশেষে বিদেশী শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

আমি আজ উত্তেজনা-বাক্য সাজিয়ে সাজিয়ে নিজের হৃদয়াবেগের ব্যর্থ আড়ম্বর করতে চাই নে এবং এই সভার বক্তাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁরা যেন একথা মনে রাখেন যে ঘটনাটা স্বতঃই আপন কলঙ্ক-লাঞ্ছিত

নিন্দার পতাকা যত ঊর্ধ্বে ধরে আছে, তত ঊর্ধ্বে আমাদের ধিক্কার-বাক্য পূর্ণবেগে পৌঁছতে পারবে না।'

আর ধিক্কার জানিয়েছিলেন বীরেন্দ্র শাসমল। মেদিনীপুর-গৌরব সেই পুরুষসিংহ বজ্রকণ্ঠে সেদিন প্রশ্ন করেছিলেনঃ

...'What would have happened to His Excellency Sir Stanly Jackson, if he was the premier of England and such an occurence had taken place in a British Jail and he was coolly moving about Downing Street and Westminister? I believe he would have been torn to pieces by the English mob.'

[History of Midnapore: pt. II, PP. 181]

[আমি জিজ্ঞেস করি, আজ গভর্ণর স্ট্যানলী জ্যাকসন যদি ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হতেন এবং সেখানকার কোন জেলে যদি এমনি ঘটনা ঘটত, তাহলে কি তিনি নিরুপদ্রবে ডাউনিং স্ট্রীটে বা ওয়েস্টমিন্‌স্টারের ধারে-পাশে ঘুরে বেড়াতে পারতেন? আমি বিশ্বাস করি, ইংল্যাণ্ডের জনতা তাহলে তাঁকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলত।]

দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করলেন সুভাষ। তিনি বললেনঃ

'...So on this day only cry that rings out of the heart is, let on the blood of the martyrs be built up the edifice of Freedom...'

শহীদ তারকেশ্বরের আদি-নিবাস বরিশাল জেলার গৈলাতে। নির্দিষ্ট দিনে সুভাষ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। সংবাদপত্র থেকেই তার বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছিঃ

'গৈলা, ২৪শে অক্টোবর। আত্মত্যাগী তারকেশ্বরের চিতাভস্ম সমাহিত-করণ উৎসব উপলক্ষে তারকেশ্বরের ঐকান্তিক যত্ন ও সেবায় গঠিত গৈলা সেবাশ্রমে গত ২৪শে অক্টোবর বৈকালে এক বিরাট জনসমাবেশ হয়। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সদলবলে বেলা ৪৷৷৹টায় আসিয়া উপস্থিত হন। উৎসবের প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত রজনী চট্টোপাধ্যায় প্রার্থনা করেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ প্রার্থনায় যোগদান করেন।'

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেনঃ

'...আমরা জানি, আত্মত্যাগীর রক্তের বিনিময়েই স্বাধীনতা ক্রয় করা সম্ভবপর। সকল যুগ, সকল সময় হইতেই আমরা এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসিতেছি। আমাদের পক্ষেও উহার ব্যতিক্রম আশা করা উচিত নয়।

হিজলীর গুলী-বর্ষণের ঘটনায় এই সত্যই আমাকে প্রবোধ দান করিয়াছে। হিজলী-চট্টগ্রামের ব্যাপার বাংলা কখনও নীরবে সহ্য করিবে না। একবাক্যে ইহার প্রতিকার দাবী করিবে।'

[আনন্দবাজারঃ ২৮-১০-৩১]

যথাসময়ে তদন্ত কমিটি বসল হিজলীর ব্যাপার নিয়ে। কমিটির চেয়ারম্যান নির্ধারিত হলেন বিচারপতি এস. সি. মল্লিক।

তদন্ত কমিশনের রায় জানা গেল অক্টোবর মাসের ৩০ তারিখে। রায়ে কি বলা হয়েছিল, শোন ঃ

হিজলীতে গুলী চালাইবার কোনই সংগত কারণ ছিল না

সরকারী তদন্ত কমিটির সিদ্ধান্ত

'হিজলীর গুলী চালনা ব্যাপার সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য সরকার পক্ষ হইতে বিচারপতি মিঃ এস. সি. মল্লিক (চেয়ারম্যান) ও মিঃ জে. জি. ড্রামন্ডকে লইয়া যে তদন্ত কমিটি গঠিত হইয়াছিল, উক্ত কমিটি তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন ঃ

'...আমাদের মতে সিপাহীরা যে বন্দী-নিবাসের উপর বেপরোয়া গুলী চালাইয়া (২৯ বার গুলী ছোঁড়া হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়) দুইজন রাজবন্দীকে নিহত ও অপর কয়েকজনকে জখম করিয়াছিল, তাহার কোন সঙ্গত কারণ নাই। বন্দী-নিবাসের ভিতরে প্রবেশ করিয়া কয়েকজন সিপাহী যে অপরাপর কয়েকজন রাজবন্দীকে নানাভাবে জখম করিয়াছিল তাহারও কোন সঙ্গত কারণ নাই।'

[আনন্দবাজার ঃ ৩০-১০-৩১]

সরকারী কাগজগুলোর মুখে শোনা গেল অন্য কথা। না, গুলী চালিয়ে প্রহরীরা এমন কিছু অন্যায় করেনি। তাদের কর্তব্য তারা করেছে, তার মধ্যে অন্যায়ের কি আছে!

এবার প্রতিবাদ করলেন রবীন্দ্রনাথ। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ২রা নভেম্বর তারিখে দার্জিলিং থেকে এক বিবৃতি দিয়ে তিনি জানালেন ঃ

'হিজলী বন্দিশালার বন্দীদের ভারপ্রাপ্ত ওয়ার্ডারগণের প্রতি খ্রীষ্টান-সুলভ মনোভাবের দ্বারা বার বার সহানুভূতি প্রকাশ করা হইয়াছে। সম্প্রতি একখানি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কাগজে আমরা ইহা লক্ষ্য করিয়াছি। ঐসব ওয়ার্ডারগণই তাহাদের রক্ষাধীন বন্দীদিগকে হত্যা করিয়াছিল। এই অপরাধের অনুষ্ঠাতাদিগের প্রতি গুরু কার্যভারের দোহাই দিয়া অনুকম্পা প্রদর্শন করা হইয়াছে।

এইসব মদগর্বিত ব্যক্তিরা সুখে-স্বচ্ছন্দে ব্যারাকে বাস করিয়া স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদার আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। ইহারাই দলবদ্ধভাবে নিতান্ত বর্বরোচিত প্রথানুযায়ী কারারুদ্ধ এবং অনির্দিষ্ট নিয়তির অসহনীয় মর্মপীড়ায় দগ্ধ অসহায় বন্দীদের উপর রাত্রির অন্ধকারের আবরণে নরঘাতী আক্রমণ চালাইয়াছিল।

তাহাদের সেই কার্যের জন্য প্যারাগ্রাফের উপর প্যারাগ্রাফে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করা হইয়াছে।

লোভ, যন্ত্রণা, ক্রোধের অদম্য তাড়না এমন একটি চরম অবস্থায় পৌঁছায়,

যখন সামাজিক দায়িত্ববোধ বা পরিণাম-চিন্তা হারাইয়া যায়। হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়, এইরূপ কোন দারুণ বিক্ষোভ হইতেই অধিকাংশ অপরাধের উৎপত্তি। এইরূপ অপরাধ যদিও অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনার মুহূর্তে এবং মানসিক দুঃস্বপ্নগ্রস্ত অবস্থায় সাধিত হয়, তথাপি আইন তাহা ক্ষমা করে না এবং সেইজন্যই ভয় এবং আত্মসংযম অপরাধাত্মক বৃত্তিগুলিকে বাধা দেয়।

কিন্তু যদি কর্মচারীদের কৃত খুনের জন্যই দয়ার ভাণ্ডার সযত্নে পূর্ণ করিয়া রাখা হয়, এবং যাহারা তাদের মনে শাস্তি এড়াইবার আশা পোষণ করে ও যাহারা আইন-শৃঙ্খলার রক্ষাকর্তা রূপে ঐ আইন ও শৃঙ্খলার সদম্ভ বিজয়োল্লাসের সহিত ভঙ্গ করে, তাহাদের জন্য যদি ন্যায় বিচারের একটি বিশেষ ধারা কৃতকার্যতার সহিত সমর্থন করা হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা সমগ্র সভ্য দেশের আইন-কানুনে ঘোষিত ন্যায়-পরায়ণতার নীতিকেই অবমাননা করা হইবে এবং জনসাধারণের মনের উপর তাহা এমন প্রতিক্রিয়া করিবে, যাহা কোন রাজদ্রোহকর প্রচার কার্যই করিতে পারে না।'...

[আনন্দবাজারঃ ৪-১১-৩১]

সরকারী তদন্ত কমিটির রায় প্রকাশিত হল। প্রমাণিত হল যে, এভাবে গুলী-বর্ষণের কোন সঙ্গত কারণই সেদিন ছিল না। কিন্তু তারপর! গভর্ণমেণ্ট কি সিদ্ধান্ত নিলেন এ ব্যাপারে! সে কাহিনীও এখানে তুলে দিচ্ছি সংবাদপত্রের পাতা থেকেঃ

হিজলীর ঘটনার জন্য রাজবন্দীরাই দায়ী

'গতকল্য ৫ই ডিসেম্বর কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় নিম্নলিখিত সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছেঃ

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ তারিখ হিজলী বন্দী-নিবাসে যে ঘটনা ঘটিয়াছে এবং তৎবিষয়ে তদন্ত কমিটি অনুসন্ধান করিয়া যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, স-পারিষদ লাট বাহাদুর তৎসম্পর্কে বিবেচনা করিয়া যে সমস্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

'...১৫ই তারিখের ব্যাপার রাজবন্দী এবং সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছিল এবং তিনি মন্তব্য করিতেছেন যে, সমস্ত ব্যাপারে রাজ-বন্দীরাই ছিল উপদ্রব সৃষ্টিকারী।'

[আনন্দবাজারঃ ৬-১২-৩১]

ব্যস. ঝামেলা মিটে গেল! তদন্ত কমিটি যা-ই বলুক না কেন, 'তিনি' মন্তব্য করিতেছেন যে, সব দোষ রাজবন্দীদের। সুতরাং 'তিনি'র কথার ওপর আর কোন কথাই চলতে পারে না।

স্টেটস্‌ম্যান, ইংলিশম্যান এবং ইউরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি বিভিন্ন সংস্থাগুলির বক্তব্য আরো স্পষ্ট। না, কোন খাতির নয়। সরকারের

উচিত, বিপ্লবী বলে যাকে সন্দেহ হবে, তাকেই দেয়ালের পাশে দাঁড় করিয়ে গুলী করে হত্যা করা!

কি করবে এখন মেদিনীপুর! হিজলী যে মেদিনীপুরের মধ্যেই! এতবড় অন্যায়-অবিচারের পরেও কি তারা চুপ করে বসে থাকবে?

দীনেশের নিজের হাতে গড়া মেদিনীপুরের তরুণ রক্ত কি এর প্রতিশোধ নেবে না?

অসহ্য উত্তেজনায় ফেটে পড়বে না?

রক্তে রক্তে মেদিনীপুরের মাটিকে ভিজিয়ে দেবে না?

দিয়েছিল মল্লিকা। দিয়েছিল ঘটনার মাসাধিকাল বাদেই। তারিখটা ছিল ১৯৩১ সালের ২৯শে অক্টোবর।

দুপুরবেলা। ক্লাইভ স্ট্রীটের গিলেণ্ডার হাউসে অবস্থিত ইয়োরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশনের অধিবেশন তখন জমজমাট। সভাপতি মিঃ ই. ভিলিয়ার্স।

হঠাৎ কার হাতের রিভলবার সেখানে সশব্দে আগুন ছড়াল—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

সঙ্গে সঙ্গে ভিলিয়ার্স এলিয়ে পড়লেন আহত হয়ে। রক্ত! আরো রক্ত! হেল্প! প্লীজ হেল্প!

দূর থেকে একটা চেয়ার ছুঁড়ে মারার দরুন আচমকা বেশ খানিকটা জখম হয়ে পড়লেন তরুণ বিপ্লবী। তারপরই ধরা পড়লেন চারপাশ থেকে ঘেরাও হয়ে।

ফলে, যা হবার তাই হল। এল পুলিশ। এল সেপাই-সান্ত্রী। এল পুলিশ বিভাগের বড় বড় সব অফিসারবৃন্দ। আসামী ধরা পড়েছে। এবার কোথায় যাবে বাছাধন!

বাছাধনের নামটি কি জানো, মল্লিকা? শুনে চমকে উঠো না যেন! নাম—বিমল দাশগুপ্ত। পেডি-হত্যাকারী সেই আসল বিমল দাশগুপ্ত।

গ্রেপ্তারের পরে অকথ্য নির্যাতন করা হল বিমল দাশগুপ্তের ওপর, কিন্তু সব বৃথা। একটি কথাও কেউ শুনতে পেল না তাঁর মুখ থেকে। এবার বিচার। সংবাদপত্র থেকেই তার বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি:

স্পেশাল ট্রাইবিউনালে বিমল দাশগুপ্ত

'বুধবার দিন আলিপুরে মিঃ বার্টলি (প্রেসিডেণ্ট), রায় বাহাদুর নলিনীকান্ত বসু এবং বাবু প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ দ্বারা গঠিত স্পেশাল ট্রাইবিউনালে বিমল দাশগুপ্তের বিচার আরম্ভ হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, গত ২৯শে অক্টোবর বেলা প্রায় ১১টা ৩০ মিনিটের সময় আসামী ইয়োরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ ভিলিয়ার্সের ক্লাইভ স্ট্রীটস্থ অফিস-গৃহে যাইয়া তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া উপর্যুপরি ৩টি গুলী করে।

২টি গুলী লাগে নাই, একটি গুলী লাগিয়া মিঃ ভিলিয়ার্স পৃষ্ঠদেশে আহত হন। রয়্যালিস্ট লীগের ৩ জন সদস্য তৎক্ষণাৎ আসামীকে ধরিয়া

ফেলে এবং আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলীসহ আসামীকে পুলিশের নিকট সমর্পণ করা হয়।' [আনন্দবাজার ঃ ১২-১১-৩১]

বিচারকালে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন বন্দী বিমল দাশগুপ্ত, হ্যাঁ, আমি মেরেছি। কিন্তু কেন?

'The Savage repressions in Midnapore, Chittagong and Hijli Camp were always inspired by the European Association. So I came to settle accounts with its president.' [মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম ও হিজলী বন্দী-নিবাসে বর্বর অত্যাচারের মূলে রয়েছে এই ইংরেজ বণিকসভার উস্কানি। তাই আমি এসেছিলাম তাদের সভাপতির সঙ্গে চূড়ান্ত হিসেব-নিকেশ করতে।]

সাজা হল দশ বছর। মাত্র দশ বছর!

তা বলে এখানেই শেষ নয়! যাবে কোথায়? পেডি-হত্যার জন্য সাজা নিতে হবে না? ফাঁসির রজ্জু তো তার জন্য বাঁধাই রয়েছে!

কিন্তু সাক্ষী! সাক্ষী-সাবুদ কোথায়? না, মেদিনীপুরবাসী, তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে রাজী নয়। হাজার প্রলোভনেও নয়। সুতরাং পেডি-হত্যা মামলা ডিসমিস।

সংবাদপত্রের পাতা থেকেই তার বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি:

বিমল দাশগুপ্ত

পেডি-হত্যার অভিযোগ হইতে অব্যাহতি

'গত ৭ই এপ্রিল তারিখে মেদিনীপুরের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জেমস্ পেডিকে হত্যা সম্পর্কে অভিযুক্ত বিমল দাশগুপ্তের বিচার গতকল্য কলিকাতা হাইকোর্টে এক নাটকীয়ভাবে পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে।

অ্যাডভোকেট জেনারেল তাহার বিরুদ্ধে পেডি-হত্যা সম্পর্কে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহার করায় ঐ অভিযোগ হইতে তাহাকে অব্যাহতি দান করা হইয়াছে।' [আনন্দবাজার ঃ ১৩-১-৩২]

মন উঠল না মেদিনীপুরের।

কি করে উঠবে! আহত হওয়া সত্ত্বেও ভিলিয়ার্স বেঁচে গেল, আর তার জন্য হারাতে হল কিনা বিমল দাশগুপ্তের মতো ছেলেকে!

উঁহু, হিসেব মিলছে না। সুতরাং হিসেব মেলাতে হবে। এমন জবাব দিতে হবে, যাতে দুবারের খরচ একবারেই উঠে আসে।

কিন্তু জবাব দিতে চাইলেই জবাব দেওয়া যায় না। তার জন্যে সময়ের দরকার।

মেদিনীপুরকে প্রস্তুত হবার সুযোগ দিয়ে চলো আমরা এই ফাঁকে একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি, মল্লিকা। কারণ, হঠাৎ আলোর ঝলকানির

মতো এ সময়ে বাংলাদেশের বিপ্লবের ইতিহাসে এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটে গেল, যা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।

তার মধ্যে বিশেষ দু-একটা ঘটনার কথা সংক্ষেপে বলে নিয়ে একটু বাদেই আবার আমরা ফিরে আসব মেদিনীপুরের মাটিতে।

ইতিমধ্যে ঢাকার কমিশনার মিঃ এ. ক্যাসেল ঘায়েল হয়েছেন ২১শে আগস্ট, টাঙ্গাইল শহরের সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ কার্যালয়ে। বিচারে ললিত রাহার সাজা হল মোট পাঁচ বছর।

বিস্ময়ের চমক নিয়ে অবশেষে এল সেই স্মরণীয় ১৪ই ডিসেম্বর।

শোনা গেল, কুমিল্লার জেলা-শাসক মিঃ স্টিভেন্স নিহত হয়েছেন। ঘটনাস্থলে যাঁরা ধরা পড়েছেন, তাঁরা ছেলে নন, মেয়ে। ফয়জুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী শান্তিসুধা ঘোষ আর সুনীতি চৌধুরী।

পরদিনই সে খবর বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হল সংবাদপত্রের পাতায়ঃ

কুমিল্লাতে বাঙালী রমণীর রিভলবারের গুলীতে
জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট খুন

'প্রকাশ, অদ্য প্রাতে আন্দাজ ৯টার সময় দুইটি বালিকা মিঃ স্টিভেন্সের বাংলোতে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল। তাহারাই রিভলবার দ্বারা গুলী করিয়া মিঃ স্টিভেন্সকে হত্যা করিয়াছে।

ঘটনার সময় সদর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত ছিলেন। তিনিই উক্ত দুই বালিকাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করেন। ইহাদিগকে জেলে প্রেরণ করা হইয়াছে।

প্রকাশ যে, মিঃ স্টিভেন্সের আততায়ী বলিয়া ধৃত বালিকা দুইটির নাম—কুমারী শান্তি ঘোষ ও কুমারী সুনীতি চৌধুরী। ইহারা উভয়েই কুমিল্লার ফয়জুন্নেসা গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের ৮ম মান শ্রেণীর ছাত্রী।'

[আনন্দবাজারঃ ১৫-১২-৩১]

খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল সারা দেশ। বলে কি! এ যে শুনেও গা-হাত-পা কাঁপে! ওঁদের কি ভয়-ডর বলেও কিছু নেই!

ঢাকা, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুরের মতো কুমিল্লাও সেদিন পিছিয়ে ছিল না। বিপ্লবী নেতা ললিত মোহন বর্মনের নেতৃত্বে সেখানেও গড়ে উঠেছিল একটি শক্তিশালী বৈপ্লবিক সংস্থা, অগ্নিযুগের ইতিহাসে যার ভূমিকা মোটেই তুচ্ছ ছিল না।

শহীদ অসিত ভট্টাচার্য, প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম, ঊর্মিলা গুহ, শান্তি সেন, বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য, অখিল নন্দী, চিত্ত দত্ত, হেমেন্দ্র ভট্টাচার্য, সত্যব্রত সেন, সুধীর ব্রহ্ম, কানুপ্রিয় দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন দেব, নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য, ননী মজুমদার, অনিল রায় বর্মন, সুরেন্দ্র দাস, সুধাংশু ভট্টাচার্য, অমূল্যকাঞ্চন দত্ত, ভুবন বর্ধন, সুবোধ মুখার্জী, চন্দ্রশেখর সরকার, লোকেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, সুবোধ রায়, বঙ্কিম চক্রবর্তী, বিরাজ দেব, সতীশ রায়, বিনয়

দত্ত, সুনীল বর্মন, রথীন্দ্র চৌধুরী, জিতেন্দ্র ভদ্র, সুকুমার চৌধুরী, নৃপেন সেনগুপ্ত, অপূর্বকাঞ্চন দত্ত, জিতেন ঘোষ, রবীন্দ্র গোস্বামী, মণীন্দ্র রায় চৌধুরী, বীরেন্দ্র দত্তগুপ্ত, হীরালাল দেবগুপ্ত, বিনয় তলাপাত্র, নিমাই দাস, সুকুমার মুখার্জী, সমরেন্দ্র পাল, মোহিনী ব্যানার্জী, ধীরেন চক্রবর্তী, গোপাল মজুমদার, হাবুল ব্যানার্জী, শৈলেন চ্যাটার্জী, মণি বিশ্বাস, প্রবোধ চক্রবর্তী, ইন্দু ভট্টাচার্য, ননী রায়, সতীশ রায় প্রমুখ সংস্থার সদস্যদের অবদানও তার পেছনে কম ছিল না।

বৈপ্লবিক সংস্থা বি. ভি.-র সঙ্গে কুমিল্লার এই দলের সম্পর্ক ছিল খুবই প্রীতিপূর্ণ। সবসময়েই তাঁরা যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন বি. ভি.-র অ্যাকশন স্কোয়াডের অন্যতম সদস্য প্রখ্যাত বিপ্লবী সুপতি রায়ের সঙ্গে।

এসব ব্যাপারে সচরাচর যা হয়ে থাকে, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। শুরু হল ব্যাপক ধর-পাকড়। অনেককেই গ্রেপ্তার করা হল একে একে। গ্রেপ্তার হলেন সুনীতির দাদা শিশির চৌধুরী। গ্রেপ্তার হলেন অপূর্বকাঞ্চন দত্তরায়, বিভূতি বসু, শিশির সোম, অনন্ত দে, সন্তোষ চ্যাটার্জী প্রমুখ অনেকেই।

গ্রেপ্তার হলেন ভুবন বর্ধন। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। পরীক্ষা চলছে। তবু রেহাই নেই। পরীক্ষার হল থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে ঢোকানো হল লৌহকারার অন্তরালে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে গ্রেপ্তার করা হল ফণীন্দ্র গুহ, বিনয় নন্দী, সমরেন্দ্র নন্দী, অমরেন্দ্র পাল প্রমুখ আরো কয়েকজনকে।

মেয়েদের মধ্যে ধরা পড়লেন চট্টগ্রামের অনন্ত সিংহের দিদি কুমারী ইন্দুমতী সিংহ ও কুমারী নীলিমা নন্দী। আর ধরা পড়লেন কুমারী প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম।

অদ্ভুত নিরলস কর্মী ছিলেন এই প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম। বিশেষ করে, কুমিল্লার নারী সংগঠনের ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে 'বিপ্লবী ললিত মোহন বর্মন' গ্রন্থ থেকে কয়েকটি লাইন এখানে তুলে দিচ্ছি, মল্লিকা। এই লাইন ক'টি থেকেই তুমি বুঝতে পারবে যে, কুমিল্লার ওপর দিয়ে কি উন্মত্ত ঝড় সেদিন বয়ে গিয়েছিল স্টিভেন্স-হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

'...শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী গ্রেপ্তার হইলেন—সরকারী চণ্ড-নীতি এবার ক্ষিপ্তভাবে নির্যাতনের মুষল চালাইল। দলের প্রতিটি কর্মীর বাড়ি খানাতল্লাশ হইল--পরিচিত প্রায় প্রতিটি পরিবারের উপর অমানুষিক নির্যাতন শুরু হইল।

সুনীতির পরিবারের উপর, তাঁহার বৃদ্ধ পিতামাতার উপর অকথ্য অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইল। পুলিশ ব্রাহ্মণবাড়িয়া চিত্তরঞ্জন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বড় বড় ঘরগুলি হাতী দিয়া ভাঙিল ও ললিতবাবুর দীর্ঘদিনের চেষ্টায় গঠিত ও কষ্টে সংগৃহীত মস্ত লাইব্রেরীর সমুদয় বই স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে আগুন দিয়া পোড়াইয়া দিল।'

বিস্ময় চরমে উঠল যখন শান্তি ও সুনীতিকে আদালতে নিয়ে আসা হল।

কি আশ্চর্য! এ যে একেবারেই বালিকা! ওরা মেরেছে সাহেবটাকে! এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত!

যাঁদের নিয়ে এত কাণ্ড, তাঁরা কিন্তু তখন অন্য জগতে। গানে-গল্পে-হাসিতে-উচ্ছ্বাসে বলতে গেলে গোটা আদালতটাকেই বুঝি তাঁরা মাথায় করে তুলেছেন।

বাচ্চা হলে কি হবে, যাকে বলে একেবারে বিচ্ছু মেয়ে।

একদিন কি করলেন, জানো! বসতে চেয়ার দেওয়া হয়নি বলে সেদিন সে কি কাণ্ড ওঁদের! চেয়ার দেবে না! দাঁড়াও, মজাটা দেখাচ্ছি!

সত্যিই ওঁরা মজা দেখালেন, মল্লিকা। কোর্ট শেষ না হওয়া পর্যন্ত সর্বক্ষণ সেদিন ওঁরা হাকিমের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইলেন দেয়ালের দিকে মুখ করে। অর্থাৎ—হয় চেয়ার দাও, নয়তো দেখতে হয় তো আমাদের পেছন দেখ।

লাল মুখ আরো লাল হয়ে উঠল হাকিমসাহেবের। গেল, মান ইজ্জৎ সব গেল এই বিচ্ছু মেয়েদুটোর পাল্লায় পড়ে। সিপাই, জলদি চেয়ার দাও।

সবচাইতে মজা হল যখন প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে এস. ডি. ও. নেপাল সেন সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালেন।

প্রশ্নের উত্তরে কি একটা কথা বলেছেন কি ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে দুজনে সমস্বরে কোরাস তুললেন—গ্রেট লায়ার! গ্রেট লায়ার! গ্রেট লায়ার!

ব্যস্, হয়ে গেল। তারপর যতবার তিনি মুখ খুলতে চেয়েছেন, ততবার সেই একই কথা—গ্রেট লায়ার! গ্রেট লায়ার! গ্রেট লায়ার!

উচ্ছল প্রাণবন্ত মেয়ে। মুখে হাসিটি লেগেই আছে। সেদিন ওঁদের এই হাসি দেখে বিপক্ষের আইনজীবীদের বুঝি বিস্ময়ের আর সীমা-পরিসীমা ছিল না। অজ্ঞাতেই বুঝি মনটা কখন ব্যথায় ভরে উঠেছিল কানায় কানায়। আহা, একেবারেই বালিকা! অদৃষ্টে কি অপেক্ষা করে আছে কে জানে? ওদের এই হাসি যেন কোনদিনই মিলিয়ে না যায়!

তবু গিয়েছিল। কোন্ দিন জানো, মল্লিকা?

যেদিন তাঁদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হল। সে কি দুঃখ! সে কি অভিমান! বড় সাধ ছিল দিব্যি হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়িটা নিজের হাতে গলায় তুলে নেবে, আর এই সাহেবটা কিনা শত্রুতা করে মাঝ থেকে সব পণ্ড করে দিল! দূর ছাই। ভাল লাগে না বাপু!

ঐ এক মুহূর্ত। তারপরই আবার সেই হাসি। হাসতে হাসতেই দুজনে গিয়ে উঠলেন জেলের কয়েদী-গাড়িতে। সেখানেও হাসি। এমন কি, পরবর্তী কালে জেল জীবনেও তাঁদের সেই হাসি মিলিয়ে যায়নি কোনদিনও।

গল্প নয় মল্লিকা। প্রমাণ, তখনকার দিনের সংবাদপত্র। সেদিনের ঘটনা সম্বন্ধে সংবাদপত্রে কি লেখা রয়েছে, শোনঃ

শান্তি ও সুনীতির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

'গত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে কুমিল্লার জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্টিভেন্স তাঁহার নিজ বাংলোয় পিস্তলের গুলীতে নিহত হন। পুলিশ এই সম্পর্কে শান্তিসুধা ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী নাম্নী দুইটি বালিকাকে গ্রেপ্তার করে। উহারা উভয়েই স্থানীয় ফয়জুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী।

উহাদের বিচারের জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ পিয়ার্সন, বিচারপতি মিঃ পি. মল্লিক এবং বিচারপতি মিঃ এস. কে. ঘোষকে লইয়া একটি বিশেষ আদালত গঠিত হয়। গতকল্য বুধবার বিশেষ আদালত এই মামলার রায় প্রদান করেন। বিচারে শান্তি ও সুনীতি উভয়েই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিতা হন।

বিচারকগণ আসামীদ্বয়কে স্বেচ্ছায় ও মিলিতভাবে মিঃ স্টিভেন্সকে হত্যা করিবার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন।

আদালতে বালিকাদ্বয়ের প্রবেশ

শান্তি ও সুনীতি লাল পাড় শাড়ি ও অনুরূপ রঙের জ্যাকেট পরিয়া এবং হাতে ফুল লইয়া কাঠগড়ায় প্রবেশ করে। তাহারা শান্তভাবে দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করে।

কাঠগড়া হইতে লইয়া যাইবার কালে তাহারা অনুচ্চ কণ্ঠে কিছু বলিতেছে বলিয়া মনে হইল এবং এইরূপ বলিতে শোনা গেল যে 'মৃত্যুই ভাল ছিল'—অবশিষ্টাংশ শ্রুতিগোচর হইল না।

এরূপ প্রকাশ যে, নিচের তলায় বন্দী-গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিবার সময় তাহারা গান গাহিতেছিল।...'

[আনন্দবাজার ঃ ২৮-১-৩২]

মল্লিকা, এই হল সেদিনের শান্তি আর সুনীতি! আর আজ! পথে-ঘাটে কত মেয়ে আজ দেখা যায়, কিন্তু কোথায় শান্তি-সুনীতির মতো অমন উচ্ছল, প্রাণবন্ত, দুঃসাহসী মেয়ে! কোথায় সেই প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর বিপুল নারীসত্তা! একালে শান্তি-সুনীতির মতো মেয়েরা ইতিহাসের কিংবদন্তী ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিস্ময়ের পর বিস্ময়। এবার বিস্ময়ের সৃষ্টি করলেন বাংলাদেশের দুটি আশ্চর্য নারী বীণা দাস আর কমলা দাশগুপ্তা। একজন প্রকাশ্যে, অন্যজন নেপথ্যে।

ঘটনাটা যেমন অভাবনীয়, তেমনি অকল্পনীয়। অগ্নিযুগের ইতিহাসে এমন নজীর সত্যিই দুর্লভ। কারণ, ইতিপূর্বে যখন যা কিছু ঘটেছে, তার সব কিছুরই মূলে ছিল পার্টি বা দলীয় নির্দেশ। এক্ষেত্রে সে প্রশ্ন ছিল গৌণ। প্রধান লক্ষ্য ছিল—সুযোগের সদ্ব্যবহার করা।

বীণা দাস তখন স্থির, দৃঢ়সঙ্কল্প। গভর্ণর স্ট্যানলী জ্যাকসনকে হাতের মুঠোয় পাওয়া গেছে। এ সুযোগ ছাড়লে চলবে না।

কিন্তু রিভলবার! একটা গুলী-ভরা রিভলবার চাই যে!

অবশ্য দিদি কল্যাণী দাস বাইরে থাকলে ভাবনা ছিল না। কিন্তু তিনিও তখন রয়েছেন কারা-প্রাচীরের অন্তরালে। এ অবস্থায় কোথায় পাওয়া যাবে এখন রিভলবার! কার কাছে!

শেষ পর্যন্ত ধরে বসলেন দিদির বন্ধু কমলা দাশগুপ্তাকে। সেই কমলা দাশগুপ্তা—ডালহৌসী স্কোয়ারের বোমা ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে যাঁর সহযোগিতার কথা আগেই তোমাকে বলেছি।

চট করে কোন জবাব দিতে পারলেন না কমলা দাশগুপ্তা। দেওয়া সম্ভবও ছিল না। নিজে তিনি যুগান্তর পার্টির বিশিষ্টা সভ্যা। কিন্তু বীণা দাস অন্য সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। তাঁকে তিনি রিভলবার দেবেন কিসের নবীতে! কোন্ যুক্তিতে!

তবে কি এমন অপূর্ব সুযোগটা হাত ফসকে চলে যাবে! তাই বা কি করে হয়!

ভাবনার পর ভাবনা। কি করা যায় এখন!

আগে হলে কথা ছিল না, কিন্তু এখন দলের প্রতিটি সহকর্মী রয়েছেন কারা-প্রাচীরের অন্তরালে। কেউ বাইরে নেই। এমন কি, এ ব্যাপারে কারো সঙ্গে একটু বুদ্ধি-পরামর্শ করার মতো পর্যন্ত কেউ অবশিষ্ট নেই। সিদ্ধান্ত যা করার নিজেকেই করতে হবে। এমন সিদ্ধান্ত করতে হবে, যাতে দলীয় সম্মান বা ঐতিহ্য যেন কোনদিক থেকেই এতটুকু ব্যাহত না হয়।

ভাবতে ভাবতে এক সময়ে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলেন কমলা দাশগুপ্তা।

আচ্ছা, ভূপেনবাবু (দত্ত) এসময়ে কাছে থাকলে কি করতেন?

কি সিদ্ধান্ত নিতেন সহপাঠী-বন্ধু ও গুরু দীনেশ মজুমদার?

রসিকবাবু (দাস) বা মনাদা (মনোরঞ্জন গুপ্ত)-ই বা কি বলতেন বীণার এই আবেদনের উত্তরে!

প্রশ্নের জবাব মিলল ১৯৩২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি।

সিনেট হল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব। চ্যান্সেলার গভর্ণর স্যার স্ট্যানলী জ্যাকসন।

হঠাৎ আসন ছেড়ে রুদ্রাণী মূর্তিতে উঠে দাঁড়ালেন বীণা দাস। তার-পরই তাঁর হাতের রিভলবার সশব্দে গর্জে উঠল—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

ত্বরিতে টেবিলের নিচে আত্মগোপন করলেন লাটবাহাদুর। আরে বাস রে বাস! আগুনে মেয়ের হাতে আগুনে রিভলবার। ঐ রিভলবারের সামনে লাটসাহেবের লাটে উঠতে কতক্ষণ!

সংবাদপত্র থেকেই তার বিস্তৃত বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছিঃ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় বাংগলার লাটের উপর গুলী

'গতকল্য শনিবার দিন অপরাহ্ণে সিনেট হাউসে এক বিষম কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। ৪৷৷৹ ঘটিকার সময় বাংগলার গভর্ণর বাহাদুর যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক কনভোকেশন সভায় বক্তৃতা করিতেছিলেন, সেই সময় ডায়োসেশান কলেজের বীণা দাস নাম্নী মহিলা গ্র্যাজুয়েট গভর্ণরকে বিষমভাবে আক্রমণ করে। গভর্ণর দৈবক্রমে বাঁচিয়া গিয়াছেন। একথা জানিতে পারিয়া তত্রত্য জনতা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।...

ঘটনার পূর্বের অবস্থা

৩-১৫ মিনিট হইতে কনভোকেশনের কার্য যথারীতি আরম্ভ হইয়া ৪-২৫ মিনিট পর্যন্ত নির্বিঘ্নেই চলে। সেই সময় একজন ভারতীয় মহিলা গ্র্যাজুয়েটের একাডেমিক গাউনের খস্‌খস্‌ শব্দ শুনিতে পাইয়া সকলেরই দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হয়। ঐ গ্র্যাজুয়েট যুবতী একটু অগ্রসর হইয়া আসে এবং মুহূর্তের মধ্যে পর পর ৪টি গুলী গভর্ণরকে লক্ষ্য করিয়া করে।

গভর্ণর বাহাদুর কয়েক পা পিছাইয়া সৌভাগ্যক্রমে ডানদিকে কাত হইয়া পড়িয়া যান। সেই সময় সমগ্র জনতার মধ্যে একটা বিষম উদ্বেগের ভাব প্রকাশ পায়।

ধোঁয়ার মধ্যেই পুলিশ কর্মচারিগণ ঐ যুবতীর দিকে দৌড়াইয়া যায় এবং তাহাকে ধরিয়া ফেলে। ভাইস-চ্যান্সেলার ও মঞ্চস্থিত অন্যান্য সমস্ত লোকই গভর্ণরের দিকে দৌড়াইয়া যান এবং পাঁচ মিনিটের জন্য সভায় একটা বিষম চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল।

ঘটনার পর

লেডী জ্যাকসন মঞ্চের নিম্নে প্রথম সারিতেই বসিয়া ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বিষম উদ্বিগ্ন হইয়া গভর্ণরের নিকট দৌড়াইয়া যান। ইতিমধ্যেই পুলিশ ঐ যুবতীকে একটু ধস্তাধস্তির পর গ্রেপ্তার করে।...'

[আনন্দবাজার ঃ ৭-২-৩২]

জ্যাকসনের তৎপরতায় লক্ষ্যভ্রষ্টা হলেন বীণা দাস। ধরাও পড়লেন প্রায় সংগে সংগেই। তারপর শুরু হল সেই চিরাচরিত একঘেয়ে নাটক। বলো, রিভলবার কোথায় পেলে? কে দিয়েছে তোমাকে? বলতেই হবে।

কে জবাব দেবে! পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবার জন্য যে মেয়ে জীবনের সমস্ত চাওয়া-পাওয়া তুচ্ছজ্ঞান করে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিতে

পারেন, তাঁকে তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুত করা এত সহজ নয়। তাই শান্তি-সুনীতির মতো তিনিও নিরুত্তর রইলেন সর্বক্ষণ।

পুলিশও সহজ পাত্র নয়। সঙ্গে সঙ্গে তারা এনে হাজির করল পিতা, শিক্ষাবিদ্, স্বয়ং সুভাষের শিক্ষাগুরু আচার্য বেণীমাধব দাসকে। অর্থাৎ —তিনি একবার বুঝিয়ে বলুন মেয়েকে। বাপের কথায় মেয়ে যদি মুখ খোলে তো ঝঞ্ঝাট চুকে যায়!

বীণা দাস তখন কি উত্তর দিয়েছিলেন জানো! পুলিশ অফিসারকে লক্ষ্য করে হেসে বলেছিলেন—'কেন শুধু শুধু বাবাকে এখানে নিয়ে এসেছেন বলুন তো! আমার বাবা কোনদিনও তাঁর মেয়েকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে শেখাননি।'

বিচারকালে বীণা দাসের মুখ থেকে একটি বিবৃতি শুনে হৈ-চৈ পড়ে গেল সারা ভারতে। সারা ইংল্যাণ্ডে। এ তো শুধুমাত্র একটি বিবৃতি নয়, এ যে ক্লাসিক লিটারেচার! ভারতবর্ষের মর্মবাণী।

'Just see, does't she look like Madonna!'

স্পষ্ট ও দৃঢ়স্বরে বীণা দাসকে বিবৃতি পাঠ করতে দেখে সেদিন আদালত-গৃহে কে এই উক্তি করেছিলেন জানো মল্লিকা!

তিনি হলেন ডায়োসেশান কলেজের সিস্টার ডরোথি! কি ভালই না তিনি বাসতেন তাঁর প্রিয় ছাত্রী বীণা দাসকে! ঘটনার খবর শুনে সেদিনই তিনি জেলখানায় গিয়ে বীণা দাসের সঙ্গে দেখা করে ভেঙে পড়েছিলেন গভীর উদ্বেগে :

'Bina dear, I love you so much! How could you do it?'

'উত্তর দিয়েছিলেন বীণা দাস :

'Sister, I love you no less, but I love my country more.'

এবার বীণা দাসের সেই বিবৃতি থেকে কিছু কিছু অংশ তোমাকে শোনাচ্ছি, মল্লিকা :

'I confess I fired at the Governor on the last convocation day, at the Senate House. I hold myself entirely responsible for it. My object was to die, and if to die, to die nobly fighting against this despotic system of Government, which has kept 300 millions people of my country in perpetual subjection to its infinite shame and endless suffering,—and fighting in a way which cannot but tell!

I had been thinking—is life worth living in a miserable India, subject to wrong and groaning under the tyranny of a foreign Government—or is it not better to make one Supreme Protest against it, by offering one's life away?

Would not the immolation of a daughter of India and of a son of England, awaken India to the sin of its acquiessances

to the continued state of subjection and England to the inequities of its proceedings? This was one question which kept thundering at the gates of my frenzied brain, like the incessant hammer-blow, that could neither be stilled nor muffled!

* * *

Now I stand alone before the Judgment seat of God and open myself before Him and pray for this all-forgiving love to wash me clean, that I may be a worthy offering to Him.

May I see the benignant countenance of the Mother Divine and feel Her loving embrace for me,—even for me, at this the most solemn moment of my life, if it be Her will that I should die. If She however, out of Her infinite mercy spares it to be used by Her as Her instrument, may I consecrate my life to the service of suffering humanity, which was the deepest longing of my heart. May God fulfil Himself through my death—or life, it so pleases Him'.

সারা রাত জেগে দীর্ঘ পঁচিশ পৃষ্ঠাব্যাপী এই বিবৃতিটি সেদিন কে লিখেছিলেন জানো, মল্লিকা! বেণীমাধব দাস। বীণা দাসের পিতা, স্বয়ং সুভাষচন্দ্রের শিক্ষাগুরু আচার্য বেণীমাধব দাস। বীণা দাস দু-এক জায়গা সামান্য অদল-বদল করে দিয়েছিলেন মাত্র।

রায় দেওয়া হল ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫ই তারিখে। সংবাদপত্র থেকেই তার বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ

গভর্ণরকে হত্যা চেষ্টার মামলা

বীণা দাসের ৯ বৎসর কঠোর কারাদণ্ড

'গতকল্য সোমবার কলিকাতা হাইকোর্টের স্পেশাল ট্রাইবিউনালে কুমারী বীণা দাসকে বাঙলার লাটের প্রাণনাশের চেষ্টা সম্পর্কে অভিযুক্ত করা হয়। অভিযোগের উত্তরে আসামী নিজেকে দোষী বলেন। ট্রাইবিউনাল তাঁহাকে নয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। গত ৬ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কনভোকেশনে এই ঘটনা সংঘটিত হয়।'

আদালতে বীণা দাস

'আসামী বীণা দাস জাফরাণী রঙের খদ্দরের শাড়ি পরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে বসিবার জন্য চেয়ার দেওয়া হইয়াছিল। তিনি শান্তভাবে দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন আদালতে উপস্থিত ছিলেন।' [আনন্দবাজার ঃ ১৬ই ফেব্রুয়ারি ঃ ১৯৩২]

আদালতের বিচারে ন' বছরের দণ্ড মাথায় নিয়ে শেষপর্যন্ত বীণা

দাসও একদিন হাসতে হাসতে চলে গেলেন কারা-প্রাচীরের অন্তরালে। পেছনে পড়ে রইল অগণিত দেশবাসীর মুগ্ধ, বিস্মিত, সগর্ব অভিনন্দন। মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। এতকাল তাঁরা শুধু গোপন সহযোগিতা দ্বারাই বাংলার বিপ্লব-আন্দোলনকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। এবার কঠিন, কঠোর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে প্রকাশ্যেই উপযুক্ত ভূমিকা নিতে শুরু করেছেন। সাবাস বাংলার মেয়ে, হাজার অভিনন্দন তোমাদের!

বলা বাহুল্য যে, কমলা দাশগুপ্তাকেও রেহাই দেওয়া হল না। প্রত্যক্ষ মামলায় জড়াতে না পেরে শেষপর্যন্ত তাঁকে বিনা বিচারে আটক করে রাখা হল বছরের পর বছর ধরে। যা ডেঞ্জারাস মেয়ে! ওঁদের আর বিশ্বাস নেই। কখন কি করে বসবে ঠিক কি!

ডেঞ্জারাস মেয়ে!

কথাটা অত্যুক্তি নয়, মল্লিকা। সেদিন পুলিশের খাতায় এই নামেই চিহ্নিত হয়েছিলেন কমলা দাশগুপ্তার মতো মেয়েরা।

আর আজ! নিজেকেই প্রশ্ন কর, মল্লিকা। প্রশ্ন কর যে, পরাধীন দেশের তিন দশকের মেয়েরা শিক্ষা, দীক্ষা ত্যাগ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ইতিহাসে যে উল্লেখযোগ্য নজীর রেখেছিলেন, আজ স্বাধীন দেশের মেয়েদের মধ্যে তার ছিটে-ফোঁটাও কোথাও দেখা যায় কি?

তবে এজন্য কাউকেই খুব একটা দায়ী করা চলে না, মল্লিকা। দায়ী দেশের বর্তমান পরিস্থিতি।

জীবন আজ দুর্বহ। প্রাণ-ধারণের গ্লানি অসহ্য। প্রাত্যহিক এই কঠিন, কঠোর, নির্মম জীবনযাত্রার মধ্যে মানুষের ন্যায়, নীতি, নিষ্ঠা, আদর্শ ইত্যাদি সুকোমল বৃত্তিগুলি ব্যর্থ হতে বাধ্য। কোথাও পথ না পেয়ে স্রোতলিকা-প্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কি-ই বা করণীয় আছে আজকের মানুষের!

আবার মেদিনীপুর। আবার সেই বি. ভি.।

আর. কে. ডগলাস, এবার তোমার পালা! পেডির পরে তুমিই এসেছ এখানকার জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে।

কিন্তু কেন? তুমি তো জানো যে, মেদিনীপুরে কোন শ্বেতাঙ্গ শাসককেই আমরা বরদাস্ত করতে রাজী নই!

তাহলে কেন এসেছ? এর প্রতিফল তোমাকে পেতেই হবে।

তাছাড়া গুরুতর অপরাধে অপরাধী তুমি! হিজলী-হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে যে তদন্ত কমিশন বসেছিল, তুমিই সেখানে নাক গলিয়ে সত্যিকার অপরাধীদের আড়াল করে রেখেছ কতকগুলো বাজে মন-গড়া যুক্তির অবতারণা করে। সুতরাং তোমার ক্ষমা নেই। রক্তের ঋণ তোমাকে রক্ত দিয়েই শোধ করতে হবে।

ভয়ে-ত্রাসে শ্বেতাঙ্গ সমাজ সেদিন অস্থির। পাঠান ও গুর্খা সৈন্য সহ কাঁটা-তার বেষ্টিত কোয়ার্টারে বাস করেও শান্তি নেই। শুধু ভয়। শুধু আতঙ্ক। এই বুঝি কিছু একটা ঘটে গেল।

বিশেষ করে, এপ্রিল মাস এলে তো কথাই নেই। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০ সালে। পরের বছর ৭ই এপ্রিল নিহত হয়েছেন মেদিনীপুরের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট জেমস্ পেডি। আবার বছর ঘুরে সেই অলুক্ষুণে এপ্রিল এসেছে! কি হবে কে জানে!

শ্বেতাঙ্গ জননীদের সবার মুখে সেদিন শোনা যেত সেই একই গান। দুষ্টু ছেলেকে শান্ত করতে গিয়ে অজ্ঞাতেই বুঝি তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসত এক আতঙ্ক-বিহ্বল ঘুম-পাড়ানি গান:

'Baby, sleep on, another April is coming!'

আশঙ্কা ওদের অমূলক নয়, মল্লিকা। এবার অঘটন ঘটল সেই এপ্রিলেই।

১৯৩২ সালের ৩০শে এপ্রিল।

সন্ধ্যা তখন প্রায় হয়-হয়। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড অফিসে সভার কাজ চলছে। সভাপতি স্বয়ং ডগলাস।

চারদিকে অসংখ্য সশস্ত্র প্রহরী। তাদের সতর্ক চোখ এড়িয়ে এক পা-ও কাছে এগুবার উপায় নেই।

তাছাড়া ডগলাসের নিজের হাতেই ধরা রয়েছে গুলী-ভরা উদ্যত রিভলবার। মেদিনীপুরকে বিশ্বাস নেই। ওরা সব পারে। সুতরাং হুঁশিয়ার থাকা ভাল।

সব বৃথা। মৃত্যু যার শিয়রে এসে হানা দিয়েছে, কে তার গতিরোধ করবে!

সহসা দুই দুর্ধর্ষ তরুণ, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য আর প্রভাংশু পাল কোথা থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন গুলী-ভরা রিভলবার হাতে নিয়ে। তারপরই শুরু হল একটানা রিভলবার গর্জন—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

সঙ্গে সঙ্গে ডগলাস হুমড়ি খেয়ে এলিয়ে পড়লেন টেবিলের ওপর। তারপর গড়িয়ে একেবারে মাটিতে।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল উপস্থিত প্রতিটি লোক। বুঝি এক মুহূর্তের ব্যাপার, তারপরই সবাই একযোগে হৈ-হৈ করে উঠল—ধর, ধর, ঐ যে পালাচ্ছে ওরা!

ছুট—ছুট—ছুট! কাজ শেষ। এবার ছুটে চলো। আরো জোরে! আরো!

পেছনে ছুটে আসছে হিংস্র শিকারীর দল। ছুটে আসছে তমলুকের মহকুমা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জর্জ, ঝাড়গ্রামের নৃপেন মিত্র প্রমুখ রাজভক্তের দল। হাতে তাদের উদ্যত রিভলবার। ঐ যে যাচ্ছে! জোরসে পা চালাও! ধরতেই হবে ওদের!

ধরবে! ঠিক আছে, কাম অন্! নতুন করে রিভলবারে গুলী ভরে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগারে টান দিলেন প্রভাংশু—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

তারপরই হঠাৎ একসময়ে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন 'অমর লজ'-এর পাশের রাস্তা ধরে। কেউ তাঁর কোন হদিসই পেল না।

প্রদ্যোৎ ছুটে চললেন সদর রাস্তা ছেড়ে দক্ষিণ দিকে। পেছনে সেই রাজভক্তবৃন্দ ও দেহরক্ষী দল।

দূরত্বের ব্যবধান কমে আসছে ক্রমশ। আরো কাছে এসে পড়েছে ওরা। অনেকটা কাছে। আর বেশি বাকি নেই।

সহসা ঘুরে দাঁড়ালেন প্রদ্যোৎ। তারপরই ট্রিগারে চাপ দিলেন দেহের সমস্ত শক্তিকে হাতে জড়ো করে এনে।

কিন্তু একি! গুলী তো ছুটল না! আবার চাপ দিলেন, কিন্তু ফল দাঁড়াল সেই একই।

কি ব্যাপার! তবে কি কোন যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিল রিভলবারে! নইলে এমন তো হবার কথা নয়!

বলা বাহুল্য যে, সঙ্গে সঙ্গে প্রদ্যোৎ ধরা পড়লেন ইংরেজের সেই খয়ের খাঁ-বৃন্দ ও রক্ষীদলের হাতে।

ধরা পড়ার পর প্রদ্যোতের পকেটে কি পাওয়া গিয়েছিল, জানো? পাওয়া গিয়েছিল ছোট্ট একটি চিরকুট। তাতে রক্তের অক্ষরে লেখা ছিল—'হিজলী অত্যাচারের ক্ষীণ প্রতিবাদ।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্দীবীরকে নিয়ে থানায় গিয়ে ঢুকল বীর প্রহরী-বৃন্দ। চোখে-মুখে তাদের বিজয়ীর উল্লাস। একজন অবশ্য হাত ফস্‌কে পালিয়ে গেছে, তা যাক গে! যা পাওয়া গেছে তাই বা মন্দ কি!

প্রদ্যোৎ নির্বিকার। থানায় ঢুকেই তিনি দারোগাকে লক্ষ্য করে কি বললেন, শুনবে? বললেন—বড্ড গরম লাগছে, স্যার। একটু চান করব। কাইন্ডলি একটু ব্যবস্থা করে দিন!

কড়া পাহারায় স্নান করে ফিরে এসেই আবার তিনি বললেন—এবার আমি একটু ঘুমোব। বড্ড ঘুম পাচ্ছে! দেখবেন, কেউ যেন আমাকে ডিস্টার্ব না করে!

দেখতে দেখতে থানায় এসে ভিড় করলেন বড় বড় সব পুলিশ অফিসারবৃন্দ। মুখে তাঁদের বড় বড় বুলি! ডাকো আসামীকে। জেরা করে সব কথা বের করতে হবে।

কোথায় আসামী! দিব্যি তিনি তখন ঘুমে অচেতন। সারা মুখে তাঁর নিরুদ্বেগ জীবনের সুপ্ত প্রশান্তি। দেখে কে বলবে যে, এই ঘুমন্ত কিশোরই এতবড় একটা প্রকাণ্ডের অধিনায়ক! বিশ্বাস করাও যেন শক্ত!

—বলো, তোমার সঙ্গে আর কে ছিল? যথাসময়ে প্রশ্ন করা হল প্রদ্যোৎকে।

—প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই। জবাব দিলেন প্রদ্যোৎ, হাজার প্রশ্ন করলেও যে এ সম্বন্ধে আমার কাছ থেকে কোনরকম সদুত্তর পাবেন না, সে তো ভাল করেই জানেন।

—বলবে না তুমি সঙ্গীর নাম?

—না। ছোট্ট করে জবাব দিলেন প্রদ্যোৎ।

—এর পরিণাম কি জানো? গর্জে উঠলেন শ্বেতাঙ্গ অফিসারবৃন্দ।

—জানি। একঝলক প্রশান্ত হাসি ফুটে উঠল প্রদ্যোতের সারা মুখে. —নির্যাতন করবেন, এই তো? করুন! যত নির্যাতন করবেন ততই দেশবাসী জেগে উঠবে। বুঝতে পারবে যে, এই হল ইংরেজ-শাসকদের আসল রূপ।

অবাক বিস্ময়ে শ্বেতাঙ্গ অফিসারবৃন্দ তাকিয়ে রইলেন বড় বড় নীল চোখ মেলে। কি নির্ভীক উক্তি! শাসকদের মুখের ওপর এমন নির্ভীক উক্তি করতে এদেশের ক'জন লোক পারে! এ যে অদ্ভুত ছেলে!

সত্যিই অদ্ভুত ছেলে, মল্লিকা। যেমন সুস্থ-সবল মিষ্টি চেহারা, তেমনি আচার-ব্যবহার ও কথাবার্তা। তাছাড়া অত্যন্ত মেধাবী ছেলে। মাত্র কিছুদিন আগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন হিন্দু স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হয়ে।

শুধু কি স্কুল-কলেজের পড়া! ইতিহাস, রাজনীতি, দর্শন, অর্থনীতি, কিছুই বুঝি বাদ নেই। শুধু পড়া আর পড়া। রাতদিন পড়া। নাড়াজোল রাজ পুস্তকাগারের কোন বই-ই বুঝি আর বাকি নেই তাঁর।

দীনেশ গুপ্তের শিক্ষাধীনে এরই ফাঁকে ফাঁকে আবার আয়ত্ত করেছেন লাঠি, ছোরা, যুযুৎসু, কুস্তি ইত্যাদি সব কিছু। এককথায় যাকে বলে চোখ-জুড়ানো সোনার টুকরো ছেলে। মেদিনীপুরের নয়ন-মণি।

শুধু প্রদ্যোৎ নন, মল্লিকা। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেদিন এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে যাঁরা দুর্বার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন এমনই মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর দল।

বিনয়, দীনেশ, প্রীতিলতা, কল্পনা, কল্যাণী, বীণা দাস, কমলা দাশগুপ্তা, দীনেশ মজুমদার, শান্তি, সুনীতি কেউ তার ব্যতিক্রম নন।

শুধু পড়া আর পড়া! পৃথিবীর ইতিহাসকে জানতে হবে। বুঝতে হবে। শিখতে হবে। সুতরাং পড়াশোনা সর্বাগ্রে দরকার।

শুধু স্কুল-কলেজে নয়, পরবর্তী কালে জেল-জীবনেও তাঁদের এই পড়াশোনার স্পৃহার এতটুকুও কমতি ছিল না। বন্দী-জীবনে নিয়মিতভাবে পড়াশোনা করে এমন অনেকেই সেদিন উত্তীর্ণ হয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষাগুলোতে।

আর আজ! নিজের মনকেই প্রশ্ন কর, মল্লিকা। আশা করি তার উত্তর পেতে তোমার এতটুকুও দেরি হবে না।

যাক, আগেকার প্রসঙ্গে ফিরে যাই। ডগলাস নিহত হলেন ৩০শে এপ্রিল, ১৯৩২ সালে। এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে কি বলা হয়েছিল, শোন:

মেদিনীপুরের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডগলাস নিহত

'৩০শে এপ্রিল, অদ্য সন্ধ্যায় মেদিনীপুরের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস যখন জেলা-বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিতেছিলেন, তখন প্রায় তিনবার তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী নিক্ষিপ্ত হয়।

প্রকাশ যে, তাঁহার বাহুতে ও বক্ষস্থলে গুলী লাগিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

গডলাস সাহেব রাত্রি ৯৷৷০টা মারা গিয়াছেন।

এই সম্পর্কে রিভলবারসহ একজন বাঙালী যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।' [আনন্দবাজার: ১. ৫. ৩২]

সচরাচর যা হয়, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। শুরু হল অমানুষিক নির্যাতন। বলো, কে ছিল তোমার সংগে? কি নাম তার? আর কে কে রয়েছে তোমাদের দলে? কোথায় পেলে এই রিভলবার?

প্রদ্যোৎ নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। না, একটি কথাও নয়। এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলার নেই তাঁর।

—ছিঃ প্রদ্যোৎ! ঠাট্টা করে বললেন ভূপেন দারোগা, তোমার মতো বুদ্ধিমান ছেলে কি না এমন একটা রিভলবার নিয়ে এলে, যা কাজের বেলায় কোন সাড়াই দিল না।

প্রদ্যোৎ এর উত্তরে কি বলেছিলেন, জানো মল্লিকা? শৃঙ্খলিত হাত দুটি কপালে ছুঁইয়ে বলেছিলেনঃ

'Irony of fate Bhupen Babu! Had my revolver spoken out I would not have been here in this condition, the story would have been otherwise'.

[অদৃষ্টের পরিহাস ভূপেনবাবু! আমার রিভলবার ঠিকমতো সাড়া দিলে কি আমাকে এ অবস্থায় এখানে দেখতে পেতেন! কাহিনী তাহলে অন্যরকম হত।]

এবার নিয়ে আসা হল প্রদ্যোতের দাদা শর্বরীভূষণকে। তারপর সেই অমানুষিক নির্যাতন। প্রহারে প্রহারে তিনি পাগল হয়ে গেলেন শেষ-পর্যন্ত। তবু রেহাই নেই। বলতেই হবে সব কথা। না জানলেও বলতে হবে।

প্রদ্যোতের বন্ধু ফণী দাস, ক্ষিতি সেন ও নরেন দাসকেও রেহাই দেওয়া হল না। নির্যাতনের যতরকম পন্থা আছে, একে একে সব কিছুই প্রয়োগ করা হল তাঁদের ওপর। ভাল চাও তো এখনো বলো। নইলে দেখে নেব যে, তোমাদের মেদিনীপুর কত শক্তি ধরে!

সব বৃথা। সব নিষ্ফল। এত নির্যাতন, এত অপমান, তবু সব কিছুই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল বিপ্লবী-চরিত্রের অনমনীয় দৃঢ়তার কাছে।

শুরু হল সেই চিরাচরিত কূটনৈতিক চাল। আসামীকে তোমরা ধরিয়ে দাও। তোমাদের পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেব। চাই কি বেশিও দিতে পারি। কিন্তু ধরিয়ে দেওয়া চাই-ই!

কিছুতেই কিছু হল না। ফলে, প্রদ্যোতের সংগী প্রভাংশু পালের নাম পুলিশের কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

এবার বিচারের পালা। সচরাচর যা হয়, তাই হল অর্থাৎ প্রাণদণ্ড। সংবাদপত্র থেকেই তার বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছিঃ

প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের প্রাণদণ্ড

'অদ্য প্রাতে ডগলাস-হত্যাকাণ্ডের মামলার রায় দেখা হইয়াছে। নরহত্যার অপরাধে আসামী প্রদ্যোৎকুমার ভট্টাচার্যের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। সে শান্তভাবে দণ্ডাদেশ গ্রহণ করে।

[আনন্দবাজারঃ ২৫. ৬. ৩২]

বেঁকে বসলেন ট্রাইবিউনালের অন্যতম বিচারপতি আই. সি. এস. জ্ঞানাঙ্কুর দে।

অসম্ভব! ফাঁসি হতে পারে না। আসামীর বয়স কম। তাছাড়া সাক্ষ্য-প্রমাণে দেখা গিয়েছে যে, কার্যকালে তার রিভলবার অকেজো হয়ে পড়েছিল। গুলী করেছে অন্য লোক। এ অবস্থায় ফাঁসির হুকুম দেওয়া সংবিধান-বিরোধী।

জ্বলে উঠলেন শাসক-কুল। তুমি কে হে বাপু! সংবিধানে এ নিয়ম নেই তো একটু পাল্টে নাও। তা বলে এহেন সিংহশাবককে হাতের মুঠিতে পেয়েও ছেড়ে দিতে হবে নাকি! ওসব চালাকি চলবে না।

অগত্যা হাইকোর্ট। হাকিম নড়ল তো হুকুম নড়ল না। ফাঁসির আদেশই বহাল রইল। দেখা গেল, অন্যান্য ক্ষেত্রে না হলেও অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বিপ্লবীদের ফাঁসি দেবার বেলায় সংবিধানের ধারাগুলোকে তেমন না মানলেও খুব একটা ক্ষতি নেই। মোট কথা, ছলে হোক, বলে হোক, ফাঁসি দেওয়া চা-ই!

সেদিন শাসকদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করার মূল্য কিন্তু বিচারক জ্ঞানাঙ্কুর দে-কে বেশ ভাল করেই দিতে হয়েছিল, মল্লিকা। তখনকার সময়ে এমন নির্ভীক ও সুদক্ষ বিচারক বাংলাদেশে খুব কমই ছিলেন। সে হিসেবে পরবর্তী কালে যে পর্যায়ে তাঁর পৌঁছনো উচিত ছিল, সেখানে আর কোন-দিনই তিনি যেতে পারেননি। বিশ্বাস কি! ওঁর হাতে মামলা পড়লে এরপর হয়তো বেকসুর খালাসই দিয়ে বসবেন। সুতরাং চেপে দাও ওঁকে!

ওদিকে ফাঁসির আদেশ শুনেও এতটুকু ভাবান্তর দেখা গেল না প্রদ্যোতের। গুরু দীনেশের মতোই নির্জন কারাকক্ষে প্রহরগুলো তাঁর কাটতে লাগল নানাবিধ বই ও ধর্মগ্রন্থ পড়ে।

শুধু পড়া আর পড়া! গীতা আর রবীন্দ্রনাথ। দুদিন বাদে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে, তাই এই অবসরে যতটা জ্ঞানার্জন করে নিতে পারা যায়।

তবু মাঝে মাঝে মনটা উদাস হয়ে যায়। যায় বিধবা মায়ের কথা ভেবে। মা হয়তো কত ভাবছেন। মা যে তাঁর বড় শ্রদ্ধার, বড় আদরের, বড় আপন-জন। মা-র মতো এমন কে আর আছে সংসারে!

মল্লিকা, শুধু প্রদ্যোৎ নন, মায়ের প্রতি এই অন্তহীন শ্রদ্ধার নিদর্শন সেদিন লক্ষ্য করা গিয়েছিল প্রতিটি বিপ্লবীর জীবনেই। বোধহয় দেশজননী আর গর্ভধারিণী জননী সেদিন এক হয়ে, একাকার হয়ে গিয়েছিল তাঁদের কাছে।

প্রদ্যোতের লেখা একটি চিঠি এখানে আমি তুলে দিচ্ছি, মল্লিকা। বিপ্লব কি, কি তার সংজ্ঞা এই নিয়ে মাঠে-ময়দানে, এখানে-ওখানে কত বড় বড় কথাই না আজকাল শুনতে পাই।

কিন্তু আজ থেকে ছত্রিশ বছর আগে সেই কনডেমন্ড্ সেল থেকে মৃত্যুপথযাত্রী প্রদ্যোৎ তাঁর মা পঙ্কজিনী দেবীকে গোপনে এই যে চিঠিখানি লিখে পাঠিয়েছিলেন, তার তুলনা কোথায় বলতে পারো?

চিঠিটা তুমি মন দিয়ে পড়। একবার নয়, বার বার পড়। বুঝতে চেষ্টা কর। তারপর নিজেকে প্রশ্ন কর যে, বিপ্লবের সংজ্ঞা সম্বন্ধে এমন সুনিশ্চিত বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে তুমি আর কোথাও পড়েছ কি? মনে রেখ, সেদিন তাঁর বয়স ছিল মাত্র আঠারো বছর। যাক, চিঠিটি তোমাকে শোনাচ্ছি ঃ

'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'

'মাগো,

আমি যে আজ মরণের পথে আমার যাত্রা শুরু করেছি তার জন্য কোন শোক করো না। আর আমার ভাইদের বলো যে, আমি আমার অসমাপ্ত কাজের ভেতর আমার হৃদয় রেখে গেলাম। আমার জন্যে দুদিন চোখের জল ফেলে ভুলে যাওয়ার চেয়ে আমার সেই অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে চেষ্টা করলে আমার ঢের বেশি তর্পণ করা হবে এবং আমার আত্মাও বেশি পরিতৃপ্ত হবে।

আজ যদি কোন ব্যারামে আমায় মরতে হত, তবে কি আপসোসই না থাকত সকলের মনে! কিন্তু আজ একটা আদর্শের জন্য প্রাণ বিসর্জন করছি। তাতে আনন্দ আমার মনের কানায় কানায় ভরে উঠেছে, মন খুশিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। ফাঁসির কাঠটা আমার কাছে ইংরেজের রসিকতা বলে মনে হচ্ছে। আমার এই অন্তরের কথাটা তোমারই অন্তরের প্রতিধ্বনি।

মা, তুমি কিন্তু আমার কাছে কাজের কোন কৈফিয়ৎ চাইতে পারবে না। তুমি হয়তো জানো না, তোমারই নিজের প্রয়োজনে আমাদের সৃষ্টি করেছ, কিন্তু তোমাকে আমি জানিয়ে যাচ্ছি, আমরা হাজার হাজার বছর ধরে তোমাদের—অর্থাৎ বাংলার মায়েদের মনে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সৃষ্টি হচ্ছিলাম। আজ ধীরে ধীরে আমরা আত্মপ্রকাশ করছি।

আর আমি চিরদিনই জানি যে, আমি বাঙালী আর তুমি বাংলা, একই পদার্থ কোনদিন আলাদা করে ভেবে উঠতে পারিনি। তাই কোন বিপদাশঙ্কাই আজ আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি।

যুগ যুগ ধরে তুমি যে অপমান, লাঞ্ছনা ও নির্যাতন সহ্য করে এসেছ, মাটিতে মুখ থুবড়ে বোবা গরুর মতো মার খেয়েছ, তারই বিরুদ্ধে তোমার মনে যে বিদ্রোহের ধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো বয়ে যাচ্ছিল, সেই পুঞ্জীভূত বিদ্রোহ-ই আমি।

সেই বিপ্লব আজ যদি আত্মপ্রকাশ করে, তবে তার জন্য চোখের জল ফেলবে কেন?

আমার এই কথাটা খুব সত্যি বলে জেনো। আর তোমায় যদি কেউ খুনীর মা বা ডাকাতের মা বলে অবজ্ঞায় পরিহাস করে, তবে নিজজ্ঞানে অন্তরের নিরুপম সৌন্দর্য বহন করে, নীরবে করুণ নেত্রে তার অজ্ঞতাকে ক্ষমা করো।

'মানুষকে আমরা খুন করি না, মানুষকে আমরা বাঁচাই।'

একথা বাংলাদেশে এখনো বোঝানো হয়নি। বাংলার বিপ্লবের ইতিহাস ক'দিনেরই বা! তাই আমাদের আদর্শ এখনো সাধারণ্যে প্রচারিত হয়নি।

সেইজন্য লোকে আমাদের হয়তো ভুল বোঝে, নতুবা জেনেও জানবার চেষ্টা করেনি।

আমাদের গালি দেওয়ার লোক পদে পদেই। ইংরেজ আমাদের কালিতে চিহ্নিত করে। কিন্তু ভারী দুঃখ হয়, যখন অহিংসবাদীরাও আমাদের হিংস্র বলে নিন্দা করে। তখন মনে হয়, পরাধীন দেশে এটাই বুঝি সবচেয়ে বড় অভিশাপ !

আমরা আজ যে আদর্শের সন্ধানে চলেছি তা অহিংসবাদীদের কল্পনারও অতীত। মানবের হিংস্রতা থেকে মানবকে রক্ষা করার জন্যই আমাদের এই প্রয়াস।

বাংলার বিপ্লবের ইতিহাসটা প্রায় পঁচিশ বছরের শিশু। এখনো ভাল করে কথা বলতে শেখেনি। তাই অনেকের গলাবাজির চোটে হয়তো তার কণ্ঠস্বর তলিয়ে যায়।

কিন্তু আজ এই শিশুকণ্ঠ হতে যে পাঞ্চজন্য শঙ্খ বেজে উঠেছে, তা শীগ্‌গিরই জগৎকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দেবে।

লোকে আমাদের ভাব-প্রবণ বলে উপহাস করে।

কিন্তু আমি এটা ভেবে পাই না, এই বাংলাদেশের হাজার হাজার ছেলে, যারা নেহাত ছেলেমানুষ নয়, লেখাপড়া শিখেছে, জ্ঞানলাভ করেছে এবং অনেক অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছে, তারা একজোটে ভাব-প্রবণ হয় কি করে ?

বুড়োরা আমাদের প্রায়ই বলে থাকেন, 'ভ্রান্ত যুবক' এবং করুণায় বিগলিত হয়ে বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁদের অনেকেই আমাদের 'ভ্রান্ত' পথ থেকে ফেরানোর অনেক চেষ্টাই নাকি করেছেন। এমন কি, খুব নিঃস্বার্থ-ভাবে কমিটিও নাকি গঠন করেছেন শুনেছি।

বুঝলে মা, এর ভেতরে কিছুই নেই। শুধুই উপর-চালাকি।

আসল কথাটা কি জানো মা, যাঁরা এরকম উঠে-পড়ে আমাদের ফেরানোর চেষ্টা করেছেন, হয় তাঁরা অথর্ব, নয় কাপুরুষ।

কাউকে আঘাত দেবার ইচ্ছা আমার মোটেও নেই। কিন্তু এ জিনিসটা দিনের আলোর মতোই স্বচ্ছ।

'বিপ্লব' জিনিসটা কিছু আমোদের নয়। কিন্তু মানব জাতিকে ধ্বংসের হাত হতে বাঁচানোর জন্য যুগে যুগে এটার প্রয়োজন হয়েছে।

বৃদ্ধ যাঁরা, তাঁদের নমস্কার করি। তাঁরা আমার পূজ্য, কিন্তু তাঁদের জরাগ্রস্ত দেহ-মন নড়ে-চড়ে বসবার সাময়িক কার্যটাকেও খুব বড় করে দেখেন এবং বাইরে তার স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করেন এবং নতুন জলে ভেসে-আসা আগাছার মতো যখন আমাদের পেছন ছাড়তে চান না, তখন বিরক্ত না হয়ে থাকতে পারি না।

কি করব ! তখন বাধ্য হয়ে সেই তথাকথিত অভিজ্ঞ বৃদ্ধদের শিশুর পর্যায়ে ফেলতে হয়।

যাঁদের প্রত্যেক রক্তবিন্দুটি দাসত্বের কলঙ্কে কলঙ্কিত হয়ে গেছে তাঁদের কথা ভাবি না। প্রকৃতির নিয়মে তাঁরা নিজের ক্ষতে নিজেরা পচে মরবেন, স্বখাত সলিলে ডুবে মরবেন।

কিন্তু যাঁরা মধ্যপন্থী, আপস-মীমাংসায় এখনো বিশ্বাসবান, তাঁদের জন্য দুঃখ হয়, কষ্টও হয়। তাঁদের শিক্ষা অভিজ্ঞতা দুই-ই আছে, কিন্তু নাই কেবল আত্মসম্মান জ্ঞান। এ বস্তু জোর করে কাউকে কখনো শেখানো যায় না, বোঝানোও যায় না। এটা যৌবনের ধর্ম।

তোমাকে কেউ যদি আমার চোখের সামনে নির্যাতন করে এবং আমি যদি পাগলের মতো লাফিয়ে না পড়ে বিচার করতে বসে যাই—এতে কোন সুরাহা হবে কিনা, এতে কতখানি বিপদ আছে, একলা ওর সঙ্গে পারব কিনা, কিংবা সামনে কোন থানা থাকলে এজাহার দিয়ে পরে সেই পলাতক অত্যাচারীর সন্ধান নিয়ে বেটাকে জেলে দেওয়া কিংবা সম্মানজনক আপস-মীমাংসা করা যাবে কিনা, আর অত্যাচারী যদি ধরা না পড়ে, তবে কোন খবরের কাগজে তীব্র প্রবন্ধ লেখা যায় কিনা ইত্যাদি করে ধীর-মস্তিষ্কের ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেব সত্যি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাতৃ-হৃদয়টা কি ছি ছি করে জ্বলে উঠবে না,—'ছেলেবেলায় বুকের দুধের সঙ্গে বিষ দিয়ে কেন এই ক্লেদের পিণ্ডটাকে মেরে ফেলিনি ?'

এ কথাটা খুবই সত্যি। যতই অধিক বিচার করবে ততই যুক্তি ও উপপত্তি অধিকারিক উৎপন্ন হয়ে শেষের নির্ণয় দুর্ঘট হয়ে পড়ে। যাক, তোমার অপমান যথেষ্ট হয়েছে। আর চোখের জল ফেলে অপমানের ভার বাড়াব না।

কি অমৃতস্পর্শে যে মরবার আগেই আমাদের ওজন বেড়ে যায়, তা সাধারণ লোকে বুঝতে পারবে না বলেই বিস্ময়ে অবাক হয়ে থাকে। নইলে এটা একটা হিসাব-নিকাশের ব্যাপার মাত্র।

বেশি আর কি বলব! জীবনে অনেক আশাই ছিল যে, দেশের মধ্যেই আমার আদর্শটাকে অন্ত্রে অন্ত্রে ছড়িয়ে যাব, নবযুগের কুসংস্কারমুক্ত ভাব নিয়ে জাতিকে ও সমাজকে নবরূপ দেব, একেবারে আমূল সংস্কার করে একটা নবজাতি গড়ে রেখে যাব, সমস্ত গ্লানি, সমস্ত আবর্জনা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দিয়ে যাব।

কিন্তু আশ্চর্য মানুষের জীবন! হঠাৎ একটা ডাক এল, আমাকে যেতে হল।

কিন্তু একথা মনেও স্থান দিও না মা, আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত চিন্তা বা আশাও লোপ পেয়ে গেল। সব রয়ে গেল আমার বাংলার ছেলে-মেয়েদের মনে, আর আমার বাংলার মায়েদের অন্তরে।

বাংলার ভূমি এত উর্বরা যে, তার ফসল উপচে পড়ছে। এ বৎসরে অগ্রহায়ণে যে ফসল অঙ্কুর হতে না হতেই শুকিয়ে গেল, আসছে হেমন্তে সে দ্বিগুণ হয়ে ফলে উঠবে। পরের ফসল দেশের মধ্যে সোনা ছড়িয়ে দেবে।

তোমার কাছ থেকে বিদায় নেবার কিছুই নেই—এইটুকু শুধু বলছি, বড় হলে আরো ভাল করে বলতে পারতাম। কিন্তু আর কেউ এই একটু 'মুখের কথা' বলুক বা নাই-বলুক, তুমি কিন্তু সম্যকরূপে বুঝবে। কেননা, এটা তো তোমারই অন্তরের কথা।

মা, তোমার প্রদ্যোৎ কি কখনো মরতে পারে! আজ চারদিকে চেয়ে দেখ,

লক্ষ লক্ষ প্রদ্যোৎ তোমার দিকে চেয়ে হাসছে। আমি বেঁচেই রইলাম মা অক্ষয় অমর হয়ে। বন্দে মাতরম্ !'

১৯৩৩ সাল, ১২ই জানুয়ারি। পৃথিবী থেকে প্রদ্যোতের শেষবিদায় নেবার দিন।

ভোর পাঁচটা। ডাকতে গিয়ে রক্ষীদল অবাক। আশ্চর্য ! স্নান শেষে পুজো সম্পন্ন করে, কপালে চন্দন-তিলক এঁকে এর মধ্যেই প্রদ্যোৎ প্রস্তুত। মুখে তাঁর প্রশান্ত হাসি। ঠিক যেন প্রাচীন ভারতের কোন ঋষিপুত্র। এইমাত্র যজ্ঞ শেষ করে উঠেছেন।

রক্ষীদের দেখেই উঠে দাঁড়ালেন প্রদ্যোৎ। তারপর নিজে থেকেই গিয়ে ফাঁসিমঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন দৃঢ় বলিষ্ঠ পা ফেলে। মুখে তাঁর তেমনি প্রশান্তি। যেন এটা একটা খেলামাত্র !

—আর ইউ রেডি প্রদ্যোৎ ?

—নিশ্চয়ই ! হাসতে হাসতেই জবাব দিলেন প্রদ্যোৎ, মৃত্যুর জন্য আমি মোটেই ভীত নই। কারণ, আমি জানি যে, আমার দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু বাংলার ঘরে ঘরে শত শত প্রদ্যোতের সৃষ্টি করবে। বন্দে মাতরম্ !

পরদিনই সে খবর প্রকাশিত হল সংবাদপত্রের পাতায়ঃ

প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের ফাঁসি

ভোর পাঁচটায় সব শেষ

'মেদিনীপুর ১২ই জানুয়ারি, ডগলাস-হত্যাকাণ্ড মামলায় প্রাণদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত আসামী প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের ফাঁসি অদ্য প্রত্যুষে পাঁচটার সময় মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলের মধ্যে হইয়া গিয়াছে।

ফাঁসির পূর্বে

এইরূপ জানা গিয়াছে যে, প্রদ্যোৎ ভোর বেলা স্নান করে। স্নান করিবার পর সে গীতা পাঠ করিতেছিল, এমন সময় ফাঁসির মঞ্চের দিকে যাইবার জন্য তাহাকে ডাকা হয়। সে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয়। তাহার দুই ভ্রাতাকে যখন জেলের ভিতর নিয়া আসা হইল, তখন তাঁহারা গিয়া দেখেন যে, প্রদ্যোৎ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। অবিলম্বে তাহাকে ফাঁসির মঞ্চে উঠিতে বলা হয়। সে অবিচলিত পদক্ষেপে ফাঁসিমঞ্চের উপর গিয়া উঠে, তৎপর ফাঁসির রজ্জু চুম্বন করিয়া জল্লাদের হাতে আত্মসমর্পণ করে।...'

[আনন্দবাজারঃ ১৩. ১. ৩৩]

প্রদ্যোৎ চলে গেলেন। কিন্তু এ মৃত্যু মৃত্যু নয়। এ হল জীবনাদর্শে উজ্জীবিত চরম আত্মোৎসর্গ। মানুষের কল্যাণই যাঁদের একমাত্র লক্ষ্য, এভাবেই তাঁদের জীবন উৎসর্গীকৃত হয়।

কিন্তু মেদিনীপুর! মেদিনীপুর যে বরাবরই শক্তির উপাসক! তারা কি এত বড় আঘাতটাকে নিঃশব্দে মেনে নেবে?

'পড়ি গেল কাড়াকাড়ি—
আগে কে বা প্রাণ করিবেক দান, তারি লাগি তাড়াতাড়ি।'

কথাটা মিথ্যে নয়। কে আগে প্রাণ দেবে, তাই নিয়ে বাংলাদেশে সত্যিই সেদিন কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল, মল্লিকা।

বস্তুত, মৃত্যুকে এমন করে ব্যঙ্গ করতে সেদিনের মতো আর কোনদিনই বুঝি বড় একটা দেখা যায়নি।

১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৪—এই পাঁচ বছরে বাংলাদেশের কত বিপ্লবী তরুণ যে সেই মৃত্যু-যজ্ঞে নিজেকে স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করেছিলেন, তার বোধ হয় কোন গোনাগুন্তি নেই।

বলা বাহুল্য যে, ইংরেজও চুপ করে বসে ছিল না। সভ্যতার যে মুখোশটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও খুলে ফেলে দিয়ে সেদিন তারা আত্মপ্রকাশ করেছিল হিংস্র হায়েনার রূপ ধরে। বাংলার উদ্বেলিত যৌবনকে পঙ্গু করে দেবার জন্য অত্যাচার, উৎপীড়ন, আঘাত, অপমান কিছুই বোধহয় সেদিন তারা করতে বাকি রাখেনি।

প্রমাণ, ঢাকার শ্রীসংঘের দায়িত্বশীল কর্মী, ছাত্রনেতা অনিল দাস। নীলক্ষেত লেভেল-ক্রসিং ডাকাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সন্দেহে গ্রেপ্তার করে কি নির্মম অত্যাচারই না সেদিন তাঁর ওপর করা হয়েছিল লালবাগ থানার অভ্যন্তরে।

একদিন নয়, দিনের পর দিন। সেই অত্যাচারের ফলেই একদিন তাঁর জীবনদীপ নিভে গেল লোকচক্ষুর অন্তরালে। কি যে হল জানতেও পারল না কেউ।

দাবী জানালেন সন্তানহারা জননী। খুবই ছোট্ট দাবী। অন্তত পোস্ট-মর্টেম করার সময় আমার নির্বাচিত একজন সার্জেনকে কাছে থাকতে দেওয়া হোক।

তাই মেনে নিলেন মহানুভব সরকার। নির্দিষ্ট সময়ও জানিয়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গেই।

কিন্তু কোথায় কি! যথাসময়ে হাজির হয়ে সার্জেন অবাক! না, আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ওসব নাকি আগেই চুকে-বুকে গিয়েছে।

কিন্তু রিপোর্ট! না, তা দেওয়া হবে না। এবং কোনদিনও তা দেওয়া হয়নি।

একইভাবে একদিন হারিয়ে গেলেন ময়মনসিংহের ধীরেন দে। তিনিও একদিন বিদায় নিলেন আই. বি. দারোগা মফিজুদ্দিন সাহেব ও তার প্রিয়পাত্র কুখ্যাত গেঁদা গুণ্ডার অকথ্য অত্যাচারের ফলে।

তারপর যা করা হল তা আরো মারাত্মক। পুলিশ-সুপার টেলার নির্দেশ দিলেন—গলা কেটে লাসটাকে জঙ্গলে ফেলে দাও, আর সেই সঙ্গে রটিয়ে দাও যে, স্পাই সন্দেহে ওর পার্টির লোকেরাই ওকে হত্যা করেছে।

কাজেও তাই করলেন মফিজদ্দিন সাহেব। সেই সঙ্গে শুরু করলেন ব্যাপক গ্রেপ্তার। হাজার হোক, তাঁর এলাকায় একটা মানুষ খুন হয়েছে। সেদিক থেকে তাঁর একটা কর্তব্য রয়েছে তো!

বি. ভি.-র মেদিনীপুর শাখার দুই অনমনীয় তরুণ সন্তোষ বেরা আর নবজীবন ঘোষও একদিন হারিয়ে গেলেন এমনি করেই। বন্দীজীবনে তাঁদেরও একদিন জীবনদীপ নিভে গেল হিংস্র পুলিশের বর্বর আক্রমণের ফলে। সেকথা পরে আসছে।

মল্লিকা, এই ছিল সেদিন ইংরেজ শাসনের সত্যিকারের রূপ। কিন্তু একটা কথা! ইংরেজ অত্যাচার করেছিল তার সাম্রাজ্য রক্ষার খাতিরে। কিন্তু তার পারিষদ দল!

মনিবের স্নেহচ্ছায়ায় পুষ্ট এই পারিষদ দল কিন্তু সেদিন কম অত্যাচার করেনি, মল্লিকা। বরং মনিবকে খুশি করার জন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা তাদেরও বুঝি ছাপিয়ে গিয়েছিল। ভাবটা এই যে, হাতে যখন ক্ষমতা পাওয়া গেছে, তখন চালাও দেশবাসীর ওপর যত খুশি অত্যাচার আর উৎপীড়ন। চাকরি-জীবনে উন্নতি করতে হলে এটাই তো সবচাইতে সোজা পথ।

আজ আর তাদের চেনার উপায় নেই। চেনা যেত, যদি দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ বিভাগ থেকে কতকগুলো গোপন নথিপত্র রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে না যেত।

এগুলো থাকলে আজকের দিনের কোন কোন জনদরদী দেশসেবক, নামী পত্রিকার নামী সম্পাদক—অনেকেরই মুখোশ খুলে যেত দেশবাসীর কাছে।

কারণ, বাইরে দেশ-সেবকের পোশাক পরে থাকলেও আসলে তাঁরাই ছিলেন সেদিন মহামান্য সরকার বাহাদুরের সবচাইতে বড় ভরসার স্থল। বিপ্লব-আন্দোলনের অনেক মূল্যবান তথ্যই তাঁরা হুজুরের দরবারে নিবেদন করেছিলেন যথাযথভাবে। একথা ঐতিহাসিক সত্য।

এমনি একটি মহাপুরুষের কথাই এবার তোমাকে বলব, মল্লিকা। ঢাকা জেলাবাসীর কাছে আজও বোধহয় তিনি প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন। অন্তত সেদিনের লোকদের কাছে তো বটেই।

লোকটি হল ঢাকা-মুন্সীগঞ্জের স্পেশাল মহকুমা-শাসক কামাখ্যা সেন।

কতরকম কায়দা-কানুনই না জানতেন ভদ্রলোক। আড়ং ধোলাই, বস্তা ধোলাই, কচুয়া ধোলাই, আঙুলে সূঁচ ফোটানো, মলদ্বারে রুল ঢোকানো ইত্যাদি কোন কিছুই বুঝি অজানা ছিল না তাঁর।

বিশেষ করে, সন্দেহভাজন ব্যক্তিটি মেয়েছেলে হলে তো আর কথাই নেই! চালাও তখন নতুন নতুন কায়দা।

সত্যি বলতে কি, তাঁর এই নিত্য-নতুন উদ্ভাবনী শক্তি দেখে শ্বেতাঙ্গ-প্রভুরা পর্যন্ত মোহিত হয়ে যেতেন এক এক সময়ে। চিয়ার আপ্ মাই বয়! চালিয়ে যাও!

অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল জনসাধারণ! একি অন্যায় কথা! দ্যাশের পোলাগুলি কি মরছে নাকি! তোগ চোখ নাই! দেখতে পাস না তোরা?

একে ১৯৩২ সাল, তার ওপর বিনয়-বাদল-দীনেশের বিক্রমপুর। সারা দেশ জুড়ে তখন চলছে দেশপ্রেমের বন্যা।

এ-ঘরের ছেলে যদি আন্দামানে যায় তো ও-ঘরের ছেলে দিব্যি লটকে পড়ে ফাঁসির দড়িটা গলায় নিয়ে। বস্তুত ঐ সময়ে বিক্রমপুরে এমন একটি পরিবারও বোধকরি ছিল না যারা স্বাধীনতা আন্দোলনে কোন না কোন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেনি।

এহেন বিক্রমপুরে যে ছেলে ছিল না, তা নয়। শাসকদের ভাষায় ডেঞ্জারাস সব ছেলেই ছিল। চোখও তাদের বন্ধ ছিল না।

তবু একটু দ্বিধা ছিল। হাজার হোক, দেশবাসী। কি হবে অহেতুক একটা বুলেট নষ্ট করে? তবে বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছে লোকটা। কিছু একটা ব্যবস্থা না করলেই নয়।

সাবধান করে দেবার জন্য প্রথমেই একখানি থান কাপড় পাঠিয়ে দেওয়া হল তাঁর স্ত্রীর ঠিকানায়। অর্থাৎ—এখনো সংযত হও। নইলে পৃথিবীর আর-এক প্রান্তে পালিয়ে গেলেও আমাদের হাত থেকে তুমি রক্ষা পাবে না। তখন থান কাপড়ের প্রয়োজন হবে নিশ্চয়ই! ওটা আগে থেকেই তোমাকে আমরা উপহার দিয়ে রাখলাম।

গ্রাহ্যই করলেন না কামাখ্যা সেন। কেনই বা করবেন! তাঁর পুলিশ রয়েছে। সেপাই রয়েছে। তাছাড়া পেছনে রয়েছে খুঁটির জোর ইংরেজ বাহাদুর। তাহলে ভাবনা কি! সুতরাং ডাণ্ডা যেমন চলছে, তেমনই চলুক। কি করবে ওরা!

যাদের জোরে এত মাতব্বরী. এবার কিন্তু তারাই ভয় পেয়ে গেল দারুণ-ভাবে। একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, মাই বয়! শীগ্‌গির পালাও এখান থেকে। যেখানে হোক, কিছুদিনের জন্য চলে যাও। কুইক্!

কিন্তু কোথায় পালাবে তুমি কামাখ্যা সেন?

না, কোন উপায় নেই। নিজের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য নিজেই তুমি মৃত্যুকে ডেকে এনেছ। সুতরাং যেখানেই যাও না কেন, নিয়তির অমোঘ নির্দেশ তোমাকে মেনে নিতেই হবে। স্বদেশবাসী হলেও স্বাধীনতার শত্রুর ক্ষমা নেই।

মুন্সীগঞ্জ থেকে ঢাকা। আশ্রয় নিলেন উয়াড়ী র‍্যাঙ্কিন স্ট্রীটে সদর মহকুমা-হাকিম শচীন চ্যাটার্জীর বাংলোতে। যাক বাঁচা গেল। কাক-পক্ষীও টের পায়নি এখানে আসার খবরটা। সুতরাং নিশ্চিন্ত।

নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না গৃহস্বামী শচীন চ্যাটার্জী। লোকটির অসম্ভব পপুলারিটির কথা তাঁর অজানা নয়। কখন কি ঘটে যায় কে বলতে পারে! তাই বার বার তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন—'রাত্তিরে শোবার আগে জানালাগুলো নিজের হাতে বন্ধ করতে ভুলবেন না যেন! দোহাই আপনার!'

—ঠিক আছে। ঠিক আছে। তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন কামাখ্যা সেন। যত সব ভীতুর কাণ্ড। সদর ফটকে সশস্ত্র প্রহরী রয়েছে, তবু কিনা এত

ভয়! ভয়ের কি আছে! তাছাড়া এতদূরে এসে এখানে তার সন্ধানই বা ওরা পাবে কি করে! জানলে তো!

১৯৩২ সাল। ২৭শে জুন।

রাত অনেক। সারা পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়েছে নিঝুম ঘুমের অন্তরালে।

শুধু ঘুম নেই কামাখ্যা সেনের চোখে। বড্ড গরম। জানালাটা একটু খুলে দিলে হয় না! হলই বা একতলা, তবু চারপাশে সশস্ত্র প্রহরী রয়েছে। এখান থেকেও তাদের বুটের শব্দ কানে আসছে। তাহলে ভয়ের কি আছে!

আস্তে আস্তে জানালাটা খুলে দিলেন কামাখ্যা সেন।

আঃ! বাইরের খোলা হাওয়ায় প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল।

কিন্তু একি! কে জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে? হাতে ওর কি ওটা?

এতটুকুও শব্দ করার মতো অবকাশ পেলেন না কামাখ্যা সেন। তার আগেই সশব্দে রিভলবার গর্জে উঠল—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

আচমকা ঘুম ভেঙে গেল গৃহস্বামী শচীনবাবুর। কিসের যেন একটা শব্দ হল না!

সঙ্গে সঙ্গে তিনি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন কামাখ্যা সেনের ঘরে। ছুটে এল বাংলোর প্রতিটি প্রাণী।

কিন্তু কামাখ্যা সেন তখন কোথায়? অব্যর্থ গুলীর আঘাতে ততক্ষণে তিনি শেষ।

ছুটে এল পুলিশ বাহিনী। ছুটে এল শাসক সম্প্রদায়। কিন্তু সব বৃথা। আততায়ীর কোন চিহ্নও নেই সেখানে। যেন হাওয়ায় মিশে গেছে লোকটা।

সংবাদপত্র থেকেই তার বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছিঃ

ঢাকায় গুলীর আঘাতে মুন্সীগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট

মিঃ কামাখ্যা প্রসাদ সেন নিহত

ঢাকা, ২৭শে জুন। মুন্সীগঞ্জের স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কামাখ্যা প্রসাদ সেন অদ্য ভোর ৪টায় অজ্ঞাত আততায়ীর গুলীতে নিহত হইয়াছেন। মিঃ সেন কয়েক দিনের জন্য ঢাকায় আসিয়াছিলেন এবং উয়াড়ীতে সদর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এস. এম. চ্যাটার্জীর বাড়িতে অবস্থান করিতেছিলেন।

[আনন্দবাজারঃ ২৮. ৬. ৩২]

এবার শোন ঘটনার পরের দিনের খবরঃ

নিহত ম্যাজিস্ট্রেটের লাস কুমিল্লায় প্রেরিত

'গতকল্য সকালবেলা মিঃ কামাখ্যা প্রসাদ সেন গুলীর আঘাতে নিহত হন, এ সংবাদ পাঠকবর্গ অবগত আছেন। মিঃ সেনের বিধবা পত্নী ঢাকাতে যাইয়া তাহার স্বামীর শেষচিহ্ন দেখিতে অসমর্থ হওয়াতে মিঃ সেনের শব

একটি বরফের বাক্‌সে পুরিয়া কুমিল্লাতে প্রেরণ করা হয়।

এই হত্যাকান্ড সম্পর্কে সন্দেহক্রমে এ পর্যন্ত ১৩জন যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।' [আনন্দবাজার ঃ ২৯.৬.৩২]

দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার ইতিহাস কোনদিনও ক্ষমা করে না, মল্লিকা। তাই কামাখ্যা সেনের নিহত হবার খবর শুনে সেদিন ধন্য ধন্য করে উঠেছিল গোটা বিক্রমপুর।

মুক্তির নিশ্বাস ফেলেছিল হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ অসহায় নির্যাতিতা নারী। মুক্তি! মুক্তি! মুক্তি! অত্যাচারী কামাখ্যা সেন বিদায় নিয়েছে। এবার অবারিত মুক্তি!

শুধু কামাখ্যা সেন নয়, ইতিহাসের এই অমোঘ নির্দেশকে সংসারে কোন অত্যাচারী শাসকই বুঝি কোনদিন এড়াতে পারেনি। জালিয়ানওয়ালা-বাগের সেই নৃশংস হত্যাকান্ডের নায়ক মাইকেল ও' ডায়ারই কি তা পেরেছিল কোনদিন ?

না, পারেনি। শত শত নিরস্ত্র অসহায় মানুষের তাজা রক্তে একদিন যে গোটা পঞ্চনদের মাটিকে ভিজিয়ে দিয়েছিল, পরবর্তী কালে সেই পঞ্চনদের উধম সিং-ই তাকে রক্ত দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য করেছিলেন খাস ইংল্যান্ডের মাটিতে দাঁড়িয়ে।

জালিয়ানওয়ালাবাগ......

শত সহস্র নিরপরাধ নরনারীর রক্তে সেদিন লাল হয়ে গিয়েছিল ঐতি-হাসিক জালিয়ানওয়ালাবাগের মাটি। বৃদ্ধ, যুবক, শিশু কেউ বাদ যায়নি।

এমন কি গর্ভবতী নারীরা পর্যন্ত সেদিন রেহাই পায়নি পাঞ্জাবের কুখ্যাত গভর্ণর মাইকেল ও' ডায়ার এবং তার উপযুক্ত সহচর সেনাধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হ্যারী ডায়ারের পাশবিক অত্যাচার থেকে।

শুধু অস্ত্রহীন, অবলম্বনহীন নির্দোষ নরনারীকে বুলেটের বন্যায় ধরাশায়ী করেই ওরা সেদিন ক্ষান্ত থাকেনি।

শহরের গণ্যমান্য নাগরিকদের ঘর থেকে বাইরে টেনে এনে বুকে হেঁটে পথ চলতে বাধ্য করা, প্রকাশ্য রাজপথে তাদের দিয়ে নাকে খত দেওয়ানো, জোয়ানদের বেত মেরে মেরে অজ্ঞান করা, মেয়েদের বেআব্রু করে থুথু দেওয়া, সভ্যতার মুখোশ পরা সেই নরপশুদের কাছে এসব ছিল সেদিন একটা খেলামাত্র।

খবর শুনে সারা দেশ স্তম্ভিত। তারপরই আসমুদ্র-হিমাচল ফেটে পড়ল তীব্র প্রতিবাদে। ধিক্ তোমাদের, শত ধিক্! এই কি তোমাদের সভ্যতার নমুনা! তোমরা পশুরও অধম।

কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষের ক্ষোভ ও বেদনা ভাষায় রূপ পেল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে। নিজের 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করে বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে তিনি লিখলেন ঃ

'বিচারের নামে যারা আমাদের দেশের অসহায় নরনারীকে এভাবে নির্বিচারে হত্যা করতে পারে, তাদের দেওয়া এই সম্মানের গুরুভার বইতে আমি অক্ষম।'

শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, স্যার শংকর নায়ারের মতো ব্রিটিশ-ভক্ত নাগরিক পর্যন্ত বড়লাটের কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করলেন ক্ষুব্ধ হয়ে। যেভাবে আমার অসহায় দেশবাসীকে তোমরা হত্যা করেছ, তারপর শাসনকার্যের কোন ব্যাপারে যুক্ত থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দয়া করে আমাকে রেহাই দাও।

উত্তরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের সে কি দম্ভোক্তি! সে কি অট্টহাসি!

'দুর্ভাগ্য, আমার কাছে সেদিন এক হাজার দু'শো পঞ্চাশ রাউন্ড গুলীর মধ্যে আর একটাও অবশিষ্ট ছিল না। থাকলে তারও সদ্ব্যবহার করতাম। রাস্তাটা সরু, তাই মেশিনগান দুটো ভেতরে নিয়ে যেতে পারিনি। পারলে আমার চাইতে বেশি খুশি বোধকরি আর কেউ হত না।'

একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেল পাঞ্জাবের গভর্ণর মাইকেল ও' ডায়ারের মুখ থেকে। ঠিকই করেছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল। নেটিভরা উপযুক্ত শাস্তিই পেয়েছে।

বিলেতের হাউস অফ লর্ডস-এরও সেই একই অভিমত। উল্টে তাঁরা আরো অভিনন্দন জানালেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ারকে।

তার চাইতেও বেশি করলেন বিলেতের অভিজাত শ্রেণীর নরনারীগণ। শুধু অভিনন্দন নয়, সঙ্গে ছাব্বিশ হাজার পাউন্ড তাঁরা ব্রিগেডিয়ার জেনা-রেলকে পুরস্কার দিলেন তার এই অসাধারণ বীরত্বের জন্য।

বীরত্বই বটে! তাই এখানেই বীরসুন্দর থামলেন না। কিছুদিন বাদে আবার তিনি বীরত্ব দেখালেন 'India as I knew it' নামে একটি বই লিখে। যার মূল বক্তব্য হল—ভারতবাসী মনুষ্য নামেরও অযোগ্য, ভারবাহী পশুর চাইতে তাদের মর্যাদা কোনরকমেই উচ্চস্তরের নয়। হতে পারে না। হওয়া উচিত নয়।

কতই বা সেদিন বয়েস ছিল উধম সিং-এর। চোদ্দ-পনের বছরের কিশোর মাত্র।

সেই কিশোর মনেই সেদিন জন্ম নিল বিচিত্র এক অনুভূতি। বিচিত্র এক চেতনা।

যারা অকারণে আমার দেশের সহস্রাধিক ভাইবোনকে হত্যা করেছে, একদিন তাদের আমি নিজের হাতে হত্যা করব। তাদের রক্ত দিয়ে হোলি খেলব।

তারপর এক এক করে কেটে গেল দীর্ঘ একুশ বছর।

উধম সিং তখনো নিজের প্রতিজ্ঞায় স্থির। প্রতিশোধ আমি নেবই।

কিন্তু ব্রিগেডিয়ার জেনারেলকে আর পাওয়া যাবে না। মহাকাল তাকে আগেই ছিনিয়ে নিয়েছে।

বাকি রয়েছে ঐ কুখ্যাত গভর্ণর ও' ডায়ার। তাকেই আমি হত্যা করব। করবই!

কিন্তু কোথায় ও' ডায়ার! চাকুরী-জীবন থেকে অবসর নিয়ে তিনি তখন বহাল তবিয়তে বিলেতে।

বিলেতেই আমি যাব।

উধম সিং তখন মরিয়া। একজন ফাঁকি দিয়ে সরে পড়েছে। আর একজন যেন কোনরকমেই পালাতে না পারে।

তাকে আমার চাই। তার জন্য বিলেতে কেন, পৃথিবীর অন্য প্রান্তে যেতেও আমি কুণ্ঠিত হব না।

অবশেষে বিলেত!

তারপর শুরু হল প্রতীক্ষা। কোথায় সেই শয়তান! শুধু একটা সুযোগ চাই। তার মুখোমুখি দাঁড়াবার মতো একটা মাত্র সুযোগ।

অবশেষে এল সেই ঐতিহাসিক ১৯৪০ সালের ১৩ই মার্চ।

বিলেতের ক্যাক্সটন হলের টিউডর রুমে সেদিন দারুণ ভীড়। রয়েল সেন্ট্রাল এশিয়ান সোসাইটি ও ইস্ট ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে এক সভা আহ্বান করা হয়েছে। বিষয়বস্তু—আফগানিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। সভাপতি, লর্ড জেটল্যান্ড।

সভায় তিলধারণেরও জায়গা নেই। নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে অনেকেই এসে গেছেন। উধম সিংও রয়েছেন তাঁদের মধ্যে।

বেলা তখন প্রায় তিনটে। কেন্সিংটনের গৃহ থেকে সভার উদ্দেশ্যে যাবার কালে পরিজনদের লক্ষ্য করে জানালেন ও' ডায়ার—'Good-bye ! I shall be back in time for tea at 5'o clock.'

অর্থাৎ, পাঁচটার সময় ফিরে এসে এখানেই তিনি চা খাবেন।

শুরু হল সভার কাজ। প্রথমেই উঠে দাঁড়ালেন লর্ড জেটল্যান্ড। লেডিজ এ্যান্ড জেন্টেলমেন...

সহসা কি দেখে চোখ দুটো ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠল উধম সিং-এর। কে? কে?

এইমাত্র কে এসে ঢুকল টিউডর রুমে! কে এই লোকটা?

মাইকেল ও'ডায়ার না?

হ্যাঁ, তাই তো! যাকে নিজের হাতে হত্যা করার একান্ত সাধ এতকাল ধরে তিনি মনে মনে পোষণ করে এসেছেন, সেই নররক্তলোভী মাইকেল ও' ডায়ারই তো এই মুহূর্তে তাঁর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে!

সঙ্গে সঙ্গে পকেটে হাত দিলেন উধম সিং। আজ কোথায় যাবে শয়তান?

কিন্তু না। অনেক দূর। ভিড় ঠেলে আস্তে আস্তে আরো খানিকটা এগিয়ে যাওয়া দরকার। নইলে ফস্কে যেতে পারে। না, সে সুযোগ ওকে দেওয়া হবে না।

সভা শেষ। এবার বিদায় নেবার পালা।

বিদায় নেবার পালাই বটে। কারণ, ইতিমধ্যেই ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে উধম সিং পোজিশন নিয়েছেন দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে। আর দেরি নেই। লগ্ন সমাগত। ঐ যে ও' ডায়ার চেয়ার ছেড়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে একটু একটু করে। আরো কাছে। আর একটু। হ্যাঁ, এবার হয়েছে।

সহসা রক্তে যেন আগুন ধরে গেল উধম সিং-এর।

পেয়েছি। দীর্ঘ-প্রতীক্ষার পরে আজ তোমাকে পেয়েছি। এবার তাকিয়ে দেখ যে, ভারতবাসী তার জাতীয় অবমাননার চরম প্রতিশোধ নিতে জানে কিনা!

বুঝি এক লহমার ব্যাপার, তারপর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই উধম সিং-এর হাতের রিভলবার সশব্দে গর্জে উঠল—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

এক গুলীতেই শেষ, তবু সব ক'টি গুলীই উধম সিং শেষ করলেন এক এক করে। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া ভালো।

শুরু হল হৈ-চৈ, চিৎকার আর চেঁচামেচি। সর্বনাশ! পালাও! বাঁচতে চাও তো এক্ষুণি পালাও এখান থেকে!

উধম সিং নির্বিকার। ধীর স্থির ভাবেই তিনি আত্মসমর্পণ করলেন শ্বেতাঙ্গ পুলিশের কাছে। জীবনের একমাত্র সাধ আজ এতদিন পরে তাঁর সার্থক হয়েছে। আজ তিনি সুখী, সার্থক ও বিজয়ী।

খবর শুনে সারা ভারতে সেদিন কি প্রচণ্ড আলোড়ন! সাবাস উধম সিং, সাবাস! তুমি দেখালে বটে! তোমার তুলনা নেই।

সত্যিই তুলনা নেই। কারণ, একটি গুলীও তাঁর ব্যর্থ হয়নি। সব ক'টাই কাজে লেগেছে। একটা পিঠে ঢুকে দেহের বাঁ-পাশ দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেছে। অন্যটা ঢুকেছে পেটে। দুটোই মারাত্মক।

পরদিনই উধম সিংকে হাজির করা হল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে। তারপর শুরু হল জেরা।

'কি নাম তোমার?'

বয়ে গেছে উধম সিং-এর জবাব দিতে। তাই সব কিছু উপেক্ষা করে তাকিয়ে রইলেন অন্যদিকে।

'কাগজ-পত্র থেকে জানা গেছে তোমার নাম রাম মহম্মদ সিং আজাদ। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। তাই কি?'

উধম সিং তেমনি নিঃশব্দ। যেন শুনতেই পাননি তিনি কোন কিছু।

শুরু হল তদন্ত। কে এই রাম মহম্মদ সিং আজাদ? কি তার পরিচয়?

পরিচয় জানা গেল কয়েক দিন বাদে। আসামী পাঞ্জাবের অধিবাসী। নাম—উধম সিং। তবে সচরাচর রাম মহম্মদ সিং আজাদ নামেই সে নিজের পরিচয় দিতে অভ্যস্ত। শুধু এখন থেকে নয়, অনেক দিন আগে থেকেই।

তাছাড়া আসামী সাময়িক উত্তেজনাবশত একাজ করেনি। বেশ বোঝা যায় যে, অনেকদিন ধরেই সে এ ব্যাপারে নিজেকে প্রস্তুত করছিল।

সোস্যালিস্ট পার্টির কর্মী হিসেবে ইতিপূর্বে জেলও খেটেছিল রাজ-দ্রোহকর বক্তৃতা দেবার অপরাধে। তবে এখানে নয়, ভারতে।

আবার উধম সিংকে কোর্টে হাজির করা হল এপ্রিল মাসের দুই তারিখে। তারপর শুরু হল প্রশ্ন।

'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, উধম সিং!'

'কে উধম সিং? আমি উধম সিং নই। আমার নাম রাম মহম্মদ সিং আজাদ।'

'কিন্তু আমরা জানি তোমার আসল নাম উধম সিং। নিজেকে সর্বত্র রাম মহম্মদ সিং আজাদ বলে পরিচয় দাও কেন?'

'আমার খুশি!'

'তবু সব কিছুর পেছনেই একটা যুক্তি থাকা উচিত?'

'যুক্তি আমারও আছে।'

'কি যুক্তি?'

'উধম সিং বলতে পাঞ্জাবী ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না। নিজেকে আমি ঐ ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে ইচ্ছুক নই। ভারতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন জাতির বাস। কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ শিখ, কেউ খ্রীস্টান, কেউ বা অন্য কোন ধর্মমতে বিশ্বাসী। রাম মহম্মদ সিং আজাদ নামটার মধ্যে আমি একটা সর্ব-ভারতীয় সমন্বয় খুঁজে পাই। তাই ও নামেই সর্বত্র নিজের পরিচয় দিয়ে থাকি।'

'তুমি দোষী, না নির্দোষ?'

'কেন, তাতে কোন সন্দেহ আছে নাকি?' হাসলেন উধম সিং।

'নিজের অপরাধের জন্য তুমি কি অনুতপ্ত?'

'নেভার!' গর্জে উঠলেন উধম সিং, 'কক্ষণো না। বিন্দুমাত্রও না।'

'তুমি যা বলছ, তা ভেবে-চিন্তে বলছ নিশ্চয়ই?'

'নিশ্চয়ই। আমি এতটুকুও দুঃখিত নই আমার কৃতকর্মের জন্য। ঐ লোকটার বিরুদ্ধে আমার চরম অভিযোগ জমা হয়েছিল অনেকদিন ধরে। সেদিক থেকে আমি ঠিকই করেছি।'

'তোমার এই স্বীকৃতির অর্থ কি জানো?'

'খুব জানি। মৃত্যুর জন্য আমি মোটেই পরোয়া করিনে। বুড়ো বয়েস পর্যন্ত বেঁচে থেকে কি লাভ! ঐ তো লর্ড জেটল্যাণ্ড! বুড়ো বয়েসে এখনো দিব্যি বেঁচে আছেন। কি লাভ! ভেবেছিলাম দুজনকেই মুক্তি দেব। ছুঁড়েও ছিলাম ওঁর পাকস্থলী লক্ষ্য করে একটা গুলী। দুর্ভাগ্য, বেঁচে গেলেন।'

২১শে এপ্রিল বো স্ট্রীট পুলিশ কোর্টে চার্জ আনা হল উধম সিং-এর বিরুদ্ধে। অপরাধ—ইচ্ছাকৃত নরহত্যা।

উধম সিং নির্বিকার। করুক না ওরা যত খুশি মামলা! আমি যা ভালো বুঝেছি—করেছি। ব্যস, ফুরিয়ে গেল।

দেশটা ভারত নয় বিলেত। তাই হত্যাপরাধে অভিযুক্ত আসামী হলেও একশ্রেণীর ইংরেজ অফিসার কিন্তু এই অসাধারণ বীরত্বের জন্য মনে মনে উধম সিংকে শ্রদ্ধা না করে পারেননি। তাঁদের একজন একদিন সেলে আবদ্ধ উধম সিংকে লক্ষ্য করে বললেন:

'কনগ্রাচুলেশন মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড। যেভাবে তুমি তোমার জাতীয় অবমাননার প্রতিশোধ নিয়েছ, তার জন্য মনে মনে আমি তোমাকে সত্যিই শ্রদ্ধা করি।'

'ধন্যবাদ!' হাসলেন উধম সিং।

'মনে হয় তোমার বিচার শেষ হতে অনেকদিন লাগবে।'

'কারণ? দেরির কি আছে, সবই তো পরিষ্কার!'

'নিজের জীবনের জন্য কি তোমার একবারও দুঃখ হয় না?'

'মোটেই না। কেন দুঃখ হবে? আমি যে দেখেছি আমার দেশের মানুষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনে উপবাসে নিঃশেষ হয়ে যেতে। না, আমি দুঃখিত নই। নিজের জন্য এতটুকুও দুঃখ হয় না আমার। আমি যা করেছি, ঠিকই করেছি। এ তো আমার মহান কর্তব্য। দেশের সম্মান রক্ষার্থে প্রাণ দেব, এ যে আমার পক্ষে আশাতীত সৌভাগ্য!'

কাজেও তাই হল। শেষপর্যন্ত ওল্ড বেইলী সেণ্ট্রাল ক্রিমিন্যাল কোর্ট রায় দিল—প্রাণদণ্ড।

আদেশ শুনে এতটুকুও মাথা নোয়ালেন না উধম সিং। কোনরকম ক্ষমা-ভিক্ষা নয়। তাঁর কাজ শেষ। এবার তাঁর ছুটি।

১৯৪০ সালের ১লা জুন বীরের মতোই বুক টান করে পেণ্টনভেলি জেলের ফাঁসিমঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালেন উধম সিং।

তখনো তাঁর মুখে সেই একই কথা—আমার প্রতিজ্ঞা আমি রক্ষা করেছি। এজন্য আমি গর্বিত।

নিজের কর্তব্য শেষ করে উধম সিং বিদায় নিলেন।

শ্রদ্ধায় মাথা নোয়াল সারা পঞ্চনদ। সারা বাংলা। সারা ভারতবর্ষ।

মাথা নোয়াল কোটি কোটি নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষ।

ধন্য উধম সিং, তুমি ধন্য! তোমাকে আমরা কোনদিনই ভুলব না।

সত্যিই ভোলেনি। তাই আজো বীর শহীদ উধম সিং-এর নামে লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী মানুষ মাথা নোয়ায় পরম শ্রদ্ধাভরে।

ভোলেনি অমর শহীদ মদনলাল ধিংড়াকেও। ধিংড়াই প্রথম শহীদ, যিনি সর্বপ্রথম ফাঁসিমঞ্চে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বিদেশের কারাগারে।

অগ্নিযুগের প্রথম পর্বের কথা।

কার্জন উইলি তখন ব্রিটিশ ভারতের সেক্রেটারী অফ স্টেটের রাজনৈতিক এ. ডি. সি.। সরকারী মতে তার কাজ হল বিলেতে অবস্থিত নেটিভ ছাত্রদের দেখাশোনা করা। আসল কাজ, তলে তলে গোয়েন্দাগিরি করা।

ভারতে অগ্ন্যুৎসব শুরু হয়ে গেছে। এর মধ্যেই তিনভাই দামোদর, বালকৃষ্ণ ও বাসুদেব ফাঁসির রজ্জুতে প্রাণ দিয়েছেন। প্রাণ দিয়েছেন বিনায়ক রাণাডে. প্রফুল্ল চক্রবর্তী, প্রফুল্ল চাকি, ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন, চারু প্রমুখ আরো কয়েকজন। কোথায় এর শেষ কে জানে! সুতরাং ভারতীয় ছাত্রদের ওপর কড়া নজর রাখা দরকার।

হাজার বাধা। হাজার বিধিনিষেধ। দেখে দেখে ক্রমশ মরিয়া হয়ে উঠলেন ধিংড়া। তারপর একদিন রক্তের অক্ষরে শপথ নিলেন,—ভারতবাসীর এই জাতীয় অবমাননার প্রত্যুত্তর আমি দেব।

১৯০৯ সালের ১লা জুলাই।

ন্যাশন্যাল অ্যাসোসিয়েশন-এর বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে লণ্ডনের জাহাঙ্গীর হল সেদিন বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারীর ভিড়ে জমজমাট। কার্জন উইলিও রয়েছেন তাদের মধ্যে।

গানের পালা শেষ। এবার শুরু হবে অন্য অনুষ্ঠান। কাজে কিন্তু তা আর হল না, মল্লিকা। তার আগেই আগুন ঝলসে উঠল ধিংড়ার হাতের আগ্নেয়াস্ত্রের মুখ দিয়ে—দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম !

বাধা দিতে এল লালকাকা নামে জনৈক রাজভক্ত পার্সী। ফলে, উইলির সঙ্গে সঙ্গে সেও শেষ।

১০ই জুলাই ধিংড়াকে হাজির করা হল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে।

প্রশ্নের উত্তরে আদালতে দাঁড়িয়ে ধিংড়া যে নির্ভীক উক্তি করেছিলেন, অগ্নিযুগের ইতিহাসে আজো তা অম্লান অক্ষয় হয়ে আছে. মল্লিকা। তিনি বলেছিলেনঃ

'জার্মানদের যেমন ব্রিটেন দখল করার অধিকার নেই. ব্রিটেনেরও তেমনি ভারতবর্ষ দখলের কোন এক্তিয়ার নেই। যে ইংরেজ আমার জন্মভূমি ভারতবর্ষকে অপবিত্র করতে চায়, তাকে হত্যা করা আমাদের কাছে ন্যায়ের নির্দেশ। ইংরেজের কপটতা, অশোভন মিথ্যাচার ও বিদ্রূপ-বর্ষী আচরণ দেখে আমি স্তম্ভিত।'

এখানেই থামেননি ধিংড়া। ওল্ড বেইলির আদালতে দাঁড়িয়ে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেনঃ

'I believe that a nation held down by foreign bayonets is in at perpetual state of War. Since open battle is rendered impossible to a disarmed race, I attacked by surprise; since guns were denied to me, I drew forth my pistol and fired.' [আমি বিশ্বাস করি যে, বিদেশী বেয়নেটের চাপে একটা জাতিকে দাবিয়ে রাখা মানে সেই জাতিকে নিয়ত যুদ্ধরত থাকতে বাধ্য করা। কিন্তু প্রকাশ্য যুদ্ধের সুযোগ নেই। কারণ, আইন করে আমাদের অস্ত্র অপহরণ করা হয়েছে। তাই আমি আচমকা আমার শত্রুকে আক্রমণ করেছি। বন্দুকের লাইসেন্স আমাকে দেওয়া হবে না, তাই এক্ষেত্রে গর্জে উঠেছে আমার গোপন পিস্তল।]

আরো বলেছিলেন ধিংড়াঃ

'The only lesson required in India at present is to learn how to die and the only way to teach it is by dying ourselves, therefore I die and glory is my martyrdom.' [ভারতবর্ষকে বর্তমানে কেবল একটি মাত্র শিক্ষাই গ্রহণ করতে হবে—সে হল মৃত্যুবরণের শিক্ষা, এবং সে শিক্ষা দেবার পদ্ধতি মাত্র একটি—নিজে মৃত্যুবরণ করে মৃত্যুভয়হীন হবার শিক্ষাদান। তাই আমি নিজে মৃত্যুবরণ করছি। আমার আত্ম-নিবেদন জয়যুক্ত হোক !]

সব শেষে বিধাতার কাছে জানালেন তিনি তাঁর অন্তিম প্রার্থনাঃ

'My only prayer to God is that I may be re-born of the same Mother and I may re-die for the same sacred cause till the cause is successful and she stands Free for the good of Humanity.' [আমার একমাত্র কামনা আমি যেন বার বার আমার গর্ভ-ধারিণীর বুকে জন্মগ্রহণ করে বার বার দেশোদ্ধারের সাধনায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করি—যতদিন না আমার ভারতভূমি সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে বিশ্বসভায় গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিতা হন।]

কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান।

কোথায় আজ ইংরেজ ! কোথায় তার সেই জগৎজোড়া সাম্রাজ্য ! কিছুই আজ অবশিষ্ট নেই।

ফাঁসির রজ্জু কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিলেও ধিংড়ার কাহিনী কিন্তু আজো অম্লান অক্ষয় হয়ে বেঁচে আছে ইতিহাসের পাতায়। শুধু স্বদেশেই নয়, বিদেশেও।

ঐতিহাসিক ডব্লিউ. এস. ব্লাণ্ট পর্যন্ত সেকথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন তাঁর 'মাই ডায়েরিজ' গ্রন্থের পাতায়। তিনি লিখেছেনঃ

'কোন ক্রিশ্চিয়ান শহীদই ধিংড়ার চাইতে অধিক নিঃশঙ্কতায় ও মাহাত্ম্যে বিচারকের সামনে দাঁড়াতে পারেননি। ধিংড়ার 'মৃত্যুদিন' ভারতবর্ষে আবহমানকাল শহীদ-তর্পণের সৌন্দর্যে পালিত হবে।....পৃথিবীখ্যাত রাজনীতিক নেতা লয়েড জর্জ পর্যন্ত চার্চিলের কাছে সেদিন বলেছিলেনঃ ধিংড়ার কোর্টে প্রদত্ত উক্তি দেশপ্রেমের শ্রেষ্ঠতম মাধুর্যে উজ্জ্বল। তার তুলনা চলে শুধু 'প্লুটার্ক'-এর মতো মৃত্যুঞ্জয়ী বীর্যবানের সঙ্গে।'

[My Diaries : Part III, P. 288]*

যাক, কামাখ্যা সেনের কথাতেই ফিরে যাই। সেদিন আততায়ীর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল পরদিন।

আশ্চর্য, প্রতিটি ব্যাপারে আগাগোড়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে এসে এ কাণ্ডের নায়ক কালীপদ মুখার্জী পরদিন ধরা পড়লেন কিনা সামান্য একটা টেলিগ্রাম করতে গিয়ে। অন্ততঃ সেদিনের পক্ষে তার ভাষাটা ছিল সত্যিই সন্দেহজনক। তাতে লেখা ছিলঃ

'কামাখ্যার অপারেশন সাকসেসফুল। চিন্তা করো না।'

সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়লেন কালীপদ মুখার্জী। সামান্য এই ভুলের জন্য শেষপর্যন্ত তিনি তাঁর প্রায়শ্চিত্ত করলেন ফাঁসির রজ্জুতে প্রাণ উৎসর্গ করে। সংবাদপত্রের ভাষায়ঃ

---

* বিপ্লবী নায়ক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়ের "ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব" গ্রন্থ থেকে তথ্য গৃহীত।

কালীপদ মুখুজ্যের ফাঁসি

'ঢাকা, ১৬ই ফেব্রুয়ারি, মুন্সিগঞ্জের স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কামাখ্যা প্রসাদ সেনকে হত্যা করার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কালীপদ মুখুজ্যেকে অদ্য প্রাতঃ ৬টার সময় ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত ২৭শে জুন তারিখে হত্যাকাণ্ড ঘটে। কালীপদর স্ত্রী একটি শিশুপুত্র প্রসব করিয়া গত ৭ই জানুয়ারি তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কালীপদ পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন।'

[আনন্দবাজার : ১৭. ২. ৩৩]

আরো একটি কিশোর বিপ্লবীকে এসময়ে প্রাণ উৎসর্গ করতে হল বরিশাল জেলের ফাঁসি-মঞ্চে। তিনি হলেন চরমুগুরিয়া অ্যাকশন মামলায় প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দী—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। তারিখটা ছিল ১৯৩২ সালের ২২শে আগস্ট।

২৮শে আগস্ট আক্রান্ত হলেন ঢাকার অ্যাডিশন্যাল এস. পি. মিঃ গ্রাসবী। তবে এই আক্রমণে তিনি শুধু একাই নন, গ্রাসবীর দেহরক্ষীর গুলীতে তরুণ বিপ্লবী বিনয় রায়ও আহত হয়ে ধরা পড়লেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মাথায় নিয়ে অবশেষে একদিন তিনি চলে গেলেন সুদূর আন্দামান দ্বীপের উদ্দেশ্যে। সঙ্গী হরিপদ আর কেশব রায় পুলিশের কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেলেন শেষপর্যন্ত।

২৮শে সেপ্টেম্বর স্ট্র্যাণ্ড রোডে আক্রান্ত হলেন স্টেটস্‌ম্যান-সম্পাদক মিঃ ওয়াটসন।

আশ্চর্য বরাত লোকটার! এর আগেও অফিসের সদর ফটকের সামনে একবার তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন মাত্র কিছুদিন আগে। কিন্তু লাভ হয়নি কিছুই। বরং আততায়ী যুগান্তর দলের একনিষ্ঠ কর্মী অতুল সেনকেই সেদিন চরম মূল্য দিতে হয়েছিল ঘটনাস্থলে পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে।

সামান্য আহত হয়ে এবারও তিনি বেঁচে গেলেন শেষপর্যন্ত, ঠিক চার্লস টেগার্টের মতোই। ইতিপূর্বে পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টের ওপরও কম আক্রমণ হয়নি। কিন্তু আশ্চর্য, প্রতিবারই তিনি বেঁচে গেছেন অদ্ভুত কপালজোরে। এ ব্যাপারেও ওদের দুজনের ভাগ্য যেন একই সূত্রে গাঁথা।

তবে শেষোক্ত আক্রমণের জন্য মূল্য দিতে হল আরো বেশি। ওয়াটসন আহত হলেও সম্মুখ-সংগ্রামে এপক্ষে প্রাণ দিলেন দলের দুজন নিরলস কর্মী অনিল ভাদুড়ী আর মণি লাহিড়ী। সাজাও হল কয়েকজনের।

তবে এরপরে কিন্তু আর এক মুহূর্তও দেরি করেননি ওয়াটসন। ভিলিয়ার্সের মতো তিনিও সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে সোজা বিলেতে। আর

বীরত্ব দেখিয়ে কাজ নেই বাপু! যথেষ্ট হয়েছে! এবার মানে মানে সরে পড়াই ভাল।

১৮ই নভেম্বর ঘায়েল হলেন রাজসাহীর জেল-সুপার মিঃ লিউক। ঘায়েল হলেন জেল-ফটকের কাছেই। সংবাদপত্রের ভাষায়ঃ

রাজসাহীর জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে গুলী

'অদ্য সায়াহ্নকালে রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ চার্লস লিউক তাঁহার স্ত্রী এবং কন্যার সহিত মোটর ভ্রমণে বাহির হইলে জেলের বাহিরে এবং রাজসাহী জেনারেল পোস্ট-অফিসের নিকট রাস্তার উপর তাঁহার উপর গুলী নিক্ষিপ্ত হয়।

তিনি ঘাড়ে এবং গালে তিনটি স্থানে জখম হইয়াছেন। তাঁহাকে একখানি ট্রেনে কলিকাতায় পাঠান হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।'

[আনন্দবাজারঃ ১৮. ১১. ৩২]

বিচারে দুঃসাহসী কিশোর ভোলানাথ কর্মকারের সাজা হল সাত বছরের কারাদণ্ড।

আবার মেদিনীপুর। আবার সেই বি. ভি.। আবার সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম।

ইতিমধ্যে দলে বেশ কিছুটা অদল-বদল ঘটেছে। আগে কখন, কাকে, কিভাবে আঘাত হানতে হবে, সে সব পরিচালনার দায়িত্ব ছিল মেজদা হরিদাস দত্ত, রসময় শূর, নিকুঞ্জ সেন, সুপতি রায় ও প্রফুল্ল দত্ত প্রমুখ অ্যাকশন স্কোয়াডের সদস্যদের ওপর। এককথায় তাঁরাই ছিলেন সেদিন বি. ভি.-র সমস্ত সংগ্রামের নেপথ্য-নায়ক।

অধুনা তার কিছুটা হের-ফের ঘটেছে।

প্রথমেই ধরা পড়লেন হরিদাস দত্ত। এতদিন গেরুয়া পরে, গলায় কণ্ঠি ধারণ করে বিশুদ্ধ 'গোবিন্দদাস বাবাজী' সেজে থাকলেও এবার আর তিনি কিছুতেই পারলেন না পুলিশের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে। গোবিন্দদাস বাবাজীকে চিনতে এবার আর এতটুকুও ভুল হয়নি তাদের।

পরবর্তী শিকার রসময় শূর। তিনিও একদিন ধরা পড়লেন আকস্মিক-ভাবে। প্রতিটি অ্যাকশন পরিচালনায় তাঁর স্থান ছিল পুরোভাগে। তাঁর গ্রেপ্তার নিঃসন্দেহে দলের ওপর একটা প্রচণ্ড আঘাত।

সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ, মেজর সত্য গুপ্ত, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ আগে থেকেই বক্‌সা দুর্গে বন্দী।

এবার ডাক এল সত্য বক্সীর। তারপর একে একে সুপতি রায়, নিকুঞ্জ সেন. প্রফুল্ল দত্ত, বীরেন গুহরায়, নীরদ দত্তগুপ্ত, কামাখ্যা ঘোষ প্রমুখ সবাই।

না, কাউকেই বাইরে থাকতে দেওয়া হবে না। একটি প্রাণীকেও না। তোমাদের চিনতে আর বাকী নেই।

এতকাল মেদিনীপুর কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব ছিল প্রফুল্ল দত্তর ওপর। এবার তাঁর সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করলেন যতীশ গুহ। সেই যতীশ গুহ যিনি পরবর্তীকালে সুভাষের অন্তর্ধানের ব্যাপারে জড়িত থাকার অপরাধে দিল্লী কোর্টে নীত হয়ে মিলিটারীর নির্মম অত্যাচারে শেষপর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

১৯৩৩ সাল। নেতৃবৃন্দ সবই প্রায় কারারুদ্ধ। তবু মেদিনীপুর সেই আগের মতোই বেপরোয়া। জবাব দিতে হবে। আরো শক্ত জবাব।

শাসক-সম্প্রদায়ও চুপ করে বসে নেই। মেদিনীপুরকে শায়েস্তা করার জন্য কতরকম বিধি-নিষেধ যে জারি করা হয়েছে, তার বোধহয় কোন আদি-অন্ত নেই। সংবাদপত্র থেকেই তার ছোট্ট একটি উদারহণ দিচ্ছি, শোনঃ

'মেদিনীপুর শহরে হুকুম হইয়াছে, রাত্রি ৮টার পর রাস্তায় বাহির হইলেই হাতে একটি করিয়া লণ্ঠন রাখিতে হইবে।

মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যালিটি কি রাস্তায় আলো দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন? অথবা পুলিশ কি কোন লণ্ঠন কোম্পানীর এজেন্সী লইয়াছে? ...শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে এই স্রেফ বেকুবীর অর্থ কি?

অর্ডিন্যান্সের বিশেষ ক্ষমতা হাতে পাইয়া পুলিশের কি মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিল?'

[আনন্দবাজার ঃ ২৮. ৭. ৩২]

পুলিশের না হলেও বিভিন্ন জেলা-শাসকদের কিন্তু সত্যিই সেদিন মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছিল, মল্লিকা। ভয়ে ত্রাসে প্রতিটি জেলা-শাসক তখন দিশেহারা। না, আমরা কিছুতেই কোয়ার্টার ছেড়ে বাইরে যেতে রাজী নই। অফিস থেকে ফাইলপত্র সব এখানে নিয়ে এসো। যা করার এখানে বসেই করব।

অবশেষে একদিন সবাই একযোগে চরমপত্র পেশ করলেন সরকার বাহাদুরের কাছে। চুলোয় যাক চাকরি। হয় আমাদের প্রাণরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা কর, নয়তো বিদেয় দাও, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই। শুধু শুধু এখানে থেকে গুলী খেয়ে মরতে আমরা রাজী নই।

অগত্যা ডাক পড়ল অতিরিক্ত সেনাবাহিনীর। যে করে হোক, বিপ্লবীদের দমন করতেই হবে। এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে কি লেখা রয়েছে, শোন ঃ

বাঙলায় বৈপ্লবিক বিভীষিকা

'বৈপ্লবিক আন্দোলনের ফলে বঙ্গদেশে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, ভারত সরকার তাহা বাঙলা সরকারের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। অনেক প্রকার বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও সরকারী কর্মচারীদের নিধন বন্ধ হয় নাই।...

ভারত সরকার বাঙলা সরকারের সহিত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, এই প্রদেশের সৈন্যসংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এই সিদ্ধান্ত

অনুসারে ছয়দল ভারতীয় পদাতিক এবং ইংরেজ পদাতিক বঙ্গদেশে যাইবে এবং যতদিন আবশ্যক, ততদিন তথায় থাকিবে।'

[আনন্দবাজার : ১৯. ৮. ৩২]

তবু ভয় যায় না শ্বেতাঙ্গ-শাসকদের। না, কাউকেই বিশ্বাস নেই। বিশেষ করে ঐ স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের। ওদের অসাধ্য কিছু নেই। ওরা সব পারে।

কথাটা মিথ্যে নয়, মল্লিকা। এ প্রসঙ্গে বিদায়ী পুলিশ কমিশনার সেই চার্লস টেগার্ট বিলেতে ফিরে গিয়ে কি বলেছেন, শোন:

সমস্ত স্কুল-কলেজে বিপ্লবীদের আড্ডা

'লণ্ডন, ১লা নভেম্বর। রয়েল এম্পায়ার সোসাইটির এক সভায় স্যার চার্লস টেগার্ট ভারতবর্ষে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন যে, যদি একথা বলা যায় যে, এমন কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নাই, যেখানে প্রধান প্রধান নেতাদের অধীনে কোনও একজন বিপ্লবী নাই, তবে নিশ্চয়ই অতিরঞ্জন করা হইবে না। ইহার ফল হইতেছে এই যে, এই সমস্ত নেতার আদেশক্রমে যুবকগণ হত্যা করিতেছে এবং পুলিশ এই সমস্ত যুবকদিগের সন্ধান পাইতেছে না।...'

[আনন্দবাজার : ৩. ১১. ৩২]

তবু মেদিনীপুরের সেই একই চেহারা। আসুক না সেনাবাহিনী! আসুক ব্রিটিশ ফৌজ! কি করবে ওরা! গুলী করবে! ফাঁসি দেবে! দিক না! তা বলে আমরা পিছিয়ে যাব! কক্ষণো না। জবাব আমরা দেবই।

কিন্তু কাকে জবাব দেবে! লোক কোথায়! পেডি, ডগলাস দুজনেই শেষ। চেয়ার যে খালি!

সত্যিই তাই মল্লিকা। সে কি শোচনীয় অবস্থা সেদিন শাসক সম্প্রদায়ের! কেউ মেদিনীপুর যেতে রাজী নয়। সবার মুখেই এক কথা। কোথায় যাব! মেদিনীপুর! মাই গড! জানো তো ওদের প্রতিশ্রুতির কথা! ওখানে গিয়ে শেষে কি বেমক্কা গুলী খেয়ে মরব নাকি! কাজ নেই বাপু অত বীরত্ব দেখিয়ে!

এখন উপায়! এ যে প্রেস্টিজ নিয়ে টানাটানি! খোঁজ! খোঁজ! খোঁজ! যে করে হোক, একজন শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেট খুঁজে বের কর। নইলে মুখ দেখানো যে ভার হবে!

কিন্তু সব বৃথা। 'No young whitemen volunteered to come down to Midnapore to take charge of this district.'

অনেক চেষ্টা, অনেক সাধ্য-সাধনার পরে অবশেষে যাঁকে পাওয়া গেল, তিনি হলেন মিঃ বার্জ।

সুতরাং, এবার তোমার পালা মিঃ বার্জ। জানি, কাজটা সহজ নয়।

জানি, পর পর দুজনকে হারিয়ে তোমরা আগের চাইতে অনেক বেশি সতর্ক হয়ে উঠেছ। সশস্ত্র প্রহরার ব্যবস্থাও করেছ ব্যাপকভাবেই। তা, উপায় কি! মরতে আমরা কোনদিন ভয় পাইনে। না হয় আর একবার তার প্রমাণ দেব। তা বলে রক্তের অক্ষরে লেখা সংকল্প তো আর ব্যর্থ হতে পারে না!

চেষ্টা করা হল এপ্রিলেই, কিন্তু সংস্কারবশত সারাটা মাস বীরপুঙ্গব এমনভাবে আত্মগোপন করে রইলেন যে, কিছুতেই তাঁর নাগাল পাওয়া গেল না।

বাধ্য হয়েই তখন কয়েকমাস অপেক্ষা করতে হল মেদিনীপুরকে। উদ্যোগ-আয়োজন সবই প্রস্তুত। শুধু সুযোগের অপেক্ষা মাত্র।

সুযোগ পাওয়া গেল ১৯৩৩ সালের ২রা সেপ্টেম্বর।

স্থান, পুলিশ গ্রাউন্ড। মহামেডান ক্লাব ভার্সাস টাউন ক্লাবের খেলা। শ্বেতাঙ্গদের মধ্যেও কেউ কেউ অংশ গ্রহণ করবেন সে খেলায়। তাই মাঠের সর্বত্র প্রহরার ব্যবস্থা।

তাছাড়া মাঠের একদিকে জেলখানা, অন্যদিকে পুলিশ আর্মারী। কার সাধ্য তাদের বেষ্টনী ভেদ করে মাঠে প্রবেশ করে!

অসাধ্য বলে কোন শব্দ বিপ্লবীর অভিধানে নেই। তাই পুলিশের দুর্ভেদ্য বেড়াজাল ভেদ করে কখন যে দুটি মৃত্যুপাগল কিশোর মাঠে ঢুকে পড়ে জনতার ভিড়ে মিশে গেলেন, কেউ তা টেরই পেল না।

জোন্স, লিনটন, স্মিথ, জঙ্গী কাপ্তান প্রভৃতি আগেই এসে গিয়েছে। এবার এলেন বার্জ। হাজার হোক সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট! তাই দেখতে দেখতেই বেশ একটু ভিড় জমে উঠল বার্জের গাড়িটার চারপাশে।

সঙ্গে সঙ্গে পোজিশন নিলেন বি. ভি.-র দুই মৃত্যুঞ্জয়ী কিশোর, অনাথ পাঁজা আর মৃগেন দত্ত। অনাথ রইলেন পশ্চিম দিকে, আর উত্তর দিকে মৃগেন।

বার্জ তখনো নামেননি গাড়ি থেকে। তবে নামব-নামব করছেন। ঐ যে তিনি মাটিতে পা রেখেছেন দুজন সশস্ত্র দেহরক্ষী সঙ্গে নিয়ে। রেডি!

বুঝি এক লহমার ব্যাপার, তারপরই হঠাৎ পশ্চিম দিক থেকে অনাথের পিস্তল গর্জে উঠল—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিক থেকে মৃগেনের রিভলবার সাড়া দিল দিক্‌বিদিক কাঁপিয়ে—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

দৌড়! দৌড়! দৌড়! শুরু হল দৌড় প্রতিযোগিতা। সবার আগে সেই জঙ্গী কাপ্তান। পেছনে স্মিথ, লিনটন, জোন্স প্রভৃতি সবাই। কথায় বলে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম! তাই দৌড়ে গাড়িতে উঠে নিমেষে মাঠ ছেড়ে সব হাওয়া।

দ্রাম! দ্রাম! না, আর পালানো সম্ভব হল না জোন্স সাহেবের। গুলীর আঘাতে ঠ্যাং ভেঙে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বসে পড়লেন মাঠের ওপর।

আর অনাথ! অনাথ তখন কি করলেন ভাবতে পার, মল্লিকা!

না, একবারও তিনি চেষ্টা করলেন না পলায়নপর জনতার মধ্যে মিশে যেতে। বরং বার্জকে ভূলুণ্ঠিত দেখে সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুরন্ত আক্রোশে

চেপে বসলেন তাঁর বুকের ওপর। তারপরই পিস্তলের সব ক'টা গুলী উজাড় করে দিলেন এক এক করে। শত্রুর শেষ রাখতে নেই।

ওদিকে ততক্ষণে তৎপর হয়ে উঠেছে রক্ষীদল। হাতে তাদের উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র।

ভ্রূক্ষেপও নেই অনাথ বা মৃগেনের। তাঁদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। করুক না এবার ওরা যা খুশি! এখন তো শুধু যাবার অপেক্ষা মাত্র।

দ্রাম! দ্রাম! সঙ্গে সঙ্গে বীর কিশোরদ্বয় লুটিয়ে পড়লেন শক্ত মাটির বুকে। সারা মুখে তাঁদের বিজয়ীর হাসি। কোন ক্ষোভ বা দুঃখের চিহ্নও নেই সেখানে।

কেনই বা থাকবে! মৃত্যু তো তাঁদের কাছে একটা খেলামাত্র। 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান'—কবির এই উক্তি তো একমাত্র তাঁদের মুখেই সাজে।

রক্তস্নাত মেদিনীপুর। পাশাপাশি শায়িত তিনটি প্রাণহীন দেহ। সবার রক্তই সমান লাল। সেখানে শাসক আর শোষিতের মধ্যে কোন তফাত নেই।

ব্যর্থতার জ্বালায় এবার যেন উন্মাদ হয়ে গেল শাসক-সম্প্রদায়। প্রথমে পেডি, তারপর ডগলাস, সবশেষে বার্জ। না, আর কোন কথা নয়। জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে এবার শেষ করে দাও মেদিনীপুরকে।

কাজেও ওরা তাই করেছিল, মল্লিকা। নিপীড়নে, নিষ্পেষণে, অত্যাচারে উৎপীড়নে, দানবিক প্রতিহিংসার যে বীভৎস তাণ্ডবে সারা মেদিনীপুরের আকাশ-বাতাস সেদিন মথিত হয়েছিল, মধ্যযুগের বর্বরতাকেও বুঝি তা হার মানায়।

শুধু কি দৈহিক অত্যাচার! নিরপরাধ জনসাধারণের বাড়ি-ঘর-দুয়ার সব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে একেবারে একাকার।

অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে কত লোক যে সেদিন মেদিনীপুর ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিল, তার বোধহয় কোন গোনাগুন্তি নেই।

বল, ওরা কোথায় আছে? তোমাদের পুরস্কার দেব। আড়াই হাজার, পাঁচ হাজার, দশ হাজার...যা চাও। শুধু ওদের আস্তানাটা কোথায় বল! কি বললে! জানো না! ওসব বাজে কথা। ভাল চাও তো এখনো বল! নইলে...

নইলে তার পরিণাম কি, তার একটা প্রমাণ দেখতে চাও, মল্লিকা? প্রমাণ—সন্তোষ বেরা। পুলিশের নির্মম অত্যাচারে মৃত্যুর কোলে নিজেকে বিলিয়ে দিলেন এই সন্তোষ বেরা, তবু একটি কথাও তিনি প্রকাশ করলেন না শেষপর্যন্ত। দেশ ও জাতির জন্য এ আত্মত্যাগের তুলনা কোথায়, বল?

ঠিক এমনি করেই চলে গেলেন বি. ভি.-র আরো একজন অনমনীয় তরুণ—নবজীবন ঘোষ। গোপালনগর থানায় তিনি ছিলেন অন্তরীণ বন্দী। সেই অন্তরীণ অবস্থাতেই পুলিশের অমানুষিক প্রহারে তিনি একদিন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

এখানেই শেষ নয়। ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে জারি হল কারফিউ আইন।

সেই সঙ্গে শুরু হল শহরের বিশিষ্ট নাগরিকদের রাতারাতি নোটিশ দিয়ে জেলা থেকে বহিষ্কারের পালা।

শ্রদ্ধেয় মন্মথ দাস, চারুচন্দ্র দাস, যতীন্দ্রনাথ দাস, জওহরলাল অধিকারী, ষতীশ গুপ্ত, চিত্তরঞ্জন দাস, রামমোহন সিংহ, বিনয়জীবন ঘোষ, নারায়ণ মুখার্জী, প্রমথ ব্যানার্জী, নরেন্দ্রনাথ দাস, অম্বিকাপ্রসন্ন সেন, শচীন সেন, সত্যেন্দ্রনাথ সেন, কিশোরীপতি রায়, সাতকড়িপতি রায় প্রমুখ কাউকেই রেহাই দেওয়া হল না সেই সরকারী নির্দেশের আওতা থেকে। দেশপ্রেমের মাশুল দিতে গিয়ে সবাইকে সেদিন পথে দাঁড়াতে হল পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে।

বার্জ-হত্যাকে কেন্দ্র করে সেদিন মেদিনীপুরের ওপর দিয়ে যে কি উন্মত্ত প্রতিহিংসার ঝড় বয়ে গিয়েছিল, শ্রদ্ধেয় নরেন দাস রচিত 'History of Midnapore' গ্রন্থ থেকে তার সামান্য একটু নজীর এখানে তুলে দিচ্ছি, মল্লিকা।

'...The authorities [Midnapore] at the instigation of the European Association became mad with vengeance. 'Midnapore should be taught a lesson' was the cry of the white people in India. Throughout the length and breadth of the country the White Press publicly demanded persecution of the people of Midnapore. The Anglo-Indian Press particularly the 'Statesman' and the 'Englishman' publicly asked the Government to bring the leaders of the movement and shoot them down publicly without any trial.' [মেদিনীপুরের সরকারী কর্তাদের ওপর ইউরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশন থেকে চাপ এল, জিঘাংসায় উন্মত্ত হয়ে অত্যাচার চালিয়ে যাও।...মেদিনীপুরকে শিক্ষা দিয়ে ছাড়...মেদিনীপুরকে পিষে ফেল। সরকারের কাছে স্টেটস্‌ম্যান, ইংলিশম্যান কাগজগুলির খোলাখুলি দাবী—গুপ্ত সমিতির নেতাদের ধরে এনে বিনাবিচারে গুলী করে মেরে ফেল।]

ঘটনার দিনই গ্রেপ্তার করা হল নির্মলজীবন ঘোষ, রামকৃষ্ণ রায়, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, সনাতন রায়, সুকুমার সেন, কামাখ্যা ঘোষ, নন্দদুলাল সিংহ প্রমুখ আদর্শবান যুবকবৃন্দকে।

তারপরই শুরু হল মামলা। সাক্ষী-সাবুদও সংগ্রহ করা হল কিছু কিছু। এমন কি, রাজসাক্ষীরও অভাব হল না। মিরজাফর সব দেশেই আছে এবং থাকবেও। এক্ষেত্রে যিনি রাজসাক্ষীরূপে মিরজাফরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন—নাম তাঁর শৈলেশচন্দ্র ঘোষ।

কিন্তু তখনকার দিনের বাঘা বাঘা সব আইনজীবী—বীরেন্দ্র শাসমল, জে. সি. গুপ্ত, নিশীথ সেন প্রমুখের বুক-কাঁপানী জেরার সামনে ওসব রেডিমেড সাক্ষী আর কতক্ষণ! ঝড়ের মুখে খড়-কুটোর মতোই তারা সব উড়ে গেল একে একে। দেখা গেল আগাগোড়া সবটাই সাজান ব্যাপার। এমন কি, রাজসাক্ষী শৈলেশ ঘোষের উক্তিও আগাগোড়া পরস্পর-বিরোধী। কোন

কথার সঙ্গেই পরবর্তী কোন কথার মিল নেই। প্রমাণও নেই।

গভীর আত্মপ্রত্যয়ের হাসি হাসলেন আইনজীবীবৃন্দ। স্রেফ বাজে মামলা। অত্যন্ত কাঁচা গাঁথুনি। আসামীদের বেকসুর খালাস দেওয়া ছাড়া এক্ষেত্রে আর কোন উপায় নেই।

তাছাড়া আসামীরা বার্জ-হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এমন কোন প্রমাণও নেই। কোন বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্রও পাওয়া যায়নি তাদের কাছে। এ অবস্থায় বেকসুর খালাস দেওয়া ছাড়া আর কোন পথই খোলা নেই আদালতের সামনে।

যথাসময়ে রায় দিলেন ট্রাইবিউন্যালের চেয়ারম্যান মিঃ এইচ. জি. ওয়েট।

কিন্তু একি! ফাঁসির হুকুম হয়েছে নির্মলজীবন ঘোষ, রামকৃষ্ণ রায় আর ব্রজকিশোর চক্রবর্তীর। সনাতন রায়, কামাখ্যা ঘোষ, সুকুমার সেন, আর নন্দদুলাল সিংহকে দেওয়া হয়েছে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। শান্তিগোপাল সেনকেও যাবজ্জীবন দণ্ড দেওয়া হয়েছে অনুরূপ অন্য একটি মামলার সৃষ্টি করে।

সংবাদপত্রের ভাষায়ঃ

তিনজনের প্রাণদণ্ডঃ চারিজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

বার্জ-হত্যার মামলার রায়

'মেদিনীপুর ১০ই ফেব্রুয়ারী, অদ্য স্পেশাল ট্রাইবিউন্যালের কমিশনারগণ বার্জ-হত্যা ষড়যন্ত্র মামলার রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

আসামী (১) নির্মলজীবন ঘোষ, (২) ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, (৩) রামকৃষ্ণ রায়—এই তিনজনের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

(১) কামাখ্যা ঘোষ (২) নন্দদুলাল সিংহ, (৩) সনাতন রায় এবং (৪) সুকুমার সেন—এই চারিজনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইয়াছে।

আসামী (১) মণীন্দ্র চৌধুরী, (২) পূর্ণানন্দ সান্যাল, (৩) বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ, (৪) সরোজদাস কানুনগো—এই চারিজনকে মুক্তিপ্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাদিগকে মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গীয় বিপ্লব-দমন আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

রাজসাক্ষী শৈলেশচন্দ্র ঘোষকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে।

মিঃ এইচ. জি. ওয়েট (প্রেসিডেণ্ট), মিঃ টি. এন. বসু ও রায়বাহাদুর এস. পি. ঘোষকে লইয়া স্পেশাল ট্রাইবিউন্যাল গঠিত হইয়াছিল।'

[আনন্দবাজারঃ ১১. ২. ৩৪]

ধিক্কার উঠল বাংলার গোটা আইনজীবী-মহলে।

এই কি আইন! এই কি বিচার! এ যে কাজীর বিচারকেও হার মানায় দেখছি! জুরির বিচার হলে কক্ষণো এমন হতে পারত না।

কে শুনবে সেকথা! শুনবেই বা কেন? শাসকদের ইজ্জত রাখতে হবে তো! সুতরাং বাগে যখন পাওয়া গেছে, তখন সাতকড়িকে না পাওয়া গেলে পাঁচকড়ি আর দুকড়িকে এনে একসঙ্গে ঝুলিয়ে দাও।

মল্লিকা, যে ব্রিটিশ প্রেস্টিজের নাম ছিল জগৎ-জোড়া, সেদিন এই ছিল তাদের ন্যায়-বিচারের আসল রূপ। অন্তত দেশপ্রেমিক তরুণদের ক্ষেত্রে কোথাও তাদের এ হেন ন্যায়-বিচারের বড় একটা ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা যায়নি।

১৯৩৪ সাল। ২৫শে অক্টোবর। ভোর সাড়ে পাঁচটা।

বীরদর্পে ফাঁসি-মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন মেদিনীপুরের দুই সিংহ শিশু রামকৃষ্ণ রায় আর ব্রজকিশোর চক্রবর্তী। কিসের শঙ্কা! কিসের ভয়! শহীদ প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের স্পর্শধন্য এই বধ্য-মঞ্চ তো তাঁদের কাছে তীর্থভূমি!

পরদিন নির্মলজীবন ঘোষ। আজ তাঁর যাবার পালা।

সেই একইভাবে ফাঁসি-মঞ্চে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন বীর বালক নির্মলজীবন ঘোষ।

সহকর্মী রামকৃষ্ণ ও ব্রজকিশোর আগেই শহীদ-তীর্থে চলে গেছেন। এবার তাঁকেও যেতে হবে।

কোন দুঃখ নেই। কোন ক্ষোভ নেই। হাত বাড়ালেই স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। তার জন্য মূল্য দিতে হয়। এমনি করে কতজনই তো মূল্য দিয়েছেন। তাহলে দুঃখ কিসের!

আর শৈলেশ ঘোষ! মেদিনীপুরের এতগুলো তরুণের মৃত্যুর জন্য যিনি দায়ী, তাঁর কি হল!

না, ইংরেজ সরকার বেইমান নয়। অন্তত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সেদিন যারা মিরজাফরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল, তাদের প্রতি কোন-দিনও তারা বেইমানী করেনি। তাই সংগে সংগেই তারা তাঁকে বিলেতে পাঠিয়ে দিয়েছিল সরকারী খরচে। যাও, মানুষ হয়ে ফিরে এস।

ফিরে তিনি যথাসময়েই এসেছেন। কেনই বা আসবেন না! আজকের সমাজে শৈলেশ ঘোষদেরই তো জয়জয়কার!

১৯৩৪ সালের ২রা জুলাই আরো একটি বিপ্লবী তরুণকে প্রাণ দিতে হল শ্রীহট্ট জেলের ফাঁসি-মঞ্চে। তিনি হলেন ইটাখোলা অ্যাকশন মামলায় প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দী, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের বিজ্ঞান-বিভাগের ছাত্র অসিত ভট্টাচার্য।

হাজার আবেদন করা সত্ত্বেও ফাঁসির পরে তাঁর মৃতদেহ তাঁর আত্মীয়-স্বজনের হাতে দেওয়া হয়নি। বাঙালীকে আর বিশ্বাস নেই এমন নির্বিকার চিত্তে যারা একের পর এক হাসতে হাসতে ফাঁসি-মঞ্চে প্রাণ দিতে পারে, তাদের হাতে শহীদের মৃতদেহ ছেড়ে দেওয়া আর কোনদিক থেকেই নিরাপদ নয়। ঐ একটি অসিতের মধ্য থেকেই যে তখন হাজার হাজার অসিত জন্ম নেবে না, তা কে বলতে পারে!

ঐ একই মামলায় বিরাজ দেব, বিদ্যাধর আর গৌরাঙ্গ দাসকে দেওয়া হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

ইংরেজ ভয় পেলেও ভরসা হারাবার জাত নয়। তাই বিপ্লব দমনে ব্যর্থ হয়ে এবার তারা বাংলার মসনদে এনে হাজির করল মহামান্য রাজপুরুষ স্যার জন অ্যাণ্ডারসনকে।

সোজা লোক নন এই অ্যান্ডারসন। আয়ারল্যান্ডের সিন্ ফিন্ আন্দোলনের মোকাবিলা করতে গিয়ে ইতিপূর্বে তিনি যে ব্ল্যাক অ্যান্ড ট্যান নীতির প্রবর্তন করেছিলেন, তাতে ধন্য ধন্য পড়ে গিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী মহলে।

হ্যাঁ, শাসক বটে! এই তো চাই! বাংলাদেশকে শায়েস্তা করতে হলে এমনি শাসকই তো আজ সর্বাগ্রে প্রয়োজন! দেখা যাক, এবার কত শক্তি ধরে মেদিনীপুর, কত প্রাণ আছে বাংলায়, আর কত সাহস আছে এই ভারতবর্ষের!

চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন বি. ভি.-র নেতৃবৃন্দ। তাই হোক। প্রমাণ হয়ে যাক যে, কত শক্তি ধরে মেদিনীপুর, কত প্রাণ আছে বাংলায়, আর কত সাহস আছে এই ভারতবর্ষের!

সংখ্যায় আমরা মুষ্টিমেয়। অস্ত্রবলও আমাদের সামান্য। কিন্তু শত্রুর বিরুদ্ধে ন্যায়যুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্ভর করে শুধু সংখ্যায় বা অস্ত্রবলের প্রাবল্যে নয়, প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে। সেই প্রাণশক্তি বাংলাদেশের আছে কিনা হাতে হাতেই তার প্রমাণ হয়ে যাক!

শাসকরূপে অ্যান্ডারসনকে কাছে পেয়ে সে কি আস্ফালন তখন বেংগল চেম্বার অফ কমার্স, ইয়োরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশন, স্টেটস্ম্যান, ইংলিশম্যান প্রমুখ সরকারী মুখপত্রগুলির! 'No track with the terrorists. Give the dog a bad name to hang him. If another European was murdered detenus should be shot.'

একই সুরে সুর মেলাল খয়ের খাঁ ও একান্ত রাজভক্তের দল। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের তথাকথিত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহ।

এমন কি, দেশের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরাও বাদ গেলেন না। বাধ্য হয়ে তাঁরাও তখন বিবৃতি দিতে শুরু করলেন অ্যান্ডারসনী চাপের কাছে নতি-স্বীকার করে।

ওরা সন্ত্রাসবাদী। দেশে সন্ত্রাস সৃষ্টি করাই ওদের একমাত্র কাজ। ওরা আমাদের কেউ নয়। ওদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই আমাদের।

পরাধীনতার অভিশাপ বুঝি একেই বলে, মল্লিকা। নইলে দেশের মুক্তির জন্য যাঁরা সবচাইতে বেশি প্রাণ দিয়েছেন, সবচাইতে বেশি নির্যাতন সহ্য করেছেন—শুধু শাসকদের বিচারে নয়, দেশবাসীর চোখেও তাঁরা হলেন কিনা সন্ত্রাসবাদী! অর্থাৎ, দেশের স্বাধীনতা তাঁদের লক্ষ্য নয়, তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হল দেশব্যাপী অরাজকতা সৃষ্টি করা।

যাক, অ্যান্ডারসনের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। জবরদস্ত শাসক অ্যান্ডারসন। তাই মসনদে বসেই তিনি কাজে হাত দিলেন অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে। যে করে হোক, বিপ্লবীদের নিশ্চিহ্ন করা চাই।

শুধু আঘাত আর নির্যাতনের পথে পা বাড়ালেই হবে না। বিপ্লবীদের সমূলে উৎখাত করতে হলে সেই সঙ্গে দেশের যুব-শক্তির চরিত্র হনন করে চিরকালের মতো তাদের পঙ্গু করে দিতে হবে।

ইংরেজ শাসনের মূলনীতিই হল ডিভাইড অ্যান্ড রুল। অর্থাৎ, এক-

পক্ষকে শায়েস্তা করার জন্য অপরপক্ষকে মাথায় তুলে আস্কারা দেওয়া।

এখানেও তার ব্যতিক্রম হল না। প্রধানতঃ মুসলমান সম্প্রদায়ের যত সব সমাজ-বিরোধী দুর্বৃত্তদের প্রচুর উৎকোচে বশীভূত করে প্রথমেই গাঁয়ে গাঁয়ে তৈরী করা হল ভিলেজ গার্ড বাহিনী। অর্থাৎ, এখন থেকে তোমরাই হলে গাঁয়ের মাতব্বর।

এবার ওদের দিকে একটু ভাল করে নজর রাখ। সন্দেহজনক কিছু দেখলেই ধরিয়ে দাও। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কার।

ভিলেজ গার্ড! বেশ গাল-ভরা নাম। তা বলে তাদের আসল স্বরূপটি কিন্তু সেদিন দেশের মানুষের কাছে অজানা ছিল না, মল্লিকা। এই ভিলেজ গার্ড প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার কি বলেছেন, শোন ঃ

'Sir John Anderson, the Governor of Bengal, set up a number of 'Village guards' to keep watch over the revolutionaries.' [History of Freedom Movement—Vol. III, P. 511]

কথায় বলে, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়! এখানেও তাই হল। ভিলেজ গার্ড তো নয়, যেন দারোগার বাবা!

সরকারী হুকুমে হিন্দু ছেলেদের ওপর খবরদারি করার সুযোগ পেয়ে সে কি হম্বি-তম্বি তখন এক এক জনের! এই কর, ঐ কর, এসব চলবে না—এমনি ধারা হুকুম যেন লেগেই আছে সর্বক্ষণ। ফলে, অনিবার্যভাবেই একদিন ঘোর সংঘর্ষ বেধে গেল নারায়ণগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠে দেওভোগ গ্রামে।

১৯৩৪ সাল। ১০ই এপ্রিল।

রাত তখন অনেক। চারিদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। দু'হাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যায় না।

অতি সন্তর্পণে গাঁয়ের পথ ধরে হেঁটে চলেছেন বি. ভি.-র নেতৃস্থানীয় কর্মী সুকুমার ঘোষ, মধু ব্যানার্জী আর এ গাঁয়েরই অতি বিশ্বস্ত কর্মী মতি মল্লিক। কথাবার্তা শেষ হয়েছে। এবার সুকুমার ও মধু ব্যানার্জী ফিরে যাবেন নারায়ণগঞ্জের আস্তানায়।

হঠাৎ বিপর্যয় ঘটে গেল। কোথা থেকে ভিলেজ গার্ড বাহিনীর বড়কর্তা রমজান মিঞা এসে তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দলবল নিয়ে। না, কাউকেই ছাড়া হবে না। আমি হাবিলদার সাহেব রমজান মিঞা। আমার হুকুমে তোমাদের সবাইকে 'গিরেপতার' করা হল।

অ্যাণ্ডারসনী আইনে কারো কাছে অস্ত্র প্যাওয়া গেলে তার একমাত্র শাস্তি ছিল—প্রাণদণ্ড। সুতরাং আত্মসমর্পণের কোন প্রশ্নই ওঠে না। ফলে, শুরু হল তুমুল সংঘর্ষ। দুপক্ষই সমান শক্তিশালী। কেউ কাউকে ছাড়তে রাজী নয়।

দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! সহসা এক সময়ে রিভলবার গর্জে উঠল দিক্‌বিদিক্ কাঁপিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে হাবিলদার সাহেবের প্রাণহীন দেহটা লুটিয়ে পড়ল শক্ত মাটির বুকে। সেই ফাঁকে সুকুমার আর মধু ব্যানার্জী যে কোথায় সরে পড়লেন তার কোন হদিসই পাওয়া গেল না।

এড়াতে পারলেন না মতি মল্লিক। শত্রুর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে করতে কখন যে তিনি বড় রাস্তা থেকে গড়িয়ে অনেকটা নিচে একটা খালের মধ্যে পড়ে গেছেন, সুকুমার বা মধু তা আদৌ বুঝতে পারেননি। বুঝতে পেরেছিলেন অনেকটা পরে। সিংহ-শাবক তখন শৃঙ্খলাবদ্ধ।

খবর শুনে হৈ-চৈ পড়ে গেল শাসক-মহলে।

বলে কি! শেষে কিনা স্বয়ং অ্যান্ডারসন সাহেবের পোষ্যপুত্র রমজান হাবিলদার নিহত! এ যে ভয়ঙ্কর কথা! এখন উপায়!

একজন অবশ্য ঘটনাস্থলেই ধরা পড়েছে, কিন্তু বাকি সবাই কোথায় গেল! কি তাদের নাম! হাজার নির্যাতনেও যে আসামী এ বিষয়ে মুখ খুলতে রাজী নয়। কি করা যায় এখন!

শেষপর্যন্ত ধরে বসল মতি মল্লিকের বাবা রাজকুমার মল্লিককে। ছেলেকে আপনি সব কথা খুলে বলে রাজসাক্ষী হতে বলুন। কথা দিচ্ছি. সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাকে বিলেত পাঠিয়ে দেব পড়াশুনা করার জন্য। আর সেই সঙ্গে আপনাকে দেব নগদ দশ হাজার টাকা।

—বলেন কি! যেন আকাশ থেকে পড়লেন রাজকুমার মল্লিক। বাপ হয়ে ছেলেকে আমি বেইমানী করতে শেখাব! মাপ করবেন, একাজ আমার দ্বারা কোনমতেই সম্ভব নয়।

—তাহলে ছেলেকে ফাঁসি-কাঠে ঝুলতে হবে।

—সবই তাঁর ইচ্ছা। সহসা কার উদ্দেশ্যে দুহাত জোড় করে প্রণাম করে বললেন রাজকুমার মল্লিক, তাঁর মনে কি আছে তিনিই জানেন। তা বলে জেনে-শুনে অধর্ম করব! অসম্ভব। বরং আজ থেকে মনে করব যে, ছেলেকে আমি দেশের কাজে বলি দিয়েছি, তবু অধর্মের কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

গল্প নয় মল্লিকা, রূপকথাও নয়। সাধারণ একজন ব্যবসায়ী। লেখাপড়া সামান্য জানেন। তবু সন্তানের নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও তিনি অন্যায়ের সঙ্গে আপস করতে রাজী হলেন না। একমাত্র অধর্মের ভয়ে! এই ছিল সেদিনের মানুষের চরিত্র।

আর আজ!

যেদিকে তাকানো যায় শুধু লোভ আর স্বার্থপরতা। অন্যায় আর অবিচার। ক্ষুদ্রতা আর হীনতা। বস্তুত, লোভ ও স্বার্থের বশবর্তী হয়ে আজকের মানুষ নির্বিকার চিত্তে যা করতে পারে, সেদিনের পরাধীন দেশের মানুষ-গুলোর পক্ষে তা কল্পনারও বুঝি অতীত ছিল।

এসব দেখি আর মনে মনে ভাবি যে, এই কি আমাদের স্বাধীনতার স্বরূপ! বিনয়, বাদল, দীনেশ, প্রদ্যোতের মতো আদর্শ চরিত্রের ছেলেরা কি এরই জন্য সেদিন হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছিলেন? এ জিজ্ঞাসার জবাব কোথায়?

যাক, মতি মল্লিকের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। সচরাচর এসব ক্ষেত্রে যা হয়, মতি মল্লিকের বেলায়ও তার কোন ব্যতিক্রম হল না। সাজা হল প্রাণদণ্ড

এবং সে আদেশ কার্যকর করা হল ১৯৩৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে।

১৯৩৪ সাল। বাংলার যৌবন সেদিন কারারুদ্ধ। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ বড় একটা বাইরে নেই। এক এক করে সবাইকেই আটক করা হয়েছে কারা-প্রাচীরের অন্তরালে। বাংলার প্রাণশক্তি স্তব্ধ, গতিহীন!

একমাত্র ব্যতিক্রম বি. ভি.-এর যতীশ গুহ আর দেওভোগ ঘটনার মতি মল্লিকের সংগী সেই সুকুমার ঘোষ ও মধু ব্যানার্জী প্রমুখ গুটিকয়েক পলাতক নেতৃস্থানীয় কর্মী। পুলিশ হাজার চেষ্টা করেও তখনো পর্যন্ত তাঁদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

এবার তৎপর হয়ে উঠলেন যতীশ গুহ।

আর দেরি নয়। হয়তো আর বেশিদিন সময় পাওয়া যাবে না। তার আগেই অ্যাণ্ডারসনী চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে হবে।

মেদিনীপুরের তৃতীয় জেলা-শাসক বার্জকে আগেই জবাব দেওয়া হয়েছে। এবার নতুন করে জবাব দেবার পালা।

কিন্তু এবার আর কোন আই. জি. বা জেলা-শাসক নয়।

মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার। সুতরাং টান দিতে হবে ঐ খোদ কর্তাকে ধরেই। বুঝিয়ে দিতে হবে যে, হাজার নির্যাতনেও বাংলা বা বাঙালী এখনো মরে যায়নি। তারা শুধু মুখ বুজে মারই খেতে জানে না, প্রয়োজন হলে পাল্টা মার দিতেও জানে।

কলকাতা বা অন্য কোন সমতলভূমিতে তাঁর নাগাল পাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং চলে যাও সবাই দার্জিলিং। ওখানেই তিনি এখন রয়েছেন গ্রীষ্ম-যাপনের জন্য। অবিলম্বে ওখানে গিয়ে যে করে হোক, ধর ওঁকে। চ্যালেঞ্জের জবাব দাও।

দলীয় নির্দেশে সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা থেকে কলকাতা হয়ে দার্জিলিং অভিমুখে যাত্রা করলেন উজ্জ্বলা মজুমদার আর মনোরঞ্জন ব্যানার্জী। আর ঢাকার জয়দেবপুর থেকে সরাসরি পৌঁছে গেলেন দুর্ধর্ষ কিশোর ভবানী ভট্টাচার্য আর রবি ব্যানার্জী।

৪ঠা মে তারিখে রবি আর ভবানী গিয়ে উঠলেন লুইস জুবিলী স্যানাটোরিয়ামে। উজ্জ্বলা মজুমদার আর মনোরঞ্জন আশ্রয় নিলেন স্নো ভিউ হোটেলে।

উজ্জ্বলা মজুমদার আর মনোরঞ্জন ব্যানার্জী। দেখে মনে হয়, অভিজাত বংশের ভ্রমণ-বিলাসী দুটি ভাই-বোন। তাছাড়া সঙ্গীত-রসিকও বটে। কারণ, সঙ্গে রয়েছে একটি সুদৃশ্য হারমোনিয়াম।

কিন্তু ঐ হারমোনিয়ামটা সম্বন্ধে উজ্জ্বলা মজুমদারের এত সতর্কতা কেন?

কি আছে ওটার ভেতরে?

তুমি ঠিকই অনুমান করেছ মল্লিকা। ঐ হারমোনিয়ামটার অভ্যন্তরেই

লুক্কায়িত রয়েছে বিপ্লবীদের বহু সাধনার ধন সেই মারাত্মক মারণাস্ত্র, যা দিয়ে অসুরকে আসুরিক ভাষায় জবাব দিতে হয়।

প্রথমে চেষ্টা করা হল ফ্লাওয়ার শো এগজিবিশনে।

কিন্তু না, সুবিধে হল না। দুর্ধর্ষ ব্রিটিশ শক্তির সান্ত্রী-পরিবেষ্টিত লাটসাহেবকে কিছুতেই সেদিন পাওয়া গেল না রিভলবারের রেঞ্জের মধ্যে। কাছেই এগুনো গেল না। সুতরাং সুযোগের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

সুযোগ পাওয়া গেল ৮ই মে লেবংয়ের ঘোড়দৌড়ের মাঠে। জানা গেল, সেদিন নাকি স্বয়ং অ্যান্ডারসন মাঠে উপস্থিত থেকে বিজয়ী দলকে পুরস্কার বিতরণ করবেন। সুতরাং সুবর্ণ সুযোগ।

যথাসময়ে ভবানী আর রবি দর্শকের টিকিট কেটে ঢুকে গেলেন মাঠের অভ্যন্তরে।

তাঁদের আসন গ্রহণ করতে দেখেই মনোরঞ্জন আর উজ্জ্বলা মজুমদার ফিরে গেলেন শিলিগুড়ি স্টেশনের দিকে। তাঁদের কর্তব্য শেষ। দলীয় নির্দেশে এবার তাঁদের ফিরে যেতে হবে কলকাতায়।

গভর্ণরের আসনের ঠিক ডান পাশ ঘেঁষে দর্শকদের স্থান। মাঝখানে একটা নিচু দেয়াল। দর্শকদের মধ্যে বেশির ভাগই শ্বেতাঙ্গ। ধামাধরা রাজা-মহারাজও রয়েছে কিছুসংখ্যক।

আর রয়েছে অজস্র পুলিশ, সার্জেণ্ট, এডিকং ও গুপ্তচরের দল। হাজার হোক, গভর্ণর! সুতরাং কোনদিক থেকেই সতর্কতার এতটুকু ত্রুটি নেই।

কিশোর ভবানী আর রবি তখন স্থির, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বুকে দুর্বার সাহস। চোখে দিগন্তসীমার মতো উন্মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি। ঐ যে দূরে সেই শয়তানটা বসে আছে পাত্র-মিত্র সঙ্গে নিয়ে। ফ্লাওয়ার শো এগজিবিশনে হাজার চেষ্টা করেও নাগাল পাওয়া যায়নি। আজ যাবে কোথায়!

কিন্তু অনেকটা দূর। এখান থেকে রিভলবারের পাল্লার মধ্যে পাওয়া যাবে কি!

তবু চেষ্টা করতে হবে। জবাব দেবার এমন সুবর্ণ সুযোগ জীবনে আর হয়তো কোনদিনই পাওয়া যাবে না।

যথাসময়ে মহামান্য লাট বাহাদুর উঠে দাঁড়ালেন আসন ত্যাগ করে। ঘোড়দৌড়ের পালা শেষ। এবার পুরস্কার-বিতরণ।

সঙ্গে সঙ্গে ভবানীও উঠে দাঁড়ালেন আসন ছেড়ে। চোখে-মুখে তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্পের রেখা। এই সুযোগ।

কিন্তু এখনো অনেকটা দূর। পাল্লার মধ্যে পাওয়া যাবে কিনা বলা শক্ত। আর একটু কাছে এগিয়ে যেতে পারলে ভাল হত।

কিন্তু না, উপায় নেই। চারপাশে সাহেব-সুবো, প্রহরী, গুপ্তচর আর মোসাহেবের দল। এগুতে গেলেই সন্দেহ করবে। হয়তো গোটা ব্যাপারটাই বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। সুতরাং লক্ষ্যস্থির করতে হবে এখান থেকেই।

বুঝি এক লহমার ব্যাপার। তারপরই শোনা গেল কান-ফাটানো আওয়াজ —দ্রাম! দ্রাম!

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল প্রতিটি মানুষ। আশ্চর্য, এত সশস্ত্র প্রহরী, এত লোকজন, তার মধ্যে কিনা এই কাণ্ড!

মুহূর্ত মাত্র, তারপরই শুরু হল চিৎকার, হৈ-হল্লা আর চেঁচামেচি। ধর, শীগ্‌গীর ধর ওকে!

একে ১৯৩৪ সাল, তার ওপর আবার অ্যাণ্ডারসন। সুতরাং সতর্কতার এতটুকুও ত্রুটি ছিল না।

সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণরের এডিকং সাহেব পর পর চারবার গুলী-বর্ষণ করলেন ভবানীকে লক্ষ্য করে। ফলে, চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই ভবানী ঢলে পড়লেন গুরুতরভাবে আহত হয়ে।

ওদিকে রবির হাতের আগ্নেয়াস্ত্র ততক্ষণে আগুন ছড়ানো শুরু করেছে —দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

'মাই গড!' সঙ্গে সঙ্গে বীরপুঙ্গব তাঁর স্টেনো মিস থর্টনের আড়ালে আত্মগোপন করলেন দুহাতে মুখ চাপা দিয়ে। রবির গুলী তাঁর ঠোঁট ছিঁড়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল অনেক দূরে।

বলা বাহুল্য, থর্টনও রেহাই পেলেন না। গুলীবিদ্ধ হয়ে তিনিও এবার বসে পড়লেন তাঁর মহামান্য প্রভুকে অনুসরণ করে।

বসে পড়লেন আরো একজন। তিনি হলেন দেহরক্ষী দলের একজন শ্বেতাঙ্গ সার্জেণ্ট। রবির নিক্ষিপ্ত গুলী তাঁকেও ছোবল দিতে ভুল করেনি।

বেগতিক দেখে স্টুয়ার্ডের আসন থেকে মিঃ টানডিগ্রীণ ও বারোয়ারীর রাজা আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়লেন রবির ওপর। সঙ্গে যোগ দিল কর্তব্যপরায়ণ দেহরক্ষীর দল। আততায়ী বেকায়দায় পড়েছে। রিভলবারের গুলীও শেষ। সুতরাং এতক্ষণ সাহস না পেলেও এবার আর বীরত্ব দেখাতে কোন অসুবিধে নেই।

বীরত্ব নয় তো কি! নিরস্ত্র একটি কিশোরের প্রতি দল বেঁধে আক্রমণ চালিয়ে চিরদিনের মতো তাঁকে পঙ্গু করে দেওয়াটাকে বীরত্ব ছাড়া আর কি বলা যায়, মল্লিকা?

অথচ পাশাপাশি একটি বিপরীত চিত্র দেখ। অচৈতন্য অবস্থায় ভবানী তখন হাসপাতালে। চারপাশে তাঁর অগণিত সেপাই-সান্ত্রী ও শ্বেতাঙ্গ শাসকদের দল। বাঙালীকে আর বিশ্বাস নেই। ওরা সব পারে। সুতরাং সতর্ক থাকাই ভাল।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে ভবানী প্রথমেই কি বলেছিলেন, জানো? না, নিজের কোন কথা নয়। বাবা-মা-ভাই-বোন বা সহকর্মী রবির কথাও নয়। শুধু একটি মাত্র ছোট্ট প্রশ্ন।

'Is Anderson still alive?'

পাশাপাশি এ দুটি চিত্রের মধ্যে কোন্‌টাকে তুমি বীরত্ব বলে আখ্যা দেবে, মল্লিকা?

এদিকে খবর শুনে সারা দেশ জুড়ে তখন সে কি তুমুল আলোড়ন!

সবার মুখে একই কথা। যাদের রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না, সেই সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর ইংরেজ সরকারের গর্বস্ফীত চ্যালেঞ্জের উপযুক্ত জবাব দিলেন কিনা বাংলাদেশেরই দুই দামাল কিশোর, ভবানী আর রবি! হাজার সাবাস ওদের!

অবশ্য অ্যান্ডারসনের মৃত্যু হয়নি। তা নাই বা হল! কারণ, মৃত্যুটাই বড় কথা নয়। এক অ্যান্ডারসন গেলে আর এক অ্যান্ডারসন আসবে। সেখানে সবাই এক।

আসল কথা হল অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করা। হিংস্রতা ও পাশবিকতার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ আঘাত হানা।

সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে অফুরন্ত প্রাণ-সম্পদে ভরপুর বাংলাদেশের এ দুটি মৃত্যুভয়হীন কিশোর যেভাবে ওদের ঐ সাম্রাজ্যবাদী দম্ভকে পথের ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন, সংসারে তার তুলনা কোথায়?

যাক, আগেকার কথায় ফিরে যাই। ভবানী আর রবি দুজনেই বন্দী। কিন্তু মনোরঞ্জন আর উজ্জ্বলা মজুমদারের খবর কি? তাঁরা তখন কোথায়?

খবর পাওয়া গেল শিলিগুড়ি স্টেশনে।

সন্ধ্যা তখন হয়-হয়। কলকাতার গাড়ি ছাড়ার সময় হয়েছে।

হঠাৎ বিরাট এক পুলিশ বাহিনীর আবির্ভাব। জরুরী মেসেজ এসেছে দার্জিলিং থেকে। একটি মেয়েকে গ্রেপ্তার করতে হবে।

অত্যন্ত ডেঞ্জারাস টাইপের মেয়ে। পরনে পিংক রঙের শাড়ি। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। গায়ের রঙ খুব ফর্সা। নাম—কুমারী উজ্জ্বলা মজুমদার। তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখ প্রতিটি কামরা। দেখা পেলে সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার!

এই তো একটি মেয়ে চুপচাপ বসে আছে এখানে। গায়ের রঙও বেশ ফর্সা।

কিন্তু চোখে চশমা নেই তো! পিংক রঙের শাড়িই বা কোথায়! এ তো দেখছি সাদাসিধে ধরনের সাধারণ সাদা রঙের শাড়ি।

উহুঁ, এ সে মেয়ে নয়। চল অন্য কামরায়।

তখনকার মতো ফাঁড়া কাটলেও শেষপর্যন্ত কিন্তু রেহাই পাওয়া গেল না। অবশেষে ঘটনার ঠিক দশ দিন পরে ১৮ই মে তারিখে পিংক রঙের শাড়ির খোঁজ পাওয়া গেল খ্যাতনাম্নী কংগ্রেস-কর্মী শোভারাণী দত্তর বাড়িতে। সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার। একজন নয়, দুজনকেই।

গ্রেপ্তার করা হল ঢাকা ও কলকাতার আরো অনেককেই।

দেওভোগ ঘটনার অন্যতম নায়ক সুকুমার ঘোষ, মধু ব্যানার্জী এবং উজ্জ্বলা মজুমদারের সহকর্মী মনোরঞ্জন ব্যানার্জী, সুশীল চক্রবর্তী প্রমুখ কেউ বাদ গেলেন না। জাল ফেলে সবাইকে টেনে তোলা হল একে একে।

সুকুমার ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হল মেটিয়াবুরুজের সেই রাজেন গুহর আস্তানা থেকে।

বলা বাহুল্য, রাজেনবাবুও রেহাই পেলেন না। ইতিপূর্বে বিনয় বোস, বিমল দাশগুপ্ত প্রমুখ এমনি কতজনকে তিনি নিজের গৃহে আশ্রয় দিয়ে-

ছিলেন একান্ত আপনজনের মতো। কোনদিন কারো মনে এ নিয়ে এতটুকুও সন্দেহের উদ্রেক হয়নি।

দুর্ভাগ্য, এবার আর তা হল না। ফলে, ছেলে গিরীন্দ্র গুহ সহ তাঁকেও এবার গ্রেপ্তার বরণ করতে হল পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দেবার অপরাধে।

একমাত্র ব্যতিক্রম যতীশ গুহ। তখনকার মতো রেহাই পেলেও একটা চঞ্চল জিজ্ঞাসা কিন্তু সর্বক্ষণ জেগেই রইল পুলিশের দৃষ্টিতে।

উঁহু, লোকটিকে বাইরে থেকে যতটা গোবেচারা বলে মনে হয়, আসলে যেন ঠিক তা নয়। কোথায় যেন অন্য একটি মানুষ লুকিয়ে আছে ওর ঐ মুখোশের আড়ালে, যাকে ঠিক বোঝা যায় না। ঠিক আছে, জাল তো পাতাই রয়েছে। যাবে আর কোথায়!

বাদবাকি সবাইকে ছেড়ে দিয়ে একমাত্র ভবানী ভট্টাচার্য. রবি ব্যানার্জী, উজ্জ্বলা মজুমদার, মনোরঞ্জন ব্যানার্জী, সুকুমার ঘোষ, মধু ব্যানার্জী আর সুশীল চক্রবর্তীকে আসামী তালিকাভুক্ত করে ৭ই আগস্ট তারিখে শুরু হল বিচার।

রবিকে আনা হল ডাণ্ডি করে। পুলিশের নৃশংস আক্রমণ চিরকালের মতো তাঁকে পঙ্গু করে দিয়েছে।

আদালত-গৃহে অ্যাণ্ডারসনী দম্ভকে আর-একবার খান্ খান্ করে ভেঙে দিলেন কিশোর বিপ্লবী ভবানী ভট্টাচার্য। ট্রাইবিউন্যালের সভাপতি জে. ইয়ুনির প্রশ্নের উত্তরে তিনি কি বলেছিলেন, জানো?

কোন কিছুর পরোয়া না করে দৃপ্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছিলেনঃ —'I came to assassinate the Governor. My object was to murder him. I have nothing more to say. None but myself and Rabi took part in the action connected in this conspiracy.'

[Amrita Bazar Patrika, 26. 8. 34.]

[আমি গভর্ণরকে হত্যা করব বলে এসেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে হত্যা করা। আমি আর রবি ছাড়া একাজে অন্য কেউ জড়িত ছিল না।]

রায় দেওয়া হল ১২ই সেপ্টেম্বর।

যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল তাই হল। ভবানী ও রবিকে দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড। তবে একবার নয়, দুবার। অ্যাণ্ডারসনী রাজত্বে কারো কাছে আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া গেলে তার একমাত্র শাস্তি ছিল, মৃত্যু। সুতরাং আগ্নেয়াস্ত্র রাখা ও হত্যার চেষ্টা করা—এ দুটি বিভিন্ন অপরাধে দুবার করে তাঁদের প্রাণ দিতে হবে ফাঁসির রজ্জুতে।

অশেষ করুণা সদাশয় সরকার বাহাদুরের। তাই মনোরঞ্জন ব্যানার্জীর বেলায় কিছুটা খাতির করা হল। তাঁকে একবার মাত্র প্রাণ দিলেই চলবে।

আরো একটু বেশি খাতির করা হল উজ্জ্বলা মজুমদারকে।

হাজার হোক মহিলা! তাই তাঁকে দেওয়া হল যথাক্রমে বিশ বছর দ্বীপান্তর, আর চৌদ্দ বছর সশ্রম কারাবাস।

সুকুমার ঘোষ ও মধু ব্যানার্জীর চৌদ্দ বছরের দ্বীপান্তর। অবশ্য

সুকুমার ঘোষের একবার নয়, দুবার। আর সুশীল চক্রবর্তীর—বারো বছর।

অবশ্য হাইকোর্টে কিছুটা রদবদল হল। সেখানে ফাঁসির পরিবর্তে মনোরঞ্জনকে দেওয়া হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। উজ্জ্বলা মজুমদার ও সুকুমার ঘোষের চৌদ্দ বছর। বাদবাকি যা আছে তাই।

এবার দাবী তুললেন পাদ্রী সাহেবের দল। বিশেষ করে মিসেস্ ফ্লিণ্ড। রবি আমাদের ঢাকার ব্যাপটিস্ট মিশনের অত্যন্ত কৃতী ছাত্র। মিশনের ছেলেকে ফাঁসি দেওয়া চলবে না।

চাপে পড়ে জাতভাইদের দাবী মেনে নিলেন অ্যাণ্ডারসন। তাই হোক। ফাঁসির পরিবর্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দিয়ে আমি তাঁকে আন্দামানে পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দিচ্ছি।

তবু খুশি হতে পারলেন না মিশনারীর দল। উঁহু, তা হয় না। ওটাও তোমাকে রদ করতে হবে বাপু।

বছরখানেক ধানাই-পানাই করে এবারও নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন অ্যাণ্ডারসন। ঠিক আছে, আমি তাকে আন্দামান থেকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করছি।

তবে দুটো শর্তে। এক—জেল-গেট থেকেই তাকে সোজা গিয়ে উঠতে হবে বিলেতের জাহাজে। দুই—হুকুম না দেওয়া পর্যন্ত কোনদিনই সে দেশে ফিরে আসতে পারবে না।

১৯৩৫ সাল। ৩রা ফেব্রুয়ারি। রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলে সেদিন ভবানীর জীবনের শেষ রাত্রি। বিদায়ের আগে ভবানী তার জীবনের শেষ চিঠি লিখলেন আত্মীয়-প্রিয়জনদের উদ্দেশ্য করে—'অমাবস্যার শ্মশানে ভীরু ভয় পায়, সাধক সেখানে সিদ্ধিলাভ করে...'

উজ্জ্বলা মজুমদার তখন মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে। সহকর্মী ভবানীর জীবনের সেই অন্তিম লগ্ন যে সেদিন তাঁর মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, সেকথা তাঁর নিজের লেখনী থেকেই খানিকটা এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ

'...তারপর ? তারপর রাজসাহী জেলের এক অসহ্য রাত। বহুদূরে অপর এক জেলে বসেই মনে মনে শুনি—রাতের গভীরে ভবানীর কণ্ঠে ফাঁসির রজ্জু পরিয়ে দিয়েছে বিদেশী শাসক। মুহূর্তে ধূলায় গড়িয়ে পড়েছে তার সোনার দেহ। সে রজনীর ইতিহাস গৌরবে সুন্দর, অশ্রুজলে বিধুর। সে রাত ভুলবার নয়। সেই রাতে একটি বাণীকে বুঝতে চেয়েছিলাম, ভবানীরই কণ্ঠে অনেকবার শোনা রবীন্দ্রনাথের একটি গানে ঃ

'কাঁপিবে না ক্লান্ত কর
টুটিবে না বীণা,
নবীন প্রভাত লাগি
দীর্ঘরাত্রি রব জাগি
দীপ নিভিবে না।'

তবু দীপ নিভে গেল। নির্মম ফাঁসির রজ্জু ভবানীর কণ্ঠ-বীণাকে স্তব্ধ করে দিল। কিন্তু অদৃশ্য রেখায় 'অদৃশ্য আলোকে'র অন্তহীন সামর্থ্যে

ঐ দীপ থেকে সেদিন যে আলোক বিচ্ছুরিত হয়েছিল, ওই মধুকণ্ঠ থেকে যে ধ্বনি বিকিরিত হয়েছিল তা যে অভ্রান্ত ও শাশ্বত।

শহীদ-কুলের বিভায় সমুজ্জ্বল যে বিপ্লববাণী, তাকে নিরস্ত করার সামর্থ্য কোন যুগে কোন শক্তিই আয়ত্ত করতে পারেনি।'

[সবার অলক্ষ্যে, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৪]

১৯৩৫ সালের ১৮ই ডিসেম্বর আরো একজনকে প্রাণ দিতে হল ফরিদপুর জেলের ফাঁসি-মঞ্চে। তিনি হলেন—রোহিণী বরুয়া।

এবার তোমাকে বৈপ্লবিক সংস্থা অনুশীলন সমিতি সম্বন্ধে কিছু বলব, মল্লিকা।

নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে, অগ্নিযুগের শেষ অধ্যায়ে যা শুরু হয়েছিল চট্টগ্রাম সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে, সেই শেষপর্বে অন্যান্য দলগুলোর তুলনায় অনুশীলন সমিতির ভূমিকা বেশ একটু নিষ্প্রভ।

কি এর কারণ ?

কারণ আর কিছু নয়, আসলে তাঁদের লক্ষ্য ছিল তখন অন্যদিকে। অর্থাৎ, কোন বিচ্ছিন্ন আক্রমণ নয়, কোন আঞ্চলিক ব্যাপারও নয়। চাই সর্বভারতীয় বিপ্লব। চাই সশস্ত্র সেনা-বিদ্রোহ, যে প্রচেষ্টা ইতিপূর্বে একবার করা হয়েছিল মহানায়ক রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে।

তোড়জোড় শুরু হয়েছিল ১৯৩১ সাল থেকেই। নেতৃস্থানীয় সবাই সেদিন লৌহ-কারার অন্তরালে।

কিন্তু এভাবে বন্দী-জীবন মেনে নিলে আর তো চলবে না। পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে বাইরে যাওয়া প্রয়োজন। সুতরাং চল এবার সবাই বাইরে। তারপর দৃঢ়পায়ে এগিয়ে চল আপন লক্ষ্যের দিকে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী বিপ্লবী পূর্ণানন্দ দাশগুপ্তের নির্দেশে প্রথমেই বক্সা ক্যাম্প থেকে পালালেন কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী আর জীতেন গুপ্ত।

প্রভাত চক্রবর্তী আর পরেশ গুহও একদিন উধাও হলেন অন্তরীণ অবস্থা থেকে।

সব শেষে এল পূর্ণানন্দের পালা। যে করে হোক জেল থেকে পালাতেই হবে।

প্রচেষ্টা সার্থক হল আলিপুর জেলে থাকাকালীন সময়ে।

প্রবল বৃষ্টির মধ্যে একজনের কাঁধে একজন দাঁড়িয়ে যেভাবে সেদিন তিনি সহকর্মী নিরঞ্জন, হরিপদ ও সীতানাথ দে সহ আলিপুর জেলের ঐ আকাশছোঁয়া পাঁচিল ডিঙিয়ে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মগোপন করেছিলেন, তা যে কোন ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসকেও বুঝি হার মানায়।

ওদিকে ততক্ষণে পাগলা ঘণ্টি বেজে উঠেছে। হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার! আসামী পালাচ্ছে! ঐ যে ওরা পাঁচিলের ওপর উঠেছে! তৈয়ার হো যাও!

ঘণ্টা শুনে সঙ্গে সঙ্গে তৎপর প্রহরীর দল ছুটে এল ছোট গেট দিয়ে।

কিন্তু কার সাধ্য ওদিকে এক পা এগোয়! গেট আগলে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দলের একনিষ্ঠ কর্মী অমূল্য সেন। প্রাণ থাকতে তিনি গেট ছাড়তে রাজী নন।

আঘাতে আঘাতে সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল অমূল্য সেনের, তবু তিনি নিজের প্রতিজ্ঞায় অবিচল রইলেন শেষপর্যন্ত।

বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনে সহকর্মী পূর্ণানন্দ, নিরঞ্জন, হরিপদ ও সীতানাথ দে-র আজ বাইরে যাওয়া প্রয়োজন। যত নির্যাতনই আসুক না কেন, কর্তব্যের খাতিরে সেই সুযোগ তাঁদের দিতেই হবে।

অমূল্য সেনের সেই অনমনীয় দৃঢ়তা সেদিন ব্যর্থ হয়নি, মল্লিকা। ঘুরে ঘুরে পূর্ণানন্দ প্রমুখ সবাই সেদিন চলে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন দলের নিজস্ব ঘাঁটি জগদ্দল কেন্দ্রে।

শুধু যেতে পারেননি হরিপদ। কিছুক্ষণ বাদেই আবার তিনি ধরা পড়েছিলেন বালীগঞ্জ স্টেশন-সংলগ্ন একটা রাজপথের ধারে।

বাকি সবার পক্ষেও বেশিদিন আত্মগোপন করে থাকা সম্ভব হল না। পাল্টা আঘাত এল ১৯৩৫ সালের ২০শে জানুয়ারি, টিটাগড়ে। পূর্ণানন্দ সহ অনেকেই সেদিন ধরা পড়লেন একে একে।

আর ধরা পড়লেন কুমিল্লার পলাতক বিপ্লবী কুমারী পারুল মুখার্জী। ধরা পড়লেও তার আগেই তিনি নষ্ট করে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন বেশ কিছু গোপনীয় কাগজ-পত্র।

শুরু হল পাশাপাশি দুটি মামলা।

একটি আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা। পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, সীতানাথ দে, প্রভাত চক্রবর্তী, পরেশ গুহ, জীতেন গুপ্ত, হরিপদ দে, ধীরেন ভট্টাচার্য প্রমুখ চল্লিশ জনকে অভিযুক্ত করা হল ষড়যন্ত্রের অপরাধে।

অন্যটি টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা। আসামীর সংখ্যা মোট উনত্রিশ জন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেনঃ পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, প্রীতিরঞ্জন দাস পুরকায়স্থ, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, শান্তিরঞ্জন সেন, প্রফুল্ল-কুমার সেন, পারুল মুখার্জী, শ্যামবিনোদ পালচৌধুরী প্রণবকুমার রায়, কালীপদ ভট্টাচার্য, হরেন্দ্রনাথ মুন্সী, বিভূতি দত্ত, নিরঞ্জন ঘোষাল, ধনেশ ভট্টাচার্য প্রমুখ বিপ্লবীবৃন্দ।

বলা বাহুল্য যে, কাউকেই রেহাই দেওয়া হল না। রেহাই দেবার প্রশ্নই ওঠে না। হাতের মুঠিতে একবার যখন পাওয়া গেছে তখন প্রতিহিংসা নেবার এমন অপূর্ব সুযোগ যে সদাশয় সরকার হারাবেন না, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং সবাইকেই দণ্ডিত করা হল দীর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ডে। অথচ কোন action তাঁরা করেছেন বলে প্রমাণ নেই।...

পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটল ১৯৩৭ সালের শেষভাগে।

শুরু হল দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন। শাসনের নামে দেশের যুবশক্তিকে এভাবে কারারুদ্ধ করা চলবে না।

হাজার হাজার যুবক-যুবতী বন্দী। বিনা বিচারে আটক বন্দীর সংখ্যাও কম নয়। তাছাড়া কত শত তরুণ যে অন্তরীণ জীবন-যাপন করছে, তার বোধহয় কোন গোনাগুন্তি নেই। তার ওপর রয়েছে আন্দামানে নির্বাসিত বন্দীর দল। ওদের ভাগ্য নিয়ে এভাবে আর ছিনিমিনি খেলা চলবে না।

একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেল বিলেতের পার্লিয়ামেন্টের লেবার পার্টির সদস্যদের মুখে।

এই কি ইংরেজ শাসনের নমুনা! দেশের যৌবনকে পাশবিক শক্তি দিয়ে এভাবে কারারুদ্ধ করে রাখলে ইংরেজ শাসনের ব্যর্থতাটাই কি বড় হয়ে দেখা দেবে না সারা পৃথিবীর চোখে?

সরকার ও বন্দীদের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য এবার এগিয়ে এলেন গান্ধীজী।

এভাবে হাজার হাজার ছেলেকে আটক করে রাখা মানে দেশের শ্রেষ্ঠ যুবশক্তির অবদান থেকে কংগ্রেসকে বঞ্চিত করা। সুতরাং যে করে হোক, দুপক্ষকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

শুধু ছোট্ট একটি শর্ত। ওরা মুখে একবার বলুক যে, ভবিষ্যতে আর কোনদিনই ওরা হিংসার পথে পা বাড়াবে না!

আলোচনার সুবিধার জন্য সুরেন ঘোষ, জ্যোতিষ ঘোষ, রমেশ আচার্য রবি সেন, মনোরঞ্জন গুপ্ত, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, জীবন চ্যাটার্জী, মেজর সত্য গুপ্ত, ভূপতি মজুমদার, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী পূর্ণ দাস, অরুণ গুহ, ভূপেন দত্ত, প্রতুল গাঙ্গুলী, রসিক দাস, প্রতুল ভট্টাচার্য প্রমুখ সমস্ত State Prisoner-দের (Regulation III-তে আটক) বহির্বাংলার নানা জেল থেকে নিয়ে আসা হল হিজলী বন্দী-নিবাসে।

কিন্তু সব বৃথা। কিছুতেই তাঁরা রাজী হলেন না গান্ধীজীর প্রস্তাবের কাছে নীতি-স্বীকার করতে।

তাঁদের সাফ কথা, কোনরকম শর্তাধীনে মুক্তি পেতে আমরা রাজী নই। আর ভবিষ্যতে কি করব না করব, সে দায়িত্ব পুরোপুরি আমাদের। সে সম্বন্ধে কোনরকম প্রতিশ্রুতি দিতে আমরা অক্ষম।

পরদিনই সে খবর বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হল সংবাদপত্রের পাতায়ঃ

'The Revolutionary Leaders Refused Conditional Release!'

আর একবার প্রেসিডেন্সি জেলে, কিন্তু ফল দাঁড়াল সেই একই। অর্থাৎ, কোনরকম শর্ত নয়, প্রতিশ্রুতিও নয়। আগে মুক্তি, তারপর অন্য কথা।

শেষপর্যন্ত তাই মেনে নিতে হল মহামান্য সরকার বাহাদুরকে। ফলে, শুরু হল বন্দী-মুক্তি। একসঙ্গে নয়, ধাপে ধাপে।

শুধু মুক্তি দেওয়া হল না দীর্ঘ-মেয়াদী বন্দিগণকে। কারণ ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাসমর শুরু হয়ে গেছে। এ অবস্থায় এসব বিপজ্জনক যুবকদের মুক্তি দিয়ে কোনরকম ঝুঁকি নিতে সরকার প্রস্তুত নন।

ফলে, সেই দীর্ঘ বন্দী-জীবন। সেই একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন দিনযাপনের গ্লানি। কোথায় এর শেষ কে জানে!

লৌহ-কপাটের দ্বার খুলল প্রায় এক যুগ বাদে, জীবন-সায়াহ্নে এসে। তখন যুদ্ধ শেষ।

ইতিমধ্যে কত কাণ্ড ঘটে গেছে। কত রাজ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে। কত উত্থান-পতন। কত গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী। কত আনন্দ-

বেদনার টুকরো টুকরো ইতিহাস। ঘরছাড়া এই পাঁথকের দল তার স্বাদ থেকে একেবারেই বঞ্চিত। পাষাণ-কারার অন্তরালে দিন আর রাত্রির যে একই চেহারা!

সেদিন এই বিপ্লবী নায়কদের অভিনন্দন জানিয়ে সাময়িক পত্রিকায় কি লেখা হয়েছিল, শোন ঃ

'অবশেষে বাঙলার রাজবন্দীদের শেষদল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। বিদেশী গভর্ণমেণ্ট এবং তাহাদের প্রভাবাধীন প্রতিক্রিয়াপন্থী শাসকের দল বাঙলার এই সব স্বদেশপ্রেমিক বীর সন্তানদিগকে দীর্ঘদিন বিনাবিচারে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ইঁহারা বীরত্বে, ত্যাগে এবং দেশসেবার বলিষ্ঠ একনিষ্ঠ সাধনায় বাঙলা দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। জগতের যে কোন দেশ শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের ন্যায় দুহিতা এবং শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দাস, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, অনিল রায়, রবীন্দ্রমোহন সেন, রমেশ আচার্য, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, সত্য গুপ্তের ন্যায় বীর সন্তান লাভ করিয়া গর্ব বোধ করিতে পারে।

স্বদেশের স্বাধীনতার সাধনায় ইঁহাদের আত্মোৎসর্গের উজ্জ্বল আদর্শ জগৎকে বিস্মিত করিয়াছে এবং ইঁহাদের বীর্যময় কর্মোদ্যম ভারতের স্বাধীনতার শত্রুদের হৃদয়ে সন্ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছে।

আজ আমরা ইঁহাদের আনন্দের সহিত অভিনন্দিত করিতেছি। ইঁহাদের আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় এবং কর্মসাধনায় বাঙলা দেশে নূতন জীবনের সঞ্চার হইবে, আমরা ইহাই আশা করি।...'

[সাপ্তাহিক দেশ ঃ ২৬শে মে, ১৯৪৬ সাল]

অগ্নিযুগের কথা আপাতত এখানেই শেষ করছি, মল্লিকা। আবার তোমাকে নূতন করে তাঁদের কাহিনী শোনাব দ্বিতীয় পর্বে।

লিখতে গিয়ে আজ বার বার মনে পড়ছে অগ্নিযুগ-সংখ্যা উল্টোরথে প্রকাশিত প্রবীণ বিপ্লবী নিকুঞ্জ সেনের সেই কথাগুলো ঃ

'স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা জীবন পণ করেছিলেন, দুঃখকে জয় করে দুঃখাতীতের মুক্তির সন্ধানে অভিযাত্রী হয়েছিলেন, তাঁদের নিয়েই তো ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যদি ভারতবর্ষই না রইল, তবে সে কিসের ইতিহাস? কার ইতিহাস?

বাংলার বিপ্লব-যজ্ঞে বুকের পাঁজরে পূজার হোমানল জেবলে রেখেছেন বাংলাদেশেরই কত শহীদ। তাঁদের ক'জনের কথা আমরা জানি? যাঁদের নাম শুনেছি, তাঁদের বহুবিচিত্র জীবনের কতটুকুই বা জানি আমরা? আর নাম যাঁদের শুনিনি তাঁদের সংখ্যা তো নিরূপণ করা অসম্ভব। তা বলে কি দেশ ও জাতি তাঁদের অস্বীকার করবে?'

অস্বীকার করেনি কি?

দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করে, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে সেদিন যাঁরা জীবনের জয়যাত্রার পথ রচনা করে গিয়েছেন, কতটুকু তাঁদের স্বীকৃতি দিয়েছে আজকের এই স্বাধীন দেশের মানুষ?

সরকারী উদ্যোগে প্রচুর অর্থব্যয় করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের

যে ইতিহাস রচিত হয়েছে, কোথায় সেখানে বাংলাদেশের এই অগণিত মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদদের স্থান?

একটি পাতাও সেখানে তাঁদের জন্য ব্যয় করা হয়েছে কি? কোথাও দেওয়া হয়েছে কি তাঁদের এতটুকু স্বীকৃতি বা মর্যাদা?

না. হয়নি।

হাসিমুখে মৃত্যু-বন্দনা করে যতই তাঁরা ভীত, আতঙ্কিত ভারতবাসীকে সেদিন অপরিম্লান জীবনের পথ দেখিয়ে থাকুন না কেন, আজ আর তাঁদের কোন দামই নেই স্বাধীন দেশের এই ভাগ্য-বিধাতাদের বিচারে। তাঁরা অপাংক্তেয়, ফসিল মাত্র।

কেন এই হীনমন্যতা? কি এর কারণ?

'মিসগাইডেড' নেতা সুভাষ বা তাঁর অনুগামী বাংলাদেশের তথাকথিত 'ভ্রান্ত' বিপ্লবী-সমাজ আর যাই করুন, লাভ-লোকসানের হিসেব খতিয়ে কোনদিনও দেশ-সেবা করেননি। এটাই কি তাঁদের সবচাইতে বড় অপরাধ?

'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই;
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।'
—রবীন্দ্রনাথ

'কমিউনিস্টদের আপনারা চিনে রাখুন। মনে রাখবেন, ওরাই সেদিন আমাদের নেতাজীকে জাপানীদের দালাল বলে কটূক্তি করেছিল।'

মাঠে-ময়দানে এ ধরনের অভিযোগ নিশ্চয়ই তুমি শুনে থাকবে, মল্লিকা। বিশেষ করে নির্বাচনের প্রাক্কালে। তখন তো বলতে গেলে এটাই সবচাইতে বড় হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায় এক শ্রেণীর বক্তাদের কাছে।

অভিযোগ সত্য। শুধু সত্য নয়, যাকে বলে নির্মম সত্য। সুভাষ-বিরোধিতার ব্যাপারে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যে সেদিন কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, ইতিহাসই তার সবচাইতে বড় সাক্ষী।

কিন্তু শুধু কি ওরাই? এ ব্যাপারে অভিযোগকারীদের ভূমিকাই কি খুব একটা সমর্থনযোগ্য ছিল?

'সুভাষ বোস ফিরে এলে আমিই সবার আগে খোলা তরবারী নিয়ে তাকে রুখে দাঁড়াব।' এ উক্তি কার? পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নয় কি?

'হাজার হোক, সুভাষবাবু দেশের শত্রু নন!' এ উক্তি কে করেছিলেন? নির্বাচনে পরাজিত হবার পরে স্বয়ং গান্ধীজীর মুখ থেকেই কি এই বক্রোক্তি শোনা যায়নি?

তাহলে শুধু একপক্ষকে দোষ দিয়ে লাভ কি? তফাতটা কোথায়?

কেন এই বিরোধ? কেন সেদিন সুভাষকে বহিষ্কার করা হয়েছিল কংগ্রেস থেকে?

নির্বাচিত সভাপতির বিরুদ্ধে অহিংস-নীতিতে বিশ্বাসী দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসী নেতৃবর্গ যেভাবে সেদিন হিংস্র মূর্তি ধরে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তা কি গণতন্ত্রসম্মত হয়েছিল? এই কি গণতন্ত্রের নমুনা?

তাছাড়া অপরাধটাই বা কি?

একমাত্র কারণ দেখা যায় যে, কংগ্রেস হাই-কম্যান্ড, তথা গান্ধীজীর মতামত উপেক্ষা করে সুভাষ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাটা কি অপরাধ?

এই সেদিনও হাই-কম্যান্ডের মতামত উপেক্ষা করে মোরারজী দেশাই প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। কই, তাঁকে তো সেদিন বহিষ্কার করা হয়নি?

তাহলে সুভাষের বেলায় ব্যতিক্রম হল কেন? সুভাষ, তথা তাঁর সমর্থক বামপন্থী দলগুলোকে ছলে-বলে-কৌশলে নিশ্চিহ্ন করার জন্যই নয় কি?

সুভাষের পথ চিরচরিত পথ নয়। বিরাট তাঁর ভূমিকা। কর্মক্ষেত্রও বহুদূর বিস্তৃত। তার মধ্যে তাঁর ছাত্রজীবন, আই. সি. এস. খেতাব বর্জন, দেশবন্ধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ, সব শেষে তিন-আইনের বন্দী হিসেবে দীর্ঘদিন মান্দালয় জেলে অবস্থানের কাহিনী নিশ্চয়ই তোমার অজানা নয়। তাই পুনরাবৃত্তি না করে আমি শুধু এই বিরোধ-পর্বের প্রধান ঘটনাগুলোকেই একে একে তোমার কাছে তুলে ধরব, মল্লিকা। মনে রেখো, এ আমার মনগড়া কাহিনী নয়, ইতিহাস। এক মর্মান্তিক বেদনাদায়ক ইতিহাস, যা অপ্রিয় হলেও সত্য।

শুরু হয়েছিল ১৯২৮ সালে অনুষ্ঠিত সেই কলকাতা কংগ্রেসে, যেবার জি. ও. সি. বেশে সুভাষ ও তাঁর বহু পরিশ্রমে গড়া ভলাণ্টিয়ার্স বাহিনী দেখে গান্ধীজী ঠাট্টা করে বলেছিলেন—'পার্ক সার্কাসের সার্কাস'!

যেদিকে পাল্লা ভারী সেদিকে ঝুঁকে পড়াই তো বুদ্ধিমানের লক্ষণ। তাই সংগে সংগে এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী জনসেবক সমস্বরে রব তুললেন—সার্কাস! সার্কাস! পার্ক সার্কাসের সার্কাস!

মুহূর্তে ভোল পাল্টে কিভাবে যে সেদিন তাঁরা সুভাষের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে মুখর হয়ে উঠেছিলেন, তখনকার সময়ের পত্র-পত্রিকা থেকে তার কয়েকটি নমুনা এখানে তুলে দিচ্ছি, মল্লিকাঃ

'সেলাম নেহেরু, কেটে পড় বাছা,
সেলাম বৃদ্ধ গান্ধী।
হাফ প্যাণ্টের নাই বটে কাছা
তবুও কোমর বান্ধি—
বুকে জোর থাকে চলে এস সাথে
স্বাধীনতা শুধু কাম্য
স্বাধীনতা ধ্বজা ধর এক হাতে
আর হাতে ধ্বজা সাম্য,
মুখে কহ শুধু জয়তু বঙ্গ
জয়তু সুভাষচন্দ্র
নতুবা দাও হে পৃষ্ঠ ভঙ্গ
যে হও, তামিল অন্ধ্র—

দেখিস না এই বিশ্ব ব্যাপিয়া
মাথা তুলিয়াছে চ্যাংড়া,
যুবা ইয়োরোপ যুবক এশিয়া
কাঁচা পাঁচ কাঁচা ল্যাংড়া ॥

[শনিবারের চিঠি]

'হে চির তরুণ ধন্য।
গান্ধী গোখেল হইল হদ্য
তুমি এলে সেই জন্য।
শোভে ঝলমল জরির পোশাক
রাবড়ি সেবিত অঙ্গে,
শিখ মারাঠিরা বিষম অবাক
মিলিটারি দেখে বঙ্গে।'

[শনিবারের চিঠি]

'সিংহ চর্মে শোভিত রাসভ
দিকে দিকে তাই ওঠে জয়রথ,
ভেকদল আজ করে কলরব
হাতীরে না মানে হাতী।'

[শনিবারের চিঠি]

'হেথা জাতীয় সমরে যুবা সৈনিক
যেন পারাবত লক্কা,
কারো ভাঙা শিরদাঁড়া, সম্বল কারো
ঘুণ ধরা বুকে যক্ষ্মা।'

[শনিবারের চিঠি]

'সেই শ্রীমান খোকারে ঘিরিয়া যত
ডাকাতের হল gang-*
পাকা গরু হয়ে সেথা নয়া ভগবান
বাড়াইয়া আছে ঠ্যাং।'

[শনিবারের চিঠি, ভাদ্র, ১৩৩৫]

এখানেই শেষ নয়, মল্লিকা। কারো রোগ-শোক নিয়ে ব্যঙ্গ করাটা আর যাই হোক, সভ্য রীতি নয়। শালীনতা বিসর্জন দিয়ে তাও কিন্তু সেদিন করতে বাকি রাখেনি তথাকথিত ঐ দেশসেবকের দল। মান্দালয় জেলে থাকাকালীন সময়ে সুভাষ একবার যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়েছেন বলে

* বিপ্লবীদের কটাক্ষ করে ডাকাতের gang বলা হয়েছে

চিকিৎসকরা সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, সে খবর তুমিও জানো। তাই নিয়েই সেদিন কটাক্ষ করে লেখা হয়েছিল ঃ

'ইতিমধ্যে কলিকাতা কংগ্রেস আসিয়া পড়িল। বিরাট আয়োজন, বিরাট হট্টগোল, হৈ-চৈ। বাংলা মায়ের কোলজোড়া ছেলে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে বাংলার নবজাগ্রত তরুণ সংঘের দুইজন বা ততোধিক একত্রিত হইলেন। ফাঁকা জায়গা দেখিয়া লেফ্‌ট্‌-রাইট্‌ ক্রমে তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতে লাগিলেন।

সুবিখ্যাত 'দেশবন্ধুবাস' তরুণী ভলাণ্টিয়ারদের লইয়া পাড়ায় পাড়ায় হানা দিতে আরম্ভ করিল।

'নেশানাল' সৈন্যদলের জন্য ৮,০০০ জোড়া বুট ও হাজার হাজার খদ্দরের মিলিটারী হাফ প্যাণ্ট ও সার্টের অর্ডার চলিয়া গেল। খদ্দরের ক্যাপ ও পিস্তল রাখিবার খাপ তৈয়ার হইতে লাগিল। বিউগল ও বংশী-ধ্বনিতে চারিদিক মুখর হইয়া উঠিল। পথে-ঘাটে নূতন জাতীয় সংগীত ঐকতান সহযোগে শ্রুত হইতে লাগিল।

'কে আবার বাজায় বাঁশী, এ ভাঙা কুঞ্জবনে', 'ফরোয়ার্ড', 'বাংলার কথার'. 'নোটিশের উপর নোটিশ'।

সেনাধ্যক্ষ সুভাষচন্দ্র নিজের বুকের দোষের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া ডাক্তারের সাহায্যে ভলাণ্টিয়ার সৈন্য বাছিতে লাগিলেন। যাহারা উচ্চতায় ৫ ফুট ৬ ইঞ্চির চাইতে কম এবং যাহাদের বুকের মাপ ৩৪ ইঞ্চির বেশি নহে তাহারা অমনোনীত হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বসুজাতা শ্রীমতী লতিকার নেতৃত্বে তরুণী সৈন্যদল ছাতে ছাতে কুচ্‌কাওয়াজ করিতে লাগিল।

...স্বয়ং সুভাষচন্দ্র একটি উপযুক্ত ঘোড়া বাছিয়া লইয়া ঘোড়ার জন্য চুমকি কাজ করা সাজ ও নিজের জন্য জরির কাজ করা ৩০০ টাকা মূল্যের এক সুট তৈয়ার করিয়া প্রমাণ সাইজ আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নেতৃত্ব প্রাক্‌টিশ করিতে লাগিলেন।.........

তারপর প্রেসিডেণ্ট আসিলেন। সেও এক কাণ্ড। মল্লিক-বাড়ির বড়-তরফের বিবাহ তো ছেলেমানুষ। ১০১ তোপ, ৩৪ ঘোড়া, ১,০০০ ঘোড়-সওয়ার, ২,০০০ মোটর সওয়ার, ২০,০০০ পদাতিক পুরুষসৈন্য, ২,০০০ রমণী বাহিনী, তিন কেতা ব্যাণ্ডের দল, ২৫টি তোরণ-দ্বার, কমসে কম ৫ লক্ষ দর্শক, বিউগল, ব্যাণ্ড, বাঁশী, ঘোড়ার হ্রেষা, মানুষের বন্দে মাতরং ও জাতীয় সংগীতে 'কে আবার বাজায় বাঁশী এ ভাঙা কুঞ্জবনে'. ফটোগ্রাফিক ক্যামেরার খুটখুট আওয়াজ, ফুলের মালা, কাগজের মালা, বাতাসা, খই।

মনে পড়িল, সাত শতাব্দী পূর্বে মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী যেদিন বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়াছিল, সেদিনও এমন আয়োজন হয় নাই।

মনে পড়িল, পলাশী যুদ্ধের পর আম্রকানন-প্রত্যাগত বীরের দলও এমনভাবে কলিকাতায় প্রবেশ করে নাই।'

[শনিবারের চিঠি]

এই কলকাতা অধিবেশনেই গান্ধীজী প্রস্তাব আনলেন—আমরা ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস বা স্বায়ত্ত-শাসন চাই। পূর্ণ স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতাও নয়। ইংরেজের আওতার মধ্যে থেকে শুধু ঐটুকু পেলেই আমরা খুশি।

—আমি প্রতিবাদ করছি। বিপ্লবী বাংলার প্রতিনিধিরূপে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন সুভাষ। ঐ আধখানা স্বাধীনতা আমি চাই নে। চাই পূর্ণ স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতায় কোন খাদ নেই। শর্ত নেই।

নিঃশ্বাস ফেলতেও বুঝি ভুলে গেলেন বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত প্রবীণ কংগ্রেসী নেতৃবর্গ।

গান্ধীজী ভারতের মুকুটহীন সম্রাট। কার এতবড় সাহস যে, তাঁর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করে! কে এই বিদ্রোহী যুবক!

সুভাষ! সুভাষ! সুভাষ!

দেশবন্ধুর মন্ত্রশিষ্য সুভাষ! 'খোকা ভগবান' সুভাষ! স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর 'গক', আজন্ম-বিপ্লবী সুভাষ!

ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। শিক্ষা দীক্ষা, সাহস, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও চিন্তা-ধারার দিক থেকে সত্যিই তিনি অতুলনীয়।

ঠিক তার বিপরীত হলেন কাজের বেলায়। সেখানে তিনি যেমন দুর্বল, তেমনই অসহায়।

সত্যি বলতে কি. বিংশ শতাব্দীর গত তিন দশকে তিনি যে মোট কতবার 'আমি সোস্যালিস্ট', কখনো বা 'আমি কমিউনিস্ট', এমনি পরস্পর-বিরোধী বিবৃতি দিয়েছিলেন, তার সঠিক হিসেব দেওয়া বোধ করি কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

এখানেও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না।

দৃপ্তকণ্ঠে তিনি সমর্থন জানালেন সুভাষের প্রস্তাবকে। হ্যাঁ, এই তো চাই! এই তো হওয়া উচিত! আমাদের একমাত্র দাবী—পূর্ণ স্বাধীনতা। পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া আর কোন কিছুই আমরা মেনে নিতে রাজী নই।

ব্যস্. ঐ পর্যন্তই। ভোট গ্রহণ কালে দেখা গেল অন্য চেহারা। তখন তিনি পুরোপুরি গান্ধী-পন্থী।

১৩৫০—৯৭৩ ভোটের ব্যবধানে সুভাষের হার হল। হার হল নীতি-গত দিক থেকে নয়, অন্য কারণে। কারণ—গান্ধীজী। কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা গান্ধীজীর পক্ষে নতুন কিছু নয়। ভোট গ্রহণের পূর্বে এবারও তেমনি একটা আশঙ্কার কথা ছড়িয়ে দেওয়া হল প্রতিনিধিদের মধ্যে। ভোটে পরাজিত হলে গান্ধীজী নাকি দূরে সরে যাবেন কংগ্রেস ত্যাগ করে। ফলে, যা হবার তাই হল।

[ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল ঃ সুভাষচন্দ্র বসু]

প্রতিবাদ করলেন শ্রদ্ধেয় সত্য বক্সী। ২রা জানুয়ারি 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকায় 'Muddled' শিরোনামা দিয়ে তিনি লিখলেন ঃ

'It will be a grievous blunder on the part of the older leaders of Congress if they run away with the idea that the numerical voting strength in favour of Gandhiji's resolution is any index of its popularity...He who runs must take note of the determinded and articulate rebellion against authority: he who runs must take note of the rebellion against popery, political or otherwise. No one is content today to take things as accepted, or trim one's convictions to the conveniences of fancies of men however reputed.

...It is no doubt true that persons and personalities do count, and the older order does not change in a day. A course of action that has to secure the approval of the ballot-box by marshalling on its sides all sorts of distinguished names of the country—revered Pandits and Maulanas, and above all, the mysterious spell of Sabarmati, does not seem to show intrinsic strength. It is a losing cause, and principles do not take long to defeat personalities.

There is nothing so dissipating and so demoralising as the confusion of thought and ideas....A programme of 'muddling on' does not encourage or inspire...It was hoped that the mental weaknesses or the intellectual hypocrisies involved in impossible compromises would be got over...The older leaders have again sought refuge in reservations and subterfuges.

Sj. Subhas Ch. Bose's amendment made the issue both clear and straight...That is the beginning of the struggle. The next few months will show whether subterfuges and mental reservations win, or a bold idea boldly conceived grips the heart, the intellect and the imagination of the country.'

হেরে গিয়েও কিন্তু এতটুকু দমলেন না সুভাষ। যুব-সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে ভাষণ দিতে গিয়ে গান্ধীজীর সবরমতী আশ্রমের প্রাচীন ভাবধারাকে তীব্র কটাক্ষ করে তিনি বললেন:

'...ভারতের যৌবন আর প্রবীণ পক্ককেশ নেতাদের স্কন্ধে সব ভার নিক্ষেপ করিয়া জোড়হস্তে মূক মেষপালের মতো অনুগমন করিতে প্রস্তুত নহে। তাহারা বুঝিয়াছে, স্বাধীন মহান শক্তিমান ভারত তাহারাই গড়িবে। সে দায়িত্ব তাহারা গ্রহণ করিয়াছে।'

'...সবরমতীর ভাবধারা তাহার প্রচারমুখে এই ধারণা জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছে যে, আধুনিকতা মন্দ, কল-কারখানায় পর্যাপ্ত-দ্রব্যজাত সৃষ্টি

অন্যায় অভাব বৃদ্ধি করা অনুচিত, জীবনযাত্রার প্রয়োজন ও প্রাচুর্য বর্ধিত করা উচিত নহে। সর্বপ্রযত্নে গোরুর গাড়ির যুগে ফিরিয়া যাওয়াই শ্রেয় এবং দৈহিক উন্নতি অথবা সামরিক শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবল আত্মার উন্নতি-সাধনই লক্ষ্য হওয়া উচিত।'

'...ভারতে আজ আমরা কর্মযোগের দর্শন চাহি। আমাদের বর্তমান যুগের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া বাঁচিতে হইবে। আমরা সর্বদ্বাররুদ্ধ জগতের কোণে বাস করিতে পারিব না। যখন ভারত স্বাধীন হইবে তখন তাহাকে আধুনিক শত্রুগণের সহিত আধুনিক প্রথাতেই যুদ্ধ করিতে হইবে—অর্থ-নীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে।'

'গোরুর গাড়ির দিন গিয়াছে, চিরদিনের মতো গিয়াছে। স্বাধীন ভারতকে সর্বদা অস্ত্রে-বর্মে সুসজ্জিত থাকিতে হইবে—কালের প্রতীক্ষায়, যতদিন না জগৎ অস্ত্রশস্ত্র পরিহারের সংকল্প কার্যে পরিণত করিতেছে।'

[আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯২৮ সাল]

সেই চিরাচরিত নবীন ও প্রবীণের দ্বন্দ্ব।

প্রবীণের বক্তব্য—হিংসা নয়, বিদ্বেষ নয়, শুধু ভালবাসা। এই ভালবাসা দিয়েই আমি ইংরেজের হৃদয় পরিবর্তন করে স্বাধীনতা এনে দেব।

নবীন তা বিশ্বাস করতে রাজী নয়। তার যুক্তি, সাপ মারতে হলে লাঠির দরকার। মনসা পুজোয় কোনদিনও সাপ মরে না।

প্রবীণ চায়, আপস-আলোচনার মাধ্যমে সাবধানে পা ফেলে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে।

নবীনের মতে এটা কোন যুক্তিই নয়। ভিক্ষায় কোনদিনও স্বাধীনতা আসে না। আলাপ-আলোচনা বা দর-কষাকষির মাধ্যমেও নয়। চাই সংগ্রাম। বৃথা কালক্ষয় না করে এখনই সংগ্রামের পথে পা বাড়ানো উচিত।

একজনের প্রথম ও শেষ কথাই হল, অহিংসা। এমন কি, স্বাধীনতার চাইতেও বুঝি সে অহিংস-নীতি তাঁর কাছে অনেক বেশি পবিত্র, অনেক বেশি মূল্যবান।

অন্যজনের জীবনভোর একটাই মাত্র স্বপ্ন—স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তিনি সব কিছু দিতে প্রস্তুত। সব কিছু করতে প্রস্তুত। মোদ্দা কথা, ছলে-বলে-কৌশলে যেভাবেই হোক, স্বাধীনতা চাই-ই।

লক্ষ্য এক, কিন্তু মত ও পথ আলাদা।

গান্ধীজীরও সেকথা অজানা ছিল না। অনেক কথাই তিনি শুনেছিলেন সুভাষের বিরুদ্ধে। অনেক অভিযোগ। অনেক নালিশ।

শুধু মুখেই নয়, লিখিতভাবেও। সুভাষ বিদ্রোহী। সুভাষ সন্ত্রাসবাদী। বিপ্লবীদের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। শুধু শুধু তাঁকে মান্দালয় জেলে আটক করে রাখা হয়নি। আটক করে রাখা হয়েছিল সেই একই কারণে। মোট কথা, সুভাষ আর যাই হোন, অহিংস-নীতিতে পুরোপুরি আস্থাবান নন।

প্রমাণ, পুলিশ দপ্তরের গোপন নথীপত্র। স্পষ্টই সেখানে লেখা রয়েছে ঃ

'...In 1924 the terrorist member of the Swarajya Party supported the candidature of Mr. Subhas Chandra Bose as Chief Executive Officer of the Corporation and it is noteworthy that after his appointment to that post many jobs in the Corporation were given to terrorists.'

[১৯২৪ সালে স্বরাজ্য দলের বিপ্লবী সদস্যগণ কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার পদের জন্য মিঃ সুভাষচন্দ্র বোসকে সমর্থন করেছিলেন, এবং এটা লক্ষণীয় যে, তাঁর ঐ পদে নিয়োগের পর কর্পোরেশনের অনেক চাকরি বিপ্লবীদের দেওয়া হয়েছিল।]

শুধু একবার নয়, বিপ্লবীদের সঙ্গে সুভাষের ঘনিষ্ঠতার কথা এমনিভাবে উল্লেখ করা হয়েছে অসংখ্যবার। যেমন ঃ

'At this time there was an agreement between Subhas Bose and the terrorists that the latter should run the Bengal Provincial Congress Committee under his guidance.'

[এ সময়ে সুভাষ বোস ও বিপ্লবীদের মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছিল যে, তাঁরা তাঁর নির্দেশমত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি পরিচালনা করবেন।]

বিপ্লবীদের সঙ্গে সুভাষের এই ঘনিষ্ঠতার কথা কি করে সেদিন জানা সম্ভব হয়েছিল পুলিশের পক্ষে! সেকথাও তাদের গোপন নথীপত্রে লিখিত রয়েছে বেশ স্পষ্টভাবেই।

'Early in 1925 a prominent member of the Congress Party admitted during an interview with a high Government official that he knew personally of the existence in Bengal of a terrorist movement the members of which, were hand in glove with the Swarajist.' [Ibid, P, 3]

[১৯২৫ সালের প্রথমদিকে কংগ্রেসের একজন বিখ্যাত নেতা জনৈক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর কাছে স্বীকার করেছিলেন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে জানেন যে, বাংলাদেশে একটি বৈপ্লবিক আন্দোলনের অস্তিত্ব আছে, যারা স্বরাজ্য দলের মুখোশ পরে রয়েছেন।]

বিখ্যাত নেতাটি কে? না, সে সম্বন্ধে রিপোর্টে কোন উল্লেখ নেই। ইংরেজ আর যাই হোক অকৃতজ্ঞ নয়, তাই লিখতে গিয়েও উপকারী বন্ধুকে সতর্কভাবে আড়াল করে রাখতে তাদের ভুল হয়নি।

খোলাখুলিভাবেই একদিন প্রশ্ন করেছিলেন গান্ধীজী,—বিপ্লবীদের সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করা কোনরকমেই কি সম্ভব নয়?

—না। সুভাষের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

—কারণ? পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন গান্ধীজী।

—কারণ, বিপ্লব মানে শুধু ধ্বংস নয়, সৃষ্টিও বটে। একহাতে তার রণতূর্য অন্যহাতে সৃজনমুখর বাঁশরী। তাই একই সঙ্গে তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে ধ্বংস ও সৃষ্টির আহ্বান। এককথায় বিপ্লবের অর্থ—

অন্যায় রাষ্ট্র-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। আপনি কি তা চান না? সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে আপনিই কি ভারতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নন?

জবাব শুনে নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন গান্ধীজী। আশ্চর্য, যেমন গুরু, তেমনই তাঁর শিষ্য। দেশবন্ধুও ঠিক এমনি কথাই বলতেন। বিপ্লবীদের প্রসঙ্গ উঠলে খোলাখুলিভাবেই তিনি বলতেন,—'ওদের নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের কথা ভাবলে আমার সকল অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে যায়।'

সুভাষের মুখেও আজ সেই একই কথার প্রতিধ্বনি। একই আকুলতা। কোথায় এর শেষ কে জানে!

লক্ষ্য এক, তবু দুই যন্ত্র দুই সুরে বাঁধা। তাই দিন কয়েক যেতে না যেতেই আবার সেই বিরোধ। আবার সেই ভুল-বোঝাবুঝির পালা।

ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের দাবী-সম্বলিত খসড়া প্রস্তুত। এবার এই খসড়া তুলে দিতে হবে বড়লাট লর্ড আরউইনের হাতে। নাও, সবাই এবার সই কর একে একে। ওয়ার্কিং কমিটির সবার সই এখানে থাকা প্রয়োজন।

সবাই সই দিলেন একে একে। এমন কি, জওহরলালও বাদ গেলেন না। বেঁকে বসলেন শুধু একজন। না, আমি সই দেব না।

—কারণ? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন গান্ধীজী।

—আমি তো আগেই বলে দিয়েছি সে-কথা। দৃপ্তকণ্ঠে জবাব দিলেন সুভাষ, আমার দাবী ঐ আধখানা স্বাধীনতা নয়, পূর্ণ স্বাধীনতা। এ ব্যাপারে কোনরকম আপস করতে আমি রাজী নই।

স্থির, অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন গান্ধীজী। চিরপরিচিত জগতে সুভাষ মস্ত বড় একটা প্রহেলিকা যেন। ওকে ঠিক চেনা যায় না। বোঝা যায় না। আবার অস্বীকারও করা যায় না।

বরং জওহরলালকে কিছুটা বোঝা যায়। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা যৌবন-শক্তির অপরিমেয়তায় জওহরলাল মাঝে মাঝে যতই মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চেষ্টা করুক না কেন, প্রয়োজনের মুহূর্তে সে আত্মসমর্পণ করতে জানে। বশ মানতে জানে।

কিন্তু সুভাষ! কার সাধ্য নিজের বিশ্বাস বা আদর্শ থেকে তাকে একচুল বিচ্যুত করে। এ ব্যাপারে সে নির্মম ও ক্ষমাহীন।

বিরোধ আরো ঘনীভূত হল ১৯২৯ সালে অনুষ্ঠিত লাহোর কংগ্রেসে। সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল।

গান্ধীজী হিসেবে ভুল করেননি। কি করে বনের পাখিকে সোনার শেকল পরাতে হয় তিনি তা ভাল করেই জানেন। সুতরাং এ জওহরলাল যেমন শান্ত, তেমনই সমাহিত।

বাকি রইল একমাত্র সুভাষ। তাকেও একদিন পোষ মানতে হবে এমনি করে। না মেনে যাবে কোথায়?

আশ্চর্য, কলকাতা কংগ্রেসে না মানলেও এবার কিন্তু নিজে থেকেই পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পেশ করলেন গান্ধীজী। সেই সঙ্গে আরো সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে সরকারকে এই দাবী মেনে নিতে হবে। অন্যথায় শুরু হবে আইন-অমান্য আন্দোলন।

গোল বাধল গান্ধীজীর পরবর্তী একটি বিবৃতি নিয়ে। দেখা গেল মুখে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বললেও আসলে তিনি যা চাইছেন, তা সেই পুরনো ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন সুভাষ। সেই একঘেয়ে পুরনো কথা! সেই পুরনো দাবী! একমাত্র কালক্ষয় করা ছাড়া কতটুকু লাভ হবে এই প্রস্তাবের ফলে?

স্বাধীনতা শিশুর হাতের খেলনা নয়। চাইলেই তা পাওয়া যায় না। তার জন্য মূল্য দিতে হয়। সংগ্রাম করতে হয়। কোথায় তার প্রস্তুতি?

সবার চোখে-মুখে সপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা। কি বলতে চান বিদ্রোহী সুভাষ?

—চাই পাশাপাশি জাতীয় সরকার গড়ে তুলতে। যেভাবে গড়ে তুলেছিলেন আয়ারল্যাণ্ডের সিন্‌ফিন্‌ বিদ্রোহীরা।

—না, আমাদের এদেশে তা সম্ভব নয়।

—কে বলে সম্ভব নয়? বুক চিতিয়ে দাঁড়ালেন সুভাষ, একফোঁটা আয়ারল্যাণ্ডে যা সম্ভব হয়েছে. আমাদের এখানে তা সম্ভব হবে না কেন? নিশ্চয় সম্ভব!

ফল পাওয়া গেল হাতে হাতেই। সঙ্গে সঙ্গেই ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য তালিকা থেকে বাতিল করে দেওয়া হল সুভাষের নাম। গান্ধীজীর ভাষায়, —'যারা একমতের মানুষ, একমাত্র তাদেরই ওয়ার্কিং কমিটিতে থাকা উচিত।'

সুভাষ একমতের নন। সুতরাং ওয়ার্কিং কমিটিতে তাঁর স্থান পাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

আর সুভাষ! সঙ্গে সঙ্গে তিনি অধিবেশন ছেড়ে বেরিয়ে এলেন তাঁর বাষট্টি জন অনুগামীকে সঙ্গে নিয়ে। আবেদন-নিবেদনে কোনদিনও স্বাধীনতা আসে না, এ সত্যটা ওরা কবে বুঝবে! কবে বুঝবে যে, প্রেম বা ভালবাসা বিলিয়ে কোনদিনও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়!

৩১শে ডিসেম্বর শেষ হল, কিন্তু কোথায় স্বাধীনতা? কোথায় কি? কোন জবাবই এল না বড়লাট লর্ড আরউইনের দিক থেকে।

বড়লাটকে লক্ষ্য করে এবার শেষ আবেদন জানালেন গান্ধীজী।

'আমি নতজানু হয়ে রুটি চেয়েছিলাম। পেলাম শুধু পাথর। সুতরাং একটি মাত্র পথই এখন আমার সামনে খোলা আছে, তা হল আইন-অমান্য আন্দোলন। সমুদ্র থেকে জল তুলে অনায়াসেই লবণ তৈরি করা যেতে পারে, অথচ তার জন্য আমার গরীব দেশবাসীকে কি বিপুল হারেই না ট্যাক্স গুনতে হয়। কেন এই বর্বর আইন? এ আইন আমি মানি নে। মানব না।'

'সুতরাং আগামী ১১ই মার্চ আমি আমার আশ্রমবাসীদের নিয়ে সমুদ্র উপকূলে গিয়ে এই লবণ-আইন অমান্য করব। যতক্ষণ একটি মাত্র অহিংস যোদ্ধা জীবিত থাকবে, ততক্ষণ এ আন্দোলন থামবে না।'

'আমি জানি আমাকে গ্রেপ্তার করে আমার এই পরিকল্পনাকে আপনি বানচাল করে দিতে পারেন। কিন্তু জেনে রাখুন যে, আমার পেছনে হাজার

হাজার লোক এগিয়ে আসবে। হাসিমুখে কারাবরণ করতে তাদের এতটুকুও বাধবে না।'

সুভাষ তখন জেলে। অপরাধ—গত বছরের আগস্ট মাসে নিখিল ভারত লাঞ্ছিত রাজনৈতিক দিবস উপলক্ষে বে-আইনী শোভাযাত্রা পরিচালনা করা। রায় দেওয়া হয়েছে ২৩শে জানুয়ারী। মোট ন' মাস সশ্রম কারাদণ্ড।

তারিখটা তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ মল্লিকা! ২৩শে জানুয়ারি। সুভাষের জন্মদিন।

ওদিকে ১২ই মার্চ সবরমতী আশ্রম থেকে গান্ধীজী তাঁর পদযাত্রা শুরু করলেন ঊনআশি জন আশ্রমবাসী সঙ্গে নিয়ে।

লক্ষ্য, দু'শ মাইল দূরবর্তী সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত ছোট্ট একটি গ্রাম—ডাণ্ডি। পায়ে পায়ে হেঁটে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে অবশেষে তিনি সেখানে গিয়ে আইন-অমান্য করবেন তাঁর আশ্রমবাসীদের সঙ্গে নিয়ে।

কাণ্ড দেখে ইংরেজ হেসেই খুন। বিশেষ করে স্টেটস্‌ম্যান প্রমুখ সরকারী মুখপত্রগুলির তো কথাই নেই। তারা তো ঠাট্টাই শুরু করে দিল রীতিমত। এই নাকি মিঃ গান্ধীর আইন-অমান্য আন্দোলন! নাঃ! মজা মন্দ নয় দেখছি!

কিন্তু একি! দেখতে দেখতে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল শাসক মহাপ্রভুদের। এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার দেখছি! কিসের প্রেরণায় আজ ঘুমন্ত ভারতবাসী এমন করে জেগে উঠল! কার ইঙ্গিতে? ঐ অর্ধ-উলঙ্গ ফকীরটি যে ভেতরে ভেতরে এত শক্তি ধরে তা কে জানত!

পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছেন গান্ধীজী। মুখে সেই শিশুর মতো হাসি। হয় গ্রেপ্তার কর, নয় তো লবণ-আইন তুলে নাও। হয় আমার ঈপ্সিত বস্তু নিয়ে ঘরে ফিরব, নয়তো আমার মৃতদেহ সমুদ্রের জলে ভাসবে। দুটোর একটাও যদি না কর, তবে আমরা হাসিমুখে তোমাদের গুলীর সামনে বুক পেতে দেব, তবু এই অন্যায় আইন মানব না।

রাস্তার দুপাশে কাতারে কাতারে লোক। বৃদ্ধ, যুবক, শিশু কেউ বাদ নেই। চল ভাই সব ডাণ্ডি! আমরাও যাব আমাদের বাপুজীর সঙ্গে। বন্দে মাতরম্! ভারতমাতাকী জয়! মহাত্মা গান্ধীকী জয়! চল ভাই সব, পা চালিয়ে।

মল্লিকা, তোমরা একালের ছেলেমেয়ে। সত্যিকারের আইন-অমান্য অন্দোলন যে কি জিনিস তা বোধহয় আজ তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। সে এক অভুতপূর্ব দৃশ্য! যেদিকে তাকানো যায়, শুধু আইন ভাঙার মহোৎসব। বন্দে মাতরম্! তোমাদের আইন আমরা মানি নে। মানব না।

সেখানেও সবার পুরোভাগে বাংলার সেই বিপ্লবিগণ। প্রমাণ—পুলিশ দপ্তরের সেই গোপন নথীপত্র:

'The Bengal terrorists took an active part in the Civil Disobedience Movement in 1930 and many of them were imprisoned for picketing.'

[বাংলার বিপ্লবিগণ ১৯৩০ সালের অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই পিকেটিং করে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন।]

হকচকিয়ে গেল ইংরেজ সরকার। এই যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে! না, আর উপেক্ষা করা চলে না। যে করে হোক, এ আন্দোলন স্তব্ধ করতেই হবে।

শুরু হল অকথ্য নির্যাতন। গ্রেপ্তার, লাঠি, গুলী, টিয়ার গ্যাস কিছুই বাদ গেল না।

কিন্তু সব বৃথা। এক যায়, আর আসে। ঝাঁকে ঝাঁকে আসে। দলে দলে এগিয়ে আসে। বুঝি আর শেষ নেই এই আসা-যাওয়া মিছিলের।

বিশেষ করে মেয়েরা। আজ দিন-কাল পাল্টে গেছে। মানুষের চিন্তাধারারও পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু সেদিন!

সেদিন কিন্তু মেয়েদের পক্ষে প্রচলিত বিধি-নিষেধের বাইরে পা বাড়ানো খুব একটা সহজ ছিল না। তা সত্ত্বেও দেশপ্রেমের দুর্বার প্রেরণায় সেদিন তারা যেভাবে সব কিছু উপেক্ষা করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সত্যিই তা অভূতপূর্ব।

গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হল ৫ই মে তারিখে। তারপর দেখতে দেখতে ষাট হাজার লোক গ্রেপ্তার বরণ করল একে একে। নতুন জেলখানা তৈরি হল, তাতেও তিলধারণের জায়গা নেই। এবার! এবার কি করবে তোমরা? কোথায় রাখবে আমাদের? মারবে? লাঠি পেটা করবে? গুলী করবে? বেশ, কর!

রুখে দাঁড়ালেন বাংলার বিপ্লবিগণ। তাঁদের সাফ কথা, ওসব বৈরাগ্য-সাধন মুক্তিতে আমাদের আস্থা নেই। তত্ত্বকথাও আর শুনতে চাই নে। আমাদের সোজা হিসেব—এক ঘা দেবে তো পাল্টা দশ ঘা ফিরিয়ে দেব। প্রমাণ চাও! বেশ, তাই দেব।

প্রমাণ দিল চট্টগ্রাম, ঢাকা, কুমিল্লা, কলকাতা, মেদিনীপুর ও এমনি কত জায়গা। চরম আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে একের পর এক তাঁরা রক্তের অক্ষরে ইতিহাসের পাতায় লিখে দিলেন যে, বাংলার বেপরোয়া যুবশক্তি কোনদিনও মরতে ভয় পায় না। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তারা মূল্য দিতে জানে।

একদিকে দুর্বার আইন-অমান্য আন্দোলন, অন্যদিকে বিপ্লবীদের বেপরোয়া অস্ত্রাঘাত। এই দুমুখী আক্রমণে ইংরেজ তখন দিশেহারা। কি করা যায় এখন! কাকে ছেড়ে কাকে ধরা যায়! বিপদ যে দুদিকেই!

সুভাষ মুক্তি পেলেন ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে। তারপর সেই একই অবস্থা। ঘূর্ণির মত আজ এখানে, কাল ওখানে, পরশু কোথায় তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

এল ১৯৩১ সাল। জানুয়ারি মাস। সুভাষ তখন উত্তরবঙ্গ পরিভ্রমণে

রত। সংগঠনকে আরও জোরদার করে তুলতে হবে। আরও শক্তিশালী।

বাদ সাধলেন মালদহের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। না, এ জেলায় তোমাকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। আমার হুকুম।

—এ হুকুম বে-আইনী। গর্জে উঠলেন সুভাষ, একজন আত্মসম্মান-বিশিষ্ট ভারতবাসী হিসেবে এ হুকুম আমি কিছুতেই মানতে রাজী নই।

অগত্যা গ্রেপ্তার। প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগারে নিয়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই বিচার। জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হুকুম অমান্য—একি চাট্টিখানি অপরাধ! সুতরাং সাজা দেওয়া হল সাত দিনের কারাদণ্ড।

সেই রাত্রেই নাটোর হয়ে সুভাষকে পাঠিয়ে দেওয়া হল আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। হাজার হোক, সুভাষ বোস! এক্ষুণি হয়তো এ নিয়ে মিছিলের পর মিছিল বেরিয়ে পড়বে সব কিছু বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে। সুতরাং ছোট শহর মালদহ থেকে ওঁকে সরিয়ে দেওয়াই সবচাইতে নিরাপদ।

আবার সংঘাত বাধল ২৬শে জানুয়ারি তারিখে।

কংগ্রেস তখন বে-আইনী ঘোষিত। সভা-সমিতি-মিছিল ইত্যাদিও নিষিদ্ধ। কিন্তু সেকথা শোনে কে!

২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা সংকল্প গ্রহণের দিন। পরাধীন জাতির কাছে এই দিনটির চাইতে পবিত্র আর কিছুই নেই। সুতরাং সব কিছু উপেক্ষা করেই মনুমেণ্ট বেদীর ওপর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। মিছিলও বেরুবে। সে মিছিলের পুরোভাগে থাকবেন স্বয়ং সুভাষ।

ওদিকে মনুমেণ্টের চারপাশে সকাল থেকেই বিরাট পুলিশ বাহিনী প্রস্তুত। সেই সঙ্গে অসংখ্য শ্বেতাঙ্গ সার্জেণ্ট ও ঘোড়সওয়ারের দল। কাউকেই তারা ধারে-কাছে এগুতে দিতে রাজী নয়।

সব কিছু উপেক্ষা করে যথাসময়ে বিরাট মিছিল নিয়ে এগিয়ে গেলেন সুভাষ। হাতে তাঁর জাতীয় পতাকা। মুখে একটি মাত্র ধ্বনি—বন্দে মাতরম্!

ইঙ্গিত পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র হায়েনার দল ঝাঁপিয়ে পড়ল উন্মত্তের মতো। তারপরই শুরু হল একটানা লাঠিচার্জ। সামনে-পেছনে ডাইনে-বাঁয়ে শুধু লাঠি, লাঠি আর লাঠি! ঢালাও হুকুম পাওয়া গেছে। সুতরাং একতরফা চালিয়ে যাও।

বাধা দিলেন জ্যোতির্ময়ী দেবী। কাকে মারছ তোমরা! জানো উনি কে? উনি যে কলকাতার মেয়র!

কে কার কথা শোনে! বৃষ্টিধারার মতো লাঠি পড়ছে অবিরাম। তার মধ্যে কে গেল, কে রইল, তার হিসেব-নিকেশ করার মতো অবকাশ তখন কোথায়!

রক্তে রক্তে সারা দেহ লাল হয়ে গেল সুভাষের। তবু তিনি নির্বিকার। সব কিছু উপেক্ষা করে তিনি এগুতে লাগলেন হিমালয়ের মতোই মাথা উঁচু করে! আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে তারপরই এক সময় জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন শক্ত মাটির বুকে।

আবার বিচার। আবার কারাদণ্ড। এবারে মেয়াদ হল মোট ছ'মাস।

হঠাৎ একটা খবর শুনে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা ভারতবর্ষ। গান্ধীজী নাকি কয়েকটি শর্তে ইংরেজের সংগে রফা করতে চলেছেন। যেমন—যাবতীয় ধৃত বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। তাঁদের জরিমানার টাকাও ফিরিয়ে দিতে হবে। আর লবণ তৈরির ব্যাপারে সমুদ্র উপকূলবর্তী জনসাধারণকে অন্তত কিছুটা রেহাই দিতে হবে। ব্যস্, এইটুকু পেলেই তিনি খুশি।

খবর শুনে অসহ্য ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বন্দী সুভাষ। সেই পুরনো টালবাহানা! সেই হরেক রকম দর-কষাকষি! সেই চৌরিচৌরা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি!

১৯২২ সালেও এমনি করে একবার গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন সামান্য একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সেদিনও তিনি বড়লাট লর্ড রেডিংকে এমনি করে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন তাঁর অভিপ্রায়ের কথা।

'আমি আপনাকে সাত দিন সময় দিচ্ছি। তার আগেই আপনি খবরের কাগজ থেকে সবরকম বিধি-নিষেধ তুলে নিন। আর যে সব লোক অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য জেলে রয়েছে, তাদের মুক্তি দিন! যদি সাত দিনের মধ্যে তা করেন, তাহলে আমি বারদোলী আন্দোলন তুলে নেব। অন্যথায় আমরা আমাদের আন্দোলনে অগ্রসর হব।'

সমগ্র দেশ আশা ও প্রতীক্ষায় উদ্গ্রীব। আজ ১লা ফেব্রুয়ারি। মাঝে সাত দিন। ৯ই ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে ঐতিহাসিক বারদোলী আন্দোলন।

কোথায় আন্দোলন, আর কোথায় কি!

সব কিছু বিপর্যস্ত হল ৫ই ফেব্রুয়ারি গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা গ্রামে অনুষ্ঠিত সামান্য একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

সত্যাগ্রহীদের একটা মিছিল যাচ্ছিল সেদিন চৌরিচৌরা গাঁয়ের পথ ধরে। হঠাৎ পথরোধ করে দাঁড়াল পুলিশ বাহিনী। না, মিছিল যেতে দেওয়া হবে না এ পথ দিয়ে। এটা বে-আইনী।

কথা-কাটাকাটি থেকে বচসা। তারপর সংঘর্ষ। শেষপর্যন্ত থানায় আগুন ধরিয়ে দিল উত্তেজিত জনতা। ফলে, অগ্নিদগ্ধ হয়ে একজন সাব-ইন্সপেক্টর ও কয়েকজন কনস্টেবলের মৃত্যু।

সংগে সংগে সমস্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন গান্ধীজী। ভারতবাসী এখনো অহিংস-নীতিতে পুরোপুরি অভ্যস্ত হতে পারেনি। সুতরাং আর আন্দোলন নয়।

দেশবন্ধু, সুভাষ, মতিলাল নেহরু, লাল লাজপত রায় সবাই তখন জেলে। জেল থেকেই তাঁরা গান্ধীজীর এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন কঠোর ভাষায়।

চৌরিচৌরার ব্যাপার একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। তার জন্য আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে কেন?

বিরাট এই ভারতবর্ষে কে, কোথায়, কবে অহিংস থাকতে পারেন, তার জন্য কি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন পিছিয়ে দিতে হবে ?

ক্ষোভে, দুঃখে জেল থেকে গান্ধীজীর উদ্দেশে দীর্ঘ সত্তর পাতা-ব্যাপী এক চিঠি লিখে পাঠলেন লালা লাজপত রায়। এর মানে কি ! কি এমন কারণ ঘটেছিল, যার জন্য দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে এভাবে বন্ধ করে দেওয়া হল ?

আর দেশবন্ধু ? সুভাষের লেখা থেকেই তার বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ

'I was with the Deshabandhu at the time and I could see that he was beside himself with anger and sorrow at the way Mahatma Gandhi was repeatedly bungling'.

[The Indian Struggle, Part II, P. 198]

[সে সময়ে আমি দেশবন্ধুর সঙ্গে ছিলাম। আমি দেখেছি যে, মহাত্মা গান্ধী বার বার যেভাবে ভুল করে যাচ্ছিলেন, তা দেখে তিনি রাগে এবং দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন।]

কংগ্রেসের পরবর্তী ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হল গান্ধীজীকে। বিশেষ করে বাংলা ও মহারাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের প্রশ্নের সামনে।

কেন সংগ্রাম প্রত্যাহার করা হল ? কেন স্বাধীনতা সংগ্রামকে এমন করে স্তব্ধ করে দেওয়া হল ? কেন ? কেন ?

সবাইকে ছাপিয়ে গেলেন প্রখ্যাত নেতা মুঞ্জে। তিনি প্রস্তাব আনলেন —গান্ধীজীকে ভর্ৎসনা করা হোক ! বলাই বাহুল্য যে, সে প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়নি।

১৯২২-এর পর ১৯৩১। আশ্চর্য, এবারেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি !

গান্ধীজী নাকি ইতিমধ্যে বড়লাটের সদিচ্ছার প্রমাণ পেয়েছেন। তাই আন্দোলন তুলে নিয়ে তাঁর সঙ্গে একটা চুক্তি করতে তিনি বদ্ধপরিকর।

কিন্তু দেশ ! দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর দেশের সমস্ত জনসাধারণ সবেমাত্র আজ ঘুম ভেঙে উঠে দাঁড়িয়েছে। বার বার এভাবে আন্দোলন প্রত্যাহার করা হলে তারা কি হতাশায় ভেঙে পড়বে না ? আবার ঘুমিয়ে পড়বে না ?

'ইনক্লাব জিন্দাবাদ !'

কথাটা সর্বপ্রথম কার মুখ থেকে বেরিয়েছিল জানো, মল্লিকা ? ভগৎ সিং। মহান বিপ্লবী ভগৎ সিং। তিনিই এই মহামন্ত্রের উদ্গাতা।

ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরু। অগ্নিযুগের ইতিহাসে তিনটি উল্লেখযোগ্য নাম। তিনজনেই তখন মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুনছেন লাহোর সেণ্ট্রাল জেলের অভ্যন্তরে।

স্বভাবতঃই ভারতবর্ষ তখন ক্ষুব্ধ, চঞ্চল। মন সায় দেয় না, কিন্তু উপায় কি! সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নির্মম প্রতিহিংসা থেকে কিছুতেই যে তাঁদের রক্ষা করার উপায় নেই!

হঠাৎ যেন একটু আলো দেখতে পাওয়া গেল চোখের সামনে। গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে সর্বাগ্রে বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাহলে ভগৎ সিং-দের মুক্তি দেওয়া হবে তো! নিশ্চয়ই তাই!

মুক্তি না হোক, অন্তত প্রাণদণ্ড রোধ তো হবেই! গান্ধীজী যেখানে রয়েছেন, সেখানে আর ভাবনা কি!

দেখতে দেখতে সামান্য কথাটা অসামান্য হয়ে দেখা দিল সমগ্র ভারতবাসীর সামনে। তারপরই আসমুদ্র-হিমাচল সোচ্চার হয়ে উঠল এই একটিমাত্র দাবী নিয়ে।

ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর প্রাণদণ্ড রোধ করতে হবে। গান্ধী-আরউইন চুক্তির এটাই হবে প্রধান শর্ত।

শুধু গান্ধীজী নন, শুধু আরউইন নন, উভয়পক্ষকেই এ ব্যাপারে ভারতবাসীর কাছে তাঁদের সদিচ্ছার প্রমাণ দিতে হবে।

বাংলা, তথা ভারতের বিভিন্ন বন্দিশালাগুলোতেও সেই একই চঞ্চলতা। ভগৎ সিং-দের ফাঁসি রোধ করতে হবে। অন্যথায় এ চুক্তি মূল্যহীন।

একই দাবী পেশ করলেন চট্টগ্রাম জেলে আবদ্ধ গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, অম্বিকা চক্রবর্তী প্রমুখ যুব-বিদ্রোহের বিচারাধীন বন্দীর দল।

গোপনে তাঁরা চিঠি লিখে পাঠালেন গান্ধীজীকেঃ

'আমরা ফাঁসির প্রতীক্ষায় দিন গুনছি। তার জন্য কোন দুঃখ নেই আমাদের। কিন্তু ওঁদের আপনি বাঁচান বাপুজী। আপনিই একমাত্র লোক যিনি ওঁদের প্রাণ রক্ষা করতে সক্ষম।'

গান্ধীজীর কাছে গোপনে প্রেরিত এই চিঠির কথা কিন্তু পুলিশ কর্তৃপক্ষের জানতে এতটুকুও বাকি থাকেনি, মল্লিকা। প্রমাণ—মামলার রায়। বিচারপতি মিঃ ইয়ুনি স্পষ্টই সেখানে বলেছিলেনঃ

'In March 1931 the under trial accused in Chittagong Armoury Raid Case sent a letter to Mr. Gandhi'...

চরমপত্র দিলেন বক্সা দুর্গে আবদ্ধ বিভিন্ন দলের প্রথম সারির বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ।

সবাই মিলে পরামর্শ করে একসঙ্গে তিনখানি চিঠি তাঁরা লিখে পাঠালেন গান্ধীজী, জওহরলাল ও স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর উদ্দেশে। চিঠিতে সব কিছু তাঁরা লিখে জানালেন খোলাখুলিভাবে।

কাউকে ফাঁসি দেওয়া চলবে না। দিলে এ চুক্তি আমরা মেনে নেব না। তখন যদি কোনরকম অশান্তি হয় তো তার জন্য দায়ী হবেন চুক্তির দুপক্ষের নেতারাই।

যথাসময়ে তেজবাহাদুর সে চিঠি তুলে দিলেন বড়লাট লর্ড আরউইনের

হাতে। চিঠিতে তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তাঁকে।

মন দিয়ে চিঠিটা পড়লেন আরউইন। আর এক সময়ে প্রশ্ন করলেন,—আলোচনা করতে আমি প্রস্তুত। কিন্তু কার সঙ্গে আমি কথা বলব এ সম্বন্ধে? ওদের প্রতিনিধি কে?

—সুভাষ বোস।

—সুভাষ বোস! যেন সাপ দেখে আঁতকে উঠলেন আরউইন। না না, সুভাষ বোসের সঙ্গে আমি এ সম্বন্ধে কোন আলাপ করতে রাজী নই। আর কেউ আছে কি?

—আছেন, তবে তিনি এখন পলাতক। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হলে তাঁকে যাওয়া-আসার অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে। প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, সেই সুযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে না।

—কে সেই লোক? আরউইনের মুখে সপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা।

—সূর্য সেন।

—মাই গড্! কানের কাছে বাজ পড়লেও বুঝি এতখানি চমকে উঠতেন না আরউইন, সূর্য সেন! দি গ্রেট্ সূর্য সেন!

আশ্চর্য, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বক্সা ক্যাম্পে সরকারী চিঠি এসে হাজির। অত্যন্ত নরম সুর—তোমাদের প্রস্তাব তোমরা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে লিখে জানাও।

তাই জানানো হল। কিন্তু এবার চিঠির জবাব এল অনেক দেরি করে। সুরও ততটা নরম নয়। কারণ ওদিকে তখন স্টেটস্‌ম্যান, ইয়োরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশন, বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স ইত্যাদি শ্বেতাঙ্গ সংস্থাগুলি রীতিমত শোরগোল তুলেছে: 'No track with the terrorists.'—ফলে, আলোচনা সেখানেই ইতি।

তা বলে ব্যাপারটা কিন্তু এখানেই শেষ হল না, মল্লিকা। সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ তৎপর হয়ে উঠলেন নতুন এক পরিকল্পনা নিয়ে। সে পরিকল্পনা যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনই অভূতপূর্ব।

'আমাদের দাবী উপেক্ষা করে কাউকে ফাঁসি দিলে আমরা তার প্রতিশোধ নেব। পনেরো দিনের মধ্যেই নেব। লোকালয় থেকে বহু দূরে পাহাড়-ঘেরা এই বক্সা ক্যাম্পে আমরা বন্দী। এই বন্দী-নিবাসে থেকেই আমরা বুঝিয়ে দেব যে, বাংলার প্রাণশক্তি এখনো মরে যায়নি।'

চুক্তি স্বাক্ষরিত হল ৫ই মার্চ। তারপর শুরু হল বন্দী-মুক্তির পালা। সবাই মুক্তি পেলেন। সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হল।

শুধু মুক্তি পেলেন না অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বাংলার বিপ্লবীগণ। বোঝা গেল, কি গান্ধীজী, কি আরউইন, কারো বিচারেই বিপ্লবীরা ঠিক বন্দীর পর্যায়ে পড়েন না। কারণ, তাঁরা গান্ধীজীর অহিংস-নীতিতে আস্থাবান নন। সুতরাং তাঁরা এক-ঘরে, সমাজচ্যুত। তাঁদের হৃৎকোনাপিত বন্ধ।

৮ই মার্চ তারিখে মুক্তি পেলেন সুভাষ। ১৪ই মার্চ তিনি বি. ভি.-র সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে গেলেন গান্ধীজীর কাছে। ব্যাপারটা সম্বন্ধে পরিষ্কার বোঝাপড়া করা দরকার।

তার চাইতেও বড় কথা ভগৎ সিং, শুকদেব আর রাজগুরু। তাঁদের কি হবে! ঐ তিনটি তরুণের ফাঁসির বদলে দ্বীপান্তর হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভেসে যাবে না, বরং ইংরেজের সদিচ্ছার পরিচয় পেয়ে দেশবাসী খুশিই হবে।

সে দায়িত্ব এখন পুরোপুরি গান্ধীজীর। একমাত্র তিনিই পারেন এ ব্যাপারে বড়লাটকে বাধ্য করতে।

—কিন্তু বড়লাট যদি আমার অনুরোধ না রাখেন? সব কথা শুনে প্রশ্ন করলেন গান্ধীজী।

—তাহলে আপনিও সঙ্গে সঙ্গে চুক্তি ভেঙে দেবেন। স্পষ্ট জবাব দিলেন সুভাষ, চুক্তির ফলে জনসাধারণের ন্যূনতম দাবীও যদি রক্ষিত না হয়, তাহলে সে চুক্তি মেনে নিয়ে লাভ কি? জনসাধারণই বা তা মানবে কেন?

এখানেই কিন্তু থামলেন না সুভাষ। গান্ধীজীর সঙ্গে একই ট্রেনে তিনি রওনা হয়ে গেলেন দিল্লীতে। যে করে হোক, গান্ধীজীকে দিয়ে ওঁদের ফাঁসির হুকুম রদ করানো চাই-ই!

তারপর! কি উত্তর পেল দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের আকুল প্রত্যাশার বিনিময়ে?

দেশের কতটুকু লাভ হল গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে?

ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরুরই বা কি হল?

সে কাহিনী যেমন মর্মান্তিক, তেমনি বেদনাদায়ক। শ্রদ্ধেয় অনন্ত সিংহের মুখ থেকেই সে কাহিনী তুমি শোনঃ

'১৯৩১ সালের ৫ই মার্চ গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট বা সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হল। গান্ধীজীর শর্ত অনুযায়ী আইন-অমান্য আন্দোলনে ধৃত সমস্ত কংগ্রেস-কর্মী মুক্তি পেল। হিংসাত্মক কার্যে দণ্ডিত বন্দীদের মুক্তির দাবীতে গান্ধীজী বড়লাট আরউইনকে কোন অনুরোধ জানাননি। এমন কি, দেশবাসীর একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের প্রাণদণ্ড রোধের জন্য কোন দাবীও বড়লাটের কাছে পেশ করা প্রয়োজন মনে করেননি। ১৯৩১ সালের ২৩শে মার্চ তাঁদের ফাঁসি হয়ে গেল। ব্রিটিশের Divide and Rule [বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন করা] নীতির জয় হল— কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা কর, আর কঠোর হস্তে বিপ্লবীদের দমন কর।'
[অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়ঃ সাপ্তাহিক বসুমতীঃ ১৮ই এপ্রিল, ১৯৬৮]

অভিযোগ করার কিছু নেই। কারণ, বিপ্লবীদের সম্বন্ধে নিজের মনোভাব গান্ধীজী কোনদিনই গোপন রাখেননি। ১৯৩০ সালের ২রা মার্চ তারিখেই সেকথা তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন বড়লাটকে এক চিঠি দিয়ে। তাতে খোলাখুলিভাবেই তিনি লিখেছিলেনঃ

'আমার উদ্দেশ্য, ক্রমবর্ধমান সহিংস সংগ্রামীদের সংগঠিত শক্তির বিরুদ্ধে আমার আন্তরিক শক্তিকে পরিচালিত করা।'

তবু ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুকে কেন্দ্র করে সেদিন যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, তার পরিণতি কিন্তু মোটেই শুভ হয়নি,

মল্লিকা। যুগান্তর দলের অন্যতম নায়ক শ্রদ্ধেয় ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের লেখা থেকেই সে কাহিনী আমি এখানে তুলে ধরছি ঃ

'চুক্তি সই করে গান্ধীজী সিমলা ছাড়ার আগে বিবৃতি দিয়ে যান যে, ঐ চুক্তি যদি দেশে সর্ববাদিসম্মতভাবে গৃহীত হয় তাহলে তিনি আশা করেন যে, এমন কি সহিংস কাজের জন্য যাঁদের ফাঁসির হুকুম হয়ে আছে, তাঁরাও মুক্তি পাবেন। বিবৃতি দিয়ে তিনি করাচি পেঁছবার আগেই ভগৎ সিং-দের ফাঁসি হয়ে যায়। ফলে, যুগান্তর ও নওজোয়ান সভার নেতৃত্বে দেশের জাগ্রত জনগণ যে বিক্ষোভ দেখায়, তাতে গান্ধী-নেতৃত্ব দেশের লোকের কাছে অনেকখানি প্রতিষ্ঠা হারায়।'

[ইতিহাসের উপাদান ঃ সাপ্তাহিক বসুমতী ঃ ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬]

কথাটা অত্যুক্তি নয়, মল্লিকা। সত্যিই সেদিন অত্যন্ত কঠোর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল গান্ধীজীকে।

করাচিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাব, বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশের বিক্ষুব্ধ তরুণদল তাঁকে সংবর্ধনা জানালেন কালো ফুলের মালা আর কালো পতাকা প্রদর্শন করে।

তাঁদের অভিযোগ, ভগৎ সিং-দের ফাঁসির জন্য গান্ধীজীই একমাত্র দায়ী। কেন তিনি চুক্তি করার সময় তাঁদের মুক্তির শর্ত অন্তর্ভুক্ত করেননি ? এ চুক্তি কোন চুক্তিই নয়। এ চুক্তি আমরা মানি নে।

নিন্দা বা প্রশংসায় বিচলিত হবার মতো মানুষ আর যিনিই হোন না কেন, গান্ধীজী নন। তাই নিঃশব্দে তিনি সে মালা নিজের গলায় তুলে নিলেন কোনরকম প্রতিবাদ না করে। মুখে তেমনি প্রসন্ন হাসি। তিনি যে গোটা ভারতের বাপুজী! এত সহজে তাঁর বিচলিত হলে চলবে কেন!

গভীর রাত্রি। করাচি কংগ্রেস সুপ্ত, নিদ্রামগ্ন।

শুধু ঘুম নেই গান্ধীজীর চোখে। ঝড় আসন্ন। উদ্দাম ঝড়। কোথায় তার শেষ পরিণতি কে জানে!

যে করে হোক এ ঝড়কে শান্ত করতেই হবে। সামনে গোলটেবিল বৈঠক। সেই বৈঠকে যোগ দেবার জন্য হয়তো তাঁকেই এবার যেতে হবে বিলেতে। কংগ্রেস সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান। ভগৎ সিংকে কেন্দ্রে করে এ সময় কংগ্রেস দুটো আলাদা শিবিরে ভাগ হয়ে যাক, তা কোনদিক থেকেই কাম্য নয়।

কে পারে আসন্ন এই ঝড়কে শান্ত করতে ?

বল্লভভাই ! আজাদ ! রাজেন্দ্রপ্রসাদ ! রাজাগোপাল ! আব্দুল গফুর খান !

না, কেউ পারে না। বিক্ষুব্ধ তরুণদল ওদের কথা শুনবে না। গ্রাহ্যই করবে না।

তবে কে পারে ! জওহরলাল !

অসম্ভব। বড় বেশি উচ্ছ্বাসপ্রবণ। কিছুটা অস্থির-চিত্তও বটে। তাছাড়া

বলতে গিয়ে প্রায়ই মাত্রা হারিয়ে ফেলে। সুতরাং সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার উপায় নেই।

পারে শুধু একজন। সুভাষ। চিরবিদ্রোহী সুভাষ। তরুণ সমাজের অবিসংবাদী নেতা সুভাষ। একমাত্র সুভাষই পারে আজ এই বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করতে।

গভীর রাত্রে গান্ধীজীর শিবিরে ডাক পড়ল সুভাষের। পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল। সব কথা বুঝিয়ে বলা দরকার সুভাষকে। এছাড়া আর কোন উপায় নেই।

যুক্তি মেনে নিলেন সুভাষ। না, প্রকাশ্য অধিবেশনে এ নিয়ে কোনরকম বিরোধিতাই তিনি করবেন না। কারণ, কংগ্রেসে ভাঙন ধরলে সবচাইতে লাভবান হবে ইংরেজ। সে সুযোগ তাদের কোনরকমেই দেওয়া চলে না।

তবে একটা শর্তে। প্রকাশ্য অধিবেশনে বিরোধিতা না করলেও তার বাইরে এ নিয়ে প্রতিবাদ করার সর্বপ্রকার অধিকার তাঁর থাকবে। সেখানে কোন কিছু দিয়েই তাঁর মুখ বন্ধ রাখা যাবে না।

কাজেও তাই করলেন সুভাষ। কোন প্রতিবাদ তিনি করলেন না প্রকাশ্য অধিবেশনে। তারপরই উত্তেজনায় ফেটে পড়লেন নওজোয়ান সম্মেলনের সভাপতিরূপে ভাষণ দিতে গিয়ে।

কেন আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করা হল?

কেন চুক্তির সময়ে ভগৎ সিং-দের মুক্তির কথা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি?

ভারতবাসী কি পেল এই গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে?

শতাব্দীর ঘুম ভেঙে যে ভারতবাসী এতদিন পরে সংগ্রাম-মুখর হয়ে উঠেছিল, তাদের যৌবনশক্তিকে আবার স্তব্ধ করে দেওয়া ছাড়া এ চুক্তিতে আর কোন কিছু লাভ হয়েছে কি?

এই কী গান্ধীবাদ? অহিংসার নামে ক্ষাত্রধর্ম বিসর্জন দিয়ে জাতিকে নৈতিবাদ শেখানোটাই কি গান্ধীনীতি?

ভগৎ সিং-এর ব্যাপার কিন্তু এখানেই শেষ হল না, মল্লিকা। আরো আছে। সে কাহিনী যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি অপ্রত্যাশিত।

হঠাৎ সেদিন এক প্রস্তাব উত্থাপন করা হল প্রকাশ্য অধিবেশনে। উত্থাপন করলেন অহিংস-মন্ত্রের ঋষি স্বয়ং গান্ধীজী। নিজে থেকেই তিনি শহীদ ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের প্রস্তাব আনলেন, তাঁদের সাহস ও আত্মত্যাগের ভূয়সী প্রশংসা করে। সে প্রস্তাব গৃহীতও হল সঙ্গে সঙ্গেই। শুধু তাই নয়, ভগৎ সিং আর শুধুমাত্র ভগৎ সিং রইলেন না সেদিন থেকে। গান্ধীজীর ভাষায় তিনি হলেন,—'সর্দার ভগৎ সিং'।

নিঃসন্দেহে গান্ধীজীর এই প্রস্তাব অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু কি হয়েছিল ১৯২৪ সালের অনুষ্ঠিত বেলগাঁও কংগ্রেসে!

সবাই চাইলেন বিশ্বের মহান বিপ্লবী লেনিনের মৃত্যুতে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি শোক-প্রস্তাব পাশ করা হোক।

না, কিছুতেই না। বাধা দিলেন সভাপতি স্বয়ং গান্ধীজী। পাশ করা

তো দূরে কথা, কোনরকম প্রস্তাবই তিনি তুলতে দিলেন না কংগ্রেসের সেই অধিবেশনে। কারণ, তাঁর মতে লেনিন একজন উপদ্রবকারী ছাড়া আর কিছুই নন।

তবে একা লেনিন নন, ভগিনী নিবেদিতা বা যুগ-প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়ের মতো প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিরাও রেহাই পাননি এ ধরনের বিশেষণ থেকে। যেমন—রামমোহন একটি বামন (pigmy) মাত্র। আর ভগিনী নিবেদিতা একটি বিলাস-বহুল জীবনে অভ্যস্থ অস্থির চিত্ত (volatile) রমণী ছাড়া আর কিছুই নন।

মহাত্মার মতো লোকের কাছ থেকে এ ধরনের উক্তি খুবই বেদনাদায়ক নয় কি! তুমি কি বল, মল্লিকা!

আরো দৃষ্টান্ত, মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ যতীন দাস। সেই যতীন দাস, ১৯২৮ সালে সুভাষের বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স গঠনে যাঁর ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত হয়ে তেষট্টি দিন অনশন করে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, সে কাহিনী তুমিও জানো। খবর শুনে সে কি তীব্র আলোড়ন সেদিন সারা পৃথিবী জুড়ে! সবাই একবাক্যে ধিক্কার জানাল ইংরেজ সরকারের অন্যায় জেদ ও অবিমৃষ্যকারিতাকে।

চঞ্চল হয়ে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ। চঞ্চল হয়ে উঠলেন বিশ্বের অন্যান্য মনীষীবৃন্দ। ইতিপূর্বে আয়ারল্যান্ডের মুক্তিযোদ্ধা টেরেন্স ম্যাকসুইনীও এমনিভাবে অনশনে প্রাণত্যাগ করেছিলেন, সেকথা তোমার অজানা নয়। খবর পেয়ে সেই ম্যাকসুইনী পরিবার সঙ্গে সঙ্গে তার পাঠালেন সুদূর আয়ারল্যান্ড থেকে।

'Family of Terence Mc Swiney have heard with grief and pride of the death of Jatin Das. Freedom will come.'

একমাত্র ব্যতিক্রম গান্ধীজী।

একটি কথাও তাঁর মুখ থেকে কেউ শুনতে পেল না যতীন দাস সম্বন্ধে। এমন কি, সুভাষ অনুরোধ করা সত্ত্বেও না।

পরে একদিন সুভাষের জিজ্ঞাসার উত্তরে জানালেন যে, যতীন দাসের মৃত্যুর ব্যাপারটা তাঁর মতে একটা ইচ্ছাকৃত আত্মহত্যার [diabolical suicide] ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই ইচ্ছা করেই এতদিন এ সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেননি। কারণ, বলতে হলে সেক্ষেত্রে অপ্রিয় কথাই তাঁকে বলতে হত।

জবাব শুনে একটা বিস্মিত আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা বাংলা দেশ। দেশ ও জাতির প্রয়োজনে যিনি দধীচির মতো তিল তিল করে নিজেকে বিলিয়ে দিলেন, বাংলার সেই পুণ্যাত্মা শহীদ যতীন দাস সম্বন্ধে মহাত্মার একি নির্মম উক্তি!

কিন্তু কেন? অনশন তো মহাত্মারই রাজনৈতিক জীবনের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার! এমন কতবারই তো তিনি অনশন করেছেন জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে। তাহলে যতীন দাসের বেলায় তাঁর এই অহেতুক রূঢ়তার কারণ

কি? দুদিন বাদে লেবুর রস পান করে আমৃত্যু অনশন ভঙ্গ করেননি বলেই কি?

অথচ একই প্রসঙ্গে সুভাষের মুখ থেকে শোনা গেল ঠিক তার বিপরীত কথা। নোয়াখালি জেলা যুব-সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বললেনঃ

'...বাংলাদেশের যুব-সমাজের ভেতর থেকে সহস্র সহস্র যতীন দাস আমরা চাই, যারা তাঁর আত্মোৎসর্গের ভাবকে রূপায়িত করবে। তীব্র জাতীয় চেতনাসম্পন্ন নতুন একদল যুবক আমাদের অবশ্যই চাই। কারণ, তারাই ভাবী ভারতবর্ষকে নির্মাণ করবে, যে ভারতবর্ষে কৃষক-শ্রমিক-নির্বিশেষে সকল নরনারী স্বাধীনতার আশীর্বাদ উপভোগ করবে।

আপনাদের আমি আহ্বান করছি। অদূর ভবিষ্যতে কি গৌরবময় ভূমিকা আপনাদের গ্রহণ করতে হবে, তা অনুভব করুন। তারপর আপনারা অগ্রসর হয়ে চলুন একটি মাত্র ভাবনা নিয়ে—মাতৃভূমির মুক্তিব্রতই আমার একমাত্র কর্তব্য।'

শুধু একবার নয় মল্লিকা, মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ যতীন দাসের স্মৃতির উদ্দেশে সুভাষ এমনিভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন অসংখ্যবার। নিজের রচিত বই, এমন কি পরবর্তীকালে আজাদ হিন্দ সরকারের সর্বাধিনায়ক-রূপেও যতীন দাসের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কোনবারই তিনি ভুল করেননি।

শুধু কি যতীন দাস! কি হয়েছিল সেদিন শহীদ গোপীনাথের বেলায়?

গান্ধীজী অনেক বড়। তার চাইতেও বড় তাঁর নীতি। সে নীতি এত বড় যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে তার নাগাল পাওয়া সত্যিই বড় শক্ত। এমন কি, তাঁর একান্ত স্নেহাস্পদ জওহরলাল পর্যন্ত সে সত্যটাকে পরবর্তীকালে অস্বীকার করতে পারেননি। খোলাখুলিভাবেই তিনি লিখেছেনঃ

'জাতির নেতা গান্ধী আর অতিমানব গান্ধীর মধ্যে বরাবরই ছিল একটা দুস্তর ব্যবধান। তাই গান্ধী ও আমাদের রাজনীতির মধ্যে মতদ্বৈধতার অন্ত ছিল না। অতিমানব গান্ধীর কণ্ঠে ছিল প্রত্যাদেশের বাণী। সেখানে তিনি শুধু ভারতবর্ষের নন, সমগ্র বিশ্বের।'

[Discovery of India : P. 471]

কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি মল্লিকা। সাধারণ মানুষ জাতির নেতা গান্ধীজীকে বরং সেদিন কিছুটা বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু বুঝতে পারেনি অতিমানব গান্ধীজীকে। সেখানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন রীতিমত দুর্বোধ্য।

যেমন দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল শহীদ গোপীনাথ সাহার বেলায়।

১৯২৪ সাল। ১২ই জানুয়ারি। সহসা সেদিন বাংলার বিপ্লব-আন্দোলনের পয়লা নম্বর শত্রু চার্লস টেগার্টকে লক্ষ্য করে গোপীনাথের পিস্তল আগুন ছড়াল—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

কিন্তু এ কি! এ তো টেগার্ট নয়! এ যে একজন সাধারণ নাগরিক, আর্নেস্ট ডে!

আদালতে দৃপ্তকণ্ঠে গোপীনাথ জানালেনঃ ভুল করে একজন নিরপরাধ

লোককে মেরেছি বলে আমি দুঃখিত। তার চাইতে বেশি দুঃখিত এই জন্য যে, টেগার্টকে আমি মারতে পারিনি। না, মৃত্যুর জন্য আমার এতটুকুও দুঃখ নেই। কারণ, আমি জানি যে, আমার প্রতিফোঁটা রক্তবিন্দু ভারতের ঘরে ঘরে শত শত গোপীনাথের জন্ম দেবে।

যথাসময়ে একদিন গোপীনাথ শহীদ-তীর্থে চলে গেলেন ফাঁসির রজ্জুতে প্রাণ উৎসর্গ করে।

কি দুঃসহ অবস্থা সেদিন সুভাষের! জেল-গেট থেকে ফিরে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি ধ্যানমৌনী তাপসের মতো তাকিয়ে রইলেন সামনে টাঙানো ভারতবর্ষের বৃহৎ মানচিত্রটার দিকে।

কবে তোমার কথা সত্য হবে গোপীনাথ? কবে তোমার মতো শত শত যুবক জন্ম নেবে ভারতের মাটিতে? আর কতদিন দেরি?

ধ্যান ভাঙল সহকর্মীদের পায়ের শব্দে। আশ্চর্য, সুভাষের দুচোখে বাঁধনহারা অশ্রু। সারামুখ আরক্ত। মনে হয় এক্ষুনি বুঝি চোখ-মুখ ফেটে রক্ত ছিটকে পড়বে অজস্রধারায়।

একটা স্তব্ধ মুহূর্ত। তারপরই সুভাষ বললেন আত্মসম্বরণ করেঃ

—গোপীনাথের ফাঁসি হয়ে গেল। ফাঁসির পরেই একজন শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্ট বাইরে এসে কি বলে জানো?

'He played like fawn
And at the dawn
Was slain on the lawn.'

মে মাসে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভা বসল সিরাজগঞ্জে। সভাপতি মৌলানা আক্রাম খাঁ।

গোপীনাথের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সেখানে গৃহীত হল এক প্রস্তাব। তাতে বলা হল—'যদিও কংগ্রেস অহিংস-নীতিতে আস্থাবান, তবু গোপীনাথের এই আত্ম-বলিদানের আদর্শ ভ্রান্ত হলেও অভিনন্দনযোগ্য।'

খবর শুনে অত্যন্ত রুষ্ট হলেন গান্ধীজী। কংগ্রেসের মধ্যে এসব কেন? ওদের জন্য কেন আমাদের এই মাথাব্যথা?

ফলে, যা হবার তাই হল। সঙ্গে সঙ্গেই পাল্টা প্রস্তাব আনা হল আমেদাবাদের অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে। সেখানে নিহত আর্নেস্ট ডে-র অকালমৃত্যুর জন্য প্রচুর শোক-প্রকাশ করা হল। শোক-সন্তপ্ত পরিবারকেও সমবেদনা জানানো হল যথাযথভাবে।

একমাত্র ব্যতিক্রম গোপীনাথ। এক তরফা নিন্দা ছাড়া সেদিন আর কিছুই জুটল না তাঁর কপালে।

এবার প্রতিবাদ জানালেন বাংলার দেশবন্ধু। শহীদ গোপীনাথ আজ ভাল-মন্দ, নিন্দা-প্রশংসা. সব কিছুর ঊর্ধ্বে। দেশগতপ্রাণ ঐ শহীদের উদ্দেশে প্রশংসা না হোক, মানবিক ধর্ম অনুযায়ী একটু সহানুভূতির কথাও কি বলা যায় না?

যায়! নিশ্চয়ই যায়! তবে বাংলার জন্য নয়, পাঞ্জাবের জন্য।

কারণ, গরজ বড় বালাই। দেশবন্ধু আর সুভাষ বোসের পাল্লায় পড়ে বাংলা তো আগেই গেছে। ভগৎ সিংকে কেন্দ্র করে এবার পাঞ্জাবও যদি হাতছাড়া হয়ে যায় তো রইল কি ?

নইলে গোপীনাথ আর ভগৎ সিং দুজনেই আদর্শ বিপ্লবী। দুজনেই ফাঁসি-মঞ্চে প্রাণ দিয়েছেন দেশের জন্য। তবু কেন এই তারতম্য ? কেন এই চিত্ত-দারিদ্র্য ?

ভগৎ সিং যে রিভলবারটা দিয়ে স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করেছিলেন, সেটা কি অহিংস রিভলবার ?

দিল্লীর অ্যাসেম্বলী হলে তিনি যে বোমাটি নিক্ষেপ করেছিলেন, তার গায়ে কি অহিংসার বাণী লেখা ছিল ? তাছাড়া ভগৎ সিং-এর ব্যাপারটাই বা কি ! বিক্ষুব্ধ জনসাধারণকে শান্ত করার জন্য সেদিন তিনি ভগৎ সিং প্রমুখ শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন একথা সত্য। কিন্তু তারপর ?

মাত্র কয়েকদিন। তারপরই আবার তাঁর মুখে শোনা গেল বিপরীত কথা। অর্থাৎ, এসব বৈপ্লবিক কার্যকলাপ তাঁর মতে একটা স্রেফ গুণ্ডামী ছাড়া আর কিছুই নয়। কংগ্রেসের উচিত, পরবর্তী অধিবেশনে এসব গুণ্ডামীর বিরুদ্ধে একটা প্রস্তাব পাশ করা। তাঁর নিজের ভাষায়ঃ

'Bhagat Singh worship has done and is doing incalculable harm to the country......The result is goondaism and degradation wherever this mad wroship being performed.

It was the peremptory duty of the A. I. C. C. to condemn at the forthcoming meeting of the trecherous outrage and reiterate its policy of non-violence in unequivocal terms.'

মত ও পথ আলাদা হলেও সবারই লক্ষ্য এক । সবারই একমাত্র উদ্দেশ্য স্বাধীনতা। তাহলে ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি গান্ধীজীর এই রূঢ়তা কেন ? এ জিজ্ঞাসার জবাব দেবে কে ?

জবাব দিল সেই বক্সা দুর্গ। দাবী উপেক্ষিত হলে পনেরো দিনের মধ্যে প্রতিশোধ নেবার কথা কিন্তু তাঁরা ভুলে যাননি, মল্লিকা। এবার এল সেই অকল্পনীয় সিদ্ধান্তকে বাস্তবে রূপায়িত করার পালা।

ভুটান-সীমান্তে অবস্থিত দুর্ভেদ্য বক্সা দুর্গ। চারপাশে সদা-সতর্ক প্রহরীর দল। তাদের চোখ এড়িয়ে মশা-মাছিরও সেখানে ঢোকবার জো নেই।

কিন্তু সব বৃথা। এত সতর্কতা সত্ত্বেও একদিন সর্বদলীয় নির্দেশে বি. ভি.-র অন্যতম নায়ক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায় প্রেরিত গোপন সঙ্কেত চলে এল কলকাতায় অবস্থিত অন্যান্য সদস্যদের হাতে। প্রতিশোধ নাও। মনে রেখো, মাত্র পনেরো দিন সময়।

দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম ! পর পর ছ-টা গুলী খেয়ে কে লুটিয়ে পড়ল অমন করে ?

পেডি ! মেদিনীপুরের দুর্দান্ত জেলা-শাসক জেমস্ পেডি। ভুলের মাশুল যোগাতে গিয়ে তাকেই সেদিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হল নিজের জীবনের বিনিময়ে।

ভগৎ সিং-এর ফাঁসি হয়েছিল ২৩শে মার্চ। আর পোডিকে বিদায় নিতে হল ৭ই এপ্রিল। ঠিক পনেরো দিনে প্রমাণিত হল যে, বিপ্লবীদের শপথ ফাঁকা আওয়াজ নয়, কথায় ও কাজে তাঁরা এক।

গান্ধীজী ও সুভাষ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য দুটি নাম। একজন প্রবীণ, অন্যজন নবীন। একজন বর্তমান, অন্যজন ভবিষ্যৎ।

কেউ ছোট নন। কারও অবদানই তুচ্ছ নয়। তবু তফাৎ ছিল। দৃষ্টিভঙ্গীরও পার্থক্য ছিল। ছিল বলেই নীতি ও কর্মধারা নিয়ে দুজনের মধ্যে সংঘাত বেধেছে বার বার।

গান্ধীজী অসাধারণ পুরুষ। বিশেষ করে জাতির গণচেতনার মূলে তাঁর অবদান সব কিছু সমালোচনার ঊর্ধ্বে। সেখানে সত্যিই তিনি ভারতের মুকুটহীন সম্রাট।

ফাঁক ছিল অন্য জায়গায়। ইতিমধ্যে পৃথিবী যে শিক্ষা, রাজনীতি, বিজ্ঞান, শিল্প ও আধুনিক চিন্তাধারার দিক থেকে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে, সে সম্বন্ধে তিনি ছিলেন আশ্চর্য রকম নির্লিপ্ত ও উদাসীন।

সুভাষের বিশেষত্ব ছিল সেইখানেই। কি আধুনিক ভাবধারা, কি পৃথিবীর রাজনীতি, কি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গী, সব মিলিয়ে তিনি ছিলেন এক অনন্য-সাধারণ পুরুষ। বস্তুত, ইয়োরোপীয় রাজনীতি সম্বন্ধে এতখানি দূরদর্শিতা সেদিন ভারতের অন্যান্য নেতাদের মধ্যে সত্যিই দুর্লভ ছিল।

প্রমাণ, গোলটেবিল বৈঠক। সুভাষের মতে এটা ইংরেজদের একটা ভাঁওতা মাত্র। এর আসল উদ্দেশ্য হল সারা বিশ্বের কাছে ভারত যে স্বাধীনতালাভের অনুপযুক্ত, জোর গলায় সেকথা প্রমাণ করা। সুতরাং গান্ধীজীর পক্ষে বিলেতে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেওয়া উচিত নয়।

গান্ধীজী এ যুক্তি মানতে রাজী নন। সংসারে কারও প্রতিই তাঁর কোন অবিশ্বাস নেই। বিদ্বেষ নেই। ঘৃণা নেই। ইংরেজও তার ব্যতিক্রম নয়। সুতরাং তাদের সদিচ্ছা সম্বন্ধে এতটুকুও দ্বিধা নেই তাঁর মনে।

কিন্তু প্রমাণ! গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুযায়ী কি হল বন্দীমুক্তির?

কি হল বাংলার হিজলী বন্দী-নিবাসে?

নিরস্ত্র অসহায় বন্দীদের এভাবে নির্বিচারে হত্যা করার নজীর পৃথিবীর আর কোথায় আছে?

তবু গান্ধীজী আশাবাদী। তবু তিনি কারও প্রতি বিশ্বাস হারাতে রাজী নন।

গোলটেবিল বৈঠকে গিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পূর্ণ স্বাধীনতা না হোক, অন্তত ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস যে আসবে না, তা কে বলতে পারে!

গান্ধীজীর মনোভাব লক্ষ্য করে অবশেষে ক্ষুব্ধভাবে সুভাষ বললেন:

'I will not stand in the way of Mahatma going to the Round Table Conference. Let him come back disillusioned. I will then stand vindicated.'

সোজা কথায়—গান্ধীজী যেতে চাইছেন—যান। তবে কার কথা সত্য, যথাসময়েই তা বোঝা যাবে।

২৯শে আগস্ট গান্ধীজী বিলেত যাত্রা করলেন গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে। গান্ধী-আরউইন চুক্তির মধ্যেই ইংরেজের সদিচ্ছার বেশ কিছুটা প্রমাণ মিলেছে। দেখা যাক, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এবার তাদের কাছ থেকে কিছু আদায় করা যায় কিনা!

এদিকে বিপ্লবীদের তৎপরতা তখন সমানভাবেই চলছে। লোম্যান, হাডসন, সিম্পসন, গার্লিক, পেডি—সবাইকে ধূলিশয্যা নিতে হয়েছে একে একে।

তারপরই এল ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডুর্নোর পালা। ডুর্নোর কথা তোমাকে আগেই বলেছি। ডুর্নো ঘায়েল হলেন ১৯৩১ সালের ২৮শে অক্টোবর। আততায়ী সরোজ গুহ ও রমেন ভৌমিক পলাতক। কোথায় যে তাঁরা ডুব মারলেন, পুলিশ তার কোন হদিসই পেল না।

ফল হল মারাত্মক। আততায়ীদের ধরতে না পেরে এবার শাসকদের সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ল ঢাকাবাসীদের ওপর। সবাইকে পেটাও। আচ্ছা করে শিক্ষা দাও ওদের। ভেঙে গুঁড়িয়ে সব একাকার করে দাও। কাউকে রেহাই দিও না।

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলেন সুভাষ। পেয়েছে কি ওরা! কি অধিকার আছে ওদের ঢাকাবাসীদের এভাবে নির্যাতন করার? এ কি মগের মুলুক নাকি যে, যা খুশি করলেই হল? এর বিচার চাই!

বাধা দেওয়া হল নারায়ণগঞ্জ রেল স্টেশনে। না, তোমাকে ঢুকতে দেওয়া হবে না ঢাকায়। ভালোয় ভালোয় ফিরে যাও। সাহেবের হুকুম।

সাহেব তো হুকুম দিয়েই খালাস। কিন্তু সুভাষ কি সেই লোক, যিনি সাহেবের হুকুম মাথা পেতে নেবেন নিঃশব্দে? সংবাদপত্র থেকেই তার বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি ধারাবাহিকভাবেঃ

নারায়ণগঞ্জে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু গ্রেপ্তার

'নারায়ণগঞ্জ, ৭ই নভেম্বর। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে নারায়ণগঞ্জে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জে. সি. গুপ্ত ও তদন্ত কমিটির অন্যান্য সভ্যগণ ঢাকা রওনা হইয়াছেন।

অদ্য অপরাহ্ণকালে কলিকাতার স্টীমার নারায়ণগঞ্জে পৌঁছিলে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে ঢাকা জেলার মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া একটি নোটিশ জারি করা হয়। মিঃ এল. জি. ডুর্নোর প্রাণনাশের চেষ্টার ফলে গ্রেপ্তার প্রভৃতির জন্য ঢাকায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তৎসম্পর্কে শ্রীযুক্ত বসু ঢাকায় যাইতেছিলেন।

...একখানা স্টীমারে তাঁহাকে চাঁদপুর প্রেরণ করা হয়। একজন ছাড়া ঐ দলের অন্যান্য সকলকে ঢাকায় যাইতে দেওয়া হয়।'

[আনন্দবাজার ঃ ৮-১১-৩১]

ঢাকা থেকে চাঁদপুর। ব্যস, আর কোন কথা নয়। ঝামেলা না করে এবার লক্ষ্মীছেলের মতো কলকাতায় ফিরে যাও। দোহাই তোমার!

কে কার কথা শোনে! ভদ্রলোকের এক কথা,—ঢাকা আমি যাবই। তবে আগেকার পথে নয়, এবারে যাব অন্য পথে।

চাঁদপুর থেকে কুমিল্লা। রাত্রে আখাউড়া ও ভৈরব হয়ে ঢাকা অভিমুখে। কিন্তু তারপর! তারপর সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

ঢাকার পথে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু গ্রেপ্তার

'ঢাকা, ১১ই নভেম্বর। ঢাকা হইতে ৪ মাইল দূরবর্তী তেজগাঁও স্টেশনে অদ্য শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু গ্রেপ্তার হইয়াছেন। মিঃ ডুর্নোর উপর আক্রমণের পর ঢাকায় পুলিশী জুলুম সম্পর্কে তদন্তের জন্য গঠিত বেসরকারী তদন্ত কমিটির কাজে যোগদানের জন্য তিনি ঢাকা প্রবেশের চেষ্টা করাতেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মহকুমা হাকিম শ্রীযুক্ত সুভাষবাবুকে ফিরিয়া যাইতে বলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে অসম্মত হন। তাঁহাকে তখন শর্তবন্ধভাবে জামীন দিতে চাওয়া হয়, এবং জেলা ত্যাগ করিয়া পুনরায় মামলার শুনানীর দিন আসিতে বলা হয়।

সুভাষবাবু এই শর্তে জামীন লইতে সম্মত হন না—তখন তাঁহাকে মোটর যোগে ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।'

[আনন্দবাজার : ১২-১১-৩১]

ঢাকা জেলে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

সাক্ষাৎকার সম্পর্কে কড়াকড়ি

'ঢাকা, ১২ই নভেম্বর। অদ্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী, অবিনাশ ভট্টাচার্য, সুরেন সেনগুপ্ত এবং উকিল শ্রীযুক্ত রজনী দাশ ও যোগেন গুহঠাকুরতা ঢাকা জেলে যাইয়া শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার আবেদন করেন। অতঃপর তাঁহাদিগকে এই শর্তে অনুমতি দেওয়া হয় যে, সুভাষবাবু আসিয়া লোহার শিক ও জালের পশ্চাতে দাঁড়াইবেন এবং সাক্ষাৎপ্রার্থীরা বাহিরে থাকিয়া কথাবার্তা বলিবেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এই ব্যবস্থার কথা জানিয়া ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বলেন, সাধারণ কয়েদীর ন্যায় এরূপ অবমাননাকর অবস্থার মধ্যে আমি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই না।' এই বলিয়া তিনি স্থানান্তরে চলিয়া যান। সুতরাং সাক্ষাৎপ্রার্থীরা তাঁহার সহিত কথা বলিতে পারেন নাই।'

[আনন্দবাজার : ১৩-১১-৩১]

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর জামীনে মুক্তি

'ঢাকা, ১৪ই নভেম্বর। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে শর্তবন্ধ জামীনে মুক্তি দেওয়ার আদেশের কৈফিয়ৎ অদ্য দর্শাইবার জন্য দায়রা জজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উপর রুল জারি করিয়াছিলেন। অদ্য উহার শুনানী উঠিবার পূর্বেই সদর মহকুমা হাকিম মিঃ এস. এম. চট্টোপাধ্যায় অদ্য প্রাতে শর্তবন্ধ জামীনের আদেশ বাতিল করিয়া ৫০০৲ টাকার ব্যক্তিগত জামীনের আদেশ দিয়াছেন।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত বসুর উপর যে ১৪৪ ধারা জারি করিয়াছিলেন তাহাও প্রত্যাহার করিয়াছেন।

অপরাহ্ন ১টার সময় সুভাষবাবুকে মুক্তি দেওয়া হয়। তথা হইতে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বার লাইব্রেরীতে গমন করেন। সুভাষবাবু তথায় দেশের অবস্থা সম্পর্কে কিছুক্ষণ আলোচনা করেন।

[আনন্দবাজার ঃ ১৫-১১-৩১]

ঢাকায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

'ঢাকা, ১৫ই নভেম্বর। গত ২৮শে অক্টোবর তারিখে পুলিশ যে সব বাড়িতে হানা দিয়াছিল তাহার প্রায় সমস্তগুলিই শ্রীযুক্ত বসু পরিদর্শন করিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক বাড়ির লোকজনদের সহিত আলাপ করেন এবং যেসব জিনিসপত্রের ক্ষতি সাধন করা হইয়াছে তাহাও পরিদর্শন করেন।

যাঁহারা পুলিশের হাতে নির্যাতিত হইয়াছেন শ্রীযুক্ত বসু তাঁহাদিগকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, সমগ্র দেশ তাঁহাদের পক্ষাবলম্বন করিবে।'

[আনন্দবাজার ঃ ১৬-১১-৩১]

ঢাকা থেকে ময়মনসিং। সেখান থেকে নেত্রকোণা। তারপর একে একে কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ ইত্যাদি পূর্ববঙ্গের বহু জায়গা।

কিন্তু সেই মামলার কি হল! এবার সে কাহিনী শোন সংবাদপত্রের পাতা থেকে।

১৪৪ ধারা অমান্যের অভিযোগ প্রত্যাহার

'শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা আছে, এই অজুহাতে ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে ঢাকা জেলায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এই আদেশ অমান্য করার জন্য সুভাষবাবুর নামে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৮৮ ধারা অনুসারে এক মামলা রুজু করা হইয়াছিল। ২৩শে নভেম্বর তারিখে এই মামলার শুনানী হইবার কথা ছিল।

ইতিমধ্যেই সুভাষবাবুর পক্ষ-সমর্থনকারী উকিল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র গুহঠাকুরতাকে জানান হইয়াছে যে, গভর্ণমেণ্ট এই মামলা প্রত্যাহার

করিয়াছেন। সুতরাং ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৮ ধারা অনুসারে সুভাষবাবুকে নিরপরাধ বলিয়া খালাস দেওয়া হইয়াছে।'

[আনন্দবাজার : ২০-১১-৩১]

ইয়োরোপীয় রাজনীতি সম্বন্ধে সুভাষ যে কতখানি ওয়াকিবহাল, তার প্রমাণ পাওয়া গেল যথাসময়েই। সমস্ত আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে গান্ধীজী গোলটেবিল বৈঠক থেকে ফিরে এলেন বিরাট একটি ব্যর্থতার বোঝা মাথায় নিয়ে।

তবে একেবারে শূন্য হাতে নয়। সঙ্গে নিয়ে এলেন প্রচুর অপযশ, প্রচুর নিন্দা আর চার্চিলের দেওয়া নতুন একটি পরিচয়-পত্র—'হাফ-নেকেড ফকীর'।

ইংরেজের ইচ্ছাই পূর্ণ হল। দেশে-বিদেশে প্রচুর অপপ্রচার করা হল এ নিয়ে। আমরা কি করব! আমরা তো ওদের স্বাধীনতা দিতেই প্রস্তুত। ওরা নিজেরাই যদি এ নিয়ে একমত হতে না পারে, তবে আমরা তার জন্য কি করতে পারি বলো!

অতুলনীয় চরিত্রের অধিকারী গান্ধীজী যে সেদিন ইংরেজের চোখে কি রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছিলেন, নিচের একটা চিঠির কয়েকটা লাইন থেকেই তুমি তা কিছুটা অনুমান করে নিতে পারবে, মল্লিকা।

এ চিঠির লেখক এওয়ার্ড টমসন শুধু জওহরলালের ঘনিষ্ঠ বন্ধুই নন, ভারতের একজন সত্যিকারের শুভার্থী বন্ধুও বটে। বন্ধু জওহরলালকে তিনি লিখেছিলেন :

'গোলটেবিল বৈঠকের আগে গান্ধীজীর কোন ত্রুটি আমার নজরে পড়েনি। এবার পড়ল। গান্ধীজী শুধু অহংসর্বস্ব নন, অসংলগ্নও বটে। উনি ইংল্যাণ্ডে না এলেই ভাল করতেন।'

[বাণ্ড অফ ওল্ড লেটার্স, পৃঃ ২০৮]

ইংরেজের ধারণা যাই হোক না কেন, গান্ধীজী কিন্তু এত সহজে হাল ছাড়েননি। শেষ চেষ্টা হিসেবে গোলটেবিল বৈঠকে তিনি যে আবেদন রেখেছিলেন, তা সত্যিই খুব মর্মস্পর্শী। কিছুটা করুণও বটে। তাতে তিনি বলেছিলেন :

'ঈশ্বরের নামে তোমাদের কাছে আমি আবেদন করছি, এই দুর্বল বাষট্টি বছরের বৃদ্ধকে শেষবারের মতো তোমরা একটু সুযোগ দাও। তোমাদের অন্তরের ক্ষুদ্র এককোণে তাকে আর তার প্রতিষ্ঠানকে একটু স্থান দাও।'

এইটুকু বলেই থামেননি তিনি। সেই সঙ্গে একটা ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছিলেন ইংরেজ শাসকদের।

'ভবিষ্যৎ কি তোমরা সত্যিই দেখতে পাও না? আমার এই দাবী উপেক্ষিত হলে ইতিহাস তোমাদের জন্য অপেক্ষা করবে না। আর সেই ইতিহাস লিখিত হবে সন্ত্রাসবাদীদের রক্ত-মাখা লেখনীতে।'

[কংগ্রেসের ইতিহাস, ডাঃ পট্টভি, পৃঃ ৪৯৮]

সন্ত্রাসবাদী! কথাটা শুধু ইংরেজের নয়, তথা গান্ধীবাদীদেরও। এ ব্যাপারে আশ্চর্য মিল দেখা যায় দুপক্ষের মধ্যে। উভয়পক্ষেরই বক্তব্য এই যে, বিপ্লবীরা দেশপ্রেমিক নয়, সন্ত্রাসবাদী। এত ফাঁসি, এত দ্বীপান্তর, যা একমাত্র বিপ্লবীদের ভাগ্যেই সেদিন জুটেছিল, তা সবই অর্থহীন। সবই মূল্যহীন। কারণ, তারা সন্ত্রাসবাদী। তারা দেশের শত্রু।

'দেশের শত্রু।' স্বয়ং গান্ধীজীর উক্তি। বাংলার মরমী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রকে একদিন তিনি খোলাখুলিভাবেই বলেছিলেন কথাটা।

চরকার সাহায্যে কোনদিন স্বরাজ আসবে—শরৎচন্দ্র কোনদিনই বিশ্বাস করতেন না একথা। এ নিয়ে তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও কম করেননি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। তাই খোলাখুলিভাবেই সেদিন শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন গান্ধীজী:

'But why don't you believe that the attainment of Swaraj will be helped by spinning?'

দ্বিরুক্তি না করে সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিয়েছিলেন বাংলার শরৎচন্দ্র:

'I think attainment of Swaraj can only be helped by soldiers, and not by spiders.'

এখানেই থামেননি শরৎচন্দ্র। তারপরই পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন:

'আপনার মতে তাহলে অহিংসাই একমাত্র অস্ত্র?'

উত্তেজিত হয়ে জোর গলায় গান্ধীজী জবাব দিয়েছিলেন:

'সে বিষয়ে আমার দ্বিমত নেই। সশস্ত্র-বিপ্লবে যারা বিশ্বাসী, তারা ভ্রান্ত—আর যারা সন্ত্রাসবাদী, তারা দেশের শত্রু।'

বাংলার মৃত্যুভয়হীন বিপ্লবীদের প্রতি শরৎচন্দ্রের মমত্ববোধ ছিল সর্বজনবিদিত। এ কারণে নিজের লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্দুক এবং পিস্তল দুই-ই সেদিন তাঁকে হারাতে হয়েছিল সরকারী নির্দেশে।

গান্ধীজীর মুখ থেকে এ ধরনের উক্তি শুনে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মুখর হয়ে উঠেছিলেন তীব্র প্রতিবাদে।

'শত্রু শব্দের অর্থ কি? মতবিরোধই যদি শত্রুতা বোঝায়, তা হলে যদি কেউ আপনাকেও শত্রু বলে আখ্যা দেয়—আপনার ব্যক্তিগত আপত্তি থাকা উচিত নয় কি?...বিপ্লবী অর্থে এই সন্ত্রাসবাদী দলকে আমি শ্রদ্ধা করি—কারণ, তারাও দেশকে ভালবাসে। ভালবাসে বলেই তো জীবনের সবচেয়ে যা কিছু প্রিয় সবই উৎসর্গ করে দেয় বুলেটের সামনে। এই যে এদের ত্যাগ, এই যে এদের আদর্শ—এটা হয়তো আপনার মতে ভ্রান্ত হতে পারে—কিন্তু দেশের শত্রু এরা হল কেমন করে?'

জবাব দিতে না পেরে শেষপর্যন্ত গান্ধীজী প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন নিজের উক্তি।

[অধ্যাপক দিলীপ ঘোষরায় রচিত 'গান্ধীবাদ কি সচল?' নিবন্ধ থেকে গৃহীত: সাপ্তাহিক বসুমতী: ১৫ই আগস্ট, ১৯৬৮]

তবে গোলটেবিল বৈঠকে রাখা গান্ধীজীর সেই ভবিষ্যৎ-বাণী কিন্তু মিথ্যে হয়নি, মল্লিকা। কংগ্রেস আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেও তথা-কথিত 'সন্ত্রাসবাদী'দের কর্মপ্রচেষ্টা কিন্তু সেখানেই স্তব্ধ হয়ে যায়নি।

আবেদন-নিবেদনে তাঁরা বিশ্বাসী নন। নতজানু হয়ে করুণা-ভিক্ষা করাও তাঁদের ধর্ম নয়। তাই সবাই পিছিয়ে পড়লেও তাঁরা কিন্তু সেদিন পিছিয়ে থাকেননি। ফাঁসি, দ্বীপান্তর, নির্যাতন, অত্যাচার সব কিছু উপেক্ষা করে একাই সেদিন তাঁরা জীবনের জয়গান গেয়ে এগিয়ে চলেছিলেন অপ্রতিহত গতিতে। পরবর্তীকালে বিপ্লবীদের এই কর্মপ্রচেষ্টাকে লোক-সমক্ষে যতই ছোট করে দেখানো হোক না কেন, হাসিমুখে প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার এই জ্বলন্ত ইতিহাসকে তো আর অস্বীকার করার উপায় নেই!

'ইংরেজকে বিশ্বাস নেই। ওরা সব পারে। শঠতা, কপটতা, বিশেষ করে কথার খেলাপ করতে পৃথিবীতে কোথাও ওদের তুলনা নেই।'

সুভাষের কথা। শুধু একবার নয়, গান্ধীজী, তথা ভারতবাসীকে একথা তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন বার বার। অনেক দিন। অনেক জায়গায়। অনেক ভাবে।

এমন কি, পরবর্তীকালে (১৯৪৩ সাল, জুন) টোকিও থেকে প্রচারিত এক বেতার-ভাষণের মাধ্যমেও তিনি এই সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন একাধিকবার। বলেছিলেন :

'পাখিদের মধ্যে কাক, পশুদের মধ্যে খেঁক-শিয়াল, আর মানুষের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সবচাইতে ধূর্ত ও নিষ্ঠুর।'

গান্ধীজী বিশ্বাস করেননি। জওহরলাল তো নয়ই। কারণ, গান্ধীজীর নিজের ভাষাতেই : 'এ মানুষটি (জওহরলাল) যত না ভারতবাসী তার চাইতে অনেক বেশি ইংরেজ।' সুতরাং প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু ইতিহাস! ইতিহাস কি বলে?

কি পেয়েছিল ভারতবাসী প্রথম মহাযুদ্ধের পরে?

কতটুকু পাওয়া গেল গান্ধী-আরউইন চুক্তির বিনিময়ে?

কি লাভ হল এত ঢাক-ঢোল বাজিয়ে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিয়ে?

একমাত্র ব্যর্থতা আর অহেতুক কালহরণ করা ছাড়া আর কিছু লাভ হয়েছে কি?

শুধু কি তাই! আরউইনের পরে বড়লাট হয়ে এলেন ঝানু ব্যুরোক্রাট লর্ড ওয়েলিংডন। তারপর কোথায় গেল চুক্তি, আর কোথায় রইল ইংরেজের প্রতিশ্রুতি?

শুরু হল প্রচণ্ড দমননীতি আর ব্যাপক ধর-পাকড়।

বিশেষ করে বাংলাদেশে। ওরা শুধু মরতেই জানে না, মারতেও জানে। সুতরাং ঢোকাও ওদের লৌহ-কপাটের অন্তরালে। কাউকে বাইরে থাকতে দেওয়া হবে না। একটি প্রাণীকেও না।

কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ অবাক। একি অন্যায় কথা! এমন তো কথা ছিল না!

চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বিপ্লবীদের তোমরা মুক্তি দাওনি, আমরা তা মেনে নিয়েছি। ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুকে ফাঁসি দিয়েছ, আমরা তা সহ্য করেছি। তারপর বাংলার হিজলী বন্দীনিবাসে অহেতুক গুলী চালিয়ে তোমরা নিরস্ত্র অসহায় বন্দীদের হত্যা করলে—সুভাষ এ নিয়ে যথেষ্ট হৈ-চৈ করলেও আমরা টুঁ শব্দটিও করিনি।

গোলটেবিল বৈঠকের নাম করে গান্ধীজীকে বিলেতে ডেকে নিয়ে এভাবে তাঁকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিলে, তাও মুখ বুজে মেনে নিয়েছি। তা সত্ত্বেও এখন কিনা তোমরা গান্ধী-আরউইন চুক্তি ভঙ্গ কর এভাবে...

চুক্তি! কিসের চুক্তি! ওয়েলিংডন অটল, অনড়। ওসব চুক্তি-টুক্তির কথা বলতে হয় তো আরউইনকে বলো গে। আমার কাছে ওসব চলবে না।

১৯৩২ সালের ১লা জানুয়ারি ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসল বম্বেতে।

প্রস্তাবে বলা হল: 'সরকারের কাছ থেকে সাত দিনের মধ্যে আমরা সদুত্তর চাই। অন্যথায় আবার শুরু হবে আইন-অমান্য আন্দোলন।'

বটে! এবার আসল মূর্তি ধারণ করলেন লর্ড ওয়েলিংডন। আন্দোলন করবে! দাঁড়াও, মজাটা দেখাচ্ছি!

কাজেও তিনি তাই করলেন, মল্লিকা। জওহরলালকে আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এবার গ্রেপ্তার হলেন গান্ধীজী স্বয়ং। গ্রেপ্তার হলেন সীমান্ত-গান্ধী, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ সবাই। মাত্র দুমাসের মধ্যেই মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা দাঁড়াল বত্রিশ হাজারেরও বেশি। এই হল ইংরেজের চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির নমুনা!

সুভাষও বাদ গেলেন না। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য না হলেও সুভাষকে সেবার বম্বের সেই বৈঠকে যোগ দিতে হয়েছিল বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে। এবার ঘরে ফেরার পালা।

কিন্তু একি! বম্বে থেকে ত্রিশ মাইল দূরে কল্যাণ স্টেশনে হঠাৎ এভাবে থেমে গেল কেন ডাক-গাড়িটা?

যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল তাই হল। এগিয়ে এল বিরাট পুলিশ বাহিনী। ১৮১৮ সালের তিন-আইনে তোমাকে বন্দী করা হল। চল এবার আমাদের সঙ্গে। অপরাধ-টপরাধ বুঝিনে। তোমাকে বন্দী করা হল। ব্যস্, ফুরিয়ে গেল!

নিয়ে যাওয়া হল মধ্যপ্রদেশের সিওনী সাব-জেলে। তারপরে জবুলপুর সেণ্ট্রাল জেলে।

কিন্তু এবার বাদ সাধল দেহ। তাই শেষ পর্যন্ত পাঠিয়ে দেওয়া হল ভাওয়ালী স্বাস্থ্য-নিবাসে। নাও, থাক এখানে।

কিছুতেই কিছু হল না। দেহের ভাঙন দিনের পর দিন এগিয়ে চলল একইভাবে। গায়ে সব সময়েই অল্প অল্প জ্বর। পেটে অসহ্য জ্বালা। হজমশক্তি নেই বললেই চলে।

শেষপর্যন্ত ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হল লক্ষ্ণৌয়ের বলরামপুর হাসপাতালে।

এবার টনক নড়ল ইংরেজ ডাক্তার কর্নেল বার্কলির। অনেক দেরি হয়ে

গেছে। আর নয়। বাঁচতে হলে সোজা চলে যাও ইয়োরোপে।

রাজী হলেন মহামান্য সরকার। তবে একটি শর্তে। যেতে হবে নিজের খরচে, আর কলকাতা হয়ে যাওয়া চলবে না। সোজা এখান থেকে যেতে হবে।

১৯৩৩ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি সুভাষ পাড়ি দিলেন ভিয়েনার উদ্দেশ্যে।

বিশেষ পরিচিত দু-একজন ছাড়া পুলিশ আর কাউকেই সেদিন সুভাষের সঙ্গে দেখা করতে দিল না বম্বের জাহাজ ঘাটে। বন্ধ অ্যাম্বুলেন্সে করে জেটিতে এনে স্ট্রেচারে করে সোজা তাঁকে তুলে দেওয়া হল ইতালীয়ান জাহাজ 'গঙ্গা'র অভ্যন্তরে।

সবাই বিষণ্ণ। সবার মনই ভারাক্রান্ত। সুভাষ অসুস্থ। এই অসুস্থ দেহ নিয়েই আজ তাঁকে জন্মভূমি ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে। আবার কবে তিনি ফিরে আসবেন কে জানে?

সহসা পরিস্থিতি জটিল হয়ে দেখা দিল ছোট একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

ক'দিন আগেই সুভাষ একটি বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে দুখানি চিঠি পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে। ইয়োরোপে থাকাকালীন তিনি ওখানকার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদদের সঙ্গে পরিচিত হতে ইচ্ছুক। তার জন্যে দুজনের কাছ থেকে দুটি পরিচয়-পত্র প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের চিঠি ইতিমধ্যেই এসে গেছে। আসেনি গান্ধীজীর চিঠি। তবে আসবে। নিশ্চয়ই আসবে। হয়তো এক্ষুণি এসে যাবে। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে গান্ধীজী তাঁকে বিমুখ করবেন না নিশ্চয়ই।

প্রহরের পর প্রহর কেটে গেল অপেক্ষা করে করে।

সুভাষ অস্থির, চঞ্চল। জাহাজের নোঙর তোলার সময় হয়েছে। কিন্তু কই, গান্ধীজীর চিঠি তো এখনো এল না।

সহসা কি দেখে সারা মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল সুভাষের। ঐ যে গান্ধীজীর সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই এসে গেছেন! এবার নিশ্চিন্ত। কই চিঠি দিন!

কোথায় চিঠি! কোথায় কি! গান্ধীজী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে সুভাষকে কোনরকম পরিচয়-পত্র দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

একটা বিস্মিত আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেলেন সুভাষ। তারপরই এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের চিঠিটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ভাসিয়ে দিলেন সাগরের জলে। কোন প্রয়োজন নেই। এখন থেকে নিজের পরিচয়েই তিনি দাঁড়াতে চেষ্টা করবেন প্রতিটি ক্ষেত্রে, কারো দেওয়া পরিচয়-পত্র বা সুপারিশের জোরে নয়।

মল্লিকা, সুভাষ সাধারণ মানুষ নন। শিক্ষা-দীক্ষা বা চরিত্র-মাধুর্যে কোথায় যে তাঁর স্থান, গান্ধীজীর তা অজানা নয়। তবে যে কেন তিনি সেদিন সুভাষকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে তা বুঝে ওঠা সত্যিই বড় কষ্টকর। তবে কি গোড়া থেকেই তিনি সুভাষকে তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে তাঁর প্রতি বিরূপ ছিলেন? এ প্রশ্নের

সদুত্তর দেওয়া একমাত্র গান্ধীজী ছাড়া আর কারো পক্ষেই বুঝি সম্ভব নয়।

৮ই মার্চ সুভাষ ভিয়েনা পেণছে আশ্রয় নিলেন ডাঃ ফুর্থের স্বাস্থ্য-নিবাসে। একটু সুস্থ হয়েই সুইজারল্যান্ড।

তারপর একে একে চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, পোল্যান্ড ইত্যাদি বহু দেশ।

পোল্যান্ড কৃষি বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় কি করে কৃষি আর কৃষক-জীবনের আমূল পরিবর্তন করা সম্ভব, সে সম্বন্ধে তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন প্রত্যক্ষভাবে।

কেন্দ্রীয় আইনসভার সভাপতি ও স্পীকার বিঠলভাই প্যাটেলও সেদিন ভিয়েনায় ছিলেন চিকিৎসার জন্য। দেখতে দেখতে গভীর অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠল দুজনের মধ্যে।

একজন নবীন, একজন প্রবীণ। তবু চিন্তাধারার দিক থেকে দুজনেই এক। দুজনেই বামপন্থী। দুজনেই প্রগতিবাদী। তাই বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও পরস্পরকে চিনে নিতে মোটেই ভুল হল না।

সহসা একটা অপ্রত্যাশিত খবর ভেসে এল স্বদেশ থেকে। সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। সেই পরাজয়ের কাহিনী।

জেল থেকে মুক্তি পাবার পরদিনই নাকি (৭ই এপ্রিল) গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। সেই সঙ্গে সরকারের কাছে রেখেছেন এক করুণ আবেদন। সত্যাগ্রহীদের তোমরা মুক্তি দাও। আর অর্ডিন্যান্সগুলো তুলে নাও।

গ্রাহ্যও করেননি বড়লাট লর্ড ওয়েলিংডন। এমন কি, দেখা করতে পর্যন্ত রাজী হননি গান্ধীজীর সঙ্গে। অর্থাৎ, কোন কথা নয়। কোন শর্ত নয়। পরাজিত প্রতিপক্ষের আবার শর্ত কি!

খবর শুনে প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন নবীন সুভাষ আর প্রবীণ বিঠলভাই।

এর মানে কি! কেন আন্দোলন প্রত্যাহার করা হল? তাই যদি করা হবে, তবে বার বার এই আন্দোলনের প্রহসন কেন?

৯ই মে, ১৯৩৩। দুজনে মিলে এক যুক্ত বিবৃতি দিলেন ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে। তাতে বলা হলঃ

'আইন-অমান্য আন্দোলন বন্ধ রেখে মহাত্মা গান্ধী শেষে যে কান্ড করলেন, তাতে মেনেই নেওয়া হল যে, কংগ্রেসের বর্তমান পদ্ধতি অচল! আমরা সুস্পষ্টভাবে মনে করি, রাষ্ট্রনেতা হিসেবে মহাত্মা গান্ধী ব্যর্থ। সুতরাং সময় এসেছে এখন নতুন নীতির ওপর নতুন পদ্ধতিতে কংগ্রেসকে ঢেলে সাজাবার। কংগ্রেসকে পুনর্গঠিত করতে হলে নেতৃত্বের বদল হওয়া দরকার।'

ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে পণ্ডিত নেহরু চিরদিনই একটি মস্তবড় জিজ্ঞাসার চিহ্ন। কখন যে তিনি কোন্ দিকে ঝুঁকে পড়বেন, তা বলা শক্ত।

এহেন অস্থিরচিত্ত লোকও কিন্তু সেদিন আন্দোলন প্রত্যাহার করার জন্য গান্ধীজীর সমালোচনা না করে পারেননি, মল্লিকা। জেল থেকে মুক্তি পেয়েই তিনি গান্ধীজীকে লিখলেন ঃ

'আপনি আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করেছেন, এ খবর যখন পাই, তখন অসুখী বোধ করেছিলাম।...এ কাজের সপক্ষে যে সমস্ত কারণ আপনি দেখিয়েছেন এবং ভবিষ্যতের কাজ সম্পর্কে যে সমস্ত প্রস্তাব আপনি করেছেন, তাতে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছি। জীবনের কঠোরতম আঘাত আপনার বিবৃতি আমাকে দিয়েছে।...কংগ্রেসকে আজ 'ককাস' ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। সুবিধাবাদের আজ জয়-জয়কার...।'

[বাঞ্চ অফ ওল্ড লেটার্স ঃ পৃঃ ১১২]

সবচাইতে কঠোর সমালোচনা করলেন বম্বে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মিঃ নরীম্যান। তীব্রভাষায় তিনি বললেন ঃ

'...গান্ধীজীর এই অসংশোধনীয় মনোভাবের প্রতিকার কি? রাজনীতি আর ধর্মের জগাখিচুড়ি, আর তার ভুল-ভ্রান্তির এই ছেদহীন পরিক্রমা—এর হাত থেকে জাতি কবে পরিত্রাণ পাবে!...উপায় আছে। গান্ধীজীর চারপাশে ঘিরে রয়েছে ঐ যে ভৈরবীচক্র, স্বাধীন সত্তাহীন কতকগুলি কলের পুতুল, গান্ধীজীকে দেখে যারা মাথা নাড়ে, কথা কয়, সায় দেয়, ওদের স্থানে যদি এমন একটি মানুষ পাওয়া যেত, যার ব্যক্তিত্ব আছে, যে সোজা কথা সহজ করে বলতে পারে, আর যার আছে রাজনৈতিক মস্তিষ্ক।'

গণতান্ত্রিক মতে সবারই সমালোচনা করার অধিকার আছে। নরীম্যানও তার ব্যতিক্রম নন। তা সত্ত্বেও অহিংস-নীতিতে আস্থাবান গান্ধী-গোষ্ঠী কিন্তু সেদিন নরীম্যানের এই মন্তব্যকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেনি, মল্লিকা। ফল পেতে হয়েছিল তাঁকে হাতে হাতেই।

'হতভাগ্য নরীম্যান! কংগ্রেসের কর্তাদের বিচারে তাঁকে ধরাশায়ী হতে দেরি হল না। নরীম্যানের দেশ-সেবার পথে নেমে এল কালো যবনিকা।'

[ইণ্ডিয়া উইনস্ ফ্রীডম ঃ মৌলানা আজাদ ঃ পৃঃ ১৬]

নরীম্যানের কণ্ঠ রোধ করা হল, তা বলে ইতিহাসের কণ্ঠ কিন্তু রোধ করা সম্ভব হল না, মল্লিকা। বরং সেখানে নরীম্যানের বক্তব্যই মুদ্রিত হয়ে রইল চিরকালের মতো। বার বার এভাবে মাঝপথে আন্দোলন থামিয়ে দেবার প্রসঙ্গে দেশবরেণ্য ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার কি বলেছেন, শোন ঃ

'Gandhi, the politician, hopelessly blundered. He sounded the order of retreat just when the public enthusiasm had reached the heating point.'

[গান্ধী রাজনীতিবিদ, অথচ অদ্ভুত একটি ভুল করে বসলেন। এমন সময়েই তিনি পশ্চাদপসরণের আদেশ দিলেন, যখন জনগণের উৎসাহ ও উদ্দীপনা চরমে উঠেছিল।]

এবার শোন দেশবন্ধুর কথা ঃ

'The Mahatma opens campaign in brilliant fashion, he works it up with unerring skill, he moves from success to success till reaches the zenith of his campaign, but after that he loses his nerve and begins to falter.'

[মহাত্মা তাঁর আন্দোলন খুবই চমকপ্রদ পদ্ধতিতে শুরু করেন। নির্ভুল এবং অসাধারণ নৈপুণ্যে ক্রমশঃ সাফল্যের চরম মুহূর্তে এসে দাঁড়ান। কিন্তু তারপরই তাঁর স্নায়ুযন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে। শুরু হয় তাঁর দ্বিধাগ্রস্ত পথচলা।]

আর জওহরলাল ! এ সম্বন্ধে পরবর্তীকালে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন, তা শোনা যাক ঃ

'I felt annoyed with him for choosing a side issue for the final sacrifice...After so much sacrifice and brave endeavour was our movement to tail off into something insignificant?

I felt angry with him at his religious and sentimental approach to a political question, and his frequent references to God in connection with it...'

[Nehru on Gandhi : P. 72 : Toward Freedom, 236.9]

[চরম আত্মোৎসর্গের জন্য আমাদের প্রধান উদ্দেশ্যের বাইরে ছোট একটা কারণ বেছে নেবার জন্য আমি তাঁর ওপর খুবই বিরক্ত হয়েছিলাম। এই আত্মদান ও সাহসী প্রচেষ্টার পর আমাদের আন্দোলন কি এমন একটা তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর কারণের পেছনে ছুটে চলবে ?

একটি রাজনৈতিক বিষয় বিবেচনা করতে গিয়ে যেভাবে তিনি ধর্ম ও ভাবপ্রবণতার আশ্রয় নিয়ে ঘন ঘন ঈশ্বরকে টেনে আনতে শুরু করেছেন, তা দেখে তাঁর ওপর আমার রীতিমত রাগই হয়েছিল।]

সবই সত্যি। তা বলে একথাও মিথ্যে নয় যে, গান্ধীজী তাঁর জীবন ও সাধনা দিয়ে বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষকে সর্বাধিক পরিমাণে আলোড়িত করেছিলেন এবং নিজের দেশকে পরিচিত করেছিলেন বিশ্বের দরবারে। তাই হাজার মতের অমিল থাকা সত্ত্বেও জওহরলাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে সেদিন গান্ধীজীর কাছে মাথা নত না করে গত্যন্তর ছিল না।

তাছাড়া গান্ধীজীর তূণে সেদিন এমন দুটি মোক্ষম অস্ত্র ছিল, যাকে ভয় না করে উপায় ছিল না। তার মধ্যে একটি হল, মাঝে মাঝেই কংগ্রেস ছেড়ে যাবেন বলে ভীতি-প্রদর্শন। অন্যটি—অনশন। সুভাষের ভাষায় ঃ

'...Whenever any opposition raised outside his cabinet, he could always coerce the public by threatening to retire from the Congress or to fast unto death.'

[The Indian Struggle : Subhas Chandra Bose : P. 245]

[যখনই তাঁর বিরুদ্ধে কোনরকম প্রতিবাদ উঠত, ঠিক তখনই তিনি

কংগ্রেস ছেড়ে যাওয়া বা আমরণ অনশন করার হুমকী দিয়ে জনসাধারণকে তাঁর মতে চলতে বাধ্য করতেন।]

দেশবন্ধু আর বিঠলভাই প্যাটেল। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে দুটি উল্লেখযোগ্য নাম।

এ দুটি মানুষ কিন্তু প্রথম-দর্শনেই সুভাষকে চিনে নিতে এতটুকুও ভুল করেননি, মল্লিকা। ভুল করেননি আরও একজন। তিনি হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। সেকথা পরে আসছে।

দেশবন্ধু আগেই গত হয়েছেন। এবার প্যাটেলজীর পালা। জীবনীশক্তি ক্রমেই কমে আসছে একটু একটু করে। এখন শুধু অপেক্ষা মাত্র।

শিয়রে উপবিষ্ট সুভাষ। চোখে-মুখে তাঁর রাত্রি জাগরণের ক্লান্তির কালিমা। স্বাধীনতার অক্লান্ত যোদ্ধা প্যাটেলজী আজ স্বদেশ থেকে কত দূরে এসে একটু একটু করে এগিয়ে চলেছেন মহাপ্রস্থানের দিকে। এ দুঃখের সান্ত্বনা কোথায়!

অপরিসীম স্নেহে প্যাটেলজী তাকিয়ে থাকেন তারুণ্যের দীপ্তিতে দীপ্যমান সুভাষের ঐ মুখখানির দিকে। তারপরই একসময়ে সারা মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কিসের একটা অস্বাভাবিক দ্যুতিতে।

গীতার শ্লোক মিথ্যে নয়। সে এসে গেছে। অন্যায় ও পাপের হাত থেকে পৃথিবীকে ভার-মুক্ত করার জন্য এরই মধ্যে সে এসে গেছে। দানবের হাত থেকে মাতৃভূমির মুক্তি অর্জন করা আর সুদূরপরাহত নয়। সংগ্রাম শুরু হল বলে!

—শোন সুভাষ! রাশি রাশি স্নেহ ঝরে পড়ে প্যাটেলজীর কথায়, যে কাজ শুরু করেছ তা শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেয়ো। আমি জানি তুমিই সেই লোক, যে ভারতের নোঙরহীন তরীকে ঠিক পথে চালিত করতে পারবে। আমার উইলে তোমার জন্য আমি একলক্ষ টাকা রেখে গেলাম। বিদেশে প্রচার-কার্য চালাবার জন্য তোমার ইচ্ছামত তুমি এটা খরচ করো।

বলতে বলতে এক সময়ে প্যাটেলজীর চোখ দুটো বুজে এল পরম শান্তিতে। অনন্ত নির্ভরতায়। নিশ্চিন্ত আরামে। সে ঘুম আর কোনদিনই ভাঙল না।

একটা নিদারুণ শূন্যতায় বুকটা হাহাকার করে ওঠে সুভাষের। প্রবাসী জীবনের শ্রেষ্ঠতম বন্ধু প্যাটেলজী আজ তাঁর কর্মবহুল জীবনের পালা শেষ করে চলে গেলেন। নির্বান্ধব পৃথিবীতে এখন সে নিঃসঙ্গ, একা।

কিন্তু ঐ একলক্ষ টাকা! কি হল সেই টাকাটার! সত্যিই কি সেই টাকাটা পেয়েছিলেন সুভাষ?

না, পাননি। বাদ সাধলেন গান্ধী-শিষ্য সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। আদালতের সাহায্যে তিনিই উইলের সেই শর্তটাকে সেদিন নাকচ করে নিয়েছিলেন নানাবিধ আইনের ফ্যাঁকড়া তুলে।

কিন্তু যদি সুভাষ না হয়ে আর কেউ হতেন? যদি জওহরলাল হতেন!

সে ক্ষেত্রে বড় ভাইয়ের নির্দেশটাকে নাকচ করার জন্য সর্দারজী এতখানি উঠে-পড়ে লাগতেন কি ? বোধহয় না !

প্যাটেলজীর মৃত্যুর পর আবার শুরু হল দেশ-পরিক্রমা। আজ ফ্রান্স, কাল রোম, পরশু হয়তো বা অন্য কোন এক জায়গায়।

নিঃসঙ্গ নির্বাসিত জীবন। আত্মীয়-স্বজনহীন, বন্ধনহীন, একাকী। এ জীবনে একটানা পথ চলা ছাড়া আর সান্ত্বনা কোথায় !

ডাক এল খাস ইংল্যান্ড থেকে। ওখানকার ভারতীয়দের সর্বদলীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে সুভাষকে সভাপতিত্ব করতে হবে।

কিন্তু না, ইংরেজ সরকার তাঁকে ওখানে যেতে দিতে রাজী নয়। দেওয়া সম্ভব নয়। সুভাষ বোসকে তারা হাড়ে-হাড়েই চেনে। সুতরাং কোনরকম ঝুঁকি নিতে তারা প্রস্তুত নয়।

আপত্তি নেই জওহরলালের বেলায়। কারণ স্বয়ং গান্ধীজীর ভাষায় ঃ

'He is more English than Indian in his thoughts and make-up. He is often more at home with Englishmen than with his countrymen.' অর্থাৎ জওহরলাল যত না ভারতবাসী তার চাইতে অনেক বেশি ইংরেজ। তাই দেশবাসীর চাইতে তিনি অনেক বেশি খুশি হন ইংরেজের সাহচর্যে।

[কংগ্রেসের ইতিহাস ঃ ডাঃ পট্টভি ঃ ২য় খণ্ড ঃ পৃঃ ১৩২]

সুতরাং জওহরলাল সম্বন্ধে আপত্তির কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আপত্তি করেওনি। বরং যথেষ্ট সমাদরই তাঁকে করা হয়েছিল আমন্ত্রণ করে ডেকে নিয়ে।

কিন্তু জওহরলাল আর সুভাষ এক নন। সুভাষ মহাবিদ্রোহী। তদুপরি আয়ারল্যাণ্ডের সিন্ ফিন্ বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত উৎসাহী। খোলাখুলিভাবেই সেকথা তিনি প্রকাশ করেছেন বার বার। এহেন লোককে ইংল্যাণ্ডে ঢুকতে দেওয়াও বিপজ্জনক !

বাধ্য হয়েই সুভাষ তাঁর ভাষণ পাঠিয়ে দিলেন ডাকযোগে।

ভাষণ তো নয়, যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। সাম্রাজ্যবাদী ইয়োরোপের মাটিতে দাঁড়িয়ে এমন অগ্নি-ঝরা ভাষণ দেবার মতো দুঃসাহস সেদিন এই একটি মানুষ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে কল্পনারও বুঝি অতীত ছিল।

'...ইংরেজের এই মনোভাব আর তার অস্তিত্ব হয়তো আরো অনেকদিন এমনি অটুট থাকবে, যদি আমরা অস্ত্রের সাহায্যে বা আর্থিক অবরোধের দ্বারা ইংরেজ ও তার সমর্থকদের জীবন অচল, ভীতিপ্রদ আর অতিষ্ঠ করে তুলতে না পারি। আইন-অমান্য আন্দোলন তা করতে পারেনি।'

১০ই জুন, ১৯৩৩ সাল। লণ্ডনের ফিয়ার্স হলে ডাঃ কিরণ ভট্টাচার্যের মুখে সুভাষের প্রেরিত এই ভাষণ শুনে বিলেতের টোরী-সম্প্রদায় চটে লাল।

সঙ্গে পোঁ ধরল ওখানকার রক্ষণশীল পত্র-পত্রিকাগুলি। তারপর শুরু হল প্রচার-বিশারদ ইংরেজের স্বভাবসিদ্ধ অপপ্রচার। সুভাষ বোস কমিউনিস্ট। সুভাষ বোস ফ্যাসিস্ট। ইয়োরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির উচিত

এই বিপজ্জনক মানুষটির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা। নইলে পরে পস্তাতে হবে।

মুখের ওপর জবাব দিলেন সুভাষ। জবাব দিলেন ভিয়েনা থেকে। সংক্ষিপ্ত এক বিবৃতি প্রচার করে খোলাখুলিভাবেই জানালেন তিনি তাঁর মনের কথা।

'পৃথিবী জুড়ে এখন নানা মতবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। তার মধ্যে শেষপর্যন্ত কোন্‌টা যে টিকে থাকবে তার কোন স্থিরতা নেই। ভাল করে দেখে-শুনে তার মধ্যে যা সত্য, যা ভারতের পক্ষে কল্যাণকর, তাই আমরা গ্রহণ করব। আগে থেকে কোন নির্দিষ্ট মতবাদের কাছে আমাদের মস্তিষ্ক বন্ধক রাখতে আমরা রাজী নই।'

আবার শুরু হল বিভিন্ন দেশ-পরিক্রমা। নির্বাসিত জীবেনর এই নিঃসংগ দিনগুলোকে হেলায় হারালে চলবে না। জানতে হবে অনেক কিছু। জানতে হবে ইয়োরোপের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির ভাঙা-গড়ার ইতিহাস। পরিচিত হতে হবে নতুন দেশের নতুন মানুষের সংগে। নতুন ভাবধারার সংগে।

জেনিভা থেকে ফ্রান্স। তারপর একে একে বুদাপেস্ট, সোফিয়া, বুখারেস্ট ও বেলগ্রেড।

সেই সংগে চলে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস রচনার কাজ। শুধু জানলেই চলবে না। সেই সংগে ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা সবাইকে জানাতে হবে। জানাতে হবে গোটা বিশ্বকে।

হঠাৎ ছন্দপতন ঘটে গেল। খবর এল পিতা মৃত্যুশয্যায়। অবস্থা আশঙ্কাজনক। কি হবে বলা যায় না।

চঞ্চল হয়ে উঠলেন সুভাষ। পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতা হি পরমং তপঃ। যত বিধি-নিষেধই থাক না কেন, এ সময়ে তাঁর কাছে তাঁকে ফিরে যেতেই হবে।

৩রা ডিসেম্বর বিমানযোগে করাচি। সেখান থেকে সোজা দমদম। কোথায় তখন স্নেহময় পিতা জানকী বসু! দুদিন আগেই সব শেষ।

তা বলে অভ্যর্থনার ত্রুটি হল না।

দীর্ঘদিন বাদে দেশের মাটিতে পা দিতে না দিতেই সাদর অভ্যর্থনা জানাল বিরাট এক পুলিশ বাহিনী। তারপরই তারা এক নির্দেশনামা তুলে ধরল পিতৃ-বিয়োগব্যথায় কাতর সুভাষের চোখের সামনে।

'বিমানঘাঁটি থেকে সোজা এলগিন রোডে যেতে হবে। বাড়ির বাইরে যাওয়া চলবে না। একমাত্র বাড়ির লোক ছাড়া অন্য কারো সংগে বাক্যালাপ নিষিদ্ধ। ডাকযোগে চিঠিপত্র যাই আসুক না কেন, সংগে সংগে না খুলেই তা পুলিশের কাছে জমা দিতে হবে। যে কোন একটি আদেশ অমান্য করলেই সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড।'

এখানেই থামলেন না সদাশয় ইংরেজ সরকার। দিন কয়েক যেতে না যেতেই আবার এক নতুন আদেশ। অবিলম্বে ইয়োরোপে ফিরে যেতে হবে।

তোমার মতো বিপজ্জনক লোককে কিছুতেই দেশের মাটিতে থাকতে দেওয়া হবে না। নাও, প্রস্তুত হও।

১৯৩৫ সালের ৮ই জানুয়ারি সরকারী নির্দেশে আবার সুভাষকে ইয়োরোপে ফিরে যেতে হল নিজের জন্মভূমি ত্যাগ করে। সেই নির্বাসন জীবনে।

প্রথমেই গেলেন নেপল্‌স। তারপর রোম। দেখা হল মুসোলিনীর সংগে। সেখান থেকে আবার সেই ভিয়েনা। তারপর জেনিভা ও ফ্রান্স।

ইতিমধ্যে ১৬ই জানুয়ারি সুভাষের লেখা 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' প্রকাশিত হবার সংগে সংগেই ঢেউ উঠল গোটা ইয়োরোপ জুড়ে। ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ইতিপূর্বে কেউ এমন করে তুলে ধরতে পারেনি সারা পৃথিবীর কাছে। মুখোশ-পরা ইংরেজের আসল চেহারাটাও বুঝি এমন করে কেউ খুলে দিতে পারেনি এর আগে।

বন্ধ করো। বন্ধ করো ঐ বই। ধরা পড়ে গিয়ে গর্জে উঠল সুসভ্য ইংরেজ সরকার। কিছুতেই এই বই ভারতবর্ষে যেতে দেওয়া হবে না। কোনমতেই না। সুতরাং মাত্র এক সপ্তাহ বাদে, ২৩ তারিখেই সুভাষের লেখা সেই বইটিকে বাজেয়াপ্ত করে দেওয়া হল গোটা ভারতবর্ষে।

সুইজারল্যাণ্ডে দেখা হল পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী রোমা র'লার সংগে।

অবশ্য তার আগেই 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' সম্বন্ধে রোমা র'লা তাঁর অভিনন্দন-বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সুভাষের কাছে। তাতে তিনি লিখেছিলেন—'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস জানতে হলে এই বই অপরিহার্য। ঐতিহাসিকের মহত্তম গুণ আপনার লেখায় ফুটে উঠেছে।...রাজনীতির সীমাহীন কর্মব্যস্ততার মধ্যে থেকেও দলীয় মনোভাব আপনার বিচার-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেনি। এটা দুর্লভ।...আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন এই কামনা করি। ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য আপনাকে সুস্থ হয়ে উঠতেই হবে।'

১৯৩৬ সাল। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস। গান্ধীজীর ইচ্ছানুযায়ী সভাপতি হলেন জওহরলাল।

তরুণদল চঞ্চল। পুরনো মতবাদে এখন আর তারা কেউ-ই আস্থাশীল নয়। তারা চায় নতুন আবেগ। নতুন তরঙ্গ। নতুন পথ-নির্দেশ।

কেউ কেউ এর মধ্যেই সোস্যালিজমের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। কেউ বা আবার মেতে উঠেছে কমিউনিজম নিয়ে। কে পারে এই উদ্বেলিত যুবশক্তিকে একটা নতুন চমক দেখিয়ে শান্ত করতে!

জওহরলাল।

সুভাষকে বাদ দিলে একমাত্র জওহরলাল সম্বন্ধে দেশের যুবশক্তি এখনো কিছুটা আশাবাদী। সুতরাং জওহরলাল ছাড়া গতি নেই।

তাছাড়া জওহরলাল সম্বন্ধে ভয়েরও কোন কারণ নেই। নিজস্ব মতবাদ

নিয়ে মুখে যাই বলুক না কেন, প্রয়োজনের মুহূর্তে সে বশ্যতা স্বীকার করতে জানে।

তাছাড়া আরো কারণ আছে। ১৯৩৫ সালে যে নতুন শাসনতন্ত্র চালু করা হয়েছে, তার ফলে প্রদেশগুলিতে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা এখন আর সুদূর-পরাহত নয়। নির্বাচনের মাধ্যমে অনায়াসেই তা পাওয়া যেতে পারে।

বাদ সেধেছে ঐ প্রগতিবাদী যুব-সম্প্রদায়। তাদের মতে এটা ইংরেজের একটা বিরাট ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, প্রদেশগুলিতে কিছু কিছু সুবিধা পাওয়া গেলেও কেন্দ্রীয় শাসনকার্যের ব্যাপারে সে সব কোন প্রশ্ন নেই। সেখানে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে এমন চাতুর্য-সহকারে আসন ভাগ-বাঁটোয়ারা করা হয়েছে যে, কোনরকমেই কংগ্রেসের পক্ষে সংখ্যা-গরিষ্ঠ হবার কোন আশা নেই।

যুব-সম্প্রদায়ের আপত্তি সেইখানেই। তাদের বক্তব্য, এই শর্তে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার অর্থই হল সাম্প্রদায়িকতাকে মেনে নেওয়া। সুতরাং কংগ্রেসের পক্ষে কিছুতেই সরকারের এই ফাঁদে পা দেওয়া উচিত হবে না।

জওহরলালের চটক আছে। দেখা যাক, এ ব্যাপারে সে কোন মীমাংসায় আসতে পারে কিনা!

জওহরলাল সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শুনে সবচাইতে বেশি খুশি হলেন সুভাষ।

ষোল আনা গান্ধী-ভক্ত হলেও জওহরলালের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে তখনো তিনি কিছুটা আশাবাদী। তাই জওহরলালকে উদ্দেশ্য করে তিনি লিখলেনঃ

'আজ যাঁরা নেতৃত্বের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র তোমার ওপরই আমি ভরসা রাখি। তুমিই পারবে কংগ্রেসকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে।...আমি একান্তভাবেই আশা করব যে, তোমার নিজস্ব আদর্শানুযায়ী সিদ্ধান্তে পৌঁছতে তোমার ব্যক্তিত্বকে তুমি বিনা দ্বিধায় প্রয়োগ করবে। নিজেকে দুর্বল ভেবো না।...কংগ্রেসের গদী-দখলের চেষ্টা যেমন করে হোক বন্ধ করতে হবে। আর ওয়ার্কিং কমিটিকে সম্প্রসারিত করতে হবে। এ দুটো কাজ যদি তুমি করতে পার, অধঃপতনের পথ থেকে কংগ্রেসকে তুমি বাঁচাতে পারবে।...যদি আমি লক্ষ্ণৌ যাবার সুযোগ পাই, আমি দাঁড়াব তোমার পাশে।'

এবার এক নতুন সিদ্ধান্ত নিলেন সুভাষ।

এ নির্বাসিত জীবন আর নয়। এবার আমি ফিরে যাব আমার দেশের মাটিতে। কি করবে ইংরেজ? বন্দী করবে? করুক! তবু তো দেশের মাটি!

সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেখতে দেখতে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল সারা পৃথিবীতে। সুভাষ তাঁর দেশে ফিরে যাবেন ইংরেজের যাবতীয় বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে। এ বিষয়ে তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প।

তার আগেই আহ্বান এল আয়ারল্যাণ্ডের মুক্তিযোদ্ধা ডি. ভ্যালেরার কাছ থেকে।

সবেমাত্র তারা ইংরেজের কবল থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছে। এ সুযোগে তারা সাদর সংবর্ধনা জানাতে চায় ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা সুভাষকে।

১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ডাবলিনে বীরোচিত সংবর্ধনা জানানো হল সুভাষকে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন সংগ্রাম করে তারা স্বাধীনতা অর্জন করেছে। সত্যিকার সংগ্রামীকে কি করে সম্মান দেখাতে হয় তারা তা জানে।

এবার ঘরে ফেরার পালা।

বাধা দিতে চেষ্টা করলেন ভিয়েনার ইংরেজ রাষ্ট্রদূত জে. ডব্লিউ. টেলার। এ প্রচেষ্টা ত্যাগ করুন। জেনে রাখুন, আমাদের বৈদেশিক দপ্তর আপনার এ কাজ অনুমোদন করেন না। তাই সতর্ক করে দিচ্ছি যে, স্বাধীনভাবে আপনার ভারতে প্রবেশ করা মোটেই সম্ভবপর হবে না। 'You cannot expect to remain at liberty.'

আমি যাবই। নিজের সঙ্কল্পে সুভাষ স্থির, অনড়। এভাবে বছরের পর বছর ধরে নির্বাসিত জীবন মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

১১ই এপ্রিল, ১৯৩৬ সাল। বম্বের জাহাজ ঘাটে সেদিন জনতার প্রচণ্ড ভিড়। আজ সুভাষ আসবেন। চিরবিদ্রোহী সুভাষ।

বাধা দিল পুলিশ বাহিনী। না, কাউকেই কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হবে না। একটি প্রাণীও না। আসুক না সুভাষ বোস! তারপর যা করার আমরাই করব। ভ্যান-গাড়ি প্রস্তুতই রয়েছে।

কাজেও তাই হল। জাহাজ ভিড়তেই কড়া পুলিশ পাহারায় সুভাষকে নিয়ে তোলা হল কালো রঙের সেই ভ্যান-গাড়িটাতে। তারপর সোজা আর্থার রোড পুলিশ ফাঁড়ি। সবশেষে যারবেদা জেল।

দূরে দণ্ডায়মান বিরাট জনতার কণ্ঠে এবার ধ্বনি উঠল—সুভাষ বোস কি জয়! সুভাষ বোস জিন্দাবাদ!

আর সুভাষ! যেতে যেতে একটি মাত্র কথাই তিনি বলতে পেরেছিলেন জনতার উদ্দেশে, 'বাইরের স্বাধীনতার চাইতে দেশের কারাগারও আমার কাছে অনেক প্রিয়।' 'Keep the flag of India's freedom flying.'

এবার প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল গোটা ভারতবর্ষ। ওয়ার্কিং কমিটি, সোস্যালিস্ট পার্টি, দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা কেউ বাদ গেল না। প্রতিবাদ হিসেবে ১০ই মে 'সুভাষ-দিবস' পালিত হল ভারতবর্ষের সর্বত্র। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড বিক্ষোভ।

কেন সুভাষকে বন্দী করা হল? কি তাঁর অপরাধ? অপরাধ কিছু থাকলে প্রকাশ্য আদালতে তা প্রমাণ করা হচ্ছে না কেন?

প্রতিবাদ করলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। তিনি লিখলেন:

'...বাংলা দেশে হাজার হাজার নরনারী আজ বন্দিশালায়। বিচারের

দাবী করছিই. সেই দাবীর পেছনে দুঃখ আছে দুঃসহ, কিন্তু তার জোর নেই। বিনা বিচারে যারা দণ্ড ভোগ করছে অপরিমিত কাল ধরে, তাদের মধ্যে দেশের যে বেদনা আছে, তার চেয়ে অনেক বড়ো আছে দেশের অসম্মান।

বিচারের অধিকারে আছে মনুষ্যত্বের সম্মান। তার থেকে আমরা বঞ্চিত। কেননা, আমরা বিশ্বের গোচর নই, আমাদের মূল্য নেই। এই দেশব্যাপী অভিসম্পাতের আক্রমণ হতে যদি কোনদিন নিজেদের রক্ষা করতে পারি তা হলেই আমাদের প্রত্যেক অন্যায়ের প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হবে দেশে-বিদেশে।...'

একই প্রশ্ন উঠল বিলেতের পার্লামেন্টে। সুভাষ সম্বন্ধে সরকারের নীতি কি? কেন তাঁকে এভাবে বছরের পর বছর ধরে নির্বাসিত জীবনে বাধ্য করা হচ্ছে?

উত্তর পাওয়া গেল সংগে সঙ্গেই। সেই চিরাচরিত উত্তর। সুভাষ বোস সন্ত্রাসবাদী।

অনেক ভেবে-চিন্তে শেষপর্যন্ত সুভাষকে আটক বন্দী করে রাখা হল কার্শিয়াং-এ। গির্দা পাহাড়ে অবস্থিত মেজদা শরৎ বোসের নিজস্ব বাংলোতে।

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস শেষ হল। প্রগতিবাদী বামপন্থী দলগুলির সেদিন অনেক আশা ছিল সভাপতি জওহরলালের ওপর। কিন্তু সে আশা বাষ্প হয়ে উড়ে যেতে দেরি হল না।

কোথায় সংগ্রামী জওহরলাল! কোথায় তাঁর সংগ্রামের পথনির্দেশ!

তার ছিটে-ফোঁটাও পাওয়া গেল না এবারকার সভাপতি জওহরলালের মধ্যে। এ জওহরলাল বৃদ্ধ, স্থবির ও সংগ্রাম-বিমুখ।

এ প্রসংগে একটি চিঠি থেকে খানিকটা অংশ আমি এখানে তুলে ধরছি, মল্লিকা। চিঠির লেখক যুক্তপ্রদেশের প্রখ্যাত কংগ্রেস-নেতা রফি আমেদ কিদোয়াই। এ চিঠি থেকেই তুমি বুঝতে পারবে যে, কংগ্রেস সভাপতি জওহরলালের ভূমিকা সেদিন দেশের প্রগতিবাদী শক্তিগুলোকে কতখানি হতাশ করে তুলেছিল।

'প্রিয় জওহরলালজী,

...আপনার ওপরই ছিল আমাদের সবচাইতে বড় ভরসা। কিন্তু মনে হয় আপনিও আমাদের কাছে মিথ্যে হয়েই দাঁড়ালেন।...আপনার সামনে সত্যিই একটা সুযোগ এসেছিল। ইচ্ছা করলে এই সুযোগে আপনি আপনার ইচ্ছামত ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে পারতেন।...আপনি তাদেরই সরিয়েছেন, যারা আপনাকে শক্তি যোগাতে পারত। গান্ধী-গোষ্ঠী চালাকি করে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করেছে।...' [বাণ্ড অফ ওল্ড লেটার্স: পৃঃ ১৭৫]

এ তো গেল রফি আমেদের কথা। এবার একান্ত স্নেহের পাত্র জওহরলাল সম্বন্ধে গান্ধীজীর নিজের কি বক্তব্য শোনা যাক।

প্রিয় শিষ্য আগাথা হ্যারিসনকে লিখিত চিঠিতে এ সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'আমার কথা এই যে, জওহরলাল যখন আদর্শ নিয়ে আলোচনা করে, তখন সে হয়ে ওঠে পুরোপুরি চরমপন্থী। কাজের বেলা কিন্তু তা নয়। তখন সে খুব সতর্ক এবং সংযত। আমার মনে হয় জওহরলাল তার অধিকাংশ সহকর্মীর সিদ্ধান্ত মেনে চলবে।'

[বাণ্ড অফ ওল্ড লেটার্স : পৃঃ ১৭৫]

তবু একদিন সংঘাত বাধল, মল্লিকা!

কারণ, চরম অবলুপ্তির আশঙ্কায় গান্ধী-চক্রের কাছে যতই নতি স্বীকার করুক না কেন, আসলে জওহরলালের মধ্যে সর্বক্ষণই বাস করত একটা আদর্শবাদী নির্ভীক সত্তা, যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাঝে মাঝে ছিটকে বেরিয়ে পড়ত স্ফুলিঙ্গের মতো।

গান্ধীবাদীদের তা মনঃপূত নয়। তাঁরা চান পূর্ণ বশ্যতা, যেখানে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বলে কিছুই থাকবে না।

এই নিয়েই সূত্রপাত। তারপরেই হঠাৎ একদিন রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বল্লভভাই প্যাটেল, রাজাগোপালাচারী, কৃপালনী প্রমুখ ওয়ার্কিং কমিটির সমস্ত সদস্যদের পদত্যাগ-পত্র এসে হাজির। হয় আমাদের কথামত চল, নয়তো তোমার সঙ্গে আর আমরা নেই। যা ভাল বোঝ কর।

পরদিনই জওহরলাল পড়ি-কি-মরি করে ওয়ার্ধায় ছুটলেন গান্ধীজীর কাছে।

হাজির অপরপক্ষও। জওহরলাল যে সঙ্গে সঙ্গে এখানে ছুটে আসবে, এ তো জানা কথাই। না এসে যাবে কোথায়? নরীম্যানের দৃষ্টান্ত তো তার ভুলে যাবার কথা নয়।

মাত্র এক মিনিটের মামলা। গান্ধীজীর সঙ্গে কি কথা হল কে জানে! কিন্তু দেখা গেল যে, সব ঠিক। কারো কোন অভিযোগ নেই। কোন অভিমানও নেই। সব হরিহর-আত্মা।

তবে লাভ হল জওহরলালেরই। পুরস্কার হিসেবে গান্ধীজীর ইচ্ছায় পরবর্তী ফৈজপুর কংগ্রেসের সভাপতির পদটাও তাঁর ভাগ্যেই জুটে গেল।

অবস্থার আরো অবনতি ঘটল ফৈজপুর কংগ্রেসে।

কোথায় সংগ্রাম! কোথায় তার সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী! ১৯৩৩ সালে সেই যে মাঝপথে সংগ্রাম প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল, সেই শেষ। তারপর বছরের পর বছর ধরে শুধু কথা, কথা আর কথা! ফলে, বহু তরুণ কংগ্রেস থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে বামপন্থী দলগুলিকে ভারী করে তুলল কোন দিকে কোন পথের সন্ধান না পেয়ে।

সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর অভাবে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ অবস্থা তখন রীতিমত ঘোরালো। এমন কি, বিদেশী রাজনীতিবিদদের চোখে পর্যন্ত সেদিন কংগ্রেসের এই সংগ্রামবিমুখতা ধরা পড়তে দেরি হয়নি। এই প্রসঙ্গে

আমি এডওয়ার্ড টমসনের লেখা দুটি চিঠি থেকে কিছুটা অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি, মল্লিকা। সেই এডওয়ার্ড টমসন, যিনি ব্যক্তিগত জীবনে শুধু জওহরলালের ঘনিষ্ঠ বন্ধুই নন, ভারতেরও একজন সত্যিকারের শুভার্থী বন্ধু বলে পরিচিত। ১৯৩৬ সালের ১লা নভেম্বর বন্ধু জওহরলালকে তিনি লিখেছেন :

'...একটি কথা ছাড়া গান্ধীজী সম্বন্ধে আর কিছু বলব না। আইন-অমান্য আন্দোলন কিছুটা সাফল্য লাভ করা সত্ত্বেও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তিনি যদি অতঃপর নতুন কোনও পথ আবিষ্কার করতে না পারেন, তাহলে হয়তো তিনি কেবল নামে-মাত্র একজন ক্ষমতাশীল 'গণপতি' হয়েই থাকবেন ; গণদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা ছাড়া তাদের একটা স্থির লক্ষ্যে পরিচালনা করতে পারবেন না।'

[বাণ্ড অফ ওল্ড লেটার্স]

পরের চিঠিটি লিখেছেন ১৯৩৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর।

'...কংগ্রেসের অবস্থা ক্রমশঃই জনসাধারণের কাছে গোলকধাঁধার মতো হয়ে উঠেছে। ফলে, স্বভাবতঃই তারা সন্দিগ্ধ। কংগ্রেসীরা যে ভাষায় কথা বলে, তার অর্থ একটাই হওয়া উচিত। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় যে, তাদের কথা ও কাজের মধ্যে রয়েছে আকাশ-পাতাল তফাত।'

[বাণ্ড অফ ওল্ড লেটার্স : পৃঃ ২০৭]

সুভাষ তখন কার্শিয়াং-এর গির্দা পাহাড়ে আটক বন্দী। একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন জীবন। দিন আর রাত্রির মধ্যে সেখানে কোন তফাত নেই।

আবার বাদ সাধল' সেই দেহ। বাধ্য হয়েই ন'মাস পরে ডিসেম্বর মাসের ১৭ই তারিখে তাঁকে নিয়ে আসা হল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। অবশেষে মুক্তি দেওয়া হল ১৯৩৭ সালের ১৭ই মার্চ তারিখে। দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে। বিনা শর্তে।

সারা দেশ আনন্দে মেতে উঠল সুভাষের মুক্তির খবর শুনে। আমাদের সুভাষ ফিরে এসেছে ! ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে দীর্ঘ পাঁচ বছর বাদে !

৬ই এপ্রিল সংবর্ধনা জানানো হল শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। সভাপতি সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বললেন : 'ইংরেজ তোমার মাথায় কাঁটার মুকুট পরিয়ে দিয়েছিল। দেশবাসীর পক্ষ থেকে আমি তোমাকে পরিয়ে দিলাম ফুলের মুকুট।'

কিন্তু দেহ অপটু। স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে হলে বিশ্রাম দরকার। পরিপূর্ণ বিশ্রাম। নইলে যে কোন মুহূর্তে আবার রোগের আক্রমণ ঘটা বিচিত্র নয়।

বিশ্রাম নিলেন ডালহৌসী পাহাড়ে ডাঃ ধরমবীরের অতিথি হয়ে। ১৯৩৯ সালের ২৫শে এপ্রিল তারিখে।

৭ই অক্টোবর আবার ফিরে এলেন কলকাতায়। ডাঃ ধরমবীর সহজে রাজী হননি। রাজী হয়েছেন একটিমাত্র শর্তে। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য সুভাষকে আর একবার ইয়োরোপে যেতে হবে। যেতেই হবে। যাওয়া খুবই দরকার।

কলকাতা থেকে কার্শিয়াং। তারপর আবার কলকাতা। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসবে কলকাতায়। এ সময়ে তাঁর কাছে থাকা দরকার।

১৮ই নভেম্বর আবার ইয়োরোপে। ডাঃ ধরমবীরের নির্দেশ। যেতেই হবে।

সুভাষের সেই সতর্কবাণী তোমার বোধহয় স্মরণ আছে, মল্লিকা! ইয়োরোপ থেকে জওহরলালকে তিনি লিখেছিলেন: 'নিজেকে দুর্বল ভেবো না। কংগ্রেসের গদী-দখলের চেষ্টা যে করে হোক, বন্ধ করতেই হবে।'

বন্ধ করা কিন্তু কিছুতেই সম্ভব হল না, মল্লিকা।

নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়-জয়কার। তারপরই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ। স্বাধীনতা নয়। স্বায়ত্তশাসনও নয়। মন্ত্রিত্ব!

অবশ্য দুদিন আগে পর্যন্ত বলা হয়েছিল অন্য কথা। সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা কিছুতেই মেনে নেওয়া হবে না। কিন্তু এখন আর সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা মেনে নিয়ে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে তেমন কোন আপত্তি দেখা গেল না।

অবশ্য কেন্দ্রীয় ব্যাপারে হাত দেবার কোন সুযোগ নেই। প্রদেশ-গুলোতেও পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীর মর্যাদা নেই। আসল জিনিসগুলো নিজেদের হাতে রেখে শুধু মামুলি কয়েকটা ব্যাপার ওরা ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছে মাত্র। তা হোক, তবু তো মন্ত্রিত্ব! ইংরেজের আওতায় থেকে এটুকুই বা মন্দ কি!

সাত সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হল। কার্যত মেনে নেওয়া হল যে, কংগ্রেস আসলে বর্ণ হিন্দুদের একটা সম্প্রদায়-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান মাত্র। মুসলমান বা অনুন্নতদের সম্বন্ধে তাদের কোন কথা বলার অধিকার নেই। কোন দায়িত্ব নেই।

ফলে বিপদ হল বিশেষ করে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ মুসলমান সদস্যদের। তাদের একূল-ওকূল দুই-ই গেল। কি কংগ্রেস, কি মুসলীম লীগ, সর্বত্রই তারা অপাংক্তেয় হয়ে রইল ভাগ্যের পরিহাসে।

অবাক হবার কিছুই নেই। এ তো জানা কথাই। সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা মেনে নেওয়াটা যে জাতীয় স্বার্থের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে, সে সম্বন্ধে সুভাষ আগেই তাঁর সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন বার বার। কেউ সেদিন কর্ণপাত করেননি তাঁর কথায়। বুঝতেও চেষ্টা করেননি কেউ। কারণ, ক্ষমতার মোহে আচ্ছন্ন জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে সেদিন সবচাইতে বড় প্রশ্নই ছিল—মন্ত্রিত্ব। তার কাছে আর সব কিছুই ছিল গৌণ।

বুঝতে পেরেছিলেন অনেক পরে। প্রমাণ, ১৯৪৫ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর বম্বে কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের স্বীকারোক্তি।

'The acceptance of the principle of communal electorate was a mistake. It has created the problem.'

সর্দারজী ভুল স্বীকার করেই রেহাই পেলেন। কিন্তু দেশ ও জাতি তার সর্বনাশা পরিণতি থেকে রেহাই পেল কি?

সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারাকে মেনে নেওয়ার অর্থ কি দ্বিজাতিতত্ত্বের স্রষ্টা জিন্নার 'পাকিস্তান' দাবীকে পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নেওয়া নয়?

ক্ষমতার মোহে আমাদের নেতৃবৃন্দ কি সেদিন নিজের হাতেই পাকিস্তান-বনেদের গোড়াপত্তন করেননি ভারতের মাটিতে?

এখানেই শেষ নয়, মল্লিকা। এই দিশাহীন নেতৃত্বের ফলে সেদিন বাংলাদেশে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তা আরও মারাত্মক।

পর পর সাত সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হল, হল না বাংলাদেশে। বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা যায়নি। সুতরাং কংগ্রেসের পক্ষে মন্ত্রিসভা গঠনের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

হঠাৎ একটা অপূর্ব সুযোগ এসে গেল হাতের মুঠোয়। এগিয়ে এলেন কৃষক প্রজা পার্টির প্রধান নায়ক জনাব ফজলুল হক। এস, আমরা মিলিত মন্ত্রিসভা গঠন করি। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। আমাদের উভয় দলের সমন্বয়ে সরকার গঠিত হলে বাংলাদেশের মাটি থেকে মুসলীম লীগকে চিরতরে উচ্ছেদ করতে দুদিনও সময় লাগবে না। এস, হাতে হাত মেলাও!

মল্লিকা, ভুল সবারই হয়। কংগ্রেস বা গান্ধীজীও তার ব্যতিক্রম নন। জীবনে এমন বহুবারই তিনি ভুল করেছেন। স্বীকারও করেছেন সেকথা। এমন কি, নিজের সেই ভুলকে তিনি 'হিমালয়ান ব্লাণ্ডার' বলে স্বীকার করতেও কোনদিন কুণ্ঠিত হননি।

কিন্তু সেদিন কংগ্রেস যে ভুল করেছিল, তাকে ইতিহাসের সবচাইতে শোচনীয় ভুল বললেও বোধহয় অত্যুক্তি হবে না, মল্লিকা। আজও সেই ভুলের মাশুল দেওয়া শেষ হয়নি। কোনদিনই হবে না। বাংলা ও বাঙালীকে সেই ভুলের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে আজীবন।

হক সাহেবের দাবী উপেক্ষিত হল। বৃথাই তিনি দিনের পর দিন মাথা খুঁড়ে মরতে লাগলেন কংগ্রেসের দরজায়। কেউ তাঁর আবেদনে সাড়া দিল না। একটি প্রাণীও না।

ফলে, যা হবার তাই হল। ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়ে এবার তিনি হাত মেলালেন সেই মসুলীম লীগের সঙ্গে। ফলে. কোয়ালিশন সরকারের পরিবর্তে গঠিত হল মুসলীম লীগ সরকার। যার শেষ পরিণতি বাংলা-বিভাগ।

সেদিন কংগ্রেস এই অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় না দিলে কিছুতেই যে বাংলা-বিভাগ হত না, এ নিষ্ঠুর সত্যকে আর কোনরকমেই অস্বীকার করার উপায় নেই।

এল ১৯৩৮ সাল। সামনেই হরিপুরা কংগ্রেস। এবার কার পালা?
শুধু সাধারণ মানুষ নয়, গান্ধীজীর মনেও সেই একই প্রশ্ন।
এবার কার পালা? কে হবেন হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি?

সবাই বশ মেনেছে একে একে। এমন কি জওহরলালও তার ব্যতিক্রম নয়। বাকি শুধু একজন। আজও সে কারো কাছে মাথা নোয়ায়নি।

অবশ্য মাথা সে ঠিকই নোয়ায়। দেখা হলেই নোয়ায়। কিন্তু মাথা নোয়ায় তার ব্যক্তিত্বের কাছে, নীতির কাছে নয়। সেখানে সে এক ও অদ্বিতীয়।

ওকে কি কাছে পাওয়া যায় না? জওহরলালের মতো পোষ মানানো যায় না?

১৮ই জানুয়ারি কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী আচার্য কৃপালনী ঘোষণা করলেনঃ 'পরবর্তী সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সুভাষ। বাংলা ও বাঙালীর সুভাষ।'

আনন্দের একটা ঢেউ বয়ে গেল যেন গোটা ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে। বিশেষ করে যুব-সম্প্রদায়ের তো কথাই নেই। সুভাষের পথ চিরাচরিত পথ নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এবার নিশ্চয়ই একটা নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে।

সুভাষ তখন বাদ্‌গাস্টিনে। সেখান থেকে লণ্ডন।

এবার আর বাধা দিল না ইংরেজ সরকার। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কি করে যে পূর্বেকার ভূমিকা ভুলে যেতে হয়, চতুর ইংরেজ তা ভাল করে জানে।

১০ই জানুয়ারি ডরচেস্টারের বিরাট জনসভায় সংবর্ধনা জানানো হল সুভাষকে।

দেখা হল এট্‌লী, বেভিন, হ্যালিফ্যাক্স প্রমুখ ইংরেজ ধুরন্ধরদের সঙ্গে। বিভিন্ন পার্লামেণ্ট সদস্যগণও বাদ গেলেন না।

বাদ গেলেন না সেই স্বনামধন্য জেটল্যাণ্ডও। মাত্র একবছর আগে যিনি পার্লামেণ্টে বলেছিলেনঃ 'মিঃ বোসের সত্যই অসাধারণ যোগ্যতা আর কর্মদক্ষতা রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই ক্ষমতা তিনি সর্বদাই ধ্বংসাত্মক কাজে নিয়োজিত করেছেন।'

এবার জেটল্যাণ্ডের অন্য চেহারা। 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকার ভূমিকাও তাই। পরদিনই তাদের মন্তব্য প্রকাশিত হলঃ

'এই প্রথম ইংরেজ সুভাষ বোসকে দেখতে পেল। ওর মধুর ব্যবহার, সংযত আচরণ ও ভারতীয় সমস্যা আলোচনার নিঃসংশয় ও নিশ্চিন্ত ধরনে আমরা মুগ্ধ।'

২৪শে জানুয়ারি করাচির মাটিতে এসে পা দিলেন সুভাষ। সে কি উদ্বেলিত জনতার ভিড় সেদিন করাচির বিমানঘাঁটিতে! সামান্য আশা শুধু একটু চোখের দেখামাত্র!

কিন্তু কোথায় সুভাষ! ফুলে ফুলে ততক্ষণে গোটা দেহটাই বুঝি তাঁর ঢাকা পড়ে গেছে।

শুরু হল হরিপুরা কংগ্রেস।

প্রথমেই সভাপতি-বরণ। নির্বাচিত সভাপতিকে শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে যাওয়া নতুন কিছু নয়। কিন্তু ভারতের লক্ষ লক্ষ মুক্তি-পাগল মানুষ সেদিন সুভাষকে যেভাবে বীরোচিত সংবর্ধনা জানিয়েছিল, কংগ্রেসের ইতিহাসে সত্যিই তা অভূতপূর্ব, মল্লিকা।

পাঁচ মাইল দীর্ঘ শোভাযাত্রা। এখানে-ওখানে অসংখ্য সুসজ্জিত তোরণ। পথের দুধারে লক্ষ লক্ষ আগ্রহাকুল নর-নারী। কণ্ঠে তাদের একই ধ্বনি —রাষ্ট্রপতি সুভাষ বসু জিন্দাবাদ! ভারতের কনিষ্ঠতম কংগ্রেস সভাপতি সুভাষ বসু জিন্দাবাদ! সুভাষ দীর্ঘজীবী হোক।

সবশেষে সভাপতির ভাষণ।

কিন্তু 'একি! গান্ধীবাদী নেতৃবৃন্দ অবাক। চরকার কথা নেই। গো-রক্ষা সমিতির কথা নেই। আছে শুধু নতুন নতুন কথা। ইয়োরোপে যুদ্ধ আসন্ন, ভারতকে তার সুযোগ নিতে হবে। শিল্পোন্নয়নের ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনাকে মেনে নিতে হবে। বুনিয়াদী শিক্ষার খসড়া তৈরি করতে হবে। দেশকে সমাজতন্ত্রের দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে হবে। এমনি সব নতুন নতুন কথা, যা আজো কেউ শোনেনি কোন কংগ্রেস সভাপতির কাছ থেকে।

এবার হরিপুরা কংগ্রেসে গৃহীত একটি প্রস্তাব থেকে বিশেষ কয়েকটি কথা আমি তোমার সামনে তুলে ধরছি, মল্লিকা। কথাগুলো তুমি ভাল করে লক্ষ্য কর। পরে দরকার হবে।

ইয়োরোপে তখন যুদ্ধের ঘনঘটা চলছে। বিস্ফোরণ ঘটতে আর খুব একটা বেশি দেরি নেই। পরিস্থিতি লক্ষ্য করে প্রস্তাব গৃহীত হল ঃ

'ভারতবর্ষ কোন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে না। সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের জন্য অর্থ বা লোকবলও নিয়োগ করবে না।...ভারতে যে সমরায়োজন চলছে, কংগ্রেস তা সমর্থন করবে না। ভারতবর্ষকে যুদ্ধে জড়াবার চেষ্টা করা হলে কংগ্রেস তা প্রতিরোধ করবে।'

সুভাষের পরিচয় তাঁর কথায় নয়, কাজে। তাই এবার শুরু হল সেই নতুন পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার কাজ। সুভাষের একান্ত আগ্রহে তার সভাপতি হলেন পণ্ডিত জওহরলাল। আর সমর্থক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

মল্লিকা, এই সেই সুভাষের সৃষ্ট ঐতিহাসিক প্ল্যানিং কমিশন, যা আজ স্বাধীন ভারতে চলে আসছে দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে।

পরবর্তীকালে জওহরলাল তাঁর নিজের বইতে অনেক গুণগানই করেছেন এই প্ল্যানিং কমিশন সম্বন্ধে। তিনিই যে তার সভাপতি, সেকথাও জানাতে ভোলেননি।

শুধু একটি কথাই জানাতে ভুলে গেছেন যে, ঐতিহাসিক এই প্ল্যানিং কমিশনের স্রষ্টা তিনি নন, সুভাষ।

গান্ধীবাদীরা সমর্থন করতে না পারলেও দেশের চিন্তাশীল লোকেদের মধ্যে কিন্তু সুভাষের এই প্ল্যানিং কমিশন সেদিন সত্যিই একটা আলোড়ন তুলেছিল, মল্লিকা। প্রমাণ, রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি। চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন জওহরলালকে ঃ

'ভারতের শিল্পোন্নয়নে বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে সেদিন ডঃ মেঘনাদ সাহার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হল। আলোচনা খুব চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। আমি এর প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসী হয়ে পড়েছি। কংগ্রেসের দৃষ্টি এর দিকে ফেরাবার জন্য সুভাষ যে কমিশন করেছে, জানলাম, তার সভাপতি হতে তুমি সম্মতি জানিয়েছ। তাই এ সম্বন্ধে তোমার মত জানতে ইচ্ছে করছে।'

[বাঞ্চ অফ ওল্ড লেটার্স : পৃঃ ২৯৫]

২৬শে জুলাই সুভাষ মহাজাতি সদন নির্মাণকল্পে একখণ্ড জমির জন্য আবেদন জানালেন কলকাতা কর্পোরেশনের কাছে। টাকার জন্য ভাবনা নেই। সহকর্মীদের সাহায্যে গঠিত 'সুভাষ ফাণ্ডে' ত্রিশ হাজার টাকা গচ্ছিত রয়েছে। জমিটা পাওয়া গেলে কাজ শুরু করতে আর কোন অসুবিধে নেই।

দাবী মঞ্জুর হল ৩রা আগস্ট। মোট এক বিঘে আঠারো কাঠা জমি। লিজ-এর মেয়াদ মোট নিরানব্বই বছর। বাৎসরিক খাজনা একটাকা মাত্র।

এল ১৯৩৯ সাল।...

এবার ত্রিপুরী কংগ্রেস। স্বাধীনতা সংগ্রামের সবচাইতে কলঙ্কময় অধ্যায়, ত্রিপুরী কংগ্রেস।

বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রস্তাব করা হল তিনজনের নাম। মৌলানা আজাদ, ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া আর সুভাষ। এ'দের মধ্যেই কাউকে সভাপতি করা হোক।

যুব-সম্প্রদায় তথা কমিউনিস্ট পার্টি, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি, লেবার পার্টি, রায়-পন্থী ইত্যাদি বামপন্থী দলগুলির দাবী—আমরা সুভাষকে চাই। ইয়োরোপে যুদ্ধ আসন্ন। জাতির পক্ষে এটা মস্তবড় একটা সুযোগ। সুভাষ ছাড়া অন্য কারো পক্ষেই এ সময়ে শক্ত হাতে হাল ধরা সম্ভব নয়।

প্রথমেই দাবী জানাল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। ১৬ই অক্টোবর দলীয় মুখপত্র 'ন্যাশনাল ফ্রণ্ট'-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে খোলাখুলিভাবেই লেখা হল সেকথা। সামনে কঠিন, কঠোর সংগ্রামের দিন। এ সময়ে সুভাষেরই প্রয়োজন সবচাইতে বেশি।

১৭ই তারিখে দাবী জানালেন সাজ্জাদ জাহির, জেড্. এ. আমেদ, মোহন সিং যশ, পি. সুন্দরাইয়া, ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ, ভগৎ সিং, রামমূর্তি প্রমুখ কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ। সুভাষ উপযুক্ত লোক। তাঁকেই আমরা চাই।

নিশ্চয়ই তুমি খুব অবাক হয়েছ, মল্লিকা। কিন্তু এটাই সত্যি। আজ এ'দের মধ্যে কেউ কেউ কমিউনিস্ট পার্টির বিশিষ্ট নেতা হলেও সেদিন ওঁরা সবাই যুক্ত ছিলেন কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে।

২২শে তারিখে আবেদন জানালেন হুমায়ুন কবীর, নবাবজাদা সৈয়দ হাসান আলী চৌধুরী, মোয়াজ্জেম আলী চৌধুরী, আবু হোসেন সরকার, আবুল মনসুর আমেদ, এ. রসিদ খাঁ প্রমুখ জাতীয়তাবাদী মুসলীম নেতৃবৃন্দ। আমরাও সুভাষকে চাই।

আর দাবী জানালেন আচার্য পি. সি. রায়। সুভাষই যোগ্য ব্যক্তি। তার সঙ্গে কারোরই তুলনা হয় না।

রবীন্দ্রনাথেরও তাই মত। খোলাখুলিভাবেই তিনি সেকথা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন গান্ধীজী ও জওহরলালকে। প্ল্যানিং কমিশনের মতো একটা নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে সুভাষের দ্বিতীয়বার সভাপতি হওয়া খুবই প্রয়োজন। উপসংহারে তিনি লিখেছেন ঃ

'কাজ করবার যন্ত্র যদি বিকল হয়ে ওঠে, ওকে চালাতে পারে সে-ই, যার চালাবার শক্তি আছে। চালকের পথে যদি বাধা এসে দাঁড়ায়, বাধা সরিয়ে দেওয়াও ঐ চালকের কাজ। যন্ত্রের চালক মানুষ হিসেবে বড় নাও হতে পারে, কিন্তু সে যে যন্ত্রবিদ এ বিষয়ে তো সন্দেহ নেই।'

[বাণ্ড অফ ওল্ড লেটার্স ঃ পৃঃ ২৯৯]

এই প্রসঙ্গে আরও একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন স্বনামখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ মেঘনাদ সাহা। সুভাষের প্ল্যানিং কমিশনের ব্যাপারে তিনিই কবিকে উৎসাহী করে তুলেছিলেন বিশেষভাবে।

হঠাৎ সরে দাঁড়ালেন মৌলানা আজাদ। সেই সঙ্গে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়ে তিনি জানালেন ঃ

'কংগ্রেস প্রতিনিধিদের কাছে আমার আবেদন, তাঁরা যেন ডাঃ সীতা-রামিয়াকে সমর্থন করেন। আমি এটাই আশা করব যে, তিনি সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়েছেন।'

সরে দাঁড়ালেন না সুভাষ। গান্ধীজী অনেক বড় কিন্তু তার চাইতে বড় দেশ। সেই দেশের দাবী। জনতার দাবী। যুব-সম্প্রদায়ের দাবী। তাদের সেই দাবীকে উপেক্ষা করার মতো সাধ্য তাঁর কোথায়!

তার চাইতে নির্বাচন হোক। কংগ্রেস কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং কংগ্রেসের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই ভোটের মাধ্যমে রায় দিক যে, তারা কাকে চায়!

পরদিনই (২১শে জানুয়ারি) সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিয়ে আরো স্পষ্ট করে সুভাষ জানালেন তাঁর মনের কথা।

'মৌলানা আজাদের ন্যায় বিশিষ্ট নেতার আবেদনের ফলে যদি অধিকাংশ প্রতিনিধি আমার পুনর্নির্বাচনের বিরুদ্ধে ভোট দেন, তবে আমি বিশ্বস্ত-ভাবে তাঁদের সিদ্ধান্ত মেনে নেব এবং সাধারণ সৈনিক হিসেবে কংগ্রেস ও দেশের সেবা করব।'

অত্যন্ত রুষ্ট হলেন গান্ধীপন্থী নেতৃবৃন্দ। নিয়ম যাই থাক না কেন, গান্ধীজীই এতকাল তাঁর ইচ্ছামত সভাপতি নির্বাচন করে এসেছেন। এবারও তাই করতে হবে।

২৩শে তারিখে সেই আশাই ব্যক্ত করলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, আচার্য কৃপালনী, ভুলাভাই দেশাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়ে ঃ

'পট্টভি সীতারামিয়াকে আমরা কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের সম্পূর্ণ উপযুক্ত

বলে মনে করি। আমরা কংগ্রেস প্রতিনিধিদের কাছে তাঁকে জয়যুক্ত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।'

সুভাষ অবাক। ব্যক্তিগতভাবে ওঁরা যতখুশি আবেদন জানাতে পারেন, কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসেবে এ ধরনের বিবৃতি দিলেন কোন্ অধিকারে? কিসের যুক্তিতে? তা করতে হলে সর্বাগ্রে সভাপতির অনুমোদন নিয়ে বৈঠক আহ্বান করা দরকার। প্রস্তাব পাস করানো দরকার। এ ক্ষেত্রে তেমন কিছু করা হয়েছে কি?

প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেল গোটা ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে। প্রথমেই প্রতিবাদ করলেন যুক্তপ্রদেশের প্রখ্যাত কংগ্রেস-নেতা সেই স্পষ্টবক্তা রফি আমেদ কিদোয়াই। এক বিবৃতি দিয়ে তিনি জানালেনঃ

'সর্দার প্যাটেল ও ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন সদস্যের বিবৃতি পড়ে আমি অবাক হয়েছি। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের পক্ষে শ্রীযুক্ত বসুর বিরুদ্ধে ক্ষতিকর বিবৃতি দেওয়া সংগত হয়নি।

সর্দার প্যাটেলের মতে ওয়ার্কিং কমিটিই কংগ্রেসের সব কাজ পরিচালনা করেন এবং সভাপতি নামে-মাত্র নেতা। কিন্তু তিনি বেশ সুবিধাজনকভাবে ভুলে গিয়েছেন যে, ওয়ার্কিং কমিটি সভাপতিরই সৃষ্টি। তিনিই তাঁদের তাঁর ইচ্ছামত নিয়োগ করে থাকেন।'

তার চাইতেও মারাত্মক বিবৃতি দিলেন ডাঃ খারে। তিনি বললেনঃ

'কংগ্রেস কর্তৃক দেশের সর্বত্র প্রভুত্ব বিস্তার হওয়া সত্ত্বেও যে ডাঃ পট্টভি নিজের মিউনিসিপ্যাল শহর ও জেলা-বোর্ডকে নিজের অনুগত রাখতে পারেননি, শ্রীযুক্ত সুভাষ বসুর সঙ্গে তাঁর তুলনাই হয় না। যে ডাঃ পট্টভি নিজের শহরে জাস্টিস পার্টির সম্মুখীন হতে পারেননি, তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সম্মুখীন হতে সক্ষম হবেন, একথা কি করে আশা করা যায়? যদি সত্যই আপনারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে স্বাধীনতা অর্জন করতে চান, তবে শ্রীযুক্ত বসুকেই ভোট দিন। তাঁকে ভোট দেবার অর্থ গণতন্ত্র আর স্বরাজকে ভোট দেওয়া।'

বিবৃতি দিলেন সেই নরীম্যান, যাঁকে গান্ধীজীর সমালোচনা করার অপরাধে চরম শাস্তি নিতে হয়েছিল মাথা পেতে। তাঁর অভিমতঃ

'কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র মতে প্রতিনিধিদের সত্যিই যদি গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে সভাপতি নির্বাচন করার অধিকার থাকে, তবে প্রতিনিধিদের স্বাধীনভাবেই ভোট দেওয়া উচিত। আমি আশা করি, সারা দেশের প্রতিনিধিগণ কারো ভয়ে বা অনুগ্রহ না দেখিয়ে তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবেন।'

যুক্ত বিবৃতি দিলেন মিঃ মাসানী ও মিঃ মেহের আলী।

'এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, রাজনৈতিক। এর মধ্যে প্রাদেশিকতার কোন প্রশ্ন নেই। তাই আমরা শ্রীযুক্ত বসুকেই সমর্থন করব বলে সিদ্ধান্ত করেছি।'

অজস্র নিন্দা করলেন সমাজতন্ত্রী নেতা আচার্য নরেন্দ্র দেব ও সর্দার শার্দুল সিং কবিশের। তাঁদের মতে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের পক্ষে এ ধরনের বিবৃতি দেওয়া শুধু অন্যায় নয়, অপরাধও বটে। প্রতিনিধিদের উচিত সুভাষ বসুকে জয়যুক্ত করা।

সামান্য ব্যাপার, খুবই সামান্য। অথচ এই সামান্য ব্যাপারটাই সেদিন দেখতে দেখতে অসামান্য হয়ে দেখা দিল গান্ধীবাদী কংগ্রেস ও বামপন্থী দলগুলির কাছে।

কেন এই বিরোধ ?

সভাপতি হিসেবে সুভাষ কি কংগ্রেসের নীতি-বহির্ভূত কোন কাজ করেছিলেন ? না, করেননি। প্রমাণ, কংগ্রেসের ইতিহাস।

'ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপারে (সুভাষের) মতপার্থক্য ছিল, কিন্তু তা নিয়ে কোনদিনও তিনি নিজেকে জাহির করেননি। বিতণ্ডায়ও কোনদিন প্রবৃত্ত হননি। পক্ষপাতিত্ব তাঁর কোনদিনই ছিল না। নেতাদের সঙ্গে কোন কোন ব্যাপারে তাঁর মতান্তর হত, কিন্তু তার জন্য কোন সমস্যা বা কোনরকম অবাঞ্ছিত পরিবেশের সৃষ্টি হয়নি। বলতে গেলে গোটা বছরটাই কেটেছিল শান্তির মধ্য দিয়ে।'

[কংগ্রেসের ইতিহাস ঃ ডাঃ পট্টভি ঃ পৃঃ ১০৪]

তাহলে এই সুভাষ-বিরোধিতার কারণ কি ?

ইতিপূর্বে জওহরলাল সভাপতি হয়েছেন মোট তিনবার। এর আগেই দুবার হয়েছেন পর পর। তাহলে সুভাষের বেলায় আপত্তি কেন ? কি এর কারণ ?

কারণ, সুভাষ আর জওহরলাল এক নন। মুখে যতই আদর্শবাদের কথা বলুন না কেন, জওহরলাল সুবিধামত পোষ মানতে জানেন। বশ্যতা স্বীকার করতে জানেন।

আর সুভাষ ! ১৯২৮ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত তাঁর সেই একই চেহারা। বক্তব্যও সেই একই। এ অবস্থায় কে আর খাল কেটে কুমীর আনতে চায় সাধ করে ? একবছরে অনেক শিক্ষা হয়েছে।

তবু শেষ চেষ্টা করেছিলেন সুভাষ। বলেছিলেন ঃ 'সভাপতি-পদের জন্য আমি লালায়িত নই। আচার্য নরেন্দ্র দেবের মতো একজন সত্যিকারের সমাজতন্ত্রী নেতাকে নির্বাচিত করা হোক, আমি এক্ষুণি নাম প্রত্যাহার করে নেব।'

রাজী হলেন না গান্ধীবাদী নেতাগণ। হওয়া সম্ভবও ছিল না। কারণ, এটা গণতন্ত্রের প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা নেতৃত্বের। ক্ষমতার। প্রভুত্বের। সেখানে হেরে যাওয়া মানেই তো চরম অবলুপ্তি।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হল ১৯৩৯ সালের ৩০শে জানুয়ারি ।

সুভাষ জয়ী হয়েছেন। তিনি পেয়েছেন মোট ১,৫৭৫ ভোট, আর পট্টভি সীতারামিয়ার পক্ষে পড়েছে ১,৩৪৬ ভোট।

সংখ্যার দিক থেকে সুভাষ সবচাইতে বেশি ভোট পেয়েছেন বাংলা, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, কেরল, কর্ণাটক, আসাম, আজমীর ও তামিলনাদে। সীতারামিয়াকে বিশেষভাবে সমর্থন জানিয়েছেন বিহার, উৎকল, গুজরাট, অন্ধ্র, বম্বে, নাগপুর আর মহারাষ্ট্র।

উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশ থেকে সেদিন মোট ঊনআশি জন সুভাষের

বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন গান্ধীবাদী নেতা ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে। তবু কিছুতেই কিছু হল না। জয় হল সুভাষেরই।

আনন্দে উত্তাল হয়ে উঠল গোটা ভারতবর্ষ। বিশেষ করে প্রগতিবাদী যুব-সম্প্রদায়। সুভাষ দ্বিতীয়বারের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। কথার মারপ্যাঁচ নয়। আবেদন-নিবেদনও নয়। এবার শুরু হবে আসল সংগ্রাম।

কিন্তু এ কি?

পরদিনই ভারতের কোটি কোটি মানুষ বিস্মিত আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেল সংবাদপত্রে একটা বিবৃতি দেখে।

'...পট্টভি সীতারামিয়ার পরাজয় আমারই পরাজয়।...হাজার হোক, সুভাষবাবু দেশের শত্রু নন!...তাঁর জয়লাভে আমি আনন্দিত।'

এ কার বিবৃতি? জনসাধারণ বিভ্রান্ত। কে দিয়েছেন এই বিবৃতি? এ কি চোখের ভুল, না কি অসুস্থ চিত্তের মায়াবিভ্রম?

না, কোনটাই নয়। কোথাও অস্পষ্টতা নেই। কোথাও এতটুকু কুয়াশার জাল নেই। সব কিছুই দিবালোকের মতো স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। বিবৃতি দিয়েছেন গান্ধীজী। অহিংস-মন্ত্রের ঋষি মহাত্মা গান্ধী।

কিন্তু এ কোন্ মহাত্মা গান্ধী! 'হাজার হোক, সুভাষবাবু দেশের শত্রু নন'—এ যে অতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত! মহাত্মার মতো মানুষ সুভাষ সম্বন্ধে এতবড় নির্মম উক্তিটা করলেন কি করে?

গণতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার—নির্বাচন! যে-কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই নির্বাচনের মধ্য দিয়েই মানুষের মৌল অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সুভাষও সেই গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমেই জয়ী হয়েছেন। তাহলে পট্টভির পরাজয়ে মহাত্মার পরাজয়ের প্রশ্ন আসে কি করে? সুভাষের জয় তাঁর নিজের জয় হবে না কেন?

জেলা-সম্মেলনের সভাপতিরূপে সুভাষ তখন মালদহে। তাঁর মনেও সেই একই জিজ্ঞাসা। নির্বাচনে জয়-পরাজয় আছেই। তাই নিয়ে মহাত্মার মতো লোক এতখানি রূঢ় হতে পারলেন কি করে?

যাঁকে নিয়ে এই বিরোধের সূত্রপাত সেই পট্টভি সীতারামিয়াও কিন্তু এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর খুঁজে পাননি মল্লিকা। পরবর্তীকালে স্পষ্টই তিনি লিখেছেন ঃ

'সুভাষের দ্বিতীয়বার সভাপতি হবার প্রশ্নকে গান্ধীজী এতখানি দোষের মনে করলেন কেন? নির্বাচনের পরেও গান্ধীজীর মনোভাবের যে কোন পরিবর্তন ঘটেনি, তা খোলাখুলিভাবেই স্বীকার করা হয়েছিল।... সুভাষ সম্বন্ধে গান্ধীজীর আচরণের আর কোন কথা ছিল কিনা, তা বলতে পারেন একমাত্র গান্ধীজীই।'

[কংগ্রেসের ইতিহাস ঃ ডাঃ পট্টভি ঃ ২য় খণ্ড ঃ পৃঃ ৬৭৯]

কলকাতায় ফিরেই সুভাষ এক বিবৃতি দিলেন গান্ধীজীর বিবৃতির জবাবে। বিবৃতিটা তুমি ভাল করে পড়ে দেখ, মল্লিকা। তফাতটা নিশ্চয়ই তোমার নজরে পড়বে ঃ

'এবারকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখে আমাদের স্বাধীনতার শত্রুরা যদি মনে করে যে, কংগ্রেসের মধ্যে আত্মকলহ দেখা দিয়েছে, তাহলে আমি স্পষ্ট করেই বলব যে, আমাদের ঐক্য বরাবরের মতোই অটুট থাকবে। কংগ্রেসের সভ্যদের মধ্যে মতান্তর থাকা অসম্ভব নয়। তা বলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যখন তারা সংগ্রাম করে, তখন তারা হয়ে ওঠে এক ও অভিন্ন।

মহাত্মার সঙ্গে কোন কোন ব্যাপারে কিঞ্চিৎ মতভেদ ঘটে থাকলেও মহাত্মার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমি কারো চাইতে কম শ্রদ্ধাবান নই। আমার সম্বন্ধে মহাত্মাজী কি অভিমত পোষণ করেন জানি নে। তবে যাই হোক না কেন, তাঁর বিশ্বাস ও আস্থাভাজন হবার জন্য আমি সব সময়েই যত্নবান থাকব। কেননা, সবার বিশ্বাস ও আস্থাভাজন হতে পারলেও যদি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের আস্থাভাজন হতে না পারি, তাহলে সত্যিই তা আমার পক্ষে মর্মন্তুদ হবে।'

[আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঃ ১৯৩৯]

একটা মিটমাটের আশা নিয়ে ১৫ই ফেব্রুয়ারি সুভাষ সেবাগ্রাম রওনা হলেন গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ফিরে এলেন বুকভরা ব্যর্থতার বোঝা নিয়ে। গান্ধীজীর উপদেশ—সুভাষ ইচ্ছে করলে তার মনোমত নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে পারে। এছাড়া এ ব্যাপারে তাঁর পক্ষে কোন কিছু করা সম্ভব নয়। 'How can we meet on the political platform ? Let us agree to differ there.'

কিন্তু কি হয়েছিল ১৯৩৬ সালে ?

সেদিন কিন্তু এই গান্ধীজীই জওহরলালের সঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের বিরোধটাকে মিটিয়ে দিয়েছিলেন চোখের নিমেষে।

কিন্তু সেদিন পারলেও আজ আর কোন কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, জওহরলাল আর সুভাষ এক নয়। তাই বিবৃতি দিতে গিয়ে খোলাখুলিভাবেই তিনি বলেছিলেন—'আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, গোড়া থেকেই আমি তার (সুভাষের) পুনর্নির্বাচনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলাম। এর কারণ আজ আমি বলতে চাই নে।'

স্পষ্ট উক্তি। এ উক্তির মধ্যে কোথাও কোন কুয়াশার জাল নেই। সুভাষ দ্বিতীয় বারের জন্য সভাপতি হন—গান্ধীজী গোড়া থেকেই তা চাননি। কেন চাননি, তিনি তা বলতে রাজী নন।

২২শে ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক শুরু হবার কথা। কিন্তু বাধ সাধল সেই দেহ। স্বাস্থ্য অবশ্য কোনদিনই ভাল ছিল না। কিন্তু এবার একটু বাড়াবাড়ি বলেই মনে হল।

দেখে বেঁকে বসলেন ডাঃ নীলরতন সরকার। না. এ অবস্থায় কোন-রকমেই বাইরে যাওয়া চলবে না। যাওয়া অসম্ভব।

তার পাঠালেন সুভাষ। আমি অসুস্থ। বৈঠক পিছিয়ে দেওয়া হোক।

কেউ কান দিল না সভাপতির সেই আবেদনে। দেবার কথাও নয়। হলই বা কংগ্রেস-সভাপতি, তা বলে তার নির্দেশ যে মানতেই হবে তার কি মানে আছে! বিশেষ করে এ সময়ে!

সুতরাং যথাসময়ে বৈঠক শুরু হল সভাপতির অনুপস্থিতিতেই। তারপর সেই পুরনো খেলা। সেই চাপ দিয়ে বশ্যতা স্বীকার করানোর চেষ্টা। অর্থাৎ—এই রইল আমাদের পদত্যাগ-পত্র। সভাপতি হিসেবে এবার তুমি যা ভাল বোঝ, কর। তোমার কোন ব্যাপারে আমরা নেই। সোজা কথায়, আত্মসমর্পণ কর, নয় তো ঘর সামলাও। নরীম্যানের কথাটা ভুলে যাওনি আশা করি। জওহরলালের অবস্থাও স্বচক্ষেই দেখছ। এবার কোন্‌টা বেছে নেবে, নাও।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের দিক থেকে জওহরলাল চিরদিনই অদ্বিতীয় পুরুষ। তিনি এই পদত্যাগ-পত্রে সই করলেন না। পরিবর্তে দিলেন ছোট্ট একটি বিবৃতি।

এবার ষোল কলা পূর্ণ হল। যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে খুঁজে ভারতবাসীই বৃথায় এতদিন মাথা খুঁড়ে মরছিল, এবার তার একটা চমৎকার সদুত্তর পাওয়া গেল জওহরলালের বিবৃতি থেকে।

সুভাষের ব্যাপারে গান্ধীবাদী ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ যা কিছু করেছেন, তা সবই নাকি গণতন্ত্রসম্মত। এ ব্যাপারে কোথাও নাকি গণতন্ত্রের এতটুকু অমর্যাদা হয়নি।

আসলে সব দোষ সুভাষের। গণতান্ত্রিক উপায়ে সভাপতি নির্বাচিত হলেও সুভাষই নাকি এ অবস্থার জন্য একমাত্র দায়ী। সুতরাং এ ব্যাপারে সুভাষকে কোনরকম সহায়তা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

সেই জওহরলাল, যাঁকে সুভাষ চিরদিন শ্রদ্ধা করে এসেছেন বড় ভাইয়ের মতো। এই সেদিনও যাঁকে লক্ষ্য করে তিনি ইয়োরোপ থেকে লিখেছিলেন ঃ

'আমি তোমাকে পুরোপুরি সমর্থন করব...নিজেকে তুমি ভুল বুঝো না। দুর্বল ভেবো না...যে কঠোর কর্তব্য তোমার জন্য অপেক্ষা করছে, তুমি নির্বিঘ্নে তা সমাধা করো। লক্ষ্ণৌ যাবার সুযোগ পেলে আমি দাঁড়াব তোমার পাশেই।'

সারা দেশ নিস্পন্দ হয়ে তাকিয়ে রইল একটি মাত্র মানুষের দিকে। কি করবেন এখন সুভাষ!

সামনেই ত্রিপুরী কংগ্রেস। গান্ধীবাদ সদস্যরা শুধু ওয়ার্কিং কমিটি থেকেই পদত্যাগ করেননি, পালামেণ্টারি বোর্ড থেকেও সরে দাঁড়িয়েছিলেন। এ সমস্যার সমাধান কি?

জওহরলাল হারিয়ে গেছেন। সুভাষও কি এবার তেমনিভাবেই হারিয়ে যাবেন গান্ধী-চক্রের কাছে নতিস্বীকার করে?

না কি বরাবরের মতোই মাথা উঁচু করে বলবেন,—'আমি সুভাষ। অন্যায় ও অবিচারের সঙ্গে কোনদিনই আমি আপস করিনি। এবারও করব না!'

ইতিহাসের পাতা একবার উল্টে গেলে আর তাকে ফেরানো যায় না।

কোথায় আজ গান্ধীজী? কোথায় পণ্ডিত নেহরু, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ রথী-মহারথীবৃন্দ? কেউ বেঁচে নেই।

তা বলে কি ত্রিপুরী কংগ্রেসের সেই কলঙ্কময় অধ্যায়কে অস্বীকার করা যাবে কোনদিন?

না, তা সম্ভব নয়। কারণ, মানুষের মৃত্যু আছে, কিন্তু ইতিহাসের মৃত্যু নেই।

সবার দৃষ্টি তখন ত্রিপুরীর দিকে। ঝড় আসন্ন। একদিকে গান্ধীবাদী কংগ্রেস, অন্যদিকে অনমনীয় বিপ্লবী সুভাষ। সুভাষ কি পারবেন বরাবরের মতো এবারও এই ঝড়ের মুখে সোজা হয়ে দাঁড়াতে?

অবশ্য এ ঝড় একেবারে আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত নয়। কংগ্রেস সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান। যে কেউ তার সভ্য হতে পারে। এমন কি, সহিংস বিপ্লবীরাও তার ব্যতিক্রম নয়। তাদের বেলায়ও কোনদিক থেকে আপত্তির কোন প্রশ্ন নেই।

আপত্তি শুধু ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের বেলায়। সেখানে গান্ধীজী অত্যন্ত সতর্ক, অত্যন্ত হুঁশিয়ার। একমাত্র নিজের অন্তরঙ্গ সহকর্মী ছাড়া আর কাউকেই তিনি সেখানে প্রবেশাধিকার দিতে রাজী নন।

এ নিয়েও গান্ধীজীর সঙ্গে কম সংঘাত বাধেনি সুভাষের।

শুরু হয়েছিল ১৯২৯ সালে অনুষ্ঠিত সেই লাহোর কংগ্রেসে।

সুভাষের বক্তব্য, কংগ্রেস গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। সবার সেখানে সমান অধিকার। তাই যদি হয়, তবে একজনের খেয়াল-খুশির ওপর নির্ভর না করে গণতান্ত্রিক মতে নির্বাচনের মাধ্যমে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হোক।

—না। গান্ধীজী অটল, অনড়।

বেশ, তাহলে বামপন্থী দলগুলো থেকে অন্তত কয়েকজনকে কমিটিতে নেওয়া হোক। তারাও কংগ্রেসের সদস্য। তারাও কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তাদের এভাবে কোণঠাসা করে রাখার পেছনে কোন যুক্তি নেই।

তবু রাজী হননি গান্ধীজী। বরং উল্টে সুভাষের নামটাই তিনি খারিজ করে দিয়েছিলেন ওয়ার্কিং কমিটি থেকে। তাঁর সাফ কথা, কেবলমাত্র একমতাবলম্বী লোকদের নিয়েই ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হওয়া উচিত। সুভাষ একমতাবলম্বী নয়। সুতরাং তাকে ওয়ার্কিং কমিটিতে রাখার আর কোন প্রশ্নই ওঠে না।

এতদিন পরে এবার তার অনিবার্য পরিণতি দেখা দিয়েছে গান্ধীজীর নির্বাচিত প্রার্থী ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া পরাজিত হবার পরে। একসঙ্গে মোট বারোজন সদস্য ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন সুভাষের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে। বাপুজীর পরাজয় যে তাঁদেরও পরাজয়! এতবড় আঘাতটাকে তাঁরা নিঃশব্দে মেনে নেবেন কি করে?

চিকিৎসকের সাবধান-বাণী উপেক্ষা করে ১৯৩৯ সালের ৫ই মার্চ রবিবার নির্বাচিত সভাপতি সুভাষ রওনা হলেন ত্রিপুরীর উদ্দেশ্যে।

গায়ে ১০২° ডিগ্রী জ্বর। অন্যান্য উপসর্গও রয়েছে। তবুও তিনি স্থির, দৃঢ়সংকল্প। যে করে হোক, ত্রিপুরী যেতেই হবে।

ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের পদত্যাগ করার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব

হয়েছে, কংগ্রেসের ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব। এ অবস্থায় কোনরকমেই তাঁকে দূরে সরে থাকলে চলবে না।

ওদিকে গান্ধীবাদী সদস্যগণ তখন প্রস্তুত। গান্ধীজীর অমতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাটাই তো মস্তবড় একটা অপরাধ! তার ওপর কিনা জয়লাভ! হোক সে কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি, তবু এহেন অবাধ্য লোককে কিছুতেই বরদাস্ত করা হবে না।

যথাসময়ে শোভাযাত্রা শুরু হল নির্বাচিত সভাপতিকে নিয়ে।

কিন্তু কোথায় সভাপতি! সুভাষ তখন উত্থানশক্তিহীন। জ্বর উঠেছে ১০৬° ডিগ্রী অবধি। দাঁড়াবার শক্তিটুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই। তাই সভাপতির জায়গায় রাখা হল তাঁর একটি প্রতিকৃতি। আর সুভাষকে নিয়ে যাওয়া হল অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি করে।

কান্ড দেখে হেসেই খুন গান্ধীবাদী নেতৃবৃন্দ। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও এ নিয়ে কম হল না।

অসুখ না আরো কিছু! আসলে এসব হল ভড়ং দেখিয়ে সহানুভূতি আদায় করার চেষ্টা। ওসব করে লাভ হবে না কিছু। অত সহজে আমরা ভুলছি নে।

স্বার্থে আঘাত লাগলে মানুষের নির্মমতা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে, ভাবতে পার মল্লিকা! চিন্তা করতে পার একবার!

ছেড়ে দিলাম ডাঃ নীলরতন সরকারের কথা। কিন্তু তাঁদেরই নির্বাচিত মেডিক্যাল বোর্ড শেষপর্যন্ত কি রায় দিলেন সুভাষকে পরীক্ষা করে! অবস্থা গুরুতর। বিপজ্জনকও বটে।

সুভাষের হয়ে ভাষণ পাঠ করলেন তাঁর মেজদা শরৎচন্দ্র বসু। আর আপস-আলোচনা নয়। কোনরকম টালবাহানা বা দর-কষাকষিও নয়। সময় নির্দিষ্ট করে সরকারকে চরমপত্র দিতে হবে। দাবী উপেক্ষিত হলে সঙ্গে সঙ্গে শুরু করতে হবে সংগ্রাম। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য শেষ সংগ্রাম।

১৯২৮ থেকে ১৯৩৯। সেই একই কথা। একই দাবী। সংগ্রাম চাই। চাই একটানা আপসহীন সংগ্রাম।

কেউ কান দেয়নি সুভাষের কথায়। গান্ধীজী বা জওহরলাল কেউ না। তা বলে এবার কিন্তু তাঁর আবেদনে সাড়া দিতে আর এতটুকুও দেরি করলেন না গান্ধীবাদী নেতৃবৃন্দ। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দুর্বার বেগে। তবে এ সংগ্রাম ইংরেজের বিরুদ্ধে নয়, সুভাষের বিরুদ্ধে।

গান্ধীজী ত্রিপুরীতে আসেননি। হাজার অনুরোধ করা সত্ত্বেও আসতে রাজী হননি। তিনি তখন ছোট্ট একটা দেশীয় রাজ্য রাজকোটে কি একটা সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের কাজের ফলে কংগ্রেসে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, ওটা নাকি তার চাইতেও জরুরী।

তা বলে কোনদিক থেকে কোনরকম ত্রুটি হল না। সব কিছু সুদে-আসলে পুষিয়ে দিলেন তাঁর একান্ত অনুগামী গান্ধীবাদী নেতৃবৃন্দ।

প্রথমেই এক অদ্ভুত প্রস্তাব আনলেন ওয়ার্কিং কমিটির বিশিষ্ট সদস্য

পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ। এবার সভাপতি তাঁর ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করুন। শুধু গঠন করলেই হবে না। সে কমিটি সব দিক থেকে গান্ধীজীর মনোমত হওয়া চাই। অন্যথায় সে কমিটি বৈধ বলে স্বীকৃত হবে না।

প্রস্তাব গৃহীত হল ২১৮-১৩৫ ভোটের ব্যবধানে। কারণ—সোস্যালিস্ট পার্টি। রায়-পন্থীরা আগেই সরে দাঁড়িয়েছিল, এবার সরে দাঁড়াল সোস্যালিস্ট পার্টি। প্রথম থেকে প্রতিটি ব্যাপারে সমর্থন জানিয়ে এলেও এবার দেখা গেল তাদের অন্য চেহারা। হাজার হোক, কংগ্রেস বড় পার্টি! সুভাষকে সমর্থন জানিয়ে তাদের সঙ্গে বিবাদ করাটা ঠিক নয়। বোধহয় নিরাপদও নয়।

এবার তুমি পন্থ-প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত কৌশলটা লক্ষ্য কর, মল্লিকা।

একদিকে গান্ধীজীর নির্দেশ—সুভাষ তার নিজের ইচ্ছামত ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করুক। অন্যদিকে প্রস্তাব গৃহীত হল সুভাষকে গান্ধীজীর মনোমত করে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে হবে। অন্যথায় সে কমিটি হবে অবৈধ।

এর একটাকে মেনে নিতে গেলে অন্যটা মেনে নেওয়া চলে কি? কিন্তু তা বললে তো আর হবে না! দুটোই তোমাকে মানতে হবে একসঙ্গে। নয়তো বিদায় হও।

ঠিক যেন শাঁখের করাত। এদিকে গেলেও বিপদ. আবার ওদিকে গেলেও বিপদ।

কিন্তু কেন? ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করার একমাত্র অধিকার সভাপতির। সেখানে গান্ধীজীর মতামতের প্রশ্ন আসে কেন?

উত্তর পাওয়া গেল অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি গান্ধীবাদী নেতা শেঠ গোবিন্দদাসের ভাষণে। তিনি খোলাখুলিভাবেই বললেন:

'...ফ্যাসিস্টদের মধ্যে মুসোলিনীর, নাৎসীদের মধ্যে হিটলারের এবং কমিউনিস্টদের মধ্যে স্ট্যালিনের যে স্থান, কংগ্রেস-সেবীদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীরও সেই স্থান।...কংগ্রেসের লিখিত গঠনতন্ত্রে তাঁহার জন্য কোন স্থান নির্দিষ্ট নাই ইহা সত্য, কিন্তু ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না, রাষ্ট্রপতি পদে মহাত্মা গান্ধীর মনোনীত ব্যক্তিকে নির্বাচন করা এবং রাষ্ট্রপতির পক্ষে ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্য পদে মহাত্মা গান্ধীর মনোনীত ব্যক্তিগণকে মনোনীত করা একটা প্রথায় দাঁড়াইয়াছে।'

[আনন্দবাজার পত্রিকা: ১১ই মার্চ: ১৯৩৯ সাল]

যেটুকু বলতে বাকি ছিল তাও এবার পূর্ণ হল সমর্থকদের সমবেত উল্লাসধ্বনিতে। সবাই মিলে তাঁরা জয়ধ্বনি দিলেন—'হিন্দুস্থানকা হিটলার কী জয়! মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়!'

চমৎকার! সত্যিই চমৎকার!

কংগ্রেস অহিংস-নীতিতে আস্থাবান গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। আশ্চর্য. তা সত্ত্বেও এহেন জয়ধ্বনি শুনে একটি প্রতিবাদ-ধ্বনিও শোনা গেল না কোন গান্ধীবাদী নেতার মুখ থেকে। বরং দেখে মনে হল. গান্ধীজীর এই

নতুন সম্মান-প্রাপ্তিতে তাঁরা যেন খুশিই হয়েছেন মনে মনে। হবারই কথা। কারণ, হিটলারের তখন সময়টা ভাল যাচ্ছিল।

শুধু প্রতিবাদ করলেন একটিমাত্র মানুষ। তিনি হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। খবর শুনে মর্মাহত কবি লিখলেন ঃ

'...অবশেষে আজ, এমন কি, কংগ্রেসের মঞ্চ থেকেও হিটলারী নীতির জয়ধ্বনি শোনা গেল।...স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করবার জন্য যে বেদী উৎসৃষ্ট, সেই বেদীতেই আজ ফ্যাসিস্টের সাপ ফোঁস করে উঠেছে।...'

এখানেই থামেননি কবি। পরে আরো এক জায়গায় তিনি লিখেছেন ঃ

'...কংগ্রেসেরও অন্তঃসঞ্চিত ক্ষমতার তাপ হয়তো অস্বাস্থ্যের কারণ হয়ে উঠেছে বলে সন্দেহ করি। যাঁরা এর কেন্দ্রস্থলে এই শক্তিকে বিশিষ্ট-ভাবে অধিকার করে আছেন, সংকটের সময় তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে, বিচারবুদ্ধি সোজাপথে চলেনি। পরস্পরের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সৌজন্য, যে বৈধতা রক্ষা করলে যথার্থভাবে কংগ্রেসের বল ও সম্মান রক্ষা হত, তার ব্যভিচার ঘটতে দেখা গেছে, এই ব্যবহার বিকৃতির মূলে আছে শক্তি ও স্পর্ধার প্রভাব।

...এই তপঃক্ষেত্রে যাঁরা রক্ষকরূপে একত্র হয়েছেন, তাঁদের মন কি উদারভাবে নিরাসক্ত ? তাঁরা পারস্পরিক আঘাত করে যে বিচ্ছেদ ঘটান সে কি বিশুদ্ধ সত্যেরই জন্যে ? তার মধ্যে কি সেই উত্তাপ একেবারেই নেই, যে উত্তাপ শক্তিগর্ব ও শক্তিলোভ থেকে উদ্ভূত ? ভিতরে ভিতরে কংগ্রেসের মন্দিরে এই যে শক্তিপূজার বেদী গড়ে উঠেছে, তার কি স্পর্ধিত প্রমাণ এবারে পাইনি—যখন মহাত্মাজীকে তাঁর ভক্তেরা মুসোলিনী ও হিটলারের সমকক্ষ বলে বিশ্বসমক্ষে অসম্মানিত করতে পারলেন ?...

...আমি সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করি জওহরলালকে।...আমি তাঁকে প্রশ্ন করি, কংগ্রেসের দুর্গদ্বারের দ্বারীদের মনে কোথাও কি এই ব্যক্তিগত শক্তিমদের সাংঘাতিক লক্ষণ দেখা দিতে আরম্ভ করেনি ?'

সুভাষ অসুস্থ। মেডিক্যাল বোর্ডের মতে অবস্থা গুরুতর। প্রতিপক্ষ ভুলে গেলেও কবি কিন্তু সেকথা ভুলে যাননি। ত্রিপুরীতে অবস্থিত অসুস্থ সুভাষকে লক্ষ্য করে তিনি লিখলেন ঃ

'কল্যাণীয়েষু,

অসুস্থ শরীর নিয়ে কংগ্রেসের দুঃসাধ্য কাজে তোমাকে পীড়িত করেছিল সেজন্য আমরা সকলেই উৎকণ্ঠিত ছিলাম, এখনো উৎকণ্ঠার কারণ আছে। আশা করি উপযুক্ত শুশ্রূষায় ও বিশ্রামে তুমি আরোগ্যের পথে চলেছ ; এবং বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে সম্মানদানের যে সঙ্কল্প আমার মনে আছে তা সফল হতে বিলম্ব হবে না। ইতি—

১১।৩।৩৯ তোমাদের

(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'

অধিবেশন শেষ। এবার সভাপতিকে বিদায় দেবার পালা। সে অশোভন দৃশ্যের কথা চিন্তাও বুঝি করা যায় না। 'কংগ্রেসের ইতিহাস' থেকে তার কিছুটা অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ

'...বরাবরই সভাপতিকে বেশ ঘটা করে জাঁক-জমক সহকারে বিদায় দেওয়া হয়। ত্রিপুরীতে তার ব্যতিক্রম দেখা গেল।...বিদায়ের কালে কাছে ছিলেন তাঁর পরিবারের লোকজন, দুজন ডাক্তার আর ওয়ার্কিং কমিটির দুজন সদস্য মাত্র।'

[কংগ্রেসের ইতিহাস : ডাঃ পট্টভি : ২য় খণ্ড : পৃঃ ১২৪]

অবাক হবার কিছু নেই। সুভাষের জয় মানেই তো বাপুজীর পরাজয়! হোক সে কংগ্রেস সভাপতি, তবু এহেন অবাধ্য লোককে উপযুক্ত মর্যাদা দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

বিক্ষোভে ফেটে পড়ল গোটা বাংলাদেশ! সুভাষের অপমান, আমাদের অপমান। বাংলার অপমান। বাঙালীর অপমান। গান্ধীবাদীদের এই অন্যায় আচরণ কিছুতেই আমরা মুখ বুজে সহ্য করব না।

আগাগোড়া সমর্থন জানিয়ে শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে যাবার জন্য সোস্যালিস্ট পার্টিকে কিন্তু সেদিন কম বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়নি, মল্লিকা। কবিতা, গান, ছড়া—অনেক কিছুই সেদিন রচিত হয়েছিল তাদের ত্রিপুরীর ভূমিকাকে কটাক্ষ করে। একটি গান এখানে তুলে দিচ্ছি :

মোরা সব কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দল
লাল বুলি আওড়ান আমাদের ছল
কাজে মোরা কংগ্রেসী পাণ্ডা
জওহরলালের ধরি ঝাণ্ডা
চিৎকার করে শুধু বাড়ায়েছি গান্ধীর বল
মোরা সব কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দল॥
লাল জুজু ভয়ে সদা সঙ্কুচিত
ত্রিপুরীতে তাই মোরা বল্লভিত
দক্ষিণী শক্তির ভক্ত
চেয়ে আছি কংগ্রেস তক্ত
অহিংস বাঘ সাথে মোরা ফেরুদল
মোরা সব কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দল॥*

সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী
[আনন্দবাজার : ১৯-৩-৩৯]

সুভাষ তখনো রীতিমত অসুস্থ। তাই ত্রিপুরী থেকে ফেরার পথে তাঁকে ধানবাদ স্টেশনে নামিয়ে জামাডোবায় নিয়ে যাওয়া হল অগ্রজ সুধীর বসুর বাড়িতে।

কে বিশ্বাস করে সেকথা! গান্ধীবাদী নেতা বল্লভভাই প্যাটেলের ভাষায়,—এটা হল সুভাষের 'পলিটিক্যাল ফিভার'। সুতরাং ও অসুখ সহজে সারবার নয়।

আর জওহরলালের তো কথাই নেই। কাগজে-কাগজে, সভায়-সমিতিতে

* শ্রদ্ধেয় নেপাল মজুমদার রচিত 'রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

মুখে তাঁর সেই একই কথা। সব দোষ সুভাষের। সুভাষই এই অচল অবস্থার জন্য দায়ী। সে ফ্যাসিস্ট। সুতরাং তাকে কোনরকমেই সমর্থন করা সম্ভব নয়।

অনেক দুঃখে, অনেক জ্বালায় এবার জওহরলালকে একটি চিঠি লিখলেন সুভাষ।

রাজনৈতিক জীবনে ইতিপূর্বে অনেক তিরস্কারই জওহরলালকে শুনতে হয়েছে গান্ধীজীর কাছে। প্রমাণ, তাঁরই সম্পাদিত—'বাণ্ড অফ ওল্ড লেটার্স'।

গান্ধীজীর লেখা অনেক চিঠিই সেখানে তিরস্কারে ভরা। কোথাও প্রচ্ছন্ন, কোথাও বা খোলাখুলিভাবে। কিন্তু সুভাষের লেখা সেদিনের সেই চিঠিটির মধ্যে যে কঠিন তিরস্কার ও নির্মম সমালোচনা ছিল, তা বোধ হয় কোনদিনই ভুলে যাবার নয়।

দীর্ঘ চিঠি। প্রায় সাতাশ পাতা। তার কিছু কিছু অংশ তোমাকে শোনাচ্ছি ঃ

'কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করছি, তুমি আমার সম্বন্ধে প্রচণ্ড বিরূপ ভাব পোষণ করছ। আমার বিরুদ্ধে কোথাও সামান্য ত্রুটি দেখলেই তুমি তার সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ো না। স্বপক্ষে কিছু থাকলে অনায়াসেই সেটা তোমার চোখ এড়িয়ে যায়।

কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি কর্মক্ষেত্রে, সব সময়েই আমি তোমাকে শ্রদ্ধা ও সৌজন্য দেখিয়ে এসেছি। রাজনৈতিক জীবনে বরাবরই বড় ভাই এবং নেতার সম্মান দিয়েছি। উপদেশও চেয়ে নিয়েছি কোন কোন সময়ে।...তা সত্ত্বেও প্রকাশ্য জনসভায় দাঁড়িয়ে আমাকে জনসাধারণের কাছে হেয় ও তুচ্ছ করতে তোমার বাধে না।...সত্যি বলতে কি বারোজন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য একযোগে আমাকে হতমান করতে যত না সমর্থ হয়েছেন, তুমি একাই করেছ তার চাইতে অনেক বেশি।

ওয়ার্কিং কমিটির সভাপতি আমি। আমার অগোচরে যখন অন্যান্য সদস্যরা ডাঃ পট্টভিকে সভাপতি পদের জন্য মনোনীত করলেন, তার মধ্যে কোন অন্যায়ই তোমার চোখে পড়ল না! ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হয়ে সর্দার প্যাটেল ও অন্যান্য সদস্যরা পট্টভির সমর্থনে আবেদন জানালেন, তাও তোমার মতে অন্যায় নয়।

তোমার অভিযোগ, সভার কাজ পরিচালনার ব্যাপারে আমি নাকি সভপতির পূর্ণ দায়িত্ব পালন করিনি। তুমি সভায় উপস্থিত থাকলে কার সাধ্য সভাপতির কাজ করে? ওয়ার্কিং কমিটিতে তোমার মতো এমন বাক্য-বাগীশ যদি আর একজন সদস্য থাকতেন, আমার তো মনে হয় না যে, আমার কাজ শেষ করতে পারতাম।

নির্মম সত্য বলতে হয়তো বলি, তুমি কখনো কখনো ওয়ার্কিং কমিটিতে আদুরে গোপালের মতো ব্যবহার করতে এবং প্রায়ই রেগে উঠতে। তোমার এই স্নায়ু-সবলতা এবং লাফানো-ঝাঁপানো সত্ত্বেও কি ফল পেলে?

তুমি সাধারণত ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠিক থাকতে পার, শেষে তো এলিয়ে

পড়। সর্দার প্যাটেল এবং অন্যান্যদের তোমার সঙ্গে ব্যবহার করার এক চমৎকার কৌশল ছিল। ওঁরা তোমাকে শুধু বকবক করতে দেবেন, শেষে ওঁরা তোমাকে ওঁদের প্রস্তাবের খসড়া করতে বলে শেষ করবেন।

একবার প্রস্তাবের খসড়া করতে দিলেই, প্রস্তাবটি যারই হোক না কেন, তুমি মহাখুশি! আমি তো খুব কমই দেখেছি, তুমি শেষ অবধি নিজের যুক্তি আঁকড়ে ধরে আছ।

জানি না রাষ্ট্রপতির কর্তব্য সম্পর্কে তুমি কি ভাব। আমার মতে তিনি মহিমান্বিত কেরানী বা সেক্রেটারীর ওপরেই হবেন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তোমার সেক্রেটারীর কাজ জবরদখল করার অভ্যাস ছিল বটে, কিন্তু অন্যান্য রাষ্ট্রপতিরা যে তাই করবেন, এমন তো কোন কারণ নেই!

এখন তোমাকে তোমার নীতি ও কর্মপন্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করবার আমন্ত্রণ জানানোই আমার উচিত, তবে তা ব্যাপক অস্পষ্টতায় নয়, বিস্তারিত বাস্তবতায়।

'আমি জানতে চাই যে, তুমি কি সমাজবাদী, না বামপন্থী, অথবা মধ্য-পন্থী, না দক্ষিণপন্থী, না আর কিছু?

তোমার কী মনে হয় যে, পন্থ-প্রস্তাবের আসল উদ্দেশ্য হল মহাত্মাকে আমার বিরুদ্ধে দাঁড় করানো?...যদি পুরাতন প্রহরীরা আমার বিরুদ্ধে লড়তেই চেয়েছিলেন, তাঁরা তা সোজাসুজি করেননি কেন? মহাত্মা গান্ধীকে আমাদের মধ্যে নিয়ে এলেন কেন?

এটা চমৎকার কৌশল সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে, এই চালটা কি সত্য আর অহিংসার সঙ্গে খাপ খায়?'

এখানেই থামলেন না সুভাষ। রোগশয্যায় শুয়ে মোট উনপঞ্চাশ খানা চিঠি ও তার পাঠালেন তিনি গান্ধীজীর কাছে।

আমি অসুস্থ। দয়া করে একবার আসুন এখানে। অসুস্থ না হলে আমি নিজেই যেতাম আপনার কাছে। আর নূতন ওয়ার্কিং কমিটি যদি একমতাবলম্বী না হয়ে সমানুপাতিক ভিত্তিতে করা হয়, তাতে আপনার সম্মতি আছে কিনা জানাবেন।

গান্ধীজী এলেন না। আসা সম্ভবও ছিল না। বৃহত্তর ভারতের চাইতেও ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য রাজকোটের সমস্যা তখন তাঁর কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তার সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত তিনি আসবেনই বা কি করে! তাই চিঠি দিয়েই তিনি জানালেন তাঁর মনের কথা। যা বলার আগেই বলে দিয়েছি। সম্ভব হলে তোমার মনোমত সদস্যদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন কর।

কিন্তু ত্রিপুরী কংগ্রেসে গান্ধীজীর মনোমত সদস্যদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে হবে বলে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, তার কি হবে?

এ জিজ্ঞাসার কোন জবাব নেই।

এবার পাশাপাশি কতকগুলো টুকরো টুকরো ছবি তোমার সামনে তুলে ধরব, মল্লিকা। ইতিমধ্যে কত যুগ কেটে গেছে, তবু তা আজও তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি অম্লান।

ছবিগুলো কংগ্রেস ও রবীন্দ্রনাথের।

একদিকে কংগ্রেস তখন যে-কোন উপায়ে সুভাষকে অপসারণ করতে বদ্ধপরিকর।

অন্যদিকে তাঁর মর্যাদা রক্ষার্থে কবি তখন ব্যাকুল, দৃঢ়সংকল্প। তাঁর সুস্পষ্ট ঘোষণা: 'আমি জানি বাংলাদেশের জন-নায়কের প্রধান পদ সভাষচন্দ্রের।'

একদিকে গান্ধীজীর কটাক্ষপূর্ণ ইঙ্গিত,—'হাজার হোক, সুভাষবাবু দেশের শত্রু নন।'

অন্যদিকে তাঁরই বন্দনা-গানে কবিকণ্ঠ মূর্ত হয়ে ওঠে মিষ্টি সঙ্গীতের মতো।

'সুভাষচন্দ্র, বাঙালী কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি। গীতায় বলেন, সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয়, তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধি-নায়ক।...বহুকাল পূর্বে একদিন আর এক সভায় আমি বাঙালী সমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশ্যে বাণীদূত পাঠিয়েছিলুম। তার বহু বৎসর পরে আজ আর এক অবকাশে বাংলাদেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ করছি।'

অনেকদিনের পুরনো ছবি। অস্পষ্ট, কিন্তু অবিস্মরণীয়।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে এবারও এগিয়ে এলেন সেই রবীন্দ্রনাথ। গান্ধী-পন্থীদের অনমনীয় জেদ ও আপসহীন মনোভাবই যে এই শোচনীয় অবস্থার জন্য একমাত্র দায়ী, সে সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়ে ক্ষুব্ধ কবি এবার তার প্রতিকার প্রার্থনা করে চিঠি পাঠালেন গান্ধীজীকে:

UTTARAYAN
Santiniketan, Bengal
March 29, 1939.

Dear Mahatmaji,

At the last Congress session some rude hands have deeply hurt Bengal with an ungracious persistence. Please apply without delay balm to the wound with your own kind-hands and prevent it from festering. With love,

Ever yours,
(Sd.) Rabindranath Tagore.

যথাসময়ে তার জবাব দিলেন গান্ধীজী। সেই একই কথা। সুভাষকে যথাযোগ্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আপাতত এছাড়া আর কোন পথ দেখতে পাচ্ছেন না তিনি।

New Delhi
2.4.39.

Dear Gurudev,

I have your letter full of tenderness. The problem you

set before me is difficult. I have made certain suggestions to Subhas. I see no other way out of the impassee.

I do hope you are keeping your strength. Charlie is still in the hospital. With love,

Yours,
(Sd.) M. K. Gandhi.

উত্তেজনা আর জল্পনা-কল্পনার ঝড় বয়ে চলেছে তখন গোটা বাংলাদেশ জুড়ে।

কি করবেন এখন সুভাষ! যেভাবে আট-ঘাট বেঁধে ওরা আসরে নেমেছে, তাতে কোনরকমেই নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা সম্ভব নয়।

হয় বশ্যতা স্বীকার, নয়তো পদত্যাগ। এ দুটোর মধ্যেই একটাকে বেছে নিতে হবে সুভাষকে।

কোন্‌টা বেছে নেবেন তিনি? আত্মসমর্পণ, না পদত্যাগ?

ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন কবি। না, এ ব্যাপারে চট করে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না। বিচারের ভার দেশবাসীর। দেশবাসীকে সবকিছু জানতে দিতে হবে। বুঝতে দিতে হবে। সুতরাং এ সম্বন্ধে ওদের বক্তব্য পরিষ্কারভাবে বুঝে নেওয়া দরকার।

২রা এপ্রিল কবি এ সম্বন্ধে চিঠি দিলেন সুভাষকে।

কলিকাতা

'কল্যাণীয়েষু,

কয়েকদিন কোলকাতায় এসে দেশের লোকের মনের ভাব ভালো করে জানবার সুযোগ পেয়েছি। সমস্ত দেশ তোমার প্রত্যাশায় আছে। এমন অনুকূল অবসর যদি দ্বিধা করে হারাও তাহলে আর কোনদিন ফিরে পাবে না। বাংলাদেশ থেকে তুমি যে শক্তি পেতে পার, তার থেকে বঞ্চিত হবে, অন্যপক্ষও চিরদিন তোমার শক্তি হরণ করতে থাকবে। এতবড়ো ভুল কিছুতেই কোরো না। তোমার জন্য বলছি নে, দেশের জন্য বলছি।

মহাত্মাজী যাতে শীঘ্রই তাঁর শেষ বক্তব্য তোমাকে জানান দৃঢ়ভাবে সেই দাবী করবে। যদি তিনি গড়িমসি করেন, তাহলে সেই কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করতে পারবে। তাঁকে বোলো, শীঘ্রই তোমাকে ভবিষ্যতের কর্তব্য স্থির করতে হবে, অতএব আর বিলম্ব সইবে না। আশাকরি তোমার শরীর সুস্থ হবার দিকে চলেছে। আজই শান্তিনিকেতনে ফিরছি। ইতি—

তোমাদের

২।৪।৩৯ (স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'

শুধু সুভাষকে চিঠি দিয়েই থামলেন না কবি। দেশের মুখ চেয়ে সুভাষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার জন্য এবার তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে তার করলেন গান্ধীজীকে।

'I earnestly appeal to you to arrange meeting immediately with Subhas and save situation from tragic disaster.'

জামাডোবায় সুভাষকেও তিনি তার করলেন অনুরূপভাবে! কিন্তু

কিছুতেই কিছু হল না। গান্ধীজী তখন রাজকোটে অত্যন্ত জরুরী কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তাঁর সময় কোথায় ?

২১শে এপ্রিল তারিখে সুভাষ জামাডোবা থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন কিছুটা সুস্থ হয়ে। ২৮শে তারিখে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন বসবে কলকাতায়। গান্ধীজী থেকে শুরু করে সবাই উপস্থিত থাকবেন সেই অধিবেশনে। তখন যদি কিছু একটা সুরাহা হয় !

গান্ধীজী কলকাতায় এলেন ২৭শে এপ্রিল। আশ্রয় নিলেন সোদপুর আশ্রমে।

একনাগাড়ে চারঘণ্টা ধরে সেখানে আলাপ-আলোচনা হল দুজনের মধ্যে. কিন্তু সব বৃথা। গান্ধীজী অটল, অনড়। তাঁর যা বলার আগেই বলে দিয়েছেন. সুতরাং নতুন আর কিছু বলার নেই তাঁর।

২৮শে তারিখে অধিবেশন বসল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে।

শেষ চেষ্টা হিসেবে এবার এক নতুন প্রস্তাব করলেন সুভাষ।

'কি দেখতে পাচ্ছি আমরা আজ পৃথিবীর ইতিহাসের দেকে তাকিয়ে ? কি দেখতে পাচ্ছি গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স বা অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রে ?

সেখানেও বিভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক দল বিদ্যমান। কিন্তু জাতীয় সংকটের দিনে তারা সবাই এক ও অভিন্ন। কারণ, দল বড় নয়. দেশ বড়।

আমরা কি এ ব্যাপারে ইতিহাস থেকে কিছু শিক্ষা নিতে পারি না ?

ইয়োরোপে যুদ্ধ শুরু হল বলে। এ সময়ে আমাদের একমাত্র কর্তব্য হল সবাই মিলেমিশে একসঙ্গে কাজ করা। তাই আমি প্রস্তাব করছি যে, অন্তত চারজন বামপন্থী সদস্যকে ওয়ার্কিং কমিটিতে নেওয়া হোক। তাতেও প্রতিপক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় থাকবে। সুতরাং এ প্রস্তাবে আপত্তির কোন কারণ থাকা উচিত নয়।'

রাজী হলেন না গান্ধীবাদী নেতৃবৃন্দ। হবার কথাও নয়। কারণ, একথা তখন দিবালোকের মতোই স্পষ্ট যে, মীমাংসা তাঁদের উদ্দেশ্য নয়।

উদ্দেশ্য, যে-কোন উপায়ে সভাপতি-পদ থেকে সুভাষকে অপসারণ করা। তাই একযোগে তাঁরা প্রতিবাদ জানালেন সুভাষের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। না, একটি আসনও নয়। কমিটির সব ক'টি আসনই আমরা চাই।

গান্ধীজী বলছেন এক কথা, ওঁরা বলছেন অন্য কথা। এর পরিপেক্ষিতে কি করবেন এখন সুভাষ ?

আত্মসমর্পণ, না পদত্যাগ ? কোন্‌টা বেশি সম্মানের ? কোন্‌টা সুভাষের পক্ষে স্বাভাবিক ?

জবাব মিলল পরদিন। অধিবেশনে নিজের পদত্যাগ-পত্র দাখিল করে সুভাষ বললেন ঃ

'ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রস্তাব মতো গান্ধীজীকে দায়িত্ব গ্রহণ করে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করবার জন্য বার বার আমি অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু অতীতের বহু নিষ্ফল আবেদনের মতো আমার সেই আবেদন ব্যর্থ হয়েছে।

...গান্ধীজীর উপদেশ মতো আমি যদি নিজের মনোমত কমিটি গঠন করতাম,

তা না হত তাঁর মনোমত, না হত তাঁর আস্থাভাজন। তাছাড়া আমার নিজের বিশ্বাসের প্রশ্নও এখানে জড়িত রয়েছে। তাই অনেক চিন্তা করে একান্ত সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে আমার পদত্যাগ-পত্র আপনাদের কাছে উপস্থিত করলাম।...”

সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ-পত্র গৃহীত হল। নতুন সভাপতি নির্বাচিত হলেন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

গান্ধীজীর মনোমত ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতেও এখন আর কোন অসুবিধার প্রশ্ন রইল না।

মোট দুজনকে নতুন কমিটিতে নেওয়া হল বাংলাদেশ থেকে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আর গান্ধীবাদী নেতা ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। সেই ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, যিনি পরবর্তীকালে কংগ্রেস ত্যাগ করে পি. এস. পি., নির্দলীয়, যুক্তফ্রণ্ট, পি. ডি. এফ., লোকদল ইত্যাদি ঘুরে সম্প্রতি আবার কংগ্রেসে ফিরে এসেছেন।

অধিবেশনের বাইরে তখন হাজার হাজার উত্তেজিত জনতা। কণ্ঠে তাদের একই শপথ।

গান্ধীবাদীদের এই অন্যায় জুলুম আমরা কিছুতেই সহ্য করব না। কি অধিকার আছে ওদের বাংলা ও বাঙালীকে এভাবে অপমান করার! এর জবাবদিহি করতেই হবে। নইলে কাউকেই ছাড়া হবে না।

বাধা দিলেন সুভাষ। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সাহায্যে তিনি সবাইকে গাড়িতে তুলে দিলেন একে একে। ওঁরা অতিথি। অতিথির অবমাননা করে বাংলার আতিথেয়তার সুনামকে কলঙ্কিত হতে দিতে তিনি রাজী নন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুরী থেকে কবিগুরু অভিনন্দন-বার্তা পাঠালেন সুভাষের কাছে।

‘অত্যন্ত বিরক্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও তুমি যে ধৈর্য ও মর্যাদা-বোধের পরিচয় দিয়াছ, তাহাতে তোমার নেতৃত্বের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উদ্রেক হইয়াছে। আত্মসম্মান রক্ষার জন্য বাংলাকে এখনও সম্পূর্ণরূপে ধীরতা ও ভদ্রতা-বোধ অব্যাহত রাখিতে হইবে ; তাহা হইলেই আপাতদৃষ্টিতে যাহা তোমার পরাজয় বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাই চিরন্তন জয়ে পরিণত হইবে।’

আপাতদৃষ্টিতে সুভাষের পরাজয় হল। কিন্তু আসলে এ পরাজয় কার? সুভাষের, না গণতন্ত্রের?

শেষপর্যন্ত সুভাষ পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন গান্ধী-গোষ্ঠীর অসহযোগিতার ফলে। প্রমাণিত হল যে, গণতন্ত্র সম্বন্ধে মুখে যাই বলা হোক না কেন, আসলে গান্ধীজীই সব। এমন কি, জনগণের ভোটে নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতিরও সেখানে কোন মূল্য নেই, যদি না তাঁর পেছনে গান্ধীজীর ব্যক্তিগত সমর্থন থাকে।

এবার পদত্যাগ সম্বন্ধে সুভাষের নিজের বক্তব্য শোনা যাক:

‘গান্ধীজী এবং নেহরুর সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধিতা সত্ত্বেও সারা দেশে

আমার অনুগামীদের সংখ্যা কত বিপুল এবং তার প্রভাব কতখানি, এই নির্বাচনের মাধ্যমে তা প্রমাণিত হল।

কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র অনুসারে পরবর্তী বছরের জন্য সভাপতি একটি কার্যকরী পরিষদ (ওয়ার্কিং কমিটি) গঠনের অধিকারী। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গেল যে, গান্ধী-পন্থী দলের পছন্দ অনুযায়ী যদি কার্যকরী পরিষদ গঠিত না হয়, তাহলে তারা আগের মতোই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে চলবেন। সে অবস্থায় সভাপতির স্বাধীনভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

গান্ধীবাদী দলের মনোভাব থেকে বোঝা গেল যে, আমার নির্দেশ তারা মেনে চলবে না, কংগ্রেসের পরিচালন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতেও আমাকে দেবে না। আমি যদি নামে মাত্র সভাপতি থাকতে রাজী হই, একমাত্র তাহলেই তারা আমাকে বরদাস্ত করবে।...ফলতঃ সভাপতি-পদে ইস্তফা দেওয়া ছাড়া আমার আর গত্যন্তর ছিল না।'

[মুক্তি সংগ্রাম ঃ সুভাষচন্দ্র বসু]

ত্রিপুরী কংগ্রেসে হাজার বলা সত্ত্বেও রাজকোট ছেড়ে গান্ধীজী আসেননি। ওয়েলিংটন স্কোয়ারেও তাই। যে কারণেই হোক, সোদপুর আশ্রম ছেড়ে অধিবেশনে যোগ দিতে তিনি রাজী হননি।

অথচ কংগ্রেস মানেই গান্ধীজী। গান্ধীজীর ইচ্ছা-অনিচ্ছাই সেখানে সব কিছু। সুভাষের ভাষায় ঃ 'The entire intellect of the Congress has been mortgaged to one man.'

এমন কি, বিদেশী ঐতিহাসিকদের কাছেও সেদিন এই অপ্রিয় সত্যটা গোপন থাকেনি, মল্লিকা। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক Michael Edwards তাঁর বিখ্যাত 'The Last Years of British Rule in India' গ্রন্থে কি বলেছেন, শোন ঃ

'Gandhi now turned the technique of non-co-operation, not against the British, but against Congress's own President. Bose was forced to resign.'

প্রায় একই সময়ে আরো এমন একটি কাজ করা হল যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কাজটি হল, জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্'-এর অঙ্গচ্ছেদ। ঠিক হল —অতঃপর কেবলমাত্র প্রথম দুটি কলি ছাড়া বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের আর কোন কিছুই গাওয়া চলবে না।

কারণ! কারণ, মুসলিম লীগ-প্রধান জিন্না। জিন্না নাকি বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত নিয়ে আপত্তি তুলেছেন। সুতরাং তাঁকে খুশি করা দরকার।

এতদিনকার চলার পথের সঙ্গী সুভাষ ও তাঁর অনুগামী বামপন্থী দলসমূহ—সোস্যালিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, হিন্দু মহাসভা, কাউকে প্রয়োজন নেই। সবাই দূরে সরে যাক একে একে।

তবু জিন্নাসাহেব থাক। হাজার হোক, কড়া লোক। অনেক চেষ্টা করেও এ পর্যন্ত তাঁর মন গলানো যায়নি। এমন কি, গোলটেবিল বৈঠকে ব্ল্যাংক

চেক উপঢৌকন দিতে চেয়েও গান্ধীজী তাঁর 'না'-কে কোনদিনও 'হ্যাঁ' করাতে পারেননি। জাতীয় সঙ্গীতের অঙ্গচ্ছেদ করে এই সুযোগে তাঁকে যদি কিছুটা খুশি করা যায় তো মন্দ কি!

খুশি করা গিয়েছিল কি? ইতিহাস কি বলে মল্লিকা?

আজন্ম বিপ্লবী সুভাষ। ফুলের মালা গলায় দিয়ে জেলে যাওয়া আর বেরিয়ে আসার মধ্যেই তাঁর রাজনৈতিক জীবন সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর নিজের ভাষায়ঃ

'আমি কারো প্রতিচ্ছবি নই, প্রতিধ্বনি নই, কারো prototype নই—I am myself.'

কথাটা যে কত বড় সত্য তার প্রমাণ পাওয়া গেল মাত্র তিন দিন বাদে ৩রা মে তারিখে। সেদিনই শ্রদ্ধানন্দ পার্কে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করলেন তার নতুন দল 'ফরোয়ার্ড ব্লক' সৃষ্টির কথা।

দলের লক্ষ্য, কংগ্রেস-বিরোধিতা নয়, সংগ্রাম। বৃথা টালবাহানা করে ইতিমধ্যে সাত সাতটা বছর কেটে গেছে। আর দেরি নয়। এবার চাই আপসহীন সংগ্রাম। 'The Forward Bloc came into existence to fulfil a historical necessity.'

একটা ঝড় বয়ে গেল যেন গোটা ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে।

দেখতে দেখতে লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী জনতা এগিয়ে এল মাথা উঁচু করে হ্যাঁ, এই তো চাই! এই তো হওয়া উচিত! কথা অনেক হয়েছে। এবার চাই সংগ্রাম।

বিশেষ করে বৈপ্লবিক সংস্থাগুলির তো কথাই নেই! সংগ্রামের আহ্বানে সবাই এসে জড় হল একে একে।

এমন কি, অনুশীলন সমিতি, নীতিগত দিক থেকে যারা ছিল বরাবর যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সমর্থক, এবার তাঁরাও এগিয়ে এসে হাত মেলাল সুভাষের সঙ্গে। আমরাও আছি, তোমার পেছনে। চাই আপসহীন সংগ্রাম।

একমাত্র ব্যতিক্রম যুগান্তর পার্টি। অবশ্য দল হিসেবে যুগান্তরের তখন আর কোন অস্তিত্ব ছিল না। এক বছর আগেই (১৯৩৮) দল ভেঙে দিয়ে তারা এক হয়ে মিশে গিয়েছিল কংগ্রেসের সঙ্গে।

তবে সবাই নয়। আসলে যুগান্তর কোন একক দল নয়, অনেকগুলি দলের সমন্বয়ে গঠিত একটা বিরাট বৈপ্লবিক সংস্থা। ১৯৩৮ সালে আইনসঙ্গতভাবে যুগান্তর ভেঙে দেওয়া হলেও এককভাবে মাদারীপুরের পূর্ণ দাসের দল, উত্তরবঙ্গের দল ইত্যাদি বৈপ্লবিক সংস্থাগুলির সমর্থন সুভাষের ওপর বরাবরই ছিল।

ডাক এল পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, নাগপুর, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা বম্বে, মাদ্রাজ ও অন্যান্য প্রদেশ থেকে। ফরোয়ার্ড ব্লক জিন্দাবাদ! আর কথার কচকচি নয়। বড় বড় গালভরা কথাও নয়। চাই সত্যিকারের সংগ্রাম।

অত্যন্ত রুষ্ট হলেন গান্ধীবাদী নেতৃবৃন্দ। একি অন্যায় কথা! কংগ্রেস সাত সাতটা প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করেছে। তা সত্ত্বেও আবার সংগ্রামের কথা কেন?

৪ঠা জুন তারিখে গান্ধীজী এক আবেদন প্রচার করলেন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে। অনির্দিষ্ট কালের জন্য কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ রাখা হল। এখন আর কোনরকম আন্দোলন করা ঠিক হবে না।

এখানেই শেষ নয়। দিন পনেরো বাদেই বম্বেতে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে গৃহীত হল অদ্ভুত দুটি বিধি-নিষেধ।

এক, কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া কোথাও কোন সত্যাগ্রহ বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করা নিষিদ্ধ। দুই, এখন থেকে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা সম্বন্ধে কোথাও কোনরকম সমালোচনা করা চলবে না।

কেন এই অদ্ভুত নির্দেশ? কি এর কারণ?

প্রথম কারণ, সুভাষ। গান্ধীজী নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন যে, সভাপতি-পদ ত্যাগ করার পর থেকে সুভাষের জনপ্রিয়তা নাকি অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে, সংগ্রামী তরুণদলের মুখে তো এখন সুভাষ ছাড়া আর কোন কথাই নেই। এটা অশুভ লক্ষণ। সুতরাং সংগ্রাম নিষিদ্ধ করে সুভাষের অগ্রগতি রোধ করা দরকার।

কিন্তু দ্বিতীয়টা! ওটা কেন? গণতান্ত্রিক নিয়মে সবারই সমালোচনা করার অধিকার রয়েছে। তাহলে এই অহেতুক নির্দেশের কারণ কি?

তবে কি কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলো সম্বন্ধে সমালোচনা করার মতো সত্যিই কোন কারণ ঘটেছিল?

এ প্রসঙ্গে আমি কয়েকটি চিঠি থেকে কিছু কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি, মল্লিকা। প্রথমটি লিখেছেন সেই এডওয়ার্ড টমসন, যিনি ব্যক্তিগত জীবনে শুধু জওহরলালের বন্ধুই নন, ভারতবর্ষেরও একজন সত্যিকারের শুভার্থী বলে পরিচিত। জওহরলালকে তিনি লিখেছেন ঃ

'কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা মাসে মাত্র পাঁচশো টাকা বেতন নিচ্ছেন শুনে আমি যারপরনাই আনন্দিত হয়েছিলাম।...শুনে খুবই খারাপ লাগল—এই যে আত্মোৎসর্গ এর বেশির ভাগই ভুয়ো, কেননা তাঁরা বাকিটা ভাতা হিসেবে নিচ্ছেন...।' [পত্রগুচ্ছ ঃ জওহরলাল]

পরেরটি স্বয়ং গান্ধীজীর লেখা। লিখেছেন জওহরলালকে ঃ

'...৫০০৲ [পাঁচশত টাকা] বেতন এবং তদুপরি বড় বাড়ি ও মোটর গাড়ি, ভাতা ইত্যাদি সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা হচ্ছে। যতই ভাবছি, ততই শুরুতেই এতটা বাড়াবাড়ি আমার খারাপ লাগছে।' [পত্রগুচ্ছ]

এবার শোন জওহরলালের বক্তব্য। লিখেছেন গান্ধীজীকে ঃ

'...সারা ভারত জুড়ে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি সম্বন্ধে ঘটনাবলী যে মোড় নিয়েছে তাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি।'... [পত্রগুচ্ছ]

সর্বশেষ চিঠিটির লেখক গান্ধীজীর সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই। লিখেছেন জওহরলালকে ঃ

'আমাদের কয়েকজন মন্ত্রীর কাজে যে সত্য ও অহিংসা ভঙ্গের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, সে সম্বন্ধে খোলাখুলি এবং পুরোপুরি যাতে লেখো—বাপুজী তাই-ই চান...।' [পত্রগুচ্ছ]

চিঠিগুলো পড়ে তোমার কি মনে হল, মল্লিকা! সত্যি হোক, মিথ্যে

হোক গুঞ্জন একটা ঠিকই উঠেছিল। তাই নয় কি?

তাহলে কেন এই অযৌক্তিক আদেশ? কেন জোর করে মানুষের মুখ বন্ধ করার জন্য এই হাস্যকর প্রচেষ্টা? তাহলে কি লাভ শুধু শুধু ইংরেজকে দোষ দিয়ে। তফাতটা কোথায়?

প্রতিবাদ করলেন সুভাষ। সঙ্গে যোগ দিল সোস্যালিস্ট, কমিউনিস্ট, র‍্যাডিক্যাল পার্টি ইত্যাদি বামপন্থী দলগুলি। যোগ দিলেন স্বামী সহজানন্দ, জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ সবাই।

এ নির্দেশ সম্পূর্ণ বে-আইনী ও গণতন্ত্রবিরোধী। এর একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হাত দেওয়া। সুতরাং এ নির্দেশ কোনরকমেই মেনে নেওয়া চলে না।

৯ই জুলাই প্রতিবাদ-দিবস পালিত হল ভারতবর্ষের সর্বত্র। আর সেই সঙ্গে 'জাতীয় সংগ্রাম সপ্তাহ' পালন করার আহ্বান জানানো হল সেপ্টেম্বর মাসের ১২ তারিখ থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে কড়া নোটিশ এসে হাজির। আমরা যেখানে সংগ্রাম নিষিদ্ধ করেছি, সেখানে সংগ্রামের আহ্বান তুমি জানিয়েছ কোন্ অধিকারে? অবিলম্বে কৈফিয়ৎ দাও!

বাংলা দেশের কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে ৭ই আগস্ট সুভাষ তাঁর বক্তব্য জানালেন নব-নিযুক্ত কংগ্রেস সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের কাছে। তাতে তিনি লিখলেন ঃ

'দীর্ঘদিন ধরে ইংরেজের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অধিকার আদায় করার জন্য আমরা সংগ্রাম করেছি, তার মধ্যে নাগরিক অধিকার অর্জন ও বাক্যের স্বাধীনতা অন্যতম। ইংরেজের হাত থেকে যে অধিকার দাবী করার বেলায় আমরা পঞ্চমুখ, কংগ্রেসের কাছ থেকে সে অধিকার পাবার কথা বলা কি মহাপাপ বলে গণ্য হবে? ডেমোক্রেসির দাবী কি আমরা উত্থাপন করব কংগ্রেসের বাইরে থেকে, ভেতর থেকে নয়?...সবশেষে আমি আপনাকে এই অনুরোধই করব যে প্রতিবাদ-দিবস পালন করার জন্য যদি কোন কংগ্রেস-কর্মীকে দণ্ড ভোগ করতে হয়, তবে তা থেকে আমি যেন বঞ্চিত না হই।...'

শক্ত প্রশ্ন। আরো শক্ত এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। তাই সুভাষের মুখ বন্ধ করার জন্য এবার উত্তর এল অন্য দিক থেকে।

তারিখটা ছিল ১৪ই আগস্ট। সেদিনই ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ঃ

'গুরুতর নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতির পদের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইল এবং ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাস হইতে তিন বৎসরের জন্য তিনি কোন নির্বাচিত কংগ্রেস কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন না।'

বিক্ষোভে ফেটে পড়ল গোটা বাংলাদেশ। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জেলা থেকে কংগ্রেস অফিসে অসংখ্য চিঠি আসতে শুরু করল সুভাষের প্রতি সমর্থন জানিয়ে। ওয়ার্কিং কমিটির এই অন্যায় আদেশ আমরা মানি নে।

সুভাষই আমাদের সভাপতি। সুভাষকেই আমরা চাই।

বটে! সঙ্গে সঙ্গে গোটা বাংলা কংগ্রেস বাতিল। পরিবর্তে বাংলার বুকে চাপিয়ে দেওয়া হল নতুন এক অ্যাডহক কংগ্রেস, যার নেতা হলেন কিরণশঙ্কর রায়। অর্থাৎ, বাংলা বা বাঙালীর সমর্থন থাকুক আর নাই থাকুক, এই অ্যাডহক কংগ্রেসই হবে এখন থেকে খাঁটি গান্ধীবাদী কংগ্রেস। তা ছাড়া সব কিছুই বাতিল।

গান্ধীবাদীদের ইচ্ছাই পূর্ণ হল। সুভাষকে তিন বছরের জন্য কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হল। আপসহীন সংগ্রাম চাই বলে ১৯২৮ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত অনেক জ্বালিয়েছিল লোকটা। এবার নিশ্চিন্ত।

ভালই হল মল্লিকা। কে বলতে পারে, হয়তো এভাবে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা না হলে পরবর্তীকালে কোনদিনই আমরা তাঁকে নেতাজীরূপে দেখতে পেতাম না।

আবার পাশাপাশি দুটি ছবি। একটি গান্ধীবাদী কংগ্রেসের, অন্যটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের।

একদিকে কংগ্রেস থেকে সুভাষকে বহিষ্কার—অন্যদিকে গুরুতর শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে অপরাধী জেনেও কবি সানন্দে এগিয়ে এসেছেন সুভাষের মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে। উল্লেখযোগ্য ছবি সন্দেহ নেই।

মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল ২০শে আগস্ট, ১৯৩৯ সালে। সেখানেও সুভাষের কণ্ঠে শোনা গেল সেই একই কথা। ইয়োরোপে যুদ্ধ আসন্ন। ভারতবাসীকে তার সম্পূর্ণ সুযোগ নিতে হবে। আর বৃথা কালহরণ হয়। চাই সংগ্রাম।

'...আজ ভারতের রাষ্ট্রীয় গগন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। আমরাও ইতিহাসের এমন এক চৌমাথায় গিয়ে পড়েছি, যেখান থেকে বিভিন্ন দিকে পথ বেরিয়ে গেছে। এখন আমাদের সম্মুখে সমস্যা এই—যে নিয়ম-তান্ত্রিকতার পথ আমরা ১৯২০ সালে বর্জন করেছিলাম, পুনরায় কি সেই পথে ফিরে যাব? অথবা, আমরা কি গণ-আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়ে গণ-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হব?

এখানে আমি তর্ক-বিতর্ক শুরু করব না। আমি শুধু এই কথা বলতে চাই যে, নবজাগ্রত ভারতীয় মহাজাতি গণ-আন্দোলন এবং গণ-সংগ্রামের পন্থা কিছুতেই পরিত্যাগ করবে না। এই পন্থার দ্বারাই তারা অনেকটা সাফল্যলাভ করবে বলে বিশ্বাস করে। সর্বোপরি বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে একটা তুচ্ছ আপস করে তারা কিছুতেই তাদের জন্মগত অধিকার—স্বাধীনতা হেলায় ছেড়ে দেবে না।'

[আনন্দবাজার পত্রিকা: ২০শে আগস্ট: ১৯৩৯]

সুভাষের ভবিষ্যৎ-বাণীই সত্যি হল। মাত্র কয়েকদিন বাদেই (৩রা সেপ্টেম্বর) যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল গোটা ইয়োরোপ জুড়ে।

গত এক বছর ধরে এমন একটা দৃষ্টান্তও বোধহয় দেখানো যাবে না, যেখানে সুভাষ ইয়োরোপের আসন্ন যুদ্ধ সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ

করেননি। কেউ কান দেয়নি তাঁর কথায়। না গান্ধীজী, না কংগ্রেস। এবার প্রমাণিত হল, বৈদেশিক রাজনীতি সম্বন্ধে সুভাষ কতখানি দূরদর্শী! কতখানি অভ্রান্ত!

কালবিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গে সুভাষ ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন অশান্ত ঘূর্ণির মতো। মুখে সেই একই ডাক। চরম সুযোগ এগিয়ে এসেছে ভারতবাসীর জীবনে। আর দেরি নয়। সংগ্রাম আসন্ন। স্বাধীনতার সংগ্রাম।

ঠিক তার বিপরীত শোনা গেল গান্ধীজীর মুখে।

৬ই সেপ্টেম্বর বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর সঙ্গে দেখা করে তিনি জানালেন, এ যুদ্ধে তাঁর সহানুভূতি সম্পূর্ণ ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের দিকে। হিটলারের বোমার ঘায়ে ইংরেজের ওয়েস্টমিনস্টার এ্যাবে বা পার্লামেণ্ট-ভবন ধ্বংস হবে, সে দৃশ্য তাঁর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। সুতরাং তাঁর অভিমত ঃ

'ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশের সঙ্কটকালে তার সঙ্গে সহযোগিতা করাই ভারতের কাম্য। ব্রিটেনের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতালাভ আমাদের কাম্য নয়। সে-পথ অহিংসার নয়।'

কংগ্রেসে গান্ধীজীর পরেই জওহরলালের স্থান। তাঁরও মুখে শোনা গেল একই কথা ঃ

'ব্রিটেন যে সময়ে জীবন-মরণ সংগ্রামে ব্যাপৃত, সে সময়ে আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করা হলে ভারতবর্ষের পক্ষে সেটা সম্মানহানিকর কাজ হবে।'

সংগ্রামী জনগণ অবাক। একি অদ্ভুত কথা! কি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল সেদিন হরিপুরা কংগ্রেসে?

যুদ্ধে সর্বপ্রকার অসহযোগিতার প্রস্তাবই কি সেদিন গৃহীত হয়নি সর্বসম্মতভাবে?

তা ছাড়া একি অদ্ভুত যুক্তি! শত্রুকে তার দুর্বল মুহূর্তে আঘাত করাই তো যুদ্ধের চিরাচরিত নীতি। আর ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ সংগ্রামী মহানায়কের মুখে কিনা এ সময়ে সহযোগিতার কথা! কি পেয়েছিল ভারত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অকুণ্ঠ সহযোগিতার বিনিময়ে? একমাত্র জালিয়ানওয়ালা-বাগের সেই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ছাড়া আর কিছু পেয়েছিল কি?

নিষ্ঠাবান খাদিপন্থীদের মধ্যেও এ নিয়ে বিস্ময় কম ছিল না। কংগ্রেসের মূল নীতি অহিংসা। তার পক্ষে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সহযোগিতার প্রশ্ন আসে কি করে? কোন্ যুক্তিতে?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাজশক্তিকে সমর্থন করার জবাবে পৃথিবীখ্যাত মনীষা রোমা র‍্যলা গান্ধীজীকে যে চিঠিখানি লিখেছিলেন, সে তো এত সহজে ভুলে যাবার কথা নয়। তিনি লিখেছিলেন ঃ

'আপনার মতো একজন অদম্য সাহসী এবং বিশ্বাসপরায়ণ ব্যক্তি, যিনি আপসহীনভাবে পাইকারী নরহত্যার নিন্দা করেন, নিন্দা করেন জাতির

সঙ্গে জাতির রণোন্মাদনার—তিনি যখন স্বেচ্ছায় এবং অন্যের বিনা প্ররোচনায় এই নরমেধে অংশ গ্রহণ করেন, তখন পৃথিবীতে এমন কিছু নেই, যা আমাকে দিয়ে আপনার এই কাজ সমর্থন করাতে পারে। এবং যে সকল যুক্তি আপনি দেখিয়েছেন, ক্ষমা করবেন, তার কোনটাই সুযুক্তি নয়। এমন কি, আমি একথাও বলব যে, বরং বিনা যুক্তিতেই আমি আপনার ঐ কাজ বেশি বুঝতে সক্ষম হব, যুক্তি দিয়ে বোঝার চাইতে।

শুধু ফলের দিক দিয়ে বিচার করলে আপনার এই রাজানুরক্ত সুবিধাবাদ কোন কাজেই আসেনি। কিন্তু যদিও তা সুফলদায়ী হত, যদি এভাবে আপনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বারা আপনাদের স্বাধীনতা-স্বীকৃতি আদায় করে নিতে পারতেন, হে বন্ধু, বিনা রূঢ়তায় শুধু এইটুকু বলতে অনুমতি দিন —লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তলিপ্ত ধ্বংসযজ্ঞে স্বেচ্ছায় সহায়তা করার মূল্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করলে তা হত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ। ভারতবর্ষকে সেই অপরাধের রক্তমাখা কালিমা কপালে নিয়ে বয়ে বেড়াতে হত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। সেই রক্ত ঈশ্বরের কাছে তাকে অভিযুক্ত করত।'

[Inde ঃ পৃঃ ১৯৩]

১৫ই সেপ্টেম্বর ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসল ওয়ার্ধায়। সুভাষ কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত, তবু তাঁকেও সেই বৈঠকে যোগ দিতে হল বিশেষ-ভাবে আমন্ত্রিত হয়ে।

লাভ হল না কিছুই। বরং গান্ধীজী ও জওহরলালের বিপরীত অভিমতই তিনি ব্যক্ত করলেন ওয়র্কিং কমিটির সেই বৈঠকে। ব্রিটেনের জয় ভারতবাসীর কাম্য নয়। কারণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরাজয় ও ধ্বংসের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষ তার বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতালাভের আশা করতে পারে। সুতরাং আর দেরি নয়। চাই সংগ্রাম।

কোথায় সংগ্রাম, কোথায় কি! কেউ কান দিল না সুভাষের কথায়। কংগ্রেসের ইতিহাস-রচয়িতা পট্টভি সীতারামিয়ার ভাষায়ঃ ওসব তামাশা অনেক হয়েছে। সুতরাং আর সংগ্রাম নয়, চাই সহযোগিতা। অবশ্য এই সহযোগিতার বিনিময়ে কতটুকু পাওয়া যাবে, সে সম্বন্ধে বড়লাট বাহাদুরের কাছ থেকে একটা সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি পাওয়া প্রয়োজন।

পরিস্থিতি লক্ষ্য করে মর্মাহত কবি তাঁর সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেনঃ

'আমাদের পক্ষে শাসনকর্তাদের বিশ্বাসপরতা অনুভব করিনি, অনুভব করেছি সন্দিগ্ধ শক্তির কটাক্ষপাত। যুদ্ধের অবসান হবে, তখন শক্তির জয় হবে, মৈত্রীর নয়। শক্তির পক্ষে কৃতজ্ঞতা একটা বোঝা, তাকে স্বীকার করার দ্বারা যে নম্রতা এবং দায়িত্ববোধ আনে, সেটা তার স্বভাবের পক্ষে পীড়া-জনক। গত যুদ্ধে ভারতবর্ষ তার পরিচয় পেয়েছে। ঠিক যে সময়টাতে হিসেব-নিকেশের অবকাশ এসেছিল, ঠিক সেই সময়টাতেই প্রভূত পরিমাণে ঘনিয়ে এল চাবুক, জেল, জরিমানা, গোরা, গুর্খা ও পুনিটিভ পুলিশ।'

বড়লাটের উত্তর পাওয়া গেল ১৭ই অক্টোবর। কোথায় প্রতিশ্রুতি, কোথায় কি! একমাত্র প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলির অধিকার সংকুচিত করা, আর দেশরক্ষার অজুহাতে ব্যাপক গ্রেপ্তার ও অন্যান্য দমনমূলক ব্যবস্থা

অবলম্বন করার কথা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না তাঁর ঘোষণায়।

ক্ষুণ্ণ হয়ে ওয়ার্কিং কমিটি এবার পদত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলিকে। সহযোগিতার ফল যে এমন হাতে হাতেই পাওয়া যাবে তা কে জানত!

মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করলেন। কিন্তু তারপর? পরবর্তী কর্মসূচী কি? সংগ্রাম?

না, সেসব কিছু নয়। কারণ গান্ধীজীর মতে দেশ নাকি সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত নয়। তাছাড়া কোথাও নাকি আলো দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। সুতরাং সংগ্রামের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু সত্যিই কি তাই! সত্যিই কি দেশ প্রস্তুত ছিল না সেদিন? না কি নেতারাই সেদিন পিছিয়ে পড়েছিলেন সংগ্রাম থেকে সহস্র মাইল দূরে!

উত্তর পাওয়া গেল ২০শে মার্চ (১৯৪০) রামগড় কংগ্রেসে। পাশাপাশি দুটি অধিবেশন। একদিকে মৌলানা আজাদের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের জাঁক-জমকপূর্ণ ব্যয়বহুল অধিবেশন, অন্যদিকে সুভাষের আপসবিরোধী সম্মেলনের দীন আয়োজন।

কিন্তু কি প্রমাণিত হল সুভাষের সেই আপসবিরোধী সম্মেলনে? কংগ্রেসের ইতিহাস-রচয়িতা পট্টভি সীতারামিয়ার লেখা থেকেই তার কয়েকটি লাইন এখানে তুলে দিচ্ছি:

'...সম্মেলনে বিরাট জনসমাগম হয়েছিল। সভাপতি (সুভাষ) তাঁর ভাষণে এক জায়গায় বললেন, 'আসন্ন সংগ্রামে কে কে অংশ নিতে চান, হাত তুলুন!' বিরাট জনতা সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে জানাল—তারা সবাই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক।'

আর বর্ণাঢ্য কংগ্রেসের অধিবেশনে! পট্টভির ভাষায়:...'There was really nothing new in it.' অর্থাৎ—সেই চিরাচরিত আবেদন-নিবেদন ছাড়া সেখানে নতুন আর কিছুই ছিল না।

প্রমাণ হিসেবে সেদিনের গৃহীত প্রস্তাব থেকে কয়েকটা লাইন এখানে তুলে দিচ্ছি:

'The Working Committee will continue to explore all means of arriving an honourable settlement even though the British Government has banged the door in the face of the Congress.'

সোজা কথায়, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেও আমরা আমাদের আবেদন-নিবেদন যথারীতি চালিয়ে যাব। ধৈর্য বটে!

তবে সবাই ভুলে গেলেও গান্ধীজী কিন্তু সেই মুহূর্তেও ভুলে থাকতে পারেননি সুভাষের কথা। বর্ষণসিক্ত অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে উপসংহারে তিনি বললেন:

'সুভাষকে আমি ছেলের মতোই দেখেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমি তার ভালবাসা হারিয়েছি।'

হয়তো গান্ধীজীর এই বেদনাদায়ক উক্তির মধ্যে সেদিন সত্যিই কোন খাদ ছিল না। তবে ইতিহাস কিন্তু তার বিপরীতটাই প্রমাণ করে, মল্লিকা।

জাতীয় স্বার্থের কথা চিন্তা করে সুভাষকে কংগ্রেসে ফিরিয়ে নেবার জন্য কি ব্যাকুল হয়েই না কবিগুরু সেদিন (২০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯) তার করেছিলেন গান্ধীজীর কাছে। লিখেছিলেন ঃ

'Owing gravely critical situation all over India and especially in Bengal would urge Congress Working Committee immediately remove ban against Subhas and invite his cordial co-operation in supreme interest national unity.'

রাজী হননি গান্ধীজী। তাঁর গুরুদেবের একান্ত অনুরোধ সত্ত্বেও না। ২২শে ডিসেম্বর তারিখেই সেকথা তিনি জানিয়েছিলেন পরিষ্কারভাবে ঃ

'Your wire considered by Working Committee. With knowledge they have they are unable to lift ban. My personal opinion is you should advise Subhasbabu submit discipline if ban is to be removed. Hope you are well.'

এখানেই থামেননি গান্ধীজী। সুভাষ সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট করে তিনি নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন (১৫ই জানুয়ারি, ১৯৪০) দীনবন্ধু এণ্ড্রুজকে লেখা একটি চিঠিতে ঃ

'...I feel that Subhas is behaving like a spoilt child...'

বকাটে ছেলে। খাঁটি সত্যি কথা। নইলে এমন সুখের আই. সি. এস্.-এর চাকরি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এই দুঃখ-কষ্টে ভরা অনিশ্চিত জীবন মেনে নেয় কেউ কখনো !

বকাটে নইলে কি ঐতিহাসিক মহাসংগ্রাম শুরু করার আগে ব্রহ্ম-রণাঙ্গন থেকে বেতারযোগে এমন আকুল প্রার্থনা জানায় কেউ কখনো ঃ

'Father of our nation, in this holy war for India's liberation, we ask for your blessing and good wishes'.

'জাতির জনক' বলে গান্ধীজী আজ সর্বত্র পূজিত। বিশেষণটা কিন্তু ঐ বকাটে ছেলেটিরই দেওয়া, তথাকথিত ভাল ছেলেদের নয়।

আবার নতুন করে বিরোধের সৃষ্টি হল কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে।

কর্পোরেশন বাঙালীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। দেশবন্ধুর আমল থেকেই সেখানে কংগ্রেসের আধিপত্য চলে আসছে।

এবার বাদ সাধল মুসলীম লীগ। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলেও স্বতন্ত্র সদস্যদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কর্পোরেশন দখল করা তাদের পক্ষে এমন কিছু কষ্টকর নয়।

এগিয়ে গেলেন সুভাষ। যে প্রতিষ্ঠান থেকে একবার ইংরেজ প্রভুত্বের অবসান ঘটেছে, সেখানে আর কিছুতেই তাদের ঢুকতে দেওয়া হবে না। যে করে হোক, সে-পথ বন্ধ করতেই হবে।

গড়ে উঠল ফরোয়ার্ড ব্লক-মুসলীম লীগ প্যাক্ট। ফলে, সুভাষ হলেন

কর্পোরেশনের অলডার ম্যান, আর মেয়র মিঃ সিদ্দিকী। ঘোরতর ইংরেজ-বিদ্বেষী লোক এই মিঃ সিদ্দিকী। সেদিক থেকে উপযুক্ত লোক বেছে নিতে এতটুকুও ভুল করেননি সুভাষ।

ঢি-ঢি পড়ে গেল সর্বত্র। শেষে কিনা মুসলীম লীগের সঙ্গে প্যাক্ট! এ যে অনাসৃষ্টি কাণ্ড শুরু হল দেখছি! নাঃ! এতবড় অন্যায় কিছুতেই মুখ বুজে সহ্য করা চলে না।

সত্যিই অন্যায়! ইতিপূর্বে হাজার তোষামোদ করেও কংগ্রেস মুসলীম লীগের সঙ্গে কোন ব্যাপারে আপস-মীমাংসা করতে সক্ষম হয়নি। গোল-টেবিল বৈঠকে ব্ল্যাঙ্ক চেক দিতে চেয়েও গান্ধীজী জিন্নাসাহেবের মন গলাতে পারেননি। জাতীয় সঙ্গীতের অঙ্গচ্ছেদ করেও না।

আর সুভাষ বোস কিনা সেই মুসলীম লীগকে চোখের নিমেষে জয় করে ফেললেন এমন করে! এর চাইতে বড় অন্যায় আর কি থাকতে পারে?

সমস্ত নিন্দা-কুৎসার জবাব দিলেন সুভাষ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় দাঁড়িয়ে। দীপ্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেনঃ

'ভারতের সামনে আজ এক মহাসুযোগ এগিয়ে এসেছে। কি কংগ্রেস, কি মুসলীম লীগ, কি হিন্দু মহাসভা, যেই হোক না কেন, তারা যদি আসন্ন এই সংগ্রামে যোগ দিতে রাজী হয়, তবে প্যাক্ট তো দূরের কথা, আমি আজীবন তাদের গোলামী স্বীকার করে নিতেও এতটুকু দ্বিধা করব না। ইংরেজের গোলামী শেষ করার জন্য যদি দেশবাসীর গোলামী আমাকে করতে হয়, তাতে সবসময়েই আমি প্রস্তুত।'

এই সুভাষ! এই হল তাঁর আসল পরিচয়। স্বাধীনতা কে না চায়! কে না ভালবাসে! কিন্তু সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এমন করে মরীয়া হয়ে উঠতে পেরেছিলেন ক'জন? সুভাষ পেরেছিলেন। পেরেছিলেন বলেই তো আজো তিনি লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর মানসলোকে বেঁচে আছেন স্বাধীনতার অগ্রদূত—মহাক্ষত্রিয় 'নেতাজী'রূপে।

ভারতে নেতার অভাব নেই। সেদিনও ছিল না, আজো নেই। কিন্তু কই, আর কারো পক্ষে তো নেতাজী হওয়া সম্ভব হল না!

আবার আঘাত। ইংরেজের দিক থেকে নয়, এল বিরোধী পক্ষের দিক থেকে। মহাজাতি সদন নির্মাণকল্পে কলকাতা কর্পোরেশন সুভাষকে এক-লক্ষ টাকা দেবে বলে স্থির হয়ে আছে। ওটা বানচাল করতে হবে।

কিন্তু কেন! মহাজাতি সদন কি সুভাষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি? ওটা কি জাতীয় সম্পদ নয়?

তা হোকগে, তবু বানচাল করতে হবে। বরং মহাজাতি সদন না হোক, সে-ও ভাল, তবু সুভাষ বোসের দ্বারা কিছুতেই নয়। এত করে ঘা দেওয়া সত্ত্বেও লোকটি প্রতিটি ব্যাপারে সবার উপরে টেক্কা মেরে যাবে, তা হবে না। সুতরাং ওটা বন্ধ করতেই হবে।

ইতিহাসের কি বিচিত্র গতি! মাত্র একলক্ষ টাকা, তাও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নয়। তবু সেই টাকাটা সেদিন দেওয়া হল না সুভাষকে।

আর, মাত্র তিন বছর বাদে সেই সুভাষেরই এক একটি গলার মালার

দাম হল কি না লক্ষ লক্ষ টাকা! তাই নিয়েই বা কত কাড়াকাড়ি! কত আকুলি-বিকুলি! কত অবিশ্বাস্য প্রতিযোগিতা! ভাবতে গেলে স্বপ্ন বলে মনে হয়. অথচ একথা ঐতিহাসিক সত্য।

ওদিকে যুদ্ধ-পরিস্থিতি তখন অত্যন্ত জটিল। হিটলারের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে একে একে হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও প্যারিসের পতন হয়েছে। ইংল্যান্ডও যায়-যায়। ডানকার্কে তাকে প্রচণ্ড মার খেতে হয়েছে হিটলারের নাৎসী বাহিনীর হাতে।

দেখে দেখে মরীয়া হয়ে উঠলেন সুভাষ। কংগ্রেস কোনমতেই সংগ্রামের পথে পা বাড়াতে রাজী নয়। শুধু কংগ্রেস কেন. কেউ রাজী নয়।

একসঙ্গে যাত্রা শুরু করলেও রায়-পন্থী এবং সোস্যালিস্ট পার্টি আগেই পিছিয়ে পড়েছে। এবার সরে দাঁড়িয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি। 'জাতীয় সংগ্রাম সপ্তাহ' পালন উপলক্ষে খোলাখুলিভাবেই তারা জানিয়ে দিয়েছে সেকথা। কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে কোনরকম সংগ্রামের পথে পা বাড়াতে তারা রাজী নয়।

যাক, সবাই যাক। সবাই সরে দাঁড়াক সংগ্রামের পথ থেকে। তা বলে সুভাষকে তো আর পিছিয়ে গেলে চলবে না! কেউ যদি না আসে তো একাই তাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়ত হবে স্বাধীনতা অর্জনের সেই মরণপণ সংগ্রামে। কে এল, কে পিছিয়ে গেল, তা নিয়ে এখন কালহরণ করার মতো অবকাশ কোথায়?

নাগপুর সম্মেলনে শেষবারের মতো নিজের সংকল্পের কথা ব্যক্ত করলেন সুভাষঃ 'All power to the Indian people.' ভারত শাসনের একমাত্র অধিকার ভারতবাসীর। ভুয়ো প্রতিশ্রুতি নয়। দর-কষাকষি বা টালবাহনাও নয়। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য স্বাধীনতা। কোন দল নয়, সম্প্রদায় নয়, ব্যক্তি-বিশেষও নয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের চরম আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই আমাদের সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতাকে অর্জন করতে হবে, কারণ, ভারত শুধু হিন্দুর নয়, শুধু মুসলমানের নয়, সবারই। আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে, হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসা করা এমন কিছু কষ্টকর কাজ নয়।

কথাটা অত্যুক্তি নয়, মল্লিকা। প্রমাণ, কর্পোরেশন প্যাক্ট। কই. তার ফলে তো মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল না! তাহলে বাধা ছিল কোথায়?

আরও প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯৪০ সালের ২৫শে মে তারিখে।

প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন উপলক্ষে সুভাষ তখন ঢাকাতে। মুখে সেই একই আহ্বান। সংগ্রাম আসন্ন। শুধু হিন্দু নয়, ভারতের বিশাল মুসলীম-সম্প্রদায়কেও সেই জাতীয় সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হবে। কারণ, ভারত শুধু হিন্দুর একার নয়, মুসলমানেরও। সুতরাং সবাই এগিয়ে এস ভাই। হাতে হাত মেলাও।

আবেদন ব্যর্থ হল না। দেখতে দেখতে অসংখ্য মুসলীম তরুণ এসে জড় হল সুভাষের চারপাশে। বাঙালী জীবনের সবচাইতে বড় কলঙ্ক,—

হলওয়েল মনুমেণ্ট। নিশ্চিহ্ন করে দাও ওটাকে বাংলার বুক থেকে। আমরা থাকব তোমার পেছনে। কথা দিলাম।

রাজী হলেন সুভাষ। অবশ্য হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ করা মানেই স্বাধীনতাপ্রাপ্তি নয়। তবু তাকে কেন্দ্র করে বিরাট মুসলীম সমাজ যদি সংগ্রামের পথে এগিয়ে আসে তো তার অবদান মোটেই তুচ্ছ হবে না।

গুরু দেশবন্ধু সব সময়েই বলতেন,—'হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তি ছাড়া ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রকে ধ্বংস করা অসম্ভব।' এই তো তার অপূর্ব সুযোগ !

২৯শে জুন অ্যালবার্ট হলের এক বিরাট জনসভায় দাঁড়িয়ে সুভাষ ঘোষণা করলেন তাঁর আসন্ন পরিকল্পনার কথা।

'হলওয়েল মনুমেণ্ট জাতীয় পরাধীনতার অন্যতম চিহ্নস্বরূপ। বহু বৎসর যাবৎ এই অলীক কলঙ্ক-চিহ্ন বাংলার বুকে দাঁড়াইয়া আছে।...এই বিষয়ে বাংলার হিন্দু-মুসলমান সকলেই একমত। তাই যখন এমন একটা বিষয় পাওয়া গিয়াছে, যাহা লইয়া বাঙালী মাত্রেই একমত, তখন তাহা লইয়া আমাদের কার্য করিতে হইবে। ৩রা জুলাই সিরাজদ্দৌলার স্মৃতি-দিবসের মধ্যে হলওয়েল মনুমেণ্টটি লোকচক্ষুর অন্তরালে সরাইয়া লইবার দাবী বাংলা সরকারের নিকট করা হইয়াছে। আমরা চাই জাতির মিথ্যা কলঙ্ক-স্বরূপ মনুমেণ্টটি লোকচক্ষুর অন্তরালে সরাইয়া লওয়া হউক।'

[আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ ৩০শে জুন ঃ ১৯৪০]

একই তারিখে ফরোয়ার্ড ব্লক পত্রিকায় এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সুভাষ জানালেন তাঁর আন্দোলনের প্রথম দিনের পরিকল্পনার কথা।

'আগামী ৩রা জুলাই থেকে আমাদের অভিযান শুরু হবে। আমি সিদ্ধান্ত করেছি যে, প্রথম দিনের বাহিনী পরিচালনা করব আমি নিজে।'

ঘুম টুটে গেল ইংরেজ সরকারের। ওদিকে ইংল্যান্ড যায়-যায়, আর এদিকে কি না সংগ্রামের প্রস্তুতি ! তাও কিনা আবার হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংগ্রাম !

অসম্ভব। ইংরেজ শাসনের প্রধান নীতিই হল ডিভাইড অ্যান্ড রুল। অর্থাৎ, এক পক্ষের বিরুদ্ধে অন্য পক্ষকে লেলিয়ে দেওয়া। সুতরাং যে করে হোক, হিন্দু-মুসলমানের এই মিলিত আন্দোলনকে স্তব্ধ করতেই হবে। কিছুতেই ওদের এক হবার সুযোগ দেওয়া হবে না। হিন্দু-মুসলমান এক হলে যে সত্যিই বিপদের কথা !

শুরু হল ব্যাপক ধর-পাকড়, গ্রেপ্তার আর নির্যাতনের পালা। সুভাষ বোসের ফরোয়ার্ড ব্লকের কাউকেই বাইরে রাখা হবে না। একটি প্রাণীকেও না। ডাঃ পট্টভির ভাষায় ঃ

'...ফরোয়ার্ড ব্লকের চরমপত্রের ফলে ইংরেজের আসল চেহারাটা প্রকাশ হয়ে পড়ল। ফরোয়ার্ড ব্লক যাতে সংগ্রাম শুরু করতে না পারে, তার জন্য তারা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। নির্বাসনে পাঠিয়ে, অন্তরীণ করে এবং অনুরূপ অন্যায়ভাবে ফরোয়ার্ড ব্লক সমর্থকদের নানাভাবে জব্দ করতে ইংরেজ এতটুকুও দ্বিধা করল না। জুলুমের প্রতিবাদে আত্মসম্মান বজায় রাখতে

গিয়ে দলে দলে তারা কারাবরণ করতে লাগল।'

[কংগ্রেসের ইতিহাস ঃ ডাঃ পট্টভি ঃ ২য় খণ্ড ঃ পৃঃ ১৮৪]

কেন সেদিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সুভাষের ফরোয়ার্ড ব্লকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এমন করে ?

এ প্রশ্নের উত্তর রয়েছে তখনকার সময়ের ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের লেখা 'বিশ্বসমর' বইটির চতুর্থ খণ্ডে। সেখানে স্পষ্টই তিনি লিখেছেন ঃ 'একমাত্র সুভাষ বোসের মতো চরমপন্থীরাই অক্ষশক্তির জয় কামনা করত।' অর্থাৎ—সবাই ভাল। সবাই বন্ধু। সবারই একমাত্র কামনা—ইংরেজের জয়। একমাত্র ব্যতিক্রম 'বকাটে ছেলে' সুভাষ বোস আর তাঁর অনুগামীরা। সুভাষ সম্বন্ধে এর চাইতে উল্লেখযোগ্য ক্যারেকটার সার্টিফিকেট আর কি হতে পারে বলো !

ঐতিহাসিক হলওয়েল মনুমেণ্ট আন্দোলন শুরু করার দিন ধার্য হল ৩রা জুলাই। ওদিকে ভেতরে ভেতরে কিন্তু অন্য একটি পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়ে গেছে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই।

বাইরে যেতে হবে। হিটলারের হাতে মার খেয়ে ইংরেজ এখন নিজের ঘর সামলাতে ব্যস্ত। এই অপূর্ব সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে। সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই।

ফরোয়ার্ড ব্লক, বি. ভি., অনুশীলন সমিতি, পূর্ণ দাসের দল, অনিল রায় ও লীলা রায়ের শ্রীসঙ্ঘ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বৈপ্লবিক সংস্থাগুলোর আনুগত্য সম্বন্ধে সন্দেহের কোন প্রশ্নই ওঠে না। সাহসে শৌর্যে, বীর্যে ও আত্মত্যাগে সত্যিই তাদের তুলনা নেই। সত্যিকারের সৈনিকের যা কিছু থাকা প্রয়োজন, সব কিছুই তাদের আছে।

তবু তা-ই যথেষ্ট নয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে মুখোমুখি সংগ্রাম চালাতে হলে আরো কিছু চাই। চাই আধুনিক অস্ত্র-সম্ভার। চাই সুদক্ষ সেনাবাহিনী। চাই আরো অনেক কিছু।

এই মুহূর্তে এখানে তা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাই চরম আঘাত হানতে হবে বাইরে থেকেই। ভারত এখন অগ্নিগর্ভ। বাইরে থেকে যথাযথ-ভাবে আঘাত হানতে পারলে ভেতরে মহাবিপ্লবের আবির্ভাব সুনিশ্চিত। সুতরাং সর্বাগ্রে প্রয়োজন বাইরে যাওয়া।

রাজনীতিতে বৃহত্তর স্বার্থের জন্য অন্য কোন শক্তিমান দেশের সাহায্য নেওয়া মোটেই অন্যায় নয়। ইংরেজ ধর্ণা দেয়নি রাশিয়ার কাছে ? হিটলার প্যাক্ট করেনি তার চিরশত্রু স্ট্যালিনের সঙ্গে ? তাহলে ভারতের বেলায় তা দোষের হবে কেন ?

বি. ভি. ও পাঞ্জাবের কীর্তি কিষাণ পার্টির যোগাযোগে পরিকল্পনা মোটামুটি প্রস্তুত। প্রস্তুত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা আকবর শা। প্রস্তুত বিশ্বস্ত গাইড কমরেড ভগৎরাম। এখন শুধু ঝাঁপ দেবার অপেক্ষামাত্র।

বি. ভি. ছাড়াও অন্যান্য দলের দু-একজন প্রভাবশালী নেতা মোটামুটি জানতেন সুভাষের এই পরিকল্পনার কথা।

অনুশীলন সমিতির প্রখ্যাত নেতা রবি সেন তাঁদের অন্যতম। এই প্রসঙ্গে দলের অন্যতম নেতা শ্রদ্ধেয় নলিনীকিশোর গুহর 'বাংলায় বিপ্লববাদ' গ্রন্থ থেকে প্রয়োজনীয় অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি :

'রবি সেনকে একদিন সুভাষবাবু বলেন,—জাপানী কনসাল অফিসে আপনাদের দলের কে একজন আছেন বলিয়াছিলেন, এখন তাঁহার সাহায্যে কিছু করা যায় কি? কনসাল অফিসে কাজ করিতেন জিতেন বসু। রবি সেন জিতেনবাবুকে বলেন,—সুভাষবাবুর বিদেশে যাবার কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা!

সেই সময় কনসাল কলিকাতায় ছিলেন না। ভাইস-কনসাল ছিলেন। জিতেনবাবু তাঁকে সুভাষবাবুর কথা জানাইলে ভাইস-কনসাল জিতেন-বাবুকে বলেন—সুভাষবাবু যখন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, তখন জাপানের মিলিটারী এ্যাটাচি সুভাষবাবুর সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু সুভাষবাবু কোন আগ্রহ দেখান না। সুতরাং এখন জাপান এই ব্যাপারে খুব favourable attitude (উৎসাহ) নাও দেখাইতে পারে। যাই হোক, ভাইস-কনসাল জিতেনবাবুকে বলেন,—কনসাল আসিলেই এ বিষয়ে আলাপ করিয়া ফলাফল জানাইব।

ইহার অল্প কয়েকদিন পরেই সুভাষবাবু রবি সেনকে বলেন,—'আর ভাইস-কনসাল-এর সঙ্গে ঐ বিষয় লইয়া আলাপ চালাইবেন না। আমি আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করিয়াছি।'

স্বাভাবিক কারণেই জাপানী ভাইস-কনসাল-এর সঙ্গে আর কোনরকম আলাপ-আলোচনা চালাতে নিষেধ করেছিলেন সুভাষ। কারণ, কীর্তি কিষাণ পার্টির সহযোগিতায় ওদিকে বি. ভি.-র প্রস্তুতিপর্ব তখন সমাপ্তপ্রায়। প্রথমেই যেতে হবে পেশোয়ার। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে দুর্গম পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে কাবুল। কাবুল থেকে অন্য কোন দূতাবাসের সহযোগিতায় সোজা ইয়োরোপ।

হঠাৎ সমস্ত কিছু পরিকল্পনা বিপর্যস্ত হয়ে গেল সাময়িকভাবে।

২রা জুলাই। নিঃশ্বাস ফেলার মতোও বুঝি তখন সময় নেই সুভাষের। কাল থেকে আন্দোলন শুরু। যে করে হোক, এই আন্দোলনকে সার্থক করে তুলতে হবে। বিপ্লবের এই অনির্বাণ শিখাকে জ্বালিয়ে রাখতে হবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

এর মধ্যেই এক ফাঁকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে গেলেন কবিগুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সামনে দুরন্ত সংগ্রাম। এ সময়ে তাঁর আশীর্বাদই যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

তারপরই নেমে এল বাস্তবের রূঢ় স্পর্শ।

বেলা তখন প্রায় দুটো। হঠাৎ কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার মিঃ জানব্রিন এলগিন রোডের বাড়িতে এসে হাজির। ভারত-রক্ষা বিধির ১২০ ধারা মতে আপনাকে বন্দী করা হল। চলুন, এবার প্রেসিডেন্সি জেলে।

বিক্ষোভের একটা তরঙ্গ বয়ে গেল দেশের এখানে-ওখানে সর্বত্র।

বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে সভা-সমিতিও হল বিস্তর। এ গ্রেপ্তার বে-আইনী। সরকারের এই নির্লজ্জ আক্রমণ আসলে একটা প্রতিহিংসা নেবার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন কর্পোরেশনের মেয়র মিঃ সিদ্দিকী। মুসলীম লীগের বিশিষ্ট সদস্য হয়েও জোর গলায় তিনি বললেন:

'সুভাষ বসুর ন্যায় একজন সর্বজনমান্য নেতার এই অহেতুক গ্রেপ্তার আমাদের পক্ষে নিঃসন্দেহে একটি অস্বস্তিকর আঘাত।'

বম্বে কর্পোরেশন তাঁদের অধিবেশন স্থগিত রাখলেন সুভাষকে গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে। আর মুখ্যমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক বললেন:

'আমরা সুভাষকে ভালবাসি। শ্রদ্ধা করি। এবং সবাই আমরা তাঁর প্রতি অনুরক্ত। এ দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনিই সবচাইতে জনপ্রিয়।'

একমাত্র ব্যতিক্রম কংগ্রেস। পরদিনই (৩রা জুলাই) ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী অধিবেশন বসল দিল্লীতে। না, একটি কথাও তাদের মুখ থেকে শোনা গেল না সুভাষ সম্বন্ধে। সুভাষ তাদের কেউ নন। পর পর দুবছরের কংগ্রেস সভাপতি সুভাষের যাই হোক না কেন, তাতে তাদের কিছু আসে-যায় না।

কিন্তু সত্যিই কি তাই! মোটেই না। বাইরে উদাসীনতার ভান করলেও ভেতরে ভেতরে কিন্তু সুভাষ সম্বন্ধে তাদের অস্বস্তিকর কৌতূহলের সীমা-পরিসীমা ছিল না, মল্লিকা। প্রমাণ পরবর্তীকালে জওহরলালকে লেখা মৌলানা আবুল কালাম আজাদের একটি চিঠি:

'...চার-পাঁচদিন আগে বার্লিন থেকে সুভাষবাবুর একটা বিবৃতি বেতারে প্রচার করা হয়েছিল। পরদিনই ঘোষণা করা হল ঐ বক্তৃতাটা রেকর্ড করা হয়েছে এবং তাতে সুভাষবাবুরই নিজের কণ্ঠস্বর শোনা যাবে। আমি শুনেছি। সুভাষবাবুর কণ্ঠস্বর। আমার কিন্তু মনে হয় ওটা রেকর্ড নয়. উনি নিজেই বলেছিলেন। তবে টোকিও থেকে যে বেতার-বক্তৃতা প্রচার করা হয়েছিল, সেটা নিশ্চয় রেকর্ড। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, রেকর্ডখানা বিদ্যুতের সাহায্যে চালানো হচ্ছে!'

[পত্রগুচ্ছ: জওহরলাল]

প্রতিশ্রুতি মতো হিন্দুর পাশে পাশে এবার মুসলমান সমাজও এগিয়ে এল সর্বশক্তি নিয়ে। হিন্দু-মুসলীম ঐক্য জিন্দাবাদ! সুভাষ বসু জিন্দাবাদ! বাংলার বুক থেকে ঐ কলঙ্কের চিহ্ন দূর করতেই হবে। নইলে এ সংগ্রাম কোনদিনই থামবে না।

১৩ই জুলাই জনাব আব্দুল করিম সাহেবের সভাপতিত্বে বিরাট প্রতিবাদ-সভা অনুষ্ঠিত হল অ্যালবার্ট হলে। সভায় যত হিন্দু তত মুসলমান। সবারই দাবী এক। সুভাষ বোসের মুক্তি চাই। আর হলওয়েল মনুমেণ্টকে অপসারণ করতেই হবে। অন্যথায় আন্দোলন চলছে এবং চলবে।

আহত জন্তুর মতো গর্জে উঠল ইংরেজ সরকার। কড়া নির্দেশ, খবরের কাগজে হলওয়েল মনুমেণ্ট আন্দোলন-সংক্রান্ত কোন খবরাখবর প্রকাশ করা চলবে না। আর ছাত্র-সম্প্রদায় সাবধান! কোনরকম সভা-সমিতি বা আন্দোলনে তোমাদের যোগ দেওয়া চলবে না। দিলে কঠোর শাস্তি।

রুখে দাঁড়াল ইসলামিয়া কলেজের মুসলমান ছাত্রগণ। এ আদেশ বে-আইনী। কোনরকমেই এ অন্যায় আদেশ আমরা মানব না। কলেজ প্রাংগণে সভা আমরা করবই। ইনক্লাব জিন্দাবাদ! সুভাষ বোস জিন্দাবাদ! হলওয়েল মনুমেণ্ট—দূর করো, দূর করো!

তবে রে! ঝাঁপিয়ে পড়ল উন্মত্ত পুলিশ বাহিনী। তারপরই শুরু হল বেপরোয়া লাঠিচার্জ! পুলিশের হিংস্র আক্রমণ থেকে কেউ রেহাই পেল না সেদিন। একটি প্রাণীও না।

আর যায় কোথায়! খবর পেয়ে সংগে সংগে গোটা ছাত্রসমাজ রাস্তায় নেমে এল পিল পিল করে। কত শক্তি ধরে ইংরেজের গোলাম ঐ পুলিশ বাহিনী এবার তা হাতে হাতেই প্রমাণ হয়ে যাক!

হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটে এলেন মুখ্যমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক। ছাত্র সমাজ ক্ষেপে গেছে। এ যে ভয়ঙ্কর কথা! যে করে হোক ওদের শান্ত করতেই হবে।

সেদিন রাত্রেই সরকারী সিদ্ধান্তের কথা জানা গেল হকসাহেবের এক বিবৃতি থেকে। হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ করা হবে। এবার তোমরা শান্ত হও।

জয় হল সুভাষের। জয় হল হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তির। প্রমাণিত হল যে, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তির কাছে যে কোন প্রতিরোধই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে বাধ্য।

সবাইকে মুক্তি দেওয়া হল একে একে। একমাত্র ব্যতিক্রম সুভাষ। অনেক অভিযোগ তাঁর নামে। অনেক মামলা। বে-আইনী জনসভা করা, রাষ্ট্রদ্রোহকর প্রবন্ধ লেখা, এমনি হাজারো অভিযোগ। সুতরাং এহেন বিপজ্জনক লোককে বাইরে রেখে সরকার এ সময়ে কোনরকম ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নয়।

কিন্তু বাইরে যে আসতেই হবে সুভাষকে! কানের কাছে অহরহ বেজে চলেছে সেই একই আকুলতা। মুক্তি চাই। দেশের মুক্তি। সেই আহ্বানকে উপেক্ষা করার মতো সাধ্য তাঁর কোথায়!

অক্টোবর মাসের ২৮ তারিখে জেল থেকেই সুভাষ কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হলেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়।

ঠিক তার একমাস পরে (২৯শে নভেম্বর) ঘুম থেকে উঠেই সারা দেশ স্তম্ভিত হয়ে গেল অভাবনীয় একটি খবর শুনে।

মুক্তির দাবীতে সুভাষ আমরণ অনশন শুরু করেছেন। তার আগেই তিনি বাংলার গভর্ণর এবং মন্ত্রীদের উদ্দেশে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর শেষ কথা :

'...আমার বিবেকের দুয়ারে আমি আজ বার বার করাঘাত শুনতে

পাচ্ছি। এই অন্যায় এবং ঔদ্ধত্যকে কি আমাকে মুখ বুজে মেনে নিতে হবে? না কি এই ন্যায়-নীতিহীন অবিচারের বিরুদ্ধে জানাব আমার প্রতিবাদ? বিশেষ চিন্তার পর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, এই ঔদ্ধত্যের কাছে আমি কোনক্রমেই নতি স্বীকার করব না। অন্যায় করার চাইতে অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়ানো আরো গুরুতর অপরাধ। সুতরাং প্রতিবাদ আমাকে করতেই হবে।

...এবার আমার দেশবাসীকে উদ্দেশ্য করে আমি বলব—ভুলে যেও না যে, দাসত্বের চাইতে বড় অভিশাপ আর নেই। ভুলে যেও না যে, অন্যায় এবং দুর্নীতির সঙ্গে আপস করার চাইতে বড় অপরাধ আর নেই। মনে রেখো, জীবনকে পরিপূর্ণভাবে পেতে হলে জীবনের বিনিময়েই তা পেতে হবে। মনে রেখো, সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতিকে স্বীকার করে নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে অবিরাম।'

মুক্তি দেওয়া হল ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখে। কি করে, কার সাহায্যে সেদিন এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা হয়েছিল, সে কাহিনী এখানে আর পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই। কারণ, শুরুতেই সেকথা তোমাকে আমি বলেছি।

ওদিকে শাসক-কুল তখন নিশ্চিন্ত। পেলেই বা মুক্তি! চারপাশে সতর্ক পুলিশ প্রহরী। তার ওপর রয়েছে সাদা পোশাক পরিহিত অসংখ্য গোয়েন্দা অফিসার। তাদের চোখ এড়িয়ে যাবে আর কোথায়!

তাছাড়া কদিনই বা! ২৭শে জানুয়ারি তারিখে মামলার তারিখ রয়েছে। ওদিনই তো আবার গিয়ে ঢুকতে হবে সেই লৌহকপাটের অন্তরালে। কোন-রকমেই এবার আর তার রেহাই নেই।

কিন্তু কোথায় তখন সুভাষ?

সংগ্রামী ভারতের একক প্রতিনিধি সুভাষ তার অনেক আগেই শক্তিমান ব্রিটিশ শক্তির সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে পর্যুদস্ত করে চলে গেছেন অনেক দূরে, দুর্গম পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে সীমান্তের ওপারে।

দেখতে দেখতেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ল ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্য-প্রান্ত পর্যন্ত। সুভাষ নিখোঁজ। সুভাষ অদৃশ্য। তন্ন তন্ন করে সর্বত্র খুঁজে দেখা হয়েছে, কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি। সে আশাও সুদূরপরাহত।

সবাই স্তম্ভিত। সবার দৃষ্টি তখন অনাগত ভবিষ্যতের দিকে। সবার মনে একই সুর। ধন্য সুভাষ, সত্যিই তুমি ধন্য! কাঁটায় কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছ, তবু সর্বাঙ্গে রুধির মেখে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে তুমি বুক পেতে দিয়েছ বার বার। নীলকণ্ঠের মতো সবটুকু বিষ নিজে পান করে তুমিই তো আমাদের দিয়েছ এই অভূতপূর্ব নবজাগরণের সন্ধান। তোমার মতো এমন সর্বত্যাগী রুদ্র সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যেই তো একদিন মরমী কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁর 'পথের দাবী' উপন্যাসে লিখেছিলেন:

'তুমি তো আমাদের মতো সোজা মানুষ নও, তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়েছ, তাইত দেশের খেয়াতরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাঁতার দিয়া

তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়, তাইত দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড়-পর্বত তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয়, কোন বিস্মৃত অতীতে তোমার জন্যই তো প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার তো শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্মিত হইয়াছিল, সেই তো তোমার গৌরব!

তোমাকে অবহেলা করিবে কার সাধ্য! এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার, সে তো কেবল তোমারই জন্য! দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বহিতে তুমি পার বলিয়াই তো ভগবান এতবড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন!

মুক্তি পথের অগ্রদূত! পরাধীন দেশের হে রাজ-বিদ্রোহী! তোমাকে শতকোটি নমস্কার।'

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥

॥ যে সব পত্রপত্রিকা থেকে সহায়তা নেওয়া হয়েছে ॥

সবার অলক্ষ্যে	ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়
বিপ্লব তীর্থে	”
ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব	”
বাংলায় বিপ্লববাদ	নলিনীকিশোর গুহ
বিপ্লবের পথে	পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত
বিপ্লবী ললিত মোহন বর্মন	বারীন্দ্র রায়
শহীদ প্রদ্যোৎকুমার	ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র
স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম	গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী	কমলা দাশগুপ্তা
প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার (অগ্নিযুগ-সংখ্যা, উল্টোরথ)	”
ডালহৌসী স্কোয়ার ষড়যন্ত্রের ইতিবৃত্ত ”	যতীশ ভৌমিক
ইতিহাস কই ”	নিকুঞ্জ সেন
সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান কাহিনী	উত্তমচাঁদ মালহোত্রা
ভারতের বিপ্লব কাহিনী	হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস		সুপ্রকাশ রায়
চট্টগ্রাম বিপ্লব		মনোরঞ্জন ঘোষ
চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাহিনী		আনন্দপ্রসাদ গুপ্ত
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন		চারুবিকাশ দত্ত
চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ		অনন্ত সিংহ
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	(সাপ্তাহিক বসুমতী)	,,
ইতিহাসের উপাদান	,,	ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত
পাক-ভারতের রূপরেখা	,,	প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী
গান্ধীবাদ কি সচল ?	,,	অধ্যাপক দিলিপ ঘোষ রায়
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র	,,	শঙ্করীপ্রসাদ বসু
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র		নেপাল মজুমদার
জয়তু নেতাজী		মোহিতলাল মজুমদার
নেতাজী সুভাষচন্দ্র		দীনেশ মুখোপাধ্যায়
সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র		সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ		নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী
আজাদ হিন্দের অঙ্কুর		বিজয়রত্ন মজুমদার
নেহরু আত্ম-চরিত		
পত্রগুচ্ছ		(জওহরলাল সম্পাদিত)
মুক্তি-সংগ্রাম		সুভাষচন্দ্র বসু
পথের দাবী		শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
রবীন্দ্র রচনাবলী		(বিশ্বভারতীর সৌজন্যে)
A Bunch of Old Letters		Nehru
On Gandhi		,,
India Wins Freedom		Abul Kalam Azad
History of Freedom Movement in India		R. C. Mazumder
The Indian Struggle		Subhas Ch. Bose
History of Midnapore		Naren Das
The History of Indian National Congress		Pattabhi Sitaramyya
The Last Years of British Rule in India		Michael Edwards

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিশ্বভারতী ঃ ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ অমৃতবাজার পত্রিকা ঃ ফরোয়ার্ড ঃ হিন্দুস্থান টাইমস্ ঃ পূর্ণদাস স্মারক সংখ্যা ঃ সাপ্তাহিক দেশ ও সাপ্তাহিক বসুমতী

আমি সুভাষ বলছি

(দ্বিতীয় খণ্ড)

সুভাষচন্দ্র,

...তোমার রাষ্ট্রিক সাধনার আরম্ভ ক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি।...আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত, তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্যাদিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট।

এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারাদুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে, কিছুতে তোমাকে অভিভূত করেনি ; তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের দূর বিস্তৃত ক্ষেত্রে।

দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোন পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য বলে মানোনি। তোমার এই চারিত্র শক্তিকেই বাংলাদেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর।...

—রবীন্দ্রনাথ

'Let us create history, let somebody else write it.'

—Netaji

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

'আমি সুভাষ বলছি' (২য় খণ্ড) পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হল। নেতাজী বিপ্লবের প্রদীপ্ত সূর্য। নেতাজী অসম্ভবের নায়ক। আজ দেশের এই ভয়াবহ সঙ্কটের দিনে দেশের তরুণ-তরুণীর দল নেতাজীর অবিস্মরণীয় সংগ্রামের কাহিনী থেকে নতুন করে জাতীয়তাবাদের শিক্ষা নিক, এই আমার একমাত্র কামনা।

কলিকাতা-১৯ — বিনয়াবনত
মহালয়া, ১৩৮৯ — গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'আমি সুভাষ বলছি' (২য় খণ্ড) পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। পুনর্মুদ্রণে আরো এমন কিছু তথ্য যোগ করা হল, যা প্রথম মুদ্রণে ছিল না।

দ্বিতীয় খণ্ড সম্বন্ধে ইতিমধ্যে আমি অসংখ্য চিঠি-পত্র পেয়েছি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে। এই সুযোগে তাঁদের সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কলিকাতা-১৯ — বিনয়াবনত
৩রা ফাল্গুন, ১৩৭৭ — গ্রন্থকার

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

'আমি সুভাষ বলছি' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল।

'আমি সুভাষ বলছি' স্বাধীনতা-সংগ্রামের পূর্ণাংগ ইতিহাস নয়। ইতিহাস-ভিত্তিক একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় মাত্র। এ অধ্যায়ের প্রধান নায়ক আপসহীন বিপ্লবী নেতাজী সুভাষ। স্বভাবতই তাঁর কথা এ কাহিনীতে যতখানি স্থান পেয়েছে, অন্য সবার কথা ঠিক ততখানি আসেনি। পাঠক-পাঠিকাগণ এ ব্যাপারে কোনরকম ভুল বুঝবেন না আশা করি।

নেতাজীকে অনেকেই অনেকভাবে দেখেছেন। অনেকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। যাঁরা রাজনীতিবিদ, তাঁরা দেখেছেন তাঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। ঐতি-হাসিকগণ বিশ্লেষণ করেছেন ইতিহাসের দিকে নজর রেখে।

আমি সাধারণ মানুষ। রাজনীতির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তাই মতবাদ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে সাধারণভাবেই আমি তাঁর কথা বলতে চেষ্টা করেছি আমার এই গ্রন্থের মাধ্যমে।

নেতাজী বলেছেন—"Let us create history, let somebody else write it." ভরসা বলতে আমার শুধু এইটুকুই। যদিও জানি যে, এই দুস্তর সাগর পাড়ি দেওয়া আমার পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়, তবু ইতিহাসের সেই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে বার বার বিভিন্নভাবে স্মরণ করতে দোষ কি?

প্রথম খণ্ডের চেয়ে দ্বিতীয় খণ্ডের পটভূমিকা অনেক বিরাট ও ব্যাপক। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত তার পরিধি-বিস্তার। দায়িত্বও তদনুযায়ী বিশাল। প্রথম খণ্ডের মতো দ্বিতীয় খণ্ডেও সেই দায়িত্ব বহনের প্রেরণা পেয়েছি প্রখ্যাত বিপ্লবী-নায়ক গ্রন্থের শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়ের কাছ থেকে। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

অনুরূপভাবে কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই শ্রীযুক্ত অমলেন্দু ঘোষের (মুকুল) কাছে। বইটি আগাগোড়া সংশোধন করে দিয়ে এবং বহু মূল্যবান পরামর্শাদি দিয়ে তিনি আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন।

তেমনি ভুলতে পারব না আজাদ হিন্দ সরকারের উপদেষ্টা ও নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী শ্রীদেবনাথ দাসের সহযোগিতার কথা। এমন নেতাজী-প্রেমিক সত্যিই দুর্লভ। ব্যাঙ্কক সম্মেলন ও স্বামী সত্যানন্দ পুরীর অপ্রকাশিত ছবি দুটি পেয়েছি তাঁরই সৌজন্যে। বার্লিন-পর্বের কয়েকটি ছবিও তাঁরই দেওয়া।

মেজর আবিদ হাসান, বিপ্লবী মণীন্দ্র নায়েক এবং নেতাজী-ভবনে সংরক্ষিত অন্তর্ধান-পর্বে ব্যবহৃত সেই ঐতিহাসিক গাড়িটির ছবি তুলে দিয়েছে শ্রীমান সুবিনয়। পাঁচখানি ছবি পেয়েছি 'নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর' সৌজন্যে। ইয়োরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানচিত্র দুটি এঁকে দিয়েছেন শ্রীঅর্ধেন্দু দত্ত। এঁদের সবার কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

তাছাড়া, এই গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে যাঁরা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁরা হলেন: সুলেখক শঙ্কু মহারাজ, দেবরঞ্জন গুহ, মনোরঞ্জন ঘোষ, পার্থসারথি বসু, অশোকা দত্ত, সুস্মিতা বসু, অধ্যাপক ফণিভূষণ আচার্য এবং লোকেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত।

কবিগুরুর রচনাবলী থেকে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করার অনুমতি দিয়ে বিশ্ব-ভারতী আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন।

'আমি সুভাষ বলছি' এই নামে সম্পূর্ণ রচনাটি একাদিক্রমে ছত্রিশটি সংখ্যায় প্রকাশ করেছেন 'উল্টোরথ'-কর্তৃপক্ষ। তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। গ্রন্থ-রচনা কালে বহু দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থাদি দিয়ে সাহায্য করেছেন কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাঠাগার 'বালীগঞ্জ ইনস্টিটিউট'। পাঠাগারের তরুণ বন্ধুদের অকৃপণ সহযোগিতার ফলে এ ব্যাপারে আমাকে কোনদিন এতটুকুও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি।

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর থেকে এ পর্যন্ত অসংখ্য আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা-পত্র পেয়েছি পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে। এই সুযোগে তাঁদের সবাইকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে ধন্যবাদ জানাই তরুণ প্রকাশক শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে। তাঁর নির্দেশমত এই খণ্ডে চাল্লিশ পাতার ছবি দেওয়া হল। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আই· এন· এ·-র কোন ছবি এই খণ্ডে দেওয়া হয়নি।

গ্রন্থখানি দ্রুত প্রকাশনার জন্য শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার ও শ্রীপরিতোষ চক্রবর্তীর অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্মরণ করছি।

২১বি, ফার্ণ রোড
কলিকাতা-১৯
২০শে আষাঢ়, ১৩৭৭

বিনয়াবনত
গ্রন্থকার
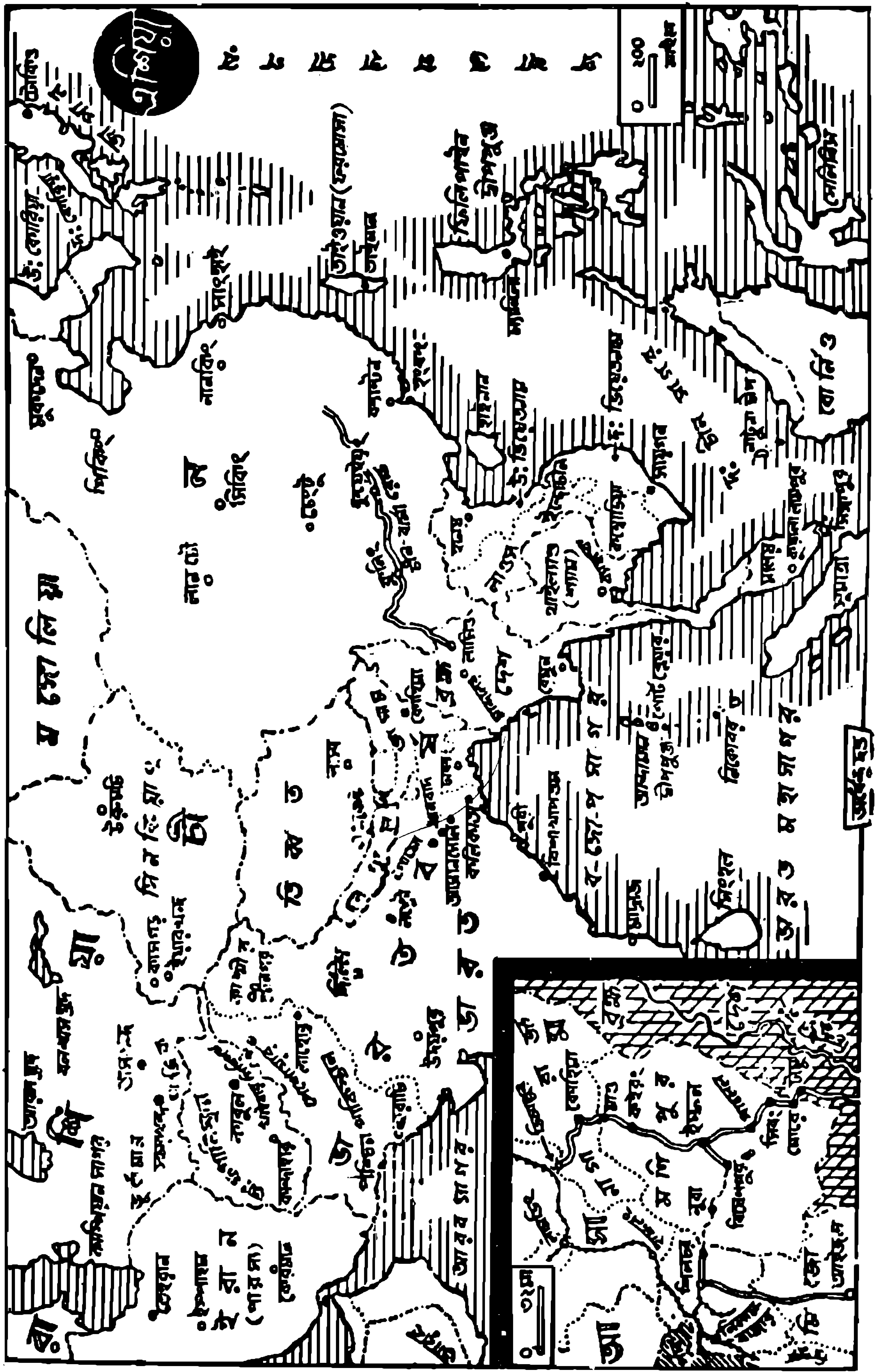
স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

আমি সুভাষ বলছি ঃ প্রথম খণ্ড প্রথম (বি) সংস্করণ
আমি সুভাষ বলছি ঃ তৃতীয় খণ্ড (তৃতীয় সংস্করণ)
ফাঁসি মঞ্চ থেকে (দ্বিতীয় সংস্করণ)
গান্ধীজী ও নেতাজী
মৃত্যুর চেয়ে বড়
বিনয়-বাদল-দীনেশ (পঞ্চম সংস্করণ)
ক্ষমা নেই (পঞ্চম সংস্করণ)
রক্ত দিয়ে গড়া (দ্বিতীয় সংস্করণ)
শপথ নিলাম
রক্তের অক্ষরে (দ্বিতীয় সংস্করণ)
যেন ভুলে না যাই (দ্বিতীয় সংস্করণ)
রক্তঝরা দিনগুলি
ইতিহাস মনে রাখেনি

উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

॥ ছয় ॥

॥ সাত ॥

॥ আট ॥

॥ নয় ॥

সেই গাড়ী

এই গাড়ীতেই নেতাজী অন্তর্ধান করেছিলেন এলগিন রোডের বাড়ী থেকে

সিনর অরল্যাণ্ডো ম্যাজিট্টো

এডলফ হিটলার

জার্মানীর জয়যাত্রা
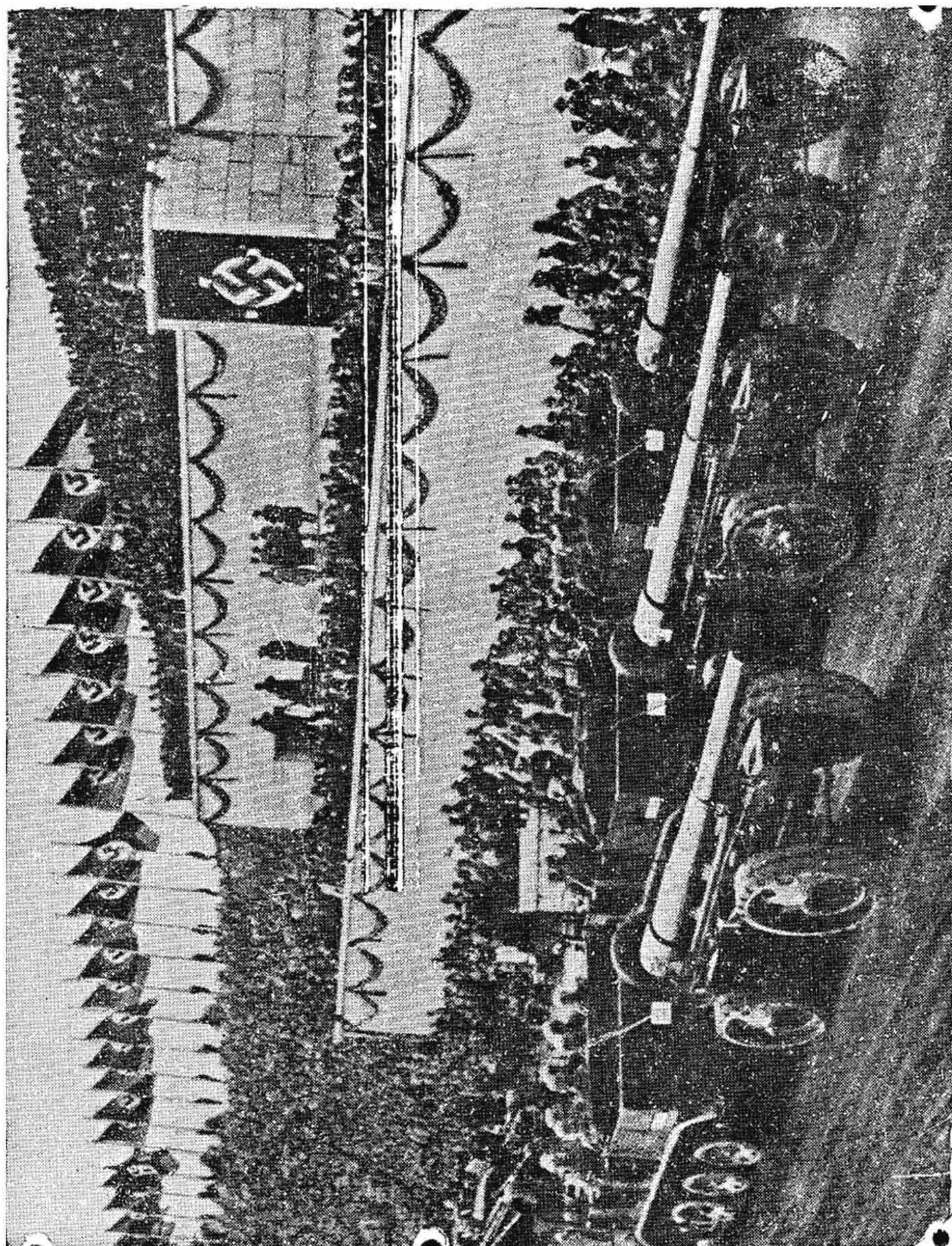
ব্রিটিশ কনভয়
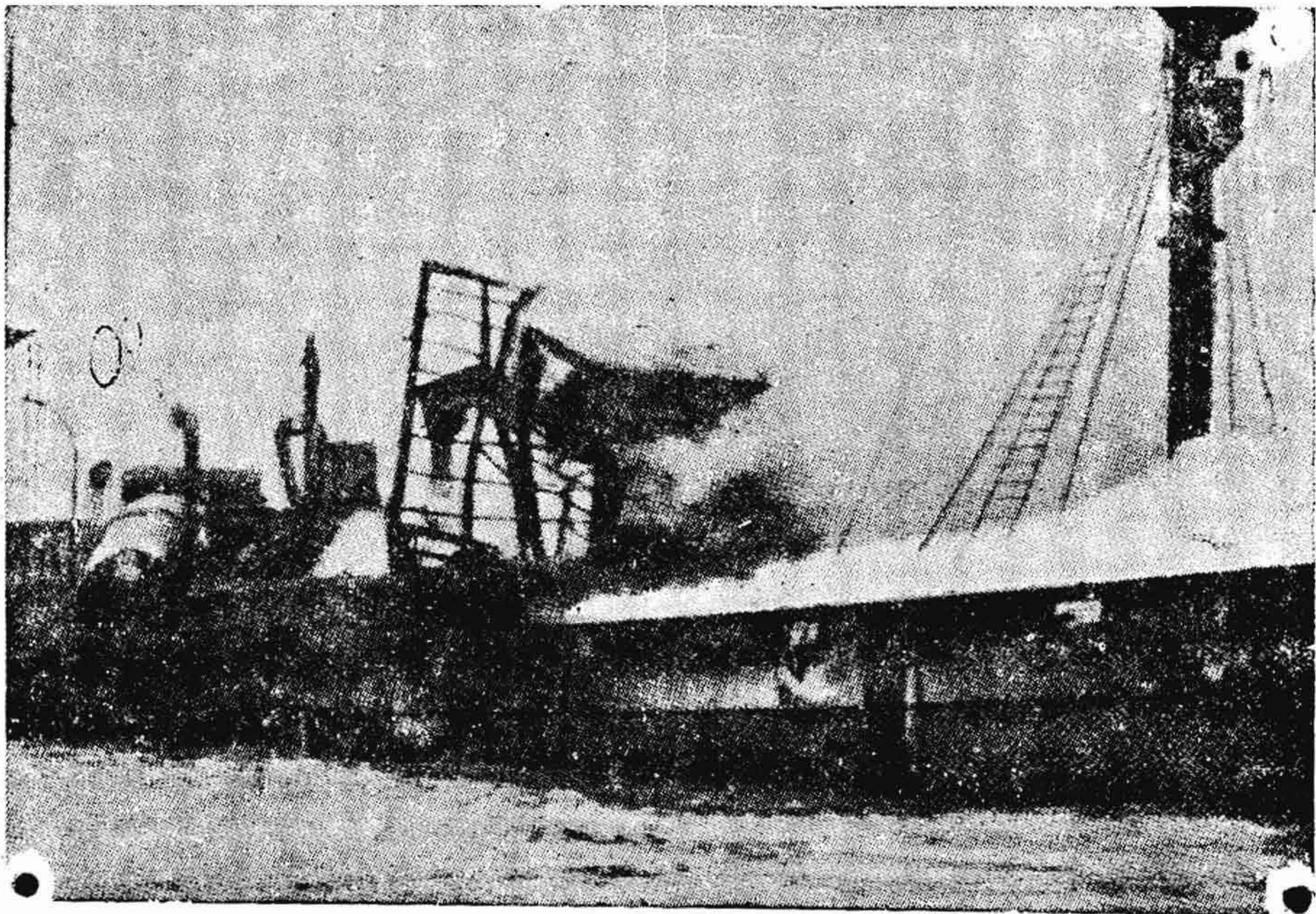
ইংলিশ চ্যানেলে টর্পেডো—বিধ্বস্ত ব্রিটিশ জাহাজ
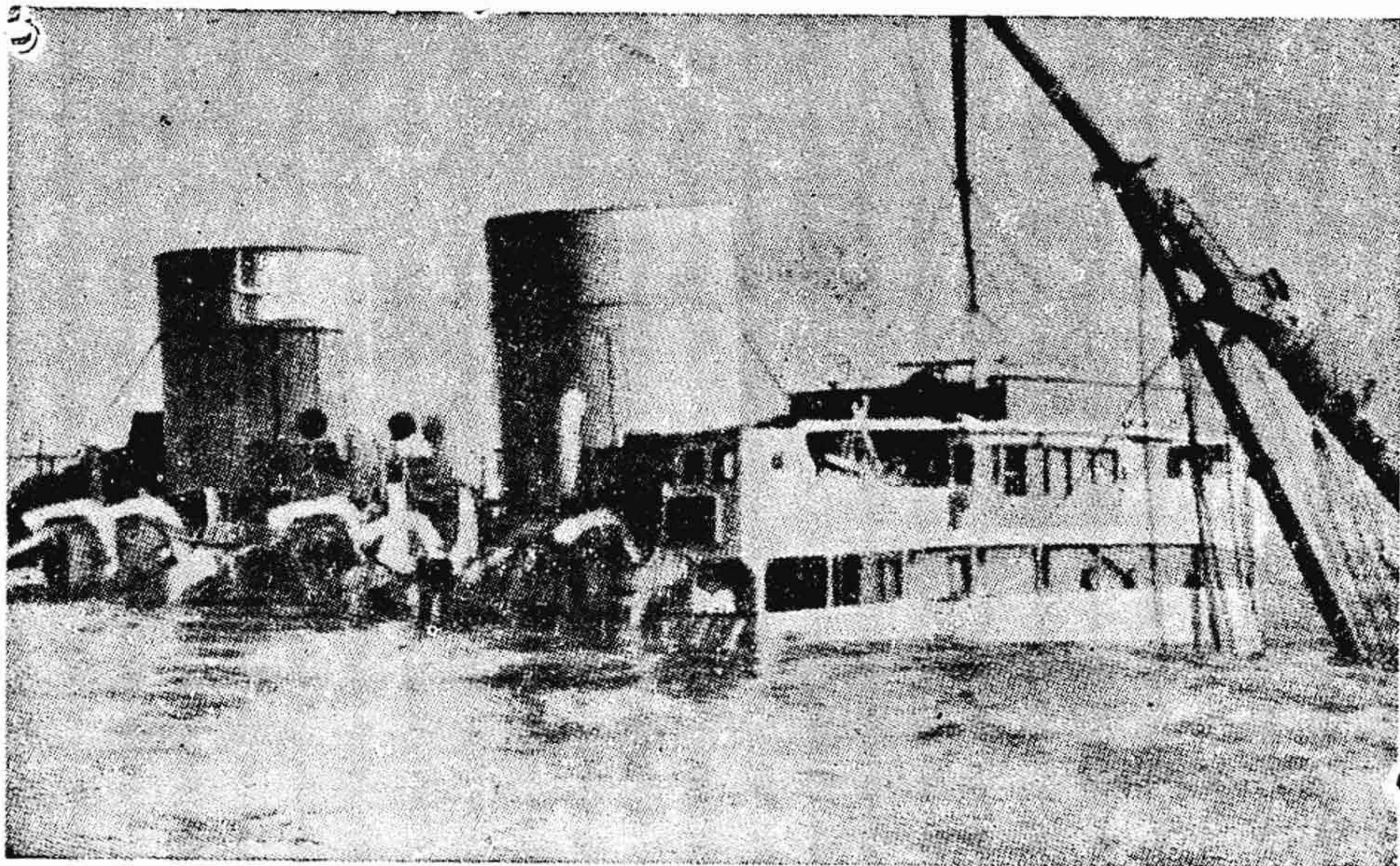
সলিল সমাধি
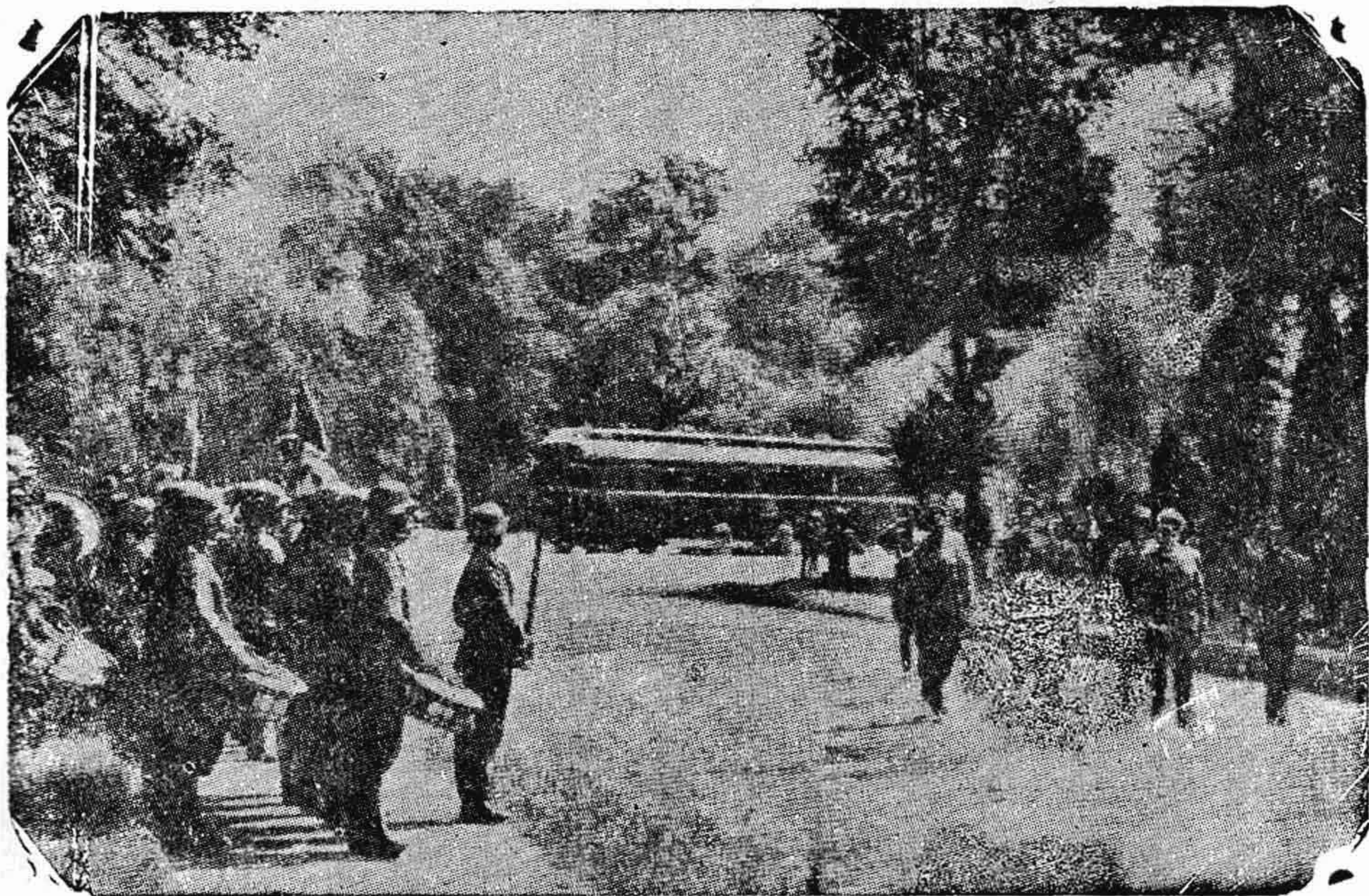
ফ্রান্সের ক্যাম্পেন অরণ্যে অবস্থিত সেই রেলগাড়ী
সামনে হিটলার প্রমুখ নাৎসী নেতৃবৃন্দ]
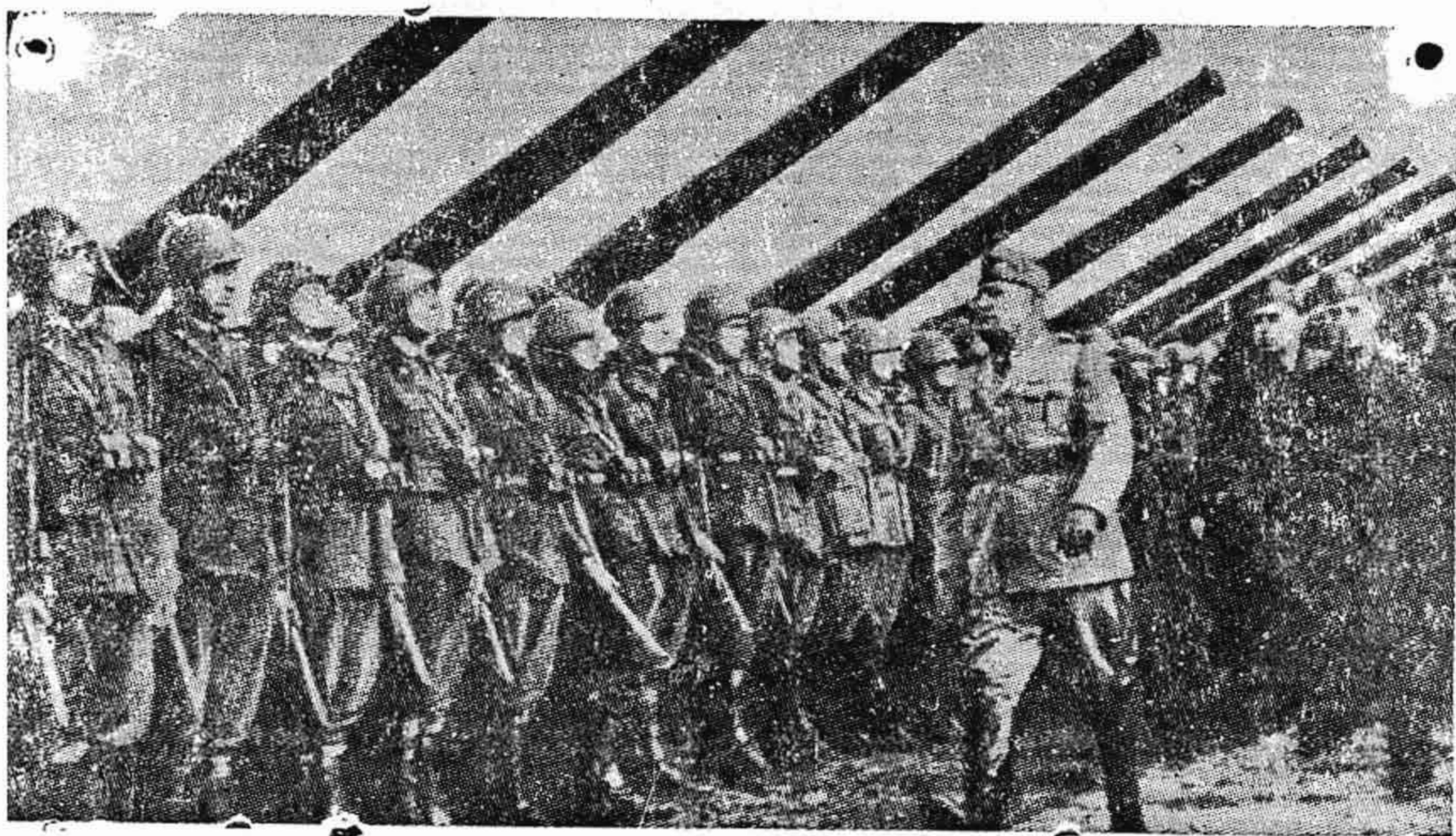
মুসোলিনীকে অভিবাদনরত সেনাবাহিনী
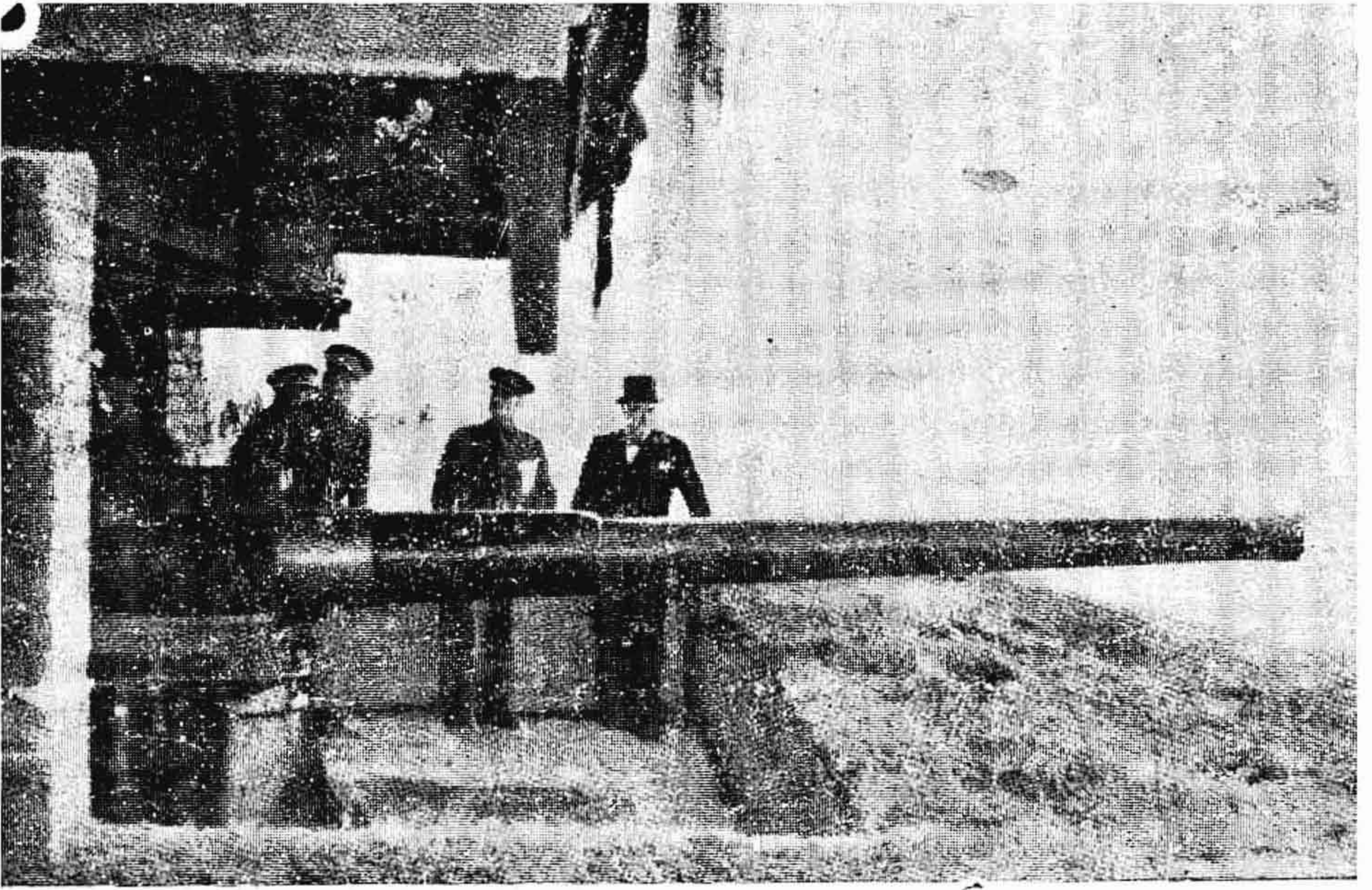
উপকূলরক্ষী দূরপাল্লার কামান
[পেছনে দাড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী চার্চিল]

সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসর
[ডানকার্ক থেকে]
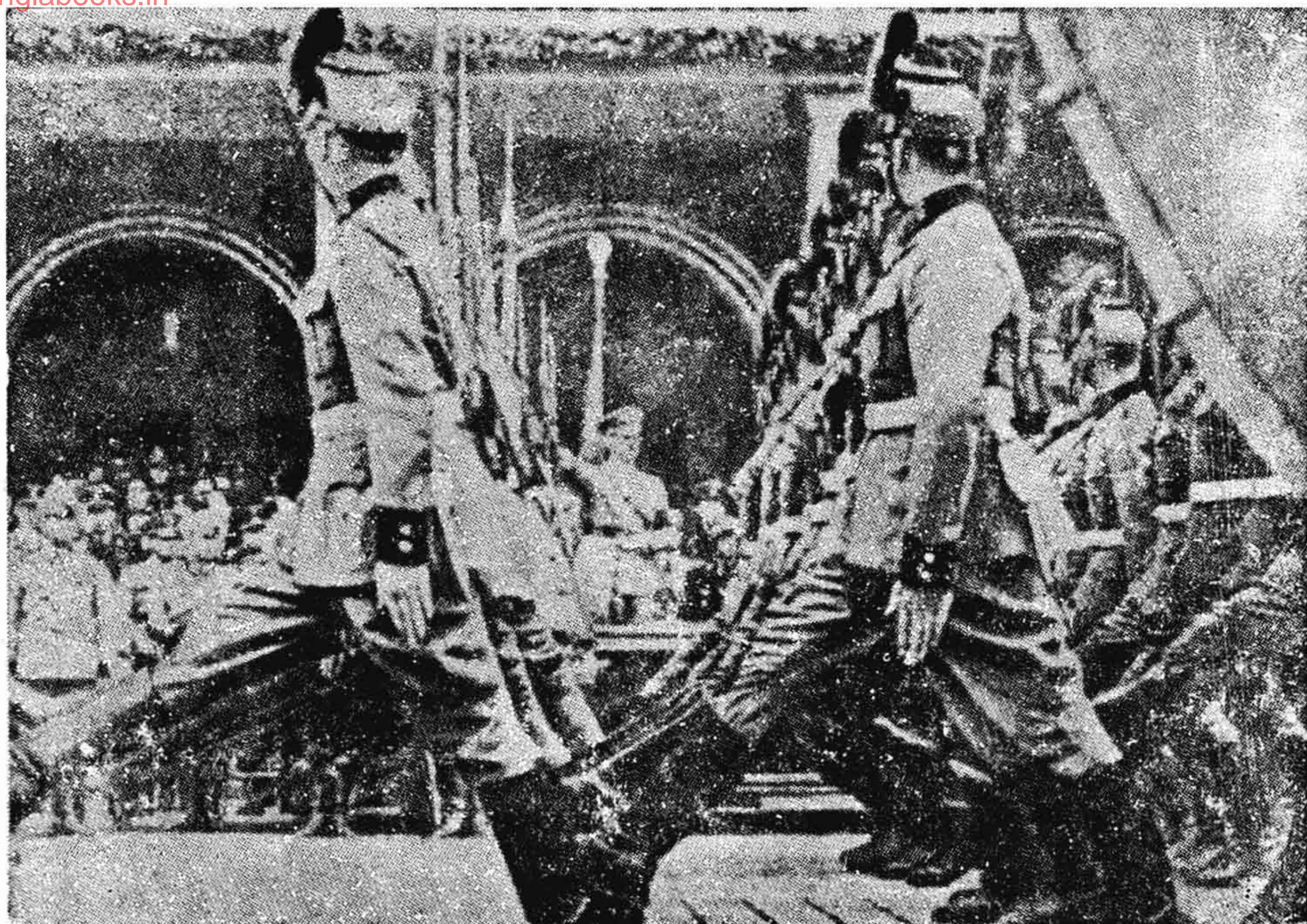
হিটলারকে অভিবাদনরত নাৎসী বাহিনী
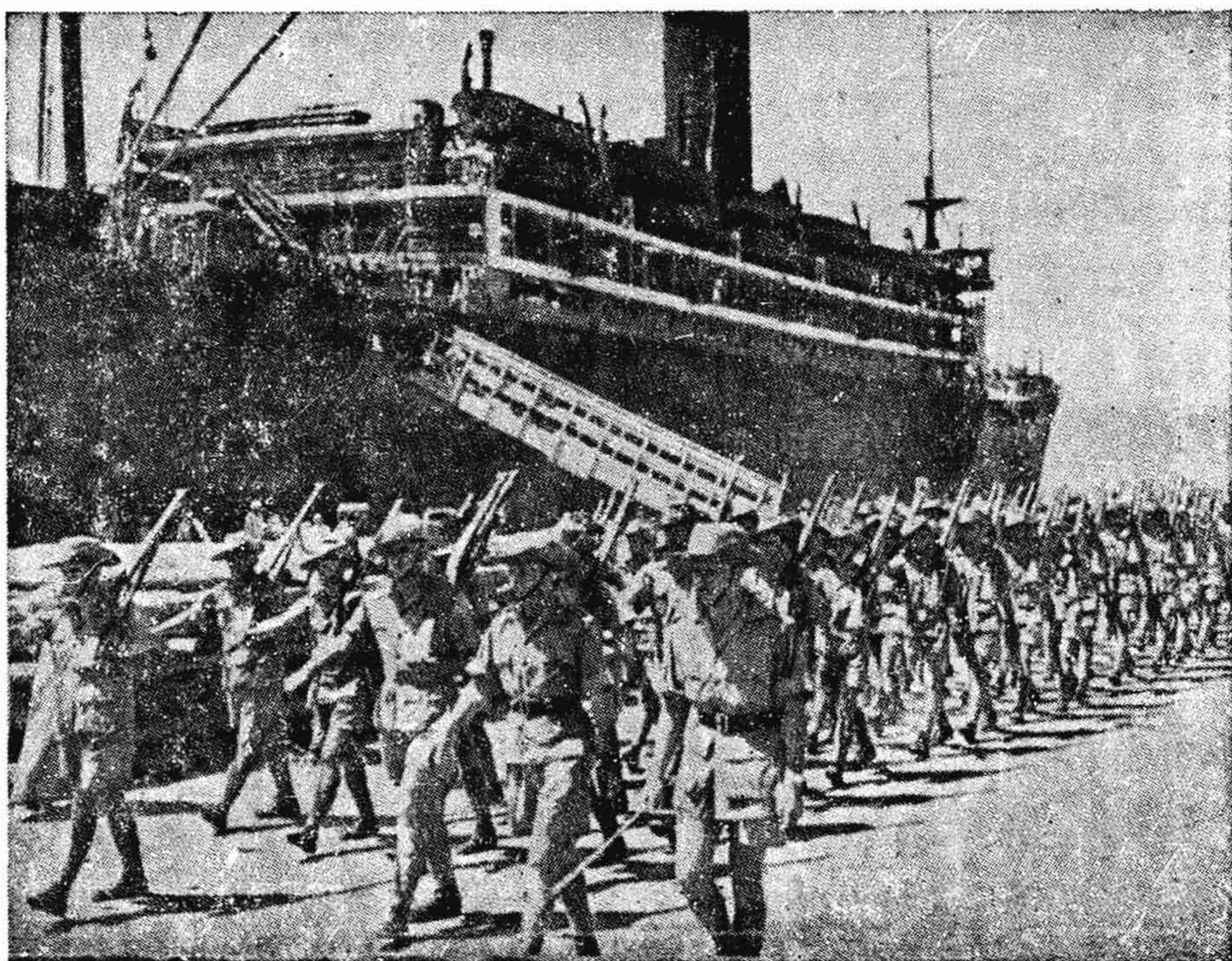
আফ্রিকা উপকূলে মার্কিন বাহিনীর অবতরণ

জার্মানীতে অবস্থিত বর্মী প্রতিনিধিদের সঙ্গে

জার্মান ট্রেনার ওয়াল্‌টার হারবিচ, নেতাজী ও অন্য একজন

আমি সুভাষ বলছি—
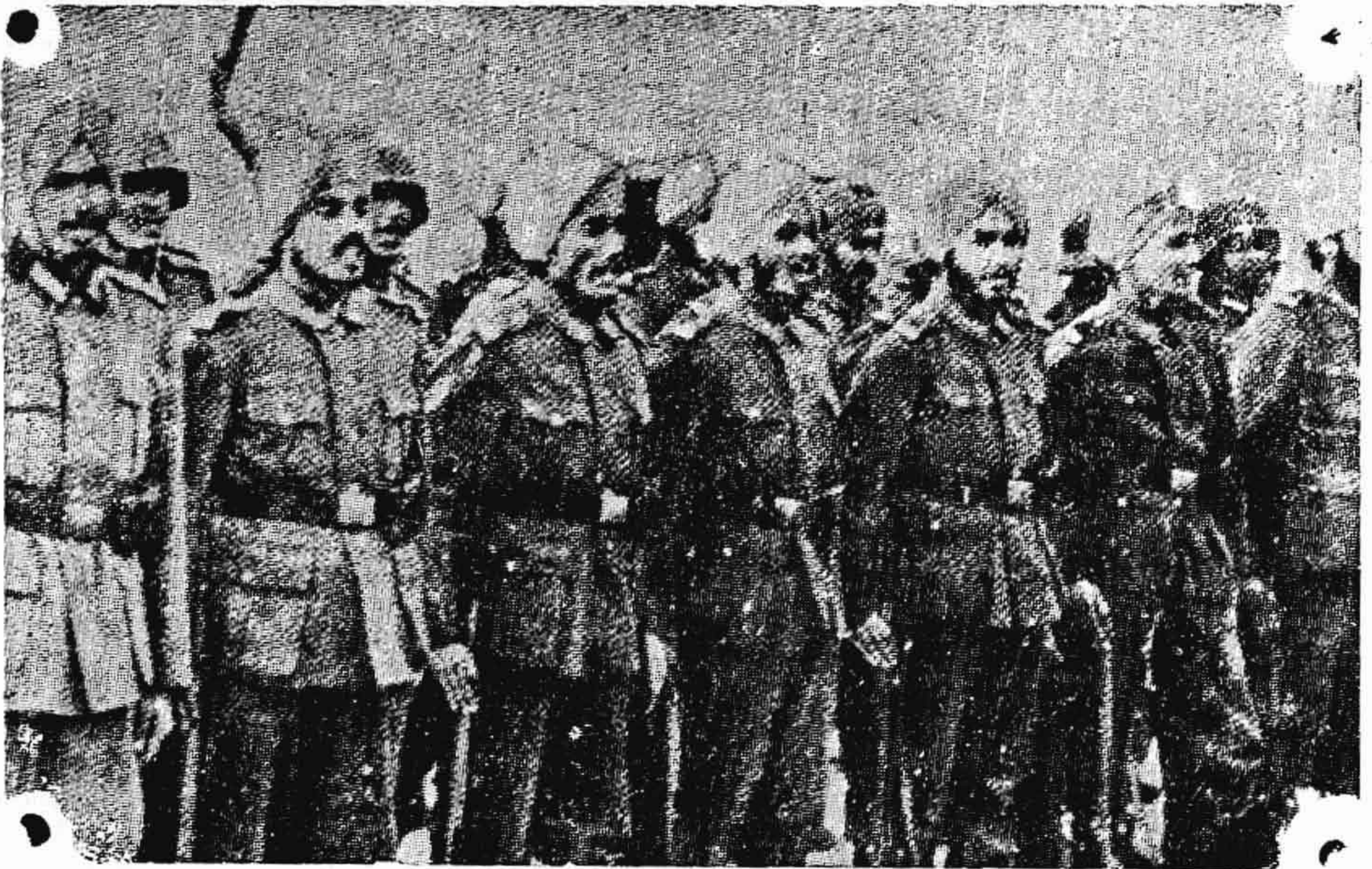
জাতীয় সঙ্গীত গাইছেন আজাদ হিন্দ্ বাহিনী
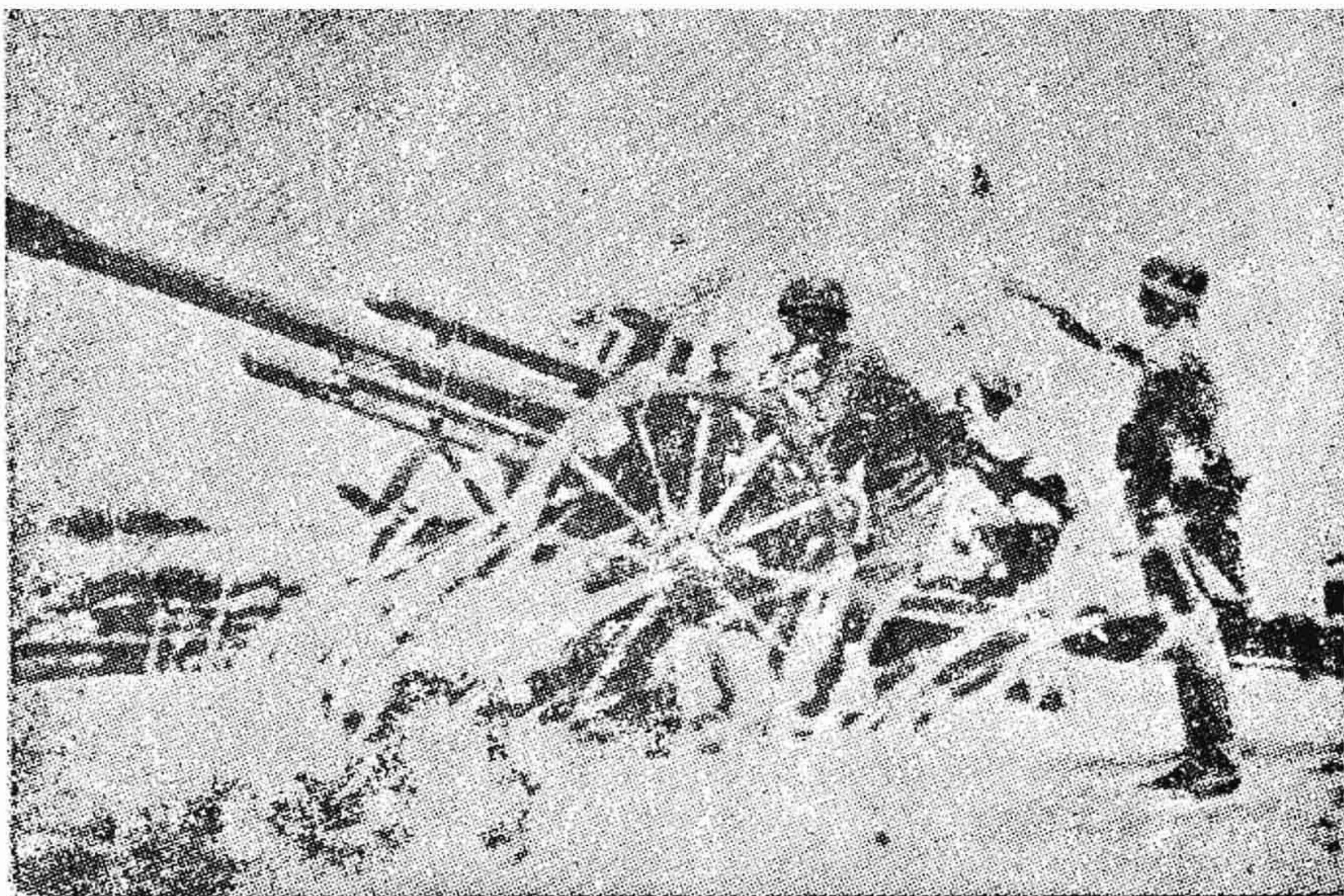
শিক্ষারত আজাদ হিন্দ্ ফৌজ
[জার্মানী]
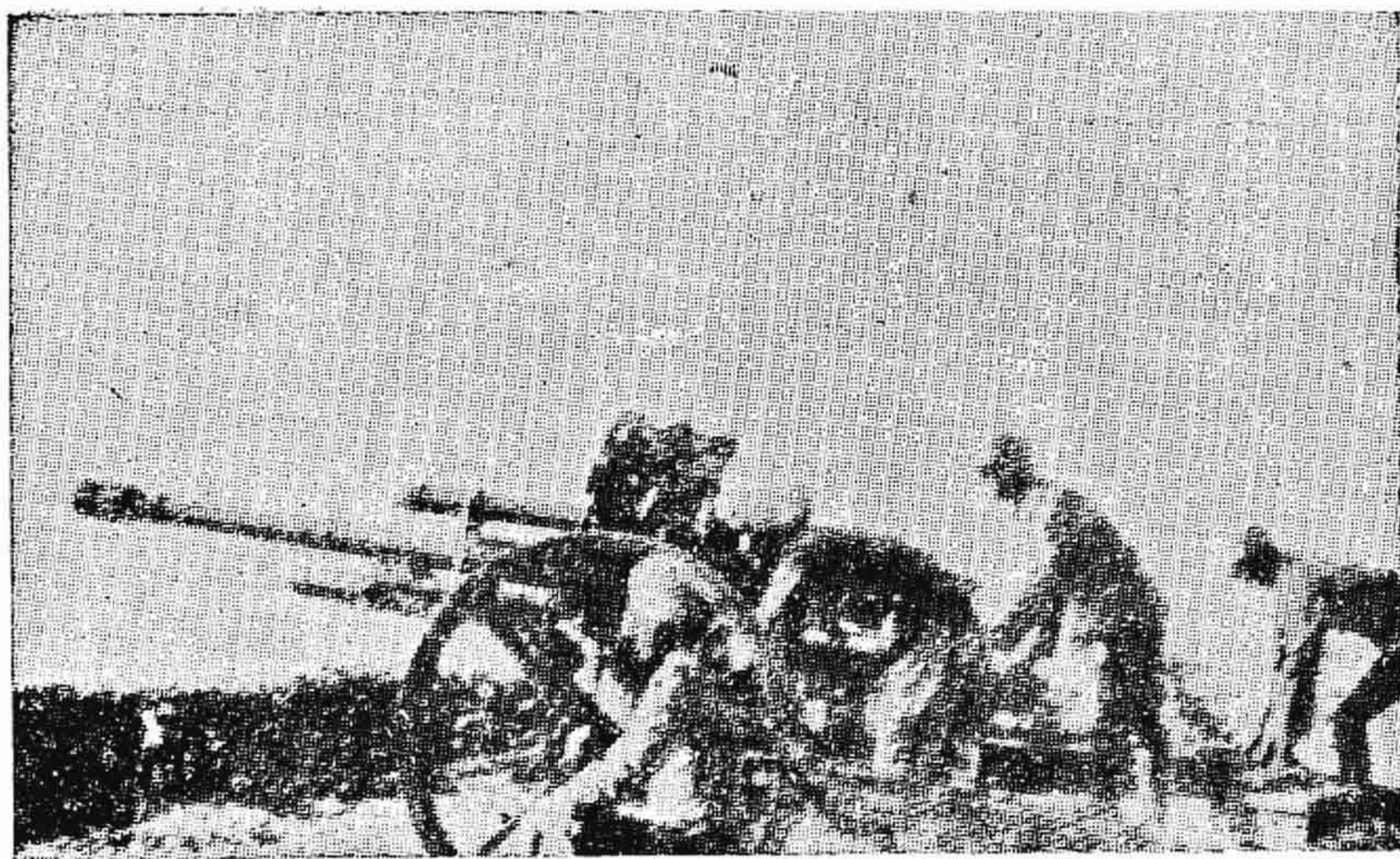
সমুদ্র উপকূলে শিক্ষারত আজাদ হিন্দ্ ফৌজ
[জার্মানী]

নিজস্ব পত্রিকা [জার্মানী]

নিজস্ব ডাক টিকেট [জার্মানী]

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু

শহীদদের প্রতি জাপ-বাহিনীর শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন
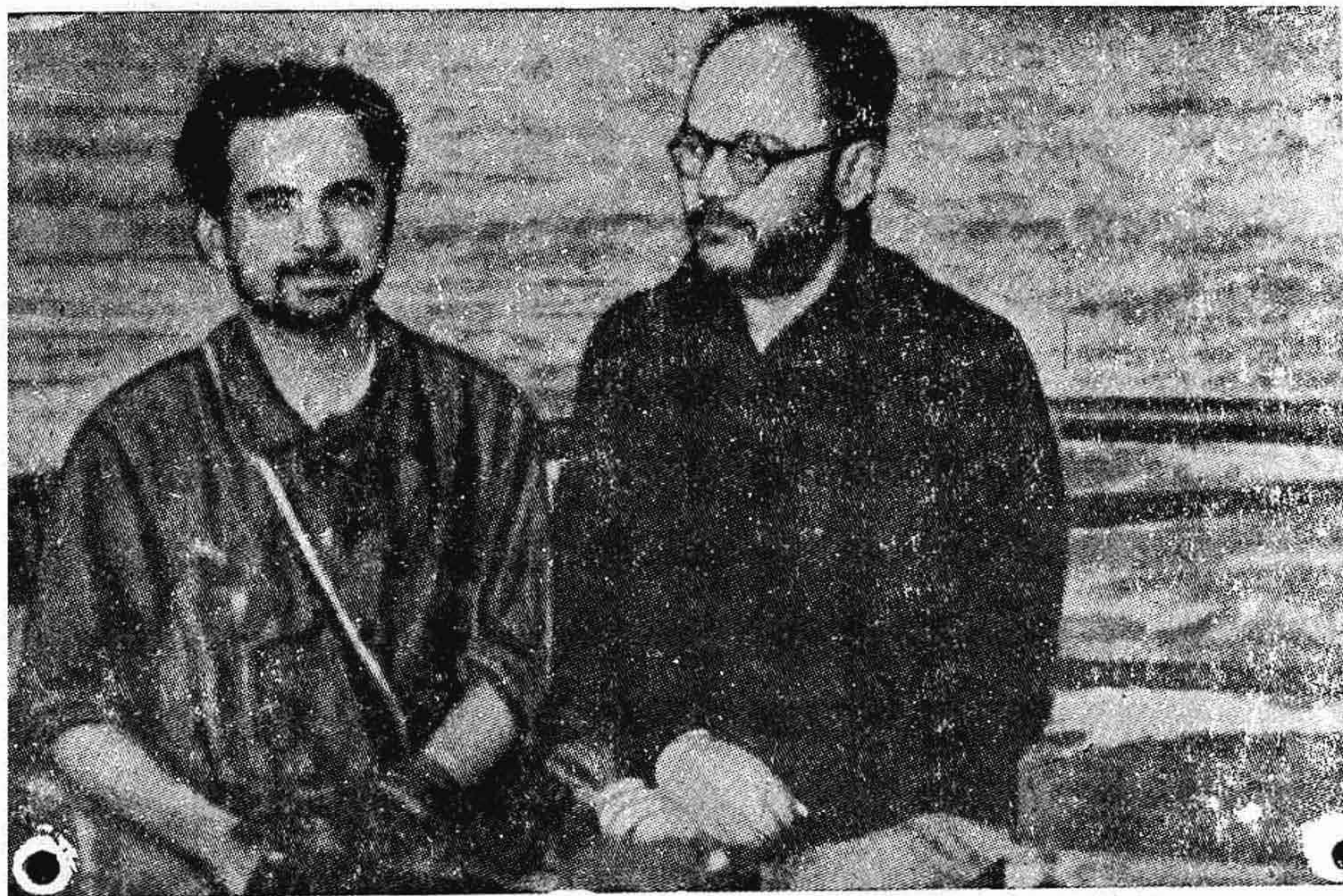
রবার বোটে সঙ্গী আবিদ হাসান সহ—সাবমেরিণ অভিমুখে
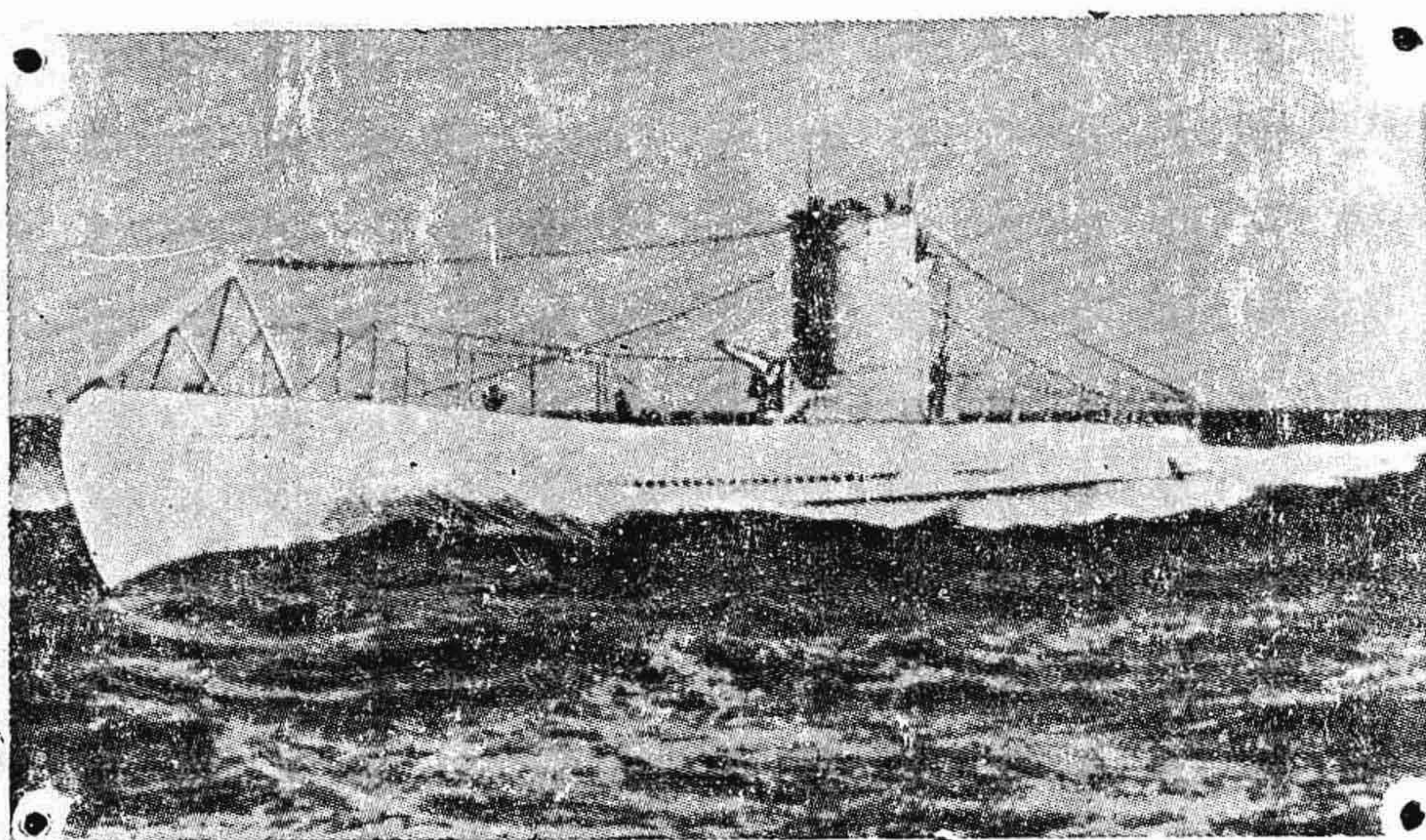
ভাসমান অবস্থায় জার্মান সাবমেরিণ

নেতাজী

ঘড়ির কাটাটা একটানা এগিয়ে চলেছে টিক্ টিক্ করে।

রাত চারটে বেজে পনেরো মিনিট। আর আধ ঘণ্টা বাকি। তারপরই শুরু হবে এক ঐতিহাসিক অভিযান, যার সাঙ্কেতিক নাম 'অপারেশন কেস্ হোয়াইট।'

হাজার হাজার ফাইটার এবং বোমারু বিমান প্রস্তুত। প্রস্তুত শক্তিশালী ট্যাঙ্ক-বহর। প্রস্তুত দুর্ধর্ষ প্যানৎসার বাহিনী। প্রস্তুত ফিল্ড মার্শাল ভন ক্লুগে, ভন বোক, রাইখ্‌নেয়, রুনস্ট্যান্ড প্রমুখ সমরকুশলী সেনাপতিবৃন্দ। এখন শুধু আপেক্ষা মাত্র!

চারটে বেজে চল্লিশ মিনিট। আরো পাঁচ মিনিট বাকি।

চারটে বেজে চুয়াল্লিশ মিনিট। চরম মুহূর্ত এগিয়ে এসেছে। আর কয়েক সেকেণ্ড মাত্র বাকি। বিশ-পনেরো-দশ-পাঁচ-জিরো আওয়ার! গো অন! চার্জ!

নিমেষে দুর্ধর্ষ নাৎসী বাহিনী দুর্বার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল পোল্যাণ্ডের ওপর। কণ্ঠে তাদের একই সুর—'ডয়েচ ল্যান্ড উইবার আলেস্'! জার্মানীর জয় হোক। জার্মানী দীর্ঘজীবী হোক!

শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। শুরু হল উত্থান, পতন আর ভাঙাগড়ার ইতিহাস।

কেন এই যুদ্ধ?

কি এর কারণ?

কে এর জন্য দায়ী?

দায়ী কি শুধু হিটলার?

মোটেই না। হিটলার উপলক্ষ মাত্র. নইলে সেদিন হোক, বা দুদিন পরে হোক, এ যুদ্ধ অনিবার্যই ছিল।

এর মূলে রয়েছে ভার্সাই সন্ধি, যা একদিন অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল জার্মানীর ওপর। তারই অনিবার্য পরিণতি এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

চলো আমরা কিছুক্ষণের জন্য সেই পেছনের দিনগুলিতে ফিরে যাই, মল্লিকা।

১৯১৮ সাল। ১১ই নভেম্বর।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ। এবার পরাজিত জার্মানীর বিচার করার পালা। তার জন্য বিজয়ী পক্ষের সবাই এসে সমবেত হয়েছেন ফ্রান্সের ঐতিহাসিক ভার্সাই নগরীতে।

কিন্তু একি! শর্ত শুনে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন জার্মান প্রতিনিধি কাউন্ট ভন রাণাৎসাও। এ শর্ত মেনে নেবার অর্থ যে জার্মানীর অপমৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নয়! অসম্ভব! এ শর্ত কিছুতেই মেনে নেওয়া চলে না।

সন্ধিপত্রে সই না করেই জার্মানীতে ফিরে গেলেন কাউন্ট রাণাৎসাও। না, আমি পারব না। নিজের হাতে জার্মানীর এই মৃত্যুদণ্ডে সই করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু সই তোমাদের করতেই হবে। না করে যাবে কোথায়! মনে রেখো, সাত দিন মাত্র সময়। তার মধ্যে সই কর তো ভালই, নইলে চরম পরিণতির জন্য তোমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

দুদিন যেতে না যেতেই এবার এসে হাজির হলেন হের হারম্যান মুলার। অর্ধমৃত জার্মানী তখন ধুঁকছে। সুতরাং বিজয়ী পক্ষের সব কিছু দাবী মেনে না নিয়ে উপায় কি!

চুক্তি স্বাক্ষরিত হল ক্যাম্পেন বনের একটা রেলগাড়ির কামরায় বসে। তারিখটা ছিল ১৯১৯ সালের ২৮শে জুন।

তারপর যুদ্ধ-জয়ের স্মৃতি-চিহ্ন হিসেবে ক্যাম্পেন বনের সেই ঘটনা-স্থলে স্থাপন করা হল একটি প্রস্তর-ফলক। তার গায়ে ফরাসী ভাষায় লেখা ছিল:

'এখানে একটি স্বাধীন জাতির কাছে জার্মানীর গর্ব খর্ব হল। তারিখ—১১ই নভেম্বর, ১৯১৮ সাল।'

শর্ত অনুযায়ী প্রথমেই দক্ষিণ সমুদ্র এবং আফ্রিকার উপনিবেশসমূহ হারাতে হল জার্মানীকে। তারপর নিজের অঙ্গচ্ছেদ করে পশ্চিম-আলসাস ও লোরেন ছেড়ে দিতে হল ফ্রান্সকে।

পুবে পোসেন এবং পশ্চিমে প্রুশিয়ার বেশির ভাগই পেল পোল্যান্ড। মেমেল গেল লিথুয়ানিয়ার হাতে।

ডানজিগকে পরিণত করা হল আলাদা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে। হারাতে হল সার অঞ্চলও। তার শাসনভার ন্যস্ত হল আন্তর্জাতিক কমিটির সদস্য-দের হাতে।

আর ক্ষতিপূরণ! হ্যাঁ, কিস্তিতে কিস্তিতে মোট ৬৬০ কোটি পাউণ্ড তোমাদের দিতে হবে বিজয়ী দলগুলিকে। তবে বেশিদিন নয়। মাত্র ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত। এই সত্তর বছর তোমরা এটা ঠিক মতো দিয়ে যাও। ব্যস, ঋণমুক্তি।

কিন্তু জামিন! জামিন কোথায় তোমাদের? তোমরা যে ক্ষতিপূরণের টাকাটা সময়মত দিতে পারবে, তার প্রমাণ কি?

সুতরাং জামিন হিসেবে রাইন নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলি পনেরো বছরের জন্য ছেড়ে দিতে হবে আমাদের সেনাবাহিনীর হাতে। আর তাদের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করতে হবে তোমাদেরই।

আরো আছে। এখন থেকে মোট এক লক্ষ সৈন্য তোমরা রাখতে পারবে সারা দেশে। তাও পুলিশ বাহিনীর ভিত্তিতে।

সাবমেরিন তৈরি একদম বন্ধ। জাহাজ-টাহাজ দু-একটা তৈরি করতে চাও তো করতে পার, তবে দশ হাজার টনের ওপর কিছুতেই নয়।

আর রাইন নদীর পশ্চিম তীরে এবং হেলিগোল্যান্ডে দুর্গ তৈরি করা বা সৈন্য রাখা চলবে না।

মল্লিকা, যুদ্ধে সর্বস্ব হারিয়েও বোধহয় জার্মানী সেদিন ততখানি আঘাত পায়নি, যতটা পেয়েছিল এই অবমাননাকর ভার্সাই সন্ধি মেনে নিতে। কারণ, একথা তখন দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, ভার্সাই সন্ধির আসল উদ্দেশ্য শান্তি প্রতিষ্ঠা নয়, প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। জার্মান ঐতিহাসিকের ভাষায়:

'The peace treaty of Versailles of June 28, 1919 was a heavy blow not only for the German people as a whole but particularly for all who were concerned about a lasting peace without hatred and a feeling of revenge. [Germany Since 1848 : Wolfgang Treue : P.—71]

তবু মেনে নিতে হল। উপায় কি? সংসারে পরাজিত পক্ষের তুচ্ছ মান-অপমানের দাম আর কতটুকু!

তাছাড়া এ-ই তো নিয়ম। এই নিয়মই তো চলে আসছে আবহমান কাল থেকে। যুদ্ধের যা কিছু দায়-দায়িত্ব, যা কিছু অপরাধ, সবই পরাজিত পক্ষের।

আর বিজয়ী পক্ষ! না, তারা নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, সাধুপুরুষ মাত্র। তারাই তখন সব কিছুর বিচারক। সুতরাং তাদের কোন দোষ থাকতে পারে না।

চুক্তি স্বাক্ষরিত হল ২৮শে জুন, ১৯১৯ সালে। কিন্তু টাকা! ক্ষতি-পূরণের জন্য এই বিরাট অঙ্কের টাকা এখন কোথায় পাবে জার্মানী? জমার ঘর যে একেবারেই শূন্য!

বাধ্য হয়েই তখন প্রচুর কাগজের নোট বাজারে ছাড়তে হল জার্মানীকে। আগে তো প্রাণ বাঁচুক, তারপর যা হয় দেখা যাবে।

ফলে, যা হবার তাই হল। দেখতে দেখতে মার্কের দাম পড়ে যেতে লাগল ধাপে ধাপে।

১৯২২ সালে দেখা দিল ঘোর দুর্দিন। ক্ষতিপূরণ দেবার মতো কিছুই তখন আর অবশিষ্ট নেই জার্মানীর।

তবে রে! গর্জে উঠল পাওনাদারের দল। টাকা দাও বলছি, নয় তো—

সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকেন্দ্র রুঢ় অঞ্চল দখল করে নিল ফরাসী বাহিনী। টাকা যখন দিতে পারছ না, তখন এটা আমাদের দখলেই থাক!

অবস্থা চরমে উঠল ১৯৩২ সালে। মার্কের আর তখন কোন দামই নেই খোলা বাজারে।

ফলে, দেশজোড়া প্রচণ্ড অর্থসঙ্কট। ট্রেজারী শূন্য। ব্যাঙ্ক শূন্য। শূন্য ছাড়া আর কিছুই তখন অবশিষ্ট নেই জার্মানীর জনজীবনে।

সেই শূন্যতাকে আরো শতগুণ বাড়িয়ে তুলল ইহুদী বণিকগোষ্ঠী। জার্মানীতে নিত্য-প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের তখন প্রচণ্ড অভাব। এই তো সুযোগ! এই সুযোগে যত পার চুষে নিঙড়ে ওদের একাকার করে দাও।

জার্মানীর তখন শেষ অবস্থা। চোখের সামনে চাপ চাপ অন্ধকার। তিল তিল করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে পায়ের নিচের মাটি। চারিদিকে অথৈ জল। কোথাও কূল নেই। এবার মৃত্যু অবধারিত।

'না, জার্মানী মরবে না।'

ঠিক তখনই ল্যাণ্ডস্‌বার্গ দুর্গ কারাগার থেকে বেরিয়ে এলেন একটি অসাধারণ মানুষ। কণ্ঠে তাঁর নতুন দিনের গান। নতুন প্রতিশ্রুতি।

জার্মানী মরবে না। আবার আমরা বাঁচব। নিজেদের শক্তি দিয়েই সব কিছু অর্জন করব। সোজা হয়ে দাঁড়াও। বলো—'ডয়েচ ল্যাণ্ড উইবার আলেস্‌'।

বিস্ময় ভরে তাকিয়ে রইল গোটা জার্মানী। কে! কে! কে তাদের আজ নতুন করে বাঁচার আশ্বাস দিচ্ছে মৃতপ্রায় এই জার্মানীর বুকের ওপর দাঁড়িয়ে?

হিটলার! হিটলার! হিটলার! অ্যাডল্‌ফ্‌ হিটলার!

হিটলার! মনে মনে হাসলেন প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গ। বীয়ারসেলার অভ্যুত্থানের ব্যর্থ নায়ক সেই বোহেমিয়ান কার্পোরালটা! জেল থেকে বেরিয়ে এসেই আবার নাটক শুরু করেছে দেখছি লোকটা!

তবে ক্ষমতা আছে। গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে কি করে যে জন-মানসে প্রভাব বিস্তার করতে হয়, লোকটা তা ভাল করেই জানে।

আর সহকর্মীর দলও জুটেছে ঠিক তেমনিই। স্ট্রেসার, রোয়েহম, গোয়েবল্‌স, গোয়েরিং, ফ্রিক, হিমলার, হেস্‌, বোরম্যান, স্পীয়ার, রিবেনট্রপ— এক-একটি রত্ন যেন! মনে হয়, নাটক এবার জমবে ভাল।

১৯৩২ সালের নির্বাচনে হিটলারের জয়-জয়কার।

দেখা গেল ২৩০টা আসনই দখল করেছে তাঁর প্রতিষ্ঠিত নাৎসী দল। ফলে, ১৯৩৩ সালে তিনিই হলেন জার্মানীর চ্যান্সেলার।

মাত্র একবছর বাদেই দেহরক্ষা করলেন প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গ। ফলে, হিটলারই তখন সর্বেসর্বা। এককথায় তিনিই জার্মানীর ভাগ্যবিধাতা।

শুরু হল গঠনমূলক কাজ। নাইট ক্লাব ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদের কুৎসিত আস্তাগুলি এখুনি ভেঙে চুরমার করে দাও। মেয়েরা 'go back to kitchen'. আমোদ-প্রমোদের সময় এখন নয়। আগে জার্মানীকে বাঁচাতে হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তার জন্য এখুনি কাজে লেগে যাও।

ছেলেরা সবাই কাজে লেগে যাও দলে দলে। কারো বেকার বসে থাকলে চলবে না। সবাইকে আমার চাই। সবাইকে আমার প্রয়োজন। রাস্তা তৈরি কর। কল-কারখানায় যোগ দাও। জার্মানী তোমাদের দেশ। তাকে বাঁচিয়ে তোলার দায়িত্ব যে তোমাদেরই। উঠে দাঁড়াও! গেট আপ্‌!

ভার্সাই সন্ধি! ওসব আমি মানি নে। অনেক শোষণ করেছ তোমরা জার্মানীকে। এবার মানে মানে হাত গোটাও।

আর ঐ ইহুদী বেনিয়ার দল, জাতির চরম দুর্দিনে যেভাবে তোমরা গোটা জার্মানীকে চুষে নিঙড়ে একাকার করে দিয়েছ, তারপর আর এক-মুহূর্তও তোমাদের এখানে থাকা চলবে না। পত্রপাঠ বিদেয় হও!

রাষ্ট্রসঙ্ঘ! সে আবার কি! না, তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। ওরা যা খুশি করতে পারে, তাতে আমার কিছু আসে-যায় না।

আমার সাফ কথা—অবস্থার সুযোগ নিয়ে জার্মানীর যেসব অঞ্চল তোমরা গ্রাস করেছ, তা কড়ায়-গণ্ডায় ফিরিয়ে দিতে হবে।

মাত্র এক লক্ষ সৈন্য! কে বললে! ওসব বস্তা-পচা কথা আমি শুনতে চাই নে। এখন থেকে জার্মানীতে সামরিক শিক্ষা-গ্রহণ বাধ্যতামূলক। সবাই এসে ভর্তি হও দলে দলে। কেউ বাদ গেলে চলবে না।

দেখতে দেখতে চেহারা পাল্টে গেল জার্মানীর। এ যেন সেই যুদ্ধ-বিধ্বস্ত জার্মানী নয়। আমূল পরিবর্তিত কোন নতুন দেশ। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এ জার্মানীর চেহারা আলাদা।

প্রতিটি নরনারীর মুখে তখন একটি মাত্র নাম। হিটলার! হিটলার! হিটলার! ফুয়েরার হিটলার! তিনি আমাদের বাঁচার পথ দেখিয়েছেন। দিয়েছেন নতুন দিনের সন্ধান। তাঁর জয় হোক! জার্মানীর জয় হোক! ডয়েচ ল্যান্ড উইবার আলেস্! হেইল্ হিটলার!

চঞ্চল হয়ে উঠল ইয়োরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি।

উঁহু, লোকটি সোজা নয়! বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, ভার্সাই সন্ধিকে আর এক কানাকড়িও সে মূল্য দিতে রাজী নয়। বরং তাকে তাচ্ছিল্য করার একটা অনমনীয় জেদই যেন ফুটে উঠতে চাইছে তার প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়ে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে কি করা যায় এখন? ইতিমধ্যেই বেশ শক্তি সঞ্চয় করেছে লোকটা। এ অবস্থায় ওকে ঘাঁটাতে যাওয়াও যে বিপদ!

১৯৩৫ সালের ১১ই জানুয়ারী সার অঞ্চল জার্মানী আবার ফিরে পেল গণভোটের মাধ্যমে।

১৯৩৬ সালের ৭ই মার্চ পাওয়া গেল রাইনল্যান্ড। আর ১৯৩৮ সালের ১১ই মার্চ—গোটা অস্ট্রিয়া।

খুবই ঝুঁকি নেওয়া হয়েছিল সন্দেহ নেই। এমন কি এ নিয়ে একটা গুরুতর সঙ্কট সৃষ্টি হওয়াও মোটেই বিচিত্র ছিল না। কিন্তু কিছুই হল না। কারণ সোভিয়েত-ভীতি। কমিউনিস্টদের বিশ্বাস নেই। কি ব্রিটিশ, কি ফ্রান্স, প্রতিটি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাছে ওরা তখন বিপদস্বরূপ। সুতরাং ওদের ঠেকানোর জন্য হিটলারকে হাতে রাখা প্রয়োজন।

দুদিন যেতে না যেতেই আবার নতুন দাবী। চেকোশ্লোভাকিয়ার ঐ সুদেতেন অঞ্চল আমার চাই। জার্মানরাই ওখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

তড়ি-ঘড়ি করে ছাতা বগলে নিয়ে ছুটে এলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলীন। অতি শান্তিপ্রিয় লোক। জীবনে কোনদিনও তিনি বিমান-ভ্রমণ করেননি এর আগে। কারণ—ভয়। দারুণ ভয়। বিমানে উঠলেই নাকি তাঁর শান্তিভঙ্গ হবে।

এবার কিন্তু তার ব্যতিক্রম হল, মল্লিকা। গুরুতর শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আকাশ-পথে এসে হাজির হলেন সর্বক্ষণের সঙ্গী ছাতাটি বগলে নিয়ে। উদ্দেশ্য, শান্তিরক্ষা করা।

ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মঁসিয়ে দালাদিয়েরকেও আসতে হল সেই একই কারণে। একগুঁয়ে এই লোকটাকে নিয়ে হয়েছে যত জ্বালা! একবার গোঁ ধরলে আর রক্ষে নেই। দেখা যাক্, বুঝিয়ে-সুজিয়ে একটু শান্ত করা যায় কিনা!

২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে কন্‌ফারেন্স বসল মিউনিকে। একদিকে চেম্বারলীন এবং দালাদিয়ের, অন্যদিকে হিটলার এবং বন্ধু মুসোলিনী। বলো, এবার কি চাই তোমার? কী পেলে তুমি খুশি হও?

চাই চেকোশ্লোভাকিয়ার ঐ সুদেতেন অঞ্চল।

বেশ, চেকোশ্লোভাকিয়াকে আমরা বলে দেব। নেহাত গাঁইগুঁই করলে আচ্ছা করে ধমক দিয়ে রাজী করিয়ে দেব। তবে দেখো বাপু, আর যেন ঝামেলা করো না! আমরা শান্তিপ্রিয় লোক। আমাদের একটু শান্তিতে থাকতে দাও। জার্মান ঐতিহাসিকের ভাষায়ঃ

'At the Munich Conference (September 29th-30th) Hitler, Mussolini, Chamberlain and Daladier agreed that Germany should take over the Sudeten German areas by stages during the first days of October. Czechoslovakia was to be given a guarantee for her new frontiers.' [German History, 1933-45: H. Mau & H. Krausnick: P.—90]

শান্তিরক্ষার চমৎকার ব্যবস্থা করে দুজনেই আবার নিজ নিজ দেশে ফিরে গেলেন মনের আনন্দে। যাক, আর ভাবনা নেই। এবার চিরস্থায়ী শান্তি।

কোথায় শান্তি! কোথায় কি!

দুদিন যেতে না যেতেই আবার অশান্তি। সেবার তোমরা মেমেল কেড়ে নিয়েছিলে আমাদের হাত থেকে। ওসব চলবে না। ঐ মেমেল আমার ফেরত চাই। আর চেকোশ্লোভাকিয়ার বাকি অংশটুকুও চাই। ও দুটোই আমার দরকার।

তাই মেনে নিতে হল সবাইকে। উপায় কি! সাধ করে কে আর নিজের ঘাড়ে অশান্তি ডেকে আনতে চায়!

সারা ইয়োরোপ তখন তটস্থ।

এবার কার পালা? এখানেই কি শেষ? না কি আরো কিছু চাই ওর?

না না, আর কিছু চাইনে। তবে ঐ ডানজিগ্। তোমরাই বলো যে, ওটা আমাদের ছিল কিনা! বলো, এখনও শতকরা সাতানব্বই জনই ওখানে জার্মান কিনা! সুতরাং,—না না, যা ভেবেছ তা নয়। বিবাদ আমি কারো সঙ্গে করতে চাইনে। শুধু ডানজিগের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য মোটর-চলাচলের একটা সুপার হাইওয়ে, আর একটা রেললাইন আমাদের পাততে দিতে হবে পোল্যাণ্ডের জমির ওপর দিয়ে। কারণ, ওখানে যাবার আমাদের কোন পথ নেই। ব্যস, এই করিডোরটুকু পেলেই আমি খুশি। আর কখনো আমি কিছু চাইব না তোমাদের কাছে। এই লাস্ট। কথা দিলাম!

ডানজিগ্ সম্বন্ধে হিটলারের এই দাবীর সবটাই কি অসঙ্গত ছিল? না কি কিছুটা যুক্তিও ছিল তার পেছনে?

এ সম্বন্ধে কোনরকম মন্তব্য না করে আমি শুধু ডানজিগের তখনকার সময়ের পরিস্থিতি সম্বন্ধে কয়েকটি লাইন এখানে তুলে দিচ্ছি অন্য একজন বিদেশী ঐতিহাসিকের লেখনী থেকেঃ

'...Neither were the German claims to the free state of Danzig unfounded, a city of 4,50,000 souls which had been separated from Germany without a plebiscite. 97 percent of the population were German, two percent Polish, one percent of other nationalities'. [A Basic History of Germany : Hubertus Prince zu Lowenstein : P.—161]

ওদিকে ততক্ষণে গলা ফাটিয়ে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছেন হিটলারের অন্তরঙ্গ সহচর, প্রচার-সচিব ডঃ গোয়েবলস্।

প্রচারের সাহায্যে কি করে যে জনমনে আগুন ধরিয়ে দিতে হয়, সে সম্বন্ধে তিনি ছিলেন রীতিমত অভিজ্ঞ। পৃথিবী তার প্রমাণ পেয়েছে বার বার।

এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। রেডিও এবং বিভিন্ন প্রচারপত্রের মাধ্যমে তিনিও এবার রব তুললেন ফুয়েরারের সঙ্গে গলা মিলিয়ে।

ডানজিগ্! ডানজিগ্! ডানজিগ্! ডানজিগ্ আমাদের। ডানজিগ্ আমরা চাই-ই!

অসম্ভব! ডানজিগ্ আমাদের। কিছুতেই আমরা ডানজিগ্ ছাড়ব না। বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।

রাজী হল না পোল্যাণ্ড। হওয়া সম্ভবও নয়। তাছাড়া ইংল্যাণ্ড ও

ফ্রান্সের সঙ্গে সে মৈত্রী-সূত্রে আবদ্ধ। তেমন কিছু হলে চুক্তিমত তারা তাকে সাহায্য করতে বাধ্য। তাহলে ভয়টা কিসের?

বটে! চোখ পাকিয়ে তাকালেন হিটলার। ঠিক আছে, দেখা যাবে!

পরিস্থিতি লক্ষ্য করে চুক্তির হিড়িক পড়ে গেল ইয়োরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে। ভয় নেই। তোমার বিপদে আমি আছি। কিন্তু দেখো ভাই, আমার বেলায় যেন মুখ ফিরিয়ে থেকো না!

কি ইংল্যান্ড, কি ফ্রান্স, সবার লক্ষ্য রাশিয়ার দিকে।

নীতিগত দিক থেকে যতই অমিল থাক না কেন, ইয়োরোপের এই শ্বেত-ভল্লুকের অসীম শক্তির কথা কে না জানে!

এখন সবচাইতে বড় প্রশ্ন—আত্মরক্ষা। সুতরাং তত্ত্বকথা আপাতত শিকেয় তুলে রেখে যে করে হোক, রাশিয়ার সঙ্গে একটা চুক্তি করা চাই।

শুরু হল আলোচনা-বৈঠক।

মাসের পর মাস কেটে গেল। খানাপিনাও কম হল না। কিন্তু কোথায় চুক্তি? কোথায় কি?

পদে পদে সংশয়। পদে পদে অবিশ্বাস। হাজার হোক ওরা কমিউনিস্ট। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির কাছে ওরা অস্পৃশ্য। ওদের বিশ্বাস কি!

তাছাড়া অত ব্যস্ত হবারই বা কি আছে। দেখাই যাক না আরো কিছু-দিন। তারপর যা হয় পরে ভেবে-চিন্তে করা যাবে।

দেখতে আর হল না, মল্লিকা। তার আগেই হঠাৎ একদিন সারা পৃথিবী চমকে উঠল অভাবনীয় একটা খবর শুনে।

হিটলার নাকি এর মধ্যেই তলে তলে দোস্তি করে ফেলেছেন রাশিয়ার সঙ্গে। মাসের পর মাস সময় লাগেনি। খানাপিনারও দরকার হয়নি। মাত্র একদিনেই নাকি সব শেষ।

'On August 23rd, Ribbentrop flew to Moscow and the same night signed a German-Soviet non-aggression pact with Molotov. When the news of the German-Soviet pact broke on August 23rd it was a shock to the whole world.' [German History, 1933-45 : P.—99-101]

সত্যিই এটা একটা বিরাট আঘাত মল্লিকা। বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পক্ষে। আমরা যেখানে মাসের পর মাস চেষ্টা করেও কিছু করতে পারিনি, হিটলার কিনা সেখানে চোখের নিমেষেই এতবড় কাজটা গুছিয়ে নিলে! এককথায় একেবারে দশ বছরের জন্য অনাক্রমণ চুক্তি! নাঃ, সংসারে আর কাউকেই বিশ্বাস নেই। হিটলার, স্ট্যালিন—কাউকেই না।

রুদ্ধশ্বাসে দিন গুনতে লাগল গোটা ইয়োরোপ। একমাত্র ভয় ছিল রাশিয়া। সেই রাশিয়া সম্বন্ধেও হিটলার এখন নিশ্চিন্ত। এ অবস্থায় তিনি কি এত সহজে রেহাই দেবেন পোল্যান্ডকে?

উত্তর পাওয়া গেল ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ভোর-রাত্রে।

হঠাৎ লক্ষ লক্ষ সুশিক্ষিত নাৎসী সৈন্য পোল্যাণ্ডের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দুর্বার বেগে। কার সাধ্য সেই বিরাট যান্ত্রিক বাহিনীর গতিরোধ করে!

দেখতে দেখতে অসংখ্য বোমারু বিমান ও ট্যাঙ্কবাহিনীর সাহায্যপুষ্ট নাৎসী সৈন্যদল পূর্ব-প্রুশিয়ার সাইলেসিয়া ও শ্লোভাকিয়ার দিক দিয়ে ঢুকে গেল পোল্যাণ্ডের অনেকখানি অভ্যন্তরে।

প্রতিবাদ জানাল ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড। অস্ত্র-সংবরণ কর সখা! পোল্যাণ্ডের সঙ্গে আমরা মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ, সে-খবর তুমিও জান। এ অবস্থায় পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হলে আমাদেরও একটা দায়িত্ব রয়েছে বৈকি!

সুতরাং শান্ত হও। এ সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য কাল এগারোটার মধ্যে আমাদের জানালে 'বড়ই বাধিত হইব'।

কোথায় জবাব? কোথায় কি? তিনদিক থেকে সাঁড়াশী-আক্রমণের চাপে ততক্ষণে পোল্যাণ্ড বাহিনী পিছু হটতে শুরু করেছে প্রতিটি ক্ষেত্রে।

বাধ্য হয়েই ৩রা তারিখে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সকে আসরে নামতে হল সম্মানের খাতিরে।

আর হিটলার!

দৃপ্তকণ্ঠে তিনি তাঁর বক্তব্য রাখলেন জাতির উদ্দেশে। আজ থেকে আমিই জার্মান রাইখের প্রথম সৈনিক। যুদ্ধে জয়লাভ না করা পর্যন্ত পবিত্র এই সৈনিকের বেশ আমি কোনদিনই ত্যাগ করব না।

'I am from now on just the first soldier of the German Reich. I have once more put on that coat that was most sacred and dear to me. I will not take it off again, until victory is secured, or I will not survive the outcome.'

ঐতিহাসিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এই হল পটভূমিকা।

১৭ই সেপ্টেম্বর আর একবার বিশ্বাসী স্তম্ভিত হল অভাবনীয় একটি খবর শুনে।

শুধু নাৎসী বাহিনী নয়, রুশ-সীমান্তের দিক থেকে লালফৌজও নাকি অনেকদূর পর্যন্ত ঢুকে পড়েছে পোল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে। পোল্যাণ্ডে অবস্থিত রুশ নাগরিকদের ধন-প্রাণ রক্ষার জন্য নাকি তাদের এই অপ্রত্যাশিত অভিযান।

সবাই অবাক। অবাক হিটলারও সেদিন কম হননি। খুব দেখালে দাদা! এমন তো কথা ছিল না। ঠিক আছে, পরে এর মীমাংসা হবে।

রাজধানী ওয়ারশ আত্মসমর্পণ করল ২৭শে সেপ্টেম্বর। এবার ভাগা-ভাগির পালা।

শিল্পকেন্দ্র আর কয়লার খনিগুলি পড়ল জার্মানীর ভাগে। আর পোলিশ ইউক্রেনের গমের ভূমি ও তেলের খনি ইত্যাদি সব কিছুই গেল রাশিয়ার দখলে।

তখনো প্রতিটি পোল নরনারীর দৃষ্টি পশ্চিম ইয়োরোপের দিকে নিবদ্ধ।

এই বুঝি তাদের সাহায্যের জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে ব্রিটিশ এবং ফরাসী বিমান এগিয়ে এল আকাশের বুকে ডানা মেলে। হয়তো ইতিমধ্যেই ওদের আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছে পশ্চিম দিক থেকে। চুক্তি অনুযায়ী ওরা যে তাদের সাহায্য করতে বাধ্য!

কোথায় সাহায্য, আর কোথায় কি? একমাত্র গালভরা প্রতিশ্রুতি ছাড়া তেমন কোন চেষ্টাই দেখা গেল না ব্রিটিশ বা ফ্রান্সের দিক থেকে।

অথচ সুযোগ ষোলআনাই ছিল। মাত্র তেইশ ডিভিশন জার্মান সৈন্য সেদিন রাখা হয়েছিল পশ্চিম-সীমান্তে। তাদের হটিয়ে মূল জার্মান ভূখণ্ডে প্রবেশ করা ফরাসী বাহিনীর পক্ষে সেদিন মোটেই কষ্টকর ছিল না। কিন্তু সে চেষ্টাই কোনদিন করেনি ফরাসী বাহিনী।

কারণ—ভয়। ভাবটা এই যে, একা একা আগ বাড়িয়ে মার খেতে যাই কেন? আগে ব্রিটিশ বাহিনী আসুক, তারপর লড়াই কাকে বলে দেখিয়ে দেব।

সত্যিই দেখিয়েছিল, মল্লিকা। গত বিশ্বযুদ্ধে এমন লড়াই বোধ হয় আর কেউ কোনদিনই দেখাতে পারেনি। সেকথা পরে আসছে।

পোল্যাণ্ডের পতন হল। কিন্তু তারপর? এবার কার পালা?

উত্তর মিলল ১৯৪০ সালের ৯ই এপ্রিল।

কোনরকম প্রস্তুত হবার সুযোগ না দিয়ে হঠাৎ সেদিন দুর্ধর্ষ নাৎসী বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল ডেনমার্ক ও নরওয়ের ওপর।

ব্রিটিশ ও ফরাসী বাহিনী নাকি নরওয়ের নার্ভিক বন্দরকে ঘাঁটি করে খাস জার্মানী আক্রমণের পরিকল্পনা করেছে। সুতরাং যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নরওয়েকে নিজের দখলে রাখা দরকার।

ডেনমার্ক বশ্যতা স্বীকার করল সঙ্গে সঙ্গেই।

বাকি রইল নরওয়ে। কিন্তু দুর্ধর্ষ জার্মান বাহিনীকে প্রতিরোধ করার মতো শক্তি তার কোথায়?

কেবলমাত্র মুখে উৎসাহ দেওয়া ছাড়া কি ফ্রান্স, কি ইংল্যাণ্ড, কেউ সেদিন এতটুকুও সহায়তা করেনি পোল্যাণ্ডকে।

তা বলে এবার কিন্তু আর ইংল্যাণ্ডের পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব হল না।

নরওয়ে থেকে ইংল্যাণ্ডের দূরত্ব কতটুকুই বা! এ অবস্থায় নরওয়ে হাত-ছাড়া হয়ে গেলে যে সত্যিই ভয়ের কথা!

অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য পরদিনই (১০ই এপ্রিল) বিরাট বিরাট সব যুদ্ধ-জাহাজসহ এগিয়ে এল ইংল্যাণ্ড।

হিটলারকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে, নৌ-শক্তিতে ইংল্যাণ্ড চিরদিনই অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

হায় ভগবান! হিটলারকে শিক্ষা দিতে এসে 'হাণ্টার' আর 'হার্ডি' যুদ্ধ-

জাহাজ দুটিকে যে এমন করে খোয়াতে হবে সে কথা কি সেদিন নৌ-বলে বলীয়ান ইংল্যাণ্ড একবারও ভাবতে পেরেছিল?

হল কিন্তু তাই। বাধ্য হয়েই শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীকে ফিরে যেতে হল হিটলারের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে।

১৫ই এপ্রিল তারিখে ব্রিটিশ বাহিনী অবতরণ করল নরওয়ের মাটিতে। জলযুদ্ধে হিটলারকে ঘায়েল করা সম্ভব হয়নি। দেখা যাক, এবার স্থলযুদ্ধে কিছু করা যায় কিনা!

দেখা গেল দিন কয়েকের মধ্যেই। সেই একই অবস্থা। বেধড়ক মার খেয়ে আবার সেই ইংল্যাণ্ডে।

বেগতিক দেখে রাজা হাকন সপরিবারে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন ইংল্যাণ্ডের মাটিতে। যুদ্ধও সেখানেই শেষ।

রাজা হাকন পলাতক। মন্ত্রিবর্গও পালিয়েছেন তাঁর পিছু পিছু। শাসন-ব্যবস্থা বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই। ফলে, সারা দেশ জুড়ে বিশৃংখলা।

এবার শাসনভার গ্রহণ করলেন নাৎসী সমর্থক মেজর কুইস্‌লিং। নরওয়ের ভিডকুন কুইস্‌লিং।

ব্রিটিশের ভাষায়—'বিশ্বাসঘাতক কুইস্‌লিং'। পরবর্তী কালে এমনি অনেককেই তারা আখ্যা দিয়েছিল এই কুইস্‌লিং বলে। বিশেষ করে তাঁদের, যাঁরা সেদিন কোনরকম সহযোগিতা করতে রাজী হননি ব্রিটিশের সঙ্গে।

কুইস্‌লিং বিশ্বাসঘাতক। বিজয়ী পক্ষের অভিমত তা-ই। নরওয়েবাসীরা এ ব্যাপারে তাদের সংগে একমত কিনা সে-তথ্য অবশ্য আমার জানা নেই।

হয়তো তাই। হয়তো বা অন্য কিছুও হতে পারে। তবে যুদ্ধশেষে বিচারসভায় দণ্ডায়মান এই লোকটির মুখ থেকে কিন্তু একটি অদ্ভুত কথা শোনা গিয়েছিল, মল্লিকা। নিজের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা শুনে দীপ্তকণ্ঠে সেদিন তিনি জুরীদের লক্ষ্য করে বলেছিলেনঃ

'আমি যদি বিশ্বাসঘাতক হয়ে থাকি, তবে আমার জন্মভূমি নরওয়ের ঘরে ঘরে যেন যুগ যুগ ধরে এমনি বিশ্বাসঘাতক জন্মায়।'

প্রথমে পোল্যাণ্ড। তারপর ডেনমার্ক এবং নরওয়ে।

এবার কার পালা?

ফ্রান্স। ওদের ইংলিশ চ্যানেল-সংলগ্ন ক্যালে, বুলোন, শেরবুর্গ ইত্যাদি বন্দরগুলি রীতিমত বিপজ্জনক। খাস ইংল্যাণ্ড থেকে বন্দরগুলির দূরত্ব খুবই সামান্য। ওদিক থেকে যে বিপদ আসবে না, তা কে বলতে পারে!

না, ইংল্যাণ্ডকে সে সুযোগ দিলে চলবে না। আক্রমণই আত্মরক্ষার একমাত্র পথ। সুতরাং আগে থেকেই আক্রমণ চালিয়ে সে-পথ ওদের বন্ধ করতে হবে।

কিন্তু ম্যাজিনো লাইন! জার্মানী ও বেলজিয়ামের সীমানা ঘিরে ফ্রান্স

যে এক শক্তিশালী দুর্গশ্রেণী ম্যাজিনো লাইন গড়ে তুলেছে, তা অতিক্রম করার উপায় কি? ও যে একেবারেই দুর্ভেদ্য।

ভাবনায় পড়ে গেলেন হিটলার। ফ্রান্স চাই-ই! কিন্তু ম্যাজিনো লাইন! ম্যাজিনো লাইনের কি হবে? দূরপাল্লার কামান, ভারী ট্যাঙ্ক, গোয়েরিং-এর বিমান-বহর, সবই যে ওখানে অচল! কি করা যায় এখন এ অবস্থায়!

একই চিন্তা তখন বড় বড় জেনারেলদের মাথায়। ফুয়েরারের হুকুম, ফ্রান্স তাঁর চাই-ই। কিন্তু ঐ ম্যাজিনো লাইনের কি হবে? ওটা অতিক্রম করার উপায় কি?

—উপায় আছে। সাহস করে একদিন বললেন অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত সেনাপতি ভন ম্যানস্টাইন, ফ্রান্স দখল করা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়।

—বটে! কথাটা একদিন কানে গেল হিটলারের, ডাকো তো একবার ছোকরাটাকে। একটু বাজিয়ে দেখা যাক।

সেই একই কথা ম্যানস্টাইন ব্যক্ত করলেন হিটলারের কাছে, এ তো খুব সোজা কাজ ফুয়েরার।

—সোজা কাজ! খেঁকিয়ে উঠলেন হিটলার, ম্যাজিনো লাইন অতিক্রম করাটা তোমার কাছে সোজা কাজ হল?

—ম্যাজিনো লাইন আমরা অতিক্রম করতে যাব কেন? আমরা তো ফ্রান্স আক্রমণ করতে যাচ্ছি নে। আক্রমণ করব বেলজিয়াম। ওখান থেকে আর্দেনেশ পর্বতমালা পেরিয়ে সোজা ফ্রান্স। অবশ্য ওখানেও ম্যাজিনো লাইন রয়েছে, তবে পর্বতসঙ্কুল জায়গা বলে লাইনটা ওখানে খুবই দুর্বল।

—বোগাস! এককথায় উড়িয়ে দিলেন হিটলার, ঐ উঁচু পর্বতসংকুল এলাকায় ট্যাঙ্ক, প্যানৎসার বাহিনী—সব কিছু অচল।

—মোটেই না ফুয়েরার। আপনি একবার ফিল্ড-মার্শাল গুডেরিয়ানকে ডেকে এনে প্ল্যানটা বুঝিয়ে বলুন। তারপর দেখুন যে, তিনি কি বলেন!

তলব পেয়ে ছুটে এলেন প্যানৎসার বাহিনীর আবিষ্কর্তা, ট্যাঙ্কবিশারদ ভন গুডেরিয়ান। আদেশ করুন ফুয়েরার। আমি সব কিছুর জন্য প্রস্তুত।

প্রস্তুত নন সেনাবাহিনীর হাই-কম্যান্ড। অতি অবাস্তব প্ল্যান। এর কোন অর্থই হয় না। আমাদের ধারণা, এ-পথে আক্রমণ চালাতে গেলে এক বছরের আগে কিছুতেই আমরা ফ্রান্স দখল করতে পারব না।

—আমি পারব। গুডেরিয়ানের সংক্ষিপ্ত উত্তর, এক বছর নয়, খুব বেশি হলে দুমাস।

—দুমাস! বেশ, তাই হবে। গো অন। মার্চ...

১৯৪০ সাল। ১০ই মে।

শুরু হল জার্মানীর নূতন অভিযান। সেই শেষরাত্রে। লক্ষ্য—বেলজিয়াম, ইংল্যান্ড আর লুক্সেমবার্গ।

যদিও আসল যুদ্ধ ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে, তবু যুদ্ধ শেষ না

হওয়া পর্যন্ত এগুলোও হাতে রাখা প্রয়োজন। বিপক্ষ দল যে একদিন ওখান দিয়েই পাল্টা-আঘাত হানবে না, তা কে বলতে পারে!

প্রথমেই আত্মসমর্পণ করল লুক্সেমবার্গ। তারপর হল্যান্ড। আমাদের রেহাই দাও বাপু। আমরা কারো কোন ব্যাপারে নেই।

আত্মসমর্পণ করল না বেলজিয়াম। ফ্রান্সের ম্যাজিনো লাইনের চাইতে আমাদের ফোর্ট এবেন-এমাল কেল্লাও এমন কিছু কম যায় না। আসুক না জার্মানরা। মজাটা টের পাইয়ে দেব'খন।

হায় ভগবান! প্রথম দিনেই এবেন-এমাল কেল্লা বেদখল। হাজার হাজার প্যারাসুটবাহী সৈন্য যে এমন বিনা নোটিশে হুট্ করে আকাশ থেকে নেমে আসবে, তা কে জানত!

ছুটে এল ব্রিটিশ বাহিনী। ছুটে এল ফরাসী বাহিনী। কিন্তু সব বৃথা। দুর্ধর্ষ ঝটিকা বাহিনীর প্রচণ্ড গতিবেগের কাছে সে বাধা আর কতক্ষণ? তাই বাধ্য হয়েই তারা পিছু হটতে লাগল ফ্রান্সের সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত ডানকার্ক বন্দরের দিকে।

মূল ফ্রান্স তখনো নিশ্চিন্ত। আসুক না জার্মান বাহিনী। আমাদের ম্যাজিনো লাইন থাকতে ভাবনা কি!

আট শ' কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই ম্যাজিনো লাইন সত্যিই দুর্ভেদ্য। সীমানাও বহুদূর-বিস্তৃত।

ফ্রান্স-সীমান্তের সুইজারল্যান্ড প্রান্ত থেকে শুরু করে মিউজ নদীর পূবে মণ্টমেডি পর্যন্ত বিস্তৃত এই দুর্গশ্রেণী বছরের পর বছর অবরুদ্ধ হয়ে থাকলেও অসুবিধের কোন প্রশ্ন নেই। কারণ, এর ভূগর্ভস্থ কক্ষে সঞ্চিত রাখা হয়েছে অপর্যাপ্ত খাদ্য ও প্রচুর অস্ত্র-সম্ভার। এ অবস্থায় মানুষ তো দূরের কথা, সামান্য মশা-মাছির পক্ষেও এই ম্যাজিনো লাইন ভেদ করা সম্ভব নয়।

কিন্তু একি! কাণ্ড দেখে চোখে পলক ফেলতেও বুঝি ভুলে গেল ফরাসী সমরনায়কগণ।

বেলজিয়ামের ভেতর দিয়ে একটি জার্মান বাহিনী মিউজ-নদী পার হয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল স্থান সেডানের দিকে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে আসছে কেন?

তবে কি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসই ওদের লক্ষ্য?

ব্যাপারটা যেমন আকস্মিক, তেমনই অপ্রত্যাশিত।

এত আকস্মিক যে, নদীর সেতুগুলি পর্যন্ত ভেঙে দেবার মতো অবকাশ পেলেন না ফরাসী প্রধান সেনাপতি জেনারেল গ্যামেলাঁ। ফলে, একেবারে খোলা মাঠ।

হঠাৎ বেলজিয়ামের রাজা তৃতীয় লিওপোল্ড আত্মসমর্পণ করলেন জার্মান বাহিনীর কাছে।

ফল হল আরো মারাত্মক। উপকূলস্থ বুলোন ও ক্যালে বন্দর আগেই হাত-ছাড়া হয়ে গেছে। বাকি শুধু ডানকার্ক। নাৎসী বাহিনীর কাছ থেকে ক্রমা-

গত তাড়া খেয়ে খেয়ে ব্রিটিশ জেনারেল লর্ড গর্ট এবার সেই ডানকার্কের দিকেই পিছিয়ে যেতে লাগলেন তড়িৎগতিতে।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, সব কিছু গেলেও ডানকার্ক বন্দর এখনো হাতছাড়া হয়নি। কোনরকমে একবার ওখানে গিয়ে চ্যানেল পেরিয়ে ওপারে যেতে পারলে তবেই রক্ষা! নইলে একটি সৈন্যও বাঁচানো যাবে না দুরন্ত ঐ নাৎসী বাহিনীর হাত থেকে।

কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব! তিন লক্ষ আটত্রিশ হাজার সৈন্যকে পার করার মতো জাহাজ কোথায়?

জাহাজ থাকলেই বা কি! ভিড়বে কোথায়? গোটা বন্দরটাই যে অকেজো হয়ে পড়েছে বোমার আঘাতে! না, কোন আশা নেই। সবাইকে আজ মৃত্যু-বরণ করতে হবে জ্বলন্ত এই ডানকার্কের মাটিতে দাঁড়িয়ে।

দেখতে দেখতে রাত্রি নেমে এল ডানকার্কের ওপর। অভিশপ্ত রাত্রি।

গোটা ডানকার্ক তখন দাউ-দাউ করে জ্বলছে। আকাশ-ছোঁয়া কালো ধোঁয়ার কুন্ডলীতে দুহাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যায় না। শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া! রাশি রাশি কুন্ডলীকৃত ধোঁয়া!

তখনো টেলিফোনের একটি ক্ষীণ যোগাযোগ অবশিষ্ট ছিল ডানকার্ক ও ইংল্যান্ডের মধ্যে। তারই সাহায্যে সেনাপতি লর্ড গর্ট নিজেদের এই শোচ-নীয় পরিস্থিতির কথা জানালেন মন্ত্রিসভার কাছে। তিন দিক থেকে ঘেরাও হয়ে আছি জার্মানদের হাতে। সামনে অথৈ সমুদ্র। এখন ভগবান ভরসা।

সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ড থেকে ক্যাপ্টেন টেন্যান্টকে পাঠানো হল ডানকার্কের উদ্দেশে। সঙ্গে ছোট-বড় ১৩০ খানি জাহাজ। যে করে হোক, ডানকার্ক পেঁছে সেনাবাহিনীকে উদ্ধার করতে হবে। নইলে আমাদের সমূহ বিপদ।

সত্যিই বিপদ। এমন ভয়ঙ্কর বিপদে বোধহয় আর কোনদিনও পড়তে হয়নি ব্রিটিশ বাহিনীকে।

মাথার ওপর মার্শাল গোয়েরিং-এর মারাত্মক লুফৎওয়াফে (Luft-waffe) ও স্টুকা বিমান-বহর। একটানা বোমা-বর্ষণ চলছে তো চলছেই। নিচে তিন দিক থেকে গুডেরিয়ান, রোমেল ও রুনস্ট্যান্ডের প্যানৎসার বাহিনী ছুটে আসছে দৈত্যের মতো। বেষ্টনী ছোট হয়ে আসছে ক্রমশ। আর রক্ষা নেই! মৃত্যু অনিবার্য!

আশঙ্কা অমূলক নয়, মল্লিকা। জয়ের আনন্দে সেকি উল্লাস তখন জার্মান বাহিনীর! এবার কোথায় যাবে ব্রিটিশ-সিংহ? না, কাউকে আজ প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে দেওয়া হবে না ডানকার্ক থেকে। একটি প্রাণীকেও না। গোটা ইংলিশ চ্যানেলের জল আজ লালে লাল করে দিতে হবে ব্রিটিশের রক্তে। চলো সবাই এগিয়ে।

হল্ট! হল্ট! হল্ট! বেশি নয়, মাত্র দুদিন তোমরা একটু বিশ্রাম কর। তারপর আবার এগিয়ে যাও।

থমকে দাঁড়ালেন জার্মান সেনানায়কবৃন্দ। কার কণ্ঠ! কে তাঁদের থামতে আদেশ দিচ্ছে এমন করে!

না কোথাও কোনরকম অস্পষ্টতা নেই। কোথাও এতটুকু কুয়াশার জাল নেই। আদেশ দিয়েছেন স্বয়ং হিটলার। জার্মানীর ভাগ্য-বিধাতা হিটলার।

কিন্তু কেন? এই চরম মুহূর্তে হেলায় হারালে আর কোনদিনই যে ফিরে পাওয়া যাবে না! কিন্তু উপায় কি? আদেশ দিয়েছেন স্বয়ং ফুয়েরার। এর পেছনে তাঁর কোন নতুন প্ল্যান আছে কিনা কে জানে!

কাণ্ড দেখে অবরুদ্ধ ব্রিটিশ বাহিনী অবাক। একি! জার্মান ট্যাঙ্কগুলি এতদূর পর্যন্ত এসে হঠাৎ এভাবে থেমে গেল কেন? স্টুকা বিমানগুলিই বা তাদের ওপর আর বোমা-বর্ষণ করছে না কেন? কি ব্যাপার!

ওদিকে ততক্ষণে ইংল্যান্ড থেকে আগত ক্যাপ্টেন টেন্যান্ট একটি জাহাজকে অতিকষ্টে তীরে আনতে সক্ষম হলেন বন্দরের পূর্বদিকের বাঁধের কাছে। সহজে নয়। কয়েক ঘণ্টা চেষ্টার পরে।

সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনে খবর চলে গেল ইংল্যান্ডে। জাহাজ পাঠাও। আরো জাহাজ। বড় নয়, ছোট ছোট জাহাজ, যেগুলি সহজেই কিনারে আসতে পারবে। একটি-দুটি নয়, শত শত, হাজার হাজার জাহাজ চাই। ইংল্যান্ডের প্রতিটি জাহাজ, প্রতিটি স্টীমার, লঞ্চ, ট্রলার, মাছধরা জাহাজ, সব পাঠিয়ে দাও এখানে। অবিলম্বে।

দেখতে দেখতে শত শত জাহাজের মিছিল এগিয়ে এল ডোভার থেকে। অসামরিক ব্যক্তিরাও পিছিয়ে রইলেন না জাতির এই চরম দুর্দিনে। তাঁরাও এগিয়ে এলেন তাঁদের ব্যক্তিগত লঞ্চ, বোট, জেলে বোট ইত্যাদি নিয়ে। সবার মুখে একই শপথ। এভাবে আমরা আমাদের ছেলেদের মরতে দেব না। তাদের আমরা রক্ষা করবই।

চ্যানেলের ওপারে ডোভার, এপারে ডানকার্ক। মাঝখানে শত শত জাহাজ। আসছে তো আসছেই। আবার ফিরে যাচ্ছে। আবার আসছে সারি বেঁধে। যেন শেষ নেই এই আসা-যাওয়া মিছিলের।

সবার সমবেত চেষ্টায় অবশিষ্ট প্রতিটি সৈন্য ফিরে যেতে সক্ষম হল ইংল্যান্ডে। সঙ্গে ফরাসী সৈন্যও গেল প্রায় দেড়লক্ষ। সব শেষে ক্যাপ্টেন টেন্যান্ট। বিদায় ডানকার্ক, বিদায়! আজকের এই ভয়ঙ্কর স্মৃতি দুঃস্বপ্নের মতো আমার মনে থাকবে চিরকাল। অভিশপ্ত এই চব্বিশে মে-কে আমি কোনদিনই ভুলব না।

অবশ্য সমর-সম্ভার বলতে যা কিছু সবই হারাতে হয়েছে। কিছুই সঙ্গে আনা যায়নি। এমন কি, ইউনিফর্ম পর্যন্ত নেই অনেকের গায়ে। বেশির ভাগ সৈন্যকেই জাহাজে উঠতে হয়েছে উলঙ্গ হয়ে সাঁতার দিয়ে। তবু প্রাণ তো বেঁচেছে। এই বা কম কি!

বিদেশী ঐতিহাসিকের ভাষায়ঃ

'Hitler halted the middle Army Group before Calais for two days. Thanks to this, the British gained time to secure a bridgehead at Dunkirk, which did not fall into German hands until June 24th.

By then greater part of the British Expeditionary Force and parts of the French Army, more than three hundred and fifty thousand men in all, had managed to escape to England, albeit by abandoning all their heavy equipment.' [German History 1933-45 : Hermann Mau & Helmut Krausnick : P.—110]

লক্ষ লক্ষ সৈন্য ডানকার্কের শ্মশানভূমি থেকে ফিরে গেল অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়ে।

নিঃসন্দেহে এ কৃতিত্ব ব্রিটিশের। সমস্ত নৌ-শক্তি, সমস্ত সওদাগরী জাহাজ, সমস্ত সাধারণ জলযান জড় করে যেভাবে তারা মাত্র দুদিনের মধ্যে অবরুদ্ধ সৈন্যদের উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল, যুদ্ধের ইতিহাসে সত্যিই তা অভূতপূর্ব। একমাত্র ব্রিটিশ ছাড়া আর কারো পক্ষেই বুঝি সেদিন এতবড় দায়িত্ব বহন করা সম্ভব ছিল না।

ধন্য ধন্য পড়ে গেল ব্রিটিশ সেনাপতি লর্ড গর্ট-এর নামে। এ অবস্থায় লক্ষ লক্ষ সৈন্যসহ ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে নিজের দেশে ফিরে যাওয়া চাট্টি-খানি কথা নয়! সেদিক থেকে সত্যিই অসাধ্য সাধন করেছেন তিনি। তাই এবার তাঁকে ভূষিত করা হল নতুন মর্যাদায়। কারণ, ব্রিটিশের ভাষায় এটা নাকি 'glorious retreat' অর্থাৎ—গৌরবজনক পশ্চাদপসরণ।

সারা পৃথিবীর চোখে মুচ্‌কি হাসি। হিটলারের দয়ায় প্রাণ নিয়ে পালানোটাও যে গৌরবজনক ব্যাপার হতে পারে, এ তথ্য সত্যিই জানা ছিল না তাদের।

ডানকার্কের পতন হল ২৪শে মে। এক বছর নয়। দুমাসও নয়। মাত্র চৌদ্দ দিনে।

কাণ্ড দেখে হিটলার পর্যন্ত হতবাক। বলে কি! মাত্র চৌদ্দ দিনে! নাঃ! সত্যিই অসাধ্য সাধন করেছে তাঁর প্যানৎসার বাহিনীগুলি। ওদের তুলনা নেই।

আর প্যারিস! না, তারও কোন আশা নেই। চার হাজার ট্যাঙ্ক ও অগুন্তি সাঁজোয়া গাড়িসহ বিশ লক্ষ সৈন্যের একটি বিরাট বাহিনী ইতি-মধ্যেই পৌঁছে গেছে প্যারিসের উপকণ্ঠে। বেশ বোঝা যায় যে, প্যারিসের পতন আসন্ন।

পরিস্থিতি আরো ঘোরালো করে তুলল ইতালী।

দুই বন্ধু। হিটলার আর মুসোলিনী।

একজন জার্মানীর ভাগ্য-বিধাতা, অন্যজন ইতালীর। বহুদিন থেকেই তাঁরা মৈত্রী-সূত্রে আবদ্ধ। যাকে বলে হরিহর-আত্মা।

ইচ্ছে করেই এতদিন চুপচাপ ছিলেন মুসোলিনী। ভাবটা এই যে,—এত ব্যস্ত কেন? যাক না আরো কিছুদিন! সময় হোক, তারপর দেখা যাবে!

পাঁজিতে ভাল দিনক্ষণ পাওয়া গেল ১০ই জুন। ব্যস, আর কথা নেই। চালাও এবার!

সঙ্গে সঙ্গেই হুকুম তামিল।

ওদিকে প্যারিস তখন যায় যায়। এদিকে পেছন থেকে ইতালীর জোর ধাক্কা। এ অবস্থায় ফ্রান্সের প্রতিরোধ-শক্তি আর কতক্ষণ!

প্রথমেই প্যারিসকে ঘোষণা করা হল অরক্ষিত নগরী বলে। ফরাসী-বিপ্লবের স্মৃতি-বিজড়িত সুন্দরী এই প্যারিস নগরী গড়ে উঠেছে বহু শতাব্দীর অধ্যবসায়ের ফলে। বোমা-বর্ষণ করে তোমরা এই মহৎ সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দিও না। নিতে হয়, এমনিই বরং নিয়ে নাও। তা বলে ধ্বংস কিছুতেই নয়। আমরা আত্মসমর্পণ করছি তোমাদের কাছে। যুদ্ধ আমরা চাই নে। সন্ধি চাই।

প্রস্তাব নিয়ে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন ভার্দুন-বিজয়ী বীর, নব্বুই বছরের বৃদ্ধ, মার্শাল পেঁতা। সেই পেঁতা, যিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিলেন ভার্দুন রণাঙ্গনে। আজ তাঁর কণ্ঠে ভীরুর আকুতি। আমরা সন্ধি চাই।

সন্ধি! বেশ, তাহলে সন্ধির শর্ত শোন। তোমাদের ট্যাঙ্ক, কামান, সাঁজোয়া গাড়ি ইত্যাদি যাবতীয় অস্ত্র-শস্ত্র অবিলম্বে আমাদের কাছে জমা দিতে হবে।

যুদ্ধ-জাহাজগুলিকে এক্ষুণি পাঠিয়ে দিতে হবে আমাদের কোন নৌ-বন্দরে। তাছাড়া উত্তর ও পশ্চিমের সমস্ত সমুদ্রোপকূল এখন আমাদের দখলেই থাকবে।

আর ইতালী যে-সমস্ত জায়গা দখল করেছে, সেখানে আপাতত তাদের সৈন্যই মোতায়েন থাকবে।

সুইজারল্যান্ড থেকে শুরু করে ভূমধ্যসাগরের উপকূলস্থ ত্রিশ মাইল পর্যন্ত স্থানে কোনরকম অস্ত্র-শস্ত্র রাখা চলবে না।

তুঁলো, এজাসিও, ওরান ও বিজার্তা—এই চারটি নৌ-ঘাঁটিতে কোনরকম সৈন্য রাখতে পারবে না।

আর আবিসিনিয়ার জিবুতি-আদ্দিসআবাবা রেললাইন এখন থেকে ইতালীর দখলে থাকবে।

বাকি অংশে তোমরা তোমাদের মনোমত সরকার গঠন করতে পার, তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু সাবধান! শত্রুপক্ষের সুবিধে হতে পারে, এমন কোন কাজ করলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা নিরুপায়!

কিন্তু সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হবে কোথায়? না, অন্য কোথাও হলে চলবে না।

মনে কর সেই ভার্সাই সন্ধির কথা। সেদিন সবাই মিলে একতরফা তোমরা অপমান করেছিলে জার্মানীকে। অপমানের বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিবাদ করার মতো শক্তিটুকু পর্যন্ত সেদিন আমাদের ছিল না।

কিন্তু আজ! আজ ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেছে।

তাই যেভাবে সেদিন জার্মানীকে সবার সামনে নতজানু হয়ে পরাজয় স্বীকার করে নিতে হয়েছিল, ফ্রান্সকেও আজ ঠিক সেইভাবেই মাথা নিচু করে সব শর্ত মেনে নিতে হবে। সুতরাং চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে সেই ক্যাম্পেনের বনে, সেই রেল-গাড়িতে, সেই একই কামরায়, সেই প্রস্তর-ফলকের সামনে—যেখানে তোমরা লিখে রেখেছ—'এখানে এক স্বাধীন জাতির কাছে জার্মানদের গর্ব খর্ব হল'।

আর তোমাদের উপস্থিতিতেই এবার সেখানে ফ্রান্সের শোচনীয় পরাজয়ের কাহিনী লিখিত হবে জার্মান ভাষায়। তোমাদের সবাইকে তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে মাথা হেঁট করে। কি, রাজী?

তা-ই মেনে নিলেন মার্শাল পেঁতা। অছাড়া উপায় কি! ইতিমধ্যেই ফ্রান্সের দুই-তৃতীয়াংশ হাতছাড়া হয়ে গেছে সর্বনেশে যুদ্ধের মাশুল দিতে গিয়ে। শর্ত মেনে নিয়ে এখন যদি বাকিটুকু বাঁচানো যায় তো তবেই রক্ষা।

যথাসময়ে সেই ঐতিহাসিক রেলের কামরাটিকে আবার নিয়ে আসা হল ক্যাম্পেনের অরণ্যে। সেদিনের মতো এবারও এখানে বসেই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে ফরাসী প্রতিনিধিদের, অন্য কোথাও নয়।

১৯৪০ সাল। ২২শে জুন। অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য সদলবলে হিটলার এসে উপস্থিত হলেন ক্যাম্পেনের বনে। সঙ্গে গোয়েরিং, ব্রাউশিচ, কাইটেল, রিবেনট্রপ, হেস্ প্রমুখ সহচরবৃন্দ।

বাইশ বছর আগেকার কথা। এই সুদীর্ঘ বাইশ বছরের মধ্যে একদিনের জন্যও হিটলার ভুলতে পারেননি পাথরে খোদাই করা ঐ অক্ষরগুলির কথা। প্রতিদিন ভেবেছেন, কি করে প্রতিশোধ নেবেন জার্মানীর সেই চরম অপমানের। আজ তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে দীর্ঘ বাইশ বছর বাদে।

সন্ধির শর্ত শুনতে শুনতে চোখে জল এসে গেল ফরাসী প্রতিনিধিদের। কিন্তু উপায় কি!

বাইশ বছর আগে ভার্সাই সন্ধির শর্ত শুনে জার্মান প্রতিনিধিদেরও চোখের জল ফেলতে হয়েছিল এমনি করে। তবু কেউ সেদিন তাদের এতটুকু করুণা করেনি। আজ তারাই বা ছাড়বে কেন?

অনুষ্ঠান-শেষে প্রস্তরফলক স্থাপন করার উদ্দেশ্যে সগর্বে সেই রেলের কামরা থেকে নিচে নেমে গেলেন জার্মানীর ভাগ্য-বিধাতা হের হিটলার। ভার্সাই সন্ধির অপমানের প্রতিশোধ তিনি অক্ষরে অক্ষরে নিয়েছেন। জার্মান জাতিকে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা তিনি ভালভাবেই পূরণ করেছেন। আজ তিনি সুখী, সার্থক ও বিজয়ী।

বাইরে মিলিটারী ব্যান্ড। দিগ্বিক্ কাঁপিয়ে সেই ব্যান্ড তখন সুর তুলেছে; 'ডয়েচ ল্যান্ড উইবার আলেস্'! সকল দেশের সেরা জার্মানী। জার্মানী দীর্ঘজীবী হোক!

ইতিহাসের কি বিচিত্র গতি, মল্লিকা! সেদিনও বিজয়ী ফ্রান্সের হয়ে ভার্সাই সন্ধিতে স্বাক্ষর করেছিলেন ঐতিহাসিক ভার্দুন-বিজয়ী বীর এই

মার্শাল পে'তা। এবারও সেই পে'তাকেই এগিয়ে আসতে হল পরাজিত ফ্রান্সের প্রতিনিধিরূপে। ভাগ্যের পরিহাস বুঝি একেই বলে।

প্যারিসের পতন হল। সব কিছু দাবী মেনে নিয়ে ফ্রান্স মাথা নোয়াতে বাধ্য হল জার্মানীর কাছে।

এদিকে অনধিকৃত ফ্রান্সের একপ্রান্তে গিয়ে নতুন সরকার গঠন করলেন মার্শাল পে'তা। নাম—ভিসি সরকার। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য। তবু তো সন্ধি মেনে নিয়ে এটুকু রক্ষা করা গেছে জার্মানদের হাত থেকে। নইলে তো সবটাই যেত।

পরবর্তী কালে বিজয়ী শক্তির বিচার থেকে এই নব্বুই বছরের বৃদ্ধ পে'তাও কিন্তু রেহাই পাননি, মল্লিকা। তাদের বিচারে তিনিও তখন 'কুইস্লিং'। তাই সাজা হয়েছিল প্রাণদণ্ড।

পরে বয়সের কথা বিবেচনা করে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। ফরাসী উপকূল থেকে সামান্য দূরে বিস্কে উপসাগরে অবস্থিত ছোট একটি দ্বীপের 'আইল দ্য ইউ' কারাগারে তাঁকে আটক রাখা হয়েছিল জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।

দেশবাসীকে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে রেখে সেদিন যাঁরা প্রাণভয়ে অন্যত্র পালিয়ে গিয়েছিলেন, মার্শাল পে'তা তাঁদের দলে নন। বরং সেই হতভাগ্যদের মধ্যে থেকেই তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন দুর্ভাগ্যকে সমানভাবে ভাগ করে নিয়ে। বাঁচাতে চেয়েছিলেন অবশিষ্ট ফ্রান্সকে।

তবু তিনি কুইস্লিং! বিশ্বাসঘাতক! - এটাই নিয়ম। যুদ্ধ শেষে বিজয়ী পক্ষের বক্তব্যই চরম। তাদের বীরত্বের কাহিনী নিয়েই সবাই ইতিহাস রচনা করে পরবর্তী কালে। পরাজিত পক্ষ সেখানে মৌন, মূক, ভাষাহীন। তাদের কোন ভাষা নেই সেখানে। সে অধিকারও তাদের নেই।

নইলে অন্য সবার মতো তিনিও যদি প্রাণভয়ে পালিয়ে যেতেন সেটাই কি বীরত্ব বলে প্রমাণিত হত পৃথিবীর চোখে? না কি চরম বিপদের দিনে অরক্ষিত মাতৃভূমির সমস্ত দায়িত্বভার স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নেওয়াটাই আইনত অপরাধ?

না, এ প্রশ্নের উত্তর আজো লেখা হয়নি কোন যুদ্ধের ইতিহাসে।

কিছুদিন চুপচাপ। তারপরই হঠাৎ আবার একদিন হিটলার উঠে দাঁড়ালেন গা-ঝাড়া দিয়ে।

পোল্যান্ড, ডেনমার্ক, হল্যান্ড, ফ্রান্স সব আজ তাঁর করতলগত। কিন্তু কূটনীতির দিক থেকে পরাজয় ঘটেছে অন্য জায়গায়। ভেবেছিলেন, ডানকার্কের ঘটনার ফলশ্রুতি হিসেবে ব্রিটিশ নিশ্চয় তাঁর কাছে মাথা নত করবে। সন্ধি ভিক্ষা করবে। কিন্তু ঐ বেরসিক ব্রিটিশ জাতটা কিনা তার ধার-কাছ দিয়েও গেল না! একবার তলিয়ে পর্যন্ত দেখল না যে, কেন আমি সেদিন

ওদের লক্ষ লক্ষ সৈন্যকে বাগে পেয়েও দয়া করে ছেড়ে দিয়েছিলাম? অসহ্য! অসহ্য! ডাকো এবার গোয়েরিংকে।

গোয়েরিং আহ্লাদে আটখানা। এই তো তিনি চান। এই তো তিনি চেয়েছিলেন এতদিন। ব্যস, আর ভাবনা নেই। এবার সারা পৃথিবী তাকিয়ে দেখুক যে, তাঁর পরিচালিত জার্মান বিমান-বহর অসাধ্য সাধন করতে পারে কিনা।

২৯শে জুলাই থেকে প্রচণ্ড বিমান-আক্রমণ শুরু হল খাস ইংল্যাণ্ডের ওপর।

একটি-দুটি নয়. একসঙ্গে শত শত, হাজার হাজার বোমারু বিমান। তারপর শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস! মৃত্যু আর বিভীষিকা!

এমনি করে দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। দিনে-রাত্রে সর্বক্ষণ।

সারা ইংল্যাণ্ড তখন জ্বলছে বোমার আগুনে। একটানা বোমাবর্ষণ চলছে তো চলছেই। পার্লামেণ্ট ভবন, ওয়েস্টমিনস্টার এ্যাবে, এমন কি বাকিংহাম প্যালেসের পর্যন্ত রেহাই নেই সেই বিধ্বংসী বোমার হাত থেকে। লক্ষ্য শুধু একটাই। ব্রিটিশকে চরম শিক্ষা দিতে হবে। ভেঙে-গুঁড়িয়ে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে মানচিত্র থেকে। ওদের ক্ষমা নেই।

বিপদের ওপর বিপদ।

২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে বার্লিনে ত্রি-পক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হল জার্মানী, ইতালী ও জাপানের মধ্যে। অর্থাৎ, আর দুই বন্ধু নয়। এখন থেকে আমরা তিন বন্ধু।

সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সব সময়ে আমরা একসঙ্গে চলব পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। কথা দিলাম!

খবর শুনে আর একবার চমকে উঠল পৃথিবীর মানুষ। চোখে-মুখে তাদের সপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা। কোথায় এর শেষ? শেষ হবে কি কোনদিন? কে জানে?

"...দেশবাসীর পক্ষ হইতে লোকচক্ষুর অন্তরালে তিলে তিলে জীবন দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যাইব। তারপর মাথার উপর যদি ভগবান থাকেন, পৃথিবীতে যদি সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তবে আমার হৃদয়ের কথা দেশবাসী একদিন না একদিন বুঝিবেই।"

—সুভাষচন্দ্র

১৯৪০ সাল শেষ হল। এল ১৯৪১ সাল।

ইংল্যাণ্ডের শোচনীয় বিপর্যয় লক্ষ্য করে ভারতবর্ষের প্রতিটি সাধারণ মানুষ সেদিন আনন্দে ভরপুর। ঠিক হয়েছে! খুব ভাল হয়েছে! আরো কেন ওরা মার খেল না হিটলারের হাতে? খেলে বেশ হত!

এ আনন্দ হিটলার বা জার্মানীর জন্য নয় মল্লিকা, ব্রিটিশের পরাজয়ের জন্য। যে ব্রিটিশ আমাদের যুগ যুগ ধরে পদানত করে রেখেছে, নির্বিচারে গুলি চালিয়ে পশুর মতো হত্যা করেছে, তার এই শোচনীয় বিপর্যয় দেখে আমরা যে খুশি হব, সে তো বলাই বাহুল্য।

সেদিন ছিল ২৬শে জানুয়ারি।

ভারতের দিকে দিকে সেদিন নবজীবনের সাড়া। নতুন দিনের সংকেত। আজ স্বাধীনতা দিবস। আমরা স্বাধীনতা চাই।

হঠাৎ একটা খবর শুনে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা ভারতবর্ষ।

সুভাষ নিখোঁজ। তন্ন-তন্ন করে সর্বত্র খুঁজে দেখা হয়েছে, কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান মেলেনি। সে আশাও সুদূর-পরাহত।

সবাই অবাক! সুভাষ নিখোঁজ! কি করে এটা সম্ভব হল?

সাদা পোশাকে মোট বাষট্টিজন গোয়েন্দা কর্মচারীকে নিযুক্ত রাখা হয়েছিল তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য। তাদের নজর এড়িয়ে কি করে তাঁর পক্ষে অন্যত্র চলে যাওয়া সম্ভব হল? এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

কিন্তু কেন? কি প্রয়োজন ছিল সুভাষের এমন করে বাইরে যাবার? কোন প্রয়োজন ছিল কি?

এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে হবে, মল্লিকা।

গান্ধীজী এবং সুভাষ। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে দুটি উল্লেখযোগ্য নাম।

ঠিক যেন বহুদূর-বিস্তৃত একজোড়া রেললাইন। পাশাপাশি স্থান, কিন্তু মিল নেই কোথাও।

মিল শুধু এক জায়গায়। দুজনেরই একমাত্র লক্ষ্য—স্বাধীনতা। তাছাড়া আগাগোড়া অমিল।

৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ সাল। শুরু হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

এবারও তাই হল। সেই অমিল। আগাগোড়াই অমিল।

গান্ধীজীর উদ্দেশ্য—ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করা। সুভাষের উদ্দেশ্য—বিরোধিতা করা। তাঁর সাফ কথা, কেন আমরা সহযোগিতা করব ব্রিটিশের সঙ্গে? কোন্ যুক্তিতে? প্রথম বিশ্বযুদ্ধেও গান্ধীজী সহযোগিতা করেছিলেন ব্রিটিশের সঙ্গে। কি আমরা পেয়েছিলাম তার বিনিময়ে?

একমাত্র জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ছাড়া আর কিছু পেয়েছিলাম কি? আজ সেকথা ভুলে গেলে চলবে কেন?

তাছাড়া ভারত আজ আইনত যুদ্ধে লিপ্ত। কিন্তু কেন? বড়লাট কি একবারও ভারতবাসীর মতামত গ্রহণ করেছিলেন যুদ্ধ ঘোষণার আগে? একবারও কি পরামর্শ করেছিলেন গান্ধীজী বা অন্য কোন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে? তাহলে তাদের ভালমন্দের জন্য আজ আমাদের এই অহেতুক মাথাব্যথা কেন?

বরং এই তো আমরা চাই। এই তো আমাদের সুযোগ। আহত ব্রিটিশ-সিংহের কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার এই তো আমাদের উপযুক্ত সময়। শত্রুকে তার দুর্বল মুহূর্তে আঘাত করাটাই তো যুদ্ধের নীতি। সুতরাং চাই সংগ্রাম। স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম।

গান্ধীজী তাতে রাজী নন। তাই বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর সঙ্গে দেখা করার পরেই তিনি এক বিবৃতি দিয়ে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিলেন তাঁর মনের কথা।

এ যুদ্ধে আমার সহানুভূতি ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের দিকে। ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট ভবন বা ওয়েস্টমিনস্টার এ্যাবে ধ্বংস হবে, এ দৃশ্য আমার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা এখন আমি মোটেই ভাবছি নে। ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্স যদি স্বাধীনতা হারায়, তা হলে কি হবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিয়ে?

'My own sympathies were with England and France from the purely humanitarian standpoint. I told him that I could not contemplate, without being stirred to the very depth, the destruction of London which had hitherto been regarded as impregnable. As I was picturing before him the House of Parliament and the Westminster Abbey and their possible destruction, I broke down. I have become disconsolate.

...I am not, therefore, just now thinking of India's deliverance. It will come but will it be worth, if England and France fail or if they come out victorious over Germany ruined and humbled?'

সুভাষ স্তম্ভিত। এ কার বিবৃতি! এ কি চোখের ভুল, না কি অসুস্থ চিত্তের মায়া-বিভ্রম?

না, কোনটাই নয়। সব কিছুই দিবালোকের মতো স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। বিবৃতি দিয়েছেন গান্ধীজী।

কিন্তু এ কোন গান্ধীজী! আশ্চর্য, এই গান্ধীজীই একদিন দেশবন্ধুর গৃহে বাংলার বিপ্লবী নায়কদের ডেকে বলেছিলেন:

'Had India sword I would have asked her to draw it. But as she had no sword—I ask her to adopt Non-violent,

Non-co-operation...I am out to destroy this satanic Government.'

অর্থাৎ—ভারতবাসীর অস্ত্র নেই। থাকলে সবাইকে অস্ত্র-ধারণ করতেই আমি পরামর্শ দিতাম। নেই বলেই বলছি যে, তোমরা সবাই অহিংসা অসহযোগ নীতি গ্রহণ কর। আমি এই শয়তান গভর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করার জন্য বদ্ধপরিকর।

আশ্চর্য, এবার সেই গান্ধীজীর মুখ থেকেই আবার শোনা গেল কিনা বিপরীত কথা। দেখা গেল, শয়তান গভর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করার জন্য তিনি মোটেই বদ্ধপরিকর নন। বরং ইয়োরোপে তাদের ধ্বংস হতে দেখে অজ্ঞাতেই কখন তাঁর মন সেই শয়তান গভর্ণমেণ্টের প্রতি সহানুভূতিতে ভরে উঠেছে কানায় কানায়।

জওহরলালের মুখেও সেই একই কথা। ব্রিটিশ এখন মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত। এ সময়ে সংগ্রাম শুরু করলে বিদেশীরা আমাদের কি বলবে?

কিন্তু বিদেশীদের মুখ চেয়ে এ সুযোগটাকে হেলায় হারালে দেশের মানুষ আমাদের কি বলবে? কি বলবে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ?

কি লেখা হবে অনাগত দিনের ইতিহাসে?

না, জওহরলালের বিবৃতির মধ্যে এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর নেই।

সুভাষ তখন কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত। কারণ, গান্ধীজী।

যদিও গান্ধীজীর ভোটে সুভাষ দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হননি, হয়েছিলেন জনসাধারণের ভোটেই। তবু গান্ধীজীই সব। তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছাই সেখানে সব কিছু। সুভাষের ভাষায়: 'The entire intellect of the Congress has been mortgaged to one man.'

আরো স্পষ্ট করে বলেছিলেন ত্রিপুরী কংগ্রেসের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি গান্ধীবাদী নেতা শেঠ গোবিন্দ দাস স্বয়ং। ভাষণ দিতে গিয়ে বেশ সগর্বেই সেদিন তিনি বলেছিলেন:

'ফ্যাসিস্টদের মধ্যে মুসোলিনীর, নাৎসীদের মধ্যে হিটলারের এবং কমিউনিস্টদের মধ্যে স্ট্যালিনের যে স্থান, কংগ্রেস-সেবীদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীরও সেই স্থান।'......

[আনন্দবাজার পত্রিকা: ১১ই মার্চ: ১৯৩৯ সাল]

সুভাষ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত সভাপতি। কিন্তু গান্ধীজীর তা মনঃপূত নয়। ফলে, যা হওয়া স্বাভাবিক, তাই হল। শেষ পর্যন্ত সুভাষকেই বিদায় নিতে হল কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে। তাতেও ষোলকলা পূর্ণ হল না। অবশেষে তাঁকে বহিষ্কার করা হল কংগ্রেস থেকে। অপরাধ—শৃঙ্খলা-ভঙ্গ করা।

কিন্তু ইতিহাস? ইতিহাস কি বলে, মল্লিকা? সুভাষের বিরুদ্ধে এই

অভিযোগ ইতিহাস কোনদিনও মেনে নিয়েছে কি? না কি গোটা ব্যাপারটাই তারা বর্ণনা করেছে গান্ধীজীর একটা কূটনৈতিক চাল হিসেবে?

এ প্রসঙ্গে বিদেশী লেখক মাইকেল এডোয়ার্ডস্ তাঁর বিখ্যাত 'The Last Years of British India' গ্রন্থে কি বলেছেন শোনা যাক:

'Gandhi now turned the technique of Non-co-operation, not against the British, but against Congress's own president. Bose was forced to resign.' [The Last Years of British India : Michael Edwardes : P. 78]

অর্থাৎ—গান্ধীর এবারের অসহযোগ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নয়, কংগ্রেসের নিজের সভাপতির বিরুদ্ধেই। ফলে, বোস বাধ্য হলেন পদত্যাগ করতে।

ইংরেজ লেখকের কলম কিন্তু এখানেই থেমে যায়নি, মল্লিকা। তিনি আরো বলেছেন:

'ভারতবর্ষ এবং বাইরের বহু লোকেরই বিশ্বাস ছিল, গান্ধী শুধু মাধুর্য এবং আলোর সংমিশ্রণেই তৈরি। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল, নিজস্ব বিপুল মর্যাদা এবং কূটনীতির সাহায্যে অনায়াসেই তিনি সরিয়ে দিলেন তাঁর নেতৃত্বের একমাত্র সত্যিকার প্রতিদ্বন্দ্বীকে।'

'Gandhi, whom so many both in India and abroad believed to be compounded only of sweetness and light, had, by the use of his overwhelming prestige and the sort of intrigue one would expect from Tammany Hall, succeeded in disposing of the only real opposition to his leadership.' [Ibid: P.—78]

১৫ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসল ওয়ার্ধায়। উদ্দেশ্য—যুদ্ধে ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতার প্রশ্ন নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা।

সুভাষ কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত, তবু তাঁকেও আহ্বান জানানো হল ওয়ার্কিং কমিটির সেই বৈঠকে। বিদ্রোহী ছেলেটা কি বলতে চায় শোনা যাক।

শোনা গেল সেই একই কথা। চুলোয় যাক ব্রিটিশ। তাদের ভালমন্দ নিয়ে আমাদের এত মাথাব্যথা কেন? কি প্রতিশ্রুতি আমরা এতদিন দিয়েছিলাম দেশবাসীকে? 'যুদ্ধে কোনরকম সহযোগিতা করব না'—এ প্রতিশ্রুতিই কি দিইনি? মাত্র একবছর আগেও কি এ প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করিনি হরিপুরা কংগ্রেসে? তাহলে এখন এই উল্টো-পাল্টা কথা কেন সবার মুখে? না, কোন কথা নয়। কোন দর-কষাকষি নয়। চাই সংগ্রাম।

কেউ কান দিল না সুভাষের কথায়। একটি প্রাণীও না।

সেই পুরনো কথা। সেই পুরনো যুক্তি। দেশ প্রস্তুত নয়। সুতরাং

সংগ্রাম চাই নে, চাই সহযোগিতা। চাই আপস-আলোচনা। সুতরাং সর্বাগ্রে প্রয়োজন বড়লাটকে একখানি চিঠি দেওয়া। দেখা যাক, সহযোগিতার কথা শুনে তাঁর কোন হৃদয়-পরিবর্তন ঘটে কিনা!

একদিকে গোটা গান্ধীবাদী কংগ্রেস, অন্যদিকে সুভাষ একা। তবে কংগ্রেসের তখন আর তিনি কেউ নন। সেখান থেকে তিনি বহিষ্কৃত। বিতাড়িত। অপরাধ—শৃঙ্খলাভঙ্গ করা।

কিন্তু নীতিগত দিক থেকে বিচার করতে গেলে কার বক্তব্য সেদিন যুক্তিসঙ্গত ছিল? কার বক্তব্যের মধ্যে কংগ্রেসের নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি অধিকতর আস্থার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল? গান্ধীবাদী কংগ্রেসের, না কি শৃঙ্খলাভঙ্গকারী সুভাষের?

উত্তর দিয়েছেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার:

'But there was one leader, Subhas Bose, who stood up boldly in defence of the Congress policy.'

[History of Freedom Movement : Vol. III : P.—597]

আর সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে কোন্‌টা ছিল বাস্তব? সংগ্রাম, না আপস?

এমন কি, শত্রুপক্ষ ব্রিটিশও কিন্তু এ ব্যাপারে সুভাষের দূরদর্শিতাকে সমর্থন না করে পারেনি, মল্লিকা। পরবর্তী কালে নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে গিয়ে স্পষ্টই তারা স্বীকার করেছে যে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে এতখানি স্বচ্ছ ধারণা সেদিন ভারতবর্ষে একমাত্র সুভাষ ছাড়া আর কোন কংগ্রেস নেতারই ছিল না।

'Bose himself welcomed the possibility of conflict because a blow to Britain in Europe would undoubtedly, weaken her grasp on India. Other Congress leaders had no such clear-cut vision of the future.' [The Last Years of British India : Michael Edwardes : P.—78]

তবে আর কেউ না হলেও ইংরেজ যে সেদিন কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তে খুবই খুশি হয়েছিল, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

হবারই কথা। কারণ, ভয় গান্ধীজীকে নয়, ঐ চরমপন্থী বিপ্লবীদের। এবার সেদিক থেকে নিশ্চিন্ত।

এটা আমার কথা নয় মল্লিকা, ওদেরই স্বীকৃতি।

'The British felt they had little to fear from Gandhi himself, for they soon recognized him for what he was—an anti-western reformer.

As long as Gandhi was in control of Congress, they knew they had an ally. As long as civil disobedience re-

mained non-violent, it did not greatly worry the Government.

Who was hurt by non-co-operation any way? Only the Indians. Gandhi's whole aim was to minimize violence; the Government's was the same. They were still capable of suffering a few outbreaks of small scale violence, but if once Gandhi ceased to dominate Congress, the machine he had built up might well be used by more dynamic and violent people. A full-scale rebellion could not be crushed.

So the Government obliged Gandhi by treating him with considerable respect jailing him occasionally to keep up appearances while they took much more positive action against terrorists and those western-style revolutionaries whom they really feared.' [The Last Years of British India : Michael Edwardes : P.—57]

অর্থাৎ—'ব্রিটিশ বুঝেতে পেরেছিল যে, গান্ধীর কাছ থেকে তাদের ভয় পাবার তেমন কিছু নেই। কারণ, প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন পাশ্চাত্য সভ্যতা-বিরোধী একজন সংস্কারক মাত্র।

যতক্ষণ গান্ধী কংগ্রেসের কর্ণধার থাকছেন, ততক্ষণ তারা নিঃসন্দেহ ছিল যে, কংগ্রেসের মধ্যে তাদের একজন বন্ধু রয়েছেন। যতক্ষণ তাঁর অসহযোগ আন্দোলন অহিংস থাকছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সরকারের তা নিয়ে বড় একটা মাথা-ব্যথা ছিল না। কারণ, এ আন্দোলনে ক্ষতি ভারতীয়দেরই।

গান্ধীর উদ্দেশ্য হিংসাত্মক সংগ্রাম দাবিয়ে রাখা। সরকারের উদ্দেশ্যও ছিল ঠিক তাই। তাছাড়া ছোট-খাট দু-চারটে হিংসাত্মক ঘটনাকে দমন করার ক্ষমতা তাদের ছিল। কিন্তু গান্ধী যদি কংগ্রেস নেতৃত্বে না থাকেন, তাহলে এই সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান এমন লোকের হাতে যেতে পারে, যারা অনেক বেশি গতিশীল এবং সহিংস আন্দোলনের সমর্থক। তাদের চেষ্টায় কোন সর্বাত্মক বিদ্রোহ ঘটলে তাকে দমন করার সাধ্য সরকারের ছিল না।

তাই সরকার চাইতেন যে, গান্ধীই কংগ্রেসের নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত থাকুন। এই কারণেই তাঁরা গান্ধীর প্রতি সবসময়ে সম্মানজনক ব্যবহার করতেন, এবং জনচিত্তে যাতে তাঁর সংগ্রামী মূর্তি ম্লান হয়ে না যায়, পাছে লোকে মনে করে তিনি ব্রিটিশের বন্ধু, সেইজন্যই মাঝে মাঝে তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলে আটকে রেখে তাঁর মর্যাদা বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করতেন।

অন্যদিকে যাদের তাঁরা সত্যিই ভয় করতেন—সেই সন্ত্রাসবাদী ও পাশ্চমী-ধাঁচে গড়া বিপ্লবীদের দমন করার বেলায় সরকার অনেক কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন।'

সুভাষ শেষোক্ত দলে। অহিংসা তাঁর কাছে নীতি নয়, পলিসি—'Not creed but policy.' সর্বোপরি তাঁর ইংরেজ-বিদ্বেষ সর্বজনবিদিত। এহেন ভয়ঙ্কর লোকটিকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হতে দেখে ইংরেজ যে আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠবে, তাতে আর বিচিত্র কি।

এ প্রসঙ্গে আমি ছোট্ট একটি ঘটনার দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করব, মল্লিকা।

জনসাধারণ চেয়েছিল, সুভাষ দ্বিতীয়বারের জন্য কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু গান্ধীজী তা চাননি। প্রমাণ, তাঁর নিজের বিবৃতি:

'আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, গোড়া থেকেই আমি তাঁর পুনর্নির্বাচনের বিরোধী ছিলাম। তার কারণ আমি আজ বলতে চাই নে।'

স্পষ্ট স্বীকৃতি। এ স্বীকৃতির মধ্যে কোথাও কোন কুয়াশার জাল নেই। সুভাষ দ্বিতীয়বারের জন্য সভাপতি হন, গান্ধীজী গোড়া থেকেই তা চাননি। কেন চাননি, তিনি তা বলতে রাজী নন।

উত্তম কথা। কিন্তু কেন? রহস্যটা কোথায়?

একই লোকের একাধিকবার সভাপতি হওয়াটা কংগ্রেসের ইতিহাসে নতুন কিছু নয়। ইতিপূর্বে জওহরলাল সভাপতি হয়েছেন মোট তিনবার। এর আগেই দু বছর হয়েছেন পর পর। কোনদিন এ নিয়ে কোনদিক থেকে আপত্তি ওঠেনি। আপত্তি উঠল শুধু সুভাষের বেলায়। এর কারণ কি?

জবাব পাবে ডঃ এ. কে. মজুমদার রচিত 'Advent of Independence' গ্রন্থের ৪০৯-এর পাতায়। একটি চিঠির মাধ্যমে রহস্যের দ্বার খুলেছেন প্রথম সারির কংগ্রেস নেতা কে. এম. মুন্সী স্বয়ং। মূল বক্তব্য তাঁর মুখ থেকেই তুমি শোন:

'The Government of India knew my relation with Gandhiji and Sardar, and often saw to it that confidential information reached Gandhiji through me.

On one such occasion, I was shown certain secret service reports that Netaji had contacted the German Consul in Calcutta and had come to some arrangement with him, which would enable Germany to rely upon him in case there was a war.

I conveyed the information to Gandhiji, who naturally felt surprised.'

[ভারত সরকার গান্ধীজী ও সর্দারের (প্যাটেল) সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা জানতেন এবং সেজন্য অনেক সময়ই তাঁরা এটা খেয়াল রাখতেন যে, সে রকম কোন গোপন সংবাদ আমার মারফৎই যেন গান্ধীজীর কাছে পৌঁছায়।

এ জাতীয় একটি ঘটনার সময় গোয়েন্দা বিভাগের কিছু গোপন রিপোর্ট আমাকে দেখানো হয়। তাতে এই ছিল যে,—নেতাজী কলকাতার জার্মান

কনসালের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং তাঁর সঙ্গে এমন একটা কিছু ব্যবস্থা হয়েছে, যাতে যুদ্ধ শুরু হলে জার্মানীর পক্ষে তাঁর ওপর নির্ভর করা চলে।

আমি এ খবর গান্ধীজীকে জানাই এবং স্বাভাবিক কারণেই এ খবর তিনি বিস্মিত হন।]

এ ঘটনা ঘটেছিল ১৯৩৮ সালে। আর মুন্সীজী তা প্রকাশ করেছেন ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে। অর্থাৎ, চব্বিশ বছর বাদে।

এবার আসল প্রশ্নে আসা যাক।

ভারত সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ তাদের গোপনীয় নথিপত্র মুন্সীজীকে দেখাতে গেলেন কেন?

উপযুক্ত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও সরকার সুভাষের বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থা অবলম্বন না করে চুপে চুপে মুন্সীজীকে দিয়ে গান্ধীজীর কাছে নালিশ জানাতে গেলেন কেন?

আর গান্ধীজীই বা অন্য সব কিছু তুচ্ছ করে ভারত সরকারের অভিমতের ওপর এতখানি গুরুত্ব আরোপ করতে গেলেন কেন? এ প্রশ্নের সদুত্তর কোথায়?

সুভাষ আজন্ম-বিপ্লবী। ব্যর্থতায় ভেঙে পড়া তাঁর স্বভাব নয়। তাই কাল-বিলম্ব না করে একাই তিনি এবার দেশের একপ্রান্ত থেকে আর এক-প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন অশান্ত ঘূর্ণির মতো।

মুখে সেই একই ডাক। চরম সুযোগ এগিয়ে এসেছে জাতির জীবনে। আর দেরি নয়। চাই সংগ্রাম!

ডাক শুনে লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী জনতা এগিয়ে এল মাথা উঁচু করে। এই তো চাই। এই তো হওয়া উচিত। কথা অনেক হয়েছে। এবার চাই সংগ্রাম!

ডাক এল পাঞ্জাব, নাগপুর, সীমান্ত-প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, বম্বে, মাদ্রাজ ও অন্যান্য প্রদেশ থেকে। আর কথার কচকচি নয়। বড় বড় গাল-ভরা কথাও নয়। চাই আপসহীন সংগ্রাম!

ওদিকে ১৭ই অক্টোবর জবাব পাওয়া গেল বড়লাটের কাছ থেকে। কোথায় প্রতিশ্রুতি, কোথায় কি! একমাত্র প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলির অধিকার সঙ্কুচিত করা, আর দেশরক্ষার অজুহাতে ব্যাপক গ্রেপ্তার ও অন্যান্য দমনমূলক ব্যবস্থা করার কথা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না তাঁর ঘোষণায়।

মোট আটটি প্রদেশে তখন কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা চলছে। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওয়ার্কিং কমিটি এবার তাদের পদত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন মন্ত্রিসভা থেকে। সহযোগিতার ফল যে এমন হাতে হাতেই পাওয়া যাবে, তা কে জানত?

মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করলেন। কিন্তু তারপর? পরবর্তী কর্মসূচী কি? তবে কি সংগ্রাম?

না, সে-সব কিছুই নয়। গান্ধীজী ও-পথে যেতে রাজী নন। বরং সংগ্রাম পরিহার করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য।

'I am not spoiling for a fight. I am trying to avoid it.'

তাছাড়া ব্রিটিশের প্রতি তিনি আস্থা হারাতে রাজী নন। বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগোর সহৃদয়তা সম্বন্ধেও তাঁর গভীর বিশ্বাস।

'I have not lost faith in Britain. I like the latest pronouncement of Lord Linlithgow. I believe in his sincerity.'

২০শে মার্চ, ১৯৪০ সাল। সুভাষের আপস-বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল রামগড়ে।

কি অভূতপূর্ব দৃশ্য সেদিন রামগড়ে! একদিকে মৌলানা আজাদের নেতৃত্বে কংগ্রেসের জাঁক-জমকপূর্ণ অধিবেশন। অন্যদিকে সুভাষের আপস-বিরোধী সম্মেলন।

একপক্ষের বক্তব্য—কোন আপস নয়। কোন দর-কষাকষি নয়। ভিক্ষায় কোনদিন স্বাধীনতা আসে না। আবেদন-নিবেদনও নয়। সুতরাং চাই সংগ্রাম! আপসহীন সংগ্রাম!

অপরপক্ষের বক্তব্য—না, সংগ্রাম নয়, আপস। সহযোগিতা। সুতরাং মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেও আমরা আমাদের আবেদন-নিবেদন যথা-রীতিই চালিয়ে যাব ব্রিটিশের দরবারে।

'The Working Committee will continue to explore all means of arriving at honourable settlement, even though the British Government has banged the door in the face of the Congress.'

দেখে দেখে মরিয়া হয়ে উঠলেন সুভাষ। কংগ্রেস কোনমতেই সংগ্রামের পথে পা বাড়াতে রাজী নয়। শুধু কংগ্রেস কেন, কেউ রাজী নয়।

একসঙ্গে যাত্রা শুরু করলেও রায়পন্থী এবং কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি আগেই পিছিয়ে পড়েছে। এবার সরে দাঁড়িয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি। কংগ্রেস সঙ্গে না থাকলেও কোনরকম সংগ্রামের পথে পা বাড়াতে তারা রাজী নয়।

কি করা যায় এখন এ পরিপ্রেক্ষিতে? এমন অপূর্ব সুযোগটা কি হাত-ছাড়া হয়ে যাবে এমনি করে?

অসম্ভব! সুযোগ কারো মুখ চেয়ে চিরকাল অপেক্ষা করে না। সুতরাং যার খুশি সে সরে যাক, তার জন্য কোন দুঃখ নেই। তা বলে সুভাষকে পিছিয়ে গেলে চলবে না। কেউ যদি না আসে তো একাই তাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে মরণপণ সংগ্রামে। কে এল, কে পিছিয়ে গেল, তা নিয়ে এখন কালহরণ করার মতো অবকাশ কোথায়?

১৮ই জুন নাগপুরে অনুষ্ঠিত ফরোয়ার্ড ব্লকের অধিবেশনে সুভাষ চরম-পত্র দিলেন ব্রিটিশ সরকারকে:

'All power to the Indian people.'

স্বাধীনতার প্রশ্নে গোঁজামিলের কোন স্থান নেই। সুতরাং ভুয়ো প্রতিশ্রুতি নয়। কোনরকম টালবাহানাও নয়। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য—স্বাধীনতা। চরম আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই সেই স্বাধীনতা আমাদের অর্জন করতে হবে। সবাই প্রস্তুত হও। লগ্ন আসন্ন।

তারপরই সুভাষের মুখ থেকে শোনা গেল এক আগুনঝরা উক্তি।

ইয়োরোপে প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ওপর সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের বজ্রমুষ্টি শিথিল হয়ে আসবে। তাই এই গভীর সংকটে ব্রিটিশের জন্য চোখের জল না ফেলে ভারতবর্ষকে সর্বাগ্রে নিজের কথা ভাবতে হবে। ভারতবাসীকে এখনই ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানাতে হবে।

'With every blow that she receives in Europe the Imperialist might of Britain as bound to loosen its grip of India.

Let us therefore cease talking of saving Britain with the Empire's help or with India's help. India must in this grave crisis think of herself first....

It is for the Indian people to make an immediate demand for the transference of power to them through a Provisional Government.'

সুভাষ কংগ্রেস থেকে বহিস্কৃত। পর-পর দু বছরের কংগ্রেস সভাপতি সুভাষ তখন আর কেউ নন কংগ্রেসের।

দোষ কার? সুভাষের? গান্ধীজীর? কংগ্রেসের?

না, দোষ কারোরই নয়, মল্লিকা। এটা অনিবার্য ছিল। কারণ মহাকালের যাত্রা তখন শুরু হয়ে গেছে।

কানের কাছে সর্বক্ষণ বেজে চলেছে সেই একই ডাক। একই আকুলতা। মুক্তি চাই! মুক্তি চাই! মুক্তি চাই! দেশের মুক্তি! মানুষের মুক্তি! নিজের মুক্তি!

কি শক্তি আছে সংসারের এই মিথ্যে মোহের যে, এরপরেও তাঁকে ধরে রাখবে?

এ প্রসঙ্গে ১৯২৭ সালে মান্দালয় জেল থেকে সুভাষের লেখা কয়েকটি লাইন এখানে তুলে দিচ্ছি:

'নিজের জীবন পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া ভারতমাতার পদাম্বুজে অঞ্জলিস্বরূপ নিবেদন করিব এবং এই আত্যন্তিক উৎসর্গের ভিতর দিয়া পূর্ণতর জীবন লাভ করিব, এই আদর্শের দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম।... আমার এই ক্ষুদ্র অথচ ঘটনা-বহুল জীবনে যে-সকল ঝড় আমার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, বিঘ্ন-বিপদের সেই কষ্টিপাথর দ্বারা আমি নিজেকে সূক্ষ্মভাবে চিনিবার ও বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছি।

এই নিবিড় পরিচয়ের ফলে আমার প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, যৌবনের প্রভাতে যে কণ্টকময় পথে আমি জীবনের যাত্রা শুরু করিয়াছি, সেই পথের শেষ পর্যন্ত চলিতে পারিব ; অজানা ভবিষ্যৎকে সম্মুখে রাখিয়া যে ব্রত একদিন গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা উদ্‌যাপন না করিয়া বিরত হইব না।

আমার সমস্ত প্রাণ ও সারা জীবনের শিক্ষা নিঙাড়িয়া আমি এই সত্য পাইয়াছি—পরাধীন জাতির সকল ব্যর্থ—শিক্ষা-দীক্ষা, কর্ম—সকলই ব্যর্থ, যদি তাহা স্বাধীনতা লাভের সহায় বা অনুকূল না হয়। তাই আজ আমার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে এই বাণী নিরন্তর আমার কানে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে,—'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায় ?'

এই হল সুভাষ। এই হল তাঁর আসল পরিচয়। জীবনভর যে স্বপ্ন তিনি দেখে এসেছেন, আজ সেই স্বাধীনতা অর্জনের চরম মুহূর্ত উপস্থিত। কি করে তিনি এ সময়ে স্থির থাকবেন মহাশঙ্খের ঐ আহ্বান শুনে ? এ যে নিশির ডাক ! এ ডাক যে একবার শুনেছে, সাড়া যে তাকে দিতেই হবে !

ভেতরে ভেতরে পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়ে গেছে কিছুদিন আগে থেকেই।

বাইরে যেতে হবে। হিটলারের হাতে মার খেয়ে ইংরেজ নিজের ঘর সামলাতে ব্যস্ত। এই অপূর্ব সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে। আঘাত হানতে হবে ঘরে-বাইরে—দুদিক থেকেই।

ফরোয়ার্ড ব্লক, বি. ভি., অনুশীলন সমিতি, পূর্ণ দাসের দল, অনিল রায় ও লীলা রায়ের শ্রীসংঘ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বৈপ্লবিক সংস্থাগুলির আনুগত্য সম্বন্ধে সন্দেহের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

সাহসে, শৌর্যে, বীর্যে ও আত্মত্যাগে সত্যিই তাঁদের তুলনা নেই। সত্যি-কারের সৈনিকের যা কিছু থাকা প্রয়োজন, সবই তাঁদের আছে।

তবু তা-ই যথেষ্ট নয়।

'I knew their strength. They were real revolutionaries of high spirit. But their strength and sacrifice were not enough to achieve complete independence for our Motherland.'

[On to Delhi : P.—71]

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে মুখোমুখি সংগ্রাম চালাতে হলে আরো কিছু চাই। চাই আধুনিক অস্ত্র-সম্ভার। চাই সুদক্ষ সেনাবাহিনী। চাই আরো অনেক কিছু।

তাই চরম আঘাত হানতে হবে বাইরে থেকেই। ভারত এখন অগ্নিগর্ভ। বাইরে থেকে ঠিকমত আঘাত হানতে পারলে ভেতরে মহাবিপ্লবের আবির্ভাব সুনিশ্চিত। সুতরাং সর্বাগ্রে দরকার বাইরে যাওয়া।

বৈপ্লবিক সংস্থা বি. ভি. ও পাঞ্জাবের কীর্তি কিষাণ পার্টির যোগাযোগে সব কিছু ব্যবস্থা প্রস্তুত। প্রস্তুত অন্তরঙ্গ সুহৃদ সত্য বক্সী। প্রস্তুত পেশো-

য়ারের আকবর শা। প্রস্তুত দুরন্ত দুঃসাহসী গাইড কমরেড ভগৎরাম তলোয়ার। এখন শুধু ঝাঁপ দেবার অপেক্ষা মাত্র।

প্রথমেই যেতে হবে পেশোয়ার। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে দুর্গম পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে কাবুল। কাবুল থেকে কোন বৈদেশিক দুতাবাসের সাহায্যে সোজা ইয়োরোপ।

প্রকাশ্য জনসভায় শেষবারের মতো সুভাষের কণ্ঠ শোনা গেল দেশপ্রিয় পার্কে :

'বন্ধুগণ, আর হয়তো আমি থাকব না। এই উন্মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে আপনাদের কাছে কিছু বলার মতো সুযোগ আর হয়তো কোনদিনই আমি পাব না। তার আগেই হয়তো শত্রুপক্ষ আমার কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেবে দীর্ঘকালের মতো। তাই শেষবারের মতো আজ আপনাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি যে, এ সুযোগ আপনারা হারাবেন না। সবাই এগিয়ে চলুন। এগিয়ে চলুন। জয় আমাদের হবেই।'

হঠাৎ সবকিছু পরিকল্পনা বিপর্যস্ত হয়ে গেল সাময়িকভাবে।

সুভাষের পরিচালনায় হলওয়েল মনুমেণ্ট আন্দোলনের দিন ধার্য হয়েছিল ৩রা জুলাই। কলকাতার বুক থেকে অন্ধকূপ-হত্যার ঐ মিথ্যে কলঙ্কের বোঝা দূর কর। এই জাতীয় অবমাননা আমরা সইব না।

ঠিক তার আগের দিন। বেলা তখন প্রায় দুটো। হঠাৎ ডেপুটি কমিশনার মিঃ জার্নাড্রন এসে হাজির। তোমাকে ভারত-রক্ষা বিধির ১২৯ ধারা মতে গ্রেপ্তার করা হল। চলো এবার প্রেসিডেন্সি জেলে।

সুভাষ বন্দী। ওদিকে গান্ধীজীও চুপচাপ বসে নেই। তখনো তিনি শান্তি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন নিরলসভাবে।

ইতিমধ্যেই তিনি হিটলারকে একখানি চিঠি লিখেছেন নানাবিধ উপদেশ দিয়ে। এভাবে যুদ্ধ করাটা ঠিক নয়। করতেই যদি হয় তো অহিংস-পন্থায় যুদ্ধ কর।

একইভাবে আর একখানি চিঠি লিখেছেন ইংল্যান্ডবাসীদের উদ্দেশে। এভাবে হিংস্র-পন্থায় হিটলার ও মুসোলিনীকে বাধা দেওয়া ঠিক নয়। তোমরা তাঁদের সমাদর করে নিজেদের দেশে ডেকে নিয়ে যাও। সবচাইতে সুরম্য প্রাসাদে থাকতে দাও। তারপর অহিংস প্রতিরোধ কর।

'....You will invite Herr Hitler and Signor Mussolini to take what they want of the countries you call your possessions. Let them take possession of your beautiful island with your many beautiful buildings. You will give all these, but neither your souls, nor your minds. If these gentlemen choose to occupy your homes, you will vacate them. If they do not give you free passage out, you will

allow yourself, man, woman and child, to be slaughtered, but you will refuse to own allegience to them.'

২২শে জ্বলাই তারিখে গান্ধীজী সেই চিঠি তুলে দিলেন বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগোর হাতে।

বড়লাট স্তম্ভিত। যাদের জন্য সর্বস্ব যেতে বসেছে, তাদের কি না ইংল্যাণ্ডে ডেকে নিয়ে আপ্যায়ন করার উপদেশ! এ ব্ঝি তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

পরের কাহিনী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের লেখা থেকেই শোন:

'When Gandhiji told Lord Linlithgow that the British people should give up arms and oppose Hitler with spiritual force, Lord Linlithgow was taken aback by what he regarded as an extraordinary suggestion.

It was normally his practice to ring the bell for an A. D. C. to come and take Gandhiji to his car. On this occasion he neither rang the bell, nor sent for the A. D. C.

The result was that Gandhiji walked away from a silent and bewildered Viceroy and had to find his way out to his car all by himself.'

[India Wins Freedom: Abul Kalam Azad]

গান্ধীজী অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী। অহিংসাই তাঁর জীবন-ধর্ম। অপরপক্ষে লিন্‌লিথগোর কাছে যুদ্ধটাই বাস্তব। সেক্ষেত্রে শিষ্টাচার ভুলে গিয়ে তিনি যদি গান্ধীজীকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন না করে থাকেন, তাতে গান্ধীজীর কতটুকু আসে-যায়, বলো?

বড়লাট মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু তারপর?

১৯৪০ সালে সুভাষ যে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছিলেন তাতে কি কংগ্রেস, কি গান্ধীজী, কেউ কর্ণপাত করেননি। স্বভাবতই তরুণদল ক্ষুব্ধ, চঞ্চল।

এমন কথাও কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন যে, অধুনা কংগ্রেস নাকি একটা সংগ্রাম-বিমুখ অনুষ্ঠান-সর্বস্ব প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং আর কিছু না হোক, অন্তত তাদের শান্ত করার জন্যও কিছু একটা করা প্রয়োজন।

কারো কারো অভিমত, অবিলম্বে গণ-আন্দোলন শুরু করা হোক। কিন্তু গান্ধীজী তাতে একেবারেই নারাজ। কোথাও নাকি আলো দেখতে পাচ্ছেন না তিনি।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, গণ-আন্দোলন নয়, একক সত্যাগ্রহ। অর্থাৎ—একটিমাত্র লোক ফুলের মালা গলায় দিয়ে, প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে, নানাবিধ ধ্বনি সহকারে আইন-অমান্য করে কারাজীবন বরণ করবেন।

তা বলে যে-কেউ যখন-তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আইন-অমান্য করবেন, তা হবে না। আগে নাম পাঠিয়ে গান্ধীজীর অনুমোদন নিতে হবে, তারপর অন্য কথা।

প্রথম সত্যাগ্রহী হবার সৌভাগ্য অর্জন করলেন গান্ধী-শিষ্য বিনোবা ভাবে। সেদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন সবার অপরিচিত। কিন্তু সর্বপ্রথম সত্যাগ্রহ করার সুযোগ পেয়ে রাতারাতি তিনি বিখ্যাত হয়ে গেলেন সারা দেশে।

দ্বিতীয় সত্যাগ্রহী জওহরলাল। তারপর কয়েক হাজার। কিন্তু অবস্থা যেমন ছিল, তেমনিই রয়ে গেল।

অঘটন ঘটল পাঞ্জাবে। গান্ধীজীর অনুমতি না নিয়েই সম্পুরণ সিং নামক ওখানকার একজন সত্যাগ্রহী হঠাৎ সেদিন আইন অমান্য করে বসলেন প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে। তারপরই একআনা মাত্র জরিমানা দিয়ে দিব্যি কোর্ট থেকে বেরিয়ে গেলেন হাসতে হাসতে।

সমালোচনার ঝড় বয়ে গেল দেশের সর্বত্র। এই কি গান্ধীজীর আইন-অমান্যের সংজ্ঞা! এই করেই কি দেশের স্বাধীনতা আসবে কোনদিন! জন্মেও না।

বড় দুঃখেই কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে বলতে হল:

'This brought such ridicule on the movement in the Punjab that I had to go there to set matters right.'

[India Wins Freedom: Abul Kalam Azad]

মাত্র কয়েকদিন। তারপরই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হল গান্ধীজীর নির্দেশে। একক সত্যাগ্রহ আন্দোলন সেখানেই শেষ।

সুভাষ তখন কারাগারে। গ্রেপ্তারের পর তাঁকে রাখা হয়েছে প্রোসিডেন্সি জেলে।

ফল কিন্তু ভালই হয়েছে, মল্লিকা। সেখানেই তিনি পেয়ে গেলেন বি. ভি.-র হেমচন্দ্র ঘোষ, সত্য বক্সী, মণীন্দ্র রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে।

ফলে আবার মন্ত্রণা শুরু হল নতুন করে। কি করা যায় এখন! এতটা পথ এগিয়ে এসে সবই কি ব্যর্থ হয়ে যাবে এমনি করে?

অসম্ভব! অভিমত প্রকাশ করলেন শ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র ঘোষ। তুমি 'দেশ-নায়ক'। দেশ ও জাতির তোমার কাছে অনেক আশা। তবে এখানে থাকলে একমাত্র জেলখানায় পচে মরা ছাড়া আর কিছু করা সম্ভব বলে আমার মনে হয় না।

আবার আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে উঠলেন সুভাষ। হ্যাঁ, আমি যাব। যাবই। যেতেই হবে আমাকে। এ সুযোগ কিছুতেই হারালে চলবে না।

'The cumulative effect of all these factors together with Sri Hem Ghosh's advice to Subhas in the Presidency jail (July 2, 1940) ultimately led Subhas Bose to take a firm decision to leave the country and to work from outside for the cause of Indian Independence.' [Two Great Indian Revolutionaries : Uma Mukherjee : P.—161]

কিন্তু ঐ আকাশ-ছোঁয়া উ'চু পাঁচিলটা!

থাক পাঁচিল। সুভাষ নিশ্চিন্ত। পরিকল্পনা মতো এগুতে পারলে ঐ পাঁচিলটাকে ফাঁকি দেওয়া তাঁর পক্ষে এতটুকুও কষ্টকর হবে না।

হলও তাই। ২৮শে অক্টোবর সুভাষ জেল থেকেই কেন্দ্রীয় আইন-সভার সদস্য নির্বাচিত হলেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়।

ঠিক তার একমাস পরে (২৯শে নভেম্বর) ঘুম থেকে উঠেই সারা দেশ স্তম্ভিত হয়ে গেল অভাবনীয় একটি খবর শুনে।

মুক্তির দাবীতে সুভাষ অনশন শুরু করেছেন। আমৃত্যু অনশন। তার আগেই তিনি বাংলার গভর্ণর এবং মন্ত্রীদের উদ্দেশে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর সিদ্ধান্তের কথা। 'হয় মুক্তি, নয়তো মৃত্যু,—এই আমার শেষ কথা।'

সেই সঙ্গে আর একটি মর্মস্পর্শী আবেদন তিনি রাখলেন দেশের অগণিত জনসাধারণের উদ্দেশে :

'Forget not that the greatest curse for a man is to remain a slave. Forget not that the greatest crime is to compromise with injustice and wrong. Remember the eternal law—you must give life if you want to get it. And remember that the highest virtue is to battle against inequity, no matter what the cost may be.'

[ভুলো না যে, দাসত্বের চাইতে বড় অভিশাপ আর নেই। ভুলো না যে,-অন্যায় এবং দুর্নীতির সঙ্গে আপস করার চাইতে বড় অপরাধ আর নেই। জীবনকে পরিপূর্ণভাবে পেতে হলে জীবনের বিনিময়ে তা পেতে হবে। আরো মনে রেখো, সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতি মেনে নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।]

মুক্তি দেওয়া হল ৫ই ডিসেম্বর। শর্তাধীনে মুক্তি।

ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুন আরো একজনকে মুক্তি দেওয়া হল প্রায় একই সময়ে। তিনি হলেন বি. ভি.-র অন্যতম নায়ক অন্তরঙ্গ সুহৃদ সত্য বক্সী। এবার ষোলকলা পূর্ণ হল।

শাসক সম্প্রদায় নিশ্চিন্ত। পেলেই বা মুক্তি! চারপাশে সদাসতর্ক পুলিশ প্রহরী। সাদা পোশাক পরিহিত গোয়েন্দাও এমন কিছু কম নেই। তাদের চোখ এড়িয়ে যাবে আর কোথায়?

তাছাড়া ক'দিন বা! মহম্মদ আলী পার্কে মারাত্মক বক্তৃতা দেবার অপরাধে ২৭শে জানুয়ারি মামলার দিন রয়েছে। ওই দিনই তো আবার গিয়ে ঢুকতে হবে লোহকারার অন্তরালে। এবার আর কোনরকমেই রেহাই নেই।

শুরু হল সুভাষের নতুন জীবন। কারো সঙ্গে দেখা নয়। কোনরকম কথাবার্তাও নয়। শুধু রুদ্ধদ্বার-কক্ষে সাধন-ভজন আর ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাছাড়া আর সব কিছুই বুঝি মিথ্যে হয়ে গেছে সুভাষের এই নতুন জীবনে।

সেই বন্দী-জীবন। আগে ছিল জেলখানায়। এখন নিজের ঘরে।

দিন কেটে যায় একই ছন্দে। একই রঙ নিয়ে আসে ভোরের সূর্য, স্তব্ধ দুপুর আর শান্ত বিকেল। দিন আর রাত্রির মধ্যে সেখানে কোন তফাৎ নেই।

কিন্তু এ কোন্ সুভাষ?

মুখে একগাল দাড়ি। চোখের নিচে ক্লান্তির কালিমা রেখা। মনে হয়, এ যেন এতদিনকার চেনা সেই সুভাষ নন। আমূল পরিবর্তিত কোন ভিন্ন সত্তা।

মাঝে মাঝে অতীতের জীর্ণ পাতা ভেসে আসে চিন্তার আবর্তে।

মনে পড়ে কত কথা। কত চেনা মুখ। কত টুকরো টুকরো ছবি। স্বাধীনতার বেদীমূলে কত নিঃশেষ আত্মবিসর্জনের কাহিনী। অস্পষ্ট, কিন্তু অবিস্মরণীয়।

মনে পড়ে মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ ক্ষুদিরামের কথা।

'হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী।'

ভারতবাসী সত্যিই দেখেছিল সেদিন। শুধু হাসি আর হাসি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হাসি। এমন কি, ফাঁসির দড়ি গলায় পরার সময় পর্যন্ত হাসি। ক্ষুদিরামের মতো এমন অনাবিল হাসি কি কোন ভারতবাসী এর আগে হাসতে পেরেছিল কোনদিন?

অবশ্য বাংলার বিপ্লববাদের ইতিহাসে ক্ষুদিরামই প্রথম শহীদ নন।

প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চক্রবর্তী। ১৯০৭ সালে দেওঘর-সংলগ্ন রোহিণী পাহাড়ে উল্লাসকর দত্তের তৈরি বোমার কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি প্রাণ দিয়েছিলেন সবার অগোচরে।

দ্বিতীয় শহীদ ক্ষুদিরামের সঙ্গী প্রফুল্ল চাকী। পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জীর হাতে ধরা পড়ার আশঙ্কায় তিনি ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেছিলেন মোকামাঘাট স্টেশনে।

ক্ষুদিরাম তৃতীয়। কিন্তু ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ উৎসর্গকারী শহীদদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম।

১৯০৮ সাল। ৩০শে এপ্রিল। বৃহস্পতিবার। রাত তখন ঠিক আটটা।

অমাবস্যার রাত। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুহাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যায় না।

ইয়োরোপীয়ান ক্লাবের বাইরে অন্ধকারে মিশে রয়েছেন ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকী। চোখে-মুখে তাঁদের অধীর প্রতীক্ষা।

কখন বেরিয়ে আসবে কুখ্যাত জেলা-জজ কিংসফোর্ড? আজ তার শেষ দিন।

বাংলার স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়া, বিশেষ করে বিপ্লবী বালক সুশীল সেনকে বেত্রদণ্ড দেবার প্রতিফল আজ তাকে পেতেই হবে।

ঐ যে তার ফিটন গাড়িটা বেরিয়ে আসছে ক্লাব-ঘরের গেট দিয়ে! এবার? এবার কোথায় যাবে তুমি কিংসফোর্ড?

নিমেষে গোটা মজঃফরপুর শহরটা কেঁপে উঠল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে।

কি হল কিছুই বোঝা গেল না। শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া! সব কিছুই ঢাকা পড়ে গেল নিশ্ছিদ্র কালো ধোঁয়ার অন্তরালে।

জানা গেল অনেক পরে। গাড়িটা কিংসফোর্ডের নয়, মিঃ কেনেডির। গাড়ির যাত্রী মিসেস কেনেডি এবং মিস কেনেডি দুজনেই নিহত। মিস কেনেডি মারা গেলেন সেই রাত্রেই। মিসেস কেনেডি আট ঘণ্টা পরে।

ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন পরদিন ভোরে চব্বিশ মাইল দূরবর্তী ওয়াইনী রেলস্টেশনে। তার পরের দিন (২রা মে) প্রফুল্ল চাকী ইচ্ছামৃত্যু বরণ করলেন মোকামাঘাট স্টেশনে।

গ্রেপ্তারের পর ক্ষুদিরামকে নিয়ে আসা হল মজঃফরপুরে। সেকি ভীড় তখন রেলস্টেশনে! কোথায় সেই বীর বন্দী বালক? কোথায়?

আর ক্ষুদিরাম! সে কাহিনী লেখা রয়েছে তখনকার সময়ের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পাতায়ঃ

'ক্ষুদিরাম দৃঢ়পদে সহাস্য বদনে গাড়িতে আরোহণ করিল। তাহার এক-দিকে পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও অপরদিকে আর একজন পুলিশ কর্মচারী উপবেশন করিলেন। ক্ষুদিরাম উচ্চৈঃস্বরে বন্দেমাতরম্ বলিতে লাগিল—গাড়ি তাড়াতাড়ি স্টেশন হইতে চলিয়া গেল।'

[সঞ্জীবনীঃ ৭ই মেঃ ১৯০৮ সাল]

একই কথা লেখা রয়েছে সরকারী মুখপত্র স্টেটস্‌ম্যান-এর পাতায়ঃ

'He came out of a first class compartment and walked all the way to phaeton, kept for him outside like a cheerful boy who knows no anxiety...on taking his seat the boy lustily cried Bandemataram.'

[The Statesman 2.5.1908]

১ই জুন এডিশনাল্ সেসন-জজ মিঃ কর্ণডফ্-এর আদালতে শুরু হল বিচার।

ক্ষুদিরাম নির্বিকার। মুখে তাঁর সেই হাসি, যা তাঁর মুখে দেখা গিয়েছিল বরাবর।

কত টুকরো টুকরো ছবি। কত অবিস্মরণীয় ঘটনা। তার মধ্যেও সেই হাসি। যেন সব কিছুই তাঁর কাছে একটা হাসির ব্যাপার মাত্র।

"—তুমি গীতা পড়িয়াছ?

—হ্যাঁ, পড়িয়াছি।

—তোমার মনে কোনরূপ ভয় হয় কি?

ভয়ের কথা শুনিয়া ক্ষুদিরাম হাসিয়া ফেলিল। হাসিয়া উত্তর করিল,—কেন ভয় করিব?" [সঞ্জীবনী : ১৮ই জুন : ১৯০৮]

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারা অনুসারে সাজা দেওয়া হল, প্রাণদণ্ড।

আশ্চর্য, ক্ষুদিরামের সারা মুখে তখনো সেই স্বর্গীয় হাসি!

"মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞার পর ক্ষুদিরামকে সম্পূর্ণ অবিচলিত দেখিয়া এবং তাহার নির্বিকার ভাব লক্ষ্য করিয়া বিদেশী রাজার স্বজাতীয় বিচারকের মনে সম্ভবত এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল যে, আসামীর প্রতি যে চরম দণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া ফাঁসির হুকুমের পর জজ ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার প্রতি যে দণ্ডের আদেশ হইল তাহা বুঝিতে পারিয়াছ?

ক্ষুদিরাম হাস্যমুখে মাথা নাড়িয়া জানাইল,—বুঝিয়াছি।"

[সঞ্জীবনী : ১৮ই জুন : ১৯০৮]

১১ই আগস্ট, ১৯০৮ সাল।

যথাসময়ে ক্ষুদিরামকে নিয়ে আসা হল বধ্যমঞ্চে।

আশ্চর্য, তখনো ক্ষুদিরামের মুখে সেই হাসি, যে হাসির কোন তুলনা নেই সংসারে!

'হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী।

হ্যাঁ, একথা ক্ষুদিরামেরই সাজে। সত্যিই সেদিন তিনি দেখিয়েছিলেন পরাধীন ভারতবাসীকে। দেখিয়েছিলেন, দেশের মুক্তির জন্য কি করে হাসতে হাসতে মৃত্যুবরণ করতে হয়। সোনার অক্ষরে তাই লেখা রয়েছে তখনকার সময়ের সংবাদপত্রের পাতায় :

'মজঃফরপুর, ১১ই আগস্ট, অদ্য ভোর ছয় ঘটিকার সময় ক্ষুদিরামের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। ক্ষুদিরাম দৃঢ় পদক্ষেপে প্রফুল্ল চিত্তে ফাঁসির মঞ্চের দিকে অগ্রসর হয়। এমন কি, যখন তাহার মাথার উপর টুপিটি টানিয়া দেওয়া হইল, তখনও সে হাসিতেছিল।'

[অমৃতবাজার : ১২ই আগস্ট : ১৯০৮]

ক্ষুদিরাম চলে গেলেন। কিন্তু এ মৃত্যু, মৃত্যু নয়। এ হল জীবনাদর্শে উজ্জীবিত চরম আত্মোৎসর্গ। মানুষের কল্যাণই যাঁদের একমাত্র লক্ষ্য, এভাবেই তাঁদের জীবন উৎসর্গীকৃত হয়। তাই মৃত্যুর পরেও তিনি বেঁচে রইলেন জাতির অন্তরে। বেঁচে রইলেন কাব্যে, সাহিত্যে, সংগীতে ও ইতিহাসের পাতায়।

ক্ষুদিরাম ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ উৎসর্গ করলেন ১৯০৮ সালের ১১ই আগস্ট।

তারপরই পালা এল কানাইলাল দত্ত আর সত্যেন বসুর।

মজঃফরপুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ততদিনে যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে।

অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, হেম দাস, নরেন গোঁসাই, সত্যেন বসু, কানাইলাল দত্ত প্রমুখ আরো অনেককেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে একে একে। শুরু হয়েছে ঐতিহাসিক মানিকতলা বোমার মামলা।

বন্দীরা নির্বিকার। গানে-গল্পে, আনন্দে-উচ্ছ্বাসে সর্বক্ষণই তাঁরা ভরপুর। যেন একটা বিরাট একান্নবর্তী সুখী পরিবার।

বিশ্বাসঘাতকতা করল নরেন গোঁসাই। সব কিছুই সে গোপনে ফাঁস করে দিল পুলিশের কাছে।

গর্জে উঠলেন কানাই আর সত্যেন। ক্ষমা নেই! ক্ষমা নেই! ক্ষমা নেই! বিশ্বাসঘাতকের ক্ষমা নেই! এর জবাব আমরা দেবই। এই জেলখানায় আবদ্ধ থেকেই প্রমাণ করে দেব যে, বাংলার বিপ্লবীরা অসাধ্য সাধন করতে পারে কিনা!

প্ল্যানমতো রিভলবার এসে গেল বাইরে থেকে। একটা নয়, দুটো।

কিন্তু কোথায় নরেন? সতর্কতা হিসেবে পুলিশ তাকে আগেই সরিয়ে নিয়েছে হাসপাতালের এক ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ডে। পাশে রেখেছে সদা-সতর্ক প্রহরী হিগিনস্ ও অন্য একজন শ্বেতাঙ্গ ওয়ার্ডার। এ অবস্থায় তাকে কাছে পাবার উপায় কি?

হাঁপানী রোগের জন্য সত্যেন তখন সাধারণ হাসপাতালে। সেখান থেকেই তিনি টোপ ফেললেন পুলিশের কাছে। আমিও রাজসাক্ষী হব। তোমরা নরেনকে একবার নিয়ে এসো আমার কাছে। একটু পরামর্শ দরকার।

পুলিশ তো আহ্লাদে আটখানা। বাঃ! এই তো লক্ষ্মী ছেলে! এই তো চাই! ঠিক আছে, কাল ভোরেই আমরা নরেনকে নিয়ে আসছি তোমার কাছে।

সঙ্গে সঙ্গে কানাইও এবার হাসপাতালে ভর্তি হলেন অসুস্থতার ভান করে। আসুক কাল নরেন। দেখা যাবে!

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯০৮ সাল।

যথাসময়ে নরেনকে নিয়ে আসা হল সত্যেনের কাছে। সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ প্রহরী হিগিনস্ ও অন্য একজন ওয়ার্ডার।

সত্যেনের একহাত তাঁর জামার পকেটে। কথা বলতে বলতে একসময়ে সেই জামার পকেট থেকেই তাঁর রিভলবার গর্জে উঠল,—দ্রাম!

একহাতে উরু চেপে ধরে সংগে সংগেই নরেন ছিট্‌কে বেরিয়ে গেল তীরের মতো। দ্বিতীয়বার গুলি করার মতো আর কোন অবকাশই পাওয়া গেল না।

ওদিকে গুলির শব্দ শুনেই কানাই নীচ থেকে দোতলায় ছুটে এলেন উদ্যত রিভলবার হাতে নিয়ে। ঐ—ঐ যে নরেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে পালাচ্ছে অন্য একটা সিঁড়ি দিয়ে! না, কিছুতেই আজ ওকে ছাড়া হবে না।

রক্তে যেন আগুন ধরে গেল কানাইয়ের। সংগে সংগেই উন্মত্ত আক্রোশে তিনি ছুটে গেলেন নরেনকে লক্ষ্য করে। তারপরেই তাঁর হাতের রিভলবার গর্জে উঠল অব্যর্থ নিশানায়,—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

গুলিবিদ্ধ হয়ে স্নানাগার-সংলগ্ন নর্দমায় দড়াম করে আছড়ে পড়ল নরেন, তবু তার রেহাই নেই।

কানাই মরীয়া। বেপরোয়া। রিভলবারের সব ক'টা গুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই যেন শান্তি নেই তাঁর। সারা পৃথিবী তাকিয়ে দেখুক যে, বাংলার বিপ্লবীরা জেলের অভ্যন্তরে থেকেও অসাধ্য সাধন করতে পারে কিনা!

আলিপুরের দায়রা-জজ মিঃ এফ. আর. রো-র আদালতে শুরু হল নতুন মামলা।

আসামী কানাই ও সত্যেন। অপরাধ—আলিপুর জেলের অভ্যন্তরে রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যা করা।

—রিভলবার কে দিয়েছে? প্রশ্ন করলেন বিচারক মিঃ রো।

—কে দিয়েছে! হাসলেন কানাই, দিয়েছে ক্ষুদিরামের আত্মা।

—সরকারী খরচে কোন উকিল রাখতে চাও কি?

—ধন্যবাদ! আবার হাসলেন কানাই, তার কোন প্রয়োজন হবে না।

সাজা হল প্রাণদণ্ড। হাইকোর্টও সে সাজা বহাল রাখলেন।

১০ই নভেম্বর, ১৯০৮ সাল।

তখনো রাতের অন্ধকার ভাল করে মেলায়নি।

একে একে এসে হাজির হলেন পুলিশ কমিশনার হ্যালিডে, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বম্পাস, জেল-সুপার এমার্সন এবং ছোট-বড় আরো অনেকেই।

আজ কানাইয়ের শেষ দিন। প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা কানাইকে আজ চিরবিদায় নিতে হবে পৃথিবী থেকে।

কানাই তেমনি নির্বিকার। তেমনি সদাহাস্যময়। ফাঁসিমঞ্চে তোলার পরে প্রশ্ন করা হল,—কিছু বলার আছে তোমার?

—না, ধন্যবাদ! কানাইয়ের সারা মুখে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবনের প্রশান্ত হাসি।

কানাই চলে গেলেন। এ মৃত্যু বীরের মৃত্যু। তাই জেল গেটের বাইরে সেদিন দেখা গেল এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। শুধু মানুষ আর মানুষ: অগণিত

মানুষ! বীর কানাইকে তারা শুধু শেষবারের মতো একটু দেখতে চায়। দেখে ধন্য হতে চায়।

শবদেহ বাইরে আসতেই শুরু হল অবিরাম শঙ্খধ্বনি। শুরু হল মহিলাদের লাজ-বর্ষণ। বীর কানাই, তোমার মৃত্যু নেই। তুমিই আমাদের নির্ভয় হতে শিখিয়েছ।

আবার সেই একই দৃশ্য দেখা গেল ২১শে নভেম্বর, ভোর পাঁচটায়। এবার ফাঁসিমঞ্চে এসে দাঁড়ালেন সত্যেন।

তবে এবার আর আগেকার ভুলের পুনরাবৃত্তি করলেন না শাসক সম্প্রদায়। তাই উদ্বেলিত জনতার হাতে শবদেহ না দিয়ে নিজেরাই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করলেন আলিপুর জেলের অভ্যন্তরে। ঘুমন্ত দৈত্য জেগে উঠেছে! বাঙালীকে আর বিশ্বাস নেই!

প্রফুল্ল. ক্ষুদিরাম. কানাই. সত্যেন—সবাই চলে গেলেন একে একে।

বাকি রইলেন অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বন্দীর দল।

সবাইকে আসামী তালিকাভুক্ত করে দিনের পর দিন মামলা এগিয়ে চলল এডিশনাল জজ মিঃ বীচক্রফট্-এর আদালতে।

রায় দেওয়া হল ১৯০৯ সালের ৬ই মে।

বারীন ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তকে দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড। আর উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, হেম দাস. বিভূতি সরকার, বীরেন্দ্র সেন, সুধীর সরকার. ইন্দ্রনাথ নন্দী. অবিনাশ ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, ঋষিকেশ কাঞ্জিলাল ও ইন্দুভূষণ রায়কে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

পরেশ মৌলিক, নিরাপদ রায় ও শিশির ঘোষের দশ বছর কারাদণ্ড। অশোক নন্দী, বালকৃষ্ণ হরিকানে আর শিশির সেনের সাত বছর। কৃষ্ণজীবন সান্যালের এক বছর। বাকি সবাই মুক্ত।

অরবিন্দও মুক্তি পেলেন, তবে তখন আর তিনি শুধুমাত্র বিপ্লবগুরু অরবিন্দ নন।

কারাজীবনে নির্জন অবকাশে বিপ্লব-গুরু অরবিন্দের খোলস ছেড়ে তখন বেরিয়ে এসেছেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ—নাম তাঁর 'ঋষি অরবিন্দ'।

আদালতে অরবিন্দকে সমর্থন করতে গিয়ে সে কি দীপ্ত ভাষণ সেদিন দেশবন্ধুর!

'My appeal to you, therefore, is that a man like this who is being charged, charged with the offence with which he has been charged, stands not only before the bar in this court, but stands before the bar of the High Court of history and my appeal to you in this: that long after the controversy will be hushed in silence, long after this turmoil, the agitation will have ceased, long after he is dead

and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and lover of humanity'...

[তোমরা মনে করো না যে, আজ এই আদালতেই এ মামলার শেষ। মানব ইতিহাসের বিরাট বিচারালয়েও এই মামলার শুনানী চলবে চিরকাল।

একদিন যখন তোমাদের সমস্ত বিচার-বিতর্ক নীরব হয়ে যাবে, যখন আজকের এই আন্দোলন ও উত্তেজনার কোন চিহ্নই অবশিষ্ট থাকবে না এবং আজ যিনি আসামী হয়ে তোমাদের সামনে দাঁড়িয়েছেন, তিনিও পৃথিবী থেকে চলে যাবেন, সেদিন সেই অনাগত যুগের মানুষ এই অরবিন্দকেই স্মরণ করবে দেশপ্রেমের কবি বলে। মানবতার উপাসক বলে সমগ্র পৃথিবী তাঁকেই দেবে সেদিন পুষ্পাঞ্জলি।

আজ যে বাণী প্রচারের জন্য তিনি অভিযুক্ত হয়েছেন, সেদিন সেই বাণীর তরঙ্গ দেশ-দেশান্তরের মানুষের অন্তরে মহাভাবের প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলবে।]

ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা গুরু দেশবন্ধুর সেই স্মরণীয় উক্তি ব্যর্থ হয়নি। তাই বিপ্লব-গুরু অরবিন্দ আজ লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষের কাছে 'ঋষি অরবিন্দ'।

আপীলে কিছুটা হেরফের হল। মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে বারীন ঘোষ আর উল্লাসকরকে দেওয়া হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। হেম দাস আর উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়কেও তাই।

অন্যান্য যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের দেওয়া হল দশ বছর; আর বালকৃষ্ণ হরিকানে, ইন্দ্রনাথ নন্দী, সুনীল সেন ও কৃষ্ণজীবন সান্যাল পেলেন মুক্তির আদেশ।

তা বলে ইতিহাস কিন্তু থেমে গেল না।

মিছিলের মতো সারি সারি সব ঘটনা। একটার পর একটা। অসংখ্য।

১৯০৯ সালের ১০ই এপ্রিল বোমার মামলার সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস প্রাণ দিলেন পুলিশের সুবার্বন আদালতে। আততায়ী চারু বসু ধরা পড়লেন ঘটনাস্থলেই।

কিন্তু একি! আশ্চর্য ব্যাপার! আসামীর ডানহাতটা একেবারেই পঙ্গু। পঙ্গু বলেই রিভলবারটাকে তিনি শক্ত করে বেঁধে নিয়েছেন ডানহাতের তালুতে। তারপর যা কিছু করেছেন, সবই বাঁ হাতে। বিশ্বাস করাও শক্ত!

আদালতে সেই একই প্রশ্ন করা হল আসামী চারু বসুকে,—সরকারী খরচে কোন উকিল রাখতে চাও কি?

বিচারপতি জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বম্পাসকে লক্ষ্য করে সে কি নির্ভীক উত্তর চারু বসুর! না, কিছুই আমি চাই নে। সেসনটেসনেরও প্রয়োজন নেই। বিচার করে কালই আমাকে ফাঁসি দাও। এটা ভবিতব্য যে, আশুবাবু আমার গুলিতে নিহত হবেন এবং আমি ফাঁসি-কাষ্ঠে প্রাণ দেব।

'No sessions, trial, but hang me to-morrow. It was

all preordained that Ashu Babu shall be shot by me, and I shall be hanged.'

তাই করা হল। সাজা দেওয়া হল প্রাণদণ্ড। সে আদেশ কার্যকরী হল দিন কয়েকের মধ্যেই।

প্রফুল্ল চক্রবর্তী, প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন, চারু সবাই চলে গেলেন একে একে। এবার এগিয়ে এলেন বীরেন দত্তগুপ্ত।

২৪শে জানুয়ারি, ১৯১০ সাল।

স্থান—কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি হ্যারিংটনের আদালত থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন বোমার মামলার প্রধান উদ্যোক্তা, গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা সামসুল আলম। আর মাত্র কয়েকটা ধাপ বাকি।

হঠাৎ কান-ফাটানো আওয়াজ—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! ব্যস, সামসুল আলম শেষ।

বিচারে আসামী বীরেন দত্তগুপ্তকে সাজা দেওয়া হল প্রাণদণ্ড। সে আদেশ কার্যকর হল ফেব্রুয়ারি মাসের একুশ তারিখে। সংখ্যায় আর একজন বাড়ল।

১৯১৫ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে কেন্দ্র করে গদর পার্টি, মহানায়ক রাস-বিহারী বসু এবং বাংলার অবিসম্বাদী বিপ্লবী নায়ক যতীন মুখার্জীর (বাঘা যতীন) সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শুরু হল অগ্নিযুগের দ্বিতীয় পর্ব।

চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে যা কিছু করা সম্ভব, সবই তাঁরা করেছিলেন দায়িত্ব ভাগ করে নিয়ে। বিদেশে অবস্থিত বিপ্লবিগণও তাঁদের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেছিলেন নিষ্ঠাভরে। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের নেতৃত্বে অস্থায়ী জাতীয় সরকারও গঠন করা হয়েছিল কাবুলের মাটিতে। তবু কিছুতেই কিছু হল না। শেষ পর্যন্ত রাসবিহারী চলে গেলেন জাপানে। আর বাঘা যতীন?

১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর জার্মানী-প্রেরিত অস্ত্র-বোঝাই জাহাজ খালাস করতে গিয়ে প্রচণ্ড সম্মুখ-সমর শুরু হল উড়িষ্যার বুড়িবালামের তীরে।

একদিকে ডেনহাম, টেগার্ট, কিলবী সহ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, অন্যদিকে বীর বিপ্লবী যতীন মুখার্জী এবং তাঁর চারজন একনিষ্ঠ সহকর্মী চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, নীরেন দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত আর জ্যোতিষ পাল।

প্রচণ্ড সংগ্রামের পরে প্রাণ দিলেন চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী। আহত বাঘা যতীন প্রাণ দিলেন পরদিন হাসপাতালে। নীরেন আর মনোরঞ্জন প্রাণ দিলেন ফাঁসিমঞ্চে।

একমাত্র ব্যতিক্রম জ্যোতিষ পাল। তাঁকে দেওয়া হল যাবজ্জীবন দ্বীপা-ন্তর। তবে বেশিদিন নয়। শেষ পর্যন্ত তিনিও একদিন প্রাণ দিলেন উন্মাদ হয়ে।

১৯১৮ সালের ১৫ই জুন পুলিশের সঙ্গে প্রকাশ্য সংগ্রামে নলিনী

বাগচী আর তারিণী মজুমদার প্রাণ দিলেন ঢাকার কলতা বাজারে। প্রাণ যায় যাক, তবু আত্মসমর্পণ কিছুতেই নয়।

মৃত্যুপথযাত্রী নলিনীর কাছে সে কি কাতর অনুরোধ পুলিশের! কে তুমি বলো? কি তোমার নাম? পরিচয় কি তোমার?

শুধু একটি মাত্র উত্তরই শোনা গেল নলিনীর মুখ থেকে,—Let me die peacefully. আমাকে শান্তিতে মরতে দাও।

১৯২৪ সালের ১লা মার্চ ফাঁসিমঞ্চে নিজেকে উৎসর্গ করলেন গোপীনাথ সাহা। মারতে চেয়েছিলেন কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে। কিন্তু ভুল হয়ে গেল। ফলে, প্রাণ দিতে হল আর্নেস্ট ডে-কে।

মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ গোপীনাথ!

বুঝি বারেকের জন্য তন্ময়তা ভেঙে জেগে উঠলেন সুভাষ। আজো তাঁর মনে আছে সেদিনের কথা। তিনি নিজেই জেল গেটে হাজির হয়েছিলেন শহীদের শবদেহ বহন করবেন বলে। ওরা তা দেয়নি।

ফাঁসির পরেই জনৈক শ্বেতাঙ্গ সার্জেণ্ট বেরিয়ে এসে গোপীনাথের নির্ভীকতার কথা উল্লেখ করে তাঁকে বলেছিলেন:

'He played like fawn
And at the dawn
Was slain on the lawn.'

১৯২৬ সালের ৯ই আগস্ট আবার ফাঁসির রজ্জু ভিজে উঠল শহীদের তাজা রক্তে। এবার প্রাণ দিলেন প্রমোদ চৌধুরী আর অনন্তহরি মিত্র।

আলিপুর জেলের অভ্যন্তরে যেভাবে ও'রা আই. বি. বিভাগের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা রায়বাহাদুর ভূপেন চ্যাটার্জীকে শেষ করে দিয়েছিলেন সত্যিই তার তুলনা নেই। রিভলবার ছিল না। ছিল একটা শাবল মাত্র। ঐ শাবলের এক ঘায়েই রায়বাহাদুর ঠাণ্ডা।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল শুরু হল তৃতীয় পর্ব। প্রথম সূত্রপাত চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ। তারপর এখানে-ওখানে সর্বত্র। শুধু ইতিহাস আর ইতিহাস! রক্তের অক্ষরে লেখা অবিস্মরণীয় ইতিহাস!

এ দাসত্ব চিরদিন থাকবে না। একদিন না একদিন ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই। সেদিন দেশবাসী ও'দের কাছে ঋণ স্বীকার করবে না? মাথা নোয়াবে না ও'দের নাম স্মরণ করে? না কি অকৃতজ্ঞ বলে জাতির ইতিহাসে এমনি করেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে চিরকাল?

প্রহরের পর প্রহর কেটে যায়। ভাবনার গতিও পাল্টায়।

মনে পড়ে গুরু দেশবন্ধুর কথা। মনে পড়ে তাঁর সেই ঐতিহাসিক উক্তি। ১৯২৪ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলে সেই পুরুষসিংহ তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন:

'If love of country is crime, I am a criminal. If Mr. Subhas Chandra Bose is a criminal, I am a criminal, not

only the Chief Executive Officer of the Corporation, but the Mayor of this Corporation is equally guilty.'

দেশবন্ধু !

সত্যিই তাই। দেশকে কে না ভালবাসে? কে না তার মঙ্গল চায়? কিন্তু দেশের জন্য এমনভাবে সর্বস্ব ত্যাগ করে 'দেশবন্ধু' হতে পেরেছেন ক'জন?

নিঝুম নিশুতি রাত্রি। চারিদিক মৌন, অকম্পিত। বুঝি গোটা অঞ্চল-টাই ঘুমিয়ে পড়েছে নিটোল ঘুমের অতলান্তে।

ঘুম নেই শুধু সুভাষের চোখে। আসে রাশি রাশি ভাবনা। অস্থির, চঞ্চল সব ভাবনা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সেই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এবারও কি তাই হবে? এমন সুবর্ণ সুযোগটাকে কি এমনি করে হেলায় হারাতে হবে? অসম্ভব!

কিন্তু কি করা যায় এখন এ পরিপ্রেক্ষিতে? কে দেবে তাঁকে পথের নির্দেশ?

ভাবতে ভাবতে অজ্ঞাতেই বুঝি এক সাগ্নিক সন্ন্যাসীর ছবি ভেসে ওঠে সুভাষের চোখের সমস্ত দৃষ্টি জুড়ে। ভেসে আসে তাঁর সেই অমৃতময় বাণী:

'পরে কি হবে—সর্বদা একথাই যে ভাবে, তার দ্বারা কোন কার্যই হতে পারে না। যা সত্য বলে বুঝেছিস, তা এখনই করে ফেল; পরে কি হবে না হবে সেকথা ভাববার দরকার কি? এতটুকু তো জীবন—তার ভিতর অত ফলাফল খতালে কি কোন কাজ হতে পারে? ফলাফল দাতা একমাত্র তিনি (ঈশ্বর) যাহা হয় করবেন, সে-কথায় তোর কাজ কি? তুই ওদিকে না দেখে কেবল কাজ করে যা।

—যারা ভীরু, কাপুরুষ তারাই সমুদ্রের তরঙ্গ দেখে তীরে নৌকা ডুবায়, মহাবীর কি কিছুতে দৃক্‌পাত করে রে?'

অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে নিমেষে মনের মণিকোঠা জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে সুভাষের। তাই হোক স্বামীজী, তাই হোক! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক! আশীর্বাদ কর, আমি যেন এই গুরু-দায়িত্ব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হাসি-মুখে বইতে পারি। তুমি আমাকে শক্তি দাও। আশীর্বাদ কর!

২৬শে জানুয়ারি, ১৯৪১ সাল।

সারা ভারত সেদিন উত্তাল। আজ স্বাধীনতা দিবস। আমরা স্বাধীনতা চাই!

হঠাৎ ছন্দপতন ঘটে গেল। জানা গেল—সুভাষ নিখোঁজ। সর্বত্র খুঁজে দেখা হয়েছে, কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান মেলেনি। কাউকে কিছু বলেও যাননি। কখন, কিভাবে গৃহত্যাগ করেছেন তাও জোর করে কিছু বলা সম্ভব নয়। ব্যাপারটা আগাগোড়াই রহস্যাবৃত।

বিস্ময়ে স্তব্ধ হেয় গেল গোটা ভারতবর্ষ। স্বাধীনতাই যাঁর জীবনস্বপ্ন, তিনি কিনা অদৃশ্য হয়ে গেলেন সেই স্বাধীনতা দিবসেরই পুণ্যলগ্নে! কিন্তু কেন? কোথায় গেলেন সুভাষ? কি ব্যাপার?

আশ্চর্য! সব যেমন ছিল, তেমনিই আছে। কোথাও কোন পরিবর্তন নেই। সবই চলছে সংসারের অপরিবর্তনীয় নিয়মের নির্দেশে। শুধু সুভাষই নেই। এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত!

খবর শুনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। মাত্র কিছুদিন আগে যাকে তিনি পরম স্নেহে কাছে টেনে নিয়ে 'দেশনায়ক' পদে বরণ করেছিলেন, সেই সুভাষ কিনা আজ নিখোঁজ!, এ দুঃখ তিনি রাখবেন কোথায়?

কাল-বিলম্ব না করে কবি এবার তার পাঠালেন মেজদা শরৎ বসুর কাছে:

'Deeply concerned over Subhas's disappearance. Convey to mother my sympathy. Kindly keep me informed of news.'

কি বলবেন মেজদা শরৎবাবু? বলার আছেই বা কি?

বিরাট বসু-পরিবারের মধ্যে এই একটি মাত্র লোক, যিনি প্রথম থেকেই জড়িত ছিলেন সুভাষের এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার সঙ্গে।

কিন্তু সেকথা বলার সাধ্য তাঁর কোথায়? সুবি যে তাঁর বড় আদরের! বড় গর্বের! তাই সব কিছু জেনেও বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে তাঁকে বলতে হল অন্য কথা:

'Mother and we profoundly touched by message. No news of Subhas yet despite utmost efforts last few days. Hope he will have your blessings whereever he may be.'

'সুভাষ যেখানেই থাক না কেন, আশা করি আপনার আশীর্বাদ সবসময়েই তার ওপর থাকবে।'

শরৎবাবু-প্রেরিত তারের এই শেষ লাইনটি খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ নয় কি, মল্লিকা! ভবিষ্যত-দ্রষ্টা ঋষি-কবিকে এই লাইনটির মধ্য দিয়ে তিনি কিছু বোঝাতে চেয়েছিলেন কিনা, কে জানে!

তার পাঠালেন গান্ধীজী:

'Startling news about Subhas. Please wire truth. Anxious. Hope all well—Bapu'.

উত্তর দিলেন শরৎবাবু:

'We as much in dark as public about Subhas's whereabouts and intention and even the exact time of leaving. No news inspite of best efforts for last three days. Circumstances indicate renunciation.'

তার পাঠালেন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ :

'Great anxiety about Subhas Babu. Please wire latest information.'

শরৎবাবুর সংক্ষিপ্ত উত্তর : 'No news'.

শুরু হল নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা। সাধু-সঙ্গের আশায় গৃহত্যাগ করা সুভাষের পক্ষে নতুন কিছু নয়। এবারও তেমন কিছু হয়নি তো!

হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই। সমর্থন জানালেন ফরোয়ার্ড ব্লকের অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট সর্দার শার্দুল সিং কবিশের। নিশ্চয় সাধু-সঙ্গের আশায় সুভাষ গৃহত্যাগ করেছেন। এমনি একটা আভাসই তিনি আমাকে দিয়েছিলেন মাত্র কিছুদিন আগে।

ভবী ভোলবার নয়, তাই সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে আহত সিংহের অন্তিম আর্তনাদ।

হ্যালো ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস, হ্যালো সুর্মাভ্যালি লাইট হর্স রাই-ফেলস.—সরকার বাহাদুরের পয়লা নম্বর শত্রু সুভাষ বোস পালিয়েছে। প্রতিটি ঘাঁটির ওপর কড়া নজর রাখো। কোনরকমেই যেন সে বর্ডার পেরিয়ে যেতে না পারে।

হ্যালো রেঙ্গুন, ব্যাঙ্কক, মালয়, সিঙ্গাপুর, হংকং এয়ারপোর্ট, প্রতিটি যাত্রীকে ভাল করে পরীক্ষা কর। প্রতিটি পাসপোর্ট নতুন করে পরীক্ষা কর।

কোনরকম সন্দেহ হলেই আটক করবে।

প্রতিটি বিদেশী জাহাজ তন্ন-তন্ন করে অনুসন্ধান কর। প্রতিটি নৌকার ওপর নজর রাখো। যে করে হোক সুভাষ বোসকে ধরা চাই-ই।

মল্লিকা, লক্ষ্য কর যে, যা কিছু তৎপরতা সবই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে।

কারণ, সময়োপযোগী একটি গুজব।

দমদম বিমান-বন্দর থেকে নাকি গতকাল একজন রহস্যময় যাত্রীকে একটি জাপানী বিমানে আরোহণ করতে দেখা গেছে। লোকটি আর কেউ নন, স্বয়ং সুভাষ।

অত্যন্ত চাতুর্য সহকারে সেদিন এই গুজবটি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল লোকের মুখে মুখে। উদ্দেশ্য—পুলিশের দৃষ্টিকে ভারতের পূর্ব-সীমান্তের দিকে নিবদ্ধ রাখা।

গুজবটি খুবই কার্যকরী হয়েছিল সন্দেহ নেই। সর্বশক্তিমান ব্রিটিশ শাসকরা সেদিন ভাবতেই পারেনি যে, তাদের ঘুম কেড়ে নেওয়া পয়লা নম্বরের শত্রু সুভাষ বোসের আসল লক্ষ্য আদপেই পূর্ব-সীমান্তে নয়, পশ্চিম-সীমান্তে।

এদিকে সবার অলক্ষ্যে তখন রুদ্ধশ্বাসে প্রহর গুনে চলেছেন অন্তর্ধান-পর্বের অন্যতম প্রধান নায়ক বি. ভি.-র সত্যরঞ্জন বক্সী। প্রতিটি দমবন্ধ

মুহূর্ত যেন একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনাকে কাছে টেনে আনছে। শেষ পর্যন্ত কি হবে কে জানে!

প্রকৃতপক্ষে সুভাষ অন্তর্ধান করেছেন ১৭ই জানুয়ারি রাত একটা বেজে পনেরো মিনিটে। কিন্তু খবরটা প্রচার করা হয়েছে আজ স্বাধীনতা দিবসের পুণ্যলগ্নে। না করে উপায়ও ছিল না। কারণ, কালই মামলার তারিখ রয়েছে সুভাষের।

ইতিমধ্যে ন'দিন কেটে গেছে। এখনো পর্যন্ত বর্ডার পেরিয়ে ওপারে যাওয়া সম্ভব হয়নি সুভাষের পক্ষে।

কোথায়, কিভাবে তিনি আছেন, সব কিছুই তাঁর নখদর্পণে। সীমান্ত-প্রদেশের ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা আকবর শা প্রেরিত সমস্ত রিপোর্টই ইতিমধ্যে তাঁর হাতে এসে গেছে।

সুভাষ এখন পেশোয়ারে। আজই তাঁর দুর্গম পথে পাড়ি দেবার কথা বিশ্বস্ত কর্মী ভগৎরামকে সঙ্গে নিয়ে।

অবশ্য যাবার কথা ছিল আরো আগেই ; তবু যে কয়েকটা দিন পেশোয়ারে দেরি করতে হল, তার মূলে রয়েছে পাঞ্জাবের কীর্তি কিষাণ পার্টির নতুন প্রোগ্রাম।

ঠিক হয়েছে, আগেকার নির্দিষ্ট পথের পরিবর্তে সুভাষকে এবার যেতে হবে অন্য একটি নতুন পথ দিয়ে।

এ-পথ যেমন দুর্গম, তেমনি বিপদসঙ্কুল। তবু কোন উপায় নেই। খাজুরী ময়দান হয়ে আফ্রিদি এলাকার শিনওয়ারি অতিক্রম করে যেতে পারলে দূরত্ব অনেক কম পড়বে। সুতরাং সব দিক বিবেচনা করে এটুকু ঝুঁকি তাঁকে নিতেই হবে।

কিন্তু সুভাষ সমতলভূমির সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের স্নিগ্ধ ছায়ায় মানুষ। এ-পথের ভয়ঙ্করতা সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও তাঁর নেই। এ অবস্থায় এই দুর্গম পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে নির্বিঘ্নে সীমান্তের ওপারে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে কি?

ভাবনার পর ভাবনা। এলোমেলো সব ভাবনা।

সবচাইতে বড় ভাবনা—সুভাষ। সুভাষ অসুস্থ। রীতিমত অসুস্থ। সুভাষ যে কতখানি অসুস্থ, সেকথা তাঁর চাইতে বেশি কেউ জানে না।

জানুয়ারি মাসে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যে কি ভয়ঙ্কর শীত, সেকথা একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া আর কারো পক্ষে কল্পনা করাও কষ্টকর।

একটা ভাল গরম জামা পর্যন্ত সঙ্গে নেই। নেওয়া সম্ভবও ছিল না। কারণ, সুভাষ এখন সুভাষ নন, সাধারণ একজন পাঠান মাত্র। কোট বা ওভার-কোট দুই-ই সেখানে বেমানান। উপযুক্ত জামা-কাপড় ছাড়া এই প্রচণ্ড শীত সহ্য করা অসুস্থ সুভাষের পক্ষে সম্ভব হবে কি?

নিশ্চয় সম্ভব। অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলাই তো বিপ্লবীর ধর্ম।

সুভাষ বিপ্লবের প্রদীপ্ত সূর্য। সুভাষ অসম্ভবের নায়ক। সুভাষ

যৌবনের অগ্রদূত। ইংরেজের সুখনিদ্রার বিভীষিকা সুভাষের অভিধানে অসম্ভব বলে কোন কথা নেই।

যত বাধা-বিপত্তিই মাথা উঁচিয়ে আসুক না কেন, সুভাষকে তাঁর লক্ষ্য থেকে কেউ বিচ্যুত করতে পারবে না। কেউ না।

তখনো ঝড় বয়ে চলেছে গোটা দেশের ওপর দিয়ে। কেন সুভাষ চলে গেলেন এমন করে? কেন? কেন?

এ-পথ অনিশ্চিতের পথ। এ-পথে জীবন ও মৃত্যুর পাশাপাশি বাস। তা জেনেও কেন সুভাষ এই বিপদসঙ্কুল পথে ঝাঁপ দিলেন কোনদিকে দৃক্‌-পাত না করে? কি এমন প্রয়োজন ছিল?

বিরাট এই ভারতবর্ষে নেতার অভাব নেই। কিন্তু কই, তাঁদের মধ্যে তো কেউ এমন করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন না সর্বস্ব পণ করে? তা হলে যত দায় কি শুধু সুভাষেরই?

এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে সর্বাগ্রে আমাদের সুভাষকে চিনতে হবে, মল্লিকা। তাঁর এই অদম্য চরিত্রের মূল উৎস কোথায়? কাদের তিনি পেয়েছিলেন চলার পথের সঙ্গীরূপে? কাদের সান্নিধ্যে তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন একটু একটু করে? কোন্‌ পরিবেশে?

এ প্রসঙ্গে প্রবীণ বিপ্লবী শ্রদ্ধেয় ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায় কি বলেছেন, শোন:

'সুভাষ একটি হঠাৎ সৃষ্টি নন।......সুভাষচন্দ্রের প্রাণগুরু স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর কর্মগুরু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। তাঁর বিপ্লবগুরু শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর সতীর্থ ও বন্ধু ছিলেন দুর্জয় বিপ্লবীদল। তাঁকে দেশনায়কের আসনে বরণ করেছেন আর কেহ নন—সুদূর-দ্রষ্টা ঋষি-কবি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।......তাঁর শৈশব-কৈশোর-যৌবন এর ধারাস্নানেই লালিত। তিনি মহনীয় এই ঐতিহ্যের সন্তান।'

এই হল সুভাষ। মহান ঐতিহ্যের সন্তান সেই সুভাষকে ধরে রাখা কি সেদিন সম্ভব ছিল কারো পক্ষে?

মায়ের স্নেহাঞ্চলই কি সেদিন তাঁকে পেরেছিল বেঁধে রাখতে?

বিপ্লবীর ধর্মই যে এগিয়ে যাওয়া! কি পেল, কি হারাল, ওসব তুচ্ছ হিসেব-নিকেশ করার মতো অবকাশ তাঁর কোথায়? ওসব ভাল ছেলেদের জন্য, সুভাষের জন্য নয়।

সুভাষ অসম্ভবের নায়ক।

কথাটা মিথ্যে নয়, মল্লিকা। জীবনে এমন বহু অসম্ভবকেই তিনি সম্ভব করে তুলেছিলেন অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে।

এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। পেশোয়ার থেকে যাত্রা শুরু করে, দুর্গম

পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে অনায়াসেই একদিন তিনি পোঁছে গেলেন কাবুল শহরে।*

তারপর প্রায় দেড়মাসাধিক কাল ওখানকার রেডিও-ব্যবসায়ী উত্তমচাঁদের আশ্রয়ে।

স্বপ্ন সার্থক হল ১৮ই মার্চ। ইতালিয়ান রাষ্ট্রদূত অ্যালবার্ট কোরানীর সহযোগিতায় সেদিন তিনি পাড়ি দিতে সক্ষম হলেন যুদ্ধরত ইয়োরোপের উদ্দেশ্যে।

সুভাষের লেখা মূল্যবান প্রবন্ধ, ইস্তাহার ও চিঠিসহ পরদিনই পথের সঙ্গী ভগৎরাম রওনা দিলেন হিন্দুস্থানের দিকে।

প্রথমেই গেলেন লাহোর। ফরোয়ার্ড ব্লকের অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট সর্দার শার্দুল সিং কবিশের এখন ওখানেই রয়েছেন। বোসবাবুর লেখা জরুরী চিঠিটি তাঁকে পোঁছে দেওয়া দরকার।

২৮শে মার্চ লাহোর থেকে কলকাতা। এবার প্রবন্ধ দুটি তুলে দিতে হবে মেজদা শরৎবাবুর হাতে।

ভগৎরামের মুখ থেকে খুঁটিনাটি সমস্ত বিবরণ শুনতে শুনতে আনন্দে আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন শরৎবাবু।

অর্ধেক পৃথিবীর অধীশ্বর ব্রিটিশ-রাজের সমস্ত শক্তিকে পর্যুদস্ত করে সুবি তার আপন লক্ষ্যে পোঁছে যেতে সক্ষম হয়েছে। এবার শুরু হবে তার আসল সংগ্রাম। দিন আগত ঐ!

সুভাষের লেখা সেই প্রবন্ধ নিশ্চয়ই তুমি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পড়ে থাকবে, মল্লিকা! আমি তার সংক্ষিপ্তসার এখানে তুলে দিচ্ছিঃ

'...ইয়োরোপে যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীজী ব্রিটিশের সঙ্গে নিঃশর্ত সহযোগিতার জন্য একটি প্রকাশ্য বিবৃতি দিলেন। এগারো বছর ধরে কংগ্রেস যা বলে এসেছিল, তা বেমালুম ভুলে যাওয়া হল।

গান্ধীজীর কাছে জাতির নেতৃত্বদানে তাঁর অক্ষমতাই প্রকাশ পেয়েছে। গান্ধী-আন্দোলন ক্রমশই গতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে এবং সংরক্ষণশীল হয়ে উঠেছে।

মন্ত্রিসভায় যোগ দেবার পর থেকেই গান্ধীবাদীরা ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছে, এবং ভবিষ্যতেও ক্ষমতার একাধিপত্য রক্ষার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছে।

বর্তমানে কংগ্রেসের মধ্যে যা চলছে, তাকে পাওয়ার পলিটিক্স ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এর মূলে কেন্দ্র হল, ওয়ার্ধা।

ওদের একমাত্র লক্ষ্য হল, কংগ্রেসের মধ্যে সমস্ত বিরোধী মনোভাবকে দমন করা, যাতে চিরকালের জন্য ওরা কর্তৃত্ব করতে পারে।...'

শরৎবাবুর নির্দেশে এবার ভগৎরাম দেখা করলেন অন্তর্ধান-পর্বের অন্যতম প্রধান নায়ক বি. ভি.-র দায়িত্বশীল নেতা শ্রদ্ধেয় সত্য বক্সীর সঙ্গে। তারপর সব কথাই তাঁকে খুলে বললেন একে একে।

---

*অন্তর্ধান-পর্বের বিস্তৃত বিবরণ প্রথম খণ্ডে দেওয়া হয়েছে।

বোসবাবুর নির্দেশ,—অবিলম্বে একজন বিশ্বস্ত কর্মীকে কাবুল যেতে হবে। তার কাজ হবে—আসন্ন সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসেবে ইতালিয়ান এ্যাম-ব্যাসির সহায়তায় ধ্বংসাত্মক কার্য-কলাপ পরিচালনা করার জন্য উপযুক্ত ট্রেনিং নেওয়া।

২১শে এপ্রিল ভগৎরাম আবার পেশোয়ার থেকে পায়ে হেঁটে কাবুলের দিকে পাড়ি দিলেন বি. ভি.-র বিশ্বস্ত কর্মী শান্তিময় গাঙ্গুলীকে সঙ্গে নিয়ে। ধ্বংসাত্মক কার্যের ট্রেনিং ছাড়াও ইতালিয়ান এ্যামব্যাসির মাধ্যমে বোস-বাবুর সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে শান্তিবাবুর সহায়তা খুবই প্রয়োজন।

আসন্ন সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসেবে বিভিন্ন উপজাতীয় সর্দারদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে শেষ পর্যন্ত কি করে যে তাঁরা একদিন কাবুলের মাটিতে পা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে আজ আর তোমাকে নতুন করে বলার কিছু নেই, মল্লিকা! কারণ, তার বিস্তৃত বিবরণ তোমাকে আমি আগেই শুনিয়েছি প্রথম পর্বে।

কাবুল পৌঁছেই ভগৎরাম দেখা করলেন উত্তমচাঁদের সঙ্গে। সেই উত্তম-চাঁদ, যিনি সব রকম বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়েও দেড়মাসাধিক কাল সুভাষকে আগলে রেখেছিলেন নিজের আশ্রয়ে।

অনেক কথাই জানালেন উত্তমচাঁদ। খবর শুভ। ২৮শে মার্চ তারিখে বোসবাবু নিরাপদে বার্লিন পৌঁছে গেছেন। ওখান থেকে যে-সব পত্র-পত্রিকা এসেছে, তা থেকেই খবরটা জানা গেছে। সঙ্গে ছবিও ছাপিয়েছে। তাছাড়া বন্ধু হাজি সাহেবের বাড়ির ঠিকানায় তাঁর চিঠিও এসেছে বার্লিন থেকে।

দেখা করলেন ইতালিয়ান রাষ্ট্রদূত অ্যালবার্ট কোরানীর সঙ্গে।

সঙ্গে সঙ্গে সে খবর চলে গেল বার্লিনে অবস্থিত সুভাষের কাছে। আমি কাবুলের ইতালিয়ান এ্যামব্যাসি থেকে অ্যালবার্ট কোরানী বলছি। কলকাতা থেকে লোক এসে গেছে। পরবর্তী নির্দেশ চাই।

নির্দেশ এল মে মাসের ২০ তারিখে।

অনেক নির্দেশ। বক্তব্যও অনেক। সেই সুদীর্ঘ বক্তব্য থেকে সংক্ষেপে কিছু কিছু অংশ তোমাকে শোনাচ্ছিঃ

'...অক্ষশক্তির সঙ্গে এখনো পর্যন্ত আমার কোন রাজনৈতিক বোঝাপড়া হয়নি। অবশ্য বোঝাপড়া না করেই তারা আমাকে সব রকম সাহায্য দিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমি তা মেনে নিতে রাজী নই।

সর্বাগ্রে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে তাদের প্রকাশ্য ঘোষণা চাই। স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের সংবিধান ভারতের জনগণই ঠিক করবেন,—এ স্বীকৃতি আমি পক্ষকালের মধ্যেই পাব বলে আশা করি।

কাবুল থেকে পেশোয়ার এবং পেশোয়ার থেকে কলকাতা পর্যন্ত যোগা-যোগ রক্ষার জন্য অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

আর কলকাতার বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা প্রয়োজনবোধে কাবুল আসবেন. তাঁদের আশ্রয় ও নিরাপত্তার দিকে কঠোর দৃষ্টি রাখা দরকার।

কলকাতার বন্ধুদের প্রতি আমার নির্দেশ, তাঁরা যেন গুর্খাসৈন্যদের মধ্যে প্রচারকার্য চালানোর জন্য কিছু-সংখ্যক বিশ্বস্ত লোককে নেপালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

আর কিছু-সংখ্যক তরুণকে অবিলম্বে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হবে। তাদের কাজ হবে সৈন্যদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা এবং সামরিক বাহিনীর গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ করা।

ব্রহ্মদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যও ওখানে কিছু-সংখ্যক লোক পাঠানো প্রয়োজন।...'

কলকাতার বন্ধুরা কি সে দায়িত্ব পালন করেছিলেন যথাযথভাবে?

করেছিলেন বৈকি। শুধু ব্রহ্মদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে নয়, সেই ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্যে মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে, পায়ে হেঁটে ব্রহ্ম রণাঙ্গণে গিয়ে স্বয়ং সুভাষের সামনেই সশরীরে হাজির হতে সক্ষম হয়েছিলেন, মল্লিকা। সুভাষ তখন আর শুধুমাত্র সুভাষ নন, বিশ্বের বিস্ময় এক ও অদ্বিতীয় নেতাজী। সে কাহিনী তোমাকে শোনাব পরবর্তী কোন এক সময়।

এদিকে তখন ব্যস্ততার সীমা নেই অন্তর্ধান-পর্বের অন্যতম প্রধান নায়ক বি. ভি.-র সত্য বক্সীর।

ব্যস্ততার কারণ সুভাষ-প্রেরিত সেই ইস্তাহার, যার ওপরে লেখা রয়েছে 'A message to my countrymen.' নিচে কোন ঠিকানা নেই। শুধু লেখা রয়েছে—'From somewhere in Europe.'

সুভাষের নির্দেশে তার হাজার হাজার কপি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এখানে-ওখানে সর্বত্র। সংবাদপত্র, বিভিন্ন দূতাবাস, যাবতীয় সরকারী ও বেসরকারী অফিস, কিছুই বাদ যায়নি। এমন কি, শহরের বিশিষ্ট নাগরিকদের কাছেও তা ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে যথাযথভাবে।

এ ব্যাপারে অমলেন্দু ঘোষ (মুকুল), নির্মল রায়, কমলা দাশগুপ্তা প্রমুখ দলীয় সদস্যদের ভূমিকা সত্যিই উল্লেখযোগ্য। কোন ত্রুটিই তাঁরা রাখেননি এ ব্যাপারে।

সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, মেজর সত্য গুপ্ত, রসময় শূর, নিকুঞ্জ সেন, সুপতি রায় প্রমুখ দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ প্রায় সবাই তখন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে।

ভরসা বলতে শুধু যতীশ গুহ, বিনয় সেনগুপ্ত, কামাখ্যা রায়, কমেট্ দাশগুপ্ত প্রমুখ কয়েকজন, যাঁরা তখনো জেলের বাইরে রয়েছেন। আর রয়েছেন গুটি-কয়েক তরুণ কর্মী। পুলিশের নজর এড়িয়ে কি নিখুঁতভাবেই না তাঁরা প্রতিটি কাজ করে চলেছেন ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে! চোখে না দেখলে বিশ্বাস করাও শক্ত।

এখন সর্বাগ্রে প্রয়োজন সুভাষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য একটি গুপ্ত বেতার-কেন্দ্র তৈরি করা।

এ কাজের জন্য চাই একজন অতি বিশ্বস্ত সুদক্ষ টেক্‌নিসিয়ান। এমন

লোক চাই, যিনি ডাক পড়লেই যেন সব কিছু ফেলে রেখে বেরিয়ে পড়তে পারেন বাড়ি থেকে।

কোথায় পাওয়া যাবে এমন লোক, যার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা চলে?

দলীয় সদস্য সত্যব্রত মজুমদার দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত।

যাদবপুর কলেজের ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসের ছাত্র। ফাইনাল ইয়ার। সামনেই পরীক্ষা। তবু বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে প্রয়োজন হলে পরীক্ষা বন্ধ রেখেও এ কাজে আত্মনিয়োগ করতে তিনি রাজী।

এমনি আরো নানা কাজে আত্মনিয়োগ করতে এগিয়ে রয়েছেন ধীরেন সাহা রায়, সুবোধ চক্রবর্তী, রাতুল রায়চৌধুরী, জগদীন্দ্র সেন, নীরেন রায় প্রমুখ বি. ভি.-র আরো কয়েকজন দায়িত্বশীল তরুণ কর্মী।

তবে আর কতদিন যে বাইরে থাকা সম্ভব হবে, বলা শক্ত। কারণ, পুলিশী তৎপরতা।

হিংস্র হায়েনার মতো পুলিশ ঘুরে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। যে করে হোক অন্তর্ধান-পর্বের রহস্য ভেদ করতে তারা বদ্ধপরিকর। হাজার চেষ্টা করেও এখন পর্যন্ত কোন সূত্র তারা আবিষ্কার করতে পারেনি। পারবে বলেও মনে হয় না। তবু সাবধানের মার নেই। একটু অসতর্ক হলে কখন কি ঘটে যাবে, কে বলতে পারে!

শুধু পুলিশ নয়, জনসাধারণও তখন সেই তিমিরে। সেই একই প্রশ্ন তাদের মনে ঘুরপাক খেয়ে চলেছে সর্বক্ষণ।

সুভাষ কোথায়? সব কিছু ফেলে কোথায় তিনি চলে গেলেন এমন করে?

২৬শে জানুয়ারি জানাজানি হলেও প্রকৃতপক্ষে সুভাষ নাকি ১৭ই জানুয়ারিই রহস্যজনকভাবে অন্তর্ধান করেছেন এলগিন রোডের বাড়ি থেকে। তারপর মাসের পর মাস কেটে গেছে, কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁর কোন সন্ধানই পাওয়া যায়নি।

তবে কি সত্যিই তিনি সন্ন্যাসী হয়ে চিরদিনের মতো চলে গেছেন হিমালয়ের কোন গহন কন্দরে? না কি জাপানে গিয়েছেন সেদিনের সেই রহস্যময় বিমানে?

সরকার পক্ষও নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। উপায় কি? এত সতর্কতা সত্ত্বেও লোকটা তাদের সমস্ত মান-সম্ভ্রম পথের ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে নাগালের বাইরে চলে গেছে। এতবড় লজ্জার কথাটা সরকার বাহাদুর নিজের মুখে ব্যক্ত করবেন কি করে?

এতবড় পরাজয়টা কি এত সহজে ভোলা যায়? না কি ভোলা সম্ভব?

তাই সুভাষকে না পেয়ে এবার যত আক্রোশ গিয়ে পড়ল এলগিন রোডের বাড়িটার ওপর। সুভাষ বোস থাক, আর না-ই থাক, বাড়িটা তো আছে!

ওটার ওপর দিয়েই গায়ের জ্বালা কিছুটা মেটানো যাক। তখনকার সময়ের সাময়িক পত্রিকা থেকেই তার কিছুটা বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি :

'ভারত-রক্ষা বিধানে অভিযুক্ত শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মামলা বিচারাধীন থাকা কালে নিরুদ্দেশ হওয়ায় তাঁহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও হুলিয়া জারি করা হয় এবং তাঁহার সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ দেওয়া হয়।

এই আদেশ জারির পর ছয় মাস অতীত হওয়ায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু আদালতে হাজির না হওয়ায় উত্তর বিভাগ পুলিশ কোর্টের অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট খান বাহাদুর ওয়ালি উল ইসলাম এই মর্মে আদেশ জারি করিয়াছেন যে, ৩৮।২ নং এলগিন রোডস্থ বাড়িতে আসামীর যে এক-চতুর্থাংশ স্বত্ব রহিয়াছে, তাহা ফৌজদারী কার্যবিধির ৮৮(৭) ধারা মতে সরকারের আয়ত্তাধীনে আসিল।

মহাজাতি সদন সম্পর্কে হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে এই সম্পত্তি সম্বন্ধে বিবেচনা ১৯৪২ সালের ৩১শে জানুয়ারি পর্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে।' [সাপ্তাহিক দেশ : ২৭শে ডিসেম্বর : ১৯৪১ সাল]

'বিচার হইয়া গেল।' কিন্তু আসামী কোথায় ? না, সে সম্বন্ধে কোন জবাব নেই।

কিন্তু জনসাধারণ সেকথা শুনবে কেন ? তারা যে জবাব চায়! জানতে চায় যে, সুভাষ কোথায় ?

১০ই নভেম্বর তারিখে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে সর্বপ্রথম প্রশ্ন তুললেন যুবরাজ দত্ত : সুভাষ কোথায় ? আমরা মহামান্য সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে সুস্পষ্ট জবাব চাই।

জবাব দিলেন স্বরাষ্ট্র-বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ কনর‍্যান স্মিথ : তিনি শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছেন। বর্তমানে রোম অথবা বার্লিনে রয়েছেন।

প্রমাণ ? প্রমাণ আছে কিছু তোমাদের কাছে ?

হ্যাঁ, আছে।

দেখানো হল কতকগুলি ইস্তাহার। সেই ইস্তাহার, যা সেদিন সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সুভাষের নির্দেশে।

হ্যাঁ, তাই। ঠিক দুদিন বাদেই সমর্থন জানাল এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস। খবর সত্যি। এ খবর আমরা শুনেছি বার্লিন, রোম এবং টোকিও রেডিও থেকে। রোম এবং টোকিও থেকে বলা হয়েছিল হিন্দুস্থানী ভাষায়।

স্রেফ বাজে কথা। প্রতিবাদ জানালেন বিলেতের 'নিউ স্টেটস্ম্যান এণ্ড নেশন' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ কিংসলী মার্টিন। আমি এসব বিশ্বাস করি নে।

মধ্যপন্থা অবলম্বন করলেন ভারত-সচিব মিঃ এমেরী। বোস কোথায় আছেন আমি জানি নে।

একই দিনে বার্লিন রেডিও থেকে বলা হল অন্য কথা। হ্যাঁ, বোস এখানেই রয়েছেন। সম্প্রতি একটা বোঝাপড়া হয়েছে আমাদের মধ্যে। আমরা এখন পরস্পরের বন্ধু।

এতটুকুও আশ্বস্ত হতে পারল না জনসাধারণ। এ তো যুদ্ধের খবর! যুদ্ধের খবর মানেই তো মিথ্যের বেসাতি! এ কবির লড়াইকে যে বিশ্বাস করাও শক্ত!

কিন্তু এটাই সত্যি। জোর গলায় জানাল বিলেতের এম্পায়ার নিউজ এজেন্সী, সুভাষ বোস বার্লিনে রয়েছেন। জার্মানরা তাঁকে আফগানিস্তান ও সিরিয়ার মধ্য দিয়ে প্রথমে রোমে নিয়ে যায়। সেখানকার বেতার-যন্ত্র যথেষ্ট শক্তিশালী নয় বলে পরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বার্লিনে। রোম রেডিও থেকে স্পষ্ট আমরা একথা শুনেছি।

তাই বুঝি? প্রশ্ন তুলল বিভিন্ন সংবাদপত্রসমূহ, রোমের বেতারযন্ত্র যথেষ্ট শক্তিশালী না হলে তোমরা সেকথা স্পষ্ট শুনলে কি করে?

এবার রঙ্গমঞ্চে হাজির হলেন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্। স্বনামখ্যাত পুরুষ। বিশেষ করে সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে এত ভাল ভাল কথা বলতে সত্যিই সেদিন তাঁর কোন জুড়ি ছিল না সারা ইংল্যাণ্ডে। তবে কাজে নয়, কথায়। তাই ঠাট্টা করে অনেকেই তাঁকে বলতেন,—'বিলিতি জওহরলাল।'

ক্রীপস্-এর বক্তব্য: সুভাষ বোস বার্লিনেই রয়েছেন। হ্যাঁ, এ ব্যাপারে তিনি নিঃসন্দেহ।

ততক্ষণে বিলেতের সবগুলি পত্র-পত্রিকা একসঙ্গে রব তুলেছে—কুইস্লিং! কুইস্লিং! কুইস্লিং! সুভাষ বোস ভারতের পয়লা নম্বর কুইস্লিং।

তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করলেন সাংবাদিক শ্রেষ্ঠ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়: 'কে বলে সুভাষ কুইস্লিং? গ্যারিবল্ডি, সান ইয়াতসেন, ডি ভ্যালেরা প্রমুখ স্বাধীনতার বীর যোদ্ধারা সবাই তাঁদের মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার জন্য বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়েছিলেন বলে জানি। তাঁরা কি কুইস্লিং? সম্প্রতি ফ্রান্সের দ্য-গল তোমাদের দেশে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন বলে শুনেছি। তাঁর উদ্দেশ্য নাকি মুক্তিফৌজ গঠন করে ফ্রান্সকে মুক্ত করা। কই তাঁকে তো তোমরা কুইস্লিং বলছ না? বরং তোমরা সবাই দেখছি তাঁর প্রশংসায় পঞ্চ-মুখ! তাহলে সুভাষের বেলায় তার ব্যতিক্রম কেন? স্বার্থে আঘাত লেগেছে বলেই কি?'

ঠিক তাই মল্লিকা। এটাই সংসারের নিয়ম। যতক্ষণ তোমার দ্বারা আমার স্বার্থসিদ্ধি হবে, ততক্ষণ আমার কাছে তুমি খুবই ভাল লোক। একটু এদিক-ওদিক হলেই মুশকিল। তখন আমার একমাত্র কাজ হবে, নানাবিধ প্রচারের মাধ্যমে সর্বসমক্ষে তোমার চরিত্র হনন করে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা।

যেমন করা হয়েছিল বাংলার মৃত্যুভয়হীন বিপ্লবীদের বেলায়। 'Give the dog a bad name to hang him.' এ তো আমাদের নিজের চোখেই দেখা।

সুতরাং সুভাষের সেদিনের সেই রুদ্রমূর্তি দেখে বিপন্ন ইংরেজ যে তাঁকে কুইস্লিং আখ্যা দেবে, তাতে আর বিচিত্র কি। বরং তাই তো স্বাভাবিক। 'সুভাষ ইংরেজের পয়লা নম্বর শত্রু'—এই তো তাঁর সবচাইতে বড় গৌরব।

সুভাষ কুইস্লিং। কারণ, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের সঙ্গে কোনরকম সহযোগিতা করতে তিনি প্রস্তুত নন।

কিন্তু কি হয়েছিল জন এমেরীর বেলায় ?

জন এমেরীকে চিনতে তোমার খুব কষ্ট হবে না, মল্লিকা।

দোর্দণ্ড-প্রতাপ মিঃ এমেরী তখন আমাদের ভারত-সচিব। পদমর্যাদার দিক থেকে ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর পরেই তাঁর স্থান। জন এমেরী তাঁরই ছেলে। যুদ্ধের সময়ে প্রচুর ব্রিটিশ-বিরোধী বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন বার্লিন রেডিও থেকে।

তাঁকেও কি বিশ্ব-সমক্ষে এভাবে হেয় করা হয়েছিল কুইস্লিং বলে ?

না, হয়নি। যুদ্ধ শেষে অনেকের মতো তাঁরও বিচার হয়েছিল। সাজাও হয়েছিল। কিন্তু কুইস্লিং! না, ইংরেজ অত বোকা নয়। 'Divide and Rule' কোথায়, কিভাবে প্রযোজ্য সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ তা ভাল করেই জানে।

জনসাধারণ আরও বিভ্রান্ত। এসব একঘেয়ে, অসংলগ্ন, পরস্পরবিরোধী অপপ্রচারে আর তারা কান দিতে রাজী নয়।

তাদের একমাত্র প্রশ্ন—সুভাষ কোথায় ? তিনি বেঁচে আছেন কি নেই ? বেঁচে থাকলে এ সময়ে তিনি নীরব কেন ?

স্বাধীনতাই যাঁর একমাত্র স্বপ্ন, এ সময়ে তাঁর চুপ করে থাকার কথা নয়। তাহলে কেন তাঁর এই নিরুত্তাপ শীতলতা ? কি ব্যাপার ? কোথায় এই রহস্যের উৎস ?

কোথায় এই রহস্যের উৎস ?

একই প্রশ্ন তখন উত্তাল হয়ে উঠেছে বার্লিন-প্রবাসী ভারতীয়দের মনে।

রহস্যের কারণ ছোট্ট একটি চিঠি। চিঠি দিয়ে কে যেন একজন অচেনা ভদ্রলোক চায়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁদের সবাইকে। নাম তাঁর—'সিনর অরল্যাণ্ডো ম্যাজোট্টা !'

কে এই সিনর অরল্যাণ্ডো ম্যাজোট্টা ? কি পরিচয় তাঁর ? সবার ঠিকানাই বা তিনি পেলেন কি করে ?

পথে-ঘাটে দেখা হলে সেই একই কথা। কে ইনি ? আপনি কিছু শুনেছেন কি ? কি ব্যাপার ?

আমারও জিজ্ঞাস্য তাই। কে এই অচেনা ভদ্রলোক ? নাম শুনে ইতালিয়ান বলে মনে হয়। কিন্তু এভাবে ওঁর সবাইকে আমন্ত্রণ জানানোর অর্থ কি ?

প্রশ্নের পর প্রশ্ন। অসংখ্য প্রশ্ন।

চিঠি এসেছে ৬নং সোফিয়েন ষ্ট্রস-এ অবস্থিত প্রাক্তন ব্রিটিশ রাজদূত ভবন থেকে। এর মানে কি ? ব্যাপারটা আগাগোড়াই কেমন যেন রহস্যময় !

যথাসময়ে সবাই গিয়ে হাজির হলেন নির্দিষ্ট স্থানে। চোখে-মুখে তাঁদের অধীর কৌতূহল।

বিশিষ্ট জার্মানদের মধ্যেও এসেছেন কেউ কেউ। তাঁরাও এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত।

কিন্তু সিনর অরল্যাণ্ডো ম্যাজোট্টা কোথায়? কোথায় সেই রহস্যময় পুরুষ?

সহসা কি দেখে বিস্ময়ে ছিটকে পড়লেন প্রবাসী ভারতীয়গণ।

কে? কে? কে এই সিনর অরল্যাণ্ডো ম্যাজোট্টা?

কে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের চোখের সামনে?

এ কি দিবাস্বপ্ন, না কি অসুস্থ চিত্তের মায়া-বিভ্রম?

আবার তাকালেন পরিপূর্ণভাবে।

না, ভুল নয়। এত কাছে থেকে নিজের লোককে চিনতে কেউ ভুল করে না। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই দীপ্ত ভঙ্গী, কোথাও এতটুকু অমিল নেই। কোথাও এতটুকু অস্পষ্টতা নেই। কোথাও কুয়াশার জাল নেই।

সুভাষ! সুভাষ! সুভাষ! ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একক প্রতিনিধি সুভাষ ছাড়া উনি আর কেউ নন।

কিন্তু কি করে এটা সম্ভব হল?

যুদ্ধের আগুনে গোটা ইয়োরোপ এখন জ্বলছে। এই ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্যে সমস্ত ব্রিটিশ শক্তিকে পরাভূত করে কি করে তাঁর পক্ষে এ সময়ে বার্লিনে আসা সম্ভব হল? এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত!

সত্যিই বিশ্বাস করা শক্ত, মল্লিকা। কারণ, কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। সুভাষকেও তার জন্য কম বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়নি দিনের পর দিন।

কাবুল থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৮ই মার্চ, ১৯৪১ সালে। সঙ্গে ইতালিয়ান পাশপোর্ট। নাম—'সিনর অরল্যাণ্ডো ম্যাজোট্টা'।

কিন্তু কেন? এত নাম থাকতে হঠাৎ সিনর অরল্যাণ্ডো ম্যাজোট্টা নামটা পছন্দ করা হল কেন?

এটা কি কোন কল্পিত নাম? না কি এই নামে সত্যিই সেদিন কেউ ছিলেন ইতালিয়ান দূতাবাসে?

হ্যাঁ, ছিলেন। বলেছেন জার্মানীর বৈদেশিক দপ্তরের তখনকার সময়ের দায়িত্বশীল কর্মী ডঃ আলেকজান্দার ওয়র্থ। সেদিন সত্যিই এই নামে একটি কূটনৈতিক পর্যায়ের ওয়্যারলেশ অপারেটারের পদ খালি ছিল ইতালিয়ান দূতাবাসে। তারপর যা হবার তাই হল। শেষপর্যন্ত সেই কূটনৈতিক পর্যায়ের ওয়্যারলেশ অপারেটার সাজতে হল সুভাষকেই।

'At the Italian Legation in Kabul there happened to be a vacant position for official wireless operator with diplomatic status. This position including a diplomatic passport in the name of Orlando Mazzota was taken over by Netaji.'

[Netaji in Germany : Alexander Werth : P.—12]

ফল কিন্তু ভালই হয়েছিল, মল্লিকা। সাধারণ যাত্রীর পক্ষে ভিন্ন রাষ্ট্রে যেতে হলে সেক্ষেত্রে তল্লাশির প্রশ্ন আসবেই। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনে কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের বেলায় সাতখুন মাপ। সুতরাং সেদিক থেকেও নিশ্চিন্ত।

হিন্দুকুষের উঁচু-নিচু গিরিপথ, তাশকুরগানের গিরিমালা, আফগান-প্রান্তরের অসংখ্য হিমশীতল মৃত নগরী, পুণ্যতীর্থ মাজার-ই-শরীফ, ভয়াবহ জঙ্গলে ঘেরা বিষাদময় অক্সাস ও পাটাকেসরের জঘন্য পারঘাট অতিক্রম করে অবশেষে সমরখন্দ।

২০শে মার্চ টারমিজ। টারমিজ থেকে ট্রেনে মস্কো। সঙ্গে সেই ডাঃ ওয়েলগার, যিনি সুভাষের সহযাত্রী হয়ে একই সঙ্গে যাত্রা করেছিলেন কাবুল থেকে।

রাশিয়া। বিপ্লবের পীঠস্থান রাশিয়া।

প্রথম থেকেই সুভাষের লক্ষ্য ছিল এই রাশিয়া।

যুদ্ধের আগে এমন বহুবারই তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে বৈদেশিক সাহায্য পেতে হলে একমাত্র রাশিয়ার কাছ থেকেই তা আশা করা সম্ভব। কারণ, সারা পৃথিবীতে রাশিয়াই একমাত্র দেশ, যাদের শোষিত ও নির্যাতিতের প্রতি সহানুভূতি আছে।

কার্যত কিন্তু তা আর সম্ভব হল না, মল্লিকা। কারণ, ইয়োরোপের তখনকার সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি।

একদিকে রাশিয়া তখন জার্মানীর সঙ্গে মৈত্রী-সূত্রে আবদ্ধ, অন্যদিকে ব্রিটিশও পিছিয়ে নেই।

মস্কোর ব্রিটিশ রাজদূত 'বিলিতি জওহরলাল' স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ ইতিমধ্যেই তাঁর কাজ শুরু করে দিয়েছেন ভেতরে ভেতরে। জার্মানীকে তোমরা বিশ্বাস করো না। একদিন তোমরাই যে তাদের দ্বারা আক্রান্ত হবে না, তা কে বলতে পারে! সুতরাং খুব সাবধান! কথাটা ভেবে দেখো একবার।

একদিকে জার্মানী, অন্যদিকে ব্রিটিশ। এ অবস্থায় ইচ্ছা থাকলেই বা রাশিয়ার পক্ষে ব্রিটিশের পয়লা নম্বর শত্রু সুভাষ বোসকে সহায়তা করার মতো সাধ্য কোথায়? জেনে-শুনে এতবড় ঝুঁকি তাঁরা নেবেনই বা কেন?

তবে সরকারীভাবে কিছু না করলেও সুভাষের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার কিন্তু ছিল খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ। তাঁর ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেও তাঁদের দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সজাগ। প্রত্যক্ষভাবে এর চাইতে বেশি কিছু করা সত্যিই সেদিন সম্ভব ছিল না তাঁদের পক্ষে।

কিন্তু পরোক্ষভাবে! পরোক্ষভাবে সেদিন যেটুকু তাঁরা করেছিলেন, তার মূল্য কিন্তু মোটেই কম নয়, মল্লিকা।

তাঁদের সহযোগিতা না পেলে সুভাষের পক্ষে বার্লিন যাওয়া সম্ভব হত কি করে? সিনর অরল্যাণ্ডো ম্যাজোট্টার পরিচয় তো তাঁদের অজানা ছিল না!

মস্কোর জার্মান দূতাবাসের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের অধিকর্তা সেদিন সুভাষের ব্যাপারে রাশিয়ার মনোভাব সম্বন্ধে বার্লিনে কি রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন, শোন :

'In Moscow no official cognizance had been taken of his presence, but the Russians had done everything they could to make his stay there a pleasant one. Revolution in India fitted their plans excellently.' [An Extract from Nachrichtendieust i.e., the German Military Intelligence Service for East in the charge of Paul Leverkuehn: Netaji in Germany: N. G. Ganpuley: P.—181]

মস্কো থাকতেই সুভাষ দেখা করলেন ওখানকার জার্মান রাষ্ট্রদূত Count Vou Derschulenburg-এর সঙ্গে।

এগিয়ে যাওয়াই বিপ্লবীর ধর্ম। চলার পথে রাশিয়াকে পাওয়া গেল না, তা বলে পিছিয়ে গেলে তো আর চলবে না। দেখা যাক, এবার বার্লিনে গিয়ে কিছু হয় কিনা!

মস্কো থেকে আকাশপথে বার্লিন অভিমুখে।

বার্লিন সুভাষের কাছে নতুন কিছু নয়। হিটলার, গোয়েরিং প্রমুখ নাৎসী প্রধানগণও তাঁর অপরিচিত নন। এ পরিচয় ঘটেছিল নাৎসী শাসনের প্রথম দিকে। সুভাষ তখন ইয়োরোপে নির্বাসিত।

কিন্তু কেন? সুভাষ কি নাৎসী সমর্থক?

না, কোনদিনই না।

তাহলে সুভাষ কেন সেদিন পরিচয় করেছিলেন হিটলার, গোয়েরিং প্রমুখ নাৎসী নায়কদের সঙ্গে?

কারণ, সুভাষের দূরদর্শিতা। সুভাষ জানতেন যে, আজ হোক বা কাল হোক, যুদ্ধ অনিবার্য। ভারতবর্ষের পক্ষে সেটা হবে একটা চমৎকার সুযোগ। সে সুযোগটাকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হবে। সর্বস্ব পণ করে সেদিন আঘাত করতে হবে পররাজ্যগ্রাসী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে। এ ব্যাপারে ব্রিটিশের শত্রুপক্ষই হবে আমাদের সবচাইতে বড় মিত্র। আর যাই হোক, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভুলের পুনরাবৃত্তি কিছুতেই আর সেদিন ঘটতে দেওয়া হবে না।

এখানেই গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষের তফাৎ, মল্লিকা।

গান্ধীজীর বক্তব্য, হিংসা বা দ্বেষ নয়, শুধু ভালবাসা দিয়েই ইংরেজের হৃদয় পরিবর্তন করে আমি তোমাদের স্বাধীনতা এনে দেব।

ঠিক তাঁর বিপরীত হলেন সুভাষ। তাঁর বক্তব্য, সাপ মারতে হলে লাঠির দরকার, মনসা পুজোয় কোনদিনও সাপ মরে না।

গান্ধীজীর লক্ষ্য, আপস-আলোচনার মাধ্যমে সাবধানে পা ফেলে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাওয়া।

সুভাষের মতে, এটা কোন যুক্তিই নয়। ভিক্ষায় কোনদিন স্বাধীনতা আসে না। দর-কষাকষির মাধ্যমেও নয়। স্বাধীনতার মধ্যে গোঁজামিলের কোন স্থান নেই। চরম মূল্য দিয়েই তা অর্জন করতে হয়। সুতরাং চাই সংগ্রাম। অহেতুক কালহরণ না করে এখনই আমাদের সংগ্রামের পথে পা বাড়ানো উচিত।

গান্ধীজীর প্রথম ও শেষ কথা, অহিংসা। স্বাধীনতা নিশ্চয়ই চাই, কিন্তু সে স্বাধীনতা আমাদের অর্জন করতে হবে একমাত্র অহিংসার মাধ্যমে। অন্যথায় সে স্বাধীনতা তাঁর কাছে অর্থহীন।

সুভাষের প্রধান লক্ষ্য, স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তিনি সব কিছুই করতে প্রস্তুত। মোদ্দা কথা, ছলে-বলে-কৌশলে, যেভাবেই হোক না কেন, স্বাধীনতা চাই-ই!

সুভাষের এই মনোভাব কারোরই অজানা ছিল না। গান্ধীজীও জানতেন। জানতেন হিটলার, গোয়েরিং প্রমুখ নাৎসী নেতৃবৃন্দও। সেদিনই তিনি হিটলার, গোয়েরিং প্রমুখ সবাইকে প্রশ্ন করেছিলেন খোলাখুলিভাবে। কবে তোমরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে, বলো?

স্পষ্ট জবাব মেলেনি। যা মিলেছিল তা সবই অস্পষ্ট, ভাসা ভাসা। অর্থাৎ—আমরা ওসব এখন ভাবছি নে।

আমরা ভেবেছি। সাফ জবাব দিয়েছিলেন সুভাষ। ব্রিটেন আমাদের চিরশত্রু। তোমরা কিছু কর বা না কর, আমরা লড়াই করবই।

'Britain is our traditional enemy. We will fight her, whether you support or not.'

'সুভাষ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। তাঁর কাছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্নটাই ছিল সবচাইতে বড়। কোন্ পন্থায়, কোন্ নীতি অবলম্বন করে সে স্বাধীনতা আসবে, তা নিয়ে কোনরকম গোঁড়ামি তাঁর ছিল না।'

বলেছেন ইহুদী লেখক Otto Zarek ১৯৩৫ সালের কথা। সুভাষ তখন ভিয়েনাতে। তখনই পরিচয় গড়ে উঠেছিল দুজনের মধ্যে। অটো জারেকের ভাষায়ঃ

'ইয়োরোপ সম্বন্ধে সুভাষের যে জ্ঞান ছিল, কোন সত্যিকারের ইয়োরোপীয়ানের পক্ষেও তার চাইতে বেশি কিছু জানা সম্ভব ছিল না।

দোষ ছিল এক জায়গায়। ভয়ঙ্কর ব্রিটিশ-বিদ্বেষী ছিলেন তিনি '..his implacable hatred of the British',—মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করতাম এই নিয়ে। শুনে হাসতেন শুধু।

হঠাৎ একদিন তিনি কাউকে কিছু না বলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ভিয়েনা থেকে। খুবই অবাক হয়েছিলাম সেদিন। অনেক ভেবেছি, কিন্তু কোন সদুত্তর খুঁজে পাইনি।

ফিরে এলেন প্রায় সপ্তাহ দুই বাদে। তেমনি হাস্যোজ্জ্বল। তেমনিই আনন্দময়।'

কিন্তু কোথায় গিয়েছিলেন সুভাষ? কার কাছে?

অটো জারেকের মুখ থেকেই সে কাহিনী শোনা যাকঃ

'দেখা হতেই সেদিন তিনি বললেনঃ

কোথায় ছিলাম—জানো? বার্লিন। হিটলারের সঙ্গে দেখা করে এলাম।

খবরের মতো খবর বটে। ভেবেছিলাম, ভারতের যুব-সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে জার্মানী এবং নাৎসীদের সম্বন্ধে তিনি খুব খারাপ কিছু বলবেন, কিন্তু আমারই ভুল হয়েছিল। জার্মান রাইখের সব কিছুই যেন তাঁকে প্রভূত আনন্দ দিয়েছিল। হিটলার যে জার্মানীর পুনরুত্থানের জন্য কিভাবে কাজ করে চলেছেন, তাই ছিল তাঁর কাছে সবচাইতে বড় বিস্ময়।

সব শুনে আমি আর প্রশ্ন না করে পারলাম না—আপনি কোন্ জাতীয় পুনরুত্থানের কথা বলছেন?

যুদ্ধ! ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধ!

এই একটি মাত্র ইচ্ছা ছাড়া তাঁর যেন আর দ্বিতীয় কোন ইচ্ছা ছিল না। আর আশ্চর্য, ইনি এমনই একজন মানুষ যে, যা চাইতেন তাই যেন পেয়ে যেতেন।

বস্তুত এই একটি মাত্র ব্যাপারই তাঁকে নাৎসীদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন করে তুলেছিল। কারণ, দুজনেরই লক্ষ্য ছিল এক—ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধ। হয়তো এই কারণেই জার্মানদের ইহুদী নির্যাতন সম্বন্ধে কোন মন্তব্য তিনি করেননি।

আমি তাই প্রশ্ন করলাম—আপনি তো আপনার জাতির স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু আপনি কি করে এমন একটি জাতির সঙ্গে এক-মত হতে পারেন, যারা অন্য জাতিকে নির্যাতন করে চলেছে?

আমাদের দীর্ঘ আলাপ-পরিচয়ের মধ্যে এই প্রথম তিনি যেন আমার প্রশ্নের সঠিক কোন উত্তর খুঁজে পেলেন না। অবশেষে বললেনঃ

'Any how, Hitler is our natural ally. And he knows it. I put before him detailed plans for an agreement between Germany and the Indian Free State which is to come into force when we gain our freedom. He is studying the project. We shall get his support when we revolt.' [German Odyssey : Otto Zarek.]

[যাই হোক হিটলার হচ্ছেন আমাদের স্বাভাবিক বন্ধু, এবং তিনিও তা জানেন। জার্মানী এবং ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের মধ্যে কিভাবে একটি চুক্তি সম্পাদন করা যায়, সে সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা আমি তাঁর কাছে উপস্থিত করেছি। সব কিছু তিনি ভাল করে খুঁটিয়ে দেখছেন। আমরা যখন বিদ্রোহ করব, তখন তাঁর সমর্থন আমরা ঠিকই পাব।]

শুধু অটো জারেক নন, বিস্ময় সেদিন Mrs. Kitty Kurti-রও কম ছিল না।

নির্বাসিত জীবনে সেদিন যাঁরা সুভাষকে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে পেয়েছিলেন, মিসেস কুট্টি কুর্তী তাঁদেরই একজন।

অটো জারেকের প্রশ্নের জবাব না দিলেও মিসেস কুর্টি কুর্তীকে কিন্তু সুভাষ তাঁর বক্তব্য খোলাখুলিই বলেছিলেন, মল্লিকা।

সেদিন সুভাষ মিসেস কুর্টি কুর্তীর বাড়িতে আমন্ত্রিত। সুভাষ ঘরে ঢুকতেই প্রশ্ন করলেন মিসেস কুর্টি কুর্তীঃ

'সূর্যালোকে আজকের আবহাওয়া বেশ মৃদু ছিল। মিঃ বোস কি প্রাতঃ-ভ্রমণের সময় পেয়েছিলেন আজ ?

না, মিসেস কুর্তী। আজ আমার মিঃ গোয়েরিং-এর সঙ্গে দেখা করার সময় নির্দিষ্ট ছিল। তাঁর অফিস থেকেই আমি সোজা এখানে চলে এসেছি।

খবর শুনে আমি ও আমার স্বামী বিস্মিত। নাৎসী জার্মানীর ঐ পাগলা ষাঁড়টার সঙ্গে মিঃ বোসের কি প্রয়োজন! কোথাও যে এতটুকু মিল নেই দুজনের চরিত্রে!...আমার নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্য আমি সব কিছুই করতে পারি, কিন্তু তাই বলে নাৎসীদের সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগের কথা আমি ভাবতেই পারি নে। ওরা ছোঁয়াচে মহামারী রোগের মতোই ঘৃণ্য জীব। আমি প্রশ্ন করলামঃ আপনার দেশ উদ্ধারের জন্য আপনি কি পৃথিবীতে শয়-তানের প্রতিনিধির সঙ্গেও হাত মেলাতে পারেন ? তিনি উত্তর দিলেনঃ

'It is dreadful, but it must be done. It is our only way out. India must gain her independence, cost what it may.

Have you an idea, Mrs. Kurti, of the despair, the misery, the humiliation of India ? Can you imagine her suffering and indignation ? British imperialism there can be just as intolerable as your Nazism here, I assure you. But it is perhaps, difficult for you to understand it all.' [Subhas as I knew him : Kitty Kurti : P.—11]

[এটা ভীতিজনক ঠিকই, তবু একাজ আমাদের করতেই হবে। এটাই আমাদের একমাত্র পথ। যে কোন মূল্যেই হোক না কেন, স্বাধীনতা আমাদের পেতেই হবে। ভারতের নৈরাশ্য, দুঃখ ও লাঞ্ছনা সম্বন্ধে আপনাদের কোন ধারণা আছে কি মিসেস কুর্তী ? আপনি কি কল্পনা করতে পারেন যে, ভারতবাসী কি যন্ত্রণায় দিন কাটাচ্ছে ? অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কিছু করতে না পেরে কি বিক্ষুব্ধ অবস্থা তাদের ?

সব অবস্থা হয়তো আপনাদের পক্ষে ঠিক বোঝা সম্ভব নয়। তবে বিশ্বাস করুন, নাৎসীবাদ আপনাদের কাছে যতখানি অসহ্য হয়ে উঠেছে, ভারতবাসীর কাছেও ঠিক ততখানিই অসহ্য হয়ে উঠেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ।]

হ্যাঁ, এই হল সুভাষ। কোথাও তাঁর বক্তব্যের মধ্যে এতটুকু অস্পষ্টতা নেই। কোনরকম কুয়াশার আবরণও নেই। তাঁর এককথা, যেভাবে হোক, যে কোন পন্থায় হোক, আগে নিজের দেশের স্বাধীনতা, তারপর পরের ভাবনা।

দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে পৃথিবীর জন্য চোখের জল ফেলে বিশ্ব-মানব সাজতে তিনি প্রস্তুত নন।

এ হল ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৫ সালের ঘটনা। তখনো যুদ্ধ শুরু হয়নি।

তারপর ছ'বছর কেটে গেছে। দীর্ঘ ছ'বছর বাদে আবার সুভাষ এসে পা দিলেন সেই বার্লিনের মাটিতে।

তবু সেদিনের সেই বার্লিন আর আজকের বার্লিন এক নয়। ক্ষমতা-দীপ্ত বার্লিন আজ পৃথিবীর বিস্ময়।

রাশিয়ায় কিছু হল না। দেখা যাক, এবার এখানে থেকে কিছু করা যায় কিনা!

৯ই এপ্রিল সুভাষ সহযোগিতার শর্ত জানিয়ে সর্বপ্রথম একটি গোপন স্মারকলিপি পাঠিয়ে দিলেন জার্মান সরকারের কাছে।

সেই দীর্ঘ স্মারকলিপি থেকে কিছু কিছু অংশ আমি এখানে তুলে দিচ্ছি:

'...ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শুধুমাত্র ভারতের মুক্তির পথেই নয়, পৃথিবীর মানব সমাজের অগ্রগতির পক্ষে সবচাইতে বড় প্রতিবন্ধক।—ভারতের প্রতিটি মানুষ আজ কামনা করে যে, এ যুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ চিরদিনের মতো ধ্বংস হোক। কারণ, ব্রিটিশ ধ্বংস হলেই ভারত তার বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে।

ভারতবাসী ব্রিটিশকে তাদের শত্রু বলে মনে করে। সুতরাং তাদের পরাজয়ের ব্যাপারে স্বভাবতই তারা সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করবে।...সেই সহযোগিতা পেতে হলে অক্ষশক্তি জয়ী হলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে, সর্বাগ্রে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

ইয়োরোপে একটি স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করতে হবে।...প্রতিটি মিত্ররাষ্ট্রে স্বাধীন ভারত সরকারের কূটনৈতিক দূতাবাস স্থাপন করতে হবে।... বিদ্রোহে সহায়তার জন্য ভারতকে আফগানিস্তানের পথে প্রয়োজনীয় সাহায্য পাঠাতে হবে।'

এবার সবচাইতে উল্লেখযোগ্য অনুচ্ছেদটি লক্ষ্য কর, মল্লিকা।

'...ব্রিটিশ প্রভাব ও প্রতিপত্তি দূর করতে হলে বর্তমানে রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানীর যে বন্ধুত্বপূর্ণ স্থিতাবস্থা রয়েছে, তা রক্ষা করতে হবে।'

[মুক্তি সংগ্রাম : সুভাষচন্দ্র বসু]

পটসডাম প্লাটজ-এর হোটেল এসপ্লানেডে বসে শুরু হল অন্তহীন প্রতীক্ষা। স্মারকলিপি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার কি জবাব আসে দেখা যাক!

কোথায় জবাব, কোথায় কি! কোন সাড়া-শব্দ নেই পররাষ্ট্র দপ্তরের। এমনি করে দিনের পর দিন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ। তবু এতটুকু আশার আলো দেখা গেল না কোনদিক থেকে।

কেন পররাষ্ট্র দপ্তরের এই অকারণ নিঃশব্দতা? এর কোন কারণ ছিল কি?

হ্যাঁ, ছিল। জার্মানী তখন নতুন পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত। তার সময় কোথায়?

'...at that time the leading lights of German politics must have been so busy that they had no time to consider in detail the case of a man, even of Bose's political status, who had appeared suddenly on the scene, with his uncommon demands.'

[Netaji in Germany: N. G. Ganpuley: P.—31]

তাছাড়া পদে পদে ভয়। পদে পদে সংশয়। সুভাষ বোস যে ব্রিটিশের গুপ্তচর নন, তা কে বলতে পারে! সুতরাং আগে থেকেই সব কিছু ভাল করে যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু না. তাই বা কি করে সম্ভব? কলকাতার জার্মান কনসালের মুখ থেকে যে শোনা গিয়েছিল ঠিক তার বিপরীত কথা! কাবুলের জার্মান কনসালের বক্তব্যও তাই। সুতরাং সন্দেহের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

'German Foreign Office was very well-informed about Bose through its pre-war Consul General in Calcutta and also from its representative in Kabul. The Foreign Office had all the information about his great past and knew from their reports that as an active fighter against British imperialism Bose could be trusted with any help that the Government thought fit to extend to him. [Ibid: P.—29]

সুতরাং সেদিক থেকে নিশ্চিন্ত। সুভাষ বসুর অতীত জীবনই তার সবচাইতে বড় সাক্ষী। সেদিক থেকে ভয়ের কোন কারণ নেই।

ভয়ের কারণ রয়েছে অন্যত্র। লোকটা যেমন জেদী, তেমনি স্পষ্টবক্তা। এ হেন লোককে কোনরকম প্রতিশ্রুতি দিতে হলে সব কিছু ভাল করে দেখে নেয়া প্রয়োজন।

কথাটা মিথ্যে নয়, মল্লিকা। সুভাষকে জার্মানরা ভাল করেই চিনেছিল। চিনেছিল বছর কয়েক আগেই। সুভাষ তখন ভিয়েনাতে।

ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রত্নখনি।

অথচ সেই ভারতবর্ষ আজ কিনা স্বাধীনতা চায়। কি অন্যায় কথা! ভারতবর্ষ হাতছাড়া হয়ে গেলে আর রইল কি!

তাই পৃথিবীর চোখে ভারতবাসীকে হেয় করার জন্য সুসভ্য ব্রিটিশ সরকারের কতরকম অপচেষ্টা!

উদ্দেশ্য মহৎ। বিশ্ববাসী তাকিয়ে দেখুক যে, ভারতবাসীর আসল পরি-

চয় কি! তারপর তারাই বলুক যে, এহেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবার কোন মানে হয় কিনা!

ছবির পর ছবি। 'ইন্ডিয়া স্পীকস', 'বেঙ্গলী' এমনি কত সব ছায়াছবি। উদ্দেশ্য সেই একই। অর্থাৎ, ভারতবাসীরা যে মানুষ হিসেবে কত নিম্ন-স্তরের, তা দেখে নাও। তারপর তোমরাই বিচার কর।

সবশেষে এল 'Everybody Loves Music.'

এ ছবিতে যা দেখানো হল তা আরো কুৎসিত। একটি দৃশ্যে দেখানো হল, স্বয়ং গান্ধীজী নেংটি পরে বল-ড্যান্স করছেন এক ইংরেজ মহিলার কণ্ঠ-লগ্ন হয়ে।

গান্ধীবাদী নেতা বলে পরিচিত কংগ্রেসের অনেকেই সেদিন ইয়োরোপে ছিলেন। কিন্তু এ ধরনের কুৎসিত অপপ্রচারের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ-ধ্বনিও শোনা গেল না কারো মুখ থেকে।

একমাত্র প্রতিবাদ করলেন সুভাষ। খবর শুনে সেই মুহূর্তেই তিনি Archbishop Cardinal Intizar-এর কাছে ছুটে গিয়ে গর্জে উঠলেন রুষ্ট বাঘের মতো।

এক্ষুণি এ ছবি বন্ধ করবেন কিনা আমি জানতে চাই!

ছবি বন্ধ হল। শুধু ভিয়েনাতে নয়, বন্ধ হল গোটা জার্মানী থেকেই। সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল ১৯৩৪ সালে।

সুভাষ তখন মিউনিকে। ওখানকার নাৎসী পার্টি সিদ্ধান্ত নিল, সুভাষকে তারা পৌর-সংবর্ধনা জ্ঞাপন করবে।

গোল বাধল ঠিক তার আগের দিন। হঠাৎ সেদিন হিটলার এক বেতার-বক্তৃতা দিয়ে বসলেন ব্রিটিশের ভারত-শাসনের সুখ্যাতি করে।

ব্যস. আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান বাতিল। 'Hitler is at liberty to lick British boots (হিটলার ব্রিটিশের জুতো চাটতে পারে), তার দেওয়া কোনরকম সংবর্ধনা গ্রহণ করতে আমি রাজী নই।'

জবাব শুনে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল গোটা ইয়োরোপ। জার্মানীর ভাগ্য-বিধাতা মহামহিম হিটলার সম্বন্ধে এমন উক্তি করার মতো দুঃসাহস যে পৃথিবীতে কারো থাকতে পারে, সেকথা বুঝি তাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

আশ্চর্য, দুঃসাহসী এই মানুষটিকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাতে সেদিন কিন্তু আর এতটুকুও দেরি করেননি অ্যাডলফ্ হিটলার। পরদিনই তিনি ভুল স্বীকার করে তাঁর বেতার-বক্তৃতা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন বাধ্য ছেলের মতো।

সেই স্পষ্টবক্তা সুভাষ বোস। তাঁকে কি কোনদিন ভুলতে পারে জার্মানী? না কি ভোলা সম্ভব? সুতরাং এহেন মানুষকে কোনরকম কথা দিতে হলে একটু ভেবে-চিন্তে দিতে হবে বৈকি!

ইতিমধ্যে যুদ্ধের গতি আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। তাসের ঘরের মতো একটার পর একটা শহর ভেঙে পড়ছে জার্মানদের প্রচণ্ড আক্রমণের কাছে।

গোয়েরিং-এর বোমার ঘায়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ইংল্যান্ড তখনো কোনরকমে টিকে আছে টিম টিম করে।

তবে সবচাইতে শোচনীয় অবস্থা হয়েছে লন্ডনের। দেখে আর তাকে চেনার উপায় নেই। অধিকাংশ ঘর-বাড়িই ধুলোয় মিশে গেছে হিটলারী বোমার ঘায়ে। এমন কি, বাকিংহাম প্যালেসও রেহাই পায়নি।

পরিস্থিতি আরো ঘোরাল করে তুলেছে জার্মানীর খুদে পকেট ব্যাটল-শিপগুলি। তাদের চোরাগোপ্তা আক্রমণের ফলে ইতিমধ্যে ব্রিটিশের কত জাহাজ যে সাগরের তলায় তলিয়ে গেছে, তার বোধহয় কোন গোনাগুনতি নেই।

একদিকে ইংল্যান্ডের বিরাট রাজকীয় নৌ-বহর, অন্যদিকে জার্মানীর তিনটি মাত্র পকেট ব্যাটলশিপ। গ্রাফ স্পি, ডয়েস্ল্যান্ড আর অ্যাডমিরাল শিয়ার।

ছোট্ট জাহাজ। খুবই ছোট্ট। কিন্তু কি প্রচণ্ড তার শক্তি। একবার কামানের পাল্লার মধ্যে পেলে আর রক্ষা নেই। যত বড় ভারি ব্যাটলশিপ, ডেস্ট্রয়ার বা ক্রুজারই হোক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে দ্রাম! তারপরই দে ছুট! এমন তীব্র গতিসম্পন্ন যে, কার সাধ্য তখন তাদের নাগাল পায়!

আর নাগাল পেলেই বা কি! ভোল পাল্টাতে কতক্ষণ! একটু আগে ছিল একটা চিমনি, পরমুহূর্তেই হয়তো দেখা গেল চিমনির সংখ্যা মোট তিনটে! গায়ের রঙও আলাদা। আর হরেক রকম নাম-ধাম বা নিশানের তো কোন প্রশ্নই নেই।

এই করে কতবার যে তারা ব্রিটিশের বিরাট কমভয়ের নাকের ডগার ওপর দিয়ে দিব্যি ভালমানুষটি সেজে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে, তার বোধহয় কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। যেন কোন নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ আর কি!

সেই সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিয়ে চলেছে মারাত্মক ইউ-বোটগুলি। নৌ-শক্তিতে ব্রিটিশ নাকি অপরাজেয়। দেখা যাক, তাদের এই বড়াই আর কতদিন থাকে!

এ ব্যাপারে খোলাখুলিভাবেই হিটলার তাঁর চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দিয়েছেন ইংল্যান্ডকে।

মনে রেখো, আমাদের ইউ-বোটগুলি ঘুমিয়ে নেই। আর বিমানবহর এবং সেনাবাহিনীও চুপচাপ বসে নেই। যেভাবেই হোক না কেন, চূড়ান্ত বোঝা-পড়া করার জন্য তারা বদ্ধপরিকর।

'Our U-boat-war will begin at sea, and they will notice that we have not been sleeping. And the Air Force will play its part and the entire armed forces will force the decision by hook or by crook.'

ইতিমধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভায়। ফ্রান্স আক্রান্ত হয়েছিল ১০ই মে, ১৯৪০ সালে। সেদিনই পদত্যাগ করেছেন সেই ছাতা-বিলাসী প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলীন। শান্তিপ্রিয় লোক তিনি। এসব অশান্তি সহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

পরিবর্তে এসেছেন উইনস্টন চার্চিল। ঝানু রক্ষণশীল। ব্রিটিশকে ভরা-ডুবি থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর।

এহেন চার্চিলও কিন্তু পারেননি নিজেদের এই বিরাট ক্ষয়-ক্ষতির কথা অস্বীকার করতে। নিজের মুখেই সেকথা তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে পার্লিয়ামেন্টের এক গোপন অধিবেশনে। হ্যাঁ, খুবই ক্ষতি হয়েছে আমাদের। এক বছরে মোট ৪৬,০০,০০০ টনের জাহাজ আমরা হারিয়েছি।

'Our losses and those of our Allies by sinking in the last few months have been heavy. In the last 12 months they amount to 46,00,000 tons.

The enemy continually varies his form of attack in order to meet our counter measures.'

[Secret Session Speeches : Churchill : P.—43]

১০ই মে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন হিটলারের ডেপুটি রুডলফ্ হেস্।

হঠাৎ তিনি কাউকে কিছু না জানিয়ে ছোট্ট একটি বিমান নিয়ে অবতরণ করলেন স্কটল্যাণ্ডের ঈগলহ্যাম বিমানঘাঁটিতে। তারপরই পুলিশের হাতে।

খবর শুনে হৈ-চৈ পড়ে গেল গোটা ইংল্যাণ্ডে। বলে কি! এই ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্যে রুডলফ্ হেস্ এখানে এলেন কি করে! কি ব্যাপার!

রুডলফ্ হেস্ নির্বিকার। আমি তোমাদের ডিউক অফ হ্যামিল্টনের সঙ্গে কথা বলতে চাই। তিনি আমার পুরনো বন্ধু। বার্লিন অলিম্পিকের সময়েই বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল আমাদের দুজনের মধ্যে। তাঁকে একবার আসতে বলো আমার কাছে। বলো যে, জরুরী বার্তা নিয়ে এসেছি।

ছুটে এলেন ডিউক অফ হ্যামিল্টন। কি ব্যাপার! কি বলতে চান তাঁকে রুডলফ্ হেস্?

আমি সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

সন্ধি! নিজের কানকেই বুঝি বিশ্বাস করতে পারলেন না ডিউক অফ হ্যামিল্টন।

হ্যাঁ, সন্ধি। মোট তিনটি শর্ত। এক—আমাদের সমস্ত পুরনো উপ-নিবেশগুলি ফিরিয়ে দিতে হবে। দুই—তোমরা এখানে নিশ্চিন্তে বসবাস করতে পার, আমরা তোমাদের ভাল-মন্দ কোন ব্যাপারে থাকব না। তোমরাও ইয়োরোপের কোন ব্যাপারে নাক গলাতে যেতে পারবে না। তিন—সন্ধির শর্ত আলোচিত হবে অন্য কারো সঙ্গে, তোমাদের প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের সঙ্গে নয়। ঐ গোঁয়ার-গোবিন্দ লোকটাকে আমরা একদম সহ্য করতে পারি নে।

ডিউক অফ হ্যামিল্টন স্তম্ভিত। বলে কি! লোকটা কি সত্যিই সুস্থ, না কি বিকৃতমস্তিষ্ক!

না, ঠিকই বলেছি আমি। অবশ্য আমার এখানে আসার খবর ফুয়েরার কিছুই জানেন না। তবে তার জন্য তোমাদের ভাবতে হবে না। তাঁকে বলে-কয়ে রাজী করানোর ভার আমার। এখন তোমরা রাজী আছ কিনা বলো?

রাজী হল না ইংল্যান্ড। হবার কথাও নয়। কারণ, এ শর্ত মেনে নেওয়া পরাজয়েরই নামান্তর মাত্র।

ওদিকে খবর শুনে হিটলার চটে লাল। এতবড় স্পর্ধা রুডলফ্ হেস্-এর! কার হুকুমে সে ইংল্যান্ডে গেছে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে? কি অপমান নাঃ! এর একটা বিহিত করতেই হবে। ঠিক আছে, ফিরে আসুক ও জার্মানীতে। এলেই ওকে গুলি করে হত্যা করা হবে।

ফিরে আসা কিন্তু আর সম্ভব হয়নি, মল্লিকা। সেই থেকেই তিনি কারাগারে। তারপর ত্রিশ বছর কেটে গেছে। এখনো তাঁর কারাজীবন শেষ হয়নি কোনদিন শেষ হবে কিনা কে জানে!

কিন্তু একটা প্রশ্ন, মল্লিকা। সত্যিই কি সেদিন তিনি স্বেচ্ছায় ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন? না কি যা কিছু করেছিলেন সবই হিটলারের নির্দেশে? নইলে ব্রিটিশের প্রতি হিটলারের প্রচ্ছন্ন মমত্ব বোধের কথা তো এখন আর কারোরই অজানা নয়! ডানকার্কের সেই ঘটনাই তো তার সবচাইতে বড় প্রমাণ।

'The Operation Dunkirk gives very clear evidence o Hitler's sympathies for Britain.

Between 29th May and 14th June 300,000 British troop were allowed to be embarked from Dunkirk because Hitle refused to allow the victorious German forces to mop u the routed Britains.'

[Netaji in Germany : N. G. Ganpuley : P.—50]

নইলে কিসের অভাব ছিল সেদিন জার্মানীর! কি তার ছিল না! হিটলারের যদি ব্রিটিশকে ধ্বংস করার এতটুকু ইচ্ছা থাকত, তাহলে একটি প্রাণীর পক্ষেও সেদিন ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়া সম্ভব হত কি?

'At that time Germany had a very strong Air Force a well equipped submarine fleet and the German army wa victoriously following the demoralised enemy at its heels

If Hitler had wished it, not a single British soul woul have ever reached England.

That was also the occasion when Germany could have invaded England; but Hitler's decision was to the contrary.'

[Ibid : P.—30]

তাহলে কোথায় এই রহস্যের উৎস? কি এর কারণ? কেন সেদিন তিনি লক্ষ লক্ষ সৈন্যকে ফিরে যেতে দিয়েছিলেন ডানকার্ক থেকে?

কারণ, প্রচ্ছন্ন স্বজাতি-প্রীতি। হিটলারের মতে,—জার্মানরাই হল পৃথিবীর সেরা আর্য জাতি। সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর ব্রিটিশও সেই একই রক্তের অধিকারী। সেই মহাশক্তিমান ব্রিটিশ নতজানু হয়ে তাঁর কাছে সন্ধি প্রার্থনা করুক, ইয়োরোপে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নিক, মনের অতলে এমনি

একটা গোপন ইচ্ছা তাঁর বরাবরই ছিল। তা বলে তাদের ধ্বংসের বিনিময়ে তিনি তা পেতে রাজী ছিলেন না কোনদিনও।

'The superiority of Nordic races was a mania with him, on account of that he was in favour of conserving this dominant Nordic power. [Ibid : P.—30]

গোল বাধাল ইতালীর ভাগ্য-নিয়ন্তা মুসোলিনী।

দুই অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু। হিটলার আর মুসোলিনী। যদিও শিক্ষা এবং চিন্তাধারার দিক থেকে মুসোলিনী ছিলেন অনেক বেশি উন্নত, তবু লক্ষ্য ছিল দুজনেরই এক। সেখানে দুজনের মধ্যে খুব একটা তফাৎ নেই।

তবু হিটলার আর মুসোলিনী এক নন। মুসোলিনীর সাধ ছিল, কিন্তু সাধ্য ছিল না। ছিল না বলেই চলার পথে তাঁকে হোঁচট খেতে হয়েছে বার বার।

যেমন হোঁচট খেতে হয়েছে গ্রীসের বেলায়।

শুরু হয়েছিল ১৯৪০ সালের ২৮শে অক্টোবর।

হঠাৎ সেদিন মুসোলিনী বন্ধু হিটলারের অনুকরণ করে বজ্রকণ্ঠে হুঙ্কার দিলেন,—গ্রীস আমার চাই-ই! হিটলার যদি অসাধ্য সাধন করতে পারে তো আমিই বা পারব না কেন? দেখাই যাক না!

দেখা গেল দিন কয়েকের মধ্যেই। সে কি বেধড়ক পাল্টা-মার গ্রীক বাহিনীর! মার খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত তাঁর সেনাবাহিনীকে ঢুকে পড়তে হল আলবেনিয়ার অভ্যন্তরে।

শেষ পর্যন্ত ডাক পড়ল সেই বন্ধু হিটলারের। এবারের মতো আমার মান বাঁচাও সখা! আর কখনো এমন কাজ করব না!

মনে মনে হাসলেন হিটলার। শিক্ষা হল তো! এবার বুঝতে পেরেছ যে, তুমি আর আমি এক নই! যাক, ব্যবস্থা করছি। তবে একটু বুঝে-সুঝে চলতে চেষ্টা কর এবার থেকে।

এল জার্মান বাহিনী। ফলে, গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়া দুই-ই গেল। যুগোশ্লাভিয়ার যুদ্ধের অবসান হল ১৭ই এপ্রিল, ১৯৪১ সালে। গ্রীক বাহিনী তাদের মূলভূমি ছেড়ে আশ্রয় নিল ক্রীট দ্বীপে।

গ্রীসের রাজধানী এথেন্স্ থেকে দেড়শো মাইল দূরে এজেন সাগরের মোহনায় ক্রীট ছোট্ট একটি দ্বীপ। গ্রীস ছাড়া অন্যান্য মিত্ররাষ্ট্রের সৈন্যরাও সেখানে ঘাঁটি আগলে রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। কারণ, দ্বীপ হিসেবে ক্রীট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্রীট হারানো মানে ভূমধ্য সাগরে নিজেদের আধিপত্য বেদখল হওয়া। সুতরাং যেভাবে হোক, ক্রীট রক্ষা করতে তারা বদ্ধপরিকর।

অবশ্য আশঙ্কার কোন কারণ নেই। ক্রীটের চারপাশেই সমুদ্র। এ অবস্থায় কোন কিছু করতে হলে উপযুক্ত নৌ-বহর থাকা দরকার! জার্মানীর তা নেই। সুতরাং তাদের দিক থেকে এ ধরনের ঝুঁকি নেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু একি! সেদিন সবগুলি বিপদ-জ্ঞাপক সাইরেন একসঙ্গে বেজে উঠল কেন এমন করে? কি ব্যাপার?

বিমান! বিমান! বিমান! একটি-দুটি নয়, হাজার হাজার জার্মান বিমান। ক্রীটের আকাশ ঢাকা পড়ে গেছে অসংখ্য বিমানের আবির্ভাবে।

ক্রীট দখল করতে গিয়ে হিটলার যে চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন যুদ্ধের ইতিহাসে সত্যিই তা অভূতপূর্ব, মল্লিকা।

তারিখটা ছিল ১৯শে মে। আকাশের পানে তাকিয়ে দ্বীপ-রক্ষী ব্রিটিশ ও অন্যান্য মিত্ররাষ্ট্রের সৈন্যগণ সেদিন অবাক। বিমান থেকে হাজার হাজার প্যারাসুট-সৈন্য ক্রীটের ওপর নেমে আসছে পাখির ঝাঁকের মতো।

সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠল নিচের বিমান-ধ্বংসী কামানগুলি। আসুক না প্যারাসুট বাহিনী। কাউকে আজ প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না। একটি প্রাণীকেও না।

কিন্তু একি! কোথায় শত্রুসৈন্য! এ যে সম-আকারের রাশি রাশি রবারের পুতুল মাত্র! এভাবে রসিকতা করার কারণ কি!

কারণ যখন বোঝা গেল, তখন সব শেষ। সবার দৃষ্টি এদিকে আবদ্ধ রেখে ততক্ষণে দ্বীপের অপর প্রান্তে জার্মান বাহিনী নেমে পড়েছে দলে দলে। তারপর আর তাদের পায় কে! ফলে, ক্রীটও গেল।

আফ্রিকাতেও সেই একই অবস্থা। বন্ধুর মান রাখতে গিয়ে সেখানেও শেষ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করতে হল অগতির গতি সেই হিটলারকে।

শুরু হয়েছিল ১৯৪০ সালের ৪ঠা আগস্ট।

হঠাৎ সেদিন ইতালিয়ান সেনাপতি গ্রাৎসিয়ানি আফ্রিকায় ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ডে ঢুকে পড়লেন বিরাট এক সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে। অধিকার করলেন সোল্লুম। ক'দিন যেতে না যেতেই ব্রিটিশ জেনারেল ওয়াভেলের কাছ থেকে বিরাট এক থাপ্পড় খেয়ে বিলকুল ঠাণ্ডা। তারপর শোনা গেল সেই কাতর প্রার্থনা। আমাকে বাঁচাও সখা! আর কোনদিন তোমার অবাধ্য হব না!

হিটলারের নির্দেশে এবার এগিয়ে এলেন রোমেল। জার্মানীর সর্বকনিষ্ঠ সেনাপতি দুর্ধর্ষ রোমেল।

সঙ্গে সঙ্গে ঝড় উঠল মরুভূমির বুকে। লিবিয়া, বেনগাজী, ডার্না, তব্রুক পেরিয়ে দেখতে দেখতে রোমেল গিয়ে হাজির হলেন এল্ আলামিনে। সামনেই মিশরের বন্দর আলেকজান্দ্রিয়া। হাত বাড়ালেই তার নাগাল পাওয়া যায়।

দৌড়! দৌড়! দৌড়!

তাড়া খেয়ে সে কি প্রাণপণ দৌড় তখন ব্রিটিশ বাহিনীর! যথাসর্বস্ব যায় তো যাক, তবু ঐ 'ডেজার্ট-ফক্স' রোমেলের মুখোমুখি কিছুতেই নয়।

তবু কিছুতেই কিছু হল না। ফলে, হাজার হাজার সৈন্যকে আত্মসমর্পণ করতে হল রোমেলের হাতে। বেশির ভাগই ভারতীয় সৈন্য। যথাসময়ে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হল ইতালীর বন্দীনিবাসে। কিছু-সংখ্যক জার্মানীতে।

কাণ্ড দেখে হৈ-চৈ পড়ে গেল ইংল্যাণ্ডে। আবার সেই ডানকার্কের পুনরাবৃত্তি! কোথায় এর শেষ কে জানে! তবে ভেঙে পড়লে চলবে না। যে করে হোক, রোমেলকে রুখতেই হবে। নইলে মিশর বা ভারত, কিছুই রক্ষা করা যাবে না ওর হাত থেকে।

রোমেলের এই অবিশ্বাস্য অগ্রগতি দেখে বিস্ময় সেদিন হিটলারেরও কম ছিল না, মল্লিক্। কোথায় বেনগাজী আর কোথায় এল্ আলামিন! বিশ্বাস করাই যেন শক্ত।

অবশ্য সেভেন্থ প্যানৎসার বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে গত বছরই তিনি ফ্রান্সে বিদ্যুৎগতিতে অভিযান চালিয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এবারের সাফল্য আগেকার সব কিছুকেই যেন ম্লান করে দিয়েছে।

সেপ্টেম্বর মাসে একদিন হিটলারের শিবিরে ডাক পড়ল রোমেলের। বলো, কি চাই?

চাই সামান্য কিছু সমর-সম্ভার। চাই তিনশো বিমান। ব্যস, এটুকু পেলেই ওদের আমি পিষে মারতে পারব।

সমর্থন জানালেন কেমারিসিং ও অ্যাডমিরাল রেডার। রোমেলকে এ পর্যন্ত যে সমর-সম্ভার দেওয়া হয়েছে তা খুবই নগণ্য। অথচ তাই দিয়ে অসাধ্য সাধন করেছেন আফ্রিকার ঐ মরুভূমির প্রান্তরে। তাঁকে আরো কিছু দেওয়া উচিত।

এল্ আলামিন থেকে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর কত দূর? জানতে চাইলেন হিটলার।

পঁয়ষট্টি মাইল।

বেশ, আরো সমর-সম্ভার তুমি পাবে।

বুকভরা আশা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রোমেল আবার ফিরে এলেন উত্তর আফ্রিকার মরু-প্রান্তরে। ফুয়েরার যখন কথা দিয়েছেন, তখন আর ভাবনা কি! দু-চার দিনের মধ্যেই হয়তো সব এসে যাবে। তারপর মিশর ছিনিয়ে নেওয়া তো কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার মাত্র!

রোমেলের এই অভাবনীয় সাফল্য দেখে আরো একটি মানুষের সেদিন বিস্ময়ের অন্ত ছিল না, মল্লিক্। তিনি হলেন ব্রিটিশ জেনারেল মণ্টোগোমারি। শত্রু হলেও রোমেলের সমর-কৌশলের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। সব সময়ে তিনি রোমেলের একটি ছবি টাঙিয়ে রাখতেন নিজের শিবিরে। বলতেন, —অনেক কিছু শেখার আছে ওঁর কাছে। যুদ্ধ শেষ হোক। তখন সব কিছুই আমি ওঁর কাছ থেকে শিখে নেব একে একে।

আফ্রিকার পরে মধ্যপ্রাচ্য।

রোমেলের ভয়ে ব্রিটিশ তখন তটস্থ। যেভাবে লোকটা মরুভূমির বুকে ঝড় তুলে দুর্বার গতিতে এগিয়ে আসছে, তাতে মধ্যপ্রাচ্য দিয়ে ভারতবর্ষে ঢুকে পড়া মোটেই বিচিত্র নয়। যে করে হোক, সে-পথ তার বন্ধ করতেই হবে। ভারতবর্ষ গেলে আর রইল কি!

১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসেই ব্রিটিশ বাহিনী বসরাতে গিয়ে হাজির। না, তোমরা যা ভেবেছ, তা নয়। আমরা তোমাদের দেশ দখল করতে আসিনি। এসেছি তোমাদের উপকার করতে! নইলে জার্মানদের হাত থেকে কিছুতেই তোমরা রেহাই পাবে না।

বাধা দিলেন প্রধানমন্ত্রী রসিদ আলী। না, তোমাদের উপকার করতে হবে না। তোমরা বিদেয় হও।

বটে! দাঁড়াও, মজাটা দেখাচ্ছি তোমাদের!

জার্মানদের সংগে না পারলেও দুর্বল ইরাককে মজা দেখাতে মোটেই দেরি হল না। বাধ্য হয়েই তখন রসিদ আলীকে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে হল ইরানে।

ইরাকের পর ইরান। সেখানেও সেই একই অবস্থা। অর্থাৎ, আমাদের উদ্দেশ্য দেশ দখল করা নয়, তোমাদের উপকার করা।

তারপর সিরিয়া। সিরিয়া আক্রান্ত হল ১৯৪১ সালের ১লা জুন। ব্রিটিশের সমস্ত শর্ত মেনে নিয়ে যুদ্ধ-বিরতি ঘটল ১৫ই জুলাই।

এবার টানা-হ্যাঁচড়া শুরু হল তুরস্ককে নিয়ে। কি জার্মানী, কি ব্রিটিশ সবাই এ ব্যাপারে সমান তৎপর। তোমরা আমাদের দলে যোগ দাও। যুদ্ধের পরে আমরা তোমাদের রাজা করে দেব।

নিশ্চয়! নিশ্চয়! একশোবার! অত্যন্ত চাতুর্যের সংগে পাশ কাটিয়ে চলতে লাগল তুরস্ক। ভাবটা এই যে, আমরা তো তোমাদের দলেই রয়েছি! সময় হোক, তারপর নিজেরাই সেটা দেখতে পাবে!

অবশ্য মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছিল একেবারে শেষের দিকে। যুদ্ধ-পরিস্থিতি লক্ষ্য করে শেষ পর্যন্ত তারা ব্রিটিশের হয়েই যুদ্ধ-ঘোষণা করেছিল জার্মানীর বিরুদ্ধে। তবে যুদ্ধ আর তাদের করতে হয়নি। তার আগেই যুদ্ধ শেষ।

মে মাসের মাঝামাঝি।

সুভাষ তখনো বার্লিনে। চোখে সেই অন্তহীন প্রতীক্ষা। কবে পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে পাকা কথা পাওয়া যাবে! কবে তাঁর এই প্রতীক্ষার শেষ হবে! সময় যে বয়ে যায়!

ডাক এল কাবুল থেকে। আমি ইতালিয়ান রাষ্ট্রদূত অ্যালবার্ট কোয়ানী বলছি। কলকাতা থেকে লোক এসেছে। তারা আপনার নির্দেশ চায়।

২০শে মে তারিখে কলকাতা থেকে আগত ভগৎরাম ও শান্তিময় গাঙ্গুলীর উদ্দেশ্যে সুভাষ তাঁর নির্দেশ পাঠিয়ে দিলেন কাবুলের ইতালিয়ান দূতাবাসের মাধ্যমে। তার বিস্তৃত বিবরণ আগেই তোমাকে জানিয়েছি।

জুন মাসে গেলেন রোমে। কতদিন আর এভাবে চুপচাপ বসে থাকা যায়! দেখা যাক ওখানে গিয়ে কিছু হয় কিনা।

দেখা করলেন বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী মুসোলিনীর জামাতা কাউন্ট চিয়ানোর সংগে। বক্তব্য সেই একই। আগে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্বন্ধে পূর্ণ স্বীকৃতি দিতে হবে। অন্যথায় সহযোগিতার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কিছুই অজানা ছিল না কাউন্ট চিয়ানোর। সুভাষ সম্বন্ধে সব কথাই তিনি জানতে পেরেছিলেন কাবুলের রাষ্ট্রদূত অ্যালবার্ট কোয়ানী প্রেরিত এক গোপন রিপোর্ট থেকে।

২রা এপ্রিল তারিখে প্রেরিত এক রিপোর্টে স্পষ্টই তিনি লিখেছিলেন:

'বসুর মতে, ইয়োরোপে একটি স্বাধীন ভারতীয় গভর্ণমেন্ট হবে ; এবং ইতালী. জার্মানী ও জাপানকে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দান করতে হবে। এ প্রতিশ্রুতি পেলে স্বাধীন ভারতের নিজস্ব বেতার-কেন্দ্র থেকে তিনি তাঁর অভিযান শুরু করতে প্রস্তুত। এজন্য যে অর্থের প্রয়োজন হবে, এখন তা আমাদের ঋণ-স্বরূপ দিতে হবে। ভারত স্বাধীন হলেই তিনি তা পরিশোধ করে দেবেন।

বসুকে আমরা জানি। ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে বসুই এক-মাত্র বাস্তববাদী, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

গতবছর জুন মাসে যখন ইংল্যান্ডের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী মনে হয়েছিল, তখন বসুর পরিকল্পনা মতো সংগঠন থাকলে অনায়াসেই ভারতের মুক্তি সম্ভব হত।

গতবছর আমরা সুযোগ হারিয়েছি। সে সুযোগ এবারও আসতে পারে। তার সদ্ব্যবহারের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত।'

আলাপ করে এতটুকুও খুশি হতে পারলেন না সুভাষ। বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী হলেও বিশ্ব-পরিস্থিতি সম্বন্ধে লোকটা খুব একটা ওয়াকি-বহাল নয়। মনে মনে খানিকটা জার্মান-বিরোধীও বটে। এমন লোকের কাছ থেকে কতটুকুই বা আশা করা যায়!

ভাবনার পর ভাবনা। অস্থির চঞ্চল সব ভাবনা। জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরের কোন খবর নেই। ইতালীর অবস্থাও তথৈবচ। কি করা যায় এখন এ পরি-স্থিতিতে!

ঠিক এমনি সময়ে একদিন পরিচয় হল জার্মানীর বৈদেশিক দপ্তরের প্রাচ্য সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ Adam Von Trott Zu Solz-এর সঙ্গে। পরি-চয় হল রোমেই।

সুভাষের পরিকল্পনার কথা শুনে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠলেন ভন ট্রট। হ্যাঁ, এই তো চাই। এই তো হওয়া উচিত। যে করে হোক, এ পরি-কল্পনাকে সার্থক করে তুলতেই হবে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে ট্রটের এই আগ্রহ বহু দিনের। এর মূলে ছিলেন একজন ভারতীয় মুসলিম তরুণ।

মুসলিম তরুণটি কে জান, মল্লিকা! হুমায়ুন কবীর। উভয়েই সেদিন একসঙ্গে পড়াশোনা করতেন ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ট্রটের অনুরোধে আবার সুভাষ ফিরে গেলেন বার্লিনে। দেখা করলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী রিবেনট্রপ ও প্রচার-সচিব গোয়েবল্‌সের সঙ্গে। যে করে হোক, ওঁদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

কাজটা মোটেই সহজ ছিল না, মল্লিকা। কারণ, হিটলারের সেই প্রচ্ছন্ন ব্রিটিশ-প্রীতি।

'It was therefore not very easy to change this pro-

British attitude of Hitler into a friendly gesture towards India which was in direct opposition to England.'

[Ibid : P.—34]

তবু দমে গেলেন না সুভাষ। নানাভাবে তিনি বোঝাতে লাগলেন সবাইকে। নানা যুক্তি দিয়ে। সেই সঙ্গে শোনালেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার পেছনে জার্মান সহযোগিতার কথা। এস. এস. ম্যাভারিক ও হেনরি এস্ জাহাজযোগে অস্ত্র-শস্ত্র প্রেরণের ইতিহাস। বিপ্লবী বীর বাঘা যতীনের নিঃশেষ আত্মবিসর্জনের কাহিনী।

নতুন করে শোনালেন ভার্সাই সন্ধির সেই চরম অবমাননার ইতিহাস। মাত্র একুশ বছর আগেকার ঘটনা। এরি মধ্যেই কি তোমরা ভুলে গেলে সেই জাতীয় অবমাননার কথা! তার জবাব দেবে না! প্রতিশোধ নেবে না!

কে সেদিন তোমাদের ভার্সাই সন্ধি মেনে নিতে বাধ্য করেছিল নতজানু হয়ে? ঐ ব্রিটিশ। বাগে পেয়েও সেই ব্রিটিশকে তোমরা খাতির করে ছেড়ে দিয়েছ। তা বলে ব্রিটিশ কিন্তু তোমাদের ছেড়ে কথা বলবে না। সেদিন তাদের হাত থেকে কে তোমাদের রক্ষা করবে, বলো? করবে কি কেউ? ব্রিটিশই কি তোমাদের এতটুকু খাতির করবে সেদিন?

এবার কাজ হল। সবাই আগ্রহ ভরে শুনলেন সুভাষের পরিকল্পনার কথা। কথাও দিলেন সঙ্গে সঙ্গেই।

যদিও জার্মানী তখন প্রতিটি রণাঙ্গনে মরণ-পণ সংগ্রামে লিপ্ত, তবু মহামান্য 'মাসসোত্তা'কে সহায়তা করার ব্যাপারে তাদের চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না।

এ তো গেল আমাদের কথা। এবার জার্মানরা এ সম্বন্ধে কি বলে শোনা যাক :

'Very soon we felt the strength of his will power, the honesty of his intentions and the inexorability of his personal dedication to India's cause,...

We could not help being influenced by his ideas and wishes.'

অর্থাৎ—খুব শীগ্‌গিরই আমরা তাঁর প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি, উদ্দেশ্যের সততা ও ভারতের জন্য তাঁর নিজের জীবন উৎসর্গ করার অনমনীয় বাসনার বিষয় উপলব্ধি করলাম এবং তাঁর ধারণা ও ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিজেরাও প্রভাবিত হলাম।

তবে সব কিছুর মূলে ছিলেন সেই ভন ট্রট।

নেতাজীর সৌভাগ্য যে, সে সময়ে ভন ট্রট ঐ বিভাগের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ট্রট এবং তাঁর বন্ধুদের অকুণ্ঠ সমর্থন না পেলে সে সময়ে তাঁর পক্ষে বার্লিনে থাকা বোধহয় সম্ভবপর হত না।

'It was great luck for Netaji and his cause that Adam Von Trott Zu Solz happened to be the head of the office

in charge of all matters concerning Netaji's activities in Germany...without Trott, his circle of friends and his devoted working team, Netaji probably would not have remained in Berlin.'

বলেছেন ডঃ আলেকজান্দার ওয়র্থ।

কে এই আলেকজান্দার ওয়র্থ? সেকথা তাঁর নিজের মুখ থেকেই শোন:

'Trott was designated head of the 'Special India Division' and I, his deputy assistant.' হ্যাঁ, আমিই সেদিন ট্রটের সহকারী ছিলাম।

এবার শুরু হল শর্তাবলী নিয়ে দফায় দফায় আলোচনা।

সুভাষের দাবী: লক্ষ্য আমাদের উভয়েরই এক। সে লক্ষ্য হল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করা। তবু আমাদের প্রতিষ্ঠান হবে সম্পূর্ণ আলাদা একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। সেখানে তোমাদের কোনরকম হস্তক্ষেপ করা চলবে না। আর প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে তোমাদের বিবাদ-বিসম্বাদের মধ্যে আমরা কোনদিনই যাব না। সে-সব তোমাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার। আমরা তার মধ্যে নেই। আমাদের একমাত্র শত্রু ব্রিটিশ। সুতরাং, বোঝাপড়া যা কিছু করবার তাদের সঙ্গেই আমরা করব, অন্য কারো সঙ্গে নয়।

ট্রেণিং-এর জন্য মিলিটারী এবং টেকনিক্যাল অফিসার দিতে হবে আপাতত তোমাদেরই। আর প্রয়োজনীয় অর্থ সব কিছুই নেওয়া হবে ঋণ হিসেবে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পরে সে সব ফিরিয়ে দেওয়া হবে কড়ায়-গণ্ডায়। সে দায়িত্ব আমার। বলো, রাজী?

রাজী হল জার্মানী। হ্যাঁ, তোমার সব শর্তই আমরা মেনে নিলাম। ডঃ ওয়র্থ-এর ভাষায়:

'Netaji's stiff demands that no German political authority should interfere with his work, that the financial assistance granted to him should be considered as a loan given to Free India which after the war would be paid back and his request for personnel and technical assistance from the German Foreign Office and the OKW (Supereme Military Command) met with the German Foreign Minister's favourable understanding.

...Indians did not want to be involved in Germany's quarrel with other countries or with her own internal quarrels.

The Germans, i.e. the German Foreign Office, accepted this point of view and never wanted Bose to support them in their war with other countries.

Neither Bose nor Azad Hind Radio ever defended, by speech or in broadcasts, the policy of the National Socialist Party in Continental Europe or elsewhere.

The work done by the Indians under Bose in Germany was based on the firm understanding that without being ideologically involved in the National Socialist doctrine, the Indians in Germany could advance the cause of Indian independence.'

[Netaji in Germany : Alexander Werth P.—17-19]

নিশ্চয়ই তুমি খুব অবাক হয়েছ, মল্লিকা। ভাবছ, কেন জার্মানীর এই নিঃশর্ত সহযোগিতা?

কি এর কারণ? ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাদের কেন এত মাথাব্যথা? এর পেছনে কি স্বার্থের কোন প্রশ্ন ছিল না?

ছিল বৈকি! নিশ্চয়ই ছিল। ব্রিটিশ শুধু সুভাষেরই শত্রু নয়, তাদেরও শত্রু। উভয় পক্ষেরই একমাত্র লক্ষ্য হল ব্রিটিশকে ধ্বংস করা। এ অবস্থায় সুভাষকে সাহায্য করার অর্থই যে চিরশত্রু ব্রিটিশকে ধ্বংস করতে সহায়তা করা।

সবচাইতে বড় লাভ—সুভাষ। সুভাষের সঙ্গে সহযোগিতার অর্থই হল ভারতের সত্যিকারের সংগ্রামী যুবশক্তির সমর্থন লাভ করা। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ঘাঁটি। এ সময়ে তার সমর্থন পাওয়া কম লাভের কথা নয়।

দেখতে দেখতে একদিন সুভাষের আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘ (Free India Centre) জন্ম নিল বার্লিনের মাটিতে।

কিন্তু কর্মী! কর্মী কোথায়? যুদ্ধের ডামাডোলে ভারতীয়দের মধ্যে কে যে কোথায় ছিটকে পড়েছে, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। এ সময়ে কর্মী সংগ্রহ করা সোজা কথা নয়।

শুরু হল ইয়োরোপ-পরিক্রমা।

যে করে হোক, সবাইকে খুঁজে বের করতে হবে। ঠিকানা সংগ্রহ করে সবাইকে একদিন চা-পানের আমন্ত্রণ জানিয়ে ডেকে আনতে হবে।

সুভাষ নন, আমন্ত্রণ জানাবেন সিনর অরল্যাণ্ডো ম্যাজোট্টা। কারণ, সরকারীভাবে সুভাষ এখনো সুভাষ বলে স্বীকৃত নন। আইনত তিনি এখন সিনর অরল্যাণ্ডো ম্যাজোট্টা। জার্মানদের ভাষায়—'মহামান্য মাসসোত্তা'।

পরিকল্পনা ব্যর্থ হল না। ডাক শুনে এগিয়ে এলেন নাম্বিয়ার, শর্মা, সুলতান, হবিবুর রহমান, প্রমোদ সেনগুপ্ত, আবিদ হাসান, এম. ভি. রাও, কান্তরাম, ডঃ মল্লিক প্রমুখ স্বাধীনতাকামী ভারতীয় তরুণবৃন্দ। আর এলেন সুখ্যাত সাংবাদিক গিরিজা মুখার্জী।

নাম্বিয়ার দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে প্যারিসের বাসিন্দা। ইয়োরোপের রাজনীতির সব কিছুই তাঁর নখদর্পণে।

হবিবুর রহমান জার্মান প্রচার-বিভাগের একজন বিশিষ্ট কর্মী। সুতরাং, তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না।

আর গিরিজা মুখার্জী!

পরাধীনতার গ্লানি যে মানুষের জীবনকে পদে পদে কতখানি দুঃসহ করে তুলতে পারে, তার প্রকৃত প্রমাণ এই গিরিজা মুখার্জী।

স্বদেশে তিনি ছিলেন ইংরেজের কারাগারে বন্দী। কারণ, তিনি স্বাধীনতাকামী যুবক। সুতরাং, ইংরেজের বিচারে তিনি শত্রু।

বিদেশেও তাই। যেহেতু তিনি ব্রিটিশ-প্রজা, সেহেতু আইনত তিনি জার্মানীর শত্রু। সুতরাং, আবার সেই কারাগার।

বেশ কিছুদিন থাকতে হয়েছিল ফ্রান্সের ফ্রেজনের বন্দিশালায়। তারপর ঐতিহাসিক সাঁড়েনীর কনসেনট্রেসন ক্যাম্পে।

এককালে ফরাসী পঞ্চদশ লুই এই ক্যাম্প তৈরি করেছিলেন তাঁর সৈন্যদের বসবাসের জন্য। পরে সেই ক্যাম্পই হয়ে দাঁড়ায় বিখ্যাত সাঁড়েনী কারাগার, যার নাম শুনলে পর্যন্ত সাধারণ কয়েদীর দল ভয়ে আধমরা হয়ে যেত।

আরো দুজন বাঙালী সেদিন বন্দী ছিলেন সাঁড়েনীর কারাগারে। কুসুম পাল এবং চৌধুরী। চৌধুরী ছিলেন সুভাষের সতীর্থ। কটকের র‍্যাভেনশ কলেজের সহপাঠী।

আর কুসুম পাল!

কুসুম পালকে আজ আর তুমি চিনতে পারবে না, মল্লিকা। চেনার কথাও নয়। তবে সেদিন কিন্তু ভারতের লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষের কাছে কুসুম পাল মোটেই অপরিচিত ছিলেন না।

ইতিমধ্যে কত যুগ কেটে গেছে। তবু মনে হয় যেন সেদিনের কথা। কান পাতলে এখনো বুঝি শোনা যাবে কুসুম পালের সেই শ্রীহট্ট জেলার বিশিষ্ট বাচনভঙ্গী:

'আজাদ হিন্দ্ রেডিও, বার্লিন, বাংলায় খবর বলছি।...'

আজাদ হিন্দ্ রেডিওর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনিই বাংলায় খবর শোনাতেন তাঁর দেশবাসীর উদ্দেশে।

একঘেয়ে বন্দী-জীবন। দিন আর রাত্রির মধ্যে সেখানে কোন তফাৎ নেই। কবে যুদ্ধ শেষ হবে?

কবে সমাপ্তি ঘটবে এই বন্দী-জীবনের?

কোনদিনও ঘটবে কি? ভয়াবহ এই সাঁড়েনী কারাগার থেকে মুক্তি পাবার আশা যে দুরাশা মাত্র!

সহসা এক অপূর্ব প্রত্যুষ এসে দেখা দিল ভারতীয় বন্দীদের জীবনে।

পররাষ্ট্র দপ্তরের জরুরী নির্দেশ,—অবিলম্বে সমস্ত ভারতীয় বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। কারণ,—অজ্ঞাত। অন্তত ক্যাম্পের বড়কর্তা কর্ণেল স্মিথ-এর তা জানা নেই।

মুক্তি পেয়ে সবাই বেরিয়ে এলেন বাইরে। সবার চোখে ঘোর ঘোর দৃষ্টি:

সবার মনে সেই একই প্রশ্ন। কি ব্যাপার! কেবলমাত্র ভারতীয় বন্দীদের প্রতি হঠাৎ এই উদারতা প্রদর্শনের কারণ কি?

কারণটা নিশ্চয়ই তুমি অনুমান করতে পেরেছ, মল্লিকা। কারণ,—সুভাষ।

সুভাষের দাবী,—অবিলম্বে সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। এইসব স্বাধীনতাকামী তরুণদের সাহায্যেই আমাকে ১৯২৮ সালে পার্ক সার্কাস ময়দানে দেখা সেই স্বপ্নটাকে বাস্তবে রূপায়িত করে তুলতে হবে। গড়ে তুলতে হবে স্বাধীন ভারতের ঐতিহাসিক আজাদ হিন্দ্ বাহিনী।

নতুন দপ্তর খোলা হল বার্লিনের তিয়ারগার্তে এলাকায়।

কর্মী-সংখ্যা প্রায় পঁয়ত্রিশ জন। বেশির ভাগই ইয়োরোপ-প্রবাসী মেধাবী ছাত্র। মনে মনে কত আশা। কত রঙীন কল্পনা। সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। তারপর একটানা ভাবনা-মুক্ত নিশ্চিন্ত জীবন।

কিন্তু সব বৃথা। এ যে নিশির ডাক! এ ডাক যে একবার শুনেছে, সাড়া যে তাকে দিতেই হবে। তাই সুভাষের ডাক শুনে সবাই ছুটে এসেছেন সব কিছু পেছনে ফেলে রেখে। আগে স্বাধীনতা, তারপর অন্য কথা। পড়াশোনা পরে হলেও চলবে, কিন্তু এ সুযোগ একবার হারালে আর কোনদিনই যে ফিরে পাওয়া যাবে না!

সুভাষের থাকার ব্যবস্থা হল ৬নং সোফেন ষ্ট্রসে অবস্থিত প্রাক্তন ব্রিটিশ রাজদূত ভবনে। স্পেনিশ দূতাবাসের ঠিক পাশেই।

'The crow is the most cunning and cruel among the birds, the fox among the animals and the British imperialist is among the human beings.'

সুভাষের কথা। শুধু একবার নয়, সুভাষের মুখ থেকে একথা শোনা গিয়েছিল অসংখ্যবার। এমন কি, পরবর্তী কালে ব্রহ্ম রণাঙ্গন থেকে বেতার-ভাষণ দিতে গিয়েও দেশবাসীর উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন এই একই কথা:

'পাখিদের মধ্যে কাক, পশুদের মধ্যে খ্যাঁকশিয়াল আর মানুষের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাই হল সবচাইতে ধূর্ত এবং নিষ্ঠুর।'

কথাটা মিথ্যে নয়, মল্লিকা। প্রমাণ,—যুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়।

ব্রিটিশের তখন একমাত্র লক্ষ্য—রাশিয়া। যদিও কমিউনিস্ট রাশিয়া সম্বন্ধে তাদের ঘৃণা আর বিদ্বেষের অন্ত ছিল না, তবু গরজ বড় বালাই। সুতরাং রাশিয়াকে চাই।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব! রাশিয়া যে জার্মানীর সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ!

তা হোকগে, তবু রাশিয়াকে চাই। যে করে হোক, ওদের মধ্যে ফাটল ধরাতে হবে। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মন ভিজিয়ে দলে আনতে হবে। হিটলারের পথে রাশিয়াকে না পেলে আর রক্ষা নেই।

মস্কোর ব্রিটিশ রাজদূত সেই বিলাতি জওহরলালের অবশ্য চেষ্টায় এতটুকুও ত্রুটি নেই। স্ট্যালিন এবং মলোটভের কানে সমানে তিনি বিষ ঢেলে

চলেছেন নিরলসভাবে। জার্মানীকে বিশ্বাস করো না। ওদের বিশ্বাস করলে পরে তোমাদের পস্তাতে হবে। কথাটা ভাল করে ভেবে দেখো একবার।

স্ট্যালিন কম কথার মানুষ। ক্রীপস্-এর এই সৎ-পরামর্শ শুনে মনে তাঁর কোনরকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল কিনা ঠিক যেন বোঝা গেল না।

তবু হাল ছাড়লেন না স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্। বরং নতুন উৎসাহে এবার তিনি শুরু করলেন তাঁর ব্রিটিশ-সুলভ কূটনীতির আসল খেলা। দেখা যাক, নতুন এই ব্যবস্থায় কোন পক্ষ টোপ গেলে কিনা।

দেখা গেল অচিরেই। রাশিয়ার প্রতিটি হোটেল, রেস্তরাঁয় সামরিক বিভাগের প্রণয়ীদের লক্ষ্য করে তাদের বিলাস-সঙ্গিনী যুবতী কন্যাদের তখন সেকি অশ্রু বিসর্জন! ডার্লিং, এই বোধহয় আমাদের শেষ দেখা।

তার মানে! সবাই অবাক!

কেন, জার্মানরা শীগগিরই রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করছে যে। একেবারে পাকা খবর। আশ্চর্য, তোমরা এখনো দিব্বি ঘুমোচ্ছ!

গুপ্তচর বাহিনীর সাহায্যে একই খেলা তখন শুরু হয়েছে জার্মানীর অভ্যন্তরে। সেই একই দৃশ্য। একই অভিনয়। শুধু বক্তব্যটা বিপরীত। আর আশা নেই। এই শেষ দেখা। কমিউনিস্টরা এল বলে! এরি মধ্যেই ওদের সৈন্য-চলাচল শুরু হয়ে গেছে ভেতরে ভেতরে। একেবারে পাকা খবর!

'গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে।'

কি রাশিয়া, কি জার্মানী সর্বত্র একই কথা। সর্বত্র একই আলোচনা। আক্রমণ শুরু হল বলে! আর দেরি নেই!

নিঃসন্দেহে এ কৃতিত্ব ক্রীপস্-এর। আর কিছু না হলেও এর ফলে উভয় দেশের জনসাধারণের মধ্যে তিনি যে পরস্পরের প্রতি একটা তীব্র অবিশ্বাস ও সন্দেহের মনোভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাতে আর কোন ভুল নেই।

সব কিছুর অবসান ঘটল ২২শে জুন, ভোররাত্রে।

অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করে হঠাৎ সেদিন হিটলার পৃথিবীর ইতিহাসে দীর্ঘতম রণক্ষেত্র,—দু-হাজার মাইল বিস্তৃত রুশ-সীমান্তের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন দুর্বার গতিতে।

রাষ্ট্রদূত ক্রীপস্-এর উস্কানিতে রাশিয়া নাকি তলে তলে ব্রিটিশের সঙ্গে যোগ দিয়ে খাস জার্মানী আক্রমণের সিদ্ধান্ত করেছে। সুতরাং আগে থাকতেই সে-পথ বন্ধ করা দরকার।

খবর শুনে উল্লাসে ফেটে পড়লেন যুদ্ধবাজ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল। হিটলার শত্রু। রাশিয়াও তাই। এবার ওরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে মরুক, তারপর ভাগ-বাঁটোয়ারার সময় দেখা যাবে।

সেদিনই রাত্রে এক বেতার-বক্তৃতায় চার্চিল ঘোষণা করলেন ইংল্যাণ্ডের বর্তমান নীতির কথা।

এখন থেকে রাশিয়া আমাদের বন্ধু। আমরা সর্বতোভাবে তাদের সহায়তা করতে প্রস্তুত। এসো, হাতে হাত মেলাও!

চিঠির পর চিঠি। টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম। বলো, কি কি সাহায্য চাই তোমাদের?

কোন উত্তরই দিলেন না স্ট্যালিন। ব্রিটিশের ওসব বড় বড় বুলি তাঁর ঢের শোনা আছে। সুতরাং, সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

চার্চিলও নাছোড়বান্দা। যে করে হোক রাশিয়ার উপকার করার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর। তাঁর নিজের ভাষায়ঃ 'হিটলারকে পরাজিত করার জন্য দরকার হলে আমি নরকের সঙ্গেও হাত মেলাতে প্রস্তুত।'

অনেক সাধ্য-সাধনার পরে অবশেষে উত্তর দিলেন স্ট্যালিন। আমি কাজের মানুষ। কাজটাই আগে বুঝি, কথা নয়। সত্যিই যদি আমাদের বন্ধুত্ব তোমাদের কাম্য হয়ে থাকে, তবে কাজেই তার প্রমাণ দাও।

বেশ, তাই হবে। বলো, কি প্রমাণ পেলে তোমরা খুশি হও?

'সেকেণ্ড ফ্রণ্ট'।

সেকেণ্ড ফ্রণ্ট! চার্চিল স্তম্ভিত। বলে কি এই বেরসিক লোকটা।

হ্যাঁ, সেকেণ্ড ফ্রণ্ট। আমরা এদিক থেকে হিটলারকে সামলাচ্ছি। তোমরা ফ্রান্সের উপকূলভাগে একটা সেকেণ্ড ফ্রণ্ট খুলে দিয়ে আক্রমণ চালাও। ব্যস, এইটুকু পেলেই আমরা খুশি।

বটেই তো! বটেই তো। সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিশ্রুতি দিলেন প্রধানমন্ত্রী চার্চিল, তবে এত ব্যস্ত কেন? এই তো সেদিন ডানকার্ক থেকে 'glorious retreat' করে এলাম। এরপর একটু সামলে নেবার জন্য সময় দেবে তো! তাই বলছি যে, আপাতত কিছুদিন তোমরা একাই মহড়া নাও। তারপর সময় হোক, তখন দেখবে যে লড়াই কাকে বলে!

নীতি এবং আদর্শের দিক থেকে সম্পূর্ণ অমিল হওয়া সত্ত্বেও রাশিয়া এবার ব্রিটিশের সঙ্গে হাত মেলাল প্রয়োজনের তাগিদে। ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা পরে করলেও চলবে। আগে স্বাধীনতা, তারপর অন্য কথা।

ওদিকে বাল্টিক সাগর থেকে শুরু করে কৃষ্ণসাগর, এই দু-হাজার মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গনে হাজার হাজার বোমারু বিমান, হাজার হাজার ট্যাঙ্ক ও লক্ষ লক্ষ মোটরারূঢ় দুর্ধর্ষ জার্মান প্যানৎসার বাহিনী ততক্ষণে পঙ্গপালের মতো ঢুকে পড়েছে রাশিয়ার অভ্যন্তরে। রাশিয়ার শীত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। তার আগেই লড়াই শেষ করে ফেলতে হবে।

উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গণে আক্রমণ পরিচালনা করার দায়িত্ব নিয়েছেন বিখ্যাত জার্মান সমরবিদ ফিল্ড-মার্শাল ভন লীব। সহকারী হিসেবে সঙ্গে রয়েছেন জেনারেল কুয়েক্লার, জেনারেল বুস ও ট্যাঙ্ক-বিশারদ জেনারেল হোয়েপনার। লক্ষ্য তাঁদের—লেনিনগ্রাদ।

মধ্য-রণাঙ্গনে ফিল্ড-মার্শাল ভন বোক্। আর রয়েছেন ফিল্ড-মার্শাল ভন ক্লুগে জেনারেল স্ট্রাউস, জেনারেল ভন ভিকস্, জেনারেল টড্ (ট্যাঙ্ক) ও মার্শাল কেসেলরিং (বিমান) প্রমুখ স্বনামখ্যাত সহকারিবৃন্দ। লক্ষ্য—রাজধানী মস্কো।

দক্ষিণ রণাঙ্গনে ফিল্ড-মার্শাল ভন রুনস্টেড। সহকারী হিসেবে সঙ্গে

রয়েছেন ফিল্ড-মার্শাল ভন রাইকেনাউ, জেনারেল স্টুয়েলপ্‌ন্যাজেল, জেনারেল ভন সোপার্ট, জেনারেল ভন ক্লাইস্ট (ট্যাঙ্ক) ও জেনারেল লোয়ের (বিমান) প্রমুখ সমরবিদগণ। লক্ষ্য—রাশিয়ার শস্য-ভাণ্ডার গোটা উক্রাইন অঞ্চল।

রাশিয়ার পক্ষে লেনিনগ্রাদ-সহ সমগ্র উত্তরাঞ্চল রক্ষার দায়িত্বে রয়েছেন মার্শাল ভরোশিলভ। মধ্য-রণাঙ্গনে মার্শাল টিমোশেঙ্কো আর দক্ষিণ রণাঙ্গণে মার্শাল বুদেনী।

'Remember, you are always within an inch of invasion.'

রাষ্ট্রগুরু লেনিনের এই সতর্ক-বাণী রাশিয়া কোনদিনই ভোলেনি।

চারপাশে তাদের একাধিক ধনতান্ত্রিক দেশ। সুযোগ পেলেই যে তারা তাদের পিষে মারতে চেষ্টা করবে, সেকথা তারা ভাল করেই জানে।

তবু অতর্কিত আক্রমণ, তার ওপর দুর্বল স্থানে আঘাত, তাই প্রথম ধাক্কাতেই জার্মান বাহিনী বিদ্যুৎবেগে প্রায় চারশ' মাইল ঢুকে পড়তে সক্ষম হল রাশিয়ার অভ্যন্তরে।

৩রা জুলাই তারিখে স্ট্যালিন নিজেই সেকথা স্বীকার করলেন তাঁর এক বেতার-ভাষণে। লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া, হোয়াইট রাশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল এবং উক্রাইনের একাংশ শত্রুপক্ষের দখলে। লেনিনগ্রাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

মধ্য-রণাঙ্গনেও মার্শাল টিমোশেঙ্কোকে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড হারাতে হল জার্মানদের কাছে। প্রথমেই হারাতে হল মিনস্ক। তারপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রেল-কেন্দ্র স্মলেনস্ক।

স্মলেনস্ক হারানো মানেই রাজধানী মস্কোর দরজা খুলে যাওয়া। তাই লাল ফৌজ এখানে প্রাণপণে বাধা দিতে চেষ্টা করল জার্মান বাহিনীকে। তবু কিছুতেই কিছু হল না। শেষ পর্যন্ত স্মলেনস্কও একদিন বেদখল হয়ে গেল দুর্ধর্ষ জার্মান বাহিনীর হাতে।

এবার স্মলেনস্ক যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতির একটা বিবরণ শোন মল্লিকা। এটা বিপক্ষের দেওয়া কোন হিসেব নয়, উভয় পক্ষের সরকারী ইস্তাহারে ক্ষয়-ক্ষতির যে বিবরণ দেওয়া হয়েছিল, তা-ই এখানে তুলে দিচ্ছিঃ

রাশিয়ার ক্ষতি—হতাহত ও নিখোঁজ সৈন্য মোট ৬ লক্ষ; ৫ হাজার ট্যাঙ্ক; ৭ হাজার কামান আর মোট ৪ হাজার বিমান।

আর জার্মানদের মতে তাদের নিজেদের নিহত সৈন্যের সংখ্যা হল মোট ৪,০২,৮৬৫ জন।

ভাবতে পার মল্লিকা! সংখ্যা চিন্তা করতে পার একবার!

এদিকে বিপদে পড়ে গেলেন মার্শাল বুদেনী। হঠাৎ তিনি বেষ্টিত হয়ে পড়লেন জার্মান সেনাপতি ভন রুনস্টেডের সেনাবাহিনীর হাতে।

তবে বেশিক্ষণ নয়। অদ্ভুত কৌশলে এক সময়ে তিনি পাশ কাটিয়ে চলে যেতে সক্ষম হলেন নীপার নদীর ওপারে।

এবার এক মহা সমস্যা দেখা দিল বুদেনীর চোখের সামনে।

কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নীপার নদীর বাঁধ শুধু পৃথিবীতে সর্ববৃহৎ নয়, সোভিয়েত রাশিয়ার পূর্ত-বিভাগীয় এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার এক বিস্ময়কর নিদর্শনও বটে।

উক্রাইন অঞ্চলের সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে এই বাঁধ। কি করা যায়, এখন এই বাঁধ নিয়ে?

জার্মান বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করতে হলে অবিলম্বে এই বাঁধ ভেঙে দেওয়া প্রয়োজন। অথচ তার ফলে রাশিয়ার যে ক্ষতি হবে, তা সত্যিই অপূরণীয়। কি করা যায় এখন এ পরিপ্রেক্ষিতে?

অনেক ভেবে-চিন্তে শেষ পর্যন্ত ২৮শে আগস্ট ভোররাত্রে বুদেনী সেই বাঁধ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র উড়িয়ে দিলেন শক্তিশালী ডিনামাইটের সাহায্যে।

অভূতপূর্ব জল-প্লাবনের ফলে জনসাধারণকে হয়তো অশেষ দুঃখ-দুর্গতির সম্মুখীন হতে হবে, কিন্তু উপায় কি!

আগে স্বাধীনতা, তারপর অন্য কথা। এমন জিনিস কোনমতেই শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া চলে না, যার দ্বারা সে এতটুকুও উপকৃত হতে পারে।

এত করেও কিন্তু জার্মান বাহিনীর গতিরোধ করা সম্ভব হল না, মল্লিকা।

একে একে হারাতে হল ওডেসা, কিয়েভ, খারকোভ, পেরেকোপ, ক্রিমিয়া, রস্টোভ, কার্চ ইত্যাদি সব কিছুই।

কিয়েভ রাশিয়ার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র উক্রাইনের রাজধানী। খারকোভ রাশিয়ার শ্রম-শিল্পের তৃতীয় বৃহত্তম নগরী এবং রেলওয়ে ও রাস্তার যোগাযোগের ব্যাপারে দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। রাশিয়ার পক্ষে এ ক্ষতি নিঃসন্দেহে মারাত্মক।

শুধু তাই নয়। লিথুয়ানিয়া ও ল্যাটভিয়ার মধ্য দিয়ে শক্তিশালী একটা জার্মান বাহিনী ততদিনে পৌঁছে গেছে লেনিনগ্রাদের উপকণ্ঠে। হিটলারের নির্দেশ—লেনিনগ্রাদ আমার চাই!

স্বাধীনতার যে কি মূল্য, রাশিয়া তা ভাল করেই জানে। তাই অনেক কিছু হারিয়েও এবার তারা রুখে দাঁড়াল রুষ্ট বাঘের মতো। অসম্ভব! পবিত্র-ভূমি লেনিনগ্রাদ আমরা কিছুতেই ছাড়ব না।

শুধু রাষ্ট্রগুরু লেনিনের নামানুসারে বলে নয়, অন্যান্য দিক থেকেও লেনিনগ্রাদের গুরুত্ব অসাধারণ।

লেনিনগ্রাদ একাধারে নৌ-দুর্গ ও স্থল-দুর্গের সমন্বয়ে শক্তিমান। তাছাড়া বস্ত্র-শিল্প, জাহাজ, বিমান, গোলা-গুলি ও বিভিন্ন অস্ত্র-সম্ভার নির্মাণের কেন্দ্র হিসেবেও রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প-নগরী বলে পরিচিত। সুতরাং, লেনিনগ্রাদকে কোনরকমেই হাতছাড়া করা চলে না।

ফিল্ড-মার্শাল ভন লীব, জেনারেল ব্রাউসিসৃত, জেনারেল রুনস্টাড, জেনারেল ভন গুড়েরিয়ান প্রমুখ বিখ্যাত সমরবিদগণ বোঝাতে চেষ্টা করলেন হিটলারকে।

লেনিনগ্রাদের চাইতে মস্কোর গুরুত্ব অনেক বেশি। সুতরাং, এখানে অহেতুক কালক্ষয় না করে মস্কোর দিকেই এখন আমাদের নজর দেওয়া উচিত।

কে কার কথা শোনে! ভদ্রলোকের এককথার মতো হিটলারেরও সেই এক গোঁ—লেনিনগ্রাদ আমার চাই-ই!

ফুয়েরারের মান রাখতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ভন লীবের দুর্ধর্ষ প্যানৎসার বাহিনী সর্বশক্তি নিয়ে আঘাত হানল লেনিনগ্রাদের ওপর। ফুয়েরারের আদেশ। লেনিনগ্রাদ চাই-ই!

অসম্ভব! রুখে দাঁড়াল মরণজয়ী লাল ফৌজ।

সেই সঙ্গে নগরীর ত্রিশ লক্ষ স্বাধীনতা-প্রিয় নরনারী। লেনিনগ্রাদ আমরা ছাড়ব না। প্রাণ যায় যাক, তবু এই পবিত্রভূমিকে যে কোন মূল্য দিয়ে আমরা রক্ষা করবই।

৮ই সেপ্টেম্বর লেনিনগ্রাদ সম্পূর্ণ বেষ্টিত হল জার্মানদের দ্বারা।

বেষ্টনী আরো দৃঢ় হল বন্ধু-রাষ্ট্র ফিনল্যান্ডের সাহায্যে। ফলে একমাত্র ক্রোনস্টাডের নৌ-দুর্গ ও নৌ-ঘাঁটি ছাড়া লেনিনগ্রাদের আর কোন যোগাযোগই রইল না মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে।

সুরক্ষিত শক্তিশালী দুর্গ আক্রমণে জার্মানদের পটুতা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। বেলজিয়ামের দুর্গমালা, ফ্রান্সের ম্যাজিনো লাইন, রাশিয়ার স্ট্যালিন লাইন সব কিছুই তাদের হাতে ধূলিসাৎ হয়েছে একে একে।

তাছাড়া ইতিপূর্বে প্রতিটি ক্ষেত্রে যেভাবে বিদ্যুৎগতিতে আক্রমণ চালিয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তারা বিপক্ষকে মাথা নোয়াতে বাধ্য করেছে, যুদ্ধের ইতিহাসে তা সত্যিই অভিনব।

যেমন—পোল্যান্ড। পোল্যান্ড জয় করতে তাদের লেগেছিল মাত্র আঠারো দিন। ডানকার্ক—বারো দিন। বলকান রাজ্যসমূহ—দশ দিন। ফ্রান্স—ছাব্বিশ দিন।

বাদ সাধল লেনিনগ্রাদ।

আশ্চর্য, চারিদিক থেকে অবরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মার্শাল ভরোশিলভের ঐতিহাসিক লাল ফৌজ এতটুকুও মাথা নোয়াল না জার্মানদের কাছে। তাদের একমাত্র পণ—লেনিনগ্রাদ আমরা দেব না। যে করে হোক, পিতৃভূমি লেনিন-গ্রাদকে আমরা রক্ষা করবই।

লেনিনগ্রাদের আশা ছেড়ে দিয়ে এবার শুরু হল মস্কো অভিযান।

শীতের আর বিশেষ বাকি নেই। সেপ্টেম্বর শেষ। অক্টোবরও যায়-যায়। এর পরই ভয়ঙ্কর শীত নেমে আসবে রাশিয়ার প্রান্তরে। সেই সঙ্গে মারাত্মক তুষারপাত। তার আগেই যে করে হোক, লড়াই শেষ করে ফেলতে হবে।

তাছাড়া লাল ফৌজের একটা বিরাট অংশ তখন ব্যস্ত রয়েছে লেনিনগ্রাদ রক্ষার জন্য। কোনরকমেই তাদের বেষ্টনী ভেদ করে বাইরে আসার উপায় নেই। মস্কো দখল করার এই তো অপূর্ব সুযোগ! সুতরাং, চলো এবার মস্কো।

সঙ্গে সঙ্গে ফিল্ড-মার্শাল ভন বোক মস্কো অভিমুখে ঝড়ের মত ছুটে আসতে লাগলেন বিরাট যান্ত্রিক বাহিনী নিয়ে। সঙ্গে রইলেন ট্যাঙ্ক-বিশারদ জেনারেল গুডেরিয়ান ও বিমান-বিশারদ হের কেসেলারিং। ফুয়েরারের নির্দেশ। মস্কো চাই-ই!

প্রথমেই দখল করলেন লেনিনগ্রাদ-মস্কোগামী রেলপথে অবস্থিত ক্যালিনিন।

তারপর একে একে ভলোকলামস্কো, ভিয়াজমা, বরোডিনো হয়ে মোজাইস্ক।

আর মাত্র সত্তর মাইল বাকি। তারপরই মস্কো।

শুধু একদিক থেকে নয়, বৃত্তাকারে বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ।

ক্যালিনিন থেকে আর একটা বাহু ক্লিনের মধ্যে দিয়ে ক্রমশ এগুতে লাগল মস্কো-ভলগা খালের দিকে। মস্কোকে যাঁতি-কলে পিষে মারতে হবে বিভিন্ন দিক থেকে। কোনমতেই যেন সে রেহাই না পায়।

২০শে অক্টোবর তারিখে মস্কোর বিপদ-বার্তা ঘোষিত হল রেডিওযোগে। পরিস্থিতি সত্যিই গুরুতর। সরকারী দপ্তর মস্কো থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে কুইবিশভে।

সামরিক বিভাগেও অদল-বদল করা হয়েছে কিছু কিছু। মার্শাল ভরোশিলভের জায়গায় এখন উত্তর রণাঙ্গন, অর্থাৎ মস্কো-লেনিনগ্রাদ অঞ্চল রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন জেনারেল জুকভ।

মধ্য-রণাঙ্গনে—মার্শাল টিমোশেঙ্কো।

মার্শাল ভরোশিলভ ও মার্শাল বুদেনীকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে মস্কো থেকে অনেকটা পেছনে। আরো সৈন্য চাই। অনেক সৈন্য। অবিলম্বে তাদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। সে দায়িত্ব এ দুজনের ওপর।

দেখতে দেখতে মস্কোর পঁয়ত্রিশ মাইলের মধ্যে পোঁছে গেল জেনারেল ভন ক্লুগ-এর দুর্ধর্ষ প্যানৎসার বাহিনী।

ট্যাঙ্ক, বিমান ও দূরপাল্লার কামানের সাহায্যে তারপর শুধু আঘাত আর আঘাত! একটানা আঘাত। দিনে-রাত্রে। অবিশ্রান্তভাবে। যে করে হোক, মস্কো চাই-ই! ফুয়েরারের আদেশ।

জেনারেল জুকভের নেতৃত্বে লাল ফৌজও তখন উন্মত্ত, মরিয়া। প্রাণ যায় যাক, তবু মস্কো আমরা শত্রু-কবলিত হতে দেব না। কিছুতেই না।

এমনি করে পুরো নভেম্বর মাস। তবু লাল ফৌজকে একটুকুও টলানো গেল না তাদের সঙ্কল্প থেকে। ফলে, আর এক ইঞ্চিও এগুনো সম্ভব হল না জার্মান বাহিনীর পক্ষে।

ততদিনে সেই ভয়াবহ শীত নেমে এসেছে রাশিয়ার প্রান্তরে। সেই সঙ্গে তীব্র তুষারপাত।

শুধু বরফ আর বরফ! ট্যাঙ্ক, বিমান, কামান সব কিছুই বরফে বরফে একেবারে একাকার।

প্রকৃতির এই নির্মম আক্রমণ থেকে বাঁচতে হলে মস্কোর আশা ত্যাগ করে অবিলম্বে পিছিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনই উপায় নেই।

না, কারও পিছিয়ে আসা চলবে না। আদেশ জারি করলেন মহামান্য হিটলার, সবাইকে ওখানে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে। শীত আর কদিন! ও তো দেখতে দেখতেই কেটে যাবে। শীত গিয়ে বসন্তকাল আসুক, তখন দেখা যাবে!

ইয়োরোপ-প্রবাসী প্রতিটি ভারতীয়ের দৃষ্টি তখন বার্লিনের দিকে। সুভাষ ডাক পাঠিয়েছেন। স্বাধীনতার ডাক। সুতরাং, আর দেরি নয়। চলো সবাই বার্লিন।

পেছনে তাকাবার সময় নেই। হিসেব-নিকেশেরও ফুরসৎ নেই। এ হল বাঁচার সংগ্রাম। এ সংগ্রামে সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে।

প্যারিস থেকে ছুটে এলেন বিনু ব্যানার্জী আর প্রমোদ সেন। প্রথমে দ্বিধা। নীতিগত দিক থেকে নাৎসীদের সঙ্গে আমাদের কোন মিল নেই। তাদের সঙ্গে হাত মেলানো কি করে সম্ভব?

পরে সব দ্বিধাই স্রোতের মত ভেসে গেল সুভাষের বক্তব্য শুনে।

পৃথিবীর কোন দেশ সাহায্য গ্রহণ করেনি অন্য কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র থেকে? আয়ারল্যান্ড তার মুক্তি-যুদ্ধে সাহায্য নেয়নি আমেরিকার কাছ থেকে?

রাশিয়া নেয়নি?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে প্রতিরোধ করার জন্য ব্রিটিশ এতদিন জাপানকে সাহায্য করেনি তলে তলে?

তাহলে আমরাই বা নেব না কেন?

নিশ্চয় নেব। নেব কূটনীতি হিসেবে। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে যাব আপন লক্ষ্যের দিকে। সে লক্ষ্য হল—আমাদের স্বাধীনতা। সোজা কথায়, এটা হল কূটনীতির খেলা। এ খেলায় প্রতিনিয়ত আমাদের সজাগ থাকতে হবে। বুদ্ধির লড়াইতে জয়ী হতে হবে।

এলেন বম্বের অধিবাসী এন. জি. গণপুলে।

অহিংস নীতিতে আস্থাবান খাঁটি কংগ্রেস-কর্মী। ডাক শুনে তিনিও এসে হাত মেলালেন সুভাষের সঙ্গে।

সব পথই স্বাধীনতার পথ। কোন্ পন্থায়, কোন্ রীতিতে স্বাধীনতা আসবে সেটা বড় কথা নয়। অহিংস পন্থায় না এলেও স্বাধীনতা স্বাধীনতাই। স্বাধীনতার কোন বিকল্প নেই।

নিজস্ব বেতারকেন্দ্র 'আজাদ হিন্দ্ রেডিও'র কাজ শুরু হল অক্টোবর মাস থেকে।

সুভাষের সারা মনে সেদিন কূলপ্লাবী আনন্দ। একটা বিপুল পরিতৃপ্তি। বুঝি এমনি একটা লগ্নের অপেক্ষায়ই তিনি উন্মুখ হয়ে ছিলেন সারা জীবন।

'The first day of broadcasting to India was an eventful day both for Netaji and India. It was the day for which Netaji was feverishly waiting. Although by temperament a very patient man, he looked that day unusually enthusiatic and even a little excited.'

[N. G. Ganpuley : P.—51]

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে সেদিনই সর্বপ্রথম পৃথিবীর মানুষ শুনতে পেল সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর ঃ

'আজাদ হিন্দ্ রেডিও—বার্লিন, আমি সুভাষ বলছি...'

সুভাষ! সুভাষ! সুভাষ!

একটা ঝড় বয়ে গেল যেন ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে। এতদিনকার সব সংশয়ের অবসান। সব প্রশ্নের পরিসমাপ্তি।

না, সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সেই তেজোদীপ্ত কণ্ঠ। সেই মনোহর ভঙ্গী। কোথাও এতটুকু অমিল নেই। সুভাষই।

কিন্তু কি করে এটা সম্ভব হল? পৃথিবীব্যাপী এখন মহাযুদ্ধ চলছে। এ সময়ে পুলিশের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কি করে বার্লিন যাওয়া সম্ভব হল সুভাষের পক্ষে? এ যে কল্পনাতীত ব্যাপার!

২রা নভেম্বর আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘের প্রথম অধিবেশন বসল বার্লিনে।

ভারতের মূল ভূমি থেকে ছ' হাজার মাইল দূরে সেই প্রথম উড্ডীন হল ভারতের তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা।

প্রথমেই কবিগুরুর 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটি গৃহীত হল জাতীয়-সঙ্গীতরূপে।

তারপর একে একে গৃহীত হল তিনটি উল্লেখযোগ্য কথা—যা আজও অমর, অক্ষয় হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়। অক্ষয় হয়ে আছে প্রতিটি ভারতবাসীর দৈনন্দিন জীবনে।

প্রথম কথাটি হল—'জয় হিন্দ্'। নমস্কার নয়। নমস্তেও নয়। জয় হিন্দ্।

মল্লিকা, এর আগে কেউ কোনদিন ভাবতে পেরেছিল কি এমনি একটি সর্বজন-গ্রহণযোগ্য জাতীয় অভিবাদনের কথা? মাথায় এসেছিল কারো?

'জাতির জনক' বলে গান্ধীজী আজ সর্বত্র পূজিত। সুভাষের দেওয়া এই 'জাতির জনক' সম্বোধনটিরই কি তুলনা আছে কোথাও?

অদৃশ্য অঙ্গুলি-হেলনে ইতিহাস আজ তার বুক থেকে সুভাষের নাম মুছে ফেলতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু তাঁর দেওয়া ঐ বিশেষণ দুটি?

না, তাতে কোন আপত্তি নেই। কারণ, অনেক চেষ্টা করেও এর বিকল্প কোন প্রতিশব্দ আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

দ্বিতীয় কথাটি হল—'আজাদ হিন্দ্ জিন্দাবাদ'। আর তৃতীয় কথাটি!

নেতাজী! নেতাজী! নেতাজী!

সুভাষ নয়। নেতা নয়। নেতাজী। তোমার—আমার—সবার নেতাজী। প্রতিটি ভারতবাসী নেতজী। স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক ও অদ্বিতীয় পুরুষ—মহাক্ষত্রিয় নেতাজী।

প্রথমে আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘ। তারপর আজাদ হিন্দ্ রেডিও। এবার চাই ভারতের নিজস্ব সেনাবাহিনী—'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ'। Indian Legion.

আফ্রিকা রণাঙ্গনে হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্য বন্দী হয়েছে ফিল্ড-মার্শাল রোমেলের হাতে। তাদের বেশির ভাগকেই রাখা হয়েছে ইতালীতে।

মাত্র হাজার দশকের মত আনা হয়েছে জার্মানীর আনাবর্গ ক্যাম্পের বন্দী-নিবাসে।

ঐ সব বন্দীদের সাহায্যে একটা ভারতীয় বাহিনী গড়া যায় না? গড়া যায় না ভারতের নিজস্ব সেনাবাহিনী 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ'?

কিন্তু কি করে তা সম্ভব? রেডিও অসামরিক দপ্তরের ব্যাপার। কিন্তু ফৌজ গঠন সম্পূর্ণ সামরিক বিভাগের ইচ্ছাধীন। জার্মানী তাতে রাজী হবে কেন? তাদের দেশে সম্পূর্ণ আলাদা একটি স্বাধীন বাহিনী গড়তে দেবার প্রশ্নই যে ওঠে না।

কিন্তু দাবী তুলেছেন স্বয়ং সুভাষ বোস। লোকটা যে একেবারে নাছোড়-বান্দা। একবার মাথায় কিছু ঢুকলেই আর রক্ষে নেই। তার শেষ পর্যন্ত দেখে সে নেবেই। এমন লোককে এড়ানোও যে মুশকিল!

'Once an idea caught his fancy, he was not the man to leave it on account of ordinary difficulties.'

[Ganpuley : P.—53]

যোগাযোগ করা হল সামরিক বিভাগের সঙ্গে। প্রথমে বৈদেশিক দপ্তরের মাধ্যমে। তারপর সোজাসুজি নিজেই।....'he tried to establish contacts with the military authorities in Berlin, first through the Special India Division of the German Foreign Office and afterwards directly. [Dr. Werth : P.—38]

অনেক আলাপ-আলোচনার পরে অবশেষে রাজী হল জার্মানী। বেশ, তাই হোক। গড়ে উঠুক তোমাদের নিজস্ব সেনাবাহিনী।

এবার শর্তাবলী। সুভাষের দাবী: এ বাহিনী হবে আমাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব। কোন অবস্থাতেই তোমাদের কোন বাহিনীর সঙ্গে তাদের মেশানো চলবে না।

আমাদের একমাত্র শত্রু ব্রিটিশ। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করা ছাড়া আমাদের সেনাবাহিনীকে অন্য কোন যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো চলবে না। তবে হ্যাঁ, কোথাও আক্রান্ত হলে সেক্ষেত্রে তারা আত্মরক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবে বৈকি।

বেতন, ছুটি, খাওয়া-দাওয়া এবং পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে তোমাদের মত আমাদের সেনাবাহিনীকেও সমান সুবিধা দিতে হবে। এ ব্যাপারে কোন-রকম তারতম্য করা চলবে না।

এবারও সুভাষের প্রতিটি দাবী গৃহীত হল যথাযথভাবে। শুধু মুখে নয়, কাজেও। এবং সে দায়িত্ব জার্মানী বহন করেছিল শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত।

'After many discussions and deliberations with the German Army Head Quarters on this subject, it was ultimately decided that Netaji should be given every help to choose his men out of the POW (Prisoner of War) camps

and the German Wehrmacht should give him all the help necessary on the lines suggested.

...All the arrangements agreed to were meticulously carried out, from the day they were approved till the very end of the war.' [Ganpuley : P.—39]

প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্যেরও ব্যবস্থা হল আলোচনার মাধ্যমে।

সুভাষের ব্যক্তিগত ভাতা বরাদ্দ হল মাসিক ৮০০ পাউন্ড। আর আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘের জন্য ১,২০০ পাউন্ড। ১৯৪৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৩,২০০ পাউন্ড। অবশ্য সেনাবাহিনীর খরচ আলাদা।

তবে সবই ঋণ হিসেবে। সে ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব ভারতের নয়, সুভাষের একার।

তাই মেনে নিলেন জার্মান সরকার। সুভাষের সততার প্রতি সে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা তাঁদের বরাবরই ছিল।

'It was a gentleman's agreement made in good faith. It was a personal debt of honour to Bose and the Indian Nation was not made responsible for its re-imbursement.'

[Ibid : P.—38]

এবার সৈন্য সংগ্রহের কাজ।

প্রথমে সহকর্মী এন. জি. স্বামী ও আবিদ হাসানকে বন্দিশালায় পাঠানো হল সৈন্য সংগ্রহ করার জন্য। তারপর নিজেই। শুধু সহকর্মীদের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। এ কাজ সবার। সুতরাং সবাইকেই যেতে হবে সেখানে।

কাজটা কিন্তু খুব সহজে হল না, মল্লিকা।

প্রথমেই বাধা এল বন্দীদের দিক থেকে। না, ওসবের মধ্যে আমরা নেই। ইংরেজের নিমক খেয়েছি, সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আমরা রাজী নই।

কেন এই দ্বিধা? কি এর কারণ?

কারণ আর কিছুই নয় মল্লিকা; আসলে এর পেছনে রয়েছে ইংরেজ শাসকদের সেই চিরাচরিত কূটনীতি, যে নীতির সাহায্যে তারা ভারতকে পদানত করে রাখতে সক্ষম হয়েছিল যুগ যুগ ধরে।

অর্থাৎ, সৈন্যবাহিনী গড়া হবে কেবলমাত্র অশিক্ষিত লোকদের নিয়ে, শিক্ষিতদের নিয়ে নয়।

শিক্ষিত লোকদের বিশ্বাস নেই। কখন যে ওরা রাইফেল নিয়ে ঘুরে দাঁড়াবে, তা বলা শক্ত।

অশিক্ষিতদের বেলায় তেমন কোন ভয়ের কারণ নেই। পেট ভরে খাওয়া, মাস গেলে নগদ মাইনে আর শেষ-জীবনে পেনসন—ব্যস, এটুকু পেলেই ওরা খুশি। তার বাইরে কোন কিছু নিয়ে ওরা বড় একটা মাথা ঘামায় না। সুতরাং, কামানের খোরাক হিসেবে ওরাই অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য।

এ প্রসঙ্গে ডঃ গিরিজা মুখার্জী তাঁর 'Netaji the Great Resistance Leader' নিবন্ধে কি বলেছেন, শোন ঃ

'The recuritment policy of the British was designed to make the simple Indian peasants when brought into the army, completely immune from any national feeling, and, inspite of the fact that they had their family roots in our Indian village, yet the British succeeded in indoctrinating them in such a manner as to make them completely indifferent to the upheavals which were going on around them.'

সুভাষ কিন্তু এতটুকুও নিরাশ হলেন না সৈন্যদের এই বিরূপ মনোভাব দেখে। বরং আরো বেশি করে ওদের সঙ্গে মিশতে লাগলেন নতুন উদ্যমে।

দোষ ওদের নয়। ওরা অশিক্ষিত, গরীব। নিজেদের দেশকে ওরা চেনে না। স্বাধীনতা যে কি বস্তু, তাও ওরা জানে না। জানতেও দেওয়া হয়নি কোনদিন।

এবার ওদের সেই নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত করতে হবে। শোনাতে হবে দেশের কথা। স্বাধীনতার কথা। জন্মগত অধিকারের কথা।

প্রথমেই তিনি দল থেকে ব্রিটিশ এন. সি. ও-দের সরিয়ে দিলেন অন্যত্র। দোষ সৈন্যদের নয়, ওদের। ওরাই সৈন্যদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে চলেছে আড়াল থেকে। সুতরাং, হটাও ওদের।

এবার কাজ হল। প্রথমে একটি দুটি, তারপর দলে দলে সবাই এগিয়ে এল সুভাষের উদাত্ত কণ্ঠের আহবান শুনে। নেতাজী! নেতাজী! নেতাজী! আমাদের নেতাজী! বলো, আমাদের কি করতে হবে? তুমি আদেশ করো!

এ প্রসঙ্গে ডঃ গিরিজা মুখার্জীর 'দিস ইয়োরোপ' গ্রন্থ থেকে কয়েকটি লাইন এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ

'I saw how the whole audience was coming under his spell and how they were listening...when he had finished they had acquired new life, new animation, new excitement...'

তিনি আরো বলেছেন ঃ

'দিনের পর দিন সুভাষকে আমি দেখেছি ভারতীয় বন্দীদের সঙ্গে কথা বলতে। শুনেছি তাঁর তেজোদীপ্ত কণ্ঠের আহবান।

একদিনের কথা আজও আমার মনে পড়ে। সেদিন ড্রেসডেনের রৌদ্র-ক্লান্ত পথে দাঁড়িয়ে সুভাষ ভারতীয় নাবিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। শ্রোতা-দের বেশির ভাগই ছিল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্মের মানুষ।

সুভাষের সেই কণ্ঠস্বর, সেই অনুভূতি মেশানো কথা, সেই সুখ-দুঃখের কাহিনী আজও আমার কানে বাজে মিষ্টি সঙ্গীতের মত। তাঁর সেদিনের

বক্তৃতা আমার দেহের শিরা-উপশিরায় সত্যই উত্তেজনার ঢেউ তুলেছিল। মনে হয়েছিল, আমি যেন সত্যই স্বাধীন ভারতের নাগরিক।

কতক্ষণ সুভাষ বক্তৃতা দিয়েছিলেন জানি নে। বোধহয় ঘণ্টা দেড়েক হবে। বক্তৃতা শেষে দেখা গেল, শ্রোতার দল স্তব্ধ। যেন তারা তাদের হারানো নেতাকে খুঁজে পেয়েছে। খুঁজে পেয়েছে মুক্তির পথ। শুনতে পেয়েছে স্বাধীনতার বাণী।

তারপর একে একে তারা এগিয়ে এসে সুভাষকে বলল:

আজ থেকে তুমিই আমাদের নেতা। আমাদের নেতাজী। আমাদের পথ-প্রদর্শক। আমরা সবাই তোমার আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘের কর্মী। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈন্য।'

আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে ইতিপূর্বে কেউ এ জিনিস পারেননি। কি গান্ধীজী, কি জওহরলাল, কেউ সক্ষম হননি সেনাবাহিনীর রাজানুরক্তিতে এতটুকু ফাটল ধরাতে।

একমাত্র ব্যতিক্রম সুভাষ। স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে তিনিই এক-মাত্র লোক, যিনি সেই রাজ-ভক্ত সেনাবাহিনীকে কাছে টেনে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন দেশ ও জাতির প্রয়োজনে।

ডঃ মুখার্জীর ভাষায়:

'...inspite of the nation-wide struggle for independence which we carried out from 1920 up to 1939, our Indian soldiers seemed completely unaffected. Neither Mahatma Gandhi nor Jawaharlal Nehru was able to pierce through this indoctrination which the British had so carefully fostered in them.

...no one amongst our national leaders, except Subhas Bose, had been able to win over the loyalty and respect of the Indian soldiers and convert them to the national cause. It was Subhas Bose's great contribution that he succeeded where the other national leaders had failed.'

আজাদ হিন্দ্ রেডিও ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে দেশে-বিদেশে।

কাজের নেশায় প্রতিটি কর্মী উন্মত্ত যেন। শুধু কাজ আর কাজ। নিরবচ্ছিন্ন কাজ। কাজ ছাড়া আর সব কিছুই বুঝি চাপা পড়ে গেছে মনের অতল গভীরে।

নিত্য-নতুন ফিচার। নিত্য-নতুন দেশের উত্থান-পতনের কাহিনী। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্বন্ধে নিত্য-নতুন প্রচার।

এই প্রচারের সাহায্যেই নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে তুলতে হবে। জানাতে হবে প্রতিটি রণাঙ্গনে ইংরেজের ভাগ্য-বিপর্যয়ের কথা।

ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীনতার কথা। সময় এসে গেছে। সংগ্রাম আসন্ন। তোমরা প্রস্তুত হও!

৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ সাল।

আবার সেদিন সেই তেজোদীপ্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল ইথার-তরঙ্গে।

'আমি সুভাষ বলছি...'

দেখতে দেখতে সেই স্বর ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। আমি সুভাষ বলছি! আমি সুভাষ বলছি! আমি সুভাষ বলছি!

'এতকাল আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য বিষয় শোনানোর কোন সুযোগ ছিল না। শত্রুপক্ষ যে অপবাদই দিক, আমি জানি, আপনারা তা বিশ্বাস করেন না। আমি আমার কাজ করে চলে যাব, কে কি বলে, না-বলে, তাতে আমার কিছু আসে-যায় না।

নিজেদের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য আজ ব্রিটিশ যদি রাশিয়া এবং আমেরিকার দ্বারস্থ হতে লজ্জা না পায়, তবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অন্য কোন জাতির সাহায্যপ্রার্থী হওয়া অন্যায়ও নয়, অপরাধও হতে পারে না।

আপনারা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে প্রস্তুত থাকুন।

যে সুযোগ আসছে, সেটা সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হবে। জাতি এবং ধর্ম-নির্বিশেষে অবিলম্বে সবাই সঙ্ঘবদ্ধ হোন। চাই ঐক্য ও একাগ্রতা। জয় হিন্দ্!'

বিস্ময়ের পর বিস্ময়।

সুভাষের কথা শেষ হতে না-হতেই হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর খবর ভেসে এল বেতার-তরঙ্গে।

জাপান ব্রিটেন এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। পার্ল হারবার বিধ্বস্ত।

ঘটনাটা যেমন আকস্মিক, তেমনিই অপ্রত্যাশিত। কেউ ভাবতে পারেনি এমন কথা। চার্চিল বা রুজভেল্ট, কেউ না। প্রধান সেনানায়ক জেনারেল ওয়াভেলও না।

তার কারণও ছিল। চীন-যুদ্ধে জাপানের লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়োজিত। তার ওপর নতুন একটা যুদ্ধের ঝুঁকি নেবার মত শক্তি তার কোথায়? বিশেষ করে ইংরেজ বা আমেরিকার বিরুদ্ধে?

অন্যদিকে রাশিয়া এখন ইংরেজের বন্ধু। তেমন কিছু ঘটলে রাশিয়াও চুপ করে বসে থাকবে না।

রাশিয়ার ভ্লাডিভোস্টক বন্দর থেকে জাপানের রাজধানী টোকিওর দূরত্ব মাত্র ৭০০ মাইল। আধুনিক যুগের বোমারু-বিমানের পক্ষে এ দূরত্ব কিছুই নয়। সে অবস্থায় জাপান তার নিজের ঘর সামলাবে কি করে?

অন্যদিকে রয়েছে পৃথিবীর নৌ-জগতের বিস্ময় সিঙ্গাপুরের দুর্ভেদ্য নৌ-ঘাঁটি।

তারও অদূরে রয়েছে হংকং নৌ-ঘাঁটি। এ দুটি নৌ-ঘাঁটি থেকে ব্রিটিশ নৌ-বহর যে দুদিনেই জাপানী নৌ-বহরকে অচল করে দেবে, তা বলাই বাহুল্য।

তার ওপর রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ, বর্মা ও ভারতের সামরিক সহযোগিতা। এদের সমবেত শক্তির তুলনায় একফোঁটা জাপানের শক্তি আর কতটুকু?

আরো প্রশ্ন আছে। আমেরিকা, রাশিয়া বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যেমন কাঁচা-মালে আত্ম-নির্ভর, জাপান তা নয়। এ-অবস্থায় জাপানের পক্ষে ব্যাপক যান্ত্রিক যুদ্ধ চালানো অসম্ভব।

তাছাড়া জাপানের চারপাশেই সমুদ্র। একমাত্র ভরসা তার নৌ-পথ। সারা পৃথিবীব্যাপী তার যা কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য সবই এই নৌ-বহরের সাহায্যে। যুদ্ধ শুরু হলে তখন তাকে যে সমস্ত পথই হারাতে হবে, সন্দেহ নেই। সেই অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া তার পক্ষে সামলানো সম্ভব হবে কি?

অবশ্য এক বছর আগে (২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০) বার্লিনে অনুষ্ঠিত এক ত্রি-পক্ষীয় চুক্তির ফলে জার্মানী, ইতালী ও জাপান এখন পরস্পর মৈত্রী-সূত্রে আবদ্ধ।

কিন্তু জাপানের তাতে কতটুকু লাভ?

তারা রয়েছে সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারে। সেখান থেকে তাদের পক্ষে জাপানকে সাহায্য করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং, যুদ্ধ চালাতে হবে জাপানকে একাই। এ অবস্থায় জাপান এতবড় একটা ঝুঁকি নেবার সাহস পাবে কি করে?

অবশ্য অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল অনেকদিন আগে থেকেই। কারণ—চীন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের কথা। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের কাছে চীন তখন একটা লুঠের মাল ছাড়া আর কিছুই নয়।

চীনের আমদানিদ্রব্যের অর্ধেকটাই তখন আসে ব্রিটেন থেকে। এমন কি, রেলপথ, ব্যাঙ্ক, কারবারী মূলধন ও আর্থিক বিলি-ব্যবস্থা সব কিছুই তখন তাদের দখলে।

মাত্র পাঁচ ভাগ রপ্তানি করে জাপান। আমেরিকা আরো কম। ষোল ভাগের এক ভাগ মাত্র।

আস্তে আস্তে এগিয়ে এল রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি সবাই।

তোমরা একা একা দইয়ের সরটুকু খাবে, এ কি অন্যায় কথা! আমাদেরও বখরা চাই!

বটেই তো! বটেই তো! ফতোয়া জারি করল আমেরিকা, একজনের ভাগেই বরাবর রুইমাছের মুড়োটা পড়বে, তা ঠিক নয়। তার চাইতে এখন থেকে চীনে 'ওপেন্-ডোর' বা খোলা-দরজা নীতি চালু হোক। অর্থাৎ এস, আমরা সবাই মিলে এই বেওয়ারিশ মালটাকে চুষে নিঙড়ে একাকার করে দিই!

ফলে, চীনের সমুদ্রতীরস্থ বন্দর ও শহরগুলি লীজ নেবার জন্য কাড়া-কাড়ি পড়ে গেল সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যে। অর্থাৎ, কেউ যেন ভুল বুঝো না আমাদের। চীনের মূল ভূখণ্ড দখল করার বাসনা আমাদের কারুরই নেই। আমরা তার বন্দর ও শহরগুলি লীজ নিচ্ছি মাত্র।

বিপদের যেন সুস্পষ্ট পদধ্বনি শুনতে পেল জাপান।

উদ্দেশ্য তোমাদের খুবই মহৎ তা বুঝতে পারছি ; কিন্তু এভাবে তোমরা আমাদের নাকের ডগার ওপর ঘাঁটি গেড়ে বসবে, ঐটি চলবে না। ঠিক আছে, দেখা যাবে !

আমদানি-বাণিজ্য নিয়ে শুরু হল তীব্র প্রতিযোগিতা।

প্রতিযোগিতায় প্রথমেই মার খেল ব্রিটেন। হু-হু করে তার বাজার পড়ে গেল এশিয়া ভূখণ্ডের প্রতিটি অংশে।

লাভ হল আমেরিকার। তারা শতকরা ৬ ভাগ থেকে একলাফে উঠে গেল ১৫ ভাগে। ফলে, এবার আসল বিরোধ দেখা দিল আমেরিকার সঙ্গেই।

বিরোধ আরো ঘনীভূত হল ১৯২৪ সালে আমেরিকার একটি সিদ্ধান্তের ফলে।

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে অসংখ্য জাপানী শ্রমিক ও মজুরের বাস।

আমেরিকাই এককালে তাদের জাপান থেকে নিয়ে এসেছিল নানাভাবে উৎসাহ দিয়ে। কারণ, শ্রমিক হিসেবে জাপানীরা যেমন কর্মপটু, তেমনিই কষ্ট-সহিষ্ণু। মজুরীও আমেরিকান মজুরদের তুলনায় অনেক কম।

১৯২৪ সালে আমেরিকার সেই সিদ্ধান্তে বলা হল অন্য কথা।

না, আর নয়। এখন থেকে কার্যত তোমাদের আমেরিকা আসা নিষিদ্ধ।

আর, এখানে তোমাদের জমি-জমার মালিকানা-স্বত্বও এখন থেকে আর রইল না। সে অধিকার আজ থেকে একমাত্র আমেরিকানদেরই। সোজা কথায় —পথ দেখ !

বিক্ষোভে ফেটে পড়ল গোটা জাপান।

১লা জুলাই জাতীয় অবমাননা দিবস পালিত হল সমগ্র জাপানে। সেই সঙ্গে প্রতিটি নরনারীর মুখে শোনা গেল একই শপথ। এ অপমানের প্রতি-শোধ আমরা নেব। এমন শিক্ষা দেব, যা জন্মেও কোনদিন আমেরিকা ভুলতে পারবে না।

জাপান যে কোনদিনই সে শপথ ভুলে যায়নি, তার প্রথম নিদর্শন পাওয়া গেল ঠিক দশ বছর বাদে—১৯৩৪ সালে।

হঠাৎ সেদিন তারা রব তুলল, 'হ্যান্ডস্ অফ্ চায়না'! চীন থেকে হাত গোটাও ! সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপার থেকে এসে তোমরা এখানে মাতব্বরী করবে, তা হবে না। এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য। আভি নিকালো !

১৯৩৭ সালে শুরু হল চীন-জাপান যুদ্ধ।

জাপানের অভিযোগ—রাষ্ট্র-নায়ক চিয়াং কাই-শেকের চক্রান্তে চীন নাকি

ক্রমশ ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির একটা শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত হতে চলেছে। না, কোন বিদেশী শক্তিকে তারা ঘরের সামনে এভাবে ঘাঁটি করতে দিতে রাজী নয়।

মজা দেখাল ব্রিটিশ। সুযোগ বুঝে একদিকে তারা চীনকে সাহায্য করতে লাগল নব-নির্মিত বর্মা রোড দিয়ে। অন্যদিকে জাপানও বাদ গেল না। তাদেরও তারা যথারীতি অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহ করতে লাগল ব্যবসার নাম করে। কারণ—আমেরিকা। আমেরিকা যেভাবে এশিয়া ভূখণ্ডে মাথা গলাতে শুরু করেছে, তা রীতিমত উদ্বেগজনক। এ অবস্থায় আমেরিকাকে রুখতে হলে জাপানকে শক্তিশালী করে তোলা প্রয়োজন।

তবে চীন অবশ্য বেশিদিন আর সে সুযোগ পেল না। কারণ, সেই ব্রিটিশ। কিছুদিন পরে ব্রিটিশই আবার একদিন বর্মা রোড বন্ধ করে দিল জাপানী হুঙ্কারের কাছে নতি স্বীকার করে।

পৃথিবী কারো মুখ চেয়ে তার চলার গতি বন্ধ করে না। এল ১৯৩৯ সাল। শুরু হল যুদ্ধ।

মনে মনে প্রমাদ গণল ইংল্যান্ড আর আমেরিকা।

বলতে গেলে গোটা ইয়োরোপ তখন হিটলারের পদানত। এদিকে জাপানেরও মতি-গতি ভাল নয়।

সবচাইতে বড় কথা, জার্মানী ও ইতালীর সঙ্গে সে মৈত্রী-সূত্রে আবদ্ধ। এ অবস্থায় কখন যে সে কি করে বসবে, ঠিক কি!

কূটনীতিতে ব্রিটেনের স্থান চিরদিনই সর্বোচ্চ। তার একমাত্র লক্ষ্য তখন—আমেরিকা। রাশিয়াকে আগেই বাগানো গেছে। এখন বাকি রয়েছে আমেরিকা। সুতরাং এমন একটি মোক্ষম চাল চালতে হবে, যার ফলে আমেরিকা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। আমেরিকার যে অনেক টাকা।

কথাটা মিথ্যে নয় মল্লিকা। এ প্রসঙ্গে আমি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবীর কোন্ কোন্ রাষ্ট্রকে আমেরিকা কত টাকা ধার দিয়েছিল, তার একটি ছোট্ট তালিকা তোমার কাছে তুলে ধরছি। এই তালিকা থেকেই তুমি বুঝতে পারবে যে, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকার স্থান কোথায়!

ইংল্যাণ্ড..................	১৩৩৫,৯০০০০০০	টাকা
ফ্রান্স.....................	১২০৭,৫০০০০০০	"
ইতালী..................	৬০৬,৬০০০০০০	"
বেলজিয়াম..............	১২২৪,৫৪০০০০০	"
রাশিয়া..................	৮৮,১৯৯৮৮৯৯	"
পোল্যান্ড..............	৬২,৩৩৩৮৫৭৮	"
চেকোশ্লোভাকিয়া......	৫১,৯২১৩০৬৯	"
রুমানিয়া..............	১৯,৫৪৮১৬৮০	"
যুগোশ্লাভিয়া.........	১৮,৬৭৫০০০০	"
গ্রীস....................	৯,৭২৯৬০০০	"
অস্ট্রিয়া................	৭,৩৮৪৪৬৫৫	"
হাঙ্গেরী..............	৫৭৯৪৬৮০	"
মোট,	৪৬,৩২,৯১,১৭,৫৬১	টাকা

এহেন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে দলে পাবার জন্য কূটনৈতিক-বিশারদ ব্রিটিশ যে সেদিন চালাচালির ব্যাপারে একটু বেশি রকমই তৎপর হয়ে উঠবে, তাতে আর বিচিত্র কি!

চাল দেওয়া হল ১৯৪১ সালের ২৫শে জুলাই।

হঠাৎ সেদিন এক আদেশ জারি করে জাপানীদের সমস্ত ধন-সম্পত্তি আটক করা হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র। অবাধ্য জাপানীদের কিঞ্চিৎ বাধ্য করার জন্য এ ছাড়া নাকি আর কোন পথ খোলা নেই। সুতরাং অন্যান্য রাষ্ট্র-গুলিরও উচিত এই একই পন্থা অবলম্বন করা।

চাল ব্যর্থ হল না। পরদিনই তাদের সেই পন্থা অবলম্বন করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট। ঠিকই বলেছে ব্রিটিশ। বড্ড বাড় বেড়েছে ঐ ক্ষুদে জাপানীদের। এবার বোঝ মজা!

জাপানও বসে রইল না। সঙ্গে সঙ্গে তারাও আটক করল ইংল্যান্ড ও আমেরিকার যাবতীয় সম্পত্তি।

আশ্চর্য, তারপরেই একেবারে গুড বয়! না, আমরা কারো সঙ্গে বিবাদ চাই নে। এস, আলাপ-আলোচনা করে ব্যাপারটা আপসে মিটিয়ে নেওয়া যাক!

আলোচনা শুরু হল আমেরিকার ওয়াশিংটনে। একদিকে টোকিও থেকে প্রেরিত বিশেষ দূত মিঃ কুরুসো ও রাজদূত অ্যাডমিরাল নোমুরু, অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, পররাষ্ট্র-সচিব কর্ডেল হাল ও পারিষদবর্গ।

মাসের পর মাস পেরিয়ে গেল, তবু আলোচনা আর শেষ হল না।

হবার কথাও নয়। কারণ, বাইরে আপস-আলোচনার ভান করলেও ভেতরে ভেতরে জাপান তখন এগিয়ে চলেছে চরম পরিণতির দিকে।

জবাব দিতে হবে। এমন জবাব দিতে হবে, যা ইংল্যান্ড বা আমেরিকা কোনদিনই যেন ভুলে না যায়।

জবাব দিল ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর। রবিবার, সকাল ঠিক আটটায়। ওদিকে তখনো ওয়াশিংটনে সেই আপস-আলোচনা চলছে একইভাবে।

সৌন্দর্যের লীলাভূমি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ নৌ-ঘাঁটি পার্ল হারবার।

যেমন ব্রিটিশের শ্রেষ্ঠ নৌ-ঘাঁটি সিঙ্গাপুর, তেমনি আমেরিকার পার্ল হারবার। দুটোই সমান উল্লেখযোগ্য।

আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ-বহরের মোট ছিয়াশিখানা জাহাজ সেদিন নোঙর করা ছিল পার্ল হারবারে।

তার মধ্যে বড় ব্যাটলশিপই ছিল আটখানা। নেভাদা, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া, আরিজোনা, ওকলাহোমা, ক্যালিফোর্নিয়া, মেরীল্যান্ড, টেনেসি ও পেনসিলভানিয়া।

সাতখানা ক্রুজার, আটাশখানা ডেস্ট্রয়ার। সাবমেরিন পাঁচটি। তাছাড়া মাইন পাতা জাহাজ ও অন্যান্য শ্রেণীর জাহাজ ছিল অসংখ্য।

৬ই ডিসেম্বর। রাত তখন অনেক, তবু আনন্দ-স্রোতের এতটুকু বিরাম নেই।

বেশির ভাগ নাবিক ও অফিসারই তখন তীরে নেমে গিয়েছে জাহাজ ছেড়ে। কেউ সিনেমায়, কেউ পানশালায়, কেউ নাইটক্লাবে। কেউ কেউ অধিকতর আনন্দের খোঁজে।

ব্ল্যাক-আউটের কোন বালাই নেই। যুদ্ধ চলছে ইয়োরোপে। এখানে সে-সব কোন প্রশ্ন নেই। সুতরাং সবাই নিশ্চিন্ত। যেমন খুশি খাও-দাও ফুর্তি কর, কারো কিছু বলার নেই।

রাত শেষ হয়ে আসছে। শুধু একটি মাত্র ডেস্ট্রয়ার 'ওয়ার্ড' তখন পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছিল পার্ল হারবারের অদূরে। এবার তারও ঘাঁটিতে ফেরার পালা।

প্রথমে খবর দিল একটি মাইন সুইপার। সে নাকি কিছুক্ষণ আগে একটি অজ্ঞাত-পরিচয় সাবমেরিন দেখতে পেয়েছে।

খানিকটা খোঁজাখুঁজি হল এখানে-ওখানে, কিন্তু কোথায় সাবমেরিন!

না, কোথাও কিছু নেই। নিশ্চয় ভুল দেখেছে মাইন সুইপার।

কিছুক্ষণ বাদে সেই একই খবর দিল 'আণ্টোয়ার্প'। সে-ও নাকি একটা সাবমেরিন দেখতে পেয়েছে খানিকক্ষণ আগে। আর সাবমেরিন আটকাবার জন্য জলের নিচে বিছানো লোহার জালটাও নাকি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। কি ব্যাপার!

সকাল সাতটা। এবার দেখতে পেল পাহারাদার জাহাজ 'ওয়ার্ড' নিজেই। হ্যাঁ, সাবমেরিন। ঐ যে জলের ওপরে তার পেরিস্কোপটা দেখা যাচ্ছে! রেডি! ডেপ্থ্‌চার্জ!

সঙ্গে সঙ্গে কান-ফাটানো আওয়াজ—দ্রাম্‌! পেরিস্কোপটা আর দেখা গেল না। সাবমেরিনটা ঘায়েল হল কিনা তাও ঠিক বোঝা গেল না।

কেটে গেল আরো কিছুক্ষণ।

হঠাৎ কি দেখে বিমান-বন্দরের রাডার স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মীটি চমকে উঠলেন দারুণভাবে। রাডারের পর্দায় কিসের যেন কতগুলো রুপালী ফুট্‌কি ফুটে উঠেছে অস্পষ্টভাবে। কি ওগুলো?

হ্যালো! হ্যালো! হ্যালো! হ্যালো ইনফরমেশন সেণ্টার! আমি রাডার স্টেশন থেকে কথা বলছি। কিসের যেন কতকগুলো অস্পষ্ট ফুট্‌কি দেখা যাচ্ছে রাডারের পর্দায়। এখনো প্রায় পোনে দুশো মাইল দূরে রয়েছে। মনে হয় একঝাঁক বিমান।

তোমার মাথা! ব্রেকফাস্ট করতে করতে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিলেন ইনফরমেশন সেণ্টারের ভারপ্রাপ্ত অফিসারগণ। রাত্রির নেশাটা এখনো কাটেনি বুঝি!

বিশ্বাস করুন, আমি নেশার ঝোঁকে বলছি নে! সত্যিই একঝাঁক বিমান ক্রমেই এদিকে এগিয়ে আসছে!

আসতে দাও।

প্লীজ, আমার কথা বিশ্বাস করুন। সত্যিই একঝাঁক বিমান এগিয়ে আসছে! একটি-দুটি নয়, অসংখ্য! এদিকেই আসছে।

আসুক না! নিশ্চয় আমাদেরই বিমান। কোন বিমানবাহী জাহাজ থেকে আকাশে উঠে ট্রায়াল দিচ্ছে হয়তো।

দেখে কিন্তু তা মনে হয় না। মাই গড! এ যে জাপানী প্লেন দেখছি!

হোয়াট! জাপানী প্লেন?

খাওয়া-দাওয়া ও আমোদ-ফূর্তির ব্যাপারে আমেরিকান সৈন্যদের দক্ষতা বরাবরই অপরিসীম।

এবারও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। ফলে, ব্রেকফাস্ট শেষ করে কোমরে বেল্ট বাঁধতে না-বাঁধতেই শুরু হল প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ।

প্রথমেই বোমা পড়ল ২৯,০০০ টনের বিরাট ব্যাটলশিপ 'নেভাদা'র ওপর।

নেভাদা তখন জাতীয়-সংগীত বাজিয়ে পতাকা তুলছিল তার মাস্তুলের শীর্ষে। কিন্তু কার্যত তা আর হল না। তার আগেই বিরাটকায় যুদ্ধ-জাহাজটা হঠাৎ কেঁপে উঠল প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দে।

তারপর শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস! একবার নয়, দফায় দফায়, ঝাঁকে ঝাঁকে! একটানা পৌনে দু' ঘণ্টা ধরে। শুধু মৃত্যু আর বিভীষিকা!

শুরু হয়েছিল সকাল আটটায়। কাজ শেষ করে বিমান-বহর ফিরে গেল ঠিক ন'টা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে।

কোথায় তখন আমেরিকার বহু-আলোচিত শক্তিশালী নৌ-ঘাঁটি পার্ল হারবার! বিরাট একটা ধ্বংসস্তূপ ছাড়া তখন আর কিছুই বলা যায় না তাকে।

ক্ষয়-ক্ষতির অঙ্কটাও বিরাট। মোট আটখানা ব্যাটলশিপ ছিল তা আগেই বলেছি। তার মধ্যে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া (৩২,০০০ টন), ক্যালিফোর্নিয়া (৩২,০০০ টন), আরিজোনা (৩২,০০০ টন), ওকলাহোমা (২৯,০০০ টন) আর নেভাদা (২৯,০০০ টন)—এই পাঁচখানা ব্যাটলশিপই সেদিন তলিয়ে গেল প্রশান্ত মহাসাগরের জলে।

বাকি তিনটিও এমন মারাত্মকভাবে জখম হল যে, সামরিক দিক থেকে তাদের আর কোন মূল্যই রইল না।

ডেস্ট্রয়ার হারাতে হল মোট তিনটি। ক্রুজারও তাই। ক্ষতিগ্রস্ত আরো দুটি। মাইন পাতা জাহাজ গেল দুটি। ভাসমান ড্রাইডক একটি।

নৌ-বিভাগীয় ২৩২টি বিমানের মধ্যে ধ্বংস হল ৮০টি। অকেজো আরো ৭০টি। সৈন্য-বিভাগীয় ২৭৩টি বিমানের মধ্যে ধ্বংস হল মোট ৯৭টি।

হতাহতের সংখ্যাও রীতিমত ভয়াবহ। কেবলমাত্র নৌ-বিভাগের নিহত সৈন্যসংখ্যাই হল মোট ২,১১৭ জন। নিখোঁজ ৯৬৫ আর আহত ৮৭৬ জন। সেনা-বিভাগের নিহত ২২৬ জন আর আহত ৩৯৬ জন।

জাপানীদের ক্ষয়-ক্ষতি খুবই নগণ্য। মোট ৩৬৩টি বিমান অংশগ্রহণ করেছিল পার্ল হারবারের সেই অভিযানে। তার মধ্যে হারাতে হয়েছে মাত্র ২৯টি বিমান।

ওদিকে খাস আমেরিকায় বসে দুপক্ষের মধ্যে আপস-আলোচনা তখনও সেই একইভাবে চলছে। সেই সঙ্গে খানা-পিনা ও যথাযোগ্য আদর-আপ্যায়ন। আর বিবাদ নয়। এখন থেকে অহিংসাই হবে আমাদের দুটি রাষ্ট্রের একমাত্র মূলধন।

হঠাৎ পৃথিবীর সবগুলি বেতারকেন্দ্র আর্তনাদ করে উঠল সমস্বরে।

ওয়ার! ওয়ার! ওবাহু বম্বড্ বাই জাপানীজ প্লেন! জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করেছে! পার্ল হারবার বিধ্বস্ত!

পরদিনই আমেরিকা যুদ্ধ ঘোষণা করল জাপান, তথা ত্রি-শক্তির বিরুদ্ধে। জার্মানীও পাল্টা-যুদ্ধ ঘোষণা করল আমেরিকার বিরুদ্ধে। ফলে, শুধু ইয়োরোপ নয়, দেখতে দেখতে এশিয়া ভূখণ্ডেও এবার যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়ল বিস্তৃতভাবে।

খবর শুনে আনন্দে নেচে উঠলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল।

জাল পাতা সার্থক হয়েছে। শিকার নিজে থেকেই এসে সে জালে ধরা দিয়েছে। এবার আর পায় কে!

কি মারটাই না এতদিন খেতে হয়েছিল হিটলারের হাতে!

ভাগ্যিস রাশিয়া ছিল! নইলে কবে বোধহয় মরে ভূত হয়ে যেতে হত।

এবার এসেছে আমেরিকা। ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিব্যি এখন আড়ালে গিয়ে গা-ঢাকা দেওয়া চলবে। তারপর দেখা যাবে ভাগ-বাঁটোয়ারার সময়। গড্ সেভ দি কিং! আর ভয় নেই।

'Timing is the first act of war.'

রণ-নীতির এই মতবাদের নির্ভুল নিদর্শন ইতিপূর্বে দেখিয়েছিল জার্মানী। এবার দেখাল জাপান।

ব্রিটিশ নিজের ঘর সামলাতে ব্যস্ত। কি নৌ-বহর, কি বিমান-বহর সব কিছু এখন তার নিযুক্ত রয়েছে দেশরক্ষার কাজে।

আমেরিকার অবস্থাও তাই। প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে যোগ না দিলেও তার নৌ-বহরের বেশির ভাগ অংশই এখন ব্যস্ত রয়েছে ব্রিটিশকে নানাবিধ যুদ্ধ-সরঞ্জাম এবং খাদ্যদ্রব্যাদি সরবরাহের কাজে। সুতরাং এই তো মাহেন্দ্রক্ষণ!

পরিকল্পনা মতো প্রথমেই তারা আঘাত হানল প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত আমেরিকার শ্রেষ্ঠ নৌ-ঘাঁটি পার্ল হারবারের ওপর। সেই সঙ্গে আক্রান্ত হল হংকং, গুয়াম, ওয়েক ও ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা। একই তারিখে তারা অধিকার করে নিল চীনের অন্যতম বৃহত্তম নগরী সাংহাই।

তারপর শুধু বিস্ময় আর বিস্ময়! এমন কি জার্মানীর দুর্ধর্ষ প্যানৎসার বাহিনীও বুঝি হার মেনে গেল তাদের সেই বিস্ময়কর অগ্রগতির কাছে।

পার্ল হারবার আক্রান্ত হল ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ সালে।

পরদিন শুধু আমেরিকা নয়, কানাডা, ওলন্দাজ উপনিবেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড যুদ্ধ ঘোষণা করল ত্রি-শক্তির বিরুদ্ধে। শুরু হল বিশ্বযুদ্ধ।

ওদিকে জাপানীরা ততক্ষণে ফরাসী ইন্দোচীন থেকে ঢুকে পড়েছে থাই-ল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে। আর একদল মালয়ের সিঙ্গোরা ও পাটানী বন্দরে।

৯ই তারিখে অধিকার করা হল গিলবার্ট দ্বীপ।

আর ১০ই! সেই চরম পরাজয়ের কাহিনী ব্রিটিশ বোধহয় জীবনেও কোনদিন ভুলতে পারবে না মল্লিকা।

ব্রিটিশ নৌ-বহরের সবচাইতে শক্তিশালী ব্যাটলশিপ 'প্রিন্স অফ ওয়েলস্' এবং 'রিপালস্' তখন সিঙ্গাপুরে।

মাত্র সপ্তাখানেক আগে (২রা ডিসেম্বর) জাহাজ দুটি সিঙ্গাপুরে এসে নোঙর ফেলেছে রাজনৈতিক পরিস্থিতি লক্ষ্য করে। জাপানীদের মতি-গতি ভাল নয়। সুতরাং প্রস্তুত থাকাই ভাল।

প্রিন্স অফ ওয়েলস্ মাত্র দু বছর আগে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরী ৩৫ হাজার টনের বিরাট ব্যাটলশিপ। গতিবেগও তার বিস্ময়কর। ৩০ টনেরও বেশি।

অস্ত্রসজ্জাও বিরাট। চৌদ্দ ইঞ্চি ব্যাসের বিরাটকায় কামানের সংখ্যাই রয়েছে মোট দশটি। তাছাড়া রয়েছে বিভিন্ন আকারের আরো ষোলটি কামান। এক কথায়—দুর্ভেদ্য একটি ভাসমান দুর্গ।

সত্যিই দুর্ভেদ্য। শুধু অস্ত্র-শস্ত্রের দিক থেকে নয়, অন্যান্য দিক থেকেও। বিশেষ করে আত্মরক্ষার ব্যাপারে। ষোল ইঞ্চি পুরু ইস্পাতের বর্ম দিয়ে তার পুরো খোলটাকে এমনভাবে ঢেকে দেওয়া হয়েছে যে, হাজার গুলি-গোলা নিক্ষিপ্ত হলেও তাতে ক্ষয়-ক্ষতির কোন প্রশ্ন নেই।

৩২ হাজার টনের অতিকায় ব্যাটলশিপ রিপালস্ও কম যায় না। সেখানেও পনেরো ইঞ্চি ব্যাসের কামান রয়েছে মোট ছটি। আর চার ইঞ্চি ব্যাসের রয়েছে সব মিলিয়ে বারোটি।

অ্যাডমিরাল স্যার টম ফিলিপস্ তখন প্রাচ্য সমুদ্রের ব্রিটিশ নৌ-বহরের প্রধান সেনাপতি।

জাপানীদের মালয় অভিযানের খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাহাজ দুটিকে আদেশ দিলেন নোঙর তুলতে। বড্ড বাড় বেড়েছে ঐ ক্ষুদে জাপানী-গুলোর! দেখা যাক কত শক্তি ওরা ধরে! চলো এবার মালয় উপকূলের দিকে! কুইক!

প্রশান্ত মহাসাগরের ঢেউ ভেঙে ক্রমশ প্রিন্স অফ ওয়েলস্ ও রিপালস্ এগিয়ে চলেছে মালয়ের দিকে। জাপানীদের শিক্ষা দিতে হবে। এমন শিক্ষা দিতে হবে যে, জন্মেও যেন ওরা সেকথা ভুলে না যায়।

দিনটা ছিল মঙ্গলবার। সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছে টিপ টিপ করে। আকাশে যেমন মেঘ, তেমনি কুয়াশা। শত্রুর সন্ধানী দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে হলে এই আবহাওয়া খুবই কার্যকরী।

মেঘ কেটে গেল বিকেলের দিকে। তারপর দেখতে দেখতেই একসময়ে

মহাসাগরের বুক লাল হয়ে গেল সূর্যাস্তের রঙে। দিগন্ত-বিস্তৃত জলরাশির বুকে শুধু রঙ আর রঙ!

ঠিক তখনই প্রশান্ত মহাসাগরের জল ফুঁড়ে আস্তে আস্তে মাথা তুলে দাঁড়াল একটা সাবমেরিনের পেরিস্কোপ।

তবে বেশিক্ষণ নয়। মুহূর্ত বাদেই আবার একসময়ে সেই পেরিস্কোপটা তলিয়ে গেল সাগরের জলে। কি প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্‌, কি রিপাল্‌স্‌, কারোরই তা নজরে এল না।

কেটে গেল আরো কিছুক্ষণ। প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্‌ ও রিপাল্‌স্‌ তখন সেই একইভাবে এগিয়ে চলেছে মালয় উপকূলের দিকে।

সহসা একসময়ে জাহাজের সবগুলি বিপদ-জ্ঞাপক সাইরেন একসঙ্গে বেজে উঠল আর্তস্বরে,—উ'-উ'-উ'-উ'-উ'...

সঙ্গে সঙ্গে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল জাহাজ দুটির সর্বত্র।

হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার! জাহাজের রাডার-যন্ত্রে একটা সাদা ফুট্‌কি ধরা পড়েছে। জাপানী প্লেন! একটা জাপানী প্লেন এগিয়ে আসছে এদিকে!

জাপানী প্লেন! তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন অ্যাডমিরাল স্যার টম ফিলিপ্‌স্‌, তাও কিনা মাত্র একটা! তা, আসুক না! একটা কেন, একসঙ্গে হাজারটা প্লেন এলেও প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্‌-এর ওরা কিছুই করতে পারবে না। তাছাড়া বিমান-ধ্বংসী কামানগুলি তৈরী আছে। কি করে ঐ নিপ্পনগুলোকে জবাব দিতে হয়, তারা তা ভাল করেই জানে।

বিমানটা কিন্তু একবারও ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে এল না, মল্লিকা। পাল্লার বাইরে থেকে বার-কয়েক চক্কর খেয়ে আবার একসময়ে সে ফিরে গেল নিজের গন্তব্যপথে।

নিশ্চিন্ত মনে জাহাজ দুটি আবার সেই একইভাবে এগিয়ে চলল মহা-সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে।

মাত্র কিছুক্ষণ। তারপরই একসময়ে রিপাল্‌স্‌ থেকে ক্যাপ্টেন উইলিয়াম টেন্যাণ্ট-এর গলা ভেসে এল লাউড-স্পীকারে,—আমার মনে হয় কেউ যেন আড়াল থেকে আমাদের প্রতিটি গতিবিধি লক্ষ্য করে চলেছে।

একথা মনে হবার কারণ? প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্‌ থেকে প্রশ্ন করলেন স্যার টম ফিলিপস্‌, তুমি দেখতে পেয়েছে কিছু?

না, পাইনি। তবে সন্দেহ হচ্ছে।

ঠিক বলেছ তুমি। আমারও ধারণা তাই। ঠিক আছে, জাহাজের মুখ ঘোরাও। কাজ নেই মালয়ে গিয়ে। তার চাইতে আবার ফিরে চলো সেই সিঙ্গাপুরে। আর জাহাজের সবগুলো কামান রেডি রাখো।

রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্‌ ও রিপাল্‌স্‌ আবার ফিরে চলল সিঙ্গাপুরের দিকে। চুলোয় যাক মালয়। এখন কোনরকমে একবার সিঙ্গাপুরে যেতে পারলে তবেই নিশ্চিন্ত।

প্রহরে প্রহরে রাত এগিয়ে চলেছে। দুঃস্বপ্নে ভরা ভয়ঙ্কর রাত।

কারো চোখে ঘুম নেই। সবাই জেগে রয়েছে একটা চাপা উদ্বেগ বুকে নিয়ে।

মনে হয়, কিসের যেন একটা নীরব ধ্বংস আর নিষ্ক্রিয় প্রাণহীনতা মুখ বুজে অপেক্ষা করছে মহাসাগরের প্রতিটি অংশে। কিছুতেই যেন তার হাত থেকে পরিত্রাণ নেই।

মাঝে মাঝে কানে আসে দূরাগত কোন বিমানের শব্দ—বোঁ-বোঁ-বোঁ-ও-ও-ও! তারপরই সব চুপ। একটানা ঢেউ ভাঙার শব্দ ছাড়া আর কিছুই তখন শোনা যায় না আশে-পাশে।

এমনি করে লুকোচুরি খেলতে খেলতে একসময়ে অন্ধকার তরল হয়ে এল একটু একটু করে। পূব আকাশে দেখা দিল নতুন দিনের নতুন সূর্য। ঠিক সূর্য-লাঞ্ছিত জাপানী জাতীয় পতাকার মতোই।

প্রিন্স অফ ওয়েল্স্ ও রিপাল্স্ তখন এগিয়ে চলেছে দক্ষিণ চীন-সাগরের ওপর দিয়ে।

হঠাৎ আবার সেই সাইরেনের তীক্ষ্ন আর্তনাদ—উঁ-উঁ-উঁ-উঁ-উঁ!

জাহাজের রাডারের পর্দায় আবার সেই রূপালী ফুট্‌কি। তবে এবার আর একটি নয়, মোট ষাটখানা।

প্রথমে পর্যবেক্ষণকারী বিমান। ঠিক তার পেছনেই জাপানের সবচাইতে শক্তিশালী 'মিৎসুবিসি ৯৬' ডাইভ বম্বার।

হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার! লাউড-স্পীকারে সতর্কবাণী শোনা গেল প্রিন্স অফ ওয়েল্স্ থেকে, সবাই প্রস্তুত হও! সবগুলো বিমান-ধ্বংসী কামান রেডি কর! এসে পড়েছে! আরো কাছে! চার্জ!

দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! না, সুবিধে হল না। প্রায় সতেরো হাজার ফিট উঁচুতে রয়েছে বিমানগুলি। এতদূর থেকে লক্ষ্যভেদ করা সহজ কথা নয়।

বুম্-ম্-ম্-ম্! সহসা প্রিন্স অফ ওয়েল্স্ কেঁপে উঠল প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দে। কি হল কিছুই বোঝা গেল না। শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। সব কিছুই বুঝি ঢাকা পড়ে গেল নিশ্ছিদ্র কালো ধোঁয়ার অন্তরালে।

বোঝা গেল ধোঁয়া সরে যাবার পরে। না, তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। হবার কথাও নয়। দুপাশে তার ষোল ইঞ্চি ইস্পাতের বর্ম। সুতরাং সামান্য একটা বোমা তা তার কাছে কিছুই নয়।

স্‌স্‌স্‌স্‌...শব্দ শুনে সহসা কি দেখে চমকে উঠল জাহাজের প্রতিটি প্রাণী।

সমুদ্রের জল কেটে কি ওটা ছুটে আসছে বিদ্যুৎগতিতে!

সর্বনাশ! এ যে টর্পেডো! একটা-দুটো নয়। ডাইনে-বাঁয়ে, এখানে-ওখানে, অসংখ্য টর্পেডো! শীগগির পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাও এঁকে-বেঁকে! কুইক!

কিন্তু কি করে এটা সম্ভব হল? কারণ, টর্পেডো চার্জ করার ব্যবস্থা থাকে একমাত্র সাবমেরিনেই। অথচ সেই টর্পেডো ওরা কিনা ক্রমাগত নিক্ষেপ

করে চলেছে বিমান থেকে। এ যে বিশ্বাস করা শক্ত! দেখালে বটে ক্ষুদে জাপানীগুলো!

যেতে যেতে হঠাৎ একসময়ে প্রিন্স অফ ওয়েল্স্ সিগন্যাল দিল রিপাল্স্কে। খবর কি! কোনরকম জখম হওনি তো টর্পেডোর ঘায়ে?

না, এখনো হইনি। তেমনিভাবেই সিগন্যালে জবাব দিল রিপাল্স্, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, এ পর্যন্ত উনিশটা এড়াতে পেরেছি। তবে শেষ পর্যন্ত পারবো কিনা জানি নে। তোমার খবর ভাল তো?

হ্যাঁ, ভাল।

দ্রাম! বলতে না বলতেই সহসা একটা টর্পেডো তীব্রবেগে ছুটে গিয়ে আঘাত করল প্রিন্স অফ ওয়েল্স্-এর শক্ত ইস্পাতের বর্মটার গায়ে। কিন্তু সব বৃথা। ভেতরের খোল তার অক্ষতই রয়ে গেল আগেকার মত।

এমনি করে পুরো তিন ঘণ্টা, তবু কিছুতেই কিছু হল না। অবস্থা যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল।

জাপানীরা তখন মরিয়া। ইতিমধ্যে তাদের মোট ছ'খানা বিমান হারাতে হয়েছে বিমান-ধ্বংসী গোলার ঘায়ে, তবু তারা ভ্রূক্ষেপহীন।

ব্রিটিশ নৌ-বহরের সবচাইতে শক্তিশালী ব্যাটলশিপ প্রিন্স অফ ওয়েল্স্ ও রিপাল্স্কে আজ বাগে পাওয়া গেছে। যে করে হোক, খতম ওদের করতেই হবে। এ সুযোগ কিছুতেই হারালে চলবে না।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব!

বর্ম দিয়ে ঘেরা ঐ প্রিন্স অফ ওয়েল্স্ যে অপরাজেয়! বোমা, টর্পেডো সব কিছুই যে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে ওর দুর্ভেদ্য বর্মের গায়ে লেগে। এ অবস্থায় ওকে ঘায়েল করার উপায় কি?

একটা উপায় আছে। ওর ঐ বিরাট চিমনিটার মধ্য দিয়ে বোমা বা টর্পেডো গলিয়ে দিতে পারলে সেগুলো হয়তো সরাসরি এঞ্জিনঘরে নেমে গিয়ে বিরাট বিস্ফোরণের সৃষ্টি করতে পারে।

কিন্তু এত উঁচু থেকে এমন নির্ভুল নিশানায় বোমা বা টর্পেডো গলিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে কি! দেখা যাক!

হঠাৎ একঝাঁক 'মিৎসুবিসি ৯৬' বিমান ছোঁ মেরে নিচে নেমে এল প্রিন্স অফ ওয়েল্স্-এর ঠিক মাথার ওপর। তারপরই শুরু হল আসল লড়াই।

বোমারুর লক্ষ্য, জাহাজের বিরাটাকার চিমনি দুটি। বিমান-ধ্বংসী কামান-গুলি তাদের সে সুযোগ দিতে রাজী নয়। কারণ, গোটা জাহাজের মধ্যে এক-মাত্র দুর্বল জায়গা হল ঐ চিমনি দুটিই। ওখান দিয়ে বোমা বা টর্পেডো ভেতরে গলিয়ে দিতে পারলে আর রক্ষা নেই।

জাপানীরা জাত-যোদ্ধা। কথায় কথায় হারিকিরি করতে তাদের জুড়ি নেই। মৃত্যু যেন তাদের কাছে একটা খেলা মাত্র।

কথাটা যে কতবড় সত্য তার প্রমাণ পাওয়া গেল মুহূর্ত বাদেই।

কোনরকমেই লক্ষ্যভেদ করতে না পেরে হঠাৎ একসময়ে পর পর কয়েকটা জাপানী বিমান গোঁত্তা খেয়ে সশব্দে গিয়ে আছড়ে পড়ল জাহাজের বিরাট

চিমনিগুলোর ওপর। এবার! এবার কোথায় যাবে তোমরা! আমরা মরব ক্ষতি নেই, তা বলে তোমাদেরও ছেড়ে দেব না।

এবার কাজ হল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অতিকায় প্রিন্স অফ ওয়েল্স্ জাহাজটা দুলে উঠল প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দে। তারপর শুধু বিস্ফোরণ আর বিস্ফোরণ! একটার পর একটা! অসংখ্য!

রিপাল্স্-এর অবস্থা আরো শোচনীয়। আঘাতে আঘাতে তখন তার শেষ অবস্থা। বেশ বোঝা গেল যে, তার অন্তিমকাল আসন্ন।

হেল্প! হেল্প! হেল্প! বেতার-তরঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে খবর ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর-একপ্রান্ত পর্যন্ত।

প্রিন্স অফ ওয়েল্স্ একপাশে কাত হয়ে পড়েছে। হু-হু করে জল ঢুকছে জাহাজের খোলে। ডুবে যেতে আর বেশি দেরি নেই। রিপাল্স্-এর অবস্থাও তাই। প্লীজ হেল্প!

রিপাল্স্-এর ডেকের চারপাশে তখন মৃতদেহের স্তূপ। জাহাজ হেলে পড়েছে একপাশে। তারই মধ্যে এক ফাঁকে জাহাজের ক্যাপ্টেন টেন্যাংটের শেষ নির্দেশ শোনা গেল মাইক্রোফোনে,—'All hands on deck. Prepare to abandon ship. God be with you!'

নির্দেশমতো সবাই এসে জাহাজের ডেকে দাঁড়াল সারি দিয়ে। তারপরই ভগবানের নাম স্মরণ করে প্রায় কুড়ি ফুট উঁচু ডেক থেকে তৈল-সিক্ত প্রশান্ত মহাসাগরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল এক এক করে।

প্রিন্স অফ ওয়েল্স্ও আর বেশিক্ষণ নয়। মাত্র মিনিট দশেক। তারপরই পৃথিবীর বিস্ময় বিরাটকায় সেই যুদ্ধ-জাহাজটা ভুস করে কোথায় তলিয়ে গেল অসংখ্য লোক-লস্কর সঙ্গে নিয়ে—আর তাকে দেখা গেল না।

জাহাজ দুটিতে লোক-লস্করের সংখ্যা ছিল মোট ২,৯২৫ জন। তার মধ্যে উদ্ধারকারী জাহাজের হাতে রক্ষা পেল মোট ২,০০০ জন। বাদ বাকি সবাই হারিয়ে গেল প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্ত জলে।

ব্রিটিশ নৌ-বহরের প্রধান সেনাপতি অ্যাডমিরাল স্যার টম ফিলিপস্ এবং প্রিন্স অফ ওয়েল্স-এর ক্যাপ্টেন জে. সি. লীচও রক্ষা পেলেন না। কোথায় যে তাঁদের দেহ অদৃশ্য হয়ে গেল তার কোন হদিসই পাওয়া গেল না।

বেঁচে গেলেন রিপাল্স্-এর অধিনায়ক ক্যাপ্টেন উইলিয়াম টেন্যাণ্ট। শেষ পর্যন্ত তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন উদ্ধারকারী একটা ডেস্ট্রয়ারের সাহায্যে।

প্রিন্স অফ ওয়েল্স্ এবং রিপাল্স্ ডুবে গেল। ফল হল সুদূর-প্রসারী। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের ভাষায়ঃ

'...Their loss alters the whole balance of naval power in Malayan waters in favour of Japan.'

অর্থাৎ, জাহাজ দুটি হারানোর ফলে নৌ-শক্তির ভারসাম্যের একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল এবং তার সবটুকুই গেল জাপানের অনুকূলে।

কথাটা মিথ্যে নয়, মল্লিকা। একদিকে আমেরিকার শ্রেষ্ঠ নৌ-ঘাঁটি পার্ল

হারবার বিধ্বস্ত। অন্যদিকে ব্রিটিশের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটলশিপ প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্‌ ও রিপাল্‌স্‌ নিমজ্জিত। সমুদ্রপথ খোলা পেয়ে জাপান যে এই সুযোগে বন্যার মতো এখানে-ওখানে ছড়িয়ে পড়বে তাতে আর বিচিত্র কি!

হলও তাই। প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্‌ ও রিপাল্‌স্‌ নিমজ্জিত হল ১০ই ডিসেম্বর। ১১ই তারিখে গুয়াম দ্বীপ চলে গেল জাপানীদের দখলে। কোনদিক থেকেই তাদের বাধা দেওয়া সম্ভব হল না তেমনভাবে। কারণ, রণনীতির সেই নির্ভুল মতবাদ—'Timing is the first act of war!'

ঠিক সময় বুঝে এমন এক মুহূর্তে জাপান আঘাত হেনেছে যে, তাল সামলানো কঠিন। এ অবস্থায় বাধা দিতে চাইলেই বা ইঙ্গ-আমেরিকার পক্ষে সে সাধ্য তখন কোথায়!

১৪ই তারিখে জাপানী সৈন্য অবতরণ করল ফিলিপাইনের দক্ষিণ অঞ্চল লুজন এবং দক্ষিণ বর্মার সীমান্ত-বরাবর ভিক্টোরিয়া পয়েণ্টে। অন্যদিকে হংকং-এর ওপরও তখন আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে ব্যাপকভাবে।

১৫ই তারিখে হংকং অবরুদ্ধ হল চারদিক থেকে। শুধু জলপথে নয়, স্থলপথেও।

হংকং ও চীনের তীরভূমি প্রায় পাশাপাশি। ব্যবধান বলতে মাঝখানে সংকীর্ণ একটি জলপথ মাত্র। তারই উত্তর প্রান্তে কোলুন।

প্রথমেই জাপানীরা কোলুন অধিকার করে নিল চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে এগিয়ে এসে। পরবর্তী লক্ষ্য—হংকং।

অন্যদিকে পদানত হতে হল বোর্ণিও দ্বীপের সারাওয়াকে। উদ্দেশ্য—মার্কিন এবং ব্রিটিশ নৌ-বহরকে একসঙ্গে মিলতে না দেওয়া।

হংকং-এর পরিস্থিতি তখন সত্যিই গুরুতর।

কোলুনের পাহাড়ের ওপর কামান বসিয়ে জাপানীরা তখন অবিশ্রান্তভাবে গোলা-বর্ষণ করে চলেছে হংকং-এর ওপর। সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিয়ে চলেছে তাদের নৌ-বহরের কামানগুলি। সেই সঙ্গে বিমান থেকে একটানা বোমা-বর্ষণ।

অন্যদিকে তখন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে উত্তর মালয় ও বর্মার দক্ষিণে অবস্থিত সেই ভিক্টোরিয়া পয়েণ্টে।

দক্ষিণ বর্মা বা উত্তর মালয়, কোনটাই বড় যুদ্ধের উপযুক্ত নয়। কারণ, এ জায়গাগুলো যেমন জঙ্গল-পাহাড়ে আচ্ছন্ন, তেমনি রাস্তা-ঘাটও অত্যন্ত কম ও সংকীর্ণ।

কিন্তু জঙ্গল-যুদ্ধে অভিজ্ঞ জাপ-যোদ্ধাদের কাছে কোন বাধাই বাধা নয়। তাই সব কিছু প্রাকৃতিক বাধাকে উপেক্ষা করে ক্রমশই তারা এগিয়ে চলেছে মালয় ও বর্মার অভ্যন্তরে। প্রতিটি জায়গায় ব্রিটিশ বাহিনীকে মান বাঁচাতে হয়েছে 'সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ' করে।

সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ। কথাটার সেদিন খুবই প্রচলন হয়েছিল, মল্লিকা। বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মধ্যে।

এর মূলে ছিল রেডিও থেকে প্রচারিত বাংলা সংবাদ। রোজ সেই একই কথা। 'অমুক জায়গা থেকে আমাদের সেনাবাহিনী শত্রুর প্রভূত ক্ষতি করে সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করেছে।'

তবে কথাটা কিন্তু একেবারে মিথ্যে নয়, মল্লিকা। গত যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনী প্রায় প্রতিটি রণাঙ্গন থেকে যেভাবে সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করেছিল, ইতিহাসে তার খুব একটা নজীর আছে বলে আমার জানা নেই।

২১শে ডিসেম্বর জাপানীরা অবতরণ করল ফিলিপাইনের মিন্দানাও দ্বীপে। ২২শে ওয়েক দ্বীপে।

তারপরই একদিন তাদের বিমান-বহর হানা দিল খাস রেঙ্গুনের ওপর। তারিখটা ছিল ২৩শে ডিসেম্বর।

হঠাৎ সেদিন শহরের সবগুলো বিপদ-জ্ঞাপক সাইরেন আর্তনাদ করে উঠল বিকট স্বরে—উ-উ-উ-উ…!

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল সাজ-সাজ রব! বিমান! বিমান! বিমান! জাপানী বিমান আসছে! ঝাঁকে ঝাঁকে! দলে দলে! সবাই নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নাও। কেউ বাইরে থেকো না। হুঁশিয়ার!

তখনো পর্যন্ত বিমান-আক্রমণ সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ ধারণা রেঙ্গুনবাসী-দের ছিল না। তাই মজা দেখার জন্য বহু লোক বাইরে বেরিয়ে এল সতর্ক-বাণী উপেক্ষা করে।

ফল হল মারাত্মক। অন্ততঃ হাজার কয়েক লোককে সেদিন প্রাণ হারাতে হল বোমা ও মেসিনগানের গুলিতে।

ওদিকে সাতদিন আত্মরক্ষার পর হংকং আত্মসমর্পণ করল ডিসেম্বর মাসের ২৫ তারিখে।

না করে উপায়ও ছিল না।

প্রথম প্রশ্ন পানীয় জল। হংকং-এর পানীয় জল সরবরাহ নির্ভর করে পাহাড়ের ওপর স্থাপিত জলাধারগুলির ওপর। সব কিছুই তখন জাপানী-দের দখলে। খাদ্য-ভাণ্ডারও তাই। বাধ্য হয়েই তখন হংকং-এর গভর্ণর স্যার মার্ক ইয়ং আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন জাপানীদের কাছে।

শুধু হংকং নয়। ভারত মহাসাগরে অবস্থিত পেনাং-এর নৌ-ঘাঁটিও একদিন চলে গেল জাপানীদের দখলে।

তবে পেনাং-এর চাইতেও হংকং-এর গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। বিশেষ করে সিঙ্গাপুর নৌ-ঘাঁটির দ্বার-রক্ষী হিসেবে হংকং ছিল অপরিহার্য। হংকং চলে যাওয়ায় জাপানীরা যে এবার খাস সিঙ্গাপুরের দিকে হাত বাড়াতে চেষ্টা করবে, তাতে আর বিচিত্র কি!

তবে, কার্যত তা কতখানি সম্ভব হবে বলা শক্ত। কারণ, সিঙ্গাপুর সত্যিই দুর্ভেদ্য নৌ-ঘাঁটি। বিশেষ করে উপকূলভাগ তার অত্যন্ত সুরক্ষিত। এ অবস্থায় জাপান এত বড় ঝুঁকি নিতে রাজী হবে কি?

হংকং জয় করা হল ২৫শে ডিসেম্বর। তারপর শুধু জয় আর জয়। একটানা জয়।

২রা জানুয়ারি জয় করা হল ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা। ১১ই মালয়ের প্রধান নগর কুয়ালালামপুর। ১৪ই টেভয়।

২২শে তারিখে জাপ ও মার্কিন নৌ-বহরের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হল ম্যাকাসার প্রণালীতে। ওলন্দাজ সাবমেরিন ও বিমান-বহরও সেই যুদ্ধে যোগ দিল মার্কিনদের সঙ্গে।

যুদ্ধ চলল একটানা চারদিন ধরে। মোট চারটি সৈন্যবাহী জাহাজ এ যুদ্ধে হারাতে হল জাপানকে। মার্কিনদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ অজ্ঞাত।

২৩শে জানুয়ারি নিউগিনির র‍্যাবাউল চলে গেল জাপানীদের দখলে।

২৪শে তারিখে নতুন অভিযান শুরু হল দক্ষিণ বোর্ণিও এবং সেলিবিস দ্বীপের কেন্দ্রারীতে।

৩০শে তারিখে পতন হল ওলন্দাজ নৌ-ঘাঁটি আম্বয়নার।

একই অবস্থা চলছে তখন মালয়ে। দুর্গম পাহাড়, জঙ্গল, জলাভূমি, নদী ইত্যাদি সব কিছু প্রাকৃতিক বাধা অগ্রাহ্য করে সর্বত্র জাপানীরা এগিয়ে চলেছে অপ্রতিহত গতিতে।

সর্বত্র ব্রিটিশ বাহিনীর সেই একই অবস্থা। অর্থাৎ, অফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ। একমাত্র পশ্চাদপসরণ করা ছাড়া বুঝি সেদিন আর কোন কাজই ছিল না ব্রিটিশ বাহিনীর।

তার কারণও অবশ্য ছিল। প্রধান কারণ—শক্তির অসমতা। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির তুলনায় সেদিন জাপানীদের শক্তি ছিল অনেক বেশি। বিশেষ করে, বিমান-শক্তিতে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ছিল খুবই দুর্বল।

অন্যদিকে জাপান ছিল এ ব্যাপারে খুবই শক্তিশালী।

বিমান-শক্তিতে জাপান যে এতদূর এগিয়ে গেছে, সেকথা কি ব্রিটিশ, কি আমেরিকা কেউ ভাবতেই পারেনি কোনদিন।

দ্বিতীয় কারণ—জাপানীদের চাতুর্য। জঙ্গল-যুদ্ধে জাপানীরা এত বেশি পটু যে, ভাবতেও অবাক লাগে।

কখনো রবার বাগানের কুলী সেজে, কখনো মাছ-ধরা জেলের বেশে, আবার কখনো বা সাধারণ গ্রাম্য লোকের সাজে এমন চাতুর্য সহকারে তারা এগিয়ে আসত যে, বোঝাই যেত না।

বর্মা রণাঙ্গনেও সেই একই ব্যাপার।

দক্ষিণ বর্মার ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট এবং টেভয় আগেই চলে গিয়েছিল জাপানী-দের হাতে। তাছাড়া রেঙ্গুন এবং মৌলমিনে বোমাবর্ষণ তো চলছেই।

৩১শে তারিখের মধ্যেই পেনাং, কেডা, সেলাংগড়, সিঙ্গোরা, কুরাণ্টান ইত্যাদি সব কিছু চলে গেল জাপানীদের দখলে। চলে গেল গোটা মালয়।

অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ভারত, মালয়—এই পাঁচ-মিশালী সৈন্যদলই ছিল সেদিন ব্রিটিশের সবচাইতে বড় ভরসা। তাড়া খেয়ে সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে সরে যেতে লাগল সিঙ্গাপুরের দিকে। সিঙ্গাপুর দুর্ভেদ্য নৌ-দুর্গ। ওখানে একবার যেতে পারলে আর ভাবনা নেই।

এপারে মালয়ের জহোর রাজ্য, ওপারে নৌ-ঘাঁটি ও নৌ-দুর্গের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরী লৌহনগরী সিঙ্গাপুর।

মাঝখানে সংকীর্ণ জহোর প্রণালীর ওপর দিয়ে বাঁধানো সেতুপথ। এই সেতুপথটুকু অতিক্রম করতে পারলেই খাস সিঙ্গাপুর।

সিঙ্গাপুরের ভৌগোলিক অবস্থান এমন চমৎকার যে, আত্মরক্ষা করা খুবই সহজ।

তাছাড়া ভাসমান ডক, শুকনো ডক, বিমান অবতরণ ক্ষেত্র, তীর-রক্ষী কামানশ্রেণী, গুপ্ত মেসিনগান ঘাঁটি, পেট্রোল ও কয়লা মজুদ করার স্থান—কোন কিছুরই অভাব নেই সেখানে।

নৌ-ঘাঁটির নির্মাণকার্য শুরু হয়েছিল ১৯২৩ সালে। শেষ হয়েছে মাত্র দুবছর আগে—১৯৩৯ সালে। খরচ পড়েছে মোট এক কোটি সত্তর লক্ষ পাউন্ড।

উপকূলভাগে বসানো হয়েছে পনেরো ও আঠারো ইঞ্চি ব্যাসের দূর-পাল্লার কামানশ্রেণী, যা পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম।

তেলের ট্যাঙ্কসমূহ রক্ষিত করার ব্যবস্থা হয়েছে মাটির নিচে। অস্ত্রাগার এবং খাদ্য মজুদ ভাণ্ডারও তাই। সুতরাং দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ হয়ে থাকতে হলেও অসুবিধার কোন প্রশ্ন নেই।

কোথায় গেল এত আয়োজন, আর কোথায় রইল কি!

আশ্চর্য, এবারও ব্রিটিশ বাহিনীকে পরাভব মানতে হল জাপানীদের স্বভাবসিদ্ধ চাতুরির কাছে।

সিঙ্গাপুর মূলত নৌ-ঘাঁটি। তার আত্মরক্ষা বা আক্রমণের যা কিছু ব্যবস্থা, সবই গড়ে উঠেছে সমুদ্রের দিকে।

উপকূলরক্ষী কামানশ্রেণী, গুপ্ত মেসিনগান ঘাঁটিসমূহ সবই বসানো হয়েছে সমুদ্রের দিকে মুখ করে। কারণ, কেউ যদি কোনদিন সিঙ্গাপুর আক্রমণ করে তো জলপথেই করবে, স্থলপথে নয়।

জাপান তা জানে। জানে বলেই সমুদ্রপথে তারা আসেনি, এসেছে মালয়ের মধ্য দিয়ে, স্থলপথে। এ ব্যাপারে বরাবরের মতো এবারও তারা এমন চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছে যে, হঠাৎ তাল সামলানোও মুশকিল।

অথচ উপায় নেই। যে করে হোক, জাপানকে রুখতেই হবে।

হংকং আগেই গেছে। এখন একমাত্র ভরসা সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুর চলে গেলে প্রশান্ত মহাসাগরে ব্রিটিশ ও মার্কিন নৌ-বহর অচল হয়ে পড়বে।

না, জাপানকে সে সুযোগ কিছুতেই দেওয়া হবে না। যেভাবে হোক, যে কোন মূল্যে হোক সিঙ্গাপুরকে রক্ষা করতেই হবে।

৩০শে জানুয়ারি, ১৯৪২ সাল। রাত তখন অনেক। ভোর হতে আর খুব একটা বেশি দেরি নেই।

কখনো মালয় থেকে আগত ছত্রভঙ্গ সৈন্য বাহিনী জহোর প্রণালীর সেতুপথ দিয়ে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে এগিয়ে চলেছে সিংগাপুরের দিকে।

দেহ অবশ। পা চলতে চাইছে না। তবু তাদের পথ চলার বিরাম নেই। ঐ যে দূরে দুর্ভেদ্য সিংগাপুর দেখা যাচ্ছে! ওখানে যেতে পারলে তবেই রক্ষা। নইলে আর কোন আশাই নেই।

সহসা গোটা দ্বীপ-অঞ্চলটা থরথর করে কেঁপে উঠল পর পর দুটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে। সংগে সংগে জহোর প্রণালীর ওপর অবস্থিত সেই সেতু-পথটা কোথায় উড়ে গেল চোখের নিমেষে।

জাপানীরা এসে পড়েছে।

মাত্র গতকালও তাদের অবস্থিতি ছিল এখান থেকে আঠারো মাইল দূরে। কিন্তু আজ সেই দূরত্বের ব্যবধান ঘুচে গেছে। ইতিমধ্যেই তারা এসে পড়েছে জহোর প্রণালীর সেতুর ওপারে। সুতরাং শক্তিশালী ডিনামাইট দিয়ে সেতু উড়িয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

তবু কোন সুবিধে হল না।

এপারে জহোর রাজ্য, ওপারে সিংগাপুর। মাঝখানে একটা সংকীর্ণ প্রণালী মাত্র। সেতুপথ থাক বা না থাক, পাল্লার মধ্যে যখন পাওয়া গেছে. তখন কামান ও মর্টারের সাহায্যে একটানা গোলাবর্ষণ করে দ্বীপটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে কতক্ষণ!

কাজেও তাই করা হল। শুরু হল একটানা গোলা-বর্ষণ। দিনে রাত্রে। সর্বক্ষণ। সেই সংগে ছোঁ-মারা বোমারু বিমান। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে তারা বোমা-বর্ষণ করতে লাগল-লক্ষ্যবস্তুর ওপর।

অপরদিকে ব্রিটিশ বাহিনীর বিমানের সংখ্যা তখন প্রায় শূন্যে এসে ঠেকেছে।

অনেক আবেদন জানানো হয়েছে হেড কোয়ার্টার্সে। অবিলম্বে বিমান চাই। এক্ষুণি!

কিন্তু কোথায় বিমান! ভাণ্ডার যে একেবারেই শূন্য!

আক্রমণের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হল ৯ই ফেব্রুয়ারি রাত এগারোটায়।

সিংগাপুরের সবগুলি সার্চলাইট তখন জহোর প্রণালীর ওপর নিবদ্ধ।

ওপারে জাপানীরা রয়েছে। তীব্র সন্ধানী আলো ফেলে তাদের গতি-বিধি লক্ষ্য করা দরকার। কখন কি করে বসবে কে জানে!

সহসা ওপার থেকে প্রচণ্ড গোলা-বর্ষণ শুরু হল সার্চলাইটগুলি লক্ষ্য করে। যে করে হোক, এগুলোকে ভাঙতেই হবে।

অব্যর্থ নিশানায় সঙ্গে সঙ্গে সার্চলাইটগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে লাগল একটি একটি করে। বাকি শুধু আর একটি। ওটা ভাঙতে পারলেই, ব্যস!

শেষ পর্যন্ত ওটাও একসময়ে ভেঙে পড়ল ঝন্ ঝন্ করে।

কিন্তু তার আগেই সিঙ্গাপুরের পৃষ্ঠদেশ-রক্ষাকারী সৈন্যবাহিনী কি দেখে চমকে উঠল দারুণভাবে।

নৌকো! নৌকো! নৌকো!

জহোর প্রণালীর ওপর দিয়ে প্রায় পঞ্চাশটি রবারের নৌকা তীব্রবেগে ছুটে আসছে সিঙ্গাপুরের দিকে।

প্রতিটিতে রয়েছে ত্রিশজন করে জাপানী সৈন্য। আর রয়েছে মাঝারি আকারের ট্যাঙ্ক।

সামাল সামাল রব উঠল সর্বত্র। জাপানীরা এসে পড়েছে। হুঁশিয়ার! তৈরি হও!

কিন্তু সব বৃথা। প্রচণ্ড গোলা ও বোমা-বর্ষণের আড়ালে ততক্ষণে জাপ-যোদ্ধারা দলে দলে নেমে পড়েছে সিঙ্গাপুরের মাটিতে। তারপরই শুরু হল তাদের হিংস্র উন্মত্ত, বেপরোয়া আক্রমণ। কার সাধ্য তখন তাদের গতিরোধ করে!

একটানা যুদ্ধের ফলে মালয় থেকে আগত ভারতীয় সৈন্যগণ তখন ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, বিপর্যস্ত। কেউ কেউ আবার অসুস্থ। বলতে গেলে একটি দিনের জন্যও তারা বিশ্রাম পায়নি গত দুমাসের মধ্যে।

তবু বরাবরের মতো এবারও তাদের সর্বাগ্রে ঠেলে দেওয়া হল অনিবার্য মৃত্যুর মুখে।

যাও, এগিয়ে যাও। তোমরা ভাড়াটে সৈনিক। তোমাদের জীবনের দাম আর কতটুকু!

মনে মনে বেশ একটু আহত হল ভারতীয় সৈনিকগণ। কিন্তু উপায় কি!

বেগতিক দেখে ব্রিটিশ অফিসারদের মধ্যে অনেকেই তখন কেটে পড়েছে অস্ট্রেলিয়ার দিকে। সর্বাগ্রে প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওয়াভেল। অবশ্য তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে একটা পাঁজরা ভেঙেছে, তা যাকগে। প্রাণ তো বেঁচেছে!

বাকি যারা রয়েছে, তাদের রক্ষা করতে গিয়ে কামানের খোরাক হওয়া ছাড়া আর কি-ই বা তখন করণীয় আছে ভারতীয় সৈন্যদের!

কিন্তু অন্যান্য সেনাবাহিনী তখন কোথায়! কোথায় অস্ট্রেলিয়ার শ্বেতাঙ্গ সৈন্যদল?

তারা তখন জায়গা ছেড়ে শহরে গিয়ে তাদের দেশোয়ালী ভাইদের নিয়ে নারী-ধর্ষণ এবং লুটতরাজে মত্ত।

'Australian Comrades were abandoning their positions and running away to take part in the indiscriminate loot-

ing and raping that their countrymen had started in the town.'

[I. N. A. & Its Netaji: Maj.-Gen. Shahanwaz Khan: P.—10]

সুতরাং দায়-দায়িত্ব তখন ভারতীয় সৈন্যদেরই। ভাবটা এই যে, পার তো জাপানীদের হঠাও, নয়তো মরো গে!

প্রথমেই কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি বিখ্যাত ভাসমান ডকটি ডুবিয়ে দেওয়া হল সাগরের জলে।

এক ইংল্যান্ড ছাড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আর কোথাও এতবড় ডক ছিল না। কিন্তু উপায় কি!

শত্রুপক্ষ সিঙ্গাপুরে ঢুকে পড়েছে। এমন কিছুই অবশিষ্ট রাখা চলবে, না, যার দ্বারা তারা এতটুকুও উপকৃত হতে পারে।

ব্রিটিশ বাহিনী তখন আশ্রয় নিয়েছে পরিখার আড়ালে।

জাপানীরা একসঙ্গে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করেছে চারিদিক থেকে। নিচে কামান থেকে একটানা গোলা-বর্ষণ, ওপরে বিমান থেকে বোমা-বৃষ্টি, তাছাড়া দুদিক থেকে ভয়াবহ চাপ সৃষ্টি—এ অবস্থায় পরিখার আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধ করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

কিছুতেই কিছু হল না। সৈন্য হিসেবে জাপানীরা আরো অনেক বেশি চতুর। অনেক কৌশলী। তাই এবার তারা একটানা গোলাবর্ষণ শুরু করল মর্টার থেকে।

পরিখা ভাঙতে মর্টারের জুড়ি নেই। এবার! এবার কোথায় যাবে তোমরা!

বিপদের ওপর বিপদ। এবার বিপদ এল ভিন্ন দিক থেকে।

ইতিমধ্যেই জাপানীরা জহোর প্রণালীর সেই সেতুপথ মেরামত করে নিয়ে দলে দলে ঢুকে পড়তে সক্ষম হয়েছে সিঙ্গাপুরের অভ্যন্তরে। ফলে, পিছু হটতে হটতে ক্রমশ দশ লক্ষ সামরিক ও অসামরিক লোক গিয়ে জড় হল মাত্র সাড়ে তিন মাইল জায়গার মধ্যে। অথচ এদিকে জল, খাদ্য, পেট্রোল, গোলা-বারুদ সব কিছুরই অভাব। সব কিছুই বাড়ন্ত!

সবচাইতে বড় প্রশ্ন—পানীয় জল।

পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা এমন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে, আর চব্বিশ ঘণ্টাও টিকে থাকা যাবে কিনা সন্দেহ। এ অবস্থায় জাপানীদের মতো দুর্ধর্ষ যোদ্ধার বিরুদ্ধে লড়াই চালানো অসম্ভব।

সত্যিই অসম্ভব।

প্রমাণ পাওয়া গেল মাত্র সাতদিন বাদে—১৫ই তারিখে।

কোথায় রইল সেদিন ব্রিটিশের দুর্ভেদ্য নৌ-ঘাঁটি সিঙ্গাপুর, আর কোথায় গেল তার বীর সেনাপতি ব্রিটিশ জেনারেল পার্সিভ্যাল!

এত সাধের সিঙ্গাপুরকে সেদিন নিজের হাতেই তাকে জাপানীদের হাতে তুলে দিতে হল ফোর্ড কোম্পানীর মোটর কারখানায় বসে।

সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ বিনাশর্তে তুলে দেওয়া হল হাজার হাজার হতভাগ্য ভারতীয় সৈনিকদের অনিশ্চিত ভাগ্যকে।

এবার তোমরা পথ দেখ। এতদিন তোমাদের মনিব ছিলাম আমরা। এবার থেকে তোমাদের নতুন মনিব হল জাপানীরা। ওরা যা বলে, তাই শোন। গুড বাই!

১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২ সাল। সকাল আটটা।

বিরাট ট্যাঙ্ক বাহিনী সামনে রেখে বিজয়গর্বে সিঙ্গাপুরে প্রবেশ করলেন জাপানী সেনাপতি লেঃ জেনারেল ইয়ামাসিটা। সূর্য-লাঞ্ছিত জাপানী পতাকায় গোটা শহরটাই বুঝি তখন ঢাকা পড়ে গেছে।

সেই সঙ্গে মিলিটারী ব্যাণ্ডে একটানা বেজে চলেছে জাপানের দেশ-বন্দনার সুর:

'Kimi ga yo wa
Chiyo ni yachiyo ni
Sazare ishi no
Iwao to nari te
Koke no musu made'.

অর্থাৎ—হে মহান সম্রাট, তোমার রাজত্ব দশ হাজার বৎসরব্যাপী স্থায়ী হোক! তুমি দীর্ঘজীবী হও!

এবার মোট কত সৈন্য সেদিন সিঙ্গাপুরে বন্দী হয়েছিল, শোন:

ব্রিটিশ...... ১৫,০০০ হাজার
অস্ট্রেলিয়ান...১৩,০০০ "
ভারতীয়...... ৪৫,০০০ "

তাছাড়া ৮,০০০ হাজার আহত সৈন্য। যুদ্ধ-সম্ভারও খোয়াতে হল বিস্তর। তার মধ্যে ছিল:

বড় কামান...............	৩০০
মেসিনগান...............	২,০০০
রাইফেল...............	৫০,০০০
ট্যাঙ্ক...............	২০০
মোটর লরী.........	১০,০০০
মোটর সাইকেল............	২০০

সেই সঙ্গে দশ হাজার টনের জাহাজ একটি। পাঁচ হাজার টনের ট্যাঙ্কার তিনটি। ছোট ছোট জাহাজ অসংখ্য এবং সেই অনুপাতে গোলা-গুলি ও মাইন ইত্যাদি।

পরদিনই (১৭ই ফেব্রুয়ারি) সমস্ত ভারতীয় সৈন্যদের ফারের পার্কে জড় করে তুলে দেওয়া হল ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর হাতে। এখন থেকে তোমাদের

ভাল-মন্দ সব কিছু দেখাশোনা করবেন এই মোহন সিং। তোমরা তাঁর নির্দেশ মেনে চলবে আশা করি।

কে এই মোহন সিং? কেন তাঁর ওপর এত বড় দায়িত্ব অর্পণ করলেন জাপানী অফিসার মেজর ফুজিয়ারা? সেকথা বলব তোমাকে আরো পরে।

ওদিকে খবর শুনে ডুকরে কেঁদে উঠলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল।

হিটলারের হাতে মার খেলে তত দুঃখ ছিল না। হাজার হোক, হিটলার ইয়োরোপীয়ান। তা বলে এশিয়ার ঐ ক্ষুদে জাপানীদের কাছে!

নাঃ! মান-মর্যাদা আর রইল না। এর চাইতে মৃত্যুও বুঝি ভাল ছিল।

অনেক যুক্তিই সেদিন চার্চিল দেখালেন জাতির উদ্দেশে বেতারভাষণ দিতে গিয়ে।

হ্যাঁ, আমরা সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করেছি, একথা ঠিক। তবে এ ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব-পালনে আমরা কোন ত্রুটি রাখিনি। জাপানীরা অসাধারণ যোদ্ধা। জলে, স্থলে, আকাশের সর্বত্র তারা সমান শক্তিশালী। তবে কিনা অত্যন্ত নৃশংস, বেপরোয়া আর বিশ্বাসঘাতক।

'No one must underrate any more the gravity and efficiency of the Japanese war machine. Whether in the air or upon the sea or man to man on land, they have already proved themselves to be the most formidable, deadly and, I am sorry to say, barbarous antagonist.'

আর ইংরেজ ঐতিহাসিকের ভাষায় সিঙ্গাপুরের এই চরম বিপর্যয় সম্বন্ধে বলা হল:

'...the most humiliating and impressive disaster which the British empire had suffered for more than a century...'

অন্যদিকে জাপানীদের এই বিস্ময়কর অগ্রগতি লক্ষ্য করে পৃথিবীর দুই প্রান্তে অবস্থিত দুটি ঘর-ছাড়া মানুষের কিন্তু সেদিন তৎপরতার আর সীমা-পরিসীমা ছিল না, মল্লিকা।

টেবিলের ওপর রক্ষিত বিরাট মানচিত্রটার দিকে তাকিয়ে প্রহরের পর প্রহর কেটে যায়, তবু স্বপ্ন দেখার বুঝি আর শেষ নেই।

এমনি করে দিনের পর দিন। রাতের পর রাত। মাসের পর মাস।

একজন মহানায়ক রাসবিহারী। অন্যজন সুভাষ।

পূর্ব দিগন্তে নতুন দিনের নতুন সূর্য উঠেছে। থাইল্যান্ড, হংকং, মালয়, সিঙ্গাপুরের পতন হয়েছে। বর্মাও যায় যায়। কিন্তু তারপর?

প্রথমে হংকং। তারপর মালয়। সবশেষে সিঙ্গাপুর। একে একে সব কিছুই চলে গেল জাপানীদের দখলে।

খবর শুনে গোটা পৃথিবী স্তম্ভিত। সিঙ্গাপুরের আত্মরক্ষা-ব্যবস্থা ও তার অভাবনীয় সামরিক শক্তি সম্বন্ধে কত গাল-গল্পই না এতদিন প্রচার

করা হয়েছিল যারা বিশ্বের কাছে। কোথায় গেল সব! এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত!

সিঙ্গাপুরের পতন হল ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২ সালে। ঠিক তার চার-দিন পরেই (১৯শে ফেব্রুয়ারি) আবার সেই তেজোদীপ্ত কণ্ঠ ভেসে এল ইথার-তরঙ্গে:

'আমি সুভাষ বলছি...'

সুভাষ! দেখতে দেখতে একটা চাপা চঞ্চলতা ছড়িয়ে পড়ল এখানে-ওখানে সর্বত্র। চুপ! কথা বলো না কেউ! সুভাষ কি বলছেন, শোন:

'...I have waited silently and patiently on the course of events; now that the hour has struck, I can come forward and speak....

In this struggle, and in this subsequent period of reconstruction we will co-operate whole-heartedly with all those who help us to destroy the common enemy....'

এতদিন আমি অলক্ষ্যে থেকে ধৈর্য ধরে সব কিছু লক্ষ্য করেছিলাম। এবার আঘাত করার সময় এসেছে। তাই আমি এখন সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। ...সবার সাধারণ শত্রুকে ধ্বংস করতে যারা আমাদের সাহায্য করবে, এ যুদ্ধে তাদের সঙ্গেই আমরা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

ব্রিটিশের সত্যিই সেদিন বড় দুর্দিন, মল্লিকা। শুধু হংকং, মালয় বা সিঙ্গাপুর নয়, তারপর একে একে সব কিছুই তাদের হারাতে হল জাপানীদের কাছে।

এই নিয়ে আমাদের দেশে সেদিন কত ছড়া! কত গান!

একটি গানের কথা আজো আমার স্পষ্ট মনে পড়ে।

শুধু আমি কেন, এমন একটি লোকও বোধ হয় তুমি খুঁজে পাবে না, যাকে সেদিন অজ্ঞাত কবির এই গানটি শুনতে হয়নি পথে-প্রান্তরে। বিশেষ করে ছোটদের মুখে।

গানটির প্রথম কয়েকটি লাইন হল:

"সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি
বোম ফেলেছে জাপানী
বোমের মধ্যে কেউটে সাপ
ব্রিটিশ বলে বাপ্‌রে বাপ্‌!"

তথ্যগত দিক থেকে কিছুটা ভুল থাকলেও জাপান যে সেদিন মহাশক্তি-মান ব্রিটিশকে সত্যিই চোখে সর্ষে ফুল দেখিয়ে ছেড়েছিল, তার মধ্যে কিন্তু এতটুকুও অত্যুক্তি নেই মল্লিকা।

২০শে তারিখে জাপানীরা বালিদ্বীপে অবতরণ করল বিরাট এক নৌ-বহরের সাহায্যে।

আর ২৭শে তারিখে! সেদিন জাপানী নৌ-বহরের সঙ্গে তাদের প্রচণ্ড নৌ-যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হল জাভা সাগরে।

প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি হল জাপানীদের।

বিশেষ করে, মার্কিন মহল থেকে ক্ষয়-ক্ষতির যে বিবরণ প্রচার করা হল, তা সত্যিই অভূতপূর্ব।

দেখা গেল যে, জাপানী নৌ-বহরের আর কিছুমাত্রও অবশিষ্ট নেই। সব শেষ। কারণ, একচল্লিশটি জাহাজ তাদের ধ্বংস হয়েছে সংঘর্ষের ফলে। মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে আরো পনেরোটি। সব মিলিয়ে মোট ছাপ্পান্নটি।

আর মিত্রপক্ষের!

না, তাদের কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি। সব ক'টি জাহাজই তাদের নিরাপদে ফিরে এসেছে নিজেদের ঘাঁটিতে।

কিন্তু একি!

এতবড় ক্ষয়-ক্ষতির পরেও জাপনীরা বালিদ্বীপে অবতরণ করে সঙ্গে সঙ্গেই বিমানঘাঁটি ইত্যাদি দখল করে নিল কি করে?

তবে কি সবটাই যুদ্ধকালীন প্রচারকার্য মাত্র?

আসল খবর জানা গেল 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে। মিত্রপক্ষীয় নৌ-বহর শেষ। এমন কি, বংশে বাতি দেবার জন্য একটিও অবশিষ্ট নেই।

শুরু হয়েছিল বিকেল চারটেয়।

ব্রিটিশ, মার্কিন ও ওলন্দাজ নৌ-বহর তখন প্রস্তুত। জাপানী নৌ-বহর এদিকেই আসছে বলে খবর পাওয়া গেছে। আসুক না একবার! কাকে বলে নৌ-যুদ্ধ দেখিয়ে দেব!

সত্যিই ওরা দেখাল, মল্লিকা। কি করে সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করতে হয়, তা বোধহয় এমন করে আর কেউ কোনদিন দেখাতে পারেনি ওদের মতো।

তা বলে রেহাই নেই। ততক্ষণে জাপানী নৌ-বহরের সবগুলি দূরপাল্লার কামান সক্রিয় হয়ে উঠেছে প্রচণ্ডভাবে।

সঙ্গে সেই মারাত্মক 'মিৎসুবিসি-৯৬' ডাইভ বম্বার। বিমানবাহী জাহাজ থেকে সঙ্গে সঙ্গে তারা তীরের মতো ছুটে এল আকাশের বুকে পাখা মেলে। যুদ্ধ করবে তোমরা আমাদের সঙ্গে! বেশ, কর!

প্রথমেই ঘায়েল হল ব্রিটিশ ক্রুজার 'এক্সিটর'।

ঘায়েল হল একেবারে মোক্ষম জায়গা, অর্থাৎ বয়লার ঘর।

তারপরই শুরু হল দৌড়—দৌড়—দৌড়!

কিন্তু যাবে কোথায়? একবার যখন বেড়াজালে আটকে পড়েছে, তখন কি আর রক্ষা আছে নাকি?

এক্সিটরের পরে ওলন্দাজ ডেস্ট্রয়ার 'কোর্টেনার'। তারপর ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ার 'ইলেকট্রা'।

বেগতিক দেখে বাকি জাহাজগুলি সরে পড়তে চেষ্টা করল ধূম্রজাল সৃষ্টি করে। আর যুদ্ধ করে কাজ নেই। অনেক হয়েছে! এখন মানে মানে সরে পড়তে পারলে তবেই রক্ষা!

কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুহাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যায় না। সুতরাং অনেকটা নিশ্চিন্ত। আর ভয় নেই। এবারের মতো খুব রক্ষা পাওয়া গেছে।

দ্রাম! ঠিক তখনই ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ার 'জুপিটার' থর থর করে কেঁপে উঠল প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দে। মাত্র কয়েক মিনিট। তারপরেই সব শেষ।

পরবর্তী বিস্ফোরণ ঘটল রাত এগারোটায়। এবার গেল ওলন্দাজ ক্রুজার 'ডি-রুয়েটার'। তারপর আরো একটি ওলন্দাজ ক্রুজার 'জাভা'।

একটার পর একটা। জাভার পরে গেল অস্ট্রেলিয়ার ক্রুজার 'পার্থ'। সেই সঙ্গে গেল মার্কিন ক্রুজার 'হাউস্টন'।

তারপর আরো দুটি মার্কিন ডেস্ট্রয়ার 'পিলস্‌বারি' আর 'এডসাল'।

সঙ্গে সহযাত্রী হল ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ার 'এনকাউণ্টার' এবং মার্কিন ডেস্ট্রয়ার 'স্টুং হোল্‌ড', মার্কিন গান-বোট 'এসডিলা' ও আরো ছ'টি জাহাজ।

তারপর পরম নিশ্চিন্তে দ্বীপে অবতরণ এবং বিমানঘাঁটি ইত্যাদি দখল।

বাধা দেবার আর কোন প্রশ্নই ওঠে না। কে বাধা দেবে? নৌ-বহর তখন পুরোপুরি বিধ্বস্ত। ইচ্ছা থাকলেই বা মিত্রবাহিনীর পক্ষে সে সাধ্য তখন কোথায়?

শুধু একটি-দুটি ক্ষেত্রে নয় মল্লিকা, মিত্রবাহিনীর যুদ্ধকালীন প্রচারকার্য এমনি হাসির খোরাক যুগিয়েছিল অসংখ্য বার।

যেমন—পরবর্তী কালে মিডওয়ের সামুদ্রিক এলাকায় অনুষ্ঠিত নৌ-যুদ্ধ।

মার্কিন সমর বিভাগের দাবী, সে যুদ্ধে তারা মোট ৫৩টি জাপানী ক্রুজার ধ্বংস করেছে।

খুব ভাল কথা। কিন্তু জাপানী নৌ-বহরে কোনদিনও ৫৩টি ক্রুজার ছিল কি?

মোটেই না। তাদের ক্রুজার ছিল সব মিলিয়ে মোট ৩৫টি। তার একটিও বেশি নয়। তাহলে বাকিগুলো এল কোথা থেকে?

ওদিকে বেগতিক দেখে ৩রা মার্চ তারিখে জেনারেল ওয়াভেল ভারতবর্ষে ফিরে এলেন প্রাচ্যের অধিনায়কের পদ থেকে বিদায় নিয়ে।

প্রাচ্য রণাঙ্গনের অধিনায়ক হিসেবে পদে পদে জাপানীদের হাতে অপদস্থ হওয়া ছাড়া আর এমন কিছুই তিনি করতে পারেননি, যা নিয়ে এতটুকু গর্ব করা চলে। দেখা যাক, ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করে এবার কিছু করা যায় কিনা!

ঠিক তার দুদিন পরেই (৫ই মার্চ) জাভার রাজধানী বাটাভিয়া চলে গেল জাপানীদের দখলে।

ব্রহ্ম-রণাঙ্গনেও সেই একই অবস্থা। সেই একঘেয়ে পশ্চাদপসরণের ইতিহাস। মারগুই, টেভয়, মৌলমেন ইত্যাদি সব গেছে।

মৌলমেন শুধু বর্মার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দরই নয়, চমৎকার একটি বিমান-বন্দরও বটে। সেদিক থেকে ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে মৌলমেন ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তবু কিছুতেই হল না। শেষ পর্যন্ত জাপানীদের অবিশ্রান্ত বোমা ও মর্টারের গোলা-বর্ষণের মধ্য দিয়েই ব্রিটিশ বাহিনীকে নৌকাযোগে মৌলমেন ত্যাগ করে আশ্রয় নিতে হল পরবর্তী ঘাঁটি—মার্তাবানে।

২৩শে তারিখে উভয়পক্ষে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হল সিতাং নদীর মোহনার কাছে।

জেনারেল হাটন তখন তার ১৭নং ডিভিশন নিয়ে প্রস্তুত।

যে করে হোক, সিতাং নদীর সেতুমুখ রক্ষা করতেই হবে। নয়তো রেঙ্গুনকে কিছুতেই রক্ষা করা যাবে না। সুতরাং জান কবুল!

শুরু হল উন্মত্ত, বেপরোয়া হাতাহাতি যুদ্ধ। তবু কিছুতেই কিছু হল না। বাধ্য হয়েই তখন জেনারেল হাটনকে সেতুপথ ধরে ওপারে চলে যেতে হল তিনদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে। তারপরই সেতুপথটাকে উড়িয়ে দেওয়া হল শক্তিশালী ডিনামাইট চার্জ করে।

আর ভয় নেই। জাপানীরা এপারে রয়েছে। সুতরাং কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত।

কিন্তু যে ভারতীয় সৈন্যগণ এতক্ষণ সর্বস্ব পণ করে কেবলমাত্র কুকরি ও সঙ্গীনের সাহায্যে জাপানীদের ঠেকিয়ে রেখেছিল, তাদের কি হল? তাদের অধিকাংশই এপারে রয়ে গেল যে।

যাকগে। কথায় বলে—আপনি বাঁচলে বাপের নাম! ভাড়াটে সৈন্যরা মরল কি বাঁচল, সেকথা চিন্তা করার মতো অবকাশ তখন কোথায়?

শুধু এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে নয় মল্লিকা, গত বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর এমনি হৃদয়হীনতার দৃশ্য দেখা গিয়েছিল প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই।

কি আফ্রিকা, কি মালয়, কি সিঙ্গাপুর, কি সিতাং নদীর সেতুমুখ, সর্বত্র সেদিন তারা এমনিভাবে গা-ঢাকা দিতে চেষ্টা করেছিল ভারতীয় সৈন্যদের কামানের মুখে ঠেলে দিয়ে।

অথচ এই ভারতীয় সৈন্যদের সাহায্যেই তারা এতদিন তাদের বিস্তৃত সাম্রাজ্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল এশিয়া ভূখণ্ডে।

এদিকে পিছু হটতে হটতে সেতুমুখ বরাবর গিয়েই ভারতীয় সৈন্যগণ অবাক। আশ্চর্য, সেতুপথের কোন চিহ্নও নেই সেখানে!

এখন উপায়! সামনে খরস্রোতা সিতাং নদী। পেছনে ক্ষমাহীন শত্রু। কি করা যায় এখন এই অবস্থায়!

এক মুহূর্তের দ্বিধা। ক্ষীণ একটা সন্দেহের ঝিলিক। তারপরই হত-ভাগ্য ভারতীয় সৈন্যগণ উন্মত্তের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল সিতাং নদীর জলে। সামান্য কয়েকজন বহুকষ্টে ওপারে যেতে সক্ষম হল। বাদবাকি সবাই প্রবল স্রোতের টানে কোথায় আদৃশ্য হয়ে গেল কে জানে!

পরবর্তী লক্ষ্য—পেগু ও রেঙ্গুন।

১৭নং ডিভিসন পুরোপুরি বিধ্বস্ত। সুতরাং যাকে বলে একেবারে খোলা মাঠ।

তাছাড়া জাপানীরা প্রত্যাশিত উন্মুক্ত প্রান্তরের পথ ধরে আসেনি। এসেছে অরণ্যভূমির কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়ে। এ অবস্থায় জঙ্গল-যুদ্ধে অভিজ্ঞ জাপানীদের বাধা দিতে চাইলেই বা ব্রিটিশ বাহিনীর পক্ষে সে সাধ্য তখন কোথায়?

বর্মায় সর্বত্র সেদিন পালাই-পালাই রব।

বিশেষ করে প্রবাসী ভারতীয়দের তো কথাই নেই। ভয়ে-আতঙ্কে প্রতিটি প্রাণী তখন উদ্বিগ্ন, দিশেহারা।

কি করা যায় এখন এ পরিপ্রেক্ষিতে। কোথায় যাওয়া যায়! কার কাছে!

নিরুপায় দেখে শেষ পর্যন্ত সবাই পাড়ি দিল দেশের দিকে। জাহাজে স্থান না পেয়ে অনেকেই তখন দল বেঁধে রওনা দিল হাঁটা-পথে।

কত বিচিত্র ছবি। কত বিচিত্র ঘটনা। কত অন্তহীন মানুষের মেলা। যেন শেষ নেই এই পথ-চলা মিছিলের।

সর্বত্র সামাল-সামাল রব। জাপানীরা নাকি আর খুব একটা দূরে নেই। যে কোন মুহূর্তে রেঙ্গুনের পতন হওয়া নাকি মোটেই বিচিত্র নয়।

সবাই ভীত। সবাই সন্ত্রস্ত। কখন কি হয় কে জানে!

এ জগতের আকাশে-বাতাসে মৃত্যু। জীবন ও মৃত্যুর এখানে পাশাপাশি বাস। অলক্ষ্য থেকে কখন যে মৃত্যু এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তা কে বলতে পারে!

সর্বোপরি দস্যু, তস্কর ও লুণ্ঠনকারীদের ভয়। এ অবস্থায় কে শত্রু, আর কে যে মিত্র তা বোঝাও মুশকিল।

এমনি করে দিনের পর দিন। রাতের পর রাত।

যত দূর চোখ যায় সেই একই দৃশ্য। সকাল-সন্ধ্যা শহরের বাইরে ছুটে চলেছে ভয়ার্ত নাগরিকদল।

সবাই রিক্ত। সবাই সম্পদহীন। দেহ অবশ। পা চলতে চায় না। তবু অনির্দিষ্টভাবে সবাই এগিয়ে চলেছে ঘরের মানুষ ঘরে ফিরবে বলে।

নানা জাতের, নানা মতের মানুষ। কিন্তু সবার হৃদয় যেন একই সূত্রে গাঁথা। পেছনে তাকাবার সময় নেই। এ হচ্ছে বাঁচার সংগ্রাম। যে করে হোক,

বাঁচতে হবে। সেই বাঁচার তাগিদেই সবাই এগিয়ে চলেছে কোনদিকে দৃক্‌পাত না করে।

প্রায়ই শোনা যায় আশে-পাশে কামান দাগার শব্দ। চোখে পড়ে, মাথার ওপর দিয়ে শিস্‌ দিতে দিতে কামানের গোলা-গুলি উল্কার মতো ছুটে চলছে দিগ্বিদিকে।

কোন কোনটা আবার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে কত দূরে গিয়ে পড়ছে, তার কোন হদিস পাওয়া যায় না। শুধু দেখা যায়, দূরে কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া আকাশে গিয়ে আস্তে আস্তে মেঘের আকার ধারণ করছে।

গোলা-গুলি একটু থামতেই আবার শুরু হয় পথ-চলা।

সে কি দৃশ্য তখন! যত দূর চোখ যায়, শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস! একটু আগেও যা ছিল সমৃদ্ধ জনপদ, তখন তার আর চিহ্নমাত্রও নেই। শুধু পড়ে আছে কতগুলো পোড়ো জমি মাত্র।

সেই দৃশ্যকে আরো ভয়ঙ্কর করে তুলেছে মানুষের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহাংশ। পথের ধারে ধারে পূতিগন্ধময় শবদেহের দৃশ্য। সে যে কি বীভৎস, তা বর্ণনা দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়।

শুধু অসামরিক জনসাধারণ নয়, সৈন্যদের মধ্যেও ছত্রভঙ্গ ভাব বেড়েই চলেছে ক্রমশ।

পথে-ঘাটে দেখা যায়, কাতারে কাতারে দলছাড়া সৈনিক চলেছে। হাতে হাতিয়ার নেই। গায়ে সম্পূর্ণ উর্দি নেই। অনেকের পায়ে জুতো পর্যন্ত নেই। তবু তারা এগিয়ে চলেছে উদ্দেশ্যহীনভাবে। কোথায় যাচ্ছে তারও কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

কলকাতা মহানগরীতেও সেই একই দৃশ্য।

শহর খালি করে কাতারে কাতারে লোক তখন গ্রামাঞ্চলের দিকে ছুটে চলেছে জাপানী বোমার ভয়ে। আকাশপথে রেঙ্গুন থেকে কলকাতার দূরত্ব কতটুকুই বা। সুতরাং আর বিশ্বাস নেই।

ওদিকে তখনো আস্ফালন চলেছে সেই একইভাবে। আসুক না জাপানীরা! দেখে নেব ওদের কতখানি হিম্মৎ!

দরকার হলে আফ্রিকার তব্রুকের মতো এখানেও আমরা দীর্ঘদিন ধরে অবরোধ-যুদ্ধ চালাব, তবু রেঙ্গুন কিছুতেই ছাড়ব না।

কোথায় যুদ্ধ, কোথায় কি!

যুদ্ধ তো দূরের কথা, তার সামান্য চিহ্নমাত্রও দেখা গেল না কোন একটি ক্ষেত্রে। বরং তার আগেই ব্রিটিশ জেনারেল আলেকজাণ্ডার সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করলেন ডক, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি যোগাযোগ-ব্যবস্থা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে একাকার করে দিয়ে।

পেগু ও রেঙ্গুনের পতন হল ৮ই মার্চ।

আর ২৫শে মার্চ হারাতে হল বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত গোটা আন্দামান। হারাতে হল বেসিন, প্রোম, টাঙ্গু, মেম্বিও, আকিয়াব ইত্যাদি সব কিছু।

৫ই এপ্রিল জাপানী বিমান-বহর হানা দিল কলম্বোতে।

আর ৮ই এপ্রিল সর্বপ্রথম বোমা-বর্ষণ হল ভারতের মূল ভূখণ্ড মাদ্রাজ উপকূলে অবস্থিত বিশাখাপত্তনম ও কোকনদে।

বিশাখাপত্তনম আক্রান্ত হল ভোরবেলা। লক্ষ্য—পোতাশ্রয়ে অবস্থিত জাহাজগুলি। দশটি করে বিমান অংশগ্রহণ করেছিল প্রতিবারের হানাতে। বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল মোট কুড়িটি। সবগুলিই ফেলা হয়েছিল ডক-এলাকায়। শহরে বা অন্য কোথাও নয়।

কোকনদে প্রথমবারে একটিমাত্র বিমান বোমা-বর্ষণ করেছিল ভোরবেলায়। দ্বিতীয় আক্রমণ ঘটে দুপুর একটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে।

সেবার অংশগ্রহণ করেছিল মোট পাঁচটি বিমান। লক্ষ্য—তেলের গুদাম। বলা বাহুল্য যে, সে লক্ষ্য ভেদ করতে তাদের এতটুকুও কষ্ট হয়নি।

৯ই এপ্রিল আবার বোমা-বর্ষণ করা হল সিংহলের শ্রেষ্ঠ নৌ-ঘাঁটি ত্রিঙ্কোমালিতে। ক্ষয়-ক্ষতি হল বিস্তর।

কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল নিজেই সেকথা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন কমন্সসভার এক গোপন অধিবেশনে দাঁড়িয়ে।

হ্যাঁ, প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি আমাদের হয়েছে। পোতাশ্রয়ে অবস্থিত সবগুলি জাহাজই জখম হয়েছে গুরুতরভাবে। তীর-রক্ষী কামানগুলিও অকেজো হয়ে পড়েছে জাপানীদের এই আকস্মিক আক্রমণের ফলে।

কিন্তু কেন? আমাদের বিমান-বহর তখন কোথায় ছিল? চেপে ধরলেন বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ, তারা কেন বাধা দিল না জাপানীদের?

দিয়েছিল। খুবই বীরত্বের সংগেই তারা বাধা দিয়েছিল। তবে কিনা শেষ পর্যন্ত আর একটিও অবশিষ্ট ছিল না। শত্রুর প্রভূত ক্ষতি করে শেষ পর্যন্ত সবগুলিই হয় নষ্ট, হয়তো জখম, কিংবা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল।

প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের রাজকীয় বাহিনীর এই ব্যর্থতার কারণ কি?

কারণ—আমাদের রাজকীয় বাহিনী এখন খুব নগণ্য অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। সমুদ্রপথে সৈন্য পাঠানোরও কোন উপায় নেই। কারণ, গোটা বংগোপসাগরই এখন জাপানীদের আয়ত্তাধীনে। একমাত্র আসামের পার্বত্য পথ দিয়েই সামান্য কিছু লোক ও রসদপত্র পাঠানো সম্ভব।

'Our Imperial forces are, however, reduced to very small proportions. There is no means of bringing reinforcements to them by sea. The Japanese hold complete command of the Bay of Bengal and only trickles of man and supplies can come over the mountain roads and tracks from Assam.'

বর্মার খবর কি?

মোটেই আশাপ্রদ নয়। এমন কোন খবরই আমার কাছে নেই, যা শুনে

মাননীয় সদস্যগণ এতটুকুও উৎসাহ বোধ করতে পারেন। বরং এই পর্যন্ত আমরা আশা করতে পারি যে, আমাদের সেনাবাহিনীর পশ্চাদপসরণের কাজটি যত ধীরে-সুস্থে ঘটে, ততই মঙ্গল। তার গুরুত্ব অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হতে পারে।

'I cannot encourage the House to expect good news from the Burma theatre. The best that can be hoped for is that the retreat will be as slow as possible and give time for other factors to make their weight tell.'

[Secret Session Speeches : Churchill : P.—43-58]

ক্ষয়-ক্ষতি এখানেই শেষ হল না, মল্লিকা। ত্রিঙ্কোমালি আক্রান্ত হয়েছিল ৯ই এপ্রিল।

আর ১১ই এপ্রিল। সেদিন কি হল?

হবে আবার কি? যা হয়ে আসছে এতদিন, তাই হল। আবার কপাল ভাঙল ব্রিটিশের।

এ ঘটনা ঘটেছিল একেবারে আমাদের ঘরের সামনে, উড়িষ্যার উপকূল থেকে সামান্য কিছু দূরে।

সেদিন ব্রিটিশ নৌ-বহরের বিরাট একটা কনভয় এগিয়ে চলেছিল উড়িষ্যার উপকূল ধরে। ডেস্ট্রয়ার, ক্রুজার, বিমানবাহী জাহাজ সব কিছুই ছিল সেই কনভয়ের মধ্যে।

সকাল তখন প্রায় আটটা। দিব্যি নিশ্চিন্তমনে জাহাজগুলি এগিয়ে চলেছে বঙ্গোপসাগরের ঢেউ ভেঙে। যুদ্ধ চলেছে অনেক দূরে। এখানে তেমন কোন আশঙ্কা নেই। সুতরাং নিশ্চিন্ত।

হঠাৎ এক সময়ে জাহাজের সবগুলি বিপদ-জ্ঞাপক সাইরেন আর্তনাদ করে উঠল—উঁ-উঁ-উঁ-উঁ...

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পড়ে গেল প্রতিটি জাহাজের অভ্যন্তরে।

বিমান! বিমান! বিমান! জাপানী বিমান! হুঁশিয়ার! বিমান-ধ্বংসী কামান নিয়ে সবাই তৈরি হও।

বেশি নয়, একটি মাত্র বিমান। তাও বম্বার নয়, পর্যবেক্ষণকারী সাধারণ বিমান। বার দুয়েক চক্কর খেয়ে কি ভেবে বিমানটি আবার এক সময়ে মিলিয়ে গেল দূর-দিগন্তে। ভাবটা এই যে, যাবে কোথায়! দাঁড়াও, সবাইকে ডেকে আনছি। তখন দেখা যাবে!

কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই এসে হাজির। মোট তিনটি আক্রমণকারী জাহাজ। তার মধ্যে দুটি বড় ক্রুজার ও একটি ডেস্ট্রয়ার।

মুহূর্তে ত্রিভুজাকৃতি ব্যূহের আকারে দাঁড়িয়ে তিনটি জাহাজই একসঙ্গে আগুন ছড়াল—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

ঘটনাটা যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি আকস্মিক।

এত আকস্মিক যে, প্রত্যুত্তরে একটি গোলাও বর্ষণ করা সম্ভব হল না ব্রিটিশ কনভয় থেকে। তার কোন সুযোগই পেল না তারা।

ফলে, যা হবার তাই হল। মাত্র আধঘণ্টার মধ্যেই ব্রিটিশ ক্রুজারের 'ডরসেটসায়ার' ও 'কর্ণওয়াল', বিমানবাহী জাহাজ 'হারমিস' এবং আরো ছ'টি জাহাজ নিমজ্জিত হল বঙ্গোপসাগরের অতল তলে।

৩০শে এপ্রিল হাতছাড়া হল উত্তর ব্রহ্মের লাসিও। ২রা মে মান্দালয়।

তবে মান্দালয় শহরের বিশেষ কিছুই তখন আর অবশিষ্ট ছিল না। সব কিছুই তার পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল বোমার আগুনে। সংবাদপত্রের ভাষায়ঃ 'No one, not even a dog, could be seen in the streets.'

৯ই মে ব্রহ্মদেশের লাটসাহেব তাঁর লাটগিরিকে লাটে তুলে দিয়ে পালিয়ে এলেন ভারতবর্ষে।

দুই সামরিক ভাগ্য-বিধাতা জেনারেল আলেকজান্ডার এবং জেনারেল স্টিলওয়েলও একদিন দুর্গম পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে কোনরকমে প্রাণ নিয়ে মণিপুরে এসে পা দিলেন গোটা ব্রহ্মদেশকে জাপানীদের হাতে তুলে দিয়ে। অনেক যুদ্ধ হয়েছে! আর নয়!

শুরু হয়েছিল ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ সালে। শেষ হল ১৭ই মে, ১৯৪২ সালে।

মাত্র পাঁচ মাস। এই পাঁচ মাসের মধ্যেই ব্রিটিশকে মালয়, সিঙ্গাপুর, বর্মা ইত্যাদি উপনিবেশগুলি হারাতে হল জাপানীদের কাছে।

বাকি রইল শুধু ভারতবর্ষ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শেষ ঘাঁটি—ভারতবর্ষ।

এবার আমাকে একটু পিছিয়ে যেতে হবে, মল্লিকা। কারণ, জাপানীদের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে ইতিমধ্যে আমি এত দূর এগিয়ে গিয়েছি যে, পেছনের অনেক কথাই তোমাকে বলা হয়নি। এবার সে-সব কাহিনী তোমাকে শোনাব একে একে।

হংকং-এর পতন হয়েছিল ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৪১ সালে।

সুভাষের পক্ষেও কিন্তু, এ তারিখটা কম উল্লেখযোগ্য ছিল না, মল্লিকা।

ইতিমধ্যে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে উঠেছে সুদূরে জার্মানীতে। সার্থক হয়েছে তিল তিল করে গড়ে ওঠা বহুদিনকার স্বপ্ন।

এবার তাদের শিক্ষার কাজ।

কূটনীতি হিসেবে ব্রিটিশ এসব ভারতীয় সৈন্যদের একমাত্র রাইফেল চালনা ছাড়া আর কিছুই শেখায়নি বলতে গেলে। কারণ,—সেই ভয়। কি জানি, যদি কোনদিন ওরা বিগড়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় তাদের বিরুদ্ধে!

কিন্তু এ যুদ্ধ আগেকার সেই পরিখা-যুদ্ধ নয়, যান্ত্রিক যুদ্ধ। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হলে উপযুক্ত শিক্ষা থাকা প্রয়োজন।

শিক্ষার জন্য প্রথমে মাত্র পনেরো জনের একটি দলকে পাঠানো সাব্যস্ত হল লিজিয়নের হেড-কোয়ার্টার ফ্রাকেনবুর্গ ক্যাম্পে।

তারিখটা ছিল ২৫শে ডিসেম্বর।

সমস্ত প্রবাসী ভারতীয়গণ সেদিন এসে সমবেত হলেন পনেরো জনের সেই ছোট্ট দলটিকে সংবর্ধনা জানাতে। বিদায় বন্ধুগণ, বিদায়। আমরা তোমাদের কোনদিন ভুলব না। তোমাদের যাত্রা শুভ হোক! আবার তোমরা আমাদের মাঝে ফিরে এসো শিক্ষা সমাপ্ত করে। আমরা তোমাদের পথ চেয়ে থাকব।

আর সুভাষ! আক্রমণোদ্যত বাঘ আঁকা ব্যাজের সঙ্গে একটি করে ফুল তিনি সেই পনেরো জনকে পরিয়ে দিলেন নিজের হাতে। এই নাও বন্ধুগণ! এই একটি মাত্র ফুল ছাড়া তোমাদের দেবার মতো আজ আর আমার কিছুই নেই।

সামরিক কায়দায় নেতাজীকে অভিবাদন জানিয়ে শুরু হল তাদের ঐতিহাসিক যাত্রা—লেফ্‌ট্‌-রাইট, লেফ্‌ট্‌-রাইট, লেফ্‌ট্‌...

শেষ পর্যন্ত সুভাষ তাকিয়ে রইলেন তাদের চলার পথের দিকে। দুচোখে তাঁর আনন্দাশ্রু। জয় হোক! জয় হোক! স্বাধীনতার অগ্রদূত তোমরা। তোমাদের এই ঐতিহাসিক যাত্রা সার্থক হোক। ভারত স্বাধীন হোক !!

'Netaji in his capacity as the leader and originator of this idea spoke in very touching language. He blessed the Legion, the first of its kind in the history of the struggle for Indian freedom.

One could never have dreamt of raising a trained military force of this type even in India under the British rule although many a national leader would have been glad to lead one.

With a heavy heart Netaji took leave of this first batch of volunteers of this Legion and christened this organisation as Azad Hind Fauz. Tears of joy stood in his eyes.'
[Ganpuley: P.—73]

এবার তোমাকে একবার পিছিয়ে যেতে হবে, মল্লিকা। পিছিয়ে যেতে হবে ১৯২৮ সালে পার্ক সার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের সেই অধিবেশনে।

লেফ্‌ট্‌-রাইট—লেফ্‌ট্‌-রাইট—লেফ্‌ট্‌-রাইট—লেফ্‌ট্‌...

তালে তালে এগিয়ে চলেছে হাজার হাজার তরুণ যুবক। এগিয়ে চলেছে সুসজ্জিত নারী বাহিনী। এগিয়ে চলেছে অশ্বারোহী বাহিনী, মোটর সাইকেল বাহিনী, মেডিক্যেল কোর বাহিনী, এগিয়ে চলেছে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে সুভাষের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি—'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'।

দেখে সবাই উচ্ছ্বসিত। কি সংবাদপত্র, কি ভারতের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ, সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। হ্যাঁ, এই তো চাই। এই তো হওয়া উচিত। এমনি নিয়ম-শৃঙ্খলাই তো আজ সবচাইতে বেশি প্রয়োজন। সুভাষ দেখালে বটে।

শুধু খুশি হতে পারলেন না একজন। তিনি হলেন অহিংস মন্ত্রের ঋষি গান্ধীজী। তাঁর মতে এসবই হল—'পার্ক সার্কাসের সার্কাস'।

১৯২৮ থেকে ১৯৪১। মাঝে ক' বছরই বা! পার্ক সার্কাসের সেই সার্কাসটাকে বাস্তবে রূপায়িত করে তুলতে খুব একটা দেরী হয়েছিল কি মল্লিকা?

যাক, পরের কাহিনী শোন। প্রথম বাহিনীকে সংবর্ধনা জানানো হল ২৫শে ডিসেম্বর। পরদিন ভোরে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা গেল এ্যানহলটার রেলস্টেশনে।

সে কি দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সেদিন গোটা জার্মানী জুড়ে! সকাল থেকে ঝুর-ঝুর করে বরফ ঝরছে তো ঝরছেই। এ আবহাওয়ার মধ্যে বাইরে পা বাড়ানোও মুশকিল।

তবু সব কিছু অগ্রাহ্য করে প্রতিটি ভারতবাসী সেই প্রথম বাহিনীকে বিদায় দেবার জন্য এ্যানহলটার রেলস্টেশনে গিয়ে হাজির। দেখে কে বলবে যে, এটা বিদেশ! মনে হয়, এ যেন আমাদেরই দেশের কোন রেলস্টেশন। মুখে তাদের একই ধ্বনি। আজাদ হিন্দ্ জিন্দাবাদ! ইনক্লাব জিন্দাবাদ! নেতাজী জিন্দাবাদ!

'On such a wintry cold morning of 26th December all the Indian residents of Berlin gathered on the Anhalter station to see the first batch...For a time Anhalter station was a scene of an Indian platform.

There was a lot of handshaking and embracing in Indian fashion. It was full of cheerful enthusiasm, the young men leaving for their military camp, were already feeling like great heros.

The train moved out of the station in the midst of loud cheers of 'Azad Hind Zindabad', 'Inquilab Zindabad', 'Netaji Zindabad'." [Ganpuley : P.—76]

একই সময়ে আরো দুজন স্বেচ্ছাসৈনিক পাঠানো হল অন্য একটি শিক্ষা-কেন্দ্র Messeritz ক্যাম্পে।

এত অল্পতে খুশি নন সুভাষ।

এ আর কতটুকু! সবে তো শুরু মাত্র। একে পরিপূর্ণভাবে রূপ দিতে হলে আরও অনেক কিছুই চাই যে! তাই আবার নির্দেশ গেল জার্মানীর সেই বৈদেশিক দপ্তরের কাছে।

লামসডর্ফ ক্যাম্প ও আফ্রিকার সাইরোনাইকা বন্দী-নিবাসের সমস্ত ভারতীয় সৈন্যদের আমার চাই। সবাইকে নিয়ে এস ড্রেসড্রেনের আনাবুর্গ ক্যাম্প বন্দী-নিবাসে। অবিলম্বে।

ফিল্ড-মার্শাল রোমেল মিশরের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছেন।

ওখান থেকে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্যারাসুটবাহী সৈন্যদের ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে নামিয়ে দেবার এই তো অপূর্ব সুযোগ!

ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশের অধীনস্থ সেনাবাহিনী নিশ্চয়ই তখন তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে।

কেন দেবে না? তারাও যে ভারতীয়। ভারতের স্বাধীনতা তাদেরও কি কাম্য নয়? দেশ শত্রু-কবলমুক্ত হোক, তারাও কি তা চায় না?

চাই প্রচার। তেমনভাবে বোঝাতে পারলে একদিন না একদিন তারা ঘুরে দাঁড়াবেই।

কেটে গেল আরো কয়েক সপ্তাহ।

আজাদ হিন্দ্ সংঘ, বেতার এবং সেনাবাহিনীর প্রস্তুতির কাজ নিয়ে সুভাষ তখন অত্যন্ত ব্যস্ত। শুধু কাজ—কাজ আর কাজ! নিরবচ্ছিন্ন কাজ।

মাঝে মাঝে যেতে হয় বাইরে। কখনো হামবুর্গের সংগ্রহশালায়। তন্ন-তন্ন করে সেখানে খুঁজে দেখেন ভারতের অর্থনীতি ও কৃষি সম্বন্ধে নানাবিধ গবেষণামূলক গ্রন্থ। জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা। সঞ্চয়ের ঝুলি ভরা যাক। দেশ স্বাধীন হবার পরে এসব অভিজ্ঞতা কাজে আসবে।

কখনো বা চেকোশ্লোভাকিয়ার বিখ্যাত অস্ত্র তৈরির কারখানা স্কোডায়। শুধু কৃষি বা অর্থনীতির দিক থেকেই নয়, স্বাধীন ভারতকে একদিন অস্ত্র-বলেও বলীয়ান হয়ে উঠতে হবে। সুতরাং সব কিছুই দেখে রাখা দরকার।

একটু ফাঁক পেলেই ছুটে যান আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সেই শিক্ষাশিবিরে। এ যে তাঁর নিজের হাতের গড়া। নিজের সৃষ্টি। যত কাজই থাক না কেন, নিজের সন্তানসম এই জওয়ানদের কাছ থেকে তিনি দূরে সরে থাকবেন কি করে?

সে কি আনন্দ-উচ্ছ্বাস তখন জওয়ানদের! নেতাজী! নেতাজী! নেতাজী এসেছেন! আমাদের নেতাজী!

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের জার্মান ট্রেনার ওয়ালটার হারবিচ্-এর ভাষায়ঃ

'Whenever his busy routine permitted it, His Excellency Bose, with several gentlemens from the Free India Centre, came to the fellowship evenings which were held at regular but long intervals and was happy to find the Indian soldiers in a relaxed mood and happy spirits. The performance (theatre, music, songs, sketches etc.) during the fellowship evenings were of a pleasing character'.

[Netaji in Germany : Walter Herbich : P.—45]

দিনের পর রাত্রি। আবার রাত্রিও এক সময়ে হারিয়ে যায় নতুন দিনের সমারোহে।

হঠাৎ একদিন কি শুনে দারুণভাবে চঞ্চল হয়ে উঠলেন সুভাষ। কে! কে! কে কথা বলছে! কার কণ্ঠ ভেসে আসছে দূরাগত কল্লোলের মতো?

তোজো! তোজো! তোজো! জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো!

সিঙ্গাপুরের পতন হয়েছে। ভেসে আসছে তোজোর এক ঐতিহাসিক ঘোষণা।

ভারত, ভারতবাসীদের জন্য। সামনে তার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। জাপান আশা করে, ভারত এবার নিজেকে তার উপযুক্ত মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

'It is a golden opportunity for India having, as it does, several thousand years of history and splendid cultural tradition, to rid herself of the ruthless despotism of Britain and participate in the construction of the Greater East Asia Co-prosperity Sphere.

Japan expects that India will attain her proper status as India for the Indians and will not stint herself in extending assistance to the patriotic efforts of the Indians.

Should India fail to awaken to her mission for getting her history and tradition and continue as before to be beguiled by the British cajolery and manipulation and act at their beck and call, I cannot but fear that an opportunity for renaissance of the Indian people would be forever lost.'

[Chalo Delhi: S. A. Das & K. B. Subbaiah: P.—11-12]

দেয়ালে টাঙানো ভারতবর্ষের বিরাট মানচিত্রটির দিকে একদৃষ্টে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সুভাষ। মাথার মধ্যে ক্রমাগত ঘূরপাক খেয়ে চলেছে সেই একটি মাত্র কথা :

India for the Indians! India for the Indians! India for the Indians!

India for the Indians!

ওদিকে সেই একইভাবে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী, জাপান প্রবাসী মহানায়ক রাসবিহারী বসু।

চঞ্চল হয়ে উঠেছেন রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, স্বামী সত্যানন্দ পুরী (প্রফুল্ল সেন), দেবনাথ দাস, আনন্দমোহন সহায়, এন. রাঘবন ও দেশপাণ্ডে প্রমুখ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশপ্রেমিক ভারতীয়গণ।

আর চঞ্চল হয়ে উঠেছেন গিয়ানী প্রীতম সিং এবং ক্যাপ্টেন মোহন সিং।

সর্বত্র জাপানীদের জয়-জয়কার। গিলবার্ট, গুয়াম, ফিলিপাইন, বোর্নিও,

নিউগিনি, পেনাং, সুমাত্রা, বলিদ্বীপ, জাভা, বাটাভিয়া, প্রতিটি ক্ষেত্রে জাপানী-দের শুধু জয় জয় আর জয়!

আর মিত্রশক্তি! সর্বত্র তাদের প্রচণ্ড মার খেতে হয়েছে জাপানীদের কাছে। কোথাও তারা দাঁড়াতে পারেনি জাপ-যোদ্ধাদের সামনে। একটি ক্ষেত্রেও না।

সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর ব্রিটিশ-সিংহ এখন রিক্ত, হৃতসর্বস্ব, নখদন্ত-হীন।

এই তো সুযোগ। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের এই চরম সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লক্ষ লক্ষ প্রবাসী ভারতীয়কে সঙ্ঘবদ্ধ করে তুলতে হবে। ডেকে বলতে হবে—ভয় পেও না তোমরা। সোজা হয়ে দাঁড়াও। এসো, হাতে হাত মেলাও!

উৎসাহ আরো শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে জাপ-প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজোর সাম্প্রতিক ঘোষণার ফলে।

১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি ঘোষণা করেছেন তাঁর নতুন নীতির কথা। ভারত ভারতীয়দের জন্য। সামনে তাঁর সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। জাপান আশা করে, ভারত এবার নিজেকে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

'It is a golden opportunity for India...Japan expects that India will restore its proper status as India for the Indians'.

আবার নতুন করে বলেছেন ১২ই মার্চ তারিখে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, 'ভারত ভারতীয়দের জন্য'—এ নীতি কার্যকরী করে তুলতে হলে এই হল উপযুক্ত সময়।

চল্লিশ কোটি ভারতবাসী এই আশাই পোষণ করে আসছে বহু দিন ধরে।

'It is my firm belief that now is the time to establish India for the Indians, which has for many years been the aspiration of the 400 million Indian people'.

গ্রেট ব্রিটেন দীর্ঘকাল ধরে ভারতকে ঠকিয়ে এসেছে এবং ভারতের ওপর তাদের স্বেচ্ছাচারী শাসন চালিয়ে এসেছে। গত বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ ভারতকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, প্রতিদানে ভারত কি পেয়েছিল, আমার বিশ্বাস ভারত-বাসীর স্মৃতিতে এখনো তা উজ্জ্বল হয়ে আছে।

'Great Britain has for long deceived and continued her arbitrary rule over India. What was the reality of the British promise made to India in the last Great War must be still fresh. I believe, in the memory of the Indian people'.

৯ই এবং ১০ই মার্চ মালয় সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এন. রাঘবনের আহ্বানে বিভিন্ন স্থানের প্রতিনিধিবৃন্দ জড় হলেন সিঙ্গাপুরে।

বলো, আমাদের এখন কি করা উচিত। যে ব্রিটিশ আমাদের কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে সবার আগে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছে, এর পরেও তাদের প্রতি আমাদের আনুগত্যের আর কোন কারণ থাকতে পারে কি?

উত্তর পাওয়া গেল ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর কথায়ঃ

'ব্রিটিশ তার দায়িত্ব পালন করেনি। যেদিন এভাবে আমাদের ফেলে রেখে তারা পালিয়ে গেছে, সেইদিন, সেই মুহূর্তেই তাদের প্রতি আমাদের আনুগত্য শেষ হয়ে গেছে।

এতদিন তারা আমাদের বুঝিয়েছিল যে, এ যুদ্ধ নাকি স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং এমনি সব বড় বড় আদর্শের জন্য। তাই যদি হয়, তবে যে স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসীকে তারা রক্ত দিতে বলেছে, সেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্নটা তারা ভেবে দেখতে রাজী নয় কেন? স্বাধীনতাকামী হাজার হাজার ভারতবাসীকেই বা তারা কারারুদ্ধ করেছে কেন?'

ডাক পাঠালেন মহানায়ক রাসবিহারী বসু। তোমরা সবাই টোকিওতে এসো ভাই। এখানে বসেই সবাই মিলে আমরা ঠিক করব যে, কোন্ পথে আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত।

কে এই মহানায়ক রাসবিহারী বসু?

ক্যাপ্টেন মোহন সিং-ই বা কে?

কেন সেদিন মেজর ফুজিয়ারা সিঙ্গাপুরে অবস্থিত সমস্ত ভারতীয় সৈন্যদের তুলে দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর হাতে?

কি তাঁর পরিচয়?

প্রথমে শোন মোহন সিং-এর কথা।

১৯৪১ সাল। ডিসেম্বর মাস।

প্রতিটি ব্রিটিশ বাহিনী তখন মালয় থেকে পিছু হটছে জাপানীদের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে।

একইভাবে ১।১৪ নং পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট বাহিনী তখন পিছু হটতে শুরু করেছে মালয় থেকে। ছত্রভঙ্গ। ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। দিশেহারা। জাপানীরা আর দূরে নেই। এসে পড়ল বলে।

দলে রয়েছে কম্যাণ্ডিং অফিসার লেঃ কর্ণেল ফিজ প্যাট্রিক, ক্যাপ্টেন মোহন সিং, ক্যাপ্টেন মহম্মদ আক্রাম খাঁ প্রমুখ সেনানায়কবৃন্দ।

অনাহারে অনিদ্রায় সবাই তখন রীতিমত কাতর। তদুপরি কম্যাণ্ডিং অফিসার ফিজ প্যাট্রিক আহত। এক পা এগিয়ে চলাও তার পক্ষে দস্তুরমতো কষ্টকর।

এ অবস্থায় যা স্বাভাবিক, তাই হল। এক এক করে সবাইকেই সেদিন বন্দী হতে হল জাপানীদের হাতে।

এগিয়ে এলেন একজন বৃদ্ধ শিখ। ভয় পেও না তোমরা। সাহস হারিও না। সুদিন আবার আসবে।

মোহন সিং অবাক। কে এই সদানন্দ বৃদ্ধ! দেখেই বোঝা যায় যে, সাধুসন্ত মানুষ। কি নাম ওঁর?

আমার নাম প্রীতম সিং। গিয়ানী প্রীতম সিং। তোমরা সবাই এসো আমার সঙ্গে। দ্বিধার কোন কারণ নেই। নির্ভয়ে চলে এসো।

কোথায়! মোহন সিং অবাক।

মেজর ফুজিয়ারার কাছে। সবরকম বোঝা-পড়াই তাঁর সঙ্গে আমার হয়েছে। এলেই সব জানতে পারবে।

যেতে যেতে সব কথাই জানতে পারলেন মোহন সিং। স্বাধীনতাকামী বৃদ্ধের একমাত্র সাধ, বন্দী সৈন্যদের সাহায্যে একটি মুক্তিফৌজ গঠন করে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ কবল থেকে মুক্ত করা। এ ব্যাপারে সব রকম সহায়তা করতে মেজর ফুজিয়ারা তাঁর কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ।

কাজও শুরু হয়ে গেছে ভেতরে ভেতরে। ইতিমধ্যেই একটি 'ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ' গড়ে উঠেছে উভয়ের প্রচেষ্টায়। লক্ষ্য সেই একই। অর্থাৎ— ভারতভূমি থেকে ব্রিটিশ প্রভুত্ব দূর করা।

কিন্তু তোমাদের বিশ্বাস কি? খোলাখুলিভাবেই মোহন সিং প্রশ্ন রাখলেন মেজর ফুজিয়ারার কাছে, ব্রিটিশের মতো তোমরাও যে একদিন সেই একই ভূমিকায় দেখা দেবে না. তার গ্যারান্টি কোথায়?

এটা সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন। যুক্তি দেখালেন মেজর ফুজিয়ারা, তেমন কোন উদ্দেশ্য থাকলে তোমাদের সহযোগিতার কি প্রয়োজন! জাপানের নিজের শক্তিই কি সেখানে যথেষ্ট নয়?

মানলাম, কিন্তু এর পেছনে তোমাদের কোন লাভের প্রশ্নই কি নেই?

আছে বৈকি! আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, এশিয়া ভূখণ্ড থেকে ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুত্বকে চিরতরে নির্মূল করে 'বৃহত্তর এশিয়া' পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে তোলা। তাতে শুধু আমরাই উপকৃত হবো না, উপকৃত হবে এশিয়া ভূখণ্ডের প্রতিটি রাষ্ট্র।

প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা শেষ করে অবশেষে রাজী হলেন মোহন সিং। বেশ, তাই হোক। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য আমি সব কিছুই করতে প্রস্তুত।

শুরু হল নতুন জীবন। শুরু হল জীবনের এক নতুন অধ্যায়।

সবাইকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে। সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে ছত্রভঙ্গ ভারতীয় সেনাবাহিনীকে। বসে থাকলে চলবে না। সময় যে বয়ে যায়!

ওদিকে তখন জাপ বাহিনী দুর্বার বেগে এগিয়ে চলেছে সিঙ্গাপুরের দিকে। কণ্ঠে তাদের একই সুর। 'সিঙ্গাপুর এ কোসিন'! চলো সিঙ্গাপুর! চলো সিঙ্গাপুর! চলো সিঙ্গাপুর!

পেছনে পেছনে চলেছেন মোহন সিং, রাসবিহারীর বিশ্বস্ত সহকর্মী দেবনাথ দাস ও আরো কয়েকজন। উদ্দেশ্য—বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্ঘবদ্ধ করা, আর অধিকৃত অঞ্চলের ভারতীয়দের ধন-সম্পত্তি এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। যুদ্ধে ক্ষয়-ক্ষতি আছেই। তবু যতটা সম্ভব ওদের সব কিছু থেকে আড়াল করে রাখতে হবে।

এমনি করে সিঙ্গাপুর।

সিঙ্গাপুরের পতন হল ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২ সালে।

সব মিলিয়ে প্রায় এক লক্ষ সৈন্যকে সেদিন বন্দী হতে হল জাপানীদের হাতে। তার মধ্যে চল্লিশ হাজারই ভারতীয়।

পরদিনই সেই চল্লিশ হাজার সৈন্যকে তুলে দেওয়া হল মোহন সিং-এর হাতে। সেনা বাহিনীর প্রতি মেজর ফুজিয়ারার নির্দেশ—আজ থেকে মোহন সিং-ই তোমাদের নেতা। তোমরা তাঁর নির্দেশ মেনে চলবে আশা করি।

মল্লিকা, এই হল মোহন সিং। আর মহানায়ক রাসবিহারী। তিনি কে?

সে কাহিনী জানতে হলে আমাদের অনেকগুলি দিন পিছিয়ে যেতে হবে, মল্লিকা। ফিরে যেতে হবে অগ্নিযুগের সেই রোমাঞ্চকর অধ্যায়ে, যা আজো অম্লান, অক্ষয় হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়।

I was a fighter.
One fight more.
The last and
The best.

Rash Behari Bose
25/11/42

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯১২ সাল।

উৎসব-মুখর দিল্লী মহানগরীকে সেদিন আর চেনাই যায় না। যেদিকে তাকানো যায়, শুধু আলো আর পতাকার সমারোহ। শুধু কালো কালো মানুষের মাথা।

সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষে ঐতিহাসিক দিল্লী দরবার। তারই শোভাযাত্রা চলেছে দিল্লী মহানগরীর রাজপথ দিয়ে।

প্রথমেই হাতির পিঠে চেপে সস্ত্রীক বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ। পেছনে প্রধান প্রধান রাজকর্মচারী, দেশীয় রাজা-মহারাজা ও মোসাহেবের দল।

এতদিন ভারতের রাজধানী ছিল কলকাতা। এবার থেকে দিল্লী। শোভা-যাত্রা শেষে বড়লাট বাহাদুর তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করবেন আনুষ্ঠানিকভাবে।

কলকাতার ছেলেদের মতি-গতি মোটেই সুবিধের নয়। ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেনের মতো ছেলেরাই সেকথা প্রমাণ করে দিয়েছে বার বার। সুতরাং একটু দূরে থাকাই ভাল। সেদিক থেকে দিল্লী অনেকটা নিরাপদ।

পথের দু পাশের বাড়িগুলোতে অসম্ভব ভীড়। ছাদে, বারান্দায়, এখানে-ওখানে কোথাও বুঝি তিল-ধারণের জায়গা নেই। শুধু মানুষ আর মানুষ!

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের তিনতলা বাড়িটাতেও সেই একই অবস্থা।

পুরুষদের স্থান একতলা ও তিনতলায়। দোতলাটা রাখা হয়েছে কেবল-মাত্র মেয়েদের জন্য। পুরুষদের সেখানে কোন প্রবেশাধিকার নেই।

কুইন্স্ গার্ডেন হয়ে শোভাযাত্রা তখন চাঁদনীচক পর্যন্ত এসে পড়েছে। ঐ যে দূরে এক বিপুল-দন্তী রাজহস্তীর পিঠে সস্ত্রীক বড়লাটকে দেখা যাচ্ছে। তাঁদের মাথার ওপর ছত্র ধরে আছে এক করদরাজ্য থেকে আগত জঙ্গী জোয়ান—মহাবীর সিং।

হঠাৎ কোথা থেকে একটি সুবেশা তরুণী এসে আশ্রয় নিল দোতলার বারান্দায়। সে কি তার মন-ভোলানো রূপ! স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যে ভরপুর যৌবনের উজ্জ্বল একটি শিখা যেন।

তোমার নাম কি বহিন? বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন জনৈকা গুজরাটী মহিলা।

নাম? হাসলেন তরুণীটি, মেরা নাম লীলাবতী।

শোভাযাত্রা এসে গিয়েছে। দোতলার ঠিক নিচেই হাতির পিঠে উপবিষ্ট সস্ত্রীক বড়লাট।

সত্যিই অপূর্ব। এত জাঁকজমক, এত সমারোহ, এত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ইতিপূর্বে দিল্লীর ইতিহাসে আর কোনদিনও দেখা যায়নি।

সহসা গোটা রাজপথ থর থর করে কেঁপে উঠল প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দে—বুম্ম্ম্ম্!

কি হল কিছুই দেখা গেল না। কিছুই বোঝা গেল না। শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া! সব কিছুই ঢাকা পড়ে গেল নিশ্ছিদ্র কালো ধোঁয়ার অন্তরালে।

তবে এটুকু বোঝা গেল যে, কলকাতার মতো দিল্লীও আর নিরাপদ নয়।

শুরু হল চিৎকার, চেঁচামেচি আর হৈ-চৈ। পালাও! পালাও! বাঁচতে চাও তো এক্ষুণি পালাও! আর এক মুহূর্তও এখানে নয়।

নিচে তখন চরম বিশৃংখলা। চারিদিক ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় একাকার। দুহাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যায় না। তার মধ্যে সবাই ঠেলাঠেলি করে পালাতে ব্যস্ত। এ ব্যাপারে রাজা-মহারাজদের উৎসাহটাই দেখা গেল সবচাইতে বেশি। প্রাণে বাঁচলে তবে তো দরবার!

বিশৃংখলা আরো শতগুণ বাড়িয়ে তুলল মিছিলের সুসজ্জিত হাতি-গুলি। হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে সে কি তাদের উন্মত্ত ছোটাছুটি! ফলে, তাদের পায়ের চাপে কত লোক যে জখম হল, তার বোধ হয় কোন গোনাগুনতিই নেই।

ধোঁয়া সরে যেতেই দেখা গেল এক বীভৎস দৃশ্য।

হাতির মাহুতটি মারা পড়েছে। লাট-বাহাদুরের অবস্থাও প্রায় লাটে ওঠবার মতো।

বোমার একটা টুকরো তাঁর পিঠের মাংস ছিঁড়ে কাঁধের ওপরে উঠে গিয়ে মস্তবড় একটা ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। প্রচুর রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে সেই ক্ষত-স্থান থেকে। তাছাড়া ঘাড়ে এবং দেহের এখানে-ওখানে অসংখ্য আঘাত। কি হবে বলা শক্ত।

ছুটে এলেন এক বিশিষ্ট রাজপুরুষ কর্ণেল ম্যাক্সওয়েল। তারপরই তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। ফলে, আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হল না। তাঁর হয়ে সে-কাজ সম্পন্ন করলেন অন্য একজন রাজপুরুষ।

আশ্চর্য! এই হট্টগোলের মধ্যে সেই সুবেশা তরুণী লীলাবতী যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, কেউ তা টের পেল না। খেয়ালই করল না কেউ।

তবে কি সে-ই বোমাটি নিক্ষেপ করেছিল দোতলা থেকে? না কি অন্য কেউ?

অনেক গবেষণা। অনেক তদন্ত। কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা গেল না।

আক্রোশে ফেটে পড়লেন শাসক-সম্প্রদায়। এতবড় সাহস! শেষে কিনা সম্রাটের সর্বোত্তম প্রতিনিধি বড়লাটের গায়ে হাত দেয়! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজাটা!

বটেই তো! বটেই তো! সঙ্গে সঙ্গে পোঁ ধরলেন দেশীয় রাজা-মহা-

রাজার দল। এ কি অন্যায় কথা! বড়লাট বাহাদুর না থাকলে আমাদের খেতাব দেবে কে? নাঃ! এবারের দরবারটাই মাঠে মারা গেল দেখছি!

সবাইকে ছাপিয়ে গেলেন সরকার বাহাদুরের একান্ত অনুগত ভক্ত, দেরাদুন বন-বিভাগের এক বিশিষ্ট কর্মচারী রাসবিহারী বসু।

রাজকর্মচারীদের উপস্থিতিতে দেরাদুনে অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ-সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে সে কি তাঁর গরম গরম তর্জন-গর্জন! সে কি প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন।

ধিক সেই পাষণ্ড আততায়ীকে, যে মহামান্য বড়লাট বাহাদুরকে এমন ঘৃণ্য পন্থায় আক্রমণ করেছে! একজন রাজভক্ত প্রজা হিসেবে আমার একমাত্র অনুরোধ, আততায়ীকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে চরম শাস্তি দেওয়া হোক!

বলতে বলতে রাগে দুঃখে কেঁদে ফেললেন রাসবিহারী। তারপরই সভামঞ্চ থেকে নিচে নেমে এলেন চোখের জল মুছতে মুছতে।

কাণ্ড দেখে শাসক-সম্প্রদায় প্রশংসায় পঞ্চমুখ। রাসবিহারীর সত্যিই তুলনা হয় না বেশ বোঝা যায় যে, আঘাতটা ওঁর খুবই লেগেছে।

লাগবেই তো! এমন রাজভক্ত প্রজা ক'জন আর আছেন ভারতবর্ষে!

প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীদের সঙ্গে সর্বদাই তাঁর দহরম-মহরম। সবাই তাঁর বন্ধু। সবাই তাঁর নামে অজ্ঞান। এমন কি, শ্বেতাঙ্গ-সম্প্রদায়ের মধ্যমণি স্বয়ং ভারত সরকারের মিলিটারি সেক্রেটারি পর্যন্ত রাসবিহারীর ভক্ত। নিজে তিনি বাংলা শেখেন তাঁর কাছে।

শুধু কি তাই! কি করে বাংলার বিপ্লবীদের দমন করা হবে, সে সম্বন্ধেও তাঁর শ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতা হলেন রাসবিহারী। কতদিন তিনি এই নিয়ে কত গুরুতর পরামর্শ করেছেন রাসবিহারীর সঙ্গে! কত গল্প!

এহেন রাসবিহারী যে বড়লাটের ওপর এই ঘৃণ্য আক্রমণে খুবই মর্মাহত হবেন, তাতে আর বিচিত্র কি!

কিন্তু কে এই আক্রমণকারী?

কি তার নাম?

সুবেশা তরুণী লীলাবতীই বা কোথায় গেল?

এই মহাযজ্ঞের প্রধান হোতাই বা কে?

অনেক চেষ্টা করেও এ প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া গেল না। রহস্য যেমন ছিল তেমনিই রয়ে গেল।

১৯১৩ সালের ২৪শে জানুয়ারি পুরস্কার হিসেবে বিরাট টাকার অঙ্ক ঘোষণা করা হল সরকারী তরফ থেকে। আততায়ীকে তোমরা ধরিয়ে দাও। আমরা তোমাদের একলক্ষ টাকা দেবো। কথা দিচ্ছি।

কোথায় আততায়ী, কোথায় কি! হাজার চেষ্টা করেও পুলিশ কোন সূত্র খুঁজে পেল না আততায়ী সম্বন্ধে।

১৭ই মে তারিখে আবার বোমা নিক্ষিপ্ত হল লাহোরের লরেন্স গার্ডেন্স্-এ অবস্থিত পুলিশ ক্লাবে। লক্ষ্য, শ্রীহট্টের প্রাক্তন এস. ডি. ও.,

বর্তমানে পাঞ্জাবের সহকারী কমিশনার মিঃ গর্ডন। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার দরুন প্রাণ দিতে হল ক্লাবের একজন চাপরাশিকে।

পুলিশ বিভাগ দিশেহারা। এই সেদিন দিল্লীতে এতবড় একটা ব্যাপার ঘটে গেল, আবার এর মধ্যেই কিনা লাহোরে এই কাণ্ড! নাঃ! যে করে হোক, এ রহস্য ভেদ করতেই হবে।

রহস্যের অবগুণ্ঠন খুলল দীর্ঘ একবছর বাদে কলকাতার রাজাবাজারে।

তারিখটা ছিল ১৯১৩ সালের ২১শে নভেম্বর। অনুশীলন সমিতির পলাতক বিপ্লবী অমৃত হাজরার খোঁজে হঠাৎ সেদিন ১৯৬।১ নম্বর আপার সার্কুলার রোডের একটা গোপন আস্তানায় পুলিশ গিয়ে হাজির। কোথায় অমৃত হাজরা? ধরো তাকে।

ফল হল মারাত্মক। দেখা গেল যে, ১৯৬।১ নম্বরের এই গুপ্ত আস্তানাটা আসলে একটা মারাত্মক বোমা তৈরির কারখানা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু একি! সহসা কি দেখে চমকে উঠল পুলিশ বাহিনী। বোমার এই খোলগুলি কি দিল্লীতে নিক্ষিপ্ত বোমাটির মতো নয়?

ধরা পড়লেন দুর্ধর্ষ বিপ্লবী অমৃত হাজরা। ধরা পড়লেন দীনেশ দাশগুপ্ত, চন্দ্রশেখর দে, সারদাচরণ গুহ প্রমুখ আরো কয়েকজন। সেই সঙ্গে ঘর তল্লাশি করে পাওয়া গেল একটুকরো কাগজ, যার মধ্যে কতগুলো হিজি-বিজি চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নেই।

পুলিশ অবাক। এই হিজিবিজি চিহ্নগুলোর মানে কি! কি ব্যাপার!

অসাধ্য সাধন করলেন পুলিশের ডি. আই. জি. ডেনহাম। অনেক চেষ্টার পরে তিনি সক্ষম হলেন ঐ হিজিবিজি চিহ্নগুলোর মর্মোদ্ধার করতে। ওখানে লেখা রয়েছে ছোট্ট একটি নাম। আমীরচাঁদ। দিল্লীর আমীরচাঁদ। সেণ্ট জোসেফ স্কুলের শিক্ষক আমীরচাঁদ।

ধরা হল আমীরচাঁদকে। সেখানে পাওয়া গেল আরো একটি নতুন নাম। নামটি হল—দীননাথ তলোয়ার।

সঙ্গে সঙ্গে ধরা হল দীননাথ তলোয়ারকে। এবার কাজ হল। দীননাথ অপরাধ স্বীকার করলেন। ফলে, বড়লাটের ওপর বোমা নিক্ষেপের ব্যাপারে সেদিন যাঁরা জড়িত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বালমুকুন্দ, অবোদবিহারী, বসন্ত বিশ্বাস প্রমুখ সবাই ধরা পড়লেন একে একে।

আমীরচাঁদ ও তাঁর ভাইপো ধরা পড়লেন ১৯১৪ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি। বসন্ত বিশ্বাস তখন বাংলাদেশে। ২৭শে ফেব্রুয়ারি তাঁকে ধরা হল কৃষ্ণনগরে।

এবার রহস্যের অবগুণ্ঠন পুরোপুরিভাবে খুলে গেল।

জানা গেল, সেদিনের সেই সুবেশা তরুণী লীলাবতী আদপেই কোন তরুণী নন। তিনি বাংলাদেশের এক দামাল কিশোর বসন্ত বিশ্বাস। লরেন্স গার্ডেন্স্-এর পুলিশ ক্লাবে বোমা নিক্ষেপটাও তাঁরই কীর্তি। তখন তাঁর নাম ছিল 'বিষন দাস'।

আর এই মহাযজ্ঞের প্রধান হোতা কে?

তিনিও বাঙালী। নাম তাঁর রাসবিহারী। চন্দননগরের রাসবিহারী। মহামান্য সরকার বাহাদুরের একান্ত রাজভক্ত প্রজা রাসবিহারী। ভারত তথা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী।

রাসবিহারী! চেনা পরিচিত প্রতিটি মানুষ স্তম্ভিত। বলে কি! রাসবিহারী তো পুলিশের গুপ্তচর। নইলে বড় বড় সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর এত মাখামাখি কেন?

হ্যাঁ, এই ধারণাই সেদিন সবাই পোষণ করতেন রাসবিহারী সম্বন্ধে। পুলিশ রিপোর্টেও তাই লেখা রয়েছে:

'...it is the general belief there amongst the Bengali community that Rash Behari was a police spy and used to supply information to the C. I. D. officers'. [The Weekly Report of the Intelligence Branch, Bengal, dated July 20, 1914. Two Great Indian Revolutionaries : Uma Mukherjee.]

বিস্ময় সেদিন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ-এরও কম ছিল না। এ প্রসঙ্গে তিনি পরবর্তী কালে তাঁর 'My Indian Years, 1910—1916' গ্রন্থে যা লিখেছেন, তা সত্যিই বড় কৌতুকপ্রদ, মল্লিকা।

দিল্লীর ঘটনার পরে দেরাদুনে এসে রাসবিহারীকে তিনি কোন্ ভূমিকায় দেখতে পেয়েছিলেন, সেকাহিনী তাঁর নিজের মুখ থেকেই তুমি শোন:

'...when driving in a car from the station to my bunglow, I passed an Indian standing in front of the gate of his house with several others, all of whom were very demonstrative in their salaams.

On my inquiring who these people might be, I was told that the principal Indian there had presided two days before at a public meeting at Dehra Dun and had proposed and carried a vote of condolence with me on account of the attack on my life.

It was proved later that it was this identical Indian who threw the bomb at me.'

অর্থাৎ—স্টেশন থেকে গাড়ি করে বাংলোতে যাবার পথে একটা বাড়ির দরজায় আমি জনৈক ব্যক্তিকে তার কয়েকজন সঙ্গীসহ দেখতে পেলাম। তারা আমাকে সেলাম জানাচ্ছিল। শুনলাম আমার প্রতি ঐ আক্রমণের জন্য তারা নাকি দেরাদুনে একটি প্রতিবাদ-সভাও করেছিল। পরে জেনেছিলাম যে, ঐ ব্যক্তি নাকি বোমা নিক্ষেপের ব্যাপারে নাটের গুরু।

বোধহয় সবচাইতে বেশি বিস্মিত হয়েছিল শ্বেতাঙ্গ শাসকসমাজ। শ্রেষ্ঠ রাজভক্ত প্রজা রাসবিহারী কিনা আসলে শ্রেষ্ঠ রাজদ্রোহী! এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত! ঠিক আছে, ধর এবার রাসবিহারীকে।

কোথায় রাসবিহারী! দেরাদুন থেকে তল্পি-তল্পা গুটিয়ে ততক্ষণে তিনি হাওয়া। তন্ন-তন্ন করে সারা ভারত চষে ফেলা হল, কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান পাওয়া গেল না।

গর্জে উঠলেন শাসক-সম্প্রদায়। যে করে হোক রাসবিহারীর শির চাই। পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার। উহু, ওটা সাড়ে সাত হাজারই রইল। মোদ্দা কথা, তাকে চাই।

'বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ।'

সুতরাং রাজা-মহারাজরা পুনরায় ঘোষণা করলেন আরো একলক্ষ টাকা। বড়লাটের গায়ে হাত দেওয়া—একি চাট্টিখানি কথা! দেখি এত দেমাক ওর কোথায় থাকে! যে করে হোক ধরতেই হবে!

বটে! মনে মনে হাসলেন রাসবিহারী। আমাকে ধরবে! ঠিক আছে, পারো তো ধর!

শুরু হল কানামাছি খেলা। এ ঘরে পুলিশ, ও ঘরে রাসবিহারী। রাস্তার এপাশে বাদী, ওপাশে আসামী। রেলের একই কামরায় এক আসনে পুলিশের সর্বময় কর্তা, অন্য আসনে লক্ষ টাকার ফেরারী বিদ্রোহী রাসবিহারী। যেন দুটি সমান্তরাল রেখা। পাশাপাশি স্থান, তবু যেন কতদূর!

ব্যর্থতার জ্বালায় এবার যেন ক্ষেপে গেলেন শাসক-সম্প্রদায়। যেভাবে হোক ধরতেই হবে রাসবিহারীকে। ঠিক আছে, আরো পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেব। মোট সাড়ে বারো হাজার।

সেই সঙ্গে তাঁর ছবি ছাপিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হল ভারতবর্ষের সর্বত্র। এই সেই লোক। তোমরা এ'কে ধরিয়ে দাও। টাকা তো পাবেই, সেই সঙ্গে খেতাব।

সব বৃথা। কোথায় রাসবিহারী! এ যুগের সব্যসাচী রাসবিহারীকে ধরা এত সহজ নয়। সম্ভবও নয়।

সত্যিই সম্ভব নয়, মল্লিকা। ভারতের প্রায় প্রতিটি ভাষায় কথা বলতে তিনি অভ্যস্ত। তাছাড়া নিমেষে ভোল পরিবর্তন করতে যাকে বলে একজন সত্যিকারের সুদক্ষ শিল্পী।

এহেন রূপকারকে ইচ্ছা করলেই কি ধরা যায়! না কি তা সম্ভব!

তাই এত তৎপরতা সত্ত্বেও আজ লাহোর, কাল অমৃতসর, পরশু কলকাতা, চন্দননগর ইত্যাদি করে দিব্যি তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তাদের নাকের ডগার ওপর দিয়ে।

তাছাড়া কত নাম! কখনো ফ্যাটবাবু। কখনো সতীন্দ্রচন্দর। কখনো বা চুচেন্দ্রনাথ দত্ত, সতীশচন্দর বা অন্য কিছু।

কতবার মুখোমুখি হয়েছেন। কথাবার্তা বলেছেন কতবার। কিন্তু ঐ পর্যন্তই !

আশ্চর্য, কেউ তাঁকে ধরতে পারেনি। সন্দেহ পর্যন্ত হয়নি কারো।

ভারতবর্ষে রাসবিহারী তখন হিরো। কত গল্প সেদিন তাঁকে ঘিরে। কত অবিশ্বাস্য কাহিনী! হয়তো বা মুখে মুখে ছড়ানোর ফলে কিছুটা অতিরঞ্জিত হতে পারে, তবু প্রচলিত কয়েকটি ঘটনার কথা তোমাকে শোনাচ্ছি।

এ ঘটনা ঘটেছিল কাশীতে। হঠাৎ সেদিন কি দেখে চমকে উঠলেন রাসবিহারী।

বাইরে পুলিশ। গোটা বাড়িটাই তারা ঘিরে ফেলেছে। এখন উপায়!

কে আছ ভেতরে? হুঙ্কার শোনা গেল বাইরে থেকে, দরজা খোল!

বেরিয়ে এল একটি উড়ে ঠাকুর। চোখে-মুখে তার সুস্পষ্ট ভীতির ছাপ!

বেশ বোঝা যায় যে, পুলিশ দেখে সে ভয় পেয়েছে। দারুণ ভয়!

রাসবিহারী ভেতরে আছেন? প্রশ্ন করলেন পুলিশ অফিসারটি।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল উড়ে ঠাকুরটি। বাবু ভেতরেই আছেন। ঘুমো-চ্ছেন।

আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে সবাই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে।

কিন্তু কোথায় রাসবিহারী! আশ্চর্য, কেউ নেই। সেই উড়ে ঠাকুরটিও নেই। কথাবার্তার ফাঁকে কখন যে সে কেটে পড়েছে, কেউ তা খেয়াল করেনি।

আর একবার কলকাতায়। শেয়ালদা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত সেদিন পুলিশে পুলিশে একেবারে একাকার। রাসবিহারী এসেছেন। এখানেই কোথাও তিনি আশ্রয় নিয়েছেন। একেবারে পাকা খবর।

তন্ন-তন্ন করে সর্বত্র খোঁজা হল, কিন্তু কোথায় রাসবিহারী! না, কোথাও নেই।

অথচ খবর সত্যিই পাকা। কারণ, শেয়ালদা পোস্ট-অফিসের দোতালায় বসে যে প্রৌঢ় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোকটি তখন তন্ময় হয়ে বেহালায় সুর তুলছিলেন, তিনি কিন্তু আসলে স্বয়ং রাসবিহারী ছাড়া আর কেউ নন।

একবার জন্মভূমি চন্দননগরে। চারপাশে সেদিন পুলিশের দৃঢ় বেষ্টনী। মশা-মাছির পর্যন্ত এদিক-ওদিক মাথা গলাবার উপায় নেই। অভ্রান্ত খবর। রাসবিহারী এই বাড়িতেই রয়েছেন। যে করে হোক, এবার তাঁকে ধরতেই হবে।

সব বৃথা। তার আগেই কখন যে এক ফাঁকে পাখি শিকলি কেটে পালিয়ে গেল, কেউ তা টের পেল না।

কিন্তু কি করে এটা সম্ভব হল! ইতিমধ্যে একটি প্রাণীও এ বাড়ি থেকে যেতে বা আসতে পারেনি। তাহলে গেল কোথায়?

তবে কি ময়লার ঝুলি হাতে নিয়ে একটু আগে যে জমাদারটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, তিনিই সেই রূপকথার জাদুকর মহানায়ক রাসবিহারী।

রূপকথার জাদুকর। কথাটা অত্যুক্তি নয়, মল্লিকা। প্রমাণ পাওয়া গেল অন্য একটি ক্ষেত্রে। সেই মুহূর্তেই তাঁর সে বাড়ি পরিত্যাগ করা দরকার। নইলে সমূহ বিপদ।

কিন্তু যাবেন কি করে? চারিদিকেই যে পুলিশ!

সঙ্গে সঙ্গেই সমাধান। দেখা গেল, জনাকয়েক লোক একটা খাটিয়া কাঁধে নিয়ে শ্মশানের দিকে এগিয়ে চলেছে। কণ্ঠে তাদের সেই পরিচিত অন্তিম প্রার্থনা—রাম নাম সত্ হ্যায়! রাম নাম সত্ হ্যায়!

বিচিত্র মানুষ! বিচিত্র তাঁর মন। বিচিত্র তাঁর কর্মধারা। চেনা যায় না। বোঝাও যায় না।

কখনো বিদ্রোহী। কখনো পাকা অভিনেতা। আবার কখনো বা সত্যি-কারের একজন সুদক্ষ শিল্পী। মাঝে মাঝেই তখন তিনি বেহালায় করুণ সুরের মূর্ছনা তোলেন তন্ময় হয়ে। তখন মনে হয়, এই আপনভোলা মানুষটি বুঝি সংসারে একমাত্র সুর ছাড়া আর কিছুই জানেন না।

আবার কখনো বা অকারণেই দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দেন বাইরের দিকে। দূরে। বহু দূরে। আকাশের দূর-দিগন্তে।

প্রহরের পর প্রহর কেটে যায়, তবু নির্জনতার সেই মায়ালোক থেকে নিজেকে বিচ্যুত করতে এতটুকুও বুঝি ইচ্ছা হয় না তাঁর।

ইতিমধ্যে দু-দুবার গুরুতর দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে রাস-বিহারীকে।

একবার কলকাতার বাদুড়বাগান মেসে।

ঢাকা থেকে বিপ্লবী বীরেন চ্যাটার্জীর আনা একটা রিভলবার অন্য-মনস্কভাবে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে কখন যে ট্রিগারে হাত রেখেছেন, টেরও পাননি রাসবিহারী। টের পেলেন গুলির শব্দে। দেখা গেল বাঁ-হাতের তৃতীয় আঙুলটা রক্তাক্ত, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন।

সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে অন্যত্র সরিয়ে দিলেন প্রখ্যাত বিপ্লবী-নায়ক প্রতুল গাঙ্গুলী। একে গুলির শব্দ, তার ওপর আবার আহত! এরপর আর এক মুহূর্তও এখানে থাকাটা ঠিক নয়।

বাদুড়বাগান থেকে ১৯৬।১ নম্বর আপার সার্কুলার রোডের আস্তানায়।

পরিস্থিতি লক্ষ্য করে নিমেষে তৎপর হয়ে উঠলেন নলিনীকিশোর গুহ প্রমুখ দলীয় সদস্যবৃন্দ। আর দেরি নয়। এখুনি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার। অবিলম্বে।

আশ্চর্য, খবরটা কিন্তু পুলিশের কানে যেতে এতটুকুও দেরি হয়নি, মল্লিকা। প্রমাণ—গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোর্ট। স্পষ্টই সেখানে তাঁর বাঁ-হাতের তৃতীয় আঙুলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যথাযথভাবে।

উল্লেখ করা হয়েছে এমন আরো অনেক কিছুই, যা থেকে রাসবিহারীর

বৈপ্লবিক চরিত্রের অন্তত কিছুটা অংশ স্পষ্ট হয়ে উঠবে তোমার চোখের সামনে ঃ

'Fairly tall : Stoutish ; Large eyed ; Moustache recently shaved, third finger of one hand stiff and scarred as result of accident ; Aged about 30. Dressed sometimes as Punjabi and sometimes as Bengali. May probably be wandering about in the guise of a Sannyasi. Frequents Rawalpindi, Multan, Ambala, Simla, Amritsar, Gurudaspur, Ferozepur, Jhelum and Lahore. Bengali Kalibaries and colonies and Hindu Shiwalas & C., should be carefully scrutinised as well as Sarais and Railway Station.'

[Vide File No. 430/14 of the I. B. Records of the Government of West Bengal. Two Great Indian Revolutionaries : Uma Mukherjee : P.—138]

আর একবার দুর্ঘটনা ঘটেছিল কাশীর ডাঃ কালীপ্রসন্ন সান্যালের বাড়িতে। হঠাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। তবে সেদিন শুধু রাসবিহারী নন, অন্যতম সহকর্মী শচীন সান্যালও আহত হয়েছিলেন বোমা বিস্ফোরণের ফলে।

সঙ্গে সঙ্গে রাসবিহারীকে সরিয়ে দেওয়া হল অন্যত্র। সাবধানের মার নেই। বিস্ফোরণের শব্দ শুনে এক্ষুণি যে পুলিশ ছুটে আসবে না তা কে বলতে পারে!

১৯১৪ সালের ২১শে মে দিল্লীর দায়রা-জজ মিঃ হ্যারিসনের আদালতে শুরু হল বিচার।

আসামী আমীরচাঁদ, অবোদবিহারী, বালমুকুন্দ, বসন্ত বিশ্বাস ও আরো সাতজন।

ধরা সম্ভব হয়নি একজনকে। নাম তাঁর মণীন্দ্র নায়েক। চন্দননগরের মণীন্দ্র নায়েক। আসলে সেদিনের সেই মারাত্মক বোমাটি তাঁরই-তৈরি। কিন্তু পুলিশ তা জানতেই পারেনি কোনদিন।

রায় দেওয়া হল ৫ই অক্টোবর।

আমীরচাঁদ, অবোদবিহারী ও বালমুকুন্দকে দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড। বসন্ত বিশ্বাসের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। বয়স কম।—এত কম বয়সে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া সংবিধানসম্মত নয়।

দুত্তোরি তোর সংবিধান! গর্জে উঠল শ্বেতাঙ্গ-সমাজ। হলই বা বয়স কম! তা বলে এসব ডেঞ্জারাস ছেলেদের ছেড়ে দিতে হবে নাকি! ওসব চলবে না বাপু। ফাঁসির হুকুম চাই।

সুতরাং ২২শে অক্টোবর তারিখে রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা হল

পাঞ্জাব চীফ কোর্ট আদালতে। ওসব দ্বীপান্তর-টীপান্তর আমরা বুঝি না। ফাঁসির হুকুম চাই।

এবার কাজ হল। ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখে (১৯১৫ সাল) পাঞ্জাব চীফ কোর্ট মান রাখলেন তাঁর জাতভাইদের। না, দ্বীপান্তর নয়, ফাঁসিই দেওয়া হবে বাংলাদেশের ঐ দুরন্ত ছেলে বসন্ত বিশ্বাসকে।

এবার আপীল করা হল বিলেতের প্রিভি কাউন্সিলে। সঙ্গে সঙ্গেই বাতিল। না, কোন দয়া বা অনুকম্পা নয়। ঐ ফাঁসি-কাঠেই ঝুলতে হবে বসন্ত বিশ্বাসকে।

কাজেও তাই হল ১৯১৫ সালের ১১ই মে চারজনকেই ফাঁসির রজ্জু কণ্ঠে ধারণ করতে হল আম্বালা জেলের অভ্যন্তরে।

যাবার আগে রাসবিহারীর প্রধান সহকারী অবোদবিহারী রেখে গেলেন তাঁর সেই স্মরণীয় উক্তি :

'Death is for all and we shall die the death of a hero.'

রাসবিহারী কিন্তু চুপচাপ বসে নেই। মাথায় তখন তাঁর অন্য পরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজও তিনি শুরু করে দিয়েছেন বেশ কিছুদিন আগে থেকেই।

ইয়োরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। ইংরেজ এখন তার নিজের ঘর সামলাতে ব্যস্ত। এই তো সুযোগ। এই অপূর্ব সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে।

কিন্তু একাজে বিপ্লবী তরুণদলই যথেষ্ট নয়। সাহসে, শৌর্যে, বীর্যে এবং ত্যাগে বিপ্লবীদের তুলনা নেই। সত্যিকারের সৈনিকের যা কিছু থাকা প্রয়োজন সব কিছুই তাদের আছে।

নেই শুধু উপযুক্ত অস্ত্র। সে অস্ত্র রয়েছে সেনা বাহিনীর হাতে। সুতরাং তাদের দলে টানতে হবে।

অবশ্য কাজটা সহজ নয়। যুগ যুগ ধরে বিদেশীর দাসত্ব করাটা তাদের এমনই মজ্জাগত হয়ে গেছে যে, স্বাধীনতার কথা তারা ভাবতে পর্যন্ত ভুলে গেছে। ধৈর্য ও নিষ্ঠাসহকারে সেই অসম্ভবকেই আজ সম্ভব করে তুলতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তখন তারা নিশ্চয়ই সহযোগিতা করবে।

কেন করবে না? এ দেশ কি তাদের নয়?

স্বাধীনতা কি তাদেরও কাম্য নয়?

তাহলে কেন তারা সেই মহান ব্রতে আত্মনিয়োগ করবে না? নিশ্চয়ই করবে। সেভাবে তাদের গড়ে নিতে হবে।

গড়ার দায়িত্ব নেবে বিপ্লবী তরুণবৃন্দ। সবাইকে একাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

বিদেশে অবস্থিত বিপ্লবী তরুণদেরও এ সময়ে দূরে থাকলে চলবে না।

অবিলম্বে ফিরে এসে সবাইকে এ কাজে উপযুক্ত অংশগ্রহণ করতে হবে। কাউকে দূরে থাকলে চলবে না।

ডাক শুনে ছুটে এলেন ভারতের এখানে-ওখানে ছড়ানো বিভিন্ন দলের বিপ্লবী তরুণবৃন্দ।

এলেন শচীন সান্যাল, নগেন দত্ত, বিষেণ সিং, জগৎ সিং, সুরণ সিং, হর-নাম সিং, দামোদর স্বরূপ, বিনায়ক রাও কাপলে, বিভূতি হালদার, প্রিয়নাথ, বিশ্বনাথ পাঁড়ে প্রমুখ দুঃসাহসী তরুণের দল।

এলেন দিল্লা সিং, মঙ্গল পাণ্ডে, নলিনী মুখার্জী, নরেন ব্যানার্জী, আউধবিহারী, ভাই পরমানন্দ, অনুকূল চক্রবর্তী, হির্দেরাম প্রমুখ এমনি আরো অনেকেই।

বিদেশস্থ বিপ্লবীরাও পিছিয়ে রইলেন না। আমেরিকা থেকে ছুটে এলেন গদর পার্টির প্রাণ-সম্পদে ভরপুর শিখ যুবক কর্তার সিং।

একাই এলেন না, সঙ্গে নিয়ে এলেন গদর পার্টির আরো চার হাজার তরুণ শিখ। আরো বিশ হাজার শীগ্‌গিরই আসবে। তারও ব্যবস্থা করে এসেছেন তিনি।

আর এলেন পিংলে। দুরন্ত দুঃসাহসী মারাঠী যুবক—পিংলে।

দেখে আশায়-আনন্দে বুকটা ভরে ওঠা রাসবিহারীর।

অদ্ভুত ছেলে কর্তার সিং আর পিংলে। ওদের চিনতে সময় লাগে না। তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টিতেই ওদের ভেতরের চেহারাটা স্পষ্ট নজরে পড়ে।

দায়িত্ব বুঝে নিয়ে প্রথম সারির কর্মীবৃন্দ চলে গেলেন তাঁদের নিজ নিজ এলাকায়।

এবার সেনা বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ওদের মধ্যে মিশে যেতে হবে। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে হবে আপন লক্ষ্যের দিকে।

এলাহাবাদের সেনাদলের ভার নিলেন দামোদর স্বরূপ। বিভূতি হালদার আর প্রিয়নাথ নিলেন বেনারস ক্যান্টনমেন্টের দায়িত্ব। রামনগর সিক্রোলের ভার নিলেন মোট তিনজন। বিশ্বনাথ পাঁড়ে, মঙ্গল পাণ্ডে আর দিল্লা সিং। জব্বলপুরের জন্য নলিনী মুখার্জী একাই যথেষ্ট।

জলন্ধরে অবস্থিত সামরিক বাহিনীর দায়িত্ব নিলেন হির্দেরাম। ওখান-কার ডোগরা রেজিমেণ্টকে চাই-ই!

হরিচরণ হারার ও পিয়ারা সিং গেলেন কোহাটের দিকে। আর সন্ত গুলাব সিং ও হরনাম সিং গেলেন বান্নু।

ওখানকার ৩৫তম রেজিমেণ্টের সহযোগিতা দরকার।

মূলা সিং চলে গেলেন গাঁয়ের দিকে। ইঙ্গিত পেলেই তিনি গাঁয়ের কৃষকদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন লাহোর ও অমৃতসরের ওপর।

দিল্লীর সেনা বাহিনীর দায়িত্ব সন্ত বাসাখা সিং-এর ওপর।

বাংলা সম্বন্ধে প্রশ্নই ওঠে না। সেখানে বাঘা যতীন একাই একশো। আগে থেকেই দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছেন নিজেদের মধ্যে। ঠিক হয়েছে,—রাসবিহারী সেনা-বিদ্রোহের ব্যবস্থা করবেন। এদিকে বাঘা যতীনের লক্ষ্য হবে প্রধানত জার্মানী থেকে গোপনে আগত অস্ত্র-শস্ত্র বোঝাই জাহাজগুলির দিকে। বার্লিন কমিটির মাধ্যমে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হয়ে আছে। ম্যাভারিক, এস. হেনরী ইত্যাদি জাহাজগুলি এসে পড়ল বলে!

সবচাইতে গুরুদায়িত্ব নিলেন পিংলে আর কর্তার সিং। তাঁরা একই সঙ্গে আম্বালা, ফিরোজপুর, রাওয়ালপিণ্ডি, মীরাট ক্যাণ্টনমেণ্ট ইত্যাদি সেনা-নিবাস ঘুরে ঘুরে কাজ চালাবেন।

হেড কোয়ার্টার্স হবে লাহোরে। সেখানের দায়িত্ব নেবেন স্বয়ং রাসবিহারী। যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব বিনায়ক রাও কাপলের। তিনিই প্রতিটি কেন্দ্রের খবরাখবর যথাযথভাবে রিপোর্ট করবেন সর্বাধিনায়কের কাছে।

কোথায় হেড কোয়ার্টার্স, কোথায় কি।

পুলিশের কড়া নির্দেশ—কোন অচেনা অবিবাহিত লোককে লাহোরে বাড়ি ভাড়া দেওয়া চলবে না।

ভাবনায় পড়ে গেলেন রাসবিহারী। তাই তো! কি করা যায় এখন?

সমাধান করলেন দলের বিশিষ্ট কর্মী রামশরণ দাসের স্ত্রী, তোমরা বাড়ি ঠিক করো। আমি সেখানে থাকব বোসবাবুর স্ত্রীর পরিচয়ে।

তাই থেকেছেন। একদিন-দুদিন নয়, পুরো দুমাস। এতটুকুও তিনি দ্বিধা করেননি দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে।

আপত্তি করেননি রাসবিহারীও। কেনই বা করবেন? উনি যে সাক্ষাৎ মা। মা তাঁর ছেলের আশ্রয়ে থাকবেন, তাতে আপত্তি কিসের?

অদ্ভুত সাড়া পাওয়া গেল প্রতিটি সেনা-নিবাস থেকে। আমরা প্রস্তুত। ভারতের এই মুক্তি-সংগ্রামে আমরাও পিছিয়ে থাকব না। অস্ত্রের জন্য ভাবনা নেই। সব অস্ত্র আমাদের হাতে। সব আমাদের হবে।

সাঁওতাল বাহিনীও প্রস্তুত। এ দেশ আমাদের। আমরা এদেশের লোক। বিদেশীর শাসন আর আমরা মানব না।

প্রস্তুত বাংলাদেশের বিপ্লবী তরুণবৃন্দ। সর্বত্র সাজ-সাজ রব। খবর চলে গেছে দূর থেকে দূরান্তরে। তৈরি হও। আর সময় নেই।

জেলাগুলিতেও তৎপরতার অন্ত নেই। কোন্ জেলায় কতগুলো বন্দুক আছে তার সঠিক হিসেব চাই। কোন্ থানায় কতগুলি রাইফেল রয়েছে তার নির্ভুল রিপোর্ট চাই। শুধু রিপোর্ট দিলেই চলবে না, ওগুলো যে করে হোক হাত করতে হবে।

বিশেষজ্ঞদের দিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় ময়মনসিং ও রাজসাহীর সুদূরের জঙ্গলে তরুণ বিপ্লবীদের রণ-কৌশল ট্রেনিং দেবার কাজ শুরু হয়েছে। তার জন্য আরো বন্দুক, আরো রাইফেল প্রয়োজন।

পার্বত্য ত্রিপুরার বিলোনিয়া ও উদয়পুর সেণ্টারের জন্য আরো কিছু অস্ত্র-শস্ত্র চাই। সুতরাং ওগুলো হাত না করলেই চলবে না।

কাজ—কাজ আর কাজ। নিরবচ্ছিন্ন কাজ। আর সময় নেই। তার মধ্যেই যাবতীয় কাজ সেরে নিতে হবে।

বিশেষ একটি দায়িত্ব নিয়ে ঢাকার সশস্ত্র শিখ বাহিনীর কাছে ছুটে গেলেন অনুকূল চক্রবর্তী। এই দেখ ভাই লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্টের সেনানায়কের চিঠি। তিনি নিজে তোমাদের অনুরোধ করেছেন! তোমরা হাত মেলাবে না আমাদের সঙ্গে?

আলবৎ? 'হাজার কণ্ঠে গুরুজীর জয় ধ্বনিয়া তুলিল দিক।'

কিন্তু শুধু এখান থেকে আঘাত হানলেই হবে না। একই সঙ্গে বাইরে থেকেও আঘাত হানা প্রয়োজন।

আমরা প্রস্তুত। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল ব্রহ্ম, মালয় ও সিঙ্গাপুরে অবস্থিত সেনা বাহিনী। এতদিন পরের জন্য লড়াই করেছি। এবার লড়াই করব নিজের দেশের জন্য। ওদের অস্ত্র দিয়েই ওদের ঘায়েল করব।

বার্লিনে অবস্থিত রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, অজিত সিং, সুফী অম্বাপ্রসাদ প্রমুখ বিপ্লবীদেরও ব্যস্ততার অন্ত নেই।

লোকজন, অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে তুরস্ক ও কাবুল হয়ে এবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে হবে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই মহাযজ্ঞে নিজেকে নিঃশেষ করে বিলিয়ে দিতে হবে। চলো সবাই!

বিদ্রোহের ঘোষণার দিন ধার্য হল ২১শে ফেব্রুয়ারি। ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি।

ঐদিনই সবাই ঝাঁপিয়ে পড়বে ব্রিটিশ বাহিনীর ওপর। তারপরই ঐ মুষ্টিমেয় ব্রিটিশ বাহিনীকে সাগরজলে ভাসিয়ে দিয়ে সুউচ্চে তুলে ধরবে ভারতের নিজস্ব পতাকা।

বিরাট সংগঠন। পেশোয়ার থেকে শুরু করে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত বিরাট পটভূমিকা। বিরাট সংগ্রাম-প্রস্তুতি। কোথাও কোন ত্রুটি নেই।

প্রতিটি সৈন্যের জন্য নিজস্ব ইউনিফর্ম প্রস্তুত। প্রস্তুত স্বাধীন ভারতের নিজস্ব পতাকা বাহিনী। যুদ্ধ-ঘোষণার খসড়াও প্রস্তুত। বার্লিন থেকে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, অজিত সিং, সুফী অম্বাপ্রসাদও প্রস্তুত হয়ে আছেন কাবুলে এসে। এমন কি, স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার গঠনের কাজও প্রস্তুত। এখন শুধু ঝাঁপ দেবার অপেক্ষামাত্র।

আহার-নিদ্রা ভুলে গেছেন রাসবিহারী। আর দেরি নেই! লগ্ন আগত-প্রায়।

একই অবস্থা তখন পিংলে ও কর্তার সিংয়ের। বেসামরিক লোক হয়েও সামরিক বেশে সজ্জিত হয়ে তারা প্রতিটি সেনা-নিবাসে ঘুরে বেড়াচ্ছেন নিঃশঙ্ক নির্ভয় চিত্তে। আর দেরি নেই। তৈরি হও।

প্রতিটি সেনা-নিবাসে তখন সে কি উত্তেজনা! সে কি অভূতপূর্ব আলোড়ন! আর কত দেরী ভাই? কবে আমরা স্বাধীন হবো? কবে?

সহসা কৃপাল সিং ও নবাব খান নামে দুটি ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতক এগিয়ে এল গুটি-গুটি পায়ে। সবাইকে ধরিয়ে দিতে পারলে পুরস্কার মিলবে। অনেক টাকা পুরস্কার। না, এ সুযোগ ছাড়লে চলবে না।

সেনাবাহিনী অবাক। অফিসার-মহলে কিসের যেন একটা চাপা চঞ্চলতা। কেমন যেন একটা ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব। মনে হয় আড়ালে আড়ালে কিছু যেন একটা ঘটেছে। তবে কি দলের মধ্যে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে?

দ্রুত খবর চলে গেল রাসবিহারীর কাছে। পরিস্থিতি সন্দেহজনক। নির্দেশ চাই।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি জানালেন তাঁর নতুন নির্দেশ। এত চেষ্টা এত আয়োজন এভাবে ব্যর্থ হতে দেওয়া চলবে না। বরং দুদিন এগিয়ে দাও। ২১শের পরিবর্তে বিদ্রোহ ঘোষণার তারিখ হোক—১৯শে ফেব্রুয়ারি।

কিছুতেই কিছু হল না। তার আগেই অতর্কিতে ইংরেজ বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল অপ্রস্তুত ভারতীয় সেনাদলের ওপর। বাধা দেবার মতো কোন অবকাশই তারা পেল না। ফলে, সবাইকে বন্দী হতে হল একে একে।

আর একদল ভারী কামান স্থাপন করল অস্ত্রাগারের দরজায়। কাউকে এগুতে দেওয়া হবে না এদিকে। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে কামান দেগে উড়িয়ে দেওয়া হবে সবাইকে।

অবশ্য সর্বত্রই যে অপ্রস্তুত সেনাবাহিনীকে এভাবে কাবু করা সম্ভব হয়েছে, তা নয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে বাধাও পেতে হয়েছে বিস্তর।

যেম[illegible] [illegible]। কিছুতেই ওখানকার সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করতে রাজী হল না ব্রিটিশের কাছে। ফলে, প্রায় পঞ্চাশজনকে সেদিন প্রাণ দিতে হল মেসিনগানের গুলিতে।

বিপ্লবী তরুণদলও বাধা দেবার মতো কোন সুযোগ পেলেন না। একই দিনে একই সঙ্গে লাহোরের প্রতিটি বাড়ি, প্রতিটি ঘরে পুলিশ হানা দিল মাইকেল ও'ডায়ারের নেতৃত্বে।

মণিরাম ও বিনায়ক রাও কাপলের কলকাতা থেকে আনা অস্ত্র-শস্ত্রও উদ্ধার করা হল প্রচুর। আর কত যে গ্রেপ্তার করা হল তার বোধহয় কোন গোনাগুনতি নেই। কর্তার সিং প্রমুখ কেউ বাদ গেলেন না। সবাইকে ধরা পড়তে হল একে একে।

কেবলমাত্র চারটি বাড়ি থেকেই গ্রেপ্তার করা হল তেরজন দুর্ধর্ষ বিপ্লবীকে। সেই সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র, বোমা তৈরির মাল-মশলা, বৈপ্লবিক পুস্তক-পুস্তিকা ও চারটি বিদ্রোহ পতাকা।

একমাত্র ব্যতিক্রম পিংলে আর রাসবিহারী। বিপদের সুস্পষ্ট আভাস পেয়ে ততক্ষণে পিংলেকে নিয়ে রাসবিহারী পাড়ি দিয়েছেন কাশীর দিকে।

এ প্রসঙ্গে জালিয়ানওয়ালাবাগের কুখ্যাত নায়ক মাইকেল ও'ডায়ার পরবর্তী কালে তাঁর 'India as I knew it' গ্রন্থে কি বলেছেন শোন:

'On the morning of the 19th February, we had information from our spies that Rash Behari and Pingle had moved their head-quarters to Lahore, that suspecting the leakage of their plans they had decided to antidate the rising to the night of the 19th and had sent messages and emissaries to various selected centres, including several cantonments, to act accordingly. We had then to act.

Thirteen of the most dangerous revolutionaries were captured with their paraphernalia of conspiracy—arms, bombs, bomb making materials, revolutionary literature and four rebel flags.'

দুর্ভাগ্য! সখেদে বলেছেন মাইকেল ও'ডায়ার, এত করেও রাসবিহারী বা পিংলেকে ধরা সম্ভব হল না।

'Unfortuately Rash Behari and Pingle were not among those who were captured.'

এদিকে কলকাতায় তখন দারুণ উৎকণ্ঠা। পাঞ্জাব মেল এসে গিয়েছে কি? না এলেই বুঝতে হবে যে, গণ-বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় বিপ্লবীরা বীর-বিক্রমে হানা দেবে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের ওপর। তাদের ওপর তাই নির্দেশ দেওয়া আছে।

কিন্তু একি! পাঞ্জাব মেল তো যথাসময়েই এসে গেল!

তবে কি কোন কারণে বিদ্রোহ শুরু হয়নি? না কি তারিখ পিছিয়ে গেল?

একই প্রশ্ন তখন ব্রহ্ম ও মালয়ে অবস্থিত সেনাবাহিনীর মনে। কই, কোন নির্দেশ তো এল না! তবে কি সব পিছিয়ে গেল?

স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পেল একমাত্র সিঙ্গাপুরে। তাও সাময়িকভাবে।

২১শে তারিখে গণ-বিদ্রোহ শুরু হবে, শুধু এইটুকুই তাদের জানা ছিল। পরবর্তী আর কোন নির্দেশই তারা পায়নি। সেই অনুযায়ী ২১শে তারিখে উষালগ্নেই তারা ভীম-বিক্রমে আক্রমণ চালাল সিঙ্গাপুরস্থ ব্রিটিশ বাহিনীর ওপর।

ঝড়ের মতো উড়ে গেল বীরপুঙ্গবের দল। সিঙ্গাপুর স্বাধীন হল। ইউনিয়ন জ্যাক-এর পরিবর্তে সেখানে উড়তে লাগল স্বাধীন ভারতের সেনাবাহিনীর নিজস্ব পতাকা। সেই সঙ্গে সমস্ত জার্মান যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করে দেওয়া হল কারাগার থেকে।

একে একে কেটে গেল সাত দিন। ভারতীয় বাহিনী চিন্তিত। কি ব্যাপার! এখনো কেন নির্দেশ আসছে না কেন ভারত থেকে?

তবে কি কোন অঘটন ঘটেছে? নিশ্চয়ই তাই। নইলে এমন তো হবার কথা নয়!

বাধ্য হয়েই তখন আবার তাদের বশ্যতা স্বীকার করতে হল ইংরেজ বাহিনীর কাছে। সিঙ্গাপুর আবার পরাধীন হল।

এ প্রসঙ্গে Lt. General Sir George Macmunn-এর 'Turmoil & Tragedy in India.' গ্রন্থে কি বলা হয়েছে শোন :

'The mutineers at first at sixes and sevens, now broke up into three parties, one to overpower the men guarding the German internment camp and release the prisoners, another to attack the Colonel's house, and a third to prevent any assistance arriving down the road from Singapore. Further, several small parties made off, apparently to murder stray Europeans.'

[Turmoil & Tragedy in India : Lt. General Sir George Macmunn : P.—105-113 Two Great Indian Revolutionaries : Uma Mukherjee.]

এ তো গেল ব্রিটিশপক্ষের বক্তব্য। অপর পক্ষের বক্তব্য কি?

প্রখ্যাত বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী তখন সিঙ্গাপুরে। এ সম্বন্ধে তিনি পরবর্তী কালে কি বলেছেন, শোন :

" 'ফিফ্‌থ লাইট ইনফ্যান্ট্রি' পাঞ্জাবী ও পাঠান দ্বারা গঠিত।...ঘটনার দিন সকালে কুচকাওয়াজে সিপাহীদের আসিতে দেরি হইল। সুবেদার মেজর ডাণ্ডি খাঁ মোটেই আসিলেন না।

ডাণ্ডি খাঁর অফিসে ডাক পড়িলে তিনি উপস্থিত হইয়া উপবিষ্ট দুইজন অফিসারকে মিলিটারী কায়দায় অভিবাদন করিলেন না। ইহাতে অফিসারদ্বয় ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

একজন বলিয়া বসিলেন—'শুয়ার কী বাচ্চা, কে'ও তুম্‌ প্যারেড্‌ মে নেহি আয়া?'

ডাণ্ডি খাঁ রিভলবার বাহির করিয়া মুহূর্ত মধ্যে ঐ দুইজনকে হত্যা করিয়া বাহিরে আসিয়া ফল্‌ ইন্‌-এর হুকুম দিলেন। তখনই অস্ত্রাগার দখল করিয়া অস্ত্রাদি বণ্টন করিয়া দিবার পর কেল্লার সমস্ত ব্রিটিশ অফিসারকেই হত্যা করা হইল।

এদিকে প্রায় আড়াইশত সিপাহী বিভিন্ন রাস্তায় বাহির হইয়া বাছিয়া বাছিয়া লালমুখ দেখিয়া হত্যা করিতে লাগিল। কিন্তু জনসাধারণের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিল না।"

[সে যুগের আগ্নেয়পথ : পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী : পৃঃ—৮৩]

প্রাণের ভয়ে বাদবাকি শ্বেতাঙ্গের দল ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিল জাহাজের

অভ্যন্তরে। তারপরই রেডিওর মাধ্যমে সাহায্যের জন্য আবেদন জানাতে লাগল এখানে-ওখানে।

হেল্প! হেল্প! বিদ্রোহীরা কেল্লা দখল করেছে। আমরা বিপন্ন! প্লীজ হেল্প!

উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাপান এবং রাশিয়া ছিল ব্রিটিশের পক্ষে। বিপদজ্ঞাপক বার্তা শুনে প্রথমেই এগিয়ে এল একটি রাশিয়ান যুদ্ধ-জাহাজ।

কিন্তু তারপর! সে কাহিনী শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর লেখনী থেকেই শোন:

'বিদ্রোহের তৃতীয় দিন সকালের দিকে একটি রাশিয়ান যুদ্ধ-জাহাজ আসিয়া পৌঁছিবার পর শহরে তিন ঘণ্টার জন্য কারফিউ-এর বিরতি হয়। এ তিনদিনই বন্দরের জাহাজ হইতে এস-ও-এস বাইতে থাকে। রাশিয়ান জাহাজটি নিকটে থাকায় তৃতীয় দিন সকালের দিকেই আসিয়া উপস্থিত হয়।

...ধীরে-সুস্থে রুশ যুদ্ধ-জাহাজের সৈন্যগণ ব্যান্ড বাজাইয়া পতাকা উড়াইয়া কেল্লার দিকে অগ্রসর হইয়া উহার ঢালু জায়গা দিয়া উঠিতে লাগিল—যেন কেল্লায় ঢুকিলেই উহা দখল হইয়া যাইবে।

বিদ্রোহীরা বিনা বাধায় সেই সৈন্যগণকে উঠিতে দিয়া মাঝপথ বরাবর প্রচণ্ডবেগে গুলি চালাতে থাকে। এইভাবে শিলাবৃষ্টির মতো গুলি চলিবার পর রুশগণের প্রায় প্রত্যেকেই হতাহত হইয়াছিল, ইহাই জনরব।

কেল্লা বিদ্রোহীদের হাতে আরও দুইদিন থাকিবার পর পঞ্চম দিনে একটা জাপানী ক্রুজার আসিয়া বহুদূর হইতে কেল্লার উপর কামান দাগিতে আরম্ভ করে।

প্রথম প্রথম বিদ্রোহীরাও ২।৪টি কামান দাগিয়াছিল বটে, কিন্তু জাপানী জাহাজটি অবিরাম নির্ভুল গোলা-বর্ষণের ফলে কেল্লার সমস্ত প্রচেষ্টার অবসান ঘটে।

ইহার পরই বিদ্রোহীরা সাদা নিশান উড়াইয়া দেয়। জাপানীগণও ব্যান্ড বাজাইয়া পতাকা উড়াইয়া কেল্লায় উঠিল, কিন্তু এবার বিনা আয়াসে কেল্লা দখল করিল—কেল্লায় বহু বিদ্রোহী কামানের গোলায় হতাহত হইবার পর।

ভারতে সৈন্যগণের বিদ্রোহ নিশ্চিত মনে করিয়া সিঙ্গাপুরের সৈন্যদের বিদ্রোহ পূর্ব-পরিকল্পনা মতোই হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু ভারতে কেহ জানিল না এই বিদ্রোহের কথা—এই বীরত্বের কাহিনী।

ভারত হইতে দূরে, বহু দূরে তাহাদের এই জীবন-দানের গৌরব ব্যর্থতার গ্লানি লইয়াই মুছিয়া গেল। স্বাধীন ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা হইতেছে। জানি না এই হতভাগ্যদের বীরত্বের কাহিনী তাহার এককোণে স্থান পাইবে কিনা!'

[সে যুগের আগ্নেয়পথ : পৃঃ—৮৪]

এদিকে কাশীতে এসে একটা দুর্নিবার জ্বালায় জ্বলতে লাগলেন পিংলে।

এভাবে ব্যর্থতা মেনে নিলে চলবে না। আবার বেরিয়ে পড়তে হবে বিভিন্ন সেনা-নিবাসের উদ্দেশ্যে। আবার তাদের গড়ে তুলতে হবে। দেরি করলে চলবে না।

রাসবিহারীর ইচ্ছা অন্যরকম। অবস্থাটা তিনি আরো দিন কয়েক পর্যবেক্ষণ করে দেখতে চান।

কিন্তু পিংলে মরিয়া। অসীম সাহসে ভর করে একাই তিনি এবার রওনা দিলেন মীরাটের দ্বাদশ-সংখ্যক রেজিমেণ্ট বাহিনীর উদ্দেশ্যে। সংগে নিলেন দশটা মারাত্মক বোমা, যা গোটা একটা রেজিমেণ্টকে উড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

ফাঁদ পাতাই ছিল, তাই বোমা সমেতই পিংলে এবার ধরা পড়লেন মীরাটের ইংরেজ বাহিনীর হাতে।

২৭শে এপ্রিল শুরু হল ঐতিহাসিক লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা।

আসামী সংখ্যা শুরুতে বাষট্টিজন। পরে আশী। তার মধ্যে ষোলজন তখনো পলাতক।

বলা বাহুল্য যে, উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে এতটুকুও ভুল করলেন না ইংরেজ সরকার। তাই মোট চব্বিশজনকে দেওয়া হল প্রাণদণ্ড। ছাব্বিশজনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

আপীলে কিছুটা হেরফের হল। সেখানে প্রাণদণ্ড বহাল রইল মোট সাতজনের। এই সাতজন হলেন, কর্তার সিং, পিংলে, সুরাইন সিং (এক নম্বর), সুরাইন সিং (দু নম্বর), হরনাম সিং, জগৎ সিং আর বখশীশ সিং।

মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দীরা সবাই অস্বীকার করলেন প্রাণভিক্ষার আবেদন জানাতে। ইংরেজ তাঁদের শত্রু। বিপ্লবী হয়ে শত্রুর কাছে প্রাণভিক্ষা চাইতেও তাঁদের সম্মানে বাধে।

বরং দীপ্তকণ্ঠে জানালেন বীর বিপ্লবী কর্তার সিং : 'কেন প্রাণভিক্ষা চাইব? আমার যদি একটার বেশি প্রাণ থাকত, তবে সবক'টি প্রাণই আমি উৎসর্গ করতাম দেশের জন্য।'

মল্লিকা, এই কর্তার সিং-এরই ভাবশিষ্য হলেন অমর শহীদ সর্দার ভগৎ সিং, যিনি পরবর্তী কালে শুকদেব ও রাজগুরুসহ একই সংগে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন ফাঁসিমঞ্চে। কর্তার সিং-এর জ্বলন্ত দেশপ্রেমই ছিল তাঁর বিপ্লবী-জীবনের প্রেরণা।

শুরু হল মৃত্যু-মিছিল। এক যায়, আর আসে। ঝাঁকে ঝাঁকে আসে। যেন শেষ নেই এই আসা-যাওয়া মিছিলের।

এবার শুরু হল দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা।

আসামী সংখ্যা মোট একশো বারোজন। তার মধ্যে উত্তম সিং, ইসার সিং, বীর সিং, রঙ্গা সিং, রুর সিং—এই পাঁচজনকে দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড।

তারপর তৃতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা। সেখানেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল

পাঁচজনকে। এই পাঁচজন হলেন—বসন্ত সিং, মৌলভী হাফিজ আবদুল্লা, অরুর সিং, হরনাম সিং আর বাবুরাম। উল্লেখযোগ্য যে, অন্যান্য প্রাণদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত বন্দীদের মতো এ'রাও গদর পার্টির সদস্য।

সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক সৈনিকরাও রেহাই পেলেন না। তাঁদেরও কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা হল সামরিক আদালতের বিচারে। তার মধ্যে কেবল-মাত্র ২৩নং অশ্বারোহী বাহিনীর মধ্যেই বারোজনকে প্রাণ দিতে হল ফাঁসির রজ্জুতে।

আর সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুরের সেই বিদ্রোহী সৈন্যদের কি হল?

প্রত্যক্ষদর্শী বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর লেখনী থেকেই সে কাহিনী তুমি শোন:

..."কিছুদিন বিচার চলিবার পর শহরের গায়ে পোস্টার পড়িল,—কেল্লার দেওয়ালের ধারে কয়েকজনের বিচারের হুকুম শুনান হইবে, জনসাধারণ পরিখার অপর পাড় হইতে উহা দেখিতে পাইবে।

যথাস্থানে পঁহুছিতে কিছু বিলম্ব হইল। গিয়া দেখিলাম, ৬ জন লোক দাঁড়াইয়া আছে—সম্মুখে বন্দুক তাক করিয়া ২০।২৫ জন গোরা সৈন্য অপেক্ষা করিতেছে।

আমরা পঁহুছিতে না পঁহুছিতেই জলদগম্ভীর স্বরে একজন বলিলেন—'দাস্ জাস্টিস ইজ ডান্।'

সঙ্গে সঙ্গেই একজন হাঁকিলেন—'রেডি—ফায়ার!' একসঙ্গে সবগুলি রাই-ফেল গর্জিয়া উঠিল।

দুই ভলি গুলি ছোড়া হইল। প্রথম ভলিতেই ছয়জন পড়িয়া গেল। তারপর আসিল ছয়টি স্ট্রেচার ও একজন ডাক্তার। পরীক্ষার পর দেহগুলি লইয়া গেল। আমরাও বিষণ্ণ মনে গৃহে ফিরিলাম।

এই ঘটনার কয়দিন পর আবার পোস্টার পড়িল, ২২ জনের হুকুম শুনান হইবে। বিদ্রোহের দলপতি সুবেদার মেজর ডাণ্ডি খাঁরও হুকুম এইদিন হইবে পোস্টারে দেখিলাম।

নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্বেই আসিয়া পঁহুছিলাম। এই দৃশ্য দেখিবার জন্য প্রচুর জনসমাগম হইয়াছিল।

দেখিলাম, পরিখার অপর পাড়ে প্রায় ১০০ জন গোরা সৈন্য অর্ধচন্দ্রাকারে অর্ধেক দাঁড়াইয়া আর অর্ধেক হাঁটুভাঙা অবস্থায় বসিয়া আছে। উহারই সম্মুখে ২২টি খুঁটি এবং তাহার পশ্চাতেই প্রাচীর। একপার্শ্বে উচ্চপদস্থ অফিসারগণ দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

ইহার পরই অপরাধিগণ আসিল। পরণে সাদা পায়জামা ও গায়ে কুর্তা, হাতে উর্দি (ইউনিফর্ম)। শুনিলাম, ইহারা সকলেই এন-সি-ও এবং ভি-সি-ও, অর্থাৎ—সুবেদার মেজর, সুবেদার, জমাদার ও হাবিলদার শ্রেণীর।

দুই পার্শ্বে দুইজন করিয়া সৈন্য। প্রত্যেককে এক-একটি খুঁটির সম্মুখে

দাঁড় করান হইল। প্রায় মধ্যস্থানে দেখিলাম বিশালকায়, গৌরবর্ণ এবং বৃহৎ গুম্ফবিশিষ্ট পুরুষসিংহ।

অপরাধিগণ দাঁড়াইতেই অত্যন্ত কর্কশ গলায় হুকুম হইল 'স্বন্' (এ্যাটেনসন্)। গোরা সৈন্যগণ অপরাধিগণের দিকে বন্দুক তাক্ করিল। অপরাধিগণও সোজা হইয়া দাঁড়াইল।

হুকুম পাঠ আরম্ভ হইল। প্রথমে মালয় ভাষায়, পরে উর্দু ও ইংরেজী ভাষায় পাঠ হইল। প্রত্যেক ভাষায় পাঠের পর ইংরেজীতে 'দাস্ জাস্টিস ইজ ডান' বাক্য হইল। যতক্ষণ পাঠ চলিল, অপরাধিগণ কেবলই উপরের দিকে তাকাইতে থাকিল। যেন কিছুতেই বন্দুকের নলের দিকে তাকাইতে পারিতেছে না। কেবল ডাণ্ডি খাঁ নির্বিকার চিত্তে সোজা দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হুকুম পাঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই হুকুম হইল—'রেডি—ফায়ার!' ১০০টি রাইফেল একসঙ্গে গর্জিয়া উঠিল—দুইবার। অর্থাৎ দুই ভলি বন্দুক দাগা হইল।

সকলেই পড়িয়া গেল। কেবল ডাণ্ডি খাঁ চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া তখনও টলিতে থাকিলেন, যেন কিছুতেই পড়িতে চাহিতেছেন না।

...আবার হুকুম হইল—'ফায়ার!' এবারও দুই ভলি গুলি চলিল। ডাণ্ডি খাঁ অবশ্য প্রথম ভলিতেই পড়িয়া গেলেন। ইহার পর স্ট্রেচার আসিল, ডাক্তার আসিল। পরীক্ষা করিয়া যে ২।১ জনের তখনও মৃত্যু হয় নাই, তাহাদের কানের উপর পিস্তল রাখিয়া দাগা হইল।

ডাণ্ডি খাঁ আমারই মতো স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাঁহার ও তাঁহার সহকর্মিগণের জীবন-দান হয়তো বৃথা যায় নাই। কেবল ভারতে কেহই জানিল না তাঁহাদের মহান ত্যাগের কথা। ইহার পর আরও কয়েকবার এইভাবে হত্যাকাণ্ড সমাধা হইয়াছে, কিন্তু আর যাই নাই, যাইবার প্রবৃত্তিও আর ছিল না।"

[সে যুগের অগ্নিপথ : পৃঃ—৮৫-৮৬]

আশাভঙ্গের বেদনায় ততদিনে রাসবিহারী চলে এসেছেন বাংলাদেশে। সহকর্মীরা সবাই ধরা পড়েছেন একে একে। কি হবে আর ওখানে থেকে? দেখা যাক, এবার বাংলায় গিয়ে নতুন কোন কাজ শুরু করা যায় কিনা!

এলেন কলকাতায়। তারপর চন্দননগর। সবশেষে নবদ্বীপ।

শুভানুধ্যায়ীদের ইচ্ছা অন্যরকম। পুলিশ হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাসবিহারীর জন্য। আজ হোক বা কাল হোক, ধরা তাকে পড়তেই হবে। কি লাভ শুধু শুধু এখানে থেকে ধরা দিয়ে! তার চাইতে সে দূরে চলে যাক। এই হতভাগ্য দেশের জন্য এখনো তার অনেক কিছু করার আছে। দূর থেকেই সেই প্রচেষ্টা সে চালিয়ে যাক।

অনেক ভেবে-চিন্তে শেষ পর্যন্ত শুভানুধ্যায়ীদের ইচ্ছাই মেনে নিলেন রাসবিহারী। তাই হোক। তাই হোক। দূরেই আমি চলে যাব।

কিন্তু একটা কথা। সংসারে কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। একদিন আমার কথাও হয়তো তোমরা ভুলে যাবে। তবু যদি কেউ কোনদিন প্রশ্ন করে যে, 'রাসবিহারী কে ছিল',—তাহলে কি উত্তর দেবে?

জবাব—তিনি আমাদের নেতা ছিলেন।

না-না-না। কক্ষণো না। নেতৃত্বের অভিমান আমার মধ্যে কোনদিনও ছিল না, আজও নেই, থাকবেও না কোনদিন। আমাদের সবার শুধু একটাই পরিচয়, আমরা বিপ্লবী! জন্ম থেকেই দেশের জন্য আমরা বলি-প্রদত্ত। তাই কেউ প্রশ্ন করলে বোলো যে,—রাসবিহারী একজন যোদ্ধা ছিলেন। 'I was a fighter.'

এবার পাসপোর্ট সংগ্রহ। ইচ্ছা করলেই বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। তার জন্য পাসপোর্ট চাই।

সেখানেও রাসবিহারী এক ও অদ্বিতীয় মহানায়ক। নইলে মাথার দাম যার লক্ষ টাকা, সেই লোক কখনো নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ্য দিবালোকে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে গিয়ে হাজির হতে পারে, এমন অসম্ভব কথা চিন্তা করতে পার একবার?

রাসবিহারী কিন্তু তাই করলেন। সটান পাসপোর্ট অফিসে ঢুকে তিনি প্রশ্ন করলেন:

May I see Passport Officer?

Yes. I am the Passport Officer, please take your seat. —শিষ্টাচার জানিয়ে আসন গ্রহণ করতে বললেন ইংরেজ ভদ্রলোকটি।

Thank you. I am Raja P. N. Tagore, Poet Tagore's relative.

I am glad to meet you, what can I do for you?

I want a Passport for Japan. You must have seen in the newspawer that Poet Tagore is shortly going to visit Japan. I am going there as his emissary to make the necessary arrangements for his stay there.

অর্থাৎ—আমি কবিগুরুর আত্মীয় রাজা পি. এন. ঠাকুর। কবি শীগগির জাপান যাচ্ছেন। আমাকে আগে থেকেই সেখানে গিয়ে তাঁর জন্য যাবতীয় বন্দোবস্ত করতে হবে। সুতরাং অবিলম্বে পাসপোর্ট চাই।

এতটুকুও আপত্তি করলেন না পাসপোর্ট অফিসারটি।

পোয়েট রবীন্দ্রনাথ জাপান যাচ্ছেন—এ তো সবাই জানে। সংবাদপত্রেই তার বিস্তৃত বিবরণ বেরিয়েছে। সুতরাং আপত্তির কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাসপোর্ট নিয়ে দিব্যি বেরিয়ে এলেন রাসবিহারী। তারপরই ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীটের গুপ্ত-আস্তানায়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, পাসপোর্ট পেতে দেরি হয়নি।

অবশ্য হবার কথাও নয়। একে রাজাবাহাদুর, তার ওপর আবার পোয়েট রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি! এ কি চাট্টিখানি কথা!

১২ই মে, ১৯১৫ সাল।

রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় ও একান্ত সচিব পি. এন. ঠাকুর পরিচয়ে জাপানী জাহাজ 'সানু কী মারু'র ডেকে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো নিজের জন্মভূমিকে দেখে নিলেন রাসবিহারী।

দু চোখে তাঁর বাঁধনহারা অশ্রু। এই দেশ, এই মাটি তাঁর কত প্রিয়। কত দিবা-রাত্রির স্বপ্ন-জড়ানো এই সুজলা সুফলা বাংলাদেশ!

আজ সেই একান্ত প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে তাঁকে চলে যেতে হবে অনেক দূরে।

মন সায় দেয় না। দেহ সাড়া জাগায় না। তবু যেতেই যে হবে!

দু চোখে গভীর তৃষ্ণা নিয়ে শেষ পর্যন্ত খিদিরপুর ডকের বারো নম্বর জেটিতে দাঁড়িয়ে রইলেন অন্তরঙ্গ সহচর শচীন সান্যাল আর গিরিজাবাবু।

বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা। মুখে তারই প্রতিচ্ছায়া। আশ্চর্য মানুষ। শুধু দিয়েই গেলেন চিরদিন। এমন কি, শেষ মুহূর্তে নিজের রিভলবারটা পর্যন্ত তুলে দিয়ে গেলেন তাঁদের হাতে। বিনিময়ে কোনদিনই কিছু চাইলেন না কারো কাছে।

ঐ যে 'সানু কী মারু' জাহাজটা একটু একটু করে দূরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে রাসবিহারীকে নিয়ে। না, আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধু আকাশের বুকে খানিকটা কালো ধোঁয়া ছাড়া আর কোন কিছুই নজরে পড়ে না। অগ্নি-যুগের মহানায়ক চিরদিনের জন্যই চলে গেলেন তাঁর একান্ত প্রিয় জন্মভূমির মায়া কাটিয়ে।

এবার তোমাকে আমি রাসবিহারীর পরবর্তী ঘটনা-বহুল জীবন সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলব, মল্লিকা।

'সানু কী মারু' জাহাজযোগে ২২শে মে সিঙ্গাপুর। ২৯শে হংকং। ৫ই জুন জাপানের কোবে বন্দরে।

পরিচয় হল মহাচীনের সংগ্রামী যোদ্ধা সান ইয়াত-সেনের সঙ্গে। একই পথের পথিক, তাই সখ্যতা গড়ে উঠতে দেরি হল না দুজনের মধ্যে।

দিন কয়েকের জন্য সাংহাই। উদ্দেশ্য—সহকর্মীদের জন্য ভারতবর্ষে কিছু অস্ত্র-শস্ত্র প্রেরণ করা। জার্মান দূতাবাসের সাহায্যে চীনা এজেন্টের মাধ্যমে পাঠানোও হল কিছু অস্ত্র-শস্ত্র। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে-সব আর কোন কাজেই এল না। মাঝপথেই সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র ধরা পড়ে গেল ব্রিটিশের হাতে।

সাংহাই থেকে আবার জাপানে। খবরটা কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের জানতে খুব একটা দেরি হয়নি, মল্লিকা। সঙ্গে সঙ্গেই কড়া নোট। রাসবিহারী

এবং আমেরিকা থেকে আগত বিপ্লবী হেরম্ব গুপ্তকে জাপান থেকে বহিষ্কার করতে হবে। অবিলম্বে।

রাজী হল জাপান। কোথাকার কে রাসবিহারী, তার জন্য তারা ব্রিটিশের সঙ্গে বিবাদ করতে রাজী নয়।

সঙ্গে সঙ্গে নোটিশ জারি করা হল রাসবিহারী ও হেরম্ব গুপ্তের ওপর। অবিলম্বে তোমাদের চলে যেতে হবে জাপান ত্যাগ করে।

মনে রেখো, শেষ তারিখ ২রা ডিসেম্বর।

ভাবনায় পড়ে গেলেন রাসবিহারী। কঠিন সমস্যা। কি করা যায় এখন এ পরিপ্রেক্ষিতে!

বুদ্ধি দিলেন সান ইয়াত-সেন। এক্ষুণি তুমি চলে যাও মিৎসু তোয়ামার কাছে। তোয়ামা শুধু জাপানের শক্তিশালী বামপন্থী দল ব্ল্যাক ড্রাগনের অবিসম্বাদী নেতাই নন, মানুষ হিসেবেও তিনি অতুলনীয়।

হিসেবে ভুল হয়নি সান ইয়াত-সেনের। খবর শুনে দুজনকেই তিনি নিজের গৃহে স্থান দিলেন পরম সমাদরে।

১লা ডিসেম্বর। আর একদিন মাত্র বাকি। তারপরই দুজনকে বিদায় নিতে হবে জাপান থেকে।

সেদিনই তোয়ামার বাড়িতে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে রাসবিহারী সব কথা খুলে বললেন একে একে।

আমি তোমাদের দেশে আশ্রয়প্রার্থী। অথচ ব্রিটিশের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে জাপান সরকার আমাকে এখান থেকে বহিষ্কার করার জন্য বদ্ধ-পরিকর। সত্যিই দুঃখের কথা। কারণ, এশিয়ার একমাত্র স্বাধীন রাষ্ট্র জাপানের কাছ থেকে এটা আমি কোনদিনই আশা করিনি।

পরদিনই এ খবর প্রকাশিত হল জাপানের প্রতিটি সংবাদপত্রের পাতায়। সমালোচনাও করা হল বিস্তর। রাসবিহারী আমাদের আশ্রয়প্রার্থী। অথচ সরকার তাঁকে তুলে দিতে চাইছে তাঁর পরম শত্রু ব্রিটিশের হাতে।

কক্‌খনো না। প্রতিবাদ জানাল ব্ল্যাক ড্রাগন পার্টি, আশ্রয়প্রার্থীকে শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া হলে ব্ল্যাক ড্রাগন পার্টি কিছুতেই তা সহ্য করবে না।

২রা ডিসেম্বর। আজ রাসবিহারীকে চলে যেতে হবে জাপান থেকে। সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়। তারপরই শেষ-বিদায়।

ওদিকে পুলিশ বাহিনী তখন প্রস্তুত। আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র। তার মধ্যে ওরা চলে যায় তো ভালই, নয়তো সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার।

নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ এসে হাজির হল তোয়ামার বাড়িতে। কোথায় ওরা? শীগগির ওদের তুলে দাও আমাদের হাতে।

ওরা নেই। তোয়ামার সংক্ষিপ্ত উত্তর, অনেক আগেই ওরা বিদায় নিয়ে চলে গেছে এখান থেকে।

সত্যিই অই। তন্ন-তন্ন করে সর্বত্র খুঁজে দেখা হল, কিন্তু কোথায় রাসবিহারী! কোথায় হেরম্ব গুপ্ত। আশ্চর্য, কেউ নেই।

পুলিশ বাহিনী অবাক। তাই তো! গেল কোথায়? হাওয়ায় উবে গেল নাকি লোক দুটো?

ওঁরা তখন এক রুটি-কারখানার মালিক মিঃ সোমার আশ্রয়ে। খবরের কাগজ থেকে সব কিছু জানতে পেরে তিনি নিজেই আগ্রহ করে তাদের স্থান দিয়েছেন পরম সমাদরে। তাঁর মতে—এভাবে ব্রিটিশের চাপে পড়ে দুজন আশ্রয়প্রার্থীকে বহিষ্কার করাটা জাতীয় অবমাননা ছাড়া আর কিছুই নয়।

শুরু হল ঠাণ্ডা লড়াই। একদিকে জাপ-সরকার, অন্যদিকে ব্ল্যাক ড্রাগন পার্টি। কেউ কারো দাবী ছাড়তে রাজী নয়। দু-পক্ষই সমান।

পরিস্থিতি লক্ষ্য করে ভাবনায় পড়ে গেল ব্ল্যাক ড্রাগন পার্টি। ইতিমধ্যে হেরম্ব গুপ্ত চলে গেছেন আমেরিকায়। রয়েছেন রাসবিহারী একা। কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে কতদিন আর তাঁর পক্ষে এভাবে লুকিয়ে থাকা সম্ভব?

একই ভাবনা তখন ব্ল্যাক ড্রাগন পার্টির নেতা মিঃ তোয়ামার মনে। কি করা যায় এখন রাসবিহারীকে নিয়ে?

ভয় জাপান সরকারকে ততটা নয়, যতটা ব্রিটিশ দূতাবাসকে। যে করে হোক, রাসবিহারীকে শিক্ষা দেবার জন্য তারা বদ্ধপরিকর।

হন্যে হয়ে তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে রাসবিহারীকে। খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের নিজস্ব গুপ্তচর ও স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে আগত সুদক্ষ ব্রিটিশ গোয়েন্দার দল। এমন কি, সুযোগ পেলে তারা তাঁকে হত্যা করতেও পিছ-পা নয়।

এ অবস্থায় রাসবিহারীকে বাঁচাতে হলে চাই এমন একজন মানুষ, যিনি দিনরাত্রি সর্বক্ষণের জন্য তাঁকে আগলে রাখতে সক্ষম। কে সেই লোক, যাঁর ওপর এ ব্যাপারে পুরোপুরিভাবে নির্ভর করা চলে?

পরের কাহিনী আশ্রয়দাতা রুটি-কারখানার মালিক মিঃ সোমার স্ত্রী শ্রীমতী সোমার মুখ থেকেই শোন:

'কিছুদিন আমাদের এখানে থাকার পরে রাসবিহারীর জন্য তখন অন্য একটি আশ্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছে।

একদিন মিঃ তোয়ামা আমাদের বড় মেয়ে তোসিকোর সংগে রাসবিহারীর বিয়ের প্রস্তাব জানালেন। আমরা খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম অপ্রত্যাশিত এই প্রস্তাব শুনে।

রাসবিহারীকে আমরা ছেলের মতোই ভালোবাসি এবং শ্রদ্ধা করি। সে-ও আমাদের বাবা-মা বলেই ডাকে। তা বলে তোসিকোর সংগে তার বিয়ে দেবার কথা কোনদিন কল্পনাও করিনি। তাছাড়া তোসিকোকে আমি একথা বলবই বা কি করে? ও যে তরুণী বালিকা মাত্র। তখনো স্কুলে পড়াশুনা করছে।

তবু রাসবিহারীর বিপদের কথা চিন্তা করে মনে মনে প্রার্থনা করলাম—

ভারতের চল্লিশ কোটি মানুষের মুখ চেয়ে তোসিকো যেন এই বিপজ্জনক দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হয়।

শেষ পর্যন্ত আমিই একদিন বললাম—তুমি কি মিঃ বোসকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পার না তোসিকো?

তোসিকো শান্তভাবে জানাল—আমাকে একটু ভাবতে দাও, মা।

একমাস বাদে তোসিকো কুণ্ঠিত নতমুখে জানাল—তাই হোক মা। আমি মনস্থির করেছি।

অশ্রুসজল কণ্ঠে বললাম—এখনো ভেবে দেখ তোসিকো। এ বিয়ে কিন্তু মোটেই আনন্দদায়ক হবে না।

তোসিকো তখন দৃঢ়সঙ্কল্প।

'I explained the situation again and again. She was determined.'*

১৯১৮ সালের জুলাই মাসে বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হল সবার অগোচরে। পৌরোহিত্য করলেন মিঃ তোয়ামা স্বয়ং।

নতুন জীবন। নতুন পরিবেশ। কিন্তু কোথায় নিশ্চয়তা, কোথায় কি!

পলাতক জীবন। এ জীবনে পদে পদে ভয়। পদে পদে সংশয়। কখন যে অলক্ষ্য থেকে মৃত্যু এসে হানা দেবে, কে তা বলতে পারে!

সব কিছুই হাসিমুখে মেনে নিলেন প্রিয়তমা পত্নী তোসিকো। ইতিমধ্যে সতেরো বার তাঁদের বাসা পরিবর্তন করতে হয়েছে পুলিশের ভয়ে। তবু এ নিয়ে কারো বিরুদ্ধেই তাঁর কোন নালিশ নেই। কোন দুঃখও নেই। এ যে হবে,—এ তো জানা কথাই।

বিপ্লবের পথ কোনদিনই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এ পথে যারা এসেছে, তাদেরই সর্বাঙ্গে বয়ে গেছে রক্তের বসুধারা। তা হলে দুঃখ কিসের!

ইতিমধ্যেই রাসবিহারী জাপানী ভাষা আয়ত্ত করে নিয়েছেন বেশ ভালভাবেই। আশ্চর্য, মাত্র চার মাসেই তিনি ঐ দুর্বোধ্য ভাষা আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন নির্ভুলভাবে। কোন শিক্ষকেরও প্রয়োজন হয়নি। পরবর্তী কালে বেশ কয়েকখানি গ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন জাপানী ভাষায়। সুধী-মহলে তা সাড়াও জাগিয়েছিল প্রচুর।

দুঃসহ জীবনের অবসান ঘটল দীর্ঘ আট বছর বাদে, ১৯২৩ সালের জুলাই মাসে। সেদিনই সর্বপ্রথম তিনি স্বীকৃতি পেলেন জাপানী নাগরিক বলে।

যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন রাসবিহারী। মুক্তি! মুক্তি! মুক্তি! অবারিত মুক্তি! দুঃখ-রজনীর অবসান ঘটেছে। আর ভয় নেই। কোন বিধি-নিষেধও নেই। এবার নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ শান্তি।

---

*'Rash Behari Bose—His Struggle for India's Independence' গ্রন্থ থেকে সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

কোথায় শান্তি, কোথায় কি! সুখের দিনের প্রারম্ভেই হারাতে হল, প্রিয়তমা পত্নী তোসিকোকে। ১৯২৫ সালের ৪ঠা মার্চ সর্বংসহা তোসিকো শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন একটি পুত্র ও কন্যা রেখে।

মল্লিকা, তুমি তো একালের মেয়ে। পারো কি তুমি একবার নিজেকে তোসিকোর ভূমিকায় কল্পনা করতে?

কিসের অভাব ছিল সেদিন তোসিকোর? কি তাঁর ছিল না? তা সত্ত্বেও জেনে-শুনে সহায়-সম্বলহীন এক পলাতক বিপ্লবীকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে সেদিন বিদেশী মেয়ে তোসিকো যে অপূর্ব ত্যাগ ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন, সংসারে তার তুলনা কোথায় বলতে পারো?

সম্পূর্ণ অজ্ঞাত-পরিচয় একটি বিপন্ন মানুষকে বাঁচানোর জন্য ব্ল্যাক ড্রাগন পার্টির নেতা তোয়ামা এবং সোমা-পরিবার যে নিঃস্বার্থ কর্তব্যবোধের নিদর্শন রেখেছিলেন, তারই কি কোন নজীর আছে সংসারে?

আর রাসবিহারী। তাঁরই বা তুলনা কোথায় বলো?

পরবর্তী কালে তোসিকোর মা শ্রীমতী সোমা একদিন আবার বিয়ে করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন রাসবিহারীকে। কি উত্তর রাসবিহারী সেদিন দিয়েছিলেন শ্রীমতী সোমাকে?

অসম্ভব! যে তোসিকো দীর্ঘ আট বছর সুখে-দুঃখে সর্বক্ষণ আমার পাশে ছিল, আজো সে আমার পাশে তেমনিই রয়েছে। তার জায়গায় আর কাউকে বসানো সম্ভব নয়।

সেদিনের সেই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ শ্রীমতী সোমার মুখ থেকেই তুমি শোন:

'Ten years later, I spoke to Mr. Bose, "You should now enter into a new life."

But he laughed at the idea of another marriage.

"Mother, it is impossible to find Tosiko's love again... it is painful for me even to think of such a thing I have my dear mother and father. That is more than enough. I am happy. Tosiko is always with me as she was during my lovely eight years in concealment. Moreover my life is not mine, it is offered to my native country. I was and am satisfied to have had eight years with Tosiko. That is more than enough."

Hearing this, I said to my daughter living in my memory:

"Tosiko, what a happy girl you are! Mr. Bose is truly a big man. He is a little too big for you. Is it not so? You are quite happy, are you not"?'

[Rash Behari Bose—His Struggle for India's Independence: P.—36-37]

নিঃসঙ্গ মহানায়ক।

এতদিন তবু তোসিকো ছিলেন। আজ সর্বক্ষণের সঙ্গিনী সেই তোসিকোও পাশে নেই। নির্বান্ধব পৃথিবীতে মহানায়ক একেবারেই নিঃসঙ্গ। একা।

তবু ভাগ্যের কাছে এতটুকুও নতি-স্বীকার করলেন না মহানায়ক। বরং বিধি-নিষেধ থেকে রেহাই পেয়ে আবার তিনি নতুন উদ্যমে ঝাঁপ দিলেন কর্মসাগরে।

সর্বক্ষণ একই চিন্তা। কবে আমার জন্মভূমি ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে? কবে আবার আমি তাকে দেখতে পাব দু চোখ ভরে? সেই দিন, সেই শুভ লগ্ন কবে আসবে? কবে?

প্রতিষ্ঠা করলেন ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ (Indian Independence League)। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়গণ এক হও। সুযোগ একদিন আসবেই।

সুযোগ পাওয়া গেল ১৯৩৭ সাল। শুরু হল চীন-জাপান যুদ্ধ।

টোকিওর রেনবোতে অনুষ্ঠিত এক ভারতীয় সমাবেশে সেদিন এক নতুন ঘোষণা শোনা গেল রাসবিহারীর কণ্ঠে—'Asia for the Asians. Go home white.'

দেখতে দেখতে রাসবিহারীর সেই ডাক ছড়িয়ে পড়ল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র। ছোট-বড় প্রতিটি মানুষের মুখে সেই একই কথা। 'Asia for the Asians. Go home white.'

একই কথা সোচ্চার হয়ে উঠল প্রতিটি জাপানীর কণ্ঠে:

'আজিয়া ওয়া আজিয়া, জিন নো তামে নো আজিয়া, হাকুজিন ইয়ো কিকোকুসেও—'

অর্থাৎ—এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য, শ্বেতাঙ্গ বিদেয় হও।

এল ১৯৩৯ সাল। শুরু হল যুদ্ধ। জাপানও একদিন সেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল অনিবার্যভাবে।

সেদিনের সেই যুবক রাসবিহারী তখন বৃদ্ধ, অসুস্থ। তবু তিনি শেষবারের মতো সোজা হয়ে দাঁড়ালেন যুদ্ধ-পরিস্থিতি লক্ষ্য করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তাঁর সেই আন্তরিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এবার তার চরম বদলা নিতে হবে। ঘৃণ্য ঐ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে এশিয়া ভূখণ্ড থেকে।

ইতিমধ্যেই তাদের সর্বত্র মার খেতে হয়েছে জাপানীদের হাতে।

এই তো সুযোগ! ক্রমাগত ঘা খেয়ে খেয়ে ব্রিটিশের এখন নাভিশ্বাস উঠেছে। এখন চাই শুধু শক্ত একটা আঘাত। সবাইকে সঙ্ঘবদ্ধ করে একটা শক্ত আঘাত হানতে পারলে পরাধীনতার অভিশাপ থেকে ভারতকে মুক্ত করা এখন আর এমন কিছু কষ্টকর কাজ নয়।

দেখে দেখে ক্রমশ সুভাষের মতোই মরিয়া হয়ে উঠলেন রাসবিহারী।

দেহ অপটু। চলাফেরা করতেও রীতিমত কষ্ট হয়। তবু তিনি সব কিছু অগ্রাহ্য করে ছুটে বেড়াতে লাগলেন সর্বত্র। মুখে সেই চিরন্তন ডাক :

'I was a fighter, one fight more, the last and the best.'

উঠে দাঁড়াও। সোজা হয়ে দাঁড়াও। স্বাধীনতা অর্জনের চরম সুযোগ এগিয়ে এসেছে জাতির জীবনে। এগিয়ে এস ভাইসব। হাতে হাত মেলাও। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

এখানেই থামলেন না রাসবিহারী। দুর্দিনের বন্ধু তোয়ামার যোগাযোগে দেখা করলেন জাপানের ইম্পিরিয়াল জেনারেল স্টাফের সর্বাধিনায়ক ফিল্ড-মার্শাল সুগিয়ামার সংগে। আমি অধিকৃত অঞ্চলের ভারতীয়দের নিরাপত্তা এবং নারীর মর্যাদা সম্বন্ধে গ্যারাণ্টি চাই।

রাজী হলেন ফিল্ড-মার্শাল সুগিয়ামা। বেশ, তাই হবে। কথা দিলাম।

সংগে সংগেই আবার নতুন দাবী। ব্রিটিশের সংগে চূড়ান্ত বোঝাপড়া করতে আমরা প্রস্তুত। এ ব্যাপারে আমাদের সংগে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করতে হবে। প্রমাণ দিতে হবে যে, 'India for the Indians', তোমাদের এই প্রতিশ্রুতি শুধুমাত্র একটা কথার কথা নয়।

এবারও রাসবিহারীর প্রস্তাব গৃহীত হল যথাযথভাবে। সহযোগিতার নিদর্শন হিসেবে প্রথমেই মেজর ফুজিয়ারাকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হল জাপ-ভারত সংযোগ রক্ষাকারী অফিসাররূপে। তাঁর প্রধান কাজ হবে—অধিকৃত অঞ্চলের ভারতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ করার কাজে সহায়তা করা।

মল্লিকা, কেন যে সেদিন এই ফুজিয়ারা চল্লিশ হাজার ভারতীয় সৈন্যকে মোহন সিং-এর হাতে তুলে দিয়েছিলেন, এবার তুমি তা বুঝতে পেরেছ আশা করি। আসলে সব কিছুর মূলেই ছিলেন রাসবিহারী, যাঁর অবদানের কথা সত্যিকারের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল।

যুদ্ধে ক্ষয়-ক্ষতি আছেই। বিশেষ করে, রণোন্মত্ত সেনাবাহিনী যখন বিজয়গর্বে এগিয়ে চলে, তখন তো কথাই নেই। যে কোন সেনাবাহিনীর পক্ষেই বোধ হয় একথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি ক্ষেত্রেও কোন ভারতীয় নারী বা তাদের ধন-সম্পত্তির এতটুকুও ক্ষতি হয়েছিল কি?

না, হয়নি। কারণ—রাসবিহারী। শুরুতেই তিনি সেনাবাহিনীর মধ্যে ছোট ছোট পুস্তিকা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন জাপ-ভারত মৈত্রীর কথা উল্লেখ করে। কিভাবে ভারতীয়দের সংগে কথা বলতে হবে, কোন্ ভাষায় ভারতীয় নারীদের সম্ভাষণ করতে হবে, সব কিছু নির্দেশই তার মধ্যে দেওয়া হয়েছিল যথাযথভাবে।

ফল হয়েছিল সুদূর-প্রসারী। এ প্রসংগে মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান তাঁর 'I. N. A. & Its Netaji' গ্রন্থে কি বলেছেন শোন :

'ভারতীয়দের প্রতি জাপানীদের ব্যবহার ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।...ভারতীয় সৈন্যদের তারা বলত,—তোমরা আমাদের শত্রু নও, ভাই।'...যুদ্ধক্ষেত্রে যে-সব ভারতীয় সৈন্য বন্দী হয়েছিল, জাপানীদের হাতে তারা ভাল ব্যবহারই পেয়েছিল।

...ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড, ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজ, ফরাসী ইন্দোচীন, সাংহাই, ব্রহ্মদেশ, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া ইত্যাদি জায়গায় ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের সমস্ত শাখাই রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হত।

পূর্ব-এশিয়ার এইসব শাখা স্থাপন করে রাসবিহারী খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন।...কোথাও ভারতীয় নারীর সম্ভ্রমহানি ঘটেনি। 'I will say this much for them that they never molested any Indian woman.' বরং বহু চীনা এবং ইউরেশিয়ান মেয়েই সেদিন শাড়ি বা দোপাট্টা পরে রেহাই পেয়েছিল নিজেদের ভারতীয় বলে পরিচয় দিয়ে।

জাপানী সৈন্যদের দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সৈন্য হিসেবে তারা খুবই ভাল। ওপরওয়ালাদের আদেশ তারা বিশ্বস্তভাবে মেনে নিতেই অভ্যস্ত। প্রায়ই দেখা যেত, ভারতীয়দের গৃহে গিয়ে তারা আলাপ করার চেষ্টা করছে। প্রশ্ন করত—'গান্ধী ক্যা ?' অর্থাৎ তুমি কি গান্ধীর দলের লোক ? উত্তরে 'হ্যাঁ' বললেই ওরা খুশি হয়ে নমস্কার বা করমর্দন করে চলে যেত।' [I. N. A. & Its Netaji : P.—11-15]

নিঃসন্দেহে এ কৃতিত্ব রাসবিহারীর। যেভাবে সেদিন তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ত্রিশ লক্ষ নরনারীর ধন-প্রাণ, মান-মর্যাদাকে যক্ষের মতো আগলে রেখেছিলেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে তার নজীর আর দ্বিতীয়টি আছে বলে আমার জানা নেই।

ওদিকে রাসবিহারীর মাথায় তখন অন্য পরিকল্পনা।

শুধু বাইরে থেকে নয়, আঘাত করতে হবে ঘরে-বাইরে দুদিক থেকেই। একসঙ্গে দুদিক থেকে আঘাত হানতে পারলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতন অনিবার্য। তার জন্য সর্বাগ্রে চাই উপযুক্ত প্রচার। এই প্রচারের সাহায্যেই ডাক পাঠাতে হবে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে। বলতে হবে—আমরা প্রস্তুত। তোমরাও প্রস্তুত হও। আর দেরি নয়। সংগ্রাম আসন্ন।

আবার যোগাযোগ করলেন জাপান সরকারের সঙ্গে। জাপ-ভারত সহযোগিতার নিদর্শন হিসেবে সব রকম প্রচারের সুযোগ চাই অবিলম্বে।

রাজী হল জাপান। বেশ, তাই হোক।—

শুরু হল প্রচারের কাজ। তারিখটা ছিল ৯ই মার্চ, ১৯৪২ সাল। দীর্ঘ সাতাশ বছর বাদে হঠাৎ সেদিন জন্মভূমির উদ্দেশ্যে রাসবিহারীর কণ্ঠ সরব হয়ে উঠল টোকিও রেডিও থেকে :

'I, Rash Behari Bose, representing the Indians, living in East Asia, pay my homage to you.

...I must pay homage to all those Indians, some of them known and honoured by their countrymen but most of them "unwept, unhonoured and unsung", who, since India lost her freedom to the British, have individually and collectively made an offer of their lives to regain it..." [Rash Behari Bose—His Struggle for India's Indepen dence : P.—160-161]

৯ই মার্চ প্রণাম জানালেন বিপ্লব-গুরু ঋষি অরবিন্দের উদ্দেশ্যে :

'This is a salute to him to whose inspiring call owes the birth of positive Indian nationalism...and due to whose burning speech and thundering pen, patriotism came to have a fresh and profound meaning for modern Indians.

This salute is offered to him in the time-honoured Indian custom of asking for the blessings of the elders and pioneers before undertaking a great and noble task.'

[Ibid : P.—162-163]

১৩ই মার্চ আবেদন জানালেন গান্ধীজীর উদ্দেশে :

'I, Rash Behari Bose, representative of Indians now living in East Asia, regard you as the sole leader of the Indian nation, and have no hesitation in saying that the fate of the Indian nation is secured in your hands.

...I shall be greatly pleased to receive your blessings in my present undertaking. May God show you the proper way to lead India to complete freedom...'

[Ibid : P.—163-165]

তারপর একে একে জওহরলাল, বীর সাভারকার, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, রাজাগোপাল আচারিয়া, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মুসলিম লীগ-প্রধান জিন্না, সীমান্ত-গান্ধী আবদুল গফুর খান প্রমুখ সবার উদ্দেশে। বক্তব্য সেই একই। চরম সুযোগ এগিয়ে এসেছে জাতির জীবনে। সুতরাং আর দেরি নয়। চাই সংগ্রাম।

এরি মধ্যেই একফাঁকে ডাক পাঠালেন ক্যাপ্টেন মোহন সিং এবং স্বামী সত্যানন্দ পুরী, গিয়ানী প্রীতম সিং, এন. রাঘবন প্রমুখ থাইল্যান্ড ও মালয়ের নেতৃবৃন্দের উদ্দেশে।

তোমরা সবাই একবার টোকিওতে এসো ভাই। আসন্ন টোকিও সম্মেলনে বসেই সবাই মিলে আমরা ঠিক করব যে, কোন্ পথে আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত। সম্মেলন শুরু হবে ২৮শে মার্চ। ১৯৪২ সালের ২৮শে মার্চ।

মনে রেখো, লক্ষ্য আমাদের সবারই এক। One nation—India. One enemy—England. One goal—Independence.

না, নেতৃত্বের কোন মোহ আমার নেই। আগেও ছিল না, এখনো নেই। শুধু একটি মাত্র কামনা। আমি যেন আমার সেই ফেলে-আসা জন্মভূমিকে শেষবারের মতো একবার দেখে যেতে পারি। একবার যেন তার পায়ে মাথা রেখে বলতে পারি—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'

না, আর আমার কিছু চাইবার নেই সংসারের কাছে। শুধু এইটুকুই। তারপরই আমার ছুটি। চিরদিনের মতোই ছুটি।

ওদিকে সুভাষ তখন এগিয়ে চলেছেন জোর কদমে।

শুধু কাজ—কাজ আর কাজ! অফুরন্ত কাজ। একটার পর একটা। অসংখ্য।

আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘের নিজস্ব মুখপাত্র চাই। নিজস্ব ডাকটিকেট চাই। অফিসার ও সৈন্যদের জন্য নিজস্ব ইউনিফর্ম, ব্যাজ ও মেডেল চাই। অবিলম্বেই চাই। ব্রিটিশ-সিংহ ফাঁদে পড়েছে। আর সময় কোথায়! এই তো সুযোগ!

তারপর বেতার-ভাষণ। নিয়মিতভাবে সব কথা দেশবাসীকে জানাতে হবে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের আসল চেহারাটা সবার সামনে তুলে ধরতে হবে। সবাইকে ডেকে বলতে হবে যে, আর সময় নেই। সংগ্রাম আসন্ন। সবাই তার জন্য প্রস্তুত হও।

কোন্ কোন্ স্টেশন থেকে সেদিন সুভাষের বেতার-ভাষণ প্রচারিত হত, জানো মল্লিকা?

পডিব্র্যাড ও হুইজেন থেকে। রেকর্ড-করা সেই ভাষণ ২০·৩৪ মিটারে প্রচার করা হত পডিব্র্যাড থেকে। সময় ওখানকার হিসেবে বিকেল পাঁচটা পনেরো মিনিট থেকে পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর্যন্ত।

আর ১৯·৭১ মিটার শর্টওয়েভ লেংথে প্রচার করা হত হুইজেন থেকে।

সেই একই খবর আবার পরদিন ভোর তিনটে ত্রিশ থেকে পাঁচটা ত্রিশ পর্যন্ত পডিব্র্যাড থেকে প্রচার করা হত ২০·৩৪ ওয়েভ লেংথে।

নির্দিষ্ট সময়ে রেডিও খুললেই শোনা যেতো সেই পরিচিত কণ্ঠঃ

'আমি সুভাষ বলছি......'

তা বলে কাজটা কিন্তু মোটেই সহজ ছিল না মল্লিকা।

বার্লিন থেকে প্রচারিত কোন খবর শোনা এবং সংবাদপত্রে তার বিবরণ প্রকাশ করা—দুই-ই ছিল সেদিন আইনত নিষিদ্ধ। তাই শুনতে হত ভাল করে দরজা-জানালা বন্ধ করে, অতি সন্তর্পণে।

তাও সব কথা ভাল করে শোনা যেত না। শত্রুপক্ষ সব কিছুই জ্যাম করে দিতে চেষ্টা করত একই তরঙ্গে নানাবিধ বিশ্রী শব্দ প্রচার করে। উদ্দেশ্য, সুভাষের বক্তব্য যেন এখানে কেউ শুনতে না পায়।

তাছাড়া ছিল নানাবিধ পাল্টা অপপ্রচার। আজ আর তাদের চেনা যায় না। নইলে দেশের তথাকথিত স্বনামধন্য ব্যক্তিরা কি সেদিন ব্রিটিশের হয়ে কম সুভাষ-বিরোধী প্রচার-কার্য চালিয়েছিলেন অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে! বিনে পয়সায় নয়, উপযুক্ত পারিশ্রমিক পকেট নিয়েই।

ওদিকে আজাদী বাহিনীর শিক্ষার কাজ তখন এগিয়ে চলেছে দ্রুত-গতিতে! শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে ওয়ালটার হার্বিচ-এর ওপর।

এতদিন একমাত্র রাইফেল ছাড়া আর কোন কিছুই তারা ব্যবহার করতে খুব একটা অভ্যস্ত ছিল না। অধুনা পর্বতারোহণ, প্যারাসুট ব্যবহার, ট্যাঙ্ক-যুদ্ধের কলা-কৌশল ইত্যাদি আধুনিক যুদ্ধের সব কিছুই তাদের আয়ত্তের মধ্যে।

বেতার, টেলিগ্রাফ, নানাবিধ সাঙ্কেতিক লিপি, অদৃশ্য কালির ব্যবহার ইত্যাদি ব্যাপারে এরই মধ্যেই বেশ রপ্ত হয়ে উঠেছেন এন. জি. স্বামী ও আরও কয়েকজন। শত্রুপক্ষের ব্যূহের মধ্যে ঢুকে নানাবিধ সামরিক তথ্য সংগ্রহ করতে হলে এসব কায়দা-কানুন ও যন্ত্র-কৌশল আয়ত্তে থাকা খুবই প্রয়োজন।

শুধু সামরিক শিক্ষা নয়, সৈন্যদের সবচাইতে বেশি পরিবর্তন ঘটেছে মানসিক দিক থেকে।

ভাড়াটে সৈনিক বলে এতদিন তাদের সম্মান বলতে কোথাও কিছুই ছিল না। সর্বত্র তারা ছিল অবজ্ঞা ও উপহাসের পাত্র।

আজ তারা ভারতে আজাদী সৈনিক। তাদের সম্মান আলাদা, ইজ্জত আলাদা। ভাবতে গেলেও যেন বুকটা দশ হাত উঁচু হয়ে ওঠে। অজ্ঞাতেই মুখ থেকে বেরিয়ে আসে—জয় হিন্দ্! নেতাজী জিন্দাবাদ!

আশ্চর্য, ধূর্ত ইংরেজের প্রচার কৌশলে সব কিছু তারা ভুলে গিয়েছিল এতদিন। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান সবার ধর্ম ছিল সেদিন আলাদা।

সেনাবাহিনীও আলাদা। সব কিছুই সেখানে গড়ে উঠেছিল ধর্ম ও সম্প্রদায় ভিত্তিতে। উদ্দেশ্য,—প্রয়োজন হলে একের বিরুদ্ধে অন্যকে লেলিয়ে দিয়ে শায়েস্তা করা।

ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, এমন কি আহার্যের ব্যাপারেও পর্যন্ত সেদিন কারো সঙ্গে কারো এতটুকুও মিল ছিল না।

আজ হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সব মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে।

তাই অনায়াসেই এখন তারা বুক ফুলিয়ে বলতে পারে:

'In India we have many religions and many gods. But here everything is Jai Hind.' [The Springing Tiger: Hugh Toye: P.—74]

[ভারতবর্ষে আমাদের বহু ধর্ম, বহু দেবতা। কিন্তু এখানে সব কিছুই জয় হিন্দ্'।]

কথাটা মিথ্যে নয়, মল্লিকা। 'জয় হিন্দ'—এই একটি মাত্র কামনা ছাড়া সেদিন বোধহয় আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না আজাদী সৈনিকদের জীবনে।

মাঝে মাঝেই সুভাষ গিয়ে দেখে আসেন তাঁর একান্ত প্রিয় আজাদী বাহিনীকে। সামনে কঠিন কঠোর সংগ্রামের দিন। ওরাই তো সেদিন সর্বস্ব পণ করে এগিয়ে যাবে সংগ্রামের পুরোভাগে। ওদের ছেড়ে তিনি থাকবেন কি করে?

ওদিকে তখন জাপানীদের জয়ের পালা চলেছে। সেই সঙ্গে বার বার ভেসে আসে জাপ-প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজোর সেই ঐতিহাসিক ঘোষণা :

India for the Indians! India for the Indians! India for the Indians!

ভারতবর্ষ ভারতবাসীদের জন্য। হ্যাঁ, এই চাই। এই তো হওয়া উচিত। নিঃসন্দেহে তোজোর এই ঘোষণা অভিনন্দনযোগ্য। ভারতবাসীদের কাছে এর চাইতে বড় সত্য আর কিছুই নেই।

ভাবতে ভাবতে কোথায় তলিয়ে যান সুভাষ। ডুবে যান নীরব মধুর এক নিঃসঙ্গতার গভীরে। জার্মানী থেকে ভারতের দূরত্ব প্রায় ছ'হাজার মাইল। কিন্তু বর্মা ও ভারত একেবারে পাশাপাশি। সংখ্যার দিক থেকেও ভারতীয়রা ওখানে অনেক বেশি। একবার যাওয়া যায় না ওখানে?

দেখা করলেন বার্লিনের জাপানী রাষ্ট্রদূত জেনারেল ওসিমা এবং তাঁর সামরিক উপদেষ্টা কর্ণেল ইয়ামামোতোর সঙ্গে। ওখানে একবার পাঠাতে পারো না আমাকে?

সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে গেল টোকিওতে। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী চন্দ্র বোস দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যেতে ইচ্ছুক। এ সম্বন্ধে নির্দেশ চাই।

যথাসময়ে তার উত্তর এল টোকিও থেকে। অত্যন্ত হতাশ-ব্যঞ্জক উত্তর :

'তোকিয়ো নিওয়া সুদোনি দাই কাকুমেকা রাসবিহারী বোস সেন্‌সেগা ইরু। গেনজুই নো আকুজি কিয়োকুজি নি তানো কাকুমেংকা ও নাজে বেরুরিন কারা ইয়োবানাকারেতা নারানাই নো কা।'

অর্থাৎ, বিখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারী বোস এখানেই রয়েছেন। তা সত্ত্বেও এ পরিস্থিতিতে আর একজন বিপ্লবী কেন?

তবু হাল ছাড়লেন না সুভাষ। আবার তিনি দেখা করলেন জেনারেল ওসিমা ও কর্ণেল ইয়ামামোতোর সঙ্গে।

একবার নয়, বার বার। বর্মা ও ভারত পাশাপাশি। এমন সুযোগ যে জীবনেও আর কোনদিন পাওয়া যাবে না! এত সহজে হতাশ হলে চলবে কেন? দেখাই যাক না!

সুভাষ এবং রাসবিহারী। পৃথিবীর দুই প্রান্তে অবস্থিত দুটি ঘরছাড়া মানুষ।

দুজনেরই তখন একমাত্র লক্ষ্য—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। ব্রিটিশসিংহ

বেকায়দায় পড়েছে। এই তো সুযোগ। পৃথিবীব্যাপী এই ভাঙা-গড়ার সুযোগে যে করে হোক, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে হবে।

দিশাহীন নেতৃত্বের ফলে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। বিশেষ করে কংগ্রেসের। যুদ্ধ শুরু হয়েছে তিন বছর, কিন্তু সহ-যোগিতার প্রশ্ন নিয়ে তখনো পর্যন্ত তাদের আবেদন-নিবেদন চলেছে সেই একইভাবে।

সত্যি বলতে কি, গত তিন বছরের মধ্যে একমাত্র সুভাষকে দল থেকে বহিষ্কার করা, আর কারণে-অকারণে মুসলিম লীগ-প্রধান জিন্নাকে তোষণ করা ছাড়া কংগ্রেস আর এমন কিছুই করেনি, যা উল্লেখ করার মতো।

সর্বত্র হতাশা। সর্বত্র বিভ্রান্তি। কোথাও কোন আলোর চিহ্নমাত্র নজরে পড়ে না।

শুধু মাঝে মাঝে সেই দূরাগত কণ্ঠ সব কিছু ছাপিয়ে ভারতের তটে এসে আছড়ে পড়ে অভয় মন্ত্রের মতো ঃ

'আমি সুভাষ বলছি......

আজকের দিনে ব্রিটিশের মতো স্বাধীনতা ও প্রগতির এতবড় শত্রু আর নেই। ব্রিটিশ শাসন ধ্বংসের অর্থই হল ভারতবর্ষের এক অত্যাচারী স্বৈর শাসনের পরিসমাপ্তি। প্রিয় ভাইবোনেরা, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে আপনারা আমাকে সাহায্য করুন।

যে সাম্রাজ্যের জন্ম হয়েছিল দস্যুতার মধ্য দিয়ে, সে সাম্রাজ্য যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন লুণ্ঠন, অত্যাচার কোন কিছু করতেই সে বাকি রাখবে না। তাদের যুদ্ধ জয়ের অর্থই হল আমাদের নিজেদের দাসত্বকে চিরস্থায়ী করা।

না। সমস্ত ষড়যন্ত্র, সমস্ত ধূর্ততা দিয়েও ব্রিটিশ এবার আর ভারতকে প্রতারিত করতে পারবে না। আমরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করব। শুধু নিজেদেরই আমরা স্বাধীন করব না, স্বাধীন করব এশিয়াকে। গোটা পৃথি-বীকে। জয় হিন্দ্!'

একইভাবে মহানায়কের কণ্ঠ ভেসে আসে সুদূর টোকিও থেকে ঃ

বন্ধুগণ, আর কথা নয়। অনেক কথা হয়েছে। এবার কথা বন্ধ রেখে সংগ্রামের পথে অগ্রসর হোন।

'Action is more important and effective than words. The less you talk, the more energy you conserve for action.'

কোথায় সংগ্রাম, কোথায় কি! বরং অবস্থা আরো ঘোরালো হয়ে উঠল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে গান্ধীজীর ভুল-বোঝাবুঝির ফলে।

গান্ধীজীর অভিমত ঃ সর্বাগ্রে অহিংসা। সুতরাং সহযোগিতার প্রশ্ন নিয়ে যা-ই সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক না কেন, সব কিছুই হবে অহিংস পন্থায়।

জওহরলাল, আজাদ, প্রমুখ বেশির ভাগ সদস্যই তা মানতে রাজী নন।

তাঁদের বক্তব্য ঃ কংগ্রেস অহিংস নীতিতে আস্থাবান হলেও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করতে কোন আপত্তি নেই, যদি বিনিময়ে কিছু পাওয়া যায়।

এই নিয়ে ভুল-বোঝাবুঝি। ফলে, শেষ পর্যন্ত নেতৃত্ব ত্যাগ এবং কংগ্রেস কার্যত দ্বিধাবিভক্ত।

'...The majority of Congress Leaders rejected Gandhi's policy and called for some sort of co-operation with the British....Congress remained divided.' [Last Years of British India: Michael Edwardes: P.—86]

অবশ্য গান্ধীজীর পক্ষে এটা নতুন কিছু নয়। এর আগেও তিনি কয়েক-বার সরে গিয়েছিলেন কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। তবে বেশি দিন নয়. তারপরই আবার একদিন যথাস্থানে ফিরে এসেছেন পূর্ণ মর্যাদায়। সুভাষের ভাষায় ঃ

'Whenever any opposition raised outside his cabinet, he could always coerce the public by threatening to retire from the Congress or to fast unto death.' [The Indian Struggle: Subhas Chandra Bose.]

অর্থাৎ—যখনই গান্ধীজীর বিরুদ্ধে কোনরকম প্রতিবাদ উঠত, ঠিক তখনই তিনি কংগ্রেস ছেড়ে যাওয়া বা আমরণ অনশন করার হুমকি দিয়ে সবাইকে তাঁর মতে চলতে বাধ্য করতেন।

নিস্তরঙ্গ নদীতে ঢেউ তুললেন চীনের রাষ্ট্র-নায়ক চিয়াং কাইশেক।

ওদিকে জাপানীদের তখন জয়ের পাল্লা চলছে। সিঙ্গাপুরের পতন হয়েছে। বর্মাও যায় যায়।

প্রধানমন্ত্রী চার্চিল নির্বিকার। সব যাক, তবু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন-রকম মীমাংসায় আসতে তিনি রাজী নন। কংগ্রেস বা অন্যান্য দলগুলি সহ-যোগিতা করুক বা না করুক, তাতে তাঁর কিছু আসে-যায় না।

দেখে-শুনে ভয় পেয়ে গেলেন চিয়াং কাইশেক। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর মার্কিন বিদ্যায় শিক্ষিতা সুন্দরী পত্নীসহ ভারতবর্ষে ছুটে এলেন হন্ত-দন্ত হয়ে।

জাপানীদের প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে চীনের তখন নাভিশ্বাস উঠেছে। বর্মাও গেল বলে!

জাপানীদের অগ্রগতি রোধ করতে হলে এ সময়ে ভারতবাসীর সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন।

জওহরলাল পুরনো বন্ধু। দেখা যাক, তাঁকে বলে-কয়ে কিছু হয় কিনা!

জওহরলাল এককথায় রাজী। জাপান সাম্রাজ্যবাদী। যে করে হোক, তাদের রুখতেই হবে। সুতরাং রাজী না হবার কোন কারণ নেই।

রাজী হলেন না গান্ধীজী।

রুদ্ধদ্বার-কক্ষে চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে তাঁর কি কথা হল ঠিক জানা গেল না। কিন্তু দেখা গেল যে, সহযোগিতার ব্যাপারে তিনি জওহরলালের সঙ্গে একমত নন।

বিপদ দেখে এবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের স্মরণ নিলেন চিয়াং কাইশেক।

ভারতবর্ষের সঙ্গে একটা মীমাংসার জন্য অবিলম্বে আপনি আরো বেশি করে চার্চিলের ওপর চাপ দিন। নইলে জাপানীদের হাত থেকে কি চীন, কি ভারত, কিছুই রক্ষা করা যাবে না। ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যই এটা একান্ত প্রয়োজন।

এবার কাজ হল। হাজার হোক, রুজভেল্ট তখন মিত্রপক্ষের বড় তরফের কর্তা। লোকবল ধনবল ও সমর-সম্ভার ইত্যাদির ব্যাপারে তিনিই তখন ইংল্যান্ডের একমাত্র বল-ভরসা। তাঁর কথা অগ্রাহ্য করার মতো শক্তি ইংল্যান্ডের তখন কোথায়?

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ১১শে মার্চ তারিখে চার্চিল ঘোষণা করলেন তাঁর সদিচ্ছার কথা।

শীগগিরই আমি আমাদের ক্যাবিনেট-সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌কে মস্ত বড় একটি উপঢৌকনসহ ভারতে পাঠাচ্ছি। ভারতীয়রা নিশ্চয়ই এবার খুশি হবে।

খুশি হলেন জওহরলাল। হবারই কথা। কারণ, চিন্তাধারার দিক থেকে দুজনেই এক। কাজের বেলায়ও তাই। সুতরাং খুশি না হবার কোন কারণ নেই।

আশাবাদী নন গান্ধীজী। তাঁর অভিমত : ক্রীপস্ অত্যন্ত ভালমানুষ। কিন্তু যে যান্ত্রিক যানে তিনি উঠেছেন, সেটা হল অতি পরিচিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। ফলে, যত ভালমানুষই হোন না কেন শেষ পর্যন্ত সেই যন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করতে তিনি বাধ্য।

ওদিকে ঘোষণা শুনে ততক্ষণে প্রায় সবগুলি দলই সোচ্চার হয়ে উঠেছে বিভিন্ন দাবী নিয়ে।

বেশ বোঝা যায় যে, স্বাধীনতা আসন্ন। শুধু ক্রীপস্ আসার অপেক্ষামাত্র। সুতরাং আগে থেকেই নিজেদের দাবী-দাওয়া সম্বন্ধে সচেতন হওয়া দরকার।

কবে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে তার কোন ঠিক নেই, তবু কত রকম দাবী! একটার পর একটা। অসংখ্য দাবী।

কংগ্রেসের দাবী, আমরা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। তবে বিনিময়ে কি পাব, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ঘোষণা চাই।

হিন্দু মহাসভার মুখে অন্য কথা। কংগ্রেস! সে আবার কে? ও তো কতকগুলি বিত্তশালী লোকের একটা প্রতিষ্ঠান মাত্র। হিন্দুদের হয়ে কথা বলবার ওদের কি রাইট আছে? তা যদি বলতে হয় তো আমরাই বলব। হ্যাঁ,

আমরাও সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। হিন্দু যুবকরা দলে দলে ঢুকে যাও সেনাবাহিনীতে।

আর কমিউনিস্ট পার্টি! সেকথা তোমাকে আমি বলব আরো পরে।

লীগ-প্রধান জিন্না এর কোনটাই মানতে নারাজ। তাঁর সাফ কথা, আমাদের যা বক্তব্য, তা লাহোর অধিবেশনেই বলা হয়েছে। হিন্দুদের সংগে আমাদের কোন মিল নেই। আমরা আলাদা জাত। কিন্তু আমাদের কোন আলাদা দেশ নেই। সুতরাং আমরা পাকিস্তান চাই।

'Pakistan is our deliverance, defence, destiny. Pakistan is our only demand and we will have it.'

শিখ-সম্প্রদায়ের বক্তব্য—মুসলমানরা যদি পাকিস্তান চাইতে পারে, তাহলে আমরাই বা ছাড়ব কেন? সুতরাং আমাদেরও আলাদা 'শিখিস্তান' চাই।

শুধু এইটুকুই! ফুট্ কাটসেন আচার্য কৃপালনী, কেন, আলাদা জেনানা-স্তান চাই নে। সরোজিনী নাইডু, কমলা দেবী প্রমুখরা দাবী তুললেই তো হয়!

লক্ষ্য কর মল্লিকা যে, প্রায় সবগুলি দাবীই গড়ে উঠেছে ধর্ম ও সম্প্রদায় ভিত্তিতে, জাতীয়তার ভিত্তিতে নয়। অর্থাৎ—নিঃশর্ত স্বাধীনতা আমাদের কাম্য নয়, চাই ধর্ম ও সম্প্রদায়-ভিত্তিক স্বাধীনতা।

আর সুভাষের আজাদ হিন্দ্ ফৌজ! সেখানেও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক কম ছিল না।

কিন্তু না, একমাত্র 'জয় হিন্দ্' ছাড়া আজ আর তাদের কোন আলাদা ধর্ম নেই। তাদের একমাত্র পরিচয়—তারা ভারতীয়। তাছাড়া আর সব পরিচয়ই আজ মিথ্যে হয়ে গেছে তাদের জীবনে।

কারণ—নেতাজী। নেতাজীই তাদের শিখিয়েছেন যে, হিন্দুস্থান এক ও অভিন্ন। সেখানে মানুষে মানুষে কোন তফাৎ নেই।

"Netaji had determined to abolish or ignore all caste and religious distinction. This had great effect and in course of time it was not 'Gods' that mattered but the Nation and 'Jai Hind' that ruled the hearts of men."

[Ganpuley : P.—97]

ওদিকে সুভাষও তখন তৎপর হয়ে উঠলেন চার্চিলের ঘোষণা শুনে।

অবিলম্বে দেশবাসীকে সতর্ক করে দিতে হবে ক্রীপস্ সম্বন্ধে। মানুষ ঠেকে শেখে। আমরাও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশকে বিশ্বাস করে ঠেকে শিখেছি। সুতরাং আর ও-পথে যেতে আমরা রাজী নই।

যথাসময়ে সুভাষের সেই সতর্ক-বাণী ভেসে এল সুদূর বার্লিন থেকে :

'আমি সুভাষ বলছি......

আমার ভাইবোনেরা, ব্রিটিশ মিশন আপনারা প্রত্যাখ্যান করুন।

ভারত সম্বন্ধে তাদের সদিচ্ছা প্রমাণ করার জন্য ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে আমরা অবিরাম আবেদন জানিয়ে এসেছি। কিন্তু লাভ হয়নি কিছুই। বিশ্বাসহীন মিথ্যা ও চাতুর্য ছাড়া আর কিছুই আমরা পাইনি আমাদের আবেদনের উত্তরে।

আজ ব্রিটিশ প্রচারকগণ ভারতবাসীকে বোঝাবার চেষ্টা করছে যে, শত্রুর আসন্ন আক্রমণের আশঙ্কায় ভারতবর্ষ বিপন্ন। তার জন্যই ভারতবাসীকে এখন অপরিমিত রক্ত, শ্রম ও অশ্রু দিতে বলা হয়েছে।

কিন্তু আমি বলছি যে, ভারত-সীমান্তের বাইরে আমাদের কোন সত্যি-কারের শত্রু নেই। আসল শত্রু আমাদের ঘরেই।

জার্মানী, ইতালী বা জাপান—ভারতের বিপদের কারণ হবে, এর চাইতে বড় মিথ্যে আর কিছু নেই। আমি তাদের যতটুকু চিনি তাতে আমি জোরের সঙ্গে একথা বলতে পারি যে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা ছাড়া আমাদের সম্বন্ধে আর কোন ধারণাই ওরা পোষণ করে না।

আজ আমাদের আনন্দের দিন যে, ত্রি-শক্তির প্রচণ্ড আঘাতে আমাদের চিরকালের শত্রু ব্রিটিশের সাম্রাজ্য ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। আজ আমাদের আনন্দের দিন যে, সুদূর প্রাচ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিটি স্তম্ভ চোখের সামনে ধসে ধসে পড়ছে।

আজ আমাদের আনন্দের দিন. কারণ আজ নতুন দিনের শুরু—যেদিন শৌর্য ও বীর্য দিয়ে অর্জন করবে ভারতের স্বাধীনতা। ভারতের ন্যায্য অধি-কার। ভারতের সুখ, ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি। জয় হিন্দ্!'

সুভাষের পরে রাসবিহারী।

১৬ মার্চ রাসবিহারী আবেদন জানালেন টোকিও রেডিও থেকে। ক্রীপস্ 'যতই ভাঁওতা দিতে চেষ্টা করুক না কেন, ওদের পুরনো চালে আর আমরা ভুলব না। কি পেয়েছিল ভারত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অকুণ্ঠ সহযোগিতার বিনি-ময়ে? একমাত্র জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ছাড়া আর কিছু পেয়েছিল কি? আজ সেকথা ভুলে গেলে চলবে কেন?

...'I like to warn you again, Oh Indian brothers and leaders of Indian nationals, against Britain's old tricks. She is now sending Sir Stafford Cripps to India to deceive the Indian nation.

Be not befooled this time. Do not forget the story of the last European war. India made enormous sacrifice for helping Britain to win that war.

In lieu of her sacrifices England promised India self-rule. But, what did India get? India got martial laws and Jalianwalla Baghs.' [Rash Behari Bose—His Struggle for India's Independence: P.—167]

এখানেই থামলেন না রাসবিহারী। একই দিনে আবার তিনি আবেদন জানালেন মুসলিম লীগ-প্রধান জিন্নার উদ্দেশ্যে।

অতীতের সমস্ত বিভেদ ভুলে গিয়ে আবার আপনি আগেকার মতো সত্যিকারের জাতীয় নেতারূপে অবতীর্ণ হোন, জিন্না সাহেব। এ সুযোগ একবার হারালে আর কোনদিনই যে ফিরে পাওয়া যাবে না।

'A great mission awaits you, Janab Jinnah, in this connection...I assure you that we are all awaiting your emergence once more as a national leader.' [Ibid : P.—169]

ভারতবর্ষের রাজনীতি সম্বন্ধে সুভাষ যতটা ওয়াকিবহাল, রাসবিহারী ঠিক ততটা নন। কারণ, দীর্ঘ সাতাশ বছর তিনি দেশছাড়া। তাই গভীর প্রত্যাশা নিয়ে একের পর এক তিনি আবেদন জানাতে লাগলেন বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের কাছে।

১৮ই মার্চ আবেদন জানালেন জওহরলালের উদ্দেশ্যে :

ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস হওয়া দরকার। এশিয়ার জাতিপুঞ্জের মধ্যে স্বাধীন ভারতের পুনরুত্থান সব দিক থেকেই কাম্য।

'On behalf of the Indians in East Asia, my only prayer to you at this moment is that you realise that the doom of the British Empire is a historic necessity, and the rise of a free India as a member of the Asiatic comity of nations, is the wish of Providence itself.' [Ibid : P.—171]

২১শে মার্চ বীর সাভারকারের উদ্দেশ্যে :

ব্রিটিশ আজ হয়তো সব রকম প্রলোভনই দেখাবে। এমন কি, স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতিও দিতে পারে। কিন্তু তাদের সেই ফাঁদে পা দেওয়াটা মোটেই ঠিক হবে না, যদি তার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

'At this stage, Britain may offer all kinds of temptation to Indians—she might even offer independence. But please do not accept even independence if it would involve India in a war with which she has got nothing to do.'

[Ibid : P.—174]

সাভারকারের পরে কংগ্রেস সভাপতি মৌলনা আজাদের উদ্দেশ্যে :

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে যোগ না দেবার যে নীতি কংগ্রেস গ্রহণ করেছিল, তাতে অবিচলিত থাকুন। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

'At this time when the whole world is facing a radical change in the course of its history, and when consequently the fate of our nation seems to hang in the balance, I, Rash

Behari Bose, appeal to you with respect, hopes and expectations.

...Appealing to you once more to stick to your fixed policy of refusing to participate in any imperialistic war of England, Revered Maulana Saheb, I, at the same time, pray to God to grant you sufficient strength to lead the country to independence and security.' [Ibid: P.—174-177]

এবার চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারিয়ার উদ্দেশ্যেঃ

কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ বা উদ্ভট কল্পনা দ্বারা দৃষ্টিশক্তিকে আচ্ছন্ন করে লাভ নেই। কোনরকম আন্তর্জাতিক জটিলতায় জড়িত না হয়ে স্বাধীনতা অর্জনই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।

...'Request you all not to be let your vision be blurred by ideological chimeras, and to set independence without international complications alone at the guiding star on your present perilous journey.' [Ibid: P.—370]

রাজাগোপাল আচারিয়ার পরে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ঃ

চূড়ান্ত সময় উপস্থিত। স্পষ্ট ভাষায় আমাদের ঘোষণা করা উচিত যে, আমরা শর্তহীন স্বাধীনতা চাই।

'Now is the time for the last supreme effort on your part as well as on the part of us Indians abroad. Now is the time to assert in unmistakable terms our national birthright, that is, immediate, complete and unconditional independence.' [Ibid: P.—179]

সবশেষে সীমান্ত গান্ধী আব্দুল গফুর খান সাহেবের উদ্দেশ্যেঃ

দুঃসাহসী পাঠানদের নিয়ে এগিয়ে আসুন। সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন। স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে এবার আমরা পৌঁছে যাবই।

'Come forward with your braves Pathans, Khan Saheb, and utilize this golden opportunity afforded us by the war of Greater East Asia, to lead India to complete independence.' [Ibid: P.—394]

সেই সঙ্গে জাপ প্রধানমন্ত্রী তোজোর আবার একটি ঘোষণা শোনা গেল নতুন করেঃ

'The British influence in India is now about to be exterminated. I wish once again to repeat at this juncture Japan's expectation that not only the leaders in India but the four hundred million people there, while avoiding unnecessary calamities which will result from their being

misled by sweet flatteries of Britain, the nation, destined to down fall, will take full advantage of this heavensent opportunity and break away from the British bonds which have so long shackled them and thus go vigorously forward to realize truly their long-cherished aspiration of "India for the Indians".'

ভারতের ব্রিটিশ প্রভুত্ব শেষ হয়ে যাবার মুখে। এই সন্ধিক্ষণে আমি আবারও বলছি যে, জাপান আশা করে, শুধু ভারতীয় নেতৃবৃন্দই নয়, চল্লিশ কোটি অধিবাসীও যেন ব্রিটিশের মিষ্টি কথায় ভুলে এমন পথে না যান, যার পরিণাম হবে মারাত্মক।

যে ব্রিটিশের পতন অবশ্যম্ভাবী, তাদের স্তোকবাক্যে না ভুলে তাঁরা যেন সেই পথে এগিয়ে যান, যার মূলকথা হল—'ভারত ভারতীয়দের জন্য'।

সহসা একটা মারাত্মক খবর ভেসে এল সুদূর লন্ডন থেকে।

সুভাষ বেঁচে নেই। রয়টারের এক সংবাদদাতা জানিয়েছেন—তিনি নাকি টোকিও যাবার পথে নিহত হয়েছেন আকস্মিক এক বিমান-দুর্ঘনার ফলে।

খবর শুনে একটা বিস্মিত আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা ভারতবর্ষ। আপসহীন সংগ্রামী সুভাষ যে এমন আকস্মিকভাবে প্রাণ হারাবেন, তা কে জানত! এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত!

তার পাঠালেন গান্ধীজী। তার পাঠালেন আরো অনেকেই। সুভাষ বেঁচে নেই! এ জীবনে আর কোনদিনই তাঁর সাড়া পাওয়া যাবে না! এ দুঃখ যে কোনদিনই যাবার নয়!

'আমি সুভাষ বলছি......'

কে! কে! চমকে উঠল গোটা ভারতবর্ষ। কে কথা বলছে? কার কণ্ঠ ভেসে আসছে অদৃশ্য-লোক থেকে?

'আমি সুভাষ বলছি। ব্রিটিশ সংবাদ-প্রচারকেরা সারা পৃথিবীতে প্রচার করেছে যে, টোকিও যাবার পথে এক বিমান-দুর্ঘটনায় আমি মারা গিয়েছি। আমি মারা গেলেই যে তারা খুশি হয়, তা আমার অজানা নয়। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য যে, আজও আমি বেঁচে আছি।

সম্প্রতি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ লন্ডন থেকে যে বেতার-বক্তৃতা দিয়েছেন, তা আমি বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখেছি।

তিনি যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেই চিরাচরিত ভেদনীতিকে কাজে লাগাবার জন্য ভারত যাত্রা করেছেন. একথা আজ দিবালোকের মতোই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ।

আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, খ্রীষ্টীয় যুগের কয়েক শতাব্দী আগে, এমন কি ইংল্যান্ডের একত্রিত হবার হাজার বছরেরও বেশি আগে, মহারাজ

অশোকের রাজত্বে ভারতবর্ষ একত্রিত হয়েছিল। বহু জাতির সৃষ্টি হয়েছে ব্রিটিশের ভেদনীতির ফলেই।

তাই একদিকে তিনি যখন একদল রাজনীতিকের সংগে আলাপ-আলোচনা করার সদিচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তখনও স্বাধীনতা-সংগ্রামের সত্যিকারের নির্ভীক ও দুর্দম যোদ্ধাদের বন্দী করে রাখা হয়েছে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে।

আমি বিশ্বাস করি যে, একদিন এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের যোদ্ধাদের অকৃত্রিম আত্মশক্তি ঐ কারাগারের শক্ত প্রাচীরগুলিকে ভেঙে চৌচির করে দেবে, ভারতের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করবে, তাদের জানাবে যে, এ অপমান শুধু তাদের অপমান নয়, এ অপমান সমস্ত দেশের, সমস্ত ভারতের।

স্যার স্ট্যাফোর্ড যদি মনে করে থাকেন যে, বরাববের মতো এবারও ভারতবাসীকে ভাঁওতা দিয়ে কার্যোদ্ধার করা যাবে, তাহলে আমি বলব যে, তিনি নির্বোধের স্বর্গে বাস করছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতের সাহায্যেই ইংল্যান্ড যুদ্ধে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল।

বিনিময়ে কি পেয়েছিল সেদিন ভারত? পেয়েছিল অশেষ নির্যাতন আর অগণিত নরহত্যা। সেকথা আমরা কোনদিনই ভুলিনি।'

দূরাগত কণ্ঠ নীরব হল। প্রমাণিত হল যে, সুভাষ বেঁচেই আছেন। তাহলে কেন ব্রিটিশের এই মিথ্যে প্রচার? কি এর উদ্দেশ্য?

উদ্দেশ্য—সুভাষের সঠিক অবস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া, আর এই সুযোগে সুভাষ সম্বন্ধে ভারতবাসীর সত্যিকারের মনোভাব যাচাই করে দেখা।

দেখে খুশি হয়েছিল কি? তোমার কি মনে হয়, মল্লিকা?

সুভাষের বক্তব্য কিন্তু এখানেই শেষ হল না। আবার একসময় তাঁর দূরাগত কণ্ঠ ভেসে এল ইথার-তরঙ্গে।

তবে এবার আর ভারতবাসীকে লক্ষ্য করে নয়, ক্রীপস্-এর উদ্দেশে।

'আমি সুভাষ বলছি......'

আপনাকে আমি খোলাখুলিভাবে গুটি-কয়েক প্রশ্ন করতে চাই, স্যার ক্রীপস্।...

আপনি যখন শ্রমিক দলের হয়ে সংগ্রাম করতেন, তখন অনেকের মতো আমিও আপনাকে শ্রদ্ধা করতাম। কারণ, বরাবরই আপনি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী।

এমন কথাও আপনি বলেছিলেন যে, ইংল্যান্ডের রাজার সিংহাসন ত্যাগ করা উচিত। কারণ, এই সিংহাসনই হল সাম্রাজ্যবাদের আসল ভিত্তি।

কিন্তু আজ?

গোটা ইংল্যান্ডে চার্চিলের মতো এমন ভারত-বিদ্বেষী লোক আর

দ্বিতীয়টি নেই। একথা যে কতবড় সত্য, তা আপনার চাইতে বেশি বোধ করি কেউ জানে না।

কিন্তু কই, তা সত্ত্বেও তাঁর অধীনে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে আপনার তো একটুকুও আপত্তি দেখা গেল না!

আপনি শ্রমিক দলের নেতা। কিন্তু মুখে ভাল ভাল কথা বলা ছাড়া রক্ষণশীল দলের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের সংগে আপনাদের তফাত কোথায় বলতে পারেন?

কি হয়েছিল ১৯২৪ সালে?

কি হয়েছিল ১৯২৯ থেকে ১৯৩১—এই তিন বছরে?

আপনারাই তো সেদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন শাসন-ক্ষমতায়। তা সত্ত্বেও বেশির ভাগ সময় তখন আমাদের কেটেছিল লৌহ-কারার অন্তরালে। তাও সাধারণভাবে নয়, বিনা বিচারে।

মোট এক লক্ষ লোককে সেদিন আপনারা ঠাঁই দিয়েছিলেন কারাগারে।

তাছাড়া কথায় কথায় বেপরোয়া লাঠি-চার্জ, পেশোয়ারে নির্বিরোধী জনতার ওপর অমানুষিক গুলী-বর্ষণ, বাংলাদেশের গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করা, নারী-নির্যাতন,—এসব তো আছেই। তাহলে তফাতটা কোথায়?

একথা কি আপনি জানেন না যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস হল প্রতিশ্রুতি ভাঙা এবং প্রতিশ্রুতি পূরণ না করারই ইতিহাস?

একথা কি আপনি জানেন না যে, আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের একমাত্র দাবী হল—পূর্ণ স্বাধীনতা? তা সত্ত্বেও আপনার মতো খ্যাতিমান লোকের অন্য কোন বিকল্প প্রস্তাব নিয়ে ওখানে যাবার মধ্যে সার্থকতা কোথায়?

সাধারণ মানুষের কাছে আপনার এই ভূমিকা অন্যান্য ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের মতোই মিথ্যা ও প্রবঞ্চনাময় বলে মনে হবে। কারণ, তারা জানে যে, ভারতের একমাত্র শত্রু হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং সেই সাম্রাজ্যবাদের শোষণ থেকে মুক্ত হওয়াই ভারতবাসীর একমাত্র লক্ষ্য।'

২২শে মার্চ তারিখে ক্রীপস্ এসে পা দিলেন ভারতের মাটিতে।

অবশ্য দু বছর আগেও তিনি একবার এসেছিলেন। তবে সেবার এসেছিলেন বেসরকারী দূত হিসেবে। এবার মন্ত্রিসভার সদস্যরূপে।

তাছাড়া এ ক্রীপস্, সে ক্রীপস্ নন। ইংল্যাণ্ডে তিনিই এখন সবচাইতে জনপ্রিয় ব্যক্তি।

কারণ—রাশিয়া। মস্কোর ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতরূপে তিনিই যে সেদিন নানাভাবে প্ররোচনা দিয়ে শেষ পর্যন্ত কার্যোদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেকথা কোনরকমেই অস্বীকার করার উপায় নেই।

নীতিগত দিক থেকে হাজার অমিল থাকা সত্ত্বেও দেশের চরম দুর্দিনে রাশিয়ার মতো শক্তিশালী রাষ্ট্রকে মিত্ররূপে পাওয়া কি কম কৃতিত্বের কথা?

এবারও যে বেছে বেছে তাঁকেই ভারতে পাঠানো হয়েছে তার কারণও সেই একই।

ক্রীপস্ অভিজ্ঞ লোক। রাশিয়ার মতো রাষ্ট্রকে যিনি কাছে টানতে পেরেছেন. ভারত তো তাঁর কাছে কিছুই নয়। সুতরাং সাফল্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না।

যথাসময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানানো হল ক্রীপস্-এর পক্ষ থেকে। এসো, আলাপ-আলোচনা করে একটা কিছু সিদ্ধান্তে আসা যাক।

কিন্তু ফরোয়ার্ড ব্লক! না, ক্রীপস্ সাহেব ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে কথা বলতে রাজী নন। ওদের হুঁকো-নাপিত বন্ধ।

কারণ! প্রশ্ন তুললেন ফরোয়ার্ড ব্লক প্রেসিডেণ্ট আর. এস. রুইকর।

কারণ? উত্তর দিলেন ক্রীপস্ সাহেব, কারণ তোমাদের নেতা শত্রুপক্ষের হয়ে কাজ করেছেন।

'Owing to the fact that the President of your organisation has been actively co-operating with enemy powers.'

অবশ্য সরকারী মুখপাত্র স্টেটস্ম্যানের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। ক্রীপস্-এর মতো রেখে-ঢেকে না বলে খোলাখুলিভাবেই তারা সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তাদের কর্তব্যের কথা।

না, কোন দয়া নয়। কোন ক্ষমা নয়। সরকারের উচিত বাংলাদেশের সুভাষ-সমর্থকদের অবিলম্বে হত্যা করা। হত্যাই তাদের একমাত্র শাস্তি।

...Nevertheless we all know that Bengal was the home of a small but convinced pro-fascist party led by Mr. Subhas Chandra Bose.

It is the business of the Government to round up the enemies of the country forthwith and put them to death. No quarter whatever should be given to them...The penalty for traitors to India must be death.'

[The Statesman : 13.3.42]

জবাব দিয়েছিলেন তখনকার সময়ের 'ফরোয়ার্ড ব্লক' পত্রিকার সম্পাদিকা বিপ্লবী-নায়িকা লীলা রায়: 'We shall not stand it.' এ আমরা সইব না।

যথাসময়ে ক্রীপস্ তাঁর উপঢৌকন বের করলেন ঝুলি থেকে। সেই পুরনো কায়দা। তোমরা যুদ্ধে নামো, আমরা তোমাদের খুশি করে দেব। তবে কিনা এখন নয়, যুদ্ধে জয়ী হবার পরে। কথা দিলাম।

জওহরলাল, মৌলানা আজাদ প্রমুখ সবাই রাজী। চমৎকার প্রস্তাব! সুতরাং আপত্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু কংগ্রেসে জওহরলালই সব নন। সুতরাং সে দায়িত্ব নিতে হল অগতির গতি সেই গান্ধীজীকেই।

কিন্তু সব বৃথা। ক্রীপস্ বুদ্ধিমান লোক। কথাও বলতে পারেন

চমৎকার। তবু জওহরলাল আর গান্ধীজী এক নন। তাই কথার মারপ্যাঁচে সবাইকে ভোলাতে পারলেও হোঁচট খেতে হল এই অসাধারণ মানুষটির কাছেই।

সহজ সরল কথা। তোমরা আমাদের খুশি করতে চাইছ যুদ্ধ জয়ের পরে। যুদ্ধে যে তোমরা জয়ী হবেই তার কি মানে আছে? গ্যারাণ্টি আছে কিছু? এ তো 'A post-dated cheque on a crashing bank.'

বার বার অনুরোধ জানালেন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট।

একটা কিছু মীমাংসায় না এসে ক্রীপস্ যেন ভারত থেকে বিদায় না নেয়। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে. তাতে যুদ্ধে জয়ী হতে হলে ভারতবর্ষের সহযোগিতাই আজ সবচাইতে বেশি প্রয়োজন।

চার্চিলকেও তিনি তার পাঠালেন অনুরূপভাবে। সত্যিই যদি ভারতকে তোমাদের খুশি করার মতো সদিচ্ছা থাকে, তবে দুদিন আগে করলেই বা ক্ষতি কি! কথাটা একবার ভেবেই দেখ না দয়া করে!

এখানেই শেষ নয়। সেই সঙ্গে আরো একটি অভিনব প্রস্তাব করা হল মার্কিন মহল থেকে:

'There is only one possible chance to make up a little of the lost time to spike the guns of Bose opposition. Nehru must be asked to become Prime Minister and Minister for Defence.' [Leadership and Political Institution of India]

অর্থাৎ—পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য নেহরুকে একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী করা হোক।

না, অন্য কোন কারণে নয়, সুভাষের অগ্রগতি রোধ করার জন্য।

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একটা কথা, মল্লিকা! সুভাষের গতিরোধ করার কথা চিন্তা করতে গিয়ে মার্কিনীদের সেদিন জওহরলালের কথা মনে হল কেন?

না, এ প্রশ্নের কোন উত্তর আমার জানা নেই।

কোন প্রস্তাবেই রাজী হলেন না চার্চিল। ভারত এখন গুরুতর বিপদের সম্মুখীন। এ সময়ে তাদের ওপর শাসনভার ছেড়ে দিলে তারা কি পারবে জাপানীদের হাত থেকে নিজেদের দেশ রক্ষা করতে?

না, তা হয় না। জেনে-শুনে ভারতকে তিনি এতবড় বিপদের মধ্যে ঠেলে দিতে রাজী নন। হাজার হোক, ভারত সম্বন্ধে তাঁর একটা নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে বৈকি! তবে হ্যাঁ, যুদ্ধের পর যত শীগ্‌গির সম্ভব ভারতের কথা তিনি বিবেচনা-করে দেখতে রাজী আছেন।

কেউ রাজী হল না ক্রীপস্-এর প্রস্তাবে। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ. হিন্দু মহাসভা—কেউ না।

খবর শুনে মন্ত্রিসভায় সর্বসমক্ষে দাঁড়িয়ে আনন্দে নেচে উঠলেন চার্চিল। যাক বাপু. সাপও মরেছে—লাঠিও ভাঙেনি। আমরা তো ওদের স্বাধীনতা

দিতেই চেয়েছিলাম। ওরা যদি নিজেরা একমত-হতে না পারে তো আমরা তার জন্যে কি করতে পারি, বলো!

'When Churchill received news from India that the Cripps' Mission had failed, he is reported to have danced around the cabinet room.' [Last Years of British India: Michael Edwards: P.—30]

রুজভেল্টের ধারণা কিন্তু অন্যরকম। তাঁর মতে ব্রিটিশের সদিচ্ছার অভাবই এর জন্য দায়ী।

১২ই এপ্রিল তারিখে বেশ খোলাখুলিভাবেই সেকথা তিনি জানিয়ে দিলেন চার্চিলকে:

'...The deadlock has been due to the British Government's unwillingness to concede the right of Self-Government to the Indians...'

ব্যর্থ হয়ে ক্রীপস্ ফিরে গেলেন নিজের দেশে।

তবে একেবারে খালি হাতে নয়। সঙ্গে নিয়ে গেলেন জওহরলালের দেওয়া অজস্র প্রতিশ্রুতি। গান্ধীজী বা কংগ্রেস সহযোগিতা না করলেও বন্ধু জওহরলাল তাঁকে একটুকুও হতাশ করেননি এ ব্যাপারে। বলেছিলেন:

'...The Japanese must be resisted. We are not going to surrender to the invader'.

এখানেই থামেননি জওহরলাল। আসল কথা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন পরের লাইনটিতে:

'Inspite of all that has happened, we are not going to embarrass the British war effort in India...'

[India Wins Freedom: Azad]

অর্থাৎ—জাপানকে আমরা রুখবই। কিছুতেই আমরা ভারতবর্ষে ইংরেজের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় এতটুকু ব্যাঘাত ঘটতে দেব না।

জওহরলাল জাপানকে রুখতে চান—ভাল কথা। কিন্তু একটা প্রশ্ন, মল্লিকা! ভারতকে কে পদানত করে রেখেছে দুশো বছর ধরে? জাপান, না ইংরেজ? তাহলে রাতারাতি সেকথা ভুলে গিয়ে সেই ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতার প্রশ্ন আসে কি করে? কোন্ যুক্তিতে?

এর উত্তর রয়েছে গান্ধীজীর একটি উক্তির মধ্যে:

'He is more English than Indian in his thoughts and make up. He is often more at home with Englishmen than with his countrymen.'

অর্থাৎ—জওহরলাল যতটা না ভারতবাসী, তার চাইতে অনেক বেশি

ইংরেজ। তাই দেশবাসীর চাইতেও তিনি ঢের বেশি খুশি হন ইংরেজের সাহচর্য পেলে। [কংগ্রেসের ইতিহাস ঃ ডাঃ পট্টভি ঃ ২য় খণ্ড ঃ পৃঃ ১৩২]

সুতরাং বিলাতি ভাবধারায় মানুষ জওহরলালের মতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী নয়, সাম্রাজ্যবাদী হল এশিয়ার একমাত্র বিদেশী কবল-মুক্ত স্বাধীন রাষ্ট্র জাপান। যে করে হোক, তাকে রুখতেই হবে।

কিন্তু একি!

সহসা ভারতের কোটি কোটি মানুষ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল হরিজন পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিবৃতি দেখেঃ

'জাপান যে ভারত আক্রমণ করবেই তার কি মানে আছে? নাও তো করতে পারে!

তবু যদি করে তাহলে বুঝতে হবে যে, ইংরেজরা এদেশে রয়েছে বলেই করেছে। তার চাইতে ওরা আমাদের দেশ থেকে চলে যাক। তারপর আমাদের ভাল-মন্দ আমরাই বুঝতে পারব।

আর আক্রমণ করলেই বা কি! ভারতবাসী আজ যে শোচনীয় অবস্থার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে, জাপান আক্রমণ করলেও তার চাইতে খারাপ অবস্থা হবে না নিশ্চয়ই।'

এ কার বিবৃতি! একি চোখের ভুল, না কি দিবাস্বপ্ন!

না, কোনটাই নয়। কোথাও অস্পষ্টতা নেই। কোথাও এতটুকু কুয়াশার জাল নেই। সব কিছুই দিবালোকের মতো স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ।

বিবৃতি দিয়েছেন গান্ধী। মহাত্মা গান্ধী।

কিন্তু এ কোন্ গান্ধী!

'সংগ্রাম চাই' বলে সুভাষ প্রতিনিয়ত মাথা খুঁড়ে মরলেও যে গান্ধী এতকাল সংগ্রামের পথ সযত্নে পরিহার করে কেবলমাত্র আবেদন-নিবেদন করাটাকেই স্বাধীনতা লাভের একমাত্র পন্থা বলে মেনে নিয়েছিলেন, এ কি সেই গান্ধীর উক্তি! এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত!

'আমি সুভাষ বলছি......'

অভিনন্দন ভেসে এল সুদূর বার্লিন থেকে।

'প্রিয় ভাইবোনেরা, ক্রীপস্-প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে আমি আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এখনো আমাদের দেশের কোন কোন লোক আছেন, যাঁরা নিজেদের কংগ্রেসী বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন, অথচ বিনা শর্তে ব্রিটিশের সংগে সহযোগিতার কথা বলতে তাঁদের এতটুকুও বাধে না।

এই সমস্ত ব্যক্তিদের স্মৃতিশক্তি কি এতই কম যে, কংগ্রেসের আদর্শের কথা তাঁরা ভুলে গেছেন?

কি প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল ১৯৩৮ সালে অনুষ্ঠিত হরিপুরা কংগ্রেসে? যুদ্ধে অসহযোগিতার প্রস্তাবই কি সেদিন গৃহীত হয়নি?

এমন কথাও কি বলা হয়নি যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে যুদ্ধে জড়াতে চাইলে আমরা সর্বশক্তি দিয়ে তাকে প্রতিরোধ করব?

এম. এন. রায়ের মতো খ্যাতিমান নেতা যুদ্ধে সহযোগিতার কথা বলেছিলেন বলে ইতিপূর্বে তাঁকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

আজ যাঁরা কংগ্রেসের নীতি অমান্য করে সহযোগিতার কথা বলছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, তা নিশ্চয়ই আমরা জানতে চাইব।

অক্ষশক্তি আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। আমাদের পক্ষে এটা একটা অপূর্ব সুযোগ।

ভারতের সবচাইতে বড় শক্তি—যুব-সম্প্রদায়। তাদের এখন একমাত্র কর্তব্য, বর্তমানের এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নেওয়া, যাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ওপর এক নতুন স্বাধীন ভারত গড়ে উঠতে পারে।

জাপ-প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজোর নীতিই আজকের দিনে একমাত্র বাস্তব নীতি। এর কোন বিকল্প নেই।

আমি অক্ষশক্তির সমর্থক নই। তাদের সমর্থন করা আমার পেশা নয়। আজকের দিনে যে-কোন চিন্তাশীল মানুষের কাছে একথা স্পষ্ট যে, ভারতবর্ষের সত্যিকার শত্রু শুধু একটিই। সে শত্রু হল—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ।

দুটি মাত্র পথ এখন আমাদের সামনে খোলা রয়েছে। হয় স্বাধীনতা, নয়তো চিরদাসত্ব। এর একটা আমাদের বেছে নিতেই হবে। জয় হিন্দ্!'

একইভাবে রাসবিহারী অভিনন্দন জানালেন টোকিও রেডিও থেকে:

'On behalf of the Indians in East Asia I wish to convey to you our sense of relief at the failure of Sir Stafford Cripps and his empty-handed departure from India.

By refusing to entertain any of his proposals, your leaders have saved you from a danger the dimensions of which are hard to encompass.' [Rash Behari Bose—His Struggle of India's Independence: P.—388]

ক্রীপস্ বিদায় নিলেন।

কিন্তু তারপর? যুদ্ধ শুরু হয়েছে তিন বছর, কিন্তু এখনো কোনো স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি কংগ্রেসের পক্ষে। এই অচল অবস্থা দূর করার উপায় কি?

উপায় বাতলে দিলেন কংগ্রেসের অন্যতম মস্তিষ্ক, চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারিয়া। ঝুট-ঝামেলা করে লাভ নেই। ওদের পাকিস্তান দাবী মেনে নাও। ব্যস, মুশকিল আসান!

শুধু মুখেই নয়, মাদ্রাজ কংগ্রেস বিধানমণ্ডলীর সভা থেকে এই মর্মে

এক প্রস্তাবও তিনি পাশ করিয়ে নিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে। পার্টিশন ছাড়া কোন উপায় নেই। সুতরাং আর দেরি নয়।

প্রস্তাবের খানিকটা অংশ তুমি শোন :

...'this party is of opinion and recommends to the All-India Congress Committee that to sacrifice the chances of formation of a national Government at this grave crisis for the doubtful advantage of maintaining a controversy over the unity of India is a most unwise policy and that is has become necessary to choose the lesser evil and acknowledge the Muslim League's claim for separation...'*

সর্বত্র বিরূপ সমালোচনা। সর্বত্র বিক্ষোভ। শেষে কিনা রাজাজীর মুখ থেকে এই কথা! এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত।

রাজাজী অটল অনড়। শেষ পর্যন্ত তিনি পদত্যাগ করলেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে, পরে মাদ্রাজ বিধানসভার সদস্যপদ থেকে। তবুও একচুলও তিনি নড়লেন না নিজের বক্তব্য থেকে।

মাদ্রাজ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য। সুতরাং রাজাজীর পক্ষে এভাবে পাকিস্তানের স্বপক্ষে প্রস্তাব পাশ করানোর মধ্যে আর যাই থাক না কেন, নিজেদের ক্ষয়-ক্ষতির কোন প্রশ্ন ছিল না।

কিন্তু তা যদি না হত? যদি মাদ্রাজের অবস্থাও বাংলা বা পাঞ্জাবের মতো হত? পারতেন কি তখন রাজাজী নিজেদের অঙ্গচ্ছেদ করে এ ধরনের উদারতা দেখাতে? তোমার কি মনে হয়, মল্লিকা?

আরো কথা আছে। শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে সুভাষকে একদিন বহিষ্কার করা হয়েছিল কংগ্রেস থেকে। কিন্তু রাজাজী! এত কাণ্ডের পরেও তাঁর বেলায় তেমন কিছু হয়েছিল কি?

না, হয়নি। গান্ধীজীর বৈবাহিক রাজাজী সম্বন্ধে সে প্রশ্নই সেদিন কারো মনে জাগেনি। তফাৎ এইখানেই।

২৮শে মার্চ টোকিও সম্মেলন শুরু হল রাসবিহারীর সভাপতিত্বে।

শুরুতেই বিভ্রাট।

ক্যাপ্টেন মোহন সিং, লেঃ কর্ণেল গীল, এন. রাঘবন, গুহ, মেনন প্রমুখ প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রথম বিমানটি নির্বিঘ্নেই পৌঁছে গেল টোকিওতে।

যান্ত্রিক গোলযোগের দরুন দুর্ঘটনা ঘটল পরেরটার বেলায়। জানা গেল, যাত্রীদের মধ্যে কেউ বেঁচে নেই। স্বামী সত্যানন্দ পুরী, গিয়ানী প্রীতম সিং, নীলকান্ত আয়ার, ক্যাপ্টেন মহম্মদ আক্রাম খাঁ প্রমুখ চারজনকেই প্রাণ দিতে হয়েছে আকস্মিক সেই বিমান-দুর্ঘটনার ফলে।

---

* হে অতীত কথা কও: সত্যানন্দ স্বামী: পৃ: ৪২২

খবর শুনে একটা বিস্মিত আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি নরনারী।

স্বামী সত্যানন্দ পুরী। থাইল্যাণ্ডের সর্বাধিক জনপ্রিয় নেতা স্বামী সত্যানন্দ পুরী। বাংলার বৈপ্লবিক সংস্থা অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট সদস্য, ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক ডঃ সত্যানন্দ পুরীর অভাব যে কোনদিনই পূর্ণ হবার নয়! অন্তত থাইল্যাণ্ডবাসীরা তাঁর অবদানের কথা বোধহয় ভুলতে পারবে না কোনদিনও।

শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বার্তা পাঠালেন জাপ-প্রধানমন্ত্রী তোজো :

'The cause for which they gave up their lives need not go in vain.

...In expressing sympathy over the loss of the four heroic souls I pledge to extend all possible aid for the complete independence of India.'

[Chalo Delhi : S. A. Das & M. B. Subbaiah : P—13]

যে মহৎ উদ্দেশ্যে ও'রা প্রাণ দিয়েছেন, তা বৃথা যাবে না।

বীর চতুষ্টয়ের মৃত্যুতে আমি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি এবং সেই সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সম্ভবপর সব রকম সাহায্যই আমরা করতে প্রস্তুত।

পৃথিবী কারো মুখ চেয়ে তার চলার গতি বন্ধ করে না। তাই নির্দিষ্ট দিনেই টোকিওর সান্নো হোটেলে সম্মেলন শুরু হল মহানায়ক রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হল টোকিও সম্মেলনে।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসেবে অবিলম্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি জায়গায় ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের (Indian Independence League) শাখা অফিস গড়ে তুলতে হবে।

আর সুভাষের আদর্শে এখানেও একটি আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গড়ে তুলতে হবে, যারা লড়াই করে ভারতভূমিকে শত্রুকবল-মুক্ত করবে নিজেদের বুকের রক্ত দিয়ে।

এ বাহিনী গঠিত হবে একমাত্র ভারতীয়দের নিয়ে। অভিযান পরিচালনা করবে একমাত্র তারাই। সেখানে বাইরের কোন হাত থাকবে না।

লীগের লক্ষ্য হবে মোট তিনটি। Unity, Faith, Sacrifice. একতা, বিশ্বাস ও বলিদান।

মোট দুটি বিভাগ থাকবে লীগের অধীনে। একটি সামরিক, অন্যটি অসামরিক। সামরিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হবে—যুদ্ধ-বিভাগ, রিক্রুটিং, সামরিক গোয়েন্দা-বিভাগ, সামরিক পুলিশ-বিভাগ ও যুদ্ধবন্দী বিভাগসমূহ।

আর বৈদেশিক, অর্থ, আইন, প্রচার, প্রশাসন. ত্রাণ. পুলিশ, গুপ্তচর-বিভাগ, স্বেচ্ছাসেবক ইত্যাদি দপ্তরগুলি থাকবে অসামরিক বিভাগের আওতায়।

চাই উপযুক্ত প্রচার। লীগের আদর্শ সর্বত্র পেঁছে দিতে হবে। বেতার: ইস্তাহার, সংবাদপত্র, বক্তৃতা, প্রদর্শনী ও সঙ্গীতের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঘরে ঘরে ডাক পাঠাতে হবে। স্বাধীনতার ডাক। সংগ্রামের ডাক।

শুধু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নয়, ভারতবর্ষের অভ্যন্তরেও প্রচারকার্য চালাতে হবে যথাযথভাবে। দরকার হলে গোপনে ভারতবর্ষে গিয়ে ওখানকার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। বলতে হবে—আমরা প্রস্তুত। তোমরাও প্রস্তুত থাকো সেদিনের জন্য।

আরো ঠিক হল যে, শীগগিরই একটি সম্মেলন ডাকা হবে ব্যাঙ্কক-এ। সেখানেই সবকিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে পাকাপাকিভাবে।

টোকিও সম্মেলন শেষ হল।

দেখতে দেখতে একটা ঘুমন্ত দৈত্য জেগে উঠল যেন কোন্ মায়া কাঠির স্পর্শ পেয়ে।

সর্বত্র একই রব। এগিয়ে চলো। এগিয়ে চলো। পেছনে তাকাবার সময় নেই। হিসেব-নিকেশের ফুরসত নেই। সামনে দুরন্ত সংগ্রামের দিন। তার জন্য সবাই প্রস্তুত হও এখন থেকে।

বিদাদরী, নীসুন, ক্রাঞ্জি ইত্যাদি ভারতীয় বন্দী-শিবিরের সেনাবাহিনীর মধ্যেও সেই একই চঞ্চলতা। কোথায় যেন একটা প্রহর বাজবার সঙ্কেত-ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আর সময় নেই। সবাই প্রস্তুত হও।

মাঝে মাঝেই বার্লিন থেকে কার যেন উদাত্ত আহ্বান ভেসে আসে বেতার-তরঙ্গে ঃ

'When British Imperialism is defeated, India will get her freedom. If on the other hand British Imperialism should somehow win the war, then India's slavery would be perpetuated for ever. India is therefore, presented with the choice between Freedom and Slavery. She must make her choice.'

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পরাজিত হলে তবেই হবে ভারতের মুক্তি। তারা বিজয়ী হলে ভারতবর্ষকে চিরকালের মতো দাসত্বের বোঝা বহন করতে হবে। সুতরাং ভারতকে আজ বেছে নিতে হবে যে, স্বাধীনতা এবং দাসত্বের মধ্যে কোন্‌টা তার কাম্য।

শুনতে শুনতে আরো উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে প্রতিটি সৈনিক। নেতাজী! নেতাজী! নেতাজীর কথা! কোন্‌টা সত্য! কোনটা বেশি কাম্য! দেশের স্বাধীনতা, না বিদেশীর দাসত্ব?

এদিকে টোকিও থেকে ফিরে এসেই ক্যাপ্টেন মোহন সিং এক সভা ডাকলেন বিদাদরী বন্দী-শিবিরে। খোলাখুলিভাবেই সেদিন তিনি তাঁর বক্তব্য রাখলেন সেনাবাহিনীর কাছে।

এতকাল আমরা পরের জন্য লড়াই করেছি। এবার লড়াই করব নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্য। নইলে কি করবে আমাদের পৃথিবীর মানুষ! কি জবাবদিহি করব ভাবী বংশধরদের কাছে! স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে অকৃতজ্ঞ বলেই কি আমরা চিহ্নিত হয়ে থাকব চিরদিন?

প্রথমেই বেশ কয়েক হাজার সৈন্য যোগ দিল আজাদ হিন্দ্ বাহিনীতে। ক্রমশ সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল ধীরে ধীরে। তারপর দলে দলে। কাতারে কাতারে। সামরিক-অসামরিক সবাই।'

'His propaganda was particularly successful and he managed to convince approximately 30,000 prisoners of war who volunteered to join the I.N.A.

He was particularly fortunate in having such men as Cols. Gill and Chatterjee to advice and assist him in his task.'

[I. N. A. & Its Netaji: Shahnawaz Khan: P.—24]

অর্থাৎ—ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর প্রচারকার্য খুবই সফল হয়েছিল। প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছিল আজাদ হিন্দ্ ফৌজে। তাঁর সৌভাগ্য যে, এ ব্যাপারে তিনি কর্ণেল গীল এবং চ্যাটার্জীর মতো অফিসার-দের সহকারী এবং পরামর্শদাতারূপে পেয়েছিলেন।

কর্ণেল এন. এস. গীল নীসুনে অবস্থিত যুদ্ধবন্দী হেড কোয়ার্টার্সের পরিচালক। আর চ্যাটার্জী! মেজর জেনারেল এ. সি. চ্যাটার্জীকে তো তুমিও জানো, মল্লিকা।

আশ্চর্য, আত্মসমর্পণের মাত্র পনের দিন আগে তিনি গিয়েছিলেন সিঙ্গাপুরে। তারপরই বিপর্যয়ের মুখে। অবশেষে ডিরেকটার অব মেডিক্যাল সার্ভিসেসরূপে আজাদ হিন্দ্ ফৌজে। কর্মদক্ষতার গুণে পরে আরো গুরুত্ব-পূর্ণ পদে। সে-সব কাহিনী তোমাকে শোনাব আরো পরে।

এপ্রিলের শেষভাগেই রাসবিহারী তাঁর হেড কোয়ার্টার্স স্থাপন করলেন ব্যাঙ্কক-এ এসে। সঙ্গে এলেন আনন্দ মোহন সহায়, দেশপাণ্ডে প্রমুখ সহ-কর্মিবৃন্দ। ব্যাঙ্কক-এ সম্মেলনের দিন ধার্য হয়েছে ১৫ই জুন। তার জন্য প্রস্তুত হওয়া দরকার।

অন্যতম সহকর্মী দেবনাথ দাস অবশ্য দেড় বছর আগেই ব্যাঙ্কক চলে এসেছিলেন রাসবিহারীর নির্দেশে। কাজও তিনি এগিয়ে রেখেছিলেন অনেক-খানি। প্রধানত স্বামী সত্যানন্দ পুরী এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় সেখানে গড়ে উঠেছিল ঐতিহাসিক 'থাই-ভারত কালচারাল লজ',—যার ফলে দুটি ভিন্ন

রাষ্ট্রের মানুষ সেদিন পরস্পরকে চিনতে পেরেছিল একান্ত কাছের মানুষ বলে। সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে এর মূল্য ছিল সত্যিই অপরিসীম।

ওদিকে সুভাষের মাথায় তখন একই চিন্তা 'India for the Indians.' কবে এই স্বপ্ন সফল হবে? কবে?

অবশ্য মুসোলিনী আগেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, ইতালীই সুভাষের প্রধান কর্মকেন্দ্র হোক।

রাজী হতে পারেননি সুভাষ। স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়েই এটুকু তিনি বুঝে নিতে পেরেছিলেন যে, মুসোলিনীর যতই আন্তরিকতা থাক না কেন, আসল চাবি-কাঠি রয়েছে জার্মানীরই হাতে।

মুসোলিনীর পরে তোজো। শুধু একবার নয়. বার বার তিনি ঘোষণা করেছেন সেই একই কথা: 'India for the Indians.' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সম্ভবপর সব রকম সহযোগিতাই আমরা করতে প্রস্তুত।

কিন্তু শুধু মুসোলিনী বা তোজো ঘোষণা করলেই হবে না। পায়ের নিচে শক্ত জমি চাই। চাই ত্রি-পক্ষীয় ঘোষণা। অর্থাৎ—জার্মানী, ইতালী ও জাপানকে একসঙ্গে একথা ঘোষণা করতে হবে সুস্পষ্ট ভাষায়।

আলাপ-আলোচনার জন্য ২৯শে এপ্রিল তারিখে হিটলার আর মুসোলিনী একসঙ্গে মিলিত হলেন ওবেরশাল্জ্বুর্গে।

ভারত সম্বন্ধে সিনর ম্যাজিট্রো ত্রি-পক্ষীয় ঘোষণা দাবী করেছেন। কি করা যায় এখন এ পরিপ্রেক্ষিতে?

ঠিক হল—না, এখনও তার উপযুক্ত সময় আসেনি। কারণ—যুদ্ধ-পরিস্থিতি।

জার্মানীর গ্রীষ্মকালীন রাশিয়া অভিযান আসন্ন। এ সময়ে এতবড় ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। সময় হলে নিশ্চয়ই বিবেচনা করে দেখা হবে।

সুভাষ তখন রোমে। খবর শুনে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গিয়ে দেখা করলেন পররাষ্ট্র-মন্ত্রী কাউন্ট চিয়ানোর সঙ্গে।

তারপর ৫ই মে খোদ মুসোলিনীর সঙ্গে। ত্রি-পক্ষীয় ঘোষণা চাই-ই। এটা করতেই হবে তোমাদের।

পরের ইতিহাস কাউন্ট চিয়ানোর ডায়েরী থেকেই তুমি শোন:

'Mussolini allowed himself to be persuaded by arguments produced by Bose to obtain a tripartite declaration in favour of Indian independence. He has telegraphed the Germans proposing—contrary to the Salzburg decisions—proceeding at once with the declaration.'

[The Springing Tiger: P.—66]

অর্থাৎ—ভারতের স্বাধীনতার জন্য ত্রি-পক্ষীয় ঘোষণার ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত মুসোলিনী সুভাষচন্দ্রের যুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হলেন। শালুজ্-বুর্গ সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিয়ে জার্মানী যাতে তখনই ঐ ঘোষণার ব্যাপারে অগ্রসর হয়, সেজন্য তাদের কাছে তার পাঠালেন তিনি।

তার-যোগে আরও একটি কথা মুসোলিনী জানিয়ে দিলেন জার্মান সরকারকে। সুভাষকে তিনি পাল্টা সরকার গঠন করতে বলেছেন। এটা খুবই দরকার।

জার্মানী কিন্তু মুসোলিনীর এই প্রস্তাব খুব একটা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেনি, মল্লিকা।

প্রমাণ, তাদের প্রচার-সচিব গোয়েবল্স্-এর ডায়েরী। সেখানে স্পষ্টই তিনি লিখেছেন:

'We don't like this idea very much, since we do not think the time has yet come for such a political manoeuvre. It does appear though that the Japanese are very eager for some such step. However, emigre governments must not live too long in a vacuum. Unless they have some actuality to support them, they only exist in the realm of theory.'

[The Springing Tiger : P.—66]

অর্থাৎ—এ ধরনের কোন ঘোষণা করার উপযুক্ত সময় এসেছে বলে আমরা মনে করি নে, যদিও জাপানীরা তার জন্য খুবই ব্যগ্র। অবশ্য কোন প্রবাসী সরকারের পক্ষে বেশি দিন এভাবে অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে থাকা সম্ভব নয়। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রত্যক্ষ সমর্থন না পাওয়া যায়, ততক্ষণ কেবল-মাত্র কল্পনার জগতেই তাদের বাস করতে হয়।

ওদিকে তখন বর্মার পতন হয়েছে। প্রধান সেনাপতি ওয়াভেল্ পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছেন ভারতবর্ষে। অনেক যুদ্ধ হয়েছে আর ওসব নয়।

ভারতবর্ষ বর্মার ঠিক গায়ে গায়ে লাগানো। একবার যাওয়া যায় না ওখানে!

আবার সুভাষ দেখা করলেন বার্লিনের জাপ-রাষ্ট্রদূত জেনারেল ওশিমার সঙ্গে। একদিন নয়, দিনের পর দিন। প্রতি সপ্তাহে।

মিলিটারি এটাচি হিগুতির ভাষায়:

'The request of Mr. Chandra Bose become more and more fervent. He came almost every week.'

কথায় কথায় একদিন জানতে চাইলেন মিলিটারী এটাচি হিগুতি:
মহানায়ক রাসবিহারীর সঙ্গে পরিচয় আছে কি?

সুভাষের উত্তর ঃ

'I don't know him. But the fact that he is fighting for the independence of India in Tokyo for so many years is very encouraging. I shall be happy if I can fight as a soldier under Mr. Rash Behari Bose, as it is good for the independence of India. In conclusion you must send me as soon as possible to Tokyo.'

[Rash Behari Bose—His Struggle for India's Independence]

অর্থাৎ—না, পরিচয় নেই, তবে তাঁর দীর্ঘদিনব্যাপী সংগ্রামের কথা আমি জানি। তাঁর অধীনে একজন সৈনিক হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেলে আমি খুশি হব। তোমরা আমাকে নিয়ে যেতে পার না তাঁর কাছে! দেখ না একবার চেষ্টা করে!

হ্যাঁ, এই হল সুভাষ। এ সুভাষ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। এ সুভাষকে চিনতে সময় লাগে না। লক্ষ্য তাঁর একটাই। সে লক্ষ্য হল—স্বাধীনতা। বহু-আকাঙ্ক্ষিত সেই স্বাধীনতা কার নেতৃত্বে আসবে, সে-সব ক্ষুদ্র চিন্তা তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেনি কোনদিনও।

জাপ-দূতাবাস থেকে আশাব্যঞ্জক কোন খবর না পেয়ে ২২শে মে সুভাষ নিজেই এক নোট পাঠিয়ে দিলেন জার্মান সরকারের কাছে ঃ

'দূর-প্রাচ্যের ঘটনাবলী সবই অবগত আছেন। জাপানীরা ভারত-সীমান্তে উপস্থিত। ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে এই তো তার অপূর্ব সুযোগ। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা আমার পক্ষে আমি কর্তব্য বলে মনে করি।

এ সময়ে দূর-প্রাচ্যে যাওয়া আমার একান্ত প্রয়োজন। আশা করি, ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমাকে ওখানে যাবার সুব্যবস্থা করে দিয়ে বাধিত করবেন, যাতে একজন জাতীয় বিপ্লবী নেতা হিসেবে স্বদেশের প্রতি আমার কর্তব্য আমি যথাযথভাবে পালন করতে পারি।'

[The India Struggle : Subhas Ch. Bose]

২৮শে মে সুভাষ দেখা করলেন নাৎসী-প্রধান হিটলারের সঙ্গে।

সঙ্গে রইলেন দুর্দিনের বন্ধু সেই ভন ট্রট। তিনিই দোভাষীর কাজ করবেন দুজনের মধ্যে। কারণ, হিটলার ইংরেজী ভাষায় অভ্যস্ত নন।

অপরপক্ষে হিটলারের পক্ষে রইলেন পররাষ্ট্র-মন্ত্রী রিবেনট্রপ, এস. এস. বাহিনীর অধিকর্তা হিমলার আর স্টেট সেক্রেটারী কেপলার প্রমুখ নাৎসী নায়কবৃন্দ।

সুভাষের বক্তব্য সেখানে একটাই। ভারত সম্বন্ধে আমি ত্রি-পক্ষীয় ঘোষণা চাই।

ইতালী বা জাপান রাজী হলেও হিটলার কিন্তু এ ব্যাপারে একমত হতে পারলেন না তাদের সঙ্গে।

কারণ—যুদ্ধ-পরিস্থিতি। ইতিমধ্যেই তাদের গ্রীষ্মকালীন অভিযান শুরু হয়ে গিয়েছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে। হু-হু করে জার্মানরা এগিয়ে চলেছে ভরোনেশ, রোস্টভ, সেবাস্তোপোল, স্ট্যালিনগ্রাড ও ককেসাসের দিকে। এ সময়ে অন্য কোন কিছু চিন্তা করার মতো অবকাশ কোথায়?

তাছাড়া ভারতবর্ষ এখনো অনেক দূর। এত দূর থেকে জার্মানীর পক্ষে আপাতত এ দায়িত্ব নেওয়া কি করে সম্ভব?

ঘোষণা করা মানেই তো দায়িত্ব মাথায় তুলে নেওয়া। বর্তমান অবস্থায় জার্মানীর পক্ষে তা সম্ভব কি?

মিশরের ক্ষেত্রে তা সম্ভব। কারণ, ইতিমধ্যেই জেনারেল রোমেল পৌঁছে গেছেন মিশরের দ্বার-প্রান্তে। তাদের স্বাধীনতা ঘোষণার খসড়াও প্রস্তুত। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সে অবস্থা এখনো আসেনি।

কথাটা মেনে নিতে পারলেন না সুভাষ। নানাভাবে তিনি বোঝাতে চেষ্টা করলেন হিটলারকে। নানা যুক্তি দিয়ে। ভারতবর্ষের সমর্থন পেতে হলে এখনই ত্রি-পক্ষীয় ঘোষণা করা উচিত।

অপরপক্ষে হিটলারেরও যুক্তির শেষ নেই। পরিস্থিতি সত্যিই বড় গুরুতর। হিজ এক্সেলেন্সী মাসসোত্তা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখবেন আশাকরি।

আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গেই সাফ জবাব:

'সারা জন্ম আমার রাজনীতি করেই কেটেছে, আমাকে উপদেশ দিতে হবে না!'

উপস্থিত প্রতিটি প্রাণী স্তম্ভিত। জার্মানীর ভাগ্য-বিধাতা, ১৯৪২ সালের মহাপরাক্রান্তশালী হিটলারকে কেউ যে মুখের ওপর এমন জবাব দিতে পারে, তা বুঝি তাঁদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

পরিস্থিতি হাল্কা করে দিলেন সেই ভন ট্রট। দোভাষী হিসেবে কথাটা তিনি একটু নরম করে বুঝিয়ে বললেন হিটলারকে। উদ্দেশ্য, দুপক্ষের ভারসাম্য বজায় রাখা।

গল্প বলে মনে হয়, তাই না মল্লিকা? হওয়াটা তো স্বাভাবিক অথচ এ কাহিনী সম্পূর্ণ সত্যি। কারণ, এটা জার্মানদেরই কথা, আমার নয়।

'When the Chancellor in this connection asked what kind of political concept Netaji actually had in mind, Netaji became impatient and asked Trott to give the Chancellor (who neither spoke nor understood English) the following reply:

'Tell His Excellency that I have been in politics all my life and that I don't need advice from any side.'

Trott translated this reply in a more diplomatic form..
[Dr. Werth: P.—36]

মনে মনে বেশ একটু আহত হলেন সুভাষ। ত্রি-পক্ষীয় ঘোষণা জারি করা হলে বেশ একটু নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। কিন্তু এ অবস্থায় সে ভরসা এখন কোথায় ?

তাছাড়া তাঁর প্রধান শত্রু হল ইংরেজ। রাশিয়া বা আর কেউ নয়। কিন্তু ইয়োরোপে ইংরেজের অস্তিত্ব এখন কোথায় ?

ইচ্ছা ছিল মিশরের মধ্য দিয়ে কিছু প্যারাসুট-সৈন্যকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নামিয়ে দেওয়া। কিন্তু রোমেলের আপত্তির ফলে সে ইচ্ছাও তাঁর কার্যকরী হয়নি। তাহলে এখানে থেকে লড়াই করবেন তিনি কাদের বিরুদ্ধে ?

কি করা যায় এখন এ পরিপ্রেক্ষিতে। এ অনিশ্চিত অবস্থাকে কতদিন আর মেনে নেওয়া সম্ভব।

ভাবতে ভাবতে একটা স্থির সিদ্ধান্তের বিন্দুতে এসে দাঁড়ালেন সুভাষ। ভারত ভারতবাসীদের জন্য--সুতরাং যে করে হোক, সেই এশিয়া ভূখণ্ডেই তাঁকে যেতে হবে।

যেতে হবে সেই নতুন সূর্যোদয়ের দেশে, যেখানে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু তাঁর জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও নিরলস-ভাবে পরিশ্রম করে চলেছেন ভারতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ করার কাজে। তাছাড়া আর কোন পথই খোলা নেই চোখের সামনে।

কিন্তু পৃথিবীব্যাপী এখন মহাযুদ্ধ চলছে । এ অবস্থায় যেতে চাইলেই তাঁর পক্ষে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাওয়া সম্ভব নয়। তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং সময়ের দরকার। ততদিন তাঁকে অপেক্ষা করতেই হবে।

১৪ই জুন বার্লিনের ইণ্টারন্যাশন্যাল প্রেস ক্লাবে সংবর্ধনা জানানো হল সুভাষকে। সেখানেও তাঁর মুখে শোনা গেল সেই একই কথা।

'ভারত ভারতবাসীদের জন্য'—বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে এশিয়ায় অবস্থিত রাষ্ট্রগুলির পক্ষে এর চাইতে বড় কাম্য আর কিছুই নেই। বিশেষ করে ভারতবর্ষের পক্ষে।

জাপ-প্রধানমন্ত্রী তোজোর এই নীতি আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। এক বেতার-ভাষণের মাধ্যমে এই স্পষ্ট ঘোষণার জন্য আগেই তাঁকে আমি অভিনন্দন জানিয়েছি। আবার জানাচ্ছি।

আজকের দিনে এটাই বাস্তব। স্বাধীনতার কোন বিকল্প নেই। সে স্বাধীনতা যে করে হোক, যে-কোন মূল্যের বিনিময়ে হোক, আমাদের পেতেই হবে। হয় কূল, নয়তো অতল সমাধি, এছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথ খোলা নেই আমাদের সামনে।

দিনের পর দিন কেটে যায়।

সেই একই ভাবনা তখন সুভাষের মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে বার বার। যে করে হোক, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাঁকে যেতেই হবে। কিন্তু কি করে তা সম্ভব ! পথ কোথায় ?

পথের ইঙ্গিত পাওয়া গেল ব্যাংকক সম্মেলনে। সেকথাই তোমাকে আমি এখন বলব, মল্লিকা।

ঐতিহাসিক ব্যাংকক সম্মেলন শুরু হল ১৫ই জুন। সভাপতি রাসবিহারী বসু। অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান দেবনাথ দাস।

সারা ব্যাংকক-এ সেদিন উৎসবের বন্যা।

শিলাপ্যাকর্ণ থিয়েটারের চারপাশে শুধু মানুষ আর মানুষ! বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্মের মানুষ। কিন্তু লক্ষ্য তাদের সবারই এক। আমরা স্বাধীনতা চাই। সে স্বাধীনতা আমরা অর্জন করব বুকের রক্ত দিয়ে, ভিক্ষাবৃত্তি বা দর-কষাকষি করে নয়।

এসেছেন মালয়, বর্মা, জাপান, থাইল্যান্ড, মাঞ্চুরিয়া, নানকিং, সাংহাই, ক্যান্টন, হংকং. বোর্ণিও, ম্যানিলা, ইন্দোচীন প্রভৃতি স্থানের প্রতিনিধিবৃন্দ। এসেছেন জাপান, জার্মানী, ইতালী প্রভৃতি দূতাবাসের কূটনৈতিক রাষ্ট্রদূতগণ। এসেছেন আরো অনেকেই।

উদ্বোধন করলেন থাইল্যান্ডের সহকারী পররাষ্ট্র-সচিব বিচিত্র বদকর্ণ। সে কি অভাবনীয় দৃশ্য তখন থিয়েটার ভবনের অভ্যন্তরে!

'The Silapakorn Theatre, Bangkok, was packed to overflowing. There was no standing room anywhere and even the spacious ground itself was packed to capacity, while the roads leading to it were crowded with people who were eager to get a glimpse of the distinguished visitors. A large number of Japanese, Thai and representatives of the Axis countries were also present.'

[Chalo Delhi: P.—23]

প্রথমেই উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে ভাষণ দিলেন অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান দেবনাথ দাস। সেই সঙ্গে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন টোকিও সম্মেলনে যাবার পথে নিহত স্বামী সত্যানন্দ পুরী, গিয়ানী প্রীতম সিং, নীলকান্ত আয়ার ও ক্যাপ্টেন আক্রাম খাঁর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে।

তারপর একে একে ভাষণ দিলেন সভাপতি রাসবিহারী বসু, আনন্দ মোহন সহায়, এন. রাঘবন, কর্ণেল এন. এস. গীল এবং ক্যাপ্টেন মোহন সিং প্রমুখ সামরিক নেতৃবৃন্দ। ভাষণ দিলেন জাপান, জার্মানী ও ইতালীর রাষ্ট্রদূতগণ। বক্তব্য সবারই এক। আর দেরি নয়। এবার প্রস্তুত হও সবাই।

সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বাণী পাঠালেন থাই-প্রধানমন্ত্রী ফিল্ড-মার্শাল পিবুল সংগ্রাম। স্বাধীন ভারতবর্ষ পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হোক. এর চাইতে বড় কাম্য আমার আর কিছু নেই।

বাণী পাঠালেন জাপ-প্রধানমন্ত্রী তোজো। আবার তিনি ঘোষণা করলেন তাঁর নীতির কথা। ভারতবর্ষকে সর্বতোভাবে সহায়তা করতে আমরা প্রস্তুত।

শুধু আমরা নই, আসন্ন সংগ্রামে ভারত ত্রি-শক্তির সহযোগিতা থেকেও বঞ্চিত হবে না।

'Japan is quite prepared to give her unstinted support as it has been announced from time to time, and I might add that the Axis powers are ready to co-operate in according their full support.' [Ibid : P.—37]

আরো স্পষ্ট করে বললেন জাপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ তোজো :

ভারতবর্ষ সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা অর্জন করুক, এছাড়া তাঁদের সম্বন্ধে অন্য কোন অভিপ্রায় আমাদের নেই।

'Japan has no desire whatever towards India except to see her realize the restoration of freedom...'

[Ibid : P.—38]

বাণী পাঠালেন সুভাষ। এ যুদ্ধে যারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করার জন্য লড়াই করছে, তারা প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষকেই সাহায্য করছে। ব্রিটিশকে সাহায্য করছে তারাই, যারা আমাদের চিরস্থায়ী দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখার জন্য বদ্ধপরিকর।

পৃথিবীর যেখানে যত ভারতবাসী আছে, তাদের সবাইকে নিয়ে একটি মিলিত সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। শুধু পরের ওপর নির্ভর করে বসে থাকলেই আমাদের চলবে না। নিজেদের চেষ্টাতেই আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে।

'Britain will lose this war and that the British Empire will be completely dismembered. All the forces that are striving to destroy or weaken the British Empire are helping India's emancipation, while all forces that are endeavouring to save the British Empire are attempting to perpetuate India's slavery.

...It is now time to link up Indian nationalists all over the world in one all-embracing organisation.'

[Ibid : P.—44]

মোট পঁয়ত্রিশটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হল নয় দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কক সম্মেলনে।

অবিলম্বে ব্যাপক স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে ভারতীয়দের মধ্যে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের শাখা স্থাপন করতে হবে। কোথাও বাদ গেলে চলবে না।

বিচ্ছিন্ন সেনাবাহিনীকে সংগঠিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে হবে। ক্যাপ্টেন মোহন সিং-ই হবেন তাদের কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ।

সেনাবাহিনীর যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ। শুধু অর্থ নয়। স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ, সংস্থান, সরবরাহ ইত্যাদি যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তাদেরই। শুধু প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র, যুদ্ধ-সরঞ্জাম, জাহাজ ও বিমানের জন্য সাহায্য চাওয়া হবে জাপান সরকারের কাছ থেকে।

লীগ বা সামরিক বাহিনী কোন ব্যক্তি-বিশেষের সম্পত্তি নয়, জাতীয় সম্পত্তি। তাই সব কিছুই পরিচালিত হবে একটি কাউন্সিল অফ এ্যাকশান বা কর্ম-পরিষদের নির্দেশে, কোন ব্যক্তি-বিশেষের খেয়াল-খুশিমত নয়। সেখানে অসামরিক বিভাগ থেকে থাকবেন এন. রাঘবন আর কে. পি. কে. মেনন। সামরিক বিভাগ থেকে লেঃ কর্ণেল গিলানী আর মোহন সিং। সবার ওপরে সভাপতি রাসবিহারী বসু স্বয়ং।

এবার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটিতে কি বলা হয়েছিল শোন:

'This Conference requests Sj. Subhas Chandra Bose to be kind enough to come to East Asia and appeals to the Imperial Government of Japan to use its good offices to obtain the necessary permission and conveniences from the Government of Germany to enable Sj. Subhas Chandra Bose to reach East Asia safe.'

অর্থাৎ—আমরা সুভাষকে চাই। জাপ-সরকারের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ যে, তোমরা তাঁকে আমাদের কাছে এনে দাও। তিনিই হবেন আমাদের আসন্ন সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক।

এদিকে ব্যাঙ্কক সম্মেলন, ওদিকে শপথ-গ্রহণ অনুষ্ঠান।

হাজার হাজার আজাদী সৈনিক সেদিন শপথ নিল সুভাষের নামে।

'In the name of God I take this holy oath that to liberate India and thirtyeight crores of my countrymen I will be absolutely faithful to our Leader, Subhas Chandra Bose, and shall always be prepared to sacrifice my life and all I have for the cause.'

ভগবানের নাম করে আমি এই শপথ করছি যে, ভারতবর্ষ এবং তার আটত্রিশ কোটি নরনারীকে পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য আমি আমাদের নেতা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি চিরবিশ্বস্ত থাকব এবং আমার সর্বস্ব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকব।

এবার সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে শুরু হল সুভাষের উদ্দীপ্ত ভাষণ:

'বন্ধুগণ, আজ আপনারা শপথ গ্রহণ করেছেন যে, এই ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকার তলে দাঁড়িয়ে মৃত্যু পর্যন্ত শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে যাবেন। আপনারা স্বাধীন ভারতের জাতীয় সেনাবাহিনীর বীরসৈনিক।

স্বেচ্ছায় আপনারা চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর সমস্ত দায়দায়িত্ব মাথা পেতে গ্রহণ করেছেন। আজ থেকে আপনাদের নিজস্ব বলতে যা কিছু, সবই ভারত-বর্ষের জাতীয় সম্পত্তি।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অগ্রগামী সৈনিক হিসেবে আপনারা সর্বাই প্রভূত গৌরবের অধিকারী। স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে আপনাদের নাম ও কীর্তির কথা সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। আজকের এই পবিত্র সংগ্রামে প্রতিটি শহীদের সম্মানার্থে স্বাধীন ভারতে স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে তোলা হবে। আগামী দিনের মানুষেরা সেই শহীদ-স্তম্ভের ওপর পুষ্পবৃষ্টি করবে।

...যদিও এই পবিত্র উৎসব আমরা বিদেশে পালন করছি, তবু আমাদের ধ্যান জ্ঞান ভাবনা চিন্তা সব কিছু পড়ে রয়েছে নিজেদের দেশে।...যত শীগগির সম্ভব আমরা নিজেদের সব দিক থেকে তৈরি করে নেব, যাতে যে দায়িত্বভার আমরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছি, তা সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারি। সেদিন আর সুদূর নয়, যেদিন আপনাদের এই সামরিক শক্তি প্রত্যক্ষভাবে কাজে লাগাতে হবে।'

বলতে বলতে রক্তে যেন আগুন ধরে গেল সুভাষের। দীপ্তকণ্ঠে আবার তিনি বলতে শুরু করলেন:

'আজ আমরা এই জাতীয় পতাকার তলে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ করেছি। এমন দিন আসবে, যেদিন আমরা লালকেল্লার ওপর দাঁড়িয়ে এই জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানাব।

মনে রাখবেন, স্বাধীনতা অর্জনের উপযুক্ত মূল্য আপনাদের দিতেই হবে। ভিক্ষায় কোনদিনও স্বাধীনতা আসে না। আসে শক্তি ও বলের বিনিময়ে। আসে রক্তের বিনিময়ে। আমরা কোন বিদেশীর কাছ থেকে নিশ্চয় স্বাধীনতা ভিক্ষা করব না। যথাযোগ্য মূল্য দিয়েই আমরা আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করব। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, আমরা যখন সবাই মিলে ভারত-বর্ষের দিকে বিজয় অভিযানে অগ্রসর হব, তখন আমিই পরিচালনা করব আমাদের সেবাবাহিনীকে।'

ভাষণ চলছে। আজাদ হিন্দ্ রেডিও থেকে সঙ্গে সঙ্গে সে খবর রটিত হয়ে চলেছে পৃথিবীর সর্বত্র। সেকথা উল্লেখ করে সুভাষ এবার বললেন:

'আজ আমরা এখানে যে উৎসব পালন করছি, তার খবর এতক্ষণে হয়তো ভারতবর্ষে পৌঁছে গেছে। আমাদের দেশে যে-সব বীর দেশপ্রেমিকগণ খালি-হাতে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা নিশ্চয় এ খবর শুনে খুবই উৎসাহিত হবেন।

আমার সারা জীবনের স্বপ্ন, এমন একটি সেনাবাহিনী গড়ে তোলা, যারা শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করবে। আপনাদের অভি-নন্দন জানাই, কারণ, এমন একটি সুসজ্জিত বীর সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে পারার সম্মান আজ আপনাদেরই প্রাপ্য।

ঈশ্বর আপনাদের সহায় হোন। আজ যে কঠিন শপথ পালন করার জন্য আপনারা কৃতসংকল্প হয়েছেন. তা পরিপূর্ণভাবে পালন করতে পারার জন্য তিনি যেন আপনাদের শক্তি দেন। ইনক্লাব জিন্দাবাদ!'

সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার সৈনিকের কণ্ঠে রব উঠল—ইনক্লাব জিন্দাবাদ! ইনক্লাব জিন্দাবাদ! নেতাজী সুভাষ জিন্দাবাদ! জয় হিন্দ্!

না, আর সুভাষ নয়। এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ। সুতরাং এখন থেকে দেশবাসীর কর্তব্য হবে.—ব্রিটিশের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করা।

পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠল কমিউনিস্ট পার্টির এই সিদ্ধান্ত নিয়ে।

অবশ্য কিছু একটা যে ঘটবে, সে আশংকা আগে থেকেই ছিল। বিপ্লবের কেন্দ্রভূমি রাশিয়া আক্রান্ত। এই নিয়ে আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় যে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে তা বলাই বাহুল্য। তবু সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টির এই সিদ্ধান্ত ছিল খুবই বিতর্কমূলক। আজও সেই বিতর্কের শেষ হয়নি।

অথচ এর আগে পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেস বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ১৯৩৯ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত কংগ্রেসের স্বপক্ষে এমন একটি ঘটনা দেখানো যাবে না, যা উল্লেখ করার মতো।

কমিউনিস্ট পার্টির সম্বন্ধে সেকথা খাটে না। মূল্যবান এই তিনটি বছর বৃথাই তারা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেনি।

প্রমাণ তাদের 'প্রলেটারিয়ান পাথ' নীতি,—যার মূল কথা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করা, বড় বড় কলকারখানায় ধর্মঘট, থানা ও সেনা-শিবির ধ্বংস এবং শহরে ও গ্রামে জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন করে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ অচল করে দেওয়া।

দিয়েছেও। যেমন—বম্বের কাপড়ের কল ধর্মঘট। যেভাবে সেদিন তারা বম্বের কাপড়ের কলসমূহকে অচল করে দিয়ে সরকার ও মালিক-পক্ষকে নতি-স্বীকার করতে বাধ্য করেছিল, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

বলা বাহুল্য যে, পাল্টা-আঘাত আসতে দেরি হয়নি। ফলে, দলে দলে কারাবরণ এবং শেষ পর্যন্ত পার্টি বে-আইনী ঘোষণা।

এ পর্যন্ত ঠিকই ছিল। তারপরই একদিন গোল বাধল হিটলারের রাশিয়া আক্রমণকে কেন্দ্র করে. যার শেষ পরিণতি—জনযুদ্ধের আহ্বান। সেই সঙ্গে নানাবিধ সুভাষ-বিরোধী সমালোচনা।

হিটলার ফ্যাসিস্ট। সুভাষ তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন, সুতরাং তিনিও তাই। এরপর আর কোনরকমেই সমর্থন করা চলে না সুভাষকে।

রাশিয়া আক্রান্ত হয়েছিল ১৯৪১ সালের ২২শে জুন।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ১৫ই ডিসেম্বর। সেদিনই দেউলী বন্দী-নিবাসে

অবশ্য কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করলেন তাঁদের এই নতুন নীতির কথা।

এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ। এবার থেকে জনসাধারণকে এই নতুন শপথ নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে সংগ্রামের পথে।

প্রস্তাবে বলা হল :

'We are a practical Party, and in a new situation it is our task not only to evolve a new form of struggle for it, but also to advance new slogans....

The key slogan of our Party (now) is 'make the Indian people play a people's role in the people's war'.' [History of the Freedom Movement in India: Vol. III: R. C. Mazumder: P.—689]

প্রথম সূত্রপাত দেউলী বন্দী-নিবাসে। তারপর বাংলার কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের জেল থেকে প্রেরিত ইস্তাহারে। সেখানেও জনসাধারণের উদ্দেশে বলা হল সেই একই কথা।

বিপ্লবের কেন্দ্রভূমি রাশিয়া আক্রান্ত। সুতরাং এ যুদ্ধ 'জনযুদ্ধ'। যে করে হোক, সর্বশক্তি দিয়ে হিটলারকে রুখতেই হবে। তারই জন্য আজ ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করা প্রয়োজন।

আপত্তি এখানেই। হিটলারকে রুখতে হবে, ভাল কথা। তা বলে ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতা কেন? ব্রিটিশের সঙ্গে হাত মেলানোর অর্থ কি নিজেদের দাসত্ব-শৃঙ্খলকে আরো সুদৃঢ় করা নয়? তাহলে অর্ধশতাব্দী-ব্যাপী এই যে এত আত্মদান, এত রক্তপাত, এত নির্যাতন ভোগ,—এ সবের কি প্রয়োজন ছিল? রক্তের দাগ কি এত শীগগিরই মুছে গেল ফাঁসির রজ্জু থেকে?

অসম্ভব! সেই কবেকার কথা। তা বলে আজও কি কেউ ভুলতে পেরেছে ক্ষুদিরাম প্রমুখ শহীদবৃন্দকে?

তাঁদেরই উত্তরসূরী সুভাষ নিজের জীবনের ওপর সমস্ত রকম ঝুঁকি নিয়ে গৃহত্যাগ করে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন, একথা সত্য। কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে অন্য কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে হাত মেলানোটা কি অপরাধ?

গ্যারিবল্ডি, সানইয়াত-সেন, ডি. ভ্যালেরা, দ্যগল প্রমুখ স্বাধীনতাসংগ্রামি-গণ তাঁদের দেশের মুক্তির জন্য সাহায্য নেননি ভিন্ন রাষ্ট্রে থেকে? স্বয়ং লেনিন কি একদিন জার্মানীর সাহায্যে প্রবেশ করেননি রাশিয়ায়?

এ সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত কূটনীতিবিদ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ চাণক্য তাঁর সুবিখ্যাত কৌটিল্য-শাস্ত্রে কি বলেছেন, শোনা যাক :

'কোন নৃপতির পক্ষে যদি একাকী শত্রুর মোকাবিলা করা অসম্ভব হয়,

সে ক্ষেত্রে তার নিজের চাইতে দুর্বলতর, সমান সমান, অথবা অধিকতর শক্তিশালী নৃপতিদের সহযোগিতায় একত্রিতভাবে আক্রমণ চালানো উচিত।'

তারপর মহাবীর নেপোলিয়নের কথা। তাঁর উক্তি : 'যুদ্ধের সময়ে শত্রুর শত্রুই হল আমার শ্রেষ্ঠ মিত্র।'

সেদিক থেকে দেখতে গেলে শত্রুর শত্রুকে চিনে নিতে সেদিন কি কোন ভুল করেছিলেন সুভাষ?

জার্মানীর চাইতে বড় শত্রু কি সেদিন ইংল্যাণ্ডের আর কেউ ছিল সারা পৃথিবীতে?

অছাড়া ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে জার্মান সহযোগিতা নতুন কোন কথা নয়। প্রমাণ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সমন্বয়ে গঠিত 'বার্লিন কমিটি'।

বিপ্লবীদের প্রয়োজনে শুধু লক্ষ লক্ষ টাকাই নয়, তিন-তিনটে জাহাজ-বোঝাই অস্ত্র-শস্ত্রও সেদিন পাঠিয়েছিল এই জার্মানীই।

তাদের প্রেরিত জাহাজ-বোঝাই অস্ত্র-শস্ত্র খালাস করতে গিয়েই যে সেদিন বাংলার মহান বিপ্লবী নায়ক বাঘা যতীন শেষ পর্যন্ত সম্মুখ-সমরে প্রাণ দিয়েছিলেন, এ তো ঐতিহাসিক সত্য।

আর প্রয়োজনের তাগিদে অন্য কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে হাত মেলানোটা যদি অপরাধ হয়, তবে রাশিয়া নিজেই কি সেই অপরাধে অপরাধী নয়?

পরস্পর সন্দেহ ও অবিশ্বাস সত্ত্বেও মাত্র একবছর আগে নিজেই কি সে হাত মেলায়নি ফ্যাসিস্ট জার্মানীর সঙ্গে? তা বলে কি নিজের নীতি আদর্শ রাজনৈতিক লক্ষ্য ত্যাগ করে সে নাৎসীবাদ গ্রহণ করেছিল সেদিন থেকে?

তারপর ইংল্যাণ্ড। জন্মলগ্ন থেকে কমিউনিস্ট রাশিয়াকে ঘায়েল করার জন্য কি করেনি এই ইংল্যাণ্ড? কি করতে বাকী রেখেছিল?

জার্মানীকে দিয়ে রাশিয়াকে শায়েস্তা করার জন্য এতকাল সে কি তলে তলে কম শক্তি যুগিয়েছিল হিটলারকে?

কিন্তু কই, সব কিছু জেনে-শুনেও তো সেই ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে হাত মেলাতে এতটুকুও আপত্তি দেখা গেল না রাশিয়ার দিক থেকে?

পরস্পরের এই হাত মেলানোর ফলে ইংল্যাণ্ডই কি নীতি হিসেবে সমাজ-তন্ত্রবাদ গ্রহণ করেছিল সেদিন থেকে? না কি রাশিয়া ধনতান্ত্রিকবাদে আস্থা-শীল হয়ে উঠেছিল পারস্পরিক এই চুক্তির ফলে?

বরং এ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের মুখে শোনা গেল এক নতুন কথা। 'হিটলার যদি নরক আক্রমণ করে তো নরকের সঙ্গে হাত মেলাতেও আমিও কুণ্ঠিত হব না।' অর্থাৎ, নেপোলিয়ানের সেই কথা—'যুদ্ধের সময়ে শত্রুর শত্রুই হল আমার সবচাইতে শ্রেষ্ঠ মিত্র।'

এবার ধরা যাক আমাদের যুক্তফ্রন্টের কথা। বাংলাদেশে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল অনেকগুলো দলের সমন্বয়ে। তাদের একের সঙ্গে অপরের নীতির

কোন মিল নেই। অন্তত, বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির তো নয়ই।

তবু তাদের একের সঙ্গে অন্যের হাত মেলাতে কোথাও এতটুকু বাধেনি। কারণ, লক্ষ্য ছিল তাদের এক। সে লক্ষ্য হল, কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করা।

সুভাষ বা হিটলারের লক্ষ্য কি সেদিন আলাদা ছিল?

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশকে পরাজিত করাই কি সেদিন দুজনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না?

তাহলে অন্যের বেলায় যা দোষণীয় নয়, সুভাষের বেলায় তা দোষের হবে কেন?

এবার সেদিনের গোটা ছবিটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। সুভাষ কংগ্রেস থেকে বহিস্কৃত। কারণ, সুভাষ ভ্রান্ত। মিসগাইডেড। অপরিণামদর্শী।

তাছাড়া ১৯২৮ সাল থেকে শুরু করে তাঁর মুখে সেই একই কথা,—'আধখানা স্বাধীনতা আমি চাইনে, চাই পূর্ণ স্বাধীনতা। চাই আপসহীন সংগ্রাম।' এ হেন সংগ্রাম-পাগল লোককে কংগ্রেসে রাখা কোনমতেই নিরাপদ নয়। সুতরাং, হটাও।

কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য আরো স্পষ্ট। সুভাষ বোস ফ্যাসিস্ট। দেশের শত্রু। হিটলারের তল্পি-বাহক।

আর ইংরেজ! হ্যাঁ, এ ব্যাপারে ইংরেজও তাদের সঙ্গে পুরোপুরি একমত।

মহামতি চার্চিল তাঁর 'Second World War' বইটির চতুর্থ খণ্ডে খোলাখুলিভাবেই বলেছেন সেকথা:

'...only a small extremist section in Bengal led by men such as Subhas Bose, were directly subversive and hoped for Axis victory...'

অর্থাৎ—সবাই ভাল। সবাই বন্ধু। সবাই সেদিন আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল যুদ্ধ-জয়ের ব্যাপারে।

যত নষ্টের গোড়া ছিল একমাত্র সুভাষ বোস ও তার অনুগামী দল। অর্থাৎ, বিরাট এই ভারতবর্ষে একটি মাত্র লোকই সেদিন ইংরেজের শত্রু ছিল, তিনি হলেন সুভাষ বোস।

ধন্যবাদ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকে। একমাত্র শত্রুকে চিনে নিতে সত্যিই সেদিন তিনি ভুল করেননি।

কিন্তু একটা কথা! যে লোক তার নিজের দেশের শত্রু. ইংরেজের কাছে তার তো সবচাইতে বড় মিত্র হওয়ার কথা! তা সত্ত্বেও, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল কেন তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থে একমাত্র সুভাষকেই চিহ্নিত করেছেন ইংরেজের শত্রু বলে? এ প্রশ্নের সদুত্তর কোথায়?

তাছাড়া আসল ঘটনা কি ছিল?

রাশিয়া আক্রান্ত বলে যাদের এত ক্ষোভ; সেই রাশিয়া সম্বন্ধে সুভাষের শ্রদ্ধা বা মমত্ববোধ কি কারো চাইতে কম ছিল ?

কে না শুনেছে সোভিয়েত দেশের প্রতি সুভাষের অপরিসীম শ্রদ্ধার কথা ?

কে না জানে যে, সুভাষের ঐতিহাসিক প্ল্যানিং কমিশন সোভিয়েত আদর্শ থেকেই গড়া ?

কত দিন তাঁকে বলতে শোনা গেছে—'পৃথিবীতে সোভিয়েত রাশিয়াই একমাত্র দেশ, যাদের কাছ থেকে ভারত তার স্বাধীনতা-সংগ্রামে উপযুক্ত সহযোগিতা আশা করতে পারে।'

শুধু মুখেই নয়, একথা তিনি বিশ্বাসও করতেন সর্বান্তঃকরণে। তাই দেশ থেকে অন্তর্ধানের সময় তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল রাশিয়া। গিয়েওছিলেন তাই।

তবু কেন তাঁকে শেষ পর্যন্ত বার্লিন যেতে হল রাশিয়া থেকে বিদায় নিয়ে ? রাশিয়ার প্রতিকূল মনোভাবের জন্যই নয় কি ?

বার্লিন পেঁাছেই সুভাষ যে স্মারকলিপিখানি পাঠিয়েছিলেন জার্মান সরকারের কাছে, তাতে কি লিখেছিলেন তিনি রাশিয়া সম্বন্ধে ? লিখেছিলেন :

'নিকট ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে ব্রিটিশ প্রভাব-প্রতিপত্তি দূর করতে হলে জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে বর্তমানে যে স্থিতাবস্থা চলছে, তা রক্ষা করা দরকার।'

সোজা কথায়—রাশিয়ার সঙ্গে কোনরকম বিবাদ নয়।

হিটলার রাশিয়া অভিযান শুরু করলেন ২২শে জুন। সুভাষ তখন রোমে।

ফিরে এসে এ সম্বন্ধে তিনি কি মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন জার্মান সরকারের কাছে ? এতটুকুও তিনি সমর্থন করেছিলেন কি হিটলারের সেই অবিমৃষ্যকারিতাকে ?

এ সম্বন্ধে জার্মান বৈদেশিক দপ্তরের সেক্রেটারী অব স্টেট হের ওয়রম্যান ১৭ই জুলাই তারিখে জার্মান সরকারের কাছে যে প্রয়োজনীয় রিপোর্টটি পাঠিয়েছিলেন, তা থেকে কিছু কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি :

'মিঃ বসু ফিরে এসে রুশ-জার্মান যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আমার সঙ্গে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।

বসুর মতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতবর্ষে খুবই জনপ্রিয়। ভারতবাসী বিশ্বাস করে যে, সোভিয়েতরা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং তাদের মিত্র।

রুশ-জার্মান যুদ্ধের ফলে ভারতবাসীর সহানুভূতি রাশিয়ার পক্ষে।

ভারতবাসীর ধারণা যে, জার্মানীই আক্রমণকারী এবং জার্মানী ভারতের পক্ষে আর একটি বিপজ্জনক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। যুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হলেও ভারতবাসীর এ ধারণা বদলাবে বলে মনে হয় না।'

'...আমি বসুকে জানিয়েছি যে, স্বাধীন ভারতের ঘোষণা সম্বন্ধে

আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্তে আমরা অটল। তবে তার উপযুক্ত ক্ষণ আমাদের স্থির করতে হবে।

বসু জোরের সঙ্গে বলেন যে, জার্মান রাইখের বৈদেশিক মন্ত্রীকে অবিলম্বে একথা ঘোষণা করতে হবে। স্পষ্টই বোঝা গেল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত স্বাধীন ভারতের ঘোষণা সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত না হবেন, ততক্ষণ অন্যান্য সব কিছুই তাঁর কাছে গৌণ।'

কি মনে হয় এই রিপোর্ট দুটি দেখে? সুভাষকে সোভিয়েত-বিরোধী বলে মনে হয় কি?

এখানেই শেষ নয়। আরও আছে। সামান্য দু-একটি মাত্র উল্লেখ করছি।

সেদিন সারা পৃথিবীর মানুষ সুভাষের ব্রিটিশ-বিরোধী বেতার-বক্তৃতা শুনেছে আজাদ হিন্দ্ রেডিও থেকে। একদিন দুদিন নয়, দিনের পর দিন। মাসের পর মাস।

সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে তিনি কোনদিন কিছু বলেছিলেন কি?

পরবর্তী কালের সে-সব বক্তৃতামালা পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হয়েছে। আছে কি কোথাও তার সামান্যতম নজীর?

কম চেষ্টা করেননি প্রচার-সচিব ডাঃ গোয়েবল্স্। কিন্তু উত্তর ছিল একটাই। না, তা হয় না। আমার শত্রু ব্রিটিশ, রাশিয়া নয়।

রাশিয়ারও সেই একই কথা। বন্ধু ব্রিটিশের দাবীর উত্তরে একটি কথাই তারা জানিয়েছে বার বার। বোস আমাদের শত্রু নয়। শুধু শুধু কেন আমরা তার বিরুদ্ধে বলতে যাব?

তারপর যুদ্ধ-ঘোষণা। ব্রিটিশ, আমেরিকা ও রাশিয়া সেদিন জোটবদ্ধ। তা সত্ত্বেও সুভাষ যুদ্ধ-ঘোষণা করলেন কিনা কেবলমাত্র ব্রিটিশ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে। রাশিয়াকে বাদ দিলেন কেন?

হ্যাঁ, এটাই হল আসল সত্য। ফ্যাসিস্ট জার্মানীর তল্পি-বাহক বলে সেদিন সুভাষের বিরুদ্ধে যতই অপপ্রচার করা হোক না কেন, হিটলারের সেই অবিমৃশ্যকারিতার জন্য কেউ যদি সেদিন কার্যকরীভাবে প্রতিবাদ করে থাকেন, তো এই একটিমাত্র মানুষই করেছেন। দূর থেকে নয়, করেছেন জার্মানীর বুকে দাঁড়িয়েই।

'Hitler is at liberty to lick British boots.' (হিটলার ব্রিটিশের জুতো চাটতে পারে।)

এ উক্তি আর কারো নয়, সুভাষেরই।

'Tell His Excellency that I have been in politics all my life and that I don't need advice from any side.' (হিটলারকে বলো যে, সারা জন্ম আমার রাজনীতি করে কেটেছে, আমাকে উপদেশ দিতে হবে না।)

এ উক্তিও সুভাষই করেছিলেন। বাইরে থেকে নয়, করেছিলেন ১৯৪২ সালের অপরাজেয় নাৎসী-নায়ক হিটলারের মুখোমুখি দাঁড়িয়েই।

'I am not an apologist of the three powers and it is not my task to defend what they have done or may do in future. That is a task which devolves on these nations themselves. My concern is however, with India, and if I may add further, with 'India alone.'

আমি ত্রি-শক্তির প্রতিভূ নই। তাদের সমর্থন করা আমার কাজ নয়। তাদের ভাল-মন্দ সব কিছুর দায়-দায়িত্ব তাদেরই। আমার কাজ ভারতকে নিয়ে। ভারতের জন্যই আমি শুধু কাজ করে যাব।

এ উক্তিও সুভাষেরই। সারা পৃথিবী সেদিন সুভাষের মুখ থেকে শুনেছিল একথা।

কোন তল্পি-বাহকের পক্ষে পরের দেশে বসে তাদেরই বিরুদ্ধে এ ধরনের দুঃসাহসিক মন্তব্য করা সম্ভব কি?

সুভাষ বোস ফ্যাসিস্ট!

তথ্যটি প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন জওহরলাল। যদিও ত্রিপুরী কংগ্রেসে গান্ধীজীর উদ্দেশেই তাঁর ভক্তবৃন্দ জয়ধ্বনি দিয়ে বলেছিলেন, 'হিন্দুস্থান কা হিটলার কী জয়', সুভাষের উদ্দেশ্যে নয়।

তবে জওহরলালের ওই নব আবিষ্কারের পেছনে কিছুটা কারণ ছিল। কারণ—ত্রিপুরী কংগ্রেস।

দেশের অগণিত মানুষের কাছে গণতন্ত্রের আসল চেহারাটা সেদিন যেভাবে ধরা পড়ে গিয়েছিল, তাতে গান্ধী-কংগ্রেসের মুখরক্ষার জন্য সুভাষকে এভাবে মসীলিপ্ত করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না জওহরলালের।

তাই একদিকে সুভাষ যখন ব্রিটিশের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার সংকল্পে উন্মত্তপ্রায়, অন্যদিকে ঠিক তখনই জওহরলালের কণ্ঠ গর্জে ওঠে বজ্রের মতো:

'The way Subhas Bose has chosen in naturally wrong ...I cannot accept but must oppose.'

[A. B. Patrika : 13. 4. 42.]

বোধহয় দুহাত তুলে ব্রিটিশ সেদিন জয়ধ্বনি দিয়েছিল জওহরলালের নামে। শুধু একদিন-দুদিন নয়, দিনের পর দিন তারা এই উক্তিটি যথাযোগ্য গুরুত্বসহকারে প্রচার করেছিল অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে। 'I cannot accept but must oppose.'

বুদ্ধিমানেরা ঠিকই বুঝেছিল, শুধু বুঝতে পারেনি কিছু সংখ্যক বোকার দল। তাই চোখে-মুখে তাদের ফুটে উঠেছিল একটা ব্যাকুল জিজ্ঞাসা। এ বিবৃতির মানে কি? এটা কি আসলে সুভাষ-বিরোধিতা, না ব্রিটিশ-সহযোগিতা? না কি একসঙ্গে দুই-ই?

এবার বাংলাদেশের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রচারিত সেই আবেদন-পত্রটি থেকে কিছু কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি, মল্লিকা। সেই সংগে অপর-পক্ষের বক্তব্যও এখানে তুলে দিচ্ছি পাশাপাশি। দু পক্ষের এই বক্তব্য থেকেই সেদিনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তুমি কিছুটা আঁচ করতে পারবে আশা করি।

'মানব ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে সারা পৃথিবী যখন এক অভূতপূর্ব সঙ্কটের মধ্য দিয়া চলিয়াছে, যখন সমগ্র মানবজাতির ভাগ্য এক অনিশ্চয়তায় দোদুল্যমান, তখন আমরা ভারতমাতার প্রত্যেকটি মহৎ সন্তানের কাছে আমাদের এই আবেদন পাঠাইতেছি।

...এই বিশ্ব-পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে ফ্যাসিস্টদের পর পর বহু জয়লাভের ফলে এবং উহার পরিণতি হইয়াছে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর নাৎসী আক্রমণে। জার্মানীর এই আক্রমণ এক রাষ্ট্রের প্রতি অন্য রাষ্ট্রের বিশ্বাসঘাতকতার চরম নিদর্শনরূপে ইতিহাসে চিরদিন উল্লিখিত হইবে।'

[বাংলার বীর বন্দীরা ঃ নিরঞ্জন সেন]

হয়তো তাই, কিন্তু একটা প্রশ্ন। জার্মানী তো এর আগেই পোল্যাণ্ড, নরওয়ে, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স ইত্যাদি বহু দেশ দখল করে-ছিল। সেগুলো কি বিশ্বাসঘাতকতার চরম নিদর্শন নয়?

কিন্তু কই, তখন তো কারো মুখ থেকে একটি প্রতিবাদ-ধ্বনিও শোনা যায়নি। বরং হিটলারের সেই একের পর এক জয়লাভে তাঁরাও তো সেদিন উল্লাস প্রকাশ করেছিলেন অন্য সবার মতো। তাহলে এতদিন পরে হঠাৎ আজ এই নতুন কথা কেন?

মিউনিক চুক্তির নাম করে ব্রিটিশ এবং ফ্রান্স যখন ভেট হিসাবে চেকো-শ্লোভাকিয়ার সুদেতেন অঞ্চল হিটলারের হাতে তুলে দিয়েছিল, তখন পৃথি-বীর একটি কণ্ঠও সেই অন্যায়ের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল কি?

শুধু প্রতিবাদ করেছিলেন একজন। তিনি এই পরাধীন দেশেরই কবি রবীন্দ্রনাথ, যিনি সর্বপ্রথম রাশিয়ার প্রগতিশীল ভূমিকার কথা ভারতবাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন তাঁর অমর সৃষ্টি 'রাশিয়ার চিঠি'র মাধ্যমে।

মর্মাহত কবি সেদিন চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেণ্ট বেনেসের কাছে প্রেরিত এক তারবার্তায় বলেছিলেন ঃ

'বিশ্বাসঘাতকতার চক্রান্তে আপনার দেশ নিঃসঙ্গ ও একক হইয়া পড়ি-য়াছে। এই শোচনীয় ঘটনায় ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে গভীর দুঃখ ও বিক্ষোভ জানাইতেছি। আমি আশা করি এই আঘাত আপনার জাতির অন্তরে নব-জীবনের সঞ্চার করিবে এবং ইহার ফলে সে নৈতিক জয় ও পূর্ণ আত্মোপলব্ধির অবাধ সুযোগ অর্জন করিবে।'

[আনন্দবাজার ঃ ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ সাল]

হ্যাঁ, মাত্র এই একজন। তাছাড়া সবাই ছিল সেদিন নিরপেক্ষ দর্শক মাত্র। অস্বীকার করবার উপায় আছে ?

'চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের জনসাধারণের সম্মিলনে বিশ্বব্যাপী সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির ব্যাপকতম ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টই সৃষ্টি হইয়াছে। জনসাধারণের এই বিশ্বব্যাপী ফ্রন্টের বিরুদ্ধে রহিয়াছে ফ্যাসিজমের সম্মিলিত শক্তি, যাহা মানব সভ্যতার সর্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত ও মহান কীর্তিকে উচ্ছেদ করিতে কৃতসংকল্প।'

জনসাধারণের ফ্রন্ট! কোথাকার জনসাধারণ? রাশিয়ার জনসাধারণ বুঝি। কিন্তু সেই সঙ্গে ইংল্যান্ড বা আমেরিকার জনসাধারণকেও কি পৃথিবীর শোষিত জনগণের প্রতি সমান সহানুভূতিসম্পন্ন বলে ধরে নিতে হবে?

অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের নায়ক ও'ডায়ারকে লক্ষ লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়ে কারা সেদিন সম্মান দেখিয়েছিল? ইংল্যান্ডের জনসাধারণ নয়?

যেভাবে একদিন মুসোলিনী গায়ের জোরে আবিসিনিয়া জয় করে নিয়েছিলেন, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। কিন্তু কেউ কি সেদিন এতটুকু প্রতিবাদ জানিয়েছিল এই নিয়ে? না কি খোলাখুলিভাবেই বাহবা দিয়েছিল মুসোলিনীকে?

'If I had been an Italian, I am sure that I should have been whole-heartedly with you from the start to finish in your struggle...'

এ উক্তি কার? ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের নয়?

এই ব্রিটিশ তার চিরাচরিত ভূমিকা ভুলে গিয়ে রাতারাতি ভারতবর্ষের বন্ধু হয়ে উঠবে, তাই কি বিশ্বাস করতে হবে আমাদের?

'একমাত্র যদি স্বাধীনতা ও প্রগতির বিশ্বশক্তি বাঁচিয়া থাকে ও পুষ্টিলাভ করে, তাহা হইলেই যে ভারতীয় জাতির স্বাধীনতা অর্জন করা ও টিকাইয়া রাখা সম্ভব,—এই সত্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে কি?'

পারে। যুদ্ধে জয়ী হলেই যে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে, তার গ্যারান্টার কে? রাশিয়া? তাহলে আটলান্টিক চার্টারে সেকথা অস্বীকার করা হল কেন? কই, রাশিয়া তো তার কোন প্রতিবাদ করেনি?

আটলান্টিক চার্টার! ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। গত ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ইংল্যান্ড ও আমেরিকার মধ্যে,—নাম তার আটলান্টিক চার্টার। চুক্তিতে বলা হয়েছিল—যুদ্ধ-শেষে পরাধীন দেশগুলিকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে।

খবর শুনে কংগ্রেসের গান্ধীবাদী নেতৃবৃন্দ আহ্লাদে আটখানা। ব্যস, হয়ে গেল! নাঃ! সুভাষ বোস সত্যিই ভ্রান্ত। ভ্রান্ত বলেই শুধু শুধু যখন-

তখন সংগ্রামের কথা বলে। নইলে লোক হিসেবে ইংরেজ মোটেই খারাপ নয়। এই তো কেমন দিব্যি ভদ্রলোকের মতো এককথায় প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিলে!

কোথায় প্রতিশ্রুতি, কোথায় কি! সব কিছুরই অবসান হল ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের একটি উক্তি শুনে। ৯ই সেপ্টেম্বর এক বিবৃতি দিয়ে খোলাখুলিভাবেই তিনি জানিয়ে দিলেন তাঁর মনের কথা। হ্যাঁ, প্রতিশ্রুতি আমরা ঠিকই দিয়েছি, এবং সে প্রতিশ্রুতি রাখবও। তবে কিনা ওটা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়।

কারণ? হ্যাঁ, সেকথাও তিনি বলেছেন পরিষ্কারভাবেই:

'I have not become the king's first minister in order to preside over the liquidation of the British Empire.'

অর্থাৎ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে দেউলিয়া করার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী হননি। সাফ কথা এবং স্পষ্ট কথা। একথার মধ্যে আর যাই থাক না কেন, কোথাও কোন অস্পষ্টতা নেই।

এ হেন ইংল্যাণ্ড যুদ্ধে জয়ী হলে তবেই নাকি আমাদের পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব। কথাটা বিশ্বাস করতে পারা যায় কি?

'মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ও মহত্তর কীর্তির প্রতীক সোভিয়েত ইউনিয়নের গৌরবান্বিত জনসাধারণ যদি নাৎসী যান্ত্রিক বাহিনীর শক্তির তলে ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা হইলে কোথায় থাকিবে ভারতের স্বাধীনতা?'

যেখানে আছে, সেখানেই থাকবে।

তাছাড়া রাশিয়া জয়ী হলেই বা ভরসা কোথায়? হিটলার পররাজ্য আক্রমণ করেছেন, সেজন্য নিন্দা তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য।

কিন্তু শুধু কি হিটলার? রাশিয়াও কি সেই একই কারণে সমানভাবে নিন্দিত হবার উপযুক্ত নয়?

জাপানের সঙ্গে কি অনাক্রমণ চুক্তি ছিল না রাশিয়ার? তা সত্ত্বেও কি রাশিয়া যুদ্ধ-ঘোষণা করেনি জাপানের বিরুদ্ধে?

জাপান কিন্তু করেনি। লক্ষণীয় যে, ত্রি-শক্তির অন্যতম অংশীদার হওয়া সত্ত্বেও রাশিয়ার বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেনি কোনদিনও। ১৯৪১ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে অনুষ্ঠিত সেই চুক্তির মর্যাদা তারা রক্ষা করে চলেছিল বরাবর।

কিন্তু যদি করত? হিটলারের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে রাশিয়ার যখন নাভিশ্বাস উঠেছে, তখন যদি তারা ত্রি-শক্তির অন্যতম অংশীদার হিসেবে আক্রমণ চালাত মাঞ্চুরিয়ার দিক থেকে? কোথায় থাকত তাহলে রাশিয়া?

ফল পেল হাতে হাতেই। ১৯৪৫ সালের ৭ই আগস্ট এ্যাটম বোমা ফেলা হল জাপানের হিরোশিমা শহরের ওপর। সুযোগ বুঝে পরদিনই অনাক্রমণ

চুক্তি ভঙ্গ করে রাশিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ল মৃতপ্রায় জাপানের ওপর। জার্মানীর ভাবনা তখন আর নেই। সুতরাং চালাও এবার।

হিটলার নিশ্চয়ই নিন্দার যোগ্য। নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে গেলে, রাশিয়া যে দৃষ্টান্ত দেখাল, তা-ই কি সমর্থনযোগ্য?

এ তো গেল কেবলমাত্র একটি দৃষ্টান্ত। তা বলে এখানেই শেষ নয়। এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখানো যায়, যা সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বুঝে ওঠা মুশকিল।

ছেড়ে দিলাম হিটলারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পোল্যান্ড ভাগাভাগি করে নেবার কথা। কিন্তু কি হয়েছিল লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া, এস্তোনিয়া ও ফিন-ল্যান্ড প্রভৃতি প্রতিবেশী দুর্বল রাষ্ট্রগুলির বেলায়?

মাত্র একবছর আগেকার কথা। অক্টোবর মাস। তখনও জার্মানীর সঙ্গে রাশিয়ার মিত্রতা চলেছে।

হঠাৎ লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া, এস্তোনিয়া প্রভৃতি দুর্বল বাল্টিক রাষ্ট্র-গুলির ওপর রাশিয়া এমন কতকগুলো মারাত্মক দাবী চাপিয়ে দিল, যার এক-মাত্র অর্থ হল,—হয় দাবী মেনে নাও, নয়তো মর।

নিজ নিজ সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিয়ে সবাই মাথা নোয়াল রাশিয়ার কাছে। তাছাড়া উপায় কি! একফোঁটা দুর্বল রাষ্ট্রের পক্ষে অমন বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো সাহস কোথায়?

এবার ফিনল্যান্ডের পালা। সেই একই দাবী।

লেনিনগ্রাদ ও ভিবোর্গের মধ্যবর্তী সমস্ত এলাকা তোমাদের নিরস্ত্রীকৃত করতে হবে। ক্রোনস্ট্যাড ও বিভোর্গের মধ্যবর্তী তোমাদের বিজুর্ক নৌ-ঘাঁটি আমাদের সেনাবাহিনীর হাতে ছেড়ে দিতে হবে। আর ফিনল্যান্ড উপসাগরের পশ্চিম প্রবেশপথে তোমাদের হাঙ্গো দ্বীপ ও বন্দর আমাদের কাছে ইজারা দিতে হবে।

রাজী হল না ফিনল্যান্ড। হওয়া সম্ভবও নয়। শুধু ফিনল্যান্ড কেন, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই তাদের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলি এভাবে অন্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

বটে! চোখ পাকিয়ে তাকাল লাল ফৌজ। আচ্ছা, মজাটা দেখাচ্ছি!

মজা দেখাল ১৯৩৯ সালের ৩০শে নভেম্বর।

হঠাৎ সেদিন বিরাট এক সৈন্যবাহিনী রে-রে করে ঝাঁপিয়ে পড়ল দুর্বল ফিনল্যান্ডের ওপর। বলো এবার ঘাঁটি ছাড়বে কি না?

ক্রমান্বয়ে তিনমাস পর্যন্ত প্রাণপণে লড়াই চালিয়ে গেল ফিনল্যান্ড। কিন্তু শক্তিশালী লাল ফৌজের তুলনায় তার সাধ্য আর কতটুকু? তাই শেষ পর্যন্ত তাকে হার স্বীকার করতে হল প্রবল প্রতাপশালী রাশিয়ার কাছে।

সন্ধি স্বাক্ষরিত হল ১৯৪০ সালের ১১ই মার্চ।

সন্ধির শর্ত অনুযায়ী শুধু পূর্বোক্ত ঘাঁটিগুলিই নয়, সেই সঙ্গে সমগ্র কারেলিয়ান যোজক, ভিবোর্গ বন্দর ও ম্যানারহাম লাইনসহ লাডোগা হ্রদের

পশ্চিম তীর তাদের তুলে দিতে হল রাশিয়ার হাতে। আর দিতে হল হেলসিঙ্কির নিকটবর্তী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নৌ-ঘাঁটি।

এ তো গেল মার্চ মাসের কথা। আর জুলাই মাসে।

সেদিন বাল্টিক রাজ্যগুলির সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিসমূহ রাশিয়া দখল করে নিল নিজের অধিকারে। পরে বাল্টিক রাজ্যের গোটাটাই। নিজের রাজ্য সুরক্ষিত করার জন্য ওগুলি নাকি তার বড্ড প্রয়োজন।

এখানেই শেষ নয়। আরো আছে। তার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯৪০ সালের ২৬শে জুলাই।

হঠাৎ সেদিন চরমপত্র দেওয়া হল রুমানিয়াকে। দাবী খুবই সামান্য। তোমাদের বেসারাবিয়া ও বাকুলিয়া, এ দুটো অঞ্চল আমাদের চাই।

কাজেও তাই হল। তাছাড়া উপায় কি? সবলের প্রয়োজনে দুর্বল মরবে, সংসারের নীতিই যে তাই।

বলা বাহুল্য যে, কোন কিছুই নজর এড়ায়নি হিটলারের।

আত্মরক্ষার নামে রাশিয়া যে তলে তলে রাজ্য বিস্তার করে ক্রমশই তাঁর দিকে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসছে, তা তিনি বেশ ভাল করেই লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন দূর থেকে।

তাছাড়া প্রতিরক্ষার ব্যয় বাবদ রাশিয়ার রুবলের অঙ্ক যে প্রতিবছরই বেশ মারাত্মকভাবে স্ফীত হয়ে উঠতে শুরু করেছে, সে খবরও তাঁর অজ্ঞাত ছিল না।

১৯৩৫ সালে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়-বরাদ্দ ছিল মোট ৮০০ কোটি রুবল। ১৯৩৯ সালে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল ৪,০'০০ কোটি রুবল। অর্থাৎ, মোট বরাদ্দের চাইতে পাঁচগুণ বেশি। ১৯৪০ সালে ৫,৬০০ কোটি। আর ১৯৪১ সালে একলাফে ৭,১০০ কোটি রুবল। অর্থাৎ শতকরা প'চাত্তর ভাগ বেশি। এ কি নিছক আত্মরক্ষার তাগিদেই, না কি অন্য কিছুর প্রয়োজন?

কূটনীতি হিসেবে হিটলারকেও তখন হাত বাড়াতে হল বলকান রাষ্ট্রগুলির দিকে।

অনেকটা এগিয়ে এসেছে রাশিয়া। আর নয়। রাশিয়ার এই অগ্রগতি রোধ করতে হলে আগে থেকেই এই বলকান রাষ্ট্রগুলিকে হাতে নিয়ে রাখা দরকার।

কি মনে হয় গোটা ব্যাপারটাকে বিচার করতে গেলে? দোষ কি শুধু হিটলারেরই? যাক, ইস্তাহারের পরের অংশ শোন:

'পৃথিবীর প্রগতিশীল জনসাধারণ আন্তর্জাতিকভাবে মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য যে বৃহত্তর সংগ্রাম চালাইতেছে, ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রয়াস তাহা হইতে অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য!'

কি করে? ইংরেজ, রাশিয়া বা ফ্রান্স কেউ ভারতের মতো পরাধীন নয়। তারা সংগ্রাম করছে নিজ নিজ রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য। তাদের সংগ্রাম আর পরাধীন ভারতের সংগ্রাম অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য হবে কি করে?

'ফ্যাসিজমের পূর্ণ পরাজয় সাধনে যথাসাধ্য সাহায্য করা আমাদের রাজনৈতিক কর্তব্য। এই কারণে আজ "আমাদের স্বার্থ সর্বাগ্রে" এই ধ্বনি না তুলিয়া "অন্যদের" স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা আমাদের কর্তব্য মনে করিতেছি।'

অদ্ভুত যুক্তি। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন নজীর আছে কি, যেখানে কোন রাষ্ট্র "আমাদের স্বার্থ সর্বাগ্রে", একথা না ভেবে "অন্যদের" স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করতে গেছে? আছে কি ব্রিটিশ, মার্কিন বা রাশিয়ার ইতিহাসে এমন নজীর?

রাশিয়া আক্রান্ত। তাদের কাছে এ যুদ্ধ নিশ্চয়ই জনযুদ্ধ। তা বলে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত সেই রাশিয়ার জন্য আমরা কেন "আমাদের স্বার্থ সর্বাগ্রে", একথা ভুলে গিয়ে এ যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলে মেনে নিতে যাব?

আমাদের স্বাধীনতার কথা তাহলে কে ভাববে? ইংল্যান্ড? আমেরিকা? না কি রাশিয়া?

'বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতিতে ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যকে অগ্রসর করিবার এবং ভারতীয় জাতির চরম স্বার্থসিদ্ধি করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে— যে সকল স্বাধীন জাতি আজ নিজেদের জীবন ও অস্তিত্বের জন্য লড়াই করিয়া সেই সঙ্গে স্বাধীন ও শ্রেষ্ঠতর জগৎ সৃষ্টির জন্য লড়াই করিতেছে, তাহাদের জয়কে নিশ্চিত করা। সে জগতে সাম্রাজ্যবাদ ও অন্য জাতির উপর উৎপীড়ন করিবার শক্তির ভিত্তি সম্পূর্ণ টলিয়া শিথিল হইয়া যাইবে।'

গিয়েছে কি? কি দেখছি আজ তিব্বত, পূর্ব-জার্মানী, হাঙ্গেরী, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, রোডেশিয়া, কঙ্গো বা চেকোশ্লোভাকিয়াতে? দুর্বলের প্রতি সবলের উৎপীড়ন সেখানে এতটুকুও শিথিল হতে দেখা গিয়েছে কি?

যুদ্ধ শেষ হয়েছে আজ পঁচিশ বছর। কিন্তু সেই যে একদিন আমেরিকা ত্রাণকর্তার ভূমিকায় এসে ভিত গেড়ে বসেছিল, তারপর থেকে এ পর্যন্ত তাকে এক চুলও নড়ানো সম্ভব হয়েছে কি এশিয়া ভূখণ্ড থেকে? তাহলে আজ ভিয়েতনাম এবং কম্বোডিয়ার গা থেকে এমন করে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে কেন?

"জনসাধারণের এই সর্বস্ব-পণ সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেস যদি প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে, তবে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী শক্তিসম্মেলন যে কেবলমাত্র অপরিমেয় ক্ষমতা সঞ্চয় করিতে পারিবে তাহা নহে, জনগণের জয়লাভ ও ভারতবর্ষের স্বাধীন দিনও আসন্ন হইয়া উঠিবে।'

সত্যি কথা। যুদ্ধ-শেষে বিজয়ী দলগুলি যে অপরিমেয় ক্ষমতার অধিকারী হবে, তাতে এতটুকুও সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের অপরিমেয় ক্ষমতার অধিকারী করে তোলার জন্যই কি আমাদের যুদ্ধে সহযোগিতা করা প্রয়োজন?

নইলে নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে বিশ্বমানবতা প্রদর্শনের জন্য আমাদের কেন এই অহেতুক মাথাব্যথা ?

বিজয়ী দলগুলি বিশ্বে অপরিমেয় ক্ষমতার অধিকারী হবে—ভাল কথা। কিন্তু যুদ্ধ-শেষে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে—এমন প্রতিশ্রুতি কি একবারও দিয়েছে বিশ্বমানবতার অধিকারী তথাকথিত মিত্ররাষ্ট্রগুলি ?

আর দিলেই বা কি ? এমন কত গাল-ভরা প্রতিশ্রুতিই তো ভারতবর্ষকে দেওয়া হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। কিন্তু তারপর ?

সাম্রাজ্যবাদী প্রতিশ্রুতি যে কি জিনিস তার একটিমাত্র নজীর তুলে দিচ্ছি।

আটলাণ্টিক চার্টারের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৯৪১ সালের ১৪ই আগস্ট। তারপর যুদ্ধের ক'বছরব্যাপী এই নিয়ে দুই প্রধানের কত প্রতিশ্রুতি! কত বেতার-ভাষণ! ঘটা করে কত বাৎসরিক উৎসব পালন!

এ ব্যাপারে যেমন চার্চিল, তেমনই রুজভেল্ট। দুজনের মুখে সেই একই কথা। আমাদের উদ্দেশ্য, পৃথিবীর শোষিত জনগণের মুক্তি। শুধু যুদ্ধটা শেষ হতে দাও। তারপর দেখে নিও তোমরা।

এ প্রসঙ্গে প্রথম বার্ষিকী উৎসবে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাঁর বেতার-ভাষণে কি বলেছিলেন শোনা যাক :

'A year ago to-day the Prime Minister of Great Britain and I as representatives of two nations, sat down and subscribed to a declaration to principles common to our peoples.

We based, and continue to base our hopes for a better future for the world on the realisation of these principles. This declaration is known as the Atlantic Charter...

We re-affirm our principles. They will bring us to happier world.'

অর্থাৎ—আজ থেকে একবছর আগে গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এবং আমি দুটি স্বাধীন জাতির প্রতিনিধিরূপে কর্মনীতির এক ঘোষণা-পত্র লিপিবদ্ধ করি এবং তাতে স্বাক্ষর করি।

এই কর্মনীতিকে কার্যে পরিণত করার ওপর ভবিষ্যৎ সুন্দরতর পৃথিবী গঠন নির্ভর করে,—এ আশা সেদিনও আমরা করেছিলাম, আজও করি। এই ঘোষণা-পত্র আটলাণ্টিক চার্টার নামে পরিচিত।

...আমরা সেই কর্মনীতিতে আমাদের আস্থা পুনরায় ঘোষণা করছি। এই সার্থকতা আমাদের অধিকতর সুখময় পৃথিবীতে এনে দেবে।

এই হল রুজভেল্ট সাহেবের স্বীকৃতি। কিন্তু তারপর ? সে কাহিনী লেখা রয়েছে তখনকার সময়ের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পাতায়। সামান্য একটু নজীর তুলে দিচ্ছি :

'গত ১৯শে ডিসেম্বর (১৯৪৪) এক সাংবাদিক সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ঘোষণা করেছেন যে, আটলাণ্টিক সনদে কেউ কখনো স্বাক্ষর করেনি, বস্তুত এরূপ কোন দলিলই নেই এবং এরূপ সরকারী দলিল কখনও ছিল না।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের এই ঘোষণায় প্রায় সব দেশেরই লোক অল্প-বিস্তর রুষ্ট, বিক্ষুব্ধ বা বিস্মিত হয়েছে।

...আজ যে দলিলের অস্তিত্বই নেই বলে মিঃ রুজভেল্ট সব আশা-নিরাশার নিরসন করে দিয়েছেন, গত তিন বছরেরও বেশি কাল ধরে কিন্তু সেই দলিল মানুষের মনের আসর বেশ গরম করে ছিল। এ নিয়ে কত বাক্-বিতণ্ডা হয়েছে, কত কূট-তর্ক উঠেছে, কত ব্যাপারে এর দোহাই দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কেউ ঘুণাক্ষরেও তো কখনো বলেনি, এরূপ দলিল নেই।'

[সাপ্তাহিক দেশ ঃ ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৪৪ সাল]

এই হল সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রনায়কদের প্রতিশ্রুতির নমুনা। এর পরেও যদি কেউ শোষিত জনগণের 'সত্যিকারের বন্ধু' ব্রিটিশ বা মার্কিন-এর প্রতিশ্রুতিতে নির্ভর করতে না পারে, তাহলে সেটা খুব একটা দোষের হবে কি?

'ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ, আসুন সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ত্যাগ করিয়া বিশ্বমানবের আহ্বানে সাড়া দিই। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে জনসাধারণ যোগদান না করিলে চরম সর্বনাশ ও অনন্ত দাসত্বের ভয়াবহ অভিশাপ আমাদের চির-দিন বহন করিতে হইবে।'

আর ব্রিটিশ জয়ী হলে? তখন যে আমরা এই অনন্ত দাসত্ব থেকে মুক্তি পাব, সে দায়িত্ব কে নেবে? রুজভেল্ট? চার্চিল? না স্ট্যালিন? না, সে সম্বন্ধে ইস্তাহারে কিছু উল্লেখ নেই।

দীর্ঘ ইস্তাহার। প্রয়োজনীয় অংশ তুলে দিয়ে এ বিতর্কমূলক অধ্যায়টি আমি আপাতত এখানেই শেষ করছি, মল্লিকা। এ প্রসঙ্গে আবার তোমাকে আমি বলব আরো পরে।

ওদিকে তখন ঝড় উঠেছে অন্তর্ধান-পর্বের অন্যতম প্রধান নায়ক বি. ভি.-র সত্য বক্সীর মনে। শুধু ভাবনা আর ভাবনা। রাশি রাশি ভাবনা।

ভাবনার কারণ সুভাষ। সেই যে তিনি বার্লিন গিয়ে ২০শে মে তারিখে একটি নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন, তারপর থেকে এ পর্যন্ত আর কোন খবরই পাওয়া যায়নি তাঁর দিক থেকে। কি ব্যাপার! এমন তো হবার কথা নয়!

ইতিমধ্যে তিনি বার বার লোক পাঠিয়েছিলেন পাঞ্জাবের কীর্তি কিষাণ পার্টির কাছে, কিন্তু কোন সদুত্তর মেলেনি। যা পাওয়া গিয়েছে সবই অস্পষ্ট, ভাসা ভাসা উত্তর। কেন ওদের এই নিরুত্তাপ শীতলতা? মনে হয় কিছু একটা ঘটেছে।

এদিকে পুলিশও চুপচাপ বসে নেই। প্রমাণ—মেজদা শরৎ বসুর গ্রেপ্তার।

জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর। ঠিক তার চারদিন পরে (১১ই ডিসেম্বর) পুলিশ তাঁর উডবার্ণ পার্কের বাড়িতে গিয়ে হাজির। তোমাকে ভারত-রক্ষা বিধির ২৬ ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হল।

অপরাধ? অপরাধ,—জাপানের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ রয়েছে।

প্রমাণ? হ্যাঁ, প্রমাণ আমাদের হাতেই রয়েছে।

হৈ-চৈ করে উঠেছিল সংবাদপত্রগুলি। প্রমাণ যখন রয়েছে, তখন বিনা-বিচারে আটক করা কেন? আদালতে গিয়ে প্রমাণ করলেই তো হয়!

পুলিশ কোন জবাব দিতে পারেনি। হয়তো বা দেবার প্রয়োজনও বোধ করেনি। ফলে, শেষ পর্যন্ত বন্দী-নিবাস।

এবার কার পালা? পরিস্থিতি সত্যিই বড় জটিল। কখন যে কি ঘটে যাবে, বলা শক্ত।

আশঙ্কা অমূলক হল না। লাহোর থেকে মারাত্মক খবর নিয়ে ফিরে এলেন বি. ভি.-র শান্তিময় গাঙ্গুলী। কমিউনিস্ট-ভাবাপন্ন কীর্তি কিষাণ পার্টি সুভাষের ব্যাপারে আর কোনরকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত নয়। সুভাষ সম্বন্ধে আর কোনরকম উৎসাহও নেই তাদের।

বিপদের যেন সুস্পষ্ট পদধ্বনি শুনতে পেলেন সত্যবাবু।

কীর্তি কিষাণ পার্টি কোনরকম সহযোগিতা করুক বা না করুক, তাতে আজ আর সুভাষের কিছু এসে-যায় না। কারণ তিনি এখন নাগালের বাইরে।

আশঙ্কার কারণ রয়েছে অন্য জায়গায়। অন্তর্ধান-পর্ব সম্বন্ধে কোন কিছুই কীর্তি কিষাণ পার্টির অজানা নয়। এ নিয়ে কোনরকম বিশ্রী পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে না তো?

এদিকে দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেউ প্রায় বাইরে নেই।

নরওয়ে আক্রান্ত হয়েছিল ১৯৪০ সালের ৯ই এপ্রিল।

১২ই এপ্রিলের মধ্যেই বি. ভি.-র প্রথমশ্রেণীর নেতৃবৃন্দের মধ্যে পঁচিশ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে একে একে। সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ, ভূপেন্দ্র-কিশোর রক্ষিত-রায়, মেজর সত্য গুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, রসময় শূর, সুপতি রায়, নিকুঞ্জ সেন প্রমুখ কেউ বাদ নেই সেই তালিকা থেকে।

বাকি রয়েছেন গুটি-কয়েক বিশ্বস্ত কর্মী মাত্র। আর রয়েছেন যতীশ গুহ, যিনি ইতিপূর্বে মেদিনীপুরের তৃতীয় জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ-নিধন এবং দার্জিলিং-এ বাংলার গভর্ণর কুখ্যাত এণ্ডারসন-হত্যা প্রচেষ্টা দুটি পরিচালনা করেছিলেন অতি নিপুণভাবে।

পরিস্থিতি মোটেই আশাপ্রদ নয়। মনে হয় শীগগিরই ঝড় উঠবে। মেঘের কুণ্ডলীতে যেন তারই আভাস। ঝড়ের সেই প্রচণ্ড দাপটে কে যে কোথায় হারিয়ে যাবে, বলা শক্ত।

অনুমান মিথ্যে হল না। প্রথমেই ধরা হল সত্য বক্সী আর যতীশ গুহকে। ওদিকে ধরা পড়লেন কাবুসের উত্তমচাঁদ। জীবনের অনেকগুলো বছরই তাঁকে কাটাতে হল লৌহ-কপাটের অন্তরালে।

অমলেন্দু ঘোষও রেহাই পেলেন না। তিনি তখন হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানীর একজন কর্মী। কীর্তি কিষাণ পার্টির প্রতি যতীশ গুহের নির্দেশ ছিল, কোন জরুরী খবরাখবর থাকলে তাঁরই অফিসের ঠিকানায় যেন যোগাযোগ করা হয়। সুতরাং ধর এবার অমলেন্দু ঘোষকে।

কিন্তু কোথায় অমলেন্দু ঘোষ? ছুটি নিয়ে তিনি তখন ঢাকাতে।

সঙ্গে সঙ্গে জরুরী টেলিগ্রাম। শীগগির ধরো ওকে। খবরদার! কোন-রকমেই যেন ফসকে যেতে না পারে।

পরবর্তী লক্ষ্য সেই ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার সত্যব্রত মজুমদার। কর্মী হিসেবে ততদিনে তিনি যোগ দিয়েছেন নারায়ণগঞ্জের ঢাকেশ্বরী মিলের পাওয়ার হাউসে।

সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ গিয়ে হাজির। কোথায় সত্যব্রত মজুমদার? এক্ষুণি তাকে চাই।

সব বৃথা। দূর থেকে ব্যাপারটা অনুমান করতে পেরে ততক্ষণে পেছনের গেট দিয়ে সত্যব্রত মজুমদার হাওয়া।

সন্দেহক্রমে ধরা হল বিভিন্ন দলের আরো অনেককেই। দিনকাল ভাল নয়। সুভাষ বোস নাগালের বাইরে। কখন যে তিনি সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ফিরে এসে কি কাণ্ড বাধিয়ে বসবেন, কে জানে! সুতরাং সতর্ক থাকাই ভাল।

যতীশ গুহ ও সত্য বক্সীর কথা তোমাকে আগেই বলেছি। এবার এগিয়ে এল ব্রিটিশ মিলিটারী বাহিনী। কি করে কথা আদায় করতে হয়, তা পুলিশের চাইতে আমরাই ভাল জানি। সুতরাং ওদের আমাদের হাতে ছেড়ে দাও।

সঙ্গে সঙ্গে দুজনকে পাঠিয়ে দেওয়া হল লালকেল্লার মিলিটারী হেপা-জতে। তারপর যা হল তা সহজেই অনুমেয়। এমন অমানুষিক নির্মম নির্যাতন বুঝি একমাত্র ব্রিটিশ টমিদের পক্ষেই সম্ভব। কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে তা কল্পনা করাও কঠিন।

সুভাষ বোস কি করে বার্লিন গিয়েছেন বলো? কোন্ পথে? তোমা-দের মধ্যে কে কে জড়িত ছিলে এ ব্যাপারে? কবে উনি ফিরে আসবেন সৈন্য-বাহিনী নিয়ে? কোন্ পথ দিয়ে? বলবে না? বেশ, তাহলে দেখ!

জ্ঞান হারিয়ে ফেললেও রেহাই নেই। কতক্ষণ আর থাকবে এভাবে? এক সময়ে না এক সময়ে জ্ঞান ফিরে আসবেই। তখন যাবে কোথায়?

দাঁত কামড়ে নিঃশব্দে পড়ে রইলেন সত্যবাবু। সুভাষ শুধু তাঁর বিপ্লবী সতীর্থই নন, সুভাষ তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু। এমন একটি কথাও নয়, যার ফলে সুভাষের সেই মরণ-পণ প্রচেষ্টা এতটুকু ব্যাহত হতে পারে। প্রাণ যায় তো যাক, তবু কোন কথা নয়।

সত্যবাবু তখন খুবই অসুস্থ। তা সত্ত্বেও কি করে যে তাঁর পক্ষে সেদিন সেই অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করা সম্ভব হয়েছিল, তা ভাবতে গেলে সত্যিই অবাক লাগে। তাও একদিন-দুদিন নয়—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

সহ্য করতে পারলেন না যতীশবাবু। দিনের পর দিন পৈশাচিক নির্যাতনের ফলে হঠাৎ একদিন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন গুরুতরভাবে।

সঙ্গে সঙ্গে টনক নড়ল পররাজ্যগ্রাসী ইংরেজ সরকারের। তাই তো! এ যে বড্ড বাড়াবাড়ি অবস্থা হয়ে দাঁড়াল দেখছি! এরপর ভাল-মন্দ কিছু একটা হলে শেষে যে বদনাম কুড়োতে হবে সরকারকেই! সুতরাং দাও ওকে খালাস।

কিছুতেই কিছু হল না। মাত্র কিছুদিন বাদেই বি. ভি.-র সেই সার্থক নায়ক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা সৃষ্টি করে।

পরিস্থিতি লক্ষ্য করে সঙ্গে সঙ্গে গা-ঢাকা দিলেন কামাখ্যা রায়, বিনয় সেনগুপ্ত, ধীরেন সাহারায়, শান্তিময় গাঙ্গুলী, সত্যব্রত মজুমদার প্রমুখ বি. ভি.-র একনিষ্ঠ কর্মিবৃন্দ। কণ্ঠে তাঁদের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সুর।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এ পর্যন্ত অনেক মূল্যই দিতে হয়েছে বৈপ্লবিক সংস্থা বি. ভি.-কে। দিতে হয়েছে স্বাস্থ্য ও প্রাচুর্যে ভরপুর অসংখ্য তাজা প্রাণ।

প্রয়োজন হলে আমরাও দেব। তবু স্বাধীনতা অর্জনের এই প্রাণপণ প্রচেষ্টাকে দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে কোনরকমেই আমরা ব্যর্থ হতে দেব না। মহাবিপ্লবী সুভাষচন্দ্র বসু জিন্দাবাদ। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

উপেক্ষিত নায়ক গান্ধীজী। কেউ নেই সেদিন তাঁর আশে-পাশে। কেউ নেই।

যুদ্ধে সহযোগিতার প্রশ্ন নিয়ে সবাই সেদিন তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেছেন। জওহরলাল, মৌলানা আজাদ, ভুলাভাই দেশাই প্রমুখ সবাই।

২৭শে এপ্রিল এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে তাঁর প্রস্তাব উপেক্ষিত হয়েছে। পরিবর্তে গৃহীত হয়েছে জওহরলালের প্রস্তাব। অন্য তো দূরের কথা, একান্ত ভক্তদের মধ্যেও কেউ সেদিন সমর্থন করেননি তাঁকে। সহকর্মীদের কাছে আজ তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

গান্ধীজী নির্বিকার। বাইরে কোথাও কোন পরিবর্তন নেই। সবই ঠিক আছে। সবই চলেছে সংসারের অপরিবর্তনীয় নিয়মের নির্দেশে।

শুধু বুকের মধ্যে কোথায় যে একটা কান্নার পাখি ক্রমাগত ডানা ঝাপটে মরছে, সে খবর কেউ জানে না।

দিনগুলি যেন দুঃস্বপ্নের মতো আসে আর যায়।

শুধু ভাবনা আর ভাবনা! অস্থির চঞ্চল সব ভাবনা। ক্রীপস প্রস্তাব ব্যর্থ হয়েছে। কি করা যায় এখন?

মাঝে মাঝে অতীতের জীর্ণ পাতা ভেসে আসে চিন্তার আবর্তে। মনে পড়ে পুরানো মানুষের কথা। পুরানো জীবনের ছন্দ।

মনে পড়ে বিদ্রোহী সন্তান সুভাষের কথা। বড় অভিমানী ছেলে, তাই অভিমান করে আজ সে দূরে সরে গেছে। যে করে হোক, যে-কোন উপায়ে হোক, স্বাধীনতা তার চাই-ই। তার জন্য কোনমতেই সে দেরি করতে প্রস্তুত নয়।

মত ও পথ আলাদা, নইলে স্বাধীনতা তাঁর নিজেরই কি কাম্য নয়? সারা জীবন কি তিনি সংগ্রাম করেননি পরাধীনতার বিরুদ্ধে?

সংগ্রাম—সংগ্রাম আর সংগ্রাম! সংগ্রামের নামে ছেলেটা একেবারে উন্মত্ত যেন। জীবনভোর একটাই মাত্র কথা। কোন আপস নয়। কোন দর-কষাকষিও নয়। সংগ্রাম চাই। আপসহীন সংগ্রাম।

সংঘাত বেধেছিল ১৯২৮ সালে অনুষ্ঠিত কলকাতা কংগ্রেসে।

তাঁর লক্ষ্য ছিল সেদিন ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস বা স্বায়ত্তশাসন। অপরপক্ষে সুভাষ পূর্ণ স্বাধীনতার কমে কিছুতেই রাজী নয়। তারপর সেকি তার উদ্দীপ্ত ভাষণ ঃ

'The youths of India are no longer content with handing over all responsibility to their older leaders and sitting down with folded hands or following like dumb-driven cattle.'

[Speeches and Writings of Subhas Bose : P.—80-81]

১৯২৯ সালে অনুষ্ঠিত লাহোর কংগ্রেসে আবার নতুন দাবী। আমি পাশাপাশি জাতীয় সরকার গড়ে তুলতে চাই।

তারপর ১৯৩১ সালে অনুষ্ঠিত করাচী কংগ্রেস ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর ফাঁসিকে কেন্দ্র করে সেকি অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি সেদিন! সুভাষের সেদিনের ভূমিকা কোনরকমেই ভুলে যাবার নয়।

তারপর দীর্ঘদিন ইয়োরোপে। সেখানেও তার সেই একই চেহারা। প্রমাণ, বসু-প্যাটেল বিবৃতি। গান্ধী-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অমন বিবৃতি দেবার মতো যোগ্যতা সেদিন সারা হিন্দুস্থানে ঐ একটি মানুষেরই বুঝি ছিল।

১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি। আশ্চর্য, সবার মুখে সেদিন একই কথা। প্ল্যানিং কমিশন! প্ল্যানিং কমিশন! প্ল্যানিং কমিশন!

সুভাষের মুখে প্ল্যানিং কমিশনের কথা শুনে সত্যিই সেদিন অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল সুধী-মহলে। ভারতবর্ষে এর আগে এমন কথা ভাবতেও বুঝি পারেনি কেউ।

সেই একই বছরে জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে সুভাষের মুখে শোনা গেল এক নতুন দাবী।

ইংরেজ, ভারত ছাড়। অবিলম্বে হাত গোটাও এদেশ থেকে। সেই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন সুভাষেরই দাদা শরৎচন্দ্র বসু।

তারপর ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সেই অবাঞ্ছিত অধ্যায়।

সেখানেও সুভাষের ভাষণে শোনা গেল সেই একই দাবী। ভারত ত্যাগ করার জন্য ইংরেজকে চরমপত্র দেওয়া হোক। মাত্র ছ'মাস সময়, তারপরই শুরু হবে ব্যাপক সংগ্রাম।

তারপর কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার এবং ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন। সবশেষে অন্তর্ধান। তারিখটা ছিল ১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারি।

সুভাষের সেই অন্তর্ধান কি সেদিন খুব একটা অপ্রত্যাশিত ছিল তাঁর কাছে?

না, ছিল না। মত ও পথ আলাদা, তবু যাবার আগে সুভাষ নিজেই একদিন তাঁকে খুলে বলেছিল সব কথা। বাইরে গিয়ে কিছু করা যায় কিনা, আমি তা একবার দেখতে চাই। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন।

উত্তরে তিনি বলেছিলেন, কৃতকার্য হলে আমিই সেদিন সর্বাগ্রে অভিনন্দন জানাব তোমাকে।

সুভাষ তার কথা রেখেছে। এরি মধ্যেই সে এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছে সুদূর জার্মানীতে গিয়ে। সেখান থেকে মাঝে মাঝেই ভেসে আসে তার সেই তেজোদীপ্ত কণ্ঠস্বর—'আমি সুভাষ বলছি।'

দিনের পর রাত্রি। আবার রাত্রিও এক সময়ে হারিয়ে যায় দিনের আলোর সমারোহে।

সেই একই ভাবনা তখন ক্রমাগত ঘুরপাক খেয়ে চলেছে গান্ধীজীর মনে।

ইতিহাস এগিয়ে চলেছে। ভারতের কোটি কোটি মানুষের বাপুজী হয়ে একমাত্র তিনিই কি শুধু নির্বাক একটি দর্শকের মতো নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবেন দেশের এই চরম বিপদের দিনে?

অসম্ভব! কিন্তু কি করা যায় এখন? কি করা উচিত?

'Azad Hind Radio, Berlin, I am Subhas calling...

Freedom is not given, it is taken. Freedom never could be a gift, because every gift carries its obligations, its ties...'

সুভাষ! সুভাষ! সুভাষ! সেই কণ্ঠ! মুখে সেই চিরন্তন সংগ্রামের ডাক! স্বাধীনতা কেউ দেয় না, আদায় করে নিতে হয়।

কোন্‌টা আজ সবচাইতে বেশি প্রয়োজন? সংগ্রাম, না সহযোগিতা? বন্ধুত্ব, না বিচ্ছেদ? স্বাধীনতা, না দাসত্ব?

'Britain's paid propagandists have been calling me an enemy agent. I need no credentials when I speak to my own people.

My whole life is one long persistent, uncompromising struggle against British imperialism, and is the best guarantee of my bonafides...

All my life I have been the servant of India Until the last hour of my life I shall remain one. My allegiance and loyalty have ever been and will ever be to India alone, no matter in which part of the world I may live...'

ব্রিটিশের ভাড়াটে প্রচারকরা আমাকে যতই শত্রুর এজেন্ট বলুক না কেন, আমি যখন দেশবাসীর সঙ্গে কথা বলি, তখন আমার কোন পরিচয়-পত্রের দরকার হয় না। সারা জীবন নিরলসভাবে আমার ব্রিটিশের সঙ্গে সংগ্রাম করে কেটেছে। তাই-ই আমার বিশ্বস্ততার গ্যারান্টি।

আমি ভারতবর্ষের সেবক। পৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেন, ভারতবর্ষের প্রতিই আমার আনুগত্য থাকবে চিরদিন।

মুহূর্তের পর মুহূর্ত কেটে যায়। তবু সেই কলকণ্ঠ কানের কাছে একটানা বেজে চলে বিরামহীনভাবে :

'Azad Hind ! To fight and win India's liberty, and then build up in India, with full freedom to determine her own future—with no interference ! Free India will have a social order based on the eternal principles of Justice, Equality and Fraternity.'

সব কথাই মিলিয়ে যায় আস্তে আস্তে। শুধু জেগে থাকে তিনটি মাত্র শব্দ। Justice ! Equality ! Fraternity ! ন্যায় ! সাম্য ! ভ্রাতৃত্ব ! এই তিনটি নীতিকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠবে সুভাষের স্বপ্নের ভারত।

এমনি করে দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। নানা ভাবে। নানা ভাষায়।

'আমি সুভাষ বলছি......'

আমার ভাইবোনেরা,

ব্রিটিশ অতীতে ভারতবর্ষকে দাস ও দরিদ্র করে রেখে যে নীতির অনুসরণ করে এসেছে, আজ তাকে তার অব্যর্থ ফলভোগ করতেই হবে।

একথা আজ অতি স্পষ্ট যে, এ সুযোগ কিছুতেই আমরা হেলায় হারাব না। ভারতের জাতীয় মুক্তির শেষ সংগ্রামের জন্য অচিরেই আমরা আমাদের অভিযান শুরু করব। আমরা সংগ্রাম করব আমাদের সকল শক্তি দিয়ে। বিধাতার আশীর্বাদে ও দেশবাসীর সহায়তায় আমরা জয় করব আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের মুক্তি।

হয় কুল, নয়তো অতল সমাধি—এ ছাড়া আর কোন পথই খোলা নেই আজ আমাদের চোখের সামনে। জয় হিন্দ্ !'

বুঝি নিমেষে মনের মণিকোঠা জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে গান্ধীজীর।

মহাভারতের পঞ্চপান্ডব তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য রাজত্বের পরিবর্তে মাত্র পাঁচখানি গ্রাম দাবী করেছিলেন দুর্যোধনের কাছে। মধ্যস্থতা করেছিলেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

দাম্ভিক দুর্যোধন তাতে কর্ণপাত করেনি। হাজার বার, হাজারভাবে অনুরোধ করা সত্ত্বেও তার হৃদয়ের এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। তাই তো মহাবীর অর্জুনকে শেষ পর্যন্ত গাণ্ডীব ধারণ করতে হয়েছিল নিরুপায় হয়ে।

তাই হয়। সংসারে দুর্যোধনরা কোন কালেই কারো উপদেশে কান দিতে জানে না। হাজার দৃষ্টান্ত দেখেও ওদের চৈতন্য হয় না। আজো তা হবে না। সে আশাও সুদূর পরাহত। সুতরাং ভারতবাসীকে তার জন্মগত দাবী আদায় করতে হলে চাই সংগ্রাম। হয় কুল, নয়তো অতল সমাধি। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে!

এ ছাড়া আজ আর কোন পথই খোলা নেই ভারতবাসীর সামনে।

ওদিকে পুরানো সহকর্মিবৃন্দ অবাক।

বাপুজী যেন আর সে বাপুজী নেই। কিসের যেন একটা দ্বন্দ্ব চলছে তাঁর ভেতরে। কিসের যেন একটা ব্যাকুল ভাবনা। দিনে-রাতে। সময়ে-অসময়ে সর্বক্ষণ।

ঠিক বোঝা যায় না, তবে তার আলোড়নটা যেন বাইরে থেকেও বেশ উপলব্ধি করা যায়। অব্যক্ত বোবা আলোড়ন।

কেন বাপুজীর এই বিস্ময়কর পরিবর্তন? কার কথা তিনি এমন করে ভাবছেন দিন-রাত? কে সেই লোক?

জানতেন শুধু একজন। তিনি হলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। একমাত্র তিনিই সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাপুজীর আসল ব্যথা কোথায়।

ব্যথার কারণ—সুভাষ।

সেই সুভাষ, যাঁকে একদিন তিনি নিজেই বহিষ্কার করেছিলেন কংগ্রেস থেকে।

আশ্চর্য, আজ আবার সেই সুভাষের ভাবনাতেই সমস্ত চেতনা তাঁর আচ্ছন্ন হয়ে আছে সর্বক্ষণ। সুভাষ যে তাঁর বিদ্রোহী সন্তান! তাঁকে তিনি ভুলবেন কি করে?

এ আমার কোন মনগড়া কাহিনী নয় মল্লিকা, এ ইতিহাস। এ ইতিহাসের সাক্ষী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।

নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও সুভাষের বেতার-ভাষণ অনেকেই সেদিন শুনেছেন। ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দও তার ব্যাতিক্রম নন। বহু দিন, বহুভাবেই তাঁরা তা শুনেছেন পরম আগ্রহভরে।

প্রমাণ, আজাদ সাহেবের একটি চিঠি। চিঠিতে বন্ধু জওহরলালকে তিনি লিখেছেন:

'......চার-পাঁচ দিন আগে বার্লিন থেকে সুভাষবাবুর একটা বিবৃতি বেতারে প্রচার করা হয়েছিল। পরদিন ঘোষণা করা হল, ঐ বক্তৃতাটি রেকর্ড করা হয়েছে এবং তাতে সুভাষবাবুরই নিজের কণ্ঠস্বর শোনা যাবে।

আমি শুনেছি। সুভাষবাবুরই কণ্ঠস্বর। আমার কিন্তু মনে হয় ওটা

রেকর্ড নয়, উনি নিজেই বলেছিলেন। তবে টোকিও থেকে যে বেতার-বক্তৃতা প্রচার করা হয়েছিল সেটা নিশ্চয়ই রেকর্ড। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, রেকর্ডখানা বিদ্যুতের সাহায্যে চালানো হচ্ছে।' [পত্রগুচ্ছ : জওহরলাল]

সুভাষকে কেন্দ্র করে গান্ধীজীর এই বিস্ময়কর রূপান্তরের কথাও লিখে গেছেন আজাদ সাহেব নিজেই। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'ইণ্ডিয়া উইনস্ ফ্রীডম' গ্রন্থে কি লিখেছেন, শোন :

'I also saw that Subhas Bose's escape to Germany had made a great impression on Gandhiji...and now I found a change in his outlook.'

এখানেই থামেননি আজাদ সাহেব। আরো লিখেছেন :

'...many of his remarks convinced me that he admired the courage and resourcefulness Subhas Bose had displayed in making his escape from India.'

'ইণ্ডিয়া উইনস্ ফ্রীডম' নিয়ে কিন্তু পরবর্তী কালে আজাদ সাহেবকে কম সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়নি, মল্লিকা। হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। হলই বা সত্যি, তা বলে সুভাষ বোসকে নিয়ে এত মাতামাতি কেন ?

৫ই জুলাই ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসল ওয়ার্ধায়।

একদিকে গান্ধীজী একা, অন্যদিকে জওহরলাল, আবুল কালাম আজাদ, ভুলাভাই প্রমুখ সবাই।

প্রাণপণে বিরোধিতা করলেন জওহরলাল।

এ সময়ে কোনরকম সংগ্রাম শুরু করা ঠিক নয়। তাতে লাভ হবে ত্রি-শক্তির। জাপানীরা যে সেই সুযোগে ভারত আক্রমণ করবে না, তা কে বলতে পারে !

গান্ধীজীর মতে এটা কোন যুক্তিই নয়। জাপান আমাদের শত্রু নয়, ব্রিটিশের। তারা যদি আমাদের দেশে আসে তো ব্রিটিশের জন্যই আসবে, আমাদের জন্যে নয়। সুতরাং ব্রিটিশ বিদেয় হোক।

'...if the Japanese army ever come into India, it would come not as our enemy but as the enemy of the British.'

বাধা দিলেন জওহরলাল। বোঝাতে চেষ্টা করলেন নানাভাবে। কংগ্রেস অহিংস নীতিতে আস্থাবান। এ সময়ে আন্দোলন শুরু করলে বিদেশে আমাদের মর্যাদার হানি হবে।

বটেই তো ! বটেই তো ! ফুট্ কাটলেন পরিহাস-প্রিয় আচার্য কৃপালনী, কিন্তু সাহেবরা আমাদের সম্বন্ধে কি ভাববে, শুধু সেটা দেখলেই তো চলবে না। কিছু একটা করা না হলে দেশবাসী কি ভাববে,—সেটাও দেখতে হবে তো !

একই অভিমত কংগ্রেসের লৌহ-মানব সর্দার প্যাটেলের। অনেক দিন গেছে। আর কত।

অনেক বাদানুবাদ, অনেক তর্ক-বিতর্ক।

কিন্তু সব বৃথা। গান্ধীজী অটল, অনড়। শেষপর্যন্ত তিনি চরমপত্র পেশ করলেন সহকর্মীদের কাছে।

তোমাদের কাউকে আমি চাই নে। কাউকে আমার দরকার নেই। কারণ, আমি জানি যে, তোমাদের আর আমার পথ আলাদা। একসঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করা আর আমাদের পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়।

'Things reached a climax when he sent me a letter to the effect that my stand was so different from his that we could not work together.'

[India Wins Freedom : Azad]

এখানেই শেষ নয়। এই সঙ্গে আরো স্পষ্ট করে গান্ধীজী জানিয়ে দিলেন তাঁর মনের কথা। কংগ্রেস যদি আসে তো ভালই, নইলে একাই আমি সংগ্রাম শুরু করব আমার অনুগামীদের নিয়ে। আর কোনরকম দেরি করতে আমি প্রস্তুত নই।

'...I shall have to fight against the whole world and stand alone. Even if all the United Nations oppose me, even if the whole of India tries to persuade me that I am wrong, even then I will go ahead, not for India's sake alone but for the sake of the world.

I cannot wait any longer for Indian freedom. I cannot wait until Mr. Jinnah is converted. If I wait any longer, God will punish me. This is the last struggle of my life.'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন জওহরলাল প্রমুখ সহকর্মীর দল।

এ কার কণ্ঠ? বাপুজীর, না সুভাষের? মনে হয় এ যেন এতদিনকার চেনা সেই বাপুজী নন। আমূল পরিবর্তিত কোন ভিন্ন সত্তা।

কিন্তু কি করে এটা সম্ভব হল? কোন অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত গান্ধীজীর প্রস্তাব মেনে নিলেন জওহরলাল, মৌলানা আজাদ প্রমুখ সহকর্মিবৃন্দ।

তাছাড়া উপায় কি! গান্ধীজী মানেই যে কংগ্রেস। তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করা মানেই যে চরম অবলুপ্তি!

একমাত্র সুভাষ ছাড়া সে সাহস, শক্তি বা যোগ্যতা ক'জনের ছিল গোটা ভারতবর্ষে? ছিল কি কারো? তোমার কি মনে হয়, মল্লিকা?

তা বলে মন থেকে কিন্তু জওহরলাল গান্ধীজীর সেই প্রস্তাব কোনদিনই সমর্থন করতে পারেননি, মল্লিকা। তাঁর মতে গান্ধীজীর সেদিনের সেই সিদ্ধান্ত একটা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের নিদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়।

'Gandhiji's approach also seemed to ignore international

considerations and appeared to be based on a narrow view of nationalism.' [Discovery of India]

প্রস্তাব গৃহীত হল ১৪ই জুলাই।

তবে সবটা নয়, খানিকটা। গান্ধীজীর সেই প্রস্তাব নাকি অত্যন্ত বিপ্লবাত্মক। কিছুটা বিপজ্জনকও বটে।

তাই তাঁর অগোচরে কখন যে সেই মূল প্রস্তাব থেকে কিছুটা অংশ কোথায় উবে গেল, সে রহস্যের কিছুতেই আর সমাধান করা গেল না।

ওদিকে তখন হৈ-চৈ পড়ে গেছে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার সর্বত্র। পত্র-পত্রিকায় সমালোচনাও করা হল বিস্তর।

এ সময়ে মিঃ গান্ধীর আন্দোলন শুরু করার একমাত্র অর্থই হল দেশে অরাজকতা সৃষ্টি ও যুদ্ধ-প্রচেষ্টা ব্যাহত করা। সুতরাং তাঁর এই আন্দোলন কোন দিক থেকেই সমর্থনযোগ্য নয়।

তীব্র আক্রমণ করলেন সেই ক্রীপস্। লন্ডন থেকে প্রচারিত এক বেতার-বক্তৃতায় খোলাখুলিভাবেই তিনি আবেদন জানালেন বড় তরফের কর্তা আমেরিকার কাছে।

মিঃ গান্ধীর এই সিদ্ধান্ত অবিবেচনাপ্রসূত। এ আন্দোলন যে করে হোক, দমন করতেই হবে। তোমরাও এস আমাদের সঙ্গে।

আমেরিকারও সেই কথা। মিত্রশক্তির প্রধান যুদ্ধ-ঘাঁটি এখন ভারতবর্ষ। এ সময়ে যারা আমাদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা ব্যাহত করবে, তারা আমাদের 'শত্রু' ছাড়া আর কিছুই নয়।

হুমকি দিলেন যুদ্ধকালীন ব্রিটিশ ভারতের সেক্রেটারী অফ স্টেট মিঃ এল. এস. আমেরী। মিঃ গান্ধী তাঁর প্রস্তাবিত আন্দোলন শুরু করলে ভারত সরকার তার মোকাবিলা করার জন্য সব সময়েই প্রস্তুত।

জবাব দিলেন গান্ধীজী।

আমার বক্তব্য এত স্পষ্ট. যা নির্বোধেরও বোধগম্য হওয়া উচিত। এ ধরনের হিস্টিরিয়া-সুলভ চিৎকার করে কোন লাভ নেই। যে যই যুক্তি দেখাক না কেন. ভারতবর্ষে এই যুদ্ধের আয়োজন নিছক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে রক্ষারই আয়োজন। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই আমার মন ব্রিটিশকে নৈতিক সাহায্য দান করতে অস্বীকার করছে। আমি একথাও বিশ্বাস করি যে. ব্রিটিশের উপস্থিতিই আজ জাপানকে ভারত-আক্রমণে উত্তেজনা দিচ্ছে। সুতরাং ব্রিটিশ আমাদের দেশ থেকে চলে যাক। তারপর আমাদের সমস্যা আমরাই বুঝে নিতে পারব।

'Let them (the British) withdraw from India and I promise that the Congress and the Muslim League will find it to their interest to come together and devise a home-made solution for the Government of India.'

গান্ধীজী সত্যাশ্রয়ী। কি ব্যক্তিগত জীবনে, কী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে,

কোথাও তাঁর মধ্যে গোপনীয়তার কিছু নেই। তাই এবার তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্যা মীরা বেনকে (মিস শ্লেড) দিল্লীতে পাঠালেন বড়লাট লিনলিথগোর সঙ্গে দেখা করার জন্য। উদ্দেশ্য—আসন্ন আন্দোলন সম্বন্ধে সব কিছু খুলে বলা।

কোথায় বড়লাট!

জবাব দিলেন তাঁর সেক্রেটারী, না, দেখা হবে না। মিঃ গান্ধী বিদ্রোহের হুমকি দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর সঙ্গে বা তাঁর প্রেরিত কোন লোকের সঙ্গে দেখা করতে ভাইসরয় কোনমতেই রাজী নন।

সরকারী ইস্তাহারে আরো পরিষ্কার করে বলা হলঃ

কংগ্রেস সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি, সরকার একথা মানতে রাজী নন। দেশে বিরাট এবং শক্তিশালী অন্যান্য দলও রয়েছে। এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও তারা জানিয়েছে। সুতরাং তাদের এই দাবীর পেছনে কোন যুক্তি নেই। মিঃ গান্ধীর এই চ্যালেঞ্জে ভারত সরকার দুঃখিত, তবে আন্দোলন যাতে বিস্তৃতভাবে হতে না পারে সরকার সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন।

কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য আরো স্পষ্ট। এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ। সুতরাং সর্ব শক্তি দিয়ে এই আন্দোলন প্রতিহত করতে হবে। এমন কোন কিছুই করতে দেওয়া হবে না, যাতে ব্রিটিশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা এতটুকুও ব্যাহত হতে পারে। কারণ, ব্রিটিশও এখন জনযুদ্ধের অন্যতম শরিক।

অবশ্য শুরুতে তাদের এ মনোভাব ছিল না। তখন তাদের বক্তব্য ছিল—এ যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ-আমেরিকার যুদ্ধ। সুতরাং—'এক পাই, এক ভাই নাহি দিব সমরে'।

মতের পরিবর্তন হল জার্মানী কর্তৃক রাশিয়া আক্রান্ত হবার পরে। তখন থেকেই দলীয় মুখপত্র 'অরণি', 'জনযুদ্ধ' ও 'পিপলস্ ওয়ার'-এ শোনা গেল নতুন শ্লোগান। 'চাল দাও, টাকা দাও, সেনাদলে ছেলে দাও'। কারণ এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ।

বছরের শুরুতেই আবেদন জানানো হয়েছিল সরকারের কাছে। এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ। সুতরাং এখন থেকে আমরা সর্বতোভাবে সহযোগিতা করব সরকারের সঙ্গে। জাপান সাম্রাজ্যবাদী। যে করে হোক, তাকে রুখতেই হবে।

জবাব মিলেছে ২২শে জুলাই। সেদিন এক সরকারী প্রেসনোটে বলা হলঃ কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তাঁদের অধিকাংশকেই মুক্তির আদেশ দেওয়া হল এবং সেই সঙ্গে পার্টি ঘোষিত হল বৈধ বলে।

সরকারী সিদ্ধান্তের প্রশংসা করে পরদিনই ভারত সরকারের লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার মিঃ নিম্বলকার এক বিবৃতি দিলেন স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায়। গান্ধী-আন্দোলনের বিরোধিতা করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে মুক্তি দিয়ে সরকার যথেষ্ট বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন।

সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছেন সুভাষ।

অজ্ঞাতেই বুঝি বুকের মধ্যে গুমরে ওঠে ছোট্ট একটি নাম—গান্ধী! গান্ধী! গান্ধী! অহিংস-মন্ত্রের ঋষি গান্ধীজী!

রাজনৈতিক জীবনে কতবার তাঁদের মতবিরোধ ঘটেছে, সংঘর্ষ হয়েছে, এমন কি শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদও ঘটেছে দুজনের মধ্যে, তবু গান্ধীজী, গান্ধীজীই। জাতির গণ-জাগরণের মূলে তাঁর বিরাট অবদানের কথা কোন-রকমেই অস্বীকার করার উপায় নেই।

সংগ্রাম শুরু করার জন্য ইতিপূর্বে তিনি কম আবেদন জানাননি গান্ধী-জীর কাছে। কম চাপ দেননি। কিন্তু লাভ হয়নি কিছুই।

প্রতিবারই তিনি পিছিয়ে গিয়েছেন কোন-না-কোন একটা যুক্তির অবতারণা করে।

সমস্ত দ্বিধা-সংকোচ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আজ সেই গান্ধীজী মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন সবার পুরোভাগে। তাঁর জয় হোক। ভারত স্বাধীন হোক।

একসঙ্গে ঘরে-বাইরে দুদিক থেকে আঘাত হানতে পারলে সাফল্য সুনিশ্চিত। জয় হিন্দ্!

ওদিকে রাসবিহারী বসুর চোখেও ঘুম নেই। তিনিও সেই একই ভাবে প্রহর গুনে চলেছেন তাঁর একান্ত প্রিয় জন্মভূমির পানে তাকিয়ে। গান্ধীজী সংগ্রাম ঘোষণা করেছেন। কবে আসবে সেই শুভলগ্ন! কবে!

২৮শে জুলাই তারিখে ভারতবাসীদের উদ্দেশে মহানায়ক রাসবিহারী এক মর্মস্পর্শী আবেদন জানালেন থাইল্যান্ড রেডিও থেকে।

দিন আগত ঐ। সবাই আপনারা দলে দলে যোগ দিন গান্ধীজীর এই আন্দোলনে। মনে রাখবেন, জাতীয় জীবনে এমন সুযোগ বার বার আসে না।

'Friends, the hour has struck. We must now break the shuckles which the British had bound us hand and foot... India had lost everything but she has not lost her soul. Centuries of oppression and exploitation have not been able to kill her soul...

...I therefore earnestly appeal to our compatriots at home to rally round Mahatma Gandhi in his campaign to compel the British to leave India immediately...'

[Rash Behari Bose—His Struggle for India's Independence : P.—180]

রাসবিহারী তখন রীতিমত অসুস্থ। চলাফেরা করতেও কষ্ট হয়। তা বলে নিজের কথা চিন্তা করার মতো সেদিন এতটুকুও অবকাশ ছিল ঘরছাড়া এই মানুষটির?

ঘর-পিয়াসী মহানায়ক তখন ঘরের নেশায় শিশুর মতো উন্মত্ত যেন!

কবে আমি ঘরে ফিরে যাব! কবে আমি স্বাধীন ভারতবর্ষকে দেখতে পাব দু চোখ ভরে! কবে!

১লা আগস্ট তারিখে আবার মহানায়কের কণ্ঠ ভেসে এল সুদূর থাইল্যান্ড থেকে। আমার আন্তরিক অনুরোধ, সবাই গান্ধীর এই সংগ্রামে যোগ দিন দলে দলে।

'In my last broadcast to you on July 28th, I appealed for unqualified support to Mahatma Gandhi in his coming final fight for our freedom...

...In the name of our sacred Motherland, I implore you all, my compatriots, to rally under Mahatma Gandhi's banner of national independence and march on to victory.'

[Ibid : P.—184-189]

৭ই আগস্ট বম্বেতে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসবে, সে খবর রাসবিহারীর অজানা নয়। তাই তার আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে (৫ই আগস্ট) আবার সতর্কবাণী ভেসে এল থাইল্যান্ড থেকে।

এবার মরিয়া হয়ে ব্রিটিশ তার শেষ কামড় দেবে ; তার জন্য আমরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়গণ প্রস্তুত। অসুরকে কি করে আসুরিক ভাষায় জবাব দিতে হয়, তা আমরা জানি। একশো রুজভেল্টও এবার ব্রিটিশকে রক্ষা করতে পারবে না।

'...The British must leave India anyway...And a hunderd Roosevelts cannot save her.

Britain has warned India that she will not hesitate to crush the Independence Movement....

I hasten to assure you that we Indians in East Asia are prepared to meet any eventuality. Even if the British overwhelm you, they will not save seen the last of Indias national forces.

The British are preparing to crush you; but we, sons of India in East Asia, are preparing to annihilate them. And I have no doubt that this time India must win and she will win.

Think of India's glorious past, her present degradation and the brilliant future that awaits her. Let us march forward with faith in ourselves and in India's destiny. Do not look back; do not falter; go on to battle, to victory, and to complete independence.' [Ibid : P.—190-195]

পূর্ব নির্দিষ্টমত ৭ই আগস্ট তারিখে কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হল বম্বেতে।

নেতৃবৃন্দ সবাই এসে সেখানে সমবেত হলেন একে একে। এবার প্রস্তাব পাস করার পালা।

'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গৃহীত হল ৮ই আগস্ট রাত দশটায়। সেই সংগে সংকল্প হিসেবে গৃহীত হল দুটি মাত্র ছোট্ট শব্দ। 'কুইট ইণ্ডিয়া' আর 'ডু অর ডাই'।

আরো ঠিক হল, বরাবরের মতো এবারও আন্দোলন হবে সম্পূর্ণ অহিংস। অর্থাৎ, দরকার হলে বরাবরের মতো পিঠ পেতে মার খাব, তবু প্রত্যাঘাত কিছুতেই নয়।

ব্যস, সেই শেষ। কবে—কোথায়—কিভাবে আন্দোলন শুরু করা হবে, সে সম্বন্ধে আর কোন রকম নির্দেশ দেওয়া হল না জনসাধারণকে। হয়তো পরে দেবার ইচ্ছা ছিল বিস্তৃতভাবে।

সবশেষে গান্ধীজী জানালেন তাঁর সদিচ্ছার কথা।

আমি নিজে গিয়ে একবার দেখা করতে চাই বড়লাটের সংগে। তাঁকে বুঝিয়ে বলতে চাই সব কিছু। হয়তো তাতে কিছু কাজ হলেও বা হতে পারে।

কোথায় রইলেন বড়লাট, আর কোথায় বা গান্ধীজী!

পরদিন ৯ই আগস্ট ভোর হতে না-হতেই দেখা গেল, 'দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি'। চল এবার বন্দী-নিবাসে। হ্যাঁ, সবাই।

সস্ত্রীক গান্ধীজী ও সেক্রেটারী মহাদেব দেশাইকে নিয়ে যাওয়া হল আগা খাঁ প্রাসাদে।

জওহরলাল, মৌলানা আবুল কালাম প্রমুখ নেতৃবৃন্দের ঠাঁই হল আহমেদ-নগর দুর্গে। বাদ বাকি সবাইকে ভিন্ন ভিন্ন জেলে। সেই সংগে কংগ্রেসকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হল সারা ভারতবর্ষে।

শাসককুল নিশ্চিন্ত। যাক, বাঁচা গেল! নেতাদের সবাইকে আটক করা হয়েছে। যাকে বলে অংকুরেই বিনাশ। সুতরাং আর আন্দোলন করতে হবে না বাছাধনদের।

কিন্তু সব বৃথা। ততক্ষণে আসমুদ্র-হিমাচল কাঁপিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ গর্জে উঠেছে—'কুইট ইণ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়! ডু অর ডাই! করেংগে ইয়ে মরেংগে!'

'শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম। দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম। পরাধীনতাই পাপ।'

—স্বামী বিবেকানন্দ

কুইট ইণ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়!

নিমেষে উত্তাল হয়ে উঠল গোটা ভারতবর্ষ। এই তো চাই। এই তো তারা চেয়েছিল এতদিন। এ তো শুধু গান্ধীজীর কথা নয়, এ যে সংগ্রামী ভারতের মর্মবাণী।

প্রথমেই গ্রেপ্তার করা হল গান্ধীজী, জওহরলাল, মৌলানা আজাদ প্রমুখ সবাইকে। তারপর শুধু গ্রেপ্তার—গ্রেপ্তার আর গ্রেপ্তার! প্রথম শ্রেণীর নেতা বলতে কেউ সেদিন রেহাই পেলেন না গ্রেপ্তারের হাত থেকে। একটি প্রাণীও না।

খবর শুনে একটা বিস্মিত আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেল সংগ্রামী ভারত। তারপরই একসঙ্গে সবাই গর্জে উঠল তীব্র আক্রোশে।

কুইট ইণ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়! এতকাল আমরা পিঠ পেতে অনেক মার খেয়েছি। এবার আমরা জবাব দেব। পাল্টা জবাব।

কংগ্রেসের মূল নীতি—অহিংসা। অহিংসাই তাদের সংগ্রামের একমাত্র হাতিয়ার।

কোথায় গেল সেই অহিংসা, আর কোথায় রইল কি! দেখতে দেখতেই এতদিনকার সেই অহিংস নীতি কোথায় ভেসে গেল স্রোতের মতো!

প্রমাণিত হল যে, নেতা হিসাবে গান্ধীজীর স্থান সর্বোচ্চে, কিন্তু নীতির দিক থেকে নয়। একটা পলিসি হিসেবে বাহ্যত মেনে নিলেও ভারতবাসী কোনদিনই তাঁর সেই অহিংস নীতিকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারেনি মন থেকে।

তাই আগস্ট-আন্দোলনে নিয়েছিল তারা সুভাষের নীতি। অর্থাৎ—আঘাতের বদলে আঘাত। মারের বদলে মার।

ভারত তখন অগ্নিগর্ভা। বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ অনেকদিন আগে থেকেই কারারুদ্ধ। কংগ্রেসেও নেতৃস্থানীয় বলতে কেউ সেদিন আর বাইরে নেই।

তা বলে সংগ্রামী ভারতবর্ষ কিন্তু এতটুকুও পিছিয়ে ছিল না, মল্লিকা। বিশেষ করে সুভাষ-সমর্থকদের তো কথাই নেই। ইংরেজ লেখক কুপল্যাণ্ডের ভাষায়:

'The Revolutionaries of extreme left, specially in Bengal, were still ready to take their orders from Mr. Subhas Chandra Bose, even if they came by Radio from Berlin.'

[Indian Politics : Coupland : P.—268]

ওদিকে পরিস্থিতি লক্ষ্য করে সঙ্গে সঙ্গে গা-ঢাকা দিলেন রামমনোহর লোহিয়া, অচ্যুত পটবর্ধন, শ্রীমতী অরুণা আসফ আলী প্রমুখ সোস্যালিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ।

কংগ্রেসের পক্ষে সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, নেতৃবৃন্দ সবাই কারারুদ্ধ। তা বলে এই অপূর্ব সুযোগটাকে কোনরকমেই হেলায় হারালে চলবে না। সবাইকে সংঘবদ্ধ করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। আঘাতের বদলে পাল্টা আঘাত হানতে হবে। মারের বদলে মার।

কিন্তু অহিংসা! এতদিনকার অহিংস নীতি ত্যাগ করে সহিংস আন্দোলনে যোগ দেওয়াটা কি নীতি-বিরুদ্ধ নয়?

মোটেই না। যুক্তি দেখালেন সংগ্রামের প্রধান হোতা জয়প্রকাশ নারায়ণ। কংগ্রেস স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। সে স্বাধীনতাকে বিদেশীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সহিংস পন্থা অবলম্বন করার সম্পূর্ণ অধিকার আমাদের আছে। গান্ধীজী তা সমর্থন করতে না পারলে আমি নাচার।

'My own interpretation of the Congress position (not Gandhiji's) is clear and definite. Congress is prepared to fight aggression violently if the country become independent. Well, we have declared ourselves independent, and also named Britain as an aggressive power; we are, therefore, pustified within the terms of the Bombay resolution itself, to fight Britain with arms. If this does not accord with Gandhiji's principles that is not my fault.'

[History of Freedom Movement : Vol.—III, P.—669]

এখানেই শেষ নয়, মল্লিকা। আরো যুক্তি আছে। সে যুক্তি একদিন দেখিয়েছিলেন গান্ধীজী নিজেই।

সেদিন দেশবন্ধুর গৃহে বাংলার বিপ্লবী নায়কদের উদ্দেশে গান্ধীজী এক আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন:

'Had India sword, I would have asked her to draw it. But she had no sword—I ask her to adopt non-violent, non-co-operation. Non-violence may be accepted as creed or policy. I am out to destroy this satanic Government.'

অর্থাৎ, ভারতবর্ষের তরবারী থাকলে আমি তাদের সেই তরবারী ব্যবহার করতে বলতাম। কিন্তু তা নেই। তাই বলছি, তোমরা আমার এই অহিংস অসহযোগের পথ গ্রহণ কর। অহিংসাকে কর্মপদ্ধতি বা পলিসি হিসেবে গ্রহণ কর। আমি এই শয়তান গভর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করার জন্য বদ্ধপরিকর।

ভারতবাসীর তরবারী নেই, একথা সত্যি! কিন্তু নেই বলেই কি তাকে চিরদিন পিঠ পেতে মার খেতে হবে বোবা গরুর মতো?

এই কি গান্ধীবাদ?

অহিংসার নামে ক্ষাত্রধর্ম বিসর্জন দিয়ে জাতিকে নেতিবাদ শেখানোটাই কি গান্ধীনীতি?

না, আমরা তা মানি নে। মানব না। সুতরাং আঘাতের বদলে পাল্টা আঘাত আমরা দেবই। মারের বদলে মার।

শুরু হল ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়' আন্দোলন।

এই 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব কিন্তু আদপেই গান্ধীজীর নয় মল্লিকা, সুভাষের। গান্ধীজী তা পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র। শুধু একবার নয়, সুভাষের কথা এমনি পুনরাবৃত্তি করেছেন তিনি অসংখ্যবার।

যেমন ধর, ১৯২৮ সালে অনুষ্ঠিত কলকাতা কংগ্রেসের কথা। সুভাষের দাবী, পূর্ণ স্বাধীনতা। যে স্বাধীনতায় কোন খাদ নেই। শর্ত নেই।

বাদ সাধলেন স্বয়ং গান্ধীজী। তিনি ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস—অর্থাৎ ইংরেজের আওতায় থেকে আধখানা স্বাধীনতা পেলেই খুশি।

কি হল পরের বছর লাহোর কংগ্রেসে ?

আশ্চর্য, গান্ধীজী নিজেই সেখানে প্রস্তাব আনলেন—'আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা চাই।' অর্থাৎ, সুভাষ যে প্রস্তাব করেছিলেন একবছর আগে, তিনি তার পুনরাবৃত্তি করলেন পুরো একবছর বাদে।

তারপর ১৯৩৮ সালে জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের কথা। সুভাষই সেখানে সর্বপ্রথম প্রস্তাব আনলেন—ইংরেজ ভারত ছাড় ! অবিলম্বে তোমরা হাত গোটাও আমাদের দেশ থেকে।

পরের বছর ত্রিপুরী কংগ্রেসেও তাঁর মুখে শোনা গেল সেই একই কথা। ইংরেজ বিদেয় হও ! মাত্র ছ'মাস সময়। তার মধ্যেই তোমাদের চলে যেতে হবে আমাদের দেশ ছেড়ে। নয়তো শুরু হবে—সংগ্রাম।

সেখানেও বাদ সাধল সেই গান্ধীবাদী কংগ্রেস। ফলে, সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ এবং শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার।

তিনবছর বাদে এবারও সুভাষের সেই প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করে গান্ধীজী ঘোষণা করলেন—'ইংরেজ ভারত ছাড় ! কুইট ইণ্ডিয়া !'

ঐতিহাসিক আগস্ট-আন্দোলন। বিরাট তার অবদান। বিরাট তার পটভূমিকা।

এত বিরাট যে, সামান্য দু-চার কথায় তার গুরুত্ব বোঝানো সম্ভব নয়। তাই সে চেষ্টা না করে আমি শুধু তার প্রধান প্রধান ঘটনাগুলোই তোমার কাছে তুলে ধরব, মল্লিকা।

গান্ধীজী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হলেন ৯ই আগস্ট ভোরবেলায়।

একই দিনে গ্রেপ্তার করা হল বম্বের মেয়র মিঃ মেহের আলী প্রমুখ খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দকে। কাউকে রেহাই দেওয়া হল না—একটি প্রাণীকেও না।

খবর শুনে তীব্র আক্রোশে ফেটে পড়ল অশান্ত জনগণ। কুইট ইণ্ডিয়া ! ইংরেজ ভারত ছাড় ! দূর হও আমাদের দেশ থেকে।

শুরু হল আক্রমণ ও পাল্টা-আক্রমণ। ফলে, পুলিশের গুলিতে নিহত হল মোট ৫ জন। আহত—২০ জন। আমেদাবাদ এবং পুণাতে নিহত হল আরো ২ জন।

ঠিক সেইদিনই মহানায়ক রাসবিহারীর ক্রুদ্ধ হুঙ্কার ভেসে এল সুদূর থাইল্যাণ্ড রেডিও থেকে।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ, শোন। আমার দেশবাসী ভাইদের তোমরা এভাবে নির্বিচারে হত্যা করবে, আর আমরা তা নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখব, সেকথা স্বপ্নেও ভেব না যেন।

মনে রেখো আমরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়গণ চুপ করে বসে নেই। সেদিন এই রক্তের ঋণ তোমাদের রক্তের বিনিময়েই শোধ করতে হবে।

'The world's eyes were focussed on Bombay...Now the historic decision has been taken, India has declared war on Britain.

Perhaps they may, by sheer brute force, overwhelm the national forces for a time. But that cannot save them either. There are other and mightier forces outside of India's borders, standing ready to pounce on the Anglo-American forces in India and to annihilate them without the slightest mercy.

The battle has begun in dead earnest. The British have unleashed their reign of frightfulness. India must wade through blood before she reaches her goal of national independence. But this time India is prepared for any sacrifice and she will win.'
[Rashbehari Bose—His Struggle for India's Independence : P.—96]

১১ই আগস্ট বম্বেতে নিহত হল ১৩ জন, আর আহতের সংখ্যা দাঁড়াল ৩০। ১২ই আগস্টও বাদ গেল না। সেদিন দুটি নারী ও শিশুকে প্রাণ দিতে হল বুলেটের আঘাতে।

১৩ই আগস্ট পর্যন্ত বম্বেতে নিহতের সংখ্যা দাঁড়াল ৩০ আর আহত মোট ৩০০ জন। তাছাড়া আরো দুজনকে প্রাণ দিতে হল আমেদাবাদে।

ততদিনে বম্বের অধিকাংশ সরকারী ভবন, পোস্ট-অফিস, পুলিশ চৌকি ইত্যাদি সব শেষ।

তোমরা আমাদের হত্যা করবে, আর বরাবরের মতো এবারও আমরা নিঃশব্দে পিঠ পেতে মার খেয়ে অহিংসার গুণগান গাইব, ওসব চলবে না।

এবার আমাদের সোজা হিসেব, আঘাতের বদলে আঘাত। মারের বদলে মার। প্রাণ যায় সে ভি আচ্ছা, তা বলে কাউকে এবার ছেড়ে কথা বলব না।

একই অবস্থা চলছে তখন কলকাতায়।

মল্লিকা, অধুনা কথায় কথায় ছাত্র-সমাজের সমালোচনা করা, কি আমাদের নেতৃবৃন্দ, কি তথাকথিত জাতীয়তাবাদী পত্রিকা—সবার পক্ষেই যেন একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রয়োজন হলেই তাঁরা বলে থাকেন—ছাত্ররাই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ। তারাই আমাদের সংগ্রামের সবচাইতে বড় হাতিয়ার।

বেগতিক দেখলে সঙ্গে সঙ্গেই আবার শোনা যায় বিপরীত কথা। যেমন—ছাত্রদের রাজনীতি থেকে দূরে থাকা উচিত। অধ্যয়নই তাদের একমাত্র তপস্যা।

কোনরকম মন্তব্য না করে আমি শুধু একটি প্রশ্নই করব, মল্লিকা। ভারত-বর্ষের প্রতিটি আন্দোলনে এই ছাত্র-সমাজই কি বরাবর সবার পুরোভাগে গিয়ে দাঁড়ায়নি ?

বুকের রক্তে মাটি ভিজিয়ে দেয়নি ?

ধর্মতলার রাজপথ থেকে রক্তের দাগ কি এত শীগগিরই মুছে গেল ?

১০ই আগস্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বে-আইনী ঘোষিত হল। আর ১১ই আগস্ট !

সমস্ত স্কুল-কলেজ সেদিন ফাঁকা। একটা দুর্জয় সংকল্প নিয়ে সবাই তখন নেমে এসেছে রাস্তায়। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে ! ডু অর ডাই ! কুইট ইণ্ডিয়া ! ইংরেজ ভারত ছাড় !

পুলিশ ও মিলিটারী বাহিনীও প্রস্তুত। কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত। শোভাযাত্রা ও সভা-সমিতিও নিষিদ্ধ। সুতরাং সাবধান ! এ ধরনের বে-আইনী কাজ কিছুতেই বরদাস্ত করা হবে না।

পরদিন সবাই জড় হল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। উদ্দেশ্য নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করা।

হঠাৎ শুরু হল লাঠি-চার্জ। না, কোনরকম সভা করা চলবে না। সুতরাং —পেটাও ! আচ্ছা করে পেটাও সবাইকে !

প্রতিবাদে হাজার হাজার কণ্ঠ গর্জে উঠল একসঙ্গে। ডু অর ডাই ! করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে ! ইংরেজ ভারত ছাড় !

দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম ! সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমানী মার্কেটের কাছে লুটিয়ে পড়লেন বৈদ্যনাথ সেন। ঐতিহাসিক আগস্ট-আন্দোলনে বাংলার প্রথম শহীদ বৈদ্যনাথ সেন।

দেখতে দেখতেই আগুন জ্বলে উঠল মহানগরীর সর্বত্র। কুইট ইণ্ডিয়া ! ইংরেজ, অবিলম্বে হাত গোটাও আমাদের দেশ থেকে। দূর হও !

পরদিন ভবানীপুরে আরো দুজন। যুদ্ধের প্রয়োজনে হাজার হাজার ব্রিটিশ-সৈন্য তখন কলকাতায়। আদেশ পেয়ে নির্বিচারে তারা হত্যাকাণ্ড চালাতে লাগল মহানগরীর বুকে। ফলে, দিনের শেষে নিহতের সংখ্যা দাঁড়াল মোট ৬, আহত ৩৩, আর লাঠির আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হল মোট ৬৬ জন।

দিলীপ ঘোষও রেহাই পেলেন না। বোনের বিয়ে। বাজারে গেলেই নয়।

কিন্তু কোথায় বাজার! রাস্তায় পা দিতেই অহেতুক এক শ্বেতাঙ্গ সার্জেণ্টের রিভলবার গর্জে উঠল—দ্রাম! যেন এ একটা খেলা আর কি!

সন্তানের মৃতদেহ বুকে নিয়ে হাহাকার করে উঠলেন বৃদ্ধ পিতা।

তবে বেশিক্ষণ নয়। চলমান সাঁজোয়া গাড়ি থেকে একঝাঁক গুলি এসে এবার তাঁকেও স্তব্ধ করে দিল চিরদিনের মতো। সেই সঙ্গে আরো একজনকে।

লাইন মেরামত-রত টেলিফোন-মিস্ত্রীরও রেহাই নেই। কাজ করতে করতে আচমকা একসময়ে তার প্রাণহীন দেহটা নিচে আছড়ে পড়ল মিলিটারীর অব্যর্থ গুলির আঘাতে।

অপরপক্ষও চুপ করে বসে নেই। লেটার-বক্স, ফায়ার অ্যালার্ম, ইলেকট্রিক ফিউজ-বক্স, পোস্ট-অফিস, ট্রামগাড়ি ইত্যাদি অসংখ্য সরকারী সম্পত্তি তখন শেষ।

এমন কি সশস্ত্র পুলিশ ও মিলিটারী বোঝাই আর্মার্ড কারগুলি পর্যন্ত রেহাই পেল না জনতার উন্মত্ত রোষ থেকে। সব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে একেবারে একাকার।

'কাওয়ার্ডস্ ডাই মেনি টাইমস্ বিফোর দেয়ার ডেথস্, দি ভ্যালিয়াণ্ট নেভার টেস্টস্ অফ্ ডেথ বাট ওয়ান্স্।'

এবার তাকিয়ে দেখ যে, মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে আমরা তোমাদের উপযুক্ত জবাব দিতে পারি কি না!

পুলিশ ও মিলিটারীর গুলিতে মোট কত লোক সেদিন নিহত হয়েছিল কলকাতায়?

না, সে খবর কোন সংবাদপত্রে প্রকাশ করা চলবে না। আন্দোলন সম্বন্ধে কোন কিছুই লেখা চলবে না সংবাদপত্রে। তাহলে কঠোর শাস্তি।

প্রতিবাদে ১৮ই আগস্ট থেকে সমস্ত সংবাদপত্র বন্ধ রাখা হল একপক্ষ কালের জন্য।

শেষ পর্যন্ত একটা অস্পষ্ট আভাস পাওয়া গেল মুখ্যমন্ত্রী জনাব ফজলুল হকের এক বিবৃতি থেকে।

গত দু সপ্তাহে কলকাতায় নিহত হয়েছে মোট ২০ জন। আহত ১৫২, আর গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৩,৫০০ জনকে।

শহরবাসীর ধারণা অবশ্য অন্য রকম। তাঁদের মতে নিহতের সংখ্যা আরো অনেক বেশি।

হঠাৎ একটা খবর শুনে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা ভারতবর্ষ। গ্রেপ্তারের পর জয়প্রকাশ নারায়ণকে রাখা হয়েছিল হাজারিবাগ সেণ্ট্রাল জেলে। কিন্তু কোথায় জয়প্রকাশ নারায়ণ? ৮ই নভেম্বর একফাঁকে তিনি হাওয়া। একা নন, ছ'জন সঙ্গীসহ।

খোঁজ-খোঁজ রব পড়ে গেল ভারতবর্ষের সর্বত্র। কিন্তু সব বৃথা। দীর্ঘ রাস্তা পায়ে হেঁটে বেনারস পেঁছে ততক্ষণে তিনি চলে গিয়েছেন নাগালের বাইরে।

তা বলে বিশ্রামের অবকাশ কোথায়! তাই সংগে সংগেই আবার তিনি সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগলেন অশান্ত ঘূর্ণীর মতো।

আঘাতের বদলে আঘাত হানতে হবে। মারের বদলে মার। তার জন্য আন্দোলনকে আরো জোরদার করে তোলা দরকার। আরো সংঘবদ্ধ।

ইতিমধ্যেই দুটি গুপ্ত বেতার-কেন্দ্র বসানো হয়েছে সংগ্রামী জনগণকে নির্দেশ দেবার জন্য। একটি বম্বেতে, অন্যটি কলকাতায়।

বম্বের গুপ্ত বেতার-কেন্দ্র পরিচালিত হত রামমনোহর লোহিয়ার নির্দেশে। সেখান থেকে কে সেদিন নিয়মিতভাবে সংবাদ পরিবেশন করতেন, জানো মল্লিকা ?

তিনি তোমার মতোই একটি মেয়ে। নাম তাঁর উষা মেহেতা।

এদিকে আন্দোলন তখন ছড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশের সর্বত্র।

হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, বোলপুর, বালুরঘাট, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা; বরিশাল, ফরিদপুর, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, যশোহর, খুলনা, মেদিনী-পুর সর্বত্র সেই একই চেহারা। শুধু আঘাত আর পাল্টা-আঘাত!

ঢাকায় নিহতের সংখ্যা দাঁড়াল মোট ৬, মুন্সীগঞ্জে ৪ এবং তালতলা বাজারে ৩ জন। সেই সংগে একজন কনস্টেবলকেও প্রাণ দিতে হল ক্রুদ্ধ জনতার হাতে। আর সরকারী সম্পত্তি যে কত বিনষ্ট করা হল, তার বোধহয় কোন গোনাগুনতি নেই।

এবার পুলিশ ও মিলিটারীর সংগে যোগ দিল বিমান-বহর। কোন দয়া নয়। কোন মায়া নয়। যেখানে কোনরকম আন্দোলন করতে দেখা যাবে, সেখানেই বিমান থেকে মেশিনগান চার্জ করা হবে। সুতরাং সাবধান!

কাজেও তাই করা হল। রাণাঘাটে রেল-লাইনের ওপর কর্মরত কুলীদের ওপর নির্বিচারে মেশিনগান চার্জ করা হল বিমান থেকে। ওরাও নাকি আন্দোলনকারী!

এবার শোন অন্যান্য প্রদেশের কথা।

১৪ই আগস্ট মাদ্রাজে ৪ জন নিহত হল পুলিশের গুলিতে। আহত মোট ১০ জন।

জবাব দেওয়া হল ১৭ই আগস্ট। বহু সরকারী ভবন ও রেলস্টেশন সেদিন পুড়ে ছাই হয়ে গেল জনতার রোষে।

১৩ই আগস্ট ৭ জন নিহত হল বাঙ্গালোরে। আহত ৭ জন।

রামনাদে নিহত—৬, আর ৫ জন নিহত হল গোদাবরী জেলায়। ফলে, রামনাদের অধিকাংশ সরকারী অফিস, সাব-জেল, ট্রেজারী ইত্যাদি লুণ্ঠিত হল জনতার হাতে।

নীলগিরিতে নিহত হল ১ জন। মহীশূর ও মাদুরায় ৩ জন করে।

১৪ই আগস্ট মধ্যপ্রদেশের নাগপুরে প্রাণ হারাল ৬ জন। ওয়ার্ধায়— ৫ জন।

আর অস্তি ও চিমুর! অস্তি ও চিমুরের কথা পরে আসছে।

দিল্লীতে সাত দিনে নিহতের সংখ্যা দাঁড়াল ৪০, পরে মিলিটারীর গুলিতে আরো ৩ জন।

উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদে প্রথম গুলি-বর্ষণ করা হল ১৪ই আগস্ট।

আলিগড় স্টেশনে নিহত ২ জন। বেনারসে ১ এবং আহত ১২ জন।

তারপরই একদিন জোর সংঘর্ষ বেধে গেল মজঃফরনগর জেলের অভ্যন্তরে। একদিকে বন্দীর দল, অন্যদিকে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। ফলে, বন্দীদের মধ্যে মোট ৬ জনকে প্রাণ হারাতে হল পুলিশের হাতে। আর পুলিশের মধ্যে নিহত হল মোট ২ জন।

এবার উত্তর-ভারতের ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ শোন।

সরকারী হিসেবে পুলিশ কর্মী নিহত মোট ১৬, আর আহত ৩২ জন। রেল-স্টেশন ভস্মীভূত হয়েছে ১৫টি। ক্ষতিগ্রস্ত আরো ১০৪টি রেল-স্টেশন।

রেল-লাইন তুলে ফেলা হয়েছে ১৬ জায়গায়। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন লাইন ধ্বংস হয়েছে ৪২৫টি। ১১৯টি পোস্ট-অফিস সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন।

পোস্ট ও টেলিগ্রাফ-কর্মী আহত হয়েছে ৩২ জন। আর সরকারী ভবন ও গুদাম যে কত ধ্বংস করা হয়েছে, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

বিহারের অবস্থা আরো মারাত্মক।

শুরু হয়েছে ১১ই আগস্ট।

সেখানেও সবার পুরোভাগে সেই ছাত্র-সমাজ। একদল এগিয়ে চলেছে হাইকোর্টের দিকে। অন্যদলের লক্ষ্য—পরিষদ ভবন। ব্রিটিশ ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে ওখানে ভারতের জাতীয় পতাকা তুলতে তারা বদ্ধপরিকর।

হাইকোর্টের দিক থেকে কোন বাধা এল না, এল পরিষদ ভবনের দিক থেকে।

বিরাট এক পুলিশ বাহিনী নিয়ে আই. সি. এস. অফিসার মিঃ আর্চার তখন প্রস্তুত। কোনরকমেই তিনি শোভাযাত্রীদের পরিষদ ভবনের দিকে যেতে দিতে রাজী নন।

ফলে, সাতজনকে সেদিন প্রাণ দিতে হল পুলিশের গুলিতে। এই সাত-জন হলেন:

উমাকান্ত প্রসাদ, রামানন্দ সিংহ, সতীশপ্রসাদ ঝা, জগপতি কুমার, দেবী-প্রসাদ চৌধুরী, রাজেন্দ্র সিংহ আর রামগোবিন্দ সিংহ।

দেখতে দেখতে একটা উন্মত্ত ঝড় বয়ে গেল যেন গোটা বিহারের ওপর দিয়ে।

প্রতিশোধ চাই, প্রতিশোধ। আমরা মরব দুঃখ নেই, তা বলে তোমাদেরও ছেড়ে দেব না। লাইফ ফর লাইফ! ব্লাড ফর ব্লাড! করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! ডু অর ডাই!

মুঙ্গের তখন পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন।

আর ভাগলপুরের তো কথাই নেই। শৈরাম সিংয়ের নেতৃত্বে বলতে গেলে প্রতিটি থানাই তখন বিপ্লবীদের দখলে। মূল্যও তার জন্য দিতে হয়েছে যথেষ্ট। দিতে হয়েছে ২১৮টি তাজা প্রাণ আর আহত মোট ২৮০ জন।

পীরপন্থীতে ৩৭ জনকে প্রাণ দিতে হল পুলিশের গুলিতে, আহত ২৬ জন। সুলতানগঞ্জে নিহত—৬৭, আহত—১৫০ জন।

দ্বারভাঙায় নিহত—৩৮, আহত—শতাধিক। কাটিহারে নিহত—৫, বিদপুরে—৮, সাহাবাদ জেলায়—৮, লাহেরিয়া সরাইতে—৯ এবং চম্পারণে—২ জন।

এবার পাল্টা-আক্রমণ। প্রথমেই আক্রান্ত হল রাঁচি জেলখানা। ১৬ই আগস্ট আক্রান্ত হল মিনাপুর থানা। ২ জন সাব-ইন্সপেক্টরকে সেখানে হত্যা করা হল আগুনে পুড়িয়ে।

সীতামারিতে মহকুমা-হাকিমের গাড়ি আক্রান্ত হল জনতার হাতে। শেষ পর্যন্ত গাড়ির আরোহী মহকুমা-হাকিম স্বয়ং, পুলিশ ইন্সপেক্টর, হেড কনস্টেবল, আরদালী ইত্যাদি সবাইকে কেটে টুকরো টুকরো করা হল এক এক করে।

তারপর পূর্ণিয়া জেলায় রুপৌলী থানা। সেখানেও একজন সাব-ইন্সপেক্টর ও দুজন পুলিশকে পুড়িয়ে মারা হল গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে।

পরবর্তী লক্ষ্য বিহারের কাটরা নামক স্থানে একটি থানা। রাইফেল নিয়ে সাব-ইন্সপেক্টর ও ৮ জন পুলিশ তখন প্রস্তুত।

সাবধান! আর এগিও না বলছি! আর এক পা এগুলেই গুলি করা হবে।

তবে রে! সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ জনতা একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল থানার ওপর। তারপর কোথায় গেল সিপাই-সান্ত্রী, আর কোথায় রইল কি!

ঘটনাস্থলেই হত্যা করা হল একজনকে। বাদ বাকি সবাই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল প্রহারের চোটে। সব শেষে থানা-গৃহ পুড়িয়ে দেওয়া হল আগুন দিয়ে।

১৮ই আগস্ট যান্ত্রিক গোলযোগের দরুন একটি সামরিক বিমান অবতরণ করতে বাধ্য হল নারায়ণপুরে।

আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বৈমানিকদের হত্যা করা হল অতি নৃশংসভাবে। অত্যন্ত সোজা হিসেবে। হত্যার বদলে হত্যা! মারের বদলে মার!

একই ব্যাপার ঘটল মারহোয়ারাতে। মোট পাঁচজন ব্রিটিশ কর্মচারীকে সেখানে বর্শা দিয়ে হত্যা করা হল মোটর থেকে টেনে নামিয়ে।

আবার হত্যা। ট্রেন থেকে টেনে নামিয়ে এবার হত্যা করা হল বিমান বিভাগের দুজন ক্যানাডিয়ান অফিসারকে।

তারপর একটা এক্কা গাড়িতে মৃতদেহ দুটি তুলে নিয়ে শুরু হল শহর-পরিক্রমা। যে যেখানে আছ তাকিয়ে দেখ যে, ভারতবাসী জবাব দিতে জানে কি না! ডু অর ডাই! করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে!

শুধু বাইরে নয়, জেলের অভ্যন্তরেও সেই একই রব। কুইট ইণ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়! তোমাদের শাসন আর আমরা মানি নে, মানব না।

দেখতে দেখতে একদিন জোর সংঘর্ষ বেধে গেল ভাগলপুর জেলের অভ্যন্তরে।

একদিকে নিরস্ত্র বন্দীর দল, অন্যদিকে সশস্ত্র শাসক-সম্প্রদায়।

কিন্তু কার সাধ্য সেদিন তাদের গতিরোধ করে। ফলে, স্বয়ং ডেপুটি জেল-সুপার, কার্ডিং মাস্টার এবং সেই সঙ্গে আরও ২৮ জনকে সেদিন প্রাণ দিতে হল উত্তেজিত বন্দীদের হাতে।

বিচারে ৩ জনকে প্রাণ দিতে হল ফাঁসির রজ্জুতে, বাকি ৬ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। অন্য একটি মামলায় ১০ জনকে দেওয়া হল প্রাণদন্ড। বাকি ৫ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

অপরপক্ষে, ছাপরায় ৫ জন মিলিটারী ও ১ জন ইয়োরোপীয়ানকে প্রাণ দিতে হল জনতার হাতে।

ভাগলপুর জেলে ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ দিতে হল বিপ্লবী তরুণ মহেন্দ্র চৌধুরীকে। আজ মহেন্দ্র চৌধুরীকে কেউ চেনে না, কিন্তু সেদিন এই মহেন্দ্র চৌধুরী ছিলেন সংবাদপত্রের মস্ত বড় একটা শিরোনাম।

ইতিহাস সৃষ্টি করলেন 'সারংবাবা' এবং তাঁর স্ত্রী 'সাঁওতাল মাতা'।

কে এই সারংবাবা? সাঁওতাল মাতাই বা কে?

সারংবাবা হলেন লম্বোদর মুখার্জী। সাঁওতাল মাতা তাঁরই স্ত্রী ঊষারাণী মুখার্জী।

সুভাষ দুজনকেই চিনতেন। তাই দেশে থাকতেই তিনি সাঁওতাল পরগণার ফরোয়ার্ড ব্লকের সভাপতিরূপে নির্বাচিত করেছিলেন এই ঊষারাণী মুখার্জীকে।

লোক চিনতে ভুল করেননি সুভাষ। প্রায় পঁচিশ হাজার সাঁওতালকে সঙ্ঘবদ্ধ করে এই মুখার্জী-দম্পতি সেদিন যেভাবে লাঠি পাহাড়ে অবস্থিত ব্রিটিশ মিলিটারীর বিরুদ্ধে গেরিলা-যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন, তা সত্যিই উল্লেখযোগ্য।

এ প্রসঙ্গে সন্ন্যাসী বাবা কাদু মুর্মু, গৈরিকধারী সন্ন্যাসী বাবা নিমচাঁদ, চরণ মুর্মু, পাইকা মুর্মু, ভাদো হেমরম, লাল হেমরম, বলিয়ার হেমরম, পাগল মুর্মু, সুক মুর্মু, তালাসী মাঝি, রসনা দেহারী, জমিদার বাবু ভগবানচন্দ্র দাস, সর্বানন্দ মিশ্র, ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারী, আনন্দময়ী চ্যাটার্জী, ডঃ

অনিমা ভট্টাচার্য, রামজীবন হিম্মৎ সিংকা প্রমুখের ভূমিকাও ছিল বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

মোট ৮০ জন সাঁওতাল বীর সেদিন মৃত্যুবরণ করেছিলেন গেরিল্লা-যুদ্ধের ফলে। আহতের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

বিক্ষোভের আগুনে গোটা ভারত তখন জ্বলছে।

লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষের কণ্ঠে সোচ্চার হয়ে উঠেছে একটি মাত্র কামনা—কুইট ইণ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়!

একমাত্র ব্যতিক্রম কমিউনিস্ট পার্টি। তাদের বক্তব্য—এ যুদ্ধ, জনযুদ্ধ। সুতরাং এ সময়ে একমাত্র কর্তব্য হল ইংরেজকে সহায়তা করা। 'কুইট ইণ্ডিয়া' ধ্বনি তুলে যারা ইংরেজকে এ দেশ-ছাড়া করার আন্দোলন শুরু করেছে, তারা আসলে দেশদ্রোহী ছাড়া আর কিছুই নয়।

কমিউনিস্ট পার্টির তৈরী দেশদ্রোহীদের তালিকায় কোন্ কোন্ দল সেদিন স্থান পেয়েছিল, শোন:

'The groups which make up the Fifth Column are the Forward Block, the party of the traitor Bose, the C.S.P. & the Trotskyte group...the Communist Party declare that all these three must be treated by every honest Indian as the worst enemy of the nation and driven out of political life and exterminated.'

[Communist Party : Facts and Fistion.]

অর্থাৎ—সুভাষের ফরোয়ার্ড ব্লক, সি. এস. পি., ট্রট্স্কীপন্থী ইত্যাদি সবাই বিশ্বাসঘাতক। জনসাধারণের উচিত, এই তিনটি ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতক দলকে তাদের রাজনৈতিক জীবন থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া।

লক্ষ্য কর মল্লিকা, তালিকায় কংগ্রেসের কোন নাম নেই। কিন্তু কেন?

কারণ 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাব নাকি আদপেই সেদিন গৃহীত হয়নি বম্বে অধিবেশনে। একটা খসড়ামত হয়েছিল মাত্র। সুতরাং তালিকা থেকে গান্ধীজী--তথা কংগ্রেস বাদ।

এ প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক কমরেড পি. সি. যোশী গান্ধীজী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তারের কয়েক ঘণ্টা পরেই এক বিবৃতিতে কি বলেছিলেন, শোন:

'......কংগ্রেসসেবী সহকর্মীদের কাছে আমরা নিম্নলিখিত কথার মর্ম অনুধাবন করিতে ও দেশপ্রেমিক কর্তব্য স্থির করিতে আবেদন জানাইতেছি:

(১) কংগ্রেস অহিংস গণ-আন্দোলনের আহ্বান জানায় নাই। নির্বাচিত একমাত্র নেতা কোন নির্দেশ দেবার পূর্বেই গ্রেপ্তার হন।

(২) নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি নেতা গ্রেপ্তার হইলে আইন অমান্যের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই।

(৩) কংগ্রেস বা মহাত্মাজী কেহই বিশৃঙ্খলা বা নিরর্থক হিংসার জন্য আবেদন জানান নাই। এই কাজগুলি কংগ্রেস ও জাতীয়তা-বিরোধী।'

[কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস : পি. সি. যোশী : পৃ.—৩৮]

২৩শে আগস্ট 'পিপলস্ ওয়ার' পত্রিকায় তিনি আরো কি বলেছিলেন শোনা যাক :

'......গভর্ণমেণ্টের কাজে উত্তেজিত হইয়া আমাদের দেশ-প্রেমিকরা ভারতের স্বাধীনতার নামে জাতির দেশরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকরী উপকরণগুলি নষ্ট করিতে উদ্যত।......ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থা লইয়া হেলাফেলা করা, ভারতীয় যানবাহন ব্যবস্থা অচল করিবার অর্থ ফ্যাসিস্ট শত্রুর সাহায্য করা, ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা নয়।

......সমস্ত কংগ্রেসসেবী দেশ-প্রেমিকের কাছে আমাদের আবেদন এই :

ধ্বংসকার্য হইতে বিরত হও, উহাতে ভারতের আত্মরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হইবে এবং স্বাধীনতার পরিবর্তে ফ্যাসিজমের লাভ হইবে।—ইহাই তোমাদের দেশ-প্রেমিক কর্তব্য, কারণ তোমরাই দেশের প্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মী।'

মল্লিকা, আমি রাজনীতির ছাত্র নই। কি কংগ্রেস, কি কমিউনিস্ট, কারো প্রতিই আমার এতটুকু বিদ্বেষ নেই।

বরং কমিউনিস্ট পার্টি একটি সত্যিকারের সংগ্রামী পার্টি বলেই আমার ধারণা। তার জন্য তাঁরা কিছু-না-কিছু নির্যাতনও ভোগ করেছেন।

সত্যি বলতে কি, এ হেন সংগ্রামী পার্টি কেন যে সেদিন 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল, তা আজও আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি, মল্লিকা। বুঝতে অনেক চেষ্টা করেছি, নানা ভাবে বিশ্লেষণ করেও দেখেছি, কিন্তু কোনও সদুত্তর পাইনি।

অবশ্য মুসলিম লীগ, জাতীয়তাবাদী দল, হিন্দু মহাসভা ইত্যাদি সংস্থাগুলিও নীতিগত দিক থেকে আগস্ট-আন্দোলন সমর্থন করেনি, তবু তাদের ভূমিকা আর কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা এক নয়।

তারা সমর্থন করেনি একথা ঠিক, তা বলে বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেও কোনদিন তাদের বড় একটা দেখা যায়নি।

কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে একথা খাটে না। তারা যে সেদিন খোলাখুলিভাবেই সর্বশক্তি দিয়ে আগস্ট-আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল, একথা ঐতিহাসিক সত্য।

প্রমাণ ১৭. ৩. ৪৬ তারিখে 'বম্বে ক্রনিকেল' পত্রিকায় প্রকাশিত কমিউনিস্ট পার্টির প্রাক্তন সদস্য মিঃ বাটলিওয়ালার চিঠি। এ প্রসঙ্গে বরেণ্য ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার কি বলেছেন শোনা যাক :

'Batlivala added that Joshi had, as General Secretary of the Party, written a letter in which he offered 'uncondi-

tional help' to the then Government of India and the Army G. H. Q. to fight the 1942 underground work and the Azad Hind Fouz (I. N. A.) of Subhas Chandra Bose, even to the point of getting them arrested.

These men were characterised by Joshi in his letter as 'trators and fifth columnists'. Joshi's letter also revealed that C. P. I. was receiving financial aid from the Government, had a secret pact with Muslim League, and was undermining Congress activity in various ways.'

[History of Freedom Movement: P.—680 : Vol.—III]

আরো প্রমাণ তাদেরই নিজস্ব পত্র-পত্রিকাগুলি। আগাগোড়াই তো সেগুলো অগস্ট-আন্দোলন, তথা সুভাষ-বিরোধিতায় ভরা। সুভাষের বিরুদ্ধে নিত্য-নতুন কুৎসা প্রচার, নানাবিধ ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ, কিছুই তো বাদ নেই সেখানে।

কমিউনিস্ট পার্টির সেদিনের সেই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত, সে প্রশ্ন আমি তুলব না, মল্লিকা। তবে একথা ঠিক যে, সেদিনের সেই সিদ্ধান্তের জন্য পরবর্তী কালে তাদের মূল্য দিতে হয়েছিল প্রচুর। আজও বোধহয় সেই মূল্য দেবার পালা শেষ হয়নি।

কিন্তু যদি উল্টোটা হত?

১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী অধিবেশনে শুধু কংগ্রেসই সুভাষের বিরোধিতা করেনি মল্লিকা, সোস্যালিস্ট পার্টিও করেছিল। সেই সোস্যালিস্ট পার্টিকে এবার দেখা গেল সংগ্রামের একেবারে পুরোভাগে।

আর কমিউনিস্ট পার্টি! সত্যি বলতে কি, ফরোয়ার্ড ব্লকের কথা বাদ দিলে সেদিন সুভাষের এতবড় সমর্থক আর কোন দলই বুঝি ছিল না।

'সুভাষকে দ্বিতীয়বারের জন্য কংগ্রেস সভাপতি করা হোক'—এ দাবীও প্রথম উত্থাপিত হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকেই।

সেই সুভাষ এখন আর তাদের বন্ধু নন, শত্রু। ইংরেজকেও এখন আর সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর পর্যায়ে ফেলা চলে না, কারণ, তারা এখন রাশিয়ার বন্ধু।

কিন্তু যদি তা না হত? যদি বিরোধিতার পরিবর্তে কমিউনিস্ট পার্টিকেও সেদিন সংগ্রামের পুরোভাগে দেখা যেত? আজ তাহলে কমিউনিস্ট পার্টির চেহারা পালটে যেত না কি? পালটে যেত না কি গোটা ভারতবর্ষের চেহারা?

তবে সুভাষ-বিরোধিতার জন্য শুধু একপক্ষকে দায়ী করলে চলবে না, মল্লিকা। এ ব্যাপারে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট দুই-ই প্রায় সমান।

কি পরিস্থিতি ছিল সেদিন ভারতবর্ষের? একদিকে কানের কাছে অষ্টপ্রহর বেজে চলেছে, সুভাষ বোস ভ্রান্ত। অপরিণামদর্শী। ফ্যাসিস্ট। 'I cannot accept but must oppose.'

অন্যদিকে সুভাষ দেশদ্রোহী। হিটলার-তোজোর হাতের পুতুল। কুইস্‌লিং।

একমাত্র ব্যতিক্রম আগস্ট-বিপ্লবের প্রধান নায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ।

জয়প্রকাশ নারায়ণ তখন পলাতক। পরিস্থিতি লক্ষ্য করে সেই পলাতক জীবন থেকেই তিনি একটি ইস্তাহার প্রকাশ করলেন জাতির উদ্দেশে।

না, সুভাষ কুইস্‌লিং নন। তাঁকে আমরা চিনি। দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে, এমন কাজ তিনি কখনোই করতে পারেন না।

'It is easy to denounce Subhas as a Quisling. Those who are themselves quislings of Britain find it easiest to denounce him. But nationalist India know him as a fervent patriot and as one who has always been in the forefront of his country's fight for freedom. It is inconceivible that he should ever be ready to sell his country.

...it is clear that he has premitted himself to accept aid from the enemies of his country's enemies in accordance with an age-old political maxim...older than Machiavelli and older than Kautilya.

In thus accepting help from a third party he may be deceived in the end, but there can be no question as to the honesty of his purpose and the scale of his resourcefulness.' [Rebel India : P.—232-233]

মল্লিকা, এই হল সেদিনকার পরিস্থিতি। এ পরিপ্রেক্ষিতে কেবল মাত্র কমিউনিস্ট পার্টিকে দোষারোপ করলে সেক্ষেত্রে সত্যের অপলাপ করা হবে না কি?

কমিউনিস্ট পার্টি সুভাষ-বিরোধিতা করেছিল একথা ঠিক। কিন্তু কংগ্রেস!

আজ যতই অস্বীকার করুক না কেন, সেদিন এই কংগ্রেসই কি খুব একটা পিছিয়ে ছিল সুভাষ-বিরোধিতার ব্যাপারে? তফাত এই যে, কমিউনিস্ট পার্টি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ১৯৪২ সালে, আর কংগ্রেস শুরু করেছিল ১৯৩৯ সালে অনুষ্ঠিত ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর থেকেই।

সামান্য একটি উদাহরণ দিচ্ছি, শোন।

সেদিন কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য ছিল: সুভাষ বোস ফিরে এলে আমরা তাকে বুলেট দিয়ে অভ্যর্থনা করব।

আর কংগ্রেস? কংগ্রেসই কি সেদিন তাঁকে রুখতে চায়নি খোলা তরবারী দিয়ে?

তফাতটা কোথায় বলতে পার মল্লিকা? যুক্তি-তর্ক দিয়ে একবার বুঝিয়ে দিতে পার আমাকে?

সেদিনের সেই সুভাষ-বিরোধিতার জন্য কম মূল্য দিতে হয়নি কমিউনিস্ট পার্টিকে।

এমন কি, এখনও নির্বাচনের প্রাক্কালে বিরোধী পক্ষের প্রতিটি বক্তার কণ্ঠে সোচ্চার হয়ে ওঠে সেই একই অভিযোগ। কমিউনিস্টদের আপনারা চিনে রাখুন। মনে রাখবেন, ওরাই সেদিন আমাদের নেতাজীকে বুলেট দিয়ে অভ্যর্থনা করতে চেয়েছিল।

আর কংগ্রেস!

না, সে সম্বন্ধে কোথাও কোন প্রশ্ন নেই। কোন অভিযোগও নেই। বোধহয় অহিংস মতে তরবারীটা বুলেটের মতো ততটা দোষণীয় নয় বলেই।

আর কমিউনিস্ট পার্টির ভুল ভেঙেছে। প্রমাণ, তাদের একাংশের অবিসম্বাদী নেতা শ্রীযুক্ত জ্যোতি বসুর স্বীকৃতি। সংবাদপত্র থেকেই তার বিবরণ এখানে আমি তুলে দিচ্ছি:

নেতাজী ও কমিউনিস্ট পার্টি

'নেতাজী সম্পর্কে আমরা, কমিউনিস্টরা অতীতে যে-সব কথা বলেছিলাম, তা ভুল। আমরা আজ আমাদের সে ভুল স্বীকার করছি। কারও পদানত হয়ে থাকবার জন্য নেতাজী কখনও কারও সাহায্য নেননি।'

বুধবার কলকাতায় নেতাজী প্রদর্শনীতে স্বাধীনতা আন্দোলনের শহীদদের ব্যবহৃত বিভিন্ন অস্ত্রের প্রদর্শনীর এক প্যাভিলিয়নের উদ্বোধন করে উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু একথা বলেন।

নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে শ্রীবসু বলেন, 'নেতাজী জাপানের সাহায্য নিয়েছিলেন ঠিকই, জাপানের উদ্দেশ্যও হয়তো খারাপ ছিল, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া নেতাজীর অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। বিশেষ করে তাঁর মতো সংগ্রামী নেতা কখনও অন্যরকম ভাবতে পারেন না।'

শ্রীবসু আরও বলেন, 'দেশের স্বাধীনতা অর্জনে গান্ধীজীর অহিংসার দান যেমন আছে, তেমনি আছে নেতাজীর আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বিরাট দান। নেতাজীর প্রেরণায় পরবর্তী কালে নৌ, পুলিশ ও জনসাধারণের বিভিন্ন অংশ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। নেতাজীর অস্ত্রের আঘাতের জন্যই ইংরেজকে বাধ্য হয়ে চলে যেতে হয়েছে।'

[আনন্দবাজার পত্রিকা : ২৯. ১. ৭০]

এ খবর ঊনত্রিশে জানুয়ারির। পরদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীবসু কি বলেছিলেন, তাও এখানে আমি তুলে দিচ্ছি সংবাদপত্রের পাতা থেকে:

'আমাদের পার্টি জাপানকে সাম্রাজ্যবাদী বলে নিন্দা করে। নেতাজী সম্পর্কে ভুল করে কমিউনিস্টরা একসময়ে 'কুইস্লিং' অপবাদকে সমর্থন

করেছিল। নেতাজীর মতো দেশপ্রেমিককে কখনই 'কুইস্‌লিং' বলা যায় না।'

নিঃসন্দেহে শ্রীযুক্ত বসুর এই স্বীকৃতি প্রশংসাযোগ্য। রাজনীতিতে বিভিন্ন মতামত থাকবেই। সেদিনও ছিল, আজও আছে, পরেও থাকবে। তা বলে ভুল করে সেকথা স্বীকার করার মতো সৎ-সাহস ক'জনের থাকে?

কিন্তু কংগ্রেস?

কমিউনিস্ট পার্টি ভুলও করেছে। দীর্ঘ আটাশ বছর ধরে তার জন্য মূল্য দিয়েছে। আজ ভুলও স্বীকার করেছে।

কংগ্রেস স্বীকার করেছে কি? এই দীর্ঘ একত্রিশ বছরের মধ্যে একবারও তারা কোথাও বলেছে কি যে 'নেতাজীর ব্যাপারে সেদিন আমরা ভুল করেছিলাম?'

মল্লিকা, আমরা সাধারণ মানুষ। রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচ কোনদিনই আমরা বুঝিনে। তবে সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে এটুকু নিশ্চয়ই বুঝি যে, রোজ একটার পর একটা বিবৃতি দেওয়াটাকেই যখন স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র পন্থা বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল, তখন সারা ভারতবর্ষে এই একটি মাত্র লোক, যিনি সেদিন কোন কিছুর পরোয়া না করে দুর্বার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সত্যিকারের ক্ষত্রিয়ের মতো।

সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। কি হবে, কেউ তা বলতে পারে না। তবু সব কিছু উপেক্ষা করে নিজের লক্ষ্যে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন অনমনীয় দৃঢ়তার সংগে।

কোন বাধাকেই বাধা বলে মানেননি। গ্রাহ্যই করেননি কোন কিছু। লক্ষ্য একটাই। সে লক্ষ্য হল, যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জন করা।

বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। যদিও পূর্ণ স্বাধীনতা নয়। সেই আধখানাই। তবু তো স্বাধীনতা!

সারা দেশ জুড়ে সেদিন উৎসবের বন্যা। ছোট-বড় ধনী-গরীব সবাই সেদিন আনন্দে ভরপুর। সবার চোখে-মুখে নতুন দিনের আশা। নতুন দিনের স্বপ্ন। আমরা স্বাধীন! আমরা মুক্ত! দাসত্বের অভিশাপ থেকে আজ আমরা মুক্তি পেয়েছি।

সে উৎসবে দেখা মেলেনি শুধু সেই মানুষটির—যাঁর একমাত্র স্বপ্ন ছিল—'অখণ্ড ভারত'।

বিশ্রাম ছিল না সেদিন দিল্লীর আকাশবাণী প্রতিষ্ঠানের। যাঁদের নেতৃত্বের বিনিময়ে এ স্বাধীনতা এসেছে, তাঁদের নামে সেদিন কত প্রশস্তি। কত ঋণ স্বীকার! কত শ্রদ্ধা নিবেদন।

একবারও কি সেদিন আকাশবাণী থেকে উচ্চারিত হয়েছিল সুভাষের নামটা?

যে সুভাষ এবং তাঁর আই. এন. এ.-র গৌরবকে মূলধন করে মাত্র কিছু-

দিন আগে কংগ্রেস নির্বাচনে জয়ী হয়েছিল, স্বাধীনতা দিবসের পুণ্যলগ্নে সেই কংগ্রেস কি ভুলেও সেদিন একবার উল্লেখ করেছিল তাদের কথা ?

না, করেনি। ভুলে নয়, ইচ্ছা করেই করেনি। কারণ—আত্মপ্রচার। অর্থাৎ, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কেউ যদি কোন মূল্য দিয়ে থাকে তো আমরা অহিংসপন্থীরাই দিয়েছি। সোজা কথায়—স্বাধীনতা-সংগ্রামে কার কি অবদান সেটা বড় কথা নয়, পথটাই বড়।

যদিও কংগ্রেস বলতে শুধুমাত্র নির্ভেজাল অহিংসপন্থীদেরই বোঝায় না। প্রায় প্রতিটি বামপন্থী দলই সেদিন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এমন কি বিভিন্ন বৈপ্লবিক সংস্থাগুলিও সেদিন কংগ্রেসের বাইরে ছিল না। তারাও কেউ কম মূল্য দেয়নি স্বাধীনতা অর্জনের জন্য।

কিন্তু দিলে কি হবে ? এতদিন নিশ্চয়ই তোমাদের সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। আজ কার্যোদ্ধার হয়ে গেছে। সুতরাং এবার তোমরা ভালোয় ভালোয় পথ দেখ।

কথাটা আমার নয় মল্লিকা, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের।

১৯৬৬ সালের ২৩শে জানুয়ারি সুভাষের জন্মোৎসব উপলক্ষে এ প্রসঙ্গে তিনি যে বক্তব্য রেখেছিলেন, শোন ঃ

'What I have not been able to forget to this day, was that the name of Subhas Chandra Bose was not mentioned even once. This, I think, was not accidental. It was sought to be conveyed that independence had been won though 'non-violence' and that Netaji and the I.N.A. had not contributed any thing at all to it.'

কতখানি মর্মান্তিক দুঃখে যে একজন দল-নিরপেক্ষ বরেণ্য ঐতিহাসিককে একথা বলতে হয়েছে, ভাবতে পার একবার ?

সুভাষ-বিরোধিতার ব্যাপারে সেদিন কমিউনিস্ট পার্টিই অগ্রণী ছিল, একথা সত্য। কিন্তু এগুলোর জন্যও কি কমিউনিস্ট পার্টিই দায়ী ?

নইলে আজ সুভাষ ভাল-মন্দ, নিন্দা-প্রশংসা সব কিছুরই আড়ালে। কে তাঁকে স্বীকৃতি দিল, বা কে দিল না, তাতে তাঁর কিছুই এসে-যায় না। তা সত্ত্বেও কেন এই চিত্ত-দারিদ্র্য ?

আজ ভুল স্বীকার করে জ্যোতি বসু যে সৎ-সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, কংগ্রেসের কাছ থেকেও কি দেশের লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ তা আশা করতে পারে না ?

এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ এখানেই থাক, মল্লিকা। চলো আমরা আবার ফিরে যাই আগস্ট-বিপ্লবের সেই ঐতিহাসিক অধ্যায়ে।

উল্লেখযোগ্য যে, 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব কংগ্রেসের হলেও আন্দোলন

পরিচালনার কৃতিত্ব তাদের নয়। সে দায়িত্ব সেদিন প্রধানতঃ বহন করেছিল সোস্যালিস্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক ইত্যাদি বামপন্থী দলগুলিই। যাক, পরের কাহিনী শোন।

ইতিহাস তখন এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে। একটি একটি করে ঘটনা ঘটছে, আর রচিত হচ্ছে ইতিহাস।

২০শে আগস্ট সরকারী কোষাগার আর অস্ত্রাগার দখল করার পরে উত্তর-প্রদেশের বালিয়া জেলাতে স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হল ছিটু পাণ্ডের নেতৃত্বে।

সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার বিপ্লবী তরুণের কণ্ঠে রব উঠল—স্বাধীন ভারত কী জয়! ভারতমাতা কী জয়! ইংরেজ ভারত ছাড়! তোমাদের আমরা মানি নে, মানব না।

বিহারের উত্তর-ভাগলপুরেও স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হল অনুরূপ-ভাবে। তাদের কণ্ঠেও সেই একই শপথ। কুইট ইণ্ডিয়া! করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে!

উড়িষ্যাও পিছিয়ে নেই। কোরাপুট জেলায় ৬ জন নিহত হল পুলিশের গুলিতে। আহত শতাধিক।

তারপরই শুরু হল পাল্টা-আক্রমণ। ফলে, আরো ২৫ জন নিহত হল গুলির আঘাতে। লাঠির আঘাতে নিহত ২ জন। তাছাড়া আরো ৫০ জনকে প্রাণ দিতে হল কোরাপুট জেলের অভ্যন্তরে। একজনকে দেওয়া হল মৃত্যু-দণ্ড। ৩২ জনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

ভদ্রক রেল-স্টেশনে নিহত হল ৮ জন। ফলে, পুরী প্যাসেঞ্জারের সব ক'টা বগিই পুড়ে ছাই হয়ে গেল জনতার রোষে। সেই সঙ্গে ভদ্রক ছাড়াও আরো চারটি রেল-স্টেশন।

মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলায় প্রতিষ্ঠিত হল স্বাধীন 'পত্রী সরকার'।

নানা পাতিলের নেতৃত্বে এই পত্রী সরকার যেভাবে দীর্ঘদিনব্যাপী ইংরেজের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন রেখেছিল, তা সত্যিই বিস্ময়কর।

নানা পাতিল ছাড়াও এ ব্যাপারে পাণ্ডু মাস্টার, কিষাণবীর, আপ্পা মাস্টার, শ্রীনাথ লাল, ডাঃ উত্তম রাও প্রমুখ বিপ্লবী নায়কদের ভূমিকা ছিল বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

এবার স্বাধীন পত্রী সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কে কোন্ বিভাগ পরিচালনা করতেন শোন:

সর্বাধিনায়ক—নানা পাতিল। ডিক্টেটর—পাণ্ডু মাস্টার। গ্রামরাজ প্রতি-ষ্ঠার কর্ণধার—শ্রীনাথ লাল। গঠনমূলক পরীক্ষা ও প্রচেষ্টা—ডাঃ উত্তম রাও। তুফান সেনা পরিচালক—আপ্পা মাস্টার।

হঠাৎ একদিন ডিক্টেটর পান্ডু মাস্টার ধরা পড়ে গেলেন পুলিশের হাতে। রাখা হল তাঁকে যারবেদা জেলে। এবার বিচার।

কিন্তু কোথায় পান্ডু মাস্টার!

অদ্ভুত কৌশলে জেল থেকে পালিয়ে ততক্ষণে তিনি পেঁৗছে গেছেন নিজের এলাকায়। কার সাধ্য তখন তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করে!

ওখানে গেলে পত্রী সরকারের অন্যতম নায়ক আপ্পা মাস্টারের দুর্ধর্ষ তুফান সেনা তাদের দু'টুকরো করে কেটে জলে ভাসিয়ে দেবে না! তুফান সেনার কাজই যে পত্রী সরকারের শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করা।

তরুণ বিপ্লবীদের দ্বারা গঠিত এই তুফান সেনা অল্প দিনের মধ্যেই যে-ভাবে তাদের এলাকায় কালোবাজার, বাল্য-বিবাহ, পণপ্রথা, সুরাপান এবং চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি নির্মূল করে দিয়েছিল, স্বাধীন ভারতেই বা তার তুলনা কোথায়?

পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর হয়ে দেখা দিল মধ্যপ্রদেশের ওয়ার্ধা জেলার অস্তি ও চিমুরে।

শুরু হয়েছিল ১৬ই আগস্ট। অস্তি ও চিমুরের হাজার হাজার বিপ্লবী জনতার কণ্ঠে সেদিন রব উঠল—কুইট ইণ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়! করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে!

প্রথমেই আক্রমণ করা হল পুলিশ থানা। তোমাদের কোন আইন আমরা মানি নে. সুতরাং থানা এখন তোমাদের নয়, আমাদের। ভাল চাও তো সরে দাঁড়াও।

থানার সাব-ইন্সপেক্টর ও সাতজন পুলিশ চেষ্টা করল বাধা দিতে। কিন্তু সে বাধা আর কতক্ষণ? ফলে, সেই সাব-ইন্সপেক্টর ও চারজন পুলিশকে প্রাণ দিতে হল উত্তেজিত জনতার হাতে।

সাব-ইন্সপেক্টরকে মারা হল থান ইট দিয়ে পিটিয়ে। আর পুলিশদের হত্যা করা হল গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে।

থানার পরে ডাকবাংলো। ওখানে স্বয়ং এস. ডি. ও. রয়েছে। ধরো ওকে। কাজেও তাই হল। ফলে, এস. ডি. ও. এবং সেই সঙ্গে একজন নায়েব তহ-শীলদারকে প্রাণ দিতে হল ঘটনাস্থলেই।

তারপর চিমুর থানা। সেখানেও একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর ও দুজন কনস্টেবলকে প্রাণ দিতে হল উত্তেজিত জনতার হাতে।

একদিকে রাইফেল ও মেশিনগানধারী বিমান-বহরসহ পুলিশ ও মিলি-টারী, অন্যদিকে বিপ্লবী জনতা।

তবু কিছুতেই কিছু হল না। তাই শেষ পর্যন্ত ডাকা হল বোমারু বিমান-বহরকে।

দলে দলে সবাই উড়ে যাও আকাশে পাখা মেলে। কে-কি-কেন-কি বৃত্তান্ত, কোন কিছু দেখার প্রয়োজন নেই। যেখানে জনতা দেখবে, সেখানেই বোমা-বর্ষণ করবে। তারপর যা হয় পরে দেখা যাবে।

কাজেও তাই করা হল। মোট পাঁচ জায়গায় জনতার ওপর বোমা-বর্ষণ করা হল বিমান থেকে। সাহেবগঞ্জ, মুঙ্গের, রাণাঘাট, তালচের আর পাটনার কাছে একটি রেল-লাইনের ধারে।

কুইট ইণ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়!

অযুত কণ্ঠের সেই বজ্র-হুঙ্কার একদিন গিয়ে আছড়ে পড়ল সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে। ডু অর ডাই! করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! আর অহিংসা নয়। এবার আমাদের সোজা হিসেব, আঘাতের বদলে আঘাত। মারের বদলে মার।

খবর শুনে সঙ্গে সঙ্গেই তৎপর হয়ে উঠলেন সুভাষ।

এই তো চাই! এই তো হওয়া উচিত! ভিক্ষায় কোনদিনও স্বাধীনতা আসে না। অশেষ মূল্য দিয়ে তাকে অর্জন করতে হয়।

এই তো তার অপূর্ব সুযোগ! সুতরাং আরো বেতার-কেন্দ্র চাই। দেশের সংগ্রামী জনগণকে উপযুক্ত নির্দেশ পাঠাতে হবে। কঠোর সংগ্রামের জন্য তাদের প্রস্তুত করে তুলতে হবে। এ সময়ে আরো অনেক বেতার-কেন্দ্র প্রয়োজন।

এতকাল সুভাষের যা কিছু বক্তব্য, সবই প্রচার করা হত আজাদ হিন্দ্ রেডিও থেকে।

এবার খোলা হল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস রেডিও। এর প্রধান কাজ হল, অত্যন্ত চাতুর্য সহকারে ভারতীয় সংবাদ প্রচার করা। কেউ যেন বুঝতে না পারে যে, এ সংবাদ বাইরে থেকে প্রচারিত হচ্ছে। শুনে মনে হবে, যেন দেশেরই কোথাও অবস্থিত কোন গুপ্ত বেতার-কেন্দ্র থেকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে জনসাধারণকে।

এই কেন্দ্রের সাঙ্কেতিক নাম হল—'কঙ্কোরডিয়া-সি'।

কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন ডঃ গিরিজা মুখার্জী। সঙ্গে রইলেন আরো দুজন। বিক্রম জহুরী ও সুরেশচন্দ্র।

এই কেন্দ্রের মাধ্যমে খবর প্রচার করা হত হুইজেন থেকে শর্টওয়েভে ১৯·৭১ মিটারে। সেই একই খবর আবার প্রচার করা হত পাডব্র্যাড থেকে ২০·৩৪ মিটারে।

এখানেই থামলেন না সুভাষ। এবার গড়ে তুললেন আজাদ মুসলিম রেডিও। কারণ, মুসলিম লীগ-প্রধান জিন্না।

সব কিছুর পেছনেই ইসলাম বিপন্নের জিগির তোলা জিন্না-সাহেবের চিরা-চরিত স্বভাব।

তার কারণও ছিল। কূটনীতিতে তিনি অদ্বিতীয়। একথা তিনি খুব ভাল করেই জানতেন যে, সহজ সরল ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা ও হিন্দু-বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে হলে এর চাইতে সহজ পন্থা আর কিছুই নেই। কোনরকম ঝুঁকি না নিয়ে শুধু এইটুকু মূলধন নিয়েই যদি কার্যোদ্ধার করা যায়, তো মন্দ কি!

বলা বাহুল্য যে, এবারও তার ব্যতিক্রম হল না।

আগস্ট-আন্দোলন শুরু হল ৯ই আগস্ট। ১৬ই থেকে ২০শে আগস্ট পর্যন্ত বম্বেতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনেই জিন্নাসাহেব ঘোষণা করলেন তাঁর নতুন আবিষ্কারের কথা।

আগস্ট-আন্দোলন শুধুমাত্র ব্রিটিশের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম নয়, মুসলমানদের বিরুদ্ধেও। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল, মুসলমানদের কংগ্রেসের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা।

দিন কয়েক যেতে না যেতেই আবার নতুন আবিষ্কার।

১৫ই নভেম্বর এই আবিষ্কারের কথা তিনি ঘোষণা করলেন জলন্ধর থেকে।

যে-কোন বুদ্ধিমান লোকই বুঝতে পারবে যে, হিন্দু-নেতা মিঃ গান্ধীর এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল মোট দুটি। এক, যুদ্ধে বিপদগ্রস্ত ইংরেজকে ভয় দেখিয়ে কংগ্রেসের দাবী মেনে নিতে বাধ্য করা ; দুই, সেই দাবীর জোরে গোটা মুসলিম সমাজকে ধ্বংস করা। সরকারের যদি সত্যিই কোন শুভ অভিপ্রায় থাকে, তবে অনায়াসেই তাঁরা এসময়ে ভারতের দশ কোটি মুসলমানের বন্ধুত্ব পেতে পারেন। আমরা প্রস্তুত।

কিছুই জানতে বাকি নেই সুভাষের। তাই অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে তিনি গড়ে তুললেন আজাদ মুসলিম রেডিও।

জিন্নার এই অপপ্রচারের জবাব দিতে হবে। সমস্ত মুসলিম সমাজকে বোঝাতে হবে যে, তোমরা কেউ এই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ো না। স্বাধীনতার কোন বিকল্প নেই। দেশের এই মুক্তি-সংগ্রামে সবাই তোমরা যোগ দাও দলে দলে। স্বাধীনতা শুধু হিন্দুদের নয়, শুধু মুসলমানদেরও নয়, গোটা ভারতবাসীর। সুতরাং, সবাই তোমরা এগিয়ে এসে হাতে হাত মেলাও।

আজাদ মুসলিম রেডিওর সাংকেতিক নাম হল—'কঙ্কোরডিয়া-এম'। পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন হায়দ্রাবাদের মুসলিম তরুণ সুলতান। অত্যন্ত চৌকস ছেলে। বিশেষ করে, উর্দু ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ।

আজাদ মুসলিম রেডিওর মাধ্যমে খবর বলা হত দুইজেন থেকে ১৯·৭১ ওয়েভ লেংথে। সময়—বিকেল সাড়ে তিনটে থেকে চারটে পর্যন্ত।

আজাদ হিন্দ্ রেডিও থেকে মোট ক'টি ভাষায় সংবাদ প্রচার করা হত, জানো মল্লিকা?

মোট ছ'টি ভাষায়। ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী, ফার্সী, তামিল আর তেলেগু।

ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস রেডিও থেকে চারটে ভাষায়। ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী আর তামিল।

আর আজাদ মুসলিম রেডিও থেকে ভারতীয় মুসলমানদের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হত কেবলমাত্র উর্দু ভাষায়। আলোচনা করতেন সুলতান নিজেই। অত্যন্ত সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন তিনি।

১৯৪২ সাল। আগস্ট মাস।

প্রতিটি কর্মী তখন অস্থির, চঞ্চল। শুধু কাজ—কাজ আর কাজ! ভারতে সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে প্রচারিত প্রতিটি খবর এখন নিখুঁতভাবে ধরতে হবে। তারপর আসল খবরটুকু আরো বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে পৃথিবীর সর্বত্র। সেই সঙ্গে জানাতে হবে ভারতবাসীর সংকল্পের কথা। ইংরেজ ভারত ছাড়! কুইট ইন্ডিয়া! ডু অর ডাই!

ঐতিহাসিক ১৯৪২।

বিক্ষোভের আগুনে সারা ভারত তখন জ্বলছে। গর্জে উঠেছে আসমুদ্র-হিমাচল—ইংরেজ ভারত ছাড়! করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! ডু অর ডাই!

পিঠ পেতে মার খেয়ে অহিংসার গুণগান গাইতে আর আমরা রাজী নই। এবার আমাদের সোজা হিসেব—আঘাতের বদলে আঘাত। মারের বদলে মার।

৩১শে আগস্ট আন্দোলন সম্বন্ধে নির্দেশ ভেসে এল সুদূর বার্লিন থেকে:

'আমি সুভাষ বলছি......

বন্ধুগণ, ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম অবাধ গতিতে এগিয়ে চলেছে। দাবাগ্নির মতোই এই সংগ্রাম এখন ছড়িয়ে পড়েছে শহর থেকে পল্লী অঞ্চলে।

আগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী বাইরের জগৎকে জানানো খুবই কষ্টকর ছিল।

আজ আর এটা কোন সমস্যাই নয়। ভারতে আজ কি ঘটছে, তার সমস্ত ইতিহাস বাইরের পৃথিবীকে জানিয়ে সবার কাছে সহানুভূতি ও সাহায্য সংগ্রহ করার কাজে আমি নিজেকে ব্রতী করেছি।

আপনারা যদি নিজের চোখে দেখতেন বা শুনতেন, তাহলে বুঝতে পারতেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর শত্রুদের কাছে ভারত আজ কতখানি সহানুভূতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমরা যত বেশি আত্মবলি দেব, যত বেশি উৎপীড়ন ও অত্যাচার সহ্য করব, পৃথিবীর সামনে ততই আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

ইংল্যাণ্ডের আজ সত্যিই দুর্দিন। তাদের দেশে যে-সব আমেরিকানরা রয়েছেন, তাঁদের ওপর ব্রিটিশ আইন প্রযোজ্য নয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

মার্কিন সৈন্যরাও আজ আর ব্রিটিশ সেনানায়কদের অধীনে যুদ্ধ করতে রাজী নয়। ফলে ব্রিটিশ এবং তার সাম্রাজ্য আজ প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নয়া সাম্রাজ্যের উপনিবেশে পরিণত হতে চলেছে।

এর কোনটাই আমাদের কাম্য নয়। তাই নতুন এবং পুরানো—এই দুটি সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।'

আজ থেকে সাতাশ বছর আগে আমেরিকার এই নয়া সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে সুভাষ যে সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন তা কি অক্ষরে অক্ষরে মিলে

যায়নি, মল্লিকা ? কি মনে হয় আজ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে ? যাক, পরের অংশ শোন :

'সংগ্রামের শেষের দিকে আমাদের দুঃখ ও বেদনার অন্ত থাকবে না। অত্যাচার, উৎপীড়ন, হত্যাকাণ্ড সব কিছুই চলবে তখন বাধাহীনভাবে। স্বাধীনতার জন্য এ মূল্য আমাদের দিতেই হবে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, অন্তিম সময়ে ব্রিটিশ একটা মরণ-কামড় দেবে। তবে সে কামড় মুমূর্ষু সিংহের, সুতরাং তাতে আমরা মরব না।

নেতৃবৃন্দ কারাগারে, তা বলে ভয় পাবার বা হতাশ হবার মতো কিছু নেই। বরং তাঁদের দুঃখ, বেদনা ও নির্যাতনের ইতিহাস সমস্ত জাতির কাছে প্রেরণা নিয়ে আসবে।

এই সংকট মুহূর্তে ফলাফলের দিকে না তাকিয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াই হবে আমাদের বর্তমান যুদ্ধের নীতি। আমাদের চূড়ান্ত জয় আসবে কেবলমাত্র আমাদের চেষ্টার মধ্য দিয়েই।

ভারত সরকার এবং ব্রিটিশ সরকার—উভয়ের গোয়েন্দা বিভাগের তৎপরতা সত্ত্বেও আমি একাধিক উপায়ে আমাদের দেশবাসীর সংগে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলেছি। তার প্রমাণও আপনারা গত কয়েক মাসে বহুভাবে পেয়েছেন।

আজাদ হিন্দ্ রেডিও এবং আমার সম্বন্ধে ভারত সরকারের কয়েকটি গোপন রিপোর্ট আমি দেখেছি। ওগুলি দেখে সত্যিই আমি না হেসে পারিনি।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে যে, আমার সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল, তাহলে আমি নাচার।

তবে একদিন যে আমার সংগে তাদের মরণ-বাঁচনের চূড়ান্ত লড়াই হবেই, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

ভারতবর্ষে আজ যে আন্দোলন চলছে তাকে মোটামুটি অহিংস গেরিলা-যুদ্ধ বলা যেতে পারে। এই গেরিলা-যুদ্ধে আমাদের ছত্রভঙ্গের রীতি অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ—আমাদের কার্যাবলী এমনভাবে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে, যাতে পুলিশ বা মিলিটারী এক জায়গায় তাদের আক্রমণ সংহত করতে না পারে। গভর্ণমেণ্ট যেন কিছুতেই বুঝতে না পারে যে, পরবর্তী আঘাত কোন্‌দিক থেকে আসবে।

গেরিলা-যুদ্ধের রাজনীতি ও কায়দা-কানুন সম্বন্ধে এখানে আমি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছি। তাই আপনাদের আমি এমন কিছু পরামর্শ দিতে পারি, যা অনুসরণ করলে আপনারা নিশ্চয়ই এই সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে পারবেন।

গেরিলা-যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য হবে দুটি। এক : সমর-প্রচেষ্টা ধ্বংস করা। আর : ব্রিটিশ শাসন অচল করে তোলা। তাছাড়া :

১। গভর্ণমেণ্টকে সব রকম ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

২। কারখানার শ্রমিকদের অবস্থান ধর্মঘট করতে হবে। অথবা ইচ্ছে করে কাজে ঢিলে দিতে হবে। সেই সঙ্গে নাট, বল্টু ইত্যাদি খুলে ধ্বংসাত্মক কাজ চালিয়ে উৎপাদন ব্যাহত করতে হবে।

৩। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধ্বংসাত্মক কার্য চালাবার জন্য ছাত্রদের গোপনে গেরিলা-বাহিনী গঠন করতে হবে।

৪। গুপ্ত সংবাদ বহন এবং সংগ্রামী পলাতকদের আশ্রয় দেবার কাজে মেয়েদের, বিশেষ করে ছাত্রীদের এগিয়ে আসতে হবে।

৫। যে-সব সরকারী কর্মচারী সংগ্রামে সহায়তা করতে ইচ্ছুক, তাদের পদত্যাগ না করে ভেতর থেকে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সংক্রান্ত গোপনীয় খবর বাইরে পাচার করতে হবে। তাছাড়া জনসাধারণকে আমি এই কাজগুলি করতে পরামর্শ দিচ্ছি:

(ক) বিলাতি দ্রব্য বর্জন। সেই সঙ্গে ব্রিটিশ ও সরকারী দোকান-পাট পোড়ানো।

(খ) ব্রিটিশ ও তাদের সমর্থকদের বয়কট করা।

(গ) সরকারী নিষেধ অমান্য করে জনসভা ও শোভাযাত্রা করা।

(ঘ) গোপন প্রচার-পত্র ছড়ানো ও গুপ্ত বেতার-ঘাঁটি স্থাপন।

(ঙ) ব্রিটিশ কর্মচারীদের গৃহে অভিযান করে তাদের ভারত ত্যাগ করতে বলা।

(চ) শোভাযাত্রা করে সরকারী অফিস, দপ্তরখানা ও আদালত গৃহে প্রবেশ করে শাসন-ব্যবস্থায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করা।

(ছ) যে সমস্ত জেল-কর্মচারী সংগ্রামী জনসাধারণের ওপর অত্যাচার-উৎপীড়ন করে, তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা।

(জ) যেসব রাস্তায় পুলিশ বা মিলিটারীর আক্রমণের সম্ভাবনা আছে, সেখানে ব্যারিকেড সৃষ্টি করা।

(ঝ) যেসব ফ্যাক্টরিতে সামরিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়, সেগুলি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া।

(ঞ) ডাক, তার ও টেলিফোন-ব্যবস্থা বার বার বিচ্ছিন্ন করা।

(ট) যুদ্ধ-সরঞ্জাম সরবরাহের সম্ভাবনা দেখলে রেলপথ, বাস ও ট্রাম চলাচল ব্যাহত করা।

(ঠ) থানা, রেল-স্টেশন ও জেলখানা ধ্বংস করা।

বন্ধুগণ, আমি নিঃসন্দেহ যে, এই কর্মসূচী কার্যে পরিণত করতে পারলে শাসনযন্ত্র অচল হয়ে পড়বেই।

এই প্রসঙ্গে আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, গেরিলা-যুদ্ধে কৃষকদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। আমি লক্ষ্য করে খুশি হয়েছি যে, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি কয়েকটি প্রদেশে কৃষকরা ইতিমধ্যেই সংগ্রামের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমরা স্বরাজ চাই জনসাধারণের জন্য। শ্রমিকদের জন্য। কৃষকদের

জন্য। সুতরাং ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ যখন তৈরী হবে, তখন শ্রমিক ও কৃষক-দের কর্তব্য জাতীয় বাহিনীর পুরোভাগে এসে দাঁড়ানো। যাঁরা যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করবেন, তাঁরাই লাভ করবেন ক্ষমতা ও দায়িত্ব, তাই তো প্রকৃতির নিয়ম।

সব শেষে আমি বলতে চাই যে, আমাদের এই অভিযান প্রয়োজন হলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস চালিয়ে যেতে হবে। সেই সঙ্গে আপনা-দেরও সমস্ত দুঃখ, যন্ত্রণা ও উৎপীড়নের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রভাতের পূর্ব মুহূর্তটিই সবচেয়ে বেশি অন্ধকার। আপনাদের বিপ্লবের বাণী হোক 'হয় এখন, নয়তো কখনো না।' ডু অর ডাই!

করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! জয় হিন্দ্!'

ডু অর ডাই! করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে!

সারা ভারত তখন জ্বলছে বিক্ষোভের আগুনে। বাংলা, বিহার, উত্তর-প্রদেশ, বম্বে নাগপুর, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, আসাম—কেউ পিছিয়ে নেই। প্রতিটি মানুষের কণ্ঠে সেই একই শপথ—ডু অর ডাই! করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে!

আসামে সংগ্রাম শুরু হল ১৫ই আগস্ট।

প্রথম সূত্রপাত গোয়ালপাড়াতে। কোনরকম সতর্ক না করে হঠাৎ সেদিন পুলিশ বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল একমাত্র মিছিলের ওপর। তারপরই লাঠি ও সংগীন সহযোগে শুরু হল পৈশাচিক আক্রমণ।

ফলে, মোট ৯ জন ছাত্রকে সেদিন গুরুতরভাবে আহত হতে হল পুলিশের হাতে।

শুরু হল পাল্টা-আক্রমণ। ফলে, দেখতে দেখতেই পুলিশের গুলি-বর্ষণ উপেক্ষা করে দরং জেলার বিভিন্ন থানাগুলি চলে গেল জনতার হাতে। মুখে তাদের সেই একই শপথ। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! ডু অর ডাই!

২০শে আগস্ট হঠাৎ একদল সৈন্য অকারণে আক্রমণ চালাল বেবেজীয়ার কাছে ফুলগুড়ি গাঁয়ের নিরীহ অধিবাসীদের ওপরে। ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, ব্রিটিশ-সিংহ এখনো মরে যায়নি। ভাল চাও তো এখনো সাবধান! নইলে কাউকেই বাঁচতে হবে না।

নিহত হল দুজন। আহত আরো কয়েকজন। তা বলে এখানেই কিন্তু শেষ হল না। আবার আক্রমণ চালানো হল গভীর রাত্রে। তারপরই অসহায় নরনারী ও শিশুদের ওপর শুরু হল অকথ্য নির্যাতন।

পরদিন ভোরে গাঁয়ের প্রায় চারশো নরনারীকে গরু-ভেড়ার মতো তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল ৯ মাইল দূরবর্তী থানাতে।

সদ্যপ্রসূতি নারী। কোলে মাত্র তিনদিনের শিশু। তবু রেহাই নেই। যেতেই হবে তোমাকে থানাতে। নইলে—

ফলে, যা হবার তাই হল। মাঝপথেই শিশুটি মায়ের কোল খালি করে চলে গেল অন্য এক জগতে, যেখানে গেলে আর কেউ কোনদিন ফিরে আসে না।

প্রতিশোধ চাই।

নতুন করে শপথ নিলেন আসামের বিপ্লবী তরুণগণ। আসামের মাটিতে দাঁড়িয়ে তোমরা আমাদের ওপর জুলুম চালাবে, তা আমরা কিছুতেই সহ্য করব না। তোমাদের সমস্ত সমর-প্রচেষ্টা আমরা ব্যর্থ করে দেব। ভাল করে তাকিয়ে দেখ যে, আমরা তা পারি কি না।

কাজেও তাই করা হল। হঠাৎ সেদিন হাজার হাজার বিপ্লবী তরুণ ঝাঁপিয়ে পড়লেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিমান-ঘাঁটি সরভোগের বরনগরের ওপর। তারপরই সব কিছু জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে একেবারে একাকার। এমন কি, অফি-সারদের বাংলো ও কোয়ার্টারগুলি পর্যন্ত রেহাই পেল না উন্মত্ত জনতার হাত থেকে।

১৬ই সেপ্টেম্বর কিছু-সংখ্যক নরনারী জড় হল নওগাঁ থেকে পাঁচ মাইল দূরবর্তী বহরমপুরে। হাতে তাদের জাতীয় পাতাকা। মুখে শ্লোগান—কুইট ইণ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়!

রে-রে করে ছুটে এল পুলিশ ও মিলিটারী বাহিনী। এসব চলবে না। অবিলম্বে বন্ধ কর এসব।

সামনেই দাঁড়িয়ে কিশোরী রত্নমালা এবং অন্যান্য মহিলাবৃন্দ। হাতে তাঁদের জাতীয় পতাকা। কিছুতেই তাঁরা সেই পতাকা ত্যাগ করতে রাজী নন।

হোয়াট! এতবড় সাহস! সহসা এক ব্রিটিশ কম্যাণ্ডার ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিল কিশোরী রত্নমালাকে।

বটে! ফুঁসে উঠলেন রত্নমালার বৃদ্ধা ঠাকুমা ভোগেশ্বরী ফুকুননী। তার-পরই তিনি হাতের পতাকার দণ্ড দিয়ে আঘাত করে বসলেন সেই ব্রিটিশ কম্যাণ্ডারকে।

ইয়োরোপ ও এশিয়া ভূখণ্ডের প্রতিটি রণাঙ্গনে মার খেলেও নিরস্ত্র বৃদ্ধার ওপর বীরত্ব দেখাতে কিন্তু একটুকুও দেরী হল না শ্বেতাঙ্গ বীরপুঙ্গবের। ফলে, নিমেষেই বৃদ্ধার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল অব্যর্থ গুলির আঘাতে।

ছুটে এসে মেয়েদের আড়াল করে দাঁড়ালেন বিপ্লবী তরুণদল।

এভাবে মেয়েদের নিগৃহীত হতে আমরা দেব না। প্রাণ যায় যাক, তবু নারীর মর্যাদা আমরা রক্ষা করবই।

ফলে, গুলির আঘাতে নিমেষে প্রাণ হারালেন দুই সহোদর ভাই বালুরাম ও থানুরাম, আর লক্ষ্মীরাম নামে অন্য একটি তরুণ যুবক।

মৃত্যুর পূর্বে লক্ষ্মীরাম তাঁর পকেটের ছ'টি পয়সা নিঃশব্দে তুলে দিলেন সহকর্মীদের হাতে। এই নাও ভাই। এ ছাড়া দেবার মতো আর কিছুই আমার নেই। এটাকে তোমরা কাজে লাগিও।

সামান্য ছ'টি পয়সা মল্লিকা। খুবই সামান্য। আজও সেগুলি সংরক্ষিত

রয়েছে আমাদের জাতীয় ভাণ্ডারে। সামান্য এই ছ'টি পয়সার মূল্য যে সত্যিই অসামান্য!

সামরিক দিক থেকে আসামের গুরুত্ব তখন অত্যন্ত বেশি।

সীমান্তের ঠিক ওপারেই দুর্ধর্ষ জাপ-বাহিনী। এপারেও তৎপরতার অন্ত নেই। রোজই দলে দলে সৈন্য এসে জড় হচ্ছে আসামের মাটিতে। যে করে হোক, জাপ-বাহিনীকে রুখতেই হবে।

রুখে দাঁড়ালেন বিপ্লবী তরুণ দল। সেনাবাহিনীকে ভাতে মারতে হবে। এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যেন এককণা খাদ্যশস্যও ওরা সংগ্রহ করতে না পারে।

কাজেও তাই করা হল। কোথায় খাবার! বাইরে থেকে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী, দুধ, চাল, সব্জী—সব কিছু শহরে আসা বন্ধ। দেখি, তোমরা খাবার পাও কোথায়!

খাবারের সন্ধানে হন্যে হয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে হানা দিল পুলিশ ও মিলিটারী বাহিনী। শীগগির বের কর খাবার। নইলে দেখে নেব।

ফলে, জোড়হাটে প্রায় পঞ্চাশ জনের অঙ্গহানি হল সারা জীবনের মতো।

একই অবস্থার সৃষ্টি হল তেওকারে। সেখানেও প্রায় পঁচিশ জনকে জখম করা হল সঙ্গীন দিয়ে খুঁচিয়ে।

ঐতিহাসিক ২০শে সেপ্টেম্বর প্রাণ দিলেন আসাম-গৌরব কুমারী কনকলতা।

হাজার হাজার নরনারীর কণ্ঠে সেদিন রব উঠল,—কুইট ইণ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়! চলো ভাইসব গহপুর থানাতে। ঐ থানা এখন আমাদের।

সাবধান! বাধা দিল পুলিশ বাহিনী, আর এক পা এগুলেই গুলি করা হবে।

গুলি করবে! হাসলেন কনকলতা—বেশ, তাই কর। তবে আমাদের কাজ আমরা করবই। বলো ভাইসব, বন্দেমাতরম্!

দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! সঙ্গে সঙ্গে বীরাঙ্গনা কনকলতার প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

বন্দেমাতরম্! এবার এগিয়ে গেলেন মুকুন্দ কাকতি।

কনকলতার হাতের পতাকা নিজের হাতে তুলে নিয়ে দৃঢ়পায়ে তিনি এগিয়ে চললেন থানার দিকে। ফলে, তাঁকেও এবার শেষশয্যা নিতে হল শক্ত মাটির বুকে।

ততক্ষণে একদল বিপ্লবী তরুণ থানা-শীর্ষে জাতীয় পতাকা তুলে ধরেছেন সব কিছু উপেক্ষা করে। মুখে তাঁদের দুর্জয় সঙ্কল্প। কুইট ইণ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়। বন্দেমাতরম্!

একই দিনে আক্রান্ত হল ঢেকিয়াজুলি থানা। সেই একই দাবী। আমরা জাতীয় পতাকা তুলব এখানে।

ফলে, বারো বছরের স্বেচ্ছাসেবিকা ফুলেশ্বরী সহ নিহত হল মোট ২০ জন। আহতের সংখ্যা যে কত, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

এবার ছুটে এল মিলিটারী বাহিনী। কোথায় মিছিলকারীরা!

হদিস না পেয়ে শেষ পর্যন্ত স্থানীয় বাজারের লোকদের লক্ষ্য করে শুরু হল বেপরোয়া গুলি-বর্ষণ।

কড়া হুকুম, জনতা দেখলেই গুলি চালাতে হবে। সে জনতা সত্যিই আন্দোলনকারী কিনা, তা ভেবে দেখার কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং চালাও একতরফা। ফলে, নিহত হল আরো ১৬ জন। তার মধ্যে তিনজন মহিলা।

২১শে তারিখে এক প্রতিবাদ-সভা আহ্বান করা হল তেজপুর শহরের টাউন ময়দানে। আমরা পুলিশ ও মিলিটারীর এই অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এভাবে নিরস্ত্র জনসাধারণকে হত্যা করার কোন অধিকার তাদের নেই।

শহরের প্রতিটি রাস্তা অবরোধ করে পুলিশ ও মিলিটারী বাহিনী তত-ক্ষণে প্রস্তুত।

না, ওসব প্রতিবাদ-ট্রতিবাদ চলবে না। কাউকে আজ যেতে দেওয়া হবে না টাউন ময়দানে। গেলে তক্ষুণি গুলি করা হবে।

তাই করা হল। ফলে প্রায় শতাধিক লোককে সেদিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হল টাউন ময়দানের মাটিতে।

২৫শে তারিখে মদন বর্মণ ও রাউতরাম দাস নামে দুটি ছাত্রকে প্রাণ হারাতে হল পাথরকুচি থানার দারোগাবাবুর গুলিতে।

তাঁরা নাকি জোলাহাট গাঁয়ে অনুষ্ঠিত সভা থেকে ফেরার পথে প্রকাশ্য রাস্তায় জাতীয় সংগীত গেয়েছিলেন। মারাত্মক অপরাধ সন্দেহ নেই! সুতরাং মৃত্যুদণ্ড তাঁদের অবশ্যই প্রাপ্য!

বন্দীদেরও রেহাই নেই। হঠাৎ একদিন জোড়হাট জেলে বেপরোয়া লাঠি চালিয়ে জখম করা হল ১৮১ জন অসহায় বন্দীকে। দেখ আমাদের ক্ষমতা আছে কিনা! জার্মান বা জাপানীদের সংগে না পারলেও নিরস্ত্র বন্দীদের শায়েস্তা করার মতো শক্তি আমাদের নিশ্চয় আছে।

পিঠ পেতে মার খাওয়া বিপ্লবীদের ধর্ম নয়। তাদের নীতিই হল, আঘা-তের বদলে আঘাত, মারের বদলে মার!

বিপ্লবী তরুণদের নিয়ে গঠিত আমাদের 'মৃত্যু বাহিনী' কিন্তু সেই পাল্টা-মার সেদিন কম দেয়নি, মল্লিকা।

আদালত-ভবন, রেললাইন, সরকারী ডাকবাংলো, পোস্ট-অফিস, পি-ডব্লিউ-ডি অফিস, সেনা-নিবাস, বিমান-ঘাঁটি কোন কিছুই সেদিন রেহাই পায়নি ধ্বংসের হাত থেকে।

চলন্ত ট্রেনকে মুখ থুবড়ে পড়তে হয়েছিল মোট ৬ বার।

সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল ২৬শে নভেম্বর। সেদিন সৈন্য-বোঝাই চলন্ত ট্রেনকে যেভাবে তাঁরা ধ্বংস করেছিলেন, দুঃসাহসিকতার ইতি-হাসে সত্যিই তা অভিনব।

একবার নয়, বার বার। তার মধ্যে সরুপথার নামক স্থানে সামরিক সাজ-সরঞ্জাম বোঝাই মালগাড়ি ধ্বংস করার ঘটনা খুবই উল্লেখযোগ্য।

জেলের অভ্যন্তরে তিলে তিলে প্রাণ দিলেন পার্বত্য জাতিভুক্ত বীর অহমকর্মী কমলা মিরি।

পুলিশের কঠোর নির্দেশ—কংগ্রেসের সঙ্গে কারো কোনরকম সম্পর্ক রাখা চলবে না।

রাজী হলেন না কমলা মিরি। কার সঙ্গে সম্পর্ক রাখব, বা না-রাখব, সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। সেখানে কোনরকম হুকুম মানতে আমি রাজী নই। ফলে, আট মাস সশ্রম কারাদণ্ড।

হঠাৎ একদিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন কমলা মিরি। খুবই গুরুতর অসুস্থ। বাঁচবেন কিনা বলা শক্ত।

শুরু হল চিরাচরিত কূটনৈতিক চাল। বণ্ড লিখে দাও যে, আর কোন-দিনও আন্দোলনে যোগ দেবে না, ব্যস্, এক্ষুণি তোমাকে খালাস দিয়ে দিচ্ছি।

ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন কমলা মিরি। অসম্ভব! কোনরকম দাস-খত্ দিয়ে মুক্তি পেতে আমি রাজী নই। তার চাইতে আমার মৃত্যু হোক।

তাই হল। মৃত্যুই তিনি বরণ করলেন তিল তিল করে, তবু এতটুকু মাথা নোয়ালেন না বিদেশী সরকারের কাছে।

অন্যতম নেতা কুশল কুঁয়র প্রাণ দিলেন ফাঁসিমঞ্চে।

যাবার আগে বলে গেলেন, 'মৃত্যু মানুষের অনিবার্য পরিণতি। আমি ভাগ্যবান, তাই দেশের জন্য প্রাণ দেবার এই দুর্লভ সুযোগ পেয়েছি। ভগ-বানের দেওয়া এই অশেষ করুণার দান আমি পরমানন্দে মাথা পেতে নিলাম। তোমরা থেমো না যেন। সংগ্রাম চালিয়ে যাও।'

জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিয়া, অচ্যুত পটবর্ধন, শ্রীমতী অরুণা আসফ আলী প্রমুখ সোস্যালিস্ট নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে প্রতিটি সংগ্রামী তরুণ সেদিন অধীর, চঞ্চল।

অনেক মার আমরা খেয়েছি, আর নয়। এবার হয় মারব, নয়তো মরব। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! ডু অর ডাই!

রূপকথার নায়িকা অরুণা আসফ আলী তখন কলকাতায়। মাথার দাম তাঁর ধার্য হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা।

হন্যে হয়ে শিকারী কুকুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে সুদক্ষ গোয়েন্দার দল। যে করে হোক, অরুণা আসফ আলীকে চাই-ই!

কিন্তু কোথায় অরুণা আসফ আলী? কতবার মুখোমুখি হয়েছেন। কথাবার্তাও বলেছেন কতবার। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বুদ্ধির লড়াইতে সবাইকে তাঁর কাছে হার মানতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

এমনি একদিনের কথা। হঠাৎ জরুরী খবর এসে হাজির। এক্ষুণি পালাতে হবে এখান থেকে। পুলিশ এসে পড়ল বলে!

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী আলী একটা ট্যাক্সি নিয়ে জনৈকা ইয়োরোপীয়ান মহিলার কাছে গিয়ে হাজির। খবরের কাগজে 'পেয়িং গেস্ট চাই' বলে তোমাদের বিজ্ঞাপন আমি দেখেছি। এখানে থাকতে হলে আমাকে কি করতে হবে বলো ?

কিন্তু আমরা তো ইয়োরোপীয়ান মহিলা চাই বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছি!

জানি, তবু আমার বিশ্বাস যে, ইয়োরোপীয়ানের পরিবর্তে আমি থাকলেও তোমাদের কোন অসুবিধে হবে না।

কথাবার্তা বলে অত্যন্ত খুশি হলেন শ্বেতাঙ্গ মহিলাটি। বাঃ! বেশ মেয়েটি। ঠিক আছে, এখানেই থাকো তুমি।

পলাতক জীবন অতি কঠোর। তাই দুদিন যেতে না-যেতেই পুলিশ এসে হাজির। কোথায় সেই মেয়েটি ? শীগগির বের কর তাকে।

তন্ন-তন্ন করে সর্বত্র খোঁজা হল, কিন্তু সব বৃথা। শিকলি কেটে পাখি তার আগেই হাওয়া।

আর একবার জনৈকা শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর বাড়িতে। অরুণা তখন অসুস্থ। খুবই অসুস্থ। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে অনেকখানি।

হঠাৎ সেখানে গৃহস্বামীর পরিচিত একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এসে হাজির। দু চোখে তাঁর অনন্ত বিস্ময়। কে এই অচেনা মেয়েটি! সেই দুরন্ত মেয়ে অরুণা আসফ আলী না!

হ্যাঁ, আমি। হাসলেন অরুণা, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? বসুন আপনি!

বিহ্বল আত্মবিস্মৃতের মতো বসে পড়লেন সরকারী কর্মচারীটি। চোখে-মুখে তাঁর সম্ভ্রমের বিহ্বলতা। ও তো মেয়ে নয়, ও যে একটি জীবন্ত ইতিহাস। না, ওর কোন ক্ষতি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

জয়প্রকাশ নারায়ণ তখন দিল্লীতে। সেখান থেকেই তিনি ডাক পাঠালেন বিভিন্ন রাজ্যের সংগ্রামী নেতৃবৃন্দের কাছে। সবাই মিলে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে একটা নীতি স্থির করা দরকার। তোমরা সবাই এস।

বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাব সবাই মেনে নিলেন একবাক্যে। ঠিক হল দিল্লী, বম্বে, মাদ্রাজ, কলকাতা ইত্যাদি স্থানে একই ধারায় সংগ্রাম পরিচালনা করা হবে এখন থেকে।

ডু অর ডাই! কোনরকমেই পিছিয়ে গেলে চলবে না। আঘাতের বদলে আঘাত হানতে হবে। মারের বদলে মার।

প্রথম টার্গেট—বড়লাট লর্ড লিনলিথগো। ওঁকে চাই-ই! যে করে হোক, ওঁকে শেষ করতেই হবে। শুধু সুযোগের অপেক্ষা মাত্র।

সুযোগ পাওয়া গেল দিল্লীর একটা সিনেমা-হাউসে।

পাকা খবর, লিনলিথগো নাকি সেদিন সেখানে সিনেমা দেখতে আসবেন সদলবলে। সিটও রিজার্ভ রাখা হয়েছে তাঁদের জন্য।

যথাসময়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে সিনেমা-হাউসটা কেঁপে উঠল থর-থর করে।

কিন্তু কোথায় লিনলিথগো! না, তিনি আসেননি। কি ভেবে সেদিন তিনি প্রোগ্রাম বাতিল করে দিয়েছিলেন একেবারে শেষ মুহূর্তে।

দ্বিতীয় টার্গেট—প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওয়াভেল। স্টেশনে স্পেশাল ট্রেন প্রস্তুত। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেনটা বম্বে অভিমুখে যাত্রা করবে ওয়াভেলকে নিয়ে।

ওদিকে বিপ্লবিগণও তখন প্রস্তুত। আজ ওয়াভেলের শেষ দিন। যে করে হোক, শক্তিশালী ডিনামাইটের সাহায্যে ঐ স্পেশাল ট্রেনটাকে উড়িয়ে দিতে হবে।

প্রথমেই একটা পাইলট এঞ্জিন ছেড়ে গেল সতর্কতা হিসেবে। খানিকটা পেছনেই স্পেশাল ট্রেন।

নিমেষে তৎপর হয়ে উঠলেন বিপ্লবীবৃন্দ। পাইলট এঞ্জিন চলে গেছে। এই ফাঁকে ডিনামাইট স্থাপন করতে হবে। আর সময় নেই। স্পেশাল ট্রেনটা এসে পড়ল বলে! ঐ যে তার এঞ্জিনটা ছুটে আসছে দৈত্যের মতো! তার আগেই সব কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। তার পরেই, ব্যস্!

নিমেষে গোটা অঞ্চলটা কেঁপে উঠল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে।

কিন্তু কোথায় স্পেশাল ট্রেন! এ যে আর একটা পাইলট এঞ্জিন! সাবধানতা হিসেবে প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করে এবার যে পর পর দুটো পাইলট এঞ্জিন দেওয়া হবে, তা কে জানত!

ডিসেম্বর মাসে জয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁর অজ্ঞাতবাস থেকে এক দীর্ঘ ইস্তাহার প্রচার করলেন সংগ্রামী জনগণের উদ্দেশেঃ

'...As a matter of fact, had the very first assault been successful and had it completely crushed imperialism, that in reality would have been a matter for surprise. The very fact that the enemy himself has admitted that the Rebellion came pretty near destroying his power, shows how successful was the first phase of our National Revolution.

...In the end, Comrades, I should like to say that it has made me inexpressibly happy and proud to be able once again to place my services at your disposal. In serving you, the last words of our leader, 'Do or Die' shall be my guiding star, your co-operation my strength and your command my pleasure.

Jayaprakash Narain
From somewhere in India, December, 1942.'

জয়প্রকাশ নারায়ণ তখন নেপালে। উদ্দেশ্য, সেখান থেকে সংগ্রাম পরিচালনা করা।

আবার বিপর্যয় ঘটল পরের বছর মে মাসে। হঠাৎ সেদিন তিনি ধরা পড়ে গেলেন আকস্মিকভাবে। এবার রাখা হল তাঁকে হনুমাননগর জেলে।

এদিকে বিপ্লবিগণ তখন প্রস্তুত। জয়প্রকাশজীকে চাই-ই! যে করে হোক, তাঁকে মুক্ত করতেই হবে।

করা হলও তাই। হঠাৎ একদিন রাত্রে সশস্ত্র বিপ্লবিগণ দুর্বার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন হনুমাননগর জেলখানার ওপর।

বেগতিক দেখে সংগে সংগে সেপাই-সান্ত্রীর দল সব হাওয়া। কথায় বলে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম! কে যাবে ওদের গুলির মুখে সাধ করে প্রাণ দিতে!

ফলে, আগস্ট-বিপ্লবের বীর যোদ্ধা জয়প্রকাশ নারায়ণ আবার বেরিয়ে এলেন কারাগারের বাইরে। শুধু একাই এলেন না, সংগে নিয়ে এলেন আরো ছ'জন অতি বিশ্বস্ত বন্দী সহকর্মীকে।

এবার জয়প্রকাশ নারায়ণ চলে এলেন কলকাতায়। মুখে বড় বড় দাড়ি-গোঁফ। গায়ে মুসলমানী পোশাক। দেখে চেনাই যায় না। লক্ষ্য—সীমান্ত পেরিয়ে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সংগে যোগাযোগ করা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর সম্ভব হল না, মল্লিকা। ১৯৪৩ সালের ১৮ই ডিসেম্বর হঠাৎ তিনি একদিন ধরা পড়ে গেলেন লাহোরে।

রামমনোহর লোহিয়া ধরা পড়লেন ১৯৪৪ সালের মে মাসে। মাসের পর মাস তাঁকে শৃংখলাবদ্ধ করে রাখা হল জেলখানার একটি ক্ষুদ্র কক্ষে।

ব্যতিক্রম অরুণা আসফ আলী। হাজার চেষ্টা করা সত্ত্বেও পুলিশ কোনদিনও পারেনি তাঁকে গ্রেপ্তার করতে। প্রকৃতপক্ষে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন ১৯৪৬ সালের ২৬শে জানুয়ারি, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তুলে নেবার পরে।

এবার শোন মেদিনীপুরের অবিস্মরণীয় সংগ্রামের কথা।

অশান্তি ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল অনেকদিন আগে থেকেই। কারণ, সরকারের বঞ্চনা নীতি।

জাপানীদের বিশ্বাস নেই। যে-কোন মুহূর্তে ওরা এখানে এসে হামলা শুরু করে দিতে পারে। সুতরাং তোমাদের কাছে যত মোটর, নৌকা ও সাইকেল ইত্যাদি আছে, সব আমাদের কাছে জমা দাও। ওগুলো ওদের হাতে পড়লে আর রক্ষে নেই! চেন না তো তোমরা জাপানীদের!

আর হ্যাঁ, তমলুক, পাঁশকুড়া, নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা, মহিষাদল ও ময়না থানার এই চিহ্নিত অঞ্চলগুলি আমাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে অবিলম্বে তোমাদের গাঁ-এর বাইরে অন্যত্র চলে যেতে হবে।

সিঙ্গাপুরে বা বর্মায় মার খেলেও এখানে ওদের আমরা রুখবই। সুতরাং দেরী না করে অবিলম্বে পাততাড়ি গোটাও। ভয় নেই, এজন্য তোমাদের যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

ক্ষতিপূরণ সত্যিই দেওয়া হয়েছিল, মল্লিকা। অন্তত এই একটি ব্যাপারে মহামান্য সরকার বাহাদুর সত্যিই তাঁর কথার মর্যাদা রেখেছিলেন।

কিন্তু কত দেওয়া হয়েছিল শুনবে? এক-একটি সাইকেলের জন্য আট আনা থেকে পাঁচ টাকা। ফলে, যথাসর্বস্ব হারিয়ে মেদিনীপুরের সাধারণ মানুষকে যে সেদিন কতখানি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা সহজেই অনুমেয়।

সর্বাধিনায়ক সতীশ সামন্ত এবং অজয় মুখার্জী, সুশীল ধাড়া, বরদা কুইতি প্রমুখ নেতৃবৃন্দের পরিচালনায় তখন থেকেই গড়ে উঠেছে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ বাহিনী।

ইংরেজকে চিনতে আর বাকি নেই। বেকায়দা দেখলে বর্মাবরের মতো এখান থেকেও যে ওরা সব কিছু জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়ে সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করবে, তাতে আর কোন ভুল নেই। সুতরাং সঙ্ঘবদ্ধ হও।

সংঘর্ষের প্রথম সূত্রপাত ৮ই সেপ্টেম্বর।

প্রায় আড়াই হাজার গ্রামবাসী সেদিন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে জড় হল দানিপুরের একটা চাল-কলের সামনে। আমাদের অভুক্ত রেখে তোমরা যুদ্ধের প্রয়োজনে বাইরে চাল পাঠাবে, তা আমরা হতে দেব না। কিছুতেই না।

জবাব এল পুলিশের রাইফেলের মুখে। ফলে, নিহত হলেন মোট তিনজন। তারপরই তাঁদের দেহগুলিকে ফেলে দেওয়া হল নদীর জলে।

খবর পেয়ে দু'হাজার লোক ছুটে এল চাল-কলের সামনে। কার সাধ্য আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়! না, আমরা তা হতে দেব না। কিছুতেই না। জান কবুল!

প্রথমেই সেই মৃতদেহগুলি তুলে নেওয়া হল নদী থেকে। ওঁরা শহীদ। শহীদের মর্যাদা দিয়েই আমরা ওঁদের দেহগুলিকে সংকার করব।

ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিশ বাহিনী। না, আমরা তা হতে দেব না। যা করার আমরাই করব।

তাই করা হল। শেষ পর্যন্ত তিনজনকেই চাপিয়ে দেওয়া হল একই চিতায়। তারপরই শুরু হল ব্যাপক গ্রেপ্তার।

বিচারে দেড় থেকে দু বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল মোট আঠারো জনকে।

ওদিকে তখন শুরু হয়েছে জনতার বিচার।

নিহত ব্যক্তিদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য চাল-কল মালিককে দু'হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিতে হবে। সেই সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, কোনদিন এক ছটাক চালও পাচার করা হবে না জেলার বাইরে।

সঙ্গে সঙ্গেই চাল-কল মালিক তা মেনে নিলেন নিঃশব্দে। এই নাও টাকা। কথা দিচ্ছি, আর কোনদিনও বাইরে চাল পাঠাব না।

ওদিকে আসমুদ্র-হিমাচল তখন গর্জে উঠেছে একই সংকল্প নিয়ে—কুইট ইণ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়!

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে মেদিনীপুর চিরদিনই সবার পুরোভাগে।

এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। দেখতে দেখতে একদিন আন্দোলনের সেই ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল মেদিনীপুরের বুকে। তারপরই আবালবৃদ্ধ-বনিতা গর্জে উঠল দারুণ রোষে—কুইট ইণ্ডিয়া! ডু অর ডাই! করেংগে ইয়ে মরেংগে!

২৭শে তারিখে নেতৃবৃন্দ মিলিত হলেন তমলুকের এক গোপন সভাতে।

সংগ্রাম আসন্ন। থানা, আদালত, ডাকঘর, ইউনিয়ন বোর্ড ইত্যাদি ধ্বংস করে সমস্ত শাসন-ব্যবস্থা অচল করে দিতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে যে, মেদিনীপুর আজও মরে যায়নি। কোনদিনও মরবে না।

সংগ্রাম শুরু হবে ২৯শে সেপ্টেম্বর। সবার পুরোভাগে থাকবে সামরিক পদ্ধতিতে গঠিত বিদ্যুৎবাহিনী আর ভগ্নী শিবিরের সদস্যগণ। নীতি হবে একটাই। ডু অর ডাই! করেংগে ইয়ে মরেংগে!

পরদিন থেকেই সাজ-সাজ রব পড়ে গেল সর্বত্র।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে ক্ষুদিরামের মেদিনীপুর কোনদিনও পিছিয়ে থাকেনি। এবারও থাকবে না। অবিলম্বে প্রস্তুত হও সবাই। হাতে আর একদিন মাত্র সময়। তার মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে সবাইকে।

প্রথমেই মেদিনীপুরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে বহির্জগৎ থেকে। এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে বাইরে থেকে সহসা কোন পুলিশ বা মিলিটারী বাহিনী এখানে এসে হাজির হতে না পারে।

রাত্রির অন্ধকারে দেখতে দেখতেই তমলুক, পাঁশকুড়া, মহিষাদল প্রভৃতি স্থানের যাতায়াতের পথগুলি বন্ধ করে দেওয়া হল বড় বড় গাছ ফেলে রেখে।

পুল ভেঙে দেওয়া হল বত্রিশটি। আর রাস্তার মাঝখানে বড় বড় গর্ত করে রাখা হল কুড়ি জায়গায়।

টেলিগ্রাফ আর টেলিফোনের তার কেটে ফেলা হল সাতাশ মাইল পর্যন্ত। টেলিগ্রাফ পোস্ট উপড়ে ফেলা হল একশো পঁচানব্বুইটি।

কাঁসাই ও হুগলী নদীর খেয়া নৌকোগুলো পর্যন্ত ডুবিয়ে দেওয়া হল গভীর জলে।

ওদিকে শাসক-সম্প্রদায়ও চুপচাপ বসে নেই। শহরের সর্বত্র কিসের যেন একটা চাপা অস্থিরতা। মনে হয় কিছু যেন একটা ঘটবে।

অনুমান মিথ্যে হল না। পরদিন ২৯শে সেপ্টেম্বর। বিকেল তখন প্রায় চারটে। সহসা কানে এল লক্ষ লক্ষ মানুষের দূরাগত ক্রুদ্ধ হুঙ্কার—কুইট ইণ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়!

শহরের সব ক'টি রাজপথ অবরোধ করে নিমেষে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল শাসক-সম্প্রদায়।

শুধু একটি মিছিল নয়, চারদিক থেকে চারটি বিরাট মিছিল এগিয়ে এসে ঘিরে ফেলতে চাইছে তমলুক শহরকে। না, কিছুতেই ওদের ঢুকতে দেওয়া হবে না। একটি প্রাণীকেও না।

বিদ্যুৎবাহিনীর নেতৃত্বে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রায় আট হাজার নরনারীর একটা শোভাযাত্রা এগিয়ে এল পশ্চিম দিক থেকে। লক্ষ্য তাদের স্থানীয় থানা। ঐ থানা আমরা চাই-ই! ওটা আমরা দখল করবই।

নিমেষে গুর্খা ও ব্রিটিশ মিলিটারী পোজিশন নিল মাটিতে হাঁটু মুড়ে। তারপরই তাদের হাতের রাইফেলগুলি গর্জে উঠল একসঙ্গে—দ্রাম! দ্রাম! ফলে, নিহত হল মোট পাঁচজন। আহত আরো পাঁচজন।

এখানেই শেষ হল না। আহত রামচন্দ্র বেরার তখন শেষ অবস্থা। সেই অবস্থার মধ্যেই তাঁর ক্ষত-বিক্ষত দেহটাকে রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে ফেলে দেওয়া হল থানার সামনে। যেমন কর্ম, তেমনি ফল! থাক পড়ে এখানে মাটিতে মুখ গুঁজে!

ওদিকে পুলিশ অফিসার মণীন্দ্র ব্যানার্জীর নেতৃত্বে তখন শোভাযাত্রা-কারীদের ওপর অবিরাম গুলি চলছে বৃষ্টিধারার মতো।

আর একদিকে আহত রামচন্দ্র বেরা তখন অতিকষ্টে একটু একটু করে থানার দিকে এগিয়ে চলেছেন মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে। প্রাণ যায় যাক, তবু থানা দখল করে আমাদের প্রতিজ্ঞা আমরা রক্ষা করবই।

কাজেও তাই করলেন রামচন্দ্র বেরা। গড়িয়ে গড়িয়ে কোনরকমে থানা-প্রাঙ্গণে ঢুকেই সহসা একসময়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন দারুণ উল্লাসে:

'আমরা থানা দখল করেছি। আমরা থানা দখল করেছি!'

তারপরই তিনি চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়লেন অনন্ত নির্ভরতায়। নিশ্চিন্ত আরামে। সে ঘুম আর কোনদিনই তাঁর ভাঙল না।

উত্তর দিক থেকে ৭৩ বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরার নেতৃত্বে এগিয়ে এল আর একটি শোভাযাত্রা। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! ডু অর ডাই!

বাধা দিল পুলিশ অফিসার অনিল ভট্টাচার্য। না, কাউকেই এগুতে দেওয়া হবে না। তাহলে গুলি করা হবে।

গুলি করবে! হাসলেন গান্ধীবুড়ি মাতঙ্গিনী হাজরা—বেশ, কর না গুলি! তবে এগিয়ে আমি যাবই। তোমার ইচ্ছা হয় তো গুলি কর নয়তো পরের গোলামী ছেড়ে আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দাও।

নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও এগিয়ে গেলেন গান্ধীবুড়ি। এক হাতে তাঁর বিজয়শঙ্খ, অন্য হাতে জাতীয় পতাকা। মুখে সেই একই মন্ত্র, বন্দেমাতরম্! ইংরেজ ভারত ছাড়!

দ্রাম! অব্যর্থ গুলির আঘাতে হাত থেকে শঙ্খটি পড়ে গেল গান্ধীবুড়ির, তবু তিনি থামলেন না। অপর হাতে মাটি থেকে শঙ্খটি তুলে নিয়ে আবার তিনি চলতে শুরু করলেন সামনের দিকে। বন্দেমাতরম্! ইংরেজ ভারত ছাড়!

এবার জখম হল অন্য হাতটি, তবু সেই একইভাবে তিনি জাতীয় পতাকাটি সমুচ্চে তুলে ধরে রইলেন আগেকার মতো। মুখে সেই একই ধ্বনি। বন্দেমাতরম্! ইংরেজ ভারত ছাড়!

দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীবুড়ির প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। আশ্চর্য! পতাকাটি কিন্তু তখনো পর্যন্ত ধরাই রয়েছে তাঁর হাতে। ঠিক তেমনি ভাবেই।

সংসারে এই নিঃশেষ আত্মবিসর্জনের তুলনা কোথায় বলতে পার, মল্লিকা? তোমরা একালের মেয়ে। পরাধীনতার যে কি দুঃসহ জ্বালা, তা তোমরা জান না। জানতেন এই গান্ধীবুড়ি। তাই তো দেশের মুক্তি-যজ্ঞে নিজেকে তিনি বিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন এমনি করে।

গান্ধীবুড়ির নাম স্মরণ করে আজ তোমরা মাথা নোয়াবে না? ঋণ স্বীকার করবে না? না কি জাতির ইতিহাসে অকৃতজ্ঞ বলে চিহ্নিত হয়ে থাকবে চিরদিন?

পুলিশ ও মিলিটারীর হিংস্র আক্রমণে সেদিন শুধু গান্ধীবুড়ি একাই প্রাণ দেননি, মল্লিকা। প্রাণ দিয়েছিলেন পুরীমাধব প্রামাণিক, নগেন্দ্রনাথ সামন্ত, জীবনচন্দ্র বেরা প্রমুখ আরো কয়েকজন।

আর প্রাণ দিয়েছিলেন তেরো বছরের দুঃসাহসী কিশোর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস। তাঁকে মারা হয়েছিল রাইফেলের কুঁদো দিয়ে পিটিয়ে।

ততক্ষণে বিদ্যুৎবাহিনীর পরিচালনায় আর একটি শোভাযাত্রা এগিয়ে এসেছে দক্ষিণ দিক থেকে। সাকড়া বাঁধের কাছাকাছি আসতেই শুরু হল প্রচণ্ড গুলি-বর্ষণ।

ফলে, প্রাণ দিলেন নিরঞ্জন জানা, আর আহত হলেন পূর্ণচন্দ্র মাইতি ও আরো কয়েকজন। পূর্ণ মাইতি মারা গেলেন দুদিন বাদে, হাসপাতালে।

আহতদের মধ্যে কয়েকজন তখন গোঙাতে শুরু করেছেন—জল! একটু জল!

ছুটে গেলেন ভগ্নী সেনা-শিবিরের মেয়েরা। এই নাও ভাই জল! হাঁ কর, আমরা খাইয়ে দিচ্ছি।

খবরদার! রাইফেল বাগিয়ে ধরল সেনাবাহিনী। ওসব জল-টল দেওয়া চলবে না। আমাদের হুকুম!

বটে! সঙ্গে সঙ্গে আর একদল মেয়ে ছুটে গেলেন রণমূর্তি ধরে। দেখেছ হাতে এগুলো কি! আমাদের বাধা দিলে এই বঁটি দিয়ে কেটে দু টুকরো করে ফেলব না!

প্রায় ত্রিশ হাজার লোকের আর একটি শোভাযাত্রা এগিয়ে এল দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে। কুইট ইণ্ডিয়া! ইংরেজ ভারত ছাড়!

বাধা দিলেন সেনানায়ক অপূর্ব ঘোষ। আর এক পা এগিয়েছ কি মরেছ! সঙ্গে সঙ্গেই তাজা বুলেট।

শুনেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বুক পেতে দিলেন কয়েকজন মহিলা। নাও, মার আমাদের। মরতে আমরা সব সময়ে প্রস্তুত।

পিছিয়ে গেলেন সেনানায়ক অপূর্ব ঘোষ। সামনে বিশাল জনতা। এ যৌবনজলতরঙ্গ রুধিবে কে? তাই গুলির পরিবর্তে এবার তিনি লাঠি-চার্জ করার হুকুম দিলেন জনতার ওপর। ফলে, আহত হলেন বেশ কয়েক-জন।

মহিষাদল থানার সামনেও সেই একই দৃশ্য।

সেখানে প্রথম দফায় প্রাণ দিলেন যামিনীকান্ত কামিলা, অনন্তকুমার পাত্র ও আরো তিনজন।

দ্বিতীয় দফায় শশীভূষণ মান্না, সুরেন্দ্রনাথ কর এবং ধীরেন্দ্রনাথ দিড়াবেরা।

তৃতীয় দফায় ভোলানাথ মাইতি, হরিচরণ দাস, আশুতোষ কুইলা, সুধীরচন্দ্র হাজরা, প্রসন্নকুমার ভুঞা, পঞ্চানন দাস, রাখালচন্দ্র সামন্ত এবং ক্ষুদিরাম বেরা।

বেলকনি থানা অভিযানে প্রাণ দিলেন ভজহরি রাউত, বংশীধর কর, চন্দ্রমোহন জানা, হেমন্তকুমার দাস, চৈতন্য বেরা, বৈদ্যচরণ মহাপাত্র, শিব-প্রসাদ, চন্দ্রমোহন দাস, সর্বেশ্বর প্রামাণিক ও রামপ্রসাদ জানা।

বৃন্দাপুর থানা অভিযানে প্রাণ দিলেন মোট দুজন। গৌরহরি কামিলা আর গান্ধার সাহু।

ভগবানপুর থানা অভিযানে নিহত হলেন যুধিষ্ঠির জানা, বিভূতিভূষণ দাস, জগন্নাথ পাত্র, শ্রীনাথচন্দ্র প্রধান, হরিচরণ বেরা, রামকান্ত দাস, রঘুনাথ মণ্ডল, হরিপদ মাইতি, পরেশচন্দ্র জানা, কৃষ্ণমোহন চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্রনাথ দাশপাঠ ও ভূষণ সামন্ত প্রমুখ সংগ্রামী তরুণবৃন্দ।

কেশবপুর থানা অভিযানে প্রাণ দিলেন শশীবালা দাসী, রামকৃষ্ণ ঘোষ ও আরো দুজন।

তারপর একে একে প্রাণ দিলেন অমূল্য দাসমল, সুধীর মাইতি, কেদার-নাথ জানা, মুচিরাম দাস, ভগীরথ রথ, মুরারীমোহন বেরা, বিপিনবিহারী মণ্ডল, চন্দ্রমোহন দিন্দা ও হরেকৃষ্ণ ধর।

বিদ্যুৎবাহিনী ও ভগ্নী সেনা-শিবিরের পরিচালনায় সুতাহাটা থানা দখল করা হল একই দিনে।

প্রথমেই বন্দী করা হল একজন পদস্থ পুলিশ অফিসারকে। তারপর বাদ বাকি সবাইকে।

লাভও কিছু কম হল না। পাওয়া গেল ৬টি রাইফেল এবং বেশ কয়েকটি তরবারী। অসুরকে আসুরিক ভাষায় জবাব দিতে হলে এগুলো খুবই কার্যকরী।

থানা দখল শেষ। এবার বহ্নি-উৎসব।

দেখতে দেখতে একসময়ে গোটা থানা-ভবনটা জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে।

সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক! নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক ওরা মেদিনীপুরের মাটি থেকে।

সহসা কি শুনে চমকে উঠলেন বিপ্লবী জনগণ। কি ব্যাপার! কিসের শব্দ ওটা!

বিমান! বিমান! বিমান! একজোড়া বোমারু বিমান! ঠিক মাথার ওপরে! মনে হয় বোমা-বর্ষণ করবে।

হ্যাঁ, তাই। ঐ যে বিমান দুটি নিচে নেমে আসছে ছোঁ মেরে। ঐ যে বাতাসের বুকে তীক্ষ্ণ শিস্ দিয়ে বোমাটা নেমে আসছে মাটির দিকে। শীগ্‌গির শুয়ে পড় সবাই মাটি কামড়ে।

আদপেই কিন্তু কোন বিস্ফোরণ হল না, মল্লিকা। কারণ, বোমাটা পড়েছিল একটা পুকুরের মধ্যে।

ফল হল মারাত্মক। দেখতে দেখতেই খাসমহল অফিস, ইউনিয়ন বোর্ড, রেজেস্ট্রি অফিস ইত্যাদি সব কিছু ভস্মীভূত হয়ে গেল জনতার রোষে। কোথায় তোমাদের বোমারু বিমান! ডাক তাদের। তারাই এসে তোমাদের রক্ষা করুক আমাদের হাত থেকে!

তারপর নন্দীগ্রাম থানা। সেখানে প্রাণ দিতে হল বীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, ভানু রায়, ভূতনাথ সাহু, গোবিন্দচন্দ্র দাস, শেখ আলাউদ্দিন ও আরো চারজনকে। আহত ষোলজন।

কাঁথি মহকুমাতেও সেই একই অবস্থা। লক্ষ লক্ষ মানুষের কণ্ঠে একই শপথ—ডু অর ডাই! করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে!

সংঘর্ষের প্রথম সূত্রপাত ২২শে সেপ্টেম্বর।

পুলিশ ও সেনাবাহিনীসহ স্বয়ং মহকুমা-শাসক সেদিন হাজির। যাও, সমস্ত গ্রামবাসীদের ধরে নিয়ে এস। যে রাস্তা ওরা ভেঙেছে, ওদের নিজের হাতেই সে রাস্তা আজ মেরামত করে দিতে হবে। না আসতে চাইলে জোর করে তুলে নিয়ে আসবে।

রুখে দাঁড়াল হাজার হাজার সাধারণ মানুষ। না, এ হুকুম আমরা মানতে রাজী নই। ইচ্ছে হলে তোমরাই নিজের হাতে মেরামত কর গে।

এতবড় কথা! আদেশ দিলেন মহকুমা-শাসক—ফায়ার! ফলে, নিহত হল মোট ছজন। আহত শতাধিক।

জনতার আক্রোশ এবার যেন শতধারায় ফেটে পড়ল পটাশপুর, খেজুরি ও ভগবানপুর থানার ওপর। ফলে, সব কিছু জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে একেবারে একাকার।

কোথায় তোমাদের মনিব ইংরেজ সরকার, কোথায় তার একান্ত দাসানুদাস দারোগা সাহেবের দল! আজ তোমাদের বিচারের পালা।

বেগতিক দেখে পটাশপুর থানার দারোগা সাহেব আগেই হাওয়া। শেষপর্যন্ত খেজুরি ও ভগবানপুরের সার্কেল অফিসার এবং এগারোজন সশস্ত্র কনস্টেবলকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হল সুন্দরবনে।

কেশপুর, ডেবরা, পিংলা, সবং, গড়বেতা, খড়্গপুর ইত্যাদি স্থানেও সেই একই চেহারা। গো ব্যাক ব্রিটিশ! কুইট ইণ্ডিয়া! তোমাদের শাসন আমরা মানি নে।

কোনরকমেই আন্দোলন দমন করতে না পেরে এবার অসংখ্য ব্রিটিশ ও পাঠান সেনাবাহিনীকে নিয়ে আসা হল মেদিনীপুরে।

বড্ড বাড় বেড়েছে এই মেদিনীপুর। এবার দেখ যে, মেদিনীপুরকে আমরা শায়েস্তা করতে পারি কিনা! ভাল করে তাকিয়ে দেখ।

সত্যিই ওরা দেখাল, মল্লিকা। যে কোন মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও বুঝি তা হার মানায়।

ইংরেজের প্রচার-মহিমায় হিটলারের কত নৃশংসতার কাহিনীই না আমরা শুনেছি। হিটলার দস্যু, হিটলার ডাকাত, এমনি কত কথা।

কিন্তু ইংরেজ নিজে কি? সে কি নিজে একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা?

যুদ্ধ শেষে হিটলারের ইহুদী-নির্যাতনের যেসব কাহিনী জানা গেছে, নিশ্চয়ই তা নিন্দার যোগ্য।

কিন্তু ব্রিটিশ! আমেরিকা!

যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মৃতপ্রায় জাপানের বুকে এ্যাটম বোমা নিক্ষেপ করে যেভাবে তারা লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নরনারী ও শিশুকে হত্যা করেছিল, তা কি অভিনন্দনযোগ্য?

মনে রাখতে হবে যে, তার আগেই জাপান যুদ্ধ-বিরতি প্রার্থনা করেছিল মিত্রপক্ষের কাছে। কিন্তু তারা রাজী হয়নি। কারণ, তখনো পর্যন্ত এ্যাটম বোমার কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখার কোন সুযোগ হয়নি। ওটা একবার দেখা দরকার।

হিটলারের নৃশংসতাকে নিশ্চয়ই আমরা নিন্দা করব। কিন্তু বিজয়ী পক্ষ বলে এগুলোকেই কি আমরা বাহবা দেব? এগুলোও কি সমান নিন্দনীয় নয়?

কি করেছিল ইংরেজ সেদিন মেদিনীপুরে? কি করেছিল অস্তি, চিমুর, বিহার বা বালিয়াতে?

আন্দোলনকারীদের নাগাল না পেয়ে যেভাবে সেদিন তারা পৈশাচিক নারী-নির্যাতনে মেতে উঠেছিল, বিংশ শতাব্দীতে কোথাও তার একটা নজীর আছে কি?

পশুত্বের দিক থেকে ফ্যাসিস্টরা কি এর চাইতেও নিকৃষ্ট?

অথচ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল সাহেবের মুখে শোনা গেল বিপরীত কথা। না, এমন কিছু হয়নি ভারতবর্ষে। মাত্র ৯৪০ জন লোক মারা গেছে পুলিশ ও মিলিটারীর গুলিতে। এ তো সামান্য ব্যাপার!

মাত্র ৯৪০ জন! অথচ কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরে যে তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছিল, তাতে জানা গেছে যে, নিহতের সংখ্যা তেরো হাজারেরও বেশি।

তাহলে প্রচারবিদ হিসেবে কে বড়, মল্লিকা? 'ফ্যাসিস্ট' জার্মানীর ডঃ গোয়েবল্‌স্‌, না 'গণতন্ত্রী' ব্রিটিশের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল?

এদিকে তখন অত্যাচারের ঝড় বয়ে চলেছে মেদিনীপুরের ওপর দিয়ে।

পুলিশ ও মিলিটারীর সাহায্যে লাঠি, গুলি, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, নারী-ধর্ষণ কিছুই বাদ নেই। মেদিনীপুরকে শিক্ষা দিতে হবে। এমন শিক্ষা দিতে হবে, যা জীবনেও যেন ওরা ভুলতে না পারে।

বিপদের ওপর বিপদ। সে বিপদ দেখা দিল ১৬ই অক্টোবর রাত্রে।

হঠাৎ সেদিন প্রচণ্ড এক ঘূর্ণিবাত্যা এসে আছড়ে পড়ল মেদিনীপুরের ওপর।

তারপর শুধু জল আর জল! চারিদিকে থৈ-থৈ করা জল। বিধ্বংসী সেই প্রাকৃতিক দুর্যোগে কত শত অসহায় নরনারীকে যে পথে বসতে হল, তার কোন হিসেব-নিকেশ নেই।

দেখে অট্টহাস্যে ভেঙে পড়লেন শাসক-সম্প্রদায়। গড্‌ সেভ দি কিং! এবার? এবার কোথায় যাবে মেদিনীপুর?

কিন্তু না, এ খবর এত শীগ্‌গির বাইরে যেতে দিলে চলবে না। সব চেপে রাখতে হবে সন্তর্পণে। কেউ যেন ওদের সহায়তা করতে না পারে বাইরে থেকে। ওদের উপযুক্ত শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন।

কাজেও তাই করা হল, মল্লিকা। সতর্কতা হিসেবে আগেই কলকাতা থেকে একাধিক টেলিগ্রাফ পাঠানো হয়েছিল মহকুমাশাসকের কাছে। ঝড় আসন্ন। জনসাধারণকে হুঁশিয়ার করে দাও।

সব চেপে দেওয়া হল নিপুণতার সঙ্গে। মেদিনীপুর শেষ হয়ে যাক। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। এই তো ওদের উপযুক্ত শাস্তি।

এত আঘাতের পরেও কিন্তু মেদিনীপুর মাথা নোয়াল না, মল্লিকা। বরং আঘাত সামলে নিয়ে আবার তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়াল সবার পুরোভাগে। মেদিনীপুর আজও মরেনি। প্রমাণ শীগ্‌গিরই তোমরা পাবে।

কাজেও তাই হল। ১৭ই ডিসেম্বর স্বাধীন তাম্রলিপ্ত সরকার প্রতি-ষ্ঠিত হল মেদিনীপুরের মাটিতে। আমরা স্বাধীন। আমরা মুক্ত। এ দেশ আমাদের। আমরাই এর মালিক। বিদেশী শাসকের কোন আইন আমরা মানি নে। মানব না।

কি ছিল না সেই স্বাধীন তাম্রলিপ্ত সরকারের!

স্বরাষ্ট্র বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, চিকিৎসা বিভাগ, জেলখানা, পোস্ট অফিস, সংবাদপত্র, ব্যাঙ্ক, নিজস্ব সেনা বাহিনী—কিসের অভাব ছিল!

এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক পরবর্তী কালে ব্যবস্থাপক সভায় কি বিবৃতি দিয়েছিলেন, শোন:

মেদিনীপুরে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাদের নিজস্ব সৈন্য, পুলিশ ও গুপ্তচর বিভাগ ছিল।

নিজস্ব কারা-বিভাগও তাদের ছিল। প্রয়োজনবোধে সেখানে অপরাধী-

দের আটক রাখা হত। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা গভর্ণমেন্টকে অচল করে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল।'

ওদিকে এত চেষ্টা করা সত্ত্বেও মেদিনীপুরের ওপর সেই অমানুষিক নির্যাতনের কাহিনী কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাপা থাকেনি, মল্লিকা। মুখে মুখে একদিন সে কাহিনী পেঁছে গেল এখানে-ওখানে সর্বত্র।

শুনেই গর্জে উঠলেন পুরুষসিংহ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রতি-বাদে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে গভর্ণর স্যার জন হারবার্টকে তিনি লিখলেন :

'...জার্মানীর অধিকৃত অঞ্চলে যেরূপ নৃশংস অত্যাচারের কথা আমরা শুনতে পাই, মেদিনীপুরেও তাই চলেছে। সশস্ত্র সৈন্য ও পুলিশের সাহায্যে শত শত বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেয়েদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছে। হিন্দুদের বাড়ি লুট করার জন্য মুসলমানদের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ নিজেই এ কাজ করেছে। এমন কি, ১৬ই অক্টো-বরের ঝড়ের পরেও গৃহলুণ্ঠন ও গৃহদাহের কাজ সমানভাবেই চলেছে।

গভর্ণমেণ্টের লোকদের এসব অত্যাচার অত্যন্ত ঘৃণিত। সরকার কর্তৃক একপক্ষ কাল ঝড়ের সংবাদ এবং সাহায্যের আবেদন গোপন রাখা অমার্জনীয় অপরাধ। ঝড়ের পর কতগুলি অফিসারের ঔদাসীন্য এবং হৃদয়হীনতার তুলনা কোন সভ্য গভর্ণমেণ্টের ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

এমন একজন ভদ্রলোককে আমি জানি, যিনি কিছু-সংখ্যক নরনারী ও শিশুকে জলে নিমজ্জিত অঞ্চল থেকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে কয়েক ঘণ্টার জন্য একটি নৌকা চেয়েছিলেন।

প্রার্থনা সরাসরি না-মঞ্জুর করা হয়েছে। ফলে, বিপদগ্রস্ত লোকগুলি স্রোতের জলে ভেসে যায়। তাদের আর জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায়নি।

ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাইরের লোককে কোনরকম সাহায্য করতে দেওয়া হয়নি। সান্ধ্য-আইন জারি করে সে-পথ বন্ধ করা হয়েছে।

অধিকন্তু একজন অফিসার এই মর্মে সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠি-য়েছে যে, আন্দোলনকারী জনসাধারণকে স্থায়ী শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে ওখানে একমাস পর্যন্ত সবরকম সরকারী সাহায্য বন্ধ করা উচিত।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতবাসীকে শুধু বেয়নেটের ভয়ে আর পদানত রাখা যাবে না।

যদি নিজের দেশকে স্বাধীন করা এবং বৈদেশিক প্রভুত্ব অবসান করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা অপরাধ হয়, তবে প্রত্যেকটি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ভারত-বাসীই আজ অপরাধী।

স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত উপায় অবলম্বন না করে বিপ্লব দমন করার জন্য গভর্ণমেণ্ট গত তিনমাস ধরে এই দমন নীতির শাসন চালিয়ে যাচ্ছেন।

তাতে লাভ্র হয়েছে এই যে, গত তিনমাসে জনসাধারণ বুলেটের ভয় হারিয়েছে।

নিরস্ত্র ও অসহায় জাতির সঙ্গে লড়াই করা খুবই সোজা।

ভারতবাসী নিরস্ত্র, তা সত্ত্বেও ব্রিটিশপক্ষ থেকে বলা হয় যে, ভারতবাসী নাকি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করেছে।

তাই যদি হয়, তাহলে ভারতবাসীকে অস্ত্র সরবরাহ করা হোক। তারপর সমস্তের ভিত্তিতে যুদ্ধ চলুক। অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য নিশ্চয় ভারতবাসী এই পরিবর্তনকে সাদরে সমর্থন জানাবে।'

উপসংহারে লিখলেন শ্যামাপ্রসাদ :

'I am sorry that our official association should end like this at this critical hour in the history of my province. I honestly feel I can be of no use to my countrymen or to you by remaining in office so long as the general all-India policy remains what it is and the province is administered by you on lines which I consider inimical to its best interest.'

এখানেই শেষ হল না, মল্লিকা। এবার পালা এল প্রধানমন্ত্রী জনাব ফজলুল হকের। স্বয়ং গভর্ণর তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করলেন রিভলবার দেখিয়ে।

অপরাধ? অপরাধ, মেদিনীপুর সম্বন্ধে তিনি তদন্ত করতে রাজী হয়েছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই গভর্ণরের কৈফিয়ৎ তলব। আমরা যেখানে রাজী নই, সেখানে তুমি কার হুকুমে তদন্তের আদেশ দিয়েছ, তার কৈফিয়ৎ দাও।

এ প্রসঙ্গে আমি গভর্ণর স্যার হারবার্ট এবং জনাব ফজলুল হক লিখিত দুটি চিঠি থেকে কিছু কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি, মল্লিকা। এই চিঠি দুটি থেকেই তুমি সেদিনের ছবিটা স্পষ্ট দেখতে পাবে আশা করি।

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী, ১৫ই ফেব্রুয়ারি

আমি সংবাদ পাইয়াছি যে, আপনি মেদিনীপুর জেলার সরকারী কর্মচারীদিগের আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করা হইবে বলিয়া আজ আইনসভায় প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

আপনি ভালভাবেই জানেন যে, এই বিষয়টি আমার বিশেষ দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। আপনি আরও জানেন যে, এই বিষয়ে কোন তদন্ত করা আমি অবাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি।

এই সংবাদ সত্য হইলে, সরকারের সিদ্ধান্ত বলিয়া বর্ণিত এই বিষয়ে পূর্বেই আমার সহিত কোন আলোচনা করেন নাই।

আগামী কল্য প্রাতঃকালে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময়ে সে সম্পর্কে আপনার কৈফিয়ৎ প্রত্যাশা করিব।

—ভবদীয়, জে. এ. হারবার্ট'

চিঠি পেয়েই রুষ্ট বাঘের মতো গর্জে উঠলেন 'শের-এ-বঙাল' হক সাহেব। পরদিনই তিনি জবাব দিলেন:

'প্রিয় স্যার জন,

আপনার ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখের পত্রের উত্তরে জানাইতেছি যে, আপনার নিকট কোনও কৈফিয়ৎ দেওয়ার বাধ্যবাধকতা আমি স্বীকার করি না। তবে মৃদু ভর্ৎসনার সহিত আপনাকে একথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমার কর্তব্য যে, আপনার পত্রে যেরূপ অসৌজন্যমূলক ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, ভবিষ্যতে গভর্ণরের ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে পত্রে সেরূপ ভাষা বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়।

...আজ প্রাতে ১০টার সময় আপনার সহিত আমার দেখা করিবার কথা ছিল। ইতিপূর্বেই আমি আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারীকে মৌখিক জানাইয়াছি যে, আপনার নিকট যাওয়া ও আপনার সহিত সাক্ষাৎ করা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না। কেননা আমি মনে করি যে, আপনার পত্রে লিখিত ভাষার জন্য ত্রুটি স্বীকার না করিলে ক্রোধ-জর্জরিত মনোভাব লইয়া যে কথাবার্তা হইবে, তাহাতে কোনই লাভ হইবে না।

—ভবদীয়, এ. কে. ফজলুল হক'

প্রথমে পদত্যাগ করলেন শ্যামাপ্রসাদ। তারপর হক সাহেব। কারণ—মেদিনীপুর।

মেদিনীপুর সম্বন্ধে কোনরকম তদন্ত কমিশন গঠিত হোক, সরকারের তা কাম্য নয়। দিনকাল ভাল নয়। বিক্ষোভের আগুনে সারা দেশ তখন জ্বলছে। এ অবস্থায় এ খবর যতদিন চেপে রাখা যায় ততই ভাল।

তাই বলে নিজেদের সেই কীর্তি-কাহিনী কি সত্যিই চেপে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন শাসক-সম্প্রদায় ?

মোটেই না। সত্য কোনদিনও চাপা থাকে না। এখানেও তা থাকেনি।

পরবর্তী কালে কংগ্রেস তদন্ত কমিশনের সামনে মেদিনীপুরের অসংখ্য নির্যাতিতা নারী স্বেচ্ছায় যে জবানবন্দী দিয়েছিলেন, তা থেকে সামান্য কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি।

প্রথমে শোন সিন্ধুবালা দাসীর কথা:

'আমার বয়স ১৯ বৎসর। আমার একটি সন্তান আছে। ৯ই জানুয়ারি বেলা সাড়ে ন'টার সময় জনৈক পুলিশ অফিসার একদল সৈন্যসহ আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে। ওরা আমার স্বামীকে অন্যত্র লইয়া যায় এবং বলপূর্বক আমাকে ধর্ষণ করে। আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি। এই দ্বিতীয়বার আমি ধর্ষিতা হইলাম।'

এবার শোন সন্তান-সম্ভবা নারী খুদিবালা পাণ্ডিতের কথা।

সিন্ধুবালা দাসীর মতো ইনিও একই দিনে, একই অফিসারের নির্দেশে ধর্ষিতা হন মহিষাদল থানার চণ্ডীপুর গ্রামে।

'আমার বয়স ২১ বৎসর এবং আমি তিনটি সন্তানের জননী। ৯ই জানুয়ারি বেলা ন'টার সময় জনৈক ব্যক্তি কয়েকজন সৈন্য লইয়া আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে এবং আমার স্বামীকে গ্রেপ্তার করিয়া অন্যত্র লইয়া যায়।

ঐ ব্যক্তির নির্দেশে দুইজন সৈন্য কাপড় দিয়া আমার মুখ বাঁধিয়া ফেলিয়া পর-পর আমাকে ধর্ষণ করে। আমি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ি। জ্ঞান ফিরিলে আমি দেখি, আমার স্বামীর শরীরের নানাস্থান হইতে রক্তপাত হইতেছে।'

এবার শোন এক অসুস্থা নারী সুহাসিনী দাসের কথা :

'আমার বয়স ২০ বৎসর এবং কোন সন্তানাদি নাই। ৯ই জানুয়ারি 'জনৈক ব্যক্তি' একদল সৈন্য লইয়া আমার স্বামীকে ধরিয়া অন্যত্র লইয়া যায়। ঐ ব্যক্তির নির্দেশে দুইজন সৈন্য কাপড় দিয়া আমার মুখ বাঁধে এবং চিৎকার করিলে গুলি করিবে বলিয়া ভয় দেখায়। তারপর দুইজনই আমাকে ধর্ষণ করে। আমি লজ্জা ও ঘৃণায় সংজ্ঞাহীন হই। আমাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করুন।'

শুধু একটি-দুটি নয়, এমনি অসংখ্য ঘটনা, যা শুনলে লজ্জা-ঘৃণায় তোমরা শিউরে উঠবে।

তবে খুবই আনন্দের কথা যে, এসব নির্যাতিতা মহিলাদের সমাজ-জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে মেদিনীপুরের সংগ্রামী জনসাধারণ সেদিন এতটুকুও পিছিয়ে থাকেননি। এখানেও তাঁরা সবার পুরোভাগে।

তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায়, মল্লিকা। ব্রিটিশ সেদিন যা কিছু করেছিল, সবই তার সাম্রাজ্য রক্ষার খাতিরে।

কিন্তু মোসাহেবের দল? মনিবের স্নেহচ্ছায়ায় পুষ্ট হয়ে কি করেনি সেদিন এই ঘৃণ্য স্বজাতদ্রোহী মোসাহেবের দল?

কি করতে বাকি রেখেছিল?

পুরস্কার ও খেতাবের লোভে এই দাসানুদাসের দলই কি সেদিন কম অত্যাচার করেছিল দেশবাসীর ওপর?

আজ তাদের চেনা যায় না। কারণ, তারাই আজ এই হতভাগ্য দেশের সবচাইতে উঁচুতলার জীব। ক্ষমাই আমাদের পরম ধর্ম কিনা—তাই রাতারাতি ভোল পাল্টে দেশসেবকের ভেক নিতে তাদের কাউকেই এতটুকু বেগ পেতে হয়নি।

ওদিকে পুলিশ তখন হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে মেদিনীপুরের সর্বত্র। যে করে হোক, আন্দোলনের মধ্যমণিদের গ্রেপ্তার করা চাই-ই!
অন্যথায় এ আন্দোলন কিছুতেই থামানো যাবে না।

সবার নামেই মোটা টাকা পুরস্কার। জীবিত অবস্থায় যদি ধরিয়ে দিতে

পার তো ভালই, নয়তো অন্তত তাদের কাটা মুণ্ডুগুলিও যদি এনে দেখাতে পার তো ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে কড়কড়ে টাকা।

তবে কাজটা সোজা নয়। চারপাশে অতন্দ্র প্রহরী বিদ্যুৎবাহিনী। তাছাড়া রয়েছে মেদিনীপুরের সাধারণ মানুষ। এতগুলি চোখকে ফাঁকি দিয়ে কার সাধ্য তাদের একান্ত প্রিয় নেতৃবৃন্দকে স্পর্শ করে!

এত করেও কিছু হল না। হঠাৎ একদিন অজয় মুখার্জী ধরা পড়ে গেলেন আকস্মিকভাবে।

সেদিন তিনি তমলুকেরই কাছাকাছি একটা জায়গায় গিয়েছিলেন সংগঠনের কাজে। সেখানেই একটি চাপরাশী তাঁকে ধরিয়ে দিল পুরস্কারের লোভে।

তারপর বিচার। বিচার ৬ বছরের কারাদণ্ড মাথায় নিয়ে নিঃশব্দে তিনি চলে গেলেন লৌহ-কপাটের অন্তরালে।

ধরা পড়লেন সতীশ সামন্ত, সতীশচন্দ্র সাহু আর বরদা কুইতি। সতীশ সামন্তকে দেওয়া হল আড়াই বছরের কারাদণ্ড।

সুশীল ধাড়া স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন আরো কিছুদিন বাদে।

কারণ—গান্ধীজী। আন্দোলনে অহিংসার মর্যাদা রক্ষিত হয়নি। সুতরাং তাঁর নির্দেশ—অবিলম্বে সব কিছু স্থগিত রেখে আন্দোলনে লিপ্ত প্রতিটি লোককে আত্মসমর্পণ করতে হবে পুলিশের হাতে। অর্থাৎ, সেই ১৯২২ এবং ১৯৩০ সালের অসহযোগ আন্দোলনের পুনরাবৃত্তি। দেশবন্ধুর ভাষায়ঃ

'The Mahatma opens campaign in brilliant fashion, he works it up with unerring skill, he moves from success to success till, reaches the zenith of his campaign, but after that he loses his nerve and begins to falter.'

মহাত্মা তাঁর আন্দোলন খুবই চমকপ্রদভাবে শুরু করেন। নির্ভুল এবং অসাধারণ নৈপুণ্যে ক্রমশ সাফল্যের চরম মুহূর্তে এসে দাঁড়ান। কিন্তু তারপরই তাঁর স্নায়ুযন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে। শুরু হয় তাঁর দ্বিধাগ্রস্ত পথচলা।

এবার মেদিনীপুরের ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ শোন। এ সম্বন্ধে জনাব ফজলুল হকের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দিনের বক্তব্য সাময়িক পত্রিকা থেকে এখানে হুবহু তুলে দিচ্ছিঃ

'বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দিন বলেন যে, ১৯৪২ সালের ঝঞ্ঝাবাত্যার পূর্বে এবং পরে তমলুক এবং কাঁথি মহকুমায় সরকারের লোকজন ১৯৩টি কংগ্রেস ভবন এবং ক্যাম্প পোড়াইয়া দিয়াছে। এই সময় কংগ্রেসীরা ৮১টি থানা, অফিস, সরকারী বাড়িঘর প্রভৃতি পোড়াইয়াছে।

১৯৪২ সালের আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে কাঁথি এবং তমলুক মহকুমায় যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি সহ স্থানীয়

অধিবাসীদের বহু কাঁচা ও পাকা বাসভবন জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছিল কিনা —মেদিনীপুরের জনৈক সদস্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মাল এই প্রশ্ন করিলে প্রধান-মন্ত্রী তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। অর্থাৎ—সরকারের লোকজন শুধু কংগ্রেস ভবন ও ক্যাম্প পোড়াইয়াই নিরস্ত হন নাই, স্থানীয় অধিবাসীদের অস্থাবর সম্পত্তি-সমেত বহু বাসভবন তাহারা জ্বালাইয়া দিয়াছে।

সরকারের লোকজন যেরূপ ব্যাপকভাবে অগ্নিকাণ্ড করিয়াছে, সে সম্বন্ধে তদন্ত করিতে সরকার প্রস্তুত আছেন কিনা—এই প্রশ্ন উঠিলে স্যার নাজিমুদ্দিন ক্রুদ্ধ হন।' [প্রবাসী : চৈত্র : ১৩৫০ সাল]

বিপদ কখনো একা আসে না। দেখতে দেখতেই বাংলার বুকে ভয়াবহ এক দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে এল ইচ্ছাকৃত সরকারী অব্যবস্থার ফলে।

পঞ্চাশের সেই মন্বন্তরে মোট কত লোককে প্রাণ দিতে হয়েছিল জানো ? প্রায় ষাট লক্ষ।

আজ ১৯৭১ সালের প্রান্তে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্যের কথা তুমি বোধহয় কল্পনাও করতে পারবে না, মল্লিকা।

পথে, ঘাটে, ফুটপাথে, পার্কে, যেদিকে তাকানো যায়, শুধু অগুনতি মৃতদেহ। বেশির ভাগই ক্ষতবিক্ষত। ক্ষুধার্ত শকুন এবং কুকুরের দল আগে থেকেই তাদের শেষ করে দিয়েছে।

মল্লিকা, যুদ্ধ হয়েছে রাজায় রাজায়। আমাদের সেখানে কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না। তাছাড়া আমাদের দেশে কোনদিন যুদ্ধ হয়ও নি। অথচ সর্বাগ্রে তার জন্য মাশুল দিতে হল কিনা আমাদেরই !

কিন্তু যে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সেদিন যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল, তাদের দেশে একটি লোককেও না খেতে পেয়ে তিলে তিলে প্রাণ দিতে হয়েছিল কি ?

না, হয়নি। তফাৎটা এইখানেই।

বিয়াল্লিশের কাহিনী এখানেই শেষ করছি, মল্লিকা।

বিপ্লব কোনদিনও ব্যর্থ হয় না। আগস্ট-বিপ্লবও ব্যর্থ হয়নি। ভিক্ষায় কোনদিনও স্বাধীনতা আসে না। তার জন্য যথাযোগ্য মূল্য দিতে হয়। মৃত্যু-ভয়কে জয় করতে শিখতে হয়।

যে জাতি মৃত্যুভয় জয় করতে শেখেনি, স্বাধীনতা তাদের জন্য নয়। ঐতিহাসিক আগস্ট-আন্দোলনের সার্থকতা সেইখানেই।

ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষ সেদিন প্রমাণ করে দিয়েছে যে, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তারা প্রাণ দিতে জানে। সুভাষের ভাষায় :

'In the histcry of India's struggle, 1942 will remain an unforgetable landmark, indicating the psychological transition from passive to active resistance.'

চলো এবার আমরা একটু পিছিয়ে যাই, মল্লিকা।

ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের দুরন্ত গতিবেগের মাঝে এতক্ষণ নিজেকে এমনভাবে হারিয়ে ফেলেছিলাম যে, পেছনের দিকে তাকানোর মতো অবকাশ পাইনি। এবার সে-সব ঘটনাগুলো তোমাকে শোনাব একে একে।

'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে। আর এ ঘটনা ঘটেছিল সেপ্টেম্বর মাসে।

সুভাষের মাথায় তখন দুঃসহ চিন্তা। চিন্তার প্রধান কারণ—অর্থ-সমস্যা।

শুরুতে ছিল মাত্র পনেরোজন। এখন তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিন হাজার। আরো আসছে। ঝাঁকে ঝাঁকে। দলে দলে।

কিন্তু টাকা। টাকা কোথায়? ফৌজের সংখ্যা বাড়ানো মানেই তো টাকা!

তাও সামান্য দু-দশ টাকার প্রশ্ন নয়। তাদের মাইনে, আহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি মিলিয়ে প্রচুর টাকার প্রয়োজন। কোথায় পাবেন সুভাষ এত টাকা?

জার্মান সরকারের কাছ থেকে মাসে মাসে যা পাওয়া যাচ্ছে, তা দয়া বা অনুকম্পার দান নয়, ঋণ। দেশ স্বাধীন হবার পরে সবই তখন আবার তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে সুদে-আসলে। ভারতবর্ষ গরীব দেশ। তার সাধ্য যে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

এদিকে তৃতীয় ব্যাটেলিয়ান গড়ার কাজ শেষ। এবার চাই চতুর্থ ব্যাটে-লিয়ান। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে এত টাকা?

উপায় বাতলে দিল জার্মানী। টাকার দায়িত্ব আমাদের। তবে একটা শর্তে। এবার থেকে তোমাদের সেনাবাহিনীকে যৌথভাবে উভয় রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত্য দেখাতে হবে।

কূটনীতিতে সুভাষও কম যায় না। কি করে যে তিনি একা ১৯৪২ সালের মহাশক্তিশালী তিন প্রধান—হিটলার, মুসোলিনী ও তোজোর সঙ্গে সমানে পাঞ্জা কষে চলতে সক্ষম হয়েছিলেন, তা ভাবতে গেলে সত্যিই অবাক লাগে।

এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। সঙ্গে সঙ্গে সুভাষ পাল্টা চাল দিলেন পাকা দাবা খেলোয়াড়ের মতো। ঠিক আছে, তাই হবে। তবে একটা শর্তে। যেখানে উভয় রাষ্ট্রের লক্ষ্য এক হবে, কেবলমাত্র সেখানেই আমরা সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকব তোমাদের সঙ্গে, অন্যত্র নয়।...'only where common Indo-German interests were at stake.'

রাজী হল জার্মানী। বেশ, তাই হবে। সেনাবাহিনীর খরচ আমরাই বহন করব এখন থেকে।

নতুন শপথ-গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল সেপ্টেম্বর মাসে।

সে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাপ-দূতা-

বাসের কর্ণেল ইয়ামামাতো। এই ইয়ামামাতোর কথা তুমি জানতে পারবে আরো পরে।

এবার ছোট্ট, অথচ গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনার দিকে আমি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করব, মল্লিকা।

সুভাষ বোস জার্মানীর কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন, একথা বোধহয় সারা পৃথিবী জানে।

কিন্তু এ খবর কেউ রাখে কি যে, সুভাষ নিজেই আবার সেই ঋণ পরিশোধ করেছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে?

অবশ্য মোট কত টাকা তিনি ঋণ নিয়েছিলেন, তার সবটাই তিনি পরিশোধ করার সময় পেয়েছিলেন কিনা, সে তথ্য আমার জানা নেই। তবে চেষ্টা যে করেছিলেন, তাতে আর কোন ভুল নেই।

সংগ্রামী ভারতের একক প্রতিনিধি হিসেবে দেশের মুক্তির জন্য সেদিন ঋণ গ্রহণ করেছিলেন সুভাষ নিজে। পরিশোধও করেছিলেন নিজের হাতেই।

জার্মানীর অস্তিত্ব তখন রীতিমত বিপন্ন। সে অবস্থায় ঋণ পরিশোধ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তা বলে সুভাষ কিন্তু তাদের সেই বিপর্যয়ের সুযোগ বিন্দুমাত্রও গ্রহণ করেননি, মল্লিকা। বরং নিজেই তিনি অগ্রণী হয়ে কিছুটা ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়া থেকে।

প্রমাণ ডাঃ আলেকজেণ্ডার ওয়েরথ-এর নিজের মুখের স্বীকৃতি:

'In 1944, 5,00,000 yen were handed over by the Japanese Government to the German Ambassador in Tokyo in the name of Netaji, to serve as the first partial repayment of loan which had been paid to the Free India centre by the German Government.

This amount was made of voluntary contribution made by Indians living in East Asia.'

[Dr. Werth: P.—19]

অর্থাৎ—সেদিন ফ্রি ইণ্ডিয়াকে সহায়তা করার জন্য জার্মান সরকারের পক্ষ থেকে যে অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছিল, তা সবটাই ঋণ হিসেবে। শর্ত ছিল—ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে সব অর্থ ফেরত দেওয়া হবে।

১৯৪৪ সালে জাপান সরকার সেই ঋণের প্রথম কিস্তি হিসেবে মোট পাঁচ লক্ষ ইয়েন টোকিওর জার্মান রাষ্ট্রদূতকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন নেতাজীর নির্দেশে। টাকাটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়গণ স্বেচ্ছায় উপহার দিয়েছিলেন নেতাজীকে।

ওদিকে বিক্ষোভের আগুনে গোটা ভারত তখন জ্বলছে। জ্বলছে সমগ্র বাংলাদেশ। জ্বলছে বাংলার হলদিঘাট—মেদিনীপুর। ডু অর ডাই! করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে!

অপরপক্ষও চুপ করে বসে নেই। দেখতে দেখতে ব্রিটিশ টমির দল জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে দিল মেদিনীপুরের অসংখ্য গ্রাম। যদিও ফ্যাসিস্ট-দের নৃশংসতার কথা বলতে গিয়ে তাদের সবার মুখেই এক রা।

খবর শুনে রক্তে বুঝি আগুন ধরে গেল সুভাষের। তারপরই তিনি অগ্নি-ঝরা ভাষায় ডাক পাঠালেন জাতির উদ্দেশ্যে:

'আমি সুভাষ বলছি...

১৯৩০ সালে মেদিনীপুরে যখন ট্যাক্স-বন্ধ আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তখনও তাদের বাড়ির পর বাড়ি, গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, মেয়েদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছিল, ভারতবর্ষ কি সেকথা ভুলে গেছে?

১৯৩১ সালে হিজলীর বন্দী-শিবিরে, ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে যে নৃশংসতার অনুষ্ঠান হয়েছিল, বাংলার প্রতিটি ঘরে আজো তার স্মৃতি বিদ্যমান।

যুদ্ধ শুরু হবার পর বর্মার ব্রিটিশ টমিরা তাদের পরিবারের কাছে ছিন্ন-শির বন্দীদের যে-সব ছবি পাঠাত, তা আমি নিজের চোখেই দেখেছি। এ ধরনের নৃশংসতা কেবলমাত্র ব্রিটিশ টমিদের পক্ষেই সম্ভব।

স্বাধীনতা দাবী করার অপরাধে আজ ব্রিটিশ টমিরা নিরস্ত্র জনসাধারণের ওপর যে নৃশংস অনুষ্ঠান শুরু করেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোন তুলনা আছে কি?

নৃশংসতার খেলায় যারা নিজেরা এতখানি পটু, অন্য কারো বিরুদ্ধে নৃশংসতার অভিযোগ তাদের মুখে শোভা পায় কি?

অবশেষে আমি বাংলাদেশের অধিবাসীদের এই বলে সতর্ক করে দিতে চাই যে, শীগগিরই তাদের খুব দুর্দিন আসছে। পূর্বাঞ্চলে রক্তপাত ঘটবে। তার জন্য ভয় পেলে চলবে না। বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম ব্রিটিশ শাসনের গোড়াপত্তন হয়েছিল। এবার বাংলাকেই আবার তার উচ্ছেদের দায়িত্ব নিতে হবে।

...এজন্য বাংলার গর্বিত হওয়া উচিত। পথিকৃৎদের কর্তব্য চিরদিনই কঠিন, কিন্তু তা গৌরবের। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বাংলাদেশ তার কর্তব্যের উপযুক্ত হয়ে উঠবে এবং এ-যুদ্ধে তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করবে।

স্বাধীনতা সূর্যের উদয় হবে পূর্বাঞ্চলে। ইনক্লাব জিন্দাবাদ! জয় হিন্দ্!'

সেপ্টেম্বর গড়িয়ে অক্টোবর। তারপর নভেম্বর।

দেখতে দেখতে ক্রমশ একটা প্রশ্ন দানা বেধে উঠল সুভাষের মনে।

হঠাৎ জাপান এত চুপচাপ কেন? কি ব্যাপার! কোথায় এই রহস্যের উৎস?

একই প্রশ্ন তখন প্রতিটি ভারতবাসীর মনে। জাপানীরা এমন চুপচাপ কেন? তাদের পরবর্তী লক্ষ্য কি? অস্ট্রেলিয়া, না ভারতবর্ষ?

কোন জবাব নেই।

বর্মার পতন হয়েছে ১৯৪২ সালের মে মাসে। সেই থেকে দীর্ঘ আট মাস জাপানীরা একেবারে চুপচাপ।

কেন তাদের এই বেমানান নিঃশব্দতা? কি এর কারণ?

অবশ্য প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত নিউওয়ে, কিস্কা, নিউগিনি, গুয়াদাল ক্যানাল ইত্যাদি দ্বীপগুলির ওপর বিচ্ছিন্নভাবে কিছু আক্রমণ যে তারা না চালিয়েছে, এমন নয়।

বছরের শুরুতে (১৯শে ফেব্রুয়ারি) অস্ট্রেলিয়ার ডারুইন বন্দরে বোমা-বর্ষণও করেছিল একবার। কিন্তু তার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় না যে, অস্ট্রেলিয়া বা ভারতবর্ষে কোনরকম অভিযান চালাতে তারা বদ্ধপরিকর।

কারণ, সেই একবারই। তারপর আর কোনদিনই তারা হাত বাড়ায়নি অস্ট্রেলিয়ার দিকে।

অথচ নিরাপত্তার দিক থেকে অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতবর্ষ, দুটোই তাদের পক্ষে বিপজ্জনক।

ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্ত ঘাঁটি। ওদিকে মার্কিন সেনাপতি জেনারেল ম্যাকআর্থার তখন অস্ট্রেলিয়ায়। ওখানেই তিনি তার হেড-কোয়ার্টার স্থাপন করেছেন ফিলিপাইন থেকে বিতাড়িত হয়ে।

এ দুটি ঘাঁটি যতক্ষণ বজায় থাকবে, ততক্ষণ এশিয়া ভূখণ্ডে তাদের নিশ্চিন্ত হবার যো কোথায়!

কাজটা সহজ নয়। আধুনিক যুদ্ধে সাফল্য অর্জন করতে হলে সব কিছুই নির্ভর করে উপযুক্ত সরবরাহ ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার ওপর।

সেখানে সামান্য এদিক-ওদিক হলেই সমূহ বিপদ।

জাপানীরা একান্তভাবেই সমুদ্র-নির্ভর জাতি। এশিয়ার বিস্তৃত ভূখণ্ড তখন তাদের দখলে। সেই বিরাট ভূখণ্ডে যোগাযোগ ও সরবরাহ-ব্যবস্থা বজায় রেখে অস্ট্রেলিয়া বা ভারতবর্ষের মতো দুটি বিরাট মহাদেশে অভিযান চালানোর মতো নৌ এবং বিমান তাদের আছে কি?

সে লোকবলই বা জাপানীদের কোথায়?

তবে কি আক্রমণের পালা এখানেই শেষ?

ঘরের পাশে ব্রিটিশ এবং মার্কিনের মতো দু-দুটো বিরাট শক্তিকে অবস্থান করতে দেখেও কি তারা চুপচাপ বসে থাকবে হাত-পা গুটিয়ে?

প্রমাণ পাওয়া গেল ২০শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে।

কনকনে শীতের রাত্রি। পথঘাট জনমানবশূন্য। প্রাণের কোন স্পন্দনই নজরে পড়ে না আশে-পাশে। শুধু ঠুলিপরা লাইটপোস্টগুলি সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে নিস্পন্দ হয়ে।

সহসা কলকাতা মহানগরীর সবগুলো বিপদ-জ্ঞাপক সাইরেন একসঙ্গে বেজে উঠল বিকট স্বরে উ'-উ'-উ'-উ'-উ'...!

ঘুম ভেঙে জেগে উঠল প্রতিটি মানুষ। কি ব্যাপার! অসময়ে হঠাৎ এই সাইরেন কেন? কোন মহড়া নয় তো? নিশ্চয়ই তাই!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল কান-ফাটানো বিকট আওয়াজ—বুম্‌ম্‌ম্‌ম্‌ম্‌...! বুম্‌ম্‌ম্‌ম্‌ম্‌!

সবাই চমকে উঠল বিস্ফোরণের শব্দে। না, মহড়া নয়। বোমা! বোমা! জাপানী বিমান-বহর হানা দিয়েছে মহানগরী কলকাতার বুকে! দীর্ঘ নীরবতার পরে পালে এবার সত্যিই বাঘ পড়েছে।

পরদিনই সে খবর বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হল সংবাদপত্রের পাতায়। জাপানী বিমান-বহর কর্তৃক কলকাতায় বোমা-বর্ষণ। ক্ষতির পরিমাণ নগণ্য।

ভবিষ্যৎ-বক্তা না হলেও ইংরেজীতেও যাকে বলে 'ইনট্যুইশন,' সেটা বরাবরই সুভাষের ছিল অত্যন্ত প্রবল।

হয়তো কোন কারণ নেই, প্রমাণও হয়তো নেই কিছু, তবু কোন চরম বিপদ ঘনিয়ে এলে মন থেকেই কে যেন ডাক পাঠাত যে, কোথাও একটা কিছু অঘটন ঘটেছে।

সুভাষ তখন কলকাতা থেকে ৬ হাজার মাইল দূরে, বার্লিনে।

আশ্চর্য, কিসের যেন একটা অদৃশ্য প্রেরণায় এত দূর থেকেও সেদিন তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, কলকাতায় কিছু একটা ঘটেছে।

এ প্রসঙ্গে সহকর্মী ডঃ গিরিজা মুখার্জী তাঁর 'দিস ইয়োরোপ' গ্রন্থে কি লিখেছেন, শোন:

'...একদিন খবর পেলাম কলকাতায় জাপানী বিমান হানা দিয়েছে। পরদিন ভোরেই আমি গেলাম সুভাষের সঙ্গে দেখা করতে।

তখন খ্রীস্টমাস। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। আমি লাইব্রেরী ঘরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। খবর পেয়ে একটু বাদেই সুভাষ নেমে এলেন নিচে। দেখলাম, সারা মুখ তাঁর পাণ্ডুর।

ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলাম—কি ব্যাপার? অসুখ করেছে নাকি?—না চিন্তিতভাবে বললেন সুভাষ, কাল সারারাত কলকাতার স্বপ্ন দেখেছি। কি দেখেছি ঠিক মনে নেই। শুধু মনে আছে মেজদা ও আরো কয়েকজনকে দেখেছিলাম। কলকাতার খবর কি বলতে পার, গিরিজা? খবরাখবর পেয়েছ কি কোন কিছু?

বুঝতে পারলাম, কলকাতায় জাপানী বিমান হানার খবর তখনো পর্যন্ত সুভাষের কানে পোঁছায়নি...'

প্রথম আক্রমণ ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৪২ সালে।

এখানেই শেষ নয়। প্রকৃতপক্ষে গত বিশ্বযুদ্ধে কলকাতার ওপর বোমা-বর্ষণ করা হয়েছিল মোট আট বার। অবশ্য ফলাফল দাঁড়িয়েছিল সেই একই। অর্থাৎ, ক্ষতির পরিমাণ নগণ্য।

কথাটা অত্যুক্তি নয়, মল্লিকা। জার্মান বা জাপানী বোমার সবচাইতে বড় গুণ এই যে, ওদের বোমায় কারো কোন ক্ষতি হয় না! বিশেষ করে ব্রিটিশ বাহিনীর তো নয়ই! হলেও তা খুবই নগণ্য!

যেমন পরের বছর ৫ই ডিসেম্বরের ঘটনা। সেদিন জাপানী বিমান হানা দিয়েছিল দিনের বেলা। পর পর দুবার।

ফল যথাপূর্বং। জাপানীদের দুটি বিমান ধ্বংস।

আর ব্রিটিশ-পক্ষের? না, বেশি কিছু হয়নি। ক্ষতির পরিমাণ খুবই নগণ্য। মাত্র একজন সামরিক ব্যক্তি হত, আর তেরোজন আহত।

এবার কর্পোরেশনের খাতায় কি লেখা রয়েছে, শোন:

'৫ই ডিসেম্বর কলিকাতা অঞ্চলে বিমান-হানার ফলে এতাবৎ ৩৭০ জন মারা গিয়াছে। আরো অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক।'

ক্ষতির পরিমাণ খুবই নগণ্য! কি বলো মল্লিকা?

তবে এ ব্যাপারে একপক্ষকে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই। সবাই সমান।

যেমন জার্মানীর প্রচার-সচিব ডঃ গোয়েবল্‌স্‌, তেমনি ব্রিটিশ প্রধান-মন্ত্রী চার্চিল।

সত্যি বলতে কি, এ ব্যাপারে দুজনের মধ্যে কে যে বড়, তা রীতিমত গবেষণার বিষয়।

বরং সেদিক থেকে সোভিয়েত সামরিক ইস্তাহার ছিল কিছুটা বিশ্বাস-যোগ্য। কারণ, শুধু শত্রুপক্ষ নয়, সেই সংগে নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি ও চরম বিপদের কথা কোনদিনই তারা গোপন করতে চেষ্টা করেনি দেশবাসীর কাছে।

মাঝে মাঝে এই নিয়ে মজাও হত মন্দ নয়। যেমন জাপানীদের বোমা-বর্ষণের ঘটনা।

সত্যি বলতে কি, অনেকেই সেদিন বিশ্বাস করেনি কথাটা। তাদের বক্তব্য: জাপানীরা আমাদের দেশে বোমা-বর্ষণ করেনি, করেছে ব্রিটিশ সরকার নিজেই। উদ্দেশ্য, আগস্ট-বিপ্লবকে অন্য পথে চালিত করা।

হয়তো সেদিনের পরিপ্রেক্ষিত সন্দেহটা একেবারে অমূলক ছিল না। তবু একথা ঠিক যে, জাপানী বিমান-বহরই সেদিন বার বার হানা দিয়েছিল ভারতের বুকে, ব্রিটিশ নয়।

তবে ব্যাপক বিমান-আক্রমণ বলতে যা বোঝায়, তা কোনদিনই ঘটেনি। যা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, সবই অতি সাধারণ ধরনের ছোট বোমা।

উদ্দেশ্য, জনসাধারণের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করে যুদ্ধরত সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করা, যা ইতিপূর্বে করা হয়েছিল পোল্যাণ্ড, প্যারিস, সিংগাপুর ইত্যাদি জায়গাগুলিতে।

লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর ভীড় যে ওসব স্থানের সামরিক ব্যবস্থাকে অনেকখানি বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, সেকথা কোনরকমেই অস্বীকার করার উপায় নেই।

এখানেও তাই হল। দেখতে দেখতেই কলকাতা শহর প্রায় ফাঁকা। সবার মুখে একই রব। পালাও! পালাও! বাঁচতে চাও তো শীগগির পালাও! জাপানীরা এসে পড়ল বলে!

সকাল-সন্ধ্যা শহরের বাইরে ছুটে চলেছে ভয়ার্ত নাগরিকের দল।

কিন্তু যাবে কোথায়? ট্রেনে জায়গা পাওয়া তো দূরের কথা, স্টেশনের কাছাকাছিও যাবার উপায় নেই। অন্যান্য যান-বাহনেরও সেই একই অবস্থা। অগত্যা হাঁটা-পথে।

ভয়ে-ত্রাসে প্রতিটি প্রাণী দিশেহারা। কখন কি হয়, কে জানে! এ জগতের আকাশে-বাতাসে মৃত্যু। অলক্ষ্য থেকে কখন যে মৃত্যু এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে, কে বলতে পারে!

পেছনে তাকাবার সময় নেই। এ হচ্ছে বাঁচার সংগ্রাম। সেই বাঁচার তাগিদেই সবাইকে অনিশ্চিতের পথে এগিয়ে যেতে হবে কোনদিকে দৃক্‌পাত না করে।

নানা জাতের, নানা মতের মানুষ। কিন্তু সবার মন তখন একই সুরে বাঁধা। বাঁচতে হবে। যে করে হোক, আমাদের বাঁচতে হবে। তোমরা আমাদের বাঁচতে দাও।

গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ষের কোথায়, মোট কতবার বিমান-আক্রমণ ঘটেছিল, এবার মোটামুটি তার একটি পূর্ণাংগ তালিকা তোমার কাছে তুলে ধরব, মল্লিকা।

তবে ব্রিটিশ সামরিক বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত এ তালিকায় হতাহত এবং ক্ষয়-ক্ষতির যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তা যে কতখানি সত্য, সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

শুধু আমি কেন, কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কারণ আধুনিক যুদ্ধের প্রধান নীতিই হল গোপনীয়তা। সেখানে এর সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দেবার মতো সাধ্য কোথায় বলো?

প্রথম আক্রমণ ঘটেছিল ১৯৪২ সালের ৬ই এপ্রিল ভিজাগাপত্তম ও কোকনদে। সেকথা তোমাকে আগেই বলা হয়েছে।

৮ই মে বোমা-বর্ষণ করা হল চট্টগ্রামে। শুধু বোমা নয়, মেসিনগানও সেদিন চার্জ করা হয়েছিল বিমান থেকে। তবে ক্ষতির পরিমাণ খুবই নগণ্য। বিমান-ঘাঁটিতে কর্মরত অবস্থায় কুলী নিহত হয়েছিল মাত্র ১৫০ জন।

পরদিন ৯ই মে শনিবার আবার চট্টগ্রামে বোমা-বর্ষণ করা হল সকাল-বেলায়। ইস্তাহারে ক্ষত-ক্ষতির কোন কিছু উল্লেখ নেই। বোধহয় নগণ্যই হবে!

১০, ১৬ এবং ১৮ই মে আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে। ক্ষতির পরিমাণ নগণ্য।

দীর্ঘ পাঁচ মাস চুপচাপ। তারপর আবার আক্রমণ চালানো হল ২৫শে অক্টোবর।

প্রায় ৯৫টি জাপানী বিমান সেদিন হানা দিল ডিব্রুগড়ে অবস্থিত মার্কিন বিমান-ঘাঁটির ওপর।

দেখতে দেখতে জোর লড়াই বেধে গেল দু পক্ষের মধ্যে। অন্ততপক্ষে দশটি জাপ-বিমান যে ধ্বংস হয়েছে, তাতে আর কোন ভুল নেই। মার্কিনদের মাত্র একটি!

একই দিনে আবার বোমা-বর্ষণ করা হল চট্টগ্রাম বিমান-ঘাঁটির ওপর। এই নিয়ে মোট তিনবার।

২৬ এবং ২৮শে আসামের বিভিন্ন স্থানে। ৫, ১০ এবং ১৫ই ডিসেম্বর আবার চট্টগ্রামে। ১৫ই ডিসেম্বর চট্টগ্রাম আক্রান্ত হয়েছিল মোট দুবার।

বর্মা হাত-ছাড়া। পরবর্তী লক্ষ্য নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ। তাই আসাম এবং পূর্ববাংলার চট্টগ্রাম, ফেণী, আগরতলা, সিঙ্গারবিল ইত্যাদি স্থানে তখন অসংখ্য বিমান-ঘাঁটি গড়ে তোলা হয়েছিল সামরিক প্রয়োজনে।

যে করে হোক, জাপানীদের রুখতেই হবে। মালয়, বর্মা সিঙ্গাপুর, হংকং সবই তো গেছে। একমাত্র বাকি রয়েছে ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষও যদি চলে যায়, তো রইল কি!

কিছুই নজর এড়ায়নি জাপানীদের। জানতেও বাকি ছিল না কোন-কিছু। আবার তার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৬ই ডিসেম্বর। সেদিন সর্বপ্রথম বোমা-বর্ষণ করা হল ফেণী বিমান-ঘাঁটিতে। সেই সঙ্গে চট্টগ্রামে।

২০, ২১ ও ২২শে ডিসেম্বর পর-পর তিনদিন বোমা-বর্ষণ করা হল মহানগরী কলকাতায়। ২২শে ডিসেম্বর কোথায় বোমা পড়েছিল জানো, মল্লিকা?

পড়েছিল—উত্তর কলকাতার হাতিবাগান বাজার ও একটা বস্তিতে। তিনদিনের আক্রমণে নিহতের সংখ্যা দাঁড়াল ২৫, আর আহত মোট ১০০ জন। দুটি জাপানী বিমান ঘায়েল হয়েছে বলে অনুমান।

২৩শে ডিসেম্বর আবার আক্রান্ত হল ফেণী বিমান-ঘাঁটি। এই সঙ্গে চট্টগ্রামও বাদ গেল না। লক্ষ্য—সেই বিমান-ঘাঁটি।

আবার পরদিন ২৪শে ডিসেম্বর কলকাতা।

প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে সেদিন বোমা-বর্ষণ করা হল কলকাতায়। প্রায় সবগুলিই ছোট বোমা। ক্ষতির পরিমাণ নগণ্য। বিমানধ্বংসী কামানের গোলায় একটি জাপানী বিমান ধ্বংস হয়েছে বলে সামরিক দপ্তরের ইস্তাহারে দাবী।

তিনদিন বিরতির পরে ২৭শে ডিসেম্বর আবার সেই কলকাতা। সেই সঙ্গে চট্টগ্রাম ও ফেণী।

১৫ই জানুয়ারি, ১৯৪৩ সাল। আবার একঝাঁক বোমারু বিমান হানা দিল কলকাতার বুকে।

বাধা দিল এ পক্ষের বিমান-বহর। সামরিক দপ্তরের ভাষায়ঃ ব্রিটিশ বিমান-বহরের ফ্লাইট-লেফটেন্যাণ্ট মিঃ স্প্রিং-এর অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন। মাত্র পাঁচ মিনিটে তিনটি জাপানী বিমান ধ্বংস। ক্ষতির পরিমাণ নগণ্য। একটা কুলী-বস্তিতে বোমা পড়ায় সামান্য কিছু লোক হতাহত হয়েছে মাত্র।

১৭ই জানুয়ারি পর পর আক্রান্ত হল ফেণী, চট্টগ্রাম ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার একটি অগ্রবর্তী সামরিক এলাকা।

১৯শে জানুয়ারি আবার কলকাতা। ধ্বংস হল দুটি জাপানী বিমান। এ পক্ষে একটি ভূপাতিত। ক্ষয়-ক্ষতি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই।

২২শে জানুয়ারি আক্রান্ত হল পূর্ববাংলার কোন একটি জায়গা।

২৩শে চট্টগ্রাম। ঠিক একমাস পরে ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বোমা-বর্ষণ করা হল উত্তর-পূর্ব আসামে অবস্থিত একটি মার্কিন বিমান-ঘাঁটির ওপর। একই বিমান-ঘাঁটি আবার আক্রান্ত হল ২৫শে তারিখে।

২রা মার্চ আবার চট্টগ্রাম। ২১শে মার্চ—ফেণী। ২৩শে মার্চ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার একটি বিমান-ঘাঁটি। ২৪শে মার্চ আবার চট্টগ্রাম।

২৫শে মার্চ পূর্ববাংলার কোন একটি বিমান-ঘাঁটি।

২৭শে মার্চ তারিখে জাপানী বিমান-বহর সর্বপ্রথম হানা দিল কক্স-বাজারে। ২৯শে মার্চ আবার কক্সবাজার।

৩০শে মার্চ বোমা-বর্ষণ করা হল দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার একটি বিমান অব-তরণ ক্ষেত্রের ওপর।

১লা এপ্রিল ফেণী বিমান-ঘাঁটি। ৪ঠা এপ্রিল চট্টগ্রাম। ৫ই এপ্রিল প্রায় ৫০টিরও বেশি জাপানী বিমান হানা দিল দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার একটি অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে। ৬ই এপ্রিল আবার জাপানী বিমান এসে হাজির সেই অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে।

৮ই এপ্রিল শহরের দক্ষিণে অবস্থিত সেই চট্টগ্রাম বিমান-ঘাঁটি।

পরদিন ৯ই এপ্রিল দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার একটি সামরিক বিমান-ঘাঁটি। ২০শে এপ্রিল সর্বপ্রথম বোমা-বর্ষণ করা হল ইম্ফলে। আবার আক্রমণ চালানো হল ২২শে এপ্রিল। ২রা এবং ৫ই মে আক্রান্ত হল দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার একটি বিমান-ঘাঁটি।

২২শে মে প্রচণ্ড আকাশ-যুদ্ধ সুরু হল কক্সবাজার ও ফেণীতে। কক্স-বাজারে জাপানী বিমান ধ্বংস হল চারটি। ফেণীতে ভূপাতিত হল তিনটি। এ পক্ষের ক্ষয়-ক্ষতি সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ নেই।

২২শে এবং ২৯শে মে চট্টগ্রাম। সেই একই বিমান-ঘাঁটিতে।

বেশ কয়েকমাস চুপচাপ। বোমার আতঙ্ক থেকে রেহাই পেয়ে ভারত-বর্ষের সাধারণ মানুষ তখন মোটামুটি নিশ্চিন্ত। যাক, বাঁচা গেছে! আর বোধহয় জাপানী বিমান-বহর হানা দিতে আসবে না আমাদের দেশে।

কার্যত কিন্তু তা হল না, মল্লিকা। আবার আক্রমণ শুরু হল ১১ই অক্টোবর। সেদিন সর্বপ্রথম বোমা-বর্ষণ করা হল মাদ্রাজে।

২০শে অক্টোবর চট্টগ্রাম।

২৫শে অক্টোবর কক্সবাজার। ৯ই নভেম্বর ইম্ফল।

১১ই নভেম্বর আবার বোমা-বর্ষণ করা হল মাদ্রাজে। ২৮শে ফেণী বিমান-ঘাঁটি। ২৯শে পূর্ববাংলার একটি বিমান-ঘাঁটিতে।

৫ই ডিসেম্বর দিনের বেলা বোমা-বর্ষণ করা হল খিদিরপুর ডক্-এরিয়ায়। একবার নয়, পর পর দুবার।

সামরিক দপ্তরের মতে—ক্ষতির পরিমাণ নগণ্য। মাত্র একজন নিহত। আহত তেরোজন।

কর্পোরেশনের হিসেবে নিহত এ পর্যন্ত ৩৭০ জন। আরো অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

হৈ চৈ করে উঠল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাগুলি। বিশেষ করে স্টেটস্ম্যান। তীব্র আক্রমণ করে তাদের সম্পাদকীয় কলমে লেখা হল:

'...এই কি আমাদের জনপ্রিয় সরকারের প্রতিরক্ষার নমুনা! এই কি তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন! প্রকাশ্য দিবালোকে ঝাঁকে ঝাঁকে শত্রু-বিমান এসে কলকাতার ওপর নির্বিচারে বোমা-বর্ষণ করে গেল, অথচ আমাদের দিক থেকে বাধা দেবার সামান্য চেষ্টা পর্যন্ত কোথাও দেখা গেল না। এই যদি প্রতিরক্ষার নমুনা হয়, তবে এ সরকারের ওপর আমরা নির্ভর করব কি করে? কোন ভরসায়?...'

এবার শোন দেশীয় সামরিক পত্রিকার মন্তব্য:

'...গত ১৯শে অগ্রহায়ণ বহুদিন পরে দুইঝাঁক জাপানী বিমান কলিকাতা অঞ্চলের উপর হানা দিয়াছিল। এবার আক্রমণ হইয়াছিল দিবাভাগে।

এই আক্রমণ আকস্মিকভাবে হইলেও ইহা অপ্রত্যাশিত নয়। কলিকাতা অঞ্চল জাপানীদের বিমান-আক্রমণের পাল্লার মধ্যে আছে এবং বিশেষ সতর্ক ব্যবস্থা সত্ত্বেও এই ধরনের আক্রমণ অসম্ভব করিয়া তোলা যায় না।

সরকারী বিবৃতিতে দেখা যায়, এই আক্রমণের ফলে একজন সামরিক ব্যক্তি হত এবং ১৩ জন আহত হইয়াছে। অথচ বেসরকারী মতে হতাহতের সংখ্যা প্রায় পাঁচশত।...' [দেশ: ৪. ১২. ৪৩]

১৩ই ডিসেম্বর আক্রান্ত হল উত্তর-পূর্ব আসামে অবস্থিত একটি মার্কিন বিমান-ঘাঁটি। ২০শে ডিসেম্বর চট্টগ্রাম। ২৬শে ডিসেম্বরও তাই।

এই নিয়ে চট্টগ্রাম আক্রান্ত হল মোট ২০ বার। কলকাতা ৮ বার। ফেণী ৭ বার। ইম্ফল ও কক্সবাজার ৩ বার করে।

আগেকার দু বছরের তুলনায় ১৯৪৪ সালে বিমান-হানার সংখ্যা অনেকটা কম। তার মধ্যে ৩রা ফেব্রুয়ারি উড়িষ্যার উপকূলভাগে। ১৩ই মার্চ শিলচর এলাকায়, ১৬ই মার্চ ইম্ফল আর ২৫শে মার্চ বোমা-বর্ষণ করা হয়েছিল কক্সবাজারে।

দীর্ঘ ন'মাস চুপচাপ। তারপর আবার শুরু হল ডিসেম্বর মাসে। তার মধ্যে ৮ই ডিসেম্বর উড়িষ্যা উপকূলে আর ২৫শে ডিসেম্বর পূর্ববাংলার একটি বিমান-ঘাঁটিতে।

২৫শে ডিসেম্বরই জাপানী বিমান-বহরের শেষ অভিযান। তারপর আর কোনদিনই তারা হানা দিতে চেষ্টা করেনি ভারতবর্ষে।

'ওরা বীর, ওরা আকাশে জাগাতো ঝড়
ওদের কাহিনী বিদেশীর খুনে
গুলি, বন্দুক, বোমার আগুনে,
আজো রোমাঞ্চকর।'

কবি সুকান্তের রচনা। যুবকের পাঁজরে পুজোর হোমানল জেনুলে সেদিন যাঁরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁদের লক্ষ্য করেই সুকান্ত একদিন রচনা করেছিলেন এই অবিস্মরণীয় কবিতাটি।

কিন্তু আজ আর ঐ কথাগুলোর এক কাণাকড়িও দাম নেই, মল্লিকা। অ যদি থাকত, তবে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস অন্যরকম ভাবে লেখা হত। কিন্তু তা হয়নি।

সত্যেন বর্ধন, এম. এ. কাদের, এস. এ. আনন্দম্, মানকুমার বসু, ফৌজ সিং—এই নামগুলি তুমি কোনদিন শুনেছ কি, মল্লিকা? জানো ওদের কি পরিচয়?

নিশ্চয়ই জানো না। শুধু তুমি কেন, কেউ জানে না।

দোষ তোমাদের নয় মল্লিকা, আমাদের। আমরাই তোমাদের এতদিন ওদের কথা জানতে দিইনি। সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবেই আমরা ওদের নামগুলি মুছে দিয়েছি ইতিহাসের পাতা থেকে।

কারণ, আমরা নৈতিবাদে বিশ্বাসী। কেউ আমাদের গালে এক চড় দিলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা অন্য গাল পেতে দেব, তবু প্রত্যাঘাত কিছুতেই নয়। তাহলে সারা পৃথিবীর কাছে আমরা আদর্শভ্রষ্ট হব।

ওদের নীতি ঠিক তার বিপরীত। দেশের জন্য ওরা মরতে জানে, মারতেও জানে।

প্রমাণ—ইতিহাস। দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করে, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে ওরা যে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছে, তাকে অস্বীকার করার সাধ্য কোথায়?

আপত্তি সেইখানেই। শুধু আপত্তি নয়, ভয়ও। কে জানে, ওদের নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে একদিন আমাদের বিরুদ্ধেই যদি তোমরা এমনি করে রুখে দাঁড়াও?

না, আমরা তা হতে দিতে পারি নে। তার চাইতে যা চাপা আছে, তা চাপাই থাক।

ওদের চিনতে হলে আমাদের সেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংগ্রামমুখর দিনগুলিতে ফিরে যেতে হবে, মল্লিকা।

১৯৪২ সাল। যুদ্ধের আগুনে সারা পৃথিবী তখন জ্বলছে।

মহানায়ক রাসবিহারী বসু ও মোহন সিংয়ের নেতৃত্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি ভারতীয় সেদিন দেশপ্রেমের বন্যায় উদ্দীপ্ত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

আহত ব্রিটিশ-সিংহের অন্তিম সময় উপস্থিত। সিঙ্গাপুরের পতন হয়েছে। পতন হয়েছে গোটা বর্মার।

এই তো সুযোগ! এবার একটা চরম আঘাত হেনে পররাজ্যগ্রাসী ঐ রক্ত-চোষা জাতকে ভারতের মাটি থেকে চিরতরে দূর করে দিতে হবে।

জানি, তার জন্য অনেক মূল্য দিতে হবে। দিতে হবে অসংখ্য তাজা তরুণ প্রাণ। তাই দেব। তবু এবারের এই অপূর্ব সুযোগটিকে আমরা কোনরকমেই হারাতে রাজী নই।

তার আগে কয়েকজন দুঃসাহসী তরুণকে উপযুক্ত বেতার ট্রান্সমিটারসহ গোপনে ভারতে ফিরে যেতে হবে।

ওখানে গিয়ে ট্রান্সমিটারের সাহায্যে জানাতে হবে শত্রুর সামরিক শক্তি সম্বন্ধে খুঁটিনাটি খবর। জানাতে হবে ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা। জানাতে হবে সব কিছু।

সুযোগ এবং সুবিধামত সম-আদর্শে বিশ্বাসী ভারতীয় নেতাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে হবে। তারপর জনসাধারণের মধ্যে মিশে গিয়ে তাদের জানাতে হবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই সামরিক প্রস্তুতির কথা। বলতে হবে —আর সময় নেই। সংগ্রাম আসন্ন। সবাই প্রস্তুত হও।

কে যাবে এই কঠিন গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার নিয়ে ভারতের মাটিতে? কাকে পাঠানো যায়?

সবাই রাজী। স্বাধীনতার এই শেষ সংগ্রামে কেউ পিছিয়ে থাকতে রাজী নয়। শুধু আদেশের অপেক্ষা মাত্র।

মোহন সিংহের নির্দেশে সব কিছু ব্যবস্থার দায়িত্ব নিলেন কর্ণেল এন. এস. গীল। ঠিক হল, মোট চৌদ্দজনকে ভারতবর্ষে পাঠানো হবে বিভিন্ন দলে ভাগ করে।

মোহন সিংয়ের বিশ্বস্ত বন্ধু মেজর মহাবীর সিংহের নেতৃত্বে একদল যাবে কালেয়া ও চীন পাহাড় পেরিয়ে ইম্ফলের দিকে। সঙ্গে থাকবেন ক্যাপ্টেন বলবন্ত সিং, রাম সিং, পরব প্রমুখ সেনানীবৃন্দ।

অন্যদলের লক্ষ্য, আরাকান, আকিয়াব, কক্সবাজার হয়ে সোজা বাংলাদেশ। বাদ বাকি সবাই সাবমেরিনে।

—বিশ্বাসঘাতক সব দেশেই আছে। কি ইংল্যান্ড, কি রাশিয়া, কি আমেরিকা, কোথাও তার অভাব নেই। এখানেও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না।

সহসা এক ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতক গুটি-গুটি পায়ে এল মাথা উঁচিয়ে।

সব পণ্ড করে দিতে হবে। সবাইকে ধরিয়ে দিতে হবে। ধরিয়ে দিলে অনেক টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে। সেই সংগে খেতাব। চাকুরি-জীবনে এ যে আশাতীত সৌভাগ্য! এই তো তার সুযোগ। না, এ সুযোগ হারালে চলবে না।

কে সেই দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক? কি তার নাম?

ধীলন। মেজর মহাবীর সিং ধীলন। আর তার সুযোগ্য সহকারী ক্যাপ্টেন বলবন্ত সিং, রাম সিং আর পরব।

অকৃতজ্ঞ আর কাকে বলে! নইলে ওদেরই একজন (পরব) যখন সিঙ্গাপুরে গুরুতরভাবে আহত হয়ে চিকিৎসার জন্য ব্রিটিশ হাসপাতালে গিয়েছিল, তখন তারা তাকে কুকুরের মতো সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল দূর-দূর করে।

হলে কি হবে! রক্তে যার বিশ্বাসঘাতকতার বীজ লুকিয়ে আছে, সে-সব ইতিহাস তো তার মনে থাকবার কথা নয়! তাই দ্বিধাহীন চিত্তেই এবার তাকে মিশে যেতে দেখা গেল বিশ্বাসঘাতকদের দলে।

যথাসময়ে মেজর মহাবীর সিং ধীলনের নেতৃত্বে প্রথম দলের যাত্রা শুরু হল রেঙ্গুন থেকে।

প্রথমে ট্রেনে। তারপর হাতীর পিঠে চেপে। লক্ষ্য, চীন পাহাড় পেরিয়ে ইম্ফলের দিকে।

তারপর যা হবার তাই হল। সীমান্ত পেরিয়েই ঘৃণ্য এই দেশদ্রোহী আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর অত্যন্ত গোপনীয় কাগজপত্রসহ সোজা গিয়ে হাজির হল ব্রিটিশ শিবিরে।

তোমাদের সেবা করব বলে অনেক কষ্টে আমি ফিরে এসেছি সাহেব। অনেক জরুরী ফাইল-পত্র নিয়ে এসেছি তোমাদের জন্য। দাঁড়াও, একে একে দেখাচ্ছি সব।

তারপর কত গল্প! সিঙ্গাপুর থেকে নিজের কৃতিত্বে পালিয়ে আসার কত রোমাঞ্চকর কাহিনী! কত কায়দা করে আমাকে আসতে হয়েছে, জান সাহেব! কানের পাশ দিয়ে কতবার সাঁ সাঁ করে গুলি ছুটে গেছে, ভাবতে পার তোমরা! যাক, তোমাদের দাসানুদাস এই গরীব বান্দাকে তোমরা ভুলো না যেন। হুজুর মেহেরবান!

এ আমার মনগড়া কথা নয় মল্লিকা, এক মর্মান্তিক কলঙ্কময় ইতিহাস। এ প্রসংগে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর প্রথম সারির অফিসার মেজর জেনারেল এ. সি. চ্যাটার্জী কি বলেছেন, শোন:

'The Kalewa party led by Major M. S. Dhillon went up to North Burma from Rangoon first by train and then by elephants, crossed the China Hills and surrendered to the British in that region.

Before starting from Rongoon Major Dhillon took with him some other officers (Captains Balwant Singh, Ram Singh, Parab) also who had escaped from Malaya but had been captured in Burma on the pretext that they must form a group in his party and go with him. All of them deserted.'

[India's Struggle for Freedom: Major General A. C. Chatterjee: P.—45]

ফল হল সুদূরপ্রসারী। ওদিকে তখন আরাকান দলের যাত্রা শুরু হয়েছে স্টীমারে চেপে। লক্ষ্য—আপাতত আকিয়াব।

আকিয়াব থেকে নৌকোতে মায়ু নদী পার হয়ে অবশেষে হাঁটাপথ। যে করে হোক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে যেতেই হবে।

রাত কাটল বুথিডং এলাকার একজন গ্রাম্য মুসলমান জমিদারের বাড়িতে।

তারপর নৌকো। এবারের লক্ষ্য কক্সবাজার। আর দেরি নেই। কক্স-বাজার এল বলে! তারপরই সবাইকে যন্ত্রপাতি নিয়ে ছড়িয়ে পড়তে হবে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে।

কিন্তু একি! সহসা কি দেখে চমকে উঠলেন বিপ্লবী তরুণবৃন্দ। পুলিশ! পুলিশ! পুলিশ! জল-পুলিশ ও ব্রিটিশ মিলিটারী বাহিনী তাঁদের ঘিরে ফেলেছে চারিদিক থেকে। কোনরকমেই এই দৃঢ় বেষ্টনী ভেদ করে বাইরে যাবার উপায় নেই।

কিন্তু কি করে এটা সম্ভব হল? কি করে ব্রিটিশ মিলিটারীর পক্ষে জানা সম্ভব হল তাঁদের অবস্থিতির কথা?

নিশ্চয়ই কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে! কে সেই বিংশ শতাব্দীর মিরজাফর?

মেজর মহাবীর সিং ধীলন। পুরস্কার ও খেতাবের লোভে সেই ঘৃণ্য দেশদ্রোহীই সব কিছু ফাঁস করে দিয়েছে ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে। মেজর জেনারেল চ্যাটার্জীর ভাষায়ঃ

'...they were surrounded and captured by the British Indian forces who must have received previously all the necessary information from those who had deserted under the leadership of Maj. M. S. Dhillon to the British.'

[Ibid: P.—46]

এখানেই শেষ নয়, মল্লিকা। এবার শোন সাবমেরিনযোগে আগত মুক্তি-যোদ্ধাদের কথা।

সবার আগে এম. এ. কাদের, এস. এ. আনন্দম প্রমুখ পাঁচজনের একটি দল এসে অবতরণ করলেন কালিকটের উপকূলে।

অন্যদলে রইলেন বেতার-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ বাঙালী তরুণ সত্যেন বর্ধন ও আরো চারজন। তাঁদের লক্ষ্য—কাথিয়াবাড়ের উপকূল।

দিগন্ত-বিস্তৃত আরব সাগর। অবিরাম ঢেউ গড়ছে আর ভাঙছে। অবিরাম ঢেউ ভাঙার শব্দ চলছে। যেন শেষ নেই এই ভাঙা-গড়া মিছিলের।

সহসা সেদিন একটা সাবমেরিনের পেরিস্কোপ আস্তে আস্তে মাথা তুলে দাঁড়াল জলের ওপর। তারপর গোটা সাবমেরিনটাই।

না, কাছে-কিনারে শত্রুপক্ষের কেউ নেই। সামান্য একটা জেলেডিঙি পর্যন্ত কোথাও নজরে পড়ে না। এই তো সুযোগ। এবার তোমরা রবারের ডিঙিতে চেপে নির্ভয়ে এগিয়ে যাও উপকূলের দিকে। মাত্র পাঁচ মাইল দূরত্ব। আশা করি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তোমরা পৌঁছে যেতে পারবে। কামনা করি, তোমাদের যাত্রাপথ শুভ হোক।

যাত্রাপথ কিন্তু মোটেই শুভ হয়নি, মল্লিকা। সে-কথাই তোমাকে এখন বলব।

বেতার ট্রান্সমিটারসহ রবারের ডিঙি করে পাঁচজন ক্রমশ এগিয়ে চললেন উপকূলভাগের দিকে।

চোখে দিগন্ত-সীমার মতো উন্মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি। বুকে দুর্বার সাহস। আমরা স্বাধীনতার সৈনিক। এগিয়ে চলাই আমাদের সহজাত ধর্ম। এগিয়ে আমরা যাবই। কেউ পারবে না আমাদের গতিরোধ করতে। কেউ না।

ততক্ষণে সাবমেরিনটা আবার তলিয়ে গেছে জলের নিচে। শুধু সমুদ্রের বুকে খানিকটা ভাসমান তেল ছাড়া আর কোন কিছুর চিহ্নও নজরে পড়ে না।

দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা। তারপর রাত্রি।

উত্তাল ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করতে করতে আস্তে আস্তে রবারের ডিঙিটা এগিয়ে চলেছে তীরের দিকে। আর বিশেষ বাকি নেই। মাইল খানেক মাত্র।

দেখতে দেখতে একসময়ে আকাশটা কালো হয়ে উঠল মেঘে মেঘে। শুরু হল ঠাণ্ডা হাওয়া।

শঙ্কায় শুকনো হয়ে উঠল সত্যেন বর্ধনের মুখ। গতিক সুবিধের নয়। সমুদ্র আজ সারাদিন ধরেই অশান্ত। বাতাসও ক্ষেপে উঠেছে। মনে হয় শীগগিরই কড় রকমের ঝড় উঠবে। মেঘের কুণ্ডলীতে যেন তারই আভাস।

অনুমান মিথ্যে হল না। সহসা ঈশান কোণ থেকে বাতাস ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল উন্মত্তের মতো।

সঙ্গে সঙ্গে উদ্দাম উচ্ছল সমুদ্রের সে কি বিচিত্র রূপ! সে কি তার নাচের ঘটা!

বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, উৎক্ষিপ্ত দু-বাহু আকাশে তুলে দুরন্ত আক্রোশে মুহুর্মুহুঃ সে আঘাত করতে লাগল রবারের পাতলা নৌকোটার

গায়ে। যেন নিজরাজ্যে অনধিকার প্রবেশকারী এই তুচ্ছ প্রাণী কটাকে অতল সমাধিতে না-পাঠানো পর্যন্ত কিছুতেই শান্তি নেই তার।

ঝড়ের সঙ্গে প্রাণপণে লড়াই চালিয়ে এগিয়ে চলেছেন ওঁরা পাঁচজন।

কিন্তু কোথায় উপকূল! উপকূলের চিহ্নও নজরে পড়ে না কোথাও। প্রচণ্ড ঝড়ের ঝাপ্‌টায় রবারের ডিঙিটা যে তখন আপন খেয়ালে কোথায়, কোন্ অনির্দেশের পথে ছুটে চলেছে, কে জানে!

এমনি করে সারারাত। কথা ছিল রাত্রির প্রথম ভাগেই তীরে অবতরণ করবেন, কিন্তু সব কিছুই ওলটপালট হয়ে গেল ঝড়ের জন্য। ফলে, মাত্র পাঁচ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে তাঁদের সময় লেগে গেল দীর্ঘ একুশ ঘণ্টা।

ওদিকে ততক্ষণে অন্ধকার কেটে গিয়ে পূব আকাশ ফর্সা হয়ে উঠেছে। রাস্তায় লোক-চলাচল শুরু হয়েছে একটি-দুটি করে। এ অবস্থায় কিছু একটা বিপদ ঘটে যাওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

আশঙ্কা মিথ্যে হল না।

সহসা কি দেখে থমকে দাঁড়াল স্থানীয় একজন গ্রাম্য লোক। চোখে-মুখে তার অধীর কৌতূহল। বাঃ! কি সুন্দর ডিঙিটা!

কিন্তু একি! এ তো কাঠের তৈরি ডিঙি নয়! এ যে রবারের! আমাদের দেশে তো এ জিনিসের কোন প্রচলন নেই!

তাহলে এ ডিঙি কোথা থেকে এল! ওরা কারা! এলই বা কোথা থেকে!

এক কান থেকে অন্য কান। তারপর গোটা গাঁ জুড়ে সেই একই আলোচনা। ওরা কারা! রবারের ডিঙি করে এল্লই বা কোথা থেকে!

শেষ পর্যন্ত স্থানীয় থানাতে। রবারের ডিঙি করে কারা এসেছে গো বাবু! ওরা কারা?

সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ বাহিনী ছুটে এল ঝড়ের বেগে। কই? কোথায় ওরা?

অবশ্য এমনি সতর্ক নির্দেশ ওপর থেকে আগেই এসে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এখানেই যে তাদের সাক্ষাৎ মিলবে, তা কে জানত!

সত্যেনের তখন একমাত্র চেষ্টা সবাইকে নিয়ে জনতার মধ্যে মিশে যাওয়া। কিন্তু সব বৃথা। যাদের মুক্তির জন্য তাঁদের এই মরণপণ সংগ্রাম, সেই গ্রামবাসীরাই তাঁদের শেষ পর্যন্ত ধরিয়ে দিল পুলিশের হাতে।

প্রথম দলে আগত এম. এ. কাদের, এস. এ. আনন্দম প্রমুখও রেহাই পেলেন না। তাঁরাও একদিন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেলেন আকস্মিকভাবে।

আর ধরা পড়লেন ফৌজ সিং এবং সেই সঙ্গে আরো কয়েকজন। বিভিন্ন দলে তাঁরা এসেছিলেন চট্টগ্রাম এবং আসামের মধ্য দিয়ে হাঁটা-পথে।

সবাইকে নিয়ে যাওয়া হল মাদ্রাজ ফোর্টে। এবার বিচার। অপরাধ— সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা।

৮ই মার্চ, ১৯৪৩ সাল। বিচার শুরু হল সবার অগোচরে, অতি সন্তর্পণে।

সাবধান, ভারতবাসী যেন ঘুণাক্ষরেও এ খবর জানতে না পারে। আগস্ট-আন্দোলনের আগুন তখনো জ্বলছে এখানে-ওখানে। এ অবস্থায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই কর্মতৎপরতার খবর একবার তাদের কানে গেলে আর রক্ষে নেই।

রায় দেওয়া হল ১লা এপ্রিল। সত্যেন বর্ধন, আবদুল কাদের, আনন্দম্ ও ফৌজ সিং—এই চারজনকে দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড। আপীলে বাকি এক-জনকে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে দেওয়া হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

বন্দীরা নির্বিকার। গানে গল্পে আনন্দে উচ্ছ্বাসে সর্বক্ষণই তাঁরা ভর-পুর। যেন মৃত্যু তাঁদের কাছে একটা খেলামাত্র।

মাদ্রাজ ফোর্টের কনডেমণ্ড্ সেল থেকেই মৃত্যুপথযাত্রী সত্যেন একদিন চিঠি লিখে পাঠালেন তাঁর দাদাকে :

'...স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দেওয়া বাঙালীর পক্ষে নতুন কিছু নয়। আমি গর্বিত যে, ভগবান আমাকে সেই সুযোগ দিয়েছেন।'

সত্যেন আগে ছিলেন মালয়ের ডাক ও তার বিভাগের কর্মী। কিন্তু এ ডাক যে একবার শুনেছে, সাড়া যে তাকে দিতেই হবে।

সত্যেনের বেলাও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাই সব কিছু ত্যাগ করে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মাতৃভূমির মুক্তি-সংগ্রামে। সেখান থেকে ট্রেনিংয়ের জন্য পেনাং-এ।

সেখানেই পরিচয় ঘটেছিল আবদুল কাদের, ফৌজ সিং প্রমুখ সহকর্মী-দের সঙ্গে। এ অভিযানে সবাই তাঁরা অংশীদার।

ফাঁসির দিন ধার্য হল ১৯শে সেপ্টেম্বর। সবাইকে সে-কথা জানিয়ে দেওয়া হল যথাসময়ে।

বন্দীরা তেমনি নির্বিকার। দিক না ওরা ফাঁসি! সময় হলেই দিব্যি চলে যাব। ব্যস, ফুরিয়ে গেল!

সন্ধ্যার পর থেকেই সেদিন শুরু হল জলসা।

শুধু গান—গান আর গান! কখনো আবৃত্তি। মাঝে মাঝে সুউচ্চ কণ্ঠে ভাষণ। সব কথা আজ শুনিয়ে যেতে হবে দেশবাসীকে। বলে যেতে হবে যে, সংগ্রাম আসন্ন। স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম। তোমরা সবাই প্রস্তুত হও।

দেখতে দেখতে একসময়ে ফর্সা হয়ে এল পুব আকাশটা। ভেসে এল দূরাগত মিলিটারী বুটের ভারী শব্দ—গট্ গট্—গট্ গট্—গট্ গট্...

ক্রমশঃ শব্দটা এগিয়ে এল আরো কাছে। প্রস্তুত হও। এবার যেতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল সবার প্রাণোচ্ছল কণ্ঠ—হ্যাঁ, আমরা প্রস্তুত। আমরা আজাদী সৈনিক। মৃত্যুকে আমরা কোনদিনও ভয় পাই নে। চল

কোথায় যেতে হবে! বল ভাই সব—ইনক্লাব জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ!

আজাদ হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ!

গট্ গট্—গট্ গট্—গট্ গট্...আস্তে আস্তে আবার একসময়ে বুটের শব্দ মিলিয়ে গেল একটু একটু করে। তখনও দূর থেকে ভেসে আসা স্বরে শোনা যেতে লাগল সেই মাতৃবন্দনা—আজাদ হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ!

তারপরই সব স্থির। সব শান্ত। কোথাও আর কোন সাড়া-শব্দ নেই।

সব যেমন ছিল, তেমনই রয়েছে। কোথাও কোন পরিবর্তন নেই। সব ঠিক থাকবে। সবই চলবে সংসারের অপরিবর্তনীয় নিয়মের নির্দেশে।

শুধু পাখির কলরব শান্ত হয়ে গেছে। সে কলকণ্ঠ তখন একেবারে স্তব্ধ।

সত্যেন বর্ধন, আবদুল কাদের, আনন্দম্, ফৌজ সিং—সবাই চলে গেলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামে নিজে কর্তব্য সুসম্পন্ন করে।

আর মেজর এম. এস. ধীলন! সেই ঘৃণ্য দেশদ্রোহীর কি হল?

না, ইংরেজ সরকার বেইমান নয়। তাই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার হিসেবে 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সভ্য'—এই খেতাব তারা তাকে দিয়েছিল যথাযথভাবেই। মেজর জেনারেল শাহনওয়াজের ভাষায়:

'On arrival at the front, however, a very prominent member of the party and a close and a trusted friend of Gen. Mohan Singh betrayed the rest of the party by communicating with the British Forces and going over to them. on arrival in India, this officer is said to have conccctcd hair-raising stories about his heroic escape from Singapore. He also brought away with him some very secret I. N. A. documents and records, and he was rewarded for his treachery to his comrades and country by being awarded the much-coveted honour of being made a Member of the British Empire.' [My Memories of I. N. A. & Its Netaji: Maj. Gen. Shahnawaz Khan: P.—49]

শুধু ব্রিটিশ সরকার নয়, পরবর্তী কালে আমাদের দেশের স্বাধীন সরকারও এই মানুষটিকে তার অপূর্ব প্রভুভক্তির জন্য যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে এতটুকুও ভুল করেননি, মল্লিকা। কারণ, ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ! এ দেশে শত্রু-মিত্র, ভণ্ড-বেইমান সবার সমান অধিকার। সুতরাং, কোনদিক থেকেই আপত্তির কোন কারণ ঘটেনি।

আপত্তি শুধু আই. এন. এ.-কে স্বীকৃতি দেবার বেলায়।

কারণ? কারণ, তারা সুভাষ বোসের নেতৃত্বে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। বুকের রক্তে ইম্ফলের মাটি ভিজিয়ে দিয়েছিল।

সেই সুভাষ বোস, যাঁকে গান্ধী-বিরোধিতার জন্য বহিষ্কার করা হয়েছিল কংগ্রেস থেকে। সুতরাং, তাঁর আই. এন. এ.-কে স্বীকৃতি দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

ভাবতে গেলে সত্যিই অবাক লাগে মল্লিকা। স্বাধীনতা-সংগ্রামে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, তাঁরা সবাই আমাদের সমান শ্রদ্ধার পাত্র, এই তো আমরা জেনে এসেছি বরাবর।

আশ্চর্য, তাই নিয়ে আজ পর্যন্ত দলবাজির আর অন্ত নেই।

অমুক আমাদের শহীদ, সুতরাং সে কুলীন ব্রাহ্মণ। আর অমুক! উহুঃ, সে আমাদের পার্টির কেউ নয়। সুতরাং, শহীদ-কুলে সে পতিত।

ছোট্ট একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসের কথা। ঠিক হল, মজঃফরপুরবাসীদের উদ্যোগে সেখানে শহীদ ক্ষুদিরামের একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা হবে।

কিন্তু ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন কে?

ক্ষুদিরাম ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ-উৎসর্গকারী বাংলাদেশের প্রথম শহীদ। তেমন উপযুক্ত লোক না হলে সেখানে চলবে কেন?

ঠিক হল, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন—জওহরলাল। ভারতের প্রধান-মন্ত্রী—সংগ্রামী পুরুষ জওহরলাল।

আশ্চর্য, আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন জওহরলাল। কারণ, দেশের মুক্তির জন্য ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ দিলেও ক্ষুদিরাম কংগ্রেসের অহিংস নীতিতে আস্থাবান ছিলেন না। সুতরাং, ক্ষুদিরামের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

কি লজ্জা! কি লজ্জা! কিন্তু লজ্জাটা কার, বলতে পারো মল্লিকা? ক্ষুদিরামের, না আমাদের?

এরপরেও কি মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ ক্ষুদিরামের নাম উচ্চারণ করার মতো কোন অধিকার আমাদের থাকা উচিত?

তবে জওহরলালকে এজন্য কোন দোষ দেওয়া চলে না, মল্লিকা। কারণ, নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি আর বিপ্লববাদ এক নয়।

প্রথমটাতে হাততালি আর ফুলের মালা, দুই-ই জোটে। কিন্তু পরেরটাতে হয় ফাঁসি, নয়তো দ্বীপান্তর, এর মাঝামাঝি কোন কথা নেই।

জওহরলালকে কোনদিনই সে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি। সুতরাং, কতবড় প্রচণ্ড মনের জোর থাকলে যে মানুষ স্বেচ্ছায় হাসতে হাসতে নিজের হাতে ফাঁসির রজ্জু ধারণ করতে পারে, সে অনুভূতি তাঁর না থাকাটাই স্বাভাবিক।

দোষ স্মৃতি-রক্ষা কমিটির। কেন তাঁরা সেদিন আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিলেন জওহরলালকে? বাংলাদেশে আজও হেমচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ যাদুগোপাল

প্রমুখ মহাবিপ্লবীগণ বেঁচে রয়েছেন। তাঁরাই কি ক্ষুদিরামের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী নন?

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

'মৃত্যুঞ্জয় যাঁহাদের প্রাণ,
সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে, দীপ যাঁরা জ্বালে অনির্বাণ ;
তাঁদের মাঝে যেন হয়
তোমাদের নিত্য পরিচয়।
তাঁহাদের খর্ব করো যদি,
খর্বতার অপমানে বন্দী হয়ে রবে নিরবধি।'

কবিগুরুর এই কথাগুলোকে সত্যিই কি আমরা মন-প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছি, মল্লিকা?

আজ যাঁরা সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে চলে গেছেন, সত্যিই কি তাঁদের সম্বন্ধে এতটুকুও শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করেন আমাদের রাষ্ট্র-নায়কগণ?

এ প্রসঙ্গে প্রবীণ বিপ্লবী নায়ক শ্রদ্ধেয় প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী বড় দুঃখের সঙ্গে কি বলেছেন, শোন :

'খাদি-কর্মীদের মধ্যে আমি প্রায় সকলেরই দেখেছি যে, অতীতের বিপ্লবী-যুগের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের সম্পর্কে একটা অহেতুক ঘৃণা ও বিদ্বেষ বা মানসিক তাচ্ছিল্যবোধ আছে। ভূতপূর্ব পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী নেহরুজী, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ ও শ্রীপ্রফুল্ল সেন এবং আরো অনেক তথাকথিত গান্ধীবাদী নেতাদের মধ্যেই আমি এই মানসিক দৈন্যের ভাব লক্ষ্য করেছি।

তাঁরা প্রকাশ্য বক্তৃতায় ঐসব বিপ্লবী-যুগের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রশংসায় মুখর হলেও ব্যক্তিগতভাবে যখন তাঁরা কথাবার্তা বলেন, তখন তাঁদের মনের আসল স্বরূপটি ফুটে বেরুতে আমি অনেকের মধ্যেই দেখেছি।

...সেইজন্যই নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজও কংগ্রেসের ও বর্তমানের ক্ষমতায় আসীন কংগ্রেস নেতাদের কাছে অপাংক্তেয় হয়ে আছেন। কার্যকালে নেতাজীর জনপ্রিয়তাকে কংগ্রেস নেতাদের অভীষ্ট সিদ্ধির কাজে লাগানোর জন্য প্রকাশ্য জনসভায় তাঁরা নেতাজীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় 'পঞ্চমুখ' হন এবং তাঁদের ভাষণ শেষ করেন 'জয় হিন্দ্' ধ্বনি দিয়ে, কিন্তু সেই 'জয় হিন্দ্' ধ্বনির উদ্‌গাতা নেতাজীকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর স্বাধীনতা-সংগ্রামের স্বীকৃতি দিতে কার্পণ্য বোধ করেন।' [পাক-ভারতের রূপরেখা : সাপ্তাহিক বসুমতী : ৩০শে নভেম্বর, ১৯৬৭ সাল]

যাক্, দলবাজির কচকচি ছেড়ে চল আমরা আগেকার সেই প্রসঙ্গে ফিরে যাই মল্লিকা।

মোট চারজনকে সেদিন প্রাণ দিতে হল ফাঁসিমঞ্চে। সত্যেন বর্ধন, আনন্দমূ, আবদুল কাদের আর ফৌজ সিং। কারণ, বিশ্বাসঘাতকতা।

কিন্তু একটা প্রশ্ন। লোক হিসেবে মহাবীর সিং ধীলন যে রীতিমত সন্দেহজনক, সে-খবর কি সেদিন তাঁদের অজানা ছিল?

এ প্রসঙ্গে মেজর জেনারেল চ্যাটার্জীর কি বক্তব্য শোনা যাক্ :

'Towards the end of the Conference in Bangkok, a big dinner was given in honour of the delegates attending the Indian Independence Conference.

I was sitting at one of the tables and overheard a confidential conversation between to high-ranking officers, both of whom tried to sabotage the Movement, and one of whom has been actually reinstated in the British Indian Army.

This was Major Mahabir Singh Dhillon, who was then acting as the Quarter-master General of the Supreme Command of the I. N. A. I reported the matter later to Rash Behari Bose.' [India's Struggle for Freedom : P.—23]

দেখা যাচ্ছে, জুন মাসে অনুষ্ঠিত ব্যাঙ্কক সম্মেলন থেকেই মেজর সাহেবের আসল চেহারাটা ধরা পড়েছিল শ্রীযুক্ত চ্যাটার্জীর কাছে। সভাপতি রাসবিহারীর কাছে সে-কথা তিনি রিপোর্টও করেছিলেন যথাযথভাবে। তাহলে জেনে-শুনে সেই মানুষটিকে আবার পাঠানো হল কেন এতবড় একটা কাজের দায়িত্ব দিয়ে?

তবে কি রাসবিহারী এ সম্বন্ধে কোনরকম সতর্ক করে দেননি মোহন সিংকে?

দিয়েছিলেন বৈকি। কিন্তু তাঁর সেই সতর্কবাণী কোন কাজেই আসেনি। 'The G. O. C. did not care to receive instruction from the President.' [Rash Behari Bose—His Struggle for India's Independence : P.—564]

কিন্তু কেন?

সে-কথা পরে আসছে। আগে এ প্রসঙ্গ শেষ করে নিই, তারপর সব কিছুই তোমাকে খুলে বলব এক এক করে।

মোট চারজন প্রাণ দিলেন ফাঁসিমঞ্চে। শুধু কি এই চারজনই?

গত বিশ্বযুদ্ধে এমনি কতজনকে যে ফাঁসির রজ্জুতে প্রাণ দিতে হয়েছিল, কে তার হিসেব রাখে!

এসব খবর কেউ সেদিন জানতে পারেনি। জানানোও হয়নি কাউকে। সব কিছুই করা হয়েছিল গোপনে, সবার অগোচরে।

জানানো হয়েছিল অনেক পরে—যুদ্ধের শেষে।

তাও বিস্তৃতভাবে কিছু নয়। শুধু সংখ্যাটাই প্রকাশ করা হয়েছিল সরকারীভাবে।

যেমন. চতুর্থ মাদ্রাজ উপকূল-রক্ষীবাহিনীর বিদ্রোহের ঘটনা।

আশ্চর্য, কেউ সেদিন জানতে পারেনি যে, এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে ভেতরে ভেতরে।

জানা গিয়েছিল তিন বছর বাদে, ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে।

এক প্রশ্নোত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে সমর-বিভাগের সেক্রেটারী সেদিন কেন্দ্রীয় পরিষদে স্বীকার করেছিলেন যে—হ্যাঁ, এমনি একটা ঘটনা ঘটেছিল বৈকি।

এবার সে কাহিনীই তোমাকে আমি বলব, মল্লিকা।

১৯৪৩ সাল। ভারতের দিকে দিকে সেদিন নতুন দিনের সঙ্কেত। সুদূর বার্লিন থেকে সুভাষ ডাক পাঠিয়েছেন সংগ্রামী জনগণের কাছে। সংগ্রাম আসন্ন। সবাই প্রস্তুত হও। দিন আগত ঐ।

উপকূল-রক্ষীবাহিনীর বাঙালী তরুণবৃন্দও সে আহ্বান শুনেছেন। শুনেছেন বিভিন্নভাবে। বিভিন্ন তারিখে।

'Countrymen, when the British Empire is disappearing, the day of India's deliverance approaches. I want to remind you that in the year 1857 began India's first war of Independence. In May, 1942 has begun her last war of Independence. Gird up your loins. The hour of India's salvation is at hand.'

শুনেছেন নিজের হাতে গড়া সেনাবাহিনীর উদ্দেশে সুভাষের সেই উদাত্ত আহ্বান :

'Brave soldiers! Today you have taken an oath that you will give fight to the enemy till the last breath of your life under the National Tricolour. From today you are the soldiers of the Indian National Army of Free India. You have volunteered to shoulder the responsibility of forty crores of Indians. From today your mind, might and money, belong to the Indian Nation.

Oh Friends! You have the honour to be the pioneer soldiers of Azad Hind Fauj. Your names will be written in golden letters in the history of Free India.'

আর এক প্রান্ত থেকে শুনেছেন মহানায়ক রাসবিহারী বসুর সংগ্রামের ডাক :

'Independence India must have. Because her independence is essential for the regeneration of the whole world. It is not the end in itself, but it is a means to an end and that end is the destruction of imperialism and militarism and the creation of a better world for all to live in.'

শুনে শুনে ক্রমশ চঞ্চল হয়ে উঠলেন উপকূল-বাহিনীর স্বাধীনতাকামী তরুণবৃন্দ।

সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক্। সামনে দুরন্ত সংগ্রামের দিন। কেউ আমরা পিছিয়ে থাকব না আসন্ন সেই সংগ্রামের দিনে। সবাই প্রস্তুত হও।

হঠাৎ সেদিন (১৮ই এপ্রিল) বাস্তবের রূঢ় স্পর্শ নেমে এল আকস্মিক-ভাবে।

কি যে হল কিছুই বোঝা গেল না, কিছুই জানা গেল না। শুধু অস্পষ্ট, ভাসা-ভাসা ভাবে শোনা গেল, বেশ কিছু-সংখ্যক বাঙালী তরুণকে নাকি গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মানকুমার বসু-ঠাকুর তাঁদের অন্যতম।

মানকুমার বসু-ঠাকুর!

রক্ষীবাহিনী অবাক। এ যে অবিশ্বাস্য কথা! কারণ, এমন মেধাবী তরুণ উপকূল-রক্ষীবাহিনীতে সত্যিই বিরল। মোট তেরো বার তিনি পরীক্ষা দিয়েছিলেন সামরিক ব্যাপারে। আশ্চর্য, প্রতিবারই প্রথম।

তাঁকে কেন গ্রেপ্তার করা হল এভাবে? কি তাঁর অপরাধ?

অপরাধ, মহামান্য ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রচেষ্টা।

আসামী সংখ্যায় মোট বারো জন। মানকুমার বসু-ঠাকুর, দুর্গাদাস রায়চৌধুরী, নন্দকুমার দে, চিত্তরঞ্জন মুখার্জী, ফণিভূষণ চক্রবর্তী, নিরঞ্জন বড়ুয়া, সুনীল মুখার্জী, কালীপদ আইচ, নীরেন মুখার্জী, আবদুল রহমান, আর. এন. ঘোষ এবং এ. কে. দে.।

৬ই জুলাই শুরু হল বিচার।

প্রকাশ্য আদালতে নয়, বাঙ্গালোরের সেণ্ট এনড্রুজ চার্চে অনুষ্ঠিত সামরিক আদালতে। সবার অলক্ষ্যে। অতি সঙ্গোপনে।

পরবর্তী কালে পবিত্র রায়, অমর সিং গীল, হরিদাস মিত্র ও যতীশ বসুর বেলায়ও তাই হয়েছিল, মল্লিকা। তাঁদের জন্য আদালত বসানো হয়েছিল ক্যামাক স্ট্রীটের একটা বাড়িতে। সে-কথা পরে আসবে।

রায় দেওয়া হল ৫ই আগস্ট। যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল, তা-ই হল। প্রথমোক্ত ন'জনকে দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড। আবদুল রহমান ও আর. এন. ঘোষকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। এ. কে. দে-র সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ সাল।

ফাঁসিমঞ্চ প্রস্তুত। পরাধীন দেশে দেশপ্রেমের একমাত্র শাস্তি—মৃত্যু। সেই দেশপ্রেমের অপরাধে এবার তাঁদের হত্যা করা হবে ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলিয়ে।

বন্দীরা নির্বিকার। একে অন্যকে আলিঙ্গন করে একসঙ্গে সবাই মিলে তাঁরা সুর তুললেন—বন্দেমাতরম্! বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক! আজাদ হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ! নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জিন্দাবাদ!

চোখের পলকে শেষ হয়ে গেল ন'টি বিপ্লবী তরুণের জীবন-নাট্য। কাউকে সে খবর জানতে দেওয়া হল না। এমন কি সংবাদপত্রগুলিকে পর্যন্ত নয়।

জানানো হল পুরো তিন বছর বাদে, ১৯৪৬ সালের ১৮ই মার্চ, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে।

সামরিক পত্র থেকেই তার বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি:

'১৮ই মার্চ—অদ্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তরে স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যার জন থর্ন জানান যে, গত যুদ্ধের সময় শত্রু-গুপ্তচর অর্ডিন্যান্সে মাদ্রাজ, দিল্লী ও কলকাতায় ৪২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ইহাদের মধ্যে ২৭ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ, ১ জনের ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয় এবং বাকি ১৪ জন মুক্তি পায়। ২৭ জন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে ১৪ জনের মৃত্যুদণ্ড রহিত করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয় এবং বাকি ১৩ জনের ফাঁসি হয়।'

খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল গোটা ভারতবর্ষ।

আশ্চর্য, সবার অলক্ষ্যে এতগুলো তরুণকে ফাঁসি দেওয়া হল, অথচ এতদিনের মধ্যেও সে-খবর কাউকেও জানতে দেওয়া হল না! এ বিশ্বাস করাও শক্ত!

এ প্রসঙ্গে সরকারের অবিমৃষ্যকারিতাকে ধিক্কার দিয়ে সেদিন বাংলা সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকীয় কলমে কি লেখা হয়েছিল, শোন:

'যুদ্ধের সময় মাদ্রাজের কেল্লায় ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর নয়জন সৈনিক জমাদার মানকুমার বসু-ঠাকুর, এন. কে. দে, হাবিলদার ডি. ডি. রায়-চৌধুরী, হাবিলদার এস. কে. মুখার্জী, হাবিলদার এন. বড়ুয়া, নায়ক পি. চক্রবর্তী, নায়েক সি. মুখার্জী, গানার কে. পি. আইচ ইঁহাদিগকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে।

আর গানার আবদুল রহমান, গানার আর. এন. ঘোষ ইঁহাদিগকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে এবং গানার এ. কে. দে-কে সাত বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে বলিয়া নয়াদিল্লী হইতে প্রাপ্ত একটি সংবাদে জানা গিয়াছে।

ইঁহারা সকলেই তরুণ। ইঁহাদের বয়স ১৭ বৎসর হইতে ২৪ বৎসরের মধ্যে। প্রকাশিত নামের তালিকা হইতে ইহাও মনে হয়, ইঁহারা সকলেই বাঙালী।

শোনা যায়, সামরিক আদালতে সরাসরি বিচারের দ্বারাই ইঁহাদের প্রতি দণ্ড বিধান করা হয়।

বলা বাহুল্য, বাহির হইতে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ইঁহাদিগকে কোনরূপ সুযোগ প্রদান করা হয় নাই।

এই মামলা সম্পর্কে ইঁহাদের আত্মীয়-স্বজনেরাও যে ইঁহাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিবার কোন সুবিধা পাইয়াছিলেন, তাহাও মনে হয় না। সুতরাং লোকচক্ষুর অন্তরালে কারাকক্ষের মধ্যেই সব কিছু সমাধা হইয়াছে।

ইঁহারা কি অপরাধ করিয়াছিলেন নিশ্চিতভাবে জানিবার উপায় নাই; তবে সংবাদ পাঠ করিয়া মনে হয়, পরাধীন দেশে যাহা সর্বাপেক্ষা দণ্ডনীয়

অপরাধ, সম্ভবত সেই শ্রেণীরই ছিল। কারণ, সংবাদে দেখিতে পাই ফাঁসির রজ্জু গলায় পরিবার আগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত যুবকেরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করেন এবং জাতীয় সংগীত গান করিতে করিতে ফাঁসিমঞ্চে গিয়া দাঁড়ান।

এতগুলি বাঙালী যুবকের অকালমৃত্যুর এই সংবাদ এমন আকস্মিক-ভাবে পাইয়া বাঙালী সমাজ স্তম্ভিত এবং ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছে ; ভিতরের ব্যাপার গোপন থাকাতে এই বেদনা সমধিক প্রগাঢ় আকার ধারণ করিয়াছে।

কারা-প্রাকারের অন্তরালে এই যে সব ব্যাপার ঘটিয়াছে, এগুলি গোপন রাখিবার জন্য সরকারের আগ্রহের কারণ কি থাকিতে পারে, আমরা বুঝি না ; অথচ আমরা অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহাদের এমন একটা আগ্রহের পরিচয় পাইতেছি।

...কারাগারের গোপন কক্ষে ভারতের স্বদেশ-প্রেমিক সন্তানদের বন্ধন, পীড়নের পরিসমাপ্তি ঘটাইতে ভারতবাসীরা কৃতসংকল্প হইয়াছে ; আমলা-তন্ত্র যদি এ সত্য এখনও উপলব্ধি না করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা নিজেদের অনর্থ নিজেরাই ডাকিয়া আনিবেন। মানব ধর্মের অগ্নিময় বেদনাকে আর এদেশে কারচুপির দ্বারা প্রশমিত করা চলিবে না।'

[সাপ্তাহিক দেশ : ৩০শে মার্চ : ১৯৪৬ সাল]

মল্লিকা, ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ। বাইরের লোকে বলে—ভিখারীর দেশ। কারণ, ভিক্ষাবৃত্তিই নাকি আজ আমাদের একমাত্র সম্বল।

সেই ভিক্ষালব্ধ অর্থ থেকেই কোটি কোটি টাকা খরচ করে আজ পৃথিবী জুড়ে ঢাক পেটানো হচ্ছে যে, বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে, সম্পূর্ণ অহিংস পন্থায়ই নাকি আমরা এ 'স্বাধীনতা' অর্জন করেছি।

তাই যদি হয়, তবে বিপ্লবাদের অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী ইতিহাসে এই যে শত শত শহীদের কথা লেখা রয়েছে, এঁরা কারা ?

বিংশ শতাব্দীর দুঃসহ অভিশাপ থেকে দেশকে ভারমুক্ত করার জন্য ঐ যে ইম্ফলের রণাঙ্গনে ওঁদেরই উত্তরপুরুষ, হাজার হাজার স্বাধীনতাকামী তরুণ প্রাণ চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে রয়েছেন—ওঁরাই বা কারা ?

স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে ওঁরা কি বিগত, বিস্মৃত, মৃত কতগুলি ফসিল মাত্র ?

দুই যন্ত্র দুই সুরে বাঁধা থাকলে এক রাগিণীতে আলাপ করা চলে না। প্রমাণ রাসবিহারী আর মোহন সিং।

রাসবিহারী দীর্ঘদিনব্যাপী জাপানবাসী। জাপানীদের সব কিছুই তাঁর নখদর্পণে। সর্বোপরি নিজে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর রাজনীতিবিদ। কি করে যে কূটনীতির সাহায্যে কার্যোদ্ধার করতে হয়, সে সম্বন্ধে তিনি রীতিমত অভিজ্ঞ।

অন্যদিকে মোহন সিং একজন যোদ্ধা মাত্র। কূটনীতি সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই তাঁর নেই।

ফলে, যা হওয়া স্বাভাবিক, তাই হল। দেখতে দেখতেই একদিন বিচ্ছেদের প্রাচীর গড়ে উঠল দুজনের মধ্যে।

অথচ শুরু হয়েছিল চমৎকার।

ব্যাঙ্কক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল জুন মাসে। তারপর শুধু কাজ আর কাজ। স্বাধীনতার স্বপ্নে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি মানুষ তখন উন্মত্ত যেন।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী দেখতে দেখতেই লীগের শাখা গড়ে তোলা হল শহরে-বন্দরে সর্বত্র। সেই সঙ্গে শুরু হল একটানা প্রচারের কাজ।

প্রধান হাতিয়ার সিঙ্গাপুর এবং সাইগন রেডিও। সিঙ্গাপুর রেডিও থেকে লীগের যাবতীয় কার্য পরিচালনার দায়িত্ব তখন মেজর ইর্শাদ আলি সাহেজাদার ওপর। কর্ণেল ইশান কাদির, কর্ণেল নাগর, কর্ণেল হাসান প্রমুখ কয়েকজন নিয়েছেন সাইগন রেডিওর দায়িত্ব।

তাছাড়া সংবাদপত্র। সিঙ্গাপুর থেকে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় প্রচারিত দৈনিক 'আজাদ হিন্দ' পত্রিকা তো তখন বলতে গেলে প্রতিটি ভারতবাসীর হাতে হাতে। সেই সঙ্গে অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা।

সেনাবাহিনীর পরিকল্পনা আপাতত তিনটি। গান্ধী রেজিমেণ্ট, আজাদ রেজিমেণ্ট আর নেহরু রেজিমেণ্ট। সেই সঙ্গে স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপ, ইনটেলিজেন্স গ্রুপ, রি-ইনফোর্সমেণ্ট গ্রুপ, রেজিমেণ্ট অফ ফিল্ড ফোর্স, আর্টিলারী ইউনিট, সাঁজোয়া গাড়ি ইউনিট, এঞ্জিনীয়ারিং ইউনিট, মেডিক্যাল এইড্ পার্টি, বেস্ হাসপাতাল ইত্যাদি।

গড়ে তোলা হল অফিসার্স ট্রেনিং স্কুল। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের জন্য আরো অফিসার দরকার হবে ভবিষ্যতে। এখন থেকেই তাঁদের তৈরি করে নেওয়া প্রয়োজন।

অসামরিক লোকদের ট্রেনিং-এর জন্য বিরাট শিক্ষা-শিবির গড়ে তোলা হল কুয়ালালামপুরে। আর একটি পেনাং-এ।

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ সালে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠিত হল আনুষ্ঠানিকভাবে।

ঠিক হল, বাহিনী পরিচালিত হবে একটি কাউন্সিল অফ অ্যাকশন বা সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশে, যার মধ্যে রয়েছেন মোহন সিং, এন. রাঘবন, কে. পি. মেনন, কিউ. গিলানী প্রমুখ সদস্যবৃন্দ। সবার ওপরে সভাপতি রাসবিহারী বসু স্বয়ং।

ব্রিটিশ র‍্যাঙ্ক পরিত্যাগ করে সবাইকে সেদিন ভূষিত করা হল নতুন মর্যাদায়। সভাপতির আদেশে মোহন সিংকে করা হল—'জেনারেল'। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের জি. ও. সি.।

ক্যাপ্টেন থেকে জেনারেল। সত্যিই দুর্লভ নজীর। কারণ, জেনারেল হতে গেলে তার আগে অনেকগুলো র‍্যাঙ্ক পার হওয়া দরকার। কিন্তু মোহন

সিংয়ের পক্ষে তাও সেদিন সম্ভব হয়েছিল সভাপতি রাসবিহারী বসুর দাক্ষিণ্যে।

যদিও মোহন সিংয়ের চাইতেও অনেক সিনিয়ার অফিসার সেদিন ছিলেন আজাদ হিন্দ্ বাহিনীতে, যেমন—কর্ণেল গীল, কর্ণেল ভোঁসলে, মেজর মেহতাব সিং, মেজর ভগৎ প্রমুখ প্রথম সারির অফিসারবৃন্দ, কিন্তু কেউ সেদিন আপত্তি করেননি এ নিয়ে। কারণ সবারই সেদিন একমাত্র লক্ষ্য ছিল—স্বাধীনতা। সেখানে কে ছোট, কে বড় সে প্রশ্ন অবান্তর।

কিন্তু সেই হল কাল।

মাত্র কয়েকদিন, তারপরই আস্তে আস্তে একদিন দেখা গেল যে, মোহন সিং আর আগেকার সেই মোহন সিং নেই। নিজের অজ্ঞাতেই কখন তিনি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন অত্যধিক ক্ষমতা হাতে পেয়ে।

বিরোধের প্রথম সূত্রপাত মোহন সিংয়ের একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে।

হঠাৎ একদিন জানা গেল, তিনি নাকি জাপানী কর্ণেল ইয়াকুরোর ইচ্ছানুসারে বর্মায় একদল সৈন্য পাঠিয়েছেন সংগ্রাম পরিষদকে না জানিয়ে।

খবর শুনে অত্যন্ত ক্ষুন্ন হলেন সভাপতি রাসবিহারী বসু এবং সংগ্রাম পরিষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

জি. ও. সি. হলেও সেনাবাহিনী সম্বন্ধে কোন কিছু সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার মোহন সিংয়ের একার নয়, সংগ্রাম পরিষদের। সেখানে এন. রাঘবন, মেনন, গিলানী প্রমুখ সদস্যবৃন্দ রয়েছেন। সর্বোপরি রয়েছেন পরিষদের সভাপতি রাসবিহারী বসু স্বয়ং।

তাঁদের না জানিয়ে মোহন সিং নিজ দায়িত্বে বর্মায় সৈন্য পাঠাতে গেলেন কোন্ অধিকারে ?

রাসবিহারীর নিজের ভাষায় ঃ

'...In the later part of November, it came to light that Mr. Mohan Singh as G. O. C. of the I. N. A. had arranged with the Iwakura Kikan for the transport of some I. N. A. troops to Burma for the purpose of training. An advance party was sent by the G. O. C. to Rangoon without the consent of the Council of Action. Naturally the Council of Action wished to know about the move in greater detail and was not prepared to sanction movement of troops without its knowledge.

...I regret to have to say that in matters connected with the I. N. A., the G. O. C. arrived at important decisions without reference to the Council of Action. In fact, the Council was kept almost in darkness with regard to various important activities of the I. N. A.—a state of affairs which were tried to rectify.

I thought it was vitally important that the Council of Action should immediately take control of the policy regarding the army and all questions of major importance should be decided by the Council and not by the G. O. C. I had to write to Col. Iwakura to that effect so that no further mistakes would be committed.' [Rash Behari Bose—His Struggle for India's Independence : P.—228]

ভুল স্বীকার করলেন জি. ও. সি. মোহন সিং। কথা দিলেন, ভবিষ্যতে এ ধরনের আর কোন কাজ তিনি করবেন না সংগ্রাম পরিষদকে না জানিয়ে।

'Gen. Mohan Singh could give no satisfactory reply, and apologised for not informing the 'Council of Action' and promised in future to refer such matters to the Council.' [My Memories of I. N. A. & Its Netaji : Maj-Gen. Shahnawaz Khan : P.—51]

তবু কোন সুরাহা হল না। আবার গোলমাল বাধল ব্যাঙ্কক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব নিয়ে।

ব্যাঙ্কক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল জুন মাসে। তারপর কয়েক মাস কেটে গেছে, তবু কোন স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায়নি জাপ-সরকারের কাছ থেকে। যা পাওয়া গেছে, সবই অস্পষ্ট, ভাসা-ভাসা উত্তর।

কেন ওদের এই বেমানান নিঃশব্দতা? না, আর আমরা দেরি করতে রাজী নই। আমরা স্পষ্ট উত্তর চাই।

যথাসময়ে একটি চিঠি পাঠানো হল কর্ণেল ইয়াকুরোর কাছে।

ব্যাঙ্কক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সম্বন্ধে তোমাদের জাপ-সরকারের কি বক্তব্য তা আমরা জানতে চাই। আর আমরা দেরি করতে রাজী নই। হ্যাঁ কিংবা না, যা হয় আমাদের ঝট্‌পট্ বলে দাও।

বোঝাতে চেষ্টা করলেন কর্ণেল ইয়াকুরো। এ চিঠি টোকিও পাঠানোর অর্থই হল দু পক্ষের মধ্যে একটা ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হওয়া। তার চাইতে এটা তোমরা প্রত্যাহার করে নাও। আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি যে কি ব্যাপার।

অই মেনে নিলেন সংগ্রাম পরিষদ। বেশ, তাই হোক। দেখা যাক আর কিছুদিন অপেক্ষা করে।

কিছুদিন চুপচাপ। তারপর আবার সেই একই প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠল নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে। আমরা স্পষ্ট জবাব চাই। নয়তো আমরা আমাদের পথ দেখতে বাধ্য হব।

না। বাধা দিলেন রাসবিহারী, অধৈর্য হয়ো না। অনেক কষ্টে আমরা একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি। এ সময় মাথা গরম করে সব কিছু পণ্ড করে দিও না। অবস্থাটা ভেবে দেখ একবার।

কি আছে আমাদের?

কতটুকু আমাদের শক্তি ?

উপযুক্ত সমর-সম্ভারই বা আমাদের কোথায় ?

ইচ্ছা করলে বর্মা দখলের সঙ্গে সঙ্গে অনায়াসে তারা ঢুকে যেতে পারত ভারতের অভ্যন্তরে। সে শক্তিও তাদের ছিল। তবু তারা তা করেনি। করেনি আমাদের মুখ চেয়েই।

'They can even smash Britain's inadequate defences in India without as much as crossing the borders. But they are holding their hand in the hope that Indians themselves will rise and drive the alien forces out of the country and establish a free India without their intervention.' [Rash Behari Bose—His Struggle for India's Independence : P.—188]

সুতরাং নিশ্চিন্ত থাক যে, জাপান আমাদের সাহায্য করবেই। আমাদের মুখ চেয়ে করবে না, নিজের গরজেই করবে। করতে বাধ্য। না করে যাবে কোথায় ? কারণ, শত্রু আমাদের এক। সে শত্রুকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত তারই বা নিশ্চিন্ত হবার পথ কোথায় ?

সুতরাং ধৈর্য ধরো। এ সময়ে চাই শুধু একটু বুদ্ধি। একটু কূট-নীতি। দেখবে যে, কোন কিছুরই অভাব হবে না। তাছাড়া জাপান এখন বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত। এ সময়ে এত বড় একটা ব্যাপার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে তাদের তো একটু দেরি হবেই। সবাই শান্ত হও। দরকার হলে জাপ-মন্ত্রিসভার সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্যে আমি নিজে টোকিওতে যাব রাঘবনকে নিয়ে। কথা দিলাম।

২৯শে তারিখে আবার চিঠি দেওয়া হল কর্ণেল ইয়াকুরোকে।

আমাদের কথা শেষ। এবার তোমাদের কিছু বক্তব্য থাকলে জানাও। নয়তো এই শেষ।

৪ঠা ডিসেম্বর জেনারেল মোহন সিং, কর্ণেল গিলানী, রাঘবন, মেনন, কর্ণেল এন. এস. গীল প্রমুখ সবাই গিয়ে সিঙ্গাপুরের সী-ভিউ হোটেলে মিলিত হলেন রাসবিহারীর আহ্বানে।

বক্তব্য সেখানে একটাই। জাপানকে পয়লা জানুয়ারির মধ্যে জবাব দিতে হবে। অন্যথায় আমরা সবাই পদত্যাগ করব আই. এন. এ. থেকে।

না। এবারও বাধা দিলেন রাসবিহারী, মনে রেখো, ভাঙা সহজ, কিন্তু গড়া সহজ নয়। আই. এন. এ. ভেঙে দিলে ওদের কিছু এসে-যাবে না, তাতে ক্ষতি হবে আমাদেরই। সুতরাং তোমরা আমাকে জানুয়ারি মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত সময় দাও। কথা দিচ্ছি, তার মধ্যে যাহোক একটা বোঝাপড়া আমি করবই। শুধু এই ক'টা দিন ধৈর্য ধরে থাক।

সবাই সেকথা মেনে নিলেন একবাক্যে। ঠিক আছে, তাই হবে। জানুয়ারি মাস পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব আপনার কথামত।

কিন্তু পরদিনই শোনা গেল অন্য কথা।

না, আমরা অপেক্ষা করে থাকতে পারব না। যা করার ঐ পয়লা জানুয়ারির মধ্যেই করতে হবে। নয়তো আই. এন. এ.-র কোন ব্যাপারে আমরা নেই।

রাসবিহারীর নিজের কথায়ঃ

'On the 4th December, at my request the members of the Council agreed to give me time till the end of January, 1943, to enable me to obtain full and satisfactory assurance from the Japanese Government. I was glad that I was given further time to attempt at a solution of those difficult questions before my colleagues resigned.

The next morning, that is on 5th December, I was surprised, therefore, to hear from Mr. Mohan Singh, Col. Gillani and Sri K. P. K. Menon that notwithstanding the previous day's decision they were not prepared to carry on the movement unless an assurance was immediately given that a reply to Bangkok resolutions in detail would be obtained on or before 1st January, 1943.

As far as I know there was no one in Malay capable of giving such an assurance. Moreover it was ultimatum to the Japanese Government which would have offended them. I then realized that an attempt was being made to obstruct the solving of the questions in issue in order to wreck the movement. This I was not prepared to agree to.' [Ibid: P.—229]

৮ই ডিসেম্বর সব কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটল আকস্মিকভাবে।

হঠাৎ সেদিন কর্ণেল গীল-এর কাছে জাপানী মিলিটারী পুলিশ এসে হাজির। গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধে তোমাকে গ্রেপ্তার করা হল। চলো এবার বন্দী-নিবাসে।

ব্যাপারটা নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পেরেছ, মল্লিকা?

এর মূলে রয়েছে সেই বিশ্বাসঘাতক মেজর মহাবীর সিং ধীলন, যে নাকি সামরিক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারতে এসে শুধু নিজেই আত্মসমর্পণ করেনি, সেই সঙ্গে সহকর্মীদেরও ধরিয়ে দিয়েছিল ব্রিটিশের হাতে।

কে সেদিন ভারতে পাঠানোর জন্য নির্বাচিত করেছিলেন সেই মহাবীর সিং ধীলনকে?

করেছিলেন বন্দী-শিবিরসমূহের ডিরেক্টার এই কর্ণেল গীল। সুতরাং আজ তাঁরও নিস্তার নেই।

ফল হল মারাত্মক। সঙ্গে সঙ্গেই মোহন সিং এবং সংগ্রাম পরিষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ পদত্যাগ-পত্র পাঠিয়ে দিলেন সভাপতি রাসবিহারীর কাছে। গীলের গ্রেপ্তারের ব্যাপারটা আমাদের কাছে মস্ত বড় একটা আঘাত স্বরূপ। সুতরাং আই. এন. এ.-র কোন ব্যাপারে আমরা আর নেই।

তারপরই স্থানীয় জাপানী কর্তৃপক্ষ মেজর ফুজিয়ারার কাছে গিয়ে কৈফিয়ৎ তলব করলেন মোহন সিং।

কেন তোমরা গীলকে গ্রেপ্তার করেছ বল? আমি জানি, গীল একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক। সে যে ব্রিটিশের গুপ্তচর, তার কোন প্রমাণ আছে তোমাদের কাছে?

আছে। অত্যন্ত বিনয় সহকারে জবাব দিলেন মেজর ফুজিয়ারা, আমি দুঃখিত যে, আমাকেই এই অপ্রিয় কাজটা করতে হয়েছে। কিন্তু বিশ্বাস কর যে, এ ব্যাপারে আমি নিরুপায়।

মেজর ফুজিয়ারা প্রদত্ত প্রমাণগুলোর মধ্যে কোন্‌টা যে সত্য, আর কোন্‌টা যে মিথ্যে, সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট অভিমত দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, মল্লিকা। তবে একথা ঠিক যে, কতকগুলি অভিযোগ সত্যিই গুরুতর।

অনেক অভিযোগ। একটার পর একটা। অসংখ্য।

আরো আশ্চর্য যে, এ সম্বন্ধে নির্দেশ এসেছে খোদ টোকিও থেকে। একবার নয়, বার বার। বক্তব্য সেই একই। গীলের ওপর কড়া নজর রাখ।

সেই সঙ্গে টোকিও, সাইগন, ব্যাঙ্কক, পেনাং, বর্মা ইত্যাদি স্থানে থাকাকালীন সময়ে তার সন্দেহজনক কার্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ।

এ সম্বন্ধে তোমাকে আমি বিস্তৃতভাবে বলব আরো পরে। এখন শুধু একটি মাত্র ঘটনার কথাই তুলে ধরেছি তোমার সামনে।

পরবর্তী কালে মালয় থেকে প্রকাশিত 'Chalo Delhi' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে কি বলা হয়েছে শোন:

'On the 18th Nov. 6 British officers landed by parachutes on Pegu and they were arrested. From investigation made after deciphering the British code, the Japanese authorities had come to the conclusion that Col. Gill was a British agent. Those six parachutists confessed that they had three objects: (1) to contact Col. Gill and Major Dhillon; (2) to spread confusion and distrust between the Japanese and the I. N. A.; (3) to find the movements of the Japanese forces.

Under these charges Col. Gill was taken for investigation.' [Chalo Delhi: S. A. Das & K. B. Subbaiah: P.—82]

অর্থাৎ—১৮ই নভেম্বর তারিখে ছ'জন প্যারাসুটবাহী ব্রিটিশ অফিসার ধরা পড়ে জাপানীদের হাতে। সঙ্গে সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিত কিছু গোপনীয়

কাগজপত্র। বিশ্বাসঘাতক মহাবীর সিং ধীলন এবং কর্ণেল গীল—এই দুজনের নামই বিশেষভাবে উল্লেখ করা ছিল সে-সব কাগজপত্রে। বন্দীরা সবাই অপরাধ স্বীকার করেছেন। বলেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল মোট তিনটি : (১) কর্ণেল গীল এবং মেজর ধীলনের সঙ্গে যোগাযোগ করা ; (২) আই. এন. এ. এবং জাপানীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা ; (৩) জাপানী সৈন্য চলাচল এবং সামরিক তথ্য সংগ্রহ করা।

শুরু হল নানাবিধ অপপ্রচার। শুধু জাপানের বিরুদ্ধে নয়, রাসবিহারীর বিরুদ্ধেও। রাসবিহারী জাপানীদের puppet, অর্থাৎ হাতের পুতুল। দীর্ঘদিন জাপানে বসবাস করার দরুন নিজেও তিনি একজন জাপানী হয়ে গেছেন। সুতরাং ভারত সম্বন্ধে তাঁর আনুগত্য সন্দেহের অতীত নয়।

পরিস্থিতি লক্ষ্য করে সবার উদ্দেশে এক মর্মস্পর্শী আবেদন করলেন রাসবিহারী। ওরা বলছে, আমি জাপানীদের হাতের পুতুল।

বেশ, তা-ই বলতে দাও।

আমি বৃদ্ধ। অসুস্থ। বহুকাল আমি জন্মভূমি থেকে নির্বাসিত। বিশ্বাস কর, স্বাধীনতা অর্জনের পর মাতৃভূমির এক কোণে নিঃশব্দে মৃত্যুবরণ করা ছাড়া আর কোন সাধই আমার নেই। একান্ত অনুরোধ, অহেতুক ভুল বুঝে স্বাধীনতা অর্জনের এই পবিত্র প্রয়াসকে তোমরা ব্যর্থ করে দিও না।

'...If my opponents call me a puppet, let them do so. But let me assure them that they are sinning against a man whose only end, and aim in life is to see his country free, absolutely free and independent, who is as proud of his birthright as any Indian alive, and who has staked his all and who will stake the last drop of his blood in upholding the honour and integrity of Hindustan.

I seek nothing from life except the success of our mission. If once it is accomplished I shall retire into seclusion in some nook or corner of our beautiful Homeland.

The full and complete independence of Hindustan is our objective and let no differences, personal or otherwise, colour or creed, obstruct the issue.' [Chalo-Delhi: P.—12]

এখানেই থামলেন না রাসবিহারী। ১২ই ডিসেম্বর আবার তিনি এক চিঠি লিখে পাঠালেন মোহন সিংয়ের কাছে।

সমস্ত পদস্থ অফিসারসহ তোমরা সবাই একবার এসো আমার কাছে। আমি সব কিছু বুঝিয়ে বলতে চাই তোমাদের।

উত্তর পেলেন পরদিন, ১৩ই ডিসেম্বর। কিন্তু কি সে উত্তর ?

আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য মল্লিকা। রাসবিহারী সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি।

মোহন সিং তারই অন্যতম সদস্য। একজন সদস্য হয়ে প্রতিষ্ঠানের সভাপতিকে তিনি এ চিঠি লিখলেন কি করে?

মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন:

'He wrote a letter to Gen. Mohan Singh and asked him to send some senior officers to meet him at his residence in Singapur so that he could explain the situation to them.

Gen. Mohan Singh, however, sent a very curt reply stating that no officer liked to see him, and Gen. Mohan Singh would allow no one to go and see him.' [P.—55]

অর্থাৎ—চিঠির উত্তরে মোহন সিং রূঢ়ভাবে জানান যে, কোন অফিসারই তাঁর (রাসবিহারী) সঙ্গে দেখা করতে চান না। চাইলেও মোহন সিং কাউকেও তাঁর ওখানে যেতে দেবেন না।

শুধু কি এইটুকুই লিখেছিলেন মোহন সিং?

এই কথাগুলো তাহলে কার?

'...It is apparent from your correspondence that you are not only totally ignorant of anything pertaining to an army but have some foolish and misguided notions about it....

...It is merely written as a courtesy and to avoid future unnecessary instructions by you to the army. Needless to say that, if you still persist in writing anything, it will not be answered.' [Chalo Delhi: P.—90-91]

সোজা কথায়—সেনাবাহিনী সম্বন্ধে তুমি একেবারেই অজ্ঞ এবং তোমার এই ধারণাকে একটা নির্বোধ ধারণা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এবার ভদ্রতা করে চিঠির জবাব দিলাম, কিন্তু ভবিষ্যতে আর কোন চিঠি দিলে জবাব দেওয়া হবে না।

হ্যাঁ, এই উত্তরই সেদিন দেওয়া হয়েছিল বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুকে। দিয়েছিলেন তিনি, যিনি মাত্র তিনমাস আগে তাঁরই অনুগ্রহে সামান্য ক্যাপ্টেন থেকে ভূষিত হয়েছিলেন জেনারেলের মর্যাদায়।

কেটে গেল দু সপ্তাহ, তবু অচল অবস্থা অবসানের কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না।

সভাপতি রাসবিহারীর অভিমত—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংগ্রামী জনগণের একমাত্র প্রতিষ্ঠান 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ'।

শুধু এখন নয়, ১৯২৪ সাল থেকেই এই লীগ সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র। লীগই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংগ্রামী জনগণের অস্থায়ী স্বাধীন সরকার।

ব্যাঙ্কক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী নবগঠিত আজাদ হিন্দ

ফৌজ এই অস্থায়ী স্বাধীন সরকারের একটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ বাহু। একে পরিচালনা করবেন কাউন্সিল অফ অ্যাকশান বা সংগ্রাম পরিষদ। ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশির সেখানে কোন স্থান নেই। তাঁর নিজের ভাষায়ঃ

'In accordance with the resolutions of the Bangkok Conference Indian National Army is a part of the Indian Independence League and every officer and man of the I. N. A. is a member of the Indian Independence League and owes allegiance to the League.

It must be understood that an army is an army of a country and not of an individual; so it was wrong of I. N. A. personnel to give allegiance to an individual, without raising an objection.' [Rash Behari Bose—His Struggle for India's Independence : P.—226]

মোহন সিং তা মানতে রাজী নন। তিনি আজাদ হিন্দ্ ফৌজের জি. ও. সি.। স্বভাবতই সেনাবাহিনীর বেশ কিছু অংশ তাঁর অনুগত। সুতরাং তাঁর অভিমত, তিনিই প্রতিষ্ঠানের সর্বেসর্বা। তাঁর সিদ্ধান্ত সবাই মেনে নিতে বাধ্য, সেখানে সংগ্রাম পরিষদ বা তার সভাপতির মতামতের কোন প্রশ্নই ওঠে না। তার জন্য যদি আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভেঙে দিতে হয় তো তাতেও কোন ক্ষতি নেই, তবু এ ব্যাপারে অন্য কারো অধিকার তিনি মেনে নিতে প্রস্তুত নন।

রাসবিহারীর ভাষায়ঃ

'He wanted to have a free hand in his undertakings, and as such, he would not bear the idea of being interfered with by others in his work, but constitutionally he had to work under the Council of Action.

In order to sweep away this restriction, he intensified his exercise of dictatorial influence over the I. N. A. and infused wrong ideas into the minds of his officers and men that the army belonged to him, and that he was its master.'

[Ibid : P.—231]

এই হল ব্যাপার। এবার দেখা যাক যে, কোন্‌টা সত্য। কোন্‌টা বাস্তব। কোন্‌টা যুক্তিসংগত।

এ সম্বন্ধে সর্বপ্রথম টোকিও সম্মেলনে কি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল শোনঃ

'The Council of Action shall be responsible for the working out of the general policy and in such working out they shall appoint departmental officers for the purpose of administration.'

[Chalo Delhi : S. A. Das & K. B. Subbaiah : P.—16]

তারপর ব্যাঙ্কক সম্মেলন। মোট পঁয়ত্রিশটি প্রস্তাব সেখানে গৃহীত হয়েছিল সেকথা তোমাকে আগেই জানিয়েছি। কাউন্সিল অফ অ্যাকশান সম্বন্ধে সেখানে কি বলা হয়েছিল শোন:

'The Council of Action shall have general superintendence and control over all branches of the Indian Independence League in all territories mentioned in article (vi) and over the Indian National Army.' [Rash Behari Bose—His Struggle for India's Independence : P.—88]

আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে অন্য এক জায়গায়:

'Resolved that the Indian National Army shall be under the direct control of the Council of Action and that the said Army shall be organised and commanded by the General Officer Commanding, Indian National Army in accordance with the directions of the Council of Action.' [Ibid : P. 89]

দেখা যাচ্ছে যে, কাউন্সিল অফ অ্যাকশান বা সংগ্রাম পরিষদই সর্বেসর্বা। জি. ও. সি. সেনাবাহিনী পরিচালনা করবেন একথা সত্যি, কিন্তু সেখানেও কাউন্সিল অফ অ্যাকশানের নির্দেশ ছাড়া স্বাধীনভাবে তাঁর কোন কিছু করবার অধিকার নেই।

তাহলে কেন এই অবাঞ্ছিত পরিবেশের সৃষ্টি, মল্লিকা? এর সদুত্তর কোথায় বলো?

যা আশংকা করা গিয়েছিল, কাজেও তাই হল। ২১শে ডিসেম্বর তারিখে মোহন সিং সেই মারাত্মক নির্দেশ পাঠালেন সেনাবাহিনীর কাছে। দরকার হলে আমি আই. এন. এ. ভেঙে দেব। তোমরা সবাই প্রস্তুত থেকো।

'...A confirmatory order will be sent out as soon as arrangements with the Nipponese are complete. In the event of my being departed from you before such an order is issued, the dissolution will take place automatically and immediately.

Also at the same time the resignation of all the members of the I. N. A. and their release from obligations and undertakings to me and the I. N. A. will be taken for granted...'

[Chalo Delhi : P.—92]

কি করবেন এখন সভাপতি রাসবিহারী?

আই. এন. এ. ভেঙে যাবে, তাই কি তিনি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবেন নির্বাক দর্শকের মতো?

অসম্ভব! আই. এন. এ. যে তাঁর বুকের রক্তে গড়া। দীর্ঘ দিনের

প্রচেষ্টায় তিল তিল করে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তার এতটুকু ক্ষতি তিনি সইবেন কি করে!

তাছাড়া আই. এন. এ. কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, জাতীয় সম্পত্তি। তাকে ভেঙে দেবার অধিকার কারোরই নেই। তাঁর নিজেরও না। সুতরাং, তেমন কোন প্রচেষ্টা দেখলে বাধা তাঁকে দিতেই হবে।

মোহন সিং দেশপ্রেমিক, একথা অনস্বীকার্য। বিশেষ করে আই. এন. এ. গড়ার ব্যাপারে গোড়ার দিকে তাঁর ভূমিকা ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য।

তা বলে তাঁর বর্তমান মনোভাবকে আর কোনমতেই প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

সবার উর্ধ্বে স্বাধীনতা। কোন কিছুর মুখ চেয়েই সেই স্বাধীনতার প্রশ্নে পিছিয়ে গেলে চলবে না।

হয়তো কেউ কেউ ভুল বুঝবে। হয়তো কিছুটা তিক্ততার সৃষ্টি হবে। কারো কারো কাছে কাজটা হয়তো রূঢ় বলেও মনে হতে পারে।

তবু এ ব্যাপারে তিনি নিরুপায়। যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে মিলিটারী ডিসি-প্লিন তাঁকে মানতেই হবে। সেখানে কারোরই ক্ষমা নেই।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ২৯শে ডিসেম্বর ভোরবেলায়।*

সেক্রেটারী বি. কে. দাস সহ রাসবিহারী প্রমুখ সবাই সেদিন উপস্থিত জাপ-ভারত সংযোগ-রক্ষাকারী 'ইয়াকুরো কিকান' অফিসে।

মোহন সিং তখনো আসেননি, তবে আসবেন শীগগিরই। কর্ণেল ইয়াকুরো তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন টেলিফোন-যোগে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মোহন সিং এসে হাজির হলেন লেঃ ইকবালকে সঙ্গে নিয়ে। কি ব্যাপার! হঠাৎ এই জরুরী তলব কেন?

নিঃশব্দে তাঁর হাতে একটি চিঠি তুলে দিলেন কর্ণেল ইয়াকুরো। সেনা-বাহিনীর জি. ও. সি. হিসেবে এই নিয়মগুলো এখন থেকে তোমাকে সঠিক-ভাবে মেনে চলতে হবে। বলো, তুমি রাজী কিনা?

না। মোহন সিংয়ের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

তাহলে এই নাও। এবার আর একটি চিঠি তুলে দিলেন কর্ণেল ইয়া-কুরো। সভাপতি রাসবিহারীর আদেশে তোমাকে জি. ও. সি. পদ থেকে বর-খাস্ত করা হল। আর আজ থেকে তুমি বন্দী। জি. ও. সি. না হলেও যথাযোগ্য মর্যাদা তোমাকে দেওয়া হবে বন্দীজীবনে। সভাপতির নির্দেশ তা-ই।

কাজেও তাই করা হল। নিজস্ব স্টাফ হিসেবে মোট সাতজন অফিসার, দুজন দেহরক্ষী এবং বেশ কিছু-সংখ্যক পাচক এবং আরদালিসহ তাঁকে রাখা হল সমুদ্রতীরবর্তী একটি বাংলো-বাড়িতে।

---

* মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খানের মতে এ ঘটনা ঘটেছিল ২০শে ডিসেম্বর। 'Chalo Delhi' গ্রন্থে বলা হয়েছে ২৯শে ডিসেম্বর। শেষোক্ত গ্রন্থের অভিমতই এখানে অনুসরণ করা হয়েছে।

দু মাস বাদে সেণ্ট জন দ্বীপে। প্রায় বছরখানেক সেখানে কাটিয়ে অবশেষে সুমাত্রায়। সেখান থেকেই শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশের হাতে।

ওদিকে ততক্ষণে বিপদ যা হবার, তা হয়ে গেছে। কোন একটা কিছুর আশঙ্কা করে আগেই মুখ বন্ধ-করা একটা খামে মোহন সিং তাঁর শেষ নির্দেশ রেখে এসেছিলেন সহকর্মীদের কাছে।

আমার কিছু হলে সঙ্গে সঙ্গেই তোমরা আই. এন. এ. ভেঙে দিও। ভুলেও যেন আর কোনদিন তোমরা এই আই. এন. এ.-তে যোগ দিও না। আর সমস্ত পরিচয়-পত্র নষ্ট করে ফেলো। জি. ও. সি. হিসেবে এই হল আমার শেষ নির্দেশ।

কাজেও তাই হল। খবর শুনে বেশির ভাগ সদস্যই সরে দাঁড়াল প্রতিষ্ঠান থেকে। এই রইল তোমাদের ব্যাজ আর ইউনিফর্ম। আই. এন. এ.-র কোন ব্যাপারে আমরা আর নেই।

তবে সবাই নয়। যেমন, মেজর জেনারেল চ্যাটার্জী, মেজর জেনারেল ভোঁসলে, মেজর জেনারেল কিয়ানি প্রমুখ প্রথম সারির সামরিক অফিসারবৃন্দ।

কোনদিনই তাঁরা সমর্থন করেননি মোহন সিংয়ের সেই অভাবনীয় সিদ্ধান্তকে।

এ প্রসঙ্গে মেজর জেনারেল চ্যাটার্জী কি বলেছেন শোন :

'General Mohan Singh wrote a most unfortunate letter to the President of the Council of Action, and issued an order to the Army which he left in a sealed cover. In this order he wrote that if he was arrested, the officers should dissolve the Army and destroy all documents.

He also enjoined on the officers and men to take an oath not to join any Indian National Army if it were formed again. The action was beyond his powers, and was against the discipline of the Army.'

[India's Struggle for Freedom : P.—49]

রাসবিহারীরও সেই একই অভিমত। নীতিগত দিক থেকে অমিল হলে পদত্যাগ করার অধিকার সবারই আছে। মোহন সিং বা আমি, কেউ তার ব্যতিক্রম নই।

কিন্তু আই. এন. এ. জাতীয় সম্পত্তি। তাকে ভেঙে দেবার অধিকার কারোরই নেই। সেটা দণ্ডনীয় অপরাধ।

তবু ভেঙে গেল। সেনাবাহিনীর বৃহত্তর অংশই সাময়িকভাবে হাত গুটিয়ে নিল মোহন সিংয়ের সেই নির্দেশের ফলে।

ফল হল সুদূরপ্রসারী।

আহত ব্রিটিশ-সিংহের তখন অন্তিম অবস্থা। শুধু শক্ত একটি আঘাতের অপেক্ষা মাত্র।

দুর্ভাগ্য, ঠিক সেই মুহূর্তে সে আঘাত আর এল না বাইরে থেকে। এল অনেক পরে। অনেক দেরিতে। তখন ব্রিটিশ-সিংহ মোটামুটি সামলে উঠেছে মার্কিন সাহায্য পেয়ে।

জাপানের অভিমতও তাই। শুধু শুধু এই ভুল-বোঝাবুঝির জন্য একটা বছর দেরি হয়ে গেল। নইলে ইম্ফল জয় সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ছিল না।

এ প্রসঙ্গে জাপানী লেখক Tatsuo Hayashida রচিত 'Netaji Subhas Chandra Bose' গ্রন্থে মেজর ফুজিয়ারা কি বলেছেন, শোন :

'I am certain that the incident retarded the growth of the I. N. A. and, to a great extent, the independence movement. That resulted in delaying by over one year the advance of the I. N. A. into Burma, which was planned as a preliminary to its operations for the liberation of India.

If its advance to Imphal had materialized a year earlier, it could have succeeded in liberating India, which was then in a defenceless and unprepared state, as admitted by the Allied Powers, and the British-India authorities in particular, after the war.'

[Netaji Subhas Chandra Bose : Tatsuo Hayashida : P.—155]

দোষ কার ?

কার ভুলের মাশুল দিতে গিয়ে ভারতবাসী বঞ্চিত হল ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায় থেকে ?

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার ভার আমি তোমার ওপরই ছেড়ে দিলাম, মল্লিকা। পার তো ভাবীকালের বংশধরদের তুমিই এ প্রশ্নের উত্তর দিও।

বিপ্লবী জীবন অতি কঠিন, কঠোর। তুচ্ছ ভাবাবেগে ভেঙে পড়লে তার চলে না। তাই অসুস্থতা ভুলে গিয়ে রাসবিহারী সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, শেষবারের মতো।

জীবনে সার্থকতা ফেলে কেউ ব্যর্থতা চায় না। তবু তা পেতে হয়। তা বলে হার মানলে চলবে না। সুতরাং আবার চেষ্টা করতে হবে। আবার নতুন করে গড়ে তুলতে হবে সব কিছু।

ফল হল অত্যন্ত শোচনীয়। একে অসুস্থ, তদুপরি এই অমানুষিক পরিশ্রম। তাই দেখতে দেখতেই তাঁর দেহের ভাঙন এগিয়ে চলল অবিশ্বাস্য গতিতে। কিছুদিন আগেও দেহের ওজন ছিল একশো পঞ্চাশ পাউণ্ড। এবার এসে দাঁড়াল পুরো একশো পাউণ্ডে।

তবু কোন ভ্রূক্ষেপ নেই রাসবিহারীর। তবু নিজের পানে তাকাবার কোন অবকাশ নেই। শুধু একটিমাত্র লক্ষ্য নিয়ে সেই একইভাবে তিনি উল্কার মতো ছুটে বেড়াতে লাগলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন শিবিরে।

মুখে সেই একই ডাক। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই গৌরবময় ইতিহাসকে তোমরা এভাবে কলঙ্কিত হতে দিও না ভাই। আমি বৃদ্ধ। আজ আছি তো কাল নেই। কিন্তু তোমরা বেঁচে থাকবে। তুচ্ছ কারণে এভাবে পিছিয়ে গেলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে তোমরা মুখ দেখাবে কি করে?

'I may die tomorrow but one of you should be ready to take my place and when he dies there should be another to take over the responsibilities. It is the most sacred duty of every Indian to sacrifice his all for the complete independence of India and the Hindusthan of tomorrow will be proud of you. If you survive in this struggle, you shall be called heroes and if you die in the attempt, you shall be martyrs.

I therefore appeal to you in the name of our motherland to set aside all petty differences, make one unit and brotherhood and move forward as one team and the freedom of our country is assured.

Remember you are born only once and will die only once, whether it is on sick-bed or whether it is on the battlefield. Come forward as men, live as men and die as men, so that the India of tomorrow can be proud of you.' [Rash Behari Bose—His Struggle for India's Independence: P.—236]

আবেদন ব্যর্থ হল না, মল্লিকা। এগিয়ে এলেন মেজর জেনারেল এ. সি. চ্যাটার্জী।

তারপর একে একে এলেন মেজর জেনারেল ভোঁসলে, এম. জেড. কিয়ানি, শাহনওয়াজ খান, লোগনাথন, আলাগাপ্পান, সেইগল, ঈশান কাদির প্রমুখ বীর সেনানায়কবৃন্দ।

ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের দিক থেকে এলেন দেবনাথ দাস, জন এ. থিবি, রঘুনাথ শর্মা, এন. রাঘবন প্রমুখ বিশিষ্ট সদস্যগণ।

একটা বড় কাজ করতে গেলে বাধা-বিপত্তি আসবেই, তার জন্য হতাশ হবার কোন কারণ নেই। আমরা এখনো মরিনি। স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই পবিত্র প্রয়াসকে কিছুতেই আমরা ব্যর্থ হতে দেব না। আবার আমরা সেনাবাহিনী গড়ে তুলব নতুন করে।

হাজার বাধা। হাজার প্রতিকূলতা। সেই হাজার বাধা অতিক্রম করে যেভাবে সেদিন তাঁরা সংগঠনকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, তা সোনার অক্ষরে লিখে রাখার মতো। আই. এন. এ. পুনর্গঠনের কাজে তাঁদের অবদান সত্যিই উল্লেখযোগ্য।

তা বলে কাজটা কিন্তু খুব সহজে সম্ভব হয়নি, মল্লিকা। এজন্য তাঁদের বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল অসংখ্য বার। সুখের কথা, এসব সত্ত্বেও কোনদিন তাঁরা পিছিয়ে পড়েননি সেই দুস্তর সাগর পাড়ি দিতে।

যেমন, একবার ঘটেছিল সেনাবাহিনীর একটা সভাতে। হঠাৎ সেখানে রাসবিহারীকে প্রশ্ন করা হল:

ভারতীয় হয়েও তোমার ছেলে জাপানী সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে কেন, বলো?

তাহলে কোথায় যোগ দেবে, বলো? চটপট জবাব দিলেন রাসবিহারী, সে জাপানের নাগরিক। জাপানেই তার জন্ম। সে হিসেবে আইনত সে জাপানী সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য। আমাদের নিজস্ব সরকার গঠিত হোক, তখন দেখো যে, তার পিতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য সে লড়াই করে কিনা।

আর একবার পরবর্তী এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত সিঙ্গাপুর অধিবেশনে। সেখানে প্রশ্ন করা হল:

সভাপতি যদি তাঁর কর্তব্য পালনে অক্ষম হন, তাহলে কি হবে?

তৎক্ষণাৎ তোমরা তাঁকে গুলি করে হত্যা করবে।

জবাব শুনে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন উপস্থিত সেনানীবৃন্দ। এমন স্পষ্ট উত্তর কোনোদিনই বুঝি তাঁরা আশা করতে পারেননি সভাপতির কাছ থেকে। মেজর জেনারেল চ্যাটার্জীর ভাষায়:

'Rash Behari Bose's reply was characteristic and at once showed his frank honesty, sincerity of purpose and typical revolutionary spirit. This frank and bold assertion of the president had a very satisfactory effect on the whole gathering.' [India's Struggle for Freedom: P.—74]

আবার একদিন আই. এন. এ. গড়ে উঠল নতুন করে।

একটি মাত্র লোকের ওপর অত্যধিক ক্ষমতা অর্পণ করাই যে সমস্ত বিপর্যয়ের কারণ, এ সম্বন্ধে রাসবিহারী এবারে পুরোপুরি সচেতন। তাই এবার দায়িত্ব দেওয়া হল দু ভাগে ভাগ করে।

প্রথমেই 'মিলিটারী ব্যুরো' নাম দিয়ে গড়ে তোলা হল একটি নতুন বিভাগ। এ বিভাগের কাজ হল প্রধানত আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সাধারণ নীতি এবং অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপার দেখা-শোনা করা।

ব্যুরোর ডিরেক্টর হলেন মেজর জেনারেল ভোঁসলে। লেঃ মির্জা এনায়েৎ আলি বেগ—এ. ডি. সি.। আর চীফ অফ দি স্টাফ—মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান।

অন্যটি—'আর্মি কম্যাণ্ডার' বিভাগ। এ বিভাগের প্রধান কাজ শাসন, সামরিক শিক্ষাদান, নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য

পরিচালনা করা। এর সুপ্রীম কম্যাণ্ডার হলেন মেজর জেনারেল এম. জেড. কিয়ানি। এ. ডি. সি.—আবদুল মজিদ।

লেঃ কর্ণেল ঈশান কাদিরের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবকদের শিক্ষাদানের জন্য একটি বিরাট কেন্দ্র স্থাপন করা হল সিংগাপুরে। সদর দপ্তরও ব্যাঙ্কক থেকে সরিয়ে আনা হল সিংগাপুরে।

গড়ে উঠল শক্তিশালী প্রচার-বিভাগ। রাসবিহারীর নির্দেশে প্রচার-অধিকর্তা এস. এন. আয়ারের নেতৃত্বে এবং শ্রীশিবরামের সম্পাদনায় সব কিছু আবার নতুন করে গড়ে তোলা হল সিঙ্গাপুরে।

প্রকাশিত হল ইংরেজী পত্রিকা 'ভয়েস অফ ইণ্ডিয়া' এবং 'আজাদ হিন্দ্'। হিন্দীতে—'আওয়াজে হিন্দ্' এবং 'আজাদ হিন্দ্'। আর তামিল ভাষায় 'স্বতন্ত্র ভারত'।

আরো দুটি পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা হল কুয়ালালামপুর এবং পেনাং থেকে। বক্তব্য সবারই এক। আর দেরি নয়—মাতৃভূমি উদ্ধারের জন্য সবাই প্রস্তুত হও।

রাসবিহারীর মাথায় তখন অন্য ভাবনা। দেহ তাঁর মোটেই সুস্থ নয়। মরণ তো বৈশাখী ঝড়। কখন যে অলক্ষ্য থেকে মৃত্যু এসে প্রাণটাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে, কেউ তা বলতে পারে না।

কিন্তু তারপর! তারপর কি হবে?

কি হবে নিজের বুকের রক্তে গড়া এই আজাদ হিন্দ্ ফৌজের?

কি হবে তিল তিল করে গড়ে ওঠা এই ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের?

সবই কি শেষ হয়ে যাবে তাঁর মৃত্যুর সংগে সংগে?

ওরা সৈনিক। ওদের কর্মক্ষম রাখতে হলে নিত্য-নতুন কাজ চাই। নতুন আবেগ চাই। চাই নতুন তরংগ।

কে শোনাবে ওদের সেই নতুন জোয়ারের আহ্বান?

কার আদেশে ওরা সব কিছু তুচ্ছ করে দুর্বার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রু বাহিনীর ওপর?

কে সেই অসম্ভবের নায়ক?

সুভাষ! সুভাষ! সুভাষ! বিপ্লবের প্রদীপ্ত সূর্য সুভাষ! সুভাষই একমাত্র নায়ক, যিনি এই গুরুদায়িত্ব বইতে সক্ষম।

অবশ্য আগেই সুভাষকে আহ্বান জানানো হয়েছে সরকারীভাবে। এবার আহ্বান করতে হবে নিজের পক্ষ থেকে। বলতে হবে—তুমি এসো সুভাষ। আমি অসুস্থ। এখানে এসে সমস্ত দায়িত্ব বুঝে নিয়ে তুমি আমাকে এই দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তি দাও।

একই ভাবনা তখন ডানা মেলেছে জাপানী সেনানায়কদের মনে। রাস-বিহারী অসুস্থ। এখন শুধু অপেক্ষা মাত্র। শেষ-বিদায়ের আগে কয়েকটা যন্ত্রণাময় দিন।

কিন্তু তারপর?

কি হবে তখন এই নবজাগ্রত আজাদ হিন্দ বাহিনীর ?
কে নেবে তার দায়িত্বভার ?
কে হবে তখন এই বিরাট মহাযজ্ঞের প্রধান হোতা ?

পরের কাহিনী জাপানী গ্রাউণ্ড সেলফ ডিফেন্স ফোর্সের লেঃ জেনারেল Seizo Arisue-র মুখ থেকেই শোন :

'...Regarding this matter, Mr. Rash Behari called me to a special room and while partaking Indian rice-curry, requested me to make a speedy arrangement to bring Mr. Subhas Chandra Bose.

Myself and my colleagues had no objection to comply with it, but we were much worried as to the seniority positions between the two Boses after the arrival of Mr. Chandra Bose. So asked his frank opinion in the matter. In reply he assured me that we should have no worry on this point and that he would subordinate himself to Mr. Chandra Bose.

This impressed me very much and I felt great respect towards him since I saw very plainly that he felt no hesitation to work under the other Bose ignoring himself, for the success of the Indian freedom movement. Further, I could clearly understand how much he was devoted to the independence of India.' [Rash Behari Bose—His Struggle for India's Independence : P.—50-51]

সংক্ষেপে : সেদিন ভারতীয় প্রথায় ভাত খেতে খেতে রাসবিহারী আমাকে সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে আসার জন্য ব্যবস্থা করতে বললেন। আমাদের কোন আপত্তি ছিল না, তবে দ্বিধা যথেষ্টই ছিল। দুজনেই বড়। পরে এ নিয়ে আবার একটা ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে না তো ?

জবাব দিলেন রাসবিহারী—না, দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি তাঁর অধীনে কাজ করতে সবসময় প্রস্তুত।

শুনে অভিভূত হয়ে পড়লাম। বুঝতে পারলাম যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য নিজেকে মুছে ফেলতেও তাঁর কোন আপত্তি নেই।

আর একজন জাপানী কর্ণেল Hideo Jwakure এ প্রসঙ্গে কি বলেছেন শোন :

'...I had consulted with Mr. Bose regarding the above matter and whether to appoint Netaji Bose as new Chairman of executive committee of the league to which Mr. Rash Behari Bose agreed at once and told me to welcome

him from the bottom of his heart, making additional remarks that Netaji was a remarkable man of merits of the Indian Independence movement with noble character and extensive knowledge....

Not only myself but also all staff of Iwakura Special Detachment were deeply moved by Mr. Rash Behari Bose's noble character.' [Ibid : P.—57-58]

সংক্ষিপ্তসার : আমিও একদিন রাসবিহারীর সঙ্গে কথা বলেছিলাম এই নিয়ে। জানতে চেয়েছিলাম—নেতাজী এখানে এসে পরে তিনিই কি তখন ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের চেয়ারম্যান হবেন ?

সমস্ত অন্তর থেকে স্বাগত জানিয়ে তৎক্ষণাৎ রাসবিহারী সম্মতি জানালেন। বললেন—ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে সুভাষ একটি মহত্তম চরিত্র। জ্ঞানের পরিধিও তাঁর বহুদূর-বিস্তৃত। সুভাষ অসম্ভব প্রতিভাদীপ্ত নায়ক সন্দেহ নেই।

শুধু আমি নই, আমরা সবাই সেদিন অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম রাসবিহারীর এই মহত্ব দেখে।

সুভাষের প্রতি রাসবিহারীর এই আকর্ষণ কি আজকের ?

আশ্চর্য, চোখেও দেখেননি কোনদিন। পরিচয়ও নেই। অথচ সুদূর টোকিও থেকে সেই সুভাষের কাছেই তিনি ডাক পাঠিয়েছেন বার বার। আর কারো কাছে নয়, শুধু সুভাষের কাছেই।

কখনো সহকর্মী দেবনাথ দাসের হাত দিয়ে। কখনো বা যতীন্দ্রলোচন মিত্র এবং জে. সি. দাসের সাহায্যে।

নির্বাসিত জীবনেও প্রথম যৌবনের স্মৃতি-বিজড়িত চন্দননগরের প্রবর্তক সঙ্ঘের সঙ্গে রাসবিহারী যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন বরাবর। সেখানেও অন্তরঙ্গ সুহৃদ শ্রীশ ঘোষকে লিখিত চিঠিতে তিনি জানতে চেয়েছিলেন সুভাষের কথা। সুভাষ কি একবার আসতে পারে না এখানে ?

সব শেষে বীর সাভারকরকে লিখিত চিঠিতে। সেখানেও সেই একই কথা। সুভাষকে একবার আসতে বলো এখানে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে হলে শুধু একদিক থেকে লড়াই করলেই চলবে না, আঘাত করতে হবে ঘরে-বাইরে দুদিকে থেকেই। তারই জন্যে সুভাষের একবার এখানে আসা প্রয়োজন।

তারিখটা ছিল ১৯৪০ সালের ২২শে জুন।

সব কথাই সাভারকরজী সেদিন খুলে বলেছিলেন সুভাষকে। চিঠিও দেখিয়েছিলেন রাসবিহারীর। সেই সঙ্গে নিজের অভিমতও ব্যক্ত করেছিলেন বেশ খোলাখুলিভাবেই।

আমাদের এখানে নানা মুনির নানা মত। নিজেরা তো কিছু করবেই

না, অধিকন্তু আর কেউ করতে চাইলেও তারা তাকে বাধা দেবে প্রাণপণে। সুতরাং যুদ্ধের সুযোগে সত্যিই যদি কিছু করতে চাও তো আর দেরি নয়। কখন সে সরকারী অতিথিশালায় ডাক পড়বে, কে বলতে পারে?

'To impress this point Savarkarji showed to Subhas Basu a letter from Sri Bose to Savarkarji written just on the eve of Japanese declaration of war.' [Two Great Indian Revolutionaries: Uma Mukherjee: P.—159]

মল্লিকা, এই হল রাসবিহারী। এ রাসবিহারীকে চিনতে সময় লাগে কি?

জীবনে একটাই মাত্র সাধ ছিল—জন্মভূমিতে ফিরে এসে মৃত্যুবরণ করা। দুর্ভাগ্য, সে সাধও তাঁর পূর্ণ হয়নি। তার আগেই তিনি চলে গিয়েছিলেন মহাকালের আহ্বান শুনে।

আর তাঁর ছেলে! না, বেশিদিন নয়। মাত্র কয়েক মাস বাদেই বীর পিতার বীর সন্তান মৃত্যুবরণ করেছিলেন টর্পেডোর ঘায়ে বিধ্বস্ত এক জাহাজ-ডুবির ফলে।

আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতা-সংগ্রামে কার কতখানি অবদান, তা নিয়ে মস্ত বড় ইতিহাসও রচিত হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে।

কোথায় সেখানে রাসবিহারীর স্থান? দেশের ক'টি ছেলেমেয়ে জানে জীবনভোর তাঁর এই অবিস্মরণীয় সংগ্রামের কাহিনী? জানে কি কেউ?

দোষ কাদের? ছেলেমেয়েদের, না কি আমাদের?

এই দীর্ঘ দিন ধরে আমরা কি দেশের ছেলেমেয়েদের জানতে দিয়েছি কোন কিছু, না কি দলীয় স্বার্থের খাতিরে সব কিছু লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছি প্রাণপণে?

আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের দুটো ইতিহাস আছে।

একটা মার খাবার ইতিহাস, অন্যটা মার দেবার ইতিহাস।

একটা লিখিত, অন্যটার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। বোধহয় হবেও না কোনদিন।

লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে লিখিত ইতিহাসে দেশের ছেলেমেয়েদের একথাই বোঝানো হয়েছে যে, যুগ যুগ ধরে আমরা শুধু মারই খেয়েছি বিদেশীর হাতে, কিন্তু কাউকেই মারিনি।

তোমরাও তাই করো। পিঠ পেতে শুধু মারই খেও, তারপর দরকার হলে রাষ্ট্রসংঘে গিয়ে নালিশ করো, তবু কাউকেই যেন পাল্টা মার দিতে যেও না। ওটাই নাকি সম্মানের। তার বাইরে কোন কিছু করতে গেলে আমরা নাকি আদর্শ-ভ্রষ্ট হব পৃথিবীর চোখে।

রাসবিহারী সে দলের নন। দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করে, মৃত্যুকে তুচ্ছ-জ্ঞান করে সেদিন যাঁরা হাসিমুখে জীবনের জয়গান গেয়েছিলেন, রাসবিহারী সেই সীমিত-সংখ্যক ঘর-ছাড়া পথিকদেরই একজন।

আপত্তি সেইখানেই। নইলে জাতীয় চরিত্র গঠনের জন্য কতগুলি মার খাবার কাহিনী না শুনিয়ে ক্ষুদিরাম, বিনয়-বাদল-দীনেশ, সূর্য সেন, বাঘা যতীন, রাসবিহারী ও সুভাষ প্রমুখের এই বীরত্বপূর্ণ কাহিনীগুলিই কি আমাদের তুলে ধরা উচিত ছিল না দেশের ছেলেমেয়েদের সামনে?

ওদিকে একই চিন্তা তখন সুভাষের মাথায়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া! দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া! দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া! ওখানে আমাকে যেতে হবে। যেতেই হবে।

ডাক পাঠিয়েছেন জাপান সরকার। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে রাষ্ট্রদূত জেনারেল ওসিমাকে তাঁরা জানিয়েছেন:

'কারো ওয়া তাইসেত্সু না নিংগেন দে আরু নোদে কারো নে আনজেন ও মাসি সোকুংগা কানজেননি হাকারু কোতো গা দেকিনু নারেবা অকুত্তেমো ইয়োই।'

অর্থাৎ—মহামান্য চন্দ্র বোস অত্যন্ত দায়িত্বশীল লোক। তোমরা যদি তাঁর নিরাপত্তা সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিতে পারো, তাহলে পাঠাবার ব্যবস্থা করো।

সেই সঙ্গে ডাক পাঠিয়েছেন মহানায়ক রাসবিহারী বসু স্বয়ং।

সুভাষ তুমি এসো। শুধু আমি নই, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ত্রিশ লক্ষ ভারতীয় আজ তোমার পথ চেয়ে আছে। আমি অসুস্থ, বৃদ্ধ। তুমি এসে সমস্ত দায়িত্ব বুঝে নিয়ে আমাকে এই দুঃসহ বোঝা থেকে মুক্তি দাও।

সুতরাং আর দেরি নয়। যে করে হোক, যে-কোন মূল্যের বিনিময়ে হোক, ওখানে আমাকে যেতেই হবে।

অবশ্য কাজটা সহজ নয়। বরং খুবই বিপজ্জনক। অসম্ভবও বলা চলে। পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধ চলছে। জলে-স্থলে, অন্তরীক্ষে—সর্বত্র এখন শুধু মৃত্যুর পদধ্বনি।

এ অবস্থায় এখান থেকে রওনা দিলেই যে শেষ পর্যন্ত ওখানে গিয়ে পৌঁছানো যাবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। বরং মৃত্যুটাই সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক।

জাপ-সরকারও এ আশঙ্কার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বার বার। আশা খুবই কম। শতকরা পাঁচ ভাগ মাত্র। বাদ বাকি সবটাই অনিশ্চিত।

তবু যেতে হবে। যত বাধা-বিপত্তিই মাথা উঁচিয়ে আসুক না কেন, সব কিছু মেনে নিয়ে তাঁকে এগিয়ে যেতে হবে আপন লক্ষ্যের দিকে।

মৃত্যু যদি আসে তো আসুক। তবু মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের এই অপূর্ব সুযোগটাকে কোনরকমেই হেলায় হারালে চলবে না।

৫ই ডিসেম্বর জার্মান সরকারের কাছে আবার এক নোট পাঠালেন সুভাষ:

'...আমি বিশ্বাস করি, সাবমেরিন, বিমান বা জাহাজে আমার দূরপ্রাচ্য যাবার ব্যবস্থা করা এখনও সম্ভব। এ-কাজে যথেষ্ট ঝুঁকি আছে, তা আমি জানি। সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় এবং আনন্দের সঙ্গে সেই ঝুঁকি আমি মেনে নেব।

আমি ভাগ্যে বিশ্বাস করি। আমি জানি যে, আমার এই প্রচেষ্টা সার্থক হবেই।

যত রকম বিপদ, যত রকম ঝুঁকি, বা যত কিছু অসুবিধাই থাকুক না কেন, এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করলে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ থাকব। যত তাড়াতাড়ি যেতে পারব, ততই ভারতের এবং আমাদের সবার মঙ্গল।'

[Indian Struggle : Subhas Ch. Bose]

কেটে গেল আরো কিছুদিন।

নিজের সঙ্কল্পে সুভাষ তখন স্থির। যেতেই হবে আমাকে এখান থেকে। যুদ্ধের অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়।

রাশিয়ার অভ্যন্তরে দুর্ধর্ষ জার্মান বাহিনী একটানা এগিয়েই চলেছে। হিটলার বলেছেন, শীতের আগেই যুদ্ধ শেষ করে ফেলতে হবে। সুতরাং এগিয়ে চল।

এ সিদ্ধান্ত অত্যন্ত ভ্রমাত্মক। রণনীতির প্রধান কথাই হল, সরবরাহ ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চালু রাখা এবং সেনাবাহিনীর পার্শ্বদেশ রক্ষার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে জার্মান বাহিনী যেভাবে একটানা এগিয়ে চলেছে, তাতে বিপদ অনিবার্য। আজ হোক বা কাল হোক, এ ভুলের মাশুল জার্মানীকে দিতেই হবে।

অতিরিক্ত জয়ের আনন্দে হিটলার এখন দিশেহারা। এ অবস্থায় কে আজ তাঁকে বোঝাবে এসব কথা।

না, এ ব্যাপারে সেনানায়কদের মধ্যে কাউকে তিনি মানতে রাজী নন। কারো কথা শুনতে প্রস্তুত নন। তাঁর এক গোঁ—এগিয়ে চল। পেছনের পানে তাকানোর প্রয়োজন নেই। হিসেব-নিকেশেরও ফুরসত নেই। শুধু এগিয়ে যাও।

কথাটা একদিন খুলেই বলেছিলেন সুভাষ। বলেছিলেন জার্মান অ্যাডমিরাল ক্যানারিসকে।

১৯৪২ সাল। জার্মানীর তখন তুঙ্গে বৃহস্পতি চলেছে। শুধু জয়, জয় আর জয়! সর্বত্র একটানা জয়।

হিটলার আত্মহারা। আত্মহারা গোয়েরিং, গোয়েবল্‌স, রিবেনট্রপ, কাইটেল প্রমুখ সবাই। আর বেশি দেরি নেই। যুদ্ধ শেষ হয়ে এল বলে!

একমাত্র ব্যতিক্রম সুভাষ। আশ্চর্য, এত জয়ের মধ্যেও জার্মানদের আভ্যন্তরীণ দোষ-ত্রুটিগুলি তাঁর অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে ধরা পড়তে দেরি হয়নি। তাই খোলাখুলিভাবেই সেদিন তিনি বলেছিলেন জার্মান অ্যাডমিরাল ক্যানারিসকে:

আমার মতো তুমিও নিশ্চয় জান যে, যুদ্ধে তোমাদের পরাজয় অনিবার্য। তবে ব্রিটিশকে এবার ভারতবর্ষ হারাতেই হবে।

'You know as well as I do that Germany cannot win this war. But this time victorious Britain will lose India.' [An Extract from Nachrichtemlieust i.e. The German Military Intelligence Service for Far East in the Charge of Paul Leverkuehn: Netaji in Germany: N. G. Ganpuley: P.—182]

কথাটা মিথ্যে নয়, মল্লিকা। প্রমাণ, আফ্রিকা রণাঙ্গন।

দুর্ধর্ষ জার্মান সেনাপতি ফিল্ড-মার্শাল রোমেলের কথা তোমাকে আগেই বলেছি। মিশর সংলগ্ন এল-আলামিনে দাঁড়িয়ে বার বার তাঁর সে কি আবেদন হিটলারের কাছে!

বেশি নয়, মাত্র তিনশো বিমান আমাকে দিন। ওটা পেলেই আমি গোটা ব্রিটিশ বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারব মিশরের বুক থেকে।

কথা দিয়েছিলেন হিটলার। একবার নয়, বার বার তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রোমেলকে।

কিন্তু কোথায় বিমান! কোথায় কি! বিমান তো দূরের কথা, যান্ত্রিক বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় তেল পর্যন্ত তিনি সরবরাহ করে উঠতে পারেননি আফ্রিকার রণাঙ্গণে!

কারণ, তাঁর কাছে সব চাইতে বড় প্রশ্ন তখন রাশিয়া—আফ্রিকা নয়। রাশিয়ায় তখন মরণ-বাঁচন সংগ্রাম চলছে দুপক্ষের মধ্যে। সেখানে একটা ফয়-সালা না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোনদিকে তাকানোর মতো অবসর তাঁর নেই। সাধ্যও নেই।

এদিকে জেনারেল রিচির পরিবর্তে ব্রিটিশ পক্ষে সেনাপতি হয়ে এসে-ছেন জেনারেল আলেকজান্দার।

সুযোগ বুঝে ২৩শে অক্টোবর তারিখে তিনি জেনারেল মণ্টগোমারীসহ পাল্টা-আক্রমণ চালাবেন রোমেলের বিরুদ্ধে। সরবরাহ বন্ধ। এবার তুমি কোথায় যাবে ডেজার্ট-ফক্স রোমেল?

রোমেল তখন হাসপাতালে। খবর শুনে সঙ্গে সঙ্গে তিনি রণাঙ্গনে ছুটে এলেন অসুস্থতা ভুলে গিয়ে।

কিন্তু সব বৃথা। যান্ত্রিক যুদ্ধের প্রধান অঙ্গ বিমান এবং তেল—দুয়েরই তখন অভাব। ফলে বাধ্য হয়েই তাঁকে পিছু হটতে হল মিশরের সেই এল-আলামিন থেকে।

এখানেই শেষ নয়। তার চাইতেও বড় ঘটনা, ৮ই নভেম্বর মার্কিন সেনা-পতি জেনারেল আইসেনহাওয়ারের নেতৃত্বে পাঁচশো সৈন্যবাহী জাহাজ এবং সাড়ে তিনশো যুদ্ধ-জাহাজ সহযোগে বিরাট এক সম্মিলিত বাহিনীর উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার আলজিরিয়ার উপকূলে অবতরণ।

আফ্রিকা আফ্রিকাবাসীদের জন্য নয়। সুতরাং লুঠের মালের বখরা ছাড়তে কেউ এত সহজে রাজী নয়।

শেষ আত্মরক্ষা-ঘাঁটি ম্যারেথ লাইনে দাঁড়িয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন রোমেল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

একদিকে বিরাট সম্মিলিত বাহিনীসহ জেনারেল আইসেনহাওয়ার, অন্যদিকে অষ্টম আর্মিসহ জেনারেল আলেকজান্দার ও জেনারেল মণ্টগোমারী।

উপযুক্ত সমর-সম্ভার ছাড়া মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিরাট এই সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর সাধ্য তাঁর কোথায় ?

ফলে, যে রোমেল একদিন জেনারেল ওয়াভেলকে চোখে সর্ষেফুল দেখিয়েছিলেন, জেনারেল অকিনলেকের সাঁজোয়া-বাহিনীকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলেন, জেনারেল রিচিসহ গোটা ব্রিটিশ বাহিনীকে ঠেলে মিশরের নীল নদে ভাসিয়ে দেবার উপক্রম করেছিলেন, তাঁকেই এবার বার্লিনে ফিরে যেতে হল পরাজয়ের কালিমা মাথায় নিয়ে।

এবার শোন রাশিয়া রণাঙ্গনের কথা।

জয়ের আনন্দে জার্মান বাহিনী তখন এগিয়ে চলেছে তো চলেছেই। বুঝি এগিয়ে চলার সহজক্রিয়া আনন্দেই তারা বিভোর।

রোস্টভ দখল করা হল ২৭শে জুলাই। আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে জার্মান বাহিনী আবার এগিয়ে চলল ককেসাস্-এর দিকে। উদ্দেশ্য—বাকুর বিখ্যাত তৈলখনি এবং কৃষ্ণসাগর তীরস্থ রাশিয়ার দুটি উল্লেখযোগ্য বন্দর নভোরোসিস্ক ও তুয়াপ্সে দখল করা। যদিও রোস্টভ থেকে বাকুর দূরত্ব রেলপথেই নশো মাইল।

১লা আগস্ট দখল করা হল কুশচেভকা। ৫ই টিখোরটস্ক। ৯ই তারিখে আরমাভির পেরিয়ে মৈকোপের তৈলখনির দিকে।

বিপদ দেখে মৈকোপের তৈলখনি এবং ক্রাসনোডারের তৈল শোধন-কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি নিজে থেকেই ধ্বংস করে দিলেন রুশরা।

মার্শাল স্ট্যালিনের নির্দেশ—এমন কিছুই পেছনে ফেলে রেখে যাওয়া চলবে না, যার ফলে শত্রুপক্ষ এতটুকুও লাভবান হতে পারে। কল-কারখানা যতটা পার পেছনে সরিয়ে নাও। বাদ-বাকি সব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে একাকার করে দাও। এককণা খাদ্যশস্যও যেন ওরা না পায় আমাদের দেশে।

২১শে আগস্ট কিউবান নদী পেরিয়ে ক্রিমস্কায়া। নভোরোসিস্ক বন্দর দখল হল ৬ই সেপ্টেম্বর।

আবার নতুন করে আক্রমণ শুরু করা হল ২৮শে অক্টোবর। এবার এক ধাক্কায় একেবারে বাটুমের কাছাকাছি।

গতি মন্থর হয়ে এল নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। কারণ, শীত।

একটু একটু করে সেই ভয়ঙ্কর শীত তখন নামতে শুরু করেছে রাশিয়ার প্রান্তরে।

অন্যদিকে কিন্তু মার্শাল ভন বোকের তখন একমাত্র লক্ষ্য হল—ডন নদী। যে করে হোক, ডন নদী পার হতে হবে।

রুখে দাঁড়িয়েছে লাল ফৌজ। ডন নদী পার হওয়া মানেই শিল্পনগরী স্ট্যালিনগ্রাড বিপন্ন হওয়া। কিছুতেই তারা ডন বোককে সে সুযোগ দিতে রাজী নয়।

দিনের পর দিন কেটে গেল, তবু কিছুতেই কিছু হল না।

এপারে ভন বোক স্থির, দৃঢ়সংকল্প। ওপারে লাল ফৌজ তেমনি অটল, অনড়। কেউ কারো কাছে হার মানতে রাজী নয়।

প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরে অবশেষে ওপারে যাওয়া সম্ভব হল দীর্ঘ সতেরো দিন পরে।

ফলে, যা হবার তাই হল। চলো এবার শিল্প-নগরী স্ট্যালিনগ্রাড।

স্ট্যালিনগ্রাড অভিযানের ভার ছিল জেনারেল ভন হথ্-এর ওপর। চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য এবার তাঁকে পরিবর্তন করে আনা হল জেনারেল ভন পাউলাসকে।

২৬শে আগস্ট উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে জেনারেল ভন পাউলাসের বাহিনী পেঁৗছে গেল স্ট্যালিনগ্রাডের শহরতলীতে।

২রা সেপ্টেম্বর ভল্গা নদীর তীরে। ৪ঠা সেপ্টেম্বর শহরের উপকণ্ঠে। ১২ই সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হল প্রচণ্ড আক্রমণ। শুধু স্থলপথে নয়, আকাশ-পথেও।

বিরাট আয়োজন। ব্যাপক প্রস্তুতি। মোট দশ লক্ষ সৈন্য, তিন হাজার বিমান এবং তিন হাজার ট্যাঙ্ক নিয়োগ করা হল স্ট্যালিনগ্রাড দখলের জন্য। ফুয়েরারের আদেশ—যে-কোন মূল্যে হোক, স্ট্যালিনগ্রাড তাঁর চাই-ই!

আসল আক্রমণ শুরু হল ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে।

স্ট্যালিনগ্রাড তখন তিন দিক থেকে অবরুদ্ধ। পিছিয়ে যাবারও কোন পথ নেই। ঠিক তার পেছনেই বিপজ্জনক ভল্গা নদী।

দেখতে দেখতে তিন-চতুর্থাংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল স্ট্যালিনগ্রাডের।

নীচে দুর্ধর্ষ জার্মান বাহিনী। সবরকম মারাত্মক সমরাস্ত্র নিয়ে তারা বার বার ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল স্ট্যালিনগ্রাডের দৃঢ় বেষ্টনীর গায়ে।

ওপরে অগুন্তি বোমারু-বিমান। আসছে তো আসছেই। ঝাঁকে ঝাঁকে। দলে দলে। এক দল ফিরে যাচ্ছে। আবার নতুন এক দল আসছে। যেন শেষ নেই এই আসা-যাওয়া মিছিলের।

সেই সঙ্গে দূরপাল্লার কামানশ্রেণীর অবিরাম গর্জন। দরকার হলে প্রতিটি বাড়ি, প্রতিটি ফ্যাক্টরী, প্রতিটি কারখানা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে হবে, তবু স্ট্যালিনগ্রাড চাই-ই! ফুয়েরারের আদেশ—স্ট্যালিনগ্রাড চাই-ই!

হ্যাঁ, তাই। নাৎসী পার্টির এক অধিবেশনে অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই হিটলার সে-কথা ব্যক্ত করলেন তাঁর মাতৃভাষায়ঃ

'We werden Stalingrad nehmen, sie Koennen dessen versichert sein.'

অর্থাৎ—নিশ্চিন্ত থাকো, স্ট্যালিনগ্রাড আমরা জয় করবই।

আর হ্যাঁ, যে-সব অফিসার এবং সৈন্য সর্বপ্রথম স্ট্যালিনগ্রাডে ঢুকবে, তাদের বেতনসহ পুরো ষাট দিনের ছুটি দেওয়া হবে। কথা দিলাম।

জেনারেল চুইকোভ ও জেনারেল জেরেমেস্কোর নেতৃত্বে অবরুদ্ধ লাল ফৌজ তখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত।

সংগে এসে যোগ দিল শ্রমিক ও মজুরের দল। যোগ দিল প্রতিটি সাধারণ মানুষ।

এমন কি মেয়েরা পর্যন্ত বাইরে এসে পা দিল হাতিয়ার নিয়ে। সবার কণ্ঠে একই শপথ। পবিত্র এই পিতৃভূমিকে কিছুতেই আমরা তুলে দেব না শত্রুর হাতে।

প্রতিটি বাড়ি, অলি-গলি, প্রতিটি কারখানা যেন এক-একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ। বাড়ির একতলায় জার্মান বাহিনী, দোতলায় লাল ফৌজ। তবু কিছুতেই তারা আত্মসমর্পণ করতে রাজী নয়।

হঠাৎ একসময়ে গোটা বাড়িটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে। জীবনে মৃত্যু একবারই আসে। তা বলে ভীরুর মতো কোনমতেই নয়। পিতৃভূমি রক্ষার জন্য দরকার হলে এমনি করেই প্রাণ দিতে হবে, নিতেও হবে।

চূড়ান্ত আঘাত এল ২১শে এবং ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে।

রাস্তায়, ঘরে, সিঁড়িতে, করিডোরে, ছাদে, সর্বত্র শুধু যুদ্ধ, যুদ্ধ আর যুদ্ধ! প্রচণ্ড হাতাহাতি যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত এমনভাবে তারা মিলে-মিশে গেল যে, কে শত্রু, আর কে মিত্র, বোঝাই গেল না।

মস্কো থেকে বেতারযোগে এক মর্মস্পর্শী আবেদন প্রচার করা হল স্ট্যালিনগ্রাডের রক্ষীবাহিনীর উদ্দেশে :

'The whole world is watching; Russia will never acknowledge the defenders as her sons and daughters if for one instant they should flinch and show themselves not worthy of what they really are!'

অর্থাৎ—সারা পৃথিবী আজ তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। রাশিয়া কোনদিনই তোমাদের নিজের পুত্র-কন্যা বলে স্বীকার করবে না, যদি তোমরা একটি ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড় বা নিজেদের উপযুক্ত বলে প্রমাণ না কর।

নতুন করে শপথ নিল রক্ষীবাহিনী। না, আমরা হার মানব না। দরকার হলে প্রাণ দিয়েও আমরা নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দেব।

পৃথিবীতে অনেক যুদ্ধ হয়েছে। আরো হয়তো হবে। কিন্তু সেদিন পিতৃভূমি রক্ষার জন্য স্ট্যালিনগ্রাডের সামরিক এবং অসামরিক জনসাধারণ যে অভূতপূর্ব বীরত্ব এবং দেশপ্রেমের নজীর রেখেছিলেন, কোথাও বুঝি তার তুলনা মেলে না, মল্লিকা।

গোটা স্ট্যালিনগ্রাড ধ্বংসস্তূপে পরিণত। সরবরাহ-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। টেলিফোন-ব্যবস্থা বলতেও কিছু অবশিষ্ট নেই। এমন কি সাইরেন বাজানো

পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। বৃষ্টিধারার মতো বোমাবর্ষণ চলছে তো চলছেই। কি হবে আর এ অবস্থায় শুধু শুধু সাইরেন বাজিয়ে।

আশ্চর্য! এত বড় বিপর্যয়ের মুখেও রক্ষীবাহিনী স্থির এবং দৃঢ়সঙ্কল্প। সেনাধ্যক্ষের কোন নির্দেশ নেই। দেবার উপায়ও নেই। সব কিছুই তখন বিধ্বস্ত।

তবু কোন ভ্রূক্ষেপ নেই রক্ষীবাহিনীর। তারা নিজেরাই তখন সেনাপতি। নিজেরাই সৈনিক। নিজেরাই সব কিছু। লক্ষ্য শুধু একটাই। যে করে হোক পিতৃভূমি আমরা রক্ষা করবই।

কাজেও তাই হল। পিছু হটতে হটতে একসময়ে রক্ষীবাহিনী ভল্গা নদীর তীরে গিয়ে দাঁড়াল পিঠ দিয়ে, তবু কিছুতেই মাথা নোয়াল না জার্মানদের কাছে।

হ্যাঁ—একেই বলে 'জনযুদ্ধ'। আমাদের দেশ আক্রান্ত। সুতরাং এ যুদ্ধ এখন তোমার, আমার, দেশের প্রতিটি আবালবৃদ্ধবনিতার। পরের ভাবনা পরে হবে। এখন আমাদের সর্বাগ্রে কর্তব্য হল কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শত্রুকে প্রতিহত করা।

কাজেও তারা তাই করেছিল, মল্লিকা। যে উজ্জ্বল নজীর সেদিন তারা স্ট্যালিনগ্রাডে দেখিয়েছিল, যুদ্ধের ইতিহাসে তা দুর্লভ।

উল্লেখযোগ্য যে, মিত্রপক্ষের অন্যতম সরিক হওয়া সত্ত্বেও তখনো পর্যন্ত রাশিয়া প্রায় কোন কিছুই সাহায্য পায়নি ইঙ্গ-মার্কিনদের কাছ থেকে।

এ নিয়ে সেদিন কম সমালোচনা হয়নি দেশে-বিদেশে। এমন কি খাস ইংল্যান্ডও তার ব্যতিক্রম নয়। খুব তো সেদিন তোমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে রাশিয়াকে। কোথায় গেল তোমাদের সেই সেকেন্ড ফ্রন্ট? ডানকার্কের সেই ঘা কি এখনো শুকোয়নি তোমাদের পিঠ থেকে।

হরেক রকম টালবাহানা আর কথার মারপ্যাঁচ ছাড়া তাতে লাভ হয়নি কিছুই। চার্চিলের ভাষায়:

'What can we do to help Russia? There is nothing that we should not do.'

অর্থাৎ—রাশিয়াকে সাহায্য করার জন্য আমরা কি করতে পারি? করণীয় এমন কিছু নেই যা আমরা করব না।

ফলে, গোটা ইয়োরোপ ভূখণ্ডে এ পর্যন্ত যুদ্ধ চালাতে হয়েছে রাশিয়াকে একা। সম্পূর্ণ একা।

শেষ চেষ্টা করা হল ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে। মরিয়া হয়ে জার্মানরা সেদিন দলে দলে গিয়ে আছড়ে পড়তে লাগল ভল্গা নদীর তীরে।

কিন্তু সব বৃথা। স্ট্যালিনগ্রাড অজেয়, অমর। তাই ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই সে রয়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

পরের কাহিনী যেমনি অবিশ্বাস্য, তেমনি অকল্পনীয়।

স্ট্যালিনগ্রাড তিনদিক থেকে অবরুদ্ধ। তা বলে বাইরের লাল ফৌজের অন্যান্য শাখাগুলি কিন্তু চুপচাপ বসে নেই। তলে তলে তখন অন্য দুটি দল নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে বিরাট একটি পরিকল্পনা নিয়ে।

জার্মানরা তখন যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত। লক্ষ্য তাদের স্ট্যালিনগ্রাড। তাদের পার্শ্বদেশ রক্ষা করে চলেছে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ইতালীয় হাঙ্গেরীয় ও রুমানীয় সৈন্যদল।

ওদের শক্তি আর কতটুকু! দুদিক থেকে আচমকা আঘাত হেনে গোটা জার্মান বাহিনীটাকে ঘিরে ফেলা যায় না! দেখাই যাক না একবার চেষ্টা করে!

১৯শে নভেম্বর, ১৯৪২ সাল। ভোররাত্রি।

হঠাৎ সেদিন লাল ফৌজের দুটি বাহু দুদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সবার অগোচরে।

ওদিক থেকে আক্রমণ চালালেন জেনারেল রকোসাভস্কি, এদিক থেকে জেনারেল ভাতুতিন। লক্ষ্য—সমস্ত বাধা-বিপত্তি ছিন্ন-ভিন্ন করে পরস্পর হাত মিলিয়ে অবরুদ্ধ জার্মান বাহিনীকে পিষে মারা।

কাজেও তাই হল। ইতালীয়, হাঙ্গেরীয় ও রুমানীয় সৈন্যদল আর যাই হোক, সুশিক্ষিত জার্মান বাহিনী নয়। তাই দেখতে দেখতেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে কোথায় তারা উড়ে গেল ঝড়ের মতো। কারো পক্ষে টিঁকে থাকা সম্ভব হল না লাল ফৌজের সেই প্রচণ্ড দাপটের কাছে।

বিপদের আশঙ্কায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরে দাঁড়াল জার্মান বাহিনী। কিন্তু সব বৃথা। লাল ফৌজ তখন দুর্বার, মরিয়া। কার সাধ্য তখন তাদের গতি রোধ করে!

সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল ভন পাউলাস বার্তা পাঠালেন জার্মান হাইকম্যাণ্ডের কাছে।

বিপদ আসন্ন। যে-কোন মুহূর্তে আমরা ঘেরাও হয়ে পড়তে পারি। তবে এখনো সময় আছে। ইচ্ছে করলে এখনো পাশ কাটিয়ে পিছিয়ে আসতে পারি। এ সম্বন্ধে নির্দেশ চাই।

রাজী হলেন না হিটলার। না, কোনরকমেই পিছিয়ে আসা চলবে না। তাহলে ককেসাস অঞ্চলের সমস্ত জার্মান সৈন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। সুতরাং ধৈর্য ধর। ব্যস্ত হবার কিছু নেই। সব ব্যবস্থা করছি।

পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ পেল ২০শে নভেম্বর তারিখে। বেলা তখন প্রায় একটা। হঠাৎ রাশিয়ার সবগুলি রেডিও সেদিন ফেটে পড়ল গভীর উল্লাসে।

ঘেরাও! ঘেরাও! ঘেরাও! জার্মানীর বিখ্যাত ষষ্ঠ আর্মি ঘেরাও! লাল ফৌজের দুটি বাহু পরস্পর হাত মিলিয়েছে লাটোসাঙ্কা গাঁয়ে। সাবাস লাল ফৌজ!

আবার ভন পাউলাস বার্তা পাঠালেন হাই-কম্যাণ্ডের কাছে। আমরাও ঘেরাও হয়ে পড়েছি। আত্মসমর্পণ করব কিনা সে সম্বন্ধে নির্দেশ চাই।

না, কোনমতেই না। সেই একই নির্দেশ এল জার্মান ফ্যুয়েরার হিটলারের কাছ থেকে, প্রতিরোধ-ব্যবস্থা চালিয়ে যাও। আমি শীগগিরই ওদের এই অবরোধের প্রাচীর ভেঙে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। ইতিপূর্বে ভন বুশও স্টারারুশাতে একবার ঘেরাও হয়েছিল লাল ফৌজের হাতে। ধরে রাখতে পেরেছিল কি তাকে? সুতরাং নিশ্চিন্ত থাকো। সব ব্যবস্থা হচ্ছে।

কিন্তু খাদ্য! সমর-সম্ভার! ঘেরাও হয়েছে মোট তিন লক্ষ তেত্রিশ হাজার সৈন্য। সোজা কথা তো নয়!

ভাবনার কিছু নেই। সব আকাশপথে বিমানযোগে পাঠানো হবে।

তাই পাঠানো হল। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সে আর কতটুকু? তাছাড়া লাল ফৌজ তাদের সে সুযোগ দেবেই বা কেন?

ডাকা হল ফিল্ড-মার্শাল ভন ম্যানস্টাইনকে। যে করে হোক, লাল ফৌজের বেষ্টনী ভেঙে ষষ্ঠ আর্মিকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করো। অবিলম্বে।

১২ই ডিসেম্বর ম্যানস্টাইন প্রচণ্ড আক্রমণ চালালেন লাল ফৌজের বিরুদ্ধে। বেষ্টনী ভেঙে এগিয়েও গেলেন অনেকটা দূরে।

আর মাত্র ত্রিশ মাইল বাকি। তারপরেই ভন পাউলাসের সেই ষষ্ঠ আর্মি।

কিছুতেই কিছু হল না। ১৬ই তারিখে আবার তাঁকে পিছু হটতে হল লাল ফৌজের হাতে পাল্টা-মার খেয়ে। ষষ্ঠ আর্মিকে উদ্ধারের আশা সেখানেই শেষ।

৮ই জানুয়ারি দুজন রুশ সামরিক অফিসার সাদা নিশান তুলে এগিয়ে গেলেন জার্মান লাইনের কাছে।

এই নাও আমাদের কম্যাণ্ডারের চিঠি। তাঁর নির্দেশ—অবিলম্বে তোমাদের আত্মসমর্পণ করতে হবে। কাল সকাল দশটার মধ্যে জবাব চাই। দাবী অগ্রাহ্য হলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা নিরুপায়!

ষষ্ঠ আর্মির অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। তিন লক্ষ তেত্রিশ হাজার থেকে নিঃশেষ হতে হতে তখন আশি হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে, তবু ভন পাউলাস সেই চরমপত্র প্রত্যাখ্যান করলেন অত্যন্ত ঘৃণাভরে। ফ্যুয়েরারের আদেশ—শেষপর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। তার ওপরে কোন কথাই থাকতে পারে না।

বাধ্য হয়ে ১০ই জানুয়ারি জেনারেল রকোসাভস্কি আক্রমণ শুরু করলেন অবরুদ্ধ ষষ্ঠ আর্মির ওপর।

হয় আত্মসমর্পণ, নয়তো মৃত্যু—দুটোর একটা তোমাদের বেছে নিতে হবেই। এখনো বলো, কোন্‌টা তোমার চাও?

দেখতে দেখতে শেষ বিমান-ঘাঁটিটিও চলে গেল ষষ্ঠ বাহিনীর হাত থেকে। ফলে, সবরকম সরবরাহ বন্ধ। খাদ্য, সমর-সম্ভার—সব কিছু।

২৫শে ডিসেম্বর ষষ্ঠ আর্মির সংখ্যা এসে দাঁড়াল মাত্র পনেরো থেকে বিশ হাজারে।

বোঝা গেল যে, প্রদীপ নিভতে আর বেশি বাকি নেই।

৩১শে ডিসেম্বর থেকে আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না ষষ্ঠ আর্মির দিক থেকে। সামান্য প্রতিরোধও না।

নাটকের শেষ অঙ্ক অভিনীত হল ২রা ফেব্রুয়ারি, বিকেল ঠিক চারটেয়। মোট চব্বিশজন জেনারেল এবং আড়াই হাজার অফিসারসহ ফিল্ড-মার্শাল ভন পাউলাসকে সেদিন বন্দী হতে হল লাল ফৌজের হাতে।

আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন কমরেড স্ট্যালিন। সাবাস লাল ফৌজ! তোমরা যা করেছ, ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

আর হিটলার! ষষ্ঠ আর্মির চরম আত্মদানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তিনি তিনদিন শোক প্রকাশের নির্দেশ দিলেন সমগ্র জার্মানীতে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে এ পর্যন্ত আর কোনদিনও জার্মানীকে এতবড় পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয়নি, মল্লিকা। সেদিক থেকে স্ট্যালিনগ্রাডের এই বিপর্যয় খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা, সন্দেহ নেই।

বিশেষ করে হিটলারের পক্ষে। স্ট্যালিনগ্রাড তাঁর অহঙ্কারে আঘাত করেছে, আহত করেছে। বিশ্বাসের ভিত ভেঙে দিয়েছে। কোথায় এর শেষ কে জানে!

দেখে দেখে অস্থির হয়ে উঠলেন সুভাষ।

নিজের হাতে গড়া আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে কেন্দ্র করে এতদিন তিল তিল করে যে স্বপ্নসৌধ গড়ে উঠেছিল, তা সবই আজ মিথ্যে হয়ে যেতে বসেছে। কি আফ্রিকা, কি রাশিয়া, সর্বত্র আজ জার্মানীকে পরাজয়ের মুখে এসে দাঁড়াতে হয়েছে হিটলারের অবিমৃশ্যকারিতার ফলে।

এ অবস্থায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের পক্ষে আফগানিস্তান ডিঙিয়ে ভারতভূমিতে পা দেবার আর কোন প্রশ্নই ওঠে না। তা করতে হলে সর্বাগ্রে এখন যেতে হবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়।

জীবনে সার্থকতা ফেলে কেউ ব্যর্থতা চায় না। তবু তা পেতে হয়। তবু তা মেনে নিতে হয়।

তাই নিরুৎসাহ না হয়ে সুভাষ এবার নানাভাবে চাপ দিতে শুরু করলেন জার্মান সরকারকে। আমি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যেতে চাই। তোমরা ব্যবস্থা করো। অবিলম্বে।

বাধা দিলেন হিটলার। তা হয় না। জাপান তো বলেই দিয়েছে যে, আশা খুবই কম। শতকরা পাঁচভাগ মাত্র। তাছাড়া যুদ্ধ-পরিস্থিতি এখন অন্যদিকে মোড় নিতে শুরু করেছে। এ অবস্থায় বাইরে যাওয়া অসম্ভব।

অসম্ভব! মনে মনে হাসলেন সুভাষ।

দেশের জন্য নিজের গলা বন্ধক রেখে আমি একদিন জার্মানীতে এসেছিলাম। দরকার হলে তেমনিভাবেই আবার একদিন চলে যাব। ব্রিটিশের

সুদক্ষ গোয়েন্দা বাহিনী হাজার চেষ্টা করেও সেদিন আমাকে বাধা দিতে পারেনি। তোমাদের গেস্টাপো বাহিনীও পারবে না।

'For the sake of my country, I have risked my neck to come to Germany. For the same reason I am prepared to risk my neck to return to India. The British C. I. D. is very efficient and just as I escaped inspite of it, I shall escape your Gestapo also.' [Ganpuley : P.—19]

চিঠি গেল পররাষ্ট্র-সচিব রিবেনট্রপের কাছে।

আমি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাব। শতকরা পাঁচভাগ নয়, একভাগ আশা থাকলেও যাব। অবিলম্বে ব্যবস্থা করো।

এবারও এগিয়ে এলেন পরম শুভার্থী সেই ভন ট্রট।

সোজা লোক নন এই হিজ এক্সেলেন্সী নেতাজী সুভাষ বোস। এই তো সেদিন ফুয়েরারকে মুখের ওপর বলে দিলেন যে—'আমাকে উপদেশ দিতে হবে না'।

এবার আরো কত কি বলে বসবেন, কে জানে! তার চাইতে দেখা যাক, দুপক্ষকেই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একটা কিছু ব্যবস্থায় আসা যায় কিনা!

কাজেও তাই করলেন ভন ট্রট। নানাভাবে তিনি বোঝালেন হিটলারকে। নানা যুক্তি দিয়ে।

জাপান আমাদের বন্ধু। শুধু বন্ধু নয়, তাদের সংগে আমরা সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ। কিন্তু কতটুকু আমরা তাদের সাহায্য করতে পেরেছি এবারের যুদ্ধে?

তারা যখন এত করে বলছে, তখন আমাদের উচিত অবিলম্বে হিজ এক্সেলেন্সী নেতাজী বোসকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা। নইলে তারা আমাদের ভুল বুঝতে পারে।

যুক্তিটা অস্বীকার করতে পারলেন না হিটলার। সত্যিই তো! জাপান আমাদের বন্ধু। তাদের দিকটাও দেখতে হবে তো!

কিন্তু কি করে নেতাজী বোসকে এখন ওখানে পাঠানো সম্ভব? কাজটা যে খুবই বিপজ্জনক!

অথচ ভন ট্রটের যুক্তিটাও একেবারে অস্বীকার করা যায় না। দেখা যাক, কতদূর কি হয়!

ভন ট্রট কিন্তু আর বেশিদিন বাঁচেননি মল্লিকা। বছর দেড়েক বাদেই তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল হিটলারকে হত্যা প্রচেষ্টার অপরাধে। শুধু ভন ট্রটকে নয়, আরো অনেককেই। সে কাহিনী বলব তোমাকে যথা-সময়ে।

চুপ করে বসে থাকার মতো লোক সুভাষ নন। ইতিমধ্যে দু-দুবার তিনি ঘুরে এলেন ইতালী থেকে। ওদের একটা দূর-পাল্লার বিমান নাকি

কিছুদিন আগে কোথাও না থেমে একটানা সিঙ্গাপুর পর্যন্ত উড়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। দেখা যাক, মুসোলিনীকে বলে কিছু ব্যবস্থা করা যায় কিনা!

ইয়োরোপের সংগ্রামী জীবনে সুভাষ হিটলারের কাছ থেকে যতটা না সহযোগিতা পেয়েছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তার চাইতে অনেক বেশি সহযোগিতা পেয়েছিলেন মুসোলিনীর কাছ থেকে।

স্বাধীনতা-সংগ্রামী সুভাষের প্রতিটি কাজের প্রতি মুসোলিনীর শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ ছিল অপরিসীম। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এককালে গান্ধীজীও অত্যন্ত শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করতেন মুসোলিনী সম্বন্ধে।

তা বলে এবার কিন্তু মুসোলিনী রাজী হতে পারলেন না সুভাষের এই প্রস্তাবে। পরীক্ষামূলকভাবে একটা বিমান সিঙ্গাপুর পর্যন্ত উড়ে গিয়েছিল, একথা ঠিক। কিন্তু পরের বারেও যে সে প্রচেষ্টা সার্থক হবে, তার নিশ্চয়তা কি?

তাছাড়া সবচাইতে বড় প্রশ্ন, মহামান্য পোপের ভ্যাটিকান শহর। ভ্যাটিকান খোলা নগরী। স্বভাবতই বিভিন্ন রাষ্ট্রের গুপ্তচরদের কাছে ভ্যাটিকান এখন স্বর্গপুরী। কোনরকমে খবরটা ফাঁস হয়ে গেলে বিপদ অনিবার্য। ভাল-মন্দ কিছু হলে তখন পৃথিবীর কাছে তিনি মুখ দেখাবেন কি করে?

অসম্ভব! জেনে-শুনে কিছুতেই তিনি সুভাষকে এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিতে পারবেন না।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, মুসোলিনী সেদিন কোনরকম ঝুঁকি নিতে রাজী হননি। নিলে বোধহয় সুভাষকে আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুখ দেখতে হত না, মল্লিকা।

এ প্রসঙ্গে এন. জি. গনপুলে কি বলেছেন শোন:

'The Vatican City in Rome was an open centre for diplomats of all countries. Rome itself was a honeycomb of spies where it was not possible to keep anything secret for very long.

Netaji was required therefore to give up the attempt of flying from Italy and had to return sadder and downcast. In reality, it was good that he did not risk the flight, otherwise he would have been surely taken prisoner or his plane shot down.'

[Nataji in Germany : N. G. Ganpuley : P.—128]

রোম থেকে আবার বার্লিন। তারপরই সোজা জাপানী দূতাবাসে। কন্দুর হল! কবে আমি যাব তোমাদের দেশে? কবে? কবে? আর কত দেরি?

ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠলেন সুভাষ। গনপুলের ভাষায়ঃ

'Netaji, however, was getting uneasy and bad-tempered because his mind was already working in the Far Eastern regions whereas his body was still in Germany.'

চলতি কথায়, মন পড়ে আছে দূর প্রাচ্যে, দেহ পড়ে আছে জার্মানীতে। ভাবনা-চিন্তা দেহ-মন সব কিছু আচ্ছন্ন হয়ে আছে সেই একটি বিন্দুতে। কবে আমি ওখানে যাব? কবে?

ওদিকে তখন ভেতরে ভেতরে কূটনৈতিক পর্যায়ের আলোচনা শুরু হয়ে গেছে, জার্মানী, ইতালী ও জাপানের মধ্যে।

যুদ্ধ-পরিস্থিতি অত্যন্ত ঘোরালো। কি করে এখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাঠানো যায় নেতাজী বোসকে?

কাজটা খুবই বিপজ্জনক। বিশেষ করে জার্মানীর পক্ষে।

জার্মানীর এখন আর সেদিন নেই। মার্কিন সাহায্য-পুষ্ট ব্রিটিশ বাহিনী ইতিমধ্যেই বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

এমন কি তাদের রাজকীয় বিমান-বহর এখন প্রকাশ্যেই এসে হানা দিতে শুরু করেছে জার্মানীর আকাশে।

নৌ-বহরের দিক থেকেও আগেকার তুলনায় ব্রিটিশ এখন অনেক শক্তিশালী।

ইংলিশ চ্যানেল, উত্তর সাগর, ভূমধ্য সাগর, আটলাণ্টিক মহাসাগর—সব কিছুই এখন তাদের দখলে। এ অবস্থায় জাহাজ বা বিমানের সাহায্যে এত দূর পথ পাড়ি দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

একমাত্র উপায় সাবমেরিন। কিন্তু তাতেই বা ভরসা কোথায়?

কখন যে টর্পেডো, মাইন, ডেপথ্-চার্জ বা ভারী কামানের পাল্লার মধ্যে পড়ে যেতে হবে, তা কে বলতে পারে? বরং সেটাই তো স্বাভাবিক। গনপুলের ভাষায়ঃ

'Germany had the most difficult task, as her submarine was required to pass through mine-infested and carefully guarded waters round the British isles. Passing through the English Channel was considered a very hazardous and dangerous assignment.'

দিনের পর দিন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ। মাসও বুঝি গড়িয়ে যায়। তবু আলোচনার আর শেষ নেই।

একবছর আগে হলে কথা ছিল না, কিন্তু এখন বলতে গেলে জার্মানীর চারিদিকেই বিপদ। সুতরাং সব দিক ভাল করে ভেবে-চিন্তে দেখা দরকার।

সবচাইতে বড় প্রশ্ন, অন্যতম শরিক জাপান। জাপান রয়েছে পৃথিবীর আর এক প্রান্তে। স্বভাবতই যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সবই করতে হয় টেলিফোন বা রেডিওগ্রামের মাধ্যমে।

সেখানেও পদে পদে সংশয়। পদে পদে ভয়। শত্রুপক্ষ মাঝ থেকে ট্যাপ করে খবরটা ধরতে পেরেছে কিনা কে জানে! তাই সব কিছুই করতে হয় সাঙ্কেতিক ভাষায়।

দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর অবশেষে একদিন স্থির সিদ্ধান্তের বিন্দুতে এসে দাঁড়ালেন কূটনৈতিক প্রতিনিধিবৃন্দ।

জাহাজ নয়, বিমানও নয়, যেতে হবে সাবমেরিনেই।

অবশ্য বিপদ সব দিকেই আছে, তবু সাবমেরিনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত কম। মাত্র একজন তাঁর সঙ্গে যেতে পারবে সঙ্গী হিসেবে।

প্রথমার্ধের পথই সবচাইতে বিপদসঙ্কুল। সে দায়িত্ব বহন করবেন জার্মান সরকার। তাঁরা তাঁকে পেঁছে দেবেন দক্ষিণ-আফ্রিকা সংলগ্ন মাদাগাস্কারের কাছাকাছি একটা স্থানে। বাকি অংশের দায়িত্ব জাপান সরকারের।

এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে জার্মান বৈদেশিক দপ্তরের আলেকজান্দার ওয়র্থ পরবর্তী কালে কি বলেছেন শোন ঃ

'After long and complicated discussions with the Italian and the Japanese Embassies in Berlin and Rome, the following was agreed upon between the Special India Division and the German military authorities; Netaji accompanied by only one friend should be taken by a German submarine by way of the British Channel, Bay of Biscay, West Africa, South Africa to the south of Madagaskar where he should be transferred to a Japanese submarine which would take him to the nearest Japanese base in East Asia.

All these arrangements were successfully carried out through the joint efforts of Netaji and the Special India Division and thanks to the initiative of General Oshima, Ambassador of Japan in Berlin, his Military attache Mr. Yamamoto, and other members of the Japanese Embassy in Berlin and Rome, as well as the competent German military authorities'.

[Netaji in Germany : Alexander Werth : P.—38]

শুরুতেই বাধা এল জাপানী নৌ-বিভাগের পক্ষ থেকে। জাপানী আইনে অসামরিক লোকের পক্ষে সাবমেরিন ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। সুভাষচন্দ্র বোস তাহলে যাবেন কি করে?

উত্তর দিলেন সেই ভন ট্রট্। সুভাষ বসু ইণ্ডিয়ান আর্মির কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ্। তিনি অসামরিক লোক হলেন কি করে?

ব্যস, সব চুপ। আর একটি কথাও শোনা গেল না জাপানী নৌ-বিভাগের পক্ষ থেকে।

'When Trott received this message by cable from the German Ambassador in Tokyo, Mr.Ott, he immediately sent his reply, 'Subhas Chandra Bose by no means private person but 'Commander-in-Chief of Indian Liberation Army'."

[Ibid : P.—38]

পরিকল্পনা মতো প্রথমেই জাপানী দূতাবাসের কর্ণেল ইয়ামামোতো পাড়ি দিলেন টোকিওর উদ্দেশ্যে। সুভাষচন্দ্র বসুর অভ্যর্থনার জন্য আগে থেকেই ওখানে গিয়ে ব্যবস্থা করা দরকার।

তখনো রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের অনাক্রমণ চুক্তি বিদ্যমান। সুতরাং তাঁর পক্ষে তুরস্ক ও মস্কো হয়ে জাপান পাড়ি দিতে অসুবিধার কোন প্রশ্ন নেই।

কিন্তু ব্রিটিশের পয়লা নম্বর শত্রু সুভাষের বেলায় এবার আর সে-কথা খাটে না। স্বভাবতই সে-পথ এখন রুদ্ধ। তাই এই দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল পথ এবার তাঁকে পাড়ি দিতে হবে সাবমেরিনে।

কিন্তু কবে? কবে নতুন করে যাত্রা শুরু হবে সুভাষের?

না, সে-কথা একমাত্র নেতাজী আর দু-তিনজন ছাড়া কাউকেই বলা হবে না।

এ-যাত্রা কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এ-পথে জীবন ও মৃত্যুর পাশাপাশি বাস।

নেতাজী বোস সাধারণ লোক নন। কোনরকমে একবার টের পেলে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি যে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে তাঁকে প্রতিহত করবার চেষ্টা করবে, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এখন নয়। বলা হবে আরো পরে।

'অতঃপর নেতাজী জার্মানী হইতে সাবমেরিনযোগে জাপান চলিয়া আসিলেন।'

বলা সহজ, কিন্তু কাজটা মোটেই সহজ নয়, মল্লিকা।

কোন গ্যারান্টি নেই। কোন নিশ্চয়তা নেই। কি যে হবে, কেউ তা বলতে পারে না। এমন কি হিটলার, মুসোলিনী, তোজো প্রমুখ রাষ্ট্রনায়কগণও সেদিন পুরোপুরি আশা করতে পারেননি যে, সুভাষের এই যাত্রা সার্থক হবে।

আশা করা সম্ভবও ছিল না। কারণ, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। প্রায় সবটাই শত্রু-অধ্যুষিত অঞ্চল। তাদের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে এই দীর্ঘ পথ নির্বিঘ্নে অতিক্রম করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

সুভাষও তা জানতেন। শত্রুপক্ষের মাইন, টর্পেডো, ডেপথ্-চার্জ ইত্যাদি এড়িয়ে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা যে সহজসাধ্য নয়, সে-সব কোন কিছুই তাঁর অজানা ছিল না।

তবু সেই বিপদসঙ্কুল পথই তিনি বেছে নিয়েছিলেন সব কিছু তুচ্ছ করে। জীবনের একমাত্র স্বপ্ন—স্বাধীনতা। সেখানে নিজের কথা চিন্তা করার মতো অবকাশ কোথায়?

যেদিন সব কিছু পেছনে ফেলে রেখে এক বস্ত্রে, প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে পা বাড়িয়েছিলেন, সেদিনই কি তিনি বারেকের জন্য চিন্তা করেছিলেন নিজের কথা ?

একবারও কি ভেবেছিলেন যে, ভবিষ্যতে তাঁর জন্য কি অপেক্ষা করে আছে ?

এই হল সুভাষ। স্বাধীনতা কে না চায়! কে না ভালবাসে! কিন্তু সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এমন করে মরিয়া হয়ে উঠতে পেরেছিলেন ক'জন!

সুভাষ পেরেছিলেন। পেরেছিলেন বলেই তো আজও তিনি লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষের মনে বেঁচে আছেন এক ও অদ্বিতীয় মহাক্ষত্রিয় 'নেতাজী' হয়ে, যা অহিংস ভারতবর্ষে সেদিন কল্পনা করাও কষ্টকর ছিল। যাক, আগেকার কথায় ফিরে যাই।

বাইরে থেকে কোন কিছু বোঝার উপায় নেই। যেন কিছুই হয়নি। যেমন চলছিল, তেমনই যেন চলছে সব কিছু।

ভেতরে ভেতরে কিন্তু প্রস্তুতি-পর্ব তখন চলেছে সমানভাবেই। সুভাষও প্রস্তুত। শুধু ঝাঁপ দেবার অপেক্ষা মাত্র।

প্রথমেই সুভাষের কয়েকটি বক্তৃতা রেকর্ড করে রাখা হল বেতারের জন্য। তাঁর অবর্তমানে মাঝে মাঝেই এগুলি প্রচার করা হবে আজাদ হিন্দ্ রেডিও থেকে।

উদ্দেশ্য—ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিকে বিভ্রান্ত করা। অর্থাৎ—সুভাষ এখানেই রয়েছেন। কোথাও তিনি যাননি জার্মানী ছেড়ে।

সুভাষের কথাবার্তার মধ্যেও নতুন সুর। পরিচিত-অপরিচিত সর্বত্র একই কথা।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য কিছুদিনের জন্য রাশিয়া ফ্রন্টে যাচ্ছি। তোমরা সবাই ঠিকমত কাজ চালিয়ে যেও। মাসখানেকের মধ্যেই আবার ফিরে আসছি এখানে।

কিন্তু সঙ্গে কে যাবেন ?

মাত্র একজনকে সঙ্গে নেওয়া চলবে।

কে সেই লোক ?

কি তাঁর নাম ?

আবিদ হাসান। হায়দরাবাদের তরুণ ছাত্র বার্লিনে অধ্যয়নরত আবিদ হাসান। সেই আবিদ হাসান, যিনি সর্বপ্রথম যোগ দিয়েছিলেন সুভাষের সেই পনের জনের বাহিনীতে। তিনিই সেদিন সুভাষের সঙ্গে পাড়ি দেবেন তাঁর একান্ত-সচিবরূপে।

সুভাষের ইচ্ছা তা-ই।

কিন্তু এন. জি. স্বামী। বেতার-বিজ্ঞান ও নানাবিধ সাঙ্কেতিক লিপিতে

অভ্যস্ত স্বামীকে যে চাই-ই! ওঁর সহযোগিতা যে খুবই প্রয়োজন হবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সেই রণাঙ্গনে! ওঁকে না পেলে কি করে চলবে?

তাই মেনে নিলেন জার্মান সরকার। ঠিক আছে, তাই হবে। স্বামীকে পাঠাবার দায়িত্ব আমরা নিলাম। তবে ঠিক এখনই নয়, ক'দিন বাদে।

তাই তাঁরা করেছিলেন, মল্লিকা। হাজার প্রতিকূলতা ঠেলেও স্বামীকে তাঁরা যথাসময়েই পেঁাছে দিয়েছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সেই রণাঙ্গনে।

২৬শে জানুয়ারি, ১৯৪৩ সাল।

অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে সেদিন ভারতের স্বাধীনতা দিবস পালন করা হল বার্লিনে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রায় ছ'শো কূটনৈতিক প্রতিনিধি সেদিন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন সুভাষের আহ্বানে। পৃথিবীর সর্বত্র সেদিন সেই অনুষ্ঠানের ধারাবিবরণী প্রচার করা হয়েছিল আজাদ হিন্দ্ রেডিও থেকে।

আশ্চর্য, সুভাষ সেদিন ভাষণ দিলেন জার্মান ভাষায়ঃ

'Britischer Imperialismus und Indischer Nationalismus koennen niemals eine libendige Einheit eingehen. Weil Indien und Gross Britannine kein gemeinsames ziel haben koennen Ihre nationalen Interessen sind vollkommen untea schieden'.

পরে দেশীয় ভাষায়ঃ

২৬শে জানুয়ারি। পৃথিবীর সর্বত্র আজ ভারতীয়গণ সমবেত হয়ে থাকেন তাঁদের স্বাধীনতা দিবস পালনের জন্য। ১৯৩১ সালে আমি যখন কলকাতার মেয়র ছিলাম, তখন এই স্বাধীনতা দিবসেই আমি আক্রান্ত হয়েছিলাম ব্রিটিশ অশ্বারোহী পুলিশের দ্বারা। সেদিনের সেই আঘাতের দাগ আজও আমার দেহে অক্ষয় হয়ে আছে।

...ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতের জাতীয়তাবাদ কখনো একসঙ্গে বেঁচে থাকতে পারে না। কারণ, ভারত ও ব্রিটেনের পরস্পরের স্বার্থ এক নয়, তাদের জাতীয় স্বার্থ সম্পূর্ণ বিপরীত।...আজ হোক, কিংবা কাল হোক, এই সংগ্রামের চরম অধ্যায়ে আমাদের পেঁাছতেই হবে। এই সংগ্রাম—যা ভারতের কাছে জীবন-মৃত্যুর সংগ্রাম হয়ে উঠেছে, যা ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হয়ে উঠেছে, তাতে একটি মাত্র লক্ষ্যই আমাদের থাকবে। সে লক্ষ্য হল—আমাদের জয়লাভ। আমাদের স্বাধীনতা। জয় হিন্দ্!'

আর একটি অনুষ্ঠান হল জাপানী দূতাবাসে।

মাত্র কয়েকজন অতিথি। সব মিলিয়ে বারো জন। সুভাষ ও সহকারী নেতা নাম্বিয়ার তাঁদের অন্যতম। তবে অন্য দিক থেকে এ অনুষ্ঠানটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অনুষ্ঠান শেষ। অতিথিরা সবাই চলে গেছেন একে একে। সহকারী নেতা নাম্বিয়ারও চলে গেছেন একটু আগে। বাকি শুধু সুভাষ।

এবার শুরু হল আসল আলোচনা। কথা বলতে একটাই। রেডি ইওর এক্সেলেন্সী চন্দ্র বোস। জিরো আওয়ার আসন্ন। সময় নিকট হয়েছে, এবার বাঁধন ছিঁড়তে হবে। কর্ণেল ইয়ামামোতো আগেই জাপানে চলে গেছেন আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবেন বলে।

অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে নিমেষে মনের মণি-কোঠা জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে সুভাষের।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটেছে। অচিরেই তাঁকে পাড়ি দিতে হবে নতুন দেশে। নতুন পরিবেশে। নতুন করে।

জয় বীরেশ্বর বিবেকানন্দ! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

'ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ে'র জন্য বলিপ্রদত্ত—'

জানি স্বামীজী, আমি জানি। তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো। প্রয়োজন হলে আমি যেন নিজেকে বলি দিয়েও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে পারি!

আর যদি যাবার পথেই ভাল-মন্দ একটা কিছু ঘটে যায়?

তাহলে জীবনের সেই অন্তিম মুহূর্তেও আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রেখে যাব মহানায়ক রাসবিহারী বসুর উদ্দেশে। তাঁর প্রচেষ্টা সার্থক হোক। ভারত স্বাধীন হোক।

'If I was lost on the way, please transfer my will to Mr. Behari Bose and my last wishes for his success.'

২৮শে জানুয়ারি।

সে কি বিশ্রী দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সেদিন গোটা জার্মানী জুড়ে। শুধু বরফ আর বরফ! সকাল থেকে ঝুর ঝুর করে ঝরছে তো ঝরছেই। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।

ইতিমধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে নানাদিক থেকে।

মে মাস থেকেই স্বাধীন বৈদেশিক মিশনের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে আজাদ হিন্দ্ কেন্দ্রকে। মুসংত আজাদ হিন্দ্ কেন্দ্রের মর্যাদা এখন যে-কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদার সমান।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজ এখন আর আগেকার সেই Annaberg ক্যাম্পে নেই। দলবৃদ্ধির জন্য এখন তাদের স্থান হয়েছে Konigsbruck ক্যাম্পে। মস্ত বড় ক্যাম্প। সুখ-সুবিধাও সেখানে যথেষ্ট।

সেদিন পায়ে পায়ে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সেই ক্যাম্পে গিয়ে হাজির হলেন সুভাষ।

যাবার আগে শেষ দেখা। নিজের হাতে গড়া সন্তান-সম এই সেনা-

বাহিনীকে এখানে ফেলে রেখে যেতে মন সায় দেয় না। দেহ সাড়া জাগায় না। কিন্তু উপায় কি! বৃহত্তর কর্তব্যের আহ্বানে যেতে যে তাঁকে হবেই।

অবশ্য ফৌজ যেমন রয়েছে, তেমনিই থাকবে। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী সব কিছুই এখন থেকে দেখা-শোনা করবেন সহকারী নেতা নাম্বিয়ার। তাই ঠিক হয়েছে জার্মান বৈদেশিক দপ্তরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে।

জয় হিন্দ্! জয় হিন্দ্! নেতাজী! নেতাজী! নেতাজী!

সুভাষকে দেখেই হাজার হাজার নওজোয়ান ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এসে ভীড় করে দাঁড়াল তাঁর চারপাশে। নেতাজী আয়া! আজাদ হিন্দ্ ফৌজকা নেতাজী! হিন্দুস্থানকা নেতাজী! সবকোইকো নেতাজী!

সুভাষ তখন বেশ একটু অসুস্থ। তাই আগেই তিনি ফৌজী ভাইদের জানিয়ে দিলেন তাঁর অক্ষমতার কথা। আমি আজ বেশি কিছু বলতে পারব না ভাই। বড়জোর পনের-বিশ মিনিট।

একে বরফ-ঝরা দিন, তার ওপর খোলা জায়গা। সেই খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে সুভাষ শুরু করলেন তাঁর পনের-বিশ মিনিটের সংক্ষিপ্ত ভাষণ। প্রথমে ক্লান্তি-জড়িত স্বরে—পরে দীপ্তকণ্ঠে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

অনেকক্ষণ কেটে গেল এমনি করেই।

কত কথা। কত ভাঙা-গড়ার কাহিনী। স্বাধীনতা-সংগ্রামের কত ইতিহাস। যেন শেষ নেই এই উত্থান-পতন আর ভাঙা-গড়ার ইতিহাসের।

এই শেষ দেখা। তাই যাবার আগে সব কথা আজ বলে যেতে হবে। উজার করে দিতে হবে নিজেকে। কিছুই ফেলে রাখলে চলবে না।

হাজার হাজার আজাদী সৈনিক বিস্মিত, নির্বাক।

ঠাণ্ডায় সর্বাঙ্গ জমে গেছে। পোশাক-পরিচ্ছদ সব কিছু ভিজে গেছে বরফ-বৃষ্টিতে। তবু কোন খেয়াল নেই তাদের। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব কিছুই বুঝি তারা ভুলে গেছে তাদের একান্ত প্রিয় নেতাজীকে কাছে পেয়ে।

কতক্ষণ সেদিন ভাষণ দিয়েছিলেন সুভাষ? বেশি নয়, মাত্র সোয়া দু ঘণ্টা।

'He wanted to speak only for about 15 to 20 minutes, but after he made the beginning and started opening his heart to those who had gathered there, he forget about his illness, and his cold and everything else, and spoke for exactly two hours and a quarter.'

সব শেষে সবার সঙ্গে বসে খাওয়া। এটা সুভাষের বরাবরের অভ্যাস। মাঝে মাঝে আজাদী সৈনিকদের মাঝে বসে খাওয়া তাঁর চাই-ই। তখন আর তিনি তাঁদের কাছে নেতাজী নন, ভাই, বন্ধু, গুরু সব কিছুই।

খাওয়া শেষ। এবার সুভাষকে বিদায় নিতে হবে। বিদায় দিতে হবে।

বরাবর যা হয়, এবারও তাই হল। হাজার কণ্ঠে সমস্বরে রব উঠল—

নেতাজী জিন্দাবাদ! নেতাজী জিন্দাবাদ! আবার এসো নেতাজী। আমরা তোমার পথ চেয়ে থাকব। জয় হিন্দ্!

'জয় হিন্দ্!'

এক অকথিত ব্যথায় সুভাষ গম্ভীর, করুণ, স্বল্পবাক্।

বুঝি এক লহমার ব্যাপার, তারপরই তিনি সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললেন জোর করে।

এ দুঃখ তাঁর একার। এ বেদনার ভাগ দেওয়া চলবে না কাউকেই। বুকটা ব্যথায় ভেঙে গুঁড়িয়ে গেলেও আজ তাঁকে মুখের হাসি জিইয়ে রাখতে হবে সর্বক্ষণ। এ ছাড়া কোন উপায় নেই।

বিদায় ফৌজী ভাইগণ, বিদায়! যেতে যেতে অজ্ঞাতেই বুঝি কথাটা বেরিয়ে এল সুভাষের বুক চিরে, সব যেমন ছিল তেমনই থাকবে। সবই চলবে সংসারের অপরিবর্তনীয় নিয়মের নির্দেশে। আমিই শুধু থাকব না। তবু যেখানেই থাকিনে কেন, তোমাদের কথা আমি ভুলব না। কোনদিনও না।

৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩ সাল। তখনো অন্ধকার কাটেনি। আলো-আঁধারিতে পথ-ঘাট, গাছ-পালা, পাহাড়-নদী সব কিছুই রহস্যময়।

বার্লিনের লেহ্র্টার ব্যানহক (Lehrter Bahnhof) রেল-স্টেশন। কিয়েল-গামী গাড়ি ছাড়ার সময় হয়েছে। আর দেরি নেই।

সাধারণ দৃষ্টিতে কোথাও কোন পরিবর্তন নেই। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, পরিস্থিতি আজ অন্যান্য দিনের মতো স্বাভাবিক নয়।

এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুর্ধর্ষ জার্মান গোয়েন্দার দল। চোখে-মুখে তাদের শাণিত তলোয়ারের দৃষ্টি।

হিজ এক্সেলেন্সী সুপ্রীম কম্যাণ্ডার আজাদ হিন্দ্ ফৌজ—নেতাজী সুভাষ বসু আজ যাবেন লেহ্র্টার ব্যানহফ স্টেশন হয়ে। এত সতর্কতা শুধু তারই প্রয়োজনে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তনের মুখে। রেল-স্টেশন, বিমান-ঘাঁটি, বন্দর, পোতাশ্রয় কিছুই এখন আর নিরাপদ নয়। শত্রুপক্ষের গুপ্তচর বিভাগও এখন আগেকার তুলনায় অনেক বেশী তৎপর। কোথায় যে কে ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছে, কে জানে!

সুভাষ বোসের মতো লোককে পেলে যে তারা সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে, সে তো বলাই বাহুল্য। সুতরাং সাবধানতা প্রয়োজন।

সাবমেরিন কম্যাণ্ডারকেও এ সম্বন্ধে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে বার বার।

শত্রু-জাহাজের সাক্ষাৎ পেলেই যে তোমাদের হাত নিস্ পিস্ করে ওঠে, তা আমরা জানি। কিন্তু সাবধান! এক্ষেত্রে ওসব একেবারেই চলবে না।

মনে রেখো যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দাবানল এখন জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে—সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

উত্তর সাগর, আটলাণ্টিক, ভারত মহাসাগর—সর্বত্র এখন ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির দুরপাল্লার বোমারু-বিমান, মাইন ও যুদ্ধ-জাহাজের সমারোহ।

প্রতিটি গতিপথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে মার্কিন এবং বিশ্বের সেরা গোয়েন্দা বিভাগ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের শত শত অভিজ্ঞ গোয়েন্দার দল।

যে-কোন মুহূর্তে টর্পেডো বা ডুবন্ত মাইনের বিস্ফোরণে অতল সমাধি হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। কারণ, যেতে হবে শত্রুর নাকের ডগার ওপর দিয়ে, যুদ্ধ-জাহাজের দৃষ্টি এড়িয়ে, রাডার-যন্ত্রকে ফাঁকি দিয়ে, অতি সঙ্গোপনে।

সুতরাং খুব সাবধান! কোনরকম ঝুঁকি এক্ষেত্রে নেওয়া চলবে না। একটিবারের জন্যও না।

মনে রেখো যে—এমন একটি কঠিন দায়িত্ব তোমার উপর অর্পণ করা হয়েছে, যা শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয়, ইতিহাসের বিষয়বস্তুও বটে।

সুতরাং এগুতে হবে একেবারে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে।

ঠিক একইভাবে, একই সময়ে ওদিক থেকে জাপানী সাবমেরিনকে পাড়ি দিতে হবে সময়ের সঙ্গে চুলচেরা হিসেব করে।

একটু এদিক-ওদিক হলেই বিপদ। হাজার চেষ্টা করলেও তখন কেউ কারো দেখা পাবে না মাদাগাস্কারের সেই নির্দিষ্ট স্থানে। সুতরাং আবার বলছি যে—সাবধান! খুব সাবধান!

লেহর্টার ব্যানহফ থেকে ট্রেনে জার্মানীর উত্তর সীমানায় অবস্থিত কিয়েল বন্দর।

ওখানেই তখন 1/29 নম্বর সাবমেরিনটা অপেক্ষা করছিল সুভাষের জন্য। সেই চরম বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়েও একজন ভিন্ন রাষ্ট্রনায়কের প্রয়োজনে একটি সাবমেরিনের ব্যবস্থা করা—এটা সত্যিই অভাবনীয়। সেই অভাবনীয় সম্মানই সেদিন জার্মানী দিয়েছিল সুভাষকে।

লগ্ন আসন্ন। এবার সুভাষকে বিদায় নিতে হবে প্রতিটি দেশী ও বিদেশী বন্ধুর কাছ থেকে। বিদায় নিতে হবে দীর্ঘদিনের কর্মক্ষেত্র জার্মানী থেকে।

সেই বিদায়-মুহূর্তে কে কে সেদিন উপস্থিত ছিলেন সুভাষের পাশে? মাত্র তিনটি লোক। আর কাউকে সেদিন খবরটা জানতে দেওয়া হয়নি সতর্কতা হিসেবে।

এ পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সহকারী নেতা নাম্বিয়ার। নাম্বিয়ারই একমাত্র লোক, যিনি জানতেন সুভাষের এই পরিকল্পনার কথা।

জার্মানীর পক্ষ থেকে ছিলেন স্টেট সেক্রেটারী কেপ্লার আর বৈদেশিক দপ্তরের আলেকজান্দার ওয়র্থ।

প্রত্যক্ষদর্শী আলেকজান্দার ওয়র্থ-এর মুখ থেকেই সে কাহিনী তুমি শোন:

'Nambiar, State Secretary Keppler and I took Netaji and Hassan to Kiel during the night of the 7th to the 8th February, 1943. As I mentioned before, with the excep-

tion of Nambiar, Keppler and myself and the military people concerned, nobody else knew about Netaji's depar ture.' [Netaji in Germany : P.—40]

আর সহযাত্রী আবিদ হাসান! তিনি কি সেদিন কিছু জানতেন নিজের গন্তব্য সম্বন্ধে?

মোটেই না। সতর্কতা হিসেবে তাঁকেও সেদিন কিছু বলা হয়নি আগে থেকে। তাঁর ধারণা, তিনি গ্রীস পরিভ্রমণে চলেছেন নেতাজীর সঙ্গে। তাই সঙ্গে নিয়েছেন সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে গ্রীকভাষায় লিখিত একটি সহজপাঠ্য বই—সুবিধে হবে বলে।

কোনিং টাওয়ারে দাঁড়িয়ে সাবমেরিন কম্যাণ্ডার তখন প্রস্তুত। আর দেরি নয়। সবগুলো ট্যাঙ্ক জলে ভর্তি হয়ে গেছে। সময় হয়ে এল বলে! এখন শুধু ডুব দেবার অপেক্ষা মাত্র।

'বিদায় বন্ধুগণ, বিদায়! তোমাদের কথা আমি কোনদিনও ভুলব না। আবার দেখা হবে!'

একটা রুদ্ধ আবেগকে চাপতে গিয়ে হঠাৎ বড় বড় পা ফেলে নিচে নেমে গেলেন সুভাষ। আর ফিরেও তাকালেন না। বিপ্লবীকে পেছন পানে তাকাতে নেই। এগিয়ে চলাই তার সহজাত ধর্ম।

স্থির, অপলক দৃষ্টিতে শেষ পর্যন্ত তাকিয়ে রইলেন সহকারী নেতা নাম্বিয়ার।

বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা। মুখে তারই প্রতিচ্ছায়া। সুভাষ চলে যাচ্ছেন। হিজ এক্সেলেন্সী সুপ্রীম কম্যাণ্ডার, আজাদ হিন্দ্ ফৌজ, নেতাজী সুভাষ!

ঐ যে সাবমেরিনটা ডুবতে শুরু করেছে সুভাষকে নিয়ে! ঐ যে তার পেরিস্কোপটা এখনো জেগে রয়েছে জলের ওপরে!

না, আর নেই। খানিকটা ভাসমান তেল ছাড়া আর কোন কিছুই এখন নজরে পড়ে না সমুদ্রের বুকে। সব শান্ত, সব স্থির।

একসঙ্গে কত দিন, কত মুহূর্ত, কত আনন্দ, বেদনা, কত সীমাহীন রাত্রিই না কেটে গেছে।

আজ সব কিছুর ইতি। সব বেদনার পরিসমাপ্তি। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় শেষ করে আজ আবার সুভাষ এক নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছেন বৃহত্তর কর্তব্যের আহ্বানে।

হে রুদ্র সন্ন্যাসী, এ সময়ে চোখের জল ফেলে তোমার চলার পথকে আমরা পিচ্ছিল করে তুলব না। তুমি যাও। তোমার যাত্রাপথ শুভ হোক!

'মুক্তিপথের অগ্রদূত। পরাধীন দেশের হে রাজবিদ্রোহী! তোমাকে শতকোটি নমস্কার!'

*** দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ***

॥ যে-সব বই ও পত্র-পত্রিকা থেকে সহায়তা নেওয়া হয়েছে ॥

ভারতে সশস্ত্র-বিপ্লব	ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়
সবার অলক্ষ্যে	"
বাংলায় বিপ্লববাদ	নলিনীকিশোর গুহ
ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস	সুপ্রকাশ রায়
ভারতের বিপ্লব কাহিনী	হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
সে-যুগের আগ্নেয়পথ	পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী
সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র	সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
শহীদ যুগল	নগেন্দ্রকুমার গুহরায়
ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ	লোকেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
বাংলার বীর বন্দীরা	নিরঞ্জন সেন
হে অতীত কথা কও	সত্যানন্দ স্বামী
অবিস্মরণীয়	গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র
মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র	শিশির দাশ
নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ	নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী
রুশ-জার্মান সংগ্রাম	বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী	"
ভারত ছাড়	নৃপেন্দ্রনাথ সিংহ
মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ তত্ত্বে ও প্রয়োগে	কাশীকান্ত মৈত্র
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ	সঞ্জয়
যুদ্ধের ইউরোপ	বিক্রমাদিত্য
জার্মানীতে নেতাজী (সাপ্তাহিক বসুমতী)	অশোক সেন
পাক-ভারতের রূপ-রেখা	প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী
কর্মবীর রাসবিহারী	বিজনবিহারী বসু
বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু	শান্তিকুমার মিত্র
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র	নেপাল মজুমদার
মুক্তি সংগ্রাম	সুভাষচন্দ্র বসু
পথের দাবী	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
পত্রগুচ্ছ	জওহরলাল সম্পাদিত
রবীন্দ্র রচনাবলী	বিশ্বভারতীর সৌজন্যে
A Basic History of Germany	Hubertus Prince Zu Loewenstein
German History 1933-45	H. Mau & H. Krausnick

Title	Author
Germany since 1848	Wolfgang Treue
The Political Legacy of the German Resistance Movement	Hans Rothfels
Hitler and The English	Fritz Hesse
Hitler	Wyndham Lewis
Hitler was My Friend	Heinrich Hoffmann
Hitler Marches in the Soviet	Bertram Otto
Story of the War	David Marley
The Ribbentrop Memoirs	Alan Bullock
Das Dritte Reich	Heinz Huber & Artur Muller
Heinrich Himmler	Roger Manvell & Heinrich Fraenkel
Hermann Goering	"
The Rise and Fall of the Third Reich	William L. Shirer
Rosmel	Desmond Young
Second World War	W. S. Churchill
Secret Session Speeche	"
Pacific Victory	Hugh Buggy
The Springing Tiger	Hugh Toye
German Odyssey	Otto Zarek
Subhas as I Knew Him	Kitty Kurti
Netaji Subhas Chandra Bose	Tatsuo Hayashida
Netaji in Germany	Alexander Werth & Walter Harbich
Netaji in Germany	N. G. Ganpuley
Indian Politics	Reginald Coupland
This Europe	Girija Mukherjee
Rebel India	Bejan Mittra & Phani Chakraborty
India Wins Freedom	Abul Kalam Azad
Chalo Delhi	S. A. Das & K. B. Subbaiah
History of Freedom Movement in India	R. C. Mazumder
Advent of Independence	A. K. Mazumder
The History of the Indian National Congress	Pattabhi Sitaramyya

The Last Years of British Rule in India	Michael Edwards
Rash Behari Bose: His Struggle for India's Independence	Biplabi Mahanayak Rash Behari Bose Smarak Samity
Two Great Indian Revolutionaries	Uma Mukherjee
My Indian Years, 1910-1916	Lord Hardinge
India as I knew It	Michael O' Dwyer
India in Revolt	Tarini Sankar Chakraborty
My Memories of the I. N. A. and Its Netaji	Maj. Gen. Shahnawaz Khan
India's Struggle for Freedom	Maj. Gen. A. C. Chatterjee
Important Speeches and Writings of Subhas Bose	Jagat S. Bright
Indian Struggle	Subhas Chandra Bose
On to Delhi	"

* কৃতজ্ঞতা স্বীকার *

বিশ্বভারতী ঃ আনন্দবাজার ঃ অমৃতবাজার ঃ স্টেট্‌স্‌ম্যান ঃ জাপান টাইমস্‌-ঃ টোকিও নির্চানিচিঃ ইয়ং ইণ্ডিয়া (সিঙ্গাপুর থেকে প্রকাশিত ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের মুখপত্র) ঃ সঞ্জীবনীঃ দেশ ঃ প্রবাসীঃ জয়শ্রীঃ বিপ্লবী নিকেতন (নেতাজী সংখ্যা) ঃ যুগধর্ম (হিন্দি)ঃ নেতাজী জন্মতিথি বুলেটিনঃ বার্ক পাবলিশিং (লণ্ডন) ঃ ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট এবং সাপ্তাহিক বসুমতী

আমি সুভাষ বলছি

(তৃতীয় খণ্ড)

সুভাষচন্দ্র,

...যাঁরা দেশের যথার্থ স্বাভাবিক প্রতিনিধি, তাঁরা কখনোই একলা নন। তাঁরা সর্বজনীন, সর্বকালে তাঁদের অধিকার। তাঁরা গিরিচূড়ায় দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের প্রথম সূর্যোদয়ের অরুণাভাসকে প্রথম প্রণতির অর্ঘ্যদান করেন।

...আশীর্বাদ করে বিদায় দেব এই জেনে যে, দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করেছ, দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন করে।

—রবীন্দ্রনাথ

॥ কৈফিয়ৎ ॥

তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল।

ভূমিকা-লিপিতে সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাবার রীতি আছে। কিন্তু আমি কাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো। এ গ্রন্থের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবটাই যে কৃতজ্ঞতার ইতিহাসে ভরা।

আজ বার বার মনে পড়ছে বিপ্লবী-নায়ক পরমশ্রদ্ধেয় ভূপেন্দ্র-কিশোর রক্ষিত-রায়ের কথা। একদিন তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় বসেই এ কাহিনী লিখতে শুরু করেছিলাম। আজ তিনি কোথায়! দুর্ভাগ্য, তৃতীয় খণ্ডের শুরুতেই আমি তাঁকে হারিয়েছি। তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে প্রণাম জানাই।

ধন্যবাদ জানাই 'মার্কসবাদই শেষ কথা নয়' গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীযুক্ত অমলেন্দু (মুকুল) ঘোষকে। দ্বিতীয় খণ্ডের মত এবারও তিনি বইটি আগাগোড়া সংশোধন করে দিয়ে এবং বহু মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে আজাদ হিন্দ্ সরকারের উপদেষ্টা, নেতাজীর সহকর্মী শ্রীযুক্ত দেবনাথ দাসের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেভাবে তিনি আমাকে নানাবিধ তথ্য দিয়ে দিনের পর দিন উৎসাহ জুগিয়ে এসেছেন. তা কোনদিনও বলে শেষ করা যাবে না।

এ গ্রন্থের বেশ কিছু অংশ লেখা হয়েছে হাসপাতালে। আজ দু বছর যাবৎ আমি অসুস্থ। বহু দিন কেটেছে আমার হাসপাতালে। অপারেশন হয়েছে তিনবার। কোনদিন যে এ কাহিনী শেষ করতে পারব এমন আশাও ছিল না। সেই দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলোতে যাঁরা আমাকে নানাভাবে সান্ত্বনা, সহানুভূতি এবং ভরসা জুগিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় শ্রীযুক্তা ব্রজরাণী বসুর কথা। প্রাতঃস্মরণীয় দেশবন্ধুর ভাগিনেয়ী পরশ্রদ্ধেয়া সতী সহায়ের শুভেচ্ছা এবং আশীর্বাদও আমার কাছে মূল্যবান সম্পদ। আর কুমারী বিনীতা সেনগুপ্তার তো কথাই নেই। যেভাবে সে প্রয়োজনীয় বইপত্রগুলি এখান-ওখান থেকে সংগ্রহ করে আমার কাছে পৌঁছে দিত, তা চোখে না দেখলে বোঝানো যাবে না।

তেমনি উল্লেখ করতে হয় বন্ধুবর শ্রীচন্দ্রধর চক্রবর্তীর কথা। আমার ব্যক্তিগত দায়িত্বগুলি তিনি যদি স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে না নিতেন, তাহলে এ কাহিনী যে কবে শেষ হতো, কে জানে!

এ ছাড়া যাঁরা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে ডাঃ শিশির বসু, সুলেখক শঙ্কু মহারাজ ও চিরঞ্জীব সেন, কবি রাণা বসু, শ্রীসমর দত্ত এবং শ্রীযুক্তা শান্তি রায়ের কথাও উল্লেখ করার মতো।

ধন্যবাদ জানাই 'প্রসাদ' পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে। তৃতীয় খণ্ডের বেশির ভাগ অংশই সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক 'প্রসাদ' পত্রিকায়। এ ব্যাপারে তাঁদের উৎসাহ ও আগ্রহ প্রশংসার দাবী রাখে।

বরাবরের মত এবারও গ্রন্থ-রচনা কালে বহু দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকা এবং মূল্যবান গ্রন্থাদি দিয়ে সাহায্য করেছেন দক্ষিণ কলকাতার শ্রেষ্ঠ পাঠাগার বালিগঞ্জ ইনস্টিটিউট। পাঠাগারের তরুণ-বন্ধুদের অকৃপণ সহযোগিতায় ফলে এ ব্যাপারে কোনদিনই আমাকে এতটুকু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি।

অনুরূপভাবে যাঁরা আমাকে নানাবিধ বই-পত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে বন্ধুবর শ্রীসত্যেন ভদ্র, শ্রীবিশ্বজিৎ দত্ত, শ্রীরথীন্দ্র ভট্টাচার্য এবং শ্রীপার্থসারথি বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবিগুরুর রচনাবলী থেকে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃতি করার অনুমতি দিয়েছেন বিশ্বভারতী। এঁদের সবার কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবার পর থেকে এ পর্যন্ত আমি অসংখ্য আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা-লিপি পেয়েছি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের কাছে থেকে। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অসুস্থতার দরুন সবার চিঠির উত্তর দিতে পারিনি। এই সুযোগে তাঁদের সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আর ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রকাশক শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে। কাগজ দুষ্প্রাপ্য, তার ওপর নিয়মিত বিদ্যুৎসঙ্কট। তা সত্ত্বেও বইটিকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর করার জন্য যেভাবে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় করেছেন তা উল্লেখ করার মত।

অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকার দাবী তৃতীয় খণ্ডে বেশ কিছু অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য ছবি চাই। যতটা সম্ভব তাই দেওয়া হয়েছে। এ দায়িত্ব বহন করেছেন প্রধানত নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো, আজাদ হিন্দ্ সরকারের সেক্রেটারী শ্রীআনন্দমোহন সহায়, উপদেষ্টা দেবনাথ দাস, সাংহাই-এর প্রাক্তন ভারতীয় কনসাল জেনারেল শ্রীযুক্ত আনিলকুমার সেন এবং আই. এন. এ.-র সর্দার মেওয়া সিং। আজাদ হিন্দ্ সরকার কর্তৃক প্রচারিত 'Immortal Hind' থেকেও নেওয়া হয়েছে কিছু কিছু। সবার উদ্দেশেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

দূর থেকে স্বতঃ-প্রণোদিত হয়ে যাঁরা আমাকে নানাবিধ তথ্য পাঠিয়ে সাহায্য করেছেন, সেইসব অচেনা সুহৃদদেরও জানাচ্ছি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

'আমি সুভাষ বলছি' ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়। ইতিহাস-ভিত্তিক একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় মাত্র। এ-কাহিনী যেমন বিরাট, তেমনিই ব্যাপক। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত এর পরিধি-বিস্তার।

আমি ঐতিহাসিক নই। কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্তও ছিলাম না কোনদিন। স্বভাবতই সাধ্য আমার অত্যন্ত সীমিত। এ অবস্থায় হাজার সতর্কতা সত্ত্বেও এই বিরাট ইতিহাসের কোথাও কোন ভুল-ভ্রান্তি বা ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকবে না, এমন কোন কথা নেই। বরং থাকাটাই স্বাভাবিক। তেমন কিছু নজরে পড়লে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ আমার সেই অক্ষমতাকে মার্জনা করবেন আশা করি। পরবর্তী সংস্করণে সেসব সংশোধন করে দেবার বাসনা রইল।

বইখানি দ্রুত প্রকাশনার জন্য শ্রীপরিতোষ চক্রবর্তী ও শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকারের অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্মরণ করছি।

২১বি, ফার্ণ রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০১৯

বিনয়াবনত
গ্রন্থকার

উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

সাবমেরিণের কোনিং টাওয়ারে সঙ্গী আবিদ হাসান-সহ

লীগ হেড কোয়ার্টার্স অভিমুখে দলে দলে
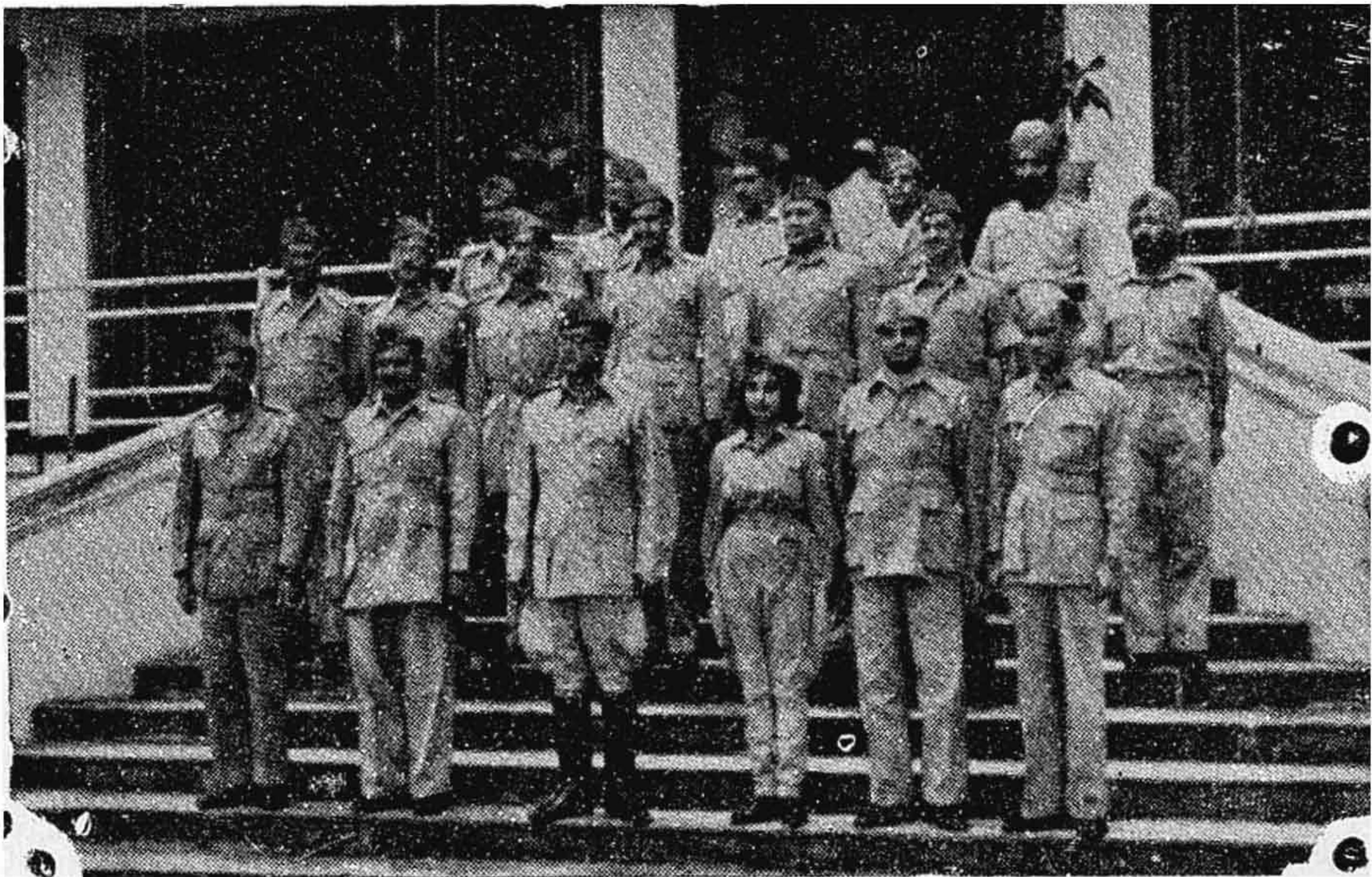
মন্ত্রীসভার সদস্যগণ

ঝাঁসির রাণীবাহিনীর ট্রেনিং,
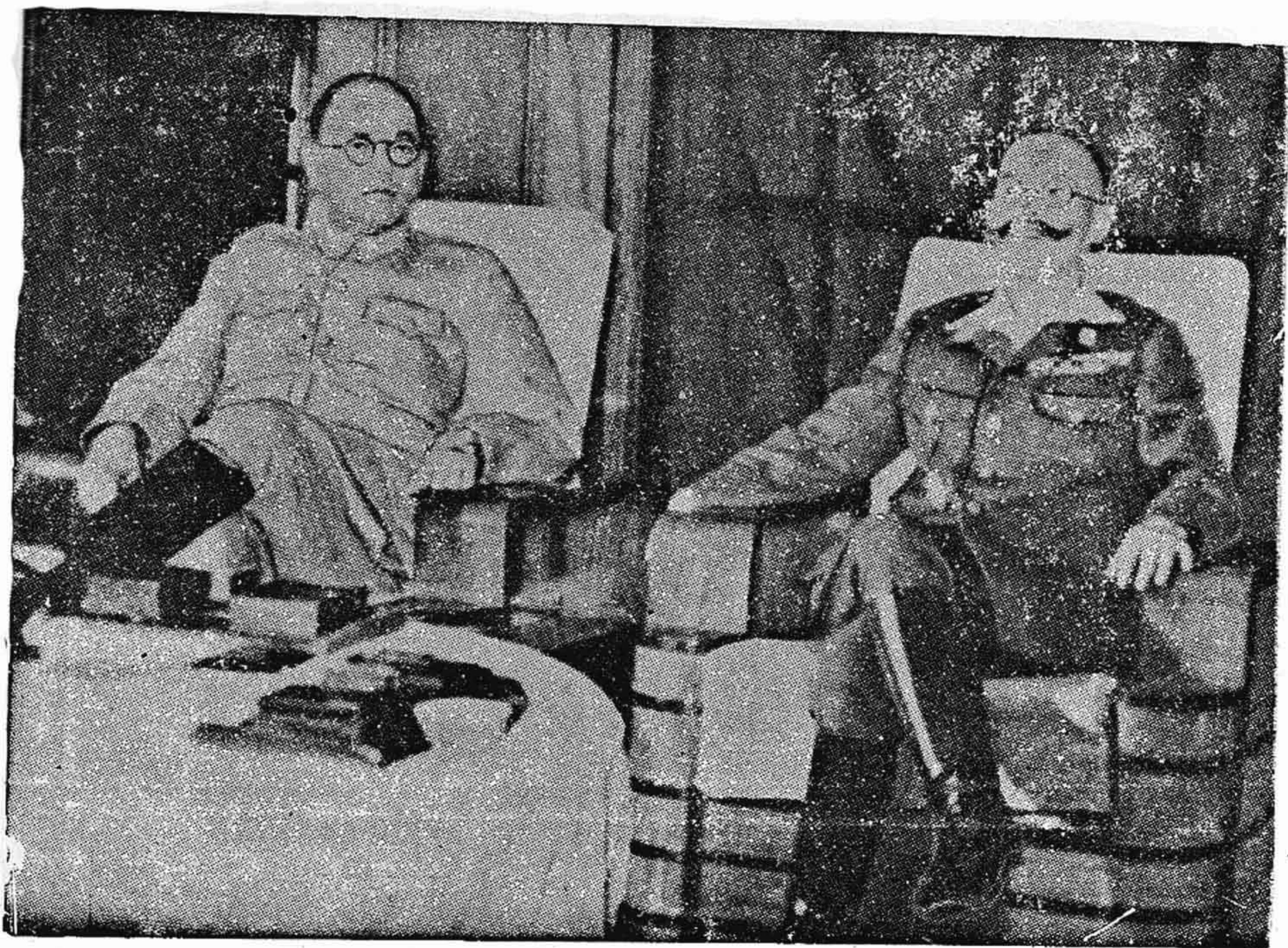
বর্মায় অবস্থিত সমগ্র জাপ বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল কাওয়ারের সঙ্গে বোঝাপড়া
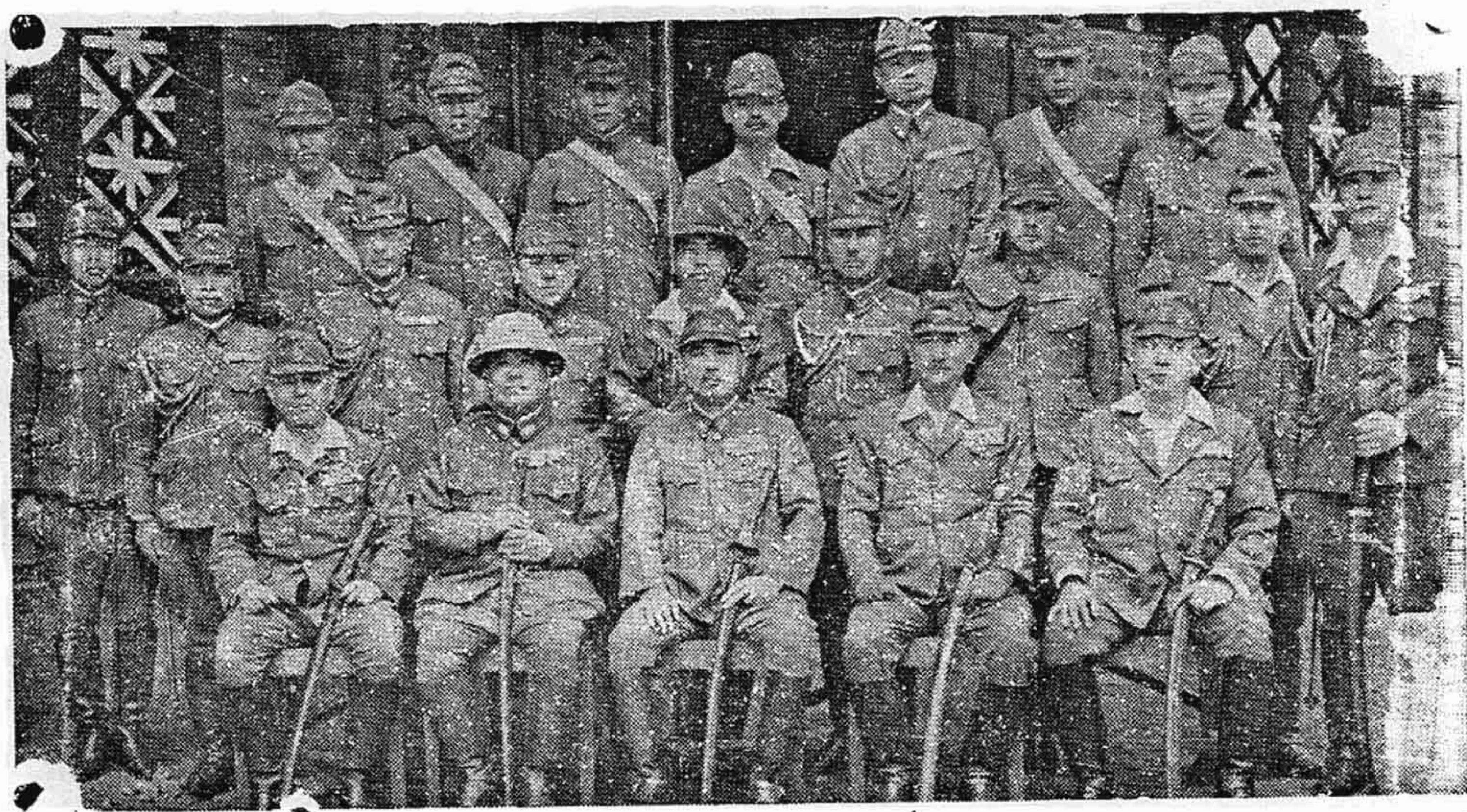
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধরত জাপ-সেনানায়কবৃন্দ

মেঃ জেঃ এম. জেড কিয়ানী

মেঃ জেঃ শাহনওয়াজখান

মেঃ জেঃ এ. সি. চ্যাটার্জী

কর্ণেল হবিবুর রহমান
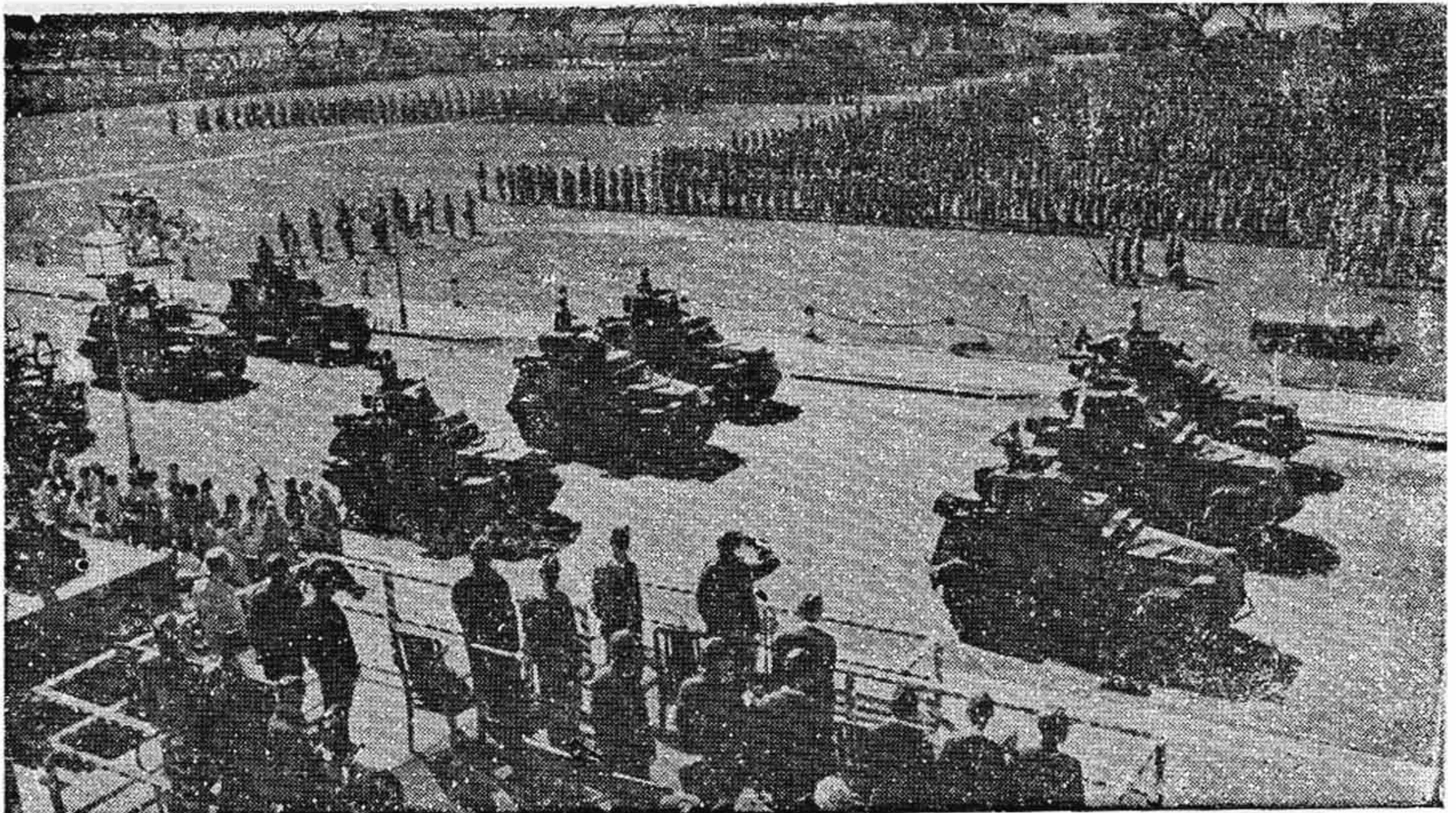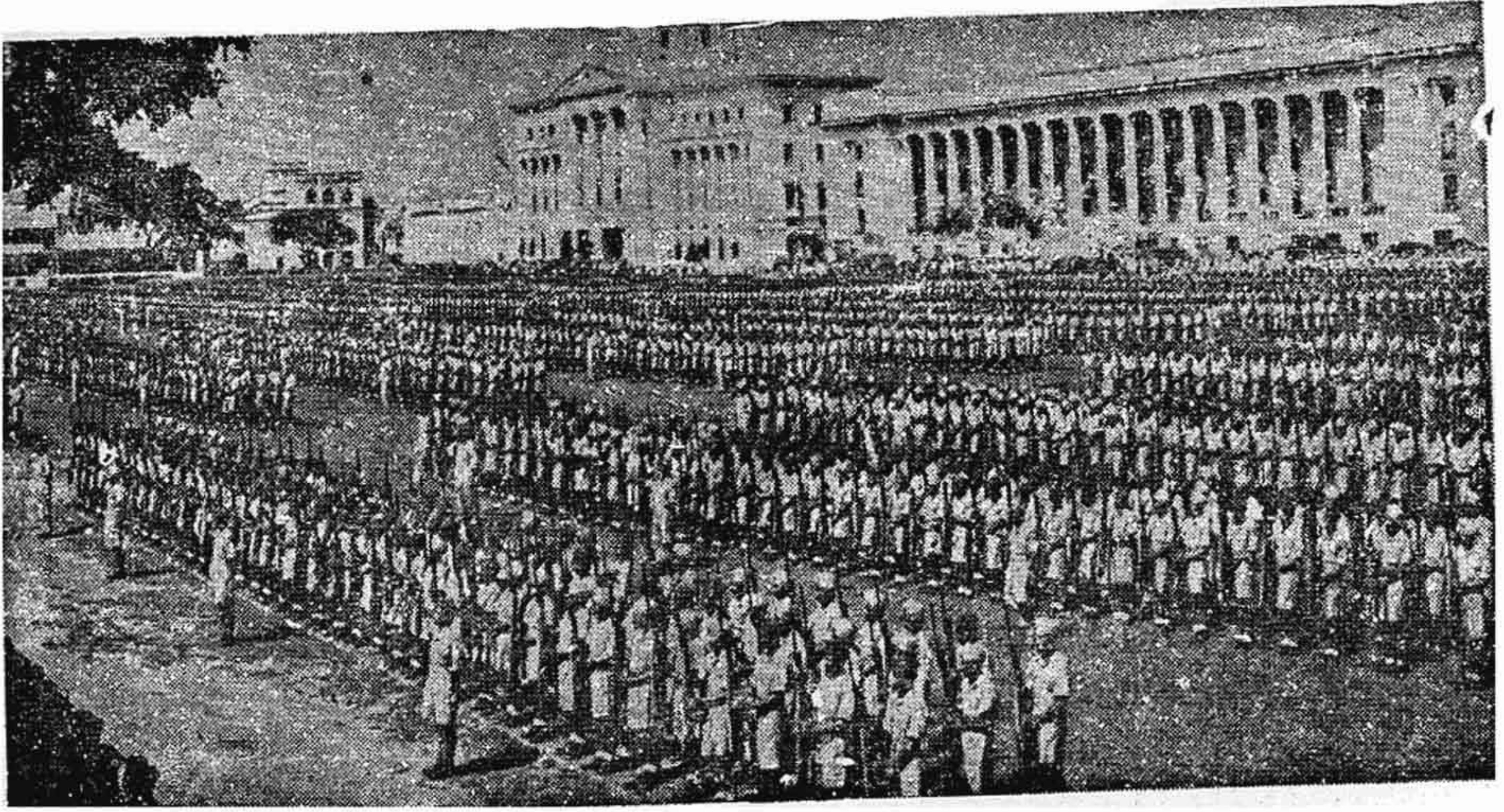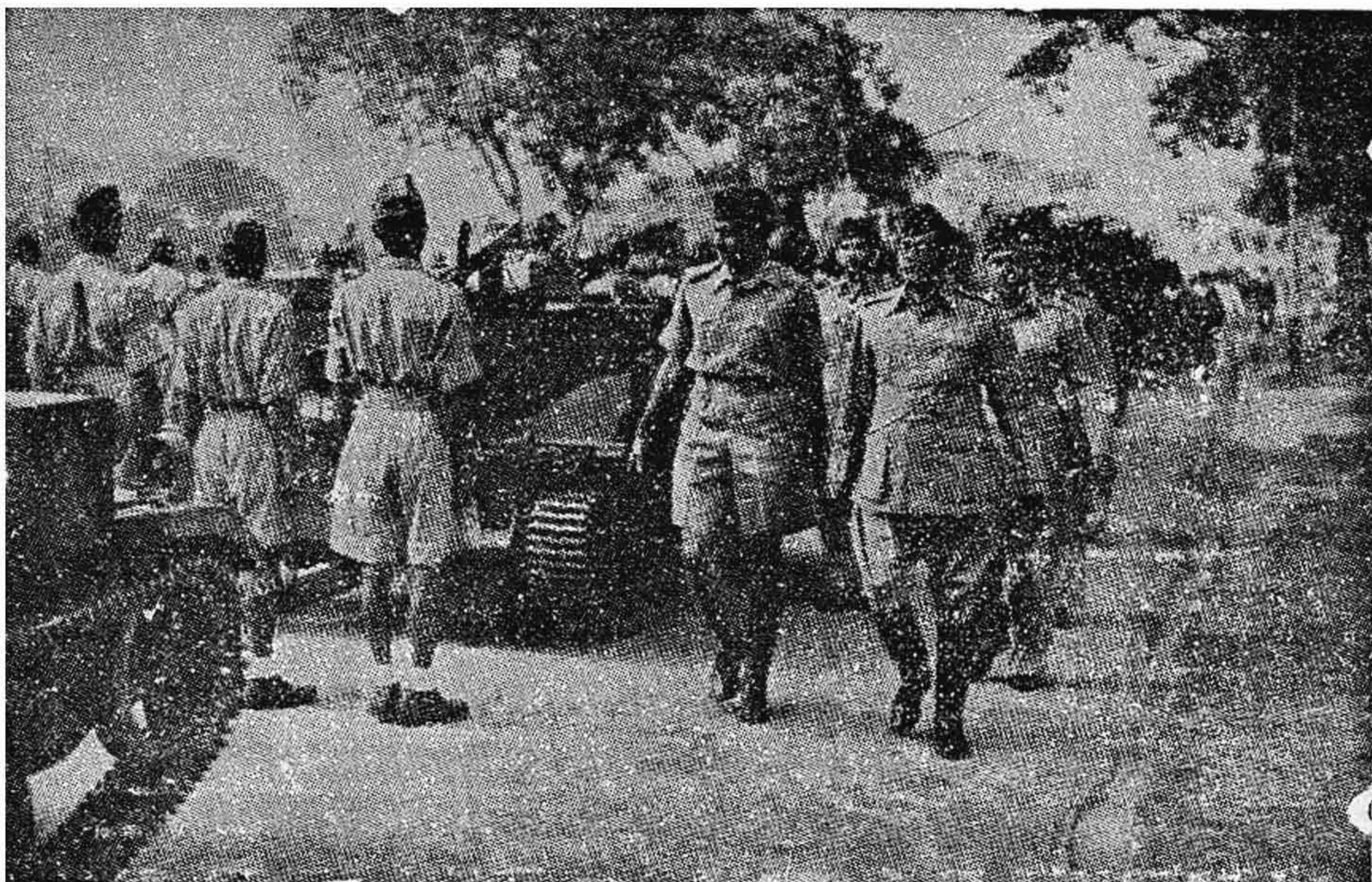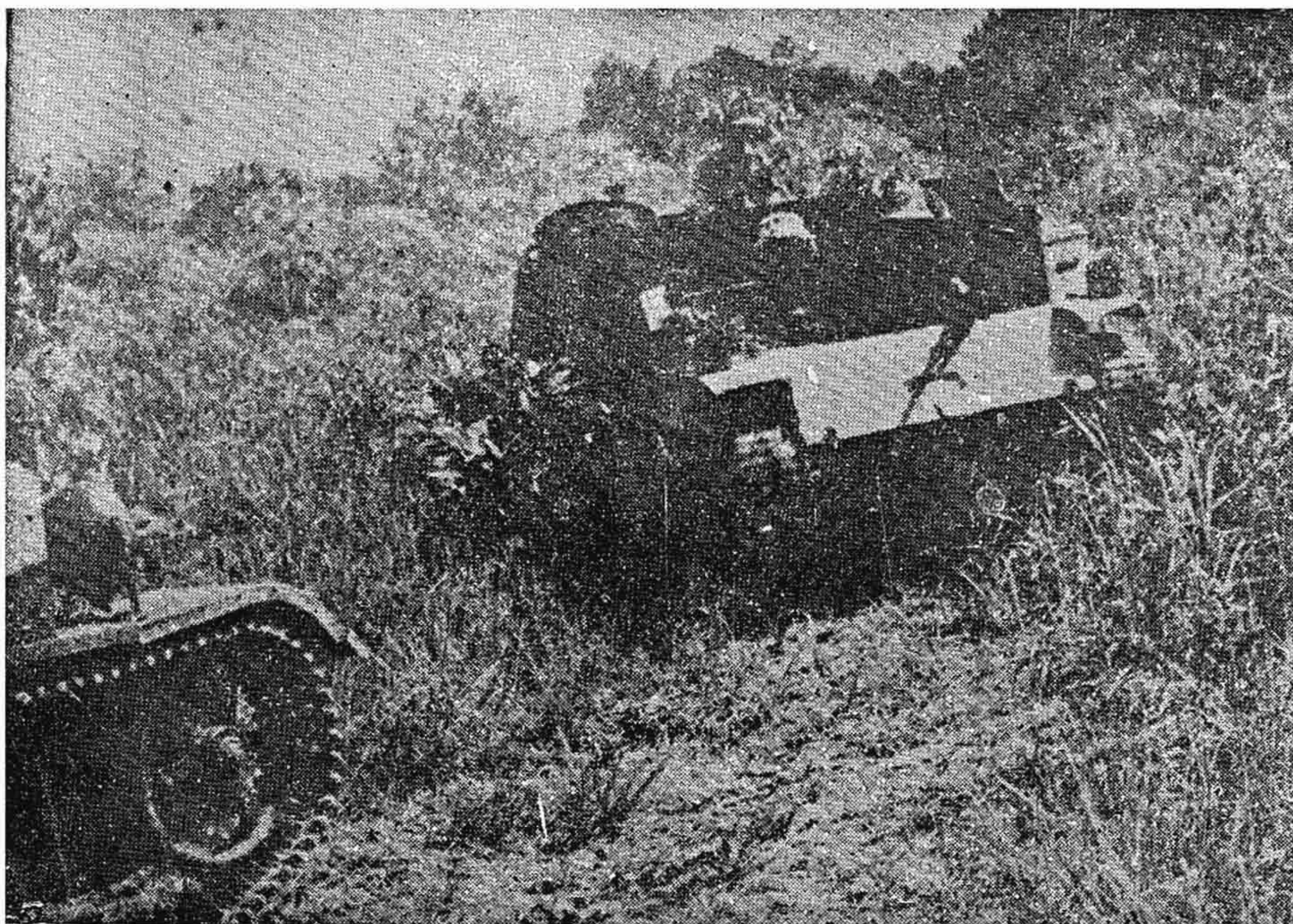
পাহাড় পর্বত অতিক্রম করে

বন-জঙ্গল পেরিয়ে

চার্জ ....

AZAD HIND

I. N. A. ENTERS INDIA

FIGHTING NOW ON INDIAN SOIL

NETAJI'S PROCLAMATION

Huge Offensive Now Underway

Nippon & Indian Forces Carry Out Annihilative Push

BRITISH ENEMY IS DOOMED NOW SAYS R.B. BOSE

Netaji In Clarion Call To Indians At Home & In East Asia
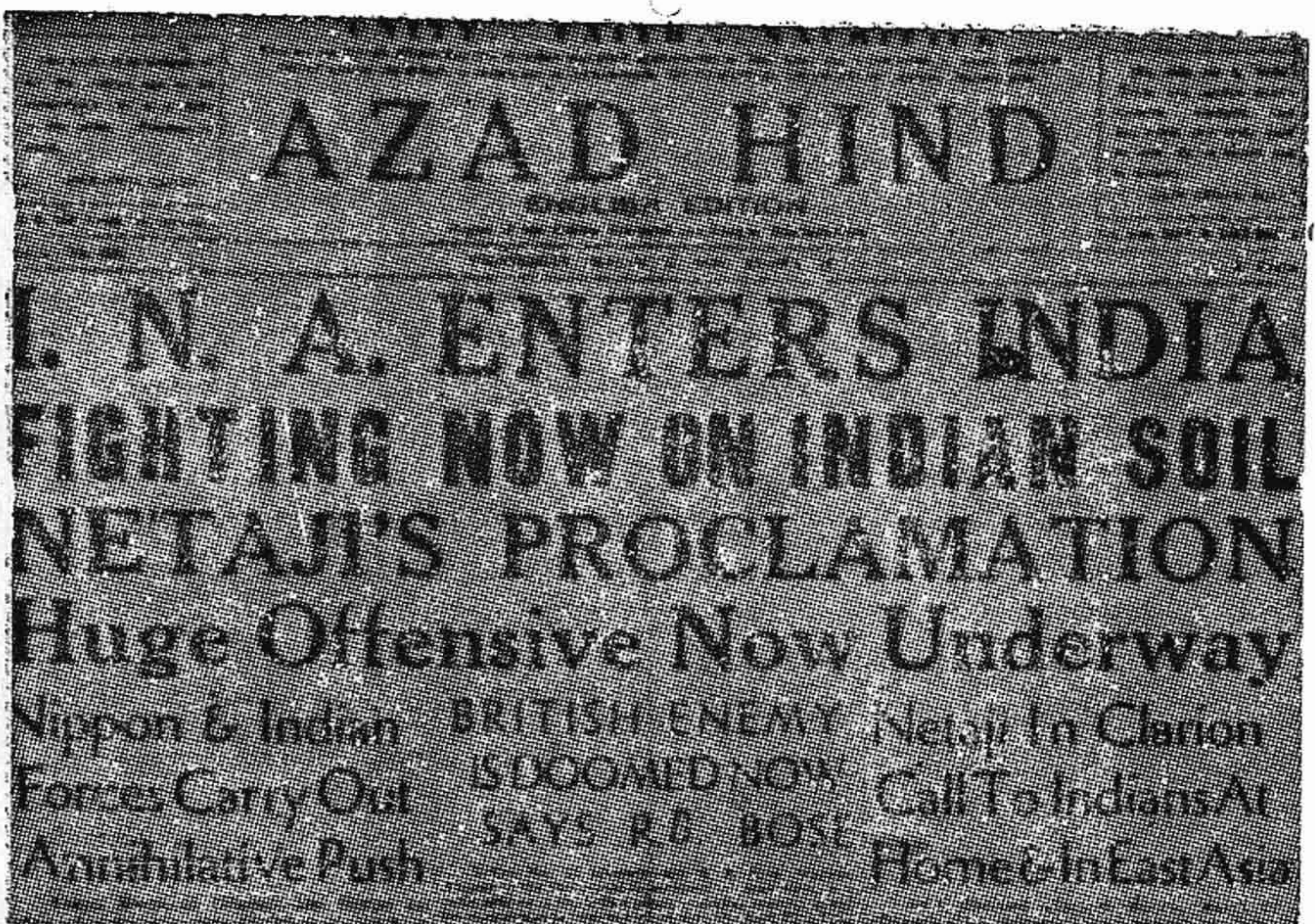
সংবাদপত্রে ভারতভূমিতে প্রবেশের খবর
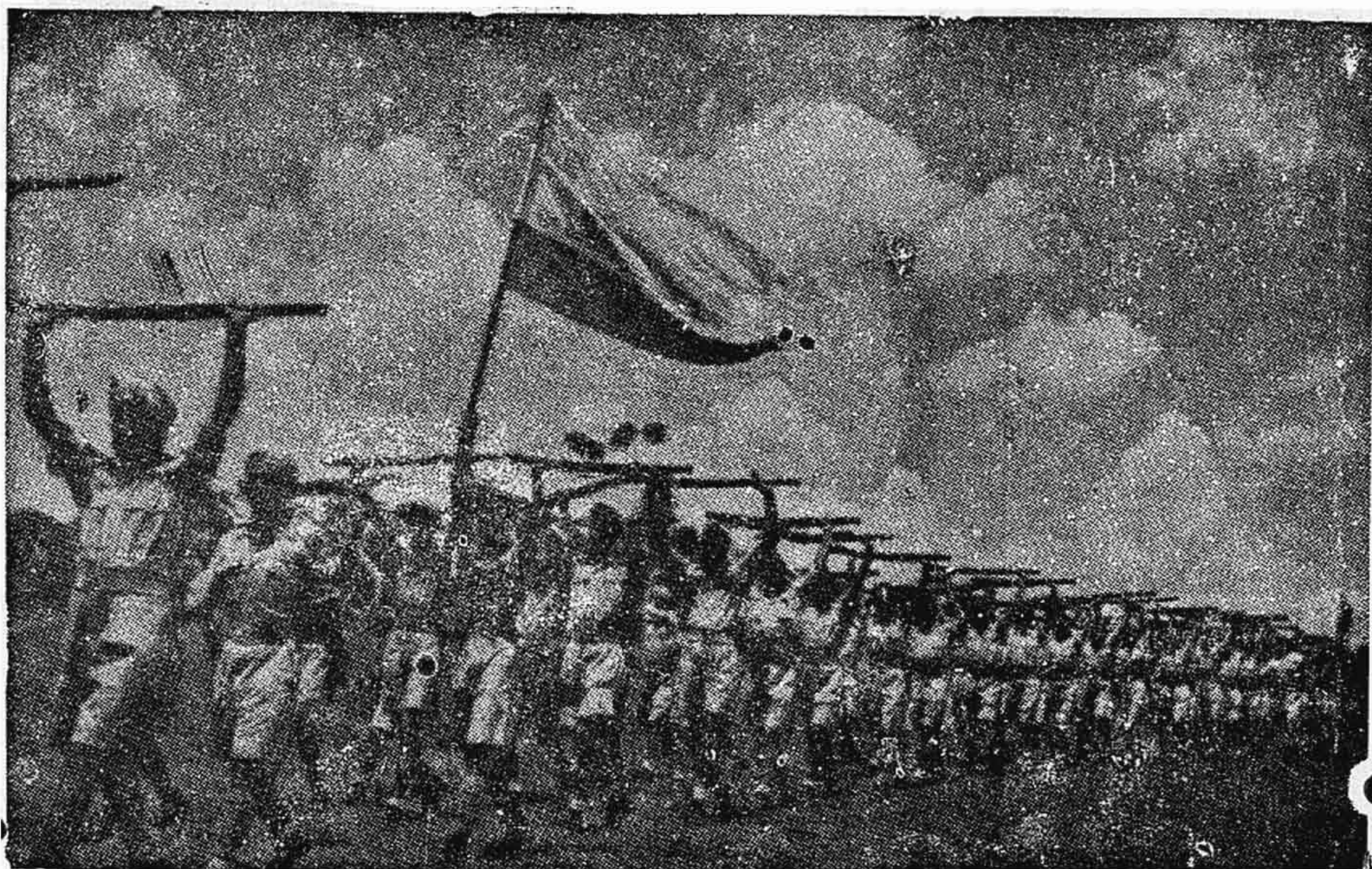
স্বদেশের মাটিতে পা দিয়ে আনন্দে নৃত্যরত আজাদী ফৌজ

মণিপুরী মহিলাগণ আজাদী ভাইদের তৃষ্ণায় জল পরিবেশন
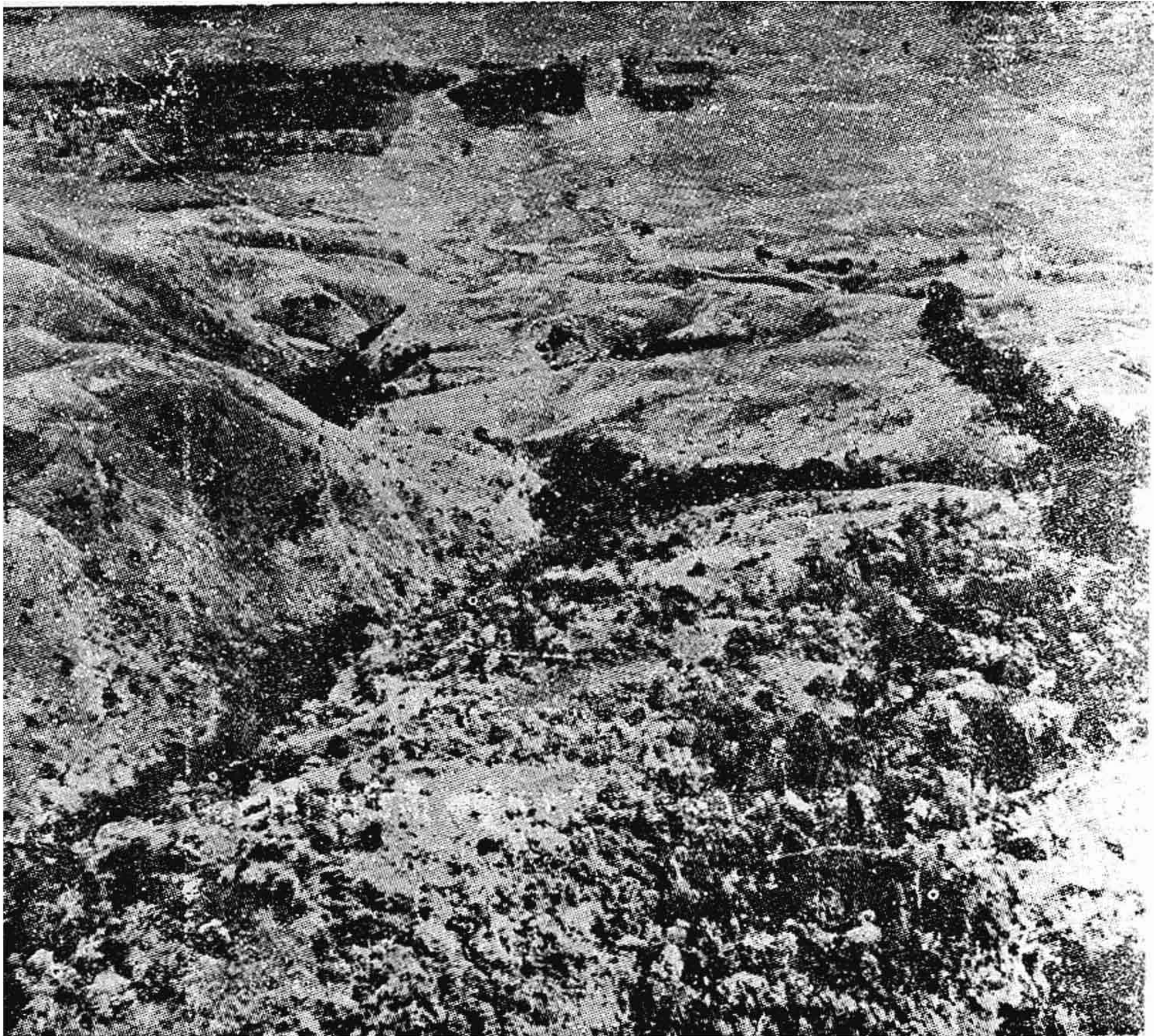
উঁচু পাহাড় থেকে রক্তস্নাত বিষেণপুরের দৃশ্য
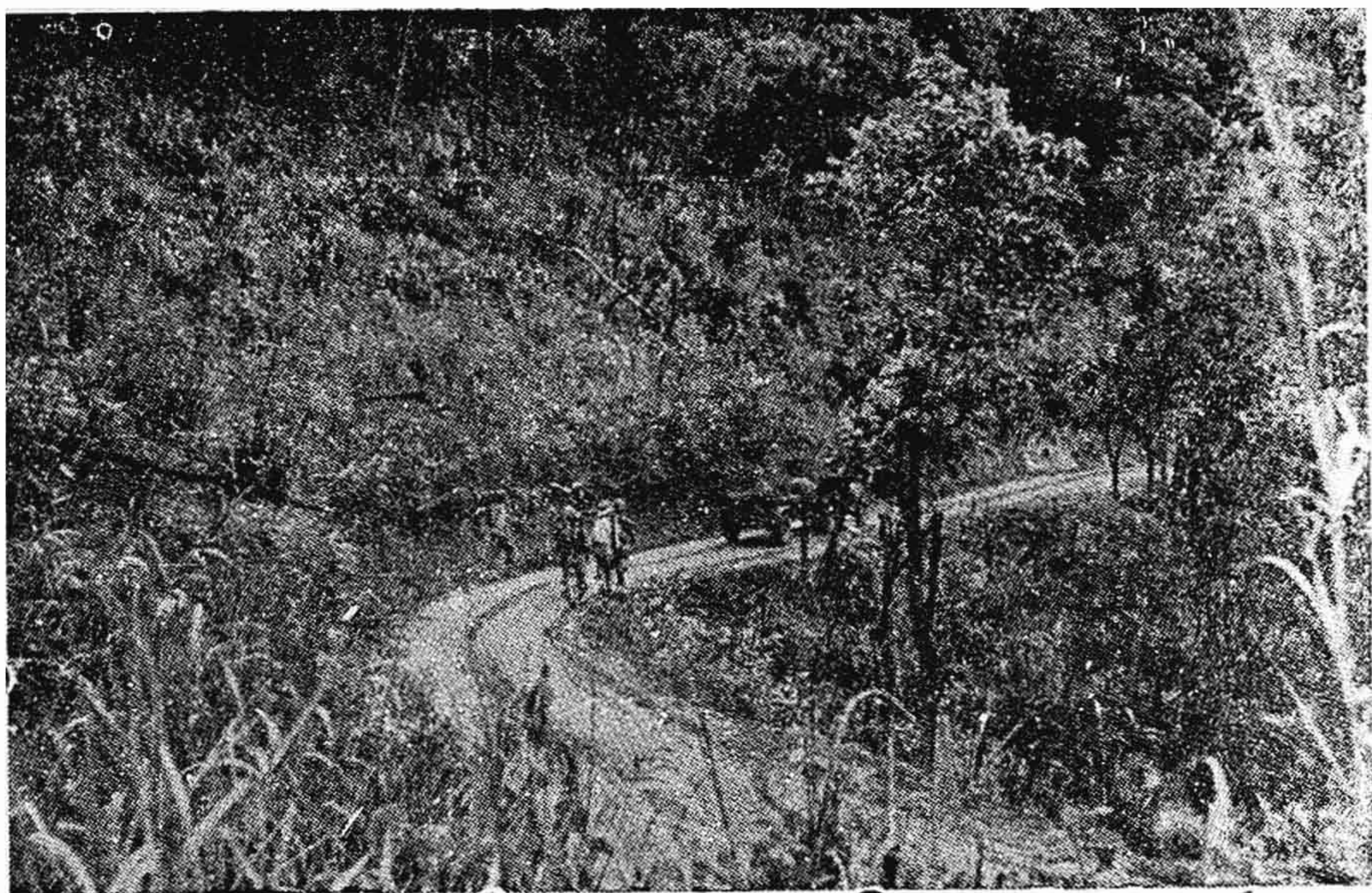
অবরুদ্ধ ডিমাপুর রোড
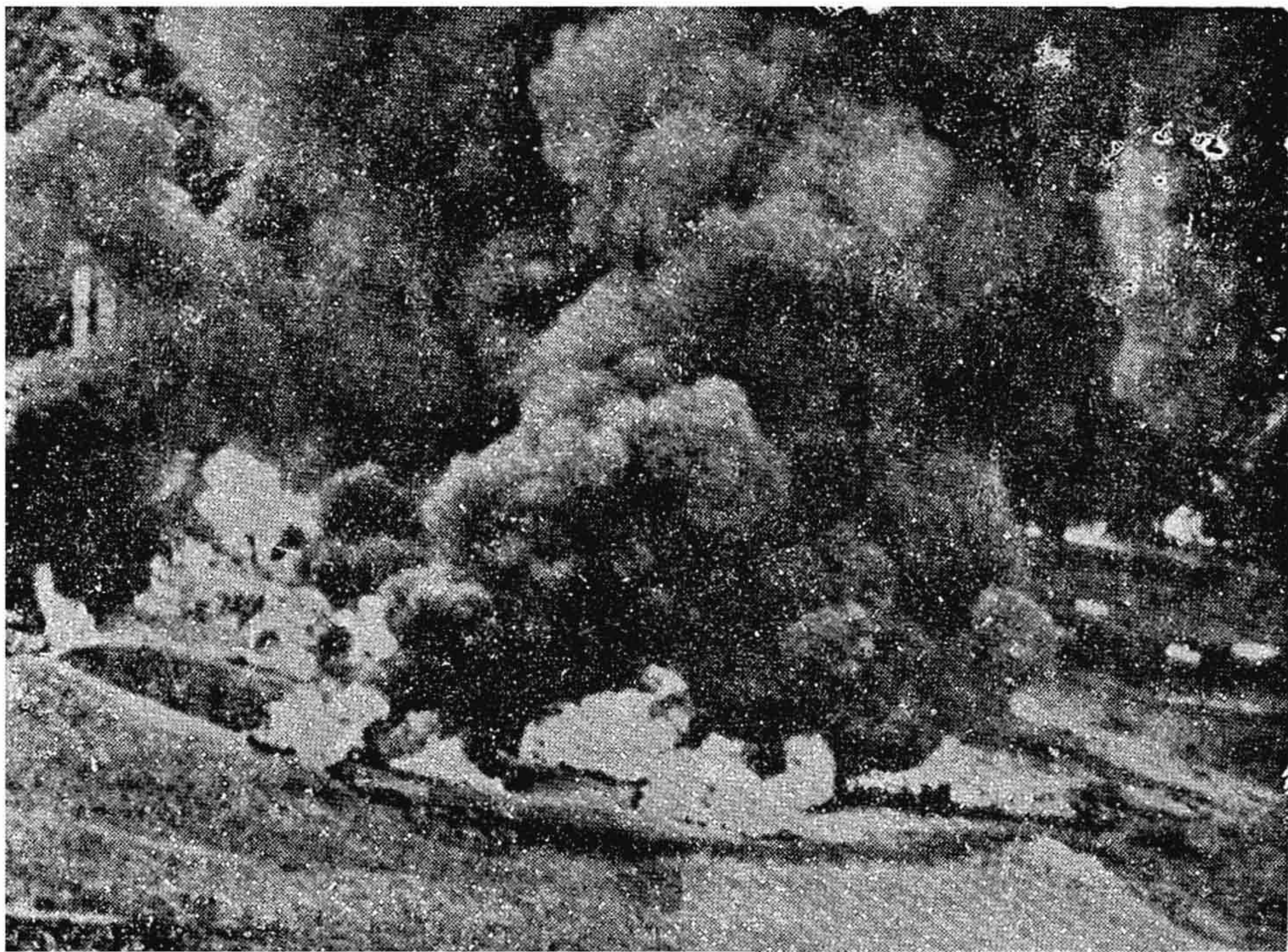
ইম্ফলের উপকণ্ঠে গোলাবর্ষণ
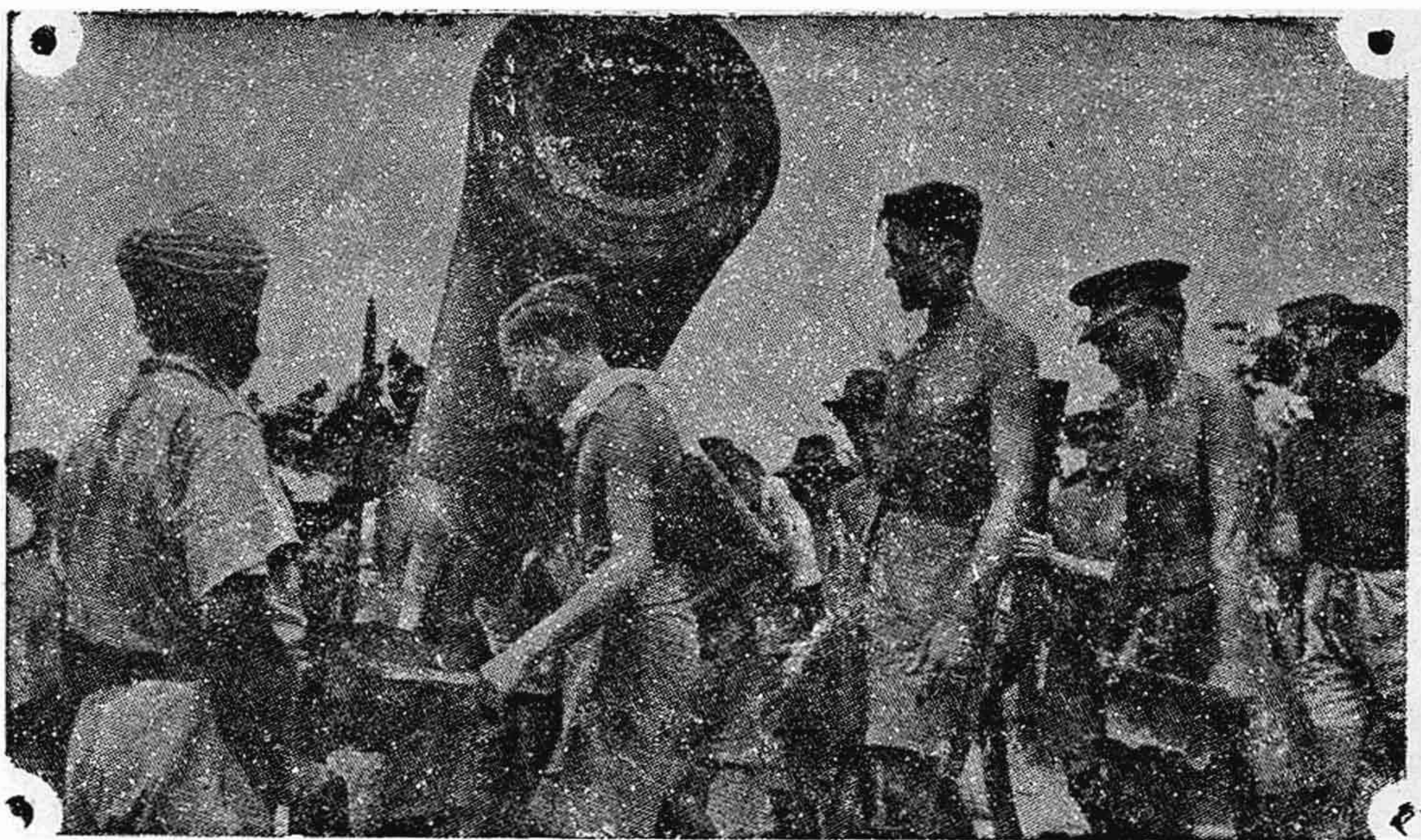
কর্মরত অবস্থায় বন্দী ব্রিটিশ সৈন্যগণ

ইম্ফল আর কতদূর ....

ইম্ফল ফ্রণ্টে নিহত ব্রিটিশ সৈন্যদের কবরস্থান

অকালবর্ষণ

যানবাহনের অচলাবস্থা
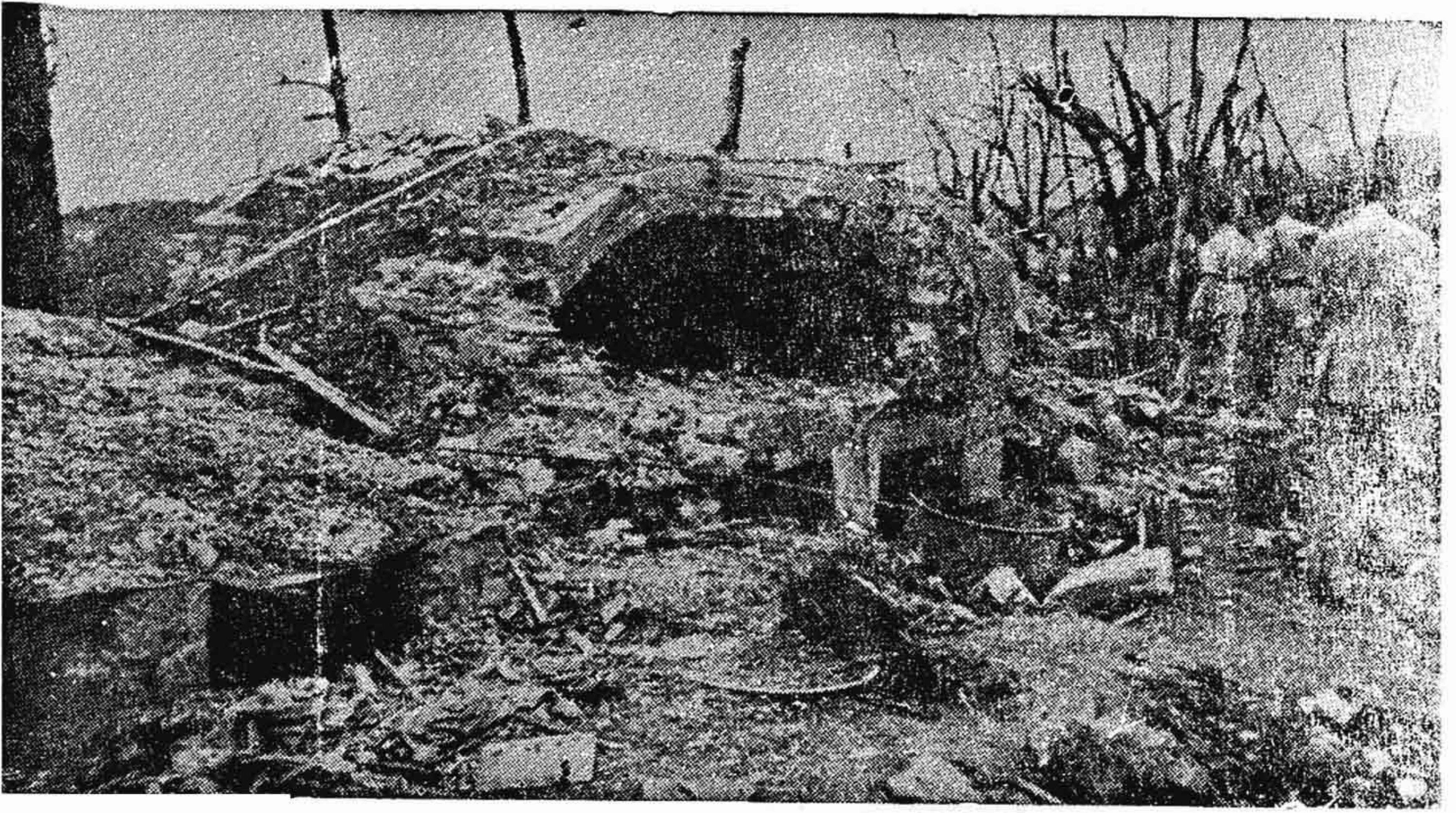
আজাদী বাহিনী কর্তৃক পরিত্যক্ত একটি বাজার
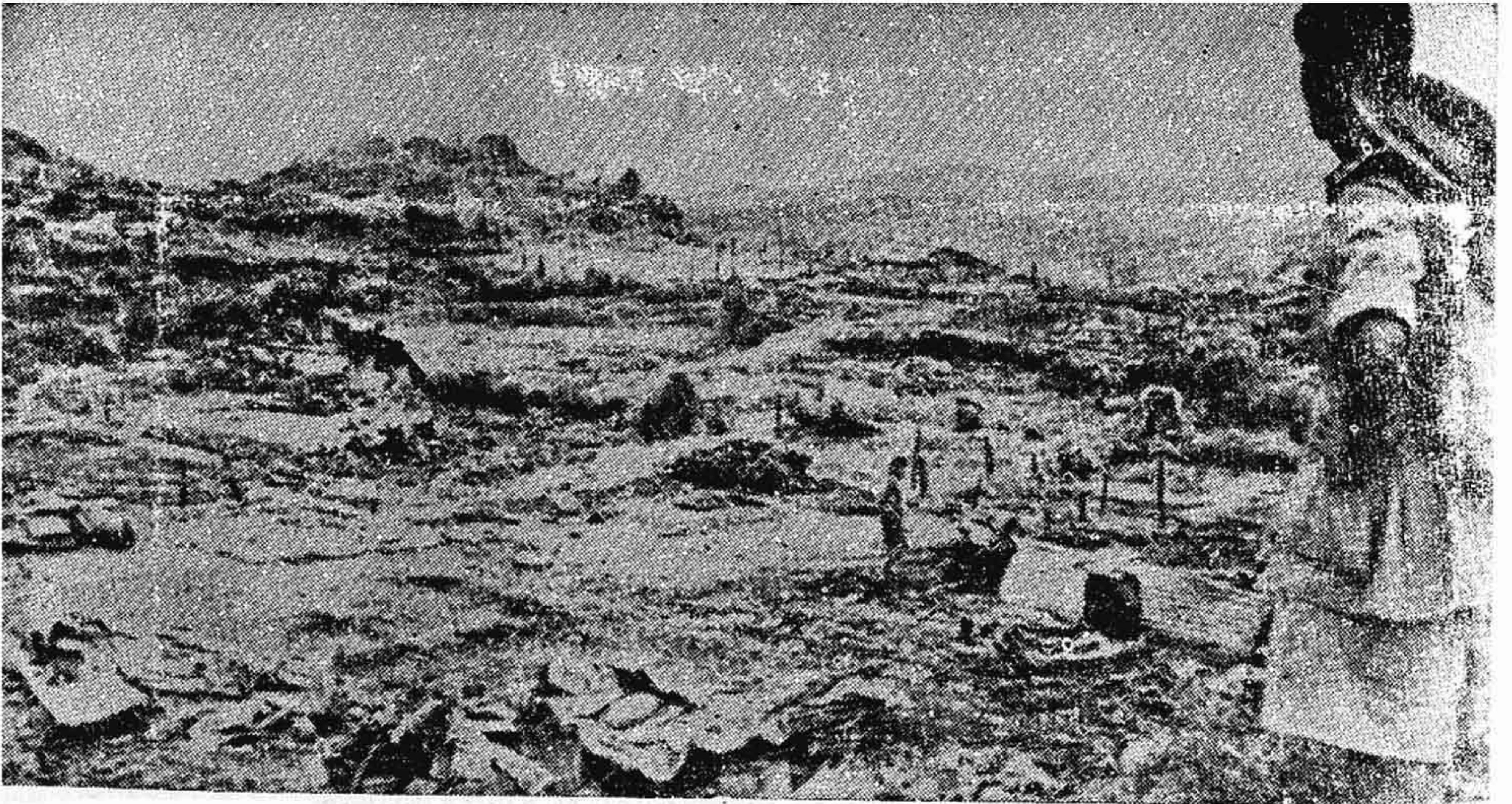
সেই ফেলে যাওয়া নাগাপল্লী

জাতীয় পতাকা হাতে দেবনাথ দাস—যা একদিন শোভা পেত নেতাজীর হেড কোয়ার্টার্সে

সাইগন বিমান-বন্দরে তোলা শেষ ছবি

এই সেই ইম্ফল রণাঙ্গন্।

এখানেই একদিন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল নেতাজী সুভাষ বসুর নেতৃত্বে।

কান পেতে শোন মল্লিকা। শুনতে পাচ্ছ কিছু মাটির বুকে? শুনতে পাচ্ছ কাদের যেন ফিসফিস চাপা গুঞ্জন আর ভারী দীর্ঘনিশ্বাস?

ইতিহাস। ইতিহাস কথা বলছে। কথা বলছে বিস্মৃতপ্রায় এক মৌন ইতিহাসের ধূসর পাণ্ডুলিপি।

প্রণাম কর মল্লিকা। প্রণাম কর এই ইম্ফলের মাটিকে, যার প্রতিটি স্তূপের নীচে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে রয়েছে কত নাম-না-জানা মানুষ, কত চাপাকান্না, কত আশা-আকাঙ্ক্ষা, কত বেদনা, কত স্বপ্ন আর কত প্রাণদানের কাহিনী।

প্রণাম কর এই ইতিহাসের নায়ক মহাক্ষত্রিয় নেতাজী সুভাষকে, যিনি সেদিন রুদ্র তেজে জ্বলে উঠে বলেছিলেন—'আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।'

প্রণাম কর হাজার হাজার উৎসর্গীকৃত-প্রাণ শহীদকে, যাঁরা মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের জন্য হাজার প্রতিকূলতা ঠেলেও সেদিন উদ্দাম আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে। সবাইকে প্রণাম কর।

এ অধ্যায় শুরু হয়েছিল ১৯৪২ সালের গোড়ার দিকে—বার্লিনে।

সুভাষের মাথায় তখন এক নতুন পরিকল্পনা। জার্মানী থেকে ভারতবর্ষের দূরত্ব প্রায় ছ' হাজার মাইল। এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে কিভাবে তাঁর পক্ষে আজাদী সৈন্য নিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করা সম্ভব?

বরং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে সেটা সম্ভব। কারণ হংকং, সিঙ্গাপুর, মালয়, বর্মা সবই তখন জাপানীদের দখলে। ভারতবর্ষ বর্মার ঠিক গায়ে গায়ে লাগানো। সংখ্যার দিক থেকেও ভারতীয়রা ওখানে অনেক বেশি। একবার যাওয়া যায় না ওখানে?

দেখা করলেন বার্লিনের জাপানী রাষ্ট্রদূত জেনারেল ওসিমা এবং তাঁর সামরিক উপদেষ্টা কর্নেল ইয়ামামোতোর সঙ্গে।—তোমরা আমাকে একবার পাঠাতে পার না ওখানে?

সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে গেল টোকিওতে। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী চন্দ্র বোস দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যেতে ইচ্ছুক। এ সম্বন্ধে উপযুক্ত নির্দেশ চাই।

যথাসময়ে তার উত্তর এল টোকিও থেকে। অত্যন্ত হতাশব্যঞ্জক উত্তর:

'বিখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারী বোস তো এখানেই রয়েছেন। তা সত্ত্বেও এ পরিস্থিতিতে আবার একজন বিপ্লবী কেন?'

তবু হাল ছাড়লেন না সুভাষ। বর্মা ও ভারত পাশাপাশি। এমন সুযোগ জীবনে আর কোনদিনও পাওয়া যাবে না। তার জন্য এত সহজে হতাশ হলে চলবে কেন? দেখাই যাক না!

তাই আবার তিনি দেখা করলেন জেনারেল ওসিমা এবং কর্ণেল ইয়ামামোতোর সঙ্গে। একবার নয়, বার বার। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই। বক্তব্য সেই একটাই: 'আমাকে একবার পাঠাতে পার না ওখানে! দেখ না চেষ্টা করে!'

অবশেষে একদিন রাজী হল জাপান। রাজী হল নিজের গরজেই।

মহানায়ক রাসবিহারী বসু অসুস্থ। খুবই অসুস্থ।

বিশেষ করে মোহন সিং-এর সঙ্গে সেই বিরোধকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে তাঁর দেহ-মনের উপর দিয়ে যে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে, তাকে জোড়া লাগানো অসম্ভব। এখন শুধু অপেক্ষা মাত্র। শেষ-বিদায়ের আগে কয়েকটা যন্ত্রণাময় দিন। কিন্তু তারপর? তারপর কি হবে?

একই ভাবনা তখন ডানা মেলেছে মহানায়ক রাসবিহারীর মনে। সময় তো ঘনিয়ে এল। কখন যে অলক্ষ্য থেকে মৃত্যু এসে প্রাণটাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে, কেউ তা বলতে পারে না।

কিন্তু তারপর? কি হবে নিজের বুকের রক্তে গড়া এই আজাদ হিন্দ্ ফৌজের?

কি হবে তিল তিল করে গড়ে ওঠা এই ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের?

সবই কি শেষ হয়ে যাবে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে?

ওরা সৈনিক। ওদের কর্মক্ষম রাখতে হলে নিত্য-নতুন কাজ চাই। নতুন আবেগ চাই। নতুন তরঙ্গ চাই।

কে শোনাবে ওদের সেই নতুন জোয়ারের কলতান?

কার আদেশে ওরা সবকিছু তুচ্ছ করে দুর্বার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুবাহিনীর উপর?

কে সেই নায়ক?

সুভাষ! সুভাষ! সুভাষ! বিপ্লবের প্রদীপ্ত সূর্য সুভাষ। সুভাষই একমাত্র নায়ক, যিনি এই গুরুদায়িত্ব বইতে সক্ষম।

যথাসময়ে টোকিও থেকে নির্দেশ পাঠানো হল জাপানী রাষ্ট্রদূত জেনারেল ওসিমার কাছে:

'মহামান্য চন্দ্র বোস অত্যন্ত দায়িত্বশীল লোক। তোমরা যদি তাঁর নিরাপত্তা সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিতে পার, তাহলে পাঠাবার ব্যবস্থা কর।'

একইভাবে ডাক পাঠালেন মহানায়ক রাসবিহারী বসু।

তুমি এস সুভাষ। সেই কত যুগ ধরে তোমাকে ডাকছি, কিন্তু একবারও তুমি এলে না। এবার নিশ্চয় এস। শুধু আমি নই, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ত্রিশলক্ষ ভারতবাসী আজ তোমার পথ চেয়ে আছে। আমি অসুস্থ, বৃদ্ধ। তুমি এসে সমস্ত দায়িত্ব বুঝে নিয়ে আমাকে এই দুঃসহ বোঝা থেকে মুক্তি দাও।

ডাক শুনেই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন সুভাষ।

হ্যাঁ, আমি যাব। যেতেই হবে আমাকে। যেতে হবে সেই নতুন সূর্যোদয়ের দেশে, যেখানে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু তাঁর জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও নিরলসভাবে পরিশ্রম করে চলেছেন ভারতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ করার কাজে।

অবশ্য কাজটা সহজ নয়। বরং খুবই বিপজ্জনক। জাপ-সরকারও সে আশঙ্কার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বার বার। পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধ চলছে। আশা খুবই কম। শতকরা পাঁচভাগ মাত্র। বাদবাকি সবটাই অনিশ্চিত।

তবু যেতে হবে। যত বাধা-বিপত্তিই মাথা উঁচিয়ে আসুক না কেন, সবকিছু অগ্রাহ্য করে তাঁকে এগিয়ে যেতে হবে আপন লক্ষ্যের দিকে। মৃত্যু যদি আসে তো আসুক, তবু মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচনের এই অপূর্ব সুযোগটাকে কোনরকমেই হাতছাড়া করা চলবে না।

বাদ সাধলেন জার্মানীর ভাগ্যবিধাতা স্বয়ং হিটলার।

না, তা হয় না। হওয়া সম্ভব নয়। জাপান তো বলেই দিয়েছে যে, আশা খুবই কম। শতকরা পাঁচভাগ মাত্র। তাছাড়া যুদ্ধ-পরিস্থিতি এখন অন্যদিকে মোড় নিতে শুরু করেছে। এ অবস্থায় জার্মানী ছেড়ে বাইরে যাওয়া অসম্ভব।

কে বলে অসম্ভব ? দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের অভিমত ব্যক্ত করলেন সুভাষ, দেশের জন্য একদিন নিজের গলা বন্ধক রেখে আমি জার্মানীতে এসেছিলাম। দরকার হলে তেমনি করেই আবার একদিন চলে যাব জার্মানী ছেড়ে। ব্রিটিশের সুদক্ষ গোয়েন্দা বাহিনী সেদিন হাজার চেষ্টা করেও আমার গতিরোধ করতে পারেনি। তোমাদের গেস্টাপো বাহিনীও পারবে না।

'For the sake of my country, I have risked my neck to come to Germany. For the same reason I am prepared to risk my neck to return to India if I cannot achieve my purpose. The British C. I. D. is very efficient and just as I escaped inspite of it, I shall escape your Gestapo also.'

[Netaji in Germany : Gunpuley : P.—19]

অধৈর্য হয়ে শেষ পর্যন্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রী রিবেনট্রপের কাছে এক কড়া নোট পাঠালেন সুভাষ। আমি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাবই। শতকরা পাঁচভাগ নয়, একভাগ আশা থাকলেও যাব। অবিলম্বে ব্যবস্থা কর।

শুভার্থী বন্ধু বৈদেশিক দপ্তরের প্রধান ভন্ট্রটের মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন হিটলার।

সত্যিই তো। জাপান আমাদের বন্ধু। শুধু বন্ধু নয়, তাদের সঙ্গে আমরা সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ। তারা যেখানে এত করে বলছে, সেখানে আমাদের কর্তব্য, হিজ এক্সেলেন্সী নেতাজী বোসকে অবিলম্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা। নইলে তারা ভুল বুঝতে পারে।

জার্মানী, জাপান এবং ইতালির মধ্যে শুরু হল কূটনৈতিক পর্যায়ের

আলোচনা। যুদ্ধ-পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল। কি করে এখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাঠানো যায় নেতাজী বোসকে?

একবছর আগে হলে কথা ছিল না, কিন্তু এখন জার্মানীর চারদিকেই সমূহ বিপদ। সুতরাং, সবদিক ভাল করে ভেবে-চিন্তে দেখা দরকার।

কাজটা খুবই বিপজ্জনক। বিশেষ করে জার্মানীর পক্ষে।

জার্মানীর এখন আর সেদিন নেই। মার্কিন সাহায্য-পুষ্ট ব্রিটিশবাহিনী ইতিমধ্যেই বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এমন কি, তাদের রাজকীয় বিমান-বাহিনী এখন প্রকাশ্যেই এসে হানা দিতে সুরু করেছে জার্মানীর আকাশে।

নৌ-বহরের দিক থেকেও আগেকার তুলনায় ব্রিটিশ এখন অনেক বেশি শক্তিশালী। ইংলিশ চ্যানেল, উত্তর সাগর, ভূমধ্যসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, সবকিছুই এখন তাদের দখলে। এ অবস্থায় জাহাজ বা বিমানের সাহায্যে এত দূর পথ পাড়ি দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

একমাত্র উপায় সাবমেরিন। কিন্তু তাতেই বা ভরসা কোথায়? কখন যে টর্পেডো, মাইন, ডেপ্থ্ চার্জ বা ভারী কামানের পাল্লার মধ্যে পড়ে যেতে হবে, তা কে বলতে পারে! বরং সেটাই তো স্বাভাবিক।

দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর অবশেষে একদিন স্থির সিদ্ধান্তের বিন্দুতে এসে দাঁড়ালেন কূটনৈতিক নায়কবৃন্দ।

জাহাজ নয়, বিমানও নয়, যেতে হবে সাবমেরিনেই। বিপদ অবশ্য সবদিকেই আছে, তবু সাবমেরিনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি কিছুটা কম। মাত্র একজন তাঁর সঙ্গে যেতে পারবে সঙ্গী হিসেবে।

প্রথমার্ধের পথই সবচাইতে বিপদসঙ্কুল। সে দায়িত্ব বহন করবেন জার্মান সরকার। তাঁরা তাঁকে পৌঁছে দেবেন দক্ষিণ আফ্রিকাসংলগ্ন মাদা-গাস্কারের কাছাকাছি একটা নির্দিষ্ট স্থানে। বাকি অংশের দায়িত্ব জাপান সরকারের।

ক্রমশ দিন এগিয়ে আসে। বাইরে থেকে কোন কিছুই বোঝার উপায় নেই। যেমন চলছিল তেমনিই চলছে সব কিছু। যেন কিছুই হয়নি।

ভেতরে ভেতরে কিন্তু প্রস্তুতি-পর্ব তখন বেশ দ্রুতলয়েই এগিয়ে চলেছে। কাকপক্ষীরও সেকথা জানবার কোন উপায় নেই। নেতাজী বোস সাধারণ লোক নন। কোনরকমে একবার টের পেলে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি যে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে তাঁকে প্রতিহত করবার চেষ্টা করবে, তা বলাই বাহুল্য।

সাবধানতা হিসেবে প্রথমেই সুভাষের কয়েকটি বক্তৃতা রেকর্ড করে রাখা হল বেতারের জন্য। তাঁর অবর্তমানে মাঝে মাঝেই এগুলি প্রচার করা হবে আজাদ হিন্দ্ রেডিও থেকে। উদ্দেশ্য—শত্রুপক্ষকে বিভ্রান্ত করা। অর্থাৎ—সুভাষ এখানেই রয়েছেন। কোথাও তিনি যাননি জার্মানী ত্যাগ করে।

সুভাষের কথাবার্তার মধ্যেও নতুন সুর। পরিচিত অপরিচিত সর্বত্র একই কথা। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য কিছুদিনের জন্য রাশিয়া ফ্রণ্টে যাচ্ছি। মাসখানেকের মধ্যেই ফিরব। তোমরা ঠিকমত কাজ চালিয়ে যেও।

৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩ সাল।

তখনো রাতের অন্ধকার কাটেনি। আলো-আঁধারিতে পথঘাট, গাছপালা, পাহাড়-নদী, সবকিছুই রহস্যময়।

বার্লিনের লেহ্‌র্টার ব্যানহফ রেল স্টেশন। কিয়েলগামী গাড়ি ছাড়ার সময় হয়েছে। আর দেরি নেই।

সাধারণ দৃষ্টিতে কোথাও কোন পরিবর্তন চোখে পড়ে না, কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, পরিস্থিতি আজ অন্যান্য দিনের মত স্বাভাবিক নয়।

এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে আছে দুর্ধর্ষ জার্মান গোয়েন্দার দল। চোখে-মুখে তাদের শাণিত তলোয়ারের দৃষ্টি। হিজ এক্‌সেলেন্সী নেতাজী সুভাষ বোস আজ যাবেন লেহ্‌র্টার ব্যানহফ স্টেশন হয়ে। এ সতর্কতা তারই প্রয়োজনে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তনের মুখে। রেল স্টেশন, বিমানঘাঁটি, বন্দর, পোতাশ্রয়, কিছুই এখন আর আগেকার মত নিরাপদ নয়। শত্রুপক্ষের গুপ্তচর বিভাগও এখন আগেকার তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয়। কোথায় যে কে ঘাপটি মেরে বসে আছে কে জানে!

সাবমেরিন কম্যাণ্ডারকেও এ সম্বন্ধে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে বার বার। হুঁশিয়ার! খুব হুঁশিয়ার!

— মনে রেখ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দাবানল এখন জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে —সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ইংলিশ চ্যানেল, উত্তর সাগর, আটলাণ্টিক, ভূমধ্যসাগর—সর্বত্র এখন ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির দূরপাল্লার বোমারু বিমান, মাইন এবং যুদ্ধ-জাহাজের সমারোহ। একবার মুখোমুখি পড়ে গেলে আর রক্ষে নেই।

তাছাড়া প্রতিটি গতিপথ আগলে রয়েছে শত শত মার্কিন এবং বিশ্বের সেরা গোয়েন্দা বিভাগ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অভিজ্ঞ গোয়েন্দার দল। তাদের সতর্ক চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ কথা নয়।

যে-কোন মুহূর্তে টর্পেডো বা ডুবন্ত মাইনের বিস্ফোরণে অতল-সমাধি হওয়াও বিচিত্র নয়। কারণ, যেতে হবে শত্রুর নাকের ডগার ওপর দিয়ে অতি সঙ্গোপনে। সুতরাং খুব হুঁশিয়ার। কোনরকম ঝুঁকি নেবে না। একটি বারের জন্যও না।

মনে রেখ, এমন একটি কঠিন দায়িত্ব তোমার ওপর অর্পণ করা হয়েছে, যা শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয়, ইতিহাসের বিষয়বস্তুও বটে। সুতরাং এগুতে হবে অতি সন্তর্পণে, ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে।

ঠিক একইভাবে ওদিক থেকে জাপানী সাবমেরিনকে পাড়ি দিতে হবে, সময়ের সঙ্গে চুলচেরা হিসেব করে। একটু এদিক-ওদিক হলেই বিপদ। হাজার চেষ্টা করলেও তখন আর কেউ কাউকে খুঁজে পাবে না মাদাগাস্কারের সেই নির্দিষ্ট স্থানে। সুতরাং খুব হুঁশিয়ার।

সবার ওপরে নেতাজী বোস। তাঁর সুখ-সুবিধের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখবে। তাঁর প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। দেখো, কোথাও

যেন এতটুকু ত্রুটি না হয়। কামনা করি তোমাদের যাত্রাপথ নির্বিঘ্ন হোক। হেইল্ হিটলার!

৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩ সাল।

লগ্ন আসন্ন। এবার সুভাষকে বিদায় নিতে হবে দীর্ঘ দিনের কর্মক্ষেত্র জার্মানী থেকে।

সামনে দাঁড়িয়ে গুটিকয়েক মাত্র লোক।

এ পক্ষ থেকে রয়েছেন সুভাষ, সহযাত্রী আবিদ হাসান আর সহকারী নেতা নাম্বিয়ার। ও পক্ষে স্টেট সেক্রেটারী কেপ্লার এবং বৈদেশিক দপ্তরের আলেকজাণ্ডার ওয়র্থ। তাছাড়া আর কাউকেই সেদিন খবরটা জানতে দেওয়া হয়নি সতর্কতা হিসেবে।

ওদিকে কোনিং টাওয়ারে দাঁড়িয়ে সাবমেরিন কম্যাণ্ডার তখন প্রস্তুত। ইতিমধ্যে দু-দুবার যাত্রা বন্ধ রাখতে হয়েছে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে। এবার আর দেরি নয়। এখন শুধু ডুব দেবার অপেক্ষা মাত্র।

'বিদায় বন্ধুগণ, বিদায়! তোমাদের কথা আমি কোনদিনও ভুলব না। আবার দেখা হবে।'

একটা রুদ্ধ আবেগকে চাপতে গিয়ে হঠাৎ বড় বড় পা ফেলে নীচে নেমে গেলেন সুভাষ। আর ফিরেও তাকালেন না। বিপ্লবীকে পেছন পানে তাকাতে নেই। এগিয়ে চলাই তাঁর সহজাত ধর্ম।

স্থির অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ওঁরা তিনজন।

বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা। মুখে তারই প্রতিচ্ছায়া। একসঙ্গে কত দিন, কত মুহূর্ত, কত আনন্দ-বেদনা, কত সীমাহীন রাত্রিই না তাঁদের কেটে গেছে। আজ সবকিছুর ইতি। সবকিছুর পরিসমাপ্তি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় শেষ করে আজ আবার সুভাষ এক নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছেন কর্তব্যের আহ্বানে।

ঐ যে সাবমেরিনটা ডুবতে শুরু করেছে সুভাষকে নিয়ে। ঐ যে তার পেরিস্কোপটা এখনো জেগে রয়েছে জলের ওপরে।

না, আর নেই। সমুদ্র স্থির, শান্ত। খানিকটা ভাসমান তেল ছাড়া আর কিছুই এখন নজরে পড়ে না জলের ওপরে।

এ প্রসঙ্গে সাবমেরিন-ক্যাপ্টেন ডব্লু মুসেমবার্গ পরবর্তীকালে অস্ট্রিয়ার 'নয়েৎসাইট্' (Neue Zeit) পত্রিকায় কি বক্তব্য রেখেছিলেন শোনা যাক:

'বোট প্রস্তুত ছিল, আমরাও নোঙর তুলে দিয়ে সমুদ্রযাত্রায় রওনা হয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। রওনা হবার তারিখও আমাদের জানিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তারপরই পাল্টে গেল তারিখ। যাত্রা স্থগিত রইল।

এমনি করে পর-পর দুবার আমাদের যাত্রারম্ভের তারিখ বিজ্ঞাপিত হয়েও পিছিয়ে গেল। কেন এমন হচ্ছে তা নিয়ে নানারকম জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হল এবং নানারকম কাহিনীও রটে গেল। আমাদের সকলেরই জানা ছিল, বোটের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সব নেওয়া হয়ে গেছে। সব সরঞ্জাম সজ্জিত হয়ে বোট রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে। তবুও রওনা

হবার দিন পিছিয়ে যায় কেন, এ রহস্যটি কেউ জানতে পারলাম না।

জানতেন শুধু একজন, আমাদের ইউ-বোটের কম্যাণ্ডার। একমাত্র তিনিই তখন জানতেন যে, ইউ-বোটের ওপর কোন বিশেষ কাজের ভার পড়েছে এবং কেন তখনও রওনা হওয়া সম্ভব হচ্ছিল না।

কিন্তু বেশিদিন আর প্রতীক্ষায় থাকতে হয়নি। রওনা হবার মুহূর্তটি দেখা দিল। ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আমাদের বোট নোঙর তুলে ফেলে তট-ভূমির দিকে শেষ সঙ্কেত জানিয়ে দিল। এমন সময় দেখা গেল যে, ক্ষুদ্র আকারের একটি বোট আমাদের দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। আমাদের ধাবমান বোটের গতি মন্দীভূত হল এবং আগন্তক বোটও এসে আমাদের বোটের গতি স্তব্ধ করল।

আগন্তুক বোটের ভেতর থেকে দুই ব্যক্তি বের হয়ে এসে আমাদের বোটে উঠলেন।...আমাদের বোট আবার চলতে সুরু করল।

দিন-কয়েক পরে বোট এসে নোঙর ফেলল নরওয়ের উপকূলের গিরি-বেষ্টিত সমুদ্র-জলের একটি খাঁড়িতে। কোন নাবিকের পক্ষে বোট থেকে নেমে স্থলভাগে ঘুরে আসবার অনুমতি ছিল না। এখানে একদিন মাত্র থেকে পরের দিনই রওনা হয়ে যাবার কথা ছিল।

আমাদের বোটের সেই ভদ্রলোক দুজন তাঁদের এই পরিচয় দিয়েছিলেন যে, তাঁরা হলেন এঞ্জিনিয়ার। আমরা পূর্বেই জেনেছিলাম যে, তাঁরা নর-ওয়ের উপকূলে নেমে যাবেন। কিন্তু এখন সকলেই দেখে আশ্চর্য হল যে, আমাদের ইউ-বোটের যাত্রী এই ভদ্রলোক দুজন উপকূলে নামলেন না, ইউ-বোটেই রয়ে গেলেন।

এইবার রহস্য ভাঙল। নাবিকরা সকলেই জানতে পারল—সুভাষচন্দ্র বসু ও তাঁর অ্যাডজুট্যাণ্ট আবিদ হাসান চলেছেন এই বোটের যাত্রী হয়ে। নাবিকরা সকলেই অনুমান করে নিতে পারল, কোথায় গিয়ে তাঁদের যাত্রা শেষ হবে।

পরদিন প্রাতে আবার তটভূমির সংগে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে আমাদের বোট রওনা হয়ে গেল। ক্লান্তিহীন যাত্রা। কোথাও বিরাম নেই। যাত্রী দুজন তখনো আমাদের বোটেই রয়েছেন। কোথাও নেমে যাবার প্রয়োজন তাঁদের হয়নি।'

[অনুবাদ : আনন্দবাজার পত্রিকা : ১১. ৫. ৫১.]

ওপরে উদ্দাম উচ্ছল সমুদ্র। অবিরাম ঢেউ গড়ছে আর ভাঙছে। অবিরাম ঢেউ ভাঙার শব্দ চলছে। যেন শেষ নেই এই ভাঙা-গড়া মিছিলের।

নীচে চলমান সাবমেরিন। ধীর মন্থর গতি। ভাসমান অবস্থায় ঘণ্টায় বিশ নট। জলের নীচে ঠিক তার অর্ধেক। অর্থাৎ, ঘণ্টায় দশ নট মাত্র। এখন আরও কম। অনেক কম।

এ যাত্রা কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এ পথ অতি কঠিন, কঠোর। জীবন ও মৃত্যুর এখানে পাশাপাশি বাস। বাঁচতে হলে এখন যুঝতে হবে প্রতি মুহূর্তে।

কোন গ্যারেণ্টি নেই। কোন নিশ্চয়তা নেই। বরং অসম্ভবই বলা চলে।

পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধ চলছে। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্বত্র এখন শুধু মৃত্যুর পদধ্বনি। এ অবস্থায় এখান থেকে রওনা দিলেই যে শেষ পর্যন্ত গন্তব্যস্থানে পৌঁছানো যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। বরং মৃত্যু-টাই সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক।

চারপাশে শত্রুপক্ষের বেড়াজাল। ব্যাটল্ শিপ, ডেস্ট্রয়ার, ক্রুজার বিমানবহর , ডেপ্থ্চার্জ, টর্পেডো সবকিছু যেন হাঁ করে বসে আছে হিংস্র হায়েনার মত। একটু টের পেলে আর রক্ষা নেই। সুতরাং যেতে হবে খুব সন্তর্পণে। সর্বদিকে চোখ কান খোলা রেখে।

সবচাইতে মারাত্মক ডুবন্ত মাইনগুলি। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মাইন। বলতে গেলে গোটা উপকূলভাগটাকেই ওরা ঘিরে রেখেছে শক্তিশালী ডুবন্ত মাইন দিয়ে। এর যে-কোন একটার সঙ্গে সামান্যতম সংঘর্ষ হলেই মৃত্যু অনিবার্য।

ঘুম নেই সদাসতর্ক সাবমেরিন-ক্যাপ্টেন মুসেমবার্গের চোখে। সারা-মুখে তাঁর রাত্রি জাগরণের ক্লান্তির কালিমা।

মাথার ওপর কর্তব্যের গুরুভার। যে করে হোক হিজ এক্সেলেন্সী সুপ্রীম কম্যাণ্ডার আজাদ হিন্দ্ ফৌজ, নেতাজী সুভাষ বোসকে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিতেই হবে। স্বয়ং ফুয়েরারের আদেশ।

কাজটা শক্ত। খুবই শক্ত। প্রায় অসম্ভবই বলা চলে।

জার্মানীর সেদিন আর এখন নেই। শত্রুবাহিনী যেভাবে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলতে শুরু করেছে, তাতে জার্মানীর ভাগ্যে কি যে আছে তা বলা শক্ত।

অথচ কিছুদিন আগেও পরিস্থিতি ছিল অন্যরকম।

কি অবিশ্বাস্য গতিতেই না জার্মানী সেদিন এগিয়ে চলেছিল প্রতিটি রণাঙ্গনে! সর্বত্র শুধু জয় আর জয়। একটানা বিরামহীন জয়।

কিন্তু কোথায় গেল সে-সব! যবনিকার অন্তরালে সেদিনের সেই গৌরবগাঁথা আজ বিগত, বিস্মৃত একটা ফসিল ছাড়া আর কিছুই নয়।

স্ট্যালিনগ্রাডের ভাগ্য-বিপর্যয়ই বুঝিয়ে দিয়েছে যে জার্মানীর চরম বিপদ আসন্ন। ফুয়েরার যা-ই বলুন না কেন, এ যাত্রা জার্মানীর আর পরিত্রাণ নেই।

শুধু স্ট্যালিনগ্রাড বলে নয়, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে, সর্বত্র এখন সেই একই অবস্থা।

কোথায় সেই ব্রিটিশের ত্রাসসৃষ্টিকারী জার্মান নৌবহরের গ্রাফ স্পি, ডয়েস্ল্যাণ্ড, অ্যাডমিরাল শিয়ার প্রমুখ বিখ্যাত পকেট ব্যাটল্শিপগুলি? একটাও অবশিষ্ট নেই। সব শেষ।

বিমানবহরের অবস্থাও তাই। আগে জার্মানীর মারাত্মক স্টুকা বিমানগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যেত লণ্ডনের আকাশে। ওদের বিমানবহর আকাশে ওঠার আগেই বোমাবর্ষণ করে আবার তারা নির্বিঘ্নে ফিরে আসত নিজেদের ঘাঁটিতে।

আজ ব্রিটিশ রাজকীয় বিমানবহরের অন্য চেহারা। বলতে গেলে ইয়োরোপের পশ্চিম ভূখণ্ডের গোটা আকাশপথটাই এখন ওদের দখলে।

আশ্চর্য, কি করে যেন আগে থেকেই ওরা সব টের পায়। তার ফলে জার্মানীর স্টুকা বিমানগুলি রওনা হবার আগেই ওদের রাজকীয় বিমান-বহর আকাশে উঠে এমনভাবে প্রস্তুত হয়ে থাকে যে, ধারে-কাছেও এগুনো দায়।

আসলে ইংল্যান্ড ইতিমধ্যে এমন একটি শক্তিশালী রাডার-যন্ত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে, যার ফলে দূরাগত সবকিছুই তাদের কাছে স্পষ্ট ধরা পড়ে যায় দিবালোকের মত। সে তথ্য জার্মানীর কাছে তখনো পর্যন্ত অজ্ঞাত।

ভয় সেখানেই। এতদিন ব্যাটলশিপ, ডেস্ট্রয়ার বা ক্রুজারকে ফাঁকি দিতে পারলেও এখন তাদের সেই মারাত্মক রাডার-যন্ত্রকে ফাঁকি দেওয়া মুশকিল। কখন যে এই সাবমেরিনের অস্তিত্ব সেই রাডার-যন্ত্রে ধরা পড়ে যাবে, তা কে বলতে পারে!

দিনের পর দিন কেটে যায়।

সাবমেরিনের চলার গতির বিরাম নেই।

এ আর কতটুকু পথ! এখনো দুস্তর পথ তাকে পাড়ি দিতে হবে সবকিছু বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে। সামনে দীর্ঘ বিসর্পিল অন্তহীন পথ। শুধু ভাগ্যদেবতাই বলতে পারেন পথের প্রান্তে তার জন্য কি অপেক্ষা করে আছে। সার্থকতা, না অতল সমাধি!

পদে পদে ভয়। শত্রুপক্ষ কিছু টের পায়নি তো! বলতে গেলে গোটা জলপথটাই এখন ওদের দখলে। কখন যে টর্পেডো চার্জ করে সবকিছু নিশ্চিহ্ন করে দেবে কে জানে!

'Netaji and Hassan were huddled in a corner of the submarine not wanting to be in the way of the crew who had to be alert night and day to avoid being torpedoed under water or being rammed to extinction on the surface by enemy naval craft that were scouring the seas for German submarines.'

[Unto Him a Witness: S. A. Ayer: P.—263]

ওদিকে তখনো ১৯·৭১ ওয়েভ লেংথে সুভাষের রেকর্ড করা কণ্ঠস্বর একটানা বেজে চলেছে হুইজেনে অবস্থিত আজাদ হিন্দ্ রেডিও থেকে:

'আমি সুভাষ বলছি।

বাংলাদেশের অধিবাসীদের আমি এই বলে সতর্ক করে দিতে চাই যে, শীগগিরই তাদের খুব দুর্দিন আসছে। পূর্বাঞ্চলে রক্তপাত ঘটবে। তার জন্য ভয় পেলে চলবে না। বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম ব্রিটিশ শাসনের গোড়াপত্তন হয়েছিল। এবার বাংলাকেই আবার তার উচ্ছেদের দায়িত্ব নিতে হবে।

এজন্য বাংলার গর্বিত হওয়া উচিত। পথিকৃৎদের কর্তব্য চিরদিনই

কঠিন, কিন্তু তা গৌরবের। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বাংলাদেশ তার কর্তব্যের উপযুক্ত হয়ে উঠবে এবং এ যুদ্ধে তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা যথাযথ পালন করবে।

স্বাধীনতা সূর্যের উদয় হবে পূর্বাঞ্চলে। ইনক্লাব জিন্দাবাদ! জয় হিন্দ্!'

এদিকে নিজের কেবিনে বসে সুভাষ তখন তাঁর আগামী দিনের সংগ্রামের পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত।

সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম। এই মরণপণ সংগ্রামই এখন তাঁকে চালিয়ে যেতে হবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। হয় কূল, নয়তো অতল সমাধি, এ ছাড়া আর কোন পথই খোলা নেই তাঁর চোখের সামনে।

ছোট্ট কেবিন। খুবই ছোট্ট। সোজা হয়ে দাঁড়াবার উপায় নেই। দু'পা হেঁটে চলার মতও জায়গা নেই।

সুভাষের কিন্তু ভ্রূক্ষেপও নেই, মল্লিকা। ইতিমধ্যে দেহের ওজন ষোল পাউন্ড কমে গেছে, তবু তিনি তেমনি নির্বিকার।

সামনে দীর্ঘ বন্ধুর অন্তহীন পথ। সেই পথই এখন তাঁর কাছে একমাত্র সত্য। সেখানে ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধের কথা চিন্তা করার মত অবকাশ কোথায়?

সহযাত্রী আবিদ হাসানের ভাষায়ঃ

'Thus the three months he spent in the submarine, denied the possibility of personal hygiene, with no room to move even a few steps, shut away from nature, clamped in a space, not only strange and artificial but narrow in the extreme, would have taken a heavy toll of a man enjoying better health than he could claim.

But from the day he entered the submarine he started to work and I too could feel on myself what a blessing engrossing work can be. He had so many plans for the struggle in East-Asia and they had all to be worked out and, as was his habit, each one in detail.'

[The Men From Imphal: Abid Hassan Safrani: P.—17]

কিন্তু এ কোন্ সুভাষ! আশ্চর্য, চেনাই যায় না! মনে হয় এ যেন আমূল পরিবর্তিত কোন ভিন্ন সত্তা!

একগাল দাড়ি। গায়ে জার্মান নৌ-বিভাগের পোশাক। মুখে নির্ভুল জার্মান ভাষা। এ অবস্থায় এই ছদ্মবেশের আড়াল থেকে আসল মানুষটিকে খুঁজে বের করা সহজসাধ্য নয়।

যুদ্ধ-পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল। যে-কোন মুহূর্তে সাবমেরিনটার

শত্রুপক্ষের হাতে ধরা পড়ে যাওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। এ সতর্কতা শুধু তাঁরই প্রয়োজনে। অর্থাৎ, আমি সুভাষ নই, এই সাবমেরিনেরই একজন জার্মান অফিসার মাত্র।

'If the submarine had been captured, it would have been very difficult for a foreigner seeing Subhas, without his glasses and with a sizeable beard, to guess that it was the Indian revolutionary leader who was making an underwater dash from Berlin to Tokyo.

If captured, both Subhas and Abid, with their fair skin, beards and fluent German would have passed for men of the submarine crew.'

[Unto Him a Witness : Ayer : P.—264]

কাগজ-কলম নিয়ে আবিদ হাসান প্রায় সর্বক্ষণই প্রস্তুত। নেতাজী এখন তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তাঁর নির্দেশমত প্রতিটি প্রয়োজনীয় পয়েন্ট নোট করে রাখতে হবে। এ ব্যাপারে কোনরকম ত্রুটি হলে চলবে না।

কখনও বা আসেন সাবমেরিন কম্যান্ডার নিজে। হিজ এক্সেলেন্সী নেতাজী বোসের কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো! কিছু দরকার হলে নিঃসংকোচে বলবেন আমাকে।

দিনের পর রাত্রি। আবার রাত্রিও একসময়ে হারিয়ে যায় নতুন দিনের সমারোহে।

কিন্তু সাবমেরিনের অভ্যন্তরে সবই সমান। একই রঙ নিয়ে সেখানে দেখা দেয় ভোরের সূর্য, স্তব্ধ দুপুর আর শান্ত বিকেল। দিন আর রাত্রির একই চেহারা। সমুদ্রের নীচে চলমান এই সাবমেরিনের অভ্যন্তরে সবকিছুই যেন স্বাদহীন, বর্ণহীন, বৈচিত্র্যহীন।

শুধু একটানা একটা গুম্‌গুম্‌ শব্দ, আর মাঝে মাঝেই মাইক্রোফোনে ভেসে আসে সতর্ক নির্দেশ,—হ্যালো! হ্যালো! হ্যালো! ডাইভ! ডাইভ! ডাইভ! জলের চাপ দেখে মনে হয়, কাছে-কিনারেই কোথাও একটা ডেস্ট্রয়ার ঘুরে বেড়াচ্ছে। নীচে নেমে যাও। আরো নীচে।...না, আর ভয় নেই। ওটা পাশ কাটিয়ে চলে গেছে।...রাত এখন তিনটে। সাবমেরিন এবার জলে ভেসে উঠবে। জলের ট্যাংকগুলো খালি করে দাও একে একে।

সাবমেরিন ভেসে উঠতেই একে একে প্রায় সবাই বেরিয়ে আসে কোনিং টাওয়ারে। বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয় সবাই।

মুক্তি! মুক্তি! মুক্তি! একটানা বন্ধ জীবনের পরে অবারিত মুক্তি! কিন্তু তাই বা কতক্ষণ! যুদ্ধের আগুনে সারা পৃথিবী তখন জ্বলছে। আকাশে-বাতাসে সর্বত্র শুধু মৃত্যুর পদধ্বনি। তাই দেখতে না দেখতেই আবার একসময়ে সেই সমুদ্রের তলায়।

ফেব্রুয়ারি পেরিয়ে মার্চ।

তখনো সাবমেরিনটা এগিয়ে চলেছে সেই একইভাবে। কখনো স্বাভাবিক লয়ে, কখনো বা ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে।

আগে হলে ভূমধ্যসাগর দিয়ে সুয়েজ ক্যানেল পেরিয়ে সোজা বেরিয়ে যাওয়া যেত। তাতে দূরত্বও অনেকটা কম হত। সে পথ এখন একেবারেই রুদ্ধ। আফ্রিকা এখন পুরোপুরি ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর দখলে। তাই যেতে হবে সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে, আটলান্টিক, উত্তমাশা অন্তরীপ ইত্যাদি অনেকটা পথ ঘুরে।

এ পথ অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। বলতে গেলে আটলান্টিক মহাসাগরের গোটা অঞ্চলটাই এখন শত্রুপক্ষের দখলে। এ অবস্থায় কখন কি ঘটে যাবে কে জানে!

মার্কিন-মুলুক থেকে খাদ্য এবং অস্ত্রসম্ভার নিয়ে বিরাট একটা কনভয় এগিয়ে চলেছে আটলান্টিকের বুকে ঝড় তুলে। ব্যাটল্‌শিপ, ডেস্ট্রয়ার, ক্রুজার কিছুই তার মধ্যে বাদ নেই। সব মিলিয়ে প্রায় শ' দুয়েক জাহাজ।

চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য ডেস্ট্রয়ার এবং ক্রুজার। মাঝখানে মাল বোঝাই আসল জাহাজগুলি। ডেস্ট্রয়ার এবং ক্রুজারগুলির কাজ হল তাদের পাহারা দিয়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেওয়া।

লক্ষ্য—ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ডের তখন বড় দুর্দিন। পৃথিবীতে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া এমন বন্ধু আর কে আছে, যারা এই দুঃসময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

যেতে যেতে সহসা একটা জাহাজ (Freighter) থমকে দাঁড়াল মুহূর্তের জন্যে. তারপরই শোনা গেল ক্যাপ্টেনের বিপদসূচক সঙ্কেত—রেডি! রেডি! রেডি! চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখ! মনে হয় শত্রুপক্ষের একটা সাবমেরিন কাছে-কিনারেই রয়েছে।

নিজের কেবিনে বসে সুভাষ তখন তাঁর ঝাঁসীর রাণী বাহিনীর পরিকল্পনার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। মেয়েদের পিছিয়ে থাকলে চলবে না। এবারের এই শেষ সংগ্রামে তাদেরও যোগ দিতে হবে দলে দলে।

ঝাঁসীর রাণী প্রাতঃস্মরণীয়া লক্ষ্মীবাঈ ও তাঁর সখীবৃন্দ মতিবাঈ, মান্দার, সুন্দর, কাশী, ঝলকারী—এ'রা তো এই দেশেরই মেয়ে। তাঁরা যদি স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পেরে থাকেন, তাহলে আজকের মেয়েরাই বা পারবে না কেন? সুযোগ পেলে নিশ্চয় পারবে।

কাছে বসে আবিদ হাসান নোট লিখে চলেছেন নিজের মনে। নেতাজীকে চিনতে তাঁর বাকী নেই। তাঁর কাছে আগে কাজ, তারপর অন্য কথা। কাজের ব্যাপারে এতটুকুও ত্রুটি হলে সেখানে মার্জনা নেই।

হঠাৎ মাইক্রোফোনে শোনা গেল সাবমেরিন কম্যান্ডারের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার! আমরা ভুল করে শত্রুর বেড়াজালের মধ্যে আটকে পড়েছি। খুব হুঁশিয়ার!

বারেক তাকিয়ে দেখলেন সুভাষ। তারপরই আবার একসময়ে কাজের

মধ্যে ডুবে গেলেন আগেকার মত। যেন কিছুই হয়নি।

আর আবিদ হাসান! মুখে প্রকাশ না পেলেও মনে কিন্তু তখন তাঁর ঝড় বইছে। উদ্দাম ঝড়।

আমরা শত্রুর বেড়াজালে আটকে পড়েছি। হয় মৃত্যু, নয়তো বন্দী-জীবন, এর একটাকে এখন আমাদের মেনে নিতেই হবে। এই দুয়ের মাঝামাঝি আর কোন পথ নেই। সৈনিকের পক্ষে কোন্‌টা বেশি কাম্য। কোন্‌টা সম্মানের!

এ কি! নিমেষে আবিদ হাসানের ভাবনার গতি পাল্‌টে দিলেন সুভাষ,—আমি দু-দুবার বললাম, তা এখনও কিনা তুমি কথাটা নোট করে নিলে না!

আমার ভুল হয়ে গেছে স্যার! সম্বিত ফিরে পেয়ে নিমেষে আবার কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন আবিদ হাসান,—আপনি বলুন, আমি নোট করে নিচ্ছি।

আক্রমণই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। তাই নিষেধ থাকা সত্ত্বেও বজ্রকণ্ঠে সাবমেরিন কম্যাণ্ডার হাঁক দিলেন, রেডি! চার্জ টর্পেডো—

হায় ভগবান! কোথায় টর্পেডো চার্জ, আর কোথায় রইল কি! সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গেল কণ্ট্রোল রুমের একটি মারাত্মক ভুলের জন্য। ফলে টর্পেডো চার্জের পরিবর্তে গোটা সাবমেরিনটাই ভেসে উঠল জলের ওপর।

আর যায় কোথায়! নিমেষে সেই জাহাজটা (Freighter) তার গতি পরিবর্তন করে ঝড়ের মত ছুটে আসতে লাগল সাবমেরিনটাকে লক্ষ্য করে।

নিশ্চয় সাবমেরিনটাতে কোন যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিয়েছে, নইলে অনিবার্য বিপদ জেনেও এ সময়ে সে ভেসে উঠবে কেন? সুতরাং, ধ্বংস নয়, গোটা সাবমেরিনটাকেই এবার বন্দী করতে হবে।

বিপদ দেখে উত্তেজিতভাবে আদেশ দিতে লাগলেন সাবমেরিন কম্যাণ্ডার, ডাইভ! ডাইভ! ডাইভ! সবগুলি ট্যাঙ্ক জলে ভর্তি করে শীগগির নীচে নেমে যাও। কুইক! কুইক!

না, আর কোন আশা নেই। জাহাজটা একেবারে গায়ের ওপর এসে পড়েছে। আর দশ ফুট মাত্র বাকী। প্লীজ ডাইভ! ফর গড সেক্‌!...

জীবন ও মৃত্যুর পাশাপাশি একটা মুহূর্ত। আর রক্ষে নেই। জাহাজটা এসে পড়েছে। আর মাত্র তিন ফুট বাকী!

হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে সাবমেরিনটা কাত হয়ে গেল একপাশে। সব শেষ, এবার মৃত্যু অবধারিত।

কিন্তু না, এবার আর ভুল হয়নি কণ্ট্রোল রুমের, তাই ধাক্কা লেগে ব্রিজের রেলিং-এর খানিকটা অংশ ভেঙে গেলেও স্বাভাবিকভাবেই সাব-মেরিনটা আবার অদৃশ্য হয়ে গেল সমুদ্রের নীচে। হাজার চেষ্টা করেও আর তার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল সাবমেরিন কম্যাণ্ডারের। বিপদ কেটে গেছে। আর ভয় নেই। চল, আবার আগের মত সেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। হ্যালো, বাঁয়ে ত্রিশ ডিগ্রি, এবার সোজা...

সুভাষ তখন কোথায় ?

আশ্চর্য, তখনও তিনি ঠিক তেমনিভাবেই কাজের মধ্যে ডুবে রয়েছেন একান্ত-সচিব আবিদ হাসানকে নিয়ে।

সামনে কঠিন কঠোর সংগ্রামের দিন। সেই সংগ্রামই এখন তাঁর কাছে একমাত্র সত্য। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েও সেই সংগ্রাম ছাড়া অন্য কোন কিছুর কথা ভাবতে তিনি রাজী নন।

বিপদ কেটে যাবার পরে সমস্ত নাবিকদের কাছে ডেকে নিয়ে সশ্রদ্ধভাবে বললেন সাবমেরিন কম্যাণ্ডার ঃ

"আজকের এই ঘটনা থেকে আমরা কি শিক্ষা পেলাম। কিছু পেয়েছি কি ? হ্যাঁ, পেয়েছি। আমাদের মহামান্য অতিথি এবং তাঁর সহযাত্রীর কাছ থেকে এই শিক্ষাই আজ আমরা পেয়েছি যে, কি করে মৃত্যুর মুখোমুখি ধীর-স্থিরভাবে দাঁড়াতে হয়। কি করে মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে হয়। তোমরা সৈনিক। আশা করি সংগ্রামের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজকের এই শিক্ষার কথা তোমরা স্মরণ রাখবে।"

প্রত্যক্ষদর্শী মেজর আবিদ হাসানের মুখ থেকেই বরং সেদিনের অবিস্মরণীয় ইতিহাসের কিছু কিছু অংশ তুমি শুনে নাও মল্লিকা ঃ

"Dive!" The captain shouted his orders, "Dive! Dive!" But having surfaced by mistake the orders to dive could not be immediately carried out, though ordinarily it would take less than a minute to do so. Moments, as our captain was reminding in his orders, separated us from sure death and to me it appeared natural that every one should be scared.

Every one, I think, was scared and I could imagine what I looked like seeing death reflected in some of the faces I could see. Not every one was scared, not Netaji. "Hasan", he remonstrated, "I have repeated a point twice and you are not noting it down."

"I am sorry, Sir," I replied much ashamed and went on, with violently beating heart and shaking fingers to write down what he calmly dictated.

Meanwhile the Freighter roared down on us. There was a jilt and our submarine suddenly turned on one side. For a time we did not know whether we were hit and sinking. After what seemed ages we came to know that we had managed to dive just in time and the Freighter could only scratch the railings of our bridge which gave us the jerk.

Later, addressing the crew, the captain said they all could take a lesson from "our distinguished guest and his adjutant

in facing a sudden crisis involving even death with manly composure."

Even I was included in the praise, I who had so shivered with fear. But I was with a great man and my weakness was hidden away in the shadow of his greatness.

[The Men from Imphal: Abid Hasan Safrani: P.—18-19]

মার্চ পেরিয়ে এপ্রিল।

তখনো সাবমেরিনটা এগিয়ে চলেছে সেই একইভাবে। লক্ষ্য—মাদাগাস্কার উপকূল থেকে চারশো মাইল দূরবর্তী সেই নির্দিষ্ট স্থান। শত্রুপক্ষের সাবমেরিন ধ্বংসের ব্যাপারে ব্রিটিশের 'অ্যান্টি-সাবমেরিন ডিটেকশন ইনভেস্টিগেশন কমিটি' (A. S. D. I. C.) তখন অত্যন্ত তৎপর। একবার তাদের রাডার-যন্ত্রে ধরা পড়ে গেলে আর রক্ষে নেই।

তবু ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের ব্যাটারী চার্জ এবং রসদ নেবার প্রয়োজনে মাঝে মাঝেই সাবমেরিনটাকে জলের ওপরে ভেসে উঠতে হয়।

কাছাকাছিই রয়েছে জার্মান নৌ-বিভাগের সর্বাধিনায়ক অ্যাডমিরাল ডোনিৎস আবিষ্কৃত রসদ সরবরাহকারী অতিকায় 'মিলচকাউ' সাবমেরিন। ওখান থেকেই জার্মান সাবমেরিন 1/29-কে রসদ সংগ্রহ করতে হয় নিয়মিতভাবে।

অবশ্য যুদ্ধের শেষের দিকে ডোনিৎস এমন এক নতুন ধরনের সাবমেরিন তৈরি করেছিলেন, যা দীর্ঘকাল জলের নীচে ডুবে থাকতে সক্ষম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে-সব আর কোন কাজেই আসেনি। তার আগেই সব শেষ।

এপ্রিলের মাঝামাঝি।

ভাল লাগে না। আর ভাল লাগে না সুভাষের। বড় একঘেয়ে লাগে। যাত্রা শুরু হয়েছিল ৮ই ফেব্রুয়ারি। তারপর দুই মাসাধিক কাল কেটে গেছে। আর কত দিন! পথ যেন আর ফুরোতেই চায় না!

এখন কোথায় এসেছি আমরা? মাঝে মাঝেই প্রশ্ন করেন সুভাষ।

আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূলের কাছাকাছি জায়গায়। জবাব দেন সাবমেরিন কম্যাণ্ডার, মনে হয় আর কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা কেপটাউনের কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারব।

তারপর? সুভাষের চোখে-মুখে সপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা।

তারপর পোর্ট এলিজাবেথের গা ছুঁয়ে ডারবানের উপকূল। সেখান থেকে মাদাগাস্কারের চারশো মাইল দূরবর্তী সেই নির্দিষ্ট স্থান।

আর কতদিন লাগবে মনে হয়?

কোনরকম বাধা না পেলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আমরা পৌঁছে যেতে পারব আশা করি।

শুরু হল অন্তহীন প্রতীক্ষা। কবে এই প্রতীক্ষার শেষ হবে কে জানে!

মাঝে মাঝে শোনা যায় সেই একঘেয়ে নির্দেশ। বাঁ দিকে পনেরো ডিগ্রি। জলের চাপ দেখে মনে হয় কাছাকাছি কোথাও একটা ব্রিটিশ কার্গো-শিপ রয়েছে।

ব্রিটিশ কার্গো-শিপ! বুঝি বারেকের জন্য চোখদুটি জ্বলে উঠল সুভাষের। বুকের মধ্যে কেমন যেন এক অসহ্য জ্বালা। মুখে তারই প্রতিচ্ছায়া।

সহযাত্রী আবিদ হাসান অবাক। কেন নেতাজীর এই ভাবান্তর? মনে হয়, হঠাৎ একটা স্নায়বিক উত্তেজনা যেন তাঁর দেহের প্রতিটি স্তরে স্তরে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। কোথায় এই রহস্যের উৎস?

এ যাত্রা অতি বিপদসঙ্কুল। একটু এদিক-ওদিক হলে অবধারিত মৃত্যু। সে ভয়ে ভীত হবার মত লোক আর যিনিই হোন না কেন, সুভাষ নন। তাই মুহূর্ত বাদেই শোনা গেল তাঁর অমোঘ নির্দেশঃ

জলের ট্যাঙ্ক খালি কর। পেরিস্কোপ তুলে দেখ যে, ব্রিটিশ কার্গো-শিপটা কতদূরে রয়েছে। তারপর টর্পেডো চার্জ কর। আমি নিজের চোখে দেখতে চাই সব কিছু।

সাবমেরিন কম্যাণ্ডার বিব্রত। দ্বিধা ও কুণ্ঠায় জড়সড়।

এ যে ভয়ঙ্কর কথা! স্বয়ং নৌ-বিভাগের অধ্যক্ষ তাঁকে বার বার সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, এ সময়ে কোনরকম ঝুঁকি নেওয়া চলবে না। আগে নেতাজীকে জাপানী সাবমেরিনে তুলে দেবে, তারপর অন্য কথা। সেকথা অগ্রাহ্য করার মত সাধ্য তাঁর কোথায়? যদি তার ফলে কোনরকম অঘটন ঘটে! যদি তলিয়ে যায় সব!

'The Captain of the submarine had strict instructions not to engage himself in any fight or attempt to sink enemy vessel till Netaji was safely delivered on the corresponding Japanese submarine.'

[Netaji in Germany : N. G. Ganpuley : P.—132]

কিন্তু না, কোন উপায় নেই। কারণ অধ্যক্ষই আবার এক সময়ে তাঁকে বলেছিলেন যে, মনে রেখ, সবার উপরে নেতাজী। তাঁর প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। দেখো, কোনরকমেই যেন তার নড়চড় না হয়। সুতরাং যতবড় ঝুঁকিই থাক না কেন, নেতাজীর এই নির্দেশ তাঁকে মেনে নিতেই হবে।

কম্যাণ্ডারের নির্দেশে দেখতে দেখতেই সাবমেরিন পেরিস্কোপটা এক সময়ে মাথা তুলে দাঁড়াল জলের ওপরে।

অনুমান মিথ্যে নয়। ব্রিটিশ মালবাহী জাহাজই বটে। তবে একটা নয়, পর-পর কয়েকটা। উপকূলভাগের গা ঘেঁষে দিব্যি তারা এগিয়ে চলেছে সমরাস্ত্র বোঝাই করে। লক্ষ্য তাদের—ইংল্যাণ্ড।

হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। সেদিন তোমরা আমাদের সাবমেরিনটাকে ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিলে। চেয়েছিলে সবাইকে বন্দী করতে।

কিন্তু আজ! আজ কোথায় যাবে? না, দয়া বা অনুকম্পা নয়। সেদিনের প্রায়শ্চিত্ত আজ তোমাদের করতেই হবে।—রেডি প্লীজ! বজ্রকণ্ঠে হাঁক দিলেন সাবমেরিন কম্যাণ্ডার,—চার্জ......

বলতে না বলতেই একটার পর একটা টর্পেডো জল কেটে বিদ্যুৎবেগে ছুটে গেল নিকটস্থ মালবাহী জাহাজটা লক্ষ্য করে...

ওদিকে তখন সামাল্ সামাল্ রব উঠেছে মালবাহী জাহাজের অভ্যন্তরে।

টর্পেডো! টর্পেডো! ওরা টর্পেডো চার্জ করেছে সাবমেরিন থেকে। শীগগির জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে পাশ কাটিয়ে যাও! জলদি! কুইক!

কিন্তু সব বৃথা। তার আগেই শোনা গেল কান-ফাটানো বিকট আওয়াজ, —দ্রাম!

সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণের শব্দে গোটা জাহাজটা কেঁপে উঠল থরথর করে। তারপর আর কিছু নেই। শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। আকাশছোঁয়া কুণ্ডলীকৃত রাশি রাশি কালো ধোঁয়া। সেই সঙ্গে আগুনের লেলিহান শিখা।

এমনি করে একটার পর একটা। তারপর আরো একটা। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। তুচ্ছ ভাবালুতার সেখানে কোন প্রশ্নই ওঠে না।

'...The captain of the submarine which carried Netaji narrated that at the request of Netaji he gave him a practical demonstration of the working of a submarine by sinking a few cargo steamers off the African coast, which were carrying war materials to England.' [Ibid : P.—132]

২০শে এপ্রিল, ১৯৪৩ সাল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পেনাং বন্দর থেকে সেদিন একটি জাপানী সাবমেরিন ডুব দিল কম্যাণ্ডার ইজুর (Izu) নেতৃত্বে। লক্ষ্য—মাদাগাস্কার উপকূল-সংলগ্ন সেই নির্দিষ্ট স্থান।

জার্মানীর দায়িত্ব সেখানেই শেষ। পরবর্তী দায়িত্ব জাপ সরকারের। তাঁরাই সুভাষকে যথাস্থানে নিয়ে আসবেন একটি জাপানী সাবমেরিনের সাহায্যে।

এ পথ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। কারণ, প্রশান্ত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর ইত্যাদি প্রতিটি সমুদ্রপথে তখন জাপ আধিপত্য পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। ব্রিটিশ, মার্কিন, ওলন্দাজ শক্তিসমূহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি স্থান থেকে তখন বিতাড়িত।

২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ সাল।

মাত্র ছয়দিনে জাপ সাবমেরিনটি নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে হাজির, কিন্তু কোথায় কিয়েল থেকে চন্দ্র বোসকে নিয়ে আগত সেই জার্মান সাবমেরিন!

না, আসেনি। আসার কথাও নয়। কারণ, হিসেব অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের দশ ঘণ্টা আগেই জাপ সাবমেরিনটি এসে হাজির হয়েছে মাদাগাস্কার-

সংলগ্ন সেই চিহ্নিত স্থানে। সুতরাং অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

ঠিক দশ ঘণ্টা বাদে গভীর রাত্রে সাবমেরিন 1/29 এসে হাজির হল মাদাগাস্কার-সংলগ্ন সেই নির্দিষ্ট স্থানে। প্রথমেই জল ফুঁড়ে ভেসে উঠল একটি সতর্ক পেরিস্কোপ। তারপর গোটা সাবমেরিনটাই।

জার্মান ক্যাপ্টেন মুসেমবার্গের ভাষায়ঃ

'পূর্বের ব্যবস্থামত নির্দিষ্ট দিনে এবং নির্দিষ্ট স্থানে আমরা রাত্রি-কালে জাপ সাবমেরিনটিকে দেখতে পেলাম। অতিক্ষুদ্র একটি কালো ছায়ার মত দেখাচ্ছিল জাপ সাবমেরিনটিকে। কিন্তু বাইরের আবহাওয়া ছিল প্রতিকূল এবং তরঙ্গের বিক্ষোভে সমুদ্রও ছিল অশান্ত। সুতরাং দুই বোট পরস্পরের সন্নিকট হতে পারছিল না।'

জাপ কম্যাণ্ডার ইজু তখন রীতিমত সতর্ক। যুদ্ধের সময় কাউকে বিশ্বাস নেই। আগে ভোর হোক, তারপর দেখে-শুনে নিঃসন্দেহ হয়ে এগোন যাবে।

এদিকে সমুদ্রের বুকে তখন ঝড় বইছে। উদ্দাম ঝড়।

এ অবস্থায় কাছাকাছি এগোতে গেলে সংঘর্ষ অনিবার্য, তাই দুটি সাবমেরিনই একে অন্যের চাইতে দূরে সরে রইল সামুদ্রিক ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে।

ভোরের আলোয় সবকিছু দেখে-শুনে নিঃসন্দেহ হলেন কম্যাণ্ডার ইজু। তবু কোন সুরাহা হল না। সমুদ্র তেমনই অশান্ত। বাতাসও ক্ষেপে উঠেছে। মনে হয় আরো বড় রকমের ঝড় উঠবে। মেঘের কুণ্ডলীতে যেন তারই আভাস।

উত্তরদিকে চল। জার্মান সাবমেরিনকে সিগন্যাল দিয়ে জানালেন কম্যাণ্ডার ইজু, আরো উত্তরদিকে। ওখানে ঝড়ের দাপট কিছুটা কম হলেও বা হতে পারে। দেখাই যাক না একবার চেষ্টা করে!

জাপানী ভাষ্যকার Tatsuo Hayashida-র ভাষায়ঃ

'At last it sighted the German submarine during the night, but it was not until the early morning the following day that coufirmed each other. Because of the rough weather, however. it was impossible to tranship. Therefore the submarine keeping in close touch with each other moved further north-east with hope of finding a calmer sea.'

[Netaji Subhas Chandra Bose : Tatsuo Hayashida : P.—25]

দুপুরের দিকে ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে দুজন জার্মান (একজন অফিসার, অন্যজন যোগাযোগ-রক্ষাকারী) সাবমেরিন থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করে। উদ্দেশ্য—সাঁতার কেটে এগিয়ে এসে দুটি সাব-মেরিনের মধ্যে একটা দড়ি বেঁধে দিয়ে যোগসূত্র স্থাপন করা।

এক ঘণ্টা প্রাণান্তকর পরিশ্রমের পর যোগসূত্র স্থাপিত হল, তবু আসল সমস্যার কোন সমাধান হল না।

সামুদ্রিক ঝড় সেই একইভাবে বয়ে চলেছে। এ ঝড় কখন যে থামবে, জোর করে তা বলা মুশকিল।

অবশ্য উত্তরদিকে আরো খানিকটা যেতে পারলে হয়তো বা কিছুটা সুবিধে হত, কিন্তু জার্মান সাবমেরিনের পক্ষে তাও আর সম্ভব নয়। কারণ, সাবমেরিনের প্রধান উপকরণ, তার তেলের ভাণ্ডার তখন প্রায় শূন্যে এসে ঠেকেছে। এ অবস্থায় তার পক্ষে এগিয়ে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কঠিন সমস্যা! কি করা যায় এখন এ পরিপ্রেক্ষিতে?

না, কোন উপায় নেই। এই ভয়াবহ দুর্যোগের মধ্যে হিজ এক্সেলেন্সী নেতাজী সুভাষ বোসের ব্যাপারে কোনরকম ঝুঁকি নেওয়াটা মোটেই সঙ্গত হবে না। দরকার হলে তার জন্য আরো চব্বিশ ঘণ্টা এখানে অপেক্ষা করতে হবে।

কাজেও তাই করা হল, মল্লিকা। প্রকৃতপক্ষে জার্মান সাবমেরিন ত্যাগ করে সহযাত্রী আবিদ হাসানসহ সুভাষ রাবার বোটে আরোহণ করলেন দুদিন বাদে, ২৮শে এপ্রিল ভোরবেলায়। লক্ষ্য—জাপানী সাবমেরিন।

বিপদ এল অন্যদিক থেকে। রাবার বোট দেখেই কোথা থেকে ছুটে এল ঝাঁকে ঝাঁকে অসংখ্য ক্ষুধার্ত হাঙর। সে কি তাদের লেজের ঝাপটানি! যেন নিজ রাজ্যে প্রবেশকারী অনধিকারী প্রাণী কটাকে উদরে না পাঠানো পর্যন্ত কিছুতেই শান্তি নেই তাদের।

দড়ি ধরে ক্রমশ রাবার বোটটা এগোতে লাগল উত্তাল ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে। ধীর মন্থর গতি। হাওয়ার বেগে একবার উল্টে গেলে আর রক্ষে নেই। হাঙরের দল তৈরিই আছে। তাদের লেজের ঝাপটায় সুভাষের জামাকাপড় ভিজে ততক্ষণে একেবারে একাকার।

প্রায় ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় সুভাষের বোট এসে থামতেই তাঁকে একযোগে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন কম্যাণ্ডার ইজু এবং সাবমেরিনের অন্যান্য অফিসারবৃন্দ। সুদূর বার্লিন থেকে নেতাজীর আগমন নিঃসন্দেহে এক অভাবনীয় ইতিহাস। এ ইতিহাসের সত্যিই তুলনা নেই।

পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত। কেউ ভাবতে পারেনি ভয়াবহ এই যুদ্ধের মধ্যে এ অভিযান কোনদিনও সার্থক হবে। হিটলার, মুসোলিনী, তোজো—কেউ না।

ভাবতে পেরেছিলেন কেবলমাত্র একজন। তিনি হলেন অসম্ভবের নায়ক নেতাজী সুভাষ।

ততক্ষণে জাপ নৌ-বাহিনীর সদর দপ্তরে খবর পৌঁছে গেছে ইথার-তরঙ্গে:

'মসি! মসি! মসি! চন্দ্র বোস...খাখা...ওয়া...স্তুই নি ওয়াগা। হো ...নো...ইয়াসুই কান নি ও নারে তা...'

অর্থাৎ—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। মহামান্য চন্দ্র বোস এইমাত্র আমাদের সাবমেরিনে এসে উঠেছেন।

একইভাবে জবাব এল নৌ-বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে:

'বানজাই! বানজি! নি...সাইদাই...নো...চন্দ্র ও হারাওয়ারে তাই! চন্দ্র বোস খাখা নো আনচাকু ওয়া ওয়ারে ওয়ারেনি...ইউদানেরারেত্স গিমু দিয়ারে কারা কামি নি কাকেতে জিক্কো সারেতাই।'

অর্থাৎ—আন্তরিক অভিনন্দন। খুব সাবধান! কোনরকম ঝুঁকি নেবে না। মনে রেখো, মহামান্য চন্দ্র বোসের নিরাপত্তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব এখন আমাদের। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমাদের যাত্রাপথ শুভ হোক।

দেখতে দেখতে জাপানী সাবমেরিনটা আবার ডুবে গেল সুভাষকে নিয়ে। সমুদ্রের বুকে খানিকটা ভাসমান তেল ছাড়া আর তার কোন চিহ্নই দেখা গেল না।

২৮শে এপ্রিল, ১৯৪৩ সাল।

আবার যাত্রা শুরু হল নতুন করে। নতুন দেশে। নতুন পরিবেশে। নতুন পরিচয়ে।

এবার জাপানী সাবমেরিনে। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এবার কম্যাণ্ডার ইজু সুভাষকে নিয়ে যাবেন সেই পেনাং বন্দরে।

সুভাষ এখন আর সুভাষ নন, 'কম্যাণ্ডার মাৎসুদা'। উদ্দেশ্য সেই একই। অর্থাৎ, শত্রুপক্ষকে ধোঁকা দেওয়া। ওরা বুঝুক যে, সুভাষ বলতে এখানে কেউ নেই। যিনি আছেন, তিনি আসলে জাপানী কম্যাণ্ডার মাৎসুদা ছাড়া আর কেউ নন।

মল্লিকা, এই নিয়ে মোট তিনবার নাম পরিবর্তন করতে হল সুভাষকে।

কলকাতা থেকে কাবুল পর্যন্ত—'মৌলবী জিয়াউদ্দিন'। কাবুল থেকে বার্লিন অবধি—'সিনর অরল্যাণ্ডো ম্যাজোট্টা'। তারপর জাপানী সাবমেরিনে 'কম্যাণ্ডার মাৎসুদা'। সবশেষে সেই এক ও অদ্বিতীয় নেতাজী। অবশ্য জাপানীদের কাছে বরাবরই তিনি ছিলেন 'চন্দ্র বোস'।

জার্মান সাবমেরিনে সুভাষের কেবিনটি ছিল খুবই ছোট। দু-পা হেঁটে চলাও সেখানে ছিল রীতিমত কষ্টকর।

সেদিক থেকে এখানকার ব্যবস্থা খুবই উন্নত। খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনও যথেষ্ট। মোট চারবার খাওয়া। পরিমাণে এত বেশি, যা সুভাষের পক্ষে দস্তুরমত কষ্টকর। এ প্রসঙ্গে জাপানী ভাষ্যকার Tatsuo Hayashida কি মজার উক্তি করেছেন শোন:

'During the one-week voyage, Subhas Chandra Bose had the use of the Captain's cabin. By pre-arrangement, they had special food ready for Bose.

...They made it a practice to eat three meals in the daytime and one additional meal at night. Subhas Chandra Bose was often seen to show his mild irritation at these frequently intervening stomach exercises. He often quipped, 'Do we have te eat again, Captain Teraoka'?'

চুপচাপ বসে থাকা সুভাষের স্বভাব নয়, তাই মাঝে মাঝেই তিনি সাবমেরিনের এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ান কৌতূহলভরে।

খুঁটিনাটি সবকিছুই লক্ষ্য করেন সতর্কভাবে। জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা। সঞ্চয়ের ঝুলি ভরা থাক। দেশ স্বাধীন হবার পরে এসব অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে।

'Despite the long, tough voyage, he showed no signs of fatigue. He was always in high spirits and inquisitive. He took a special interest in taking a tour through every section of the ship. He was so careful about his health that he made it a rule to take exercise wherever possible. He was often seen taking a nap. [Ibid : P.—26]

কতটা পথ এলাম! কণ্ঠে ব্যগ্রতা ঝরে পড়ে সুভাষের।

মরিসাস দ্বীপের পাশ কাটিয়ে এবার ভারত মহাসাগরের নীচ দিয়ে চলেছি।

ভারত মহাসাগর! মুহূর্তের জন্য আনমনা হয়ে গেলেন সুভাষ। বুকের মধ্যে ঐ একটি কথাই বুঝি ঘুরপাক খেতে থাকে বার বার।

ভারত! স্বাধীন ভারত! মুক্ত ভারত! 'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।' সেই দিন, সেই মহালগ্ন কবে আসবে! কবে!

এপথ অনেকটা নিরাপদ। মনে হয়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আমরা পেনাং বন্দরে গিয়ে হাজির হতে পারব। সেখান থেকে জাপান।

জাপান। সূর্যোদয়ের দেশ জাপান।

ভাবতে ভাবতে কোথায় তলিয়ে গেলেন সুভাষ। ডুবে গেলেন নীরব মধুর এক নিঃসঙ্গতার গভীরে।

মনে পড়ে ১৯০৫ সালে অনুষ্ঠিত রুশ-জাপান যুদ্ধের কথা।

কি অবিশ্বাস্য ইতিহাসই না সেদিন সৃষ্টি করেছিল ছোট্ট দেশ এই জাপান! ভাবতে গেলেও যেন অবাক লাগে।

এর আগে পর্যন্ত মানুষের মনে বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, ইয়োরোপের শ্বেতাঙ্গ শক্তি বুঝি অপরাজেয়। একফোঁটা জাপানই সেদিন সর্বপ্রথম দেখাল যে, এশিয়াবাসীরাও শ্বেতাঙ্গদের সেই চিরস্থায়ী দম্ভকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে জানে।

সে এক অবিশ্বাস্য কাহিনী।

পোর্ট আর্থার এবং ভ্লাডিভস্টক বন্দরে অবস্থিত বিশাল রুশ নৌ-বহর তখন প্রস্তুত। বড্ড বাড় বেড়েছে ঐ ক্ষুদে জাপানীগুলোর। ওদের একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার।

অপরদিকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল নৌ-বহর নিয়ে জাপ-নৌবাহিনীর প্রধান সেনাপতি অ্যাডমিরাল টোগোও তখন প্রস্তুত।

বুকে দুর্বার সাহস। চোখে দিগন্তসীমার মত উন্মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি। ওদের সায়েস্তা করতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে যে, এশিয়াবাসীরাও পাল্টা মার দিতে জানে।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব! একদিকে রয়েছে ওদের পোর্ট আর্থার নৌ-বন্দর, অন্যদিকে ভ্লাডিভস্টক। দুটোই সমান সুরক্ষিত। ব্যাটলশিপ, ক্রুজার, ডেস্ট্রয়ার, কোন কিছুরই সেখানে অভাব নেই।

অপেক্ষাকৃত দুর্বল এই নৌবহর নিয়ে কি করে তার মোকাবিলা করা সম্ভব ?

সব চাইতে বড় কথা, জাপ-নৌ-বহরে তখন আর কোন রিজার্ভ বা মজুদ যুদ্ধ-জাহাজ নেই। সেক্ষেত্রে এর কোন একটি জাহাজ ঘায়েল হলে পরিপূরক হিসেবে অন্য কোন জাহাজের সহায়তা পাবার আর কোন প্রশ্নই ওঠে না।

তা বলে পিছিয়ে গেলে চলবে না। কিছু একটা জবাব দিতেই হবে। যাকে বলে মুখের মত জবাব। এমন চাতুরিতে কার্যোদ্ধার করতে হবে, যাতে ওদের দুই বন্দরে অবস্থিত নৌ-বহর কোনরকমেই এক হয়ে মিলতে না পারে।

একবার যোগাযোগ ঘটে গেলে আর রক্ষে নেই। বিরাট ঐ নৌ-শক্তির বিরুদ্ধে জাপানের এই ক্ষুদ্র শক্তি তখন আর কতক্ষণ! ঝড়ের মুখে খড় কুটোর মত তখন উড়ে যেতে হবে না জাপানকে ?

কাজেও তাই করলেন অ্যাডমিরাল টোগো। প্রথমেই তিনি টোপ ফেললেন পোর্ট আর্থার বন্দরে অবস্থিত রুশ-নৌ-বহরের কাছে। দোহাই তোমাদের, বন্দর ছেড়ে তোমরা বেরিয়ে এসো না যেন। তাহলে কিন্তু আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব! দেখতে পাচ্ছ না যে, আমরা কত দুর্বল আর অসহায়!

চাল বৃথা গেল না। জাপ-নৌ-বহরকে ঘোরাফেরা করতে দেখেই রুশ-জাহাজগুলি বন্দর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে লাগল দলে দলে। এত বড় সাহস ঐ বেঁটে জাপানীগুলোর! শেষে কিনা আমাদের দোরগোড়ায় এসে হাজির! দাঁড়াও, মজাটা দেখাচ্ছি তোমাদের!

ব্যস, আর যায় কোথায় ? ফাঁদে পা দিতে না দিতেই আদেশ দিলেন অ্যাডমিরাল টোগো, চার্জ টর্পেডো—

বলতে না বলতেই একসঙ্গে অসংখ্য মৃত্যুবাণ ছুটে গেল অব্যর্থ নিশানায়। তারপর আর কিছু নেই। শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া! সবকিছুই ঢাকা পড়ে গেল আগুন আর কালো ধোঁয়ার অন্তরালে।

ওদিকে তখন চঞ্চল হয়ে উঠেছে ভ্লাডিভস্টক নৌ-ঘাঁটিতে অবস্থিত রুশ-যুদ্ধজাহাজগুলি।

শীগগির বন্দর ছেড়ে পোর্ট আর্থারের দিকে চল। জাপানীদের রুখতেই হবে। রুশ-ভল্লুক যে কি জিনিস তা ওদের ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে। চল সবাই।

কিন্তু কোথায় যাবে ? পথ কোথায় ? না, কোন উপায় নেই কারণ, সেখানেও বন্দরের মুখ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি জাপানী যুদ্ধজাহাজ। তারপর সেই একই ইতিহাস। শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস। একটার পর একটা ধ্বংস।

তবে রে! খবর পেয়ে বাল্টিক সাগরে অবস্থিত একটি শক্তিশালী রুশ-নৌ-বহর ছুটে এল তড়িৎ বেগে, আমরা এর বদলা নেব। বেঁটেগুলোর

যুদ্ধের সাধ চিরতরে ঘুচিয়ে দেব। চেনে না তো রুশ-ভল্লুককে!

বটে! সুশিমা প্রণালীতে পথরোধ করে দাঁড়ালেন অ্যাডমিরাল টোগো, ঠিক আছে, তাই হোক। জাপান তার জন্য সব সময়েই প্রস্তুত। তবে মনে রেখ যে, এই সুশিমা প্রণালী থেকে কাউকে এবার ফিরে যেতে দেওয়া হবে না। একটাকেও না।

কথা রাখলেন অ্যাডমিরাল টোগো। সামান্য শক্তি নিয়ে যেভাবে সেদিন তিনি শক্তিশালী রুশ-নৌবহরকে ধ্বংস করেছিলেন, নৌ-যুদ্ধের ইতিহাসে সত্যিই তা অভাবনীয়।

গোলার আঘাতে তাঁর নিজের জাহাজ 'মিকাসা' তখন ধ্বংসপ্রায়, তবু তিনি তেমনই মরীয়া, বেপরোয়া। মনে রেখ, ওদের সবক'টা জাহাজকে ধ্বংস করতে হবে। কেউ যেন পালাতে না পারে।

কাজেও তাই হল। বংশে বাতি দেবার জন্য একটা জাহাজও সেদিন আর অবশিষ্ট রইল না রুশ-নৌ-বহরের। সব শেষ।

খবর শুনে সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতাঙ্গ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সে কি আলোড়ন! বলে কি! এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার! নিপ্পনগুলো যে ইতিমধ্যেই রুশ-নৌবহরকে ধ্বংস করার মত এতখানি শক্তি সঞ্চয় করেছে, তা কে জানত!

অপরদিকে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের কণ্ঠে সেদিন চাপা উল্লাস। সাবাস জাপান! দেখালে বটে! গোটা এশিয়া ভূখণ্ডে তোমরাই প্রথম দেখালে যে, ইয়োরোপের শ্বেতাঙ্গ শক্তি অপরাজেয় নয়। মারের মত মার দিতে পারলে তাদের পরাস্ত করা এমন কিছু কষ্টসাধ্য কাজ নয়।...

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায় শেষ করে আজ আবার সুভাষ এক নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছেন সেই সূর্যোদয়ের দেশ জাপানে। কোথায় তার শেষ কে জানে!

এপ্রিল শেষ হল। শুরু হল মে মাস।

ভারত মহাসাগরের নীচ দিয়ে সাবমেরিনটা তখন এগিয়ে চলেছে মালাক্কা প্রণালীর দিকে। অদূরে পেনাং। মনে হয়, আর দু-তিন দিনের মধ্যেই পৌঁছানো যাবে পেনাং বন্দরে।

হঠাৎ সেদিন বেতারের মাধ্যমে এক সাঙ্কেতিক নির্দেশ ভেসে এল জাপ নৌ-বিভাগের সদর দপ্তর থেকে।

হ্যালো! হ্যালো! হ্যালো! তোমাদের খবর কি?

খবর শুভ। সাড়া দিলেন কম্যাণ্ডার ইজু, আর মাত্র দু-তিনদিন। তারপরই পেনাং।

না, পেনাং নয়।

পেনাং নয়! কম্যাণ্ডার ইজু অবাক! কি ব্যাপার?

চন্দ্র বোসের আসার খবরটা কি করে যেন ওখানে ফাঁস হয়ে গেছে। ফলে সবার মুখে এখন ঐ একই কথা। সুভাষ! সুভাষ! সুভাষ! শীগগিরই তাঁকে নিয়ে একটি জাপানী সাবমেরিন আসছে পেনাং বন্দরে। এ অবস্থায় কোনরকম ঝুঁকি নেওয়াটা মোটেই সঙ্গত হবে না।

তাহলে কোথায় যাব?

সাবধানের মার নেই, তাই তুমি বরং পেনাং-এর পরিবর্তে সাবান বন্দরে চলে যাও। আমরা নির্দেশ পাঠাচ্ছি ওখানকার বন্দর কর্তৃপক্ষকে।

বেশ, তাই হবে।

বাধ্য হয়েই সাবমেরিনের মুখ ঘোরাতে হল কম্যান্ডার ইজুকে। উপায় কি! কর্তৃপক্ষের নির্দেশ যে মানতেই হবে। সুতরাং পেনাং-এর পরিবর্তে চল সাবান বন্দরে।

'The submarine sailed striaght for Saban without returning to Penang, where rumours had already been circulating about Subhas Chandra Bose's arrival. [Ibid: P.—26]

ভেতরে ভেতরে সুভাষ তখন খুশিতে ভরপুর। কতদিন ডাঙার মুখ দেখা হয়নি। আর মাত্র তিনদিন বাকি। তারপরই দীর্ঘ তিনমাসের বন্দীজীবনের পরিসমাপ্তি।

ইতিমধ্যে ছোট-বড় অনেকের সঙ্গেই বেশ একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সুভাষের।

সংসারে তুচ্ছ ভাবালুতার কোন মূল্য নেই, তবু এতদিনের সঙ্গীদের ছেড়ে যাবার কথা মনে হলে মনটা একটু ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে বৈকি! তাই নিজে থেকেই তিনি আহ্বান জানালেন সবার উদ্দেশে:

এস, সবাই মিলে একটা ফটো তোলা যাক। এরপরে কে কোথায় চলে যাব, কে জানে। তাই একটা স্মৃতিচিহ্ন থাক সবার কাছে। হয়তো পরবর্তীকালে এই ফটোটার দিকে তাকালেই মনে পড়বে যে, একসঙ্গে অনেকগুলো দিন আমরা কাটিয়েছিলাম।

পরদিন ফটো দেখে খুবই খুশি হলেন সুভাষ। তারপর নিজে থেকেই তিনি তার উল্টো পিঠে কয়েকটি কথা লিখে দিলেন আগ্রহভরে:

হয়তো ভবিষ্যতে আর কোনদিনই আমাদের দেখা হবে না। তবু তোমাদের এই সহজ সরল, আন্তরিক ব্যবহারের কথা আমি কোনদিনই ভুলব না। হে বন্ধু বিদায়!

'It was a great pleasure to sail abroad this submarine. I am deeply grateful to the Japanese Imperial Government for having made it possible.

The Captain has always treated me and my ai-de-camp so nicely that we felt quite at home during the voyage.

I hereby express my sincere thanks for the kindness shown us by all the crew members from Captain downwards.

The voyage I had abroad this ship will evoke pleasant memories for the rest of my life. I believe that this will mark a milestone in our fight for victory and peace.'

Subhas Chandra Bose.

৬ই মে, ১৯৪৩ সাল। সাবান এসে গেছে। এবার সাবমেরিন ভেসে উঠবে জলের ওপর। আর দেরি নেই।

সাবমেরিন ভেসে উঠতেই সহযাত্রী আবিদ হাসানকে নিয়ে কোনিং টাওয়ারে এসে বুকভরে নিঃশ্বাস নিলেন সুভাষ।

মুক্তি! মুক্তি! মুক্তি! যাত্রা শুরু হয়েছিল ৮ই ফেব্রুয়ারি। আজ ৬ই মে। দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার পরে আজ অবারিত মুক্তি।

ঐ যে অদূরে ডাঙার মাটি দেখা যাচ্ছে। আহা, মাটির রূপ যে এত সুন্দর হতে পারে, তা এর আগে কে ভাবতে পেরেছিল!

সবার আগে অভ্যর্থনা জানালেন বার্লিনে অবস্থিত জাপ দূতাবাসের সামরিক উপদেষ্টা কর্ণেল ইয়ামামোতো। সেই ইয়ামামোতো, যিনি কিছু-দিন আগেই স্বদেশে ফিরে এসেছেন সুভাষকে অভ্যর্থনা জানাবেন বলে। বর্তমানে তিনি জাপ-ভারত সংযোগরক্ষাকারী সংস্থা 'হিকারী কিকান'-এর অধ্যক্ষ। সুভাষের কাজের সুবিধার কথা ভেবেই তাঁকে ঐ পদে বহাল করা হয়েছে বার্লিন থেকে ফিরে আসা পরে।

সংগে ছিলেন আরও দুজন। মুরুতারো সোণ্ডা এবং টাডামোটো নোগিসি। শেষোক্তজন দোভাষী।

কর্ণেল ইয়ামামোতো, মরুতারো সোণ্ডা ও দোভাষী টাডামোটো নোগিসি—মোট এই তিনজন। এছাড়া আর বিশেষ কাউকেই সেদিন খবরটা জানতে দেওয়া হয়নি সতর্কতা হিসেবে।

একই কারণে তখনো পর্যন্ত সুভাষের নিজের পরিচয় গোপন রাখা হল কম্যাণ্ডার মাৎসুদা ছদ্মনামের আড়ালে। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির সেরা শত্রু চন্দ্র বোস সাধারণ লোক নন। একটু অসতর্ক হলে কখন কি ঘটে যাবে, কে বলতে পারে!

সুভাষের থাকবার ব্যবস্থা হল জাপ নৌ-বিভাগের একটি নিজস্ব বাংলোতে। এবার পূর্ব-নির্দিষ্ট বিমানটি এসে গেলেই হয়। তারপরই সোজা একেবারে সূর্যোদয়ের দেশ—জাপান।

কলকাতা থেকে বার্লিন।

বার্লিন থেকে সাতসমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপে অবস্থিত অস্থায়ী সাবান নৌ-বন্দর।

পরবর্তী লক্ষ্য—জাপান। এখন শুধু নির্দিষ্ট বিমানটি আসার অপেক্ষামাত্র।

কোথায় বিমান! অপেক্ষা করে করে তিনদিন কেটে গেল, তবু তার কোন দেখা নেই। কোন খবরও নেই।

দেখে দেখে অস্থির হয়ে উঠলেন সুভাষ। কি ব্যাপার! তবে কি কোথাও কোন অঘটন ঘটেছে! এভাবে আর কতদিন চুপচাপ বসে থাকা চলে!

এখন সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর সঙ্গে একবার দেখা করা। এখানকার পরিস্থিতিটা তাঁর কাছ থেকে একবার ভাল করে জেনে নেওয়া দরকার।

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু!

ভাবতে ভাবতে এক নিমেষে অনেকগুলো দিন পিছিয়ে গেলেন সুভাষ।

কি অবিশ্বাস্য ইতিহাসই একদিন সৃষ্টি করেছিলেন এই মহানায়ক রাসবিহারী বসু! ১৯১২ সাল থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের গোটা ইতিহাসটাই যেন রাসবিহারীর কাহিনীতে ভরা।

কত কাহিনী! মিছিলের মত সারি সারি কত ঘটনা!

১৯১২ সালে দিল্লীতে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর ওপর বোমা নিক্ষেপ। তারপর সারা ভারতব্যাপী সেনা-বিদ্রোহের আয়োজন। ভুলতে চাইলেই কি তাঁকে ভোলা যায়?

ধরা পড়ে ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ দিলেন বসন্ত বিশ্বাস, আমীরচাঁদ, বালমুকুন্দ এবং অবোধ বিহারী। তারপর একে একে কর্তার সিং, পিংলে, হরনাম সিং, জগৎ সিং, সুরাইন সিং, উত্তম সিং, ইসার সিং, বীর সিং, রঙ্গ সিং, রুর সিং, বলবন্ত সিং, মৌলভী হাফিজ আবদুল্লা, অরুর সিং, বাবুরাম প্রমুখ শহীদবৃন্দ। সবাইকে সেদিন প্রাণ দিতে হয়েছিল ফাঁসির রজ্জুতে।

ধরা গেল না সেই কর্মকাণ্ডের প্রধান নায়ক রাসবিহারীকে। ইংরেজ সরকারের বিচারে তাঁর মাথায় দাম ধার্য হল এক লক্ষ টাকা।

এত সতর্কতা সত্ত্বেও শাসকদের চোখে ধুলো দিয়ে রাসবিহারী ততদিনে পোঁছে গেছেন জাপানে। সেই থেকে তিনি জাপানেই রয়েছেন বরাবর।

সেই মহানায়কের ডাকঃ 'সুভাষ, তুমি এসো। আমি অসুস্থ, বৃদ্ধ। তুমি এসে সমস্ত দায়িত্ব বুঝে নিয়ে আমাকে এই দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তি দাও।'

এ কি সম্ভব! সত্যিকার বিপ্লবী নইলে কেউ কখনো পারে নিজের গড়া জিনিসকে এভাবে অন্যের হাতে তুলে দিতে! সংসারে এ মহত্বের তুলনা কোথায়?

১০ই মে, ১৯৪৩ সাল।

ভাবনায় চিন্তায় ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন সুভাষ। একে একে পাঁচদিন কেটে গেল, কিন্তু কোথায় জাপ ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-প্রেরিত সেই নির্দিষ্ট বিমান?

কি ব্যাপার! কেন এমন হল! কতদিন আর এভাবে সাবান বন্দরে চুপচাপ বসে থাকা যায়?

একই ভাবনা ডানা মেলেছে সুভাষের পুরানো বন্ধু জাপ-ভারত সংযোগরক্ষাকারী সংস্থা 'হিকারী কিকান'-এর অধিকর্তা কর্ণেল ইয়ামামোতোর মনে। অহেতুক এতটা দেরী হবার কারণ কি! কি ব্যাপার!

বার বার তিনি খবর পাঠিয়েছেন এই নিয়ে। কিন্তু টোকিওর সদর দপ্তরের সেই একই কথা। শীগগিরই বিমান পাঠাচ্ছি এখান থেকে। তোমরা প্রস্তুত থেকো।

কিন্তু কোথায় বিমান! আজ পাঁচদিন হল চন্দ্র বোস এসেছেন সাবান বন্দরে। আর কত কাল এভাবে অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে থাকা যায়!

পশ্চিম আকাশে বিদায়ী সূর্যের অস্তরাগ। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নেমে আসবে সুমাত্রা দ্বীপে অবস্থিত এই সাবান বন্দরে।

সহসা কি দেখে অলস দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল সুভাষের। একটা জীপ এদিকেই যেন ছুটে আসছে রাশি রাশি ধুলো উড়িয়ে! কি ব্যাপার! এই অসময়ে কে এমন করে ছুটে আসছে তাঁর এই বাংলো লক্ষ্য করে!

গুড নিউজ ইওর এক্সেলেন্সী চন্দ্র বোস! জীপ থেকে সহাস্যে নেমে এলেন কর্ণেল ইয়ামামোতো, খবর এসে গেছে। কাল ভোরেই আমরা যাত্রা করছি এখান থেকে। আপনি প্রস্তুত থাকবেন।

বুক থেকে যেন একটা পাষাণভার নেমে গেল সুভাষের। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটেছে। আর ভাবনা নেই। এখন শুধু অপেক্ষা মাত্র।

পরদিন ভোরেই সুভাষ রওনা দিলেন সূর্যোদয়ের দেশ জাপানের উদ্দেশ। সঙ্গে রইলেন বার্লিন-জীবনের বন্ধু সেই কর্ণেল ইয়ামামোতো।

স্বাভাবিক সময়ে হলে সোজা পথেই যাওয়া যেত, কিন্তু যুদ্ধপরিস্থিতির জন্য যেতে হল এখানে-ওখানে যাত্রা-বিরতি ঘটিয়ে, অনেকটা পথ ঘুরে।

প্রথম রাতটা কাটাতে হল সুমাত্রার বিখ্যাত নৌ-ঘাঁটি পেনাং বন্দরে। পরের রাত সাইগনে। তারপর ম্যানিলা, ম্যানিলার পরে তাইপে। পঞ্চম বা শেষের রাতটি কাটাতে হল হামামাৎসুতে। পরদিন ১৬ই মে ভোরবেলায় টোকিও বিমানবন্দরে।

বিমানবন্দর থেকে সোজা টোকিওর বিখ্যাত ইম্পিরিয়াল হোটেলে। জাপানী ভাষ্যকারের ভাষায়:

'Because of a delay in the arrival of the plane sent by the Imperial General Headquarters to pick him up, Bose had to stay here for five days.

He eventually took off from Saban on the morning of 11 May. After spending one night successively in Penang, Saigon, Manila, Taipeh and Hamamatsu, he arrived in Tokyo on the morning of 16 May, and proceeded directly to the Imperial Hotel. Thus, the stage was for Bose to emerge as the leader of the independence movement in East Asia.'

[Netaji Subhas Chandra Bose : Tatsuo Hayashida : P.—27]

প্রায় একই সময়ে মহানায়ক রাসবিহারী বসু পাড়ি দিলেন সিঙ্গাপুর থেকে। সুভাষ এসেছেন। এ সময়ে তাঁর টোকিওতে উপস্থিত থাকাটা একান্তই প্রয়োজন।

সুভাষ সম্বন্ধে তাঁর এই আকর্ষণ আজকের নয়। যদিও চাক্ষুষ পরিচয় নেই, তবু সেই ১৯৩৭ সাল থেকে কতবার তিনি খবর পাঠিয়েছেন সুভাষের কাছে। তুমি একবার এস সুভাষ। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে বিতাড়িত করতে

হলে শুধু ভেতর থেকে আঘাত করলেই চলবে না, আঘাত করতে হবে ভেতর এবং বাইরে দু'দিক থেকেই। তারই প্রয়োজনে তোমার একবার এখানে আসা দরকার।

সবকিছু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে সেই সুভাষ আজ চলে এসেছেন জাপানের রাজধানী টোকিওতে। এ আনন্দ তিনি রাখবেন কোথায় ?

'He is a born leader. I will be glad to turn the leadership over to Mr. Subhas Chandra Bose. Our ultimate goal is to win our independence. Since I have done my bit, I would like Mr. Chandra Bose to take over. He is young and bouncy.'

[Ibid : P.—28]

দেখা হল ইম্পিরিয়াল হোটেলে।

সে এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য। দুজনেই বিস্মিত। দুজনেই নির্বাক। দুজনের চোখে-মুখেই মুগ্ধ সম্ভ্রমের বিহ্বলতা। দুজনেই যেন কথা বলতে ভুলে গেছেন অভূতপূর্ব এক রহস্যের সন্ধান পেয়ে।

প্রত্যক্ষদর্শী কর্ণেল ইয়ামামোতোর ভাষায় :

'...I was charged with the task of introducing them. When I ushered Mr. Behari Bose into the room of Mr. Chandra Bose, they, both of whom had dedicated themselves to the independence of their fatherland since their younger days, shook hands and embraced each other.

The dramatic meeting apparently made their hearts rise up in their throats. They were so deeply moved that they could not talk. After a while, they began to talk like old friends in own language. And I left them alone.

Their meeting lasted for about an hour. After the meeting Mr. Behari Bose said to me : I feel quite relieved. I am leaving him for the present. Please let him stay in Tokyo as long as he likes. With that, he left. I had never seen them so happy.'

[Ibid : P.—28]

ভাবনা এ নিয়ে কম ছিল না জাপানী কর্তৃপক্ষের। যেমন মহানায়ক রাসবিহারী, তেমনিই নেতাজী সুভাষ। স্বাধীনতার অক্লান্ত যোদ্ধা হিসেবে কেউ ওঁরা ছোট নন। দুজনেই বড়। দুজনেই মহান।

এ নিয়ে পরে আবার ওঁদের মধ্যে কোনরকম ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে না তো ?

ভুল ভাঙল অচিরেই। না, এস সঙ্কীর্ণতা থেকে ওঁরা অনেক উর্ধ্বে। ওঁদের একমাত্র লক্ষ্য সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা। সে সংগ্রাম কার নেতৃত্বে পরিচালিত হবে সে-সব ক্ষুদ্র চিন্তা ওঁদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি কোনদিনও।

দেখতে দেখতেই কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন সুভাষ। অহেতুক অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে। আর দেরি নয়।

দেখা করলেন জাপানী প্রধান সমরনায়ক সুগিয়ামার সঙ্গে। দেখা করলেন নৌ-বিভাগের সর্বাধিনায়কের সঙ্গে। দেখা করলেন বৈদেশিক দপ্তরের প্রধান সিগিমিৎসুর সঙ্গে।

বাকি শুধু জাপ-প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো। তোজোর সঙ্গে দেখা হওয়াটা একান্তই দরকার।

কিন্তু এ কি! খবর শুনে প্রতিটি প্রাণী স্তম্ভিত! তেজো নাকি দেখা করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। যে কারণেই হোক, সুভাষের সঙ্গে দেখা করতে তিনি রাজী নন।

'He (Subhas) ran against a stone wall when he tried to meet Premier Tojo. Tojo refused to see him on the pretext of pressure of work.'

[Netaji Subhas Chandra Bose: Tatsuo Hayashida: P.—29]

সবাই অবাক! এ কি অদ্ভুত কথা!

সুভাষ তাদের আমন্ত্রিত অতিথি। অনেক বিপদ কাটিয়ে, অনেক ঝুঁকি মাথায় নিয়ে তাঁকে আসতে হয়েছে বার্লিন থেকে। আর প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো কিনা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে রাজী নন! এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত!

কেন তোজোর এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত! কি ব্যাপার! কোথায় এই রহস্যের উৎস!

তবে কি ভারতবর্ষের এই সংগ্রাম-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে সহকর্মীদের মধ্যে কেউ তাঁকে কিছু ভুল বুঝিয়েছে?

না কি রাসবিহারী এবং মোহন সিং-এর বিরোধকে কেন্দ্র করে এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুটা সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে তাঁর মনে?

নইলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্বন্ধে এতকাল যাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না, আজ হঠাৎ তাঁর এই বিরূপ মনোভাব কেন?

সবচাইতে বেশি ক্ষুব্ধ হলেন বার্লিনের বন্ধু সেই কর্ণেল ইয়ামামোতো।

কোথায় বার্লিন আর কোথায় টোকিও! পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত।

দীর্ঘ নব্বুই দিন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কি করে যে সুভাষ এতটা পথ অতিক্রম করে এসেছেন, সে কথা তো তোজোর অজানা নয়! তা সত্ত্বেও কেন তাঁর এই অনমনীয় সিদ্ধান্ত?

না, অসম্ভব। কিছুতেই তাঁর এই অন্যায় সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়া চলে না। তার চাইতে পদত্যাগ করা বরং ঢের সম্মানের। জাপ ভাষ্যকার Tatsuo Hayashida-র ভাষায়:

'Yamamoto, who took charge of Liaison, was caught in a cleft-stick and tendered his resignation.'

[Ibid: P.—29]

এবার উঠে-পড়ে লাগলেন জাপ-নায়কবৃন্দ। এ হয় না। হতে পারে না। যে করে হোক, তোজোকে রাজী করাতেই হবে। দরকার হলে তার জন্য আরো চাপ সৃষ্টি করতে হবে। এটা যে কত বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তোজো তা বোঝেন না কেন?

সহকর্মীদের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন জেনারেল তেজো। ঠিক আছে, তাই হবে। ১০ই জুন আমি দেখা করব মহামান্য চন্দ্র বোসের সঙ্গে।

নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে সুভাষ গিয়ে হাজির হলেন জাপ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে। সারা মুখে তাঁর অনির্বচনীয় কমনীয়তা ও অসঙ্কোচ দৃঢ়তা।

জার্মানীর ভাগ্যনিয়ন্তা হিটলারকে তিনি দেখেছেন। দেখেছেন ইতালীর গ্রেট ডিক্টেটার মুসোলিনীকেও। এবার দেখবেন জাপ প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজোকে। দেখা যাক তার পরিণতি কি দাঁড়ায়!

চোখের পলক ফেলতেও বুঝি ভুলে গেলেন জেনারেল তোজো। সারা-মুখে তাঁর মুগ্ধ সম্ভ্রমের বিহ্বলতা।

কে! কে! চোখের সামনে দণ্ডায়মান কে এই অসাধারণ মানুষটি! চোখে দিগন্তসীমার মত উন্মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি। বুকে দুর্বার সাহস। আপন দীপ্তিতে আপনিই যেন সে দীপ্যমান। বেশ বোঝা যায়, এ মানুষ বরং ভাঙবে, তবু কোনদিনই মচকাবে না।

দাঁড়িয়ে উঠে দুহাত বাড়িয়ে সাদর সম্ভাষণ জানালেন জেনারেল তেজো। যেন সুভাষ তাঁর কতকালের চেনা। কত আপন জন।

শুধু তাই নয়। কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে একই অনুরোধ তিনি জানাতে লাগলেন বার বার।

হিজ এক্সেলেন্সী চন্দ্র বোসের জন্য তাঁর দরজা সব সময়েই খোলা। যখন খুশি তিনি আসতে পারেন তাঁর এখানে। আবার কবে দেখা হওয়া সম্ভব দুজনের মধ্যে? ঠিক চারদিন পরে, ১৪ই জুন দেখা করাটা সম্ভব হবে কি?

সবাই অবাক! এ কি সেই জেনারেল তোজো, যিনি সেদিন পর্যন্ত দেখা করতে অস্বীকার করেছিলেন চন্দ্র বোসের সঙ্গে! আশ্চর্য, দেখে বিশ্বাসই যেন হয় না। মনে হয় এ যেন অন্য কোন তোজো। আমূল পরিবর্তিত কোন ভিন্ন সত্তা।

কিসের আকর্ষণে অমন কঠিন, কঠোর মানুষটা বদলে গেলেন এমনি করে?

কোন্ সোনার কাঠির স্পর্শে?

উত্তর দিয়েছেন ব্রিটিশ রাজনৈতিক ভাষ্যকার হিউ টয়। বিপক্ষ শিবিরের লোক হয়েও মুক্তকণ্ঠে তিনি স্বীকার করেছেন:

এমন একটা অসাধারণ উৎসাহ-উদ্দীপনা অসামান্য প্রাণশক্তি তাঁর মধ্যে ছিল যে, যারা একবার তাঁর সংস্পর্শে যেত, তারাই তাঁর ব্যক্তিত্বে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত। তাঁর সান্নিধ্যে থাকলে আদর্শই যেন তখন সবার কাছে ধ্যান-

জ্ঞান ও তপস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর দৃষ্টিই যেন সবার দৃষ্টি। তাঁর চিন্তাই যেন সবার চিন্তা। তাঁকে অদেয় কিছুই নেই।

'For most, the personality of the man was over-whelming, there was a genius of enthusiasm, of inspiration. Men found that when they were with him only the cause mattered, they saw only through his eyes, though the thoughts he gave them, could deny him nothing.'

[The Springing Tiger: Hugh Toy: P.—177-178]

১৪ই জুন তারিখে আবার সুভাষ দেখা করলেন জেনারেল তোজোর সঙ্গে।

মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অন্য রাষ্ট্রের সহায়তা নেওয়াটা নতুন কিছু নয়। এমন অনেকেই নিয়েছেন। ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি, ডি ভ্যালেরা, লেনিন, সানইয়াৎ-সেন প্রমুখ কেউ তার ব্যতিক্রম নন।

তাঁকেও আজ বিভিন্ন ব্যাপারে এমনি করেই সহায়তা নিতে হবে জাপানের কাছ থেকে। কিন্তু তার আগে খুঁটিনাটি প্রতিটি ব্যাপারে পরিষ্কার বোঝাপড়া করে নেওয়া প্রয়োজন। এ কাজে এতটুকুও ত্রুটি থাকলে চলবে না।

একে একে সুভাষের সব দাবীই মেনে নিলেন জেনারেল তোজো। সেই সঙ্গে জানালেন একটি বিশেষ আমন্ত্রণ, যা জাপানের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। পরশুদিন, ১৬ই জুন ডায়েট (পার্লামেণ্ট)-এর অধিবেশন বসবে। হিজ এক্সেলেন্সী চন্দ্র বোসকে সেদিন সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে বিশেষ অতিথি হিসেবে। কারণ, সেদিনই সব কিছু ঘোষণা করা হবে সরকারীভাবে।

কাজেও তাই করলেন প্রধানমন্ত্রী তোজো। ডায়েট-এর সেই অধিবেশনে মুক্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন তাঁর সিদ্ধান্তের কথা।

ভারত ভারতীয়দের জন্য। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ উভয় পক্ষেরই ঘৃণ্য শত্রু। সেই শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য সংগ্রামী ভারতকে সহায়তা করতে জাপান সব সময়েই প্রস্তুত এবং সেই সহযোগিতা হবে সম্পূর্ণ নিঃশর্ত।

'We are indignant about the fact that India is still under the relentless suppression of Britain and are in full sympathy with her desperate struggle for independence.

We are determined to extend every possible assistance for the cause of India's independence. It is our belief that the day is not far off when India will enjoy freedom and prosperity after winning independence.'

কর্মব্যস্ত দিনগুলি ডানা-মেলা পাখির মতই যেন উড়ে যাচ্ছিল একে একে।

১৯শে জুন টোকিওতে এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করলেন সুভাষ। প্রকাশ্যে এই তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। প্রায় ষাটজন সাংবাদিক সেদিন উপস্থিত ছিলেন সুভাষের সেই আহ্বানে।

প্রথমেই সুভাষ ত্রুটি স্বীকার করে নিলেন তাঁর ভাষার জন্য।

'শত্রুর ভাষায় কথা বলতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত, কিন্তু এক্ষেত্রে আমি নিরুপায়, কারণ জাপানী ভাষা আমার জানা নেই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমরা ব্রিটিশের কথায় বিশ্বাস করে প্রতারিত হয়েছিলাম। সেদিনই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, আর কোনদিনই আমরা তাদের মিষ্টি কথায় ভুলব না। গত বিশ বছর ধরে আমরা সুযোগের প্রতীক্ষা করেছি। আজ সেই সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। এ সুযোগ আমরা কোনরকমেই হেলায় হারাতে রাজী নই।

কেবলমাত্র নিজেদের রক্তের বিনিময়েই আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে এবং বহুমূল্যে অর্জিত সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হলে সব সময়েই আমাদের প্রচুর ত্যাগ ও আত্মদানের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।'

'We would, however, get our freedom only by shedding our own blood. We will be able to preserve our freedom only if we get it through our own sacrifice and toil.'

'এবারের এই যুদ্ধে উপযুক্ত ভূমিকা আমাদের নিতেই হবে। শত্রুর তরবারির জবাব তরবারি দিয়েই দিতে হবে। এতদিনকার নিরস্ত্র সংগ্রামকে সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত করতে হবে।'

এখানেই গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষের তফাৎ, মল্লিকা।

গান্ধীজীর বক্তব্য: হিংসা নয়, বিদ্বেষ নয়, শুধু ভালবাসা। এই ভালবাসা দিয়েই আমি ইংরেজের হৃদয় পরিবর্তন করে স্বাধীনতা এনে দেব।

সুভাষের অভিমত: সাপ মারতে হলে লাঠির দরকার, মনসা পুজোয় সাপ মরে না।

প্রবীণ চায়, আপস-আলোচনার মাধ্যমে সাবধানে পা ফেলে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে।

নবীনের মতে, ভিক্ষায় কোনদিনও স্বাধীনতা আসে না। আলাপ-আলোচনা বা দর-কষাকষির মাধ্যমেও নয়। অসহযোগ আন্দোলন করে বড়-জোর একটা দখলকারী সরকারকে কিছুটা বিব্রত করা যায়, কিন্তু উচ্ছেদ করা যায় না। তা করতে গেলে অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে চাই একটা শক্ত আঘাত। চাই সংগ্রাম।

মল্লিকা, কথাটা কি মিথ্যে?

কি দেখছি আজ আমরা পৃথিবীর পানে তাকিয়ে? কি দেখেছি সেদিন আমরা প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে?

অসহযোগ আন্দোলন তারাও সেদিন করেছিল, এবং সে আন্দোলন ছিল আমাদের চাইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। আমাদের আন্দোলন ছিল সাধারণ মানুষের আন্দোলন।—তার মধ্যে সরকারী কর্মচারী বা রাজপ্রতিনিধিদের কোন ভূমিকা ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশের বেলায় সে-কথা খাটে না। সরকারী, বেসরকারী, ব্যাঙ্ক, বেতার, পুলিশ, বিচারক, সাধারণ মানুষ—সবাই সেখানে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল একজোট হয়ে।

কিন্তু এত করেও দখলকারী শক্তিকে উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়েছিল কি? শেষ পর্যন্ত তরবারির জবাব তরবারি দিয়েই দিতে হয়নি কি?

ততদিনে সারা পৃথিবীর লোক বোধ হয় জেনে ফেলেছে সুভাষের এই নতুন অধ্যায়ের কথা।

সুভাষ বার্লিনে নেই। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বেড়াজাল ডিঙিয়ে আগের মতই আবার তিনি অন্তর্ধান করেছেন বার্লিন থেকে। বর্তমানে তিনি জাপানে।

চমকে উঠল গোটা পৃথিবী। বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ চলছে। এ সময়ে কি করে এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়া সম্ভব হল তাঁর পক্ষে! এ যে অবিশ্বাস্য! অকল্পনীয়! অভাবনীয়!

ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী স্তম্ভিত! লোকটা কি তাহলে সত্যিই জাদু জানে! নইলে কি করে এটা সম্ভব হল তাঁর পক্ষে! এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত!

১৯শে জুন্ সংবাদ সংস্থা ডোমেই এজেন্সীর মাধ্যমে সর্বপ্রথম খবরটা প্রকাশিত হল স্টকহল্ম থেকে।

সুভাষ বসু জাপানে। ব্রিটিশ খুবই সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে সুভাষের দিকে। তাদের মতে—ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে প্রকাশ্যে তারা কোন মন্তব্য করেনি এ সম্বন্ধে।

Stockholm, June 19, Domei

The British attach great importance to Mr. Subhas Chandra Bose's visit to Japan and keep a close watch on his future course of action. But they have not yet made any comment.

একই দিনে সে-খবর সমর্থন করা হল বার্লিন থেকে। হ্যাঁ, সুভাষ বোস টোকিওতে আছেন। খবর সত্য।

পরদিন ২০শে জুন, জাপানের বিখ্যাত 'নিসি নিপ্পন সিম্বুন' পত্রিকায় সে-খবর স্বীকার করা হল খোলাখুলিভাবে।

হ্যাঁ, সংগ্রামী নায়ক সুভাষ বোস আমাদের এখানেই রয়েছেন। ভারত-বর্ষের আসন্ন-সংগ্রাম সম্বন্ধে জাপ-প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো এবং প্রধান সামরিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনাও হয়েছে বিস্তৃতভাবে।

Mr. Subhas Chandra Bose Arrived in Japan

'Mr. Subhas Chandra Bose, India's independence movement leader and one-time Indian National Congress President, has come to East Asia after staying in Germany for some time to step up the independence movement with the help of Japan and other countries in the Greater East Asia.

He arrived in Tokyo recently and met Premier Tojo on 14 June. Subsequently he met other military and government leaders to discuss the Indian independence movement.'

ওদিকে তখন চঞ্চল হয়ে উঠেছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ত্রিশ লক্ষ ভারতীয় নরনারী।

সুভাষ! সুভাষ! সুভাষ! নেতাজী সুভাষ! আজ ২১শে জুন তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দেবেন টোকিও রেডিও থেকে। রাত দশটায়।

একই চঞ্চলতা আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বিভিন্ন শিবিরগুলিতে। মোড়ে মোড়ে নতুন লাউড-স্পীকার। মোড়ে মোড়ে বিচ্ছিন্ন জওয়ানের দল। আজ আমাদের নেতাজী ভাষণ দেবেন। রাত দশটা বাজতে আর দেরী নেই। কখন আমরা শুনতে পাব আমাদের নেতাজীর কথা! কখন!

'আমি সুভাষ বলছি'...

লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে জয়ধ্বনি ওঠে—সুভাষ! সুভাষ! সুভাষ! নেতাজী সুভাষ!

'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কোনদিন তার শ্রেষ্ঠ রত্ন ভারতবর্ষকে স্বেচ্ছায় স্বাধীনতা দেবে, এ কথা চিন্তা করাটা নিছক পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়।'

তন্ময় হয়ে শোনেন ভোঁসলে, শাহনওয়াজ খান, কিয়ানি, আয়ার, সহায়, দেবনাথ দাস প্রমুখ আই. এন. এ. এবং ভারতীয় লীগের সদস্যবৃন্দ। শোনেন ডঃ বা. ম, থাকিন নু প্রমুখ বর্মার জাতীয় নায়কগণ।

শোনে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ত্রিশ লক্ষ নরনারী ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বীর সেনানিগণ। শোনে গোটা পৃথিবী।

'ব্রিটিশ হয়তো এখন ভাল ভাল প্রতিশ্রুতি দেবে। নানাভাবে আপস-আলোচনা চালাতে চাইবে। কিন্তু আসলে এসব তাদের কালহরণের চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতবাসী এই ধাপ্পাবাজীতে আর ভুলবে না।

আমাদের স্বাধীনতায় আপসের কোন স্থান নেই। একমাত্র ব্রিটিশের ভারত ত্যাগের মধ্য দিয়েই আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব। যাঁরা সত্যিই স্বাধীনতা চান, তাঁদের নিজের বুকের রক্ত দিয়েই সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করে তুলতে হবে।

স্বদেশবাসী বন্ধুগণ, দেশের ভেতর এবং বাইরে থেকে সর্বশক্তি দিয়েই

শত্রুকে এবার আঘাত করুন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই এবং অচিরেই হবে।

India shall be free and before long.'

উল্লাসে মেতে উঠল হাজার আজাদী সৈনিক। সাবাস! সাবাস! এই তো মরদকা বাত! হ্যাঁ, আমরাই শেষ আঘাত হানব দুশমন ব্রিটিশরাজকে। জান কবুল!

অভিনন্দন জানিয়ে তারবার্তা পাঠালেন বর্মার অবিসম্বাদী নেতা ডঃ বা. ম.।

টোকিও থেকে প্রচারিত বেতারবার্তা বর্মার জনসাধারণ এবং ভারত-বাসীদের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহের সৃষ্টি করেছে। আসন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতবাসীর পাশে সব সময়েই আমরা থাকব, কথা দিলাম।

'I sincerely congratulate you on your return to the East. Your first statement issued in Tokyo deeply impressed the Indian people here and gave them courage and hope. Both Indian and Burmese people have long awaited this opportunity.

The time has come for us to rise. Burma hereby pledges herself to fight on your side in the event of your fight for the national honour and independence.'

পরদিন ২২শে জুন, সন্ধ্যা ৬-১৫ মিনিটে আবার সুভাষ ভাষণ দিলেন টোকিও রেডিও থেকে।

প্রথমে জার্মান জনগণের উদ্দেশে। তারপর ৬-৪০ মিনিটে আবার ইতালীর জনসাধারণের উদ্দেশে। আসন্ন সংগ্রামে পাশাপাশি আমরা লড়ব শত্রুর বিরুদ্ধে। শত্রুর ক্ষমা নেই।

শুনে বুকটা বুঝি কেঁপে উঠল সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের।

আশ্চর্য এই লোকটা! দেশে থাকতে এ লোকটা কম জ্বালায়নি মহামান্য সরকার বাহাদুরকে। বলতে গেলে জীবনভোরই জ্বালিয়েছে। আজো তার বিরাম নেই। দেশের বাইরে গিয়েও সমানে লোকটা জ্বালিয়ে চলেছে। কোথায় যে এর শেষ কে জানে!

কিন্তু এ যে ভয়ঙ্কর কথা! এর চাইতে বার্লিন বরং ভাল ছিল, কারণ মাঝখানে দূরত্বের ব্যবধান ছিল অনেকটা। কিন্তু এ যে একেবারে ঘরের পাশে! ডাক দিলেই বুঝি শোনা যায়। কি আছে ওঁর মনে কে জানে!

২২শে জুন এ সম্বন্ধে বিলেতের বিখ্যাত 'দি টাইমস অফ লণ্ডন' পত্রিকায় খোলাখুলিভাবেই বলা হল :

'Subhas Chandra Bose appeared in Tokyo. All the news-papers in the countries under Axis Powers expect a great deal from his forthcoming activities and claim that the plea he made over the radio from Tokyo was far more effective than any broadcasts he made from Berlin.

His movement to Tokyo means not only his personal movement but also the fact that the centre of the Indian in-

dependence movement has moved from Berlin to Tokyo.

Germany and Italy failed to do much to help the Indian independence movement. From now on, they will embark on propaganda emphasizing military aid from Japan.'

২৩শে জুন বেলা দুটোয় টোকিওর ইম্পিরিয়াল রুল অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হল সুভাষকে। উত্তরে সুভাষ 'ভারতবর্ষ আমার মাতৃভূমি' সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দিলেন শ্রোতাদের উদ্দেশে।

দেখতে দেখতে কেটে গেল চল্লিশ দিন।

আপাততঃ আলাপ-আলোচনা সব শেষ। এবার সুভাষকে যেতে হবে সিঙ্গাপুরে, যেখানে হাজার হাজার আজাদী সৈনিক দিন গুনছে তাঁর পথ চেয়ে।

তার আগে ২৮শে জুন সুভাষ টোকিও রেডিও থেকে আবার একটি ভাষণ দিলেন জাপানের জনগণের উদ্দেশে।

'সুযোগ কখনো বার বার আসে না। এ সুযোগ একবার হারালে আর শতবর্ষের মধ্যেও ফিরে পাওয়া যাবে না। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা কখনই নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারিনে। নতুন ভারত তার সমগ্র জনসাধারণের মুক্তির জন্যেই লড়াই করবে। সেখানে জাতি বা ধর্মের আলাদা কোন প্রশ্ন নেই।'

'There is no discrimination because of religion and caste in India to-day. New India wants freedom for its entire people.'

সিঙ্গাপুর যাবার ঠিক আগের দিনের কথা।

সহসা কি ভেবে সুভাষ সেদিন গিয়ে হাজির হলেন জাপ-নেতৃবৃন্দের কাছে। সারা মুখে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়ের রেখা। কণ্ঠে এক অবিশ্বাস্য দাবী। আমি স্বাধীন জাতীয় সরকার গঠন করতে চাই। এই আমার প্রথম কথা।

মুখে কোন কথা জোগাল না জাপ-কর্তৃপক্ষের। কি আশ্চর্য লোক এই মহামান্য চন্দ্র বোস! বিশ্ব-পরিস্থিতি সম্পর্কেই শুধু উনি রীতিমত ওয়াকিবহাল নন, কূটনীতির দিক থেকেও ওঁর নাগাল পাওয়া দায়।

উত্তরের জন্য এতটুকুও চাপ দিলেন না সুভাষ। যেমন এসেছিলেন তেমনিই আবার একসময়ে ফিরে গেলেন নিজের গন্তব্য পথে। ষোল আনা পেতে হলে ধৈর্য ধরতে হয়, এ সত্য তাঁর আজানা নয়।

জাপ-ভাষ্যকার Tatsuo Hayashida-র ভাষায়ঃ

'Netaji Subhas Chandar Bose presented his long-cherished plan to establish a provisional government of free India to the Japanese leaders on the last day of his stay in Japan.

Japanese side did not immediately respond to idea. But he showed patience and not press them for a reply.'

[Ibid : P.—42]

'Forget not that the greatest curse for a man is to remai a slave. Forget not that the greatest crime is to compromis with injustice and wrong. Remember the eternal law; yo must give life, if you want to get it.' —*Netaj*

২রা জ্বলাই, ১৯৪৩ সাল।

অধীর আগ্রহে প্রহর গ্বনে চলেছে গোটা সিঙ্গাপ্বর।

হাজার গোপনীয়তা সত্ত্বেও খবরটা কারো আর জানতে বাকী নেই আজ নেতাজী আসবেন। আমাদের নেতাজী। চল ভাইসব বিমানবন্দরে

বেলা এগারোটা। সিঙ্গাপ্বর বিমানবন্দর তখন রীতিমত জম-জমাট

এসেছেন আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সেনানায়কবৃন্দ। এসেছেন ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। এসেছেন বিভিন্ন দেশের কূট নৈতিক প্রতিনিধিবৃন্দ। এসেছেন আরো অনেকেই।

লাইন দিয়ে প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়িয়ে অসংখ্য আজাদী যোদ্ধা হ্বঁশিয়ার ভাইসব! দেখো, লাইন যেন ভেঙে না যায়।

জনসাধারণ অধীর, চঞ্চল। আর কত দেরী ভাই? কখন আসবে নেতাজী? কখন?

সহসা কি দেখে জনতা চঞ্চল হয়ে উঠল উচ্ছ্বসিত আনন্দে। ঐ যে একটা সাদা ফ্বট্‌কি দেখা যাচ্ছে দ্বর আকাশের ব্বকে। ঐ যে উত্তর-প্ব কোণে। হ্যাঁ, নেতাজী আসছেন। আমাদের নেতাজী।

কিছ্বক্ষণের মধ্যেই দ্বই-ইঞ্জিনয্বক্ত বিমানটি নেমে এল রানওয়ের ওপর এবার যাত্রীদের নামবার পালা।

প্রথমেই নেমে এলেন স্বভাষ। ঠিক তাঁর পেছনেই একান্ত-সচিব আবি হাসান। তারপর একে একে মহানায়ক রাসবিহারী বস্ব, কর্ণেল ইয়ামামোতো এবং জাপ জেনারেল মিঃ সেণ্ডা।

সঙ্গে সঙ্গে হাজার কণ্ঠে রব উঠল—নেতাজী! নেতাজী! নেতাজী আমাদের নেতাজী আ গিয়া! এবার শ্বর্ হবে আসল লড়াই।

শত্র্বপক্ষ ব্রিটিশও কিন্তু স্বভাষের এই অভূতপ্বর্ব জনপ্রিয়তার কথ অস্বীকার করতে পারেনি মল্লিকা। এ প্রসঙ্গে হিউ টয় কি বলেছেন শোন যাক:

'He reached Singapore on July 2nd and received a tumultuous welcome..Soldiers and civilians were ready for him. His personal enthusiasm, his vitality, his authority and his world view won him the real allegiance of Indians in East Asia'.

[The Springing Tiger : Hugh Toye : P. 71-81]

[২রা জ্বলাই তিনি (স্বভাষ) সিঙ্গাপ্বরে পৌঁছলেন। তাঁকে সংবর্ধন জানাতে শহর ভেঙে লোক এল। সেনাবাহিনী এবং জনতা সবাই তাঁর প্রতীক্ষায় ছিল, তিনি আসতেই তারা মহাউৎসাহে ভীড় করে সংবর্ধনা

জানাল। তাঁর ব্যক্তিগত উৎসাহ-উদ্দীপনা, অফুরন্ত প্রাণশক্তি, স্বাভাবিক নেতৃত্ব এবং বিশ্ব-পরিস্থিতি সম্বন্ধে একান্ত নির্ভুল ধারণার জোরে তিনি পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের অন্তর সত্যিই জয় করে ফেললেন।]

একে একে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল সুভাষকে। ইনি মিলিটারী ব্যুরোর ডিরেক্টর—ভোঁসলে। ইনি আর্মি কম্যান্ড-এর প্রধান—এম. জেড. কিয়ানি। আর ইনি হলেন মিলিটারী ব্যুরোর চীফ অফ দি স্টাফ—শাহনওয়াজ খান।

করমর্দন করতে গিয়ে কিসের একটা অনুভূতিতে কেঁপে উঠলেন শাহনওয়াজ খান।

আই. এন. এ.-র ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এতদিন কত সংশয়, কত প্রশ্নই না দেখা দিয়েছিল তাঁর মনে। আজ একটা প্রবল বর্ষণে সব যেন ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এ কি অদ্ভুত অনুভূতি!

তাঁর নিজের ভাষায়ঃ

'I was thrilled, আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। জীবনে এই আমি তাঁকে প্রথম দেখলাম। আমি সতৃষ্ণ নয়নে তাঁর গতিবিধি দেখতে লাগলাম।

ইতিমধ্যে তাঁর আগমন-বার্তা বিদ্যুৎগতিতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, দলে দলে পুরুষ, নারী ও শিশুরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে ছুটে এল। শ্রদ্ধা ও ভালবাসার এক বিপুল উচ্ছ্বাসে সবাই অভিভূত হয়ে পড়ল। এক বিরাট জনসমুদ্র—ভারতীয়, চীনা, মালয়বাসী, জাপানী—সবাই ঠেলাঠেলি করে এই বিপ্লবী-বীরকে একটিবার দেখার জন্য সামনে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল।

গৌরবব্যঞ্জক মূর্তিতে সোজা হয়ে মাথা তুলে স্মিতহাস্যে নেতাজী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। যে দেখছে, সে-ই মুগ্ধ হচ্ছে। আমরা তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছিলাম—হ্যাঁ, এবার আমাদের উপযুক্ত নেতা পেয়েছি, ইনিই পারবেন আমাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিতে।'

পরিচয়ের পালা শেষ ; এবার সৈনিকদের গার্ড-অব-অনার প্রদর্শন।

সুভাষ অভিভূত। সামনে তাঁর পূর্ণাঙ্গ একটি সেনাবাহিনী। এই তো তিনি চেয়েছিলেন সারাজীবন। এ আনন্দ প্রকাশের বুঝি ভাষা নেই তাঁর। অভিবাদনের উত্তরে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন সুভাষঃ

'The only thing that we have been lacking go far in our fight for independence is an armed force to fight against the British. You patriotic warriors have come forward and provided that armed force.

Let us all march forward together, ready to lay down our lives and thus win the freedom of our Motherland.'

[Cholo Delhi: S. A. Das and K. B. Subbaiah: P.—124]

[ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোর জন্য এতদিন আমাদের একটি উপযুক্ত সেনাবাহিনীর অভাব ছিল। আপনারা আমাদের সে অভাব পূর্ণ

করেছেন। মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের জন্য এবার আমাদের সবাইকে চরম আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।]

উত্তরে তিনবার ধ্বনি দিয়ে সমর্থন জানাল জওয়ানবৃন্দ। নেতাজী জিন্দাবাদ! আমরা প্রস্তুত! জান কবুল!

এবার সুভাষকে নিয়ে যাওয়া হল তাঁর নির্দিষ্ট বাসস্থান সিঙ্গাপুরের গেলাং অঞ্চলে। পেছনে অসংখ্য জনতা। মুখে তাদের সেই একই ধ্বনি—নেতাজী জিন্দাবাদ! আমরা প্রস্তুত! জান কবুল!

৪ঠা জুলাই রাসবিহারী সব কিছুর দায়িত্ব তুলে দিলেন সুভাষের হাতে।

সিঙ্গাপুরের ক্যাথে বিল্ডিং-এর চারপাশ সেদিন লোকে-লোকারণ্য। যেদিকে তাকানো যায় শুধু উৎসবমুখর জনতা। সকাল থেকে আসছে তো আসছেই।

সুভাষকে দেখেই অধীর আনন্দে মুখর হয়ে উঠল হাজার হাজার জনতা—নেতাজী জিন্দাবাদ! রাসবিহারী বসু জিন্দাবাদ! ইনকিলাব জিন্দাবাদ!

হলের ভেতরে তিল-ধারণেরও বুঝি স্থান নেই। সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে বিশেষ একটি মুহূর্তের জন্য।

সুরু হল সভার কাজ। প্রথমে মাল্যদান। তারপর সুগায়িকা মিস্ সরস্বতীর সুভাষ-বন্দনা—সুভাষজী! সুভাষজী! আমরা তোমাকে আমাদের মধ্যে বরণ করি......

গানের শেষে জাপ-প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো কর্তৃক প্রেরিত শুভেচ্ছা লিপি পাঠ ঃ

'শুধু জাপানের পক্ষ থেকে নয়, সমগ্র এশিয়ার পক্ষ থেকে আমি শ্রীযুক্ত সুভাষ বসুকে সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছি। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁর পথই একমাত্র পথ, যার ফলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হবে। আমি তাঁর সাফল্য কামনা করি।'

এবার ভাষণ দিলেন মহানায়ক রাসবিহারী। প্রকাশ্য জনসভায় এটাই ছিল তাঁর জীবনের শেষ ভাষণ।

'বন্ধুগণ, টোকিও যাবার আগে বলেছিলাম, আপনাদের জন্য আমি একটি ভাল উপহার নিয়ে আসব। (সুভাষকে দেখিয়ে) এই আমার সেই উপহার। সুভাষ তারুণ্যের প্রতীক। ভারতবর্ষ বা পৃথিবীর কোথাও তাঁর নতুন করে পরিচয় দেবার মত কিছু নেই। তাঁর পরিচয় তিনি নিজেই। শুধু সেনাবাহিনী নয়, সেই সঙ্গে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের সভাপতির দায়িত্বও আজ থেকে আমি তাঁর হাতে তুলে দিলাম। এখন থেকে তিনিই আমাদের নেতা। আমরা সবাই তাঁর আজ্ঞাবাহী সৈনিক মাত্র।'

গোটা প্রেক্ষাগৃহ নিঃশব্দ, নিশ্চুপ।

ধন্য রাসবিহারী। একদিন তিনি কথায় কথায় বলেছিলেন, আমি বৃদ্ধ, অসুস্থ। অনেক বোঝা টেনে টেনে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সুভাষ এলে তাঁর হাতে সমস্ত দায়িত্ব তুলে দিয়ে আমি ছুটি নেব। আজ তিনি তাঁর

সেই প্রতিশ্রুতি রেখেছেন। এ মহত্ত্বের তুলনা কোথায়?

এই নিয়ে বিস্ময় সেদিন জাপানীদেরও কম ছিল না মল্লিকা।

সশ্রদ্ধচিত্তে একথা স্বীকার করেছেন প্রাক্তন জাপ-কর্ণেল ইয়াকুরা। নিজের এক কষ্টে গড়া জিনিষকে এমন নিঃশর্তভাবে অন্যের হাতে তুলে দিতে দেখে সত্যিই আমরা সেদিন অবাক হয়েছিলাম।

'I can hardly believe whether there is a man like Mr. Rash Behari Bose who built up a great work despite many difficulties, and transferred unconditionally his work and position to another person.'

দেশের জন্য সর্বস্ব দিতে হবে, ফকির হতে হবে—একথা বলা তো রাসবিহারীরই সাজে।

এ বয়সে অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি কী না করেছিলেন দেশের জন্য! কী দিতে বাকী রেখেছিলেন।

নিজের সঞ্চিত বলতে যা কিছু, সবই তো তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের এই প্রস্তুতির কাজে। কিছুই অবশিষ্ট রাখেননি নিজের জন্য। একটি কানাকড়িও নয়।

ফলে কাল যিনি ছিলেন ঐতিহাসিক ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ এবং আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্বাধিনায়ক, আজ তিনি নিঃস্ব ফকির মাত্র।

কোন দুঃখ নেই। ক্ষোভও কিছু নেই। তাঁর যতটুকু সাধ্য তিনি করেছেন। এবার তাঁর ছুটি। চিরদিনের মতই ছুটি।

সবকিছু পেছনে ফেলে রেখে এবার তিনি ফিরে যাবেন টোকিওর সেই নিঃসঙ্গ জীবনে।

আর কোন কাজ নয়। আর কোন কথা নয়। শুধু বিশ্রাম। শেষ-বিদায়ের আগে কয়েকটা যন্ত্রণাময় দিন। তারই জন্য শুধু ব্যাকুল প্রতীক্ষা।

তাঁর অর্থাভাবের কথা জানতে পেরে নিজে থেকে একটি চেক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন লীগের মালয় শাখার সভাপতি এন. রাঘবন। তাও তিনি গ্রহণ করেননি। ফিরিয়ে দিয়ে সকৃতজ্ঞ-চিত্তে বলেছিলেন, দরকার নেই ভাই। কোন চিন্তা করো না। আমার ঠিক চলে যাবে।

রাঘবনের নিজের ভাষায়ঃ

'I was afraid for his finances as I knew he had given everything to the Movement. I felt he would be in need.; and ventured to send him a cheque.

He returned it with many expressions of thanks.'

[Rash Behari Basu: His Struggle for India's Independence: P.—440]

মল্লিকা, এই হলেন বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী। এই হল তাঁর পরিচয়। বড় সাধ ছিল, নির্বাসিত জীবন থেকে স্বাধীন জন্মভূমির মাটিতে ফিরে এসে শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করবেন। সে সাধ যে তাঁর পূর্ণ হয়নি, সে-কথা তো তুমিও জানো।

মল্লিকা, এই ছিল সেদিন আমাদের দেশের নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিকদের সত্যিকারের চেহারা।

আর আজ! কি দেখছি আজ দেশের চারপাশে তাকিয়ে?

একটা আসনের জন্য কি নির্লজ্জ খেয়োখেয়ি আর মারামারি! দেশ পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে যায় তো যাক, তবু ঐ আসনটি আমাদের চাই-ই। পরিণতি যা-ই হোক না কেন, পার্টির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করতে কোনরকমেই আমরা রাজী নই।

কেন সেদিন রাসবিহারী পক্ষে এমনি করে নিজের অধিকার, নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করা সম্ভব হয়েছিল? আজই বা কেন তা সম্ভব নয়?

কারণ, সে যুগটাই হল দেবার যুগ। তাই দেশের মঙ্গলের চাইতে বড় কাম্য তাঁদের কাছে আর কিছুই ছিল না। দল বা পার্টির প্রশ্ন ছিল সেখানে গৌণ। এক কথায় 'দলের চাইতে দেশ বড়' এই ছিল তাঁদের মূল নীতি।

আজ নেবার যুগ। তাই এমন নজীর খুব কমই চোখে পড়ে, যাঁরা দেশসেবার প্রশ্নেও দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন। তফাৎ এই-খানেই। অথচ সেদিন দেশ ছিল পরাধীন, আজ স্বাধীন। যাক, আগের কথায় ফিরে যাই।

রাসবিহারীর বক্তব্য শেষ হল। শ্রোতাদের সুবিধার জন্য লেঃ কর্ণেল আলাগাপ্পন তাঁর সেই বক্তব্যকে অনুবাদ করে শোনালেন তামিল ভাষায়।

এবার নব-নির্বাচিত সর্বাধিনায়ক সুভাষকে সাদর অভিনন্দন জানালেন ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের মালয় শাখার চেয়ারম্যান জন এ. থিবি।

তারপর সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে আনুগত্য প্রকাশ করলেন আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মিলিটারী ব্যুরোর ডিরেক্টার জে. কে. ভোঁসলে। আমরা প্রস্তুত। আপনি আমাদের আদেশ দিন নেতাজী। আপনার আদেশ পেলেই আমরা শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব দুর্বার বেগে। কথা দিলাম।

সবার শেষে উঠে দাঁড়ালেন সুভাষ। প্রথমেই তিনি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করলেন বিদায়ী সভাপতি রাসবিহারীর প্রতি। তারপর শুরু করলেন তাঁর বক্তব্য।

না, কোন মিথ্যে প্রতিশ্রুতি নয়। কোন মন-রাখা ফাঁকা বুলিও নয়। বরং যা সত্য, যা বাস্তব, অনাগত ভবিষ্যতের সেই কঠিন কঠোর রক্তঝরা দিনগুলির কথাই তিনি ব্যক্ত করলেন বলিষ্ঠ কণ্ঠে।

'সামরিক নিয়মশৃঙখলা মেনে নিয়ে, আদর্শের প্রতি গভীর নিষ্ঠা রেখে মহাযুদ্ধের এই সঙ্কটময় দিনে আমাদের কর্মপথে এগিয়ে যেতে হবে। তার জন্য সমস্ত ভারতবাসীকে আমি সংঘবদ্ধ হয়ে প্রস্তুত হতে আহবান জানাচ্ছি। আমি জানি, আপনারা আমার এই আহবানে সাড়া দেবেন।

ব্রিটিশ যদি আজ সাহায্যের জন্য দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিতে পারে, তাহলে আমাদের পক্ষেও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অন্যের সাহায্য নেওয়াটা অন্যায় নয়, অপরাধও নয়। এমন নজীর পৃথিবীর বহু দেশেই রয়েছে।

জাপান আর এখন আগেকার সেই জাপান নেই। তার নবজন্ম হয়েছে।

চিন্তাধারারও পরিবর্তন ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে 'এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য' এ নীতিকে কার্যে পরিণত করা ছাড়া বর্তমানে তাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

তবু যদি আপনাদের কারো মনে এ সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে, তাহলে একথাই বলব যে, অন্তত আমাকে আপনারা বিশ্বাস করুন। ভারতবর্ষের একজন নগন্য সেবক হিসেবে এটুকু দাবী আমি আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই করতে পারি। বিশ্বাস করুন, ব্রিটিশই যখন আমাকে প্রতারিত করতে পারেনি, তখন পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই, যারা আমাকে প্রতারিত করতে পারবে।

শত্রুপক্ষের শক্তিকে এতটুকুও ছোট করে দেখলে চলবে না। যে যুদ্ধ আমাদের করতে হবে তা বড় কঠিন। কারণ, শত্রু প্রবল ক্রূর ও নৃশংস।

স্বাধীনতার এই শেষ সংগ্রামে আপনাদের অনেক দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। ক্ষুধার জ্বালা, তৃষ্ণা, অনিদ্রার কষ্ট, দুর্গমপথে অভিযান, এমন কি মৃত্যুকে পর্যন্ত বরণ করতে হতে পারে। এসব কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে তবেই আসবে আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।'

এরই মধ্যে এক ফাঁকে সুভাষ ঘোষণা করে দিলেন তাঁর মনের কথা,—আমার প্রথম কাজ, একটি স্বাধীন সরকার গঠন করা।

স্বাধীন সরকার!

পৃথিবীর গতি বুঝি স্তব্ধ হয়ে রইল এক মুহূর্ত, তারপরই দারুণ উল্লাসে ফেটে পড়ল গোটা প্রেক্ষাগৃহ। এই তো চাই। এই তো হওয়া উচিত। সাবাস নেতাজী, সাবাস! হাজার সাবাস তোমাকে!

চমকে উঠলেন উপস্থিত জাপ-ভারত সাহায্য সংস্থা 'হিকারী কিকান'-এর জাপানী নেতৃবৃন্দ। মনে মনে ক্ষুণ্ণও হলেন কিছুটা। কই, এমন তো কোন কথা ছিল না! হিজ এক্সেলেন্সী চন্দ্র বোস তো একবারও তাঁদের জানাননি একথা! বোধ হয় প্রয়োজনও বোধ করেননি!

কিন্তু এ যে ভয়ঙ্কর ঘোষণা! এর পেছনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত। অনেক সমস্যা। এ দাবী স্বীকার করে নিতে হলে এই স্বাধীন সরকরকে আইনসঙ্গত গভর্ণমেণ্টের পূর্ণ মর্যাদা এবং সবরকম কূটনৈতিক সুবিধা দিতে হবে।

তাছাড়া রীতিমত বিধি-বিধান। যেমন—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্ত ভারতীয় হবে আইনত এই স্বাধীন সরকারের অধীন। কি সামরিক, কি অসামরিক কোন ক্ষেত্রেই জাপানী আইন তাদের কোন ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে না।

এমন কি ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও এ সরকারের সর্বাধিনায়ক এবং মহামান্য সম্রাটের মধ্যে কোন তফাৎ থাকবে না। জাপ-প্রধানমন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি বা অন্য যে-কোন মন্ত্রীর সম্পর্ক হবে পারস্পরিক।

ওদিকে বন্ধু-রাষ্ট্র ইতালী ও জার্মানী রয়েছে অনেক দূরে। ইচ্ছা থাকলেও তাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ সহযোগিতার কোন প্রশ্ন নেই। এ অবস্থায়

একা জাপানের পক্ষে এত বড় গুরুদায়িত্ব বহন করা কি সম্ভব? ইম্পিরিয়াল ডায়েট কি রাজী হবে এ প্রস্তাবে?

কিন্তু দাবী তুলেছেন স্বয়ং হিজ এক্সেলেন্সী মহামান্য চন্দ্র বোস। লোকটা যে একেবারে নাছোড়বান্দা। একবার মুখ দিয়ে কথা বের করলে আর রক্ষে নেই। তখন কার সাধ্য তাঁকে সেই গোঁ থেকে নিবৃত্ত করে!

'Once an idea caught his fancy, he was not the man to leave it on account of ordinary difficulties.'

মনে মনে হাসলেন সুভাষ। বেচারা হিকারী কিকান!

না, এসব ব্যুরোক্রেসির কাছে আত্মসমর্পণ কোনমতেই নয়। ওরা শক্তের ভক্ত, নরমের যম। একবার নত হলে আর রক্ষে নেই। অমনি পেয়ে বসবে। তাই বলতে হলে প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজোকেই তিনি বলবেন, ওদের নয়।

জাপান তাঁকে সাহায্য করবে এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। করবে নিজের গরজেই। গত একবছরে জাপান এত বেশি জায়গা দখল করে বসে আছে, যাকে নিয়ন্ত্রণ করবার মত উপযুক্ত লোকবল তাদের নেই। তার ওপর রয়েছে ভারতবর্ষের প্রশ্ন। ভারতবর্ষ বর্তমানে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির শ্রেষ্ঠ ঘাঁটি। সেখান থেকে তাদের নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত জাপানেরই বা নিশ্চিন্ত হবার মত অবকাশ কোথায়?

সে কাজ করতে পারে একমাত্র আজাদ হিন্দ্ ফৌজ। সুতরাং নিজেদের প্রয়োজনেই আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে তারা সাহায্য করবে। করতে বাধ্য।

প্রকৃতপক্ষে স্বার্থ এখানে দু-পক্ষেরই সমান। জাপানের স্বার্থ—ভারতবর্ষ থেকে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিকে বিতাড়িত করা। ভারতের স্বার্থ—এ সুযোগে স্বাধীনতা অর্জন করা। সোজা কথায়—এ হল উভয় পক্ষেরই কূটনীতির লড়াই। কার্যোদ্ধার করতে হলে এ লড়াইয়ে ভারতকে সর্বক্ষণ মাথা উঁচু করে চলতে হবে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। এ ব্যাপারে একমুহূর্তও অসতর্ক হলে চলবে না।

পরদিন ৫ই জুলাই সকাল দশটায় সিঙ্গাপুর মিউনিসিপ্যাল ভবন-সংলগ্ন বিরাট ময়দানে সশস্ত্র সেনাবাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ।

সে কি বর্ণাঢ্য দৃশ্য! একসঙ্গে দশহাজার সৈনিক মদমত্তে এগিয়ে চলেছে তালে তালে পা ফেলে। চোখ যেন আর ফেরানো যায় না।

সুভাষের দুচোখে রাশি রাশি স্বপ্ন। বুঝি তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতি পরিচিত একটি প্রাসাদের ছবি। লালকেল্লা! ভারতের প্রাণকেন্দ্র লালকেল্লা। কবে ওঁদের পদভরে ঐ লালকেল্লা কেঁপে উঠবে এমনি করে? কবে?

ভাষণ দিতে গিয়ে এক নতুন সুরে ডাক দিলেন সুভাষ—'সাথীয়োঁ আউর দোস্তোঁ!

থমকে গেল হাজার হাজার যোদ্ধার দল। বুঝি সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল

থরথর বিহ্বলতায়। নেতাজী তাদের সাথী বলে ডেকেছেন! ডেকেছেন দোস্ত বলে! এ আনন্দ, এ গৌরব তারা রাখবে কোথায়! এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত।

ঠিক যেন স্বামীজীর প্রতিচ্ছবি। বিদেশের ধর্মসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে স্বামীজীও সেদিন চিরাচরিত প্রথায় শ্রোতৃমণ্ডলীকে 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেণ্টেলমেন' বলে সম্বোধন করেননি, ডেকেছিলেন 'সিস্টার্স অ্যাণ্ড ব্রাদার্স' বলে। নেতাজীও যেন আজ ঠিক তেমনি সুরেই সবাইকে ডাক দিলেন—'সাথীয়োঁ আউর দোস্তোঁ!'

এ সম্বন্ধে আজাদ হিন্দ্ সরকারের তথ্য ও প্রচার বিভাগের মন্ত্রী এস. এ. আয়ার কি মন্তব্য করেছেন শোনা যাক ঃ

'One could see with half an eye that a thrill ran through the ranks of the guard of honour at being addressed by such a great man as "Sathion aur Doston."

[Unto Him a Witness : P.—210]

আর কি রূপ! কি এশিয়া, কি ইউরোপ, কোথাও কোন সেনানায়কের এমন তেজোদ্দীপ্ত রূপ দেখা যায়নি। সর্বাঙ্গ দিয়ে তেজ ও বীর্য যেন ঝরে পড়ছে।

'The title of Supreme Commander, if it truly fitted any Commander on the battlefields of Europe or Asia, fitted Netaji most superbly. He looked supreme, every inch of him.'

[Ibid : P.—210]

'বন্ধুগণ, আজ আমার জীবনের সবচাইতে আনন্দ ও গর্বের দিন। ভগবানের কৃপায় আজ আমি গোটা বিশ্বের কাছে একথা ঘোষণা করার সুযোগ পেয়েছি যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য আমরা একটি সুদক্ষ সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি। যে সিঙ্গাপুর একদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গর্বের বস্তু ছিল, সেই সিঙ্গাপুরেই আজ আমাদের সেনাবাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

আজ থেকে আমাদের একমাত্র ধ্বনি হবে—চলো দিল্লী! জানিনে, আমরা ক'জন এই মুক্তিসংগ্রামের পর বেঁচে থাকব, তবে একথা জানি যে, জয় আমাদের হবেই। জীবিত বন্ধুরা লালকেল্লায় গিয়ে বিজয়-উৎসব পালন না করা পর্যন্ত আমাদের কাজ শেষ হবে না।

রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি যে, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ভারতবর্ষ সব দিক থেকেই যোগ্যতা অর্জন করেছে, শুধু অভাব ছিল নিজস্ব একটি সেনাবাহিনীর।

এই সেনাবাহিনী ছিল বলেই জর্জ ওয়াশিংটন যুদ্ধ করে আমেরিকাকে স্বাধীন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গ্যারিবল্ডি সশস্ত্র স্বেচ্ছাবাহিনীর সাহায্য পেয়েছিলেন বলেই ইতালী স্বাধীন হয়েছিল।

আপনাদেরও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথিকৃৎ হিসেবে তেমনিভাবেই ইতিহাস সৃষ্টি করতে হবে। যে সব সৈনিক নিজের দেশের কাছে বিশ্বস্ত থেকে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করতে পারে, দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারে, জগতে তাদের পরাজয় নেই।

ভারতবর্ষের জাতীয় মর্যাদা রক্ষা করার দায়িত্ব আজ আপনাদের। আপনারাই ভারতের আশা ও আকাঙ্ক্ষা। কথা দিচ্ছি—সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে সর্বক্ষণ আমি আপনাদের সাথী হয়ে পাশে পাশে থাকব।

কিন্তু বন্ধুগণ, আজ আমি রিক্ত। অনাহার, বুকফাটা পিপাসা, কষ্ট, দুঃসাধ্য অভিযান আর মৃত্যু ছাড়া আজ আর আমার কিছুই দেবার নেই। আমাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ক'জন বেঁচে থেকে স্বাধীন ভারতে পদার্পণ করতে পারব সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল—ভারত স্বাধীন হবে। সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমাদের সব কিছু দিতে হবে।'

পরদিন জাপ-প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজোকে সংবর্ধনা জানানো হল সিঙ্গাপুরে। নীচে সেনাবাহিনীর প্যারেড এবং অভিবাদন প্রদর্শন। ওপরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জেনারেল তোজো এবং সুভাষ। একজন স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রী, অন্যজন পরাধীন দেশের মুক্তিফৌজের সর্বাধিনায়ক। উল্লেখ-যোগ্য দৃশ্য বটে!

সংবর্ধনা শেষে আবার নিজের প্রতিশ্রুতির কথা ঘোষণা করলেন তোজো।

'ভারতবর্ষের কোন অঞ্চলে সামরিক বা অর্থনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অভিপ্রায় জাপানের নেই। ভারতবর্ষ বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হোক। এ ব্যাপারে জাপান সর্বতোভাবে সহায়তা করতে প্রস্তুত।'

'Japan had no territorial or economic ambitions in India. India would achieve complete independence, free from any foreign domination. Japan promised all-out aid to the Indian independence Movement.'

একদিন বাদেই সিঙ্গাপুরের বিশিষ্ট নাগরিকগণ এক জমকাল পার্টি দিলেন ক্রিকেট ময়দানে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সেদিনই সর্বপ্রথম সুভাষ সবাইকে লক্ষ্য করে সম্ভাষণ জানালেন—'জয় হিন্দ্!'

দেখতে দেখতে সে ধ্বনি ছড়িয়ে গেল দূর থেকে বহুদূরে। বৃদ্ধ প্রৌঢ় যুবক শিশু, যে-ই হোক না কেন, দেখা হলেই—জয় হিন্দ্! সরকারী বেসরকারী প্রতিটি ক্ষেত্রে—জয় হিন্দ্! সর্বত্র—জয় হিন্দ্!

নমস্কার নয়, নমস্তেও নয়, শুধু 'জয় হিন্দ্'! সবার ওপরে জন্মভূমি ভারত। তার জয় হোক। মঙ্গল হোক। কল্যাণ হোক।

মল্লিকা, আমাদের দেশে বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বী বহু জাতির বাস। তাদের ভাষা আলাদা, রীতিনীতি আলাদা। সম্ভাষণও আলাদা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষের এই 'জয় হিন্দ্'-এর মত এমন একটি সর্বজন গ্রহণযোগ্য জাতীয় সম্ভাষণ এর আগে কোথাও তুমি শুনেছ কি?

কারো মাথায় এসেছিল কি এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা? কেউ ভাবতে পেরেছিল এর এমন একটি সুষ্ঠু সমাধানের কথা?

আবার জন-সমাবেশ। আবার ভাষণ। তারিখটা ছিল ৯ই জুলাই।

বোধহয় গোটা সিঙ্গাপুর সেদিন জমায়েত হয়েছিল সুভাষের ভাষণ শুনতে। প্রায় ষাটহাজার ভারতবাসী। তার মধ্যে বেশির ভাগই ছিল মহিলা। তা ছাড়া চীনা এবং মালয়ীদের সংখ্যা যে কত ছিল তা নিরূপণ করা অসম্ভব।

সকাল থেকেই আকাশের সেদিন মুখ ভার। বাতাসও ক্ষেপে উঠেছে। মনে হয় বড় রকমের ঝড় উঠবে।

অনুমান মিথ্যে হল না। সহসা ঈশান কোণ থেকে বাতাস এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল উন্মত্তের মত। তারপরই শুরু হল বৃষ্টি। প্রথমে ফোঁটায় ফোঁটায়। তারপর মুষলধারে।

আশ্চর্য, একটি লোকও সরে গেল না সভাস্থল থেকে। ছোট-বড়, নারী-শিশু, কেউ না। কেন যাবে তারা? নেতাজী তো আগেই তাদের কঠিন কঠোর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। তার কাছে এ তো কিছুই নয়। ঝড় আসে তো আসুক। আকাশ ভেঙে পড়ে তো পড়ুক। তা বলে নেতাজীর কথা না শুনে সভাস্থল ত্যাগ করতে তারা রাজী নয়।

প্রবল বর্ষণ মাথায় নিয়ে প্রায় দুঘণ্টা ধরে ভাষণ দিলেন সুভাষ। সেদিন বেশ খোলাখুলিভাবেই তিনি ব্যক্ত করলেন তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার কথা।

"বিশ বছর ধরে আমি আইন অমান্য আন্দোলন করে এসেছি। বার বার আমাকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছে। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে আজ আমি একথা বলতে পারি যে, ভারতবর্ষে এমন কোন নেতা নেই, যিনি আমার মত এত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছেন।

সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমার এ ধারণাই হয়েছিল যে, দেশের ভেতর থেকে চেষ্টা করে কোনদিনই আমরা ভারতবর্ষকে ব্রিটিশের কবল থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হব না। তাই আমার উদ্দেশ্য হল, ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে যে স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে, বাইরে থেকে তাকে সাহায্য করা।

আজ থেকে আমাদের ধ্বনি হোক—সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য সর্বস্ব পণ। 'Total Mobilisation for a Total war.' এই মহৎ উদ্দেশ্যে আমি তিন লক্ষ সৈন্য এবং তিন কোটি ডলার আপনাদের কাছ থেকে পাবার আশা করি।

মেয়েদেরও পিছিয়ে থাকলে চলবে না। শিগ্‌গীরই আমি একটি নারী-বাহিনী গঠন করতে চাই। তাঁদেরও প্রাতঃস্মরণীয়া ঝাঁসীর রাণীর মত মুক্ত রণাঙ্গণে লড়াই করতে হবে। সেদিন যা সম্ভব হয়েছিল, আজ কেন তা সম্ভব না? নিশ্চয়ই হবে!"

১লা আগস্ট বর্মার স্বাধীনতা উৎসব।

বর্মা আগে ছিল ব্রিটিশের অধীন। একবছর আগে সেই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড

তাদের হারাতে হয়েছে জাপানীদের কাছে। জাপ-সদিচ্ছার নিদর্শন হিসাবে ১লা আগস্ট থেকে সেই বর্মা স্বাধীন।

প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করবেন বর্মার জনপ্রিয় নেতা ডঃ বা. ম। কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ জেনারেল আউঙ্গ সান। থাকিন নু বৈদেশিক মন্ত্রী।

সুভাষকেও সেই উৎসবে যোগ দিতে হল বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে।

আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ভাবী প্রধানমন্ত্রী ডঃ বা. ম স্বয়ং। শুধু সরকারী-ভাবেই নয়, ব্যক্তিগতভাবেও। মনে মনে তিনি খুবই শ্রদ্ধা করতেন সুভাষকে। যেদিন প্রথম দেখেছিলেন, সেদিন থেকেই। তাঁর নিজের ভাষায়ঃ

'It was at the Singapore airport that we met. Bose made a fine handsome and towering figure among the people round him and he was at ease with all of them. I simply saw Bose as a very palpable presence whose general bearing and personality made him stand out in that vast glittering scene of military pomp and power.'

[Break through in Burma : Dr. Ba Maw.]

[আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ সিঙ্গাপুর বিমান বন্দরে। সুভাষচন্দ্র কান্তিমান সুশ্রী দীর্ঘদেহী, তাঁকে ঘিরে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের সবার চাইতে মাথায় তিনি উঁচু। স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে তাদের সঙ্গে তিনি কথা বলছিলেন। আমি দেখেছিলাম সামরিক আড়ম্বর আর সামর্থ্যের সেই ঝকমকে দৃশ্যপটেও একটি মানুষের ব্যক্তিত্ব যেন আর পাঁচজনের থেকে স্বতন্ত্র করে তাঁকে চিনিয়ে দিচ্ছে।]

আরো বলেছেন ডঃ বা. ম, 'অতীত আর বর্তমানকে আমি যেন একই সঙ্গে দেখতে পেলাম। আমার মনে হল, দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষে যে ঐকান্তিক বিপ্লব-সাধনা চলছে, সুভাষচন্দ্র যেন তারই মূর্ত প্রতীক। মনে হল, সেই বিপ্লব-সাধনা যেন এশিয়ার বৃহত্তর বিপ্লবের সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে এবং এশিয়াকে তা যেন পালটে দেবে। এই হচ্ছে তখন আমার মনের অবস্থা।

শুধু তাই নয়, আমার মনে হয়েছিল, ভারতীয় বিপ্লবের অন্তঃস্থ আর এক বিপ্লবকে যেন আমি প্রত্যক্ষ করছি। সুভাষচন্দ্র আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত। এই উপস্থিতিই যেন বলে দিচ্ছে যে, ভারতের দীর্ঘ সহিষ্ণুতার পর্ব এবারে সমাপ্ত, সে তার নিষ্ক্রিয়তার দর্শন পরিহার করে বাস্তবকে স্বীকার করে নিচ্ছে, অর্ধেক পৃথিবী যখন বাকী অর্ধেকের সঙ্গে যুদ্ধ-নিরত, ভারতবর্ষও তখন বাহুবলের সাহায্যেই বাহুবলের মোকাবিলা করবে।

বরাবরই আমি বিশ্বাস করেছি যে, ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মের মুক্তিসংগ্রাম এক ও অবিচ্ছেদ্য, ভারতবর্ষের ভূমিকার এই পরিবর্তন দেখে তাই আমার পক্ষে উৎফুল্ল হওয়াটাই স্বাভাবিক। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আমার সেই প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় ছিল সংক্ষিপ্ত। ঠিক হল যে, শিগ্‌গীরই তিনি আবার আমার সঙ্গে দেখা করবেন।'

[বাংলা অনুবাদ—দেশ]

সেই ডঃ বা. ম আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সুভাষকে। শুধু সরকারীভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবেও।

সানন্দে রাজী হলেন সুভাষ। ভারতবর্ষে যেতে হলে এই বর্মার উপর দিয়েই তাঁকে মার্চ করে যেতে হবে সেনাবাহিনী নিয়ে। ডঃ বা. ম-র সঙ্গে আলাপ করে এ সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়া করে নেওয়া প্রয়োজন।

নির্দিষ্ট তারিখে রেঙ্গুন বিমান-বন্দরে বিরাট সংবর্ধনা জানানো হল সুভাষকে। এসেছেন ডঃ বা. ম। এসেছেন লীগের বর্মা শাখার সভাপতি মিঃ গণি। এসেছেন বর্মা এবং জাপ-সরকারের নেতৃবৃন্দ। আর এসেছেন অগণিত উৎসাহী জনতা।

একটা ব্যাপারে কিন্তু সুভাষের সঙ্গে ডঃ বা. ম-র অদ্ভুত মিল ছিল মল্লিকা। সুভাষ অন্তর্ধান করেছিলেন এলগিন রোডের বাড়ি থেকে। বা. ম মান্দালয় জেল থেকে।

বর্মার যুদ্ধ-পরিস্থিতি তখন অত্যন্ত গুরুতর। জাপানীরা ক্রমশঃই এগিয়ে আসছে দুর্বার বেগে। বেশ বোঝা যায় যে, রেঙ্গুনের পতন আসন্ন।

ঠিক হয়েছিল—দু-একদিনের মধ্যেই বিপজ্জনক বন্দী বা. ম-কে পাঠিয়ে দেওয়া হবে ভারতবর্ষের কোন কারাগারে। কিন্তু কোথায় তখন বা. ম! নির্দিষ্ট দিনে দেখা গেল খাঁচা শূন্য। তার আগেই পাখী শিকলি কেটে পালিয়ে গেছে বহুদূরে!

পরদিন স্বাধীনতা উৎসব। উৎসবে সুভাষের উপস্থিতির কথা প্রধান-মন্ত্রী ডঃ বা. ম-র মুখ থেকেই বরং শোনা যাক:

'নেতাজী যাতে আমাদের উৎসবে যোগ দেন, তার জন্য আমি নিজে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তিনি এলেন, আমাদের অনুষ্ঠান দেখলেন। ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করলাম।

সেই ঘোষণা শুনলেন তিনি। ইতিপূর্বে তাঁর চোখে যে স্বপ্ন দেখেছি, সেদিনও সেই স্বপ্ন তাঁর চোখে। কিন্তু তাতে একটু যেন বিষন্নতার ছায়া। তাঁর হাসিও ঈষৎ ম্লান।

কারণ বুঝতে আমার দেরী হয়নি। ব্রহ্ম স্বাধীন, কিন্তু তাঁর দেশ তখনও শৃঙ্খলিত। তিনি হয়তো সামনের দিনগুলিকে মনশ্চক্ষে দেখছিলেন। দীর্ঘ পথ তাঁর সামনে। সেই পথ তাঁকে পেরোতে হবে, অনেক রক্ত ঝরবার পর তবেই স্বাধীন হবে তাঁর মাতৃভূমি।

সিঙ্গাপুরে ফিরবার পর একমাসের মধ্যেই তিনি আমাকে অনুরোধ জানালেন যে, ব্রহ্মদেশে তিনি তাঁর সদর দপ্তর সরিয়ে নিতে চান, আমি যেন অনুমতি দিই। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষের যথাসম্ভব নিকটবর্তী জায়গা থেকেই যে তাঁর কাজ চালানো দরকার, সেকথা আমাকে বুঝিয়ে বলবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। আমি মুক্তকণ্ঠে তাঁকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানালাম।'

উৎসবে মনোজ্ঞ একটি ভাষণ দিলেন সুভাষ:

'১৯২৫ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত এই ব্রহ্মদেশেরই মান্দালয় জেলে আমি বন্দী ছিলাম। খোলা জানালা দিয়ে প্রায়ই তাকিয়ে থাকতাম বাইরের

দিকে। চোখে পড়ত, ব্রহ্মদেশের প্রাচীন রাজপ্রাসাদ। ভাবতাম, কবে এই পরাধীন ব্রহ্মদেশ আবার স্বাধীন হবে? আজ সেই স্বাধীনতা বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

আপনাদের এই স্বাধীনতা থেকে আমরা দুটো শিক্ষা পেয়েছি। এক—উপযুক্ত সুযোগ এলে তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রহণ করা। দুই—একদিন যে ব্রিটিশ ভারতবর্ষকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে ব্রহ্মদেশ অধিকার করেছিল, আজ সেই ব্রহ্মদেশকেই ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে ব্রিটিশের হাত থেকে ভারতবর্ষকে পুনরুদ্ধার করা। ভারতবর্ষ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত বৃহত্তর এশিয়ার স্বাধীনতা কোনদিনও পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না।

সবশেষে সুভাষ ভারতবাসীর শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে দু লক্ষ টাকা উপহার দিলেন নতুন বর্মা সরকারকে। সবে মাত্র বর্মার নবজন্ম ঘটেছে। তাকে পুনর্গঠন করতে হলে এ সময়ে বিস্তর অর্থের প্রয়োজন, একথা তাঁর অজানা নয়।

এই রেঙ্গুনেই একদিন ভারতবর্ষের শেষ সম্রাট বাহাদুর শার সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন সুভাষ। তবে সেটা আরো পরের ঘটনা।

সুভাষের দুচোখে সেদিন রাশি রাশি স্বপ্ন। একদিন এই সম্রাট বাহাদুর শা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। পররাজ্যগ্রাসী ব্রিটিশের হাত থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কোথায় আজ সেই সম্রাট বাহাদুর শা?

কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান। কিন্তু তার স্বপ্ন! সবই কি শেষ হয়ে যায় মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে? তার আত্মা কি সেই স্বপ্নকে ঘিরে সব সময়েই ঘুরে বেড়ায় না অতৃপ্ত জীবনতৃষ্ণা নিয়ে?

কি ধূর্ত এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর দল! তাদের বিচারে ভারতবর্ষের শেষ সম্রাটকে বন্দী অবস্থায় শেষ-নিঃশ্বাস ফেলতে হল কিনা সুদূর এই বর্মার মাটিতে! আর ব্রহ্মদেশের শেষ সম্রাটকে শেষ-শয্যা নিতে হল ভারতভূমিতে!

সম্রাট বাহাদুর শা, তুমি আমার শ্রদ্ধার্ঘ গ্রহণ কর। আমি যেন তোমার সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করে তুলতে পারি। তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর।

সবশেষে সুভাষ আবৃত্তি করেছিলেন বাহাদুর শারই লেখা একটি উর্দু কবিতাঃ

"গাজিওঁমে বু রহেগী যব তক্ ইমান কী
তব্ তো লণ্ডন তক্ চলেগী তেগ্ হিন্দুস্থান কী।"

'যতদিন মুক্তিসেনানীর মনে এককণাও বিশ্বাস অবশিষ্ট থাকবে ততদিন পর্যন্ত ভারতের শৌর্য লণ্ডনের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করবে।'

কাজ আর কাজ। নিরবচ্ছিন্ন কাজ। একটার পর একটা। অসংখ্য কাজ। কাজ ছাড়া আর সবকিছুই বুঝি চাপা পড়ে গেছে অতল মনের গভীরে।

রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসেই লীগের পুনর্গঠনের কাজে হাত দিলেন

সুভাষ। মোহন সিং এবং রাসবিহারীর ভুল-বোঝাবুঝির ফলে লীগের কাজে কিছুটা মন্থরতা এসেছিল একথা সত্য, তা বলে এ অবস্থাকে তো আর মেনে নেওয়া চলে না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র জুড়ে লীগের শাখা বিদ্যমান। দরকার হলে সেগুলোকে আবার নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে।

লড়াই করবে জওয়ানের দল, কিন্তু পিছন থেকে সবকিছুই যে জোগান দিতে হবে এই লীগকে। অর্থ, পোশাক, খাদ্য ইত্যাদি প্রতিটি জিনিস সরবরাহ করার দায়িত্ব যে এই ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগেরই। তাকে মজবুত করে গড়ে না তুললে চলবে কেন?

প্রথমেই সুভাষ তেরোটি বিভাগ ঢেলে সাজালেন নতুন করে। তারপর আস্তে আস্তে অন্য বিভাগ।

দায়িত্ব বণ্টন করা হল এইভাবে: ফিনান্স এবং ডিপার্টমেণ্ট অফ জেনারেল অ্যাফেয়ার্স—লেঃ কর্ণেল এ. সি. চ্যাটার্জী (জেনারেল সেক্রেটারী), পাবলিসিটি অ্যাণ্ড প্রোপাগাণ্ডা—এস. আয়ার, এডুকেশন—জে. থিবি, সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এবং হাউসিং অ্যাণ্ড ট্রান্সপোর্ট—ডি. এম. খান, মহিলা বিভাগ—লক্ষ্মী স্বামীনাথন, সাপ্লাই—লেঃ কর্ণেল এ. সি. চ্যাটার্জী (পরে হরদয়াল সিং), রিক্রুটমেণ্ট—মেজর পট্টনায়ক, ট্রেনিং—লেঃ কর্ণেল ঈশান কাদির, ইণ্টেলিজেন্স—লেঃ কর্ণেল এ. সি. চ্যাটার্জী (পরে সত্যমোহন সহায়), রিকনস্ট্রাকশন—এন. সরকার, সিংহল ডিপার্টমেণ্ট—মিঃ কোটলা-ওয়ালা।

লক্ষ্য কর মল্লিকা, চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগই সুভাষ চাপিয়ে দিলেন লেঃ কর্ণেল এ. সি. চ্যাটার্জীর উপর। পরবর্তীকালেও সুভাষের নির্দেশে বহু দায়িত্বের বোঝা বইতে হয়েছিল এই চ্যাটার্জীকেই। তখন অবশ্য তিনি আর লেঃ কর্ণেল চ্যাটার্জী নন, মেজর জেনারেল চ্যাটার্জী।

চ্যাটার্জীর প্রতি সুভাষের এই আস্থার কারণও ছিল। সত্যি বলতে কি, এমন সুদক্ষ সংগঠক ও প্রশাসক সেদিন খুব কমই ছিল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগে। যেখানে সাংগঠনিক প্রশ্ন সেখানেই চ্যাটার্জী। এককথায় আজাদ হিন্দ্ সরকারে তিনি ছিলেন অপরিহার্য।

শুধু আজাদ হিন্দ্ সরকার বলে নয়, তার আগে দেশে থাকতেও একজন সৎ এবং আদর্শবান সরকারী মেডিকেল অফিসার হিসেবে তিনি যে দক্ষতা দেখিয়েছিলেন, তার নজীর খুব অল্পই দেখা যায়।

দেখতে দেখতে কাজের মধ্যে আরো বেশি করে ডুবে গেলেন সুভাষ। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত ঠাসা প্রোগ্রাম। কোথাও ফাঁক নেই। ফাঁকিও নেই কোথাও। সবই সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলেছে অবিশ্বাস্য গতিতে।

বিরাট আয়োজন। বিরাট প্রস্তুতি। প্রশাসন, প্রচার, সমাজকল্যাণ, অর্থ, গুপ্তচর, শিক্ষা, সামরিক, স্বাস্থ্য, জাতীয় কৃষ্টি, সরবরাহ, পুনর্গঠন, বৈদেশিক দপ্তর, আবাসও পরিবহণ—এমনি কত বিভাগই না গড়ে উঠেছে এর মধ্যে। শুরু হয়েছে ঝাঁসীর রাণীবাহিনী এবং কিশোর ও বালকদের নিয়ে গড়া বালসেনার কাজ।

ওদিকে রয়েছে সামরিক বিভাগের সংগঠনের কাজ। স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপ, রি-এনফোর্সমেণ্ট গ্রুপ, রেজিমেণ্ট অফ ফিল্ড ফোর্স, আর্টিলারী ইউনিট, সাঁজোয়া গাড়ি ইউনিট, ইণ্টেলিজেন্স গ্রুপ, ইঞ্জিনীয়ারিং ইউনিট, মেডিকেল এইড পার্টি, বেস হাসপাতাল—এমনি কত বিভাগ।

রয়েছে অফিসার্স ট্রেনিং স্কুল। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের জন্য ভবিষ্যতে আরো অফিসার দরকার হবে। এখন থেকেই তাদের গড়ে নেওয়া প্রয়োজন।

অসামরিক লোকদের ট্রেনিং-এর জন্য বিরাট শিক্ষা-শিবির গড়ে উঠেছে কুয়ালালামপুরে। আর একটা পেনাং-এ। নতুন করে সংবাদপত্র প্রকাশ করা হয়েছে দুটি—'ভয়েস অফ ইণ্ডিয়া' আর 'আওয়াজ-ই-হিন্দ্'। প্রথমটা ইংরেজী, পরেরটা হিন্দুস্থানী ভাষায়।

একটা ঘুমন্ত দৈত্য যেন জেগে উঠল কোন্ মায়াকাঠির স্পর্শ পেয়ে।

সর্বত্র এক রব—এগিয়ে চলো। এগিয়ে চলো। পিছনে তাকাবার সময় নেই। হিসেব-নিকেশেরও ফুরসত নেই। সামনে দুরন্ত সংগ্রামের দিন। তার জন্য সবাই প্রস্তুত হও।

সেনানিবাসগুলিতে সেই একই চঞ্চলতা। কোথায় যেন একটা প্রহর বাজবার সঙ্কেত-ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আর সময় নেই। সবাই প্রস্তুত হও!

সেনাবাহিনীর সবচাইতে বেশি পরিবর্তন ঘটেছে মানসিক দিক থেকে। ভাড়াটে সৈনিক বলে এতকাল তাদের সম্মান বলতে কোথাও কিছু ছিল না। সর্বত্র তারা ছিল অবজ্ঞা ও উপহাসের পাত্র।

আজ তারা আজাদী সৈনিক। তাদের সম্মান আলাদা। ইজ্জত আলাদা। ভাবতে গেলেও যেন বুকটা দশহাত উঁচু হয়ে ওঠে। অজ্ঞাতেই মুখ থেকে বেরিয়ে আসে—জয় হিন্দ্! নেতাজী জিন্দাবাদ!

আশ্চর্য, ধূর্ত ইংরেজদের চক্রান্তে সব কিছু তারা ভুলে গিয়েছিল এতদিন। হিন্দু, মুসলমান, শিখ,—সবার ধর্ম ছিল সেদিন আলাদা। ভগবানও বুঝি আলাদা। তাই প্রতিটি সেনাবাহিনী গড়ে উঠেছিল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে। উদ্দেশ্য, প্রয়োজন হলে একের বিরুদ্ধে অন্যকে লেলিয়ে দিয়ে শায়েস্তা করা। ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, এমন কি আহারের ব্যাপারেও সেদিন কারো সঙ্গে কারো মিল ছিল না।

আজ হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সব মিলে-মিশে একাকার। নেতাজী তাদের শিখিয়েছেন যে, ভারতবর্ষ এক ও অভিন্ন। সেখানে মানুষে মানুষে কোন তফাৎ নেই। তাদের একমাত্র পরিচয়—তারা ভারতীয়।

'When Bose took over it's leadership, the army, having no high morale, or discpline, was in a very bad shape. But within a short period of time the I. N. A. became a real revolutionary force under the new leadership. It's strength increased, it's moral rose and it's status became that of the army of a Provisional Government.

The leader gave the army a sense of pride, a battle-cry, and helped it realise for the first time the significance of it's revolutionary role.

[The Indian National Army: Dr. K. K. Ghosh : P.—260]

—মাঝে মাঝেই সুভাষ গিয়ে দেখে আসেন তাঁর একান্ত প্রিয় আজাদী বাহিনীকে। সামনে কঠিন কঠোর সংগ্রামের দিন। ওরাই তো সেদিন সর্বস্ব পণ করে এগিয়ে যাবে সংগ্রামের পুরোভাগে। ওদের ছেড়ে তিনি থাকবেন কি করে?

এক-একদিন সোজা চলে যান রান্নাঘরে। খুঁটে খুঁটে সবকিছু পরীক্ষা করে দেখেন নিজের চোখে। ওরা সৈনিক। নিজেকে শক্ত সমর্থ রাখতে হলে ভাল খাবারের ব্যবস্থা থাকা চাই। সেখানে কোন ত্রুটি থাকলে চলবে না।

সবশেষে একসঙ্গে বসে খাওয়া। মাঝে মাঝে আজাদী সৈনিকদের সঙ্গে বসে খাওয়া তাঁর চাই-ই। তখন আর তিনি তাদের নেতাজী নন—ভাই, বন্ধু, গুরু, সব কিছুই।

২৫শে আগস্ট (১৯৪৩) আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করলেন সুভাষ।

সর্বাধিনায়ক হিসেবে এক নির্দেশনামায় তিনি ঘোষণা করলেন:

"ভারতের মুক্তি আন্দোলনে সহায়তা করার জন্য আজ থেকে আমি আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেছি। আজ আমার জীবনের পরম আনন্দ ও গৌরবের দিন। যে কোন ভারতীয়ের কাছেই আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নেতা হওয়ার চাইতে বেশি সম্মানের আর কিছুই হতে পারে না।

নিজেকে আমি আমার আটত্রিশ কোটি দেশবাসীর সেবক বলে মনে করি। এই আটত্রিশ কোটি ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষার্থে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যাতে প্রত্যেকটি ভারতবাসী আমাকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারে, সেইভাবেই আমি আমার কর্তব্য করে যাব।

কেবলমাত্র অকৃত্রিম দেশপ্রীতি, ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতেই সত্যিকার আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গড়ে উঠতে পারে। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমাদের যে সংগ্রাম করতে হবে তাতে সবচাইতে বড় দায়িত্ব থাকবে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের।

এ কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে হলে আমাদের সামনে থাকবে দুটি মাত্র পথ। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দরকার হলে আমরা প্রাণ দেব, নয়তো বিজয় গৌরবের অধিকারী হব।

যখন আমরা সোজা হয়ে দাঁড়াব, তখন শত্রুরা যেন মনে করে আমরা একটা দুর্লঙ্ঘ্য চীনের প্রাচীর। আবার যখন মার্চ করে এগিয়ে যাব, তখন স্টীম রোলারের মতই সমস্ত বাধা-বিঘ্ন গুঁড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে যাব।

আমাদের কাজ শুরু হয়ে গেছে। 'দিল্লী চলো'—এই হুঙ্কার দিয়ে আসুন আজই আমরা রণযাত্রা শুরু করে দিই। যেদিন দিল্লীর বড়লাট-

প্রাসাদে আমাদের জাতীয় পতাকা সগৌরবে উড়বে, আর আজাদ হিন্দ্ ফৌজ লালকেল্লায় বিজয়-উৎসবে মেতে উঠবে, সেদিনই আমাদের এই অভিযান শেষ হবে।”

নতুন এশিয়ার ঘুম ভেঙেছে।

সর্বত্র বেজে চলেছে একটি আশ্চর্য যাদুভরা কণ্ঠস্বর, ওঠো! দাঁড়াও! স্বাধীনতা অর্জনের চরম সুযোগ এগিয়ে এসেছে জাতির জীবনে। এগিয়ে এস ভাইসব! হাতে হাত মেলাও। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

মেয়েদেরও পিছিয়ে থাকলে চলবে না। তাদেরও বীরাঙ্গনার সাজে সেজে রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে রিভলবার বেয়নেট রাইফেল মেসিনগান নিয়ে লড়াই করতে হবে।

কেন পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। যেখানে তোমাদের ভাইয়েরা দেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে প্রাণ দেবে, সেখানে তোমরা কি পিছিয়ে থাকবে? ভাইদের পাশে এসে দাঁড়াবে না?

এর মধ্যেই বিভিন্ন স্থান থেকে অসংখ্য নতুন স্বেচ্ছাসেবক আসতে শুরু করেছে। দলে দলে। ঝাঁকে ঝাঁকে। হংকং, ফিলিপাইন, জাভা, সুমাত্রা, সাংহাই, জাপান, ব্যাঙ্কক, রেঙ্গুন সব জায়গা থেকেই। আসছে ছেলে-মেয়ে সবাই।

কণ্ঠে তাদের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সুর। স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই মহাযজ্ঞে কেউ আমরা পিছিয়ে থাকতে রাজী নই। জানি, তার জন্য মূল্য দিতে হবে। দিতে হবে অনেক তাজা প্রাণ। প্রয়োজন হলে তাই আমরা দেব, তবু দিল্লী আমরা যাবই। তারপরই একসঙ্গে সবাই ধ্বনি তোলে—চলো দিল্লী! চলো দিল্লী! চলো দিল্লী!

একটা নতুন জোয়ারে লক্ষ লক্ষ মানুষ যেন ভেসে চলেছে একাত্ম হয়ে। দেখা হলেই—জয় হিন্দ্! চলো দিল্লী! ছেলে-বুড়ো সবাই। এমন কি শিশুরা পর্যন্ত বায়না তোলে, জয় হিন্দ্! চলো দিল্লী! জন্মভূমিকে যারা এ পর্যন্ত চোখেও দেখেনি, তাদের মুখে পর্যন্ত সেই একই কথা—চলো দিল্লী! জয় হিন্দ্! এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?

এক-একসময় হিমসিম খেয়ে যেতে হয় এত লোককে ঠাঁই দিতে গিয়ে। এদের থাকা-খাওয়া, শিক্ষা, পোশাক-পরিচ্ছদ চাট্টিখানি কথা তো নয়। কিন্তু সব চলেছে সুশৃঙ্খলভাবে। কোথাও এতটুকু এদিক-ওদিক হবার যো নেই। সবই চলেছে কাঁটায়-কাঁটায়।

ওরা আসবেই তো। আরো আসবে। ব্রাহ্মণ থেকে পতিত, সবার পরশ না পেলে মায়ের অভিষেকের মঙ্গলঘট পূর্ণ হবে কি করে?

স্বাধীন বর্মার প্রধানমন্ত্রী ডঃ বা. ম'র ভাষায়ঃ

“বিশাল সেই সভা, সেখানে তিনি বক্তৃতা দিলেন, আহ্বান জানালেনঃ চলো দিল্লী! আশ্চর্য সেই ধ্বনি, উপস্থিত মানুষদের কানে তা যেন প্রায় মার্চ করে এগিয়ে চলবার নির্দেশের মত শোনাল, ওই একটি ধ্বনিতেই

সুভাষচন্দ্র সকলের হৃদয় জয় করে নিলেন। তাঁর নির্দেশঃ এ সংগ্রামে সবাইকে যোগ দিতে হবে। কার্যত তাই হল, সিঙ্গাপুরে গোটা ভারতীয় সমাজ তাঁর নির্দেশে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ এক আশ্চর্য ঘটনা।”

এ তো গেল কর্মব্যস্ত মানুষটার বাইরের রূপ। ভেতরের মানুষটা কেমন ছিল?

এ সম্বন্ধে সুভাষের সেই কর্মব্যস্ত জীবনের বহু খুঁটিনাটি ঘটনার সাক্ষী প্রচার-সচিব আয়ার সাহেবের মুখ থেকেই বরং কিছু শোনা যাকঃ

“একটু বেলাতেই উঠতেন নেতাজী। যদিও ঘুম ভাঙত অনেক আগেই। শুয়ে শুয়েই কিছুক্ষণ গীতা পড়তেন। তারপর জপ করতেন তুলসীর মালা হাতে নিয়ে। সকাল ছ'টার আগে কোনদিনও উঠতেন না। আবার সাতটার পরেও নয়।

ঠিক আটটায় স্নান সেরে ব্রেক্‌ফাস্ট। আলাদা কোন ঘর ছিল না। অফিস আর শোয়া ছিল একই ঘরে। গোটা তিনেক আধসিদ্ধ ডিম, আর কয়েক পেয়ালা চা,—এই ছিল তাঁর সকালের খাবার। চা অবশ্য অনেকবারই খেতেন। বলতে গেলে যখন-তখন।

ব্রেক্‌ফাস্টের পরেই সোজা চলে যেতেন লীগের সদর দপ্তরে। বেলা প্রায় এগারোটা পর্যন্ত থাকতেন সেখানে। তারপর মিলিটারি হেড কোয়ার্টার্সে। সেখানেও বেশ কিছুক্ষণ। সেই সঙ্গে চায়ের পালা চলছে তো চলছেই।

ফিরতে ফিরতে বেলা দুটো। তারপর খাবার। ব্যক্তিগত কর্মচারী, অতিথি বা কোন জাপ-কূটনৈতিক প্রতিনিধি, যে ই হোক না কেন, সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে খেতে বসতেন একই টেবিলে।

সাধারণ খাবার। ভাত, ডাল, দই ও একটি করে কলা। কোনদিন মাছ জুটলে তো কথাই নেই। সেদিন নিজেই হয়তো দু-একবার ভাত চেয়ে নিতেন। সবশেষে এক কাপ কফি। কফিটা বেশ কিছুক্ষণ ধরে তারিয়ে খেতেন। সেই সঙ্গে চলত নানারকম গল্প ও মিষ্টি পরিহাস।

সবচাইতে বেশি মজা করতেন টেবিল-বয় কালীকে নিয়ে। সহজ সরল লোক কালী। সব কিছু ছেড়ে, এমন কি নিজের নব-বিবাহিতা স্ত্রীকে পর্যন্ত ছেড়ে সে চলে এসেছিল নেতাজীর কাছে। নেতাজীকে সেবা করার চাইতে বড় কাম্য আর কিছুই ছিল না তার।

খুব সুপুরি খেতেন নেতাজী। এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি মেশানো ভাজা সুপুরি। প্রায় সর্বক্ষণই খেতেন। বাইরে গেলে কৌটো ভর্তি করে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এ ব্যাপারে কোনদিনও ভুল হত না তাঁর।

মাঝে মাঝে মকরধ্বজ খেতেন। সে একটা দেখবার মত জিনিস বটে। এমন তন্ময় হয়ে জিনিসটি তৈরী করে চেটে চেটে খেতেন যে, দেখে মনে হত, এ ছাড়া বুঝি সংসারে আর তাঁর দ্বিতীয় কোন কাজ নেই।

আর সিগারেটটা প্রায় সারাদিনই খেতেন। একটার পর একটা। যাকে

বলে চেইন-স্মোকার। সিগারেটের শেষটুকু অবধি খেতেন। কম করে হলেও দিনে-রাতে মিলিয়ে ত্রিশ-চল্লিশটা তো বটেই। তবে সেটা নির্ভর করত পরিস্থিতির ওপর। কোন কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনা কালে মাত্রাটা বৃদ্ধি পেত। সর্বশেষ সিগারেটটি খেতেন রাত প্রায় একটা নাগাদ। তারপরে আর নয়। তবে কাজের চাপে প্রায়ই রাত কাবার হয়ে যেত। সিগারেটও সেই হারেই চলত।

মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত চিকিৎসক রাজু এই নিয়ে উস্‌খুস্‌ করতেন। তাঁর মতে নেতাজীর এত সিগারেট খাওয়া উচিত নয়। দু-একবার বোঝাতেও চেষ্টা করেছেন সেকথা। কিন্তু কে কার কথা শোনে! একটার পর একটা চলছে তো চলছেই।

ব্যাডমিণ্টন খেলা নিয়েও রাজুর অশান্তির অন্ত ছিল না। তাঁর বক্তব্য,—নেতাজীর পক্ষে তিন-চার দান খেলাই যথেষ্ট। কিন্তু বলতে গেলে ফল হত উল্টো। তখন দানের মাত্রা বেড়ে যেত।

সামাল দিতে গিয়ে মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে ফেলতেন রাজু। যা তিনি নিষেধ করবেন, ঠিক তার উল্টোটাই নেতাজী করবেন। এমন অবুঝ লোককে সামাল দেওয়া কি সোজা কথা!

কফি খাবার বেলাতেও তাই। সত্যি বলতে কি, তাঁর কফি খাওয়া দেখেই রাতের প্রোগ্রাম অনেকটা অনুমান করা যেত। এক কাপ হলে বুঝতে হবে রাত একটা পর্যন্ত কাজ চলবে। দু-কাপ হলে রাত দুটো বা তিনটে পর্যন্ত। তার চাইতে বেশি হলেই বুঝতে হবে যে, সারা রাতের প্রোগ্রাম। কোনদিন মোটেই চাইতেন না। বোঝা যেত, সেদিন তিনি একটু তাড়াতাড়ি ঘুমোতে চান। তবে এটা খুব কমই হত।

কোন-কোনদিন দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পরে সিগারেট মুখে দিয়ে চেয়ারে বসেই একটু ঝিমিয়ে নিতেন। এক-আধদিন খেয়াল হলে গড়িয়ে নিতেন বিছানায়। তবে আধঘণ্টার বেশি কোনমতেই নয়।

জন্তু-জানোয়ার বেশ ভালবাসতেন। ছোটখাট একটা চিড়িয়াখানাও তৈরী করেছিলেন নিজের কোয়ার্টারে। কিন্তু বেড়াল ছিল দু-চক্ষের বিষ। ঠিক তার বিপরীত ছিল বার্লিন থেকে আগত একান্ত সচিব আবিদ হাসান। বেড়াল ছিল তার খুবই প্রিয়। দুটো বেড়াল যোগাড়ও যেন সে করেছিল কোথা থেকে। ওদের কাচ্চা-বাচ্চাও হয়েছিল কয়েকটা। এই নিয়ে আবিদ হাসানের সতর্কতার অন্ত ছিল না। সব সময় নজর থাকত,—ওগুলো যেন তার ঘর ছেড়ে কখনো বাইরে না যায়।

একদিন অঘটন ঘটে গেল। নেতাজী সেদিন নিজের ঘরে ঢুকেই অবাক। দুটো বেড়াল-ছানা তখন দিব্যি খেলা করছিল তাঁর ঘরে ঢুকে।

অবস্থাটা বুঝতে পেরে ত্রস্তে ছুটে গেল আবিদ হাসান। সর্বনাশ! এত সতর্কতা সত্ত্বেও সব কিছুই আজ ধরা পড়ে গেছে নেতাজীর কাছে! এখন উপায়!

এগুলো কার? জানতে চাইলেন নেতাজী।

আমার স্যার। দ্বিধা ও কুণ্ঠায় আবিদ হাসান তখন রীতিমত বিব্রত,

সব সময়ে আমার ঘরেই খেলা করে। রাত্রে চুপচাপ আমার বিছানায় ঘুমিয়ে থাকে।

বিছানায়! নেতাজী অবাক, তুমি কি রাত্রে এগুলোকে নিয়ে বিছানায় শোও নাকি ?

হ্যাঁ, স্যার।

নেতাজী স্তম্ভিত। নিজের কানকেই বুঝি বিশ্বাস হল না তাঁর। কেউ যে কোনদিন বেড়াল নিয়ে বিছানায় শুতে পারে, এ বুঝি তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

এক-একদিন গভীর রাত্রে ব্রহ্মচারী কৈলাসকে নিয়ে আসার জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দিতেন রামকৃষ্ণ মিশনে। স্বামীজী এলে দীর্ঘসময় তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন আধ্যাত্মিক ব্যাপার নিয়ে। কোন-কোনদিন নিজেই চলে যেতেন মিশনে। সিল্কের একটি ধুতি পরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে বসে থাকতেন তন্ময় হয়ে। দেখে মনে হত, যেন নিজেকে তিনি পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করে দিয়েছেন ভগবানের কাছে। তাঁর সেই আত্ম-সমাহিত ভাব দেখলে আমাদের ভগবান বুদ্ধের কথাই মনে হত।

"Those of us who came nearest to him, sometimes referred to him as 'The Buddha'—so serene and so silent was he, whenever he could snatch a moment off from active duties".

[Unto Him a Witness : S. A. Ayer : P.—269]

একই অভিমত থাইল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী পিবুল সংগ্রামের: 'বুদ্ধের পাশে বসবার মত একটিমাত্র লোকই আমি দেখেছি, তিনি হলেন নেতাজী বসু।' [ওকার রোবস্ : লিউপোল্ড ফিসার]

অথচ খাবার টেবিলে একেবারে বিপরীত চেহারা। রাত আটটায় নৈশ-ভোজ। প্রায়ই সঙ্গে থাকতাম আমি। তাছাড়া রাজু, টাইপিস্ট ভাস্করণ, এ. ডি. সি. রাওয়াৎ ও সমশের সিং ও দু-একজন অতিথি—এ তো আছেই।

সবাই এক টেবিলে। সেখানে ছোট-বড়র কোন প্রশ্নই নেই। সবাই সমান। কোন গুরুগম্ভীর আলোচনা তখন নয়। শুধু খেতে খেতে হাল্কা রসালো পরিহাস।

মাঝে মাঝে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের খাবারের গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা হতো। এ ব্যাপারে নেতাজী ছিলেন রীতিমত সমঝদার। এমনভাবে তিনি নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতেন যে, শুনে আমরা হেসে গড়িয়ে পড়তাম।

একদিন আমাদের সঙ্গে ইয়েলাপ্পা সাহেবও খেতে বসেছেন। দই পরিবেশন করতে দেখেই তিনি বললেন—'মোষের দুধের দই রোজ খাওয়া উচিত নয়, তাতে বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যায়।'

বলতে না বলতেই নেতাজী জবাব দিলেন—'এটা কি আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নাকি ?'

আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে হাসির রোল উঠল খাবার টেবিলে।

আর একদিন খেতে খেতে আনন্দমোহন সহায় বললেন—'লীগের সাংহাই

শাখার একজন অফিসারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এসেছে। তদন্তের জন্য কাউকে ওখানে পাঠানো দরকার। কাকে পাঠানো যায়?'

নেতাজী লীগের চৌকিও শাখার সভাপতি রামমূর্তির নাম প্রস্তাব করলেন। দ্বিধাগ্রস্তের মত সহায় বললেন—'কিন্তু রামমূর্তি যে খুব সিধা আদমী স্যার।'

'ও!' সঙ্গে সঙ্গে নেতাজীর জবাব—'টিধা (বাঁকা) আদমী চাই—না!'

উপস্থিত প্রতিটি লোক হেসে উঠলেন সশব্দে। সহায়ও গলা মেলালেন তাঁদের সঙ্গে।

এই ছিলেন আমাদের নেতাজী। নেতা অনেকেই হয়, কিন্তু নেতাজী একজনই। তিনি সর্বকালের। সর্বযুগের।"

দিনগুলো যেন ঝড়ের মত আসে আর যায়।

কাজের নেশায় সুভাষ তখন উন্মত্ত যেন। যুদ্ধ ছেলে-খেলা নয়। তার উদ্যোগ-আয়োজনের জন্য বিস্তর সময়ের প্রয়োজন। অথচ এদিকে হাতে সময় খুবই কম। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁকে সবকিছু গড়ে-পিটে নিতে হবে মজবুত করে।

ফাঁকে ফাঁকে মনে পড়ে জন্মভূমি ভারতবর্ষের কথা। বাংলাদেশের কথা। একান্ত প্রিয় সতীর্থদের কথা। কবে আমি আমার সেই ফেলে-আসা জন্মভূমিতে ফিরে যাব মুক্তির মশাল হাতে নিয়ে? কবে? আর কত দেরী?

বার্লিনের খবরও তাঁর অজানা নয়। সব কিছুই সেখানে চলছে আগের মত। তাঁর নির্দেশমত নাম্বিয়ারই এখন দেখাশোনা করে সব কিছু। গনপুলে, গিরিজা মুখার্জী, শর্মা, কুসুম পাল, প্রমোদ সেনগুপ্ত, কান্তারাম, সুলতান—সবাই যে-যার কাজ করে চলেছে সুষ্ঠুভাবে। জার্মান বন্ধু ভন ট্রট, আলেকজাণ্ডার ওয়র্থ, কেপলার—ওঁরাও রয়েছেন আগের মত।

ভারতবর্ষের খবরও কিছু কিছু তাঁর জানা আছে। গান্ধীজী, জওহরলাল, আজাদ, সর্দার প্যাটেল—সবাই এখন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে।

কিন্তু বাংলাদেশ! ওখানকার বিপ্লবী সতীর্থদের খবর কি? হেমচন্দ্র ঘোষ, সত্য বক্সী, মেজর সত্য গুপ্ত, মহারাজ, রবি সেন, অনিল রায়, লীলা রায়—ওঁদের খবর কি? ওঁরা কি এখনো বাইরে আছেন? মনে তো হয় না। আগস্ট আন্দোলনের পরে ধূর্ত ইংরেজ যে ওঁদের কাউকেই জেলের পাঁচিলের বাইরে রাখবে না সে তো বলাই বাহুল্য।

মেজদাও বাইরে নেই। অনেক আগেই তাঁকে ওরা আটক করেছে চার দেওয়ালের ভেতরে। খবরটা নিজেরাই ওরা প্রচার করেছিল অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে। ভাইপো শিশিরের খবর কি? ও কি এখনো বাইরে আছে? তাকে গোমো স্টেশনে পোঁছে দিতে গিয়ে সেদিন যেভাবে ও ঝুঁকি নিয়েছিল সত্যিই তার তুলনা নেই। ধরা পড়লে আর রক্ষে ছিল না।

আকবর শা, ভকৎরাম, আবাদ খাঁ, উত্তমচাঁদ—ওঁদেরই বা খবর কি? ওঁরা কি রেহাই পেয়েছেন ব্রিটিশের হিংস্রতার হাত থেকে? খুব সম্ভব পাননি। পাবার কথাও নয়।

পেনাং ট্রেনিং সেণ্টারের শিক্ষক এন. এস. চোপরার নেতৃত্বে ভারতবর্ষে

সাবমেরিনযোগে একটা দল পাঠালে কেমন হয়! ওখানকার সামরিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানা দরকার। তাছাড়া আগামী দিনের সংগ্রামের জন্য ওখানকার একান্ত বিশ্বস্ত সতীর্থদেরও প্রস্তুত থাকতে বলা প্রয়োজন।

অবশ্য তাঁর এখানে আসার আগেও যে এ ধরনের প্রচেষ্টা না হয়েছিল এমন নয়, কিন্তু তা কার্যকর হয়নি। সবাই ধরা পড়ে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন ফাঁসিমঞ্চে। তা বলে আর তো পিছিয়ে গেলে চলবে না। চেষ্টা যে চালিয়ে যেতেই হবে।

কিন্তু না, আর দেরী নয়। খবরের সময় হয়েছে। কি বলে ব্রিটিশ-পরিচালিত অল ইণ্ডিয়া রেডিও শোনা যাক।

এমনিভাবেই একদিন খবর শুনতে গিয়ে সহসা দারুণভাবে বিচলিত হয়ে উঠলেন সুভাষ। আঘাতটা যেমন আকস্মিক, তেমনিই অপ্রত্যাশিত।

বাংলাদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। খাদ্যাভাবে অসংখ্য লোক মৃত্যুবরণ করছে শেয়াল কুকুরের মত। পরিস্থিতি সত্যিই শোচনীয়। ভয়ঙ্কর শোচনীয়।

সত্যিই তাই মল্লিকা। আজ ১৯৭৩ সালের প্রান্তে দাঁড়িয়ে সেই ভয়াবহ দৃশ্যের কথা তুমি বোধ হয় কল্পনাও করতে পারবে না। সরকারী অব্যবস্থার ফলে সেদিন মোট কত লোককে এই ইচ্ছাকৃত দুর্ভিক্ষের ফলে প্রাণ দিতে হয়েছিল, জানো? প্রায় ষাট লক্ষ।

পথে-ঘাটে, ফুটপাথে, ময়দানে যেদিকে তাকানো যায় শুধু অস্থিচর্মসার অগুনতি মৃতদেহ। বেশির ভাগই ক্ষত-বিক্ষত। শকুন এবং কুকুরের দল আগে থেকেই তাদের শেষ করে দিয়েছে।

মল্লিকা, যুদ্ধ হয়েছে রাজায় রাজায়। বাংলাদেশের সেখানে কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না। তাছাড়া সত্যি বলতে গেলে বাংলাদেশে সেদিন যুদ্ধ হয়ও নি। অথচ সর্বাগ্রে তার জন্য মাশুল দিতে হয়েছিল এই বাংলাদেশকেই।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ! যে ব্রিটিশ সেদিন প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে জড়িত ছিল, তাদের দেশের কাউকে এভাবে না খেতে পেয়ে তিলে তিলে প্রাণ দিতে হয়েছিল কি?

না, হয়নি। সেই ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্যেও মার্কিন দেশ থেকে খাবার আনিয়ে দেশবাসীর মুখে তুলে দিতে তাদের ভুল হয়নি। আপত্তি শুধু আমাদের বেলায়। তফাৎ এইখানেই।

অপূর্ব সংযম দেখিয়েছিল সেদিন বাংলার মানুষ। কোনরকম জোরালো দাবি তুলে সরকারকে তারা বিব্রত করেনি। বেঁচে থাকার তাগিদে খাবার-ভর্তি একটা দোকানও তারা লুট করেনি। লাখে লাখে প্রাণ দিয়েছে, তবু তারা অহিংসার মর্যাদা রক্ষা করে চলেছিল বরাবর।

বাংলার সেই চরম দুর্দিনে সহসা কার কণ্ঠ শোনা গেল অভয় মন্ত্রের মত—আমি সুভাষ বলছি...

বাংলার প্রয়োজনে যত চাল দরকার, সব আমি পাঠাব। প্রথমে পাঠাব একলক্ষ টন চাল। তারপর আস্তে আস্তে আরো পাঠাব। শুধু শাসকদের

কথা দিতে হবে যে, আমার প্রেরিত জাহাজগুলিকে তারা আটক করবে না। নির্বিঘ্নেই আবার সেগুলোকে তারা ফিরে আসতে দেবে। এ প্রস্তাবে রাজী থাকলে রেডিওযোগেই যেন সেই সম্মতির কথা জানিয়ে দেওয়া হয়।

কোন উত্তরই সেদিন দেননি মহামান্য ভারত সরকার। দেবার কথাও নয়। বাংলাদেশে লোক মরছে তো মরুক না! আগস্ট-আন্দোলন করার সময় মনে ছিল না! এখন বুঝুক মজা!

সস্তা প্রচার কৌশল নয় মল্লিকা, একথা সম্পূর্ণ সত্য। সুভাষ সেদিন সত্যই এভাবে আবেদন করেছিলেন রেডিওর মাধ্যমে। পরবর্তীকালে ব্রিটিশও স্বীকার করেছিল সে কথা। হ্যাঁ, আগস্ট মাসে সুভাষ বোস এমনি একটা প্রস্তাব করেছিলেন বটে, তবে আমরা তার কোন জবাব দিইনি।

'In August he made an offer of 1,00,000 tons of rice to be shipped under suitable guarantees to Indian ports as gift from the League. The offer was ignored.' [Hugh Toye : P.—82]

কিন্তু কেন? শত্রু হলেও কতকগুলো বিশেষ ক্ষেত্রে এ ধরনের আবেদন করা তো সেদিন কোন পক্ষ থেকেই কিছু কমতি ছিল না। যেমন এখান থেকে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর মাধ্যমে হয়তো বলা হতো—'পেনাং-এর ভুবনচন্দ্র সরকার, আপনি শুনুন। চন্দননগরের শ্রীমতী রেখা সরকার আপনার খবর জানতে চাইছেন। কেমন আছেন জানান।'

তিন-চারদিন বাদেই হয়তো সিঙ্গাপুর, ব্যাঙ্কক বা সাইগন রেডিও থেকে শোনা যেত—'পেনাং-এর ভুবন সরকার ভালই আছেন। চিন্তার কোন কারণ নেই।'

তাহলে চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ লোককে মৃত্যু-বরণ করতে দেখেও ব্রিটিশ সরকার সেদিন মৌনব্রত অবলম্বন করেছিলেন কেন?

কারণ—প্রতিশোধ। বাঙালী তাদের অনেক জ্বালিয়েছে। ক্ষুদিরাম, বিনয়-বাদল-দীনেশ, সূর্য সেন, কেউ তাদের কম জ্বালায়নি। তাদেরই উত্তরসূরী হল এই সুভাষ বোস। না, এসময়ে তার সাহায্যগ্রহণ কোনমতেই নয়। বরং খবরটা অতি সন্তর্পণে চেপে রাখতে হবে। আগস্ট-আন্দোলনের আগুন এখনো ধিকি-ধিকি জ্বলছে এখানে-ওখানে। এসময়ে সুভাষ বোসের উপস্থিতির কথা জানতে পারলে রক্ষে আছে!

একথা কোনমতেই ভুললে চলবে না, ভারতবর্ষে সুভাষ বোসই একমাত্র লোক, যাকে কোনদিনই মিষ্টি কথায় ভোলানো যায়নি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোনদিনই যাকে সহযোগিতা বা আপস আলোচনার প্রস্তাবে রাজী করানো যায়নি। সুতরাং সে আমাদের শত্রু। পয়লা নম্বরের শত্রু। দেশের শত্রু।

শুধু ব্রিটিশ নয়, ভারতবর্ষের ব্রিটিশ-দরদীরাও সেদিন এই নিয়ে সুভাষের বিরুদ্ধে কম লড়াই করেনি মল্লিকা। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নয়, মনুমেণ্টের নীচে দাঁড়িয়ে।

সুভাষ দেশের শত্রু, কুইস্‌লিং, ফ্যাসিস্ট, হিটলার ও তোজোর হাতের পুতুল, ভ্রান্ত, অপরিণামদর্শী এমনি কত কথা। কত বিশেষণ। সত্যি বলতে

কি, সেদিন এই ব্রিটিশ-দরদীরা সুভাষকে যেসব বিশেষণে ভূষিত করে-ছিলেন সুভাষের পয়লা নম্বর শত্রু ব্রিটিশও বোধহয় কোনদিন তা করতে পারেনি। 'সুভাষ ফিরে এলে তাকে তরবারি বা বুলেট দিয়ে অভ্যর্থনা করা হবে।' এসব উক্তি আর যারই হোক না কেন, ব্রিটিশের নয়।

কিন্তু কেন? কারণ, হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণ। তার আগে পর্যন্ত হিটলার খুব মন্দ লোক ছিলেন না। বরং ব্রিটিশকে বেধড়ক মার দিতে দেখে সবাই তাঁরা খুশিই হয়েছিলেন মনে মনে। খারাপ হয়ে গেলেন রাশিয়া আক্রান্ত হবার পরে। সুভাষ সেই হিটলারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন, সুতরাং তিনিও সমান অপরাধে অপরাধী। তিনিও ফ্যাসিস্ট। কাজেই ব্রিটিশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যে করে হোক, তাকে রুখতেই হবে।

এই নিয়ে সেদিন কত ছড়া। কত গান। কত মিছিল। উল্লেখযোগ্য যে, ইচ্ছাকৃত দুর্ভিক্ষের ফলে চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রাণ দিতে দেখেও কিন্তু সেদিন 'আমাদের দাবী মানতে হবে' বলে একটি মিছিলও পথে-ঘাটে দেখা যায়নি। একটি 'বাংলা বন্‌ধ'ও ডাকা হয়নি। তা বলে মিছিল অবশ্য বন্ধ ছিল না। তবে তার বক্তব্য ছিল আলাদা।

আজো ভাসা-ভাসা ভাবে মনে পড়ে সেই সব দু-একটি গানের লাইন।

> 'কমরেড ধরো হাতিয়ার—ধরো হাতিয়ার...
> স্বাধীনতা সংগ্রামে নহে আজ একলা
> বিপ্লবী সোভিয়েত, দুর্জয় মহাচীন
> সাথে আছে ইংরেজ, নির্ভীক মার্কিন...'

নির্ভীক মার্কিন! তা ঠিক! পরবর্তীকালে গোটা পৃথিবী বোধ হয় সেই নির্ভীকতার নিদর্শন লক্ষ্য করেছে কোরিয়া, ভিয়েতনাম আর কম্বোডিয়াতে।

মল্লিকা, নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করাটা মানুষের সহজাত ধর্ম। সংসারের প্রতিটি লোকই অল্প-বিস্তর মনে করে যে, আমি খুব বুদ্ধিমান। লোক-চরিত্র সম্বন্ধে আমি যা বুঝি, এমনটি আর কেউ বোঝে না। তাই হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও সেদিন একথা বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে, সুভাষ ফ্যাসিস্ট! ভ্রান্ত! দেশদ্রোহী!

কিন্তু যাঁরা সেদিন খুব কাছে থেকে সুভাষকে দেখেছিলেন, তাঁরা কি বলেন এ সম্বন্ধে?

কি বলেন বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু?

কি বলেন নাম্বিয়ার, গনপুলে. গিরিজা মুখার্জী, আবিদ হাসান, জেনারেল ভোঁসলে, জেনারেল কিয়ানী, জেনারেল চ্যাটার্জী, শাহনওয়াজ খান, হবিবুর রহমান, এস. এ. আয়ার, আনন্দমোহন সহায়, দেবনাথ দাস প্রমুখ তাঁর সর্বক্ষণের সহকর্মিগণ?

কি বলেন ডঃ বা. ম, থাকিন নু, পিবুল সংগ্রাম, ডঃ লরেল, টুঙ্কু আবদুল রহমান, সুকর্ণ প্রমুখ রাষ্ট্রনায়কগণ? শিক্ষা, দীক্ষা, পাণ্ডিত্য, দেশপ্রেম—কোনদিক থেকেই তো এঁরা কম নন জানি। কই, এঁরা তো কোনদিনও

বলেননি যে, সুভাষ ভ্রান্ত? বরং আজো দেখি এঁরা শ্রদ্ধায় মাথা নত করেন সুভাষের নামে।

এঁরাও কি ভ্রান্ত? হাজার হাজার মাইল দূর থেকেও যেখানে সবকিছু জলের মত স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, সেখানে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে এঁদের মধ্যে একজনেরও কি মনে হল না যে, সুভাষ ভ্রান্তপথে চলেছেন! এঁরা কি অন্ধ? না কি এঁদের বিদ্যাবুদ্ধি কিছু কম ছিল কারো চাইতে?

সর্বোপরি বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবী আয়ারল্যাণ্ডের ডি. ভ্যালেরা। তিনি কেন সেদিন সমর্থন জানিয়েছিলেন সুভাষকে? তবে কি বুঝতে হবে যে, তিনিও ভ্রান্ত? না কি বিপ্লবী হিসেবে তিনি কিছু কমতি ছিলেন কারো চাইতে?

আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঐ ত্রিশ লক্ষ ভারতীয় নরনারী! কি না করেছেন সেদিন ওঁরা সুভাষের জন্য? কি করতে বাকী রেখেছিলেন? ওঁরাও কি ভ্রান্ত?

সুভাষ হিটলারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন একথা সত্য। শুধু হিটলার কেন, তোজো, মুসোলিনী সবার সঙ্গেই তিনি হাত মিলিয়েছিলেন।

কিন্তু কেন?

কারণ, বিশ্বের সমস্ত শক্তি তখন দুটি আলাদা শিবিরে বিভক্ত।

একদিকে জোট বেঁধেছে—ব্রিটিশ, আমেরিকা, রাশিয়া এবং সেই সঙ্গে চীন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ইত্যাদি কয়েকটি রাষ্ট্র। অন্যদিকে জার্মানী, ইতালী এবং জাপান।

ব্রিটিশের শত্রু হিসেবে স্বভাবতই সুভাষ বেছে নিয়েছেন শেষোক্ত দলকে। কারণ, নেপোলিয়নের সেই নীতি—'শত্রুর শত্রুই আমার মিত্র'। ক্রমাগত ঘা খেয়ে খেয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এখন ডুবতে বসেছে। এই তো সুযোগ। এ সুযোগ হেলায় না হারিয়ে কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হবে।

এই বিশ্বযুদ্ধে কে এভাবে অন্যের সঙ্গে হাত মেলায়নি প্রয়োজনের তাগিদে? রাশিয়া তার আগেই হাত মেলায়নি হিটলারের সঙ্গে? হাত মেলায়নি জাপানের সঙ্গে? পরে হাত মেলায়নি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ এবং আমেরিকার সঙ্গে? তাই বলে কি রাশিয়া ধনতন্ত্রবাদ গ্রহণ করেছিল সেদিন থেকে? না কি ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি সমাজতন্ত্রবাদ গ্রহণ করেছিল পারস্পরিক এই চুক্তির ফলে?

আর প্রয়োজনের তাগিদে অন্য রাষ্ট্রের সাহায্য নেওয়াটা কি অপরাধ?

জর্জ ওয়াশিংটন, গ্যারিবল্ডি, ম্যাটসিনি, ডি. ভ্যালেরা, দ্যগল, লেনিন, সানইয়াৎ-সেন, মাও-সে-তুং প্রমুখ বীর সংগ্রামিগণ এভাবে সাহায্য নেননি অন্য রাষ্ট্র থেকে? সাহায্য নেননি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান?

মাতৃভূমি উদ্ধারের জন্য দ্যগল সেনাবাহিনী গঠন করেননি ইংল্যাণ্ডে গিয়ে? বিভিন্ন দেশের স্বেচ্ছাসৈনিকরা লড়াই করেনি ভিয়েতনামে গিয়ে? আমরা লড়াই করিনি বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে?

সবাই ভাল। সবাই জাতীয় বীর। দেশের শত্রু শুধু সুভাষ। কারণ, লড়াই তিনি ব্রিটিশের পক্ষে করেননি, করেছিলেন বিপক্ষে। তাও মনুমেণ্টের

নীচে নয়, একেবারে আসল যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে। সেই নৈতিবাদের যুগে ভারত-ভাগ্যবিধাতা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নেমে তিনি যে একটা মহাপাতকের কাজ করেছিলেন তাতে আর সন্দেহ কি! নিজেদের অক্ষমতা ঢাকতে হলে এর পরে সুভাষকে ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া ছাড়া আর কি-ই বা করা যেতে পারে?

সুভাষ ভ্রান্ত। আশ্চর্য, এ ব্যাপারে ব্রিটিশ কিন্তু পরবর্তীকালে কোনদিনও তার বন্ধুদের সুরে সুর মেলায়নি মল্লিকা, তাদের বক্তব্য ছিল ঠিক তার বিপরীত। মুক্তকণ্ঠে তারা স্বীকার করেছে যে, ভারতবর্ষে সুভাষই ছিলেন একমাত্র লোক, যাঁর মতবাদ ছিল পরিচ্ছন্ন। তিনি বাইরে থেকে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করে যাচ্ছিলেন।

'Bose, the only one with a clear cut view of the world, was far away in Europe nurturing his plans to liberate India from outside.'

[The Last Years of British India : Michael Edwards, P.—87].

যাক, এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করে চলো আমরা আবার সুভাষের কাছে ফিরে যাই মল্লিকা। কর্ম-পাগল মানুষ। ইতিমধ্যে আবার কোন্ কাজ নিয়ে মেতে উঠেছেন কে জানে! দেখাই যাক না!

২রা অক্টোবর, ১৯৪৩।

সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সেদিন অন্য চেহারা। যেদিকে তাকানো যায় শুধু রাশি রাশি ভারতের জাতীয় পতাকা। সেই সঙ্গে অগুন্তি মানুষের মিছিল। মুখে একটি মাত্র ধ্বনি—'মহাত্মা গান্ধী কী জয়!'

২রা অক্টোবর, গান্ধীজীর জন্মদিন। সুভাষের নির্দেশ,—লীগের প্রতিটি শাখাকে নিষ্ঠাসহকারে তাঁর জন্মতিথি উৎসব পালন করতে হবে। ছোট-বড় সবাইকে যোগ দিতে হবে দলে দলে। কেউ যেন বাদ না যায়।

কাজেও তাই হয়েছিল মল্লিকা। কী জাঁকজমকসহকারেই না সেদিন এই জন্মতিথি উৎসব পালিত হয়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি রাষ্ট্রে! সিঙ্গাপুর, মালয়, বর্মা, সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও, ব্যাঙ্কক, সাংহাই, ক্যান্টন, হংকং, টোকিও—কোথাও বাদ ছিল না।

সবচাইতে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান হয়েছিল সিঙ্গাপুরের ফারার পার্কে। অসামরিক জনসাধারণ তো বটেই, তাছাড়া সামরিক বাহিনী এবং ঝাঁসির রাণী বাহিনীর মেয়েরাও সেদিন সর্বপ্রথম মার্চ করে যোগ দিয়েছিলেন দলে দলে। না, শাড়ি পরে নয়, পুরো মিলিটারী ইউনিফর্ম পরে। এবং সে ইউনিফর্ম তাঁরা গায়ে রেখেছিলেন বিশ্বযুদ্ধের শেষদিন পর্যন্ত। একটু শোনাই না:

'The Rani of Jhansi Regiment also took part in this procession and for the first time all the volunteers of this Regiment were seen in their military uniform. The Regiment

looked very smart and throughout the march they were the recipients of vociferous cheering.

The Regiment was headed by Dr. S. Lakshmi and the Regiment is indeed an eloquent testimony to the great organising ability of the leader.'

[Young India : 10. 10. 43]

ফারার পার্কে পতাকা উত্তোলন করলেন মেজর জেনারেল ভোঁসলে। আর ভাষণ দিলেন মেজর জেনারেল চ্যাটার্জী, এম. ভি. পিল্লাই, এম. কে. চিদাম্বরম প্রমুখ বক্তাগণ। টোকিওতে জন্মোৎসব পালিত হল রাসবিহারীর নেতৃত্বে।

সুভাষ তখন ব্যাঙ্কক-এ। সেখান থেকেই তিনি বেতার-যোগে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন গান্ধীজীর উদ্দেশে ঃ

"১৯২০ সাল থেকে মহাত্মা গান্ধীর কাছে আমরা দুটো জিনিস শিখেছি। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এ দুটির খুবই প্রয়োজন। এর একটি হল,—জাতীয় মর্যাদা ও আত্মপ্রত্যয় বোধ, যার ফলে প্রতিটি ভারতীয়ের অন্তরে আজ বিপ্লবের বহ্নিশিখা দীপ্যমান। দ্বিতীয়—সংঘবদ্ধতা, যার জন্য আজ ভারতের সুদূর নিভৃত অঞ্চলেও অসংখ্য স্বাধীনতা সংস্থা গড়ে উঠেছে।

মহাত্মা গান্ধী আমাদের স্বাধীনতার সরল পথের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি এবং ভারতের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আজ কারাগারে। তাঁর আরব্ধ কাজ আজ ভারতবাসীকেই সম্পূর্ণ করতে হবে। তা দেশে থেকেই হোক, আর বিদেশে থেকেই হোক।

১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেসে এই মহাত্মা গান্ধীই বলেছিলেন—'ভারতের হাতে যদি তরবারি থাকত, তবে সেই তরবারি হাতে নিয়েই সে যুদ্ধে অবতীর্ণ হত।' ইতিহাসের চাকা ঘুরে গেছে, তাই ভারতবাসীর এখন অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধে নামবার দিন এসে গেছে। আজ আনন্দ ও গৌরবের কথা—আমাদের নিজস্ব আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গড়ে উঠেছে এবং দিন-দিনই তার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জয় হিন্দ্ !"

'Free India will not to be a land of capitalists, land-lords and castes. Free India will be social and political democracy.'

—*Netaji*

সুভাষের মাথায় তখন নতুন এক চিন্তা। টাকা চাই। প্রচুর টাকা। হাজার হাজার সেনানী। হাজার হাজার লীগ-কর্মী। তাছাড়া বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে রোজই লোক আসছে দলে দলে। ঝাঁকে ঝাঁকে।

এদের শিক্ষা, থাকা-খাওয়া ও পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য বিস্তর টাকার প্রয়োজন। চাই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা।

তাছাড়া যুদ্ধ-সাজসরঞ্জামও কিনতে হবে কিছু কিছু। আত্মসমর্পণের পর ব্রিটিশের কাছ থেকে যেসব অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে সে তো আছেই, তবু আরো চাই। আরো অনেক চাই।

অবশ্য জাপান শর্তহীনভাবেই সবকিছু দিতে প্রস্তুত। তাদের এখন একমাত্র চিন্তা—'এশিয়া—এশিয়াবাসীদের জন্য'। সে নীতিকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য সব কিছুই তারা এখন মেনে নিতে রাজী।

তবু একমাত্র অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে তাদের কাছ থেকে সাহায্য না নিতে পারলেই ভাল। কেন নেব? নেওয়া মানেই তো একটা নৈতিক বাধ্য-বাধকতার মধ্যে যাওয়া। তার থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়।

'Netaji never asked for any facility from Japan which could be provided by the Indians in the Far-East. Netaji was approached on this point but he refused to accept any assistance other than the supply of war material. He told the Indian people that he did not want to approach any one as long as they could help themselves.'

[Maj. Gen. Shahnawaz Khan]

নির্ভর করতে হবে প্রধানত ভারতীয়দের দানের উপরেই। স্বাধীনতা কে না চায়? কে না ভালবাসে? ত্রিশ লক্ষ ভারতীয় এখন রয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। বুঝিয়ে বলতে পারলে তারা ঠিক সাড়া দেবে।

এখুনি তাকে একবার বেরিয়ে পড়তে হবে সময় করে। ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে স্বাধীনতার আহ্বান। বলতে হবে, চরম সুযোগ এগিয়ে এসেছে জাতির জীবনে। এ সুযোগ তোমরা হেলায় হারিও না ভাই। এ মহাযজ্ঞে সবাই তোমরা এগিয়ে এসো দলে দলে। সবাই অংশ নাও। সবাই পূর্ণ করে তোল এই জাতীয় ভাণ্ডার। ছোটবড় যে যা পার, সব তুলে দাও দেশের কাজে। সর্বস্ব দাও!

'আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি—'

মল্লিকা, এই একটি মাত্র মন্ত্রেই বুঝি সেদিন একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ত্রিশ লক্ষ ভারতীয় নরনারী। হ্যাঁ, দিতে হবে। সবকিছুই আমাদের তুলে দিতে হবে নেতাজীর হাতে। সর্বস্ব দিতে হবে।

ষোল আনা পেতে হলে ষোল আনা দিতে হয়। তাই সিকি বা আধখানা নয়, দিতে হবে যথাসর্বস্ব। কিছুই অবশিষ্ট রাখলে চলবে না। এক কানাকড়িও নয়।

কিন্তু কাল? কাল সংসার চলবে কি করে? কেন, ভাবনার কি আছে? আমরা ছেলেরা চলে যাবো লড়াইতে। মেয়েরা ঝাঁসির রাণী বাহিনীতে। আর ছোটদের জন্য বালসেনার দল তো রয়েছেই। ব্যস, সমস্যা মিটে গেল।

সে কি আগুন-ঝরা ডাক সেদিন সুভাষের কণ্ঠেঃ

'করো সব নিছোয়ার, বনো সব ফকির।' সর্বস্ব দিয়ে ফকির হয়ে

যাও। শৃঙ্খলিতা ভারত-জননীর কান্না শুনতে পাচ্ছ না? তোমরা তাঁরই সন্তান। তাঁর মুক্তির জন্য সর্বস্ব দাও। সব দিয়ে নিঃস্ব, ফকির হয়ে যাও।'

'You shall give up your all for India's Freedom. You shall lay down your lives on the Road to Delhi. You shall become freedom-mad.'

তাই দিয়েছে মল্লিকা। সিঙ্গাপুর, ব্যাঙ্কক, সাইগন, কুয়ালালামপুর, রেঙ্গুন, পেনাং, সাংহাই, ক্যান্টন—যেখানে সুভাষ গিয়েছেন, সেখানেই সবাই তাঁকে দিয়েছে উজাড় করে। যথাসর্বস্ব দিয়েছে। দিয়ে ফকির হয়ে গেছে এক-একজন।

এ যেন নিশির ডাক। এ ডাক একবার শুনলে আর রক্ষে নেই। সাড়া তাকে দিতেই হবে। তাই নিয়েই কত প্রতিযোগিতা! কত সাধ্যসাধনা! শুনলে স্বপ্ন বলে মনে হয়, অথচ এ-কাহিনী সম্পূর্ণ সত্য।

এর কোন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নেই। শুধু সকৃতজ্ঞ চিত্তে সেদিনের কয়েকটি উজ্জ্বল স্মৃতির কথা উল্লেখ করেছেন প্রত্যক্ষদর্শী মেজর জেনারেল এ. সি. চ্যাটার্জী, শাহনওয়াজ খান এবং প্রচারমন্ত্রী এস. এ. আয়ার প্রমুখ সুভাষের সহকর্মীবৃন্দ। তাঁদের সেই স্মৃতির ভাণ্ডার থেকেই কয়েকটি ঘটনার কথা আজ তোমাকে শোনাচ্ছি মল্লিকা।

এ প্রসঙ্গে প্রথমই উল্লেখ করতে হয় রেঙ্গুনের বিখ্যাত ব্যবসায়ী হাবিব সাহেবের কথা। সুভাষের ডাকে সাড়া দিয়ে নগদ অর্থ, অলঙ্কার এবং সমস্ত সম্পত্তি মিলিয়ে সেদিন তিনি যা দিয়েছিলেন, তার মূল্য এক কোটি তিন লক্ষ টাকা।

বিনিময়ে তিনি দুটিমাত্র জিনিস চেয়েছিলেন সুভাষের কাছে। একটা খাঁকি ইউনিফর্ম, আর সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে লীগের সেবা করার জন্য যে কোনও রকম একটি কাজ।

বিখ্যাত জেয়াওয়াড্‌ডি স্টেটের মালিকও তাঁর যথাসর্বস্ব তুলে দিলেন সুভাষের হাতে। ঠিকই বলেছেন নেতাজী। আগে স্বাধীনতা, তারপর অন্য কথা। নামী ব্যবসায়ী করিম গণিও কম গেলেন না। তিনিও ফকির সাজলেন সুভাষের ডাক শুনে।

আর সর্বস্ব দিলেন বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার চৌধুরী এবং শ্রীমতী জ্যোৎস্না চৌধুরী। অলঙ্কার এবং নগদ অর্থ মিলিয়ে মোট আটচল্লিশ লক্ষ টাকা। নেতাজী বলেছেন যে! দিতে হবে না!

সব দিয়ে-থুয়ে আজ এই দম্পতি নিঃস্ব, হৃতসর্বস্ব। সাধারণভাবে বেঁচে থাকার মত সম্বলটুকুও আজ তাঁদের নেই। কোন দুঃখ নেই। ক্ষোভও কিছুমাত্র নেই। নেতাজী সর্বস্ব দিয়ে ফকির সাজতে বলেছিলেন—ফকিরই সেজেছেন। তার জন্য দুঃখ কিসের!

একইভাবে বিখ্যাত এঞ্জিনিয়ার বি. ঘোষ তাঁর সর্বস্ব তুলে দিলেন সুভাষের হাতে। সঙ্গে তাঁর নিজস্ব কারখানাটিও।

বিখ্যাত একজন ব্যবসায়ীর স্ত্রী শ্রীমতী হীরাবাঈ বেতাইও পিছিয়ে

রইলেন না। তিনিও তাঁর নিজস্ব বলতে যা কিছু সবই তুলে দিলেন দেশের জন্য।

সাড়া দিলেন নিজামি সাহেবও। তিনি দিলেন সাতাশ লক্ষ টাকা। আর বাসির আমেদ? তিনিও বিভিন্ন কিস্তিতে দান করলেন বহু লক্ষ টাকা। এক বর্মা থেকেই পাওয়া গেল মোট পঁচিশ কোটি টাকা। তা ছাড়া এখানে-ওখানে তো আছেই।

রবার বাগানের এক-চতুর্থাংশ শেয়ার দান করলেন পেরাকের উত্তম সিং। স্বাধীনতা-সংগ্রামের সেই মহোৎসবে কেউ কারো চাইতে পিছিয়ে থাকতে রাজী নন। বাগান গেলে বাগান হবে, কিন্তু এ সুযোগ তো আর দ্বিতীয়বার আসবে না!

কুয়ালালামপুরের এক জনসভায় মিনিট কয়েকের মধ্যে সংগৃহীত হল সত্তর লক্ষ ডলার। দিতে হবে না! নেতাজী সর্বস্ব দিতে বলেছেন যে!

মল্লিকা, ত্রিশ বছর বাদে এ কাহিনী লিখতে গিয়ে বার বার একটা প্রশ্ন আমার মনে জাগছে। প্রশ্নটা হল—ভালবাসার সংজ্ঞা কি? মানুষ মানুষকে কতখানি ভালবাসতে পারে? কতখানি শ্রদ্ধা করতে পারে?

সেদিন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ত্রিশ লক্ষ লোক নরনারী যেভাবে সুভাষকে ভালবেসে তাঁদের যথাসর্বস্ব তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন, জাগতিক সংসারে এর চাইতে বেশি কেউ কাউকে ভালবাসতে পেরেছে কি?

ছেলেবেলায় শোনা একটা গানের কয়েকটি কথা মনে পড়ে—'ডাকার মত ডাকলে পরে, পাষাণেরও অশ্রু ঝরে'। এ যেন ঠিক সেই ডাক। এ ডাক একবার যে শুনেছে, সে-ই মজেছে। পতঙ্গের মত উড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে তাকে পড়তেই হবে।

মেয়েদের কথাই ধরো। মেয়েরা অলঙ্কার ভালবাসে একথা কে না জানে! কিন্তু খুব কম অলঙ্কারই বোধহয় সেদিন অবশিষ্ট ছিল ওখানকার মেয়েদের গায়ে। এক-এক করে প্রায় সবই তাঁরা খুলে দিয়েছিলেন তাঁদের একান্ত প্রিয় নেতাজীর হাতে। কে-কি-কেন কোন প্রশ্ন নেই। নেতাজী বলেছেন, তাই তো যথেষ্ট।

বোধ হয় সবচাইতে বেশি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল সিঙ্গাপুরের বিত্তশালী চেট্টিয়া সম্প্রদায়। তাদের দাবী—নেতাজীকে একবার দয়া করে তাদের মন্দিরে যেতে হবে।

সুভাষ রাজী। ঠিক আছে, যাব। যে আমার ভাণ্ডার পূর্ণ করে দেবে, তার কাছে যেতে আমি সবসময়েই প্রস্তুত। তবে আমি একা নই। আমার সর্বধর্মীয় সহকর্মিগণও সঙ্গে যাবে।

কি সর্বনাশ! মাথায় হাত দিয়ে পড়ল চেট্টিয়া সম্প্রদায়। মুসলমান, খ্রীষ্টান, এরা কিনা ঢুকবে আমাদের হিন্দু-মন্দিরে! না, জাত-ধর্ম বিসর্জন দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

তাহলে আমার পক্ষেও যাওয়া সম্ভব নয়। সুভাষের সাফ জবাব, আমার কাছে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান সবাই এক। সবাই আমার ভাই।

সবাই ভারতবাসী। তাদের যেখানে প্রবেশাধিকার নেই, সেখানে আমিও যেতে অক্ষম।

সমস্ত সংস্কার, সমস্ত গোঁড়ামী ভুলে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাই মেনে নিল চেট্টিয়া সম্প্রদায়। তাই হোক নেতাজী, তাই হোক। তুমি সবাইকে নিয়ে এসো আমাদের মন্দিরে। হ্যাঁ, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান সবাইকে নিয়েই।

সেই প্রথম একটি ধর্ম-মন্দিরে সবাই প্রবেশ করল হাতে হাত মিলিয়ে।

এমন কি যে ঘরে একমাত্র ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কারো প্রবেশাধিকার নেই, সেখানে পর্যন্ত সেদিন সবার অবারিত দ্বার। পুরোহিত সবার কপালে চন্দন লেপে দিলেন সমানভাবে। সেখানে হিন্দু-মুসলমান বলে কোন প্রশ্নই নেই। সবাই এক। সবাই অভিন্ন। সবাই ভাই ভাই। 'এক জাতি এক প্রাণ' কথাটির এমন সার্থক রূপায়ণ আর কি হতে পারে বল?

'This was a very remarkable departure in the history of the temple. In due course Netaji went to the temple accompanied by his Muslim, Hindu, Sikh and Christian officers. They went not only into the inner courtyard of the temple where previously non-Hindus were not allowed to enter, but they even went close to the door of the sanctus sanctorum where only Brahmins could set their foot. This was an even more remarkable incident in the annals of temple.'

[India's Strugle for Freedom : Maj. Gen. A. C. Chatterjee : P.—148]

হ্যাঁ, ইতিহাসে সেই প্রথম। বোধহয় শেষও। কারণ, পরবর্তীকালে এমন কোন ঘটনা ঘটেছে বলে জানা যায়নি। কিন্তু কেন? পরাধীন যুগে যা সম্ভব হয়েছিল. আজ কেন তা সম্ভব নয়? তাহলে সেদিন সম্ভব হয়েছিল কি করে? কোন্ সোনার কাঠির স্পর্শে?

গল্প নয় মল্লিকা, রূপকথাও নয়। কালস্রোতে মানুষ সবকিছুই ভুলে যায়। কিন্তু ইতিহাস! হাজার চেষ্টা করলেও যে তাকে মুছে ফেলা যায় না।

সুভাষের এক-একটা গলার মালা, তাই নিয়েই তো কত প্রতিযোগিতা! কত কাড়াকাড়ি! এ যদি একলাখ বলে তো, অন্যজন হাঁক দেয় পাঁচলাখ। সব যায় তো যাক, তবু নেতাজীর ঐ মালাটা আমার চাই-ই।

সুভাষের গলার মালা নিয়ে যে সেদিন কিভাবে কাড়াকাড়ি সৃষ্টি হত. তার একটি মাত্র ঘটনার বিবরণ ঝাঁসির রাণী ডিটাচ্‌মেণ্টের কম্যাণ্ডার লেঃ মিস্ থিবার্সের 'বিদ্রোহী কন্যার রোজনামচা' গ্রন্থ থেকে তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি ঃ

"প্রথমে ডাক উঠল একলাখ টাকা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অঙ্ক বেড়ে সাতলাখে পেঁছল।

একটি ধনী পাঞ্জাবী যুবক প্রথম ডাক দিয়েছিল। যখন টাকা বেড়ে গিয়ে সওয়া চারলাখ হয়েছে, তখন সে চীৎকার করে বলল, 'পাঁচ লাখ'।

কিন্তু ডাক, যখন সাতলাখে পৌঁছল, তখন সে অত্যন্ত বিরক্ত হল। মনে মনে তার তখন আলোড়ন চলেছে। যেমনি মালাটা বিক্রি হল বলে ঘোষণা করা হবে, সেই সময় সে লাফিয়ে মঞ্চের উপর উঠে পড়ল। উঠে চীৎকার করে বলল, 'আমার যত অর্থ আছে, পাই পয়সা পর্যন্ত সব দেব।'

ছেলেটি তখন কাঁপছে। নেতাজী দুহাত দিয়ে তাকে ধরে বললেন, 'ঠিক আছে, মালা তোমারই রইল। আমার ফৌজ যুদ্ধ করে তোমার মত দেশ-প্রেমিকের মাথায় গৌরবের মুকুট পরিয়ে দেবে।'

ছেলেটির সেদিকে কান ছিল না। সে মালাটি নিয়ে তার মুখে, চোখে, বুকে রাখছিল। সে বলে উঠল, 'আমার নিজের কিছু রইল না, এখন আমি ফৌজে ভর্তি হব। দেশের মুক্তির জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করব।'

এ ছেলেটি কি অকেজো ধনী লোকদেরই একজন, না অন্য কেউ? নেতাজী যথার্থই তাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। এতদিনে হয়তো ফুলের মালাটি শুকিয়ে গিয়ে থাকবে। ফুলগুলো নিশ্চয় ঝরে গেছে, হয়তো মৃত্যুর নিশ্বাস মালাটির চারদিকে ঘিরে রয়েছে। এই ছেলেটির ভাগ্যের মত, কালকেই হয়তো ফুলগুলো একই পথের পথিক হবে।

ছেলেটি কিন্তু আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। যখন সে মালাটি নিয়ে চলে গেল, তখন যেন তার চোখদুটি এক অপূর্ব আলোকে ঝলমল করছিল।"

সর্বত্র একই ব্যাপার। একবার গিয়ে সভামঞ্চে দাঁড়ালেই, ব্যস। অমনি কাড়াকাড়ি পড়ে গেল নিজেদের মধ্যে। দেখি কে কত বেশি দিতে পারে নেতাজীকে! না দেওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই। স্বস্তি নেই। ঘুমও বুঝি নেই।

সুভাষ তখন সাইগনে। মুখে তাঁর সেই একই ডাক। সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য সর্বকিছু দিতে হবে। এ স্বাধীনতা তোমার-আমার-সবার। তার জন্য অর্থ দিতে হবে। স্বাধীনতার জন্য তাও যে যথেষ্ট নয়। সব—সব—সর্বস্ব দিতে হবে।

'That is what I want you all to do. Give up your all for India's freedom, and become beggars, and if that is not enough, give up your lives too. Even that is not too much of a sacrifice.'

সেদিন কি ভেবে বিশ বছরের একটি সিন্ধি যুবক সুভাষের আস্তানায় গিয়ে হাজির। চোখে-মুখে তার স্পষ্ট দ্বিধার ছাপ। না, সে কিছু চায় না। শুধু একপলকের জন্য একটু দর্শন চায় নেতাজীর।

রাজী হলেন সুভাষ। ঠিক আছে, ওকে আসতে দাও আমার কাছে। দেখা যাক কি বলে!

না, কিছুই বলতে আসেনি সে। শুধু একপলকের জন্য দেখতে এসেছে। আর প্রণামী হিসেবে সঙ্গে নিয়ে এসেছে ওখানকার মুদ্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার একটি চেক। নেতাজী চেকটি গ্রহণ করলে সে ধন্য হবে। শুধু এইটুকুই তার সাধ।

কে এই যুবক! কি ওর পরিচয়! না, কেউ তা জানে না। নিঃশব্দে এসে আবার নিঃশব্দেই একসময়ে সে হারিয়ে গেছে জনারণ্যের মাঝে।

মল্লিকা, আজ আমাদের কোথাও কিছু দিতে হলে সর্বাগ্রে সাক্ষী রাখতে হয় একজন ফটোগ্রাফারকে। তারপর পত্র-পত্রিকার প্রচার। ভাবটা এই যে, লোকেই যদি না জানতে পারল, তাহলে আমার দান করে লাভ কি? দশজনে দেখবে—তবেই না!

ওরা কিন্তু তা চায়নি মল্লিকা। তাই ওদের অধিকাংশ কাহিনীই অজ্ঞাত রয়ে গেছে দেশবাসীর কাছে। যেমন এই সিন্ধি যুবকটি। একেবারেই সে মুছে গেছে ইতিহাসের পাতা থেকে।

নিজেও সে তাই চেয়েছিল সুভাষের কাছে। কেউ যেন কোনদিন জানতে না পারে এই দানের কথা। একজন অজ্ঞাতপরিচয় ভারতবাসী হিসেবেই আমি বেঁচে থাকতে চাই সবার মাঝে। না, এ ছাড়া আর কিছুই চাইবার নেই তার।

'He wanted to remain unknown. Although it was not mentioned on official records, this became known by any by to the public...it was greatly appreciated.'

[Maj. Gen. A. C. Chatterjee.]

ব্যতিক্রমও ছিল। যেমন কিছু-সংখ্যক অতিলোভী মুনাফাশিকারীর দল। তাদের তো তখন সোনায় সোহাগা। যুদ্ধের এই ডামাডোলে যত ইচ্ছা মুনাফা লুটে নেওয়া যাক।

আজ এদের রাজত্ব চলছে ভারতবর্ষের সর্বত্র। দেখে-শুনে মনে হয়, এরা যেভাবে দেশকে চালাতে চাইছে, সেইভাবেই যেন দেশ চলছে। কি সরকার, কি জনসাধারণ, সবাই যেন এ ব্যাপারে অসহায় দর্শক মাত্র।

সুভাষ কিন্তু তাদের ছেড়ে কথা বলেননি মল্লিকা! তাঁর সাফ কথা—এসব আমি বরদাস্ত করব না। বাইরে ভারতবাসী সেজে অবস্থার সুযোগ নিয়ে যা খুশি তাই করবে, তা আমি হতে দেব না। মোট সম্পত্তির শতকরা দশভাগ দেশের জন্য তোমাদের দিতেই হবে। অন্যথায় আমাকে তখন অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। নিজেদের বেশি চালাক মনে করো না যেন। তাহলে ভুল করবে।

'You claim to be Indians only for the purpose of making money. This will not do. Come forward voluntarily to do your duty by India; if you fail to do so I shall take money from you by imposing a levy. Whatever happens, I am determined to see that a handful of wealthy Indians do not set a bad example to other rich Indians and to the masses. Do not run away with the idea that you are too clever.'

'আমি এক কথা দুবার বলিনে। একদিন ইংরেজ আমাকে বন্দী করে রেখেছিল মান্দালয় জেলে। আজ ওদেরই ওখানে দিন কাটাতে হচ্ছে বন্দী অবস্থায়। বুঝে-সুঝে না চললে তোমাদেরও স্থান হবে ঐ মান্দালয় জেলেরই অভ্যন্তরে।'

'Either you are with us or you are a friend of the British. If the later, then there is only one place for you for the duration, that is, the prison; it would be a shame if in your greed and selfishness you would rather not be considered as Indians'.

ব্যস, ঐ একটি কথাই যথেষ্ট। তারপরই তারা সুড়-সুড় করে গিয়ে হাজির হয়েছিল ইণ্ডিয়ান লীগের হেড কোয়ার্টার্সে। না গিয়ে উপায় কি! মান্দালয় জেল যে ভীষণ ভয়ঙ্কর জায়গা!

সুভাষ একদিনেই পেরেছিলেন। আমরা পঁচিশ বছরেও তা পারিনি। তফাৎ এইখানেই।

সাধারণ মানুষও পিছিয়ে এল না। এবং তারাই ছিল সংখ্যায় বেশি। সবাই যেন সেদিন পাগল হয়ে গিয়েছিল সুভাষের সেই ডাক শুনে। সর্বস্ব দিতে হবে। সর্বস্ব না দেওয়া পর্যন্ত কিছুতেই যেন শান্তি নেই।

পেনাং-এর একটি ঘটনা। ডাক শুনে এগিয়ে গেল অল্পবয়সী একটি কিশোর ভৃত্য। হাতে তার একটি সামান্য ফুলদানী। এটাই তার শেষ সম্বল। মায়ের দেওয়া এই ফুলদানীটা ছাড়া নেতাজীকে দেবার মত আর কিছুই তার অবশিষ্ট নেই।

তক্ষুণি ফুলদানীটাকে নিলাম ডাকলেন সুভাষ। মায়ের দেওয়া শেষ-চিহ্ন। সে হিসেবে এর মূল্য অপরিসীম। এর বিনিময়ে অন্ততঃ পঁচিশ হাজার ডলার আমার চাই। বল কে নেবে?

আমি নেবো! আমি নেবো! বহু দাবীদার উঠে দাঁড়ান একসঙ্গে। কিন্তু না, হল না। ততক্ষণে আর একজন হাঁক দিয়েছে—পঞ্চাশ হাজার ডলার।

কি, পঞ্চাশ হাজার ডলার? আমি দেবো পুরো এক লাখ! শেষ পর্যন্ত ফুলদানীটা বিক্রি হল এক লক্ষ পঁচিশ হাজার ডলারে।

বিপদে পড়তে হয়েছিল ব্যাঙ্কক-প্রবাসী বিহার ও উত্তরপ্রদেশের সহজ সরল গোয়ালা সম্প্রদায়কে নিয়ে। নেতাজী সব দিতে বলেছেন, সুতরাং সবই দিতে হবে। কোন কিছুই অবশিষ্ট রাখলে চলবে না। তাহলে নেতাজীর কথা অমান্য করা হবে যে!

এমনি একদিনের কথা। সুভাষ তখন ব্যাঙ্ককে। ডাক শুনে প্রথমেই এগিয়ে এল সহজ সরল একটি গোয়ালা। পকেটে তার দুশো ডলারের নোট। এই তার শেষ সম্বল। এমন কি কাল সে কি খাবে, তারও কোনও ব্যবস্থা নেই।

বাধা দিলেন মেজর জেনারেল চ্যাটার্জী। একশো ডলার তুমি রেখে দাও ভাই। নইলে তোমারই বা চলবে কি করে?

স্পষ্ট অনিচ্ছার ছাপ ফুটে উঠল লোকটির চোখে-মুখে। তা কি করে হবে! নেতাজী সর্বস্ব দিতে বলেছেন যে!

বোঝাতে চেষ্টা করলেন জেনারেল চ্যাটার্জী। তোমার নিজের দিকটাও

দেখতে হবে তো। ঠিক আছে, এতই যখন ইচ্ছে, তখন বিশ ডলার নিজের কাছে রেখে বাকিটা বরং জমা দাও।

তখনকার মত তাই মেনে নিল লোকটি। সত্যিই তো। সবটা দিলে তারই বা চলবে কি করে? না, ঐ একশো আশী ডলার দেওয়াই ভাল। বাকী বিশ ডলার বরং নিজের কাছেই থাক।

কিন্তু তা আর কতক্ষণ! যেই না সুভাষ তাঁর ভাষণে আর একবার বলেছেন—'সর্বস্ব দাও', অমনি সে সামনের দিকে ছুটে গেল সেই বিশ ডলার হাতে নিয়ে। সারা মুখে তার গভীর প্রশান্তি। নেতাজী সর্বস্ব দিতে বলেছেন। ব্যস, তার ওপর আর কোন কথাই থাকতে পারে না।

ওদিকে ততক্ষণে লাইন পড়ে গেছে গোয়ালা সম্প্রদায়ের। সবার হাতে পুরনো তেল-চিটচিটে পাস-বই। এগুলো নেতাজীর হাতে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত কিছুতেই যেন স্বস্তি নেই তাদের।

পাস-বই জমা দিয়ে এক সময়ে তারা ফিরে গেল নিজের ঘরে। সারা মুখে তাদের নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবনের স্বচ্ছ সরল হাসি। নেতাজী সর্বস্ব দিতে বলেছেন। সর্বস্বই তারা দিয়েছে। ব্যস, ঝামেলা মিটে গেল।

কিন্তু একি! দেখা গেল পরদিনই আবার এসে তারা ভীড় করেছে লাইন দিয়ে। সারা মুখে তাদের অপরাধ বোধের গ্লানি। দেখে মনে হয়, কি যেন তারা একটা অপরাধ করে ফেলেছে নিজেদের অজ্ঞাতে।

সত্যিই অপরাধ। নেতাজী সর্বস্ব দিতে বলেছেন। কাল টাকা-পয়সা সব দিলেও গরু-মোষগুলোর কথা একদম মনে হয়নি। তাই আজ ওগুলো সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে নেতাজীকে দেবে বলে।

বিস্ময়ের ধাক্কায় ছিট্‌কে পড়লেন জেনারেল চ্যাটার্জী। সঙ্গে ওদের অসংখ্য গরু-মোষ! হাজার হাজার!

বোঝাতে চেষ্টা করলেন জেনারেল চ্যাটার্জী। নানাভাবে। এসব দরকার নেই ভাই। তোমরা এগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

তা কি করে সম্ভব! ওরা অবাক। এগুলো না হলে সর্বস্ব হবে কি করে! তাহলে নেতাজীর কথা অমান্য করা হবে যে!

বাধ্য হয়েই রাজী হতে হল সুভাষকে। তাছাড়া উপায় কি! ওদের ভালবাসার দান কি অস্বীকার করা চলে! তাহলে ওরা মনে মনে আহত হবে যে! ভালই হল! এগুলো থেকে যা দুধ পাওয়া যাবে, সব জওয়ান ভাইদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ওদেরই তো সর্বাগ্রে সুস্থ থাকা দরকার।

'I would like specially to mention the gift of the goalas (milkmen) belonging to U. P. and Bihar, who donated all their cattle which sometimes fetched several thousand dollars per head, and then enlisted themselves as volunteers in the I. N. A.' [Maj. Gen. Chatterjee]

পরবর্তীকালেও কিন্তু এই গোয়ালাদের নিয়ে মজা কম হয়নি মল্লিকা। যুদ্ধশেষে ব্রিটিশ কম্যান্ডার ফিনলের সে কি চোটপাট ওদের ওপর! কেন তোমরা সুভাষ বোসকে সবকিছু দিয়েছ বল?

—কি করব সাহেব! ওদের হয়ে মুখ কাঁচুমাচু করে জবাব দিল একজন, নেতাজী দিতে বললেন যে!

—বললেই দিতে হবে? আরো রেগে গেলেন কম্যান্ডার ফিনলে, চুপ করে রইলে কেন? জবাব দাও!

—বাঃ! আমরা কী জানি! সেই একই জবাব ওদের, নেতাজী দিতে বললেন যে!

—ইডিয়ট! এবার বোমার মত ফেটে পড়লেন ফিনলে, চাইলেই যে দিতে হবে তার কি মানে আছে?

—তুমি কি করে বুঝবে সাহেব? তুমি তো আর নেতাজীর ডাক শোননি! ও ডাক শুনলে তুমিও সব দিয়ে দিতে।

সামান্য ভিখারীও পিছিয়ে থাকেনি। ডাক শুনে সে-ও তার যথাসর্বস্ব সেদিন তুলে দিয়েছিল নেতাজীর হাতে। মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খানের মুখ থেকেই বরং সে কাহিনী শোনা যাক ঃ

'সবাই লাইন দিয়ে নেতাজীর সামনে এসে টাকা দিয়ে যেতে লাগলেন। বেশ মোটা টাকাই দিচ্ছিলেন সবাই। হঠাৎ দেখি, একটি নিঃস্ব স্ত্রীলোক মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে। পরনে তার শতছিন্ন বস্ত্র, মাথায় কাপড়ও জোটেনি। আমরা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

তিনটি টাকা সে নেতাজীর সামনে এগিয়ে দিল। নেতাজী বেশ বিব্রত—দ্বিধা ও কুণ্ঠায় জড়সড়। করুণভাবে বলল স্ত্রীলোকটি—এই আমার যথাসর্বস্ব। আর কিছু নেই।

দেখতে দেখতে নেতাজীর দুচোখ জলে ভরে এল। তারপরই তিনি টাকা তিনটি গ্রহণ করলেন হাত বাড়িয়ে।

আমার জিজ্ঞাসার জবাবে পরে নেতাজী আমাকে বলেছিলেন—আমি বুঝেছিলাম, ঐ ওর যথাসর্বস্ব। ও টাকা আমি নিলে পরে ওকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হবে। কিন্তু দেশের স্বাধীনতার জন্য ওর যা কিছু ছিল, সব দিতে এসেছে। ওকে প্রত্যাখ্যান করে ওর মনে আমি দুঃখ দেব কি করে? আমার কাছে লক্ষ লক্ষ টাকার চাইতে ওর ঐ তিনটি টাকার মূল্য যে অনেক বেশি!'

মল্লিকা, এ সবই কি মিথ্যে? সবই কি অর্থহীন? সবই কি ভাবপ্রবণ মনের উচ্ছ্বাস মাত্র? নইলে কেন ওরা সেদিন ওদের যথাসর্বস্ব তুলে দিয়েছিল সুভাষের হাতে? কোন্ বিশ্বাসে?

উত্তর পাবে মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খানের তখনকার সময়ের কয়েকটি কথার মধ্যে ঃ

'এ সবই তিনি পেয়েছিলেন তাঁর মহান চরিত্র, অতুলনীয় সাহস ও অনন্যসাধারণ উদারতার গুণে। লোকে তাঁকে হৃদয়ের পূজা দিয়েছে, প্রীতি দিয়েছে, দেবতা জ্ঞানে নয়, তাঁর মধ্যে সত্যিকার মানুষ, বীর, বন্ধু ও সাথীর দেখা পেয়েছে বলে।'

১৭ই অক্টোবর ফিলিপাইনের স্বাধীনতা উৎসব।

'এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য'—জাপান তার এই প্রতিশ্রুতি রেখেছে। প্রথমে মালয়, তারপর বর্মা, ঠিক তার আড়াই মাস পরেই এল ফিলিপাইনের স্বাধীনতা উৎসব। দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছর আমেরিকার দখলে থাকার পরে ফিলিপাইন এবার স্বাধীন, মুক্ত।

এ উপলক্ষে একটি সময়োচিত ভাষণ প্রচার করলেন সুভাষ। ফিলিপাইনের এই স্বাধীনতা আমাদের আটত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে নতুন করে সংগ্রামের প্রেরণা দেবে। আমি আমার ফিলিপাইন ভাইদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর অভিনন্দন জানাচ্ছি নব-নির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট ডঃ জোস পি. লরেলকে।

'Today is a red-letter day in the annals of the Philippines. Today, 18 million Philippinis will regain the complete independence of their Republic which America robbed forty-two years ago...

I heartily congratulate Dr. Jose Laurel on his election as the first President of the Philippine Republic and Mr. Jorge Vargas on the achievement of the goal for which he has toiled night and day since the outbreak of the Greater East Asia War.'

সবশেষে রাজধানী ম্যানিলার সমুদ্রোপকূলে লুনেটা পার্কে ফিলিপাইনের শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক শহীদ জোস্ রিজলের মর্মর-মূর্তিতে মাল্যদান।

সে কি মর্মস্পর্শী দৃশ্য! চারিদিকে হাজার হাজার জনতা। বেশির ভাগই ভারতীয়। সুভাষকে দেখেই তারা ধ্বনি তুলল—জয় হিন্দ্! নেতাজী জিন্দাবাদ! চলো দিল্লী!

কোন চেতনা নেই সুভাষের। সবকিছু ভুলে গিয়ে সেই একই ভাবে তিনি নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন জোস্ রিজলের মর্মর-মূর্তির দিকে। অমর শহীদ, তোমাকে অসংখ্য প্রণাম। আজ তোমার মাতৃভূমি ফিলিপাইন স্বাধীন, মুক্ত। কিন্তু ভারত! ভারত কবে স্বাধীনতা উৎসব পালন করবে এমনি করে?

না, আর দেরী নয়। ফিরে এসেই তার প্রস্তুতির জন্য একেবারে উঠে-পড়ে লাগলেন সুভাষ। প্রত্যক্ষদর্শী আয়ার সাহেবের মুখ থেকে বরং তার বিবরণ কিছুটা শোনা যাক ঃ

'রাত্রির খাবার শেষ করে পাশের ঘরে চলে গেলাম। টাইপ-রাইটার এবং কাগজপত্র প্রস্তুত। কখন ডাক আসবে কে জানে! বেশ ঘুম পাচ্ছিল। ভাবলাম,—মেসে গিয়ে পোশাক-পরিচ্ছদ পালটে শুয়ে পড়ি। ঠিক তখনই ডাক এল।

রাত তখন দ্বিপ্রহর। চুপচাপ বসে আছি। নেতাজীর হাতে এক গোছা সাদা কাগজ। তারপরই শুরু হল তাঁর লেখা। একবারও কাগজ

থেকে চোখ উঠল না। একটা শেষ হলেই আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে আবার হাতে তুলে নেন নতুন কাগজ।

পাশের ঘরে গিয়ে টাইপ-রাইটার নিয়ে বসলাম। এবার আবিদ হাসান এবং স্বামী পালা করে এক-একটা কাগজ দিয়ে যেতে লাগল আমার ঘরে।

একবারও নেতাজী আগের পাতা দেখতে চাইলেন না। সামঞ্জস্য রইল কিনা সে প্রশ্নও তাঁর মনে এল না। কোন শুদ্ধিরও প্রয়োজন মনে করলেন না। কমা বা সেমিকোলন বদলানোর কথাও ভেবে দেখলেন না।

গোটা ঘোষণাপত্রটাই তিনি লিখে গেলেন একটানা। একবারও চিন্তা করলেন না। একবারও থামলেন না। যেন সেই ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র এবং একটা চিঠি লেখার মধ্যে কোনই তফাৎ নেই। দুটোই যেন তাঁর কাছে অতি সহজ ও সাধারণ ব্যাপার।

টাইপ শেষ করে নেতাজীর কাছে গেলাম। কাগজগুলো সরিয়ে রেখে সহসা দুষ্টুমির হাসি হেসে তিনি বললেন,— কে কে মন্ত্রী হবে জানতে ইচ্ছে করে না?

—না, স্যার। সপ্রতিভভাবে জবাব দিলাম আমি।

—বেশ, তাহলে কালই জানতে পারবে।

তখন ভোর ছ'টা বাজে প্রায়। দুপুর রাত পর্যন্ত মাঝে মাঝেই তিনি কফি খাচ্ছিলেন। এবার আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বিছানার দিকে গেলেন। আমিও কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে তখনকার মত ফিরে গেলাম।

সন্ধ্যায় আবার আমার ডাক পড়ল। সেদিন ছিল ২০শে অক্টোবর। চারিদিকে একটা চাপা উত্তেজনা। অনেকেই আসছেন এবং যাচ্ছেন। রাত্রির খাওয়া শেষ হতেই অতিথিরা বিদায় নিলেন। নেতাজী আমাকে নিয়ে ওপরে গেলেন। তারপর কাগজগুলো আমার হাতে তুলে দিয়ে নির্দেশ দিলেন—এগুলো যেন বেশি করে ছাপিয়ে ভোরেই লীগের হেড্-কোয়ার্টার্সে পৌঁছে দেওয়া হয়।

দেখলাম কাগজের ফাঁকা জায়গাটাতে বসান রয়েছে মন্ত্রীদের নাম। বললেন—কি, ঠিক হয়নি?

উল্লেখযোগ্য যে, নামগুলোর মধ্যে একটা ছিল আমার নাম—এস. এ. আয়ার, মন্ত্রী, প্রচার বিভাগ।'

এলো ২১শে অক্টোবর। ১৯৪৩ সালের ঐতিহাসিক ২১শে অক্টোবর।

নিজস্ব সেনাবাহিনী আগেই গঠিত হয়েছিল। বাকী ছিল অস্থায়ী সরকার গঠন। আজ সেই পুণ্য দিন।

বোধ হয় গোটা দক্ষিণ এশিয়া ভেঙে সেদিন সমস্ত নরনারী এসে জড় হয়েছিল সিঙ্গাপুরের "দাই-তোয়া গেকিজো"তে। তা ছাড়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ তো আছেনই।

বিরাট সাজানো গোছানো মণ্ডপ। চারিদিকে অসংখ্য পুষ্পস্তবক এবং রাশি রাশি ফেস্টুন। ঠিক পেছনেই গান্ধীজীর মস্ত বড় একটি তৈলচিত্র। সর্বশীর্ষে ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা।

সর্বাধিনায়কের পোশাকে সজ্জিত হয়ে সুভাষ এলেন সকাল ঠিক সাড়ে দশটায়। সারা মনে সেদিন তাঁর একটা কূলপ্লাবী আনন্দ। একটা বিপুল পরিতৃপ্তি। বুঝি এমনি একটা লগ্নের আশায়ই তিনি উন্মুখ হয়ে ছিলেন সারাজীবন।

রুদ্ধশ্বাসে প্রহর গুনতে লাগল হাজার হাজার ভারতীয় নরনারী। আজ থেকে আমাদের সরকার আলাদা। আইন-কানুন আলাদা। আমাদের ভালমন্দ সবকিছুর দায়-দায়িত্ব আজ থেকে এই জাতীয় সরকারের। এ সরকার আমাদের নিজস্ব সরকার। নেতাজী তার সর্বাধিনায়ক।

কিন্তু কখন আমরা নেতাজীর মুখ থেকে শুনতে পাব সেই যুগান্তকারী ঘোষণা? কখন শপথ গ্রহণ করবেন তিনি? আর কত দেরী?

একটু বাদেই উঠে দাঁড়ালেন সুভাষ। চোখে তাঁর সুদূর-প্রসারিত দৃষ্টি। বেশ বোঝা যায়, ভেতরে ভেতরে তাঁর কিসের যেন একটা আলোড়ন চলেছে। অব্যক্ত বোবা আলোড়ন।

"ভগবানের নামে, ভারতবর্ষ এবং আমার আটত্রিশ কোটি দেশবাসীর মুক্তির জন্য, আমি সুভাষচন্দ্র বসু, এই পবিত্র শপথ করছি যে, আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি এই সংগ্রাম চালিয়ে যাব।"

কিন্তু একি! একি! একি! নিমেষে চঞ্চল হয়ে উঠল হাজার হাজার নরনারী। নেতাজী থেমে গেলেন কেন? কি হল?

কে জবাব দেবে! একটা রুদ্ধ আবেগকে চাপতে গিয়ে সুভাষের কণ্ঠ তখন স্তব্ধ হয়ে গেছে। চোখের কোল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়।

জীবনে দুটো স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। এক—ভারতবর্ষের একটি নিজস্ব সেনাবাহিনী, যার প্রাথমিক পর্যায় ছিল—'বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স'। দুই—ভারতবর্ষের একটি স্বাধীন সরকার। আজ দুটোই তিনি পেয়েছেন ভগবানের আশীর্বাদে। এ আনন্দ প্রকাশের ভাষা নেই তাঁর।

আত্মসম্বরণ করে নিমেষেই আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন সুভাষ। বুঝি সেই মুহূর্তেই তাঁর চোখের সমস্ত দৃষ্টি জুড়ে ভেসে উঠল সর্বত্যাগী এক সাগ্নিক সন্ন্যাসীর ছবি। স্বামীজী! তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর স্বামীজী। আমি যেন এই গুরু-দায়িত্ব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হাসিমুখে বইতে পারি। তুমি আমাকে শক্তি দাও। আশীর্বাদ কর।

"ভারতের আটত্রিশ কোটি ভাইবোনের সেবায় আমি চিরকাল নিযুক্ত থাকব, এই হবে আমার জীবনের সবচাইতে বড় ব্রত। স্বাধীনতা লাভের পরেও সে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রয়োজন হলে আমার শেষ রক্তবিন্দু অবধি দিতে আমি প্রস্তুত।"

তারপর মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যদের একে একে শপথ গ্রহণ।

"ভগবানের নামে এই শপথ করছি যে, ভারতবর্ষ এবং আমার আটত্রিশ কোটি দেশবাসীর মুক্তির জন্য আমি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাসী থাকব, এবং এই সংগ্রামে আমার সর্বস্ব, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করতে প্রস্তুত থাকব।"

এবার কে-কি দায়িত্ব গ্রহণ করলেন শুনে নাও:

সুভাষচন্দ্র বসু: রাষ্ট্রনায়ক, প্রধানমন্ত্রী, সমর ও পররাষ্ট্র।

ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন: নারী সংগঠন।

এস. এ. আয়ার: প্রচার।

লেঃ কর্ণেল এ. সি. চ্যাটার্জী: অর্থ।

সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি: কর্ণেল জে. কে. ভোঁসলে ; লেঃ কর্ণেল আজিজ আহম্মদ ; লেঃ কর্ণেল ভগৎ ; লেঃ কর্ণেল গুলজারা সিং ; লেঃ কর্ণেল এম. জেড. কিয়ানী ; লেঃ কর্ণেল এ. ডি. লোগনাথন ; লেঃ কর্ণেল ঈশান কাদির এবং লেঃ কর্ণেল শাহনওয়াজ খান।

এ. এম. সহায়: সেক্রেটারী (মন্ত্রীর সম-মর্যাদাসহ)।

রাসবিহারী বসু: প্রধান উপদেষ্টা।

উপদেষ্টা: করিম গণি; দেবনাথ দাস; ডি. এম. খাঁ; এ. ইয়েলাপ্পা; জে. থিবি; সর্দার ঈশ্বর সিং।

এ. এন. সরকার: আইন-বিষয়ক পরামর্শদাতা।

ঘোষণাপত্রে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন সুভাষ: "সরকারের পক্ষ থেকে আমরা সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকার এবং ধর্মগত স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। বিদেশী সরকার সৃষ্ট সকল প্রকার ভেদনীতি দূর করে সবার সুখ-সমৃদ্ধি বিধান করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ভগবানের নামে, যে সব পরলোকগত বীর আমাদের জন্য বীরত্ব ও আত্মত্যাগের আদর্শ রেখে গেছেন, তাঁদের নামে সমস্ত ভারতবাসীকে আমাদের পতাকাতলে সমবেত হয়ে ভারতের মুক্তি-সমরে অস্ত্র ধারণের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। যতদিন পর্যন্ত ভারতভূমি থেকে শত্রু চিরদিনের মত বিতাড়িত না হবে, ততদিন অদম্য সাহস, চরম অধ্যবসায় এবং জয়লাভের পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে আমাদের এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

ভারতবর্ষের সমস্ত নেতা আজ কারারুদ্ধ। জনগণও নিরস্ত্র। এ অবস্থায় তাঁদের পক্ষে সেখানে কোন সরকার গঠন করে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই সে দায়িত্ব নিতে হবে আমাদেরই। চরম আত্মত্যাগের জন্য আপনারা সবাই প্রস্তুত হোন। সংগ্রাম আসন্ন। জয় হিন্দ্!"

জয় হিন্দ্! জয় হিন্দ্! জয় হিন্দ্! বজ্র নির্ঘোষে কাঁপতে লাগল গোটা সিঙ্গাপুর। নেতাজী জিন্দাবাদ! চলো দিল্লী! চলো দিল্লী! চলো দিল্লী!

সর্বস্ব দিয়েছি। আর কি দিতে পারি! প্রাণ! রক্ত! হ্যাঁ, তাও দেব। রক্তে রক্তে পথ পিচ্ছিল করে দেব। সেই রক্তঝরা পিচ্ছিল পথেই আমরা এগিয়ে যাব সবাই মিলে। জয় আমাদের হবেই।

২১শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ্ সরকার গঠিত হল আনুষ্ঠানিকভাবে।

২৩শে অক্টোবর প্রথমেই স্বীকৃতি দিল জাপান। হ্যাঁ, আজাদ হিন্দ্ সরকার সম্পূর্ণ বৈধ সরকার। আমরা সানন্দে স্বীকৃতি দিচ্ছি এই সরকারকে।

'The Provisional Government of Free India, having been establishment with Mr. Subhas Chandra Bose as the Head,

the Nippon Government in its firm belief that it is a great forward step toward the realization of an independent India for which the Indian people have long aspired, has recognized it as the Provisional Government of Free India and hereby declares its intention to extend every possible co-operation and support in the Provisional Government's efforts to attain its object.'

সেই সঙ্গে অভিনন্দন-বার্তা পাঠালেন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো ঃ

'Your Excellency :—I have the honour of sending you my hearty congratulations on the establishment of the Pro visional Government of Azad Hind which has been Your Excellency's long cherished desire and thereby dashing for- ward to expel the British influence to attain the everlasting prosperity of India. The Nippon Government is firmly deter- mined to render every possible co-operation to your Government.'

আর সেই জাপ-ভারত সাহায্য সংস্থা 'হিকারী কিকান'! একদিন সুভাষের মুখে স্বাধীন সরকার গঠনের কথা শুনে যাঁরা মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, সেই হিকারী কিকানের কি হল?

না, আর কোন কথা নেই তাদের মুখে। কিন্তু কেন? উত্তর দিয়েছেন শত্রুপক্ষের মুখপাত্র হিউ-টয়।

'জাপানীরা সাহসীকে তারিফ করে। তারা লক্ষ্য করেছিল যে, সুভাষ- চন্দ্রের যথেষ্ট সাহস আছে।...সুভাষচন্দ্র কখনও তাদের পরোয়া করেননি। বরং মাঝে মাঝেই উপেক্ষা করেছেন। অধিকারের ব্যাপারে সামান্য এদিক- ওদিক হলে সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে গর্জে উঠতেন, তাতে সবাই তাঁকে সমীহ করতেন। একদিন জেনারেল ইসোদাকে এমন ধমক দিয়েছিলেন যে, তারপর থেকে জেনারেল ইসোদা তাঁকে দেখলেই জড়সড় হয়ে থাকতেন। শরীরে তাঁর ভয়-ডর বলতে কিছু ছিল না। মাথা উঁচু করে বোমাবর্ষণ বা বুলেটের সামনে দাঁড়াতে পারতেন। জাপানীদের হাত থেকে যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে তিনি তাঁর স্বাতন্ত্র্য বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।'

'The Japanese respected courage, and courage they certainly found in Bose. Bose showed no fear of them and some times little respect, indeed his readiness to quarrel with them over the slightest infringement of his rights was one of the pillars of his reputation. . .He treated Isoda to such a flow of invective that the General was never wholly at ease with him again.

There was no lack of physical courage, he could stand as straight as any under aerial bombs or bullets. He main-

tained a brave independence from the Japanese.'

[Hugh Toye : P.—105-107]

২৩শে অক্টোবর স্বীকৃতি দিল জাপান। এবার অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কে-কবে স্বীকৃতি দিল দেখা যাক।

২৪শে অক্টোবর স্বীকৃতি দিল—বর্মা। ২৭শে ক্রোটিয়া। ২৯শে জার্মানী। ১লা নভেম্বর মাঞ্চুকু।

একই দিনে স্বীকৃতি দিল চীনের নানকিং সরকার। ৯ই নভেম্বর ইতালী। তারপরে—ফিলিপাইন। সেই সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট লরেল-এর অভিনন্দন-বার্তা।

'The Philippine Government and people have learned with piofound gratification the establishment of the Provisional Government of Free India under your leadership in the firm belief that the freedom of India is essential to a new world order based on justice.

The Philippine Government is pleased to recognise your Government and sincerely hopes to see established a new free and independent India as befitting the race that has made one of the greatest contributions to human civilization.'

সবশেষে ১৯শে নভেম্বর স্বীকৃতি জানালেন থাইল্যাণ্ড সরকার।

সর্বোপরি সুদূর আয়ারল্যাণ্ড থেকে অভিনন্দন-বার্তা পাঠালেন ডি. ভ্যালেরা। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী ডি. ভ্যালেরা।

সুভাষ আত্মহারা। পৃথিবীর নয়টি রাষ্ট্র আজাদ হিন্দ্ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে, এটা নিঃসন্দেহে আনন্দের কথা। কিন্তু ডি. ভ্যালেরা! ঐতিহাসিক সিন্ ফিন্ আন্দোলনের প্রধান পুরোহিত ডি. ভ্যালেরা-প্রেরিত এই অভিনন্দন-বার্তার তুলনা কোথায়?

২২শে অক্টোবর ঐতিহাসিক ঝাঁসি রাণীবাহিনীর উদ্বোধন।

সুভাষের সৃষ্ট ঝাঁসি রাণীবাহিনীর কথা কে না জানে! কে না সেদিন শুনেছিল ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন. কর্ণেল সলীম, মিসেস চন্দ্রন, জেভিয়ার, হীরাবাঈ বেতাই, প্রতিমা পাল, বেলা দত্ত, এম. ভি. চিন্মাম্মু, জানকী থিবার্স প্রমুখ বীরাঙ্গনাদের কথা!

আজো সেই দেশ আছে। সেই মেয়েরা আছে। কিন্তু কোথায় লক্ষ্মী স্বামীনাথনের মত প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা দুঃসাহসী মেয়ে? কোথায় সেই বিপুল নারীসত্তা? আজ ওঁদের মত মেয়েরা ইতিহাসের কিংবদন্তী ছাড়া আর কিছুই নয়।

অবশ্য রাসবিহারীর সময়েই লীগে মহিলা শাখা বলে একটা বিভাগ ছিল, কিন্তু সেটা ছিল প্রধানতঃ নার্সিং এবং গঠনমূলক কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সুভাষের নির্দেশে সেই মেয়েরাই একদিন হয়ে উঠলেন ঐতিহাসিক ঝাঁসির রাণীর সার্থক উত্তরসাধিকা।

এ সম্বন্ধে সুভাষের বক্তব্য ছিল বরাবরই স্পষ্ট। কেন তোমরা পিছিয়ে থাকবে? না, শুধু সেবামূলক কাজের মধ্যেই তোমাদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। তোমাদেরও লড়াই করতে হবে। রক্ত দিতে হবে। সামনে কঠিন কঠোর সংগ্রামের দিন। সেখানে তোমাদের পূর্ণ সহযোগিতা না পেলে তো চলবে না ভাই।

তাছাড়া এ তো নতুন কিছু নয়। আমাদের অসহযোগ আন্দোলনে কত মেয়ে কারাবরণ করেছে। বাংলাদেশের কত মেয়ে অস্ত্রঝঙ্কারে শাসকদের বুক কাঁপিয়ে দিয়েছে। তাহলে তোমরাই বা পারবে না কেন? নিশ্চয়ই পারবে।

স্বাধীনতা কে না চায়! কে না ভালবাসে! তাই দেখতে দেখতে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান সব প্রদেশের মেয়েরাই একবাক্যে সাড়া দিল সুভাষের ডাকে। আমরাও প্রাণ দেব। রক্ত দেব। চলো দিল্লী! জয় হিন্দ্!

এবার ট্রেনিং। না, শাড়ি আর ঐ একরাশ চুল চলবে না। পুরোপুরি সামরিক পোশাক চাই। আর প্যারেড, কুচকাওয়াজ, বোমা, রাইফেল, বেয়নেট, মর্টার, মেসিনগান চালানো ইত্যাদি পূর্ণ সামরিক শিক্ষা নিতে হবে। সেই সঙ্গে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক শিক্ষা। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথনের ভাষায়:

"Jodhpur Breeches and Bush shirts were to be the uniform...most of the recruits sacrificed their long and beautiful tresses.

Training Programme was on the same lines as in the men's camp, viz...Physical training, infantry drill, rifle training and bayonet training, use of machine guns, mortars, morse code and signalling. Lectures were given in map reading, tactics, strategy etc. and also on Indian and world history.'

[Netaji Research Bureau Bulletin: 1965]

আর একটি নির্দেশ সুভাষের। ওঁরা আমাদেরই ঘরের মেয়ে। আমাদেরই বোন। দীর্ঘ দিনের সংস্কার চট্ করে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়, তাই ট্রেনিং-কালে কখনোই ওঁদের প্রতি রূঢ় হওয়া চলবে না। যদিও শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রায় একই, তবু ধীর স্থির ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে ওঁদের শিক্ষা দিতে হবে।

'No rude and uncourteous language must ever be used to reprimand a recruit and at no time should they forget that they were dealing with their sisters and must at all times guard their honour.'

সেই ঝাঁসি রাণীবাহিনী সুভাষ আজ উদ্বোধন করবেন আনুষ্ঠানিক-ভাবে। কিয়েল থেকে মাদাগাস্কারের পথে যেদিন তাঁর সাবমেরিন আক্রান্ত হয়েছিল, সেদিনও তিনি তন্ময় হয়ে ডুবে রয়েছিলেন এই ঝাঁসি রাণী-

বাহিনীর গঠনেরই পরিকল্পনা নিয়ে। সেই রাণীবাহিনী। তাঁর পার্ক-সার্কাস কংগ্রেস ময়দানের স্বপ্ন—রাণীবাহিনী।

যথাসময়ে সুভাষ এলেন তাঁর মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্যকে সংগে নিয়ে। তাছাড়া দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ তো আছেনই।

প্রথমে পতাকা উত্তোলন। তারপর ক্যাপ্টেন লক্ষ্মীর নেতৃত্বে পূর্ণ সামরিক কায়দায় রাণীবাহিনী কর্তৃক গার্ড-অফ-অনার প্রদর্শন। সেই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এবং দীপ্তভঙ্গী দেখে কে বলবে যে, ওরা অবলা মেয়ে? কে বলবে যে, কোন কষ্টসাধ্য কাজ ওদের দ্বারা করা সম্ভব নয়? বিশ্বাসই যেন হয় না।

তেমনি দীপ্তকণ্ঠেই মেয়েদের লক্ষ্য করে ভাষণ দিলেন সুভাষঃ

'পূর্ব এশিয়ায় ঝাঁসি রাণীবাহিনীর শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্বোধন নিঃসন্দেহে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

এই যুগ-সন্ধিক্ষণে আমি ঝাঁসির রাণী সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলব। তখন তাঁর বয়েস বিশ বছর মাত্র। সেই বয়েসে ঘোড়ায় চড়ে খোলা তরবারী হাতে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি যে সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তার তুলনা মেলা ভার।

প্রথমে তিনি ঝাঁসির দুর্গ থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। দুর্গের পতন হলে কাল্পী চলে যান। সেখানে গিয়ে আবার যুদ্ধ চালাতে থাকেন। তারপর তাঁতিয়া তোপির সংগে মিলে গোয়ালিয়র দুর্গ জয় করেন। পরে যুদ্ধ-ক্ষেত্রেই তাঁর মৃত্যু হয়। সে পরাজয় তাঁর একার নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের। তিনি চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর বীরত্বের কাহিনী এখনো লোপ পায়নি। তাঁর মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক ঝাঁসির রাণীই এখানে উপযুক্ত-ভাবে তৈরী হবে, এটাই আমি আশা করি আমার ভগ্নীদের কাছে। জয় হিন্দ্!'

২২শে অক্টোবর শেষ হল। এল ২৩শে অক্টোবর।

রাত তখন বারোটা বেজে পাঁচ। ঠিক তখনই একটা বলিষ্ঠ ঘোষণা শোনা গেল বেতার-তরংগে। আজাদ হিন্দ্ সরকারের পক্ষ থেকে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করছি ব্রিটিশ এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে।

যুদ্ধ! বুঝি ঘুম ভেঙে জেগে উঠল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্ত ভারতীয় নরনারী। কেউ কেউ কেঁদে ফেলল মনের আনন্দে। যুগ যুগ ব্যাপী দাসত্বের পরে এই প্রথম স্বাধীন ভারতের নামে যুদ্ধ ঘোষণা। নিজেকে যে ধরে রাখা দায়।

প্রায় সংগে সংগেই কয়েকটি বিদেশী বেতার-কেন্দ্র চেঁচিয়ে উঠল সমস্বরে—যুদ্ধ! যুদ্ধ! যুদ্ধ! আজাদ হিন্দ্ সরকার ব্রিটিশ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

হ্যাঁ, যুদ্ধ। পরদিন পাডাং ময়দানে পঞ্চাশ হাজার লোকের সামনে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন সুভাষ, আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছি

ব্রিটিশ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে। যাঁরা আমাদের সমর্থন করেন, তাঁরা হাত তুলুন।

খট্ খট্! হাজার হাজার জওয়ান তাদের সমর্থন জানাল রাইফেল তুলে। আর জনসমুদ্র! ততক্ষণে তারা বুঝি পাগল হয়ে গেছে সুভাষের কথা শুনে। শুধু হাত তুলেই শান্তি নেই। কাছে গিয়ে সমর্থন জানাতে হবে। সেই সঙ্গে একবার ভাল করে দেখতে হবে নেতাজীকে। একেবারে মঞ্চের কাছে গিয়ে। কার সাধ্য সেই দুরন্ত যৌবনকে রোধ করে! সে দৃশ্য যে না দেখেছে তাকে ঠিক বোঝানো যাবে না।

শুধু একবার মাত্র হাত তুললেন সুভাষ। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে যে যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল মন্ত্রমুগ্ধের মত। আর কোন কথা নয়। কোন ফিস্ ফিস্ আলাপ-আলোচনাও নয়। যেন একটা যাদুমন্ত্রে নিমেষে পাথর হয়ে গেছে সবাই।

'বন্ধুগণ, ব্রিটিশ খুব ভাল করেই জানে যে, আমি যখন কোন কথা বলি, তখন তার অর্থ একটাই হয়। মুখে এবং মনে চিরদিনই আমি এক ও অভিন্ন। তাই আমি যখন বলছি—'যুদ্ধ', তখন তার অর্থ—যুদ্ধই। এবং যতদিন ভারতবর্ষ স্বাধীন না হবে, ততদিন এ যুদ্ধ চলবে।'

'The British know very well that I say what I mean and that what I mean I say. So, when I say 'war', I mean war —war to the finish—a war that can only end in the Freedom of India.'

বুঝি উন্মাদ হয়ে গেল পঞ্চাশ হাজার নরনারী। নেতাজী! নেতাজী! নেতাজী! আমাদের নেতাজী! হ্যাঁ, এই তো চাই। এই তো হওয়া উচিত।

এ যুদ্ধ সেদিনই শেষ হবে, যেদিন আমরা দিল্লী জয় করব। চলো দিল্লী! চলো দিল্লী! চলো দিল্লী! উত্তেজনায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল কেউ কেউ। সেই অবস্থার মধ্যেও তাদের হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বলতে শোনা গেল—চলো দিল্লী! চলো দিল্লী! চলো দিল্লী!

সেই অবিস্মরণীয় ঘটনার কথা বলতে গিয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে স্মৃতিচারণ করেছেন ডঃ বা. ম.ঃ

'সুভাষচন্দ্র যখন ভারতের সংগ্রামের কথা বলতেন, শ্রোতাদের তখন মনে হত, তাঁরা যেন একটি মাত্র মানুষের কথা শুনছেন না, যেন সমগ্র জাতিই সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠে কথা বলছে, দীর্ঘ দিনের নিপীড়িত একটি জাতীয় শক্তি যেন অকস্মাৎ তাঁর কথার মধ্যে মুক্তি খুঁজে পেয়েছে।

একবার যদি তাঁর আবেগ কোনক্রমে ছাড়া পেত, তাহলে তৎক্ষণাৎ সেই শক্তির মূল চরিত্র লক্ষণ—চলিষ্ণুতা, আত্মত্যাগ, লক্ষ্যাভিমুখিতা—তাঁর কথার মধ্যে যেন মূর্ত হয়ে উঠত।'

ঝড় উঠেছে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে। উদ্দাম ঝড়। সবার কণ্ঠে একই সুর। সবার মনে একই গুঞ্জন। আর আলাপ-

আলোচনা নয়। একের পর এক বৈঠক বা দর-কষাকষিও নয়। ওসব অনেক হয়েছে। এবার চাই যুদ্ধ। হ্যাঁ, যুদ্ধ—যুদ্ধ—যুদ্ধ। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। হয় স্বাধীনতা অর্জন করব, নয়তো মরব। এর মাঝামাঝি কোন পথ আর আমরা মানতে রাজী নই।

'শক হুনদল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।'

সত্যিই সেদিন তাই হয়েছিল মল্লিকা। সবাই যেন সেদিন এক হয়ে মিশে গিয়েছিল এই একটি মাত্র মন্ত্রে।

এর আগে পর্যন্ত হিন্দু কোনদিন মুসলমানকে ভাই বলে এমন করে বুকে টেনে নিতে পারেনি। মুসলমানও কোনদিন পারেনি এমন সহজভাবে হিন্দু-মন্দিরে পা দিতে। সেই অসম্ভবও সেদিন সম্ভব হয়েছিল সুভাষের নেতৃত্বে।

এ ব্যাপারে সুভাষই প্রথম এবং শেষ। পরবর্তী কালে 'এক জাতি এক প্রাণ' কথাটির এমন সার্থক রূপায়ণ আর কোথাও ঘটেছে বলে শোনা যায়নি।

কারণ কি! কারণ, সুভাষ তাঁর চিন্তা এবং কাজে প্রমাণ করেছিলেন যে, ভারতবাসী সবাই এক ও অভিন্ন। সেখানে ফাঁকি বলতে কিছু নেই।

আমি হিন্দু—আমার ধর্ম আলাদা। তুমি মুসলমান—তোমার ধর্ম আলাদা। আর একজন খ্রীষ্টান—তার ধর্ম আলাদা। থাক না, তাতে কার কি ক্ষতি? ধর্ম—সে তো যার-যার ব্যক্তিগত ব্যাপার। দেশের মঙ্গলের প্রশ্নে ওসব ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ আসবে কেন?

'হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই'—একথা মুখে বলা যত সহজ, কাজের বেলায় মেনে নেওয়া বোধহয় তত সহজ নয়। তাহলে সুভাষের বেলায় সেদিন যা সম্ভব হয়েছিল, অন্যত্র তা সম্ভব হল না কেন? অথচ সুভাষ প্রতিটি পর্যায়ে প্রমাণ করেছিলেন যে, কাজটা মোটেই শক্ত নয়, বরং খুবই সোজা। তার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন কথায় ও কাজে এক হওয়া। নইলে দীর্ঘ দিনের সন্দেহ ও অবিশ্বাস ভুলে গিয়ে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান সবাই সেদিন একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছিল কিসের প্রেরণায়!

ঝাঁসির রাণীবাহিনীর কথাই ধরো। সব ধর্মের, সব জাতির মেয়েরাই তো সেদিন রাণীবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন দলে দলে। তামিল, তেলেগু, মালয়ী, বাঙালী, নেপালী, হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রীষ্টান—কেউ বাদ ছিল না।

কই, ধর্ম নিয়ে তো তাঁদের কারো মনে কোন প্রশ্ন জাগেনি! ছোঁয়াছুঁয়ির ফলে কারো জাত গেছে, এমন কথাও শোনা যায়নি। কি করে তাঁদের পক্ষে এতদিনকার সংস্কার ভুলে যাওয়া সম্ভব হল? কার প্রেরণায়? 'ঝাঁসির রাণীবাহিনীর ডায়েরী' থেকে একটি রাণীর বক্তব্য এখানে তুলে ধরা যাক:

'ঝাঁসি শিক্ষাকেন্দ্রে আমিষাশী নিরামিষাশী সকলে একসঙ্গে খেতে বসে। প্রথমে নিরামিষ খাবার দেওয়া হয়, তারপর যারা মাছ-মাংস খায়, তাদের তাই দেওয়া হয়। খাদ্যের বাছ-বিচার আমরা কঠিন হাতে দূর করেছি।

আগে এটা বড় সমস্যার বিষয় ছিল। স্বদেশ-প্রীতি আমাদের দৃষ্টি

নির্মল করেছে। ব্রিটিশের ভেদনীতি যাদের নষ্ট করেছে, তাদের এটা শেখা উচিত। যারা ক্রীতদাস, যাদের রাজনীতি জ্ঞান কিছুমাত্র নেই, মুক্তির কোন আগ্রহ নেই, সাম্প্রদায়িক মনোভাব থাকে কেবল তাদেরই।'

এবার সুভাষের সবচাইতে নিকটতম সহকর্মীদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নাও।

চিকিৎসক কর্ণেল রাজু, অন্ধ্রের অধিবাসী। এ্যাডজুট্যান্ট কর্ণেল রাওয়াৎ, গাড়োয়াল রাজ্যের লোক। এ. ডি. সি. ক্যাপ্টেন সমশের, পাঞ্জাবী। অন্য একজন গুর্খা।

গোয়েন্দা বিভাগের অধিকর্তা মেজর স্বামী এবং স্টেনো ভাস্করণ যথাক্রমে তামিলনাদ এবং কেরালার অধিবাসী। চীফ অফ স্টাফ মেজর জেনারেল ভোঁসলে, মহারাষ্ট্রীয়।

ইয়েলাপ্পা, কুর্গের অধিবাসী। প্রচার-সচিব আয়ার এবং লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট জন এ. থিবি, খ্রীষ্টান। মেজর জেনারেল এ. সি. চ্যাটার্জী, বাঙালী। কর্ণেল স্ট্র্যাসী, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান।

মেজর জেনারেল কিয়ানী এবং শাহনওয়াজ খান দুজনেই রাওয়ালপিণ্ডির অধিবাসী। কর্ণেল ইশান কাদির, লাহোরের। মেজর জেনারেল আজিজ আহম্মদ কপুরতলার।

আর সুভাষ! তিনি কোথাকার লোক! বাঙালী! না, তিনি ছিলেন— ভারতবাসী। তাই তো সেদিন সবাই এক হয়ে তাঁর নেতৃত্বকে মেনে নিয়েছিলেন দ্বিধাহীন চিত্তে। ভারতবর্ষে এর দ্বিতীয় নজীর কোথায় বল?

'The greatest and the lasting act of Netaji was that he abolished all distinctions of caste and class. He was not a mere Bengalee. He never thought himself to be a caste Hindu. He was Indian first and last. What is more, he fired all under him with the same zeal so that they forgot in his presence all distinction and acted as one man.'

সুভাষ সম্বন্ধে এ উক্তি কার জানো? স্বয়ং—গান্ধীজীর।

এবার সমরায়োজন।

তার আগে জাপ সাদার্ণ আর্মি কম্যাণ্ড ফিল্ড-মার্শাল কাউণ্ট তেরাউচির সঙ্গে একবার কথাবার্তা বলে নেওয়া দরকার। একই উদ্দেশ্য নিয়ে দুটি রাষ্ট্রকে পাশাপাশি লড়াই করতে হবে শত্রুর বিরুদ্ধে। সে উদ্দেশ্য হল, এশিয়া ভূখণ্ড থেকে শ্বেতাঙ্গ-প্রভুত্বকে চিরতরে ধ্বংস করা। তবু আগে থেকে সব কিছু বোঝাপড়া করে নেওয়া প্রয়োজন। আর যা-ই হোক, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য কোনরকমেই বিসর্জন দিলে চলবে না।

কাউণ্ট তেরাউচির প্রস্তাবঃ এশিয়া ভূখণ্ডে ব্রিটিশ পরাজিত। তার ফলে ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর মনোবল দুর্বল হতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রে তাদের নিয়ে গড়া আই. এন. এ.-র উচিত হবে পেছনে থেকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে অগ্রগামী জাপ-যোদ্ধাদের সহায়তা করা।

সুভাষ এ প্রস্তাবে একেবারেই রাজী নন। তাঁর বক্তব্যঃ জাপানী সেনাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জনের চাইতে পরাধীনতাও ভাল। মণিপুরের যুদ্ধ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের যুদ্ধ। এর সঙ্গে আমাদের জাতীয় মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত। সুতরাং আমরাই সেখানে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্রভাবে লড়াই করব সবার পুরোভাগে দাঁড়িয়ে। আমরাই প্রথম রক্ত ঢালব আমাদের ভারত-ভূমিতে। না পারলে তখন তোমরা এসো, তার আগে নয়।

'Any liberation of India secured through Japanese sacrifices is to me worse than slavery.'

তাই মেনে নিলেন কাউন্ট তেরাউচি। না নিয়ে উপায়ও নেই। শুধু জাপ-ভারত সাহায্য-সংস্থা 'হিকারী কিকান' নয়, ততদিনে তিনিও বুঝে নিয়েছেন যে, হিজ এক্সেলেন্সী চন্দ্র বোসকে তাঁর সংকল্প থেকে টলানো সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। ঠিক হল, প্রথমে এক ব্রিগেড আজাদী সৈনিক অংশগ্রহণ করবে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে। তারপর আস্তে আস্তে অন্যান্য বাহিনী।

গান্ধী, নেহরু এবং আজাদ ব্রিগেড থেকে বাছা বাছা সৈনিকদের নিয়ে গড়ে তোলা হল—'সুভাষ ব্রিগেড'। নামটা সুভাষের পছন্দ নয়, কিন্তু সেকথা শুনছে কে! জওয়ানদের দাবী,—আমরা ঐ নামই চাই। সুতরাং বাধ্য হয়েই সে দাবী মেনে নিতে হল সুভাষকে।

ঠিক হল ডিভিশনাল কম্যাণ্ডার মেজর জেনারেল কিয়ানী সাহেবের অধীনে থেকে এ বাহিনী পরিচালনা করবেন মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান। সহকারী পরিচালক—কর্ণেল ঠাকুর সিং। আর কর্ণেল মহবুব আহমেদ—রেজিমেণ্টাল এ্যাডজুট্যাণ্ট।

আবার শিক্ষার কাজ শুরু হল নতুন করে। শুধু সামরিক শিক্ষা নয়, সেই সঙ্গে নৈতিক শিক্ষা।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম মুক্তিফৌজ তোমরা। প্রতিটি ভারতবাসী যেন তোমাদের দেখে সগর্বে বলতে পারে—'ওরা আমাদের মুক্তির দূত।'

ইংরেজ-ভাষ্যকার হিউ টয়-এর ভাষায়ঃ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের মণিকোঠায় তাঁর ফৌজের স্থান। ওতপ্রোতভাবে তিনি তাদের বাঁধতে চাইলেন নিজের সঙ্গে।

এ ছাড়া রয়েছে বাহাদুর দলের ট্রেনিং-এর কাজ। এ দলের প্রধান কাজ হবে, শত্রুপক্ষের পশ্চাদ্ভাগে গিয়ে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়া। গোয়েন্দাগিরি এবং শত্রুপক্ষের ভারতীয় সৈন্যদের ভাঙিয়ে আনাও এদের অন্যতম কাজ।

শিগগীরই দলের কয়েকজনকে শক্তিশালী ট্রান্সমিটার সহ ভারতবর্ষে পাঠানো হবে সাবমেরিনের সাহায্যে। বার্লিনে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেজর স্বামীর শিক্ষাধীনে ইতিমধ্যেই এরা বেশ দক্ষতা অর্জন করেছে এসব কাজে।

পুনর্গঠন বিভাগের কাজও কম জরুরী নয়। অধিকৃত অঞ্চলে বেসামরিক শাসন এবং রিলিফ-ব্যবস্থা চালু রাখতে হলে উপযুক্তভাবে শিক্ষার

প্রয়োজন। যোগ্যতার ভিত্তিতে 'শহীদ-ই-ভারত', 'শের-ই-হিন্দ', 'সর্দার-ই-জঙ্গ' পদক এবং সরকারী নোট ছাপানোর কাজেও এখন থেকেই তৎপর হওয়া দরকার।

তাছাড়া শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আবশ্যক। ইতিমধ্যেই অসংখ্য জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে এখানে-ওখানে। এক বর্মাতেই চলেছে অর্ধ-শতাধিক বিদ্যালয়। আরো চাই। অনেক চাই। চাই শোষণমুক্ত এক নতুন ভারতবর্ষ, যেখানে মানুষে মানুষে কোন তফাৎ নেই।

আশ্চর্য মানুষ। আশ্চর্য কর্মদক্ষতা।

কখনো রাষ্ট্রনায়ক। কখনো সিপাহশালার। কখনো বা ভগবানের পায়ে আত্মসমর্পিত এক আপনভোলা পথিক, যাকে চেনা যায় না। বোঝা যায় না। মনে হয়, এ যেন এতদিনকার দেখা সেই সুভাষ নয়, আমূল পরিবর্তিত কোন ভিন্ন সত্তা।

স্বামী ভাস্করানন্দের মুখ থেকেই বরং সেই দ্বৈত-সত্তা সম্বন্ধে কিছু শোনা যাক ঃ

'১৯৪৩ সালের বিজয়া দশমীর রাত্রিতে সুভাষবাবু তাঁহার বাসভবন হইতে সিঙ্গাপুর Indian Independence League-এর মারফত গাড়ি পাঠাইয়া আমাকে তাঁহার সঙ্গে অনতিবিলম্বে দেখা করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন রাত্রি নয়টা হইবে।

আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। গাড়ি বাড়ির দরজায় পৌঁছিতেই সশস্ত্র প্রহরীরা সন্ত্রস্তভাবে আমাকে সুভাষবাবুর সেক্রেটারীর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। সেক্রেটারি মিস্টার হাসান আমাকে উপরে সুভাষবাবুর নিকট লইয়া গেলেন।

পৌঁছিবা মাত্র তিনি বিনীত ও শ্রদ্ধাবনত হইয়া প্রণাম করিয়া আমাকে বসিতে বলিলেন এবং সহকারীদের চা আনিতে আদেশ দিলেন। ইত্যবসরে কথা চলিতে লাগিল।

...সিঙ্গাপুরে অবস্থানকালে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া নেতাজী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বাটিতে আসিয়াছিলেন। সেইদিন ঠাকুর-ঘরে তিনি প্রায় আধঘণ্টাকাল ধ্যানাবিষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন। পরে পূজান্তে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া কিছুকাল ধরিয়া আলাপ-আলোচনাদি করেন। প্রায় এক ঘণ্টাকাল এইরূপে অতিবাহিত হইবার পর তিনি একখানা 'চণ্ডী'র জন্য বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করায় আমি আমার চণ্ডীখানি তাঁহাকে উপহার দেওয়ায় তিনি অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

নেতাজী আমাদের মিশনের কাজের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এখানকার মিশনের অনাথালয়ের জন্য আবেদন জানাইলে তিনি বাড়িঘর তৈয়ারী করিবার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করেন। বাড়ি নির্মাণের জন্য তিনি নিজে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ডলার দান করেন এবং আরও পঞ্চাশ হাজার ডলার সংগ্রহ করিয়া দেন। তিনি স্বয়ং আসিয়া 'Boys Home'-এর দ্বার উদ্ঘাটন করেন। অনাথালয়ের ছেলেমেয়েদের জন্য অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থাও তিনিই করিয়া দিয়াছিলেন।

আমাদের মিশনের স্কুলটিকে Indian National School-রূপে পরিণত করা হইয়াছিল। এই স্কুলে Military Training-এর বন্দোবস্ত করা হয় এবং নেতাজী ছেলেদের Demonstration দেখিতে একদিন মিশনে আসেন। অন্য একদিন আসিয়া তাহাদের Concert শ্রবণ করেন। পঞ্চমবারে তিনি নিজেই আমাদের হলে একটি সভার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।'

[স্মরণে-মননে সুভাষচন্দ্র : পৃঃ ১৯২-১৯৮-১৯৯]

এ সুভাষকে দেখে তোমার কি মনে হয় মল্লিকা! রাষ্ট্রনায়ক! সিপাহ-সালার! না কি সর্বত্যাগী এক সন্ন্যাসী!

এবার টোকিও। সামনেই বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়া সম্মেলন। সুভাষকে সেখানে যোগ দিতে হবে বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে।

নির্দিষ্ট দিনে সুভাষ যাত্রা করলেন টোকিওর উদ্দেশ্যে। সঙ্গে গেলেন জেনারেল ভোঁসলে, এ. এম. সহায়, কর্ণেল রাজু, আবিদ হাসান প্রমুখ মোট সাতজন।

৩১শে অক্টোবর জাপানের হেনিডা বিমানবন্দরে বিরাট সংবর্ধনা জানানো হল সুভাষকে।

বৈদেশিক মন্ত্রী সিগিমিৎসু, বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়া-বিষয়ক মন্ত্রী কাজুওকি, ইনফরমেশন বোর্ডের সভাপতি ইজি আমু প্রমুখ সবাই সেদিন উপস্থিত ছিলেন বিমানবন্দরে। আর ছিলেন জাপানের বিশিষ্ট নাগরিক কাইজু সিবুযায়া, যাঁর বাড়িতে সুভাষ এবার অবস্থান করবেন অতিথি হিসেবে। তাছাড়া লীগের বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দের তো কথাই নেই।

সেদিনই জাপানের বোর্ড অফ ইনফরমেশনের পক্ষ থেকে সুভাষের উপস্থিতির কথা ঘোষণা করা হল সরকারীভাবে।

'For the purpose of expressing gratitude to Nippon Government for the recognition and co-operation extended to his Government Mr. Subhas Chandra Bose, head of the Provisional Government of Free India, came to Tokyo to-day.'

পরদিন সকাল ১১-২০ মিনিটে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজোর সঙ্গে। মোট চল্লিশ মিনিট কথাবার্তা হল দুজনের মধ্যে। ব্রিটিশ মুখপাত্র হিউ টয়-এর ভাষায় : 'তোজোর সঙ্গে সমান সমানভাবে তাঁর কথা হল (To Tojo he spoke confidently as to an equal.)। তিনি দাবী করলেন, ইম্ফল অভিযানে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের গোটা প্রথম ডিভিশনকে পাঠাতে হবে। আরো দুটি ডিভিশন তিনি গড়তে চাইলেন মালয়ে। আর ভারতবর্ষের অধিকৃত অংশ আজাদ হিন্দ্ সরকারের কর্তৃত্বে আসবে, এ সম্বন্ধে তিনি সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দাবী করলেন।

সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল সুগিয়ামাকে তিনি রাজী করালেন যে, আসন্ন অভিযানে আজাদ হিন্দ্ ফৌজও অংশগ্রহণ করবে।

দ্বিতীয় ডিভিশনের জন্য সৈন্য ভর্তি করা বা তৃতীয় ডিভিশন গড়ার পরিকল্পনা করা, অথবা তাদের উপযুক্তভাবে শিক্ষার ব্যাপারে কোনদিক থেকেই আপত্তির কোন কারণ দেখা গেল না।'

পরদিন ২রা নভেম্বর বৈদেশিক মন্ত্রী সিগিমিৎসু প্রদত্ত ডিনার পার্টি। সুভাষকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে সিগিমিৎসু বললেন: আমাদের জয় সুনিশ্চিত। একই উদ্দেশ্য নিয়ে এবার থেকে আমরা লড়াই করব কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।

'Now that we are comrades devoted to the same cause, we pledge to join forces to fight this war through until ultimate victory rewards our common efforts.

India is now awaiting the sunrise. The grey dawn that now envelops the Indian horizon will soon break into full daylight.'

৫ই নভেম্বর বৃহত্তম পূর্ব-এশিয়া সম্মেলন শুরু হল জাপ-প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজোর সভাপতিত্বে।

সুভাষ সেই সম্মেলনে একজন পর্যবেক্ষক মাত্র। তাঁর বক্তব্য: ভারতবর্ষ পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত নয়, সুতরাং একজন পর্যবেক্ষক ছাড়া এখানে তাঁর অন্য কোন ভূমিকা থাকতে পারে না।

পরদিনই সম্মেলনের চেহারা পালটে গেল বর্মার প্রধানমন্ত্রী ডঃ বা. ম'র একটি প্রস্তাবের ফলে। হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে উঠে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন:

'ভারতবর্ষ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত বৃহত্তর এশিয়ার পরিকল্পনা কোনদিনও সার্থক হতে পারে না। সুতরাং আমাদের সবার উচিত ভারত-বর্ষের স্বাধীনতা প্রস্তাবকে সহানুভূতির সঙ্গে সমর্থন করা।'

সবাই সমর্থন জানালেন একবাক্যে। জাতীয়তাবাদী চীনের প্রেসিডেণ্ট ওসিও, মাঞ্চুরিয়ার প্রধানমন্ত্রী চু, ফিলিপাইনের প্রেসিডেণ্ট লরেল, জাপ-প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো—সবাই। হ্যাঁ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্ন-টাকেই আজ আমাদের বড় করে দেখা উচিত। ভারতবর্ষ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত 'এশিয়া—এশিয়াবাসীদের জন্য' পরিকল্পনা কোনরকমেই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। হওয়া সম্ভব নয়।

এবার ভাষণ দিলেন সুভাষ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্নকে এতখানি গুরুত্ব দেবার জন্য সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আজকের এই ঘোষণা পরাধীন ভারতের আটত্রিশ কোটি মানুষকে অনেকখানি প্রেরণা দেবে সন্দেহ নেই।

'I am sure that this resolution will go beyond the walls of this Capital Building to hundreds of millions of the Indian people groaning under British Yoke, give them a new hope and inspiration and cause a sense of fear in those who have a guilty conscience.

Compromising with British means to compromise with slavery.'

সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করতে গিয়ে আবার নতুন করে প্রতিশ্রুতি দিলেন জেনারেল তোজো। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য আমরা সর্বতোভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত। শুধু তাই নয়, শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে শিগগীরই আমরা আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপ দুটি তুলে দেব আজাদ হিন্দ্ সরকারের হাতে।

'I would like to announce here and now that Japan is ready to transfer the Andaman and the Nicobar Islands to the Provisional Government of Free India in the near future.'

ঘোষণা শুনে মনে মনে খুশি হলেন সুভাষ। এতদিন আজাদ হিন্দ্ সরকারের নিজস্ব কোন ভূখণ্ড ছিল না। আন্দামান এবং নিকোবর সে অভাব কিছুটা পূর্ণ করবে সন্দেহ নেই।

আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপ হস্তান্তরের খবরে সন্তোষ প্রকাশ করে এক সরকারী ইস্তাহার প্রকাশ করলেন সুভাষ। আন্দামান এখন থেকে আর আন্দামান নয়। স্বাধীনতা-সংগ্রামের অসংখ্য শহীদের পদস্পর্শে ধন্য আন্দামানের নতুন নাম হল—'শহীদ দ্বীপ'। আর নিকোবর—'স্বরাজ দ্বীপ'।

'The Liberation of these islands has a symbolic significance because the Andaman Islands were always used by the British as a prison for political prisoners. Most of the political prisoners sentenced to penal servitude for conspiracies to overthrow the British Government and there have been hundreds of them—were locked up in this island.

Bastille in Paris, which was the first to be stormed in the French Revolution, setting free political prisoners, the Andamans, where our patriots suffered, are the first to be liberated in India's fight for independence.

Part by part, Indian territory will be liberated, but it is always the first piece of territory that has the most significance. We have renamed the Andamans as 'Shaheed', in memory of the martyrs, and the Nicobars as 'Swaraj'.'

৭ই নভেম্বর বিরাট এক জনসভা অনুষ্ঠিত হল টোকিওর বিখ্যাত হিবিয়া পার্কে। সুভাষ সেখানে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দিলেন শ্রোতাদের উদ্দেশে।

দেখতে দেখতে সর্বত্র সাড়া পড়ে গেল সুভাষকে নিয়ে। সবার মুখে এক রব—সুভাষ! সুভাষ! সুভাষ! ব্রিটিশ মুখপাত্রের ভাষায়ঃ এ যেন সুভাষচন্দ্রের দিগ্বিজয়। টোকিওতে দ্বিতীয় আর কোন বিদেশী রাষ্ট্রনেতা ছিলেন না, যিনি রাজনৈতিক খ্যাতিতে কিংবা ব্যক্তিত্বের জোরে সুভাষচন্দ্রের ধারে-কাছে দাঁড়াতে সক্ষম। নিমন্ত্রণকর্তাদের কাছে তিনি সমাদরও পেলেন প্রচুর। জাপানী জনসভায় তাঁকে ভাষণ দেবার জন্য ডাকা হল। এ্যাকাডেমী, ক্যাডেট কলেজ, অস্ত্র-কারখানা—সবকিছু তাঁকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখানো

হল। জাপান ও অন্যান্য দেশের নেতৃবৃন্দ তাঁর গুণগান করলেন। জাপ-সম্রাটের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হল।

জাপানীদের কাছে তাদের মহামান্য সম্রাট স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতীক। শোনা যায়, চন্দ্র-সূর্যও নাকি তাঁর মুখ দেখতে পায় না কোনদিন। প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করে সেই মহামান্য জাপ-সম্রাট এবার তাঁর নিজস্ব ফনিক্স হলে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন হিজ এক্সেলেন্সী চন্দ্র বোসকে। জাপানের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

সংবর্ধনার উত্তরে এক সরকারী ইস্তাহার প্রকাশ করলেন সুভাষ। মহামান্য জাপ-সম্রাট কর্তৃক এই সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। এ সম্মান সমগ্র ভারতবর্ষের সম্মান। আজাদ হিন্দ্ সরকারের সম্মান।

১৫ই নভেম্বর জাপানের বিখ্যাত 'ব্ল্যাক ড্রাগন পার্টি'র নেতা মিৎসু তোয়ামা-প্রদত্ত পার্টি। সেই তোয়ামা, যাঁর অনুগ্রহে রাসবিহারী জাপানে আশ্রয় পেয়েছিলেন ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে গিয়ে। সেদিন তোয়ামা না থাকলে কারো সাধ্য ছিল না তাঁকে ব্রিটিশের উদ্যত থাবা থেকে রক্ষা করে।

প্রায় চল্লিশজন বিশিষ্ট সামরিক ও অসামরিক অতিথি সেদিন উপস্থিত ছিলেন তোয়ামা-প্রদত্ত সেই পার্টিতে। আর ছিলেন রাসবিহারী স্বয়ং। সিঙ্গাপুর থেকে চলে আসার পরে এই তাঁর প্রথম দেখা সুভাষের সঙ্গে।

এর মধ্যেই সময় করে মোট তিনদিন কিছু বলতে হল টোকিও রেডিও থেকে। ৫ই নভেম্বর, ১৬ই নভেম্বর এবং ১৭ই নভেম্বর। প্রথম দিন—এশিয়ার জনগণের উদ্দেশে। পরের দিন জার্মানীর উদ্দেশে। শেষ দিন —ভারতবর্ষের উদ্দেশে।

এবার সুভাষকে বিদায় নিতে হবে টোকিও থেকে। কিন্তু তার আগে একটি মোক্ষম কথা তিনি জানিয়ে গেলেন সবার উদ্দেশে। এ যুদ্ধে জার্মানী পরাজিত হলেও আমরা আমাদের লড়াই চালিয়ে যাব। দরকার হলে রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে লড়াই চালাব। শুধু রাশিয়া কেন, ব্রিটিশ শাসনে যুগ যুগ ধরে আমরা যেভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছি, তার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য দরকার হলে শয়তানের সঙ্গে হাত মেলাতেও আমরা কুণ্ঠিত হব না।

'Should Germany lose, we will have to continue to fight the allied powers even by joining hand with Russia. Since you do not know the full facts, you may as well question what I have said, but the indignation on the part of the Indian people, who have been groaning under British oppression for so long, is such that they would not mind joining hands, with the devil.'

হ্যাঁ, এই হল সুভাষ। এ সুভাষকে চিনতে সময় লাগে না। স্বাধীনতা চাই-ই। সে স্বাধীনতা ছলে-বলে-কৌশলে যেভাবেই আসুক না কেন, তাতে তাঁর কোন আপত্তি নেই। সোজা কথায়, পথটা তাঁর কাছে বড় নয়, স্বাধীনতাই বড়।

টোকিওর পরে প্রেসিডেন্ট ওসিও'র আমন্ত্রণে চীনের নানকিং। সহ-

কর্মিগণ ছাড়াও এ যাত্রায় দোভাষী হিসেবে সঙ্গে রইলেন জাপ- জেনারেল সেন্ডা, কর্ণেল ইয়ামামোতো এবং বৈদেশিক বিভাগের দায়িত্বশীল কর্মী মিঃ ওহাতা।

প্রকৃতপক্ষে বিরাট চীনদেশে তখন পাশাপাশি দুটি সরকার প্রতিষ্ঠিত। একদিকে ইঙ্গ-মার্কিন দলভুক্ত চিয়াং-কাই-শেক-শাসিত চুংকিং সরকার। অন্যদিকে জাপ-সমর্থক নানকিং সরকার।

হিসেবটা বড্ড গোলমেলে মল্লিকা। যুদ্ধ তখন প্রধানতঃ দুটি শিবিরে বিভক্ত। একদিকে ব্রিটিশ, আমেরিকা, রাশিয়া, চিয়াংকাই-শিক-শাসিত চীন ও অস্ট্রেলিয়া প্রমুখ শক্তিসমূহ। অন্যদিকে জার্মানী, ইতালী ও জাপান। অথচ মজা দেখ, ইঙ্গ-মার্কিন জোটে থাকা সত্ত্বেও জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার কোন বিবাদ নেই। বরং দীর্ঘদিন ধরে তারা পরস্পর অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ।

আবার এদিকে সুভাষ বিপক্ষ দলে যোগ দিলেও যুদ্ধ ঘোষণা করলেন কিনা কেবলমাত্র ব্রিটিশ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে, রাশিয়া বা চিয়াং-কাই-শেক-শাসিত চীনের বিরুদ্ধে নয়। তাঁর বক্তব্য—আমাদের একমাত্র শত্রু হল ব্রিটিশ। রাশিয়া বা চীন নয়। তাহলে অহেতুক আমরা তাদের সঙ্গে বিবাদ করতে যাব কেন?

প্রশ্ন হতে পারে—তাহলে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হল কেন?

সুভাষের উত্তর ঃ নয় কেন? আমরা লড়াই করছি আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য। ব্রিটিশ লড়াই করছে কিসের স্বার্থে? ভারতবর্ষকে আগের মতই পদানত করে রাখার জন্য নয় কি? এ ব্যাপারে আজ তাদের সবচাইতে বড় মুরুব্বি হল আমেরিকা। তাই ভারতবর্ষে আজ যত শ্বেতাঙ্গ সৈন্য রয়েছে, তার বেশির ভাগই হল আমেরিকান। সমর-সম্ভারেরও বেশির ভাগ তাদেরই আমদানি। কেন? কেন? কেন? কেন তারা এসেছে ভারতবর্ষের মাটিতে? কিসের স্বার্থে? ব্রিটিশের সঙ্গে সঙ্গে এই নয়া সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করতে না পারলে ভারতবর্ষের মুক্তি কোথায়?

১৮ই নভেম্বর নানকিং।

নানকিং-এ পা দিয়ে প্রথমেই তিনি নতুন চীনের জনক সান-ইয়াত-সেনের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন যথাযথভাবে।

তারপর যাকে বলে একেবারে ঠাসা প্রোগ্রাম। প্রথমেই প্রেসিডেন্ট-প্রদত্ত ভোজসভা। তারপর একে একে জাপ কম্যাংডার-ইন-চীফ জেনারেল সুনরুকুহাটা, রাষ্ট্রদূত মাসাওকিতানি এবং মাঞ্চুকুও রাষ্ট্রদূত লু ওয়াং হুয়ান ও জার্মান রাষ্ট্রদূত ডঃ আর্নেস্ট ওয়রম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। রাত সাড়ে আটটায় বৈদেশিক মন্ত্রী চু মিন-ই প্রদত্ত ভোজসভা। মাঝে এক-ফাঁকে মিলিটারি একাডেমী পরিদর্শন।

পরদিন সকাল এগারোটায় ন্যাশনাল পাবলিক হলে অনুষ্ঠিত জনসভায় ভাষণ। সেখানে স্পষ্টই তিনি বললেন ঃ চীনকে বাদ দিয়ে কোনদিন বৃহত্তর এশিয়ার পরিকল্পনা সার্থক হতে পারে না। দুর্ভাগ্য, চিয়াং-কাই শেক-

সরকার ইঙ্গ-মার্কিন জোটে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু এশিয়া ভূখণ্ডে অবস্থিত কোন দেশের পক্ষে পশ্চিমী শক্তিগুলির সঙ্গে হাত মেলানোর পরিণতি কোনদিনও শুভ হতে পারে না।

২০শে নভেম্বর রাত্রে নানকিং রেডিও থেকে চল্লিশ মিনিটব্যাপী দীর্ঘ বক্তৃতা ঃ

'আমি জানি, ভারত-সীমান্তে আজ শুধু আমাকে ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধ করলেই চলবে না, বোধহয় সেই সঙ্গে তাদের সাহায্যকারী চিয়াং-কাই-শেক সরকার প্রেরিত সৈন্যদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে হবে। জানি না একটি বন্ধুরাষ্ট্রের প্রতি চিয়াং-কাই-শেক সরকারের এই মনোভাবের কারণ কি ?

কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে আমিই সেদিন একটি মেডিকেল মিশন পাঠিয়েছিলাম চুংকিং সরকারের সাহায্যার্থে। পরেও নানাবিধ সাহায্য পাঠিয়েছি। আজ বোধহয় তারই প্রতিদান তাঁরা দিচ্ছেন ভারত-সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে। অথচ আমরা আদপেই যুদ্ধ ঘোষণা করিনি তাঁদের বিরুদ্ধে।

চিয়াং-কাই শেকের উচিত এশিয়ার মুক্তির জন্য লড়াই করা, এশিয়ার শত্রুদের জন্য নয়। Chiang-Kai-Shek should fight for Asia and not for Asia's enemy.'

নানকিং থেকে সাংহাই। সেখানেও এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দিতে হল সুভাষকে।

২২শে নভেম্বর বিকেল তিনটে পনের মিনিটে প্রেসিডেণ্ট লরেলের আমন্ত্রণে ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায়। প্রেসিডেণ্ট লরেলসহ অসংখ্য সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তি সেদিন উপস্থিত ছিলেন বিমানবন্দরে।

বিকেলে জনসভা। সন্ধ্যায় প্রেসিডেণ্ট লরেল-প্রদত্ত ভোজসভা। সংবর্ধনার উত্তরে সুভাষ সবাইকে হুঁশিয়ার থাকতে বললেন নতুন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে।

'British Imperialism is dead, however, the United States is succeeding and replacing it in all its mercilessness and injustice.

The world must choose between the prepetuation of this Imperialism or establishment of a new world based on justice and equality.'

২৪শে নভেম্বর দুপুর দেড়টায় সাইগন। তারপর এক বিরাট জনসভায় ভাষণ। সেই সঙ্গে জাপানের সাদার্ণ আর্মি কম্যাণ্ড কাউণ্ট তেরাউচি এবং স্থানীয় নৌ-বিভাগের প্রধানের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার। সময় এগিয়ে এসেছে। কিভাবে, কোন্ রণাঙ্গনে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ লড়াই করবে সে সম্বন্ধে উভয়পক্ষের মধ্যে একটা বোঝাপড়া প্রয়োজন।

২৫শে নভেম্বর দীর্ঘ পরিক্রমার পরে আবার সেই সিঙ্গাপুর। তারপর সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত সেই একটানা নিরলস কর্মময় জীবন। অনেক কাজ জমা হয়ে আছে গত চার সপ্তাহ অনুপস্থিতির ফলে। ওগুলো যে

শেষ করে না ফেললেই নয়। আর সময় কোথায়! চূড়ান্ত বোঝাপড়ার দিন তো এলো বলে।

মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান পরিচালিত সুভাষ ব্রিগেড অবশ্য চুপচাপ বসে নেই। ৯ই নভেম্বর তারিখেই তাদের মার্চ শুরু হয়ে গেছে তাইপিং থেকে। লক্ষ্য—আপাততঃ রেঙ্গুন। তারপর আদেশ পেলেই তারা এগিয়ে যাবে ইম্ফলের দিকে।

কোথায় তাইপিং, আর কোথায় রেঙ্গুন! প্রায় পাঁচ সপ্তাহের পথ। তার মধ্যে চারশো মাইল তাদের যেতে হবে পায়ে হেঁটে। বাকী পথ কখনো ট্রেন, কখনো বা স্টীমার, নৌকো বা লরীতে।

ভ্রুক্ষেপও নেই আজাদী বাহিনীর। দরকার হলে গোটা পথই আমরা পায়ে হেঁটে যাব। শুধু একবার আমাদের সুযোগ দিন নেতাজী। ভাড়াটে সৈনিক বলে এতদিন আমরা ছিলাম সবার কাছে অবজ্ঞার পাত্র। এবার দেখুন যে, দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারি কিনা। পৃথিবীর যে কোন দেশের শ্রেষ্ঠ সৈনিকদলের আমরা সমকক্ষ কিনা।

'Netaji, give us a chance and we will prove to the whole world that the so-called Indian mercenary soldiers can fight as gallantly for the liberation of their country as any other soldier in the world.'

[Maj. Gen. Shahnawaz Khan : P.—267]

কি অভাবনীয় দৃশ্য সেদিন তাইপিং রেল-স্টেশনে! ডাক্তারী নির্দেশ অমান্য করে হাসপাতাল থেকে সমস্ত অসুস্থ, রুগ্ন সৈনিকরা এসে শুয়ে পড়েছে ইঞ্জিনের সামনে। দেশের জন্য প্রাণ দেব বলে নেতাজীকে আমরা কথা দিয়েছি। কথার খেলাপ করতে পারব না। আমাদেরও নিয়ে যেতে হবে তোমাদের সঙ্গে।

বেশ, তাই হবে। অনেক করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করা হল সবাইকে, তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠো, তারপর সবাই তোমরা যাবে লড়াই করতে। কথা দিলাম।

তাইপিং থেকে ছুম্পন পর্যন্ত ট্রেনে। তারপর নব্বুই মাইল পায়ে হেঁটে।

সঙ্গে সঙ্গে একমণ বোঝা কাঁধে নিয়ে আজাদী বাহিনী প্রস্তুত। কোন ক্ষোভ নেই। কোন অভিযোগ নেই।

এ তো কিছুই নয়। নেতাজী আমাদের রক্ত দিতে বলেছেন। আমরা রক্ত দিলে যদি দেশ স্বাধীন হয়, তাহলে এত রক্ত দেব যে, গোটা মণিপুর তাতে ভেসে যাবে।

লেফট্ রাইট্—লেফট্ রাইট্—লেফট্...

যেতে যেতে একসময়ে তারা গান ধরে সমবেত কণ্ঠে—'কদম কদম বড়ায়ে যা, খুশিকা গীত গায়ে যা......'

কখনো বা নতুন জাতীয় সঙ্গীত—'শুভ সুখ চিহ্ন কি বরখা বরষে ভারত ভাগ হৈ জাগা'......

বাংলা ভাষা সবার পক্ষে বোধগম্য নয়, তাই কবি গুরুর 'জনগণমন' গানটির সুরে রচিত এই গানটিই সেদিন সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছিল সুভাষের নির্বাচিত একটি কমিটির বিচারে। রচয়িতা একজন মুসলিম তরুণ। নাম—হুসেন। গানটি রচনার জন্য শ্রেষ্ঠ সম্মান হিসেবে মোট দশহাজার ডলার তিনি পুরস্কার লাভ করেছিলেন সুভাষের কাছ থেকে।

'Netaji rewarded Hussain with ten thousand dollars for his effort in evolving the new national song.'

[Maj. Gen. Chatterjee : P.—147]

লেফট্ রাইট্—লেফট্ রাইট্—লেফট্......

পা চালিয়ে চলো ভাই। জাপানীরা বড়াই করে, ওরা নাকি খুব কষ্ট-সহিষ্ণু। কেন, আমরা কষ্ট সহ্য করতে পারিনে! যে পথ যেতে ওদের পাঁচদিন লাগে, আমরা দুদিনেই সে পথ হেঁটে চলে যাব। থাক না কাঁধের উপর একমণ বোঝা, তা বলে রোজ বিশ-পঁচিশ মাইল পথ হেঁটে যাওয়া এমন কি শক্ত কাজ!

আবার ট্রেন। জায়গাটার নাম ওয়া। আর বিশ মাইল গেলেই পাওয়া যাবে বর্মার বিখ্যাত বন্দর—পেগু।

সহসা সাইরেনের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ—উঁ-উঁউঁ-উঁ-উঁ...

হুঁশিয়ার ভাই, হুঁশিয়ার! ঐ যে দূরে আকাশে শত্রু-বিমান দেখা যাচ্ছে। মনে হয়, এ ট্রেনটাই ওদের লক্ষ্য। হুঁশিয়ার! একেবারে কাছে এসে গিয়েছে। ঝোপে, জঙ্গলে, যে যেখানে পারো আশ্রয় নাও। কুইক! কুইক!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কান ফাটানো আওয়াজ—বুম্ ম্ ম্ ম্! বুম্ ম্ ম্ ম্...

না, তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। মোট দুজন আহত। নিহত একজন। নাম জিৎ সিং। গাড়োয়ালের জিৎ সিং। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রথম শহীদ—জিৎ সিং।

সামরিক কায়দায় শেষ সম্মান প্রদর্শন করা হল নিহত সৈনিক জিৎ সিং-এর উদ্দেশে। তোমাকে আমরা ভুলব না বন্ধু। এর বদলা আমরা নেবই। হিসেব আমাদের অত্যন্ত সোজা। রক্তের বদলে রক্ত। প্রাণের বদলে প্রাণ।

২৭শে নভেম্বর জেনারেল তোজো জাপ ডায়েটে আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করলেন সরকারীভাবে।

প্রায় একই সময়ে সুভাষ 'একান্ত গোপনীয়' একটি নোট পেলেন জাপ নৌ-বহরের সদর-দপ্তর থেকে। লিখেছেন ভাইস এ্যাডমিরাল তাকাজুমো ওকা।

মহামান্য চন্দ্র বসুর নির্দেশে তাঁর আন্দামান যাবার যাবতীয় ব্যবস্থা প্রস্তুত। ডিসেম্বরের শুরুতেই দিন ঠিক হয়েছে। যুদ্ধ-পরিস্থিতির জন্য এ সংবাদ আগে থেকে প্রচার করা মোটেই ঠিক নয়। কারণ, যেতে হবে

শত্রুপক্ষের আগোচরে, অত্যন্ত গোপনে। সিঙ্গাপুরের নৌ-দপ্তরের প্রধানকে এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

From The Imperial Japanese Navy Department To Subhas Chandra Bose

Strictly Confidential

'...Barring a sudden change in the military situation, arrangements will be made to have this visit made during the early part of December. Details of the trip will be communicated to Mr. Bose by the Commander-in-Chief of the Fleet stationed in Shonan.

This trip is to be kept strictly secret until its completion. Publicity subsequent to the completion of the visit....'

৮ই ডিসেম্বর এস. এন. চোপরার নেতৃত্বে মোট চারজন দুঃসাহসী তরুণ ভারতবর্ষে রওনা দিলেন সাবমেরিনযোগে। সঙ্গে তাঁদের শক্তিশালী ট্রান্সমিটার।

ঠিক হল—চোপরা দিল্লীতে থাকবেন। বাকী তিনজন বম্বে, পাঞ্জাব এবং বাংলাদেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তাঁকে জানিয়ে দেবেন রেডিওর সাহায্যে ; চোপরা সে-সব তথ্য সাঙ্কেতিক ভাষায় পেঁাছে দেবেন আজাদ হিন্দ্ ফৌজের হেড-কোয়ার্টার্সে।

পরিকল্পনা সুভাষের নিজের। ব্রিটিশ মুখমাত্রের ভাষায়ঃ

'কোন্ কোন্ এলাকায় চেনাজানা সহানুভূতিসম্পন্ন সমর্থক রয়েছে, তিনি তার তালিকা তৈরি করে দিলেন। তাঁদের পেশা কি, কখন কি ছদ্মবেশ ধারণ করতে হবে, সে সম্বন্ধেও উপদেশ দিলেন। বললেন—প্রধান লক্ষ্য হবে, সামরিক এবং অর্থনৈতিক খবর সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দেওয়া।'

সুভাষচন্দ্র বার বার তাঁদের সতর্ক করে দিলেন—'কোনরকম ঝুঁকি নেবে না। বিপদ দেখলে ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকবে। এক-এক সময় প্রাণ হাতে নিয়েও কাজ করতে হবে। উপযুক্ত সুযোগ না আসা পর্যন্ত সব সময়ে গা বাঁচিয়ে চলতে চেষ্টা করবে।'

১০ই ডিসেম্বর আবার সুভাষকে বেড়িয়ে পড়তে হল জাকার্তা, সুরাবায়া, জাভা, সুমাত্রা ও বোর্ণিও অঞ্চলে। উপায় কি! কারো দাবীই যে না রাখলে নয়।

১১ই ডিসেম্বর জাকার্তায় এক মনোজ্ঞ ভাষণ দিলেন সুভাষঃ

ভারতবর্ষে সত্যাগ্রহ বা অসহযোগ আন্দোলন ফলপ্রসূ হয়নি। প্রকৃত-পক্ষে গত বিশ বছরে আমরা আমাদের লক্ষ্যের কাছাকাছিও যেতে পারিনি। তাই আমি দেশত্যাগ করে চলে এসেছি বাইরে থেকে শত্রুকে আঘাত করব বলে।

আজ ভারত-সীমান্তে আমাদের আজাদ হিন্দ্ ফৌজ আদেশের

প্রতীক্ষায় প্রস্তুত। স্বাধীনতা রক্তের বিনিময়ে অর্জন করতে হয়। যে স্বাধীনতা দান হিসেবে পাওয়া যায় তা কোনদিনই চিরস্থায়ী হয় না।

২৯শে ডিসেম্বর আন্দামান। সঙ্গে রইলেন এ. এম. সহায় এবং আবিদ হাসান।

সুভাষের বাসস্থান ঠিক হল প্রাক্তন ব্রিটিশ কমিশনারের সুরম্য বাংলোতে। আন্দামানে সেদিন রীতিমত উৎসব-সজ্জা। যেদিকে তাকানো যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। নেতাজী সম্বন্ধে কত রোমাঞ্চকর কাহিনীই না তারা শুনে এসেছে এতদিন। সেই নেতাজী যে স্বয়ং তাদের এখানে আসবেন, একথা বোধ হয় তাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

পরদিন ভোরে পোর্ট ব্লেয়ারে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় পতাকা উত্তোলন। তারপর সময়োচিত ভাষণ। ভাষণ শেষে স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানালেন মিঃ রামকৃষ্ণ, দুর্গাপ্রসাদ, নবাব আলী প্রমুখ স্বাধীনতা লীগের নেতৃবৃন্দকে।

এর মধ্যেই একফাঁকে সেলুলার জেল পরিদর্শন। সুভাষের দুচোখে সেদিন বিস্ময়। এই সেই বিখ্যাত সেলুলার জেল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের কত বেদনাবিধুর স্মৃতিই না জড়িয়ে আছে এই সেলুলার জেলের প্রতিটি ইট-পাথরের গায়ে। মহাবীর সিং, পণ্ডিত রামরক্ষা, মোহিত মৈত্র, মোহনকিশোর দাস এমনি কতজনই না প্রাণ দিয়েছেন এই কুখ্যাত জেলের নির্জন কক্ষে। কান পাতলে এখনো বুঝি ওঁদের অতৃপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস শোনা যায়।

শহীদ দ্বীপ! হ্যাঁ, ওঁদের স্মরণেই এ দ্বীপের নাম রাখা হয়েছে শহীদ দ্বীপ। ওঁরা মৃত্যুঞ্জয়ী। ওঁদের এই নিঃশেষ আত্মবিসর্জন কোনদিনও বিফলে যাবে না।

নতুন শাসন-ব্যবস্থা অনুসারে সুভাষ মেজর জেনারেল এ ডি. লোগনাথনকে নিযুক্ত করলেন আন্দামানের চীফ কমিশনারের পদে। সহকারী হিসেবে থাকবেন দক্ষ প্রশাসক মেজর আলী। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিরক্ষার দায়িত্ব বহন করবেন আগের মতই জাপান সরকার।

সংগ্রাম আসন্ন, সুতরাং আর সিঙ্গাপুর নয়। এসময় ভারতবর্ষের যত কাছাকাছি থাকা যায় ততই মঙ্গল। সুতরাং, হেড-কোয়ার্টার্স তুলে নিয়ে চলো এবার রেঙ্গুন।

৭ই জানুয়ারি (১৯৪৪) সুভাষকে বিরাট সংবর্ধনা জানানো হল রেঙ্গুনে। শুধু ভারতীয় নয়, বর্মীরাও সেদিন এগিয়ে এসেছিল সমানভাবে। এতকাল চতুর ব্রিটিশ তাদের সাম্রাজ্য রক্ষার খাতিরে ভারতবাসী এবং বর্মীদের মধ্যে যে বিরোধ পাকিয়ে তুলেছিল, সে-সব কিছু সেদিন ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সুভাষের ভাষণ শুনে। না, আর বিরোধ নয়। ভারতবাসী আমাদের শত্রু নয়. ভাই। এ যুদ্ধে আমরাও তাদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করব ব্রিটিশের বিরুদ্ধে।

প্রধানমন্ত্রী ডঃ বা ম'র তো কথাই নেই। তিনি সর্বতোভাবে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত সুভাষের সঙ্গে। কথায় নয়, কাজেও।

ততদিনে সুভাষ ব্রিগেড রেঙ্গুনের মিঙলাডোন মিলিটারী ব্যারাকে পৌঁছে গেছে তাইপিং থেকে। অন্যান্য বাহিনীও আসতে শুরু করেছে দলে দলে। মুখে তাদের একই ধ্বনি—চলো দিল্লী! চলো দিল্লী! চলো দিল্লী! কবে আমরা দিল্লী যাব ভাই? কবে? আর কত দেরী?

ঠিক সেদিনই জাপানের পক্ষ থেকে সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল সুগিয়ামা তাঁর চূড়ান্ত নির্দেশ পাঠালেন সাদার্ণ আর্মি কম্যাণ্ডের জি. ও. সি. কাউণ্ট তেরাউচির কাছে। সময় ও সুযোগ বুঝে ইম্ফলের দিকে অগ্রসর হও।

Army Instruction No. 1776

In order to strengthen the defence of Burma, G. O. C. Southern Army is to attack the enemy when conditions become favourable and occupy and consolidate the 'Imphal Area' and strategically important regions in N. E. India.

Sugiyama Gen.
Chief of Genearl Staff
7 January, 1944.

To G. O. C. Southern Command,
Count Terauchi, Misaichi.

শুরু হল সাজ-সাজ রব। গ্রীণ সিগন্যাল এসে গেছে। আর দেরী নয়।

ঘুম নেই সুভাষের চোখে। শুধু কাজ—কাজ আর কাজ। আর সময় নেই। ইতিমধ্যে সব কাজ শেষ করে নিতে হবে একে একে। কিছুই ফেলে রাখলে চলবে না।

গড়ে তোলা হল ইণ্টারন্যাল সিকিউরিটি সংস্থা। বিভীষণ সব দেশে, সব দলেই আছে। আমাদের মধ্যেই যে নেই তা কে বলতে পারে! দেবনাথ দাসের নেতৃত্বে এই সংস্থার কাজ হবে এদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা। সহকারী হিসেবে থাকবেন জামাল সাহেব।

আধুনিক যুদ্ধের একটা মস্তবড় অস্ত্র হল—প্রোপাগাণ্ডা। সেই প্রোপাগাণ্ডার কাজকে এখন আরো জোরদার করে তুলতে হবে। দেশবাসীকে জানাতে হবে—সংগ্রাম আসন্ন। তোমরা প্রস্তুত হও।

একসঙ্গে গর্জে উঠল রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, ব্যাঙ্কক, সাইগন ও টোকিও প্রভৃতি বিভিন্ন বেতারকেন্দ্রগুলি।

ক্রমাগত ডাক পাঠাতে লাগলেন সুভাষ। ডাক পাঠাতে লাগলেন মহানায়ক রাসবিহারী বসু, কর্ণেল লোগনাথন, মিসেস চিন্মাম্মু, বলজিৎ কাউর, ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন, কর্ণেল রাজু, মেজর বিষেণ সিং, লেঃ কর্ণেল আজিজ আহম্মদ, প্রতিমা পাল প্রমুখ স্বাধীনতা-সংগ্রামীবৃন্দ। সংগ্রাম আসন্ন। তোমরা প্রস্তুত হও ভাই।

প্রথমে শোন বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারীর কথা। তিনি ডাক পাঠালেন

টোকিও বেতারকেন্দ্র থেকে। দাসত্বের দিন শেষ হয়ে এসেছে। আমি বিশ্বাস করি যে, আটত্রিশ কোটি ভারতবাসী কখনই এ সুযোগ হেলায় হারাবে না।

৮ই জানুয়ারি সুভাষ নিজে বললেন রেঙ্গুন বেতারকেন্দ্র থেকে।

সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হবে, এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের সেই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে শত্রুর বিরুদ্ধে। তিন বছর আগে আমি যখন ভারতবর্ষ ত্যাগ করে চলে এসেছিলাম, সেদিন কোন শক্তিই আমাকে বাধা দিতে পারেনি। আমি যেদিন ফিরে যাওয়া মনস্থ করব, সেদিনও কেউ পারবে না আমাকে বাধা দিতে।

'No power could prevent my getting out of India when I wanted to do so three years ago and no power will be able to prevent my return when the hour strikes.'

শুধু বেতার-ভাষণ নয়, অন্যান্যভাবেও তখন জোর প্রচারকার্য চলছে জনসাধারণের মধ্যে। বিশেষ করে দেশাত্মমূলক নাটকের মাধ্যমে। একটি উল্লেখযোগ্য নাটকের কাহিনী এই ফাঁকে বরং শুনে নাও।

সেনাবাহিনীর মধ্যে তখন রীতিমত চাঞ্চল্য। নেতাজীর নির্দেশ, প্রতিটি ইউনিটকে একটি করে স্বরচিত দেশাত্মমূলক নাটক অভিনয় করতে হবে। বিচারকদের বিচারে যে নাটকটি সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে, তাকে তিনি পুরস্কার দেবেন নিজের হাতে।

প্রতিটি ইউনিটে তখন সাজ-সাজ রব। ভাল নাটক লিখতে হবে। ভাল অভিনয় করতে হবে। তবেই না পুরস্কার!

ঘুম নেই ফিল্ড-প্রোপাগাণ্ডা বিভাগের তরুণ নাট্যকার ও অভিনেতা নাজির হোসেনের চোখে। হ্যাঁ, ভাল একটা নাটক লিখতেই হবে। ভাল অভিনয় করতে হবে। সবাইকে মাতিয়ে দিতে হবে। যে করে হোক, এ পুরস্কার তাঁকে পেতেই হবে। নেতাজীর নিজের হাত থেকে পুরস্কার নেওয়া কি কম ভাগ্যের কথা?

শুরু হল নাটক প্রতিযোগিতা। এক-একদিন এক-একটা ইউনিটের নাটক। এমনি করেই একদিন এল নাজির হোসেনের পালা।

সেদিন সকালে কি ভেবে দুরু-দুরু বক্ষে সুভাষের কাছে গিয়ে হাজির হলেন নাজির হোসেন। সামান্য প্রার্থনা তাঁর। বিচারকরা যা খুশি বিচার করুন তাতে তাঁর কিছু বলার নেই। শুধু একটি আর্জি—নেতাজী আজ নিজে উপস্থিত থেকে তাঁর নাটকটা একবার দেখুন। এ তাঁর বহুদিনের সাধ।

পারব কি! চিন্তিতভাবে জবাব দিলেন সুভাষ, আমি তোমাকে কথা দিতে পারছিনে নাজির ভাই। হাতে অনেক জরুরী কাজ রয়েছে। তবে সময় এবং সুযোগ করে উঠতে পারলে নিশ্চয়ই যাব।

মৌন অবগুণ্ঠনবতী সন্ধ্যা। তবু প্রকাশ্যে আলো জ্বালবার উপায় নেই। একবার আলোর রেখা চোখে পড়লে আর রক্ষা নেই। তক্ষুণি হয়তো শত্রু-বিমান এসে হানা দেবে ঝাঁকে ঝাঁকে। তাই কাজ চলছে অতি সংগোপনে, আলোর মুখে ঢাকনা দিয়ে।

সহসা কি দেখে মনটা দমে গেল নাজির হোসেনের। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। একটানা ঝরছে তো ঝরছেই। মুহূর্তেও বুঝি বিরাম নেই তার। সেই সঙ্গে সকাল থেকেই শুরু হয়েছে বোমাবর্ষণ।

নাটক কিন্তু চলবেই। ঝড়-বৃষ্টি বা বোমাবর্ষণ যা-ই হোক না কেন, মিলিটারী ডিসিপ্লিনের তাতে নড়চড় নেই।

সময় আগতপ্রায়। কুশীলবগণ প্রস্তুত। এবার শুরু হবে নাটক।

মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকতে লাগলেন নাজির হোসেন। আমার এত-দিনের এত পরিশ্রম, এত সাধ কি ব্যর্থ হবে? খোদা মেহেরবান। অন্তত এক মিনিটের জন্য নেতাজীকে তুমি এখানে হাজির করে দাও। বেশি নয়, মাত্র এক মিনিট। তার বেশি আমি চাইব না।

কিন্তু কোথায় নেতাজী! আশাহত বেদনায় বুকটা টন্‌টন্ করে ওঠে নাজির হোসেনের। লগ্ন সমাগত, কিন্তু নেতাজী আসেননি। আসা সম্ভবও নয়। এখনো বৃষ্টি ঝরছে টিপটিপ করে। পথঘাটও ভাল নয়। তার ওপর থেকে থেকে বোমাবর্ষণ। না, এ অবস্থায় নেতাজীর আসা সম্ভব নয়। উচিতও নয়। সর্বাগ্রে তাঁর নিরাপত্তার প্রশ্ন ভাবতে হবে তো।

ভাঙা মন নিয়ে নির্দিষ্ট সময়েই নাটক শুরু করে দিলেন নাজির হোসেন। প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্য শেষ। তখনো আশপাশে থেকে থেকে বোমা ফাটছে—বুম্‌ম্‌ম্! বুম্‌ম্‌ম্! সেই সঙ্গে মেসিনগানের একটানা গর্জন—ট্যা-ট্যা-ট্যা-ট্যা-ট্যা...

সহসা কি দেখে চমকে উঠলেন নাজির হোসেন। নেতাজী! নেতাজী এসেছেন! ভিজে, জলকাদা মেখে একাকার হয়ে গেছেন, কিন্তু মুখে সেই প্রশান্ত হাসিটি লেগেই রয়েছে।

একলাফে ছুটে গেলেন নাজির হোসেন। দয়া করে আমাকে অনুমতি দিন নেতাজী। আমি আবার গোড়া থেকে শুরু করতে চাই।

বেশ। স্মিতহাস্যে জবাব দিলেন সুভাষ, তোমার যখন ইচ্ছে, তখন তাই কর।

আবার নাটক শুরু হল নতুন করে। প্রথম দৃশ্য: ভারতবর্ষে অবস্থিত একটি গৃহ-প্রাঙ্গণ। পুত্রের জন্যে বিরহকাতর এক বৃদ্ধের ব্যাকুল প্রতীক্ষা। কবে তার বেটা ঘরে ফিরে আসবে। লড়াই শুরু হয়ে গেছে। ওপার থেকে নেতাজী ডাক দিয়েছেন—চলো দিল্লী! প্রতিটি ভারতবাসীকে এ ডাকে সাড়া দিতে হবে। মূল্য দিতে হবে। এ যে তাদের জাতীয় কর্তব্য।

কিন্তু সে যে এক অক্ষম বৃদ্ধ। এ ডাকে সাড়া দেবার সামর্থ তার কোথায়? হ্যাঁ, সে সামর্থ্য আছে তার বেটার। দীর্ঘকাল সে বাইরে রয়েছে। এবার সে ঘরে ফিরে আসুক, তারপর পিতা হয়ে নিজেই তাকে সে সাজিয়ে দেবে যোদ্ধার সাজে। বলবে, যাও বেটা, লড়াই কর। আজাদীর জন্য খুন দাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য: বৃদ্ধ পিতার সাধ পূর্ণ হয়েছে। বেটা তার ঘরে ফিরে এসেছে। কিন্তু এ কি! বৃদ্ধ অবাক! কোথায় তার সেই প্যায়ারেলাল! এ যে স্যুট-প্যাণ্ট পরা একজন খাঁটি সাহেব। মুখে ইংরেজী বুকনী। আর

হাতে সর্বক্ষণ সরাবের গ্লাস ধরাই রয়েছে। এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত!

পুত্রকে বোঝাতে চেষ্টা করে বৃদ্ধ, এ তোমার অন্যায় বেটা। দেশ এখন বলিদান চাইছে। আর তুমি কিনা সরাব খেয়ে সময় কাটাচ্ছ! বহুত শরমকী বাত।

তা কি করতে বল আমাকে? ঠোঁট বেঁকিয়ে প্রশ্ন করে বিলিতি সন্তান।

দেশের কাজ কর। দেশ আমাদের পরাধীন। এই তো আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের উপযুক্ত সময়। নেতাজী ডাক দিয়েছেন—দিল্লী চলো। তাঁর ডাকে সাড়া দাও। আজাদীর জন্য লড়াই কর। ওসব সরাব-টরাব ছেড়ে দিয়ে দেশের কাজ কর।

দেশের কাজ! হা-হা করে হাসে বিলিতি ছেলে, তারপরই একালের বুদ্ধিমানদের মত প্রশ্ন করে, কি হবে দেশের কাজ করে? তাতে আমার কি লাভ! কেয়া ফয়দা?

ফয়দা! আহত পশুর মত গর্জে ওঠে বৃদ্ধ পিতা, বেশরম! বেত্তমিজ! একথা উচ্চারণ করার আগে তোমার জিভ খসে পড়ল না! নইলে দেশের কাজ করতে গিয়ে কেউ লাভ-লোকসানের বিচার করে?

আরে যাও যাও। তাচ্ছিল্যভরে জবাব দেয় ছেলে, তোমার মত আমি বেয়োকুফ নই। জমানা বদল গ্যয়া। এখন আগে লাভ-লোকসানের বিচার, তারপর দেশের কাজ।

বুকভাঙা বেদনায় হাহাকার করে ওঠে বৃদ্ধ। সব মিথ্যে। সব মিথ্যে। মিথ্যে হয়েছে তার স্বপ্ন সাধ। ছেলে তার অমানুষের ভীড়ে হারিয়ে গেছে। আর কোনদিনই তাকে ফিরে পাওয়া যাবে না। কিন্তু এখন তার কি কর্তব্য! নেতাজী আজাদীর ডাক দিয়েছেন। কি করে সে চুপ করে থাকবে তাঁর ঐ ডাক শুনে? এ অবস্থায় তাঁর কি কিছু করণীয় নেই? বৃদ্ধ বলে শুধু কি সে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে ঘরের কোণে?

তৃতীয় দৃশ্য: লাঠিতে ভর দিয়ে বৃদ্ধ হেঁটে চলেছে ঠুক্‌ঠুক্‌ করে। সারাদেহ তার কাঁপছে অসহায় দৌর্বল্যে। মনে হয়, এখুনি বুঝি সে ভেঙে পড়বে জীবনী-শক্তির অভাবে। লক্ষ্য তার ভারত-বর্মা বর্ডার। যে করে হোক, ঐ বর্ডার পেরিয়ে নেতাজীর কাছে গিয়ে সে হাজির হবেই।

বলবে—তুমি আমাকে ক্ষমা কর নেতাজী। আমি অক্ষম পিতা। নিজের বেটাকে আমি তোমার কাজে দিতে পারিনি। তাই নিজেই চলে এসেছি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে। বল আমি এখন কি করব? তুমি আদেশ দাও।

সুরক্ষিত ভারত-বর্মা বর্ডার। এপারে ব্রিটিশবাহিনী, ওপারে আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ। একদলের লক্ষ্য মাতৃভূমিকে মুক্ত করা, অন্যদলের লক্ষ্য সাম্রাজ্য কায়েম রাখা।

এখানে-ওখানে ঘুর-ঘুর করে বৃদ্ধ, কিন্তু ওপারে যাবার কোন পথ খুঁজে পায় না। সর্বত্রই সশস্ত্র সেনাবাহিনী। একটু সন্দেহ হলেই রাইফেল উঁচিয়ে তারা হাঁক দেয়—হু কাম্‌স্‌ দেয়ার?

তবু পথ খুঁজে বেড়ায় বৃদ্ধ। সে শুনেছে, বাঙ্গাল মুলুকের কয়েকজন দুঃসাহসী তরুণ নাকি এর মধ্যেই ওপারে পৌঁছে গেছে। কে দেবে তাকে

সেই পথের নির্দেশ! বিশ্বাসই বা করবে কে! সর্বত্রই যে সতর্ক বেড়াজাল। কিন্তু তাকে যে একবার ওপারে যেতেই হবে। নেতাজীর কাছে ক্ষমা চাইতে না পারলে সে যে মরেও শান্তি পাবে না।

সহসা কি দেখে থমকে দাঁড়াল বৃদ্ধ। এ জায়গাটা যেন একটু ফাঁকা বলে মনে হচ্ছে। কাছে-কিনারে কেউ আছে বলেও মনে হয় না। এই সুযোগে ছুটে ওপারে চলে যাওয়া যায় না!

কাছেই জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে কয়েকটি ব্রিটিশ টমি। চোখে তাদের শাণিত দৃষ্টি। কে ওই বৃদ্ধ! ওর ভাবগতিক রীতিমত সন্দেহজনক। মনে হয় বর্ডার পেরিয়ে যাবার তাল খুঁজছে। কিন্তু কেন? শত্রুপক্ষের কোন গুপ্তচর নয় তো! নিশ্চয় তাই। ঐ যে সে চোরের মত এদিক-ওদিক তাকিয়ে বর্ডারের দিকে এগুচ্ছে। ঐ যে সে দৌড় শুরু করেছে—রেডি! ফায়ার! দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

চলতে চলতে বৃদ্ধ হঠাৎ গুলী খেয়ে লুটিয়ে পড়ল বর্ডারের ওপারের মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে মর্টার গর্জে উঠল উভয় পক্ষ থেকে। একদিকে ব্রিটিশবাহিনী, অন্যদিকে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ।

ক্রমশ এগিয়ে আসছে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ। আরো এগিয়ে। আরো কাছে। তাদেরও চোখে-মুখে গভীর বিস্ময়। কে এই বৃদ্ধ! কেনই বা সে এপারে আসতে চেয়েছিল এত বড় ঝুঁকি নিয়ে! কি মতলব ওর!

সবাই ভীড় করে দাঁড়াল আহত বৃদ্ধের চারপাশে।

কে ভাই তুমি? কেন তুমি এমনভাবে প্রাণ দিলে জেনে-শুনে?

হল না! হল না! একটা গভীর আর্তনাদ বেরিয়ে এল বৃদ্ধের বুক চিরে, বড় আশা নিয়ে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম অন্তত মৃত্যুর পূর্বে একবার নেতাজীকে নিজের চোখে দেখব, কিন্তু হল না। কিছুই হল না।

তন্ময় হয়ে বৃদ্ধ-বেশী নাজির হোসেনের অভিনয় দেখছেন সুভাষ। তাঁর চোখের সামনে কেমন যেন সব হারিয়ে যাচ্ছে, গুলিয়ে যাচ্ছে, মিলে-মিশে সব একাকার হয়ে যাচ্ছে। শুধু জেগে আছে এক মৃত্যুপথযাত্রী অসহায় বৃদ্ধ। সে তাকে একবার দেখতে চায়।

ওদিকে বৃদ্ধ তখনো বলে চলেছে, হল না! হল না! আমি হেরে গেলাম। মরতে আমার কোন দুঃখ নেই, শুধু দুঃখ এই যে, নেতাজীকে আমি একবার দেখতে পেলাম না। নেতাজীকে দেখা আমার অদৃষ্টে নেই।

বুঝি এক লহমার ব্যাপার, তারপরই হঠাৎ সবকিছু ভুলে গিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন সুভাষ। দুচোখে তাঁর ব্যাকুল-বিহ্বল দৃষ্টি। যেন ঐ দৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি বলতে চাইছেন—এই যে ভাই, আমি এখানে। তুমি আমাকে দেখতে চেয়েছিলে। এই দেখো, আমি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি!

উল্লেখযোগ্য যে, নাজির হোসেন কৃত এই নাটকটিই সেদিন শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছিল বিচারকদের বিচারে। নাম ছিল—'বলিদান'।*

---

* হিন্দী রাষ্ট্রধর্ম পত্রিকায় নাজির হোসেন লিখিত নিবন্ধ থেকে তথ্য সংগৃহীত। নাজির হোসেন বর্তমানে হিন্দী ছায়াচিত্রের একজন প্রখ্যাত অভিনেতা।

হ্যালো! হ্যালো! হ্যালো! আমি চোপরা বলছি...

চোপরা! একটা খণ্ডিত মুহূর্ত। তারপরই সাড়া পড়ে গেল আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ইনটেলিজেন্স দপ্তরে। চোপরা সাঙ্কেতিক ভাষায় কথা বলছে দিল্লী থেকে। কি খবর ভাই চোপরা? সাবমেরিনে কোন কষ্ট হয়নি তো? কেমন আছ তোমরা?

—এখনো পর্যন্ত নিরাপদেই আছি, তবে কতদিন থাকতে পারব জানিনে।

—খুব সাবধানে থাকবে। তারপর, খবর কি বলো?

—বাংলাদেশের এজেন্ট জানিয়েছে, আসামের দিকে প্রচুর সৈন্য চলাচল শুরু হয়েছে। মনে হয়, ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী একটা বড় রকমের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

—ও. কে.! বলে যাও।

—আমার মনে হয়, ইম্ফলে ওরা প্রচুর শক্তি সমাবেশ করেছে। কিছু কৃষ্ণকায় আফ্রিকান সৈন্যও রয়েছে বলে বাংলাদেশের এজেন্ট জানিয়েছে।

—ইয়েস, বলে যাও।

—গত একবছরে ইঙ্গ মার্কিন শক্তি কিছুটা সামলে নিয়েছে বলে মনে হয়। অস্ত্রশস্ত্র এবং বিমান-বহরও সমাবেশ করেছে প্রচুর। আমার মনে হয়, ওদের ইণ্ডো-বর্মা বর্ডারের ঘাঁটিগুলোতে হেভি বম্ব করা উচিত।

—বলে যাও।

—আই. এন. এ. সম্বন্ধে বেশির ভাগ লোক কিছু জানে না বলে মনে হয়, কারণ শত্রুপক্ষের বেতার শোনা এখানে আইনত দণ্ডনীয়। তবে মণি-পুরের দু-একজন প্রভাবশালী জননেতা আই. এন. এ. সম্বন্ধে খুবই উৎসাহী বলে জানা গেছে।

—এনি মোর?

—না, আপাততঃ আর কোন খবর নেই। পেলে যথাসময়ে জানাব। জয়হিন্দ্!

—ও. কে.। উইস ইউ গুড লাক। জয় হিন্দ্!

খবর শুনে অত্যন্ত খুশি হলেন সুভাষ। চোপরা তাহলে রিপোর্ট পাঠাতে সক্ষম হয়েছে। কাজটা খুব কঠিন সন্দেহ নেই। তবু যেটুকু খবর পাওয়া গিয়েছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিটিশ মুখপাত্রের ভাষায়ঃ

'মাস্টার চোপরার নেতৃত্বে যে দলটিকে ডিসেম্বর মাসে সাবমেরিনযোগে ভারতে পাঠানো হয়েছিল, এ সময়ে তাদের কাছ থেকে সংবাদ এসে গেল। তার ফলে মনের জোর অনেকখানি বৃদ্ধি পেল। চোখের সামনে এতবড় প্রমাণ দেখে গুপ্তচরদের শিক্ষাকেন্দ্র এবং সংগঠনের ওপর সুভাষচন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে জাপানীদের আপত্তি স্রোতের মত ভেসে গেল।'

বাংলাদেশের বিপ্লবী সতীর্থরাও পিছিয়ে ছিলেন না। এবার তাঁদের কথা কিছু কিছু বলছি তোমাকে। তার আগে সুভাষ সিঙ্গাপুরে এসেই

যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তার থেকে দু-একটি কথা আমি তুলে ধরব তোমার সামনে :

'I have publicly declared several times that when I left homeland in 1941, on an important mission, it was in accordance with the will of the vast majority of my countrymen. Since then, despite all the restrictions imposed by the C. I. D. I have remained in constant touch with my countrymen at home.'

[আমি আগেও বলেছি, ১৯৪১ সালে আমি যখন গৃহত্যাগ করি, তখন অধিকাংশ দেশবাসীর ইচ্ছানুসারেই তা করেছিলাম। তখন থেকে এ পর্যন্ত গোয়েন্দা-বিভাগ নানাভাবে বাধা দেওয়া সত্ত্বেও দেশবাসীর সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদান করা আমি বজায় রেখেছি।]

কথাটা অত্যুক্তি নয় মল্লিকা। বিপ্লবী সতীর্থদের সঙ্গে ক্ষীণ একটা যোগাযোগ প্রায় সবসময়েই সুভাষের ছিল, তবে তাদের সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত।

প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের মধ্যে বি. ভি.-র সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ, সত্যরঞ্জন বক্সী, মেজর সত্য গুপ্ত, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায় প্রমুখ সবাই তখন কারা-প্রাচীরের অন্তরালে। অনুশীলন সমিতির সর্বজনপ্রিয় মহারাজ শ্রীসংঘের অনিল রায়, লীলা রায়, বিপ্লবী নেতা পূর্ণদাস, শ্রমিক নেতা নীহারেন্দু দত্ত-মজুমদার—সবাই তখন কারা-রুদ্ধ। সুতরাং দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল প্রধানতঃ তরুণদেরই, যাঁরা তখনো পলাতক জীবন যাপন করছিলেন বিভিন্ন গুপ্তঘাঁটিতে।

তাছাড়া আসা-যাওয়া তো ছিলই মাঝে মাঝে। যেমন—চোপরা চোপরা অবশ্য বেশিদিন থাকতে পারেননি পুলিশের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কিছুদিন বাদেই তিনি দলবলসহ ধরা পড়ে গিয়েছিলেন পুলিশের হাতে

ডাঃ পবিত্র রায়ের নেতৃত্বে পরবর্তীকালে এসেছিলেন অমর সিং গীল মাহিন্দর সিং, তুহিন মুখার্জী প্রমুখ কয়েকজন। এঁরা সবাই পেনাং-এর সেই সিক্রেট সার্ভিসে শিক্ষাপ্রাপ্ত।

সেই একই ধরনের পরিকল্পনা। প্রথমে সাবমেরিন থেকে পুরীর সমুদ্র উপকূলে অবতরণ। তারপর এক-একদিকে এক-একজন। মাহিন্দর সিং গেলেন পাঞ্জাবে। তুহিন মুখার্জী বম্বে। পবিত্র রায় এবং অমর সিং গীল চলে এলেন কলকাতায়।

এবার যোগাযোগ। সবার আগে এলগিন রোডে অবস্থিত নেতাজীর বাসভবনের সঙ্গে একবার যোগাযোগ করা দরকার, কিন্তু পুলিশের নজর এড়িয়ে কি করে তা সম্ভব! নেতাজীর ভাই শ্রীযুক্ত সুনীল বসু একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক। রোগী সেজে তাঁকে একবার কল দিলে হয় না?

কাজেও তাই করলেন পবিত্র রায়। নিজে তিনি রোগী সেজে রইলেন খিদিরপুরে। অমর সিং গীল এলগিন রোডের বাড়ীতে গেলেন ডাঃ বসুকে কল দিতে।

কিন্তু কোথায় ডাঃ বসু! বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে তিনি তখন হাজারীবাগে। কবে ফিরবেন ঠিক নেই।

তাই তো! ভাবনায় পড়ে গেলেন অমর সিং গীল। কি করা যায় এখন! নেতাজীর মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করলে হয় না!

নেতাজীর মা! বিচিত্র এক কৌতূহলে চোখদুটো সজাগ হয়ে ওঠে কাছেই দণ্ডায়মান হরিদাস মিত্রের। কে এই আগন্তুক! কি চান উনি!

পরিচয় পেয়ে শেষ পর্যন্ত হরিদাস মিত্রকেই খিদিরপুর নিয়ে এলেন অমর সিং গীল। হরিদাসবাবু বসু-পরিবারের জামাতা। তাঁকে বিশ্বাস করা চলে।

সব কথা শুনে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করতে রাজী হলেন হরিদাস মিত্র। এ ব্যাপারে স্ত্রী বেলা মিত্রের আগ্রহ এবং উদ্দীপনা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আরো একজনকে পাওয়া গেল এ ব্যাপারে। নাম তাঁর জ্যোতিষ বসু।

খবর চলে গেল কলকাতা এবং ঢাকার বিভিন্ন গুপ্তঘাঁটিতে। প্রস্তুত থাকো সবাই। জিরো আওয়ার আসন্ন।

যোগাযোগ করা হল শক্তিশালী ট্রান্সমিটারের সাহায্যে। কলকাতা থেকে বলছি। আমরা ঠিকই আছি। ভয়ের কোন কারণ নেই।

সব ভেস্তে গেল লাহোরে মাহিন্দর সিং-এর গ্রেপ্তারের ফলে। ধরা পড়ে গিয়ে সব কিছু তিনি ফাঁস করে দিলেন পুলিশের কাছে। হ্যাঁ, আমি আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সিক্রেট সার্ভিসের লোক। পেনাং থেকে এখানে এসেছি নেতাজীর দূত হিসেবে।

অনুতাপে, আত্মগ্লানিতে তারপরই একদিন নিজেকে শেষ করে দিলেন মাহিন্দর সিং। আমি বিশ্বাসঘাতক। নেতাজীর সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। এরপরেও আমার আর বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। এর চাইতে মৃত্যুই শ্রেয়।

মাহিন্দর সিং-এর স্বীকারোক্তির জন্য হোক, বা যে কারণেই হোক, এবার ধরা পড়লেন জ্যোতিষ বসু। তারপর একে একে সবাই। পবিত্র রায়কে ধরা হল পুরীর একটা হোটেল থেকে। আর হরিদাস মিত্রের কাছ থেকে পাওয়া গেল শক্তিশালী একটা ট্রান্সমিটার।

সবার অলক্ষ্যে ক্যামাক স্ট্রীটের একটা বাড়িতে শুরু হল বিচার। যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল কাজেও তাই হল। রাজসাক্ষী তুহিন মুখার্জী মুক্ত। পবিত্র রায়, জ্যোতিষ বসু ও হরিদাস মিত্রের প্রাণদণ্ড।

এটা নতুন কিছু নয় মল্লিকা। এর আগেও যে সত্যেন বর্ধন, এস. আনন্দম, ফৌজ সিং, আব্দুল কাদের প্রমুখ তরুণগণ দুই ফ্রন্টের মধ্যে যোগাযোগ রাখতে গিয়ে ফাঁসির রজ্জুতে প্রাণ দিয়েছিলেন, সে কাহিনী তো তোমাকে দ্বিতীয় পর্বেই শুনিয়েছি।

আর প্রাণ দিয়েছিলেন মানকুমার বসু-ঠাকুর, এন. কে. দে, ডি. ডি. রায়চৌধুরী, এস. কে. মুখার্জী, এন. বড়ুয়া, পি. চক্রবর্তী, সি. মুখার্জী এবং কে. পি. আইচ প্রমুখ মাদ্রাজ উপকূল-রক্ষীবাহিনীর বাঙালী

তরুণবৃন্দ। বিদ্রোহের অপরাধে এ'দের সবাইকেই অতি সঙ্গোপনে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল মাদ্রাজ ফোর্টের অভ্যন্তরে।

কিন্তু এভাবে সবার অগোচরে প্রাণ দিলে তো চলবে না। যাবার আগে সব কথা জানিয়ে যেতে হবে দেশবাসীকে। তাই আলিপুর জেলের কনডেম্ড সেল থেকে পবিত্র রায় অতি গোপনে একটি চিঠি লিখে পাঠালেন বিপ্লবী নায়ক মহারাজকে। মৃত্যুর জন্য দুঃখ নেই। নেতাজীর সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। সবাই প্রস্তুত থাকুন।

আর অমর সিং গীল! আপীলের জন্য তাঁকে আবেদন করতে বলা হল সরকারের কাছে। হবেই যে তার কোন মানে নেই, তবু চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি।

আরে বাসরে বাস! শুনেই তিনি বোমার মত ফেটে পড়লেন তীব্র প্রতিবাদে। কভী নেহী। আমি সৈনিক, সৈনিকের মতই আমি মরতে চাই।

অমর সিং গীল এবং জ্যোতিষ বসুকে রাখা হয়েছিল প্রেসিডেন্সী জেলে। বাকী দুজনকে আলিপুর জেলের কনডেম্ড সেলে। ঠিক তখনই একদিন অমর সিং গীল এবং জ্যোতিষ বসুর সঙ্গে শ্রমিক-নেতা নীহারেন্দু দত্ত-মজুমদারের সাক্ষাৎ হয়েছিল প্রেসিডেন্সী জেলে। সেদিনের সেই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে তখনকার সময়ের সংবাদপত্রে কি লেখা রয়েছে দেখে নাও ঃ

রুদ্ধদ্বার-কক্ষে সর্দার গীল ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বসুর বিচার
অনুকম্পা ভিক্ষা করিতে সর্দার গীলের অসম্মতি

"শত্রুপক্ষের চর বলিয়া সামরিক আদালতে সর্দার অমর সিং গীল এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বসুর যে বিচার হইয়াছে শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত-মজুমদার (এম. এল. এ.) আজ তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। গীল ও বসুর উপর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ জারী হইবার পর শ্রীযুক্ত মজুমদার জেলে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মজুমদার বলেন, 'এই তথাকথিত বিচারের একটি বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, বাঙ্গলার যে সমস্ত স্থানে সাধারণতঃ বিচার বসে, তাহার কোথাও ইহা বসে নাই। ক্যামাক স্ট্রীটের একটি বেসরকারী বাড়ি ভাড়া করা হয় এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট সেখানে একজন বিচারককে প্রেরণ করেন; এই তথাকথিত বিচার রুদ্ধদ্বার-কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এবং উহার সম্পর্কে সকল সংবাদ সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়। আসামীদের সম্পর্কে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে জনসাধারণকে কিছুমাত্র জানানো হয় নাই এবং এমন কি, একটা বিচার যে চলিতেছে তাহাও প্রকাশ করা হয় নাই।

এই বিচারকালে এবং ভারতের অন্যান্য অংশে এ ধরনের মামলার বিচারের কালে আসামীদিগকে আত্মপক্ষ সমর্থনের এইমাত্র অধিকার দেওয়া হইয়াছে যে, সরকার কর্তৃক মনোনীত জনৈক আইনজীবীকে তাহাদের পক্ষ

সমর্থনের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। জনসাধারণের কাছে যে সামান্য সংবাদ প্রকাশ করা হয়, তাহা সমস্ত ব্যাপারটি শেষ করিয়া দণ্ডিত ব্যক্তিগণকে ফাঁসি দিবার পরেই করা হয়। কিন্তু তৎপূর্বে জনসাধারণ, পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবেরা এ সকল আসামীর অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছে সে সম্পর্কে একটি কথাও জানিতে পারেন না।'

গীল ও বসুর সহিত তাঁহার সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত মজুমদার বলেন. 'আমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলাম। বসু আমাকে এই অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, তাঁহার ফাঁসি হইয়া যাইবার পর তাঁহার স্ত্রীকে যেন সেবাগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর তত্ত্বাবধানে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং সেখানে যেন তাঁহার স্ত্রী কোন গঠনমূলক কাজের শিক্ষা লাভ করিয়া জাতির সেবা করেন। জাতির সেবায় প্রাণ বিসর্জন করিয়া তিনি নিজেকে সম্মানিত বোধ করিতেছেন।

গীল 'জয় হিন্দ্' বলিয়া আমাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, তিনি কোনরূপ অনুরোধ জানাইবেন না বা কোনরূপ অনুশোচনা প্রকাশ করিবেন না। অতঃপর তাঁহাদিগকে প্রেসিডেন্সী জেলের অভ্যন্তরস্থ ফাঁসি-কাষ্ঠের সন্নিকটবর্তী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট সেলে লইয়া যাওয়া হয়।'

শ্রীযুক্ত মজুমদার বলেন, 'উভয়ের প্রাণরক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাইবার জন্য পরে চেষ্টা করা হয়। কিন্তু গীল আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, তিনি আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈন্য এবং সৈন্যের মতই নিজের সম্মানকে ক্ষুন্ন না করিয়া তিনি মৃত্যুবরণ করিতে চাহেন'।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ ২০শে কার্তিক ঃ ১৩৫২ সাল]

তিনজনই তখন ফাঁসির অপেক্ষায়। লগ্ন সমাগত। এখন শুধু অপেক্ষা মাত্র।

ততদিনে যুদ্ধ প্রায় শেষ। ভাতরবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও তখন দ্রুত পরিবর্তনের মুখে। তাই সময় নেবার জন্য সবার অনুরোধে রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করলেন জ্যোতিষ বসু ও হরিদাস মিত্র। দেখাই যাক না আপীলের ফলে কিছু হের-ফের হয় কিনা!

অমর সিং গীল তাতেও নারাজ। নেহি মাংতা আপীল। আমিও আজাদী সৈনিক। জান দেবো সেভি আচ্ছা, তবু দুশমন ইংরেজ সরকারের কাছে নতি-স্বীকার কিছুতেই নয়।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য এঁদের কারোরই ফাঁসি হয়নি। শ্রীমতী বেলা মিত্রের অনুরোধে গান্ধীজীর হস্তক্ষেপের ফলে যুদ্ধ শেষে অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে এঁরাও যে মুক্তি পেয়েছিলেন, সেকথা তো তুমিও জানো। এ প্রসঙ্গে আরো একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন বর্মা থেকে হাঁটা-পথে আগত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত সঞ্জীব ব্যানার্জী। যুদ্ধ শেষে তাঁকেও মুক্তি দেওয়া হয়েছিল ঐ একই কারণে।

মহাযুদ্ধের অন্তরালে এমনি কত ঘটনা যে সেদিন ঘটেছিল কে তার খবর রাখে!

কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। ব্রিটিশের কাছে সুভাষ তখন পয়লা নম্বর শত্রু বলে চিহ্নিত। এ অবস্থায় তাদের গোয়েন্দা-বিভাগ যে সুভাষ-সমর্থকদের সম্বন্ধে প্রতিমুহূর্তেই সজাগ থাকবে তা বলাই বাহুল্য। তবু চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। তার জন্য সর্বতোভাবে ঝুঁকি নিতেও সেদিন পিছিয়ে থাকেননি মৃত্যুভয়হীন এই তরুণ-তরুণীর দল।

যেমন, কুমারী শান্তি রায়চৌধুরী। আজ এসব স্বপ্ন বলে মনে হয়, অথচ এ কাহিনী অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

অতি আধুনিকা হাল-ফ্যাশানের মেয়ে। ঠিক যেন হাল্‌কা ছন্দে ভেসে চলা একটি রঙীন প্রজাপতি।

ইণ্টার এলায়েড ইনটেলিজেন্স চীফ-এর সদর দপ্তর তখন কলকাতায়। তার প্রধান অধিকর্তা একজন আমেরিকান মেজর জেনারেল। শান্তি ছিলেন তাঁরই পার্সোনাল ক্লার্ক।

এমনি একদিনের ঘটনা। মাত্রাটা সেদিন একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিল জেনারেল সাহেবের। টেবিলের উপর যে ইণ্টার এলায়েড ডিসপজিশন অফ দি ফাইটিং ফোর্সেস-এর যুদ্ধ-সংক্রান্ত একটি অত্যন্ত গোপনীয় ব্লু-প্রিণ্ট রয়েছে, সে হুঁশও সেদিন তাঁর ছিল না।

যথাসময়ে ঘোর কেটে গেল জেনারেল সাহেবের। কিন্তু একি! ব্লু-প্রিণ্টটা কোথায়! টেবিলের উপরেই তো ছিল! তাহলে গেল কোথায়?

হৈ-চৈ পড়ে গেল গোয়েন্দা-দপ্তরে। মিলিটারীর গোপন জরুরী কাগজ-পত্র উধাও! এ যে ভয়ঙ্কর কথা! শত্রুপক্ষ একবার এ সামরিক তথ্য জানতে পারলে আর রক্ষা নেই।

খোঁজ-খোঁজ-খোঁজ! সর্বত্র খোঁজ! কিন্তু না, কোথাও নেই। যেন হাওয়ায় উড়ে গেছে মহামূল্যবান সেই ব্লু-প্রিণ্টটা।

তা হলে কোথায় যেতে পারে! কে নিতে পারে! যে-ই নিক না কেন, সে যে শত্রুপক্ষের চর তাতে কোন সন্দেহ নেই। কে সেই লোক! নিশ্চয়ই পার্সোনাল ক্লার্ক মিস শান্তি রায়চৌধুরী! এ ঘরে বাইরের কোন লোকের প্রবেশাধিকার নেই। তাহলে সে ছাড়া আর কে নিতে পারে?

শুরু হল জেরা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরা। বলো কোথায় রেখেছ ওটা! কাকে দিয়েছ? সব কথা খুলে বলো, নয় তো মৃত্যু অনিবার্য!

শান্তি হেসেই খুন। কি আশ্চর্য! মেয়েছেলে হয়ে ওসব নক্সা-টক্সা দিয়ে আমি কি করব বলুন তো? খুব দেখালেন যাহোক। এমন হাসি পাচ্ছে যে, কি বলব!

এসব অপরাধের একমাত্র শাস্তি মৃত্যু, তাই যথাসময়ে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করানো হল শান্তিকে। চোখদুটি বেঁধে দেওয়া হল রুমাল দিয়ে। এখন শুধু আদেশের অপেক্ষা মাত্র। তারপরই স্কোয়াড বাহিনীর উদ্যত রাইফেলগুলি এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে শান্তির দেহটাকে।

তখনো শান্তি একটানা হেসে চলেছে ঝর্ণাধারার মত। যেন ব্যাপারটা তার কাছে মস্তবড় একটা খেলা মাত্র।

ওয়ান...টু...

বাধা দিলেন সেই জেনারেল সাহেব। মেয়েটার সারামুখে কি শিশুর সারল্য! না, এমন মেয়ে কখনো একাজ করতে পারে না। নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হয়েছে। বরং আর-একবার ওকে ভাল করে জিজ্ঞেস করা যাক।

শোন মেয়ে! বার বার বোঝাতে চেষ্টা করলেন জেনারেল সাহেব, আমি সত্যিই তোমাকে স্নেহ করি। তোমাকে দেখলেই আমার নিজের মেয়ের কথা মনে পড়ে। কেন এভাবে প্রাণ দেবে? তার চাইতে ব্লু-প্রিণ্টটা ফিরিয়ে দাও, আমি কথা দিচ্ছি, কোনরকম শাস্তি দেওয়া হবে না তোমাকে। সে দায়িত্ব আমার।

সেই একই হাসি তখন শান্তির সারামুখে। বেশ মজা তো! আমি কি বাচ্চা মেয়ে নাকি যে, নক্সার বই নিতে যাব! টয়লেট্‌স গুড্‌স্ হলে বরং কথা ছিল। কিন্তু ওসব নক্সার বই দিয়ে আমি কি করব! ধুয়ে ধুয়ে জল খাব?

আবার সেই ফায়ারিং স্কোয়াড। আবার সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। অপরাধীর সাজা হোক, এটা সবসময়েই কাম্য, কিন্তু এ মেয়েটি কি সত্যিই অপরাধী! এমন হাসি-খুশিতে উচ্ছল প্রাণবন্ত মেয়ের পক্ষে কি এহেন ভয়ঙ্কর কাজ করা সম্ভব?

অনেক ভেবে-চিন্তে শেষ পর্যন্ত পাঠিয়ে দেওয়া হল আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। সেই সঙ্গে গোপন নির্দেশ। মেয়েটিকে ভাল করে ওয়াচ করো। সন্দেহজনক কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গেই রিপোর্ট পাঠাবে আমাদের কাছে।

যথাসময়ে রিপোর্ট এল আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে। সন্দেহ অমূলক। অত্যন্ত হাল্‌কা টাইপের মেয়ে। এর দ্বারা কোন গুরুতর কাজ করা সম্ভব নয়। মনে হয় মেয়েটি নির্দোষ।

নির্দোষ! তাহলে ব্লু-প্রিণ্টটা কে সরিয়েছিল ওখান থেকে? গেলই বা কোথায়? এ নাটকের প্রধান আসামীই বা কে?

আসামী স্বয়ং শান্তি রায়চৌধুরী, পুলিশের ভাষায়—যার পক্ষে এমন গুরুতর কাজ করা কোনদিনই সম্ভব নয়। হ্যাঁ, তিনিই সেদিন সেই ব্লু-প্রিণ্টটা দিয়েছিলেন বৈপ্লবিক সংস্থা বি. ভি.-এর তরুণদের হাতে। তারপর সোজা সীমান্তের ওপারে।

রেহাই পেলেন না গোপাল সেন। সবার অলক্ষ্যে একদিন তিনি শেষ হয়ে গেলেন দানবের হাতে। এ ঘটনা ঘটেছিল আরো পরে। তারিখটা ছিল ১৯৪৪ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর।

পুলিশ তখন হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে হিংস্র হায়েনার মত। সুভাষ-সমর্থকদের মধ্যে কাউকেই জেলের বাইরে রাখলে চলবে না। তার জন্য হত্যা করতে হয় তো সে ভি আচ্ছা, তবু জেলের বাইরে কিছুতেই নয়।

সরকারী মুখপাত্র স্টেটস্‌ম্যান অবশ্য আগে থেকেই দাবী তুলেছে স্পষ্ট

ভাষায়। সুভাষ-সমর্থকদের অবিলম্বে ধরে ধরে হত্যা করা হোক্। হত্যাই তাদের একমাত্র শাস্তি।

'...Nevertheless we all know that Bengal was the home of a small but convinced pro-fascist party led by Mr. Subhas Chandra Bose.

It is the business of the Government to round up the enemies of the country forthwith and put them to death. No quarter whatever should be given to them....The penalty for traitors to India must be death.'

[The Statesman: 13. 3. 42]

এমনি একদিনের কথা। বড়বাজারের ৪৬নং শিবঠাকুর লেনের চারতলার একটি কক্ষে সেদিন কেমন যেন একটু চাপা চঞ্চলতা।

আসলে এটা ছিল বি. ভি.-র অতি নির্ভরযোগ্য একটি গুপ্তঘাঁটি। বর্মা থেকে আগত সিক্রেট সার্ভিসের লোক এবং বি. ভি.-র মধ্যে এটাই ছিল তখন প্রধান যোগাযোগ কেন্দ্র।

যোগাযোগ হত প্রধানতঃ সত্য বক্সীর ছোট ভাই সুধীর বক্সীর মাধ্যমে। তিনি পুলিশের সন্দেহভাজন নন। তাই সুবিধাও ছিল প্রচুর।

সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। সন্ধ্যা তখন হয়-হয়। ঘরে গুটি-কয়েক তরুণ। তাঁদের মধ্যে দুজন সীমান্তের ওপার থেকে আগত।

সহসা কি শুনে মুখ তুলে তাকালেন তরুণবৃন্দ। দরজায় সাঙ্কেতিক করাঘাত—ঠক্-ঠক্ঠক্ঠক্—ঠক্ঠক্-ঠক্...

দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকলেন দুটি তরুণী। দীপ্তি ঘোষ আর হেনা ঘোষ। কিছু জরুরী কাগজপত্র তুলে দিয়ে যেমন এসেছিলেন, তেমনি নিঃশব্দেই আবার তাঁরা নীচে নেমে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে। কে-কি-কেন কোন প্রশ্ন নেই। বিপ্লবীদলে এসব কৌতূহল নিষিদ্ধ।

কাগজগুলো গোপাল সেনের কাছে গচ্ছিত রেখে এবার বেরিয়ে গেলেন সত্যব্রত মজুমদার এবং ধীরেন সাহা-রায়। সঙ্গে গেলেন সীমান্তের ওপার থেকে আগত সদস্যদ্বয়। আপাততঃ লক্ষ্য তাঁদের সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা হোটেল। সিক্রেট সার্ভিসের লোকদের একটি গোপন আস্তানা ছিল তখন ঐ হোটেলের এক নিভৃত কক্ষে।

এদিকে চারতলার ঘরে রইলেন তখন মাত্র দুজন। নীরেন রায় আর গোপাল সেন।

ঠক্; ঠক্-ঠক্ঠক্-ঠক্ঠক্-ঠক্ঠক্....

চমকে উঠলেন বিপ্লবী তরুণদ্বয়। না, এ তো তাঁদের পরিচিত সেই সাঙ্কেতিক শব্দ নয়। নিশ্চয় কোন নতুন লোক।

কিন্তু কেন! কি প্রয়োজন এখানে! কে ওরা!

পুলিশ! পুলিশ! পুলিশ! পুলিশ ছাড়া আর কেউ নয়। ঐ যে ওদের পাগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কাঠের দরজার ফাঁক দিয়ে। হ্যাঁ, পুলিশই। অসংখ্য পুলিশ।

পিঠ দিয়ে সজোরে দরজা চেপে ধরলেন নীরেন রায়। আর সেই অবকাশে গোপাল সেন জরুরী কাগজগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিলেন দিয়াশলাই জেবলে! পুড়ে ছাই হয়ে যাক। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। তবু এগুলো যেন কিছুতেই ওরা উম্ধার করতে না পারে।

একদঙ্গল পুলিশের বিরুদ্ধে একার শক্তি আর কতক্ষণ! তাই কিছু-ক্ষণের মধ্যেই কাঠের দরজা ভেঙে পড়ল হুড়মুড় করে। তারপরই শুরু হল ধস্তাধস্তি। পুলিশ সেই অর্ধদগ্ধ কাগজগুলো উম্ধার করতে বম্ধ-পরিকর। কিন্তু গোপাল সেন তাতে রাজী নন। প্রাণ যায় যাক, তবু এসব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-সম্বলিত কাগজ কিছুতেই ওদের হাতে দেওয়া চলবে না। নেতাজীর কর্মপ্রচেষ্টা এতটুকু ব্যাহত হতে পারে, এমন কোন কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

বটে! এখনো তেজ দেখানো হচ্ছে! তবে দেখ। বলেই বিরাট এক ধাক্কা। সঙ্গে সঙ্গে গোপাল সেনের দেহটা নীচু রেলিং টপকে চারতলা থেকে সশব্দে গিয়ে আছড়ে পড়ল শক্ত মাটির বুকে। ব্যস, শেষ। গোপাল সেন তাঁর নিজের প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন যে, সত্যিকারের বিপ্লবী বরং ভাঙে, তবু মচকায় না।

বি. ভি.-র তখন বেশ দুঃসময় চলেছে। বলতে গেলে কেউ বাইরে নেই। সুধীর বক্সী এবং ধীরেন সাহা-রায়ও ধরা পড়ে গেছেন কিছুদিন বাদে। মিলিটারীর প্রার্থনা মত তারপরই তাঁদের পাঠানো হয়েছে লাহোর দুর্গে। পরের ইতিহাস সহজেই অনুমেয়।

উল্লেখযোগ্য সদস্যদের মধ্যে তখনো কামাখ্যা রায়, সত্যব্রত মজুমদার এবং শান্তিময় গাঙ্গুলী পলাতক।

সেই শান্তিয়ম গাঙ্গুলী, যিনি ১৯৪১ সালে বার্লিনে অবস্থিত সুভাষের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য পায়ে হেঁটে কাবুল গিয়েছিলেন ভগৎরামের সঙ্গে।

শান্তিময় গাঙ্গুলীর লক্ষ্য তখন—বর্মা। চট্টগ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে ওপারে যাওয়া যায় না! দেখাই যাক না একবার চেষ্টা করে!

চলে গেলেন চট্টগ্রাম। আশ্রয় দিলেন বি. ভি.-র পরম শুভার্থী ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রবীণ নেতা চট্টগ্রামের মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী এম. এল. এ. সাহেব। এ ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ ছিল অপরিসীম।

ইসলামাবাদী সাহেবের মত এমন তেজস্বিতা এবং সংগঠন ক্ষমতা খুব কম নেতারই ছিল তখনকার সময়ে। তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে তিনি অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলেন সুভাষের।

ব্যবস্থা প্রায় ঠিক। আর ক'দিন বাদেই শান্তিময়বাবু যাত্রা শুরু করবেন চট্টগ্রাম থেকে। ইসলামাবাদী সাহেবের সহকর্মীরাই তাঁকে পৌঁছে দেবেন সীমান্তের ওপারে।

না, হল না। তার আগেই শান্তিময় গাঙ্গুলী গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন অন্য একটি সেল্টার থেকে।

ধরা পড়লেন ইসলামাবাদী সাহেব নিজেও। তারপরই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল সেই লাহোর দুর্গে।

সত্যব্রত মজুমদারও রেহাই পাননি। বেশ কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকবার পর তিনিও একদিন ধরা পড়ে গেলেন আকস্মিকভাবে। তারপর সোজা লাহোর দুর্গে।

ধরা সম্ভব হল না বি. ভি.-র দুঃসাহসী তরুণ অজিত রায়কে। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-বুথিডং সেক্টর পেরিয়ে ততদিনে তিনি পেঁাছে গেছেন একেবারে রেঙ্গুনে। সে কাহিনী যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনিই অকল্পনীয়। অথচ এ প্রসঙ্গে আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে ৭. ২. ৬৯ তারিখে আজাদ হিন্দ্ সরকারের উপদেষ্টা পরম শ্রদ্ধেয় দেবনাথ দাস যা জানিয়েছেন, তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এ কাহিনীর মধ্যে অত্যুক্তি বলতে কিছুই নেই। তিনি লিখেছেন ঃ শ্রীঅজিত রায়কে আমি জানি। তিনি Thinganyun এবং Kamba ট্রেনিং-ক্যাম্পে সামরিক শিক্ষালাভ করেছিলেন।'

দীর্ঘ রোমাঞ্চকর কাহিনী। সে কাহিনী সংক্ষেপে শোনাবার ভার আমি অজিত রায়ের উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি ঃ

'১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাস। দলের আদেশে কলকাতা এলাম শ্রীযুক্ত কামাখ্যা রায়ের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি জানালেন সীমান্ত অতিক্রমণে মৌলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী সাহেব পূর্ণ সহায়তা দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। এবং তার জন্য 'কৃষক' পত্রিকার সম্পাদক সিরাজুদ্দিন সাহেবকে সঙ্গে করে মৌলানা সাহেবের কাছে যেতে হবে। এ ব্যাপারে জগদীন্দ্র (পানু) সেনের সাহায্য নেবার কথাও কামাখ্যাদা আমাকে বলেছিলেন।

মৌলানা সাহেবের সঙ্গেই একদিন চাঁদপুর রওনা হলাম মেল ট্রেন ধরে। আমার নামকরণ হল—মজিদ। বাড়ি কুমিল্লার কাছেই মীরেশ্বরী গ্রামে।

স্টীমারে মৌলানা সাহেব তাঁর শ্যালক মুরশেদ মিঞার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁরই নির্দেশমত মুরশেদ মিঞা আমাকে নিয়ে চট্টগ্রাম হয়ে 'বাইনজুরি' এসে পেঁাছলেন। তিন-চারদিন বাদে মৌলানা সংবাদ পাঠালেন—আমাকে চট্টগ্রাম গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

চট্টগ্রামের এতিমখানায় মৌলানা সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। সেইখানেই আমার থাকার ব্যবস্থা হল, এবং তাঁরই মাধ্যমে তুম্বিসাহেব ও জালাল-এর সঙ্গে পরিচিত হলাম। তুম্বিসাহেব আরাকানের প্রতিপত্তিশালী মুসলিম নেতা।

...কক্সবাজার পেঁাছতে চারদিন লাগল। পথে সে কি ঝড়! মনে হল, মৃত্যুর বড়োই যেন কাছাকাছি এসে গিয়েছি।

কক্সবাজার পেঁাছে কুলি সেজে হাঁটাপথে চলেছি। সামরিক ঘাঁটির পর ঘাঁটি। কুলি-মজুর আর মিলিটারি ছাড়া কেউ কোথাও নেই।

মুরশেদকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলেছি। আরো তিনদিনের পথ পেরিয়ে পেঁাছলাম এসে 'গন্দুমবাজার'।

একটি হোটেলে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা মুরশেদই করে দিলেন। পথশ্রমে

আমরা দুজনেই বিশেষ ক্লান্ত। দরাজ হাতে চাটাই পেতে রাখা হয়েছে ঘরের মেঝেতে। পঁচিশ-ত্রিশজন কুলি-মজুরের শোবার ব্যবস্থা। ওখানেই স্থান করে নিলাম।

রাত্রিতে তুম্বিসাহেবের সংগে দেখা হল। অনেক রাত পর্যন্ত পরামর্শ চলল। তম্‌বরুঘাট থেকে বুথিডং বা মঙদো দীর্ঘ ত্রিশ মাইল পথ। মাঝে পঁচিশ মাইল সাহেববাজার পর্যন্ত বেওয়ারিশ অঞ্চল। এই ত্রিশ মাইল অতিক্রম করা সহজসাধ্য নয়। তাছাড়া পথে পড়বে তিনটি বড় বড় নদী ও আরাকান পর্বতমালা।

ঠিক হল তিন সপ্তাহ পরে আমি 'উখিরা'র ঠিকাদার হামিদ আলীর সংগে দেখা করলেই উপযুক্ত সংগী এবং পথের খোঁজ-খবর পেয়ে যাব। তুম্বিসাহেবও নির্দিষ্ট দিনে সেইখানে উপস্থিত থাকবেন।

তিন সপ্তাহ পরে 'দোহাজারি' হয়ে হাঁটাপথে 'উখিরা' এসে উপস্থিত হলাম। তুম্বিসাহেবও ওখানেই ছিলেন। শুনলাম ব্যবস্থা পাকা হয়ে আছে। এখন রওনা হলেই হয়।

আমার গাইড হিসেবে তুম্বিসাহেব একটি লোক দিলেন, নাম তার রসিদ। আর দিলেন একটি পরিচয়পত্র সাহেববাজারের জনৈক মাস্টার সাহেবের নামে।

পার্বত্যপথ ধরে চলেছি আমি এবং গাইড। গোপীবাগ পার হয়ে সমতল অঞ্চলে নামলাম। এর পরেই তঙ বাজার। তারপর শুরু হয়েছে বেওয়ারিশ অঞ্চল।

কিছুদূর অগ্রসর হতেই মাঠে কর্মরত চাষীদের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলাম। গাইড খোঁজ নিয়ে জানালো যে, জাপানীরা নাকি এদিকেই আসছে। গাইড এগুতে ভয় পাচ্ছে। তাকে ভরসা দিলাম যে, আমি জাপানীদের বন্ধু, সুতরাং ভয়ের কোন কারণ নেই।

গাইডকে একরকম টেনেই এগিয়ে চললাম। খানিকটা হেঁটে একটা গ্রামে ঢুকলাম। দেখলাম দুজন জাপানী সৈনিক মুরগী ধরার চেষ্টা করছে। তাই দেখে গ্রামের লোক দৌড়াচ্ছে এদিকে-ওদিকে। গাইডও ভয় পেয়ে তাদের দলে মিশে গেল।

আমি তখন একা, কিন্তু মনে বড় আনন্দ। এবার নিশ্চয় ওদের সাহায্যে নেতাজীর কাছে যাবার পথ পেয়ে যাব।

ইংরেজী-হিন্দী-বাংলা সব ভাষাতেই আমি মনের কথা বোঝাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোন কাজ হল না। একটা মুরগী হস্তগত হয়েছে। ওটা নিয়ে ওরা রওনা হল এবং আমার দিকে রাইফেল উঁচিয়ে ধরে নিষেধ করল ওদের অনুসরণ করতে।

মরীয়া হয়ে আমি ঐ সৈনিকদের লক্ষ্য করেই হাঁটা শুরু করলাম। একমাত্র ভরসা ভগবান। সৈনিকরা উধাও হয়ে গেছে। কিন্তু যেদিকে তারা উধাও হয়েছে সেদিক পানে আমার যাত্রা।

পথে পড়ল নাফ, মায়ু ও কালপাঙজিং নদী। সাঁতরে পার হতে হল।

এলাম নালেদং। এখানে জনমানব নেই। পাহাড়ের পর পাহাড়। যতদূর চোখ যায় কেবল পাহাড়ের মালা।

এবার কোথায় যাব জানি না। ক্ষুধায় পেট জ্বলে যাচ্ছে। হাতে-পায়ে সর্বাঙ্গে যেন বশ নেই। দেহমনে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছি রুক্ষ মাটির উপর। নিজেকে মনে হচ্ছিল একান্ত একা, সীমাহীন অরণ্য-পর্বতের নির্জনতায়।

কিন্তু আমি জানতাম না যে, বহুক্ষণ ধরেই আমি কারো সতর্ক দৃষ্টির পাহারায় বন্দী ছিলাম। চিতাবাঘ নিজেকে গোপন রেখে গিরিকন্দর বেয়ে যেমন শিকার অনুসরণ করে, আমাকেও তেমনি তিনজন জাপানী সৈন্য গোপনে অনুসরণ করছিল। এবার ভগবানের আশীর্বাদের মত তারা আমাকে ঘিরে ফেলল।

দেহতল্লাশি করে কয়েকটি ভারতীয় মুদ্রা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। সামনে একজন এবং পেছনে দুজন অবস্থান করে তারা আমাকে নিয়ে চলল ক্যাম্পের দিকে। ক্যাম্পে ঢুকে আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

সারা রাত প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তর দিতে ও নানারকম বিবৃতি লেখানোতেই কেটে গেল। পরের দিন বন্দীদশায় কাটল সকাল-দুপুর সন্ধ্যা। রাতে এলেন মেজর মেহরি ও ক্যাপ্টেন মিউচি। ঘণ্টাখানেক তাঁরাও প্রশ্ন করলেন আমার পার্টি সম্পর্কে। অর্থাৎ আমি সত্যিই বি. ভি.-র সদস্য কিনা এ সম্পর্কে তাঁরা স্থির নিশ্চয় হতে চান। আমাকে নানাভাবে বাজিয়ে নেবার মধ্যেই আমি সেটা বুঝতে পারলাম। যাহোক, অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া গেল।

পরের দিন 'পেরাবীন' চলে আসি। এখানে জাপানীদের আতিথেয়তার কোন ত্রুটি ছিল না। সাতদিন সেখানে অবস্থান করি। তখন জাপানী কর্তারা আমাকে বাংলায় ফিরে গিয়ে মোটামুটি নিম্নোক্ত কাজগুলি করতে বললেন :

(১) চট্টগ্রাম থেকে বলিবাজার পর্যন্ত যোগাযোগ রক্ষার্থে বেশ কয়েকটি আশ্রয়-ঘাঁটি করতে হবে।

(২) জেল থেকে নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের মুক্ত করতে হবে।

(৩) সংবাদ সংগ্রহ এবং সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থার মধ্যে খুঁত রাখলে চলবে না।

বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম। কামাখ্যাদা এবং অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গেও আলাপ হল। সংবাদ সংগ্রহ, জেল থেকে বন্ধুদের মুক্ত করার চেষ্টা এবং যোগাযোগ স্থাপনের কাজ শুরু হল।...

চট্টগ্রাম থেকে গন্দুমবাজার পর্যন্ত আমরা অনেকগুলি ঘাঁটি স্থাপন করতে পেরেছিলাম। কোন কোন সামরিক ঘাঁটির মধ্যে আমরা ক্যাণ্টিন করতেও সক্ষম হয়েছিলাম। এই ঘাঁটিগুলির মাধ্যমে লুঙি ইত্যাদি সরবরাহ করা হতো এবং সেই ফাঁকে সংবাদ ইত্যাদিও পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, মৌলানা ইসলামাবাদীর সাহায্য ব্যতীত বর্ডার অঞ্চলে এসব

কাজে হাত দেওয়া অসম্ভব ছিল। তবু কোনদিকেই আশানুরূপ কাজ এগুচ্ছিল না।

১৯৪৪ সালে আমাকে আকিয়াব পর্যন্ত যেতে হল। শুনলাম, নেতাজী জানিয়েছেন যে, কোন বিপ্লবী ফ্রন্টিয়ার অতিক্রম করে এলে তাকে যেন তাঁর কাছে রেঙ্গুন পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

রেঙ্গুনের পথে রওনা হয়ে প্রতি পদক্ষেপে বিমান-আক্রমণের সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। সময় সময় মেসিনগানের গুলীবর্ষণের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম।

আকিয়াব থেকে আটদিনে পৌঁছেছিলাম রেঙ্গুনে। সে যাত্রা যে কি বিপজ্জনক ছিল তা বলে শেষ করা যায় না। আকিয়াব থেকে 'তঙ্গাপ' পর্যন্ত গেলাম জাপানীদের মোটরবোটে। তঙ্গাপ থেকে 'পাদঙ্গ' জিপ-এ। পাদঙ্গ থেকে 'প্রোম' (ইরাবতী নদী স্টীমারে পেরিয়ে) এবং প্রোম থেকে রেঙ্গুনে ট্রেনে।

আমার সঙ্গে ছিলেন মরিয়ত গুল্হাই। গুল্হাই মানে নায়েক। রেঙ্গুনের আগেই 'কিম ইন্দাইন' রেল-স্টেশনে নেমে আমরা চলে গেলাম 'হিকারী কিকান' হেড কোয়ার্টার্সে।

হেড কোয়ার্টার্সে পৌঁছবার পর ক্যাপ্টেন সুগমটো আমাদের সংবাদ নেতাজীকে দিতে গেলেন মোটরবাইক করে। আধঘণ্টার মধ্যেই মেজর নারায়ণ গোপালস্বামী চলে এলেন আমাদের কাছে। তাঁর কাছে শুনলাম যে, সে-রাতে জাপানীদের সঙ্গেই থাকতে হবে এবং পরদিন তিনি আমাকে যথাস্থানে নিয়ে যাবেন।

বর্মার প্রাক্তন গভর্ণরের বাড়িতে জাপানী কর্মচারীদের বাসস্থান। আমি সেখানেই রাত কাটালাম। পরদিন রেঙ্গুনের রয়েল হোটেলে জাপানী অফিসারদের সঙ্গেই মধ্যাহ্ন ভোজন করা হল। খাবার টেবিলে উপস্থিত ছিলেন বিদ্রোহী নাগাদের পরবর্তী নেতা ফিজো ও তাঁর দু-একটি বন্ধু।

তিনটে নাগাদ মেজর স্বামী এলেন। বললে—নেতাজীর কাছে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য তিনি এসেছেন এবং এখন থেকে আমার ছদ্মনাম হবে—'গুপ্ত'। এসেছি 'তাওয়াই' (মৌলমিন—দক্ষিণ বর্মা) থেকে, বাংলা থেকে নয়।

হিকারী কিকানের দপ্তর থেকে রওনা হয়ে যথাসময়ে পৌঁছলাম নেতাজীর বাংলোর গেটে। বাংলোটি ছিল ইউনিভারসিটি এ্যাভেন্যুতে কন্দান হ্রদের কাছে।

গাড়ি থেকে নামতেই মেজর স্বামী চাপাকণ্ঠে বললেন—নেতাজী। আগ্রহ-ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখি—আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান সামরিক পোশাক পরিহিত আমাদের দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র। প্রণাম করবার অবকাশ হল না। তার আগেই তিনি আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন দোতলার ঘরে।

নেতাজী আমাকে বসিয়ে দু-একটা কথা বলেছিলেন। কি বলেছিলেন মনে নেই। কি উত্তর দিয়েছিলাম জানিনে। তখন আমার বাক্শক্তি রুদ্ধ; আমি আনন্দে, বিস্ময়ে ও আবেগে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম।

শুধু মনে আছে প্রথমেই তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন আমাদের পার্টির সত্যরঞ্জন বক্সীর কথা। তারপর একে একে হেমচন্দ্র ঘোষ, মেজর সত্য গুপ্ত, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, মণীন্দ্র রায়, রসময় শুর, জ্যোতিষ জোয়ারদার এবং যতীশ গুহের কথা।

আর বলেছিলেন আমাকে ট্রেনিং নেবার কথা। আধুনিক যুদ্ধে অংশ-গ্রহণ করতে হলে কি কি ট্রেনিং থাকা দরকার, তাও সেদিন তিনি বিস্তারিত-ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে।

ট্রেনিং আমি যথাযথভাবেই নিয়েছিলাম। নাশকতা বিদ্যা যে কি কৌশলপূর্ণ ও কার্যকরী তা আমি মোটামুটি ভালভাবেই আয়ত্ত করার সুযোগ পেয়েছিলাম। এ বিদ্যা আগস্ট-বিপ্লবীদের জানা থাকলে ১৯৪২ সালে ইংরেজের আর রক্ষে থাকতো না।

এবার শেষ বোঝাপড়া।

ইম্ফল অভিযান আসন্ন। খুব শিগগীরই আজাদ হিন্দ্ ফৌজ যাত্রা শুরু করবে আরাকান, কালাদান উপত্যকা এবং চীন পাহাড়ের দিকে। তার আগে জাপ-বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল কাওয়াবের সঙ্গে ভাল করে একবার বোঝাপড়া করে নেওয়া প্রয়োজন।

জাপান মিত্ররাষ্ট্র। কি প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো, কি সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক সুগিয়ামা, কি বৈদেশিক মন্ত্রী সিগিমিৎসু কারো কাছেই এ পর্যন্ত অসহযোগিতার কোন মনোভাব পরিলক্ষিত হয়নি। তবু এসব গুরুতর ব্যাপারে কাউকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে নেই। তাই প্রতিটি ব্যাপারে, প্রতি মুহূর্তে সজাগ থাকা প্রয়োজন।

কোন ঝগড়া-বিবাদ নয়। তর্ক-বিতর্কও নয়। এবারের যুদ্ধে জাপান বিজয়ী পক্ষ, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই কাজ গুছিয়ে নিতে হবে অতি পদক্ষেপে, ঠাণ্ডা মাথায়। সেখানে মোহন সিংএর মত উত্তেজনা প্রকাশ করলে নিজেদেরই ক্ষতি।

বৈঠকের পর বৈঠক। দিনের পর দিন। রাতের পর রাত।

অবশেষে কয়েকটি নির্দিষ্ট শর্তে একটা স্থির সিদ্ধান্তের বিন্দুতে এসে দাঁড়ালেন সুভাষ এবং জেনারেল কাওয়াবে। বিশেষ বিশেষ শর্তগুলি এখানে তুলে দিচ্ছি, মল্লিকা। ভাল করে দেখে নাও যে, সুভাষ কর্তৃক গৃহীত এই শর্তগুলোর মধ্যে কোথাও ভারতবর্ষের জাতীয় সম্মান বা স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে কিনা।

1. The two armies would work on a common strategy.

2. Officers and men of the Azad Hind Fouj would be under their own military law (The I.N.A. Act) and not under the Japanese military law and police.

3. Liberated territories were to be handed over to the Azad Hind Fouj.

4. A definite independent sector would be allotted to the Azad Hind Fouj.

5. The only flag to fly over the Indian soil would be National Tri-colour.

6. No indiscriminate bombing in Calcutta was to be carried out.

7. Any Japanese or Indian soldier found looting or raping any woman was to be shot at once.

অর্থাৎ—দুপক্ষ একই উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করবে। আই. এন. এ.-র অফিসার এবং সৈন্যগণ তাদের নিজস্ব সামরিক আইনের আওতায় থাকবে, জাপানের কোন আইন তাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হবে না। ভারতবর্ষের দখলীকৃত অংশ আজাদ হিন্দ্ ফৌজের হাতে থাকবে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ একটা নির্দিষ্ট অংশে স্বতন্ত্রভাবে লড়াই করবে। অধিকৃত অংশে কেবলমাত্র ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা উড়তে পারবে। কলকাতায় যথেচ্ছভাবে বোমাবর্ষণ করা চলবে না। জাপানী হোক, বা ভারতবাসী হোক, কোন সেনাকে লুটপাট বা নারী-ধর্ষণ করতে দেখা গেলে তৎক্ষণাৎ তাকে গুলী করা হবে।

সেই মুহূর্তেই জাপ-সেনাদের উদ্দেশে এক কঠোর নির্দেশ জারী করলেন জেনারেল কাওয়াবে। সাবধান, এ নির্দেশ প্রতিটি সেনাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। অন্যথায় কঠোর শাস্তি।

'The Japanese Commander-in-Chief greatly appreciated this and issued similar orders to his own Army.'

[Maj. Gen. Chatterjee: P.—165]

এখানেই শেষ নয়, আরো আছে, যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

'Japanese civilians and institutions moving into the liberated regions, including Japanese banks and firms, would come under the control of the Governor-Designate and would use only the currency notes of the Azad Hind Government.

The National Bank of Azad Hind would be the only authorised bank of the Provisional Government and the Japanese banks and firms would operate under the control and direction of the National Bank.' [Story of the I. N. A.: S. A. Ayer: P.—54]

[মুক্ত এলাকায় যেসব জাপ অসামরিক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা ব্যাঙ্ক-এর কাজকর্ম চলবে, তা সবই থাকবে আজাদ হিন্দ্ সরকারের অধীনে। কেবলমাত্র আজাদ হিন্দ্ ব্যাঙ্ক-এর কারেন্সী নোটই তারা ব্যবহার করতে পারবেন। আজাদ হিন্দ্ ব্যাঙ্কই হবে অস্থায়ী সরকারের একমাত্র স্বীকৃত ব্যাঙ্ক। জাপানী

ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানসমূহও পরিচালিত হবে আজাদ হিন্দ্ ব্যাঙ্কের নির্দেশেই।]

মল্লিকা, এই ছিল সেদিন দুপক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মোটামুটি বয়ান। এবার তোমরাই বিচার করো যে, সুভাষ কর্তৃক সম্পাদিত এই চুক্তির মধ্যে আমাদের জাতীয় স্বার্থ বা মর্যাদা ক্ষুন্ন হবার মত সত্যিই কিছু ছিল কিনা।

কিন্তু এ তো গেল চুক্তির কথা। অভিবাদন! পারস্পরিক অভিবাদন কি হবে? কে-কাকে আগে অভিবাদন জানাবে দুপক্ষের মধ্যে? আজাদ হিন্দ্ ফৌজ জাপানীদের আগে অভিবাদন জানাবে, না কি জাপানীরা আগে অভিবাদন জানাবে আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে?

জাপান বিজয়ী পক্ষ। সুতরাং তাদের দাবী, আগে আমাদের অভিবাদন জানাতে হবে আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে।

সুভাষ তাতে রাজী নন। তাঁর বক্তব্য: এ হীনমন্যতাকে আমি কোন-মতেই প্রশ্রয় দিতে রাজী নই।

তাহলে কি হবে? কে আগে অভিবাদন জানাবে অপর পক্ষকে?

কেন, অসুবিধার কি আছে। দেখা হলে একই সঙ্গে দুপক্ষ দুপক্ষকে অভিবাদন জানাবে সমানভাবে। ব্যস, ঝামেলা মিটে গেল!

'The Azad Hind Fouj and the Japanese Army were to be of equal status. Officers of equal rank were to salute each other simultaneously, while seniority of rank in each Army would be acknowledged by the order.'

[Maj. Gen. Chatterjee: P.—174]

তবু একটা প্রশ্ন রয়ে গেল। অত্যন্ত গুরুতর প্রশ্ন।

ভারতবর্ষের অধিকৃত অঞ্চলে যৌথভাবে কাজ করার জন্য আগে থেকেই একটি কাউন্সিল গঠন করে তার একজন চেয়ারম্যান ঠিক করে রাখা প্রয়োজন। কে হবে সেই চেয়ারম্যান? একজন জাপানী, না ভারতবাসী?

জাপানের বক্তব্য—আমরাই হব। হাজার হোক, আমরা বিজয়ী পক্ষ। ব্রিটিশ, মার্কিন, ওলন্দাজ—সমস্ত বিদেশী শক্তিকে আমরা বাহুবলে পরাস্ত করেছি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে। সুতরাং আমাদের দাবী মানতে হবে।

পত্রপাঠ দাবী নস্যাৎ করে দিলেন সুভাষ। জাপানের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান! অসম্ভব! এ কি হয় কখনো! না কি হতে পারে?

দীর্ঘ ছঘণ্টাব্যাপী ধস্তাধস্তি। একদিকে জেনারেল ইসোদা, জেনারেল সেন্ডা, মেজর জেনারেল ইয়ামামোতো, কর্ণেল কাগোয়া প্রমুখ জাঁদরেল জাপ-সমরনায়কগণ।

অন্যদিকে সুভাষ একা। শুধু কাছে দাঁড়িয়ে নির্বাক দর্শক আয়ার সাহেব। কিন্তু কার সাধ্য সুভাষকে তাঁর বক্তব্য থেকে এক চুল নড়ায়! শান্ত স্মিতহাস্যে তাঁর সেই একটিই মাত্র কথা। না, তা হয় না। জাপানের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান—এ একেবারেই অবাস্তব দাবী।

'With extraordinary patience Netaji would put forward in very clear language all the important reasons why he could not accept the proposal. He told them in plain language that a Japanese Chairman for the Indo-Japanese War Co-operation Council on Indian soil was absolutely out of the questions, and he was not going to budge an inch of this issue.'

[S. A. Ayer : P.—195]

এবার অন্য সুর ধরলেন জাপ-সমরনায়কবৃন্দ। ইওর এক্সেলেন্সী. টৌকিও আপনার এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করবে বলে মনে হয় না।

—তাই বুঝি! হাসলেন সুভাষ, ঠিক আছে, আমি তাহলে সোজাসুজি টৌকিওর সঙ্গেই কথা বলব এ ব্যাপার নিয়ে।

মনে মনে প্রমাদ গণলেন জাপ-সমরবিদগণ। প্রধানমন্ত্রী তোজো, সেনা-বাহিনীর সর্বাধিনায়ক সুগিয়ামা. বৈদেশিক মন্ত্রী সিগিমিৎসু প্রমুখ সবাই যে হিজ এক্সেলেন্সী চন্দ্র বোসের সংগ্রামী-সত্তাকে কতখানি শ্রদ্ধা করেন, তা কে না জানে! নাঃ! এই একগুঁয়ে লোকটাকে নিয়ে বিপদ হল দেখছি!

—তাহলে কি হবে ইওর এক্সেলেন্সী? শেষবারের মত চেষ্টা করলেন জাপ-সমরবিদগণ কাউন্সিল গঠিত হোক, তা কি আপনি চান না?

—নিশ্চয় চাই! অত্যন্ত সৌজন্য সহকারে জবাব দিলেন সুভাষ, যে করে হোক, এটা করতেই হবে। তবে কি না চেয়ারম্যান হবেন একজন ভারতীয়। তাই বা কেন? চেয়ারম্যান যে থাকতেই হবে তার কি মানে আছে! একজন গভর্ণরই তো যথেষ্ট। এ ব্যাপারে মেজর জেনারেল চাটার্জীর চাইতে যোগ্যতম লোক কে আর আছে?

ব্যস. সাপও মরল. লাঠিও ভাঙল না। ঠিক হল—চেয়ারম্যান নয়, গভর্ণর। এবং বলাই বহুল্য যে. সে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন একজন ভারতীয়, কোন জাপানী নয়।

'যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল
এসেছে আদেশ—
বন্দরের বন্ধনকাল হল শেষ'

সিগন্যাল ডাউন। এবার সেনাবাহিনীকে যাত্রা করতে হবে রণাঙ্গনের দিকে।

সুভাষ তখন অত্যন্ত ব্যস্ত। স্বাধীনতার অগ্রদূত আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে এবার বিদায় দিতে হবে। এ পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। জীবন ও মৃত্যুর এখানে পাশাপাশি বাস। শেষ পর্যন্ত ওদের মধ্যে ক'জন যে লালকেল্লায় পৌঁছতে সক্ষম হবে কে জানে!

তবু কোন উপায় নেই। তবু সেই অনিশ্চিত পথেই ওদের কদম কদম পা বাড়িয়ে যেতে হবে। ভিক্ষায় কোনদিনও স্বাধীনতা আসে না। স্বাধীনতা হাত মুচড়ে আদায় করতে হয়। সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য পরাধীন জাতিকে এ মূল্য দিতেই হবে।

সুভাষের সেদিনের সেই কর্মব্যস্ততা সম্বন্ধে ব্রিটিশ মুখপাত্রের বক্তব্য কি শোনা যাক ঃ

'সারাদিন তিনি তখন সুভাষ রেজিমেণ্ট নিয়ে ব্যস্ত। কখনো তাদের কুচকাওয়াজ দেখছেন। কখনো দেখছেন তাদের মহড়া। কখনো কথা বলছেন অফিসারদের সঙ্গে। এমন করে এর আগে তিনি কোনদিনও ফৌজের মধ্যে মায়াজাল বিস্তার করতে চাননি। যুদ্ধে তাদের সাফল্যের উপরই সবকিছু নির্ভর করছে, এই আত্মবিশ্বাস যেন তাদের মধ্যে ষোলআনা সঞ্চারিত হয়। তারা যেন তাঁর প্রাণ-প্রাচুর্যের স্পর্শ উপলব্ধি করে।'

'They must absorb all his feeling of confidence, feel the whole of his personal force.' [Hugh Toye: P.—103]

এত ব্যস্ততার মধ্যেও কিন্তু দুটি কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেননি সুভাষ। এ পথ অতি কঠিন কঠোর। স্বাধীনতার বেদীমূলে উৎসর্গীকৃত স্বেচ্ছাসৈনিক তোমরা। এখনো সাতদিন সময় আছে। কেউ যদি পিছিয়ে থাকতে চাও তো বলো, আমি তাকে পিছিয়ে থাকবারই ব্যবস্থা করে দেব। বলো, কে কে পিছিয়ে থাকতে চাও ?

না, কেউ পিছিয়ে থাকতে রাজী নয়। একটি সৈনিকও নয়। সংসারে কেউ অমর নয়। একদিন না একদিন সবাইকেই মরতে হবে। কিন্তু দেশের জন্য প্রাণ দেবার মধ্যে যে এত আনন্দ লুকিয়ে আছে তা আগে কে জানতো !

দ্বিতীয় কথাটি আরো গুরুত্বপূর্ণ। চোখ-কান খোলা রেখো ভাই। স্বাধীনতা কেউ কাউকে দিতে পারে না। তাই এ-ব্যাপারে কাউকেই পুরোপুরি বিশ্বাস করো না যেন। এমন কি জাপানীদেরও নয়। এ যুদ্ধে তারা আমাদের মিত্র, একথা ঠিক, তবু এসব ব্যাপারে সবকিছুর জন্যই প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। যদি দেখো যে. শর্ত অমান্য করে তারা কায়েম হয়ে বসার চেষ্টা করছে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াতেও দ্বিধা করো না যেন।

'He warned his soldiers that where the question of the independence of the country was concerned they were to trust no one, not even our allies the Japanese, and that the surest guarantee against betrayal was their own armed might.

He said, 'If ever you find the Japanese trying to establish any type of control over India, turn round and fight them as vigorously as you will fight the British.'

[Maj. Gen. Chatterjee : P.—175-176]

৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪ সাল।

এ্যাটেনশন ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে সুভাষ ব্রিগেড। চোখে তাদের দিগন্ত সীমার মত উন্মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি। বুকে দুর্বার সাহস। আর একটু পরেই তারা যাত্রা করবে রণক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে। তারপরই শুরু হবে আসল লড়াই।

মোট তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে গোটা ব্রিগেডকে। মেজর পি. এস.

রাতুরি পরিচালনা করবেন—১নং ব্যাটেলিয়ান। প্রোম, তাউনগ্‌প, মাইও, হাউং, কাউলট, প্যালেটোয়া হয়ে তাঁকে এবার যেতে হবে কালাদান উপত্যকার দিকে। ওখানে রয়েছে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর নতুন আমদানি পশ্চিম আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ সেনাদল। রাতুরির কাজ হবে তাদের মোকাবিলা করা।

২নং এবং ৩নং ব্যাটেলিয়ান মেজর রণ সিং ও মেজর পদম সিং-এর নেতৃত্বে মান্দালয় ও কালেওয়ার হয়ে যাবে হাকা ও ছিন্ এলাকার ফালমের দিকে। তিনটি ব্যাটেলিয়ানই পরিচালিত হবে মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খানের নেতৃত্বে।

সেনাবাহিনীকে বিদায় জানাতে গিয়ে হৃদয়ের সমস্ত আবেগ, সমস্ত ব্যাকুলতা বুঝি সেদিন শতধারায় ফেটে পড়েছিল সুভাষের।

'There, there in the distance—beyond the river, beyond those jungles, beyond those hills, lies the promised land, the soil from which we sprang—the land to which we shall now return.

Hark! India is calling, India's metropolis Delhi is calling, three hundred and eighty eight millions of our countrymen are calling. Blood is calling blood.

Get up, we have no time to lose. Take up your arms There in front of you is the road that our pioneers have built. We shall march along that road. We shall curve our way through the enemy's ranks or if God will, we shall die a martyr's death.

And in our last sleep we shall kiss the road that will bring our Army to Delhi The road to Delhi is the road to Freedom. Chalo Delhi.'

'ওই দূরে—বহু দূরে—নদীর ওপারে, পর্বত ও অরণ্য পেরিয়ে আমাদের চির-আকাঙ্ক্ষিত দেশ—ওখানকার মাটিতে আমাদের জন্ম—ওই দেশে এবার আমরা ফিরে যাব।

শোন, ভারতবর্ষ আমাদের ডাকছে—ভারতের রাজধানী দিল্লী আমাদের ডাকছে—কোটি কোটি স্বদেশবাসী আমাদের ডাকছে—আত্মীয় ডাকছে আত্মীয়কে।

রক্তের ডাক এসেছে। ওঠো, সময় নষ্ট করো না। অস্ত্র হাতে নাও। সামনে আমাদের পথ-প্রদর্শকদের তৈরী পথ। ওই পথ ধরেই আমরা এগিয়ে যাব। শত্রুসৈন্যের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের রাস্তা করে নেব। অথবা ভগবানের যদি ইচ্ছা হয়, আমরা শহীদের মৃত্যু বরণ করব। যে পথে আমাদের সেনাবাহিনী দিল্লী যাবে, মৃত্যুর পূর্বে সেই পথকে আমরা চুম্বন করব। দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ। চলো দিল্লী!'

একসঙ্গে গর্জে ওঠে হাজার হাজার আজাদী সৈনিক—চলো দিল্লী। চলো দিল্লী! চলো দিল্লী!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল সেনানায়কের বজ্রকণ্ঠের নির্দেশ,—
এ্যাটেনশন্! কুইক মার্চ!

লেফ্ট-রাইট-লেফট্-রাইট-লেফট্...

'কদম কদম বঢ়ায়ে যা
খুশিসে গীত গায়ে যা
য়ে জিন্দগী হৈ কৌম কী
(তো) কৌম পে লুটায়ে যা'

লেফট্-রাইট-লেফট্-রাইট-লেফট্......

'তু শের-ই-হিন্দ্ আগে বঢ়
মরনেসে ফিরভী তু ন ডর
আসমান্ তক্ উঠাকে শির
জোশে বতন বঢ়ায়ে যা......'

শেষপর্যন্ত তাকিয়ে রইলেন সুভাষ। দুচোখে তাঁর আনন্দাশ্রু। ঐ যে ওরা তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে স্টেশনের দিকে। ঐ যে ওদের দেহগুলো ছোট হতে হতে মিলিয়ে যাচ্ছে পথের বাঁকে। স্বাধীনতার অগ্রদূত তোমরা! তোমাদের জয় হোক! ভারত স্বাধীন হোক!

এ তো গেল সুভাষ ব্রিগেডের কথা। যে ছোট ছোট দলগুলো আগেই চলে গেছে, এই সঙ্গে তাদের কথাও কিছু শুনে নাও। একটি দল গেছে আরাকান সেক্টরে। এ দল পরিচালনা করবেন মেজর এল. এস. মিশ্র এবং মেজর মেহর দাস। কর্ণেল এস. এ. মালিকের নেতৃত্বে আর একটি দল গেছে বিষেণপুর (ইম্ফল) সেক্টরে। তৃতীয় দলটি—কোহিমা সেক্টরে। সে দল পরিচালনার দায়িত্ব যথাক্রমে মেজর মঘর সিং ও মেজর আজমীর সিং-এর ওপর। এ'দের কাজ, যুদ্ধ ছাড়াও শত্রুর গুপ্ত খবর সংগ্রহ করা, যুদ্ধ-বন্দীদের কাছ থেকে তথ্য অনুসন্ধান করা এবং লাউড-স্পীকার ও পত্র-পত্রিকার সাহায্যে শত্রুপক্ষের অভ্যন্তরে ঢুকে প্রচারের ব্যবস্থা করা।

এখানেই শেষ নয়। আরো অনেকগুলো দলই যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে বিভিন্ন সেনানিবাসে। এখন শুধু আদেশের অপেক্ষা মাত্র।

এই ফাঁকে তুমি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দলগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নাও মল্লিকা। তাতে বুঝতে তোমার অনেকটা সুবিধে হবে।

প্রথমে শোন ১নং ডিভিশনের কথা। এ ডিভিশনের সর্বোচ্চ সেনানায়ক হলেন—মেজর জেনারেল এম্. জেড. কিয়ানী। এ'র অধীনে রয়েছে মোট তিনটি ব্রিগেড। সুভাষ ব্রিগেড, গান্ধী ব্রিগেড এবং আজাদ ব্রিগেড।

সুভাষ ব্রিগেড পরিচালনা করবেন মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান। গান্ধী ব্রিগেড—কর্ণেল আই. জে. কিয়ানী, আর আজাদ ব্রিগেড—কর্ণেল গুলজারা সিং।

এরপর ২নং ডিভিশন। এর প্রধান সেনানায়ক—কর্ণেল আজিজ আহমেদ (পরে শাহনওয়াজ খান)। এখানেও মোট তিনটি ব্রিগেড। ১নং ব্রিগেড, ২নং ব্রিগেড এবং নেহরু ব্রিগেড। ১নং ব্রিগেড পরিচালনা করবেন কর্ণেল এস. এম. হোসেন। ২নং ব্রিগেড কর্ণেল পি. কে. সেহ্‌গল, আর নেহরু ব্রিগেড—কর্ণেল জি. এস. ধীলন।

৩নং ডিভিশন। প্রধান সেনানায়ক এন. এস. ভগৎ (পরে জি. আর. নাগর)। এখানেও সেই তিনটি ব্রিগেড। ৬নং, ৭নং এবং ৮নং ব্রিগেড। কর্ণেল এ. আই. এস. দারা পরিচালনা করবেন ৬নং. ৭নং কর্ণেল গুরুমিৎ সিং এবং ৮নং কর্ণেল বিষেণ সিং।

এ ছাড়া রয়েছে কম্যান্ড গ্রুপস্‌। তার মধ্যে একটি হল কর্ণেল বুরহানউদ্দিনের নেতৃত্বে বাহাদুর গ্রুপস্‌, অন্যটি কর্ণেল এস. এ. মালিক পরিচালিত ইনটেলিজেন্স গ্রুপস্‌।

আর রয়েছে মেজর জেনারেল চ্যাটার্জীর পরিচালনায় আজাদ হিন্দ্‌ দল! এদের কাজ হবে অধিকৃত এলাকায় সুষ্ঠুভাবে শাসন-ব্যবস্থা চালু করা।

মেডিকেল ইউনিটে থাকছেন আলী আকবর খাঁ, হেম মুখার্জী, কর্ণেল চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, কর্ণেল নন্দী, কর্ণেল মেনন, কর্ণেল অমিয় চক্রবর্তী এবং মেজর জ্ঞান দাশগুপ্ত প্রমুখ অভিজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দ।

আর ঝাঁসীর রাণীবাহিনীর তো কথাই নেই। শুধু আহতদের দেখা-শোনা নয়, হাতিয়ারও তাদের ধরতে হবে সাহসী সৈনিকের মত। নেতাজীর ইচ্ছা লালকেল্লায় অনুষ্ঠিত বিজয়-উৎসবে সবার আগে স্থান দিতে হবে রাণীবাহিনীকে। সেইদিন, সেই শুভলগ্ন কবে আসবে? কবে?

৪ঠা ফেব্রুয়ারি বিরাট জয়ের খবর এল আরাকান অঞ্চল থেকে।

ব্রিটিশ সপ্তম বাহিনী বিধ্বস্তপ্রায়। সেক্টর কম্যান্ডার এল. এস. মিশ্র পরিচালিত অগ্রগামী দল চারদিক থেকে ঘিরে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে আরাকান অঞ্চল থেকে।

স্বীকার করেছেন ব্রিটিশ মুখপাত্র হিউ টয়। হ্যাঁ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি আরাকানে যে যুদ্ধ হয়, তার ফলে মায়ু উপত্যকায় আমাদের ৭ম ভারতীয় ডিভিশন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এর প্রধান কারণ আই. এন. এ. কম্যান্ডার মেজর এল. এস. মিশ্রের নাশকতামূলক কাজ।

'The offensive in Arakan, launched on February 4th, quickly cut off the 7th Indian Division in the Mayu Valley. Among the reasons for success was the reconnaissance and subversion of an Indian outpost position by Major L. S. Misra, the I.N.A. Commander in Arakan.'

[Hugh Toye: P.—103]

উত্তেজনায় টগবগ করছে তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিদ্রোহী যৌবন। ঘর ছেড়ে সবাই বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। কেউ নৃত্য করছে। কেউ বা গান ধরেছে মনের আনন্দে। প্রথম যুদ্ধেই তাদের পরমপ্রিয় আজাদী সৈনিক জয়লাভ করেছে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। এই তো চাই। এই তো হওয়া উচিত। সাবাস জওয়ান! চলো দিল্লী! দিল্লী আর কতদূর!

খুশি হয়ে সুভাষ ব্যক্তিগতভাবে এক বার্তা পাঠালেন সেক্টর কম্যাণ্ডার এল. এস. মিশ্রের কাছে। আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আই. এন. এ.-র কৃতিত্বে আমরা সবাই গর্বিত।

'All officers and men of the Indian National Army and myself feel happy and proud over the achievement of our troops at the Arakan front under your command.'

[Azad Hind: 10. 2. 44]

৯ই ফেব্রুয়ারি এ প্রসঙ্গে এক বিবৃতি দিলেন সুভাষ। আজ সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি আরাকানের দিকে নিবদ্ধ। বন্ধুগণ, আজ থেকে আমাদের ধ্বনি হোক—স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু! চলো দিল্লী! দিল্লীর পথই স্বাধীনতার জয় আমাদের হবেই।

'The eyes of the whole world are now focussed on the Arakan front, where events of far-reaching importance are taking place today.

Comrades! Officers and men of Inida's Army of Libertion, let there be but one solemn resolve in your hearts —either liberty or death. And let there be but one slogan on your lips—onward to Delhi. The road to Delhi is the road to freedom. That is the road along which we must march. Victory will certainly be ours.'

অভিনন্দন বার্তা পাঠালেন জাপ-বৈদেশিক মন্ত্রী সিগিমিৎসু। আমি বিশ্বাস করি, মহামান্য চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ভারতীয় বাহিনীর এই সংগ্রামের কাহিনী ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

'Your Excellency! Allow me to tender to your Excellency my heart-felt congratulations upon the splendid achievements of your gallant troops who have demonstrated their prowess in fighting shoulder to shoulder with the Nippon forces.'

লেফট্-রাইট—লেফট্-রাইট—লেফট্...

সুভাষ ব্রিগেডের এক নম্বর ব্যাটেলিয়ান তখন মার্চ করে এগিয়ে চলেছে মেজর পি. এস. রাতুরির নেতৃত্বে।

রেঙ্গুন থেকে প্রোম পর্যন্ত ট্রেনে। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে একশো মাইল দূরবর্তী তাউনগুপ। আবার হাঁটাপথ। এবারের লক্ষ্য দেড়শো মাইল দূরে মিউহাউং।

ইতিমধ্যে ষোলজন প্রাণ হারিয়েছে শত্রুপক্ষের বোমাবর্ষণের ফলে। কোন দুঃখ নেই। স্বাধীনতা পেতে হলে মূল্য দিতে হয়, এ তো জানা কথাই! তাহলে দুঃখ কিসের! না, ওসব কথা এখন ভাববার অবকাশ নেই তাদের। সামনে দুরন্ত লড়াই। সেই লড়াই-ই এখন তাদের জীবনে একমাত্র সত্য, একমাত্র বাস্তব। তাছাড়া আর সব কিছুই এখন মিথ্যে হয়ে গেছে তাদের জীবনে।

কিন্তু কি আছে তাদের! কিসের প্রেরণায় তারা এই দুর্গম পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল ভেঙে এগিয়ে চলেছে মৃত্যু-অভিযানে! আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী ভারী সমর-সম্ভার তাদের আছে কি! আছে কি উপযুক্ত বিমান-বহর বা প্রয়োজনীয় ট্যাঙ্কবাহিনী!

না, নেই। এমন কি উপযুক্ত জামা-কাপড় পর্যন্ত নেই। যে অঞ্চলে তারা যুদ্ধ করতে চলেছে, সেখানে যেমন শীত, তেমনি ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। তা সত্ত্বেও একটা মশারী পর্যন্ত জোটেনি তাদের। উপযুক্ত যানবাহনের তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। এক-কথায় বলতে গেলে আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী কিছুই নেই তাদের।

তাহলে কি আছে? কিসের আশায় তারা ছুটে চলেছে মৃত্যুপণ করে?

আছে শুধু দুর্জয় সঙ্কল্প, আর জ্বলন্ত দেশপ্রেম। ব্রিটিশের ভাড়াটে সৈনিক বলে এতকাল কি ঘৃণাই না কুড়িয়েছে পৃথিবীর কাছ থেকে। এবার তারা তার প্রায়শ্চিত্ত করবে দেশের জন্য লড়াই করে। সারা পৃথিবীকে তারা দেখিয়ে দেবে যে, যোগ্যতার দিক থেকে কারো চাইতেই তারা কম নয়।

একবার। শুধু একবার ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে বাংলাদেশে যেতে পারলেই হয়। ব্যস্, তাহলে আর ভাবনা নেই। নেতাজী বলেছেন, একবার যখন তারা নিজের চোখে দেখবে যে, আমরা ভারতের মুক্তি-ফৌজ, তখন দলে দলে তারা এগিয়ে আসবেই। বিপ্লবের সেই অগ্নিশিখাকে বাধা দেবার সাধ্য ব্রিটিশের নেই।

'When the people inside India will see with their own eyes that a Liberation Army has given the first defeat to the British on Indian soil, that will be the signal for a general uprising in Bengal and Assam, which will soon spread to the rest of India.'

সেই বাংলাদেশেই এবার তাদের যেতে হবে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে। নেতাজীর সেই কথা তারা রাখবে। জান কবুল!

কিন্তু না. আর দেরী নয়। চলো ভাই সব পা চালিয়ে। সামনেই কালাদিন নদী। খবর পাওয়া গেছে, ব্রিটিশ দলভুক্ত পশ্চিম-আফ্রিকার একটা পুরো কৃষ্ণাঙ্গ ডিভিশন রাস্তা তৈরি করতে করতে এদিকেই এগিয়ে আসছে। উদ্দেশ্য—একটা সেতু তৈরি করে নদীর এপারে আসা। না, সে সুযোগ ওদের কিছুতেই দেওয়া হবে না। এক্ষুণি আমাদের নদীর এপারে তেতমায় পৌঁছতে হবে। কুইক মার্চ!

কিন্তু একি! ওরা যে ইতিমধ্যেই সেতু তৈরি করে এপারে এসে গেছে

দলে দলে ! না, আর দেরী করলে চলবে না। যে করে হোক, ওদের হটাতেই হবে এপার থেকে। দ্দল দ্দিকে যাও। ওদের ঘিরে ফেল চারদিক থেকে।

সারেণ্ডার করে তো ভাল. নয় তো খতম।

হ্যাঁ, খতম। প্রো দলটাই খতম। উপায় নেই বন্ধ্। তোমরা আমাদের শত্র্ নও। আমাদের মতই পরাধীন জাতি তোমরা। তাহলে কেন এখানে এসেছিলে প্রাণ দিতে ? এর নাম য্দ্ধ। এখানে তুচ্ছ হৃদয়বৃত্তির স্থান কোথায় ?

এবার কালাদিন উপত্যকা। কিন্তু না, ভাল খবর আছে। প্রো এক ব্যাটেলিয়ান শত্র্সৈন্য নাকি পাহাড় চ্ড়ায় অবস্থান করছে পরিখা খনন করে। ওদের সাবাড় করা চাই। তবে দিনের আলোতে নয়, রাত্রে। আর যেতে হবে অতি সন্তর্পণে. হামাগ্ড়ি দিয়ে। তারপর পরিখায় লাফিয়ে পড়ে বেয়নেট চার্জ।

কাজেও তাই হল। দ্দিক থেকে দ্টো দল হামাগ্ড়ি দিয়ে গিয়ে আচমকা লাফিয়ে পড়ল পরিখার মধ্যে। তারপরই শ্র্ হল ভয়ঙ্কর হাতাহাতি লড়াই। য্দ্ধ—য্দ্ধই। এখানে ভাবাল্তার কোন স্থান নেই। চালাও বেয়নেট। এফোঁড়-ওফোঁড় করে দাও সবাইকে।

ঐ যে ওরা ছ্টছে নদীর দিকে। ঐ যে পালাচ্ছে নৌকো করে। না. কাউকে ছাড়লে চলবে না। চালাও মেসিনগান। ক'টা নৌকো ডুবল ! ষোলটা ! সাবাস ! হ্শিয়ার ! ওপার থেকে ওরা কামান দাগছে। আমাদের দ্র-পাল্লার কামান নেই। তাই সবাই এখন ম্খ গ্জে পড়ে থাকো পরিখার মধ্যে।

বরং এই ফাঁকে ক্ষয়ক্ষতির হিসেবটা দেখা যাক। আমরা হারিয়েছি আমাদের চৌন্দজন জওয়ান সাথীকে। সেই সঙ্গে আহত আরো বাইশজন। শত্র্পক্ষে নিহত দ্শো পঞ্চাশ। তা ছাড়া ফেলে গেছে বন্দ্ক, কামান, গোলাগ্লী ও বেশ কিছ্ স্স্বাদ্ খাবার। ভালই হল। অনেকদিন ভাল খাওয়া জোটেনি। এবার খেয়ে নাও সবাই মনের আনন্দে।

আবার এগিয়ে চললেন রাতুরি। প্রচণ্ড য্দ্ধের পরে দখল করলেন পঞ্চাশ মাইল দ্রবর্তী পালেটোয়া। তারপর দালেৎমি। আর মাত্র চল্লিশ মাইল বাকী। তারপরই ভারত-সীমান্ত। কিন্তু না, আপাততঃ আর নয়। জওয়ানদের প্নর্গঠনের জন্য দ্-একদিন সময় দরকার।

মন সায় দেয় না আজাদী সেনাদের। প্রায়ই তারা অন্রোধ করে রাতুরিকে—নেতাজীর আদেশ. যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভারত-ভূমিতে গিয়ে আমাদের জাতীয় পতাকা তুলতে হবে। তাই বিশ্রাম না করে আমরা শ্ধ্ এগিয়ে যেতে চাই।

'Soldiers frequently approached their officers and said: Sahib, our orders from Netaji are that we have to hoist the Tri-colour on Indian soil as soon as possible. Let us therefore, not wait for any rest here.'

[Maj. Gen. Shahnawaz Khan : P.—18]

দালেংমির পরে মোডক। ফলাফল সেই একই। আচমকা আক্রান্ত হয়ে সংগে সংগে যথাসর্বস্ব ফেলে ভোঁ দৌড়। আগে তো প্রাণ বাঁচুক, তারপর অন্য কথা!

পাওয়া গেল প্রচুর আটা, ঘি, চিনি, রাইফেল, গোলাগুলী এবং সবচাইতে মূল্যবান জিনিস তিন ইঞ্চি ব্যাসের কামান, যা এতদিন অভাব ছিল আজাদী বাহিনীর।

কিন্তু জায়গাটা বিপজ্জনক। যে কোন মুহূর্তে পাল্টা-আক্রমণ ঘটতে পারে। রাতুরিকে ডেকে পরামর্শ দিলেন জনৈক জাপ-কম্যাণ্ডার, এখান থেকে খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে ঘাঁট করা উচিত।

অসম্ভব। জবাব দিলেন রাতুরি, জাপানীরা পিছিয়ে যেতে পারে, কারণ তাদের টোকিওর অবস্থিতি পেছনের দিকেই। কিন্তু আমাদের লালকেল্লা সামনের দিকে। আমরা সামনের দিকেই যাব। ফেরা আমাদের হবে না।

'The Japanese can retreat because Tokyo lies that way; our goal the Red Fort of Delhi—lies ahead of us. There is no going back for us.' [Ibid: P.—38]

তবু দীর্ঘ সাপ্লাই লাইনের কথা চিন্তা করে রাতুরি তাঁর মূল বাহিনীকে কিছুটা সরিয়ে নিলেন মোডক থেকে। তা বলে অধিকৃত অঞ্চল কিছুতেই ছাড়া চলবে না। তাই ক্যাপ্টেন সুরজমলের নেতৃত্বে রেখে গেলেন ছোট্ট একটি দলকে। প্রয়োজন হলে তারাই নিজেদের অধিকার অক্ষুন্ন রাখবে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে।

কাণ্ড দেখে জাপ-কম্যাণ্ডার অবাক। এতখানি দুঃসাহস বুঝি তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। এ যে একেবারে জেনেশুনে মৃত্যুগুহায় অবস্থান করা। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও এক প্লেটুন জাপানী সৈন্য তুলে দিলেন সুরজমলের হাতে। ওরা রইল এখানে। তোমার অধীনেই ওরা যুদ্ধ করবে এখন থেকে। তুমি ওদেরও ক্যাপ্টেন।

ঘটনা ছোট্ট, কিন্তু এর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, কোন জাপানী সৈন্য বিদেশী অফিসারের অধীনে রাখা ইতিহাসে এই প্রথম।

'It was probably the first time in the history of the Japanese army that their troops had been placed under command of a foreign officer.' [Ibid: P.—84]

একটার পর একটা জয়ের খবর শুনে ততক্ষণে হৈ-চৈ পড়ে গেছে গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে। সাবাস রাতুরি—সাবাস! দেখালে বটে তুমি। হাজার সাবাস তোমার জওয়ান বাহিনীকে! আজাদ হিন্দ্ ফৌজ—জিন্দাবাদ! নেতাজী জিন্দাবাদ! চলো দিল্লী!

প্রথমেই অভিনন্দন জানালেন বর্মার জাপবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল কাওয়াবে। আমাদেরই ভুল হয়েছিল ইওর এক্সেলেন্সী। আপনার আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে আগে আমরা চিনতে পারিনি। এখন বুঝতে পারছি, ওরা সত্যিই দেশকে ভালবেসে লড়াই করছে, পেটের দায়ে নয়।

'Your Excellency, we were wrong. We misjudged the

soldiers of the I. N. A. We know now that they are no mercenaries, but real patriots.' [Ibid : P.—84]

মল্লিকা, ভাবতে গেলে সত্যিই অবাক লাগে না কি! ক'দিনের কথাই বা! ১৯৪৩ সালের ২রা জুলাই সুভাষ সর্বপ্রথম পা দিয়েছিলেন সিংগাপুরের মাটিতে। ২৫শে আগস্ট সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পদ গ্রহণ। ২১শে অক্টোবর অস্থায়ী স্বাধীন সরকার গঠন। ২৩শে অক্টোবর রাত্রিতে যুদ্ধ ঘোষণা। ফেব্রুয়ারী মাসে সংগ্রাম শুরু। তারপর একটার পর একটা জয়।

মাত্র আট মাস। এই আট মাসের মধ্যেই যেন ইতিহাসের অনেকগুলো পাতা লেখা হয়ে গেল অবিশ্বাস্য গতিতে। সত্যি বলতে কি, এই প্রচণ্ড গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে সবকিছুই যেন অসম্ভব বলে মনে হয়। সেই অসম্ভবকেই সেদিন সম্ভব করে তুলেছিলেন বাংলা মায়ের দামাল ছেলে এই সুভাষ। সারা পৃথিবীকে তিনি দেখিয়েছিলেন যে, সংসারে অসম্ভব বলতে কিছু নেই।

২০শে ফেব্রুয়ারি সুভাষ এক বিবৃতির মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন কস্তুরবা গান্ধীর স্মৃতির উদ্দেশে। গান্ধীজীর সহধর্মিণী শ্রীমতী কস্তুরবা গান্ধী যে সেদিন পুনা বন্দী-নিবাসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন সে কথা তুমিও জানো।

'Shrimati Kasturba Gandhi is dead. She has died in British custody in Poona at the age of 74. I share the deepest bereavement over the death of Kasturba. She died under tragic circumstances, but for a member of an enslaved nation no death could have been more honourable or more glorious. India has suffered a personal loss.

I pay my humble tribute to the memory of that great lady who was a mother to the Indian people, and I wish to express my deepest sympathy for Gandhiji in his bereavement.'

ওদিকে তখন প্রচণ্ড লড়াই চলেছে বিভিন্ন রণক্ষেত্রে। সর্বত্র আজাদ হিন্দ্ ফৌজ এগিয়ে চলেছে বীর বিক্রমে। সর্বত্র একই রণ-হুঙ্কার—নেতাজী জিন্দাবাদ! চলো দিল্লী! দিল্লী আমরা যাবোই। জান কবুল!

প্রথমে সুভাষ ব্রিগেড। এবার গান্ধী ব্রিগেড এগিয়ে চলেছে রণক্ষেত্রের দিকে। তারপর একে একে অন্যান্য ব্রিগেড।

ডিভিশনের প্রধান সেনাপতি এম. জেড. কিয়ানী। তাঁর নির্দেশ মত গান্ধী ব্রিগেড পরিচালনা করবেন তাঁরই খুড়তুতো ভাই কর্ণেল আই. জে. কিয়ানী। লড়িয়ে সেনাপতি। দুশমনের মহড়া নিতে তিনিও বড় কম যান না।

সেনাবাহিনীর সে কি রণোন্মাদনা সেদিন রেঙ্গুন রেল-স্টেশনে! আসন্ন

যুদ্ধের কল্পনায় এক-একজন উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে যেন। কখন আমরা লড়াই করব? কখন দেখা পাব দুশমনের? আঃ! গাড়িটা ছাড়তে এত দেরী হচ্ছে কেন?

অবশ্য কয়লা-বোঝাই গাড়ি। তা হলই বা! কোনরকমে একবার দুশমনের কাছাকাছি যেতে পারলেই হয়। তারপর দেখিয়ে দেব যে, আমরা লড়াই করতে পারি কিনা!

আনন্দ-উচ্ছ্বাস শতগুণে বৃদ্ধি পেল সুভাষের উপস্থিতিতে। অমনি হাজার হাজার কণ্ঠে রব উঠল—নেতাজী! নেতাজী! নেতাজী! হয় জয়লাভ, নয়তো মৃত্যু, একথা আমরা ভুলব না নেতাজী! চলো দিল্লী!

দেখতে দেখতে একটার পর একটা গাড়ি ছেড়ে গেল স্টেশন থেকে। লক্ষ্য—মান্দালয়। ব্যস, ঐটুকুই। তারপরই শুরু হবে চড়াই-উৎরাই ভেঙে দুর্গম পদযাত্রা। সে যাত্রা কোথায় গিয়ে শেষ হবে কে জানে!

কি বিস্ময়কর পরিবর্তন! দুদিন আগেও যারা ছিল ব্রিটিশের বেতন-ভোগী সৈনিক, আজ তারাই কিনা পরাধীন ভারতের দুঃসাহসী মুক্তিফৌজ।

কি করে এটা সম্ভব হল! কারণ নেতাজী। নেতাজী তাদের শিখিয়েছেন—দাসত্বের চাইতে মৃত্যুও সম্মানজনক। সেই নেতাজীর প্রভাবেই আজ তারা দুর্জয়, দুর্বার, মৃত্যুভয়হীন আজাদী সৈনিক। কণ্ঠে তাদের রুল ব্রিটানিয়ার পরিবর্তে বিপ্লবের গান। চলো দিল্লী! চলো দিল্লী! চলো দিল্লী! দিল্লীর পথে কোন বাধাই আমরা মানব না।

ওদিকে তখন আজাদ হিন্দ্ ফৌজ দুর্বার বেগে এগিয়ে চলেছে ইম্ফলের দিকে, যে অভিযানের সাঙ্কেতিক নাম—'অপারেশন ইউ'।

পৃথিবীর ইতিহাসে বোধহয় কোন সেনাবাহিনীকে এত দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আসতে হয়নি। এত বাধা-বিপত্তিরও সম্মুখীন হতে হয়নি। শুধু পাহাড় আর পাহাড়। দুর্গম বিপদ-সঙ্কুল পাহাড়।

পথ বলেও কিছু নেই। এখানে-ওখানে পাথরের ফাটল দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় বনস্পতির দল। তাদের শাখায় শাখায় জড়াজড়ি। ডালে ডালে লতার জাল বোনা।

মাঝে মাঝে লতাগুলি পরস্পর জড়াজড়ি করে পথকে করে তুলেছে দুর্ভেদ্য। কোথাও নিচু হয়ে, কোথাও বা হামাগুড়ি দিয়ে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।

এখানে-ওখানে ছড়ানো ছোট-বড় পাথরের চাঁইগুলোও রীতিমতো বিপজ্জনক। কখন যে পায়ের চাপে হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়বে, কারো পক্ষেই তা বলা সম্ভব নয়।

তাছাড়া যেমন আর্দ্র, তেমনি পিচ্ছিল। প্রায় সর্বত্রই পাথরের গায়ে শ্যাওলা জমেছে। অসম্ভব শ্যাওলা।

কোথাও কোথাও অগ্রবর্তী স্যাপার বাহিনী পাহাড়ের গা কেটে কোনরকমে চলাচলের ব্যবস্থা করে দিয়েছে মাত্র। সেই পথ ধরেই জওয়ানদের যেতে হয়েছে ভারী মালপত্র কাঁধে নিয়ে। একটু এদিক-ওদিক হলে আর

রক্ষে নেই। পাহাড়ের ঢাল্ গড়িয়ে কোথায় যে তলিয়ে যেতে হবে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। তাছাড়া রয়েছে অসংখ্য স্রোতস্বিনী নদী। সেগুলো রীতিমত বিপজ্জনক।

সেই দুস্তর বাধা অতিক্রম করে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ছুটে চলেছে একটি মাত্র সঙ্কল্প বুকে নিয়ে। নেতাজীর আদেশ—দিল্লী যেতে হবে। দিল্লী আমরা যাবই। চলো দিল্লী!

আরাকান সেক্টরে জয়ের কথা তোমাকে আগেই বলেছি। সেই একই দিনে জয় করা হয়েছে তাউং বাজার। দুদিন পরে মিয়ামিয়াং।

১লা মার্চ জয় করা হল সেটাবিন। কালাদিন দখলে এল ৫ই মার্চ। ৮ই মার্চ ফোর্ট হোয়াইট। ঠিক তার চারদিন পরে লেনাকট।

'On the same day, Taung Bazar was occupied. Two days later, Myamiggyan was captured. After a little over two weeks, the occupation of Saetabin, in the Kaladan Sector, was effected on the 1st of March. This was followed by the king of Kaladan on the 5th March.

A few days of intensive combat, and Fort White was reduced on March the 8th. Lanacot was reduced four days later'...

['The Struggle of East Asia': John A. Thivy: P.—78]

১৮ই মার্চ জয় করা হল কেনেডি পিক।

উত্তেজনায় তখন থর থর করে কাঁপছে প্রতিটি আজাদী সৈনিক। আর দেরী নেই। ঐ যে আমাদের পবিত্র ভারতভূমি দেখা যাচ্ছে। 'বহুদিন পরে হইব আবার আপন কুটিরবাসী'।

কিন্তু আর কতক্ষণ! কখন আমরা পা দেব জন্মভূমির মাটিতে! আর কত দেরী! নিজেকে যে ধরে রাখা দায়!

১৯শে মার্চ ১৯৪৪ সাল।

তখনো রাতের অন্ধকার কাটেনি। সবেমাত্র ফর্সা হয়ে উঠেছে পূব আকাশটা।

ঠিক সেই মুহূর্তে সবাই পাহাড় থেকে নেমে ওপারে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল উন্মত্তের মত। তারপর সে কি মর্মস্পর্শী দৃশ্য! কেউ হাউ-হাউ করে কাঁদছে মনের আনন্দে। কেউ মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। কেউ বা উপুড় হয়ে চুম্বন করছে দেশের মাটি। এই মাটি, এই দেশ তাদের কত প্রিয়! দিবারাত্রির কত স্মৃতি জড়ানো এই জন্মভূমি। জীবনের মধুগন্ধে ভরা দিনগুলি যেখানে কেটেছে, আজ কতদিন পরে আবার তারা সেই পবিত্র জন্মভূমিতে ফিরে এসেছে। এ আনন্দ প্রকাশের ভাষা কোথায়?

'Who can describe the ecstatic joy with which that band of India's Freedom Fighters hoisted the National Flag to the strains of the National Anthem?' [Ibid: P.—78-79]

সেদিনের সেই মর্মস্পর্শী দৃশ্য সম্বন্ধে আজাদী বাহিনীর সঙ্গে ভ্রমণরত জনৈক জাপানী সাংবাদিক কি বলেছেন শোনা যাক:

'স্বদেশের পাহাড়, স্বদেশের নদী যখন প্রথম চোখে পড়ল, ভারতীয় সৈন্যদের আনন্দ তখন ধরে না। আত্মহারা আনন্দের সেই চিত্র দেখে আমরাও অভিভূত বোধ করছিলাম।

একজন ভারতীয় সৈন্যের কথা একটু বিশেষভাবেই উল্লেখ করবার মত। হাঁটতে তার কষ্ট হচ্ছিল, তবুও তিনি সঙ্গীদের কাঁধে ভর দিয়ে এগোচ্ছিলেন। স্বদেশের পুণ্যভূমিতে প্রবেশ করবেন, এই আগ্রহে তিনি সেই অবস্থায়ও জোরে জোরে পা ফেলছিলেন। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। আর একটু হলেই মূর্ছিত হয়ে পড়তেন। কাছেই একটি পাহাড়ী নদী। একজন জাপানী সেনা পাহাড় বেয়ে নীচে গিয়ে সেই নদী থেকে জল নিয়ে এলেন, তারপর ভারতীয় সেনার দিকে জলের পাত্র এগিয়ে ধরে বললেন—এই নিন আপনার স্বদেশের জল, নীচের ওই নদী থেকে নিয়ে এসেছি।,

ভারতীয় সেনাটি পাগলের মত সেই জল খেলেন। জাপানী সেনাটি তাঁকে প্রশ্ন করলেন—কেমন জল, মিষ্টি?

ভারতীয় সেনাটি বললেন—হ্যাঁ। তাঁর চোখে তখন জল। আবেগে তিনি কথা বলতে পারছিলেন না।

চতুর্দিক থেকে মুহুর্মুহুঃ ধ্বনি উঠেছিল—জয় হিন্দ্! জয় হিন্দ্! সীমান্তের ঘন অরণ্যের ভিতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল সেই ধ্বনি, শত্রু-শিবিরে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছিল।'

২১শে মার্চ সুভাষ এ উপলক্ষে এক বিশেষ ঘোষণা প্রচার করলেন ভারতবাসীর উদ্দেশে। স্বাধীনতার লগ্ন আসন্ন! এ সময়ে প্রতিটি ভারতবাসীকে তার কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে হবে। এ সুবর্ণ সুযোগ হারালে চলবে না।

'Sisters and brothers in India! This is the golden opportunity for you to fulfil yours long cherished aspirations for freedom. If you rise to the occasion and do your duty, freedom will be yours before long. In this momentous crisis India expects every one to do his or her duty. Jai Hind.'

২২শে মার্চ জেনারেল তোজো জাপ-ডায়েটে ঘোষণা করলেন তাঁর পূর্ব-প্রতিশ্রুতির কথা। ভারতবর্ষের অধিকৃত অঞ্চলের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব আজাদ হিন্দ্ সরকারের। সেখানে আমাদের কিছু করণীয় নেই।

'It is natural that all areas over which the Indian National Army marches within India, must be placed completely under the Administration of the Provisional Government.'

[John A. Thivy: P.—80]

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তোজোর এই আগ্রহ নতুন নয়। এ সম্বন্ধে বার বার তিনি ঘোষণা করেছেন তাঁর নীতির কথা। সবশেষে বর্মার জাপ-বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল কাওয়াবেকে ডেকে এনে সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন স্পষ্ট ভাষায়। ভুলে যেও না, এ অভিযানের মূল উদ্দেশ্যই হল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা।

'Gen. Kawabe was summoned by Premier Tojo and told that the real purpose of the military operations in Burma is to pave the way for Indian independence movement. Fully convinced of the significance of his mission, Gen. Kawabe left for Burma.' [Tatsuo Hayashida : P.—79]

বর্ডার পেরিয়ে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ তখন একইভাবে এগিয়ে চলেছে ভারতের অভ্যন্তরে।

ছুটেছে গান্ধী ব্রিগেড। ছুটেছে সুভাষ ব্রিগেড। ছুটেছে আজাদ ব্রিগেড। এবং অন্যান্য বাহিনী। দেখি কে আগে যেতে পারে আমাদের মধ্যে!

১নং ডিভিশনের সেনানায়ক কিয়ানী সাহেব ছুটে চলেছেন ইম্ফলের দিকে। শাহনওয়াজ খানের লক্ষ্য—কোহিমা। যে করে হোক, ইম্ফল ও কোহিমার বুকে ভারতের তেরঙা জাতীয় পতাকা আমরা তুলবই।

সমস্ত প্রতিরোধ-ব্যবস্থা তছনছ করে দিয়ে আটদিক থেকে আটজন সেক্টর কম্যান্ডার ছুটে চলেছেন মরীয়া হয়ে। গুলজারা সিং, ঠাকুর সিং, প্রীতম সিং, পূরণ সিং, এস. মালিক, রাতুরি, বুরহানউদ্দিন, রামস্বরূপ, কেউ আজ আর পিছিয়ে থাকতে রাজী নন।

পরবর্তী লক্ষ্য বর্তমান নাগাল্যান্ডের রাজধানী—কোহিমা।

মরীয়া হয়ে বাধা দিচ্ছে রয়েল ইয়র্কশায়ার রেজিমেণ্ট, ডারহাম লাইট ইনফ্যান্ট্রি, রয়েল স্কটস্ প্রভৃতি বিদেশী দলগুলি। কিন্তু কার সাধ্য রণোন্মত্ত আজাদী বাহিনীর গতিরোধ করে? দেখে মনে হয়, দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া এবং নেওয়া, দুটোই যেন তাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ কাজ।

প্রথমেই দখল করা হল জি. টি. পাহাড়ে অবস্থিত জলাধার কেন্দ্র। তারপর ডেপুটি কমিশনারের বাংলো। সে কি ভয়াবহ লড়াই তখন দুপক্ষের মধ্যে। ক্রমশ পিছু হটতে হটতে শত্রুপক্ষ এমন একটা জায়গায় গিয়ে জড় হল, যা দৈর্ঘ্যে ছয়শো গজ এবং প্রস্থে সাড়ে তিনশো গজ মাত্র। এ অবস্থায় লড়াই আর কতক্ষণ!

৮ই এপ্রিল কোহিমার পতন হল আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কর্ণেল ঠাকুর সিং-এর হাতে। হাজার হাজার জওয়ানের কণ্ঠে তখন রব উঠল—জয় হিন্দ্! চলো দিল্লী! নেতাজী জিন্দাবাদ! আমরা কোহিমা জয় করেছি নেতাজী।

'The final onslaught on Kohima was then done under the command of Col. Thakur Singh, Second-in-Command of

the Subhas Brigade. The Tri-colour Flag was hosited on the mountain tops around Kohima.'
[Battle of Imphal : Debnath Das : Contemporary : June, 1972]

সেনাদের সঙ্গে সঙ্গে সুভাষও তখন কদম কদম এগিয়ে চলেছেন ভারতের দিকে। প্রথমে সিঙ্গাপুর। তারপর রেঙ্গুন। কোহিমা পতনের পরদিনই তিনি তাঁর হেড কোয়ার্টার্স এগিয়ে নিয়ে গেলেন মেমিওতে সেনাবাহিনীর যত কাছাকাছি থাকা যায় ততই ভালো।

কোহিমা ইম্ফলের উত্তরে। এবার আক্রমণ শুরু হল দক্ষিণ দিক থেকে। ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর সমস্ত শক্তি এখন কেন্দ্রীভূত করেছে ইম্ফলে। নানাদিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে ইম্ফলকে এবার ঘিরে ফেলা চাই।

শুরু হয়েছে বাহাদুর গ্রুপের কাজ। ছদ্মবেশে শহরে ঢুকে যাও। গোপনে সাক্ষাৎ করে সব কথা বুঝিয়ে বল ওখানকার স্বাধীনতাকামী নেতৃবৃন্দকে। দেখো, ধরা পড়ো না যেন। খুব হুঁশিয়ার!

নির্বিঘ্নে ফিরে এলেন বাহাদুর গ্রুপের বাহাদুর তরুণ মহম্মদ সাহেব। খবর শুভ। স্থানীয় নেতা কৈরেণ সিং এবং নীলমণি সিং নেতাজীর এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে সহায়তা করতে রাজী হয়েছেন—সর্বতোভাবে।

কৈরেণ সিং এবং নীলমণি সিং। নামদুটো চেনা চেনা লাগছে না! তুমি ঠিকই অনুমান করেছ মল্লিকা। জনপ্রিয় নেতা এই কৈরেণ সিংই মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন পরবর্তীকালে। আর নীলমণি সিং ক্যাবিনেট মন্ত্রী। দুজনেই সেদিন এগিয়ে এসে হাত মিলিয়েছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে।

খবর শুনে সঙ্গে সঙ্গে সেক্টর কম্যাণ্ডার গ্রীণ সিগন্যাল দিলেন জওয়ান বাহিনীকে। চলো এবার ময়রাং। ময়রাং আমাদের চাই-ই!

শত্রুপক্ষও তখন রীতিমত প্রস্তুত। গত দু বছরে তারা প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করেছে ভেতরে ভেতরে। সৈন্যসংখ্যাও অনেক বেশি। ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ছাড়াও সঙ্গে রয়েছে চীন, পশ্চিম আফ্রিকা এবং ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনী, যাদের সংখ্যা কয়েক লক্ষের কম নয়। আর সমর-সম্ভারের তো কথাই নেই। মার্কিন মুলুক থেকে সমর-সম্ভার আসছে তো আসছেই।

আর এ পক্ষে শুধু আজাদ হিন্দ ফৌজ ও জাপানের তিনটি ডিভিশন মাত্র। যোগাযোগ এবং সরবরাহ-ব্যবস্থাও অত্যন্ত অনিশ্চিত। শত শত মাইলব্যাপী সাপ্লাই-লাইন। শত্রুপক্ষের বিমান-বহর এবং গেরিলাবাহিনীর হাত থেকে এই সুদীর্ঘ সাপ্লাই-লাইন রক্ষা করা রীতিমত কষ্টকর ব্যাপার। ব্যাপার।

শুরু হল লড়াই। প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য লড়াই। প্রতিটি পাহাড়ে প্রচণ্ড হাতাহাতি লড়াই। দিন-রাত্রি সর্বক্ষণ রক্তক্ষয়ী লড়াই। তবু কিছুতেই গতিরোধ করা গেল না দুরন্ত আজাদ হিন্দ বাহিনীর। অবশেষে ময়রাং-এর সেই রক্ত-ঝরা পথে শোনা গেল তাদের বিজয় উল্লাস। চলো দিল্লী! চলো দিল্লী! চলো দিল্লী! ময়রাং আমাদের। আমরা ময়রাং জয় করেছি। আর মাত্র পঁচিশ মাইল। তারপরেই ইম্ফল।

১৪ই এপ্রিল জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বিজয়-উৎসবের সূচনা করলেন কর্ণেল এস. এ. মালিক। নেতাজী জিন্দাবাদ! আমরা ময়রাং দখল করেছি। ইম্ফল আর কতদূর?

'It was fourteenth April, 1944, that Col. S. Malik, Sector Commander, Azand Hind Fouj hoisted the National Flag of India.'

এবার হেড কোয়ার্টার্স স্থাপন করা হল ময়রাং-এ। মল্লিকা, কোনদিন ময়রাং গেলে স্বাধীনতা-সংগ্রামের তীর্থভূমি নীলমণি সিং-এর এই বাড়িটা দেখে আসতে ভুলো না যেন। দেখবে, বাড়িটার সর্বাঙ্গে এখনো কত মেসিনগানের গুলীর দাগ চিহ্নিত হয়ে আছে ইতিহাসের সাক্ষীরূপে। সে স্মৃতি আজো তেমনি উজ্জ্বল। তেমনি অবিস্মরণীয়।

আমরা ভুলে গেছি, কিন্তু বিদেশীরা ভোলেননি। তাই মুগ্ধ বিস্ময়ে বলেছেন ডঃ বা. ম.:

'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানান জায়গায় ছড়িয়ে-থাকা মানুষদের নিয়ে যে একটি ভারতীয় রাষ্ট্র, সরকার ও সেনাবাহিনী গড়ে তোলা যেতে পারে, তা কেউ কখনও কল্পনা করেনি। কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে আমি সেই অসাধ্য সাধন করতে দেখলাম। চোখের সামনে দেখলাম যে, বিশ্বযুদ্ধে তিনি তাদের একটি বড় রকমের শক্তি হিসেবে গড়ে তুললেন। এটি সম্ভব হয়েছিল তাঁর একাগ্রতার জন্য, তাঁর নিষ্ঠার জন্য। চিত্তের এই একাগ্র সঙ্কল্পই বিশ্বের অর্ধাংশ জুড়ে সেদিন ভারতবর্ষের স্বপ্নকে অনুসরণ করে ফিরেছে।

মধ্য-প্রাচ্যের ভিতর দিয়ে এগিয়েছে, রাশিয়ায় গিয়ে ঢুকেছে, তারপর সেখান থেকে জার্মানীতে, জার্মানী থেকে পূর্ব-এশিয়ার দূরতম প্রান্তে, সেখান থেকে আবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং তারপর ব্রহ্মদেশে সেই সঙ্কল্পের অগ্রগতিই আমরা লক্ষ্য করেছি।

অবিশ্বাস্য সেই সপ্তাহগুলির কথা মনে পড়ে, সীমানা অতিক্রম করে সুভাষচন্দ্রের সঙ্কল্প যখন ভারতভূমির মধ্যে গিয়ে প্রতিষ্ঠা পেল। একটি জীবন আর তার জ্বলন্ত বিশ্বাস যেন দেখতে দেখতে সেদিন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ত্রিশ লক্ষ ভারতবাসীর বুকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে সেদিন সমস্ত কিছুই দিয়েছিল তারা।'

কোহিমার পরে ময়রাং। তারপর বিষেণপুর।

কাজটা কিন্তু মোটেই সহজ ছিল না মল্লিকা। বলতে গেলে গোটা পথটাই আজাদী বাহিনীকে এগুতে হয়েছিল মাটি কামড়ে, বুকে ভর দিয়ে। সবচাইতে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল মিখতুখং গ্রামে। কতবার যে গ্রামটা হাত-বদল হয়েছিল তার বোধহয় গোনা-গুনতি নেই।

আজাদী বাহিনী তখন মরীয়া, বেপরোয়া। কত রক্ত দিতে হবে আমাদের! যা লাগে তাই দেব, তবু বিষেণপুর আমাদের চাই-ই।

অনেক রক্তের বিনিময়ে অবশেষে বিষেণপুরও একদিন চলে এলো আজাদী বাহিনীর হাতে। সে কি জয়োল্লাস তখন প্রতিটি জওয়ানের!

আমরা বিষেণপুর এসে গিয়েছি। ঐ যে ইম্ফল দেখা যাচ্ছে। আর মাত্র তিন মাইল বাকী। তারপরই আমরা আমাদের জাতীয় পতাকা তুলে ধরব ঐ ইম্ফলের বুকে। জান কবুল!

কিন্তু শিলচর! শিলচর দেখা যায় না এখান থেকে! দেখা যায় না লামডিং, গৌহাটি বা চট্টগ্রাম!

হ্যাঁ, দেখা যায়। উঠে এসো এই পাহাড়টার চূড়ায়। তাকিয়ে দেখ ভাল করে। আর মাত্র ন'টা পাহাড়ের রেঞ্জ। তারপরই শিলচর। ঐ যে ওদিকে।

উন্মাদ হয়ে উঠেছে আজাদী ফৌজ। কোহিমা স্বাধীন। ময়রাং, বিষেণপুর মুক্ত। আর দেরী নয়। চলো এবার ইম্ফল।

কাণ্ড দেখে ভয়ে আতঙ্কে নীল হয়ে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ ও মার্কিন বাহিনী। দুর্বার, দুরন্ত, বেপরোয়া এই আজাদী বাহিনীর হাত থেকে বাঁচতে হলে বরাবরের মত সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

একই আর্তনাদ তখন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের কণ্ঠেঃ

'ইম্ফলের পরিস্থিতি সম্বন্ধে সেনাধ্যক্ষরা অত্যন্ত চিন্তিত। যদি অবিলম্বে রিজার্ভ সৈন্য না পাঠানো যায়, তাহলে ইম্ফল রক্ষার কোন উপায়ই আর থাকবে না।'

কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব! পথ কোথায়! না, কোন পথ নেই। একমাত্র পথ ছিল ডিমাপুর রোড. আজাদী বাহিনী সে পথও এখন বন্ধ করে দিয়েছে বিদ্যুৎগতিতে। ফলে, ইম্ফল চারিদিক থেকে পরিবেষ্টিত। এখন হয় আত্মসমর্পণ, নয়তো মৃত্যু, এ ছাড়া আর কোন পথই খোলা নেই সাম্রাজ্যবাদী বাহিনীর কাছে।

খবর শুনে উল্লাসে ফেটে পড়ল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবগুলি বেতার কেন্দ্র। ব্রিটিশ-সিংহ ইম্ফলের লৌহ-বেষ্টনীর মধ্যে ঘেরাও। এখন শুধু জাঁতিকলে পিষে মারবার অপেক্ষা মাত্র। সাবাস জওয়ান! হাজার সাবাস তোমাদের!

জাপানী সেনানায়কদের মুখেও সেই একই কথা। দেখালে বটে হিজ এক্সেলেন্সী চন্দ্র বসুর আজাদী বাহিনী। সত্যিই ওদের তুলনা নেই। ব্রিটিশ মুখপাত্রের ভাষায়ঃ

'রেঙ্গুনের জাপানীরা তখন যুদ্ধরত আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।'

কিয়ানীর নেতৃত্ব ও তাঁর সৈন্যদলের অসাধারণ কর্মকুশলতা সম্পর্কে ক্রমে ক্রমে আরো খবর এল।

'The Japanese in Rangoon spoke highly of the I. N. A. in battle, and there were other reports of Kiani's leadership and of the wonderful work of his men.'

[Hugh Toye: P.—114]

আর মাত্র তিন মাইল বাকী। তারপরই ইম্ফল। কতদিন লাগবে এই ইম্ফল জয় করতে ?

প্রশ্নটা শুধু সুভাষের একার নয়, রেঙ্গুনের প্রতিটি অধিবাসীর। কবে ? কবে ? কবে ? ৪ঠা জুলাই থেকে আমাদের 'নেতাজী সপ্তাহ' উৎসব শুরু হবে রেঙ্গুনে। তার আগেই হবে কি ?

না. অতদিন লাগবে না। এ পর্যন্ত যে সব খবর পাওয়া গেছে তাতে খুব বেশি হলে তিন সপ্তাহ। তার মধ্যে ইম্ফলের পতন অনিবার্য।

ইম্ফলে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী পরিবেষ্টিত। চারিদিকে তার লৌহ-বেষ্টনী।

এ তো গেল আমাদের কথা। এ প্রসঙ্গে বিপক্ষ দলের বক্তব্যটাও একবার শুনে নাও। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের হাতে একটার পর একটা পরাজয় সত্ত্বেও সেদিন চতুর ইংরেজ কিভাবে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করেছিল, তা নিজের চোখেই একবার দেখে নাও।

লক্ষ্য কর যে, ব্রিটিশ কর্তৃক প্রকাশিত এই ইস্তাহারে কোথাও সুভাষ বা আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কোন উল্লেখ নেই। কেন নেই ? সেকথা বলব আরো পরে। এখন শুধু দেখে যাও।

২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪ সাল

'দিল্লীতে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, আরাকানে চতুর্দশ আর্মির ভারতীয় ও ব্রিটিশ সৈন্যরা জাপানীদিগকে ভালভাবে পরাজিত করিয়াছে। প্রায় আট হাজার জাপানী সৈন্য চতুর্দশ আর্মির যোগাযোগ ছিন্ন করিয়া উহাকে পরিবেষ্টনপূর্বক ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায় এবং তাহারা নিজেরাই গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এযাবৎ প্রায় পনের শত জাপানীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে ; আহতের সংখ্যা মৃতের প্রায় দ্বিগুণ হইবে। আর মাত্র কয়েকশত সৈন্য লইয়া গঠিত দুইটি জাপানী দলকে পর্যুদস্ত করিতে বাকী আছে। প্রতি-পক্ষের তুলনায় ব্রিটিশপক্ষের হতাহত কম।'

মল্লিকা, আরাকান সেক্টরে কর্ণেল এল. এস. মিশ্রের অবিশ্বাস্য কীর্তির কথা তুমি আগেই শুনেছ। ব্রিটিশ মুখপাত্র হিউ টয়ও সেকথা স্বীকার করেছেন বার বার। তাহলে কেন এই অসত্য ভাষণ ?

কারণ, এর নাম যুদ্ধ। যুদ্ধে যে বস্তুটি সর্বপ্রথম নিহত হয়, তার নাম হল—'সত্য'। শুধু সেদিন বলে নয়, যুদ্ধের সময়ে এ ইতিহাস চলে আসছে বরাবর। যাক, তাড়াতাড়ি আরো কয়েকটি ইস্তাহারের দিকে চোখ বুলিয়ে নাও।

২২শে মার্চ, ১৯৪৪ সাল

'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কম্যাণ্ডের ইস্তাহারে প্রকাশ, চিন্দুইন নদীর উপর দিয়া পাল্টা-আক্রমণ চালনাকালে জাপবাহিনী পশ্চিমাভিমুখে পার্বত্য

অঞ্চলের অরণ্য ও পর্বতের মধ্যে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। দুই-এক স্থানে তাহারা মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কোন কোন জায়গায় তাঁহারা ব্রিটিশ টহলদারদের সংস্পর্শে আসে। চিন পার্বত্যাঞ্চলে টিডিমের উত্তরে জাপানীদের পার্শ্ব পরিবেষ্টন কৌশল রোধ করিবার জন্য ব্রিটিশবাহিনীর একাংশ সর্বাধিক অগ্রবর্তী অবস্থান হইতে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। আক্রমণকারী একদল জাপানী সৈন্য চিন পাহাড়ের পথটির একাংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

ভারতের প্রধান সেনাপতি জেনারেল স্যার ক্লড অকিনলেক জাপানী সৈন্যের মণিপুরে প্রবেশ এবং ভারত-ব্রহ্ম রণাঙ্গনের যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্বন্ধে এক বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—বসতি-বিরল পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়া ভারতের যে সীমারেখা রহিয়াছে, মানচিত্রের ঐ লাইন বরাবর শত্রুসৈন্য অগ্রসর হইতেছে জানিয়া অযথা আতঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই। আসামে আমাদের রেল ও নদীপথগুলি এবং বিমানঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাইতে পারে—এইরূপ স্থানে জাপানীরা যে পর্যন্ত ঢুকিয়া পড়িতে না পারিতেছে, ততদিন পর্যন্ত আতঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই।'

৮ই এপ্রিল, ১৯৪৪ সাল

'ইম্ফল-কোহিমা সড়ক বিচ্ছিন্ন হওয়ায় শত্রুর প্রধান লক্ষ্যস্থল ইম্ফলে কার্যতঃ অবরোধকালীন অবস্থা দেখা দিয়াছে।—জাপানীরা কোহিমা আক্রমণ করে এবং শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছিতে সমর্থ হয়। পাল্টা-আক্রমণ চালাইয়া তাহাদিগকে পুনরায় বিতাড়িত করা হয়।'

১২ই এপ্রিল, ১৯৪৪ সাল

'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কম্যাণ্ডের ইস্তাহারে প্রকাশ, জাপানীরা ইম্ফল সমতলের উত্তর-পূর্বে একটি ছোট পাহাড় দখল করে। আসাম রণাঙ্গনে ডিমাপুর হইতে ৪৬ মাইল এবং ইম্ফল হইতে ৯০ মাইল দূরে মণিপুর রোডের বাঁকে অবস্থিত কোহিমায় গত তিনদিন ধরিয়া তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে।

ইম্ফলের দক্ষিণ-পশ্চিমের বিষেণপুর-শিলচর রোড এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কার্যকলাপের বিষয় অদ্যকার মিত্রপক্ষীয় সমর-ইস্তাহারে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার দক্ষিণ দিকে দলে দলে জাপ-সৈন্য আসিয়া শক্তি বৃদ্ধি করায় সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।'

২২শে মে, ১৯৪৪ সাল

'ইম্ফল রণাঙ্গন হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, কয়েক দল জাপ-সৈন্য বিষেণপুর টিডিম রোডের পশ্চিম দিকের পার্বত্য অঞ্চল হইতে আত্মগোপন

করিয়া অগ্রসর হইয়া ইম্ফলের দশ মাইলের মধ্যে একটি অঞ্চলে আক্রমণ চালায়। এই অভিযানে জাপানীরা মিত্রপক্ষের ঘাঁটিগুলির সম্মুখভাগে রাস্তার উপর দুইটি সেতুমুখ ধ্বংস করিতে সক্ষম হয়।'

ইস্তাহারে যা-ই বলুক না কেন, এদিকে কিন্তু তলে তলে হাওড়া সেতুর নীচে শক্তিশালী ডিনামাইট বসানো হয়ে গেছে মল্লিকা। ওদের বিশ্বাস নেই। ওরা সব পারে। ইম্ফল তো কবেই খরচের খাতায় তোলা হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে আসাম এবং বাংলাদেশও যে যায়-যায় অবস্থা। তেমন বেকায়দা দেখলে পাততাড়ি গুটিয়ে ওপারে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেতু উড়িয়ে দেওয়া হবে ডিনামাইট দিয়ে। তারপর সোজা রাঁচী। ওখানেই আবার ডিফেন্স লাইন গড়ে তোলা হবে নতুন করে। অদৃষ্টে কি আছে কে জানে! শেষ পর্যন্ত ডানকার্কের পুনরাবৃত্তি হবে কিনা তাই বা কে বলতে পারে!

শুধু ইম্ফল বলে নয়, অন্যান্য সেক্টরেও তখন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলেছে দুপক্ষের মধ্যে। সর্বত্রই ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে মার খেতে হচ্ছে আজাদী বাহিনীর হাতে। যেমন ক্লাংক্লাং ঘাঁটি। আজাদী বাহিনীর তখন একমাত্র লক্ষ্য, যে করে হোক, ব্রিটিশের ঐ মজবুত ক্লাংক্লাং ঘাঁটিকে বিধ্বস্ত করা চাই-ই।

১৪ই মে একদল সেনা নিয়ে পাড়ি দিলেন মেজর মহবুব আহম্মদ। মাত্র বিশ মাইল পাহাড়ী পথ। ও তো দেখতে দেখতেই কেটে যাবে। চলো ভাইসব পা চালিয়ে। তারপর কার কত হিম্মৎ দেখা যাবে!

শেষরাত্রির দিকে নিঃশব্দে ঘাঁটির কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন মেজর মহবুব আহম্মদ। চেষ্টা করলেন চারদিক থেকে ঘিরে ফেলতে। কিন্তু না. কোন উপায় নেই। একেবারে খাড়া পাহাড়। উপরে যাবার একটা মাত্র পথ আছে. কিন্তু সেদিকে মুখ করে সাজানো রয়েছে অসংখ্য কামান। টের পেলে ঠিক উড়িয়ে দেবে।

নাঃ। সামনা-সামনি আক্রমণ করা ছাড়া কোন উপায় নেই। ঠিক আছে, তাই হোক। হামাগুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে সবাই উঠে যেতে চেষ্টা কর খাড়া পাহাড় বেয়ে। সাবধান, আগে থেকে ওরা যেন কিছুই টের না পায়। তাছাড়া কোনরকমে পা পিছলে পড়ে গেলে অবধারিত মৃত্যু, সেটাও মনে রাখতে হবে।

তবু শেষরক্ষা করা গেল না। তার আগেই ব্যাপারটা ধরা পড়ে গেল বিপক্ষের সন্ধানী চোখে। তারপরই শুরু হল একটানা গোলাবর্ষণ।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল আজাদী ফৌজ। এতদূর পথ এসে কিছুতেই ফিরে যাওয়া চলবে না। চালাও একধারসে মেসিনগান।

গর্জে উঠলেন আজাদী দলের ক্যাপ্টেন অম্বিক সিং। নিমেষে তিনি কয়েকজন সঙ্গীসহ ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুপক্ষের পরিখার মধ্যে। তারপরই শুরু হল হাতাহাতি লড়াই। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! নেতাজী জিন্দাবাদ! ঐ যে ওরা পালাতে শুরু করেছে ঘাঁটি ছেড়ে। কাউকে ছেড়ো না যেন। চালাও বোমা।

দেখতে দেখতে কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গেল ভোরের আকাশ। কি হল কিছুই বোঝা গেল না। ঘণ্টাখানেক বাদে দেখা গেল, যে ক্লাংক্লাং ঘাঁটি গত রাতেও ব্রিটিশ দখলে ছিল, এখন সেখানে পত্‌পত্‌ করে উড়ছে ভারতের তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা।

আক্রমণ এবং পাল্টা-আক্রমণ দুপক্ষ থেকেই তখন চলছে সমানভাবে। কেউ কাউকে সহজে ছেড়ে দিতে রাজী নয়।

একবার ব্রিটিশপক্ষীয় বিখ্যাত 'সি ফোর্থ হাইল্যাণ্ডার' দল এল মিথানখুনাও অঞ্চলে অবস্থিত আজাদী ঘাঁটি আক্রমণ করতে। অবাধ্য আজাদী বাহিনীকে শিক্ষা না দিয়ে জলস্পর্শ করতেও বুঝি তারা রাজী নয়।

এদিকে লেঃ আজইব সিংও তখন প্রস্তুত। ঠিক আছে ওদের আসতে দাও। সবাই পরিখার মধ্যে পজিশন নাও। হুকুম পেলে সঙ্গে সঙ্গে চার্জ করবে মেসিনগান।

দৌড়! দৌড়! দৌড়! গুলী খেয়ে পড়ি কি মরি বলে দৌড়। তা বলে এত সহজে হার মানতে রাজী নয় শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের দল। তাই আবার তারা এগিয়ে এল কামান এবং মর্টার নিয়ে।

বার বার তিনবার, কিন্তু ফল দাঁড়াল একই। অর্থাৎ—সেই সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ।

আবার আক্রমণ ঘটল কিছুদিন বাদে। এবারের আয়োজন আরো বিরাট। আরো ব্যাপক। একসঙ্গে সি ফোর্থ হাইল্যাণ্ডার বাহিনীর প্রায় তিন হাজার সুদক্ষ সৈন্য। সেই সঙ্গে বড় বড় কামান এবং ওপরে বোমাবর্ষণকারী বিমানের ঝাঁক।

এদিকে মাত্র ছ'শো আজাদী সৈনিক। সমর-সম্ভার ওদের তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট। তার ওপর কিছু সৈনিক আবার রীতিমত অসুস্থ।

শুরুতে আজাদী বাহিনীর বিপর্যয়। দেখা গেল ক্যাপ্টেন রাও-এর অধীনস্থ পুরো দলটাই ঘেরাও হয়ে পড়েছে সি ফোর্থ হাইল্যাণ্ডারের হাতে। এমন কি স্বয়ং কর্ণেল আই. জে. কিয়ানী সাহেব পর্যন্ত ঘেরাও। চারপাশে তাঁর দৃঢ় বেষ্টনী।

একমাত্র উপায় সমনের ঐ উঁচু পাহাড়-চূড়াটা দখল করে শত্রুপক্ষের মহড়া নেওয়া। কিন্তু সে যে একেবারেই অসম্ভব। শত্রুপক্ষ সে সুযোগ দেবে কেন তাদের?

মাত্র ত্রিশজন সৈন্য নিয়ে সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুললেন লেঃ মনসুখলাল। নেতাজী জিন্দাবাদ! চলো ভাই সব, এগিয়ে চলো। জলদি চলো। আউর থোড়া।

এক এক করে তেরোটি গুলি গায়ে নিয়ে একসময় লুটিয়ে পড়লেন মনসুখলাল, তবু মুখে তাঁর সেই একই ধ্বনি। জলদি চলো। আউর থোড়া। সাবাস জওয়ান!

মুহূর্তে থমকে দাঁড়াল আজাদী সৈনিকের দল। দলনেতা মনসুখলালজী আহত। কি করা উচিত এ পরিপ্রেক্ষিতে?

আরে বাসরে বাস! সঙ্গে সঙ্গে সব যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে গর্জে উঠলেন মনসুখলাল, থামলে কেন? জলদি এগিয়ে যাও। চার্জ! দুশমনকে ছেড়ো না যেন। এবার ঝাণ্ডা ওড়াও!

সত্যিই পাহাড়-চূড়াটা দখলে এল মল্লিকা। এই ঘাঁটি নেওয়া-না-নেওয়ার উপরই সেদিন নির্ভর করছিল গোটা গান্ধী ব্রিগেডের ভবিষ্যৎ।

ততক্ষণে লেঃ আজইব সিং ছুটে এসেছেন পাল্টা-আক্রমণ চালিয়ে অবরুদ্ধ ক্যাপ্টেন রাও-এর বাহিনীকে মুক্ত করতে। ফল হল মারাত্মক। দেখা গেল, শত্রুপক্ষই এবার ঘেরাও হয়ে পড়েছে আজইব সিং-এর হাতে। চারপাশে তাদের বজ্রবেষ্টনী।

বিপক্ষ দল হতভম্ব। তারপরই রব উঠল—পালাও! পালাও! কিন্তু কোথায় পালাবে? পথ কোথায়? দুদিকেই যে তার অগ্নিবেষ্টনী। ফলে বহু শত্রুসৈন্যকে প্রাণ দিতে হল যুদ্ধক্ষেত্রে।

সে এক ভীষণ হত্যাকাণ্ড। রণক্ষেত্র ভরে উঠল নিহত ও আহত টমির মৃতদেহে।

ওদিকে তখন চঞ্চল হয়ে উঠেছেন ঝাঁসীর রাণীবাহিনীর মেয়েরা। ভাইয়েরা সবাই লড়াইতে গিয়ে প্রাণ দিচ্ছে, রক্ত দিচ্ছে, আর আমরা বুঝি সবাই পড়ে থাকব পেছনের এই মেমিও হাসপাতালে! তা কি হয় কখনো! ভাইদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে হবে না!

শেষপর্যন্ত মেমিও হাসপাতাল থেকেই তাঁরা এক চিঠি লিখে পাঠালেন সুভাষকে। কালি দিয়ে নয়, রক্ত দিয়ে। আপনিই একদিন বলেছিলেন, এ যুদ্ধে পুরুষ এবং নারীকে সমানভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাহলে আমরা কেন পিছিয়ে থাকব নেতাজী? দয়া করে আমাদের যুদ্ধ-যাত্রার অনুমতি দিন।

'It is you who taught us that there is no distinction between men and women. It is you who gave us training fit for men-folk, have inspired us with courage and moral stamina required for actual warfare. We have received complete military training. In these circumstances why should we not be sent to battle front? It is our prayer that we be sent to the front without delay.'

পরের কাহিনী লেঃ মিস জানকী থিবার্স-এর 'বিদ্রোহী কন্যার রোজ-নামচা' গ্রন্থ থেকেই তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি:

কি মজা! হুকুম এসেছে, ঝাঁসীর রাণীবাহিনী থেকে দুটো দল সম্মুখ-যুদ্ধে এগিয়ে যাবে। তবে সম্মুখ-যুদ্ধে লড়াই করা খুবই কঠিন, সেইজন্যে পুনঃ পুনঃ আমাদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে।...যখন আমরা ফ্রণ্ট-লাইনে পেঁছিলুম, তখন সেখানে বেঁচে থাকাই খুব কঠিন, কিন্তু আমরা কিছুতেই দমে যাইনি।

...রাত্রি তিনটায় শুরু করে অনেকদূর মার্চ করে যেতে হল। আলো একদম নেই, গাঢ় অন্ধকার ; আমাদের বলে দেওয়া হল, যেন কোন কথা-বার্তা বা অনাবশ্যক শব্দ না করা হয়। খালি তাড়াতাড়ি মার্চ করে যাওয়া।

মনে হচ্ছিল যেন পথের আর শেষ নেই। চলেছি তো চলেইছি। শেষে এক পাহাড়ের পাশে আমাদের পজিশন নিতে বলা হল। মাঝের যে জায়গা তার মালিক কেউ নেই। তার ওধারে প্রায় মাইলখানেক পরে ব্রিটিশ সৈন্যদল। আমাদের সামনের উপত্যকায় তারা মার্চ করে এল। কখন আমাদের বন্দুক ছুঁড়তে হুকুম দেওয়া হবে ? সময় যে বয়ে যায়! শেষে হুকুম দেওয়া হল।

তখনকার মত ভুলে গেলাম যে, আমি নারী। আমরা প্রত্যেকে যেন এক-একটা যন্ত্র। আওয়াজ করলুম, ফের ভর্তি করলুম, আবার ছুঁড়লুম, পর-পর, কোন বিরাম নেই। তারপর হুকুম এল, বেয়নেট সোজা করে চার্জ কর।

লাফ দিয়ে পাহাড় থেকে নীচের দিকে নামতে লাগলাম। আমার পাশে যে ছিল, সে পড়ে গেল। আমি কিন্তু থামলাম না। আমার পায়ের চাপে তার হাত পিষে গেল। 'জয় হিন্দ্' বলে চীৎকার দিয়ে পাগলের মত এগিয়ে গেলাম। তারপর একসময়ে আঘাত পেয়ে টলতে টলতে পড়ে গেলাম।

আমার আঘাতগুলি আস্তে আস্তে সেরে উঠেছে। এখন একটু বেড়াতে পারি। পরে শুনেছি যে, বেয়নেট চার্জের দরকার ছিল না। কারণ, শত্রুপক্ষ আত্মসমর্পণ করেছিল। আমাদের অনেকেই আহত, একটা গুরুত্ব-পূর্ণ যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করেছি। কেবলমাত্র আমরা মেয়েরাই সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম।—The action was won by our girls.'

ইতিহাস তখন এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে। একটি একটি করে ঘটনা ঘটছে, আর রচিত হচ্ছে ইতিহাস।

কোহিমা, ময়রাং ও বিষেণপুর জয়ের কথা আগেই বলেছি। এবার পরবর্তী তালিকাটি দেখে নাও।

২০শে মার্চ জয় করা হয়েছে তাউংজন। ২১শে মার্চ—উখরুল। ২২শে—টিড্ডিম। একই তারিখে জয় করা হয়েছে—মোলেন। সাংহাক দখল করা হয়েছে—২৫শে মার্চ। মাসের শেষ তারিখে—মোর্স।

এখানেই শেষ নয়। আরো আছে। ১লা এপ্রিল জয় করা হয়েছে—তামু এবং কাবাউ। ৫ই এপ্রিল—হেঙটাম। ৮ই এপ্রিল—কোহিমা, যার কথা তোমাকে আগেই বলেছি। তারপর—কাঙরা টংগী। ১৪ই—ময়রাং। ২০শে এপ্রিল—পেলেটোয়া এবং টেঙনপাল। ৭ই মে আর একটি আজাদী বাহিনী বর্ডার পেরিয়ে ভারতভূমিতে পা দিল দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে।

ইতিমধ্যে নব-নিযুক্ত গভর্ণর জেনারেল চ্যাটার্জীর পরিচালনায় শাসন-ব্যবস্থা বেশ সুষ্ঠুভাবেই চালু হয়েছে অধিকৃত অঞ্চলে। স্থানীয় জনসাধারণ তার নাম দিয়েছে 'নঙ্গ সরকার।

সমস্যা দেখা দিয়েছে সাপ্লাই-ব্যবস্থা নিয়ে। এ দায়িত্ব প্রধানত জাপ-ভারত সাহায্য সংস্থা 'হিকারী কিকান'-এর। কিন্তু এই দীর্ঘ সাপ্লাই-ব্যবস্থা চালু রাখা অধুনা বেশ কষ্টকর হয়ে উঠেছে তাদের পক্ষে।

সবচাইতে বড় সমস্যা—খাদ্য। খাদ্য বলতে যা পাওয়া যাচ্ছে, তা খুবই অকিঞ্চিৎকর। খানিকটা চাল, আর সেই সঙ্গে সামান্য একটু নুন মাত্র। তাও একদিন মেলে তো তিনদিন মেলে না।

দোষ ঠিক হিকারী কিকানের নয়। বর্মা নিজেই তখন খাদ্য এবং বস্ত্র-সমস্যায় রীতিমত বিব্রত। অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও অত্যন্ত দুর্মূল্য। এই নিয়ে ভেতরে ভেতরে বেশ বিক্ষোভও দানা বেঁধে উঠেছে প্রধানমন্ত্রী ডঃ বা. ম. এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী আউঙ্গ সানের মধ্যে। ঘটনা-স্রোত যে কোন্‌দিকে মোড় নেবে বলা শক্ত।

দায়িত্ব নিলেন স্থানীয় নাগা-সর্দারগণ। বিশেষ করে সাইকট গাঁয়ের নাগা-সর্দার রাজা কল্‌বেল। অত চিন্তার কি আছে! আমরা তো রয়েছি। ব্রিটিশ বা জাপানী কাউকেই আমরা চাইনে, চাই নেতাজীকে। তিনি তো আমাদেরও রাজা।

সহজ সরল মানুষগুলির চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই, কিন্তু হাজার হাজার জওয়ানের পক্ষে সে আর কতটুকু! তাছাড়া ওরা দেবেই বা কোথা থেকে! ওদের নিজেদেরই যে খাদ্যাভাব। সুতরাং ভাবনার কারণ আছে বৈকি।

এর মধ্যেই একদিন সুভাষ এসে পা দিলেন অধিকৃত অঞ্চলের বাসদেব-পুর গাঁয়ে। একটা বিশেষ সুরে ও ছন্দে মন সেদিন তাঁর কানায় কানায় ভরা। তৃপ্ত। 'সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি।' এই তো সেই দেশ! সেই জন্মভূমি! সংসারে এর তুলনা কোথায়?

বাসদেবপুর থেকে চূড়াচাঁদপুর। তারপর সাইকট গাঁয়ের রাজা সেই কল্‌বেলের বাড়িতে। নিজের চোখকেই বুঝি সেদিন বিশ্বাস করতে পারেননি রাজা কল্‌বেল। রাজার রাজা নেতাজী সুভাষ এসেছেন কিনা তাঁর এই দীন কুটিরে। এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত। কোথায় এখন বসাবেন তিনি তাঁকে? বরণ করবেনই বা কি দিয়ে?

পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ রাজা কিন্তু আজো কিছু ভোলেননি মল্লিকা। স্মৃতির দিগন্তে অনন্ত সেই কয়েকটি মুহূর্ত আজো তাঁর কাছে তেমনি উজ্জ্বল, তেমনিই মধুময়। ঐ তো ঐ গাছটার নীচে তিনি বসেছিলেন! পাহাড় থেকে সব সেপাইরা সেদিন নেমে এসেছিল তাঁকে দেখতে। তারপর কত কথা! কত কুশল-বার্তা! ভুলতে চাইলেই কি তাঁকে ভোলা যায়?

কিন্তু ইম্ফলের কি হলো! চলো, আবার আমরা ফিরে যাই সেই ইম্ফল রণাঙ্গনে।

ঐতিহাসিক ইম্ফল রণাঙ্গন!

একদিকে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ। অন্যদিকে অবরুদ্ধ ইঙ্গ-মার্কিন

বাহিনী। একদলের লক্ষ্য জন্মভূমিকে মুক্ত করা, অপর দলের লক্ষ্য পৃথিবীর অন্য প্রান্তে এসে নিজেদের প্রভুত্বকে কায়েম রাখা। একদল তাদের স্বদেশ থেকে বিদেশী শক্তিকে উচ্ছেদ করত দৃঢ়সংকল্প, অন্যদল তাদের নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর।

একদিকে আজাদী সৈনিকের লক্ষ্য, বুকে হেঁটে এগিয়ে গিয়ে শত্রু-বাহিনীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা। অন্যদিকে প্রতিপক্ষের লক্ষ্য—যে করে হোক তাদের প্রতিহত করা।

একটানা গর্জন করে চলেছে দূরপাল্লার কামান, মর্টার, ট্যাংক, মেসিন-গান ইত্যাদি ভারী ভারী মারণাস্ত্রসমূহ। চলেছে উভয় পক্ষ থেকেই। তবু অবস্থার কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। দুপক্ষই তেমনি অটল, অনড়।

বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে ধোঁয়া আর বারুদের গন্ধে। বিস্ফোরণের শব্দে কান পাতা দায়। নিশ্বাস নেওয়াও রীতিমত কষ্টকর। তবু চলছে তো চলছেই। মুহূর্তও বুঝি বিরাম নেই তার।

যাকে বলে খাঁচায় বন্ধ আহত সিংহ। সুভাষ ব্রিগেড নিয়ে ইম্ফল-কোহিমা রোড অবরোধ করে আছেন মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান। বিষেণপুর-ময়রাং সেক্টরে সদাসতর্ক বাহাদুর গ্রুপ। প্যালেলটামু রোডের পার্বত্য পথের উপর এক নম্বর ডিভিশনের প্রধান সেনাপতি মেজর জেনারেল এম. জেড. কিয়ানী। আর গান্ধী ব্রিগেড নিয়ে রয়েছেন তাঁরই খুড়তুত ভাই কর্ণেল আই. জে. কিয়ানী। এই দুর্ভেদ্য বেড়াজাল ভেদ করে বেরিয়ে আসার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

বন্যার মত এক-একবার সর্বকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ, কিন্তু না, কোন উপায় নেই। অপরপক্ষও তখন মরীয়া। পালাবার যখন পথ নেই, তখন লড়াই করেই মরব। মালয়, বর্মা, হংকং, সিঙ্গাপুর সব হারাতে হয়েছে একে একে। বাকী আছে শুধু ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষও যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, তাহলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আর রইল কি! তাই শেষপর্যন্ত না দেখে এবার আর আত্মসমর্পণ নয়।

আলোচনায় বসলেন সুভাষ এবং জাপ-সেনাপতি ফিল্ড-মার্শাল মুতাগাচি। কি করা যায় এখন এ পরিপ্রেক্ষিতে?

সুভাষের প্রস্তাব : অন্ততঃ একটা রাস্তা খুলে দেওয়া হোক। রাস্তা খোলা পেলে এবারও ওরা ঠিক পালিয়ে যাবে বরাবরের মত।

তার ফলে বেনাযুদ্ধেই হয়তো আমরা গোটা ইম্ফল পেয়ে যাব। মুতাগাচির ইচ্ছা অন্যরকম। তিনি চান—সিঙ্গাপুরের পুনরাবৃত্তি। অর্থাৎ—যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্রসহ গোটা বাহিনীর আত্মসমর্পণ।

তাই মেনে নিলেন সুভাষ। প্রস্তাবটা মন্দ নয়। সব মিলিয়ে মোট পঞ্চাশ হাজার সৈন্য রয়েছে এখন আজাদী বাহিনীতে। ভারতবর্ষের অন্যান্য ফ্রণ্টে লড়াই চালাতে হলে এ সংখ্যা যথেষ্ট নয়। অথচ ইম্ফলে ব্রিটিশ-ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা এখন দেড় লক্ষ। আত্মসমর্পণের পরে তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আজাদী বাহিনীতে টেনে আনা খুব একটা কষ্টকর হবে না। সেই সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রও পাওয়া যাবে প্রচুর। ফলে আজাদ হিন্দ্

ফৌজের শক্তি যে অনেকখানি বৃদ্ধি পাবে তাতে আর সন্দেহ কি!

তাছাড়া জওয়ানদের নিয়মিত খাদ্য সরবরাহের ব্যাপারটাও চিন্তা করার মত। মান্দালয় থেকে ইম্ফল—বহুদূর বিস্তৃত এই সাপ্লাই-লাইন এখন খুবই অনিশ্চিত। শত্রুপক্ষের বোমারু-বিমান এবং গেরিলাবাহিনীর উপদ্রবে কখন যে এ লাইন ভেঙে পড়বে, কেউ তা বলতে পারে না। তখন কি হবে ঐ হাজার হাজার জওয়ানের? কোথায় পাবে তারা প্রয়োজনীয় খাদ্য?

ইম্ফল ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর প্রধান সরবরাহ কেন্দ্র। প্রচুর খাদ্য ওখানে ওরা জড় করেছে বাঙালী ও অসমীয়াদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে। সামগ্রিকভাবে ঐ 'চার্চিল সরবরাহ কেন্দ্র' দখল করতে পারলে তবেই এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হওয়া সম্ভব। সুতরাং ইম্ফল চাই-ই।

কিন্তু আর কতদিন! কবে শেষ বাধা অতিক্রম করে আজাদী বাহিনী জাতীয় পতাকা তুলতে সক্ষম হবে ইম্ফলের বুকে! ইতিমধ্যে তিনমাস কেটে গেছে। তবু অবরুদ্ধ ইম্ফল অপরাজেয় রয়ে গেছে আগেকার মত। আর কত দেরী?

আর কত দেরী?

সুভাষেরও সেই একই ভাবনা। আশ্চর্য, গত দু সপ্তাহের মধ্যেও ফ্রন্ট-লাইন থেকে কোন খবর আসেনি। কি ব্যাপার! যুদ্ধের খবর কি! ইম্ফল জয়ের আর কত দেরী?

এদিকে বর্ষা আগতপ্রায়। আর মাত্র মাসখানেক বাকী। তারপরই শুরু হবে মারাত্মক পাহাড়ী বর্ষা। তার আগেই যে ইম্ফল অপারেশন শেষ করে ওখানে শক্ত হয়ে বসা দরকার।

সঠিক খবর সংগ্রহের জন্য ইতিমধ্যে মোট তিনজন সিনিয়ার অফিসার ঘুরে এসেছেন অধিকৃত অঞ্চল থেকে। মেজর জেনারেল চ্যাটার্জী, এস. সি. আলাগাপ্পন আর আনন্দমোহন সহায়। ফিরে এসে চ্যাটার্জী যে রিপোর্ট দিয়েছেন, তাতে প্রশাসনিক দিক থেকে কিছু সংশোধনের কথা উল্লেখ থাকলেও যুদ্ধ-পরিস্থিতি বেশ সন্তোষজনকই বলা চলে। তা সত্ত্বেও এই দীর্ঘ দু সপ্তাহের মধ্যে কোন খবর নেই কেন?

একই জিজ্ঞাসা তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ত্রিশ লক্ষ ভারতীয় নর-নারীর মনে। ইম্ফল পতনের আর কত দেরী? আর দুদিন বাদেই পূর্ব-ঘোষিত 'নেতাজী-সপ্তাহ' শুরু হবে রেঙ্গুনে। তার আগেই কি কোন উল্লেখযোগ্য খবর আসবে না রণাঙ্গন থেকে?

আসবে ঠিকই। দীর্ঘ তিনমাস যাবৎ ইম্ফল অবরুদ্ধ। এ অবস্থায় দুদিন আগে হোক বা পরে হোক আত্মসমর্পণ না করে যাবে কোথায়?

৪ঠা জুলাই প্রস্তাবিত নেতাজী-সপ্তাহ শুরু হল রেঙ্গুনের জুবিলী হলে। গত বছর ঠিক এই দিনে সুভাষ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন সিঙ্গাপুরে। আজ সেই ৪ঠা জুলাই।

প্রথমদিনে গত একবছরে কি কি কাজ করা হয়েছে তার একটি বিস্তৃত তালিকা সুভাষ তুলে ধরলেন জনসাধারণের কাছে।

সে-সব কাজের বিবরণ তুমি আগেই শুনেছ, তাই নতুন করে বলার কিছু নেই। এর মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য হল—আজাদ হিন্দ্ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা। অস্থায়ী স্বাধীন সরকারের একটি নিজস্ব ব্যাংক থাকা একান্তই প্রয়োজন। তাই ইতিমধ্যেই সুভাষ এই আজাদ হিন্দ্ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেছেন রেঙ্গুনে। ডি. এন. ভাদুড়ীর পরিচালনায় তার কাজও চলেছে খুবই সুষ্ঠুভাবে।

তাছাড়া মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করেছেন আরো পাঁচজন নতুন রাষ্ট্রমন্ত্রী। এঁরা হলেন যথাক্রমে—এস. রাঘবন, এ. ইয়েলাপ্পা, ঈশ্বর সিং. লেঃ কর্ণেল জি. নাগর এবং কর্ণেল হবিবুর রহমান।

পরদিন ৫ই জুলাই রেঙ্গুনে অবস্থিত সেনাবাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ এবং ভাষণ। ভাষণ দিতে গিয়ে সেদিন একটি মূল্যবান উক্তি করলেন সুভাষ:

'অল ইণ্ডিয়া রেডিও বলে, এখানে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীরা আজাদী বাহিনীতে যোগ দিতে চায়নি, তাই আমরা নাকি বেসামরিক লোকদের জোর করে ফৌজে ঢুকিয়ে নিচ্ছি। যার এতটুকু সহজ বুদ্ধি আছে. সে পর্যন্ত বুঝতে পারবে যে. জোর করে একটা বেতনভোগী সৈন্যদল গঠন করা যায়, কিন্তু মুক্তিফৌজ গঠন করা যায় না। কারণ. একজন সৈন্যকে জোর করে রাইফেল কাঁধে তুলতে বাধ্য করা যায়. কিন্তু বিনাস্বার্থে তাকে প্রাণ দিতে বাধ্য করা যায় না।'

৬ই জুলাই গান্ধীজীর উদ্দেশে বেতার-ভাষণ। কেন এই সংগ্রাম ? কি এর উদ্দেশ্য ? সব কথাই সেদিন তিনি বিশ্লেষণ করে বললেন গান্ধীজীর উদ্দেশে।

মহাত্মাজী,

আপনি বিশ্বাস করুন, এই কঠিন. বিপদসঙ্কুল পথে যাত্রা করবার আগে দিনের পর দিন. সপ্তাহের পর সপ্তাহ. মাসের পর মাস আমি এর ফলাফল সম্বন্ধে নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করেছি।...বাইরে না এলেও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হবে—এমন আশা যদি আমার বিন্দুমাত্র থাকত. তাহলে এই সঙ্কটময় মুহূর্তে আমি কখনোই ভারতবর্ষ ত্যাগ করতাম না। যদি আমার মনে একটুও আশা থাকত যে, আমাদের জীবদ্দশায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের এমনি আর একটা সুবর্ণ সুযোগ আমরা পাব, তাহলেও বোধহয় আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তাম না।

অক্ষশক্তিতে কেন যোগ দিয়েছি সে সম্বন্ধে এবার কিছু বলতে চাই। ওদের দ্বারা আমি প্রতারিত হয়েছি, এ কি সম্ভব ? একথা সর্বজনসম্মত যে, ব্রিটিশের চাইতে ধূর্ত এবং চতুর কূটনীতিজ্ঞ পৃথিবীতে আর নেই। যাকে সারাজীবন ধরে তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক চাল দিতে হয়েছে. লড়াই করতে হয়েছে, তাকে প্রতারিত করার মত কূটনীতি-বিশারদ পৃথিবীতে আর কোথাও নেই বলেই আমি বিশ্বাস করি। যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের

হাতে আমাকে কারাদণ্ড, নির্যাতন, এমন কি প্রহার পর্যন্ত সহ্য করতে হয়েছে, তারাই যখন আমাকে দমাতে পারেনি, তখন পৃথিবীর কোন শক্তিই তা পারবে না আশাকরি।

এমন একটা সময় গেছে, যখন জাপান আমাদের শত্রু ছিল, ততদিন আমি এখানে আসিনি। যতদিন ইঙ্গ-জাপান সম্পর্ক অটুট ছিল, ততদিন আমি এখানে আসার কল্পনাও করিনি। জাপান যখন ব্রিটিশ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, কেবলমাত্র তখনই আমি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে এখানে এসেছি।

মহাত্মাজী, আপনি ভাল করেই জানেন যে, শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতির প্রতি ভারতের আস্থা কত কম। যদি জাপানের ঘোষণাবাণী শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতিই হত, তাহলে কিছুতেই আমি তা বিশ্বাস করতাম না।

...স্বাধীনতার জন্য ভারতের শেষ সংগ্রাম এখন চলছে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ এখন ভারতের অভ্যন্তরে বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করছে এবং শত বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও তারা এগিয়ে চলেছে। যতদিন না শেষ ইংরেজটি ভারত থেকে বিতাড়িত হয়, যতদিন না আমাদের জাতীয় পতাকা দিল্লীর বড়লাট প্রাসাদে সগৌরবে উড্ডীন হয়, ততদিন আমাদের এই সংগ্রাম চলবেই।

জাতির জনক...'

সহজা কিসের একটা রুদ্ধ আবেগে গলাটা কেঁপে উঠল সুভাষের। এক মুহূর্তের নীরবতা। তারপরই আবার তিনি বললেন, 'ভারতের এই পবিত্র মুক্তি-সংগ্রামে আমরা আপনার শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।'

'আমি নিশ্চিত যে, সে মুহূর্তে জাতির জনক কাছে উপস্থিত থাকলে নেতাজীর সেই প্রার্থনা পূর্ণ করতেন।' বলেছেন প্রত্যক্ষদর্শী আয়ার সাহেব। সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তটির কথা আয়ার সাহেবের মুখ থেকেই বরং শোনা যাকঃ .

'As I remained seated across the mike desk, my eyes were glued to Netaji's glowing face. He was coming to the last poignant words. I was all agog in my seat. I looked at his face.

There was a pause.

Then he began: "Father of our Nation!" His voice had become somewhat hoarse; then it quivered a bit; a solemn look came over his face; then his throat cleared, the words now came out clear and strong; "In this holy war for India's liberation"...then again a slight pause, a slight lowering of the pitch, a tone of supplication:..."we ask for your blessings and good wishes."

If Gandhiji had been there on the spot, I am sure the great man would have granted a prayer like this which was profoundly genuine.' [S. A. Ayer: P.—256]

৯ই জুলাই সুভাষ 'সেবক-ই-হিন্দ্' পদক দিয়ে সম্মানিত করলেন রেঙ্গুনের বিখ্যাত ব্যবসায়ী হাবিবসাহেবকে।

হাবিবসাহেবের কথা তোমাকে আগেই বলেছি। নগদ ও ধন-সম্পত্তি মিলিয়ে মোট এককোটি তিন লক্ষ টাকা তিনি দান করেছিলেন সুভাষের আহ্বানে।

১০ই জুলাই আজাদী সৈনিকদের মনোবলের প্রশংসা করতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত ভাষায় বললেন সুভাষ:

...'As we anticipated long ago, their rations and equipment are superior to ours, because they have been looting India in order to fight us. We have, nevertheless, beaten them everywhere.

Revolutionary armies everywhere in the world have to fight under conditions similar to ours but they, nevertheless, triumph at the end. Their strength does not come from beer and rum, tinned-pork and bully-beef, but from faith and sacrifice, heroism and fortitude.'

[আমরা জানি যে, শত্রুপক্ষের খাদ্যসম্ভার ও সাজসরঞ্জাম আমাদের চাইতে উৎকৃষ্ট, কারণ আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য অনেকদিন আগে থেকেই তারা ভারতবর্ষকে শোষণ করছে। তা সত্ত্বেও আমরা তাদের হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি প্রতিটি জায়গা থেকে।

পৃথিবীর যে কোন বিপ্লবী সেনাবাহিনীকেই এমনি অবস্থার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়েছে। কারণ তাদের শক্তি বিয়ার, রম্, পরক্ বা মাংস থেকে আসেনি, এসেছে আত্মবিশ্বাস, আত্মত্যাগ, বীরত্ব আর অবিচলিত ধৈর্য থেকে।]

১১ই জুলাই বাহাদুর শাহের সমাধির পাশে নতুন করে শপথ গ্রহণ।

'যদি মানুষ হই, তবে ব্রিটিশের হাতে অকথ্যভাবে নির্যাতিত বীরদের অকালমৃত্যুর প্রতিশোধ আমরা নেবই। যে ব্রিটিশ আমাদের স্বাধীনতাকামী বীরদের রক্তপাত ঘটিয়েছে, তাদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছে, সেই ব্রিটিশকে তার এই ঋণ পরিশোধ করতেই হবে।

তার জন্য চাই রক্ত। কিন্তু রক্ত নিতে গেলে রক্ত দেবার জন্যও তৈরি থাকতে হবে। আগে আমাদের জাত যেসব ভুলভ্রান্তি করেছে, আমাদেরই বীর সৈনিকদের বুকের রক্ত দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। চাই বীর্য, শৌর্য আর আমাদের হৃদয়ের রক্তের প্লাবন।'

রক্তস্নাত ইম্ফল।

তখনো তার সর্বাঙ্গ দিয়ে রক্ত ঝরছে অবিশ্রান্তভাবে। শুধু রক্ত আর রক্ত।

সর্বক্ষণ এখানে ওখানে কামান দাগার শব্দ। দেখা যায়, মাথার ওপর

দিয়ে শিস্ দিতে দিতে কামানের গোলাগুলি উল্কার মত দিক-বিদিকে ছুটে চলেছে।

কোন কোনটা আবার মাথার ওপর দিয়ে কতদূরে গিয়ে ছিটকে পড়ছে, তার কোন হদিশ পাওয়া যায় না। শুধু দেখা যায়, দূরে কুণ্ডলী-পাকানো ধোঁয়া আকাশে উঠে গিয়ে আস্তে আস্তে মেঘের আকার ধারণ করছে।

আর সে কি দৃশ্য! যতদূর চোখ যায়, শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস। দুদিন আগেও যা ছিল প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর জনপদ, আজ তার চিহ্নমাত্রও নেই। শুধু পড়ে আছে কতকগুলো পোড়া জমি মাত্র।

সে দৃশ্যকে আরো ভয়ঙ্কর করে তুলেছে মানুষের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহাংশ। এখানে-ওখানে পূতিগন্ধময় শবদেহের দৃশ্য। সে যে কি বীভৎস তা বর্ণনা দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়।

তবু বিরাম নেই। তবু ক্ষান্তি নেই। 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'—এছাড়া বুঝি দ্বিতীয় আর কোন কথা নেই ইম্ফল-যুদ্ধের ইতিহাসে।

একটা দুর্নিবার জ্বালায় আজাদী বাহিনী তখন জ্বলছে। মাত্র আর তিন মাইল। কবে এই তিন মাইল শেষ হবে? কবে? সর্বস্ব পণ করেও কি ওদের ঐ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে দেওয়া যায় না? সব কিছু তুচ্ছ করে এগিয়ে যাওয়া যায় না?

না, যায় না। রীতিমত শক্তিশালী ওরা। সারিবদ্ধ কামানশ্রেণী থেকে একটানা ওরা অনল বর্ষণ করে চলেছে ইম্ফলের বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে। এ অবস্থায় এগয়ে যাওয়া আর পাথরের বুকে মাথা ঠুকে মরার মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

চাই এখন উপযুক্ত বিমানবহর। একটানা কার্পেট বম্ব করে ওদের ঐ প্রতিরোধ ঘাঁটিগুলোকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া দরকার। তা ছাড়া ওদের নতিস্বীকার করানোর কোন উপায় নেই।

কোহিমা, ময়রাং, বিষেণপুর, কোহিমা-ইম্ফল সড়ক—সব এখন আমাদের। এমনকি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্যালেল বিমানঘাঁটিও এখন আমাদের দখলে। মেজর প্রীতম সিং পরিচালিত সেই অবিস্মরণীয় সংগ্রামের বীর যোদ্ধা লেঃ লাল সিংকে আমরা হারিয়েছি একথা সত্য, তা বলে সেটা একতরফা হয়নি। আহত অবস্থায়ও তিনি বদলা নিয়ে গেছেন দুজন ব্রিটিশ অফিসারকে হত্যা করে।

সেই প্যালেল বিমানঘাঁটি এখন আমাদের দখলে। চাই শুধু এখন উপযুক্ত বোমারু-বিমান। অবিলম্বেই চাই।

কিন্তু কোথায় বিমান? না, বিমান নেই। জাপ-কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সমস্ত বিমান তখন চলে গেছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে। সেখানে জাপানকে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছে আমেরিকার বিরুদ্ধে। সুতরাং বিমানের আশা দুরাশামাত্র।

বিমান নেই! খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সমরনায়কবৃন্দ। কি ভয়ঙ্কর কথা! বিমান ছাড়া আধুনিক যুদ্ধ যে চিন্তাও করা যায় না।

কেন এমন হল? যে জাপান দু' বছর আগেও উন্নত বিমান-বহরের সমাবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল, হঠাৎ কেন তাদের এই অভাবনীয় অনটন দেখা দিল? তবে কি প্রয়োজনের তুলনায় তাদের উৎপাদন-ব্যবস্থা এর মধ্যেই দুর্বল হয়ে পড়েছে?

অবস্থাটা অনুমান করে নিতে এতটুকুও দেরী হল না ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর। ওদের কোন বিমান নেই। সুতরাং বাধা দেবারও কোন প্রশ্ন নেই। যুদ্ধের সময়ে এ যে অভাবনীয় ব্যাপার।

ফলে যা হওয়া স্বাভাবিক তাই হল। দেখতে দেখতে ইম্ফলের আকাশ ছেয়ে গেল অসংখ্য মার্কিন বিমানের আবির্ভাবে। কোন ভয় নেই। কোন ভাবনা নেই। আকাশপথ যখন খোলা পাওয়া গেছে, তখন ভাবনা কিসের?

শুরু হল এলোপাথাড়ি বোমাবর্ষণ। বিষেণপুর, ময়রাং, কোহিমা-ইম্ফল সড়ক, এখানে-ওখানে সর্বত্র। বৃষ্টিধারার মত ঝরছে তো ঝরছেই। দিন-রাত্রি সর্বক্ষণ। এই তো সুযোগ। এ সুযোগ ছাড়তে আছে কখনো! সব ভেঙে গুঁড়িয়ে তছনছ করে দাও। নিশ্চিহ্ন করে দাও ওদের ইম্ফল থেকে।

'I. N. A. Advance Troops mobilised at Bishanpore were pounded by enemy bombers almost continuously—no fighter plane on our side to combat the enemy planes. Morning, the Headquarters of I. N. A. Advance Forces was enemy's target.

The road from Moirang to Bishanpore—the only connecting link between the I. N. A. Headquarters, and the Advance Forces was so heavily bombarded at ease by enemy's B29 bombers to the point of softening the earth that it was not possible for our Tanks and Armoured vehicles to negotiate the route.'

[Battle of Imphal : Debnath Das : Contemporary : July, 1972]

প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হল আজাদী বাহিনীর। রাস্তাঘাট, যোগাযোগ-ব্যবস্থা সব ভেঙে একাকার। ট্যাঙ্ক, আর্মড কার, বিমানধ্বংসী কামান—বেশির ভাগই অচল অবস্থায়। অবস্থা যে রীতিমত গুরুতর তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

তবু আজাদী বাহিনী তেমনি মরীয়া, বেপরোয়া। বিমান থাকলে ইতিহাস পাল্টে যেত একথা ঠিক, কিন্তু যা নেই. তার জন্য আফসোস করে লাভ কি। বরং যা আছে, তাই দিয়েই আমরা লড়াই চালিয়ে যাব দুশমনের বিরুদ্ধে। জান কবুল!

সত্যিই দুর্ভাগ্য মল্লিকা। সেদিন ইম্ফলের আকাশে শত্রু-বিমানের প্রাধান্য, কিন্তু কি অবস্থা ছিল মাত্র কয়েক মাস আগে! কোথায় বিমান? কোথায় যুদ্ধ-সরঞ্জাম? না, কিছুই নেই। সত্যি বলতে কি, সেদিন ব্রিটিশের অবস্থা ছিল অনেকটা পিতামাতাহীন অনাথ বালকের মতো।

প্রমাণ—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সেক্রেটারী অফ স্টেট-এর কাছে তখনকার

সময়ের ব্রিটিশ প্রধান সেনাপতি লর্ড ওয়াভেল (পরবর্তীকালে ভারতের বড়লাট) প্রেরিত একটি গোপন রিপোর্ট। রিপোর্টে স্পষ্টই তিনি জানিয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষ বা সিংহলকে রক্ষা করার মত কোন শক্তিই তাদের নেই।

সামান্য দু-একটি উদাহরণ দিলেই তুমি বুঝতে পারবে।

ভারতবর্ষ এবং সিংহলের উপকূলভাগ রক্ষার জন্য জাহাজ ছিল মাত্র একটি। সৈন্য ছিল মাত্র সাত ডিভিশন। তার মধ্যে এক ডিভিশন শ্বেতাঙ্গ। বাকী ছয় ডিভিশনই ভারতীয়। তাও যুদ্ধ-বিদ্যায় কেউ তেমন শিক্ষিত নয়। কলকাতা মহানগরী রক্ষার জন্য বিমান ছিল মাত্র আটটি।

লর্ড ওয়াভেল প্রেরিত সেই গোপন রিপোর্ট থেকে কিছু কিছু অংশ আমি তুলে ধরছি তোমার সামনে।

EXCERPTS FROM THE SECRET REPORT (27 SEPTEMBER 1943)

FROM FIELD-MARSHAL WAVEL TO THE SECRETARY OF STATE FOR WAR GOVERNMENT OF BRITAN.

...The forces available for defence at this time were dangerously weak. The Eastern Fleet had only one modernized battleship...

There were only one British and six Indian divisions available for the defence of the whole of India and Ceylon...

No single one of these divisions was complete in ancillary troops or fully equipped or adequately trained. There of them had two brigades only.

The number of A. A. guns (heavy and light) to defend Calcutta (India's largest city) her most important war industries and vitial points...was less than 150 against an estimated requirement of some 1,500.

For the defence of Calcutta one fighter squadron was available with eight serviceable Mohawks.

মল্লিকা, এই ছিল সেদিন ব্রিটিশের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা। মার্কিন মুরুব্বীর জোরে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে সেই ব্রিটিশ বাহিনীর কি বিপরীত চেহারা!

বিপদ কখনো একা আসে না। এবার বিপদ এল অন্যদিক থেকে। দেখা গেল—সাপ্লাই-লাইন বন্ধ। কি খাদ্য, কি সমরসম্ভার, কিছুই আর আসছে না পিছন থেকে।

অবশ্য সাপ্লাই-ব্যবস্থা কোনদিনই খুব একটা মজবুত ছিল না। কোথায়

ইম্ফল, আর কোথায় সুদূর মান্দালয়! যুদ্ধের ইতিহাসে এমন সুদীর্ঘ সাপ্লাই-লাইন কল্পনাও করা যায় না। তবুও অনিশ্চিত হলেও ক্ষীণ একটা যোগাযোগ বরাবরই ছিল। এবার তাও হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল আকস্মিকভাবে।

শঙ্কায় কালো হয়ে উঠল সমরনায়কদের মুখ। নতুন কোন সমরসম্ভার পাওয়ার উপায় নেই। রসদও বন্ধ। এ অবস্থায় কি করে চলবে! শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা সেনাদের পক্ষে নতুন কিছু নয়, কিন্তু ক্ষুধার বিরুদ্ধে তারা লড়াই করবে কি করে! তাও একদিন-দুদিন নয়, দিনের পর দিন।

অবশ্য কোহিমা সেক্টরের নাগা-সর্দারগণ আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, কিন্তু হাজার হাজার জওয়ানের পক্ষে সে আর কতটুকু! নিশ্ছিদ্র কালো অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই যে নজরে পড়ে না!

ভাবনার পর ভাবনা। অস্থির চঞ্চল সব ভাবনা। এই নিয়ে পরপর তিনদিন। এই তিনদিন কোন জওয়ানের পেটে একটি দানাও পড়েনি। তেমন কোন সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না কোনদিক থেকে। কি করা যায় এখন এ পরিস্থিতিতে? খাবার না পেলে কি করে এই জওয়ানের দল লড়াই করবে শত্রুর বিরুদ্ধে?

আশ্চর্য, জওয়ানের দল নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। দেহ অবশ। পা টলছে। মনে হয়, এখুনি বুঝি ওরা ভেঙে পড়বে জীবনী-শক্তির অভাবে। তবু কারো মুখে কোন কথা নেই। কোন দুঃখও নেই। কেন দুঃখ করবে? নেতাজী তো স্পষ্টই বলে দিয়েছেন যে, এ যুদ্ধে তোমাদের আমি ক্ষুধা এবং বুক-ফাটা পিপাসা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারব না। তাহলে দুঃখ কিসের?

কিন্তু আর যে সয় না। মনে হয়, পেটের মধ্যে একটা অশান্ত দৈত্য যেন তোলপাড় শুরু করে দিয়েছে। সে তার ক্ষুধার উপকরণ চায়। কিছুতেই যেন তাকে শান্ত করা সম্ভব হচ্ছে না।

না মা, খাবারের কোন অভাব নেই তাদের। ঐ তো কত বুনো ঘাস রয়েছে ওখানে। তাই বা মন্দ কি! দেখাই যাক না একবার চেষ্টা করে।

মল্লিকা, ক্ষুধার জ্বালায় তাই সেদিন খেয়েছে আজাদী ফৌজ। হোক বুনো ঘাস, তবু তো খাবার। না খেলে লড়াই করব কি করে! বদলা নিতে হবে না! দুশমন ইংরেজের রক্তে হাত রাঙাতে হবে না! কলজেটা ছিঁড়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিতে হবে না!

নিষ্ফল আক্রোশে মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকায় আজাদী ফৌজ। ইস্! কত বিমান ঐ দুশমনদের। কত বিচিত্র খাদ্য-সম্ভার। একটানা বিমান থেকে নীচে ফেলছে তো ফেলছেই। ঐ যে স্পষ্ট দেখা যায়। এত খাবার দিয়ে কি করবে ওরা? সর্বশক্তি দিয়ে ঐ 'চার্চিল রেশন ভাণ্ডার'টাকে দখল করা যায় না?

আর শুধু কি রেশন? নিত্য-নতুন কত সৈন্যই না নেমে আসছে প্যারাসুটের সাহায্যে। রোজই আসছে। আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে। দলে দলে। হাজারে হাজারে।

বিশ্বাসঘাতক সব দেশেই আছে। এখানেও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। সহসা এক ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতক গুটি-গুটি পায়ে উঠে দাঁড়াল অবস্থার সুযোগ নিয়ে। আজাদী ফৌজ বেকায়দায় পড়েছে। এই তো সুযোগ। এবার সব পণ্ড করে দিতে হবে। একফাঁকে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে গিয়ে সব কিছু ফাঁস করে দিতে হবে হুজুরের দরবারে। প্রতিদানে নিশ্চয়ই যথেষ্ট পুরস্কার পাওয়া যাবে। সেই সঙ্গে খেতাব।

কে এই বিশ্বাসঘাতক? নাম তার গারেওয়াল। গান্ধী ব্রিগেডের সহকারী কম্যাণ্ড্যান্ট মেজর বি. জে. এস. গারেওয়াল। শুধু একাই তিনি গেলেন না, সঙ্গে গেলেন মেজর প্রভুদয়াল নামে আরো একজন এবং সেই সঙ্গে আজাদী বাহিনীর সেনা-সমাবেশ সংক্রান্ত অত্যন্ত গোপনীয় নক্সা ও কাগজপত্র. শত্রুপক্ষের কাছে যার মূল্য অপরিসীম।

ফল হল মারাত্মক। এতদিন একটানা বোমা-বর্ষণ করলেও সেটা ছিল অনেকটা অনুমান-নির্ভর, কিন্তু এবার বোমা-বর্ষণ শুরু হল একেবারে নির্ভুল নিশানায়। একান্ত রাজভক্ত ভৃত্য গারেওয়ালের সাহায্যে সেনা-সমাবেশের মূল নক্সা যখন পাওয়া গেছে, তখন খবর মিথ্যে নয়। সুতরাং চালাও এবার। একধারসে চালাও!

শুধু তাই নয়। একথাও ওরা জেনে গেল যে, আজাদ হিন্দ্ ফৌজ তখন তীব্র সঙ্কটের মুখে। তাদের সরবরাহ-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। খাদ্যসম্ভার নেই বললেই চলে। এ অবস্থায় উপযুক্ত টোপ ফেলতে পারলে অচিরেই যে তাদের মনোবল শিথিল হয়ে পড়বে, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। দেখাই যাক না।

দেখতে দেখতেই সেই বিশ্বাসঘাতকের নামাঙ্কিত লক্ষ লক্ষ ইস্তাহার ছড়িয়ে দেওয়া হল বিমান থেকে। কেন তোমরা আজাদী দল থেকে কষ্ট পাচ্ছ ভাইসব? কি আছে ওদের? না আছে খাদ্য, না সমরসম্ভার। তার চাইতে আমি যেমন বেইমানি করেছি, তোমরাও তাই কর। প্রচুর খাবার পাবে এখানে। আর পাবে অর্থ এবং খেতাব।

স্বীকার করেছেন ব্রিটিশ মুখপাত্র হিউ টয়। বলেছেন, 'রেজিমেণ্টে কম্যাণ্ডারের পরেই যার স্থান, চামলের হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে দলত্যাগ করে। অল্পদিনের মধ্যেই আই. এন. এ. এলাকায় তার স্বাক্ষর করা "নিরাপদে পৌঁছুবার ছাড়পত্র" ও ইস্তাহার বিমান থেকে বিলি করা হয়। তাতে আই. এন. এ.-র লোকদের তার মত নির্ভয়ে ভারতীয় বাহিনীতে ফিরে যেতে বলা হয়েছিল।'

তা বলে আজাদী সৈনিকরা কিন্তু তাদের মনোবল এতটুকুও হারায়নি, মল্লিকা। তখনো ইম্ফলের চারপাশে পাহাড়ে-পর্বতে জোর লড়াই চলেছে দুপক্ষের মধ্যে। হয়তো কয়েক গজ দূরে শত্রুসৈন্য, এধারে একটা ঝোপের আড়ালে আজাদী ফৌজ। ঠিক তখনই হয়তো লাউডস্পীকারে বেজে উঠল সেই একই আবেদন। ঘাস খেয়ে আর কতদিন লড়াই করবে? চলে এসো এদিকে। ভালো খাবার পাবে।

ঘৃণাভরে জবাব দিয়েছে আজাদী ফৌজ—বেইমানি করে ঘি-দুধ খাবার চাইতে ঘাস খেয়ে থাকা অনেক সম্মানের।

অবশ্যম্ভাবী জয়ের কি অভাবনীয় পরিণতি! কিছুদিন আগেও খাঁচায় বন্ধ ইংগ-মার্কিন বাহিনী ছিল রীতিমত ভীত-সন্ত্রস্ত। স্পষ্টই তারা বুঝে নিয়েছিল যে, এভাবে দীর্ঘদিন আত্মরক্ষা করা কোনমতেই সম্ভব নয়। আজ হোক বা দুদিন বাদে হোক, আত্মসমর্পণ অনিবার্য। ঘটনাচক্রে তারাই আবার নববলে বলীয়ান হয়ে উঠল ঘৃণ্য দুটি ভারতবাসীর সহায়তা পেয়ে। দুর্ভাগ্য ছাড়া একে আর কি বলা চলে!

মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান সাহেবের বক্তব্য: 'গান্ধী ব্রিগেডের সহকারী কম্যাণ্ড্যাণ্ট মেজর বি. জে. এস. গারেওয়াল দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আজাদ হিন্দ্ দল ত্যাগ করে ব্রিটিশ পক্ষে যোগ দেন।'

চমৎকার যুক্তি! এ যেন একালের একশ্রেণীর নেতাদের মত সকাল-বিকেল দল-বদলের খেলা আর কি। কিন্তু সত্যিই কি তাই! সত্যিই কি শুধুমাত্র দুঃখকষ্ট সইতে পারেনি বলেই ঘৃণ্য ঐ মানুষটা এ দল ত্যাগ করে ও দলে চলে গিয়েছিল? আর কোন উদ্দেশ্যই কি তার ছিল না? তা হলে জরুরী কগজপত্রগুলি সংগে করে নিয়ে গিয়েছিল কিসের জন্য? মনের ভুলেই কি?

একথা সত্য যে, খাদ্য-সঙ্কট সেদিন খুবই তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সেটা কি গারেওয়াল সাহেবের একারই? ঐ যে হাজার হাজার জওয়ান, যারা নিজের দেহ পাত করে দু হাজার মাইল দূর থেকে লং মার্চ করে এসেছিল, তারা কি সেদিন খাদ্যাভাবে কষ্ট পায়নি? মুখ বুজে সব কিছু সহ্য করেনি? হাজার প্রলোভন সত্ত্বেও নিজেদের সংযত রাখেনি?

কি অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে যে এই জওয়ানের দলকে সেদিন খাদ্যের প্রয়োজন মেটাতে হয়েছিল, সে কথা তো শাহনওয়াজ খান সাহেবের অজানা নয়। তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি:

"হাকা-ফালম পাহাড়ী অঞ্চল। ফালমের উচ্চতা ৬,০০০ ফুট। হাকা সাত হাজার। আমাদের নির্ভীক সৈন্যরা তাদের যুদ্ধরত সহকর্মীদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য রোজ রসদের ভারী বোঝা মাথায় নিয়ে এই উঁচু পাহাড়ে উঠে আসত। শুধু চাল আর নুন, তাও মাঝে মাঝে মিলত না।

আমরা আট মাইল অন্তর অন্তর ছটা ঘাঁটি স্থাপন করেছিলাম। প্রত্যেককে রোজ গড়ে প্রায় ষোল মাইল করে হাঁটতে হত বোঝা মাথায় নিয়ে।'

মল্লিকা, এই ছিল সেদিন সাপ্লাই রক্ষা করার ইতিহাস। এমনি অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়েই সেদিন আজাদী সৈনিকরা সরবরাহ-ব্যবস্থা চালু রাখতে সক্ষম হয়েছিল দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চল হাকা-ফালম এলাকায়।

কই, তার জন্য তো জওয়ানরা কোন অনুযোগ দেয়নি। কোন নালিশও জানায়নি। বরং সবকিছুই সেদিন তারা হাসিমুখে মেনে নিয়েছিল তাদের একান্ত প্রিয় নেতাজীর মুখ চেয়ে। হাজার হাজার জওয়ানের পক্ষে যা সম্ভব হয়েছিল, গারেওয়াল সাহেবের পক্ষে তা সম্ভব হল না কেন? এ প্রশ্নের সদুত্তর কোথায়?

শাহনওয়াজ খান সাহেব যোদ্ধা। অপর একজন যোদ্ধার প্রতি তাঁর মমত্ববোধ থাকাটা স্বাভাবিক।

কিন্তু ইতিহাস বড় নির্মম। সেখানে বিশ্বাসঘাতকতার কোন মার্জনা নেই। তাই দেশদ্রোহীরূপেই গারেওয়াল এবং প্রভুদয়াল সেখানে চিহ্নিত হয়ে থাকবে চিরদিনের মত। হাজার চেষ্টা করলেও এ পরিচয় তাদের কোনদিনই মুছে ফেলা সম্ভব হবে না।

গারেওয়ালের পরে সহকারী কম্যাণ্ড্যাণ্ট হয়েছিলেন সুভাষের একান্ত সচিব, বার্লিন থেকে আগত সেই আবিদ হাসান। অথচ দেখ, তার ইতিহাস সম্পূর্ণ বিপরীত।

পরবর্তীকালে গোটা গান্ধী ব্রিগেডটাই একবার ঘেরাও হয়ে পড়েছিল শত্রুবাহিনীর হাতে। চারপাশে তাদের লৌহ-বেষ্টনী। হয় আত্মসমর্পণ, নয়তো মৃত্যু, এছাড়া আর কোন পথই সেদিন খোলা ছিল না, গান্ধী ব্রিগেডের কাছে।

অদ্ভুত কৌশলে তিনি বেষ্টনী ভেঙে বেরিয়ে গিয়েছিলেন মাত্র এক কোম্পানী জওয়ানের সাহায্যে। তারপরই ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন ক্রুদ্ধ বাঘের মত। শুধু নিজে বেরিয়ে গেলে চলবে না। গোটা ব্রিগেডকে মুক্ত করতে হবে ওদের ঐ বেষ্টনী থেকে।

করেছিলেনও তাই। সে যুদ্ধে তিনি যে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন তার তুলনা মেলা ভার। তাই পরবর্তীকালে সুভাষ তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন 'সর্দার-ই-জঙ্' পদক দিয়ে।

এবার পাশাপাশি ছবিটা একবার মিলিয়ে দেখ। মেজর গারেওয়াল এবং মেজর আবিদ হাসান, দুজনে একই ব্রিগেডের সহকারী কম্যাণ্ড্যাণ্ট। অথচ দুজনের মধ্যে কত তফাৎ। একজন আজো বীর যোদ্ধা বলে সর্বত্র পরিচিত। অন্যজন স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে ঘৃণ্য এক দেশদ্রোহীরূপে।

ওদিকে তখনো আজাদী সেনাদল ঘাঁটি আগলে পড়ে রয়েছে সেই একইভাবে। বিমান নেই। নিজেদের অবস্থানের নক্সাও শত্রুপক্ষের নখদর্পণে। তবু তারা রক্তের বিনিময়ে অর্জিত অধিকৃত অঞ্চল থেকে এক ইঞ্চিও সরে যেতে রাজী নয়। মরতে হয়তো লড়াই করেই মরব, তবু বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সুচ্যগ্র মেদিনী।

এই নিয়ে অপরপক্ষেও শলা-পরামর্শ কম নয়। শুধু বোমাবর্ষণ করে হস্তচ্যুত ভূমি উদ্ধার করা যাবে না। তা করতে গেলে মুখোমুখি লড়াইয়ে নামতে হয়। না, সেটা সম্ভব নয়। আজাদী সৈনিক বেপরোয়া। ওদের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করা একেবারেই অসম্ভব।

কিন্তু একি! সহসা কি দেখে ঘন ঘন আকাশের দিকে তাকাতে লাগলেন অবরুদ্ধ ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর সমরনায়কগণ। ঐ ঈশান কোনটা একটু কালো হয়ে উঠেছে না!

না, তাই বা কি করে সম্ভব। বর্ষা আসতে এখনো তো প্রায় মাসখানেক বাকী। তবে কি ভগবান সত্যই মুখ তুলে চাইলেন দীর্ঘ তিনমাস

অবরোধের পরে! নইলে অসময়ে এই আকাশ কালো করা মেঘ দেখা দেবে কেন ঈশান কোণে?

এদিকে দুশ্চিন্তায় কালো হয়ে উঠলেন আজাদী বাহিনীর সমরনায়কগণ। অসময়ে আকাশে মেঘ কেন? এমন তো হবার কথা নয়! মনে হয় ঝড় রকমের ঝড় উঠবে। মেঘের কুণ্ডলীতে যেন তারই আভাস।

বিপক্ষ শিবিরে তখন রীতিমত আনন্দ উচ্ছ্বাস। ঝড় আসছে! ঝড় আসছে! ঝড় আসছে! বড় ভয়ংকর এই পাহাড়ী ঝড়। একবার শুরু হলে আর রক্ষে নেই। কোথায় যে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, কেউ তা বলতে পারে না। গড্ সেভ দি কিং। আয় বৃষ্টি ঝেঁপে।

বেশ ঝেঁপেই বৃষ্টি এল। প্রথমে ফোঁটায় ফোঁটায়, তারপর মুষল-ধারায়। ঝর ঝর বর্ষা আর দিগন্তপ্রসারী কালো অন্ধকারে মনে হল গোটা পৃথিবীই বুঝি পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে।

দিনের পর দিন কেটে গেল, তবু বর্ষণের এতটুকু বিরাম নেই। একটানা ঝরছে তো ঝরছেই। কালো আকাশটা ক্রমাগত ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল বিদ্যুতের রেখায় রেখায়। মনে হয়, এ ঝড় বুঝি আর কোনদিনই থামবে না।

ঝড়ের এমন ভয়ংকর রূপ বুঝি জীবনে আর কোনদিনই দেখেনি আজাদী সৈনিকের দল। অন্ধকার। নিচ্ছিদ্র কালো অন্ধকার। শুধু জল আর জল। পাথরের পরে পাথরে ধাক্কা খেয়ে সেই ফুলে-ফেঁপে ওঠা উচ্ছল জলস্রোত কোথায় যে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে কে জানে? সেই সঙ্গে উদ্দাম বাতাসের ঝাপটা। হাওয়ার বেগে বড় বড় বনস্পতির দল এক-এক-বার মাটিতে নুয়ে পড়ে, পরক্ষণেই আবার মাথা তুলে উঠছে আকাশের দিকে।

প্রতিপক্ষের কোন ভাবনা নেই, কারণ এ যুদ্ধের জন্য বহুদিন ধরেই তারা প্রস্তুত। নিজেদের তারা সেইভাবেই গড়ে তুলেছে ধীরে ধীরে।

বিপদ হয়েছে এ পক্ষের। বর্ষার মুখোমুখি হবার জন্য কোন সাজ-সরঞ্জামই তাদের নেই। তাই সর্বত্র সামাল-সামাল রব। হাতিয়ার সামালকে। সব যাক, তবু হাতিয়ার যেন ঠিক থাকে। হাতিয়ার গেলে দুশমনের সঙ্গে লড়াই করবে কি করে? পার তো কোন উঁচু জায়গায় আশ্রয় নাও।

কিন্তু সব বৃথা। কোথায় যাবে? কোথায় আশ্রয় নেবে? সর্বত্রই যে জল। কোথাও এক কোমর, কোথাও বা তার চাইতেও বেশি। শুধু কানে আসে বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ আর হাওয়ার করুণ কাতরানি। মনে হয়, পৃথিবীময় কে যেন বুক-ভাঙা বেদনায় চীৎকার করে কেঁদে কেঁদে ফিরছে।

নিরুপায় বেদনায় বার বার আকাশের পানে তাকায় আজাদী ফৌজ। বৃষ্টিটা একটু ধরেছে কি! না, কোন আশা নেই। প্রলয়-ঝঞ্ঝা সেই একইভাবে বয়ে চলেছে রণাঙ্গনের ওপর দিয়ে। কানে আসে জলস্রোতের ক্রুদ্ধ হুঙ্কার। ঝড়ের দাপটে আর বজ্রপাতের শব্দে মনে হয় পৃথিবীতে যেন মহাপ্রলয় শুরু হয়ে গেছে।

ইতিহাসের পাতা একবার উল্টে গেলে আর তাকে ফেরানো যায় না।

এতদিন আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে বন্দী করে রেখেছিল ইম্ফলের অভ্যন্তরে। এবার তারা নিজেরাই অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল প্রকৃতির অভিশাপে। কোথায় যাবে! জলে থৈ থৈ করছে চারিদিক। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছে পাহাড়ী নদীগুলিতে। ফলে পথঘাট, খাল-বিল, নদী-নালা সব ধুয়ে মুছে একাকার।

খাদ্য নেই। যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন। সমর-সম্ভার বলতে যা কিছু ছিল—সব ভিজে একাকার। পথঘাট সব ডুবে গেছে জলের তলায়। একদিন পলাশী প্রান্তরে সিরাজের স্বপ্ন ডুবে গিয়েছিল অকস্মাৎ বৃষ্টি-পাতের ফলে। সুভাষের স্বপ্নও কি এমনি করেই আজ নিঃশেষ হয়ে যাবে অকাল বর্ষার আগমনে?

না, আজাদী বাহিনী এসব মানতে রাজী নয়। ইম্ফলের ওপর থেকে তাদের বজ্রমুষ্টি শিথিল করতেও তারা প্রস্তুত নয়। যে মাতৃভূমিতে একবার তারা নিজেদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে, সেখানে দরকার হলে তারা মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে, তবু দুশমনের সঙ্গে একদিন না একদিন শেষ মোকাবিলা তারা করবেই। নেতাজীর আজাদী সৈনিক না তারা?

তবু এবারের মত তোমাদের ফিরে যেতে হবে ভাই। তাছাড়া কোন উপায় নেই।

কভি নেহি! গর্জে ওঠে আজাদী ফৌজ, এখান থেকে আমরা এক ইঞ্চিও সরে যেতে রাজী নই। জান কবুল!

কিন্তু খাবার! খাবার পাবে কোথায়? পথঘাট, নদী-নালা সবকিছু ভেসে গেছে বন্যার জলে। এ অবস্থায় কোথায় পাব আমরা হাজার হাজার লোকের খাবার?

কেন, খাবারের অভাব কি? ঐ তো বন্যার জলে কত শ্যাওলা, কত লতা-পাতা ভেসে এসেছে। ওই দিয়ে আমাদের দিব্যি চলে যাবে। তা বলে দুশমনকে কোনরকম খাতির নয়। টুঁটি ছিঁড়ে ফেলব না!

'We have lived on grass and leaves so long. We shall live on yet. We must keep marching on. Let us pursue the enemy and annihilate him when we have a chance.'

কিন্তু তোমরা সৈনিক। হুকুম যে তোমাদের মানতেই হবে।

না, এ হুকুম আমরা মানব না। নেতাজীর আদেশ—দিল্লী যেতে হবে। তা হলে কেন আমরা ফিরে যাব এখান থেকে? কভি নেহি!

'Our orders are to reach Delhi. That is what our Sepah-salar Netaji told us. He has warned us not to retreat under any circumstances.'

তবু তোমাদের এবারের মত ফিরে যেতে হবে ভাই। হুকুম তো আর অমান্য করা চলবে না।

এ হুকুম কৌন দিয়া? Who ordered this retreat? এ তো জাল হুকুম। এ হুকুম আমরা মানিনে। কার সাধ্য এখান থেকে আমাদের নড়ায়!

'When they received the order 'Retreat', there was general commotion. It looked as if there would be mutiny, because every one of them refused to obey the order.'

কিন্তু আজাদী সৈনিক হয়ে তোমরা হুকুম মানবে না?

আলবৎ মানব। কিন্তু আমাদের সাফ কথা—একমাত্র নেতাজী ছাড়া আর কারো হুকুম আমরা মানিনে, মানব না।

কিন্তু এ যে নেতাজীরই হুকুম।

নেতাজী! নিমেষে সোজা হয়ে দাঁড়াল প্রতিটি আজাদী সৈনিক, নেহি! নেহি! নেতাজী কখনো এ হুকুম দিতে পারে না। ঝুট বাত্।

ঝুট বাত্ নয় ভাই। এই দেখো নেতাজীর নিজের হাতে লেখা হুকুমনামা।

নেতাজী! সর্বস্ব হারালে মানুষের চোখে যে দৃষ্টি ফুটে ওঠে, সেই ব্যাকুল বিভ্রান্ত দৃষ্টিই ফুটে উঠল জওয়ানদের চোখের তারায়। নেতাজী এ আদেশ দিয়েছেন? তিনি ফিরে যেতে বলেছেন আমাদের সবাইকে!

হ্যাঁ, ভাই। বলেছেন, বর্ষার জন্য আমাদের এখান থেকে সরে গিয়ে এমন কোথাও অবস্থান করতে হবে, যেখান থেকে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা সহজ। এ অবসরে আমাদের যাবতীয় আয়োজন সম্পূর্ণ করে নিতে হবে, যাতে বর্ষা শেষ হলেই আবার আমরা আক্রমণ শুরু করতে পারি। বলেছেন,—এটাই আমাদের শেষ লড়াই নয়। আরো অনেক লড়াই আমাদের করতে হবে এমনি করে। আরো অনেক রক্ত দিতে হবে। দিতে হবে আরো অনেক প্রাণ। কিন্তু এ পরিস্থিতিতে এখানে থেকে এভাবে আত্মহত্যার কোন অর্থ হয় না। তাই আমি আদেশ করছি—তোমরা ফিরে এসো।

ফিরে যাব! নিষ্ঠুর একটা উপলব্ধি নিষ্ফল হাহাকারের মতই যেন বেজে ওঠে আজাদী সৈনিকদের কণ্ঠে। এ পর্যন্ত আমরা একটা লড়াইতেও হারিনি, তবু কিনা আমরা ফিরে যাব এখান থেকে! হায় ভগবান!

এর জন্যই কিনা আমরা পাহাড়-পর্বত তুচ্ছ করে দু হাজার মাইল দূর থেকে পায়ে হেঁটে এখানে এসেছিলাম? এর জন্যই কিনা আমরা সাতাশ হাজার সাথীকে বলি দিয়েছিলাম? এত কষ্ট, এত অনাহার,—এসব কি এর জন্যই নিঃশব্দে সহ্য করেছিলাম? হায় আল্লা! হায় ঈশ্বর! এই কি আমাদের ভাগ্যলিপি!

নেতাজীর আদেশ। তবু মন সায় দেয় না। দেহ সাড়া জাগায় না। এত দূর পথ এসে আবার ফিরে যাব! জন্মভূমি থেকে ফিরে যাব! তার আগে এক কাজ করলে হয় না! আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ, তারা তো এমনিতেই মারা যাবে। তার চাইতে লড়াই করেই মরিনে কেন! হ্যাঁ, তাই হোক। সবাই আমরা প্রাণ দেব লড়াই করে।

'আমি তাদের এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলাম।' বলেছেন শাহনওয়াজ খান সাহেব, 'কিন্তু জাপানী লিয়াজোঁ অফিসার আমাদের এই অভিপ্রায় জানতে পেরে নেতাজীর কাছে এক বিশেষ জরুরী বার্তা পাঠান। নেতাজী এই খবর পেয়ে আমাকে পশ্চাদপসরণের জন্য কড়া হুকুম পাঠালেন। সৈনিক

হিসেবে তাঁর এই আদেশ মেনে নিয়ে কালেওয়াতে ফিরে যাওয়া ছাড়া আমার আর কোন গত্যন্তর রইল না।'

কিন্তু ঐ জাতীয় পতাকা! না, জাতীয় পতাকার অবমাননা আমাদের সইবে না। একদিন ময়রাং-এর এই হেড কোয়ার্টার্স-শীর্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন ইনটেলিজেন্স গ্রুপের কর্ণেল এস. এ. মালিক সাহেব। দীর্ঘ তিনমাস বাদে তিনিই আবার সেই জাতীয় পতাকা তুলে নিলেন মর্মস্পর্শী একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।

'Col. S. A. Mallick did not allow the National Flag to be dishonoured by enemy. Before retreat the Flag was pulled down with ceremony and kept with all honour.'

[Battle of Imphal: Debnath Das: Contemporary: August, 1972]

সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে আজাদী ফৌজ। দু চোখে তাদের অশ্রুর বন্যা। এই দেশ, এই মাটি তাদের কত প্রিয়। আবার যে কোনদিন তাদের এই মাতৃভূমি থেকে এমন করে বিদায় নিতে হবে তা কে জানত!

বিদায় ময়রাং! বিদায় বিষেণপুর! বিদায় ইম্ফল! একমাত্র তোমাদের কোলেই আমরা সাতাশ হাজার জওয়ান সাথীকে রেখে গেলাম চিরদিনের মত। দেশের জন্য তাদের এই নিঃশেষ আত্ম-বিসর্জনের ইতিহাস সবাই ভুলে গেলেও তোমরা কোনদিনও ভুলো না যেন।

এ্যাবাউট্ টার্ণ! লেফ্ট্-রাইট্, লেফ্ট্-রাইট, লেফ্ট্...

দেখতে দেখতে আজাদী ফৌজ মিলিয়ে গেল দৃষ্টির আড়ালে। শুধু যাবার আগে মাতৃভূমির পদপ্রান্তে রেখে গেল একটি নীরব প্রণাম। মাগো, আবার যেন আমরা তোমার কোলে ফিরে আসতে পারি। তোমার কোলেই যেন আমরা শেষনিঃশ্বাস ফেলতে পারি। জয় হিন্দ্!

আজাদী ফৌজ ফিরে চলেছে ইম্ফল ত্যাগ করে।

কোহিমা সেক্টরের বাহিনী যাবে তামুতে। বিষেণপুর সেক্টরের বাহিনীর লক্ষ্য—টিড্ডিম।

দেহ টলছে। পা কাঁপছে। অসহ্য যন্ত্রণায় বোবা বুকটা ফেটে পড়তে চাইছে। তবু তারা নিজের দেহটাকে টেনে নিয়ে চলেছে কোনরকমে।

পুঞ্জ পুঞ্জ কান্নার মেঘ জমে উঠেছে মনে। কিন্তু সেকথা কাউকে বলার নয়। কাউকে বোঝাবার নয়। সে দুঃখ তাদের একার।

ঐ যে দূরে ইম্ফল দেখা যাচ্ছে। ঐ যে ময়রাং। ঐ যে এখনো কোহিমা দেখা যাচ্ছে অনেকটা উত্তরে। আর বিষেণপুর। না, বিষেণপুর আর দেখা যাচ্ছে না। বিষেণপুর হারিয়ে গেছে। চলে গেছে দৃষ্টির আড়ালে।

ডঃ বা. ম'র ভাষায়ঃ

'ভারতীয় ফৌজের কথা বলতে পারি। এই যে তাঁদের হাতের মুঠো থেকে জয়কে ছিনিয়ে নেওয়া হল, এর দুঃখ তাঁদের ভীষণভাবে বেজেছিল।

স্বদেশের মৃত্তিকায় পদার্পণের পর থেকেই আশায়—আগ্রহে তাঁদের চিত্ত এমনভাবে মথিত হচ্ছিল যে, পরাজয়ের আঘাতে তাঁরা যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল।’

আবার সেই পথ-পরিক্রমা। আবার সেই দীর্ঘ মানুষের মিছিল।

কাজটা কিন্তু মোটেই সহজ হয়নি মল্লিকা। সেদিন ফেরার পথে আজাদী বাহিনীকে যে মূল্য দিতে হয়েছিল, তা সত্যিই বড় মর্মান্তিক। বোধহয় পৃথিবীর কোন সেনাবাহিনীকেই এতখানি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়নি যুদ্ধের ইতিহাসে।

ভুক্তভোগী মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান সাহেবের লেখনী থেকেই তার খানিকটা অংশ তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি ঃ

‘...ভীষণ বর্ষা শুরু হয়ে গেল। একটা কাঁচা পাহাড়ী পথ দিয়ে আমাদের রসদ আমদানি করা হত, প্রবল বর্ষণে সে পথ একেবারে ধসে গেল। ফলে সবরকম সরবরাহ পথ বন্ধ হল। ক্রমশঃ আমাদের রসদও ফুরিয়ে গেল।

সৈন্যরা নাগাপল্লী থেকে অনেক কষ্টে দুটি চাল সংগ্রহ করে আনত। জংলী ঘাসের সঙ্গে তাই সিদ্ধ করে খেয়ে কোনরকমে প্রাণ ধারণ করত। একটু নুনও তাদের জোটেনি। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এসব খেয়ে ক্রমশঃ তারা দুর্বল হয়ে পড়ল. তবু ব্রিটিশের সামনে থেকে পশ্চাদপসরণের কথা তাদের একবারও মনে হয়নি।

ওষুধপত্রও সব শেষ হয়ে গেল। ডাক্তাররা রোগীর চিকিৎসা করবেন—এমন কিছুই ছিল না। তার উপর আবার সেই জঙ্গলে অসংখ্য বড় বড় মাছি—মানুষ বা জন্তুর দেহে কোথাও একটু ক্ষত পেলে অমনি তারা সেখানে গিয়ে বসবে, তারপর আধঘণ্টা যেতে না যেতেই সেই ক্ষতস্থানে দেখা দেবে রাশি রাশি পোকা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই অসহ্য যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার জন্য সৈন্যরা নিজের হাতে গুলী করে আত্মহত্যা করেছে।

এ সময়ে কোহিমা থেকে প্রত্যাবর্তন করা যে কি কঠিন কাজ তা বলে বোঝানো যাবে না। কোন দেশের কোন সেনাবাহিনীকেই বুঝি এমন কঠিন পশ্চাদপসরণ করতে হয়নি। প্রবল বারিপাতে রাস্তাঘাট সব ধুয়ে মুছে গেছে। যে সব নতুন রাস্তা তৈরি করা হল তাতে প্রায় একহাঁটু কাদা, দলের অনেক লোক পথ চলতে গিয়ে ঐ কাদায় আটকে পড়ে মারা গেল।

এ সময়ে যানবাহনের কোন ব্যবস্থা আমাদের ছিল না। তাছাড়া অনেকেই আমাশয় ও ম্যালেরিয়ায় ভুগছিল। কারো শরীরেই এমন সামর্থ্য ছিল না যে, অন্যকে সাহায্য করে। চারদিন আগে মারা গেছে, এমন ঘোড়ার মাংস খেতেও এ সময়ে সৈন্যদের আমি দেখেছি। রাস্তার দুধারে পড়ে রয়েছে শত শত জাপানী এবং ভারতীয় সৈন্যের মৃতদেহ। এদের কেউ মরেছে ক্লান্তিতে. কেউ অনাহারে, আবার কেউ বা এত দুঃখকষ্ট সহ্য করতে না পেরে নিজেই নিজেকে শেষ করেছে। ব্রিটিশের হাতে বন্দী হবার চাইতে আত্মহত্যাকেই তারা শ্রেয় বলে মেনে নিয়েছে।

আমাদের প্রায় সব ব্যবস্থাই তখন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তারদের

চিকিৎসা করার মত কোন ওষুধপত্র ছিল না। তাছাড়া তারা নিজেরাও আমাশয় এবং ম্যালেরিয়াতে ভুগছিলেন। আশেপাশের জঙ্গলে বড় বড় সব মাছি মৃতদেহের উপর বসে দিবারাত্র ভন্ ভন্ করত। এ ছাড়া আরো কত রকম বীভৎস দৃশ্য যে দেখা যেত তা বর্ণনা করা অসম্ভব। যে একবার সে দৃশ্য দেখেছে জীবনে সে তা কখনোই ভুলতে পারবে না।

একদিন আমি এক আহত সৈনিকের দেখা পেলাম পথের ধারে। কখন মৃত্যু এসে তার সমস্ত জ্বালার অবসান ঘটাবে তারই জন্য সে অপেক্ষা করছিল। ক্ষতস্থানে তার কিলবিল করছিল অসংখ্য পোকা। বোঝা যায়, মৃত্যুর আর বেশি দেরী নেই।

আমাকে দেখেই সে চোখ মেলে তাকাল, তারপর ওঠার চেষ্টা করল, কিন্তু সে সাধ্য তার ছিল না। সুতরাং আমাকেই সে ইঙ্গিত করল তার কাছে বসে একটি কথা শোনার জন্য। কথাগুলো বলার সময় তার দুচোখ দিয়ে জল পড়ছিল। সে বলল,—আপনি ফিরে যাচ্ছেন, নেতাজীর সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনার দেখা হবে। কিন্তু আমার আর তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না। তাঁকে আমার জয় হিন্দ্ জানিয়ে বলবেন, তাঁর কাছে আমি যে অঙ্গীকার করেছিলাম, সে অঙ্গীকার আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। কি করে আমার মৃত্যু হল সেকথা তাঁকে আপনি খুলে বলবেন। জীবন্ত অবস্থাতেই আমার দেহ পোকায় কিভাবে কুরে কুরে খাচ্ছে—তাও বলবেন। আর একথাও তাঁকে বলবেন—এই নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও আমি এক দিব্য আনন্দ ও অপূর্ব শান্তি উপলব্ধি করছি। কারণ প্রতি মুহূর্তেই আমার মনে হচ্ছে,—আমি আমার জন্মভূমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিচ্ছি।

শুধু এই একটি নয়, রোজ এমনি শত শত ঘটনা ঘটত। সৈন্যরা এতখানি মনের বল যে কি করে পেল ভাবলে অবাক হতে হয়। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নেতাজী এবং তাঁর কাছে ওরা যে অঙ্গীকার করেছে সেকথা ভুলতে পারেনি।

বহুদিন দেখেছি—আমাশয় এবং বেরিবেরিতে ভুগে সেনাদের মুখ ও পা ভীষণভাবে ফুলে গেছে। এত দুর্বল যে, আর এক পাও চলার সাধ্য নেই। সে অবস্থায় তাদের অফিসার এসে হয়তো বললেন—নেতাজীর কাছে কি অঙ্গীকার করেছ তা কি তোমরা এর মধ্যেই ভুলে গেলে? বীরের মত তোমরা সব দুঃখকষ্ট সহ্য করবে—এই কি তোমাদের প্রতিজ্ঞা ছিল না? এখান থেকে আর মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে কালেওয়াতে নেতাজী আমাদের জন্য পথ চেয়ে আছেন। ওখানে গিয়ে তাঁকে কি তোমাদের দেখতে ইচ্ছে করে না?

এসব বলে অফিসার যেই তাদের উঠে চলতে হুকুম দিতেন, অমনি যেন তাদের নির্জীব দেহে কোন যাদুমন্ত্রে বল ফিরে আসত। আমি এমনও দেখেছি যে, কোন কোন রুগ্ন সৈনিক নেতাজীকে একবার দেখার জন্য হামাগুড়ি দিয়ে এই পঞ্চাশ মাইল অতিক্রম করার চেষ্টা করছে। অনেকে এমনি করে এই পঞ্চাশ মাইল গিয়ে নেতাজীকে দেখামাত্র হাসিমুখে মৃত্যু-

বরণ করেছে। তাদের মনে এই শান্তি যে, পরমপ্রিয় নেতাজীর দেখা তারা পেয়েছে।

এমনি করে হাঁটু সমান কাদা-পাঁকের পথ বেয়ে গুলী-গোলা ও মেশিন-গানের অগ্নিবর্ষণের মধ্য দিয়ে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বীর সৈন্যদলকে পায়ে হেঁটে পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছিল।'

খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন সুভাষ। ফেরার পথে আজাদী বাহিনীকে যে এতখানি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে, একথা বোধহয় তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

একান্ত প্রিয় আজাদী ফৌজকে রক্ষা করার জন্য সুভাষের সেদিনের সেই প্রচেষ্টা সম্বন্ধে ব্রিটিশ মুখপাত্র হিউ টয়-এর বক্তব্য কি শোনা যাক :

'তৎক্ষণাৎ তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন আর্তত্রাণের কাজে। ইতিমধ্যে উত্তর-বর্মায় শিবির, চিকিৎসালয় ও বিশ্রামকেন্দ্র তৈরী হয়েছে। যানবাহন-ব্যবস্থারও কিছুটা সুরাহা হয়েছে। রেঙ্গুন থেকে গুদামজাত রসদ ও বাজারের জিনিসপত্র পাঠানো হতে লাগল। জামাকাপড় এবং বুট সংগ্রহ করা হল। নতুন একটি হাসপাতালও খোলা হল। সুভাষচন্দ্র তাঁর নিজের মেডিকেল অফিসারকে পাঠিয়ে দিলেন। অন্যান্য চিকিৎসকদের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হল।'

এখানেই থামলেন না সুভাষ। যতদূর সম্ভব সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করে অবশেষে নিজেই একদিন তিনি চলে গেলেন বিভিন্ন হাসপাতালে অবস্থিত অসুস্থ আজাদী সৈনিকদের কাছে। ওরা যে তাঁর বড় প্রিয়। এ সময়ে ওদের কাছ থেকে তিনি দূরে থাকবেন কি করে ?

প্রায় দুহাজার আজাদী সৈনিক তখন অবস্থান করছিল মেমিও হাসপাতালে। কেউ ভুগছিল ম্যালিরিয়ায়, কেউ আমাশয়ে. কেউ বা আঘাতজনিত দুষ্টক্ষতে।

দেখাশোনার ভার নিয়েছেন ঝাঁসির রাণীবাহিনীর মেয়েরা। একটি ভাইকেও তাঁরা বিনা শুশ্রূষায় মরতে দিতে রাজী নন। বিশেষ করে মাত্র ষোল বছরের মেয়ে কুমারী বেলা দত্তর তো কথাই নেই। যেভাবে তিনি একাই ৮৫ জন রোগীকে সেবা-শুশ্রূষা করে চলেছেন তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

আশ্চর্য ব্যাপার ! নিমেষে যেন সবার রোগ-শোক সব দূর হয়ে গেল সুভাষের দেখা পেয়ে। নেতাজী ! নেতাজী ! নেতাজী তাদের দেখতে এসেছেন, এ আনন্দ তারা রাখবে কোথায় ?

তোমাদের কোন কষ্ট হচ্ছে না তো ভাই ? জানতে চাইলেন সুভাষ।

না-না। নিমেষে সরব হয়ে ওঠে অসুস্থ যোদ্ধার দল. বেলা দিদি থাকতে কষ্ট হবে কেন ? বাড়িতে মা-বোনেও এর চাইতে বেশি করতে পারত না নেতাজী।

খুশি হয়ে সুভাষ সেইদিনই বেলা দত্তকে নায়েক পদ থেকে উন্নীত

করলেন হাবিলদার পদে। এই তো চাই। এমনি মেয়েই তো আজ সবচাইতে বেশি দরকার রাণীবাহিনীতে।

তারপর, তোমার খবর কি? প্রশ্ন করলেন আর একজন আজাদী সৈনিককে, কবে সেরে উঠছ বলো?

কবে! জবাব দেয় আজাদী যোদ্ধা, আপনি যেদিন আবার আমাদের যুদ্ধে যেতে আদেশ করবেন, সেইদিনই আমি সেরে উঠব নেতাজী।

এমনি কত কথা। কত ঘটনা। কত টুকরো টুকরো ছবি। শুনলে স্বপ্ন বলে মনে হয়। অথচ সব সত্য। একবার তাদের নেতাজীর দেখা পেয়েছে কি ব্যস। অমনি এতদিনকার এত দুঃখ কষ্ট, এত মর্মান্তিক বিপর্যয়, সব ধুয়ে মুছে একাকার।

'নির্মম কঠোরতা মেরেছে ঢেউ
আমার নৌকার ডাইনে বাঁয়ে,
জীবনের পণ্য চেয়েছে ডুবিয়ে দিতে
নিন্দার তলায় পঙ্কের মধ্যে।'—রবীন্দ্রনাথ

আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ফিরে গেল ভারতবর্ষ থেকে। রেখে গেল স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী, যা প্রতিটি বঞ্চিত মানুষ স্মরণ করবে যুগ যুগ ধরে।

কেউ কি সেদিন আমরা জানতে পেরেছিলাম ইম্ফল রণাঙ্গনে মহাক্ষত্রিয় সুভাষের এই অবিস্মরণীয় সংগ্রামের কাহিনী? ভাবতে পেরেছিলাম কি কেউ?

না, পারিনি। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসে আবার নিঃশব্দে দূরে চলে গেছে. একথা সেদিন আমাদের কল্পনারও বাইরে ছিল।

কারণ কি? কারণ, চতুর ইংরেজের প্রচার-কৌশল। 'জাপান ভারত আক্রমণ করেছে'—এটাই ছিল সেদিন তাদের প্রচারের মূল কথা। কি রেডিও, কি সংবাদপত্র কোথাও আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কোনরকম উল্লেখ থাকত না। যেন আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নামই শোনেনি তারা।

প্রয়োজন হলে বলত—Japanese inspired Fifth Column (J. I. F. C.)। সোজা কথায়—জাপানের পুতুলবাহিনী। সে যে আসলে আমাদের ভারতবর্ষেরই মুক্তিফৌজ, তা কে জানত?

কেন সুভাষ সম্বন্ধে ব্রিটিশের পদে পদে এত সতর্কতা? কেন সুভাষের নামে তাদের এত জ্বালা? কি এর কারণ?

ভয়! ভয়! ভয়! দারুণ ভয়! শুধুমাত্র বাণী আর বিবৃতি দানের মধ্যে সুভাষ বোসের সংগ্রামী জীবন সীমাবদ্ধ নয়। লোকটা অসাধ্য সাধন করতে জানে। এমন একগুঁয়ে লোককে ভয় না করে উপায় আছে?

সেই ভয়ঙ্কর লোকটি এবার তাঁর আসল মূর্তি ধরে একেবারে ইম্ফলের দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির হয়েছেন, একথা তাঁর দেশবাসী জানতে পারলে রক্ষে আছে? ঠেলে আরব সাগরের জলে ভাসিয়ে দেবে না! সুতরাং চেপে যাও। সবকিছু চেপে যাও। সাবধান! সুভাষ বোসের উপস্থিতির কথা কেউ জানতে না পারে। খুব হুঁশিয়ার!

অবশ্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন বেতারকেন্দ্র থেকে সুভাষ প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন কম নয়, কিন্তু বেশ বোঝা যায় যে, ভারতবর্ষে তার সেই প্রচেষ্টা খুব একটা কার্যকরী হয়নি। খুব কম লোকই সেদিন জানতে পেরেছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই নবজাগরণের কথা।

তার কারণও ছিল। প্রধান কারণ, শত্রুপক্ষের খবর শোনা সম্বন্ধে সরকারী বিধি-নিষেধ। তাছাড়া আজকের মত ঘরে ঘরে সেদিন এত রেডিওর প্রচলন ছিল না। সর্বোপরি রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, ব্যাঙ্কক, সাইগন, নানকিং ইত্যাদি বেতারকেন্দ্রগুলি এমন কিছু শক্তিশালী ছিল না, যা অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। প্রায় শোনাই যেত না। অনেক কসরত করে যাও বা শোনা যেত, তারও বেশির ভাগই ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট। এখানকার অভিজ্ঞ বেতার-কুশলিগণ একই সময়ে, একই তরঙ্গে এমন কতগুলো বিশ্রী যান্ত্রিক শব্দ প্রচার করত, যার ফলে বক্তব্য বিষয় বুঝে ওঠা রীতিমত কষ্টকর ছিল।

বেতারের পর সংবাদপত্র। সেখানেও রীতিমত নিষেধাজ্ঞা। সেন্সার না করে একটি লাইনও প্রকাশ করা চলত না। ফলে সেখানেও সেই একই বক্তব্য। অর্থাৎ—জাপানই আক্রমণকারী। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই।

তাছাড়া ছিল বিভিন্ন অপপ্রচার। সুভাষ দেশের শত্রু, সুভাষ কুইসলিং, এ তো অষ্টপ্রহর লেগেই ছিল কানের কাছে।

শুধু ব্রিটিশ নয়, এ ব্যাপারে ব্রিটিশ-বন্ধু ভারতীয়রাও সেদিন কিছু কম করেনি সুভাষের বিরুদ্ধে। যে সুভাষ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে, সে কখনো দেশের শত্রু না হয়েই পারে না। সুতরাং ব্রিটিশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাকে রুখতেই হবে।

শুধু ভারতবর্ষে নয়, বাইরেও সেদিন কিছু কম কুৎসা করা হয়নি সুভাষের বিরুদ্ধে। এ ব্যাপারে সমান তৎপর ছিল ব্রিটিশবান্ধব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। প্রমাণ তখনকার সময়ের সংবাদপত্রগুলি। সেখানে কি মার্কিন, কি ব্রিটিশ, কি ব্রিটিশ-বন্ধুর দল, সবারই বক্তব্য ছিল এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ—সবাই সাধু। সবাই ভাল। সবাই ভারতবর্ষের পরম বান্ধব! শত্রু শুধু একজনই, নাম তাঁর সুভাষচন্দ্র বসু।

তাই কিছুই সেদিন আমরা জানতে পারিনি মল্লিকা। ওরা আমাদের জানতেই দেয়নি যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটা চূড়ান্ত পর্যায় তখন শুরু হয়ে গেছে ইম্ফলের রণাঙ্গনে।

আজই কি সে কাহিনী খুব একটা জানি আমরা? লেখা হয়েছে কি সেই ঐতিহাসিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের কোন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস?

না, হয়নি। বোধহয় হবেও না আর কোনদিন। ফলে সব কিছুই আজ অস্পষ্ট কতগুলো রেখাচিত্র হয়ে বেঁচে আছে মানুষের মনে। একদিন তাও হয়তো থাকবে না। নতুন দিনের নতুন ইতিহাসে একথাই হয়তো শুধু লেখা থাকবে—'একদা এদেশে সুভাষ বসু নামে একটি ক্ষত্রিয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।'

জীবনে সার্থকতা ফেলে কেউ ব্যর্থতা চায় না। তবু তা পেতে হয়। তবু তা মেনে নিতে হয়। তা বলে সংগ্রাম কোনদিনও পিছিয়ে যেতে পারে না। তাই সাময়িক বিপর্যয়ে দমে না গিয়ে আবার সুভাষ মেতে উঠলেন নতুন করে। ডঃ বা. ম.-র ভাষায়ঃ

'দুই অসম প্রতিপক্ষের মধ্যে যখন যুদ্ধ চলছে. তারপর যখন পশ্চাদ-পসরণের পালা এল, এবং বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত আজাদ হিন্দ্ ফৌজের টুকরো টুকরো অংশ দিয়েই যখন গড়ে তোলা হল এক প্রায় নতুন সেনাবাহিনী, তখনই সম্ভবত সুভাষচন্দ্রকে তাঁর দীপ্তিময় মহিমায় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। সেই সংকটের মধ্যেই যেন জীবনের শ্রেষ্ঠ লগ্নটি তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন, সেই দুর্যোগের দিনগুলিতেই প্রকট হয়েছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ রূপ। মুখে বিষাদের ছায়া, কিন্তু বুকে তখনও দুর্জয় সাহস, যুদ্ধ চালিয়ে যেতে তখনও তিনি সমান যুদ্ধ-পরিকর। আমি লক্ষ্য করেছি, ইম্ফলের ব্যর্থতার জন্য কাউকে তিনি দোষ দেননি।'

কি লাভ জাপান বা আর কাউকে দোষ দিয়ে! জাপান সমুদ্রনির্ভর জাতি। এশিয়ার বিস্তৃত ভূখণ্ড তখন তাদের দখলে। সেই বহুদূর-বিস্তৃত বিরাট ভূখণ্ডে যোগাযোগ এবং সরবরাহ-ব্যবস্থা বজায় রাখার মত যথেষ্ট জনবল তার কোথায়?

তাছাড়া জাপান নিজেই তখন বিব্রত। ১৫ই মে বিরাট শক্তি নিয়ে মার্কিন বাহিনী অবতরণ করেছে সাইপান দ্বীপে। এ অবস্থায় জাপান যে তার ছড়ানো-ছিটানো শক্তিকে যথাসম্ভব গুটিয়ে নিয়ে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করতে চাইবে—এ তো খুবই স্বাভাবিক।

তা বলে ঐ 'হিকারী কিকান' আর নয়। ইম্ফল অপারেশনের যাবতীয় সরবরাহ এবং যোগাযোগ-ব্যবস্থার দায়িত্ব ছিল ঐ হিকারী কিকানের উপর। তাদের অব্যবস্থাই যে এই বিপর্যয়ের জন্য অনেকখানি দায়ী, তা কোনরকমেই অস্বীকার করার উপায় নেই।

অবশ্য বর্মায় তখন প্রচণ্ড খাদ্যাভাব—একথা সত্য। একথাও সত্য যে, হিকারী কিকানের এই ব্যর্থতার জন্য শুধু আজাদ হিন্দ্ ফৌজ নয়, জাপানী সেনাদেরও কিছু কম মূল্য দিতে হয়নি। তাদেরও দুঃখ-কষ্ট এবং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে সমানভাবেই। তবু যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায় এ যুক্তি অচল। সুতরাং যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়।

কেন এই বিপর্যয়? কেন আমাদের ফিরে আসতে হল ইম্ফল থেকে?

সব কিছু একদিন সুভাষ বিশ্লেষণ করে বললেন মন্ত্রণা-সভার সদস্য-দের কাছে। ভুল-ত্রুটি আমাদেরও কিছু ছিল। আমরা আক্রমণ শুরু করতে দেরী করে ফেলেছিলাম। জানুয়ারিতে যদি আমরা শুরু করতে পারতাম, তাহলে ইতিহাস অন্যরকম হতো।

এ অভিযান থেকে আমরা কি শিক্ষা পেলাম? উত্তরঃ এই অভিযানে আমরা অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছি। আমাদের সেনাদের আত্মপ্রত্যয়ও বহু-

গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের ডিভিশনাল কম্যান্ডার ও অফিসাররাও অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন।

আর একটি ত্রুটি—রসদ এবং ওষুধপত্রের জন্য জাপানীদের উপর নির্ভর করা। না, ও পথে আর নয়। এখন থেকে আমাদের সরবরাহের দায়িত্ব আমরা নিজেরাই নেব। দায়িত্ব বহন করবেন আমাদের সরবরাহ বিভাগের সচিব—শ্রীপরমানন্দ। এ ছাড়া একটি পররাষ্ট্র বিভাগও দরকার। তার প্রধান পদে থাকবেন মেজর জেনারেল চ্যাটার্জী। আর চাই উপযুক্ত একটি সমর-পরিষদ।

মোট বারো জনকে নিয়ে গঠিত হল সমর-পরিষদ। এ'রা হলেন যথাক্রমে :

জেনারেল ভোঁসলে, জেনারেল চ্যাটার্জী, জেনারেল এম. জেড. কিয়ানী, কর্ণেল আজিজ আহম্মদ, কর্ণেল ঈশান কাদির, কর্ণেল হবিবুর রহমান, কর্ণেল গুলজারা সিং, শ্রীপরমানন্দ, এন. রাঘবন, কর্ণেল আই. জে. কিয়ানী, শাহনওয়াজ খান এবং সুভাষ স্বয়ং।

আবার সাজ-সাজ রব পড়ে গেল সর্বত্র। বর্ষার জন্য সাময়িকভাবে পিছিয়ে এলেও লড়াই আমাদের শেষ হয়নি। নতুন করে আবার এ লড়াই শুরু হবে বর্ষার পরে। সবাই প্রস্তুত হও।

আইপো (Ipoh), কুয়ালালামপুর, পেনাং, সিঙ্গাপুর এবং রেঙ্গুনে প্রতিষ্ঠিত সামরিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে আরো বিস্তৃত করা হল সুভাষের নির্দেশে। উপায় কি! ডাক শুনে দলে দলে লোক আসছে বিভিন্ন দেশ থেকে। আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে। কাতারে কাতারে। তাদের সবাইকে ঠাঁই দিতে হবে তো।

দেখতে দেখতে ফৌজের সংখ্যা দাঁড়াল পঞ্চাশ হাজার। ২নং ডিভিশন আগেই গড়ে উঠেছিল। কর্ণেল জি. আর. নাগরের নেতৃত্বে এবার গড়ে উঠল ৩নং ডিভিশন।

বর্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টার্স এবং স্থায়ী বাহিনীগুলোকে রাখা হল বর্মার বিভিন্ন কেন্দ্রে। অনেকটা এইভাবে :

ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টার্স—মান্দালয়। সুভাষ ব্রিগেড— বুদালিন। গান্ধী ব্রিগেড—মান্দালয়। আজাদ ব্রিগেড—ছাউনগাঁও। বেস হাসপাতাল—মেমিও এবং মানিওয়া।

২১শে সেপ্টেম্বর শহীদ-দিবস পালিত হল রেঙ্গুনে।

মল্লিকা, আজ থেকে ঊনত্রিশ বছর আগে রেঙ্গুনের জুবিলী হলে অনুষ্ঠিত এই শহীদ-দিবসে সুভাষ এমন একটি দাবী জানিয়েছিলেন, যা আজো অক্ষয় অমর হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়।

প্রথমে বিভিন্ন বক্তা একে একে তুলে ধরলেন শহীদ ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরু, ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, বিনয়-বাদল-দীনেশ, সূর্য সেন এবং চন্দ্রশেখর আজাদ প্রমুখ বিপ্লবীদের নিঃশেষে আত্মবিসর্জনের কথা। কেউ

বললেন বাংলার দুঃসাহসী অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা, শান্তি-সুনীতি, উজ্জ্বলা মজুমদার এবং বীণা দাসের কর্মকাণ্ডের কথা। কেউ বা শোনালেন মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ যতীন দাসের ঐতিহাসিক অনশনের কাহিনী। একটার পর একটা। অসংখ্য কাহিনী। অসংখ্য ঘটনা।

শ্রোতার দল অসাড়, নিস্পন্দ। অগণিত শহীদের এই নিঃশেষ আত্ম-বিসর্জনের ইতিহাস এতদিন বুঝি তাদের কল্পনারও অতীত ছিল।

সবশেষে জনগণের কাছে সেই দাবী জানালেন সুভাষ।

মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য নিজের বলতে যা কিছু সব বিসর্জন দিতে হবে। ঐ বিপ্লবীদের মতই সর্বস্ব ত্যাগ করতে হবে। শুধু বিদ্রোহী নয়, বিদ্রোহিনীও চাই, যারা শত্রুকে ভাসিয়ে দিতে পারবে নিজের রক্তে।

'আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।' 'তুম হামকো খুন দেও, তুমকো আজাদী দুংগা।' 'Give me blood, and I promise your freedom.'

বুঝি এক লহমার ব্যাপার। তারপর দেখতে দেখতেই একটা ঝড় বয়ে গেল যেন গোটা হলটার ওপর দিয়ে। নেতাজী! নেতাজী! নেতাজী! আমরা প্রস্তুত নেতাজী! বলুন কত রক্ত দিতে হবে আমাদের? কত রক্ত চাই? আমরা সবাই প্রস্তুত।

না। সুভাষের কণ্ঠে লোহ-কঠিন দৃঢ়তা, ভাবাবেগে চালিত হয়ে কেউ কিছু করুক, আমি তা চাইনে। আমি চাই যারা সত্যিকারের বিপ্লবী, তারা এগিয়ে এসে আত্মঘাতী (সুইসাইড স্কোয়াড) চুক্তিতে সই করুক। এ চুক্তি সাধারণ চুক্তি নয়, এ চুক্তির অর্থই হল স্বাধীনতার যূপকাষ্ঠে নিজের মাথাকে এগিয়ে দেওয়া।

আমরা তাই দেব নেতাজী। রব উঠল শত শত কণ্ঠে, আমরা এক্ষুণি এ চুক্তিতে সই করতে প্রস্তুত।

—বেশ, তাই হোক। তবে এই মৃত্যু-পরোয়ানায় কালি দিয়ে সই করলে চলবে না, সই করতে হবে নিজের রক্ত দিয়ে। যার সাহস আছে, আমার সামনে এগিয়ে এসো।

পরের কাহিনী মিস্ জানকী থিবার্সের 'বিদ্রোহী কন্যার রোজ-নামচা' গ্রন্থ থেকেই তুলে দিচ্ছি:

'শ্রোতার দল সবাই মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত। প্রথম দল মঞ্চের উপর উঠে গেল। ছুরি, পিন, যার যা আছে তাই দিয়ে রক্ত বের করতে লাগল।

প্রায় একঘণ্টা ধরে হলের প্রতিটি আনাচে-কানাচে মানুষ নিজের রক্ত দিয়ে নিজের মৃত্যু-পরোয়ানায় স্বাক্ষর দিতে লাগল'

শ্রোতাদের সে যে কি উৎসাহ, কি উদ্দীপনা, না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। সেদিন বুঝতে পারলাম, রাজপুতেরা যখন অস্ত্র-হাতে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কেশোদীয়া উৎসব পালন করত, তখন কি রকম দেখাত।'

১৮ই অক্টোবর সুভাষ অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন মৃত্যুর হাত থেকে।

অবশ্য সুভাষের পক্ষে এটা নতুন কিছু নয়। মাস কয়েক আগেও তাঁকে একবার মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়েছিল মেমিওতে। মাথায় তখন তাঁর নতুন পরিকল্পনা। মেমিও জায়গাটা বেশ স্বাস্থ্যকর। তাই এখানের হাসপাতালটাকে আরো বড় করতে হবে। তারপর বেশির ভাগ অসুস্থ জওয়ানকে এখানে নিয়ে আসতে হবে মান্দালয় থেকে।

ইনটেলিজেন্স বিভাগের পক্ষ থেকে আগেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল সুভাষকে। শত্রুপক্ষ অত্যন্ত তৎপর। তাদের কয়েকজন গুপ্তচর গভীর রাত্রে প্যারাসুটের সাহায্যে মেমিওতে অবতরণ করেছে, একথা বিশ্বাস করার পিছনে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এ সম্বন্ধে উপযুক্ত প্রমাণও রয়েছে ইনটেলিজেন্স বিভাগের হাতে।

সুতরাং খুব সাবধান। নেতাজী এখানে রয়েছেন, একথা জানতে পারলে শত্রুপক্ষ যে মরীয়া হয়ে উঠবে, সে তো বলাই বাহুল্য।

আশঙ্কা সত্যি বলে প্রমাণিত হল বিকেলের দিকে। সহসা শহরের সবগুলো বিপদজ্ঞাপক সাইরেন আর্তনাদ করে উঠল বিকট-স্বরে। তারপরই শুরু হল বোমাবর্ষণ এবং সেই সঙ্গে একটানা মেসিনগানের গুলী-বৃষ্টি।

বোঝাই যায় যে, লক্ষ্য তাদের সুভাষ এবং আজাদী বাহিনী। সৌভাগ্যবশত সে লক্ষ্য তাদের কোন কাজেই এল না। ফলে বেঁচে গেলেন সুভাষ। বেঁচে গেলেন তাঁর এ. ডি. সি. মেজর রাওয়াৎ, মেজর জেনারেল চ্যাটার্জী, আনন্দমোহন সহায় প্রমুখ পদস্থ অফিসারগণ।

শুধু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ঝাঁসীর রাণীবাহিনীর ক্যাম্পগুলি। তবে মেয়েদের কোন ক্ষতি হয়নি। তার আগেই তাঁরা ট্রেঞ্চ-এ আশ্রয় নিয়েছিলেন সাইরেন শুনে। পরদিন সুভাষ নিজে উদ্যোগী হয়ে নতুন বাসভবনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন মেয়েদের জন্য। কর্ণেল লক্ষ্মী স্বামীনাথনের ভাষায় ঃ

'There was no doubt that Netaji and the I. N. A. were the main targets but fortunately the operation was unsuccessful. The area in which we had gathered the previous evening was raised to the ground but there was not a single casualty. Our camp was reduced to a mass of rubble. The next day Netaji personally supervised our shifting to a disused school building.'

একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল ১৮ই অক্টোবর ভোরবেলায়।

এ ঘটনা ঘটেছিল রেঙ্গুন থেকে চোদ্দ মাইল দূরে অবস্থিত মিঙলাডোন সামরিক শিবিরের ময়দানে।

এক বছর আগে ২১শে অক্টোবর তারিখে সুভাষ সিঙ্গাপুরে অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন করেছিলেন, সেকথা নিশ্চয় তোমার স্মরণ আছে। তারই প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে এ বছর ১৮ই অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে 'জাতীয় সরকার গঠন সপ্তাহ'। সেই দিনই ছিল তার প্রথম অনুষ্ঠান।

হাজার হাজার লোক সেদিন জড় হয়েছে মিঙলাডোনে। এসেছেন আজাদ হিন্দ্ ফৌজের শ্রেষ্ঠ সমরনায়কগণ। এসেছেন লীগের বিশিষ্ট সদস্যগণ। এসেছেন বিভিন্ন রাষ্ট্রের আমন্ত্রিত কূটনৈতিক প্রতিনিধিবৃন্দ। ডিভিশনাল কম্যাণ্ডার কিয়ানী, মেজর জেনারেল চ্যাটার্জী, প্রচার-সচিব এস. এ. আয়ার। কেউ বাদ নেই।

সে কি অপূর্ব দৃশ্য! তালে তালে পা ফেলে মার্চ করে চলেছে শত শত নারী-সৈনিক। চলেছে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত চার হাজার তাজা জওয়ান—

লেফট্-রাইট লেফট্-রাইট লেফট্-রাইট লেফট্......

মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিবাদন গ্রহণ করছেন সুভাষ। ঠিক তাঁর পেছনেই সারি সারি উপবিষ্ট মেজর জেনারেল চ্যাটার্জী, এস. এ. আয়ার ও বিদেশী অতিথিবৃন্দ। মঞ্চ-শীর্ষে পত্ পত্ করে উড়ছে ভারতের তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা, যা বহুদূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যায় সূর্যের আলোতে।

সময়টা ভাল নয়, তাই সতর্ক প্রহরীর মত আকাশে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে কয়েকটি জাপানী বিমান। একে হিজ এক্সেলেন্সী চন্দ্র বসুর উপস্থিতি, তার উপর বিরাট জনসমাবেশ। কখন কি ঘটে যাবে, কে বলতে পারে! তাই সতর্ক থাকাই ভাল।

সহসা কান-ফাটানো আওয়াজ—বুম্-বুম্—বুম্ম্ম্......

কানও দিল না কেউ। কাছেই কোথাও ট্রেনিং চলছে হয়তো। যুদ্ধের সময় এ তো নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। তাই হবে হয়তো।

কিন্তু একি! এ যে শত্রুপক্ষের ফাইটার বিমান! একেবারে মাথার ওপর নেমে এসেছে। আর মাত্র পঞ্চাশ-ষাট গজের ব্যবধান। ঐ যে ডাইভ দিয়ে আরো নীচে এসেছে। একেবারে নীচে।

কিন্তু কি করে এটা সম্ভব হল! কি করে ওরা এখানে আসার সুযোগ পেল জাপানী বিমানের বেড়াজাল ডিঙিয়ে?

মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বয়ং সুভাষ। কি জাতীয় পতাকা, কি সুভাষ, সব কিছুই তখন ওদের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দিবালোকের মত। এ অবস্থায় কি সহজে ওরা রেহাই দেবে ওদের পয়লা নম্বর শত্রু সুভাষকে !

জীবন ও মৃত্যুর পাশাপাশি দম-বন্ধ করা একটা মুহূর্ত। কি হবে কে জানে! না, কোন উপায় নেই। ঐ যে বিমানের পাইলট প্রস্তুত হচ্ছে। ঐ যে সে লক্ষ্য স্থির করছে। আর দেরী নেই। শুরু হল বলে!

আশঙ্কা মিথ্যে হল না। সঙ্গে সঙ্গে একঝাঁক জ্বলন্ত বুলেট ছুটে এল মেসিনগান থেকে। কিন্তু না, ধাক্কাটা পার্ক-করা গাড়িগুলোর উপর দিয়েই গেছে, তাছাড়া আর কোনই ক্ষতি হয়নি সুভাষ বা আজাদী বাহিনীর। ভাগ্যিস, পাইলটের ডানদিকের মেসিনগানটাই শুধু কার্যকরী হয়েছিল, বাঁ দিকেরটা চালু হলে আর রক্ষে ছিল না। কারণ, ঐ দিকেই ছিল সবকিছু।

এদিকে তখন একটানা গোলা ছুটে চলেছে স্বপক্ষের বিমান-ধ্বংসী কামান থেকে। একটার পর একটা। অসংখ্য। শত্রুপক্ষকে কোনরকম সুযোগ দিতে তারা রাজী নয়।

নীচে তখনো মার্চ করে চলেছে আজাদী সৈনিকের দল। কোন চাঞ্চল্য নেই। কোন ভাবান্তর নেই। আসুক বিমান। চালাক মেসিনগান। তা বলে মিলিটারী ডিসিপ্লিন ভংগ করা কোনরকমেই সম্ভব নয়।

মঞ্চের উপর তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে আছেন সুভাষ। ঠিক যেন পাথরে গড়া অটল, অনড় কোন গ্রীক-যোদ্ধার মূর্তি।

সহসা স্বপক্ষের একটা গোলা নীচু হয়ে এসে নিমেষে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিল জনৈক জওয়ানের দেহটাকে। তা বলে লাইন কিন্তু ভেঙে গেল না। চলার গতিও থামল না। যেমন যাচ্ছিল তেমনিভাবেই তারা এগিয়ে গেল তালে তালে পা ফেলে। সৈনিক-জীবন বড় কঠোর। সেখানে তুচ্ছ হৃদয়-বৃত্তির কোন অবকাশ নেই।

বিপদ দেখে সহসা সুভাষকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে উঠলেন ডিভিশনাল কম্যাণ্ডার কিয়ানী সাহেব, ইয়ে ফ্রণ্ট নেহি হ্যায়, সাব—মেহেরবাণী করকে আপ নীচে উৎরাইয়ে।

সুভাষ তেমনি অটল, অনড়। না, আজাদী বাহিনী দূরে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁর পক্ষে স্থানত্যাগ করা সম্ভব নয়। মরতে হয় তো এখানে এই পজিশনেই মরব, আশ্রয় নিতে গিয়ে নয়।

'I had made up my mind that if I had to die, I would rather like to die at this position than be caught while trying to take shelter.'

মল্লিকা, কি বলে তুমি আখ্যা দেবে সুভাষের সেদিনের সেই সিদ্ধান্তকে! একগুঁয়েমী! দুঃসাহস! আত্মবিশ্বাস! না কি ভগবানের পায়ে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, যা ছিল তাঁর একান্ত নিজস্ব ব্যাপার!

উত্তর পাবে খ্রীষ্টধর্মে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী আয়ার সাহেবের কয়েকটি কথার মধ্যে:

'I always came to the conclusion that he derived his strength from God himself...Most intensely he sought the guidance of God. He felt that in every step forward that he took, God himself was leading him by both hands; hence that immobile face, iron determination, supreme but quiet self-confidence, and an ascetic indifference to success or failure.

...This was itself typical of the strictest privacy in which Netaji lived with his God. His faith was not an article for parade...He never even one spoke his God in public. He lived him.

...I would content myself with quoting from the Bible the words of Nicodemus to Jesus: "For no man can do these miracles that thou doest, except, God be with him."

[S. A. Ayer: P.—268-269]

না, এর কোন অনুবাদ বা ভাবার্থ হয় না মল্লিকা। পার তো বুঝে নিও।

জাপানের ইতিহাসে ব্যর্থতার কোন মার্জনা নেই। নানা অজুহাত দেখিয়ে গদী আঁকড়ে থাকারও কোন নজীর নেই। তাই ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো পদত্যাগ করেছেন মন্ত্রিসভা থেকে। তাঁর জায়গায় এসেছেন জেনারেল কুনিয়াকি কইসো (Koiso)।

নিঃসন্দেহে সুভাষের পক্ষে এটা ভাবনার কথা। তোজোর আমলে জাপ সরকারের মনোভাব ছিল খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ। নতুন সরকারের আমলে কি হবে কে জানে! যা-ই হোক, ইতিমধ্যেই তিনি নতুন মন্ত্রিসভার উদ্দেশে এক তারবার্তা পাঠিয়ে দিয়েছেন সৌজন্য হিসেবে। যুদ্ধে জয়লাভ না করা পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে আছি এবং থাকব।

'I hereby declare that we will fight side by side with Japanese and other friendly powers until we win independence by crushing our common enemy.'

উত্তর দিয়েছেন নতুন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল কইসো : 'জাপ-সরকারের মহামান্য অতিথি হিসেবে আমরা আপনাকে টোকিওতে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, ইওর এক্সেলেন্সী। ভবিষ্যৎ সংগ্রাম সম্বন্ধে দুপক্ষের মধ্যে একবার সামনা-সামনি আলাপ-আলোচনা হওয়া খুবই প্রয়োজন।'

সানন্দে রাজী হলেন সুভাষ। ভালই হল। বেশ কিছুদিন আগে পি. বি. নায়ার, বালান, রাজাধুরাজ, মহম্মদ ইকবাল, নারাণ প্রমুখ চল্লিশটি কিশোর ক্যাডারকে উচ্চতর সামরিক শিক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল টোকিওতে। এই ফাঁকে ওদের কাজকর্মও দেখে আসা যাবে নিজের চোখে। বড় ছেলেমানুষ ওরা। চিঠি পেতে একটু দেরী হলে অমনি মুখ ভার। ওদের কি কখনো ভুলে থাকা যায়!

২৮শে অক্টোবর সুভাষ পাড়ি দিলেন রেঙ্গুন থেকে। সঙ্গে রইলেন মেজর জেনারেল চ্যাটার্জী, ডিভিশনাল কম্যান্ডার মেজর জেনারেল কিয়ানী এবং হবিবুর রহমান।

রেঙ্গুন থেকে ব্যাঙ্কক। ব্যাঙ্কক থেকে সাইগন। সাইগনের পরে হ্যানয়। তারপর তাইহোকু। সেই তাইহোকু, যেখানে এক রহস্যময় নাটক অনুষ্ঠিত হয়েছিল পরবর্তীকালে। ১লা নভেম্বর টোকিও।

সুভাষের সম্মানার্থে পরদিনই এক ভোজসভা অনুষ্ঠিত হল প্রধানমন্ত্রী জেনারেল কইসোর সরকারী বাসভবনে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজোও সেদিন উপস্থিত ছিলেন আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে।

বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের মধ্যেই সেদিন আলাপ-আলোচনা হল রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে। স্থির হল, মন্ত্রিসভার পরিবর্তন হলেও জাপানের নীতির কোন পরিবর্তন হবে না ভারত সম্বন্ধে। আগে যেমন ছিল, তাই থাকবে বরাবর।

নতুন করে ঘোষণা করলেন নতুন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল কইসো : আমাদের

কোন প্রত্যাশা নেই ভারতবর্ষের কাছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হোক এটাই আমাদের একমাত্র কাম্য।

কিন্তু ঐ হিকারী কিকান! না, হিকারী কিকান আমরা চাইনে। আজাদ হিন্দ্ সরকার একটি স্বাধীন সরকার। সে হিসেবে একজন রাষ্ট্রদূতই আমরা আশা করব অন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের কাছে।

দাবী মেনে নিলেন জেনারেল কইসো। বেশ, তাই হবে। অচিরেই আমরা একজন রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করব জাপানের পক্ষ থেকে।

তারপর একে একে দেখা করলেন মহামান্য সম্রাট, রাসবিহারী বসু ও জাপানের বিখ্যাত কবি নোগুচির সঙ্গে। ভালবাসার নিদর্শন হিসেবে বিভিন্ন জায়গা থেকে উপহার-সামগ্রীও পেলেন বিস্তর। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল প্রাক্তন জাপ-প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো কর্তৃক প্রদত্ত একটি সুদৃশ্য তরবারী। 'Many presents were given to Netaji, including a sword from Gen. Hideki Tojo.'

[Maj. Gen. Chatterjee: P.—244]

তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের ভাষণ। বেতার-ভাষণও বাদ গেল না। ভাষণ দিলেন পরপর কয়েকদিন। বিশেষভাবে একদিন ভাষণ দিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে।

সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ভাষণ দিলেন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে।

'স্বাধীনতা অর্জনের পরেই ভারতবর্ষে দরকার হবে দারিদ্র্য ও অশিক্ষার বিরুদ্ধে লড়াই। ব্যক্তিগত উদ্যোগে এটা সম্ভব নয়। এ ভার রাষ্ট্রকেই নিতে হবে। চাই দ্রুত ও মৌলিক সংস্কার সাধনের ক্ষমতাযুক্ত সমাজতন্ত্র। চাই এমন একটি শক্তিশালী সরকার, যা কেবলমাত্র কোন একটি গোষ্ঠীর স্বার্থে কাজ করবে না, কাজ করবে জনসাধারণের সেবক হিসেবে।'

মল্লিকা, সুভাষের সমাজতন্ত্র আর আজকের দিনের নতুন ভাষ্যকারদের সমাজতন্ত্র কিন্তু এক জিনিস নয়। অধুনা কেউ কেউ বলে থাকেন,—মার্কস-বাদী না হলে নাকি সমাজতন্ত্রী হওয়া যায় না। সুভাষ কিন্তু তাঁদের সঙ্গে একমত নন। তাঁর বক্তব্য জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষের এই সমাজতন্ত্র কার্ল মার্কস-এর গ্রন্থ থেকে জন্মগ্রহণ করেনি। এর মূল উৎস হল—জীবসেবা এবং দরিদ্র-নারায়ণের উন্নয়ন সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা। সুভাষের নিজের ভাষায়ঃ

'Socialism in India did not derive its birth from the books of Karl Marx but from Swami Vivekananda's Gospel for the uplift of the poor or 'দরিদ্রনারায়ণ'।'

যাক, আগেকার কথায় ফিরে যাই। টোকিওর কাজ শেষ। এবার চীনের সাংহাই। সেখানেও বিরাট সংবর্ধনা এবং সেই সঙ্গে ভাষণ। সাংহাই থেকে তাইহোকু হয়ে সায়গন। ১৪ই ডিসেম্বর আবার সেই সিঙ্গাপুর।

১৭ই ডিসেম্বর সিঙ্গাপুরে বিরাট জনসভায় ভাষণ। ভারতবর্ষের এই স্বাধীনতা-সংগ্রাম একটা ছেলেখেলা নয়। এর সঙ্গে আটত্রিশ কোটি ভারত-

বাসীর ভাগ্য জড়িত। হয় স্বাধীনতা, নয়তো মৃত্যু—এর একটা আমাদের বেছে নিতেই হবে, তবু আপস কিছুতেই নয়।

দিন-কয়েক বাদেই আবার ঝটিকা-সফর। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে সন্দেহ নেই। তার জন্য অর্থ চাই, প্রচুর অর্থ। সে অর্থ সংগ্রহ করতে হলে তাঁর নিজের যাওয়া প্রয়োজন।

২২শে ডিসেম্বর মালয়ের রাজধানী কুয়ালালামপুর। একই দিনে সেলাংগড়ে অবস্থিত ইণ্ডিয়ান ওয়েলফেয়ার সেণ্টারের কাজকর্ম পরিদর্শন। সেখানে থেকে সুমাত্রা। প্রায় দশ লক্ষ ডলার সংগৃহীত হল সুমাত্রা থেকে। মালয় থেকে সংগৃহীত হল নব্বুই লক্ষ ডলার। আরো চাই। আধুনিক যুদ্ধ অত্যন্ত ব্যায়বহুল ব্যাপার। সুতরাং আরো চাই, অনেক চাই।

ওদিকে রাসবিহারী তখন মৃত্যুশয্যায়।

জীবনের একমাত্র সাধ ছিল, জন্মভূমিতে ফিরে এসে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন, সে সাধ তাঁর পূর্ণ হল না। তার আগেই একদিন ডাক এসে গেল ওপার থেকে। তোমার কর্তব্য শেষ। এবার তোমাকে বিদায় নিতে হবে পৃথিবী থেকে।

স্বাস্থ্য অবশ্য কিছুদিন ধরেই ভাল যাচ্ছিল না। বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে, জীবনদীপ নিভে আসছে ধীরে ধীরে। শেষ-বিদায়ের আগে কয়েকটা যন্ত্রণাময় দিন। তারই জন্য শুধু অপেক্ষা মাত্র।

মাঝে মাঝে জ্ঞান ফিরে আসে। কি যেন তখন ভাবেন মনে মনে। কাকে যেন বড় দেখতে ইচ্ছে করে। কে সেই লোক? কার ছবি মনের পর্দায় ফুটে উঠছে বার বার?

১৯১৫ সালে তাঁর নেতৃত্বে ভারতবর্ষে যে সেনা-বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল, সেইসব ঘটনায় ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ উৎসর্গকারী শহীদদের কথাই কি?

বসন্ত বিশ্বাস, বালমুকুন্দ, অবোধবিহারী, পিংলে, কর্তার সিং, হরনাম সিং, মৌলভী হাফিজ আবদুল্লা—এমনি কত নাম। কত ঘটনা। ভুলতে চাইলেও যে তাঁদের ভোলা যায় না।

জীবন-সঙ্গিনী তোসিকার কথাই কি ভোলা যায়! সংসারে সে শুধু দিয়েই গেছে, পায়নি কিছুই।

আর সুভাষ? সুভাষের খবর কি? প্রকৃতির অভিশাপে ইম্ফল থেকে ফিরে আসতে হলেও লড়াইতে নেমে থেমে যাবার পাত্র সে নয়। তার প্রচেষ্টা সার্থক হোক।

রাসবিহারী অসুস্থ।

খবর শুনে স্বয়ং জাপ-সম্রাট তাঁকে সম্মানিত করলেন জাপানের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'দি সেকেণ্ড অর্ডার অফ দি মেরিট' পদক দিয়ে। কোন বিদেশীকে এ পদক দিয়ে সম্মানিত করা জাপানের ইতিহাসে সেই ছিল প্রথম।

সম্রাট-প্রদত্ত সেই পদক নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ছুটে গেলেন লেঃ জেনারেল সিজু আরিসু। ভারতবাসী হলেও রাসবিহারী জাপানের

সর্বত্র পরিচিত একজন সত্যিকারের সেইন্ (শিক্ষক) বলে। এ সময়ে তাঁকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা তাদের জাতীয় কর্তব্য।

খবর শুনে দেখতে দেখতেই চোখদুটো জলে ভরে এল রাসবিহারীর। মাথা তোলার মত শক্তি ছিল না। তাই শুয়ে শুয়েই অতিকষ্টে বললেন—'ধন্যবাদ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে জাপানের এই সহযোগিতার জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।'

সবকিছুর পরিসমাপ্তি ঘটল ১৯৪৫ সালের ২১শে জানুয়ারি, টোকিওর সেই হাসপাতালে।

শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ালেন মহামান্য জাপ-সম্রাট। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শবাধার বহনের জন্য রাজশকট পাঠিয়ে দিলেন, যা কেবলমাত্র রাজ-পরিবারের লোকেদের জন্যই সীমাবদ্ধ। নিঃসন্দেহে এটাও একটা ইতিহাস। একমাত্র রাসবিহারী ছাড়া এ ধরনের সম্মান প্রদর্শনের আর দ্বিতীয় কোন নজীর নেই জাপানের ইতিহাসে।

মাথা নোয়ালেন সুভাষ। খবর পেয়েই তিনি পতাকা অর্ধনমিত করতে আদেশ দিলেন মহানায়কের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

মহৎকে শ্রদ্ধা করার মত মহত্ব সবার থাকে না। সে মহত্ব শুধু তাঁদেরই থাকে, যাঁরা নিজেরা মহৎ।

থাকিন নু (বর্মার পরবর্তী বিপ্লবী সরকারের প্রধানমন্ত্রী) তাঁদেরই একজন। কি অপরিসীম শ্রদ্ধাই না তাঁর প্রকাশ পেয়েছিল ছোট্ট একটি কথার মধ্য দিয়ে। বলেছিলেন ঃ

'স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেতাজী যদি গ্যারিবল্ডির সমকক্ষ হন, তবে রাসবিহারীর ভূমিকা নিঃসন্দেহে ম্যাটসিনির।'

'If Netaji came out in the light as Garibaldi of the movement, Rash Behari's part in the drama was more than that of a Mazzini.'

আর আমরা! 'আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতা-সংগ্রামে কার কতখানি অবদান, তাই নিয়ে মস্ত বড় ইতিহাস রচিত হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে।

কোথায় সেখানে রাসবিহারীর স্থান? দেশের ক'টি ছেলেমেয়ে জানে জীবনভোর তাঁর এই নিরলস সংগ্রামের কাহিনী? জানে কি কেউ?

'নব জীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে—
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে, বন্ধন হোক ক্ষয়।
তোমারি হউক জয়।'

—রবীন্দ্রনাথ

২৩শে জানুয়ারি। সুভাষের জন্মদিন।

গোটা রেঙ্গুনে সেদিন উৎসবের বন্যা। আজ ২৩শে জানুয়ারি। আজ আমরা সমপরিমাণ সোনা দিয়ে ওজন করব নেতাজীকে। তারপর সেই রত্ন সম্ভারের সবটাই আমরা তুলে দেব নেতাজীর হাতে।

কত সোনা সেদিন সংগৃহীত হয়েছিল রেঙ্গুনে! যা প্রয়োজন, তার দ্বিগুণেরও বেশি। 'Later on, more than double that quantity was collected.'

সুভাষ কিন্তু এটাকে সমর্থন করেননি মল্লিকা। কিন্তু সেকথা শোনে কে! ভাবটা এই যে, আমাদের নেতাজীকে আমরা যত খুশি সোনা দিয়ে ওজন করব, তাতে কার কি!

ব্রিটিশ ভাষ্যকার হিউ টয়-এর অভিমতও তাই। বলেছেনঃ '২৩শে জানুয়ারি খুব ঘটা করে সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন পালন করা হয়। খানিকটা তাঁর অমতেই তাঁকে সোনা দিয়ে ওজন করা হয়। টাকা ওঠে দুকোটি টাকার ওপর।'

৪ঠা ফেব্রুয়ারি 'সেনাবাহিনী দিবস'। সেদিনই সুভাষ তাঁর এক বিশেষ ঘোষণায় চ্যাটার্জী, ভোঁসলে, কিয়ানী এবং লোগনাথন—এই চারজনকে সম্মানিত করলেন মেজর জেনারেলের মর্যাদায়। অধিকন্তু বৈদেশিক মন্ত্রীর দায়িত্বও সেদিন থেকে তিনি চাপিয়ে দিলেন চ্যাটার্জীর ওপর।

আর শাহনওয়াজ খান, গুলজারা সিং, হবিবুর রহমান, আজিজ আহমেদ, জি. আর. নাগর এবং এস. এ. আলাগাপ্পন—এই ছ-জনকে করা হল লেঃ কর্ণেল থেকে পূর্ণ কর্ণেল। শোনা যায়, পরবর্তীকালে এঁদের মধ্যে আবার কেউ কেউ নাকি উন্নীত হয়েছিলেন মেজর জেনারেলের মর্যাদায়।

দুদিন বাদেই থাই-সরকারের বিশেষ আমন্ত্রণে ব্যাঙ্কক। সঙ্গে রইলেন কর্ণেল হবিবুর রহমান এবং প্রচারমন্ত্রী আয়ার সাহেব। সেবারের সেই রাষ্ট্রীয় সফরে সুভাষকে যে বিরাট সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল, থাইল্যাণ্ডের ইতিহাসে তা ছিল অভূতপূর্ব।

সেই সঙ্গে অর্থও সংগৃহীত হল প্রচুর। ভাণ্ডার পূর্ণ করে দিলেন শেঠ জগৎরাম চুনীলাল, চরণজিৎ রায় নাড়ুলা, মুলামল অমরনাথ প্রমুখ ব্যাঙ্ককের নামী ব্যবসায়ীবৃন্দ।

পূর্ব-সিদ্ধান্ত মত দিন কয়েকের মধ্যেই টোকিও কর্তৃক নিযুক্ত জাপ-রাষ্ট্রদূত মিঃ হাচাইয়া এসে হাজির। এবার হিজ এক্সেলেন্সী চন্দ্র বসুর সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার।

কিন্তু পরিচয়পত্র? এই যাঃ? ওটা তিনি টোকিওতে ফেলে এসেছেন ভুল করে। এখন উপায়?

না, কোন উপায় নেই। আগে টোকিও থেকে ওটা আনিয়ে নিতে হবে, তারপর সাক্ষাৎকার। তার আগে হিজ এক্সেলেন্সী চন্দ্র বোস কোনরকম সাক্ষাৎকারে রাজী নন। হাচাইয়ার নিজের ভাষায়ঃ

'I think he (Subhas Chandra Bose) refused to see me because I did not have any credentials with me. I sent a telegram to Tokyo asking for my credentials.

আবার যুদ্ধযাত্রা। আবার সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম।

প্রথম ডিভিশনকে আগেই তুমি লড়াই করতে দেখেছ ইম্ফল রণাঙ্গনে। এবার যাত্রা শুরু করবে দ্বিতীয় ডিভিশন। এ ডিভিশন পরিচালনা করবেন কর্ণেল আজিজ আহমেদ। লক্ষ্য তাঁদের—উত্তর-বর্মার বিভিন্ন অঞ্চল।

ইনটেলিজেন্স গ্রুপ এবং বাহাদুর গ্রুপের কাজ বেশ আশানুরূপভাবেই চলেছে। ব্রিটিশ ভাষ্যকারের মতেঃ 'শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে বেতারবাহী গুপ্তচর পাঠিয়ে যুদ্ধ-এলাকার খবর সংগ্রহের জন্য সুভাষচন্দ্র এক দূর-প্রসারিত গুপ্ত পরিকল্পনার সূত্রপাত করেন। উত্তর-বর্মায় মার্কিন পাইপ-লাইন ধ্বসিয়ে দেবার জন্য মেজর স্বামী তখন একটি বিশেষ দলকে তালিম দিচ্ছিলেন। তাছাড়া ভারতবর্ষে পাঠানো কয়েকজন গুপ্তচরের সঙ্গে তখনো তাঁর যোগা-যোগ ছিল।'

ভাবনা মেজর গারেওয়ালের মত বিশ্বাসঘাতকদের নিয়ে। স্বভাবতই আগের চাইতে সুভাষ এবার অনেক বেশি সতর্ক

যুদ্ধের সময়ে দলত্যাগ করা অত্যন্ত ঘৃণ্য অপরাধ। তাই প্রত্যেক সেনা-পতিকে এবার যুদ্ধযাত্রার আগে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, তার সেনাবাহিনীর প্রতিটি সৈনিক মানসিক দিক থেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। যদি কারো মনে এত-টুকুও দ্বিধা থাকে, তাহলে আগে থেকেই তাকে পেছনে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। তাতে তার সামরিক-জীবনের কোনরকম ক্ষতিই হবে না।

'Commanders were to certify as to the 'spiritual fitness' of their men before taking them into an operational area. Every soldier would be given the chance of staying behind if he did not think himself fit, and his doing so would not affect his military prospects.'

ইতিমধ্যে যুদ্ধ-পরিস্থিতি বেশ জটিল হয়ে উঠেছে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ফিরে আসার পরে স্বাভাবিক কারণেই তাদের সেই অধিকৃত অঞ্চল-গুলি আবার চলে গেছে শত্রুপক্ষের দখলে। অধিকন্তু ইতিমধ্যেই তারা বর্ডার পেরিয়ে এসে বেশ কয়েকটি শক্ত ঘাঁটি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে উত্তর-বর্মার

বিভিন্ন অঞ্চলে। বলাই বাহুল্য যে, এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। ব্রিটিশ এবং চিয়াংকাই-শেক পরিচালিত চীন সঙ্গে রয়েছে মাত্র।

আকাশ-পথেও তখন মার্কিন আধিপত্য বিদ্যমান। বলতে গেলে বর্মার গোটা আকাশটাই বুঝি তখন ছেয়ে গেছে মার্কিন বিমানের আবির্ভাবে। দিন-রাত্রি এখানে-ওখানে বোমাবর্ষণ চলছে তো চলছেই। কখন যে কোথায় এসে হানা দেবে, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

জাপানী বিমান-বহর প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মরণ-পণ সংগ্রামে লিপ্ত। এ অবস্থায় আকাশ-পথ খোলা পেয়ে শত্রুপক্ষ যে দুর্বার হয়ে উঠবে তাতে আর বিচিত্র কি।

ওদিকে ইয়োরোপের যুদ্ধ-পরিস্থিতিও রীতিমত জটিল হয়ে উঠেছে। ইতালি আগেই ডুবেছে। দীর্ঘদিন লড়াই চালিয়ে জার্মানীরও তখন দম ফুরিয়ে এসেছে। স্ট্যালিনগ্রাডের ভাগ্য-বিপর্যয়ের পরে আর কোথাও তারা দাঁড়াতে পারেনি লালফৌজের আক্রমণের কাছে।

সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯৪৪ সালের ৬ই জুন তারিখে মার্কিন সেনাপতি জেনারেল আইসেনহাওয়ারের নেতৃত্বে ফ্রান্সের নরম্যাণ্ডি উপকূলে ব্রিটিশ এবং মার্কিন বাহিনীর অবতরণ।

১৯৪২ সাল থেকে এই দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার জন্য রাশিয়া কম সাধ্য-সাধনা করেনি তার মিত্রপক্ষকে, কিন্তু উত্তরে একমাত্র প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই জোটেনি তাদের অদৃষ্টে। ভাবটা এই যে, 'যায় শত্রু পরে পরে।'

হিটলার শত্রু সন্দেহ নেই, কিন্তু রাশিয়াও এমন কিছু মিত্র নয়। সুতরাং, আগে দুপক্ষই লড়াই করে একটু ঘায়েল হোক, তারপর বখরা নেবার সময় দেখা যাবে। ফলে এতদিন রাশিয়াকে একাই যুদ্ধ চালাতে হয়েছে দুর্ধর্ষ নাৎসী বাহিনীর বিরুদ্ধে।

কিন্তু আজ ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেছে। লালফৌজ এখন বার্লিনের দ্বার-প্রান্তে। সুতরাং আর দেরী করা ঠিক নয়। নইলে যুদ্ধ জয়ের পরে রাশিয়া যে একাই গোটা ইয়োরোপকে গ্রাস করে ফেলবে না তা কে বলতে পারে?

এদিকে জাপানের অবস্থাও তখন আর খুব একটা ভাল বলা চলে না। ইতিমধ্যেই যে তার সামরিক শক্তিতে বেশ একটু ভাঁটা পড়েছে, একথা অনস্বীকার্য। কারণ অনেক। প্রথমত—বিমানবহরের স্বল্পতা। তাছাড়া যোগাযোগ ও সরবরাহ-ব্যবস্থার দুর্বলতা।

জাপান বহুদূরে অবস্থিত। সেখান থেকে অধিকৃত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সরবরাহ-ব্যবস্থা চালু রাখা সহজসাধ্য নয়। প্রায় অসম্ভবই বলা চলে। তার ফলে ইতিমধ্যেই জাপানকে তার অধিকৃত হাজার গণ্ডা দ্বীপের মধ্যে কয়েকটি আবার হারাতে হয়েছে মার্কিন সেনাপতি ম্যাক আর্থারের কাছে। এ অবস্থায় ক্রমবর্ধমান মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে আর কতদিন যে তারা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে, তা বলা মুস্কিল।

তা বলে সুভাষকে তো আর থামলে চলবে না। এ যুদ্ধে জাপানের লক্ষ্য, আর তাঁর নিজের লক্ষ্য এক নয়। জাপানের লক্ষ্য—এশিয়াকে বিদেশী শাসন-মুক্ত করা। সুভাষের লক্ষ্য--জাপানের সামরিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সেই সুযোগে নিজের মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচন করা। সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তাঁর বিশ্রামের অবকাশ কোথায়? জাপান সঙ্গে থাকে তো ভালই, নইলে একা হলেও লড়াই যে তাঁকে চালিয়ে যেতেই হবে।

বিপ্লবী কোনদিনও থামতে জানে না। তাই সুভাষকে তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এগিয়ে চলতেই হবে সারা জীবন। তারপর ভাগ্যদেবতাই শুধু বলতে পারেন, শেষ প্রান্তে তাঁর জন্য কি অপেক্ষা করে আছে। যাই থাক না কেন, সংসারে কতটুকু দিয়ে কতটুকু পেলাম—সেসব লাভ-লোকসানের হিসেব কষে সাবধানে পা ফেলার মত সময় তাঁর কোথায়! বোহিসেবী পথ চলাতেই যাঁর আনন্দ, তাঁর কাছে ঐ হিসেবের খাতাটা যে একেবারেই অর্থহীন।

দ্বিতীয় ডিভিশন প্রস্তুত। লক্ষ্য তার—পোপা হিল এরিয়া।

শুরুতেই বিভ্রাট। কথা ছিল, এ বাহিনী পরিচালনা করবেন কর্ণেল আজিজ আহমেদ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর সম্ভব হল না। তার আগেই তিনি একদিন গুরুতরভাবে আহত হলেন শত্রুপক্ষের বোমার আঘাতে। ফলে শাহনওয়াজ খান সাহেবকেই সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হল সুভাষের নির্দেশে।

বর্মার বিভিন্ন স্থানে মার্কিন বিমানের বোমাবর্ষণ তখন আর নতুন কিছু নয়। শুধু সামরিক লক্ষ্যবস্তুই নয়, সেই সঙ্গে হাসপাতাল, স্কুল, ধর্মস্থান, হাট-বাজার, লোকালয় কিছুই বুঝি সেদিন রেহাই পায়নি মার্কিন বিমানের হাত থেকে। দেখে মনে হত, যেন অকারণে ধ্বংস এবং প্রাণিহত্যা করাটা তাদের কাছে একটা খেলা মাত্র।

বিশেষভাবে তার প্রমাণ পাওয়া গেল মিয়াং হাসপাতালে বোমাবর্ষণ করার ব্যাপারে।

'হাসপাতাল' কথাটি বেশ বড় বড় অক্ষরেই লেখা ছিল, যা বারো-তেরো হাজার ফুট উঁচু থেকেও স্পষ্ট নজরে পড়ে। রেডক্রশ-চিহ্নও বাদ ছিল না। তা সত্ত্বেও প্রচলিত বিধি-নিষেধ ভঙ্গ করে সেদিন যেভাবে তারা আজাদী বাহিনীর সেই হাসপাতালটাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল, তা বোধহয় একমাত্র গণতন্ত্রের নতুন ভাষ্যকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব। অন্য যে কোন সভ্য রাষ্ট্র, এমনকি বহু-নিন্দিত খুনে ডাকাত হিটলারও যে এ-কাজে লজ্জা পেত, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

তারিখটা ছিল ১৯৪৫ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি, শনিবার। বেলা তখন ঠিক আড়াইটে।

শুরু হল বোমাবর্ষণ। একবার নয়, ঘুরে-ফিরে মোট ছ-বার। তাও সাধারণ বোমা নয়, আগুনে বোমা!

যুদ্ধের যা কিছু দায়-দায়িত্ব, যা কিছু অপরাধ, সব পরাজিত পক্ষের।

তাদের কোন বক্তব্য নেই। থাকতে পারে না। আবহমান কাল থেকে এই নিয়মই চলে আসছে।

আর বিজয়ী পক্ষ! না, তারা নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, সাধুপুরুষ মাত্র। তাদের কোন দোষ থাকতে নেই। কারণ, তারাই তখন সবকিছুর বিচারক। তাদের কাহিনী নিয়েই ইতিহাস রচিত হয় পরবর্তীকালে।

তা নইলে এই 'নির্ভীক মার্কিন'কে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করা যেত যে, কেন তারা সেদিন সবকিছু জেনেশুনে কতকগুলো রুগ্ণ, অর্ধমৃত, অসহায় মানুষকে এভাবে পুড়িয়ে মেরেছিল আগুনে বোমা ফেলে? কিন্তু এ যুদ্ধে তারা বিজয়ী পক্ষ, তাই প্রশ্নের সদুত্তর মিলবে না কোন-দিনও।

খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন সুভাষ। তারপরই সবকিছু অগ্রাহ্য করে ছুটে গেলেন রেঙ্গুন থেকে ছ-মাইল দূরবর্তী সেই মিয়াং হাসপাতালে। যুদ্ধক্ষেত্রে হতাহতের পেছনে তবু একটা যুক্তি আছে, কিন্তু সমস্ত সভ্য নীতি বিসর্জন দিয়ে এভাবে কতকগুলো অসহায় মানুষকে পুড়িয়ে মারার পেছনে কি যুক্তি থাকতে পারে?

এ যে নিছক পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়! কি পৌরুষ আছে এ কাজের মধ্যে? ভীরুতা বা কাপুরুষতা ছাড়া এ-কাজকে আর কিছু বলা যায় কি?

স্থির অপলক দৃষ্টিতে বহুক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে রইলেন সুভাষ। বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা। মুখে তারই প্রতিচ্ছায়া। কোথায় গেল মানুষের সহজাত মানবতা বোধ? কোথায় রইল এত গণতন্ত্রের বড়াই? এই যদি ওদের গণতন্ত্রের নিদর্শন হয়, তাহলে দস্যুতা আর কাকে বলে?

কালবিলম্ব না করে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আহতদের জন্য একটি হাস-পাতালে পাঠিয়ে দিলেন সুভাষ।

তারপর রোজই সেখানে চলে যেতেন সেই অসহায় মানুষগুলোকে দেখতে। দুবার তো বটেই, তিনবারও যেতেন কোন কোন দিন। ফিরে আসতেন অত্যন্ত বিমর্ষভাবে—দুঃসহ একটা ব্যথা বুকে নিয়ে। বরাবরই সবাইকে নিয়ে গল্প-গুজব করে খেতে ভালবাসতেন, কিন্তু সেদিন থেকে সেই মানুষটা যেন কোথায় হারিয়ে গেল। বলতেন, 'খাবারটা ওপরে পাঠিয়ে দাও।' বেশ বোঝা যেত, নিজেকে তিনি সবার কাছ থেকে আড়াল করতে চান। চান একটু নির্জন একাকিত্ব।

তবে প্রচার-সচিব আয়ার সাহেব কিন্তু আজো আশাবাদী। তাই এখনো তিনি বিশ্বাস করেন যে, একদিন না একদিন আমেরিকা বিশ্ববাসীর কাছে ঠিকই জবাব দেবে যে, কেন সেদিন তারা প্রচলিত নিয়ম অগ্রাহ্য করে এমন নৃশংসভাবে আগুনে বোমা ফেলেছিল মিয়াং হাসপাতালে?

'I am still hoping that one day the Americans will tell the world the real reason for their blasting and burning the I. N. A. Hospital in Myang (Rangoon) on Saturday, 10th February, 1945.'

জবাব তারা ঠিকই দিয়েছিল। দিয়েছিল কোরিয়া, ভিয়েতনাম আর কম্বোডিয়াতে। সে ইতিহাস তো গোটা বিশ্ববাসীই জানে।

এই শেষ নয় মল্লিকা। এর পরেও হাসপাতালের উপর বোমা-বর্ষণ করা হয়েছিল ইচ্ছাকৃতভাবে। তারিখটা ছিল ১০ই এপ্রিল। তবে সেবার আর মার্কিন বিমান নয়। হিটলারের দস্যুতার বিরুদ্ধে যাদের কণ্ঠ ছিল সবচাইতে বেশি সোচ্চার, সেই ব্রিটিশ বিমানই সেদিন অংশগ্রহণ করেছিল হাসপাতাল ধ্বংসের অভিযানে।

কিন্তু পৃথিবীর মানুষ কি বিশ্বাস করবে একথা ? বোধহয় না। বিজয়ী পক্ষ যে !

ইতিমধ্যে যুদ্ধ-পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠেছে।

শত্রুপক্ষ মান্দালয় দখল করতে সক্ষম হয়েছে। তার পরই তারা মান্দালয় মিকটিলা-রেঙ্গুন সড়ক ধরে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে দক্ষিণ দিকে। লক্ষ্য, ইরাবতী নদী পেরিয়ে এপারে আসা।

সামরিক দিক থেকে মিকটিলার গুরুত্ব অসাধারণ। মিকটিলা শুধু বিখ্যাত রেলওয়ে জংশনই নয়, অন্যান্য যানবাহন পথেরও সংযোগস্থল। মিকটিলা শত্রুপক্ষের হাতে চলে গেলে পরিস্থিতি যে আরো ঘোরালো হয়ে উঠবে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

ডিভিশনাল কম্যাণ্ডার শাহনওয়াজ খানের নির্দেশে ৪নং গেরিলা রেজিমেণ্ট (নেহরু ব্রিগেড) নিয়ে দ্রুত ছুটে গেলেন মেজর জি. এস. ধীলন। সঙ্গে মাত্র বারোশ' সৈন্য। ভারী অস্ত্রশস্ত্র নেই বললেই চলে। তবু তাঁর এক প্রতিজ্ঞা—ওদের আমরা রুখবই। কিছুতেই আমরা ওদের আসতে দেব না নদীর এপারে।

যথাসময়ে নদীর এপারে অবস্থিত নিওগুতে পেঁাছে গেলেন মেজর ধীলন। কিন্তু না, অসম্ভব। মাত্র বারোশ' সৈন্য নিয়ে এই দীর্ঘ বারো মাইল বিস্তৃত নদীতীর রক্ষা করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তা বলে হাল ছাড়লে তো আর চলবে না। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে ! দেখাই যাক না।

কিন্তু এভাবে এক জায়গায় জড়ো হয়ে থাকাটা ঠিক নয়। ৭নং ব্যাটেলিয়ান নিয়ে লেঃ হরিরাম চলে যাক ন্যানগুতে। আর ৯নং ব্যাটেলিয়ান নিয়ে লেঃ চন্দ্রভান মহড়া নিক পাগান অঞ্চলে। ৮নং ব্যাটেলিয়ান আপাতত রিজার্ভ থাক পেছনের দিকে।

ঐ যে ওরা নদীর ওপারে এসে গেছে। ঐ যে ওরা বড় বড় কামান বসাতে শুরু করছে। হুঁশিয়ার ভাইসব, হুঁশিয়ার ! আমরা নেতাজীর আজাদী সৈনিক, একথা ভুলো না যেন।

শুরু হল ওপার থেকে একটানা গোলাবর্ষণ। দিনে-রাত্রে সর্বক্ষণ। বিশেষ করে পাগানে, যেখানে লেঃ চন্দ্রভান ঘাঁটি আগলে রয়েছেন সামান্য কিছু আজাদী সৈনিক নিয়ে।

লেঃ চন্দ্রভান অটল অনড়। গোলাবর্ষণের আড়ালে ঐ যে ওদের বিখ্যাত ইস্ট ল্যাঙ্কাসায়ার সৈন্যরা মোটরবোটে করে এপারে এগিয়ে আসছে একটু একটু করে। আসুক না! আর একটু আসুক! হ্যাঁ, এইবার। চার্জ মেশিনগান। ঝাঁঝরা করে দাও সবাইকে।

এমনি করে বার বার। তখনো লেঃ চন্দ্রভানের সেই একই চেহারা। আসুক না ওরা! ভারী কামান না থাকলেও মেশিনগান তো আমাদের রয়েছেই। তাহলে যাবে কোথায়?

জোর আক্রমণ চালানো হল ১২ই ফেব্রুয়ারি রাত্রে, কিন্তু ফল হল আরো শোচনীয়। মোট কত শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের যে সেদিন সলিল সমাধি হল তার বোধহয় কোন গোনা-গুন্‌তি নেই।

স্বীকার করেছেন ব্রিটিশ ভাষ্যকার হিউ টয়। 'হ্যাঁ, সেদিন আমরা খুবই মার খেয়েছিলাম ওদের হাতে। দেখতে দেখতে বেশ কিছু নৌকো স্রোতের টানে ভেসে যেতে লাগল বেসামাল হয়ে। পাশেই পড়ল আই. এন. এ.-র ট্রেঞ্চ। তাদের নিশানা ব্যর্থ হল না। কিছু কিছু নৌকো পশ্চিমতীরে ফিরে যেতে পারলেও এবং অনেকে সাঁতার কেটে পালালেও বহু লোক হতাহত হয়।'

'Many of the boats were soon out of control and drifting downstream past the I. N. A. trenches for which they made perfect targets. There were many casualties, although some of the craft returned to the western bank and many men escaped by swimming.'

এ তো গেল লেঃ চন্দ্রভানের অতুলনীয় বীরত্বের কথা। আর লেঃ হরিরাম! তাঁর কি হলো? সেকথা বলব আরো পরে।

এবার সেনানায়কদের মধ্যে কে-কোথায় পজিশন নিয়েছেন দেখে নাও। মেজর জি. এস. ধীলন ঘাঁটি আগলে রয়েছেন নিওগুতে। কর্নেল পি. কে. সেইগল পাঁচহাজার ফুট উঁচু মাউন্ট পোপাতে। আর ডিভিশনাল কম্যান্ডার মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান—মান্দালয় থেকে দুশ' মাইল দূরবর্তী পাইনমানাতে।

১৪ই ফেব্রুয়ারি সুভাষ নিজে গিয়ে হাজির হলেন পাইনমানাতে। উদ্দেশ্য—নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করে যুদ্ধরত আজাদী বাহিনীকে উৎসাহ দেওয়া।

২০শে ফেব্রুয়ারি ভোরবেলা ইন্দোগাঁয়ে। সঙ্গে নিজস্ব স্টাফ এবং শাহনওয়াজ খান সাহেব।

আর মাত্র বিশ মাইল, তারপর যোগাযোগ রক্ষার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জংশন সেই মিকটিলা।

আপাততঃ এখানেই যাত্রা-বিরতি। বিমান-হানার জন্য দিনের আলোতে পথচলার উপায় নেই। তাই আবার যাত্রা শুরু হবে সন্ধ্যার পর।

সহসা একটা মারাত্মক খবর পাওয়া গেল নিওঙ্গু রণাঙ্গন থেকে। শত্রু-পক্ষ ইরাবতী নদী পেরিয়ে নিওঙ্গু রণাঙ্গনের ব্যূহ ভেদ করতে সক্ষম হয়েছে। পরবর্তী লক্ষ্য তাদের—মিকটিলা। আজাদী বাহিনীর বহু জওয়ানকে প্রাণ দিতে হয়েছে তাদের এই অগ্রগতির ফলে। ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে প্রচুর।

কি করে এটা সম্ভব হল? কি করে ওরা মেজর ধীলন, লেঃ চন্দ্রভানের মত বীর যোদ্ধাদের পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হল? কি এর কারণ?

কারণ, মেজর গারেওয়ালেরই সগোত্র ৭নং ব্যাটেলিয়ান কম্যাণ্ডার লেঃ হরিরামের বিশ্বাসঘাতকতা। মেজর গারেওয়ালের মতই তিনি একফাঁকে ব্রিটিশ শিবিরে পেঁছে গেছেন জরুরী কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে। একমাত্র তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই আজাদী বাহিনীকে এভাবে পিছু হটতে হয়েছে নিওঙ্গু থেকে।

হ্যাঁ, তাই। ব্রিটিশ মুখপাত্রও স্বীকার করেছেন একথা। বলেছেন: 'প্যাগানে নদী অতিক্রমের ব্রিটিশবাহিনীর প্রাথমিক চেষ্টা সফল হয়নি। আবার যখন নদী পার হবার তোড়জোড় চলছে, তখন তারা দেখতে পেল, একটা নৌকো সাদা নিশান উড়িয়ে এগিয়ে আসছে। নৌকোয় ছিল আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ছ-জন প্রতিনিধি। তারা জানাল যে,—তারা আত্মসমর্পণ করতে চায়!...বাকী সৈন্যদের নিয়ে মিকটিলার পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে নতুন এলাকা কিওকপাদাং-এ পিছু হটে যাওয়া ছাড়া ধীলনের আর গত্যন্তর রইল না।'

হ্যাঁ, এইভাবে সেদিন লেঃ হরিরাম নৌকো করে গিয়ে স্বেচ্ছায় আত্ম-সমর্পণ করেছিলেন তাঁর গুটিকয়েক অনুচর সঙ্গে নিয়ে। নইলে ধীলনকে হটানো সেদিন এত সহজ ছিল না নিওঙ্গু থেকে।

এটা নতুন কিছু নয় মল্লিকা। মোহন সিং-এর আমলে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু মহাবীর সিং এর কথা তোমাকে আগেই বলছি। তারপর মেজর গারেওয়াল। এবার লেঃ হরিরাম।

সেই লোভ। সেই উচ্চাশা। জীবনে বড় হতে হবে। উন্নতি করতে হবে। তার জন্য দরকার হলে বেইমানী পর্যন্ত করতে হবে। আসল মালিক তো ইংরেজ সরকার। তিনি একটু সদয় হলে উন্নতি আর ঠেকায় কে!

মনে পড়ে মরমী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের একটি স্মরণীয় উক্তি—'পরাধীন দেশের সবচাইতে বড় অভিশাপ এই যে, মুক্তি সংগ্রামে বিদেশীদের অপেক্ষা, দেশের লোকদের সঙ্গেই মানুষকে বেশি লড়াই করতে হয়।'

সত্যিই তাই। নইলে মাত্র কয়েক লক্ষ ইংরেজের সাধ্য কি এতবড় ভারত-বর্ষকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পদানত করে রাখে! তা সম্ভব হয়েছিল কতকগুলি ঘৃণ্য দেশদ্রোহীর জন্যই। ধূর্ত ইংরেজ ভাল করেই জানত যে, কি করে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়। এ ব্যাপারে হিসেবে তাদের এতটুকুও ভুল হয়নি।

শুধু ইংরেজ কেন, শক, হুন, মোগল, পাঠান কেউ তাদের চিনতে ভুল করেনি। করেনি বলেই ভারতবর্ষ এমনি করে বিদেশীদের পদানত হয়েছে বার বার। তার প্রতিটি উত্থান-পতনের আড়ালে রয়েছে এই ঘৃণ্য বিশ্বাস-ঘাতকতার কাহিনী। ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনেকগুলো পাতাই যে এমনি বিশ্বাসঘাতকতার কালিমায় ভরা।

এদিকে খবর শুনে একটা বিস্মিত আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেলেন সুভাষ। তাঁর এতদিনের চেষ্টায় গড়ে তোলা এই প্রয়াসকে বার বার ব্যর্থ করে দেবে কিনা বিদেশীর পদলেহী কতকগুলো ঘৃণ্য দেশদ্রোহীর দল! কিন্তু কেন? যারা দুর্বলচিত্ত, যারা ভীরু-কাপুরুষ, তাদের তো পিছিয়ে থাকার জন্য সব-রকম সুযোগই দেওয়া হয়েছিল। তাহলে কেন বার বার এই ঘৃণ্য বিশ্বাস-ঘাতকতা?

না, আর নয়। কিছুতেই আর এসব বরদাস্ত করা হবে না। এ ব্যাপারে যথেষ্ট দৃঢ় না হলে তাঁর চলবে না। বাধ্য হয়েই এক বিশেষ হুকুমনামা তিনি জারী করলেন আজাদী সরকারের প্রধান হিসেবে:

'এখন থেকে আই. এন. এ.-র যে কেউ,—কোন অফিসার, এন. সি. ও. বা সৈনিককে কাপুরুষোচিত আচরণ বা বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখলে তাকে গ্রেপ্তার অথবা গুলী করতে পারবে।'

'Every member of the I. N. A. Officer, N. C. O. or Sepoy —will in future be entitled to arrest any other member of the I. N. A., no matter what his rank may be, if he behaves in a cowardly manner, or to shoot him if he acts in a treacherous manner.'

মর্মাহত সুভাষ তক্ষুণি ইন্দোগাঁ ত্যাগ করে পা বাড়ালেন মিকটিলার দিকে। সঙ্গে নিজস্ব স্টাফ, বিশজন দেহরক্ষী আর ডিভিশনাল কম্যান্ডার শাহনওয়াজ খান সাহেব।

দিনের আলোতে পথচলা বিপজ্জনক সন্দেহ নেই, তবু এর পরে এখানে থাকার আর কোন অর্থ হয় না। যে করে হোক, মিকটিলা এবং পোপা হিল এরিয়ায় গিয়ে শত্রুপক্ষের অগ্রগতিকে রোধ করার ব্যবস্থা করতেই হবে। তাছাড়া কোন উপায় নেই।

সন্ধ্যায় মিকটিলা। পরিস্থিতি সত্যিই গুরুতর। নিওংগু, পাগান ও পেকোকাউ, মাউণ্ট পোপা, প্রতিটি অঞ্চলে তখন ঘোরতর যুদ্ধ চলেছে দুপক্ষের মধ্যে। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও শত্রুপক্ষ কয়েক জায়গায় ইরাবতী নদী অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। ইতিমধ্যেই তারা অগ্রসর হতে শুরু করেছে মিকটিলার দিকে। শেষ পর্যন্ত কি হবে বলা শক্ত।

বোঝাতে চেষ্টা করলেন শাহনওয়াজ খান সাহেব। নেতাজীর এখন এখানে থাকাটা মোটেই ঠিক নয়। মাউণ্ট পোপায় যাওয়াও উচিত হবে না। কারণ, সেখানেও এখন ঘোরতর যুদ্ধ চলছে দুপক্ষের মধ্যে।

সুভাষ তা মানতে রাজী নন। বরং এ সময়েই তিনি আরো বেশি করে থাকতে ইচ্ছুক আজাদী সৈনিকদের মাঝে। ওরা যদি প্রাণ দিতে পারে তাহলে আমিই বা পারব না কেন? তফাৎটা কোথায়?

সবাই মিলে বোঝানোর পরে শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন সুভাষ। তবে এক শর্তে। আগে শাহনওয়াজ খান গিয়ে পোপার অবস্থা দেখে আসবেন নিজের চোখে। অবস্থা অনুকূল মনে হলে পরে তিনি সেখানে যাবেন সবাইকে নিয়ে।

২১শে ফেব্রুয়ারি শাহনওয়াজ খান রওনা দিলেন সুভাষের মিলিটারী সেক্রেটারী মহবুব আহমেদকে সঙ্গে নিয়ে। প্রথমেই কিওকপাডাং এরিয়াতে গিয়ে একটি চিঠি দিলেন ধীলনের হাতে। এই নাও ভাই নেতাজীর চিঠি।

চিঠি পড়ে লজ্জায়, দুঃখে, আত্মগ্লানিতে যেন মরে গেলেন মেজর ধীলন। নেতাজী লিখেছেন ঃ

'দুঃখ বেদনা ও লজ্জার সঙ্গে লেঃ হরিরাম এবং অন্যান্যদের বিশ্বাস-ঘাতকতার কথা শুনলাম। আমি আশা করি, ৪র্থ রেজিমেণ্টের সৈন্যরা নিজের রক্ত দিয়ে আই. এন. এ.-র এই কলঙ্ক মোচন করবে।'

কয়েকটা স্তব্ধ মুহূর্ত। তারপরই সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মেজর ধীলন। সারা মুখে তাঁর দৃঢ় সংকল্পের রেখা। বেইমান হরিরাম তাঁরই অধীনস্থ অফিসার। এ লজ্জা তাঁর নিজের। তাঁর গোটা রেজিমেণ্টের। সুতরাং নেতাজীর কথামত রক্ত দিয়েই আমাদের সবাইকে এ কলঙ্ক মোচন করতে হবে। পণ করলেন। [স্থান?]

পঞ্চনদের যোদ্ধা ধীলন কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞা ভোলেননি মল্লিকা। সেকথা তোমাকে বলব আরো পরে।

২৫শে ফেব্রুয়ারি কর্ণেল সেইগলের সঙ্গে দেখা করে পোপা থেকে ফিরে এলেন শাহনওয়াজ খান সাহেব। না, পরিস্থিতি মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। এ সময়ে নেতাজীর পক্ষে কিছুতেই ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না।

মিকটিলাও আর নিরাপদ নয়। দূর থেকে কামান-গর্জন ভেসে আসছে থেকে থেকে। বেশ বোঝা যায় যে, শত্রুপক্ষ ক্রমেই এগিয়ে আসছে মিকটিলার দিকে। সুতরাং নেতাজীর উচিত—অবিলম্বে মিকটিলা ত্যাগ করে অন্যত্র সরে যাওয়া।

একই বক্তব্য এ. ডি. সি. রাওয়াৎ এবং মিলিটারী সেক্রেটারী কর্ণেল মেহবুবের। নেতাজীর আর এখানে থাকাটা ঠিক নয়। এখুনি তাঁর অন্যত্র সরে যাওয়া উচিত।

শেষ খবর জানা গেল জনৈক জাপানী অফিসারের মুখে। পরিস্থিতি খুবই খারাপ। শক্তিশালী ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া বাহিনী পাইনবিন অধিকার করে ক্রমশ এগিয়ে আসছে মিকটিলার দিকে। হিজ এক্সেলেন্সীর উচিত এক্ষুণি পাইনমানায় সরে যাওয়া। সেখানে আই. এন. এ.-র একনম্বর ডিভিশন রয়েছে। প্রয়োজন হলে তারা যুঝতে পারবে। কিন্তু এখানে

ডিফেন্সের কোন ব্যবস্থাই নেই। ভরসা বলতে মাত্র বিশজন দেহরক্ষী। শক্তিশালী ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া বাহিনীর কাছে ওদের সামান্য রাইফেল আর কতক্ষণ!

সুভাষ অটল, অনড়। পোপা আমি যাবই। আজাদী সৈনিকরা যেখানে প্রাণ দিচ্ছে, সেখানে তাদের ফেলে পেছনে সরে যেতে আমি রাজী নই।

'নেতাজী, আপনি বড় স্বার্থপরের মত কাজ করছেন।' একটা অশুভ আশংকায় বুকটা দুলে ওঠে শাহনওয়াজ খানের, 'এভাবে নিজের জীবন বিপন্ন করার কোন অধিকার আপনার নেই। আপনার জীবন আপনার একার নয়, গোটা ভারতবর্ষের। আপনাকে আমি এভাবে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারিনে। একবার ভেবে দেখুন যে, যদি আপনার ভালমন্দ কিছু হয়, তখন আজাদ হিন্দ্ ফৌজ বা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অবস্থা কি হবে।'

'আমাকে বলে কোন লাভ নেই শাহনওয়াজ।' হাসলেন সুভাষ, 'যাওয়া যখন ঠিক করেছি, তখন আমি যাবই। কিছু ভেব না। সুভাষ বোসকে মারতে পারে, এমন বোমা ব্রিটিশ আজো তৈরী করতে পারেনি।'

সেই আত্মবিশ্বাস, যা আমরা সুভাষের জীবনে দেখে আসছি বার বার। এ বিশ্বাস থেকে কে তাঁকে টলাবে বলো?

কিন্তু না, এ সময়ে তাঁকে পোপায় যেতে দেওয়া চলে না।

পরিস্থিতি সত্যিই গুরুতর। এ অবস্থায় জেনে-শুনে তাঁকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কিন্তু উপায় কি? উনি যে কারো কোন যুক্তিই শুনতে রাজী নন'

উপায় ঠাওরালেন এ. ডি. সি. মেজর রাওয়াৎ। এ পরিস্থিতিতে কোন-রকমেই দিনের আলোতে পথ চলা সম্ভব নয়। রাত এখন দুটো বাজে। কোনরকমে আর ঘণ্টা দুয়েক দেরী করিয়ে দেওয়া যায় না! দেখাই যাক না চেষ্টা করে!

ড্রাইভারকে একটা ইসারা করে তক্ষুণি টাইপরাইটার নিয়ে বসে গেলেন রাওয়াৎ। একটা জরুরী চিঠি টাইপ করা দরকার। নেতাজীর নির্দেশ তাই।

কিন্তু না, হল না। শুধু ভুল আর ভুল। আগাগোড়াই ভুল। আবার টাইপ করতে হবে। আবার ভুল। নাঃ! কোন উপায় নেই। বড্ড জ্বালাচ্ছে অজ মেসিনটা।

ওদিকে গাড়িটাও বিগড়ে বসেছে। কিছুতেই যেন স্টার্ট নিচ্ছে না। ইঞ্জিনটায় কি হয়েছে কে জানে! বনেট্‌টা একবার খুলে দেখতে হয়।

অপেক্ষা করে করে ক্রমশঃ অধৈর্য হয়ে উঠলেন সুভাষ, কিন্তু উপায় কি? গাড়ি ছাড়া তো আর এত দূর পথ যাওয়া চলে না।

কাণ্ড দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন শাহনওয়াজ খান সাহেব। যাক, ভোর হয়ে গেছে। অন্ততঃ একটা দিনের জন্য তো নিশ্চিন্ত। তারপর ভেবে-চিন্তে যা হয় করা যাবে।

বাঁচিয়ে দিল মেজর জেনারেল কিয়ানী-প্রেরিত একটি টেলিগ্রাম। নেতাজীর অবিলম্বে রেঙ্গুন চলে আসা প্রয়োজন। জরুরী দরকার।

কিন্তু যাওয়ার পথ কোথায়? খবর দিলেন জাপানী লিয়াসোঁ অফিসার, না, কোন পথ নেই। শত্রুপক্ষের সাঁজোয়া বাহিনী দশমাইল দূরবর্তী মাহ্-লেয়িং পর্যন্ত এসে গেছে। মিকটিলা-মান্দালয়-ক্যায়ুকপাডাং সড়কও ওরা বন্ধ করে দিয়েছে। যে কোন মুহূর্তে মিকটিলার পতন হওয়াটা মোটেই বিচিত্র নয়।

কি করা যায় এখন? দুটো পথ খোলা আছে। এক—এখানে থেকেই যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করা, আর বেষ্টনী ভেঙে রেঙ্গুন ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করা।

পরেরটাই ভাল। এই সামান্য লোকবল নিয়ে সাঁজোয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার কোন অর্থই হয় না। তার চাইতে দেখা যাক, ওদের ব্যূহ ভেদ করে রেঙ্গুনে ফিরে যাওয়া যায় কিনা। শাহনওয়াজ খানের ভাষায়ঃ

'দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা সবাই প্রস্তুত হয়ে নিলাম। যতটা সম্ভব হাতবোমা ও গুলী-গোলা গাড়িতে তুলে নিলাম। আশা অবশ্য খুবই কম, তা বলে পিছিয়ে গেলে তা আর চলবে না। আমরা কেউ কোন কথা বলছিলাম না, কিন্তু প্রত্যেকেই জানতাম আর সবাই কি ভাবছেন।

নেতাজীর কোলের উপর রইল একটা গুলী-ভর্তি টমীগান। রাজুর কাছে দুটি হাতবোমা। জাপানী অফিসারের হাতে আর একটা টমীগান। আমার হতে গুলী-ভর্তি একটা ব্রেনগান। এমনভাবে আমরা সবাই তৈরী হয়ে রইলাম যে, দরকার হলে একসঙ্গে যেন গুলী চালাতে পারি। জাপানী অফিসার গাড়ির পাদানির উপর দাঁড়িয়ে রইলেন। ওখান থেকে কোন শত্রু বিমান আসে কিনা তিনি তা লক্ষ্য করবেন। নেতাজী ও আমি পেছনে বসে রাস্তার দুদিকে দৃষ্টি রাখলাম।

প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে আমরা ইন্দোগাঁয়ে এসে হাজির হলাম। গ্রামটি মিকটিলা থেকে প্রায় বিশমাইল দক্ষিণে। খুবই আশ্চর্য বলতে হবে—এই চল্লিশ মিনিট মোটরে আসতে আমাদের একটিও শত্রু-বিমান চোখে পড়েনি। রাস্তাও কোথাও বন্ধ দেখতে পাইনি।

আমরা গাঁয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই শত্রুপক্ষের জঙ্গী-বিমান এসে গোটা গ্রামটার উপর মেসিনগান চালাতে লাগল। অল্পের জন্য আমরা মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলাম। বিমান থেকে বোমাবর্ষণ ও মেসিনগানের গুলী চালানোর সম্মুখীন যে না হয়েছে, সে বুঝবে না খোলা জায়গায় বা মাঠে জঙ্গী-বিমানের দ্বারা আক্রান্ত হবার অর্থ কি। এসব জঙ্গী-বিমানের কোন কোনটায় বারোটা পর্যন্ত মেসিনগান ছিল।

এ সময়ে ইন্দোগাঁ এবং মিকটিলার পার্শ্ববর্তী অন্যান্য গ্রামগুলি শত্রু-পক্ষের গুপ্তচরে ভরে গিয়েছিল। এসব চিন্তা করে নেতাজীকে আমি গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নেবার জন্য অনুরোধ করলাম। প্রথমে আমরা

গ্রামের কাছেই একটা সিজ-মনসার ঝোপের মধ্যে আশ্রয় নিলাম। খানিক বাদেই একটা লোক এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে জায়গাটা ভাল করে দেখে গেল। কেমন যেন সন্দেহ হল। কোন গুপ্তচর নয় তো?

তাড়াতাড়ি নেতাজীকে নিয়ে মাইলখানেক দূরে অন্য একটা জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দুটি শত্রু-বিমান এসে আগেকার সেই সিজ-মনসার ঝোপের উপর খুব নীচু হয়ে বার বার কি যেন খুঁজতে লাগল। লোকটি যে সত্যিই গুপ্তচর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না।

সেদিনটা আমরা জঙ্গলেই কাটালাম। শেষের দিকে বড্ড খিদে পেয়েছিল। আমি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটা ক্ষেতে গিয়ে কিছু ছোলা নিয়ে এলাম। তাই খেয়েই আমাদের সারাদিন কেটে গেল।

সেদিন আকাশে অনেক শত্রু বিমান টহল দিচ্ছিল, কিন্তু সৌভাগ্যের কথা যে, তারা আমাদের দেখতে পায়নি। বিমান-আক্রমণ এবং কামানের গোলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য ইতিমধ্যে আমি একটা ছোট পরিখা খুঁড়ে ফেলেছিলাম। একবার কয়েকটি শত্রু-বিমান এসে আমরা যেখানে আশ্রয় নিয়েছিলাম তার চারধারে নীচু হয়ে ঘুরতে লাগল।

আমরা সেই ছোট পরিখায় আশ্রয় নিলাম। হঠাৎ দেখি, মস্ত বড় একটা বিষধর কালো বিছে পরিখার গা বেয়ে নেতাজীর গলার ঠিক এক ইঞ্চির মধ্যে এসে পড়েছে। নেতাজী নিজেও ওটাকে দেখতে পেয়েছিলেন, কিন্তু শত্রু-বিমান দেখতে পাবে এই আশঙ্কায় একটি বারের জন্যও তিন নড়লেন না। আমাদের খুঁজে না পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই শত্রু-বিমান অন্য একটা ঝোপের দিকে চলে গেল। তখন আমরা সেই বিছেটাকে মেরে ফেললাম।'

২রা মার্চ আবার তার এল রেঙ্গুন থেকে। নেতাজীর অবিলম্বে রেঙ্গুনে চলে আসা প্রয়োজন। খুবই জরুরী ব্যাপার।

সুভাষকে রেঙ্গুনে পৌঁছে দিয়ে শাহনওয়াজ খান আবার ফিরে গেলেন তাঁর ২য় ডিভিশনের হেড কোয়ার্টার্সে। সেদিনের সেই বিদায়কালীন মর্মস্পর্শী দৃশ্যের কথা ব্যক্ত করার ভার আমি তাঁর উপরই ছেড়ে দিলাম:

'১৯৪৫ সালের ৭ই মার্চ সন্ধ্যাবেলা আমরা রেঙ্গুন পরিত্যাগ করলাম। যাত্রা করার আগে আমি একবার সমস্ত স্টাফ অফিসারদের নিয়ে নেতাজীকে বিদায়-অভিবাদন জানাতে গেলাম।

সেদিন আমরা নেতাজীর সাথে একসঙ্গে বসে আহার করলাম। আহারের পর নেতাজী আমাদের বললেন—আমি জানি, যুদ্ধে আমরা হেরে যাচ্ছি, কিন্তু তার জন্য আমাদের নিরুৎসাহ হবার কিছু নেই। ভারতবর্ষের সম্মান বজায় রাখবার জন্য যুদ্ধ আমাদের চালিয়ে যেতেই হবে। আজাদ হিন্দ ফৌজের অতি সঙ্কটময় অবস্থায় তোমরা যুদ্ধের ভার গ্রহণ করেছ, এটা কম গৌরবের কথা নয়। ফৌজের মান-মর্যাদা এখন তোমাদের হাতে। আমি বিশ্বাস করি—যে দায়িত্ব তোমরা গ্রহণ করেছ, নিজেদের কাজের মধ্যে দিয়েই প্রমাণ করবে যে, তোমরা ঐ দায়িত্ব বহনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

আমি আমার স্টাফ অফিসারদের পক্ষ থেকে নেতাজীকে আশ্বাস দিয়ে বললাম—আপনি আমাদের বিশ্বাস করুন নেতাজী। কোন অবস্থাতেই আমরা ভারতের মর্যাদা ক্ষুন্ন হতে দেব না। কথা দিলাম।

আমাদের বিদায় দেবার জন্য তিনি বারান্দার সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখে তখন জল। হয়তো ভাবছিলেন, যে বিপদসংকুল পথে আমরা যাত্রা করেছি, তাতে আর হয়তো আমাদের সঙ্গে তাঁর কোনদিনও দেখা হবে না।'

আর ধীলন! পঞ্চনদের বীর যোদ্ধা সেই ধীলনের কি হল!

ব্রিটিশ মুখপাত্র হিউ টয় অবশ্য একটি মাত্র লাইনের মধ্যেই ধীলন্ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন। বলেছেন—'১৫ই থেকে ১৭ই মার্চ ধীলনের রেজিমেণ্ট দাঁতে দাঁত দিয়ে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে এবং এই সংঘর্ষে দলের প্রচুর সৈন্য হতাহত হয়।'

ব্যস, এইটুকুই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ শেষ পর্যায়ে যে লড়াই চালিয়েছিল, সেখানে ধীলনের অবদান মোটেই তুচ্ছ ছিল না।

তারিখটা ভুল করেছেন হিউ টয়। আসলে ওটা হবে ১১ই মার্চ। ঐদিনই ধীলন টাউঙ্গাজিন দখল করেছিলেন বীর-বিক্রমে আক্রমণ চালিয়ে। এবং কখন!

যখন বেতার যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা ছিল না, নিওঙ্গুরে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ও ক্ষয়-ক্ষতির কোন পূরণ হয়নি, হেড কোয়ার্টার্সের সঙ্গে রেজি-মেণ্টের কোন টেলিফোন-সংযোগ ছিল না, এমন কি রেজিমেণ্ট হেড কোয়ার্টার্সে সামান্য একজন সংবাদবাহকের পর্যন্ত একান্ত অভাব—ঠিক তখন।

পরদিন ১২ই মার্চ, সুভাষ তারবার্তা পাঠিয়ে অভিনন্দন জানালেন মেজর ধীলনকে। আজ আমাদের শুধু সংগ্রাম করে যেতে হবে। দিতে হবে স্বাধী-নতার সর্বোচ্চ মূল্য।

যথাসময়ে তার উত্তর দিলেন মেজর ধীলন। 'নেতাজী, কথা দিয়ে আমি আমার মনোভাব বোঝাতে পারব না, একমাত্র চোখের জলেই বুঝি তা সম্ভব।

রেঙ্গুনে থাকতে আপনাকে কি বলেছিলাম তা আমি ভুলিনি। বলে-ছিলাম—ম্যয় আপ কি আঁখে কিসি কি সামনে নীচি না হোনে দুঙ্গী। আপনার সামনে একথা আবার বলার মত মুখ আমার নেই, তাই কাজের মধ্যে দিয়েই আমি তার প্রমাণ দিতে চাই।

আমাদের ভাগ্যে কি আছে জানিনে, জানতে চাইও নে। আপনার আদর্শ ও ইচ্ছানুযায়ী এ সংগ্রাম চলতেই থাকবে এবং আমাদের বাহিনীর একটি লোক জীবিত থাকতে এ সংগ্রাম আমরা পরিহার করব না।'

অপূর্ব দুটি চিঠি। একটি সুভাষের, অন্যটি ধীলনের। দুটোই অপূর্ব। পরবর্তীকালে লালকেল্লার সেই ঐতিহাসিক বিচারসভায় এই দুটো চিঠিই এগজিবিট হিসেবে দাখিল করা হয়েছিল ব্রিটিশ পক্ষ থেকে। চিঠিদুটো আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি :

Exhibit "OOO"

(Headquarters, Superme Command,
Indian National Army)

Major G. S. Dhillon, Rangoon
Jai Hind, 12th March, 1945

I have been following the work of your Regiment and of yourself with the closest interest and I want to congratulate you on the manner in which you have stood up to face bravely the situation that is difficult. I want to express my complete confidence in you and in all those who are standing by you in the present crisis.

Whatever happens to us individually in the course of this historic struggle, there is no power on earth that can keep Indian enslaved any longer. Whether we live and work, or whether we die fighting, we must under all circumstances, have complete confidence that the cause for which we are striving is bound to triumph. It is the finger of God that is pointing the way towards India's freedom. We have only to do our duty and to pay the price of India's liberty.

Our hearts are with you and with all who are with you in the present struggle, which is paving the way to our national salvation. Please convey my warmest greetings to all officers and men under you and accept same yourself. May God bless you and crown your efforts with success.

Jai Hind.

Subhas Chandra Bose.

Exhibit "QQQ"

Beloved Netaji, Burma
Jai Hind, 20th March, 1945

I have received your letter of 12th March, 1945. Not words, only tears could express my feelings.

I thank you with all my heart for expressing your complete confidence in me and in those who are with me.

I assure you, our Netaji, on behalf of the Regiment that it does not matter what may come our way, we will continue the struggle according to your ideals and wishes to

earn our Motherland's Freedom as long as a single soldier of this regiment is alive.

As for myself, my last words to you at Rangoon, "Main aap ki ankhen kisi ke samne nichi na hone dungi", have been ringing in my ears ever since I left you, and specially so after I have come back from Nyaungu. I fully realize that inspite of reasons which may be produced, I have not only failed to do what I voluntarily promised, but have been the only Regimental Commander to bring humiliation to you and to the Azad Hind Fauj. I have no face to promise again, only my actions will do so.

Your letter has put a new spirit into us.

All the officers and men present here and I humbly and with warmest hearts have accepted your greetings. We are confident that with God's grace and your blessings it will not difficult to achieve success.

We all pray for your long life and health to guide us through this holy war. Jai Hind

Your Excellency's obediently
G. S. Dhillon.

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আরো একটি চিঠি ধীলন লিখেছিলেন মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খানকে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মর্যাদা রক্ষার জন্য আমরা শেষ পর্যন্ত লড়াই চালাতে প্রস্তুত। বিশ্রামের কোন আবশ্যক নেই। জল থাক বা না থাক, রেশন পাই বা না পাই, ওসব ভাবতে আমরা প্রস্তুত নই।

সেই সঙ্গে একটি রিপোর্টে তিনি জানিয়েছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মী সেকেণ্ড লেঃ গিয়ান সিং এবং প্লেটুন কম্যাণ্ডার মাঙ্গুরামের নিঃশেষ আত্ম-বিসর্জনের কথা।

'গিয়ান সিং সব সময়েই তাঁর অধীনস্থ জওয়ানদের বলতেন—তিনি তাদের সঙ্গেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেবেন। তাঁর সেই প্রতিশ্রুতি তিনি রেখেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক বীরত্ব-কাহিনীর সঙ্গে আমরা পরিচিত, কিন্তু এই অসম যুদ্ধে মাঙ্গুরাম এবং গিয়ান সিং দেশপ্রেমের যে নিদর্শন রেখে গেলেন ভারত-বর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে তা এক অমর কাহিনী হয়ে থাকবে।'

কর্ণেল সেইগল তখন পোপা হিল এরিয়ায়।

সামরিক দিক থেকে পোপার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। তিনটি প্রয়োজনীয় রাস্তা এসে মিলেছে এই হিল এরিয়ায়। তাছাড়া এখান থেকেই জল সরবরাহ করা হয় বিশ মাইল পরিধি পর্যন্ত।

এ এলাকা রক্ষার দায়িত্ব সেহগলের। তাছাড়া গুরুত্বপূর্ণ পোপাক্যায়ুক-পাডাং সড়কও তাঁকে মুক্ত রাখতে হবে তাঁর ২নং পদাতিক বাহিনীর সাহায্যে।

১৪ই মার্চ এক নতুন আদেশ পেলেন কর্ণেল সেইগল। তোমাকে পাইনবিন আক্রমণ করতে হবে। অবিলম্বে।

আদেশমত ঘাঁটিগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে আবার সেইগল ফিরে গেলেন তাঁর সেই পোপা হিল এলাকায়।

আবার নতুন আদেশ এল ২০শে মার্চ। শুধু ঘাঁটিগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলে চলবে না, পাইনবিন দখল করতে হবে। মিকটিলার আশেপাশে এখন তুমুল যুদ্ধ চলছে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী এবং জাপ-সেনাদের মধ্যে। ওখানে রসদ, সমরোপকরণ ও নতুন সেনা পাঠাতে হলে জাপ-বাহিনীর পক্ষে পাইনবিনই হল শ্রেষ্ঠ সংযোগ-স্থল। সুতরাং আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর কাছে তাদের একান্ত অনুরোধ, তারা যেন পাইনবিন দখল করে এ ব্যাপারে তাদের সাহায্য করে।

২৯শে মার্চ সেইগল যাত্রা শুরু করলেন পাইনবিনের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে তাঁর এক নম্বর ব্যাটেলিয়ান।

মাত্র ঘণ্টা দুয়েক, তারপরই একসময়ে সেইগল শত্রুপক্ষের ফাঁদে পড়ে গেলেন গোটা ব্যাটেলিয়ান নিয়ে। তারপরই শুরু হল প্রচণ্ড গুলী-বর্ষণ। এই প্রচণ্ড শব্দে কান পাতাও দায়।

এক এক করে চৌদ্দটা বুলেট এসে আঘাত করল সেইগলের জীপ-গাড়ীটার গায়ে। নিজে তিনি বেঁচে আছেন কিনা বলা শক্ত। এই প্রচণ্ড গুলী-বর্ষণের মধ্যে বেঁচে থাকার তো কথা নয়।

তবু তিনি বেঁচে গেলেন আশ্চর্যজনকভাবে। শুধু বেঁচেই গেলেন না, পাল্টা-আঘাত হেনে ট্রাক এবং নিজের জীপটাও ছিনিয়ে নিলেন শত্রুপক্ষের কাছ থেকে। শুধু হারালেন জীপে রক্ষিত যুদ্ধাদেশ-সংক্রান্ত কাগজপত্র, দলিল, মানচিত্র ইত্যাদি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, শত্রুপক্ষের কাছে যার মূল্য অপরিসীম।

না, আর পাইনবিন নয়। পোপাও নয়। আক্রমণ-সংক্রান্ত প্ল্যান, নক্সা ইত্যাদি সব এখন শত্রুপক্ষের হাতে। সুতরাং ফিরে চল এবার লেগীতে।

'আজিকে তোমার অলিখিত নাম
আমরা বেড়াই খুঁজি—
আগামী প্রাতের শুকতারা সম
নেপথ্যে আছে বুঝি।'

—রবীন্দ্রনাথ

পরিস্থিতি লক্ষ্য করে সুভাষ তখন খুবই চিন্তিত।

আজাদী বাহিনী এখনো পোপা হিল এরিয়া, লেগী ও কব্যু অঞ্চলে

প্রাণপণে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে বটে, তবু রেঙ্গুন রক্ষা করা যাবে বলে মনে হয় না। আজ হোক বা কাল হোক, রেঙ্গুনের পতন অনিবার্য। কি করা যায় এখন এ পরিপ্রেক্ষিতে? কি করা উচিত?

ভাবনার পর ভাবনা। সবচাইতে বেশি ভাবনা ঝাঁসীর রাণী-বাহিনীর মেয়েদের নিয়ে। সাম্রাজ্যবাদী বাহিনী কি ওদের মর্যাদা রাখবে? রেডক্রশ চিহ্ন আঁকা থাকা সত্বেও যে ইঙ্গ-মার্কিন দস্যুর দল হাসপাতালের উপর আগুনে বোমা ফেলে অসংখ্য অসহায় রোগীকে পুড়িয়ে মারতে পারে তাদের কাছ থেকে কতটুকু সুবিচার আশা করা চলে?

না, আর দেরী নয়। অন্ততঃ কিছু-সংখ্যক মেয়েকে আগে থেকেই ব্যাঙ্ককে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার।

একদিন ওরাও স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল। জীবনের পরোয়া না করে মুক্তি-পাগল ডাকে সাড়া দিয়েছিল। কেউ এসেছিল রেঙ্গুন থেকে। কেউ বা সুদূর হংকং, টোকিও, সাংহাই, বোর্ণিও বা সুমাত্রা থেকে। এমন কি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ পর্যন্ত পিছিয়ে ছিল না। সমষ্টিগতভাবে এই প্রথম তারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল দলে দলে। এসেছিল মৃত্যু-ভয়হীন বেপরোয়া মেয়ে জোসেফাইন, স্টেলা এবং এমনি আরো কয়েকজন।

সবকিছু পেছনে ফেলে রেখে আজ আবার ওদের ফিরে যেতে হবে সেই ব্যাঙ্ককে। পারবে কি ওরা এই সিদ্ধান্তকে প্রসন্নচিত্তে মেনে নিতে?

তবু যেতেই যে হবে। যুদ্ধ-পরিস্থিতি সত্যিই খুব জটিল। সবাই না হোক, অন্ততঃ কিছু-সংখ্যক মেয়ের ব্যাংকক চলে যাওয়া এখন একান্তই প্রয়োজন।

কার উপর এ কাজের দায়িত্বভার অর্পণ করা যায়! মেজর জেনারেল চ্যাটার্জী! না, এ সময়ে তাঁর কাছে থাকাটা খুবই প্রয়োজন। তবে কি দেবনাথ দাস! হ্যাঁ, সেই ভাল। দেবনাথ ব্যাঙ্ককে খুবই পরিচিত। এ ব্যাপারে তাঁর উপর নির্ভর করা চলে।

খুব তাড়াতাড়ি একটা হুকুমনামা লিখে দিলেন সুভাষ। লক্ষ্য করো, এত ব্যস্ততার মধ্যেও কখন, কোথায় কি করতে হবে তার প্রতিটি খুঁটিনাটি নির্দেশ কি নিখুঁতভাবেই না তিনি দিয়েছিলেন সেদিনের সেই হুকুমনামাতে।

ARZI HUKUMATE AZAD HIND

(The Provisional Government of Free India)

Most Secret

Instructions for Sri Debnath Das.

Sri Debnath Das will accompany the Rani of Jhansi Regiment (1st Batch) to Bangkok and make immediate temporary arrangements for putting them up somewhere in

town. After doing so, he should set to work to make permanent arrangements for their stay in a safe place—either in Cholbury camp or elsewhere.

After finishing the above work, he should send two survey parties to survey two land routes from Thailand to Burma. First of these routes meets the Thai-Burma Railway at a point south of Moulmein.

The other route comes up to Toungoo via the Mochi-Mines. The first will survey the route up to the Thai-Burma border and stop there. The officer-in-charge of the party will, thereupon, send a courier down to Rangoon with the report of his survey.

The second survey party shall survey the route upto Mochi-Mines and stop there. From the Mochi-Mines, a courier is to be sent to Rangoon via Toungoo with the report of the survey.

If Sri Debnath Das in urgently wanted back in Rangoon during his stay in Bangkok, then a telegram to be sent to Bangkok to this effect.

Subhas Chandra Bose
Head of the State
Provisional Government of Azad Hind.

অর্থাৎ—দেবনাথ দাসকে অবিলম্বে ঝাঁসী বাহিনীর প্রথম দলটি নিয়ে ব্যাংকক অভিমুখে যাত্রা করতে হবে। ওখানে নিয়ে প্রথমেই মেয়েদের বসবাসের জন্য কোন অস্থায়ী শিবিরের ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর আস্তে আস্তে একটা স্থায়ী ব্যবস্থা। তাছাড়া আজাদ হিন্দ্ সরকারের জরীপ বিভাগের দুটি দলকে অবিলম্বে কাজে লাগাতে হবে। তাদের প্রধান কাজ হবে—রেঙ্গুন থেকে ব্যাংকক পর্যন্ত যাতায়াতের একটা সুবিধাজনক পথের সন্ধান করে তাঁর কাছে রিপোর্ট করা। আপাতত এই। তবে টেলিগ্রাম পেলেই দেবনাথ দাসকে আবার ফিরে যেতে হবে সেই রেঙ্গুনে।

২৯শে মার্চ (১৯৪৫) রেঙ্গুন থেকে যাত্রা শুরু হল দেবনাথ দাসের নেতৃত্বে।

সঙ্গে রাণীবাহিনীর দেড়শো নারী সৈনিক। তাঁদের দেখাশোনা করার জন্য বিশেষ করে সঙ্গে রইলেন রাণীবাহিনীর সুদক্ষ সেঃ মিস প্রতিমা পাল। আর রইলেন ক্যাপ্টেন রাওয়াৎ-এর নেতৃত্বে একশো আজাদী সৈনিক। তাদের প্রধান কাজ বন্দিনীদের নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি রাখা।

বিদায় বেলায় বার বার সতর্ক করে দিলেন সুভাষ। দিন-কাল ভাল নয়। শুধু ইঙ্গ-মার্কিন বিমান-বহরই নয়, সুযোগ বুঝে তাদের বন্ধু কমিউনিস্ট গেরিলা বাহিনীও এখন অত্যন্ত তৎপর। পথে-ঘাটে তাদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। কাজেই হুঁশিয়ার। খুব হুঁশিয়ার। সর্বক্ষণ চোখ-কান খোলা রাখতে ভুলো না যেন।

প্রথমদিন নির্বিঘ্নেই কেটে গেল। না, আশঙ্কার কোন কারণ দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া সবাই সশস্ত্র। শুধু রাইফেল নয়, মেসিনগানও সঙ্গে রয়েছে গোটা দুয়েক। তেমন কিছু ঘটলে তারাও যে ছেড়ে কথা বলবে না, সে তো বলাই বাহুল্য।

বিপদ হল পরদিন। সামনেই সিতাং নদী। এবার খেয়া নৌকো। তাছাড়া ওপারে যাবার কোন পথ নেই।

সহসা আশেপাশের সবগুলো বিপদজ্ঞাপক সাইরেন একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠল বিকট স্বরে—উঁ...উঁ...উঁ...উঁ...উঁ...

নিমেষে নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন দেবনাথ দাস। যে যেখানে পারো ঝোপে-জঙ্গলে আশ্রয় নাও। আমাদের সঙ্গে কোন ভরী অস্ত্র নেই। তাই আত্মরক্ষাই এখন শ্রেষ্ঠ পথ।

বুম্‌ম্‌ম্‌ম্! বুম্‌ম্‌ম্‌ম্! বলতে না বলতেই সহসা গোটা অঞ্চল কেঁপে উঠল প্রচণ্ড বোমা বিস্ফোরণের শব্দে। একটার পর একটা। অসংখ্য।

রেঙ্গুন থেকে সড়ক-পথে দক্ষিণে যেতে হলে সবচাইতে বড় বাধা এই সিতাং নদী। শত্রুপক্ষও তা জানে। তাই বোমাবর্ষণ এখানে নতুন কিছু নয়।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে বিমানগুলো ফিরে গেল নিজেদের ঘাঁটিতে। আশ্চর্য, যদিও মালপত্র খোয়াতে হল বিস্তর, তবু প্রাণহানির কোন ঘটনা ঘটেনি। ভাবতে গেলে সত্যিই অবাক লাগে।

এবার ট্রেন। একটি মাত্র বগি নির্দিষ্ট হয়েছে সবার জন্যে। সাধারণ কামরা নয়, ওয়াগন। তারও দরজার কোন বালাই নেই। তাতেই আড়াইশো লোককে যেতে হবে গাদাগাদি করে।

সেখানেও সেই একই সতর্ক-বাণী শোনা গেল জাপানী কর্তৃপক্ষের মুখে। খুব হুঁশিয়ার। এ গাড়ি শেষপর্যন্ত গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারবে কিনা বলা শক্ত। পরিস্থিতি খুবই গুরুতর। গেরিলা বাহিনী অত্যন্ত তৎপর। পথে সংঘর্ষ অনিবার্য।

তা হোক, তবু যেতেই যে হবে। গেট আপ ! সবাই উঠে পড় মালগাড়িতে।

'কে আগে উঠবে'—শুরুতেই এই নিয়ে একপ্রস্থ তর্ক বেধে গেল আজাদী সৈনিক এবং রাণীবাহিনীর মেয়েদের মধ্যে। জওয়ানদের বক্তব্য—বাহিনজীরা আগে উঠুক, তারপর তারা উঠবে। হাতে যতক্ষণ অস্ত্র রয়েছে, ততক্ষণ তারা এতটুকুও আঁচড় লাগতে দেবে না বহিনজীদের গায়ে।

স্টেলা, জোসেফাইন, কমলা প্রমুখ রাণীবাহিনীর মেয়েরা তাতে একেবারেই রাজী নন। তাঁদের দাবী—না, তা হয় না। মরতে হয় তো আমরাই মরব, তবু

জওয়ান ভাইদের আমরা এভাবে মরতে দেব না। ভবিষ্যতে ভারী লড়াই চালাতে হলে জওয়ান ভাইদের বেঁচে থাকাটা খুবই প্রয়োজন। তাই তাদের উঠতে হবে সবার আগে। আমরা খোলা দরজার পাশে থাকব রাইফেল নিয়ে।

শেষ পর্যন্ত তাই মেনে নিতে হল জওয়ান ভাইদের। উপায় কি! এ যে বোনেদের দাবী। তাদের স্নেহের দাবী কি কোন ভাই উপেক্ষা করতে পেরেছে কোনদিন? তাই তাদেরই মালগাড়িতে উঠতে হল সবার আগে।

সবার শেষে দরজা আগলে বসলেন স্টেলা, জোসেফাইন, কমলা প্রমুখ কয়েকজন। হাতে উদ্যত রাইফেল। চোখে উন্মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি। সংসারে কেউ অমর নয়। তা বলে ভীরুর মত মরব কেন? নেতাজীর রাণীবাহিনীর সৈনিক না আমরা?

ততক্ষণে ওয়াগনের ছাদের উপর উঠে পর-পর কয়েকটি বালির বস্তা সাজিয়ে মেসিনগানসহ পজিশন নিয়েছেন ক্যাপ্টেন রাওয়াৎ। সঙ্গে গুটিকয়েক জওয়ান। এ পথ অত্যন্ত বিপদসংকুল। কখন যে কোন্‌দিক থেকে আক্রমণ আসবে কেউ তা বলতে পারে না। তাই প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত থাকা দরকার।

যথাসময়ে যাত্রা শুরু হল রাত্রির অন্ধকারে। ইঞ্জিনের সার্চলাইট নেভানো। ভেতরের অবস্থাও তাই। কোথাও আলো জ্বালবার হুকুম নেই। আলো জ্বালা মানেই শত্রুপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

প্রহরের পর প্রহর কেটে গেল এমনি করেই।

উপরে মেসিনগান নিয়ে ক্যাপ্টেন রাওয়াৎ। ভেতরে গাদাগাদি করে বসে জওয়ানের দল এবং রাণীবাহিনীর মেয়েরা। দরজার গোড়ায় স্টেলা, জোসে-ফাইন, কমলা প্রমুখ কয়েকজন। কারো মুখেই কোন কথা নেই। সবাই নিঃশব্দ, নিশ্চুপ।

চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই নজরে পড়ে না। শুধু গাড়ির ঝাঁকুনিতে কখনো কারো গায়ে লাগলে আজাদী সৈনিকের কণ্ঠ সরব হয়ে ওঠে—মাপ কিজিয়ে বহিনজী, দেখতে পাইনি।

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর—কোই বাত নেহি ভাইসাব। এখানে সবাই আমরা কমরেড।

বার বার রেডিয়াম দেওয়া ঘড়ি দেখছেন দেবনাথ দাস। কটা বাজে এখন? না, এখনো সবচাইতে বিপদসংকুল জায়গাটা আসেনি।

একইভাবে তখন ঘড়ি দেখতে শুরু করেছেন ছাদের উপর অবস্থানরত ক্যাপ্টেন রাওয়াৎ। চারিদিকে নিচ্ছিদ্র কালো অন্ধকার। কোথায় যে কে ঘাপটি মেরে বসে আছে বোঝাও যায় না। তবে মনে হয় কিছু একটা ঘটবে। চার-পাশের ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গলে যেন তারই আভাস।

সহসা কি দেখে দৃষ্টিটা তীক্ষ্ম হয়ে উঠল ক্যাপ্টেন রাওয়াৎ-এর। দূরে ঐ লাল আলোটা কিসের? ওটা এভাবে জ্বলছে আর নিভছে কেন? কিসের সঙ্কেত ওটা? তবে কি কেউ কাউকে সিগন্যাল দিচ্ছে ঐ আলোটার সাহায্যে?

গাড়িটা তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে সেই একই গতিতে। লাল আলোটা আরো কাছে এসে পড়েছে। আরো কাছে।

আশঙ্কা অমূলক নয়। সিগন্যালই বটে। শত্রুপক্ষীয় গেরিলা বাহিনীর সিগন্যাল। হুঁশিয়ার ভাইসব! হুঁশিয়ার বাহিনজী! হুঁশিয়ার সবাই!

নিমেষে প্রস্তুত হয়ে নিলেন খোলা দরজার পাশে উপবিষ্ট স্টেলা, জোসেফাইন, কমলা প্রমুখ নারী সৈনিকগণ। প্রস্তুত জওয়ানের দল। যে আশঙ্কাটা এতক্ষণ মনের আনাচে-কানাচে বাদুড়ের মত কালো ডানা মেলে ছিল, সেটা এখন বাস্তব রূপ ধরে চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আর দেরী নেই।

না, আর দেরী নেই। ঐ যে আরো কাছে এসে পড়েছে লাল আলোটা। ঐ যে ওটা দুলে দুলে সঙ্কেত দিচ্ছে আড়ালে অবস্থানরত গেরিলা বাহিনীকে। ঐ যে আগুন ঝলসে উঠেছে ওদের আগ্নেয়াস্ত্রের মুখ দিয়ে।

সহসা রুষ্ট বাঘের মত হাঁক দিলেন ক্যাপ্টেন রাওয়াৎ—জয় হিন্দ্! ফায়ার! বলতে না বলতেই ছাদের উপর থেকে মেসিনগান গর্জে উঠল দিক্-বিদিক্ কাঁপিয়ে—ট্যা-ট্যা-ট্যা-ট্যা-ট্যা...

জয় হিন্দ্! নীচ থেকে সাড়া দিলেন স্টেলা, জোসেফাইন, কমলা, প্রতিমা প্রমুখ নারী সৈনিকগণ। তারপরই তাঁদের হাতের রাইফেল আগুন ছড়াতে লাগল গেরিলা বাহিনীকে লক্ষ্য করে—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লাইনের দুপাশ থেকে গর্জে উঠল গেরিলা বাহিনীর একাধিক মেসিনগান—ট্যা-ট্যা-ট্যা-ট্যা-ট্যা...

বাতাস ভারী হয়ে উঠল ধোঁয়া আর বারুদের গন্ধে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধু অন্ধকারের বুক চিরে একটানা শোনা যেতে লাগল রাইফেল আর মেসিনগানের গর্জন।

মাত্র মিনিটখানেক, তারপরই সব শান্ত। যেন কিছুই হয়নি। ততক্ষণে গাড়িটা পেরিয়ে গেছে বিপদসীমা অতিক্রম করে। শুরু হয়েছে ক্ষয়ক্ষতির হিসেব-নিকেশের কাজ।

সর্বত্র চাপ চাপ অন্ধকার। কোথাও পা ফেলার মত জায়গা নেই। তবু অতিকষ্টে আস্তে আস্তে পা ফেলে অনুমানে এক-একজনের মাথায় হাত রেখে হিসেব মেলাতে লাগলেন দেবনাথ দাস—কে তুমি? নাম বল...

—সিপাহী ধরমরাজ।

—ঠিক আছে। কি নাম তোমার?

—ল্যান্স-নায়েক আলি আকবর খাঁ।

—ঠিক হ্যায়, নেক্সট্?

—লেফটেন্যান্ট মিস প্রতিমা পাল।

—ঠিক আছে। তুমি কে বল?

কোন জবাব নেই। যেন শুনতেই পায়নি সে কথাটা।

—কথা বলছ না কেন? বল কে তুমি?

উত্তর না পেয়ে এবার পাশের মেয়েটিকে প্রশ্ন করলেন দেবনাথ দাস—এখানে কে বসে ছিল বলতে পার?

—হাবিলদার মিস্ স্টেলা।

—স্টেলা! স্টেলা! বার বার ডাকতে লাগলেন দেবনাথ দাস, কথা বল স্টেলা! একি! হাতটা ভিজে ভিজে লাগছে কেন? এ যে রক্ত! অনেক রক্ত! স্টেলা, কথা বল, সাড়া দাও—

না, স্টেলা আর কোনদিনই সাড়া দেবেন না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নিজের ভূমিকা শেষ করে ততক্ষণে স্টেলা ঠাঁই নিয়েছেন পরম পিতা ভগবান যীশুর পায়ে। এ ঘুম তাঁর কোনদিনই আর ভাঙবে না।

যুদ্ধে ভাবালুতার কোন স্থান নেই, তাই নিজেকে সামলে নিয়ে আবার হিসেব মেলাতে লাগলেন দেবনাথ দাস—কে, নাম বল?

—সুবেদার আক্রাম খাঁ।

—তুমি! তোমার নাম কি?

—আঃ! উত্তরে ক্ষীণ একটা আর্তনাদ শোনা গেল অন্ধকারের বুক চিরে।

—কে? কে? কে কথা বলছে? কে এখানে বসে ছিল?

—হাবিলদার মিস জোসেফাইন।

—জোসেফাইন! জোসেফাইন! কি হয়েছে তোমার? বল—

—জ্-জ্-জ্-জ্......

—বল—বল জোসেফাইন! কি বলতে চাও—বল—

—জ্-জ্-জ্-জয়...হিন্‌দ্‌! !

আর কোন কথা নেই। কোন সাড়াও নেই। সব কথাই বুঝি হারিয়ে গেল মৌন রাতের অন্ধকারে।

সহসা কার কাতরোক্তি শোনা গেল বাংলা ভাষায়—জল......একটু জল......

—কে? তাড়াতাড়ি জলের বোতলটা মুখে তুলে ধরলেন দেবনাথ দাস—খুব কষ্ট হচ্ছে কি? কোথায় লেগেছে তোমার?

—বাঁ হাতে। অতিকষ্টে জবাব দিলেন মিস্ কমলা, একদম নাড়তে পারছি নে হাতটা।

একটা বিমূঢ়, নিশ্চল পরিস্থিতি। কারও মুখে কোন কথা নেই। যেন ঘটনার আকস্মিকতায় বোবা হয়ে গেছে সবাই।

'মরতে হয় তো আমরাই মরব, তবু জওয়ান ভাইদের আমরা মরতে দেব না।'

স্টেলা, জোসেফাইন ও কমলা তাঁদের সেই প্রতিশ্রুতি রেখেছেন।

স্টেলা সংগে সংগেই শেষ। পরদিন ভোরে জোসেফাইনও চলে গেলেন নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। তাঁদের দুজনের দেহই সমাহিত করা হল পূর্ণ সামরিক মর্যাদায়। আর কমলা! তাঁর পুরো বাঁ হাতটাই কেটে বাদ দিতে হল অস্ত্রোপচার করে।

'Hav. Steilla was found killed. Hav. Josephine expired in the morning. Hav. Steilla and Hav. Josephine were buried with full honours. Hav. Kamala was brought in Moulmein. She survived but her left hand had to be amputated.'

[The Contemporary : Debnath Das : April, 1973]

স্টেলা নেই। জোসেফাইনও নেই। শুধু মেসিনগানের গুলীতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া তাঁর ব্যাগটা আজো পড়ে আছে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে। আর কমলা! না, তাঁরও কোন খবর নেই। সবার অলক্ষ্যে পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে তিনি পড়ে আছেন কে জানে! বেঁচে আছেন কিনা তাই বা কে বলতে পারে।

কে মনে রেখেছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রাণ উৎসর্গকারী এ দুটি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান তরুণীর কথা?

কে মনে রেখেছে জীবনভোর কমলার এই পঙ্গুত্ব বরণের কথা? রেখেছে কি কেউ?

না, রাখেনি কবে কোন্ বিস্মৃতপ্রায় অতীতে আমাদেরই দেশের একদল বেপরোয়া তরুণী মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে দুর্বার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, ইতিহাস সেকথা একেবারেই মনে রাখেনি।

'মূর্ছিত বিহ্বল করা মরণে মরণে আলিঙ্গন
ওরই মাঝে পথ চিরে চিরে
নূতন সমুদ্রতীরে
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি
ডাকিছে কাণ্ডারী,
এসেছে আদেশ—
বন্দরের বন্ধন কাল এবারের মত হল শেষ'—

—রবীন্দ্রনাথ।

ওদিকে তখন জোর লড়াই বেধে উঠেছে লেগীতে।

তারিখটা ছিল ২রা এপ্রিল। বেলা তখন ঠিক একটা বেজে দশ মিনিট। তারপর সচরাচর যা হয়ে থাকে তাই হল। প্রথমেই বিমান থেকে প্রচুর বোমাবর্ষণ। সেই সঙ্গে নীচে থেকে গোলন্দাজ বাহিনীর একটানা গোলাবর্ষণ। তারপর ট্যাঙ্কের আড়ালে পদাতিক বাহিনী। বোমার আগুনে গোটা অঞ্চলটা তখন দাউ-দাউ করে জ্বলছে, তবু তাদের এগিয়ে আসার বিরাম নেই।

প্রথম রাউণ্ডে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর পশ্চাদপসরণ। হতাহতও হল বিস্তর। বেগতিক দেখে হাতাহাতি লড়াইয়ে নেমে পড়লেন সেকেণ্ড লেঃ

কানওয়াল সিং। বলাই বাহুল্য যে, এবার শত্রুপক্ষের পশ্চাদপসরণ। কিন্তু না, আবার ওরা আক্রমণ করেছে প্রবলভাবে। ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে-পেছনে—সবদিক থেকেই ওরা গোলা ছুঁড়তে শুরু করেছে কামান থেকে।

আবেদন জানালেন কর্ণেল সেইগল। জায়গাটা যুদ্ধ চালানোর পক্ষে ঠিক উপযুক্ত নয়। শত্রুসেনা কর্তৃক ঘেরাও হবার আশংকা খুব বেশি। আরো কিছু সৈন্য চাই।

এক কোম্পানী সৈন্য এল মেজর বি. এস. নেগীর নেতৃত্বে। সেই সংগে এল একটি নতুন নির্দেশ—পোপা এলাকায় ফিরে যাও। ধীলনকেও তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১০ই এপ্রিল আবার নতুন নির্দেশ পাওয়া গেল ডিভিশনাল হেড-কোয়াটার্স থেকে। আর পোপা নয়। এবার তোমাদের যেতে হবে মাগুই-মিনবু-ইয়ানবুইঙ্গি এলাকাতে। একসংগে নয়। শত্রুপক্ষ অতি তৎপর। তাই যেতে হবে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে। অতি সন্তর্পণে। চোখ-কান খোলা রেখে।

আজাদী বাহিনী ফিরে চলেছে পোপা ত্যাগ করে। একসংগে নয় বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে।

পরিস্থিতি সত্যিই গুরুতর। ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে-পেছনে, সর্বত্রই যেন শত্রুসৈন্য বসে আছে ঘাপটি মেরে। কখন যে কে ঘেরাও হয়ে পড়বে বলা শক্ত।

এবার নতুন এক সিদ্ধান্ত নিলেন কর্ণেল সেইগল। বর্তমান পরি-স্থিতিতে একসংগে এত লোক নিয়ে পথ চলা বিপজ্জনক। খাবার মিলবে কোথায়? তাছাড়া শত্রু-বিমান সর্বক্ষণ টহল দিয়ে ফিরছে আকাশের বুকে। একসংগে এত লোক থাকলে ওদের চোখ এড়ানো মুস্কিল। তাই সেনা-বাহিনীকে দুটি কলামে ভাগ করা যাক। বৃহত্তর অংশের নেতৃত্ব করবেন তিনি নিজে। ৩নং ব্যাটেলিয়ান নিয়ে দ্বিতীয় কলাম যাক ক্যাপ্টেন বাগড়ীর নেতৃত্বে।

কাজেও তাই করা হল। দুটি আলাদা আলাদা পথে অগ্রসর হলেন কর্ণেল সেইগল এবং ক্যাপ্টেন বাগড়ী।

মনে হয়, এ ব্যবস্থায় শত্রুপক্ষের চোখ এড়িয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়াটা খুব একটা কষ্টকর হবে না।

সেদিন তারিখটা ছিল ২০শে এপ্রিল। ক্যাপ্টেন বাগড়ী তখন খোলা একটা ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছেন তাঁর ব্যাটেলিয়ান নিয়ে। আর মাত্র বিশ মাইল বাকী। তারপরেই তোয়ানডুইঙ্গি।

ঠিক তখনই খবরটা পেঁছে গেল ক্যাপ্টেন বাগড়ীর কানে! শত্রুপক্ষের অসংখ্য ট্যাংক এগিয়ে আসছে তাঁদের লক্ষ্য করে। আর সময় নেই। এসে

গেল বলে : ঐ যে দূরে দেখা যাচ্ছে সারিবন্ধ ট্যাংক! ঐ যে ওরা এগিয়ে আসছে তাদের সন্ধান পেয়ে!

মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন বাগড়ী। গর্ত খুঁড়ে পরিখা তৈরি করার মত সময় নেই। লৌহদানবের সঙ্গে লড়াই করার মত উপযুক্ত অস্ত্র-শস্ত্রও সঙ্গে নেই। হয় আত্মসমর্পণ, নয়তো মৃত্যু, এছাড়া আর কোন পথই খোলা নেই তাঁর সামনে।

কোন্‌টা বেশি কাম্য! কোন্‌টা গৌরবের! আত্মসমর্পণ, না মৃত্যু?

ভাইসব! মাথা উঁচিয়ে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন বাগড়ী, প্রাণ থাকতে দুশমনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে আমি রাজী নই। তার চাইতে সত্যিকারের সৈনিকের মত লড়াই করে প্রাণ দেওয়াই আমি ইজ্জতের ব্যাপার বলে মনে করি। আমি যাচ্ছি। তোমাদের মধ্যে কারো যদি ইচ্ছে হয় তো আমার সঙ্গে আসতে পার। না এলেও বলার কিছু নেই।

সঙ্গে সঙ্গে শতাধিক জওয়ান উঠে দাঁড়াল সোজা হয়ে। আমরাও রাজী নই দুশমনের কাছে মাথা নোয়াতে। আগে ইজ্জত, তারপর অন্য কথা। ইজ্জত গেলে আর রইল কি?

—বেশ, তাহলে চল আমার সঙ্গে।

এগিয়ে গেলেন বীর সেনানী ক্যাপ্টেন বাগড়ী। সঙ্গে সেই শতাধিক জওয়ান। সম্বল বলতে হাতবোমা আর পেট্রোল-ভর্তি বোতল। তা হোকগে। তা বলে শেষ পর্যন্ত লড়াই না করে দুশমনকে তারা ছাড়তে রাজী নয়।

—তৈরী হও ভাইসব। ঐ যে ওরা সামনে এসে গেছে। ব্যস, সামনে লাফিয়ে পড়ে চালাও এবার বোমা আর পেট্রোল-ভর্তি বোতল। বলো সবাই —নেতাজী জিন্দাবাদ! চার্জ......

—ঐ যে একটা ট্যাংক জ্বলে উঠেছে দাউ-দাউ করে। ঐ যে একটা সাঁজোয়া গাড়িও জ্বলছে পেছনের দিকে। সাবাস জওয়ান, সাবাস! ফিন চালাও ফুর্তিসে। বলো নেতাজী......

কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না ক্যাপ্টেন বাগড়ী। তার আগেই কোথায় তাঁর দেহটা উড়ে গেল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে। শুধু তাঁরই নয়, একে একে সবারই।

তাড়াতাড়ি ট্যাংকের ঢাকনা খুলে নীচে নেমে এলেন ব্রিটিশ কম্যাণ্ডার জেনারেল গ্রেসী। দুচোখে তাঁর অনন্ত বিস্ময়।

কে? কে? ওরা—ওরা কি উন্মাদ? নইলে এভাবে কেউ লড়াই করতে পারে ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে? তাহলে জেনেশুনে কেন ওরা প্রাণ দিল এমন করে? কেন? কেন?

অনেক ভেবেও সেদিন এর কোন উত্তর খুঁজে পাননি জেনারেল গ্রেসী। পাবার কথাও নয়। পরের স্বাধীনতা হরণ করাই যাদের একমাত্র লক্ষ্য, তারা কি করে বুঝবে যে, এত সহজে মানুষ প্রাণ দিতে পারে কিসের প্রেরণায়?

যুদ্ধ-পরিস্থিতি তখন ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর অনুকূলে। একটার পর একটা দ্বীপ পুনর্দখল করে চলেছেন মার্কিন সেনাপতি ম্যাক আর্থার। টোকিওর ওপরে বিমানহানা ঘটেছে কয়েকবার, যা দুবছর আগেও ছিল কল্পনাতীত। বেশ বোঝা যায়, জাপান ক্রমশই কোণঠাসা হয়ে পড়েছে প্রতিটি ক্ষেত্রে।

বর্মাতেও সেই একই অবস্থা। সেই যে তারা ইম্ফল থেকে পিছু হটতে শুরু করেছে, তখনো পর্যন্ত তা চলেছে অব্যাহত গতিতে। প্রথমত বিমানের অভাব। তাছাড়া পূর্বেকার সেই মনোবলই যেন তারা হারিয়ে ফেলেছে পরিস্থিতি লক্ষ্য করে। দেখে মনে হয়, এ যেন আগেকার সেই দুর্ধর্ষ জাপ-বাহিনী নয়, পরাজিত, বিপর্যস্ত কতকগুলো সৈনিক মাত্র।

অথচ সেদিক থেকে আজাদী বাহিনীর মনোবল তখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণ অটুট। ফলে এই দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধে বহু ক্ষেত্রেই শত্রুর মোকাবিলা করতে হয়েছে এই আজাদী বাহিনীকেই। যেন বর্মার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব জাপান বা বর্মী-সেনাদের নয়, আজাদী বাহিনীর একারই।

পরিস্থিতি আরো শোচনীয় হয়ে দেখা দিল স্বাধীন বর্মার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আউঙ্গসানের একটি সিদ্ধান্তের ফলে।

তারিখটা ছিল ১৯৪৫ সালের ১৫ই মার্চ।

বর্মী জনসাধারণের মনে সেদিন একটা বিপুল চাঞ্চল্য। দেড় বছর আগে দেশ স্বাধীন হলেও এতদিন তাদের কোন নিজস্ব সেনাবাহিনী ছিল না। জাপ শিক্ষাধীনে তাদের এতদিনকার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে। আজ তাদের সেই জাতীয় বাহিনী যুদ্ধযাত্রা করবে আউঙ্গসানের নেতৃত্বে।

যথাসময়ে জাতীয় বাহিনী রওনা দিল যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তারপর! তারপরই এক সময়ে তারা ঘুরে দাঁড়াল আউঙ্গসানের নেতৃত্বে। ব্রিটিশ বা মার্কিনদের বিরুদ্ধে নয়, জাপানীদের বিরুদ্ধে। সেই সঙ্গে ডঃ বা ম. পরিচালিত নিজেদের স্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে।

শুরু হল বিভিন্ন স্থানে গেরিলা কায়দায় আক্রমণ। জাপানীদের হত্যা কর। তাদের সাপ্লাই ডিপো, যোগাযোগ-ব্যবস্থা সব ধ্বংস কর। গো ব্যাক জাপান।

পৃথিবীতে বিদ্রোহ নতুন কিছু নয়। এমন বহু দেশেই বিদ্রোহ ঘটেছে। ভবিষ্যতেও হয়তো ঘটবে। কিন্তু সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে আউঙ্গসান-পরিচালিত এই বিদ্রোহ ছিল খুবই বিতর্কমূলক। বিশেষ করে তাঁর একটি সিদ্ধান্ত ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। সেটা হল,—যে ব্রিটিশকে একদিন তারা বিতাড়িত করতে সহায়তা করেছিল, সেই ব্রিটিশকেই আবার আমন্ত্রণ করে নিজের ঘরে ডেকে আনা।

'একথা কোনরকমেই অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বর্মায় জাপানীরা যে হঠাৎ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল, তার মূলে শত্রুসৈন্যের পরাক্রমের

চাইতে তথাকথিত এই বিদ্রোহীদের জাপানী-পক্ষ ত্যাগই কাজ করেছিল অনেক বেশি।'

[মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান]

তবে উল্লেখযোগ্য এই যে, আজাদী বাহিনীকে কোথাও তারা বাধা দিতে চেষ্টা করেনি। তার কারণও ছিল। জাপ-কর্তৃপক্ষের হাজার অনুরোধেও সুভাষ রাজী হননি এই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। তাঁর স্পষ্ট কথা—আমাদের লক্ষ্য স্বাধীনতা। তার জন্য আমরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে হাজার বার লড়াই করতে পারি। কিন্তু জাপান এবং বর্মা দুই-ই আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র। তাদের এই ঘরোয়া ব্যাপারে আমরা নেই।

কথাটা বিদ্রোহীদের কানে যেতে দেরী হয়নি, তাই তারাও কোনরকম বাধা দিতে চেষ্টা করেনি আজাদী বাহিনীকে।

আর বর্মী জনসাধারণের তো কথাই নেই। লুটপাট এবং দস্যুতস্করের ভয়ে বেশির ভাগ লোকই তখন আত্মগোপন করেছে বনে-জঙ্গলে। কিন্তু যে মুহূর্তে তারা গাঁয়ে আজাদী বাহিনীর উপস্থিতির কথা শুনেছে, অমনি তারা বন-জঙ্গল থেকে ঘরে ফিরে এসেছে নিশ্চিন্ত মনে। গাঁয়ে যখন আজাদী বাহিনী এসেছে, তখন আর লুটপাট বা দস্যু-তস্করের কোন ভয় নেই।

' A part of the Burmese National Army revolted against the Burmese Government and fought against their own troops, the Japanese and generally indulged in armed dacoity. It may by mentioned here, to the credit of the Indian National Army, that wherever units of this Army camped on their way to the fighting fronts, or established bases, the villagers would, if they had previously gone into hiding in the jungles, for fears of dacoits and others return to their villages, secure in the knowledge that they will be protected by the Indian National Army.'

[The Struggle in East Asia : John A. Thivy : P.—88]

জাপানীদের তখন উভয় সঙ্কট। একদিকে ক্রমবর্ধমান ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি, অন্যদিকে আউংসান-পরিচালিত বর্মী বিদ্রোহ। এই দুই প্রবল প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করা তাদের পক্ষে তখন সাধ্যাতীত।

ফলে আজাদী বাহিনী তখন প্রায় একা। শুধু একটি মাত্র পথই তাদের সামনে খোলা আছে, সেটা হল মৃত্যুর পথ। তাছাড়া আর সব পথই তখন রুদ্ধ হয়ে গেছে তাদের কাছে।

এদিকে আর সময় নেই। শত্রুপক্ষ ক্রমশঃই এগিয়ে আসছে রেঙ্গুনের দিকে। আধুনিক যান্ত্রিক বাহিনীর কাছে এ দূরত্ব কিছুই নয়।

২০শে এপ্রিল নতুন জাপ-সেনাপতি জেনারেল কিমুরা তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন সুভাষকে। শত্রুপক্ষ আর দূরে নেই। রেঙ্গুন পরিত্যাগ করে পিছিয়ে যাওয়াই এখন সঙ্গত হবে আমাদের পক্ষে।

পত্রপাঠ প্রস্তাব বাতিল করে দিলেন সুভাষ। এখনো আমাদের ছ-হাজার সৈন্য মজুত রয়েছে রেঙ্গুনে। দরকার হলে আমরা একাই তাদের নিয়ে লড়াই চালাব এখান থেকে।

'On 20 April Gen. Kimura advised Netaji of his intention to withdraw from Rangoon. But Netaji flatly rejected the idea of withdrawal'.

[Tatsuo Hayashida : P.—104]

সেদিনই সমর-পরিষদের এক বৈঠক ডেকে নিজের অভিপ্রায়ের কথা ব্যক্ত করলেন সুভাষ। আমাদের শেষ লড়াই হবে রেঙ্গুনেই। তাতে যদি আমার মৃত্যু হয় হোক, তবু লড়াই চলবেই।

সমর-পরিষদের ইচ্ছা অন্যরকম। শেষ লড়াই এখানে হবে কেন? কর্ণেল জি. আর. নাগরের নেতৃত্বে এখনো আমাদের ৩নং ডিভিশন অটুট রয়েছে মালয়ে। তাছাড়া আমরা আরো নতুন বাহিনী গড়ে তুলব ব্যাঙ্ককে গিয়ে। তারপর দরকার হলে চীনদেশে। না হয়তো রাশিয়ায়। সে-সব কাজের পৌরোহিত্যের দায়িত্ব নিতে হবে নেতাজীকেই। সুতরাং তাঁর উচিত অবিলম্বে রেঙ্গুন পরিত্যাগ করে সে-সব কাজে আত্মনিয়োগ করা।

শেষ পর্যন্ত তাদের দাবীই মেনে নিলেন সুভাষ। ঠিক হল, অচিরেই তিনি অন্য কোথাও চলে যাবেন রেঙ্গুন পরিত্যাগ করে। কিন্তু ঝাঁসীর রাণী-বাহিনীর অবশিষ্ট মেয়েরা! তাদের কি হবে?

অবশ্য স্থানীয় মেয়েদের জন্য ভাবনা নেই। যাবার আগে তাদের নিজ নিজ বাবা-মায়ের কাছে পেঁাছে দিয়ে গেলেই চলবে। কিন্তু দূর-দূরান্ত থেকে আগত মেয়েরা?

কেউ এসেছে সিঙ্গাপুর থেকে। কেউ কেউ জাভা, সুমাত্রা বা সুদূর হংকং থেকে। তাদের কি হবে? না, তাদের পেছনে ফেলে রেখে সুভাষ রেঙ্গুন পরিত্যাগ করতে কোনমতেই রাজী নন। তাই যত কষ্টই হোক না কেন, অবশিষ্ট মেয়েদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতেই হবে।

মন্ত্রিসভার সদস্য এবং সেনানায়কদেরও কেউ কেউ সঙ্গে যাবেন। আর যাবেন ডঃ বা. ম.। যেতেই হবে। তিনিও যে ব্রিটিশের কাছে পয়লা নম্বর শত্রু বলে চিহ্নিত। তবে তিনি যাবেন আলাদাভাবে।

ছ-হাজার জওয়ান নিয়ে পেছনে থাকবেন মেজর জেনারেল লোগনাথন। তাঁর কাজ হবে, আজাদী সেনাদের সাহায্যে রেঙ্গুনের অসামরিক ব্যক্তিদের ধনপ্রাণ রক্ষা করা। তিনবছর আগে জাপ-আক্রমণকালে প্রায় পঞ্চাশ হাজার অরক্ষিত ভারতবাসীকে প্রাণ দিতে হয়েছিল বর্মী-দস্যুদের হাতে। এবার যেন কোনরকমেই তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

২৩শে এপ্রিল, ১৯৪৫ সাল।

শহর-সীমান্ত থেকে ক্রমাগত ভেসে আসছে গুলী-গোলার শব্দ। বেশ বোঝা যায়, শত্রুপক্ষ আর খুব একটা দূরে নেই।

শুরু হয়েছে জাপ-সেনাবাহিনীর পশ্চাদপসরণের কাজ। ক্রমাগত তাদের লরী ছুটে চলেছে রেঙ্গুন-পেগু সড়ক ধরে। একটার পর একটা। অসংখ্য।

দাউ-দাউ করে জ্বলছে তাদের সামরিক ছাউনিগুলি। দিগন্ত লাল হয়ে উঠেছে আগুনের লেলিহান শিখায়। সব পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে যেতে হবে। এমন কিছুই ফেলে রেখে গেলে চলবে না, যা শত্রুপক্ষের কোন কাজে আসতে পারে।

জাপ-কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা—হিজ এক্সেলেন্সী চন্দ্র বোস বিমানযোগে ব্যাঙ্কক চলে যান। কিন্তু সুভাষ তাতে রাজী নন। তাঁর সাফ কথা—আগে মেয়েরা, তারপর অন্য সবাই।

'He refused to leave Rangoon unless transport was provided for the Ranis first'.

নির্দিষ্ট সময়ে মেয়েদের পাঠিয়ে দেওয়া হল রেঙ্গুন রেল-স্টেশনে। ওয়া (Waw) পর্যন্ত যেতে হবে ট্রেনে। তারপর অন্য ব্যবস্থা।

অপেক্ষা করে করে তিন ঘণ্টা কেটে গেল, কিন্তু কোথায় ট্রেন? না, ট্রেন নেই।

খবর শুনে তক্ষুণি সুভাষ আয়ার সাহেবকে পাঠিয়ে দিলেন জাপ-রাষ্ট্রদূত হাচাইয়ার কাছে। এই সেই হাচাইয়া, যাঁর সঙ্গে সুভাষ সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করেছিলেন, সঙ্গে পরিচয়পত্র ছিল না বলে। সাক্ষাৎ করেছিলেন টোকিও থেকে পরিচয়পত্র পাঠানোর পরে।

রাত-দুপুরে ফিরে এলেন আয়ার সাহেব। হ্যাঁ, হয়েছে। হাচাইয়া কথা দিয়েছেন। বলেছেন, শীগগীরই তিনি যানবাহনের ব্যবস্থা করবেন সবার জন্যে।

শুরু হল প্রতীক্ষা। কখন যানবাহন আসবে? কখন? খবর পাওয়া গেছে পেগুর পতন আসন্ন। একবার পেগু শত্রুর হাতে চলে গেলে আর কোনরকমেই তাদের বেষ্টনী ভেদ করে ওপারে যাওয়া সম্ভব হবে না। সুতরাং যা কিছু করার তার আগেই করতে হবে। নয়তো এখানেই সব কিছুর ইতি। সব কিছুর পরিসমাপ্তি।

'The hours passed, 2-0, 3-0 and 4-0 a.m. and yet there was no sign of the lorries. At last they came at 4-30 a.m. It was too late to leave that day'.

যানবাহন এল একেবারে ভোররাত্রে। কিন্তু শত্রুপক্ষ অত্যন্ত তৎপর। এ সময়ে দিনের আলোতে একটা কনভয় নিয়ে পথ চলাটা মোটেই সঙ্গত হবে না। তাই যেতে হবে আবার সেই—রাত্রে।

২৪শে জুলাই।

সারাদিন ব্যস্ততার আর সীমা রইল না সুভাষের। ঘণ্টায় ঘণ্টায় নির্দেশ। প্রতিটি বিভাগে। প্রতিটি শাখায়। অনেক কাজ। অনেক দায়িত্ব। সব বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে সঠিকভাবে।

বেশ কিছু লীগ-কর্মীকে ছুটি দেওয়া হল দুমাসের বেতন দিয়ে। আপাতত তোমরা ঘরে ফিরে যাও ভাই। আবার তোমাদের কাজে ডাকা হবে সময় হলে।

কেউ রাজী নয়। না, আমরা ছুটি চাইনে। সবকিছু ফেলে একদিন আমরা চলে এসেছিলাম নেতাজীর ডাক শুনে। সংকল্প ছিল, হয় স্বাধীনতা, নয়তো মৃত্যু। আজ আমরা কি করে ফিরে যাব সেই সংকল্প অসমাপ্ত রেখে? কোন্ মুখে?

অনেক করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করা হল সবাইকে। এ লড়াই শেষ লড়াই নয়। আবার আমরা লড়াই করব নতুন করে। নতুন উদ্যমে। সেদিন তো তোমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে সবার আগে।

তখনো প্রচুর টাকা মজুদ রয়েছে আজাদ হিন্দ্ ব্যাংকে। অন্যদিকে বা. ম. সরকারের তখন প্রচণ্ড অর্থাভাব। এমন কি অনুগত সেনাদের মাইনে দেবার সামর্থ্য পর্যন্ত তখন তাদের নেই। তাই প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়া হল তাদের ভাণ্ডারে।

'The Government of Burma were in need of funds and as there was sufficient money in the Azad Hind Bank in Rangoon, a sum of five lakhs of rupees were donated to the Provisional Government of Burma'.

[Maj Gen. Chatterjee : P.—64]

দেখা হল ডঃ বা. ম.-র সঙ্গে। দুজনে একই পথের পথিক। কে জানে, হয়তো এই শেষ দেখা। অনাগত ভবিষ্যতে কার ভাগ্যে কি অপেক্ষা করে আছে কে বলতে পারে!

সেদিনের সেই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে ডঃ বা. ম. কি বলেছেন শোনা যাক ঃ

'১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে সূচনা হল চূড়ান্ত বিপর্যয়ের। আমাদের চারপাশে সবকিছুই তখন ধসে পড়েছে, আপার বর্মার প্রায় সবটাই আবার ব্রিটিশ বাহিনীর দখলে চলে গেছে এবং ব্রহ্মের সৈন্যবাহিনী ও তাদের সহ-যোগিরা ইতিমধ্যে দল বদল করেছে। জাপানীরা সেই সময়ে রেঙ্গুন থেকে আড়াইশো মাইল দক্ষিণ-পূর্ব মৌলমিনের দিকে হটে যেতে থাকে। আমরাও তাদের সঙ্গে পিছিয়ে যাই।

তার আগে নেতাজী বসুর সঙ্গে শেষবারের মত আমার দেখা হয়। সেদিনকার কথা আজো আমার স্পষ্ট মনে আছে। ইতিপূর্বে আমরা ঠিক করেছিলাম যে, গোটা ব্রহ্মদেশও যদি আবার ব্রিটিশ বাহিনীর দখলে চলে যায়,

তবু আমরা একযোগে যুদ্ধ চালিয়ে যাব। কিন্তু ব্রহ্মের সৈন্যবাহিনী ব্রিটিশের পক্ষে চলে যাওয়ায় সেই পরিকল্পনা আমাদের বর্জন করতে হয়।

আমাদের দুজনেরই চিত্ত তখন ভারাক্রান্ত। ব্রহ্মের বাহিনী এইভাবে দল বদল করায় নেতাজী খুবই সমস্যায় পড়েছিলেন। তাঁকে তখন একেবারে গোড়া থেকে আবার নতুন করে সব শুরু করার কথা ভাবতে হচ্ছিল।

সেদিন আমরা পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে বিশেষ কিছু কথাবার্তা বলিনি। তার কারণ পরস্পরের মনের খবর আমাদের জানা ছিল ; আমরা জানতাম, এই পরাজয় আমাদের দুজনের একজনেরও মনের পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। তবু একটা কিছু তো বলতেই হয়, তাই নেতাজীকে আমি প্রশ্ন করলাম— এর-পরে তিনি কি করবেন ?

কেন ? আমার প্রশ্ন শুনে শান্তভাবে তিনি একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, নতুন করে আবার শুরু করব। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, প্রস্তুতির পর্ব শেষ হলেই আবার যুদ্ধে নামব। তাছাড়া আর করবার কী আছে ? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে তো আর দাড়ি টেনে দেওয়া যায় না, যুদ্ধ চালাতেই হবে।

নেতাজীর মুখে আমি যেন আমার মনের কথাই শুনতে পেলাম। আমার চোখে সেদিন প্রায় জল এসে গিয়েছিল।

ব্রহ্মদেশ আর বর্মী-বাহিনী ব্রিটিশের হাতে চলে গিয়েছে—এই অবস্থায় আমার পক্ষে তখন কিছু করা সম্ভব ছিল না। নেতাজীকে আমি সেকথা বললাম। আমার অসুবিধের ব্যাপারটা তিনি বুঝলেন। পরে শুনলাম, তাঁর অনুগামীদের উদ্দেশে সেই সময়ে তিনি নাকি বলেছিলেন—জাপানও যদি পরাস্ত হয়, তবু আমরা হাল ছাড়ব না। নিজেরা যেটুকু পারি যুদ্ধ চালিয়ে যাব। জীবনের চরম সংকটকালে এই কথাগুলি তিনি বলেছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র যে কেমন মানুষ ছিলেন, তাঁর এই কথা থেকেই তা বুঝতে পারা যায়।

পরস্পরের কাছ থেকে আমরা বিদায় নিলাম। সামনে দীর্ঘ পথ। নিজের নিজের অনুগামীদের নিয়ে আলাদাভাবে এবার আমরা মৌলমিনের দিকে যাত্রা করব।

জীবনের একটা পর্যায়ে আমরা পরস্পরের খুব কাছে এসেছিলাম। অসংখ্য অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে একসঙ্গে এগিয়েছি, যুদ্ধ আমাদের দুজনের জীবনে প্রায় একই ফলাফল বহন করে এনেছিল, একই রকমের সঙ্কটের মোকাবিলা আমরা করেছি, একই সঙ্গে একাধিক শত্রুর সঙ্গে আমাদের লড়তে হচ্ছিল।

সামনে ছিল ব্রিটিশবাহিনী ; পেছনে, ভেতরে, চারপাশে ছিল গুপ্ত শত্রুরা। সেসব দিনের কথা যখন ভাবি চোখের সামনে তখন যেন একটা সুর‍্যারিয়ালিস্ট ছবি ভেসে ওঠে।

এত বাস্তব, অথচ এত অবাস্তব। ভালোয়-মন্দে, আশায়-আনন্দে-

বেদনায় সেই দিনগুলি ছিল আপ্লুত। একদিকে ছিল আশ্চর্য উল্লাস, অন্য-দিকে—অন্ধকার, নিবিড় নিরাশা।'

'I am a bron optimist and I shall not admit defeat under any circumstances'. —Netaji

রাত দশটায় সুভাষ রেঙ্গুন ত্যাগ করলেন সবাইকে নিয়ে। রেখে গেলেন দুটি মর্মস্পর্শী বিদায়-বাণী, যা আজো সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। প্রথমটি অফিসার এবং জওয়ানদের উদ্দেশ্যে। পরেরটা বর্মী এবং ভারতীয় জনসাধারণের উদ্দেশে।

'আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বীর অফিসার ও সৈন্যগণ—

১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে যে ব্রহ্মদেশে আপনারা অতুলনীয় বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন এবং এখনো করছেন, সেই ব্রহ্মদেশ আমি বেদনার্ত হৃদয়ে ছেড়ে যাচ্ছি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দফায় ইম্ফল এবং ব্রহ্মদেশে আমাদের ভাগ্য-বিড়ম্বনা ঘটেছে, কিন্তু এ তো শুধু প্রথম দফা। এখনো আমাদের দফায় দফায় লড়তে হবে। আমি আজন্ম আশাবাদী। কোন অবস্থাতেই আমি পরাজয় মেনে নিতে রাজী নই।

ইম্ফলের পাহাড়তলীতে, আরাকানের পাহাড়ে জঙ্গলে এবং ব্রহ্মদেশের তৈলাঞ্চল ও অন্যান্য এলাকায় শত্রুর বিরুদ্ধে আপনাদের কীর্তিকলাপ আমা-দের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

...ভারতবর্ষের মুক্তি হবে—এ বিশ্বাসে আজো আমি অটল। আমি আপনাদের হাতে সঁপে দিয়ে যাচ্ছি আমাদের জাতীয় ত্রিবর্ণ পতাকা, আমাদের জাতীয় সম্মান এবং ভারতের বীর যোদ্ধাদের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য। আমার বিন্দু-মাত্র সন্দেহ নেই যে, ভারতবর্ষের মুক্তিফৌজের অগ্রদূতরূপে আপনারা দেশের সম্মানের জন্য সব কিছু, এমন কি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে এমন উচ্চ আদর্শ স্থাপন করবেন, যা অন্য সবাইকে সর্বকালে অনুপ্রাণিত করবে।

নিজের ইচ্ছামত চলতে পারলে এই দুঃখের দিনে আমি আপনাদের মধ্যেই থেকে এই সাময়িক পরাজয়ের বেদনা সমানভাবে ভাগ করে নিতে পার-তাম। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য আমার মন্ত্রীমণ্ডলী এবং উচ্চ-পদস্থ অফিসারদের উপদেশে আমাকে ব্রহ্মদেশ ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে।

...আমার দিক থেকে আমি বলতে পারি যে, আটত্রিশ কোটি স্বদেশ-বাসীর স্বার্থরক্ষা ও তাদের মুক্তির জন্য সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করবার যে সঙ্কল্প ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর আমি গ্রহণ করেছি, সে সঙ্কল্পে আমি অবিচলিত থাকব।

পরিশেষে আপনাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ এই যে, আপনারাও আমার মত আশা এবং বিশ্বাস রাখুন,—গভীর অন্ধকারের পরেই দেখা দেয়

উষার অরুণ আলো। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই, অচিরেই হবে। ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দ্ জিন্দাবাদ! জয় হিন্দ্!

সুভাষচন্দ্র বসু
২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫ সর্বাধিনায়ক, আজাদ হিন্দ্ ফৌজ।'

* * *

'ভ্রাতা ও ভগিনীগণ,

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি ব্রহ্মদেশ ছেড়ে চলেছি। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে আমরা পরাজিত হয়েছি, তার জন্য আমাদের হতোদ্যম হবার কোন কারণ নেই।

ব্রহ্ম প্রবাসী স্বদেশবাসিগণ, যেভাবে আপনারা মাতৃভূমির প্রতি কর্তব্য পালন করেছেন, তা দেখে সারা বিশ্ব আজ মুগ্ধ। আপনারা মুক্তহস্তে আপনাদের ধন, জন ও সম্পত্তি দিয়েছেন। সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জগতে সত্যই দুর্লভ। আপনাদের আত্মত্যাগের কথা, বিশেষ করে ব্রহ্মে যখন আমি আমার হেডকোয়ার্টার্স নিয়ে আসি, তখন থেকে আপনারা যা করেছেন, সেকথা আমি জীবনে কোনদিনও ভুলতে পারব না।

মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য আমি আপনাদের কাছে আকুল আবেদন জানাই—আপনারা উন্নত শিরে, অদম্য উৎসাহে সেই শুভদিনের অপেক্ষা করুন, যেদিন আপনারা আবার ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবার সুযোগ পাবেন।

পরিশেষে ব্রহ্ম সরকার এবং ব্রহ্মবাসীদের আর একবার আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারছি নে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য আপনারা আমাদের প্রভূত সাহায্য করেছেন। এমন একদিন আসবে, যেদিন স্বাধীন ভারত মুক্তহস্তে এই কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করবে।'

জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাত্রি।

গাছপালা দিয়ে ঢাকা গাড়িগুলো ক্রমশ এগিয়ে চলেছে পেগু সড়ক ধরে। মোট ষোলখানা গাড়ি। তার মধ্যে চারটি মোটর কার। বাকীগুলো লরী।

কর্ণেল রাতুরীর নেতৃত্বে জানবাজ বাহিনী (বাহাদুর গ্রুপ) এগিয়ে চলেছে পায়ে হেঁটে। তাঁদেরও লক্ষ্য—তিনশো মাইল দূরবর্তী সেই ব্যাঙ্কক।

এ যাত্রা কুসুমাস্তীর্ণ নয়। মাথার উপরে শত্রু-বিমান। নীচে গুপ্তচর ও গেরিলা-আক্রমণের ভয়। কখন যে অলক্ষ্য থেকে মৃত্যু এসে হানা দেবে, কারো পক্ষেই তো জোর করে বলা সম্ভব নয়।

অবশ্য সুভাষের পক্ষে এটা নতুন কিছু নয়। এমনিভাবে বিপদসঙ্কুল পথে তিনি পা বাড়িয়েছেন বার বার। কলকাতা থেকে কাবুল, কাবুল থেকে

বার্লিন, বার্লিন থেকে টোকিও—কোনটাই কিছু কম বিপজ্জনক ছিল না সুভাষের পক্ষে। তবু কেউ কোনদিন পারেনি তাঁকে নিজের সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে। কি ব্রিটিশ—কি মার্কিন—কেউ না।

এবারের পরিস্থিতি আরো গুরুতর। গুপ্তচরের সাহায্যে সুভাষের রেঙ্গুন পরিত্যাগের খবর শত্রুপক্ষের নিশ্চয়ই জানতে বাকী নেই। এ অবস্থায় তারা যে সর্বশক্তি দিয়ে সুভাষের গতিরোধ করতে চেষ্টা করবে তাতে আর সন্দেহ কি! সেই প্রবল শক্তিকে বাধা দেবার মত উপযুক্ত সেনাবল সুভাষের তখন কোথায়?

তার চাইতেও বড় প্রশ্ন—পেগু। যে কোন মুহূর্তে পেগুর পতন হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। অথচ যেতে হবে সেই রেঙ্গুন-পেগু সড়ক ধরেই। তাছাড়া আর কোন পথই খোলা নেই তাদের সামনে।

কিন্তু ইতিমধ্যেই যদি পেগু ব্রিটিশের হাতে চলে গিয়ে থাকে? যদি সড়ক খোলা না থাকে?

না, সড়ক খোলা থাকবেই। দায়িত্ব নিয়েছেন সেই আরাকান বিজয়ী বীর মেজর এল. এস. মিশ্র। তাঁর এক কথা—'নেতাজী না যাওয়া পর্যন্ত পেগু সড়ক খোলা রাখার দায়িত্ব আমার। তার জন্য যদি নিজের জীবন দিতে হয় তো দেব, তবু আমার কথা আমি রাখবই।'

কেটে গেল এক ঘণ্টা। শুধু সুভাষ নন, জেনারেল চ্যাটার্জী, জেনারেল ভোঁসলে, জেনারেল কিয়ানী, কর্ণেল গুলজারা সিং, কর্ণেল প্রীতম সিং, কর্ণেল মালিক, কর্ণেল চোপরা, মেজর স্বামী, আয়ার সাহেব, জন এ. থিবি, কর্ণেল রাতুরী, মেজর আবিদ হাসান প্রমুখ সবার মনে তখন একই প্রশ্ন।

পেগুর খবর কি! হয়তো এর মধ্যেই পেগু চলে গেছে ব্রিটিশের হাতে। হয়তো তাদের হাতেই গিয়ে পড়তে হবে সবাই মিলে। কি যে ওখানকার অবস্থা—কে জানে!

সব কিছু এখন নির্ভর করছে সেই আরাকান বিজয়ী বীর মেজর মিশ্রের উপর। তিনি যদি সড়ক খোলা রাখতে পারেন তো ভালই, নয়তো সেখানেই শেষ।

হঠাৎ কি শুনে সবাই গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে আশ্রয় নিলেন এখানে-ওখানে। মাথার উপর জঙ্গী-বিমানের গর্জন। মনে হয় ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই আন্দাজ করতে পেরেছে ওরা।

এমনি করে বার বার। তার ফলে এগুতে হচ্ছে অতি ধীরে, চারিদিকে চোখ-কান খোলা রেখে। একটু এদিক-ওদিক হলেই যে বিপদ।

জ্যোৎস্নায় ফুটফুট করছে সারা প্রান্তর। সেই জ্যোৎস্নালোকের মধ্য দিয়েই গাড়ির কনভয়টা আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে পেগুর দিকে। ইতিমধ্যে তিনঘণ্টা কেটে গেছে। সূর্য ওঠার আগেই পেগুর সন্নিকটস্থ সেই মারাত্মক তে-রাস্তার মোড়টা পেরিয়ে যাওয়া যাবে কিনা কে জানে!

হঠাৎ কনভয়টা থেমে গেল পথের উপর। কানে আসছে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। একবার নয়, বার বার। তবে কি এর মধ্যেই পেগুর পতন হয়েছে ব্রিটিশের হাতে! না কি এখনো ওখানে জোর লড়াই চলছে দুপক্ষের মধ্যে!

কি করা যায় এখন! আর এগুনো ঠিক হবে কি! না কি আবার সেই রেঙ্গুন!

ইঙ্গিত পেয়ে নিমেষে একটা গাড়ি ছুটে গেল সামনের দিকে। খবর নিয়ে দেখা যাক, কি ব্যাপার। নইলে একসঙ্গে সবাই গিয়ে ফাঁদে পা দেওয়ার কোন অর্থই হয় না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িটা আবার ফিরে এল যথাস্থানে। না, খবর ভালো নয়, তবে সড়ক এখনো পর্যন্ত খোলাই আছে। মেজর মিশ্র আপ্রাণ চেষ্টা করছেন শত্রুপক্ষকে ঠেকিয়ে রাখতে। কতক্ষণ তা সম্ভব হবে বলা শক্ত।

আবার কনভয় এগিয়ে চলল পেগু সড়ক ধরে। অদূরে পেগু তখন জ্বলছে। কানে আসছে প্রচণ্ড গোলাগুলী ও বিস্ফোরণের শব্দ। দু-একটা এদিক-ওদিক ছিট্‌কে আসাটা মোটেই বিচিত্র নয়। বরং সেটাই স্বাভাবিক। তবু যেতে হবে। অদৃষ্টে যাই থাক না কেন, রাস্তা যখন খোলা রয়েছে, তখন শেষ চেষ্টা হিসেবে ঝুঁকি এক্ষেত্রে নিতেই হবে।

সামনেই সেই ভয়ঙ্কর তে-রাস্তা। ওখান থেকে একটা রাস্তা চলে গেছে পূর্বদিকে ওয়াতে। অন্যটা সোজা পেগুর দিকে। কনভয়ের লক্ষ্য—পূর্বদিকে অবস্থিত ওয়া।

কয়েকটা দমবন্ধ মুহূর্ত। চোখের সামনে কেমন যেন সব হারিয়ে যাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে, মিলেমিশে সব একাকার হয়ে যাচ্ছে। জীবন-মৃত্যু সব কিছুই যেন সেখানে অর্থহীন।

'Life and death lost all their meaning. We were alive at that moment but we were not sure that we would be alive the next'. [S. A. Ayer : P.—17]

এই সেই বিপদসঙ্কুল তে-রাস্তা, যার জন্য এত সতর্কতা। না, কোন ভয় নেই। শত্রুপক্ষের কেউ নেই কাছে-কিনারে। রাস্তা খোলাই রয়েছে। গো অন্। কুইক্! কুইক্!

বিদ্যুৎবেগে কনভয়টি ঘুরে গেল পূর্বদিকে অবস্থিত ওয়-র দিকে। যাক, আপাততঃ নিশ্চিন্ত। হাজার ধন্যবাদ আরাকান যুদ্ধের বীর সেনানায়ক মেজর মিশ্রকে। তিনি তাঁর কথা রেখেছেন।

হ্যাঁ, কথা রেখেছেন। বলেছিলেন—প্রয়োজন হলে নিজের প্রাণ দিয়েও আমি নেতাজীর জন্য সড়ক খোলা রাখব। সেকথা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। প্রাণ দিয়েই তিনি রাস্তা খোলা রেখেছেন নেতাজীর জন্য।

সবার অলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত এ অধ্যায়টি সত্যিই বড় মর্মান্তিক, মল্লিকা।

প্রথমেই তিনি যোগাযোগ করেছিলেন বিপক্ষ দলে সেনানায়ক জনৈক ভারতীয় কর্ণেলের সঙ্গে। তুমি ভারতীয়। একজন ভারতীয় হিসেবে তোমার কাছে আমার একমাত্র আবেদন—সড়ক বন্ধ করো না। নেতাজীকে তুমি নির্বিঘ্নে যেতে দাও।

—কক্ষণো না। উত্তর দিয়েছিলেন রাজভক্ত সেই ভারতীয় কর্ণেল, সুভাষ বোস বা আই. এন. এ.-র যাকে পাব, তাকেই আমি গুলী করে হত্যা করব, এই আমার শেষ কথা।

—সাবাস ! এই না হলে, ভারতীয় ! ঠিক আছে, পার তো তাই করো। তবে আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি, ততক্ষণ কিছুতেই তোমাদের এই সড়ক বন্ধ করতে দেব না।

—বেশ, পার তো বাধা দিও।

—সেটা কাজেই প্রমাণ পাবে। দেখবে, তুমি না পারলেও তোমার মতই আর একজন ভারতীয় তার দেশের জন্য, তার আদর্শের জন্য, নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য কত সহজে মৃত্যুবরণ করতে পারে।

সেই প্রমাণই সেদিন দিয়েছিলেন আজাদী বীর মেজর মিশ্র। দেখিয়েছিলেন যে, আজাদী সৈনিকের শপথ নিছক ফাঁকা আওয়াজ নয়।

মল্লিকা, সংসারে কেউ অমর নয়। সবাইকে একদিন মৃত্যুবরণ করতে হয় প্রাকৃতিক নিয়মে। কিন্তু নিজে মৃত্যুবরণ করে সবাইকে বাঁচানোর এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এর আগে তুমি কোথাও দেখছ কি ? শুনেছ কি কোনদিন ?

এ ঘটনা ঘটেছিল ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে। তারপর কত দিন কেটে গেছে। কিন্তু কে মনে রেখেছে তাঁর এই নিঃশেষ আত্মবিসর্জনের কথা ?

না, কেউ মনে রাখেনি। এমন কি তাঁর নামটা পর্যন্ত জানে না আজকের এই স্বাধীন দেশের তরুণ-তরুণীর দল। দোষ তোমাদের নয় মল্লিকা, আমাদের। দলীয় স্বার্থ আমাদের দৃষ্টিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে, দলের চাইতেও যে দেশ বড়—এই বাস্তব সত্যটাকে স্বীকার করতে পর্যন্ত আজ আমরা ঠেলে গিয়েছি। তাই আমরাই সেদিনের এই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে তুলে ধরতে চেষ্টা করিনি তোমাদের কাছে। দুঃখের হলেও একথা সত্য। যাক, আগেকার কথায় ফিরে যাই।

বিপদসংকুল সেই তে-রাস্তা পেরিয়ে ভোররাত্রে কনভয় এসে পৌঁছল একটা নিরাপদ জায়গাতে। দিনের আলোতে পথ চলা সম্ভব নয়, তাই আপাতত বিরতি। আবার যাত্রা শুরু হবে—রাত্রে।

পরের কাহিনীর কিছু অংশ তোমারই মত একটি মেয়ে, ঝাঁসির রাণী ডিটাচ্‌মেণ্টের কম্যাণ্ডার মিস্‌ জানকী থিবার্সের ডায়েরী থেকে (বিদ্রোহী কন্যার রোজনামচা) তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি। সেদিন রাণীবাহিনীর যে শতাধিক মেয়ে পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে পাল্লা দিয়ে হাসিমুখে সবকিছু মেনে

নিয়ে এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন, লেঃ থিবাস্রে তাঁদেরই একজন।

আপাতত তাঁর কথাগুলো তুমি শুধু শুনে যাও। তারপর একটা প্রশ্ন করো নিজেকে। প্রশ্ন করো যে, আজ যদি প্রয়োজন হয় তাহলে দেশের জন্য, নিজের মাতৃভূমির জন্য এমনি অবর্ণনীয় কষ্ট তুমি হাসিমুখে সহ্য করতে পারবে কি? পারবে কি তখন ওঁদের মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে? না কি দুদিন বাদেই ভেঙে পড়বে অসহায়ভাবে? যাক, আমি ডায়েরীর পাতা উল্টে যাচ্ছি ঃ

'২৫শে এপ্রিল।

গতরাত্রে নেতাজী একটু বিশ্রামও করতে পারেননি। কে-কোন্ লরীতে যাবে নিজেই সে-সব ব্যবস্থা করেছিলেন এবং কখন কিভাবে যাত্রা শুরু করতে হবে তার নির্দেশ দিচ্ছিলেন। কি অদ্ভুত কর্মী! সবকিছু খুঁটিনাটির হিসেব নেওয়া চাই। সব কাজ শেষ করে তবে তিনি গেলেন এক পেয়ালা চা খেতে।

না ঘুমিয়ে তাঁর চোখদুটি লাল হয়ে গিয়েছিল, তবু এতটুকু ক্লান্ত দেখাচ্ছিল না তাঁকে। একেবারেই যেন বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন তিনি। মাথার উপর শত্রুপক্ষের জঙ্গী-বিমান ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু সে-সব দেখেও যেন দেখছেন না। আমি সবসময় তাঁর পাশে পাশে রয়েছি। আমি তাঁকে দেখাশোনা করবই।

অনেকক্ষণ পরে এবার নেতাজী একটু বিশ্রাম করবার জন্য বসলেন। তারপর একসময়ে দাড়ি কামাতে শুরু করলেন। ঠিক তখনই শত্রুপক্ষের তিনটি জঙ্গী-বিমান আমরা যেখানে বসে ছিলাম, তার মাথার উপর দিয়ে ঘুরপাক খেতে লাগল। আমরা সবাই পরিখার মধ্যে আশ্রয় নিলাম। নেতাজী তেমনিভাবেই দাড়ি কামাতে লাগলেন। কোনরকম আশ্রয় নিলেন না তিনি।

এরপর মেয়েরা যেখানে বিশ্রাম করছে, নেতাজী সেই জায়গা পরিদর্শন করা স্থির করলেন। আমরা তখন খোলা একটা ধানক্ষেতের মাঝ দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মাথার উপর ছ খানা জঙ্গী-বিমান এসে হাজির। আমি নেতাজীকে নীচু হয়ে আশ্রয় নিতে বললাম, কিন্তু কোথায় আশ্রয়! কাছা-কাছি কোন পরিখা নেই।

আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। শত্রু বিমানের জন্য নয়, নেতাজীর নিরাপত্তার জন্য। বিমানগুলি আমাদের দেখতে না পেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। এ কি যাদু, না মন্ত্রশক্তি! নইলে বার বার তিনি এমনি অদ্ভুতভাবে রেহাই পাচ্ছেন কি করে?

এখন বিকেল চারটে। নেতাজী একটা মানচিত্র নিয়ে কি যেন দেখছেন। তারপরই একজন বার্তাবাহককে মোটর সাইকেল নিয়ে ছুটে যেতে বললেন 'জানবাজ' বাহিনীর কাছে। তারা যেন খোলা সড়ক ছেড়ে রেললাইন ধরে

আসে, নয়তো শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্কবাহিনীর মুখোমুখি হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে।

হুকুমটা তিনি ঠিক সময়েই দিয়েছিলেন। কারণ, পরে কর্ণেল রাতুরীর কাছ থেকে শুনেছিলাম যে, আমাদের বাহিনী সড়ক ছেড়ে আসার কয়েক মিনিট বাদেই নাকি ওখানে শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্ক এসে পড়ে। তার ফলে আমাদের জওয়ানরা অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে যায়।

সন্ধ্যা ছ-টায় আবার আমরা যাবার জন্য প্রস্তুত হবার আদেশ পেলাম। নেতাজী কেবলই এদিক-ওদিক ছুটছিলেন। খুব জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল তখন। নেতাজী ভিজে একেবারে একাকার।

সন্ধ্যার পর আমাদের লরী ও গাড়িগুলি চলতে শুরু করল। জাপানী-দের শত-শত লরীও তখন ওয়া-র দিকে ছুটছিল। ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক এসে পড়ার আগেই তারা চাইছিল সিতাং নদীর ওপারে চলে যেতে।

রাস্তার অবস্থা অতি শোচনীয়। হঠাৎ নেতাজীর গাড়ি আট ফুট গভীর একটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তাঁর কোন আঘাত লাগেনি। গাড়িটা ওখানেই রেখে যেতে হল। অবশেষে রাত প্রায় দুটোয় আমরা ওয়া পেঁৗছে গেলাম।

২৬শে এপ্রিল।

ওয়া নদীর উপর কোন সেতু নেই। আমাদের খেয়া নৌকোয় পার হতে হবে। জাপানী জেনারেল ইসোদা এগিয়ে এসে নেতাজীকে প্রথম পার হয়ে যেতে বললেন। নেতাজী রাজী হলেন না। বললেন—মেয়েরা সবাই ওপারে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

কর্ণেল মালিক ও মেজর স্বামী পরীক্ষা করে দেখলেন, এক জায়গায় নদীর জল ছ-ফুট মাত্র গভীর। আমি মেয়েদের মার্চ করে ওখানে গিয়ে সাঁতরে নদী পার হতে আদেশ দিলাম। রাইফেল হাতে নিয়ে সবাই সে আদেশ মেনে নিয়ে ওপারে চলে গেল। কেউ কেউ ডুবে যাচ্ছিল, কিন্তু কর্ণেল মালিকের সুদীর্ঘ দেহকে ধন্যবাদ! তিনিই বাঁচিয়ে দিলেন সবাইকে।

ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। নেতাজীর জন্য খুবই দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমাদের। খেয়াতে লরী পার করানোর জন্য তিনি তখনো নদীর ওপারে রয়েছেন। যে কোন মুহূর্তে শত্রু-বিমানের দেখা দেওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

একেবারে শেষ খেয়ায় নেতাজী এপারে চলে এলেন। সারারাত চেষ্টা করে মোট ছ-খানি লরীকে তিনি এপারে আনতে সক্ষম হয়েছেন। বাকিগুলোকে ওপারেই ফেলে আসতে হল। দিনের আলোতে শত্রু-বিমানের ভয়ে লরী তো দূরের কথা, কোন মানুষের পক্ষে নদী পার হওয়া সম্ভব নয়।

আমরা নেতাজীকে একটু বিশ্রাম করে চা খেতে বললাম। কিন্তু তাঁর বিশ্রামের অবকাশ কোথায়! তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নিয়ে শত্রুদৃষ্টি এড়ানোর

জন্য লরীগুলোকে ডালপালা দিয়ে ঠিকমত ঢেকে রাখা হয়েছে কিনা তাই দেখতে ছুটে গেলেন।

বেলা প্রায় তিনটের সময় ছ-খানি ব্রিটিশ জঙ্গী-বিমান আমাদের মাথার উপর এসে ঘুরতে লাগল। আমরা সবাই গাছের গুঁড়ির আড়ালে আশ্রয় নিলাম।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে বিমানগুলি আমাদের এলাকার উপর আক্রমণ চালায়। সেই সঙ্গে একটানা মেসিনগান। আমাদের পাঁচখানি লরী পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যানবাহন বলতে আর অল্পই অবশিষ্ট রইল আমাদের।

নেতাজী যে কি করে রক্ষা পেলেন, তা ভাবতে গেলে অলৌকিক ব্যাপার বলে মনে হয়।'

অধিকাংশ যানবাহন বিধ্বস্ত।

লটবহর, সরকারী ফাইলপত্র এবং দলিল-দস্তাবেজও খোয়াতে হয়েছে বিস্তর।

তবু কোন দুঃখ নেই সুভাষের। তবু সারামুখে তাঁর সেই মনভোলানো হাসি। যেন ভাবনামুক্ত এক সদানন্দ পুরুষ। আয়ার সাহেবের ভাষায়ঃ

'সেই পরিবেশে আমি আরো ভালো করে নেতাজীকে দেখলাম। সৈনিক, রাজনীতিবিদ, নেতা এবং গোটা মানুষ—সব মিলিয়ে একটা বিরাট ব্যক্তিত্ব ও দুর্লভ মহত্বের আলোতে বর্মা-থাইল্যাণ্ডের সেই বনভূমি যেন আলোকিত হয়ে উঠেছে।'

যাক, ডায়েরীর পাতা আবার উল্টে যাচ্ছি। ২৬শে এপ্রিলের কাহিনী আগেই শুনেছ। এবার শোন ২৭শে এপ্রিলের কথাঃ

'আজ আমাদের যাত্রা শুরু হল দুপুররাত্রেরও পরে। বৃষ্টির দরুন পথে কাদা হয়েছিল, তাই গাড়ির চাকাগুলো বার বার আটকে যাচ্ছিল। তার ফলে আমরা মোটেই এগুতে পারছিলাম না। নেতাজী গাড়িগুলো কর্ণেল চোপরার তত্বাবধানে রেখে রাণীবাহিনীর মেয়েদের নিয়ে সিতাং নদী পর্যন্ত—অবশিষ্ট দশ মাইল হেঁটে গেলেন।

শোনা গেল, শত্রুবাহিনী নাকি আমাদের অনুসরণ করে ক্রমেই এগিয়ে আসছে। সিতাং নদী পার হয়ে যেতে পারলে আমরা অবশ্য খানিকটা নিরাপদ। কারণ, ওপারে শক্তিশালী জাপ-বাহিনী ইতিমধ্যেই তাদের ঘাঁটি সুদৃঢ় করে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

ভোর হবার আগেই আমরা সিতাং পেরিয়ে এলাম। আমাদের যানবাহনগুলো খেয়াঘাটে এসে গিয়েছিল। আজ আবার প্রবল মেসিনগান ও বোমাবর্ষণ করা হল। লেঃ নাজির আহাম্মদ প্রাণ হারালেন এই বোমাবর্ষণের ফলে।

নেতাজীর গাড়ি এবং একটা লরী এপারে আনা সম্ভব হয়েছে মাত্র। আর সবই রয়ে গেছে ওপারে। জাপানীদেরও হাজার হাজার লরী ওপারে ছিল। শত্রুপক্ষের বোমারু-বিমান সব পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

এখন থেকে আমাদের পায়ে হে'টে যেতে হবে। পথে প্রায় হাঁটুসমান কাদা। আমরা মেয়েরা সবাই যার যার রসদ, রাইফেল, গুলী-বারুদ, হাতবোমা, নিজেরাই সব বহন করে চলেছি। পথে শত্রু গেরিলাদল বার বার হানা দিতে চেষ্টা করছিল। আমরা সব সময়েই তাদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে চলেছি। প্রতিটি মেয়ে প্রায় সতেরো সের মাল বহন করে চলেছি।

নেতাজীও দলের সঙ্গে নিজের মাল নিজেই বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই রাতে আমরা প্রায় দশ মাইল পথ অতিক্রম করেছিলাম।

২৮শে এপ্রিল।

আজ ভোরে একটা গাঁয়ে আমরা আশ্রয় নিয়েছি।

সন্ধ্যায় এখান থেকে যাত্রা শুরু করে আবার আমরা প্রায় পনেরো মাইল পথ অতিক্রম করেছি। প্রায় নিশাচর হয়ে উঠেছি আমরা। এভাবে পথ চলতে আগেই আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, তাই খুব একটা কষ্ট হচ্ছিল না আমাদের।

২৯শে এপ্রিল।

আজ পুরোপুরি বিশ্রাম। পথ চলা থেকে আজ বিরতি। নেতাজীকে বললাম—ভারী বুটজোড়া থেকে আজ পা দুটোকে একটু বিশ্রাম দিন। আর মোজা জোড়া খুলে দিন, ধুয়ে দিচ্ছি।

নেতাজী জুতো-মোজা খুলতেই নজরে পড়ল তাঁর সমস্ত পা ফোস্কায় ভরে গেছে। গাড়ি পিছু পিছু এলেও তিনি হে'টেই এসেছেন বরাবর। আমরা তাঁকে বার বার গাড়িতে উঠতে বলেছি, কিন্তু তিনি তা শোনেননি।

আবার আমাদের যাত্রা শুরু হল সন্ধ্যা-লগ্নে। নেতাজী আগের মতই দলের সঙ্গে যেতে লাগলেন এবং পায়ে ফোস্কা থাকা সত্ত্বেও পনেরো মাইল পর্যন্ত হে'টে গেলেন আমাদের সঙ্গে।

নেতাজীর সঙ্গে যে জাপানী জেনারেল আসছিলেন, তিনি তাঁকে বার বার গাড়িতে যেতে অনুরোধ করলেন, কিন্তু নেতাজী কিছুতেই সম্মত হলেন না।

জানবাজ দল আজ নদী পার হতে পারেনি। তারা এখনো অনেক দূরে—'বিলিন'-এর ওপারে রয়েছে।

সন্ধ্যায় জাপানী জেনারেল ইসোদা মৌলমিন থেকে কয়েকটা লরী নিয়ে এসে নেতাজীকে বললেন—আপনি রাণীবাহিনীর মেয়েদের নিয়ে এই লরী করে চলে যান, জানবাজ দল পরে পায়ে হে'টে যাবে।

তিনি রাজী হলেন না। বোধহয় ভাবছিলেন, তিনি চলে গেলে জানবাজ দলের খেয়া পার হতে অসুবিধে হতে পারে।

প্রায় পনেরো মাইল অতিক্রম করে ৩০শে এপ্রিল ভোরে আমরা মৌল-মিনের কাছাকাছি একটা গাঁয়ে আশ্রয় নিলাম।

১লা মে, ১৯৪৫ সাল।

সকাল বেলায়ই আমরা মৌলমিনে এসেছি। এই ছ'-দিনে নেতাজী কোনদিনই দু ঘণ্টার বেশি ঘুমোতে পারেননি। আমরা রাত্রে পথ চলেছি, কিন্তু দিনের বেলায় একমাত্র নেতাজী ছাড়া সবাই আমরা বিশ্রাম করেছি। তিনি সারাদিন কিসে সবার সুখ-সুবিধা হবে, তাই দেখে বেরিয়েছেন।

মৌলমিন এসেও তাঁর বিশ্রাম নেই। যেন এক দৈবশক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করে চলেছেন তিনি। ছ'দিন অর্ধাহারের পর আজ আমাদের জন্য খুব ভাল খাবারের ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু পথশ্রমে আমরা এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, কিছুই খেতে পারিনি।

নেতাজী আমাদের জন্য ট্রেনের ব্যবস্থা করেছেন। ঠিক হয়েছে, এখান থেকে ব্যাঙ্কক পর্যন্ত মেয়েরা সবাই ট্রেনে যাবে। সঙ্গে থাকবেন জেনারেল চ্যাটার্জী এবং কর্ণেল মালিক। নেতাজী কিন্তু মৌলমিনেই রয়ে গেলেন। জানবাজ দল না আসা পর্যন্ত কিছুতেই তিনি রাজী হলেন না মৌলমিন ত্যাগ করতে।

গভীর রাত্রে মালগাড়িতে চেপে মৌলমিন ত্যাগ করলাম। বিশ মাইল গিয়েই গাড়ি থেমে গেল। শোনা গেল, মার্কিন বিমান-বহর নাকি কাছাকাছিই একটা সেতু উড়িয়ে দিয়েছে। পরবর্তী রেলস্টেশনে যেতে হলে এখন আমাদের ষোল মাইল হাঁটতে হবে। সারারাত পথ চলে সেখানে পেঁছে গেলাম পরদিন ভোরে। গিয়ে দেখি, সেই ছোট স্টেশনটাও রেহাই পায়নি বোমারু-বিমানের হাত থেকে। তবে ভরসার কথা এই যে, রেল-লাইনের কোন ক্ষতি হয়নি।

বুক থেকে যেন একটা পাষাণ-ভার নেমে গেল সুভাষের। ভাবনা ছিল মেয়েদের নিয়ে। এ যে কত বড় গুরুদায়িত্ব তা ভাষায় বোঝানো যাবে না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তাদের কোনরকমে পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত।

'From the moment our convoy left Rangoon, Netaji's one serious concern was for the safety of the Rani of Jhansi Regiment girls, the minimum food necessary to sustain them through the risky adventure and some little privacy for them whenever we camped near any village or in the jungle.

What a responsibility, having to look after some one hundred girls on the three hundred mile jungle trek from Rangoon to Bangkok!' [S. A. Ayer : P.—22]

যথাসময়ে মেজর জেনারেল চ্যাটার্জী এবং কর্ণেল মালিক ব্যাঙ্কক পেঁছে গেলেন মেয়েদের নিয়ে। সুভাষ নিজে রইলেন মৌলমিনে। দলের সবাই না আসা পর্যন্ত মৌলমিন পরিত্যাগ করতে তিনি রাজী নন।

পরের কাহিনী বিপক্ষ শিবির থেকেই বরং শোনা যাক। দেখা যাক, তাদের কি অভিমত এ সম্বন্ধে ঃ

'রেঙ্গুন থেকে শ্যাম (থাইল্যান্ড)। দীর্ঘ কষ্টকর পথ।...বিষাদে মন তাঁর (সুভাষচন্দ্রের) ভারাক্রান্ত। তিনি চাইতেন সর্বক্ষণ কাজের মধ্যে মগ্ন থাকতে। সে ইচ্ছে তাঁর পূরণ হতো সঙ্গী ও সাথীদের সযত্ন তত্ত্বাবধানের মধ্য দিয়ে।

...অন্ধকার নামলেই শুরু হতো পলাতকদের যাত্রা। ভোর হলেই তারা আত্মগোপনের জন্য এমন একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজত, যেখানে সারাটা দিন কাটানো চলে।

পানীয় জল আছে তো! খাবার-দাবার! যখনই কোথাও বিশ্রাম নেওয়া হতো, সুভাষচন্দ্র দলের লোকজনদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে এসব ব্যাপারে খোঁজ নিতেন। লোক গণনা করতেন। পায়ে ফোস্কা পড়ে যাদের ঘা হয়েছে এবং যারা অসুস্থ, তাদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা করতেন।

ফেরীতে নদী পার হবার সময় সুভাষচন্দ্র নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নির্দেশ দিতেন, ওপারে গাড়িগুলো যাতে নির্বিঘ্নে পেঁছুতে পারে তার জন্য নিজ-হাতে মেহনত করতেন। তাঁর ক্লান্তিহীনতা, সবার সঙ্গে দুঃখ ভাগ করে নেবার ক্ষমতা এবং ব্যক্তিগত সাহস দেখে সবাই মুগ্ধ হতো।

মৌলমিনে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে দলের অর্ধেক লোক রওনা হল ট্রেনে। ট্রেনে যেতে কম কষ্ট পেতে হয়নি। ট্রেন চলে শুধু রাত্রে, তাও খুব আস্তে আস্তে। সবাইকে গাড়িতে তুলে দিয়ে সুভাষচন্দ্র নিজেও একদিন রওনা হয়ে গেলেন ব্যাঙককের উদ্দেশে। দীর্ঘ একুশ দিন পরে অবশেষে ব্যাঙকক। তারিখটা ছিল ১৪ই মে।'

মৌলমিন থাকতেই খবরটা পেয়েছিলেন সুভাষ।

জার্মানী পরাজিত। হিটলার আত্মহত্যা করেছেন। আত্মহত্যা করেছেন প্রচার-সচিব ডঃ গোয়েবলস এবং গেস্টাপো বাহিনীর অধিকর্তা হেনরিক হিম-লার। সেই সঙ্গে শোনা গেছে নতুন উত্তরাধিকারী এ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎস-এর বেতার-ঘোষণা ঃ

'German men and women! Soldiers of the German Wehrmacht.' Our Fuehrer Adolf Hitler has fallen....It is my first task to save the German people from destruction by Bolshevism.

The Fuehrer is dead. Long live the Fuehrer. The Fuehrer has fallen in battle at the head of the heroic defenders of the Reich Capital. Inspired by his resolve to save his people and Europe from destruction he sacrificed his life.

৭ই মে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ। জার্মানীর পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করেছেন ফিল্ড-মার্শাল কাইটেল, জেনারেল জোড্‌ল্‌, জেনারেল স্টুম্‌ফ্‌

এবং এ্যাডমিরাল ভন ফ্রেইডবার্গ। আমরা নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করছি মিত্রবাহিনীর কাছে। আমরা পরাজিত।

'We, the undersingned, acting by the authority of the German High Command, hereby surrender unconditionally to the Supreme Commander, Allied Expeditionary Force, and simultaneously to the Supreme High Command of the Red Army, all forces on land, at sea and in the air who are at this date under German control.'

তারপরই শুরু হয়েছে গ্রেপ্তার। ৯ই মে গ্রেপ্তার করা হয়েছে গোয়েরিং এবং মার্শাল কেসেলরিংকে। ২৪শে মে নতুন উত্তরাধিকারী ডোয়েনিৎস। ১৫ই জুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ। এছাড়া কাইটেল, জোড্ল্, ফ্র্যাঙ্ক, রেডার, প্যাপেন—এ'রা তো আছেনই।

ভাবতে ভাবতে কোথায় তলিয়ে যান সুভাষ। মনে পড়ে কত নাম। কত পরিচিত মুখ।

নাম্বিয়ার, গনপুলে, গিরিজা মুখার্জী, কুসুম পাল, বিনু সেন, শর্মা, সুলতান, ভনট্রট, কেপ্লার, ওয়র্থ, হারবিচ—এমনি কতজন। ওঁরা কেমন আছেন এখন? পরমশুভার্থী বন্ধু ভনট্রট আগেই প্রাণ দিয়েছেন হিটলারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অপরাধে। আরো কতজনকে যে প্রাণ দিতে হবে কে জানে!

বার্লিনে তাঁর বাসস্থান সেই ৬নং সোফেনট্রাস ভবনটি কি আছে এখনো? না কি এর মধ্যেই ধুলিসাৎ হয়ে গেছে বোমাবর্ষণের ফলে?*

এদিকে ১লা মে (১৯৪৫) পতন হয়েছে রেঙ্গুনের।

সবার পুরোভাগে সেই প্রভুভক্ত ভারতীয় কর্ণেল, যার একান্ত বাসনা ছিল—সুভাষ এবং তাঁর আজাদী বাহিনীকে লাইন করে দাঁড় করিয়ে গুলী করে হত্যা করা।

সে কি বিচিত্র সংবর্ধনা সেদিন ব্রিটিশ বাহিনীর! পথে-ঘাটে, হাটে-মাঠে, সর্বত্র এক ধ্বনি—ইনকিলাব জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দ্ জিন্দাবাদ! নেতাজী জিন্দাবাদ!

"When enemy troops marched through streets in Rangoon they heard slogans: 'Inquilab Zindabad', 'Azad Hind Zindabad', 'Netaji Zindabad' echoing and re-ehoing everywhere." [The Contemporary: Debnath Das: June, 1973]

ক্ষেপে গেলেন প্রভুভক্ত কর্ণেল। এতবড় সাহস! এখনো কিনা ব্রিটিশের পয়লা নম্বর শত্রু সুভাষ বোস এবং তাঁর আজাদ হিন্দের নামে জয়ধ্বনি! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজাটা!

* ৬নং সোফেনট্রাস ভবনটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল বোমাবর্ষণের ফলে।

সঙ্গে সঙ্গেই জারী করা হল এক কঠোর আদেশ। শহরবাসীকে নিজের হাতে সব ধ্বংসস্তূপ সরাতে হবে। আবর্জনা সাফ করতে হবে। দরকার হলে মলমূত্রাদি পর্যন্ত পরিষ্কার করতে হবে। আজাদী সৈনিকদের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। তাদেরও সবকিছু করতে হবে নিজের হাতে। অন্যথায় কঠোর শাস্তি।

সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা-আদেশ জারী করলেন আজাদী বাহিনীর মেজর জেনারেল লোগনাথন। কোন আজাদী সৈনিক এ হুকুম মানবে না। ভুলে যেও না যে, তোমরা নেতাজীর আজাদী সৈনিক।

'Major General Loganathan who was Netaji's representative in Burma protested and ordered that not a single soldier of the Indian National Army would go for fatigue-duty'. [Ibid]

একই প্রতিবাদ-ধ্বনি শোনা গেল জনসাধারণের কণ্ঠে। এ কি মগের মুল্লুক নাকি! এ হুকুম আমরা মানিনে। মানব না।

দিনকাল ভাল নয়। জনসাধারণের মতিগতিও সুবিধের নয়। তাই প্রভু-ভক্ত কর্ণেলকে সরিয়ে এবার যাঁকে আনা হল, তিনি হলেন ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর অন্য একজন কর্ণেল, নাম—থিমাইয়া। হ্যাঁ, ঠিকই অনুমান করেছ তুমি। এই থিমাইয়াই ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ সেনানায়ক পদে অনুষ্ঠিত হয়েছিলেন পরবর্তীকালে।

দেখতে দেখতেই শহরের অন্য চেহারা। সবাই খুশি। থিমাইয়া আর-যা-ই হোন, আগেকার সেই রাজভক্ত কর্ণেল নন।

ঠিক এমনি সময়েই একদিন থিমাইয়া গিয়ে হাজির হলেন আজাদ হিন্দ্ ফৌজের হেড কোয়ার্টার্সে।

—আজাদ হিন্দ্ ফৌজের আত্মসমর্পণ সম্বন্ধে আমি মেজর জেনারেল লোগনাথনের সঙ্গে কথা বলতে চাই। কোথায় তিনি?

—তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে রাজী নন।

—কে? চমকে উঠলেন কর্ণেল থিমাইয়া। দুচোখে তাঁর অনন্ত বিস্ময়। চোখের সামনে দণ্ডায়মান কে এই লোকটি? কে? কে?

—আমি আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কর্ণেল থিমাইয়া।

আশ্চর্য যোগাযোগ! নাম এক। পদমর্যাদার দিক থেকেও এক। দুজনেই কর্ণেল। শুধু একজন ব্রিটিশ-পক্ষীয়, অন্যজন আজাদী বাহিনীর।

—শুনুন কর্ণেল! ধীর, স্থির এবং গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন আজাদী বাহিনীর কর্ণেল থিমাইয়া, আমাদের সুপ্রীম কম্যাণ্ডার নেতাজীর নির্দেশ, উপযুক্ত মর্যাদাসহকারে আমাদের আত্মসমর্পণ করতে হবে। তার আগে আমাদের শর্তগুলি আপনাকে জানিয়ে দেওয়া কর্তব্য বলে মনে করি।

—বেশ, আপনাদের শর্ত কি বলুন?

—আজাদ হিন্দ্ সরকার সম্পূর্ণ বৈধ স্বাধীন সরকার। সুতরাং আমাদের প্রধান শর্ত—স্বাধীন সরকারের যুদ্ধবন্দীদের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা আমাদের দিতে হবে।

—বেশ, বলে যান।

—এ সম্বন্ধে আমাদের ভারপ্রাপ্ত অফিসার মেজর জেনারেল লোগনাথনের সঙ্গে কথা বলার জন্য ব্রিটিশ-পক্ষের সমপদমর্যাদাসম্পন্ন কাউকে আসতে হবে। আর—চুক্তি-স্বাক্ষরিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের ব্যারাকে জাতীয় পতাকা যেমন আছে, তেমনিভাবেই উড্ডীয়মান থাকবে।

—ব্রিটিশ সরকার যদি এ শর্তে রাজী না থাকেন?

—সে ক্ষেত্রে লড়াই চালিয়ে যাওয়াই আমরা সম্মানজনক বলে মনে করব। এখনো আমাদের ব্যারাকে ছ-হাজার সৈন্য রয়েছে। অস্ত্রশস্ত্রেরও অভাব নেই। সুতরাং মাথা হেঁট করার কোন প্রশ্নই আসে না। তবে সেটা না হলেই নেতাজী সবচাইতে বেশি খুশি হবেন। তাঁর বক্তব্য—বর্মা আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছে। আমাদের খাইয়েছে, পরিয়েছে, থাকার জায়গা দিয়েছে। এর পরেও নতুন করে রক্তপাত ঘটলে তাদের দুঃখের বোঝা বাড়বে বৈ কমবে না। সেটা খুবই মর্মান্তিক হবে সন্দেহ নেই।

স্থির অপলক দৃষ্টিতে দুজন তাকিয়ে রইলেন দুজনের দিকে। আর কোন কথা নয়। বুঝি সব কথাই তাঁদের হারিয়ে গেছে অপ্রত্যাশিত এক রহস্যের সন্ধান পেয়ে।

—ঠিক আছে, আমি এখন যাচ্ছি। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য আমরা পরে জানাব। গুডবাই!

—জয় হিন্দ্!

উঠে দাঁড়ালেন ব্রিটিশ-পক্ষের কর্ণেল থিমাইয়া। তারপরই তিনি পা চালিয়ে দিলেন বাইরে রক্ষিত জীপ গাড়িটার দিকে। কথা শেষ। এবার তাঁকে ফিরে যেতে হবে নিজেদের সেনাবাহিনীর হেড-কোয়ার্টার্সে।

আর আজাদী বাহিনীর থিমাইয়া! শেষ পর্যন্ত তিনি তাকিয়ে রইলেন ব্রিটিশ বাহিনীর কর্ণেল থিমাইয়ার অপসৃয়মান দেহটার দিকে। ঐ যে তাঁর জীপ গাড়িটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে পথের বাঁকে। না, আর দেখা যাচ্ছে না। গাড়িটা হারিয়ে গেছে দৃষ্টির আড়ালে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই থিমাইয়া পেঁৗছে গেলেন ব্রিটিশ হেডকোয়ার্টার্সে। চোখে মুখে তাঁর দুঃসহ বেদনার ছাপ। একথা কাউকে বলার নয়। কাউকে বোঝাবার নয়। এ দুঃখ, এ গর্ব তাঁর একার।

কে ঐ আজাদী বাহিনীর কর্ণেল থিমাইয়া। ও যে তাঁরই বড় আদরের আপন সহোদর ভাই! 'Both Thimayas are own brothers.' দীর্ঘদিন বাদে এমন আকস্মিকভাবে যে আজ তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে তা কে জানত।

কত কথা বলার ছিল। শোনার ছিল কত কথা। কিছুই করা হল না।

উপায়ও ছিল না। তিনি যে সামরিক আইনের নাগপাশে আবদ্ধ এক ব্রিটিশ-ভারতীয় কর্ণেল। শত্রুপক্ষকে অভ্যর্থনা করার মত সাধ্য তাঁর কোথায় ?

অবশেষে আত্মসমর্পণ। ফলে মেজর জেনারেল লোগনাথন, কর্ণেল আর্শাদ, কর্ণেল থিমাইয়া, আজাদ হিন্দ্ ব্যাঙ্কের পরিচালক মিঃ ভাদুড়ী প্রমুখ সবারই স্থান হয়েছে বন্দী-নিবাসে। মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান, কর্ণেল সেইগল, মেজর ধীলন, কর্ণেল এস. এম. হুসেন, মেজর জেনারেল আজিজ আহম্মদ প্রমুখ আগেই বন্দী হয়েছেন যুদ্ধক্ষেত্রে। কর্ণেল লক্ষ্মী স্বামীনাথন ধরা পড়েছেন শত্রুদের হাতে। লীগের চেয়ারম্যান এ. ইয়েল্যাপ্পা শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন বোমা বিস্ফোরণের ফলে।

ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন রেঙ্গুনের ঝাঁসী রাণীবাহিনীর মেয়েরা।

সুভাষের নির্দেশ ছিল—পরাজয়ই যদি মানতে হয় তো সে পরাজয়কে বীরের মতই মানতে হবে। সে নির্দেশ তাঁরা অক্ষরে অক্ষরেই পালন করেছেন। কোথাও তাঁরা মাথা হেঁট করেননি শত্রুপক্ষের কাছে। একটি মেয়েও না।

যথাসময়ে প্রতিটি মেয়ের কাছে নোটিশ এসে হাজির। নির্দিষ্ট দিনে সবাইকে গিয়ে দেখা করতে হবে ব্রিটিশ বাহিনীর সদর-দপ্তরে। মিলিটারী ইউনিফর্ম পরে নয়, বেসামরিক পোশাকে। সাবধান, আদেশের যেন নড়চড় না হয় !

সবাই গিয়ে হাজির হল নির্দিষ্ট তারিখে। কিন্তু একি ! কান্ড দেখে ব্রিটিশ ব্রিগেডিয়ার মিঃ লয়ডার স্তম্ভিত। কেউ তাঁর আদেশ গ্রাহ্য করেননি। সবাই তাঁর নির্দেশ অমান্য করে হাজির হয়েছেন মিলিটারী ইউনিফর্ম পরে, অসামরিক বেশে নয়।

বিস্ময়ের পর বিস্ময়। এই বাড়িটাতে আগে ছিল আজাদ হিন্দ্ সরকারের একটি বিশেষ দপ্তর। কি করে যেন ওখানে সুভাষের একটা ফটো রয়ে গিয়েছিল ভুল করে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সেটা নজরেই আসেনি।

চোখ এড়ায়নি রাণীবাহিনীর মেয়েদের। তারপর সে এক অভাবনীয় দৃশ্য ! নিমেষে মেয়েরা লাইন করে দাঁড়ালেন এ্যাটেনশনের ভঙ্গীতে। তার-পরই সামরিক কায়দায় স্যালুট। জয় হিন্দ্ ! নেতাজী জিন্দাবাদ !

বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেলেন ব্রিগেডিয়ার লয়ডার ! কি আশ্চর্য সাহস এই মেয়েদের ! ঘরে ঢুকে বিজয়ী সেনাপতিকে ওরা অভিবাদন জানাল না, —জানাল কিনা ঐ ফটোটাকে ! এ যে চিন্তাও করা যায় না। এতবড় সাহস, এতখানি চারিত্রিক দৃঢ়তা ওরা কোথা থেকে পেল ?

এবার প্রশ্ন—আমার আদেশ অমান্য করে কেন তোমরা সামরিক পোশাক পরে এসেছ বল ?

—নয় কেন ? চটপট উত্তর দিলেন একজন, আমরা আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নারী-সৈনিক। আমরা আত্মসমর্পণ করলেও আমাদের সরকার তো আত্ম-সমর্পণ করেনি। তাহলে কেন আমরা এই বে-আইনী আদেশ মানতে যাব ? কোন্ যুক্তিতে ?

—আমার উপস্থিতিতে কেন তোমরা স্যালুট দিলে ঐ ফটোটাকে?

—কেন দেব না? উনি আমাদের নেতাজী। ওঁর ফটো যেখানে যে অবস্থায় দেখব, সেখানেই আমরা স্যালুট দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করব এমনি করে।

কি যেন ভাবলেন ব্রিগেডিয়ার লয়ডার। তারপর একসময়ে বললেন, ঠিক আছে, তোমরা বণ্ড লিখে দাও যে, আজাদ হিন্দ্ ফৌজে তোমরা স্বেচ্ছায় যোগ দাওনি। তোমাদের জোর করে দলে নেওয়া হয়েছিল। তার জন্য তোমরা এখন অনুতপ্ত। কথা দিচ্ছি, তাহলে কোনরকম সামরিক শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হবে না তোমাদের বিরুদ্ধে।

—কক্ষণো না। একসঙ্গে প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন প্রতিটি নারী-সৈনিক, লিখতে হলে একথাই লিখব যে, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় আমরা যোগ দিয়েছিলাম আজাদ হিন্দ্ ফৌজে এবং সুযোগ পেলে আবারও দেব।

চোখের পলক ফেলতেও বুঝি ভুলে গেলেন ব্রিগেডিয়ার লয়ডার। যুদ্ধ করে দেশ জয় করা যায়, কিন্তু মানুষের মন জয় করা যায় না। কোথায় গেল পরাধীন ভারতবাসীর আগেকার সেই ভীত সন্ত্রস্ত ভাব? এ যে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন সত্তা! কি করে এটা সম্ভব হল! এর শেষই বা কোথায়? কর্ণেল লক্ষ্মীর ভাষায়ঃ

'The British officers were really surprised to find this spirit and many of them gained a clear insight into the true personality of Netaji after seeing the spirit of courage and sacrifice which Netaji alone had infused into the minds of these young women'.

[Lakshmi Sahgal: Bulletin of the Netaji Research Bureau, 1965]

'A true revolutionary is one who never acknowledges defeat, who never feels depressed or disheartened. A true revolutionary believes in the justice of his cause and is confident that his cause is bound to prevail in the long run'.

—Netaji

আবার শুরু হল প্রস্তুতির কাজ। আবার নতুন করে লীগ ও হেড-কোয়ার্টার্স স্থাপন। আবার চালু হল ব্যাঙ্কক রেডিও।

তাছাড়া প্রায় রোজই মন্ত্রিসভার বৈঠক। যুদ্ধে সাময়িক জয়-পরাজয় আছেই, তার জন্য পিছিয়ে গেলে চলবে কেন? সুতরাং লড়াই যেমন চলছে, তেমনই চলবে।

সেনাবাহিনীর জন্য ভাবনা নেই। ৩নং ডিভিশন সম্পূর্ণ অটুট রয়েছে মালয়ে। তাছাড়া কর্ণেল রাতুরীর নেতৃত্বে ইতিমধ্যেই জানবাজ বাহিনী পৌঁছে গেছে ব্যাঙ্ককে। সবচাইতে উল্লেখযোগ্য খবর কর্ণেল ঠাকুর সিং-এর নেতৃত্বে 'এক্স' রেজিমেন্টের উপস্থিতি। এতদিন ধারণা ছিল—এক্স রেজিমেণ্ট পিন-

মানার যুদ্ধে বন্দী হয়েছে ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক বাহিনীর হাতে। সে ধারণা মিথ্যে প্রমাণ করে যেভাবে এক্স রেজিমেন্ট পিনমানা থেকে পদব্রজে সুদূর ব্যাঙ্ককে এসে উপস্থিত হতে সক্ষম হয়েছে, তা ভাবতে গেলে সত্যিই অবাক হতে হয়।

কিন্তু কোন্ পথে এখন এগুনো যায়? কোথায় কোথায় শক্ত প্রতিরোধ ঘাঁটি গড়ে তোলা উচিত?

সুভাষের নির্দেশে পরবর্তী কাজের তালিকা তৈরি করে দিলেন মেজর জেনারেল চ্যাটার্জী এবং আয়ার সাহেব। ঠিক হল—প্রথম হেড-কোয়ার্টার্স হবে সিঙ্গাপুর। দ্বিতীয়—সাইগন।

আপাতত ৩নং ডিভিশনের প্রধান কাজ হবে মালয়ের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা। প্রয়োজন হলে সর্বশক্তি দিয়ে ব্রিটিশকে বাধা দিতে হবে। প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য লড়াই করতে হবে। কোনরকমেই যেন তারা ঢুকতে না পারে মালয়ের অভ্যন্তরে।

২১শে মে সুভাষ এক ভাষণ দিলেন ব্যাঙ্কক থেকেঃ

'আমরা ইম্ফল হয়ে দিল্লী যেতে পারিনি একথা সত্য, তা বলে দিল্লীর পথ শুধু একটাই নয়। অচিরেই আমরা সে পথ ধরে আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হব, একথা সুনিশ্চিত।

ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীর বেশ একটা বড় অংশ আজ আই. এন. এ.-র প্রতি সহানুভূতিশীল। বর্মায় এসে তারা এখন আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে চাক্ষুস দেখতে পাবে। দেখতে পাবে যে, এতদিন তাদের যা বলা হয়েছিল তা সত্য নয়। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ কারো হাতের পুতুল নয়।

তারা দেখবে—ভারতীয়রা অবাধে জয় হিন্দ্ বলে পরস্পরকে সম্ভাষণ জানাচ্ছে। অবাধে জাতীয় সঙ্গীত গাইছে। এই অভিজ্ঞতার ফলে তারা যে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রতি আরো সহানুভূতিশীল হয়ে পড়বে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। কিছুতেই তারা তখন দূরে থাকতে পারবে না আই. এন. এ.-র প্রভাব থেকে। কিছুতেই তখন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না ভারতবর্ষের চিরন্তন স্বাধীনতার প্রশ্নকে। ১৯৪৬ সালের লড়াইই হবে শেষ লড়াই।'

হ্যাঁ, একথা সত্য। স্বীকার করেছেন ব্রিটিশ মুখপাত্র হিউ টয়। সুভাষচন্দ্র বুঝেছিলেন যে, রাজভক্ত ব্রিটিশ-ভারতীয় বাহিনীকে এবার আর ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। আই. এন. এ.-র এই দেশপ্রেমিক ভূমিকা তাদের মধ্যে সংক্রামিত হবেই। এ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন পুরোপুরি নিঃসন্দেহ।

'He now saw the I.N.A. carrying the infection of his influence into the Indian Army, to loosen still further the British grasp and to deepen nationalist cofidence'. [Hugh Toye: P.—179]

সংগঠন এবং অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এবার সবাই ছড়িয়ে পড়লেন দিকে দিকে। মেজর জেনারেল চ্যাটার্জী এবং আয়ার সাহেব গেলেন সাইগন।

আনন্দমোহন সহায়কে পাঠানো হল হ্যানয়। রাঘবন সিঙ্গাপুর। ১৮ই জুন সুভাষ নিজেই চলে গেলেন সিঙ্গাপুরে। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে ওখানে। তা ছাড়া মালয়ে অবস্থিত ৩নং ডিভিশনকেও একবার নিজের চোখে পরিদর্শন করা দরকার! সুতরাং আর দেরী নয়।

এবার তোমাকে একবার ভারতবর্ষের দিকে চোখ ফেরাতে হবে মল্লিকা! কারণ তখনকার সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি।

১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই যে গান্ধীজী, জওহরলাল, মৌলানা আজাদ প্রমুখ প্রতিটি প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতাকে বন্দী করা হয়েছিল, সেকথা নিশ্চয়ই তোমার স্মরণ আছে।

ইতিমধ্যে পরিস্থিতির অনেকখানি পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৪৪ সালের ৬ই মে ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য গান্ধীজীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে বন্দী-জীবন থেকে। ১৯৪৫ সালের ১৫ই জুন জওহরলাল মুক্তি পেয়েছেন আলমোড়া জেল থেকে। একই দিনে মৌলানা আজাদ মুক্তি পেলেন বাঁকুড়া জেল থেকে। বল্লভভাই প্যাটেল ও শঙ্কর রাও দেও যারবেদা জেল থেকে। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে মুক্তি দেওয়া হল বাঁকিপুর জেল থেকে। করাচী জেল থেকে মুক্তি পেলেন আচার্য কৃপালনী। আর ভেলোর বন্দী-নিবাস থেকে পট্টভি সীতারামাইয়া।

আর শরৎ বসু! না, তাঁকে নয়। সুভাষের মেজদা যে! আর বিপ্লবীরা! না, কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু পরবর্তী কর্মপন্থা কি? সংগ্রাম? না, গান্ধীজী ও-পথে যেতে রাজী নন।

'He has no intention of offering civil disobedience. History can never be repeated and he cannot take the country back to 1942.' [The History of Indian National Congress: Pattabhi Sitaramyya]

তাই শুরু হয়েছে সেই চিরাচরিত আপস আলোচনা। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল নাকি ভারতবাসীর সঙ্গে একটা রফা করতে ইচ্ছুক। তাঁর ইচ্ছা নাকি অবিলম্বে ভারত শাসনের জন্য একটি এক্‌সিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন করা। তবে কিনা সেটা হবে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে। অর্থাৎ সমানুপাতিক বর্ণহিন্দু ও মুসলিমদের সমন্বয়ে।

আলোচনার দিন ধার্য হয়েছে ২৫শে জুন, সিমলার বড়লাট প্রাসাদে।

বড়লাটের সৌজন্য দেখে কংগ্রেস সভাপতি আজাদ সাহেব তখন রীতিমত মুগ্ধ। কারণ, হোটেলের পরিবর্তে বড়লাট প্রাসাদেই তাঁর থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন লর্ড ওয়াভেল। তাছাড়া একথাও নাকি তিনি বলেছেন যে, সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক মত-বিরোধ থাকলেও কংগ্রেসী নেতারা ভদ্রলোক।

'I was impressed by the frankness and sincerity of the Viceroy. He (Wavell) also said that whatever their political opinion or their differences with the Government, Congress leaders were gentlemen.' [India Wins Freedom : Abul Kalam Azad]

কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর বক্তব্য রাখলেন ওয়ার্কিং কমিটির কাছে। আমাদের উচিত হবে বড়লাটের এই প্রস্তাব গ্রহণ করা। 'We should accept it.'

এদিকে খবর শুনেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন সুভাষ। কেন যে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল হঠাৎ এমন সদয় হয়ে উঠেছেন, সে রহস্য তাঁর অজ্ঞাত নয়। যে করে হোক, ওয়াভেল-প্রস্তাব ব্যর্থ করতেই হবে। ভারতবাসীকে ডেকে বলতে হবে এ সর্বনেশে প্রস্তাব কক্ষণো তোমরা গ্রহণ করো না। এ প্রস্তাব গৃহীত হলে তার পরিণাম হবে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী।

এবার আমি পাশাপাশি দুটো ছবি তোমার সামনে মেলে ধরব মল্লিকা।

এদিকে সিমলার বড়লাট প্রাসাদে নানাবিধ খানাপিনাসহ আপস আলোচনা। অন্যদিকে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এক আপসহীন বিপ্লবীর ব্যাকুল আহ্বান।

একদিকে শত্রুপক্ষ রেঙ্গুন, পেগু, মৌলমিন ইত্যাদি দখল করে হিংস্র হায়নার মত এগিয়ে আসছে সিঙ্গাপুরের দিকে। তাদের এক দাবী—সুভাষ বোসের শির চাই-ই!

অন্যদিকে সেই মৃত্যুভয়হীন মানুষটা সব কিছু জেনেশুনে তখনো পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে দাঁড়িয়ে প্রতিনিয়ত আবেদন করে চলেছেন ভারতবর্ষের কাছে। এ প্রস্তাব তোমরা গ্রহণ করো না। দেশের এত বড় সর্বনাশ তোমরা করো না।

'Comrades, I would never have opened my mouth and said one word to you, if I had been sitting as an arm-chair politician here. But I and my comrades here are engaged in a grim struggle. Our comrades at the front have to play with death. Even those who are not at the front have to face danger every moment of their existence.

When we were in Burma, bombing and machine-gunning were our daily entertainment. I have seen many of my comrades killed, maimed and injured from the enemy's ruthless bombing and machine-gunning. I have seen the entire hospital of the Azad Hind Fauj in Rangoon razed to the ground, with our helpless patients suffering heavy casualties.

That I and many others with me are still alive to-day,

is only through God's grace. It is because we are living, working and fighting in the presence of death that I have a right to speak to you and to advise you.

Most of you do not know what carpet-bombing is. Most of you do not know what it is to be machine-gunned by low-flying bombers and fighters. Most of you have had no experience of bullets whistling past you, to your right and to your left. Those who have gone through this experience and have nevertheless kept up their morale, cannot even look at Lord Wavell's offer.'

[বন্ধুগণ আমি এখানে আর্মড-চেয়ার পলিটিসিয়ান হয়ে বসে নেই। তা যদি থাকতাম, তাহলে এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলতে যেতাম না। কিন্তু আমি এবং আমার সহকর্মিগণ এখানে এক জীবন-মরণ সংগ্রামে ব্যাপৃত। প্রতি মুহূর্তে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করছি। যারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে, তাদেরও জীবন আজ অনিশ্চিত।

বর্মায় প্রতিদিন আমরা আমাদের জীবন উপভোগ করছি অনবরত বোমা এবং মেসিনগানের অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে। চোখের সামনে কত প্রিয় সহকর্মী মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন গুলীর আঘাতে। কতজন পঙ্গু-জীবন বরণ করে নিয়েছেন চিরদিনের জন্য। আমার চোখের সামনেই মার্কিন বিমান রেঙ্গুনের আজাদ হিন্দ্ হাসপাতাল ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে বোমাবর্ষণ করে। তার ফলে রুগ্ণ, আহত ও উত্থান-শক্তিহীন অসহায় রোগীরা মৃত্যু-বরণ করেছে দলে দলে।

আজো আমরা কয়েকজন বেঁচে আছি শুধু ভগবানের দয়ায়। বেঁচে আছি বলেই ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিছু বলবার অধিকার রয়েছে। বোধ হয় অনেকেই জানেন না কার্পেট-বম্বিং কাকে বলে। ফাইটার বিমান যখন নীচু হয়ে মেসিনগানের গুলী-বৃষ্টি করতে থাকে, সে দৃশ্যও বোধ হয় দেখেননি অনেকেই। কানের দুপাশ দিয়ে অবিরাম বুলেট ছুটছে, সে ছবিও বোধহয় অনেকেরই অপরিচিত। যারা প্রতিনিয়ত সেই পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বেঁচে আছে, তাদের কাছে এই ওয়াভেল-প্রস্তাবের মূল্য কতটুকু ?]

শুধু একদিন নয়, পরিস্থিতি লক্ষ্য করে ১৯শে জুন থেকে প্রায় প্রতি-দিন সুভাষ সিঙ্গাপুর থেকে আবেদন জানিয়েছেন এমনি করে। কখনো গান্ধীজীর উদ্দেশে। কখনো বা জওহরলাল, আজাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের উদ্দেশে।

সুভাষের তখনকার সেই বিভিন্ন বেতার-ভাষণ থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু কিছু অংশ তোমাকে আমি পড়ে শোনাচ্ছি মল্লিকা। ভাল করে লক্ষ্য করো। তফাৎটা নিশ্চয়ই তোমার চোখে পড়বে।

'আমি আজীবন কংগ্রেসের সেবা এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে এসেছি। সেই অধিকারে আমি আমার দেশের ভাইবোনদের বলতে চাই যে, ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি এ যুদ্ধে জয়লাভ করলেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমাদের নিরাশ হবার কোন কারণ নেই। কারণ, বিশ্বরাজনীতিতে যা-ই ঘটুক না কেন, ভারতবর্ষের জয়লাভ সুনিশ্চিত। এই সন্ধিক্ষণে আপনারা ভুল পথে পা বাড়িয়ে দেশের অনিষ্ট করবেন না। বহুদিন ধরে বহু কষ্ট আমরা সহ্য করেছি। অভীষ্ট লাভের জন্য আরো কিছুদিন এ কষ্ট আমাদের সহ্য করতেই হবে।'

'ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতার অর্থ হচ্ছে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আমাদের নৈতিক সংগ্রামের পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেওয়া। কংগ্রেস এবং ভারতবাসীর পক্ষে সেটা হবে রাজনৈতিক আত্মহত্যা।'

'জাতীয়তাবাদী ভারত যে মুহূর্তে ব্রিটেনের সঙ্গে আপস করবে, সে মুহূর্ত থেকে ভারতবর্ষ ব্রিটেনের একটা পারিবারিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তখন রাশিয়া বা অন্য কোন শক্তির পক্ষে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য কোন-রকম সাহায্য করা সম্ভব হবে না।'

'অন্যান্য কথা ছেড়ে দিলেও বড়লাটের প্রস্তাবের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন রয়েছে, তার জন্য এ প্রস্তাব কোনরকমেই গ্রহণ করা চলে না। কংগ্রেস একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। সব ধর্মের লোকই কংগ্রেসে রয়েছে। অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করেও তারা জাতীয়তার ভাবধারা রক্ষা করে চলেছেন। আজ যদি সেই জাতীয়তার ভাব বিসর্জন দিয়ে সাম্প্রদায়িকতাকে গ্রহণ করা হয়, তাহলে তাকে আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।'

'৫ই জুলাই ইংল্যান্ডের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবারের এই নির্বাচনের ফলে ইংল্যান্ডের শ্রমিকদল ক্ষমতায় আসবে, একথা জোর করেই বলা চলে। তখন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটা নতুন নীতি ঘোষিত হবে, এটাও প্রায় সুনিশ্চিত। তাই ৫ই জুলাইয়ের আগেই বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ভারতবর্ষের সঙ্গে একটা রফা করার জন্য এত ব্যস্ত। তা বলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাঁর এই ফাঁদে পা দেবেন কেন?'

শেষ পর্যন্ত ওয়াভেল-প্রস্তাব ভেস্তে গেল তখনকার মত। গেল সেই সাম্প্রদায়িক প্রশ্নেই। কংগ্রেসের বক্তব্য—কংগ্রেস সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান। সুতরাং মুসলিম আসনে কংগ্রেসী মুসলিম প্রার্থী দেবার অধিকার আমাদের থাকবে। অন্যদিকে মুসলিম লীগ-প্রধান জিন্না সাহেবের বক্তব্য—ঐটি চলবে না। মুসলমানদের সম্বন্ধে কথা বলবার একমাত্র অধিকার মুসলিম লীগের। সুতরাং তাদের সম্বন্ধে যা করার আমরাই করব। ব্যস, ওয়াভেল-প্রস্তাবের সেখানেই ইতি।

কিন্তু একটা কথা মল্লিকা। জন্মভূমি থেকে শত-শত মাইল দূরে থেকেও হঠাৎ ওয়াভেল-প্রস্তাবের কথা শুনে সুভাষ এমন করে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন

কেন? কেন তিনি এ প্রস্তাব গ্রহণ না করার জন্য এভাবে আবেদন জানিয়েছিলেন দিনের পর দিন?

উত্তর পাবে বিপক্ষ শিবিরের মুখপাত্র হিউ টয়-এর কয়েকটি কথার মধ্যে ঃ

'সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলে ভারতবর্ষ বিভক্ত হবে এবং তখন নতুন শাসকদের এমন ক্ষমতা থাকবে না, যার জোরে তারা সংস্কার চালু করতে সক্ষম হবে। আসলে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠবে ভারতের ঐক্য এবং ভবিষ্যৎ শাসনকর্তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি। এই সাফল্যের পরে আসবে সংস্কারের পালা। অশিক্ষা, জাতিভেদ, প্রকাশ্য দুর্নীতি এবং মেয়েদের ক্রীতদাসপ্রায় অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে ভারতবর্ষে সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।'

আপস আলোচনার ফাঁদে পা দিলে ভারতবর্ষ বিভক্ত হবে—সুভাষের এই আশঙ্কা কি অমূলক ছিল? ইতিহাস কি বলে?

জাপান তখন রীতিমত ধুঁকছে।

ইয়োরোপের যুদ্ধ শেষ। ফলে শত্রুপক্ষ এখন যাবতীয় শক্তি এদিকে সরিয়ে এনে নিয়োজিত করেছে তাদের বিরুদ্ধে। এই ক্রমবর্ধমান শক্তির বিরুদ্ধে কতদিন আর লড়াই চালানো সম্ভব?

ইতিমধ্যেই মূল ভূখন্ড থেকে তিনশো মাইল দূরবর্তী ওকিনওয়া দ্বীপ চলে গেছে মার্কিন সেনাপতি ম্যাক আর্থারের দখলে।

কিন্তু তারপর! শত্রুপক্ষের পরবর্তী লক্ষ্য কি?

সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল ৬ই আগস্ট হিরোসিমাতে।

সেদিন হিরোসিমা নগরীর প্রায় লক্ষাধিক অসহায় শিশু বালক-বালিকা ও অসামরিক মানুষ নিমেষে পুড়ে ছাই হয়ে গেল মার্কিন বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত এ্যাটম বোমার আঘাতে।

৯ই আগস্ট একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল নাগাসাকিতে। ফলাফল সেই একই।

মল্লিকা, নরঘাতক হিসেবে হিটলারের নাকি তুলনা নেই। কিন্তু প্রচলিত বিধি-নিষেধ অমান্য করে সুসভ্য মার্কিন সরকার সেদিন যেভাবে লক্ষ লক্ষ অসামরিক মানুষকে হত্যা করেছিল, যুদ্ধের ইতিহাসে তার কোন তুলনা আছে কি!

এবং কখন! যখন জাপান নিজে থেকেই আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল বিজয়ী শক্তির কাছে। প্রথমে টোকিওর সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত জেকব মালিকের মাধ্যমে। তারপর সুইস প্রতিনিধির মাধ্যমে। অবশেষে সম্রাটের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি প্রিন্স কনোয়ে-কে মস্কো পাঠিয়ে।

পটাসডাম কনফারেন্সে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল, মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এবং রাশিয়ার মার্শাল স্ট্যালিনের মধ্যে আলোচনাও হয়েছিল এই নিয়ে,

কিন্তু কেউ সেদিন কর্ণপাত করেননি জাপানের সেই প্রস্তাবে। বিশেষ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান।

কারণও ছিল। কোটি কোটি ডলার খরচ করে এ্যাটম বোমা তৈরি হয়েছে। তার কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখার জন্য একটা জায়গা চাই তো। জাপানের মত তেমন উপযুক্ত জায়গা পৃথিবীতে তখন আর কোথায় ? অবশ্য বিস্ফোরণের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রাণ হারাতে হবে, তা হলই বা ! জাপান তো আর পশ্চিম দুনিয়ার কোন শ্বেতকায় রাষ্ট্র নয়। সুতরাং ফেল জাপানেই।

অনুশোচনা তো দূরের কথা, মার্কিন সমর-দপ্তর থেকে বরং বাহাদুরী প্রকাশ করে এ সম্বন্ধে বলা হলঃ

'ভাগ্যে এই বোমা আবিষ্কৃত হয়েছিল, নইলে জাপানকে সৈন্যের সাহায্যে আক্রমণ করতে গেলে আমাদের হাজার হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটত। হিরোসিমার ২,৫৫,০০০ অধিবাসীর মধ্যে ১৩,৫০০ হতাহত হয়। বেশির ভাগই বোমা বিস্ফোরণের সংগে সংগে মারা যায়। নাগাসাকির লোকসংখ্যা ১,৯৫,০০০ ; তার মধ্যে হতাহত হয় ৬৫,০০০। হিরোসিমায় যারা নিহত হয় তাদের মধ্যে শতকরা ৬০ জনই আগুনে দগ্ধ হয়ে মারা যায়। নাগাসাকির নিহতদের মধ্যে এ হার শতকরা ৭০ জন। হিরোসিমার ৯০,০০০ পাকাবাড়ির মধ্যে ৬০,০০০ বাড়ি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। নাগাসাকি থেকে বারো মাইল দূরের ঘর-বাড়ির দরজা-জানালাও উড়ে গিয়েছিল।'

এই সংগে ব্রিটিশ মিশন কর্তৃক প্রকাশিত ভয়াবহ রিপোর্টটার দিকেও একবার চোখ বুলিয়ে নাওঃ

'বোমা পড়বার এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে বিদ্যুতের মত অগ্নি-জ্যোতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তার ফলে বহুদূর পর্যন্ত সব কিছু ঝলসে যায়। এ অঞ্চলে যে সব নরনারী ছিল তাদের গায়ের চামড়া পুরে অংগারের মত কালো হয়ে যায়। বোমা বিস্ফোরণের সময় যারা দূরে চলাফেরা করছিল, তাদের ছায়া এখনো রাস্তায় প্রতিফলিত হয়। এসব ছায়া দেখে স্থানীয় লোক ভূত মনে করে ভয় পায়।

এক হাজার গজের মধ্যে যে সব গর্ভবতী নারী ছিল, তাদের অকালপ্রসব ঘটে এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই শিশু মারা যায়। দুই মাইলের মধ্যে যারা ছিল, তাদের মধ্যে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ নারী সুস্থ সন্তান প্রসব করে। বিস্ফোরণের দুমাসের মধ্যে গর্ভপাত, অকালপ্রসব প্রভৃতির সংখ্যা স্বাভাবিক অবস্থার চাইতে পাঁচগুণ বেশি দেখা যায়।'

মল্লিকা, আজ যখন ভিয়েতনামের অসহায় নরনারীর উপর নির্বিচারে ন্যাপাম বোমাবর্ষণের বিবরণ শুনি, তখন আমরা বিস্ময়ে হতবাক হই। কিন্তু এর পরেও অবাক হবার মত কিছু আছে কি !

ইতিহাসের পর ইতিহাস।

৬ই আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বোমা নিক্ষিপ্ত হল হিরোসিমাতে।

পরদিনই মিত্রপক্ষের অন্যতম শরিক রাশিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করল জাপানের বিরুদ্ধে।

একটা কথা মল্লিকা। ১৯৪১ সালের ২২শে জুন অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করে হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেছিলেন, সে কারণে নিন্দা তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য। কিন্তু রাশিয়া! জাপানের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ ঘোষণার ফলে রাশিয়াও সমানভাবে নিন্দিত হবার যোগ্য নয়?

জাপানের সঙ্গে কি অনাক্রমণ চুক্তি ছিল না রাশিয়ার? সেই চুক্তি ভঙ্গ করেই কি রাশিয়া সেদিন যুদ্ধ ঘোষণা করেনি জাপানের বিরুদ্ধে?

জাপান কিন্তু কোনদিনই তা করেনি। ১৯৪১ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে অনুষ্ঠিত সেই অনাক্রমণ চুক্তির মর্যাদা তারা রক্ষা করে চলেছিল বরাবর।

কিন্তু যদি করত? হিটলারের প্রচণ্ড আক্রমণের চাপে রাশিয়ার যখন নাভিশ্বাস উঠেছে, তখন যদি তারা ত্রিশক্তির অন্যতম অংশীদার হিসেবে আক্রমণ চালাত মাঞ্চুরিয়ার দিক থেকে? তাহলে কোথায় থাকত সেদিন রাশিয়া?

ফল পেল হাতে হাতেই। হিরোসিমা আক্রান্ত হল ৭ই আগস্ট। সুযোগ বুঝে পরদিনই অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করে রাশিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ল মৃতপ্রায় জাপানের ওপর। জার্মানীর ভয় তখন আর নেই। এবার চালাও এদিকে।

হিটলার নিশ্চয়ই নিন্দার যোগ্য। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে রাশিয়া যে দৃষ্টান্ত দেখাল সেটাই কি সমর্থনযোগ্য? সেদিন যাঁরা মনুমেণ্টের নীচে দাঁড়িয়ে হিটলারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, তাঁরা কি বলেন এ সম্বন্ধে?

সুভাষ তখন আজাদী বাহিনীর শ্রেষ্ঠ সমর শিক্ষাকেন্দ্র মালয়ের সেরামবামে। সঙ্গে রয়েছেন মেজর জেনারেল আলাগাপ্পন, ৩নং ডিভিশনের অধিনায়ক কর্ণেল জি. আর. নাগর, কর্ণেল হবিবুর রহমান এবং আয়ার সাহেব।

১০ই আগস্ট। রাত তখন প্রায় দশটা। খবরটা তখনো সুভাষের অজ্ঞাত। কারণ, সর্টওয়েভের কোন রেডিও ছিল না সেরামবামের সেই গেস্ট-হাউসে।

সহসা এককোণে রক্ষিণ টেলিফোনটা বেজে উঠল ঝন্‌ঝন্‌ করে।

দূরাগত টেলিফোন। কথা বলছেন কর্ণেল ইনায়েত কিয়ানী। অত্যন্ত অশুভ খবর। রাশিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করেছে জাপানের বিরুদ্ধে।

নিঃশব্দে খবরটা শুনলেন সুভাষ। মনে মনে তাঁর কি ভাবের আলোড়ন চলছে, বাইরে থেকে তা বোঝা গেল না।

আবার টেলিফোন। এবার ডাক পাঠিয়েছেন মেজর জেনারেল এম. জেড. কিয়ানী। নেতাজীর অবিলম্বে সিংগাপুর চলে আসা প্রয়োজন। তবে রাতে না গিয়ে দিনের বেলা যাওয়াই ভাল। দিনকাল ভাল নয়। সুযোগ বুঝে কমিউনিস্ট গেরিলারা এরি মধ্যে মাথা তুলতে চেষ্টা করছে এখানে-ওখানে।

টেলিফোনের পর টেলিফোন। এবার মালাক্কা থেকে। লীগের জেনারেল সেক্রেটারী ডঃ লক্ষ্মণাইয়া এবং প্রচার-বিভাগের শ্রীগণপতি মোটরে করে আসছেন গুরুতর একটা সংবাদ নিয়ে। মনে হয়, রাত দুটোর মধ্যেই ওঁরা পোঁছে যেতে পারবেন সেরামবামে।

শুরু হল প্রতীক্ষা। কি ব্যাপার! কি এমন জরুরী খবর থাকতে পারে, যার জন্য ওরা ছুটে আসছে এতদূর থেকে! কখন আসবে ওরা! আর কত দেরী!

যথাসময়ে গেস্ট হাউসের সীমানার মধ্যে গাড়ি এসে থামতেই লাফিয়ে নেমে পড়লেন ডঃ লক্ষ্মণাইয়া এবং গণপতি। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের ডাক পড়ল সুভাষের শোবার ঘরে। এবার প্রচার-সচিব আয়ার সাহেবকেই বরং এগিয়ে দেওয়া যাক ঃ

"নেতাজীর ঘর ছিল দোতলায়। একটা টেবিলের সামনে বসেছিলেন তিনি। ঘরে বেশ গরম। গায়ে শুধু গেঞ্জি। পায়ে টপবুট। বুশ-সার্টটা খুলে রেখেছিলেন।

লক্ষ্মণাইয়া ও গণপতি সামনে এসে দাঁড়িয়ে স্যালুট জানিয়ে বললেন—জয় হিন্দ্!

নেতাজী ইঙ্গিতে বসতে বললেন সবাইকে। ওঁরা এবং আমি টেবিলের আর এক প্রান্তে আসন নিলাম। নেতাজী আমাকে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে দিতে বললেন। তারপর লক্ষ্মণাইয়ার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—এবার বলো কি খবর তোমরা এনেছ?

লক্ষ্মণাইয়া চেয়ারটা একটু টেনে নিলেন নেতাজীর সামনে। তারপর ফিসফিস করে বললেন—জাপান আত্মসমর্পণ করেছে।

আত্মসমর্পণ!

সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকালাম নেতাজীর মুখের দিকে। মাথাটা কেমন যেন ঘুরে উঠেছিল আমার। হাজার জমাট-বাঁধা কথা প্রবল বেগে মস্তিষ্কে আলোড়ন তুলেছিল।

মনে মনে বললাম—সব শেষ। এই অসাধারণ মানুষটি গত চব্বিশ মাসে যা গড়ে তুলেছিলেন, সব কিছুরই পরিসমাপ্তি ঘটল। কিন্তু সত্যিই কি সব শেষ? তাঁর স্বপ্নের এখানেই কি পরিসমাপ্তি? তাঁর কর্মজীবন, উদ্যম, সবই কি নির্মূল হয়ে গেল এই মুহূর্তে?

মুহূর্ত চিন্তামগ্ন দেখাল নেতাজীকে, কিন্তু মুহূর্তই। তারপরই স্বাভাবিক শান্ত হাসি ফুটে উঠল তাঁর সারামুখে। বললেন—ব্যস, এই তো।

আবার সারা মুখে দেখা দিল অনবদ্য হাসি। নানাবিধ সরস মন্তব্য ও হাসি-তামাসাও বাদ গেল না। যেন কিছুই হয়নি। বললেন ঃ

জাপানের যুদ্ধ শেষ হতে পারে, কিন্তু আমাদের হয়নি। তাদের আত্মসমর্পণ মানে ভারতবর্ষের মুক্তিফৌজের আত্মসমর্পণ নয়। আজাদী বাহিনী এ পরাজয়কে কোনদিনই মেনে নেবে না।

'Japan's surrender was not India's surrender. Japan's surrender was not the surrender of the Liberation Forces fighting for India's freedom. The I.N.A. would not admit defeat.'

রাত তিনটে। তখনো একটার পর একটা নির্দেশ দিয়ে চলেছেন নেতাজী।

ইনায়েৎ খাঁ তার গাড়ি নিয়ে চলে যাক। রাঘবন আর স্বামী রয়েছে পেনাং-এ। আর জন. এ. থিবি রয়েছে ইপোতে। ওদের তুলে নিয়ে ইনায়েৎ সোজা চলে যাক সিঙ্গাপুর। ওদের সঙ্গে অবিলম্বে দেখা হওয়া দরকার। ইনায়েৎকে বলে দাও গাড়িতে প্রচুর তেল ভরে নিতে। কাল থেকে আমাদের তেলের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে।'

হাসলেন নেতাজী। সেই ভুবন-ভোলানো হাসি, যা তাঁর মুখে বরাবর দেখে এসেছে পৃথিবীর মানুষ।

রাত চারটে তিরিশ।

বারান্দার একটা বেতের চেয়ারে বসে নেতাজী। পাশে আমি। পূর্বদিক ফর্সা হয়ে উঠেছে। হঠাৎ এক সময়ে অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠলেন—এবারের পালা শেষ। এখন পরেরটা আমাদের ভাবতে হবে।

কুণ্ঠিতভাবে বললাম, রাত শেষ হয়ে এল। একটু বিশ্রাম নেবেন না ?

উত্তরে বললেন, কাল থেকে আমরা বিশ্রামের প্রচুর অবকাশ পাব।

পরদিন ১২ই আগস্ট আমাদের যাত্রা শুরু হল সিঙ্গাপুরের দিকে।

প্রথম এক লরী সশস্ত্র প্রহরী। তারপর নেতাজীর গাড়ি। আমাকেও সেই গাড়িতে যেতে হল নেতাজীর নির্দেশে। ড্রাইভারের পাশে এ. ডি. সি. সমশের সিং। পরের গাড়িতে মেজর জেনারেল আলাগাপ্পন, কর্ণেল নাগর এবং কর্ণেল কিয়ানী। সবার শেষে সত্য সহায়ের গাড়ি।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় সিঙ্গাপুর।

তারপরই মেজর জেনারেল কিয়ানী, কর্ণেল হবিবুর রহমান প্রমুখ সবাইকে ডেকে এনে শুরু হল মন্ত্রণা-সভা। জাপান আত্মসমর্পণ করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কর্তব্য কি ?

আলোচনা চলল রাত তিনটে পর্যন্ত। আবার শুরু হল পরদিন ভোরে। পরিস্থিতি গুরুতর। যে কোন মুহূর্তে শত্রুপক্ষের উপস্থিতি মোটেই বিচিত্র নয়। সুতরাং ব্যবস্থা যা করার, তার আগেই করে ফেলতে হবে। নইলে পরে আর সময় পাওয়া যাবে কিনা কে জানে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত লীগের শাখাগুলির কাছে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠানো দরকার। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতেও নির্দেশ দেওয়া দরকার। আর সময় কোথায় ?

অবশ্য জাপানের আত্মসমর্পণ সম্বন্ধে কোন সরকারী ঘোষণা এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবু খবরটা মিথ্যে নয়। বি. বি. সি., ওয়াশিংটন,

মস্কো ইত্যাদি বিভিন্ন বেতারকেন্দ্র থেকেই তার সমর্থন পাওয়া গেছে বার বার। সুতরাং সেদিক থেকে সন্দেহের আর কোন অবকাশ নেই।

১৩ই আগস্ট।

কাজ-কাজ-কাজ। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত অবিশ্রান্ত কাজ। যা কিছু করণীয় সব শেষ করে ফেলতে হবে। কিছুই ফেলে রাখলে চলবে না।

সবচাইতে বড় ভাবনা ঝাঁসীর রাণীবাহিনীর অবশিষ্ট পাঁচশো মেয়েকে নিয়ে। টোকিওতে শিক্ষারত সেই পঁয়তাল্লিশটি কিশোরের জন্যও ভাবনা কম নয়। জাপান আত্মসমর্পণ করেছে। ওরা এখন কি করবে? কোথায় যাবে? একেবারেই যে ছেলেমানুষ ওরা।

ডেকে পাঠালেন সিঙ্গাপুরের ঝাঁসীর রাণীবাহিনীর কম্যাণ্ডার ক্যাপ্টেন মিসেস থেবরকে। প্রতিটি মেয়েকে যার-যার ঘরে পেঁছে দিতে হবে, আর সবাইকেই যেন সঙ্গে বেশি করে অর্থ দেওয়া হয়। এই আমার শেষ আদেশ।

মন্ত্রিসভার বৈঠক তখনো চলছে তো চলছেই। সকাল-সন্ধ্যা-রাত্রি, তবু বৈঠকের যেন আর শেষ নেই।

মন্ত্রিসভার বক্তব্য ঃ পরিস্থিতি সত্যিই গুরুতর। শোনা যাচ্ছে, শত্রুপক্ষ নাকি এরি মধ্যে তাদের মার্চ শুরু করেছে সিঙ্গাপুরের দিকে। যান্ত্রিক বাহিনী বা নৌ-বহরের পক্ষে এটা মোটেই অসম্ভব কিছু নয়। সুতরাং নেতাজীর উচিত, অবিলম্বে সিঙ্গাপুর পরিত্যাগ করে অন্য কোথাও চলে যাওয়া।

সুভাষ তা মানতে রাজী নন। মন্ত্রিসভার সদস্য এবং সমর নায়কদের নিয়ে এখানেই তিনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে শেষ বোঝাপড়া করতে বদ্ধপরিকর।

১৪ই আগস্ট।

দাঁতের গোড়ায় অসহ্য যন্ত্রণা। শেষ পর্যন্ত তুলেই ফেলতে হল দাঁত-টাকে। রক্তপাতও হল প্রচুর। ডাক্তারের নির্দেশ, অন্ততঃ আজকের দিনটা বিশ্রাম নিতে হবে। পরিপূর্ণ বিশ্রাম।

বিশ্রাম! তাও কিনা এ সময়ে? এ পরিস্থিতিতে কি বিশ্রাম করা যায়? না কি তা সম্ভব?

বিকেল চারটেয় রাণীবাহিনীর কয়েকটি মেয়ে এসে হাজির। সামান্য তাদের দাবী। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ এর জীবন-কথা নিয়ে আজ তারা একটি নাটিকা করবে। নেতাজীকে একবার যেতেই হবে তাদের অনুষ্ঠানে।

সঙ্গে সঙ্গেই রাজী। একদিন ওরাও স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল। তার জন্য মূল্যও ওদের দিতে হয়েছে কম নয়। আজ শেষ-বিদায়ের দিনে ওদের এই সামান্য দাবীটাকে কি উপেক্ষা করলে চলে?

অপূর্ব অভিনয় করল রাণীবাহিনীর মেয়েরা। অদূরে নিষ্ঠুর ক্ষমাহীন শত্রু, সেকথাও যেন সবাই ভুলে গেল অভিনয়ের গুণে। তারপরই একসঙ্গে তিনহাজার জওয়ান আর রাণীবাহিনীর মেয়েরা গেয়ে উঠল সমবেত কণ্ঠে—'শুভ সুখ চৈন......'

শেষবারের মত সিঙ্গাপুরের আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হয়ে উঠল মুক্তি-পাগল ভারতবর্ষের মাতৃ-বন্দনার সঙ্গীত—'শুভ সুখ চৈন......'

ইতিমধ্যে একটি ব্যাপার ঘটে গেছে সবার অলক্ষ্যে। হঠাৎ আজাদ হিন্দ্ সরকারের আইন-সদস্য শ্রীযুক্ত এ. এন. সরকার এসে হাজির। ব্যাংকক থেকে বিমানে এসে সোজা তিনি চলে এসেছেন অভিনয়ের আসরে। তিনি নাকি কি একটা জরুরী খবর নিয়ে এনেছেন জাপ-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। নেতাজীকে তাঁর চাই। খুবই দরকার। বিশেষ জরুরী প্রয়োজন।

ইশারায় তাঁকে নিজের পাশে বসতে বললেন সুভাষ। কিন্তু কোন কথা-বার্তা নয়। আগে অভিনয় শেষ হোক, তারপর কথাবার্তা বলা যাবে বাংলোতে ফিরে গিয়ে।

সবকিছুর মোড় ঘুরিয়ে দিলেন আইন-সদস্য মিঃ সরকার। নেতাজীর আত্মসমর্পণ করাটা মোটেই ঠিক হবে না। বিচারের নাম করে নেতাজীকে ফাঁসি দিলে ভারতবর্ষে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হবে একথা সত্য, কিন্তু শাহনওয়াজ খান, সেইগল বা ধীলনের ফাঁসি হলেও কিছু কম বিক্ষোভ হবে না।

তখন সেই বিক্ষোভকে পরিচালিত করবে কে? নেতাজী ছাড়া সে যোগ্যতা আর কার আছে? ছোট্ট একটা স্ফুলিঙ্গ যে তখন বিরাট একটা দাবানলের সৃষ্টি করবে না তা কে বলতে পারে? সুতরাং নেতাজীর উচিত হবে অবিলম্বে আত্মগোপন করে সেই শুভ মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করা।

এই প্রথম কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল সুভাষকে। মিঃ সরকারের যুক্তি-টাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। হাজার হাজার শহীদের বুকের রক্তে গড়া এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস কি এখানেই স্তব্ধ হয়ে যাবে? ব্যর্থ হয়ে যাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের এই স্বাধীনতার স্বপ্ন?"

১৫ই আগস্ট, ১৯৪৫ সাল।

চারদিকে গুজবের আর অন্ত নেই। শত্রুবাহিনী নাকি যে কোন মুহূর্তে এসে পা দিতে পারে সিঙ্গাপুরের মাটিতে। আর সময় নেই।

খবর পেয়ে দেখা করতে এলেন কর্ণেল স্ট্র্যাসি। সঙ্গে ক্যাপ্টেন আর. এ. মালেক। দুজনের হাতেই নানারকমের নক্সা এবং রেখাচিত্র।

৮ই জুলাই একটি শহীদ-বেদীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল সিঙ্গাপুরে। সে বেদী নির্মাণের ভার এই কর্ণেল স্ট্র্যাসির উপর। তারই বিভিন্ন নক্সা এগুলো।

নক্সাগুলো হাতে নিয়ে কোথায় তলিয়ে গেলেন সুভাষ। ডুবে গেলেন নীরব মধুর এক নিঃসঙ্গতার গভীরে। বুঝি অজ্ঞাতেই কখন চোখের দৃষ্টি জুড়ে ভেসে উঠল সেই হাজার হাজার পরিচিত-অপরিচিত শহীদের মুখ-গুলি। সেই ইম্ফল—কোহিমা—বিশেণপুর আজ কত দূর! তবু ওদের এই

নিঃশেষ আত্মদান কোনদিনও ব্যর্থ হবে না। আজ হোক, কাল হোক, ভারত স্বাধীন হবেই।

সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। যে কোন মুহূর্তে শত্রুর আবির্ভাব মোটেই বিচিত্র নয়। তার আগেই ওঁদের স্মরণে এই শহীদ-বেদী নির্মাণের কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। শহীদ-বেদীকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা সভ্য সমাজের রীতি। বিজয়ী পক্ষের কাছ থেকে এটুকু সৌজন্য আশা করাটা বোধ-হয় অন্যায় হবে না।

শোন স্ট্র্যাসি। মুখ তুলে তাকালেন কর্ণেল স্ট্র্যাসির দিকে, আমি চাই ব্রিটিশ সিঙ্গাপুরে অবতরণ করেই যেন সর্বাগ্রে সমুদ্রমুখী এই শহীদ-স্তম্ভ দেখতে পায়। কি, পারবে তো?

পারব স্যার। স্যালুট করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন কর্ণেল স্ট্র্যাসি। চোখ মুখে তাঁর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের ভাব।

কাজটা সহজ নয়। আসন্ন দুর্যোগের প্রতীক্ষায় গোটা সিঙ্গাপুরে তখন একটা থমথমে ভাব। কোথায় পাওয়া যাবে এ সময়ে মালমশলা বা কুলি-মজুর! কোথায়ই বা কণ্ট্রাক্টার বা লোকজন! তবু পারতেই হবে। যে করে হোক, নেতাজীর এই শেষ ইচ্ছাকে পূর্ণ করতেই হবে।

উঠে দাঁড়ালেন সুভাষ। তারপর স্ট্র্যাসির একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললেন, ভগবান তোমার সহায় হোন। হ্যাঁ, তুমি পারবে। নিশ্চয়ই পারবে।

সত্যিই পেরেছিলেন, মল্লিকা। ব্রিটিশবাহিনী অবতরণ করবার আগেই যেভাবে তিনি দিন-রাত্রি পরিশ্রম করে সুভাষের সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, তা শতমুখে প্রশংসা করবার মত। কিন্তু তারপর! সে কলঙ্কের কথা তোমাকে বলব আরো পরে।

রাত দশটায় আবার শুরু হল মন্ত্রিসভার বৈঠকে। আত্মসমর্পণের খবর সত্য। জাপ-সম্রাট নিজেই আজ সেকথা ঘোষণা করেছেন টোকিও রেডিও থেকে। এ পরিস্থিতিতে এখন আমাদের কি করা উচিত?

মন্ত্রিসভার দাবী—নেতাজীকে সিঙ্গাপুর ত্যাগ করে অন্যত্র যেতেই হবে। অবিলম্বেই যেতে হবে। আর কোনরকমেই দেরী করলে চলবে না।

অন্যদিকে তখনো সুভাষের ইচ্ছা তিনি সিঙ্গাপুরেই থাকবেন সবার সঙ্গে।

শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভার প্রবল চাপের কাছে আত্মসমর্পণ করতেই হল সুভাষকে। উপায় নেই। ওদের সবার ইচ্ছাই তাই। সুতরাং যেতেই হবে।

ব্রিটিশ মুখপাত্রের ভাষায়: 'সেদিন মন্ত্রিসভার সদস্যরা জোর করে চেপে ধরায় তিনি চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন!' '...under strong pressure from his Cabinet, he decided to leave...'

কিন্তু কোথায় যাবেন থাইল্যান্ড। ইন্দোচীন। জাপান! মাঞ্চুকু! না কি রাশিয়া।

যেখানেই হোক, সিঙ্গাপুর বা মালয়ে আর নয়। থাইল্যান্ড বা ইন্দোচীনও নিরাপদ নয়। জাপান পরাজিত। সেখানেও যাওয়ার কোন অর্থ হয় না।

তাহলে কোথায়, যেখানে গেলে ইঙ্গ-মার্কিন রোষবহ্নি থেকে রেহাই পাওয়া যায়! পৃথিবীতে এমন কোন দেশ আছে কি, যে দেশ ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির রক্তচক্ষু দেখেও ভয় পাবে না?

হ্যাঁ, রাশিয়াই একমাত্র দেশ, যে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত সাহস রাখে। একথা সবাই জানে যে, প্রয়োজনের তাগিদে রাশিয়া ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির সঙ্গে হাত মেলালেও যুদ্ধ শেষে তাদের সেই সম্পর্কে ফাটল ধরবেই।

ব্রিটিশ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না। যতই জয়লাভ করুক না কেন, এ যুদ্ধে তাদের সর্বদিক থেকে ভরাডুবি হয়েছে। বিশেষ করে তার অর্থনৈতিক কাঠামো এমনভাবে ভেঙে পড়েছে যে, সহসা আর তাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে না।

কিন্তু আমেরিকা সম্বন্ধে সেকথা খাটে না। স্বভাবতই সে তখন চাইবে গোটা পৃথিবীতে নিজের প্রভুত্ব কায়েম করতে। রাশিয়া তা হতে দেবে না। দেওয়া সম্ভব নয়। তাই রাশিয়াই একমাত্র দেশ, যার কাছ থেকে ভারত তার স্বাধীনতা-সংগ্রামে কিছুটা সহযোগিতা আশা করতে পারে।

ইতিমধ্যে তার প্রমাণও পাওয়া গেছে কয়েকটি ক্ষেত্রে। যেমন ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত সিকিউরিটি কনফারেন্স। ব্রিটিশ ভারতীয় প্রতিনিধিকে সেখানে কোনরকম আমলই দেননি সোভিয়েত রাশিয়ার বৈদেশিক মন্ত্রী মিঃ মলোটভ। বলেছিলেন—পরবর্তী কনফারেন্সে স্বাধীন ভারতের প্রতিনিধির মন্তব্য শুনতে পেলেই আমরা বেশি খুশি হব।

'Russia would like to hear the voice of Free India at future conferences. Therefore, though Russia was an ally of Britain, she was not against India's struggle for Indepeodence.' [The Struggle in East Asia : John A. Thivy : P.—67-68]

রাশিয়া সম্বন্ধে সুভাষের এই মনোভাবের কথা জাপানেরও অজানা ছিল না। ১৯৪২ সালের কথা। তখনো ইম্ফল-অভিযান শুরু হয়নি। বৃহত্তম পূর্ব এশিয়া সম্মেলন উপলক্ষে সুভাষ তখন টোকিওতে। সেখানে প্রকাশ্যেই তিনি বলেছিলেন—জার্মানী পরাজিত হলে প্রয়োজন বোধে আমরা রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে যুদ্ধ করব।

'Should Germany lose, we will have to continue to fight the Allied Powers even by joining hands with Russia.'

ইম্ফল থেকে ফেরার পরে প্রশ্নটা যে আরো বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল সেকথা বলাই বাহুল্য। সে প্রচেষ্টায় ইন্ধন জুগিয়েছিলেন বর্মাস্থ জাপ রিয়াল-

এ্যাডামরাল নাকাডো। নেতাজীর উচিত, রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে উত্তর সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করা। সম্মতি পেলে আমিই নেতাজীকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি রাশিয়াতে।

সম্মত হতে পারেননি জাপ-সরকার। যদিও রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের অনাক্রমণ চুক্তি বিদ্যমান, তবু সে বিপক্ষ শিবিরের অংশীদার। তাই এ ব্যাপারে হিজ এক্সেলেন্সী চন্দ্র বোসকে কোনরকম সাহায্য করতে আমরা অক্ষম।

তবু হাল ছাড়েননি সুভাষ। তারপরও তিনি রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করেছেন বার বার। বিশেষ করে আজাদ হিন্দ্ সরকারের সেক্রেটারী আনন্দমোহন সহায়ের মাধ্যমে। সহায় দীর্ঘদিন ধরে টোকিও রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত। তাঁর পক্ষে টোকিওর সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতে জেকব মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা খবই সহজ ও স্বাভাবিক।

তাই টোকিও বা ব্যাঙ্কক নয়। সাইগন বা হ্যানয়ও নয়। যেতে হবে সেই রাশিয়া ভূখণ্ডেই।

তবে যুদ্ধ-পরিস্থিতির জন্য সরাসরি রাশিয়া ভূখণ্ডে যাওয়া এখন সম্ভব নয়। তাই যেতে হবে প্রথমে—মাঞ্চুরিয়া। মাঞ্চুরিয়া এখনও জাপ-সরকারের করতলগত। হয়তো দু-চার দিনের মধ্যেই মাঞ্চুরিয়া চলে যাবে লালফৌজের দখলে। তখন আত্মপরিচয় দিয়ে নিজের উদ্দেশ্যের কথা খুলে বললে হয়তো বা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্বন্ধে তাদের সমর্থন পেতে খুব একটা দেরী হবে না।

সবটাই অনুমানের কথা। হয়তো তাই হবে। হয়তো শেষ পর্যন্ত নিরাপদেই মাঞ্চুরিয়ায় চলে যাওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু হবেই যে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে বৈকি।

তাছাড়া উপায়ই বা কি! পথ কোথায়? জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে, সর্বত্রই তো শত্রুর বেড়াজাল। ঐ কঠিন, কঠোর, দুর্ভেদ্য বেড়াজাল থেকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া খুব সহজসাধ্য নয়।

রাত তিনটে।

মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষ। ঠিক হয়েছে—অবিলম্বে সুভাষকে চলে যেতে হবে সিংগাপুর থেকে।

কিন্তু কোথায়? যেখানেই হোক। তবে সিংগাপুরে আর নয়।

সুভাষ নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। সারা মুখে তাঁর বেদনার সুস্পষ্ট ছায়া। এই সেই সিংগাপুর, যেখানে তাঁর ১৯২৮ সালে দেখা স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পেয়েছিল দুবছর আগে। এই সিংগাপুরেই একদিন গঠিত হয়েছিল স্বাধীন ভারতবর্ষের অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ সরকার, যাকে পৃথিবীর নয়টি রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিয়েছিল বিভিন্ন পর্যায়ে। সেই বহু স্মৃতিবিজড়িত সিংগাপুর ছেড়ে এবার তাঁকে চলে যেতে হবে এমন এক অজানা পথের সন্ধানে, যে পথের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে কারোরই কোন স্পষ্ট ধারণা নেই।

রক্তাক্ত দিনের সহকর্মীদের এভাবে ছেড়ে যেতে মন সায় দেয় না। দেহ সাড়া জাগায় না। তবু যেতেই যে হবে। মন্ত্রিসভার নির্দেশ তাই।

বারেক সুভাষ মুখ তুলে তাকালেন সবার দিকে। আজো ওরা সবাই রয়েছে তাঁর পাশে। কিন্তু কাল!

চরম দুর্ভাগ্যের বোঝা মাথায় নিয়ে কাল কোথায় থাকবে এই সহকর্মীর দল, আর কোথায় তাঁকে চলে যেতে হবে অজানা এক ভবিষ্যতের পথে! ভাবতে গেলেও যেন ব্যর্থ-বেদনায় বুকটা টন্‌টন্‌ করে ওঠে।

কিন্তু না, সবাইকে রেখে যাওয়াই ঠিক হবে না। আগামী দিনের প্রস্তুতির জন্য অন্তত কয়েকজনকে সঙ্গে নেওয়া দরকার। কর্ণেল প্রীতম সিংকে নিতেই হবে। কিন্তু আর কেউ! হবিব, তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

হ্যাঁ, স্যার। সম্মতি জানালেন কর্ণেল হবিবুর রহমান।

বেশ, তাই চল। আবিদ হাসান আর দেবনাথ দাস ব্যাঙ্ককে রয়েছে। ওদেরও তুলে নেওয়া যাবে ওখান থেকে। পেনাং থেকে স্বামী এখনো আসেনি। যে কোন মুহূর্তে এসে যাবে হয়তো। এলে তাকেও নেওয়া যাবে সঙ্গে করে। আর আয়ার সাহেব তোমার এখন কত বছর চলছে?

আটচল্লিশ বছর স্যার।

তাহলে আমার চাইতে এক বছরের ছোট। তা তোমার ইচ্ছা কি?

আমিও যাব স্যার। মালয় আর মস্কো—দুই-ই আমার কাছে সমান।

বেশ, তাই চল। আর তোমার উপর আজাদ হিন্দ্‌ সরকারের সমস্ত দায়িত্ব রইল কিয়ানী। তোমাকে সাহায্য করবেন আলাগাপ্পন আর সরকার।

আর কোন প্রশ্ন নেই। কোন উত্তরও নেই। বুঝি সব প্রশ্ন, সব উত্তর হারিয়ে গেল মৌন রাতের অন্ধকারে।

> 'মৃত্যু ভেদ করি
> দুলিয়া চলেছে তরী।
> কোথায় পৌঁছিবে ঘাটে, কবে হবে পার,
> সময় তো নাই শুধাবার।'
>
> —রবীন্দ্রনাথ

১৬ই আগস্ট, ১৯৪৫ সাল। সকাল সাড়ে ন'টা।

সবাই এসে গিয়েছেন বিমান-বন্দরে। সুভাষ, আয়ার সাহেব, কর্ণেল প্রীতম সিং, কর্ণেল হবিবুর রহমান, দোভাষী মিঃ নিগেশী প্রমুখ সবাই।

আর এসেছেন মেজর জেনারেল কিয়ানী, আলাগাপ্পন, সরকার প্রমুখ আরো অনেকেই। কি এক অকথিত ব্যথায় সবাই গম্ভীর, করুণ, স্বল্পবাক্‌। কে জানে, হয়তো এই শেষ দেখা। এ সময়ে যতক্ষণ কাছাকাছি থাকা যায়।

কিন্তু নেতাজী কোথায় যাবেন সেকথা তো জানা হল না। টোকিও!

মাণ্ডুরিয়া ! না কি মস্কো ! না, এ জিজ্ঞাসার কোন স্পষ্ট জবাব নেই। শুধু বোঝা গেল—শেষ যাত্রা শুরু হবে ব্যাঙ্কক থেকে।

জয় হিন্দ্ ! শেষবারের মত সবাই অভিবাদন জানালেন তাঁদের একান্ত প্রিয় নেতাজীকে।

জয় হিন্দ্ ! কোনরকমে কথাটা উচ্চারণ করেই সবার আগে সিঁড়ি বেয়ে বিমানে উঠে গেলেন সুভাষ। আর ফিরেও তাকালেন না। বিপ্লবীকে যে পেছনে তাকাতে নেই।

সজল চোখে শেষ পর্যন্ত তাকিয়ে রইলেন, কিয়ানী, আলাগাপ্পন, সরকার প্রমুখ সহকর্মীবৃন্দ।

ঐ যে বিমানটা রানওয়ের উপর চক্কর দিয়ে আকাশে উঠে তার যাত্রা শুরু করেছে। ঐ যে দিক-চক্রবালে ক্রমশঃ ছোট হতে হতে মিলিয়ে যাচ্ছে আকাশের বুকে। না, আর দেখা যাচ্ছে না। নেতাজী সত্যিই চলে গেছেন সিঙ্গাপুর ত্যাগ করে। এ জীবনে আর কোনদিন তাঁর দেখা পাওয়া যাবে কিনা কে জানে!

রেখে গেছেন একটি বিশেষ হুকুমনামা এবং দুটি বিদায়-বাণী। হুকুম-নামায় তিনি নিজের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে গেছেন মেজর জেনারেল কিয়ানীকে।

ARZI HAKUMAT-E-AZAD HIND

Syonan
Date, 16th August, 1945.

ORDER

During my absence from Syonan, Major General M. Z. Kiani will represent the Provisional Government of Azad Hind.

Subhas Chandra Bose
Head of the State
Provisional Government of Azad Hind.

মোট দুটি বিদায়-বাণী। তার একটি থেকে কিছুটা অংশ পড়ে শোনাচ্ছি :

'ভাই ও ভগিনীগণ,

...আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ও ঝাঁসীর রাণীবাহিনীতে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য আপনারা আপনাদের সন্তানদের পাঠিয়েছিলেন। আজাদ হিন্দ্ সরকারের যুদ্ধ-ভাণ্ডারে আপনারা মুক্তহস্তে দিয়েছিলেন অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রী। এক-কথায় বলতে গেলে সত্যিকারের ভারত-সন্তানের মতই আপনারা আপনাদের কর্তব্য করেছিলেন।

আপনাদের এই দুঃখভোগ ও আত্মত্যাগের ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়নি, তার জন্য আপনাদের চাইতে আমিই বেশি দুঃখিত। কিন্তু এই আত্মত্যাগ ও

দুঃখভোগ বৃথা যায়নি। তার ফলে আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা সুনিশ্চিত হয়েছে এবং সারা বিশ্বে, সমস্ত ভারতবাসীর কাছে আপনাদের এ কাহিনী অমর প্রেরণা হয়ে থাকবে।

ইতিহাসের এই অভাবনীয় সংকটে একটি কথাই আমার বলার আছে। এই সাময়িক পরাজয়ে যেন আপনাদের আশাভঙ্গ না হয়। আস্থা হারাবেন না। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই, যা ভারতবর্ষকে পদানত রাখতে পারে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই, সেদিন আর দূরে নয়।'

বিকেল তিনটেয় ব্যাঙ্কক।

কেউ আসেনি সেদিন বিমান-বন্দরে সুভাষকে অভ্যর্থনা জানাতে। আসার কথাও নয়। জানতই না কেউ খবরটা।

সূর্যের প্রচণ্ড তাপে পৃথিবী যেন ঝলসে যাচ্ছে, তাই বিমান থেকে নেমে সুভাষ সোজা এসে দাঁড়ালেন একটা কাঠের ছাউনির নীচে। সঙ্গে বাদবাকি সবাই।

প্রায় দুঘণ্টা পরে খবর পেয়ে গাড়ি নিয়ে ছুটে এলেন মেজর জেনারেল ভোঁসলে। এসময়ে নেতাজী আসবেন, এটা বাধহয় তাঁর কল্পনারও অগোচর ছিল।

দেখতে দেখতে খবরটা ছড়িয়ে গেল সর্বত্র। তারপরই শুরু হল উদ্বেলিত জনতার স্রোত। সবাই দেখতে চায় নেতাজীকে। সবার চোখে-মুখে ব্যাকুল উৎকণ্ঠা। নেতাজীর কি হবে! কোথায় যাবেন তিনি এখন! চারপাশেই যে শত্রু!

প্রহরে প্রহরে রাত্রি এগিয়ে চলে, তবু জনস্রোতের বিরাম নেই। বাংলোর চারপাশে শুধু কালো কালো মানুষের মাথা। একবার শুধু নেতাজীকে দেখব। শুধু একবার। কে জানে, হয়তো এই শেষ দেখা!

দেখা করতে এলেন জাপ-রাষ্ট্রদূত মিঃ হাচাইয়া। সঙ্গে জাপ-সরকার প্রেরিত একটি জরুরী বার্তা। আত্মসমর্পণের খবর সত্য। তবে হিজ এক্সেলেন্সী চন্দ্র বোসের কোন বিশেষ ইচ্ছা থাকলে জাপান তাতে সহযোগিতা করতে সর্বতোভাবে প্রস্তুত।

জেনারেল ইসোদার সঙ্গেও কথাবার্তা হল কিছুক্ষণ। সুভাষের বক্তব্য : জাপান পরাজিত। এ অবস্থায় জাপানের পক্ষে সহযোগিতা করা কতটুকু সম্ভব?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন শুধু একজন। তিনি হলেন সাইগনে অবস্থিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কম্যাণ্ডের সর্বাধিনায়ক ফিল্ডমার্শাল কাউণ্ট তেরাউচি।

বেশ, তাই হোক। চল তাহলে এবার সাইগন।

যাবার আগে শেষবারের মত একটি হুকুমনামা জারী করলেন সুভাষ। ইতিপূর্বে তিনি রাষ্ট্রপ্রধানরূপে প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছিলেন মেজর জেনা-রেল কিয়ানীকে। এবার আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হিসেবে নির্বা-

চিত করলেন মেজর জেনারেল ভোঁসলেকে। একজন রাষ্ট্রপ্রধান। অন্যজন ফৌজের সর্বাধিনায়ক।

১৭ই আগস্ট, ১৯৪৫ সাল।

তখনো রাতের অন্ধকার কাটেনি। সবেমাত্র ফর্সা হয়ে উঠেছে পূব আকাশটা।

সুভাষ প্রস্তুত। প্রস্তুত আয়ার সাহেব, হবিবুর রহমান, প্রীতম সিং, গুলজারা সিং, আবিদ হাসান এবং দেবনাথ দাস।

লগ্ন আসন্ন। এবার সবাইকে যাত্রা শুরু করতে হবে সাইগনের উদ্দেশ্যে।

সামনে দাঁড়িয়ে পরমানন্দ, ঈশ্বর সিং, পণ্ডিত রঘুনাথ শর্মা, পিল্লাই, এতদিনকার সঙ্গী স্টেনোগ্রাফার ভাস্করণ, ক্যাপ্টেন রিজভি এবং ভৃত্য সুনীল। কারো চোখই শুকনো নেই। এমন করে যে একদিন নেতাজীকে বিদায় দিতে হবে তা কে জানত!

এবার যাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে আরো কয়েকজন। এপক্ষে কর্ণেল গুল-জারা সিং, আবিদ হাসান এবং দেবনাথ দাস। জাপানের তরফে জেনারেল ইসোদা, মিঃ হাচাইয়া এবং কর্ণেল কিয়ানো।

একটি বিমানই যথেষ্ট, তবু সুবিধা হবে বলে আরো একটি বিমান রওনা হল জাপ-কর্তৃপক্ষের নির্দেশে। প্রথমটাতে রইলেন সুভাষ, কর্ণেল হবিবুর রহমান, প্রীতম সিং, আয়ার এবং জাপানী অফিসার কর্ণেল কিয়ানো। অন্য-টাতে জেনারেল ইসোদা, মিঃ হাচাইয়া, গুলজারা সিং, আবিদ হাসান এবং দেবনাথ দাস।

বেলা দশটায় সাইগন।

ঠিক হল—জেনারেল ইসোদা, হাচাইয়া এবং একজন পদস্থ জাপানী স্টাফ অফিসার তক্ষুণি একটা বিমান নিয়ে চলে যাবেন 'দালাত্'। ওখানেই ফিল্ড-মার্শাল কাউণ্ট তেরাউচির সদর দপ্তর। ওখানে গিয়ে তেরাউচির সঙ্গে আলাপ করে তাঁরা জেনে আসবেন—হিজ এক্সেলেন্সী চন্দ্র বোসের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য বিমান দিয়ে কতটা সহযোগিতা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব।

দালাতের দূরত্ব সামান্যই। যেতে-আসতে খুব একটা দেরী হবার কথা নয়।

সবাইকে নিয়ে সাময়িকভাবে শ্রীনারায়ণ দাসের বাসভবনের আশ্রয় নিলেন সুভাষ। নারায়ণ দাস স্থানীয় আজাদ হিন্দ্ সংঘের গৃহ-নির্মাণ বিভাগের সেক্রেটারী।

সাইগনকে সেদিন আর চেনার উপায় নেই। বেশির ভাগ বাড়িতে তালা ঝুলছে। পথ-ঘাটও জনমানবশূন্য। মাত্র দুদিন আগে জাপানের আত্ম-সমর্পণের সংবাদ ঘোষিত হয়েছে। কখন যে আগেকার সেই ফরাসী বাহিনী

এসে হাজির হবে কে জানে! কিন্তু তারপর! পারবে কি তারা পরাজয়ের ক্ষমতাটাকে এত সহজে ভুলে যেতে?

আজাদ হিন্দ্ সংঘ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কর্মীরা বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে নানাদিকে। কেউ কেউ চলে গেছে অনেক দূরে—নিরাপদ স্থানে। তাই সুভাষের উপস্থিতির কথা কেউ সেদিন জানতে পারেনি সাইগনে। তার প্রয়োজনও ফুরিয়ে গিয়েছিল। শুধু গুজব শুনে একটিমাত্র লোক সেদিন উপস্থিত হয়েছিল বিমানবন্দরে। তিনি হলেন আজাদ হিন্দ্ সংঘের জনৈক কর্মী—চন্দ্রমাল।

নারায়ণ দাসের বাড়ি পেঁছে প্রথমেই জামা-জুতো খুলে, দাড়ি কামিয়ে নিয়ে স্নান করলেন সুভাষ। তারপরই আশ্রয় নিলেন বিছানায়। সঙ্গে সঙ্গেই গভীর নিদ্রা। গত কদিন দুচোখের পাতা এক করবার মত সময় মেলেনি। উদ্বেগ ও দুর্ভাবনা থেকে এবার কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি।

আধঘণ্টা যেতে না যেতেই ছুটে এলেন জাপানী লিয়াসোঁ অফিসার মিঃ কিয়ানো। এই মুহূর্তে একটা জাপানী প্লেন ছাড়বে বিমান-বন্দর থেকে। একজনের সীট খালি আছে। নেতাজী কি যাবেন সেই প্লেনে? তাহলে এক্ষুণি তাঁকে চলে যেতে হবে বিমান-বন্দরে।

বিছানায় উঠে বসলেন সুভাষ। আবিদ হাসানকে জিজ্ঞেস করলেন—প্লেনটা যাবে কোথায়?

আমি জানিনে স্যার। মিঃ কিয়ানোও জানেন না বলছেন।

তাহলে যে জানে, তাকে পাঠিয়ে দিতে বল।

স্যার, মিঃ কিয়ানো বলছেন, হাতে আর মোটেই সময় নেই।

প্লেন কোথায় যাচ্ছে, তা না জেনে-শুনে আমি যেতে পারিনে। এমন কেউ আসুক, যে সবকিছু জানে।

ঝড়ের মত ফিরে গেলেন মিঃ কিয়ানো। আবার একটা গাড়ি এসে থামল আধঘণ্টা বাদে। এবার গাড়ি থেকে নামলেন জেনারেল ইসোদা, হাচাইয়া এবং ফিল্ড-মার্শাল তেরাউচির একজন স্টাফ অফিসার।

সুভাষের ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিলেন ওঁরা। কাছে রইলেন শুধু একজন। তিনি হলেন কর্ণেল হবিবুর রহমান। 'Habibur Rahman was also asked to join the fateful conference.'

বাকিটুকু আয়ার সাহেবই শোনাবেন তোমাকে:

'হবিব সে সময়ে ঘরের ভিতরে ছিল। আমি বাইরে। জানিনে, তাদের মধ্যে কি আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। একটু বাদেই নেতাজী সেই রুদ্ধদ্বার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সবাইকে ডাকলেন। বললেন—এক্ষুণি একটা জরুরী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রীতম আর গুলজারা কোথায়? ওদের ডাকো।

প্রীতম এবং গুলজারা পাশের বাড়িতে ছিল। তক্ষুণি তাদের ডাকতে পাঠালাম। লক্ষ্য করলাম, নেতাজী অত্যন্ত অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। পাঁচ সেকেন্ড যেতে না যেতেই বললেন, ওদের বল, সাজ-পোশাক ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে না। যেমন আছ, তেমনিই চলে আসুক। এক্ষুণি। এই মুহূর্তেই। আর সময় নেই।

ওরা আসতেই নেতাজী আমাদের নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর এক নিশ্বাসে বললেন, শোন, একটামাত্র সীট শুধু পাওয়া গেছে। আমার যাওয়া যদি তোমরা সাব্যস্ত কর, তাহলে আমাকে একাই যেতে হবে। যা বলবার বলে ফেল। দেরী করো না। অবশ্য আর একটা সীটের কথা আমি বলেছি তবে সেটা হবে বলে মনে হয় না।

নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম আমরা ছ-জন। প্রশ্নটা যেমন আকস্মিক, তেমনি অপ্রত্যাশিত। কি বলব! অজানা ভবিষ্যতের হাতে নেতাজীকে একা ছেড়ে দেবার কথা যে চিন্তাও করা যায় না।

কিন্তু কেন? ওরা কি ইচ্ছে করলে আর একটা সীটের ব্যবস্থা করতে পারে না? কেন নেতাজীকে একা নিয়ে যেতে চাইছে ওরা?

আবার বলে উঠলেন নেতাজী, দেরী করো না। সময় নেই। আমি যাব কি যাব না, একটা শুধু তোমরা বলে দাও।

এবার আমাদের মধ্য থেকে একজন বললেন, আপনি জোর দিয়ে ওদের বলুন অন্তত আর একটা সীটের ব্যবস্থা ওরা করে দিক। নেহাৎ যদি না হয়, তাহলে আপনি একাই সাইগন ছেড়ে চলে যান।

কিন্তু নেতাজী কোথায় যাবেন! আমরা কেউ তাঁকে সে প্রশ্ন করিনি! কিন্তু আমরা জানতাম যে, বিমানটি যাবে মাঞ্চুরিয়ার দিকে। নেতাজী মনে করেছিলেন যে, আমরা সবই জানি। তাই তিনিও নিজে থেকে কিছু বলেননি আমাদের।

পাশের ঘরে কথাবার্তা বলে আবার একটু বাদেই ফিরে এলেন নেতাজী। বললেন, আর একটি সীট পাওয়া গেছে। হবিব, তুমি বরং চল আমার সঙ্গে। তোমরাও চল বিমান-বন্দরে। কি জানি, যদি আরো দু-একটা সীট পাওয়া যায়!

কিন্তু জিনিসপত্র! এত সমস্ত জিনিসপত্রের কি হবে! সঙ্গে সরকারী দলিল-দস্তাবেজও রয়েছে কম নয়। এগুলোর কি হবে?

যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলো সঙ্গে যাবে। বাকিগুলো নষ্ট করে ফেলতে হবে।

তাড়াতাড়ি একটা প্যাকেট এগিয়ে দিলেন দেবনাথ দাস। এটা কি করব স্যার?

কি এটা! সুভাষের দুচোখে সপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা।

আপনার হেড-কোয়ার্টার্সের জাতীয় পতাকা।

মুহূর্ত কি ভাবলেন সুভাষ। তারপর বললেন, ওটা এখন তোমার কাছেই থাক। যত্ন করে রেখে দিও।

তৎক্ষণাৎ আমরা দুটি গাড়িতে করে রওনা দিলাম বিমান-বন্দরের দিকে। প্রথমটাতে নেতাজী, হবিব এবং আমি। অন্যটাতে গুলজারা, প্রীতম, আবিদ এবং দেবনাথ দাস।

যথাসময়ে আমাদের গাড়ি পেঁছে গেল বিমান-বন্দরে। কিন্তু বেশ কিছু-ক্ষণ কেটে গেল, তবু পরের গাড়িটির দেখা নেই। ক্রমশঃ সবাই অধৈর্য হয়ে পড়ল দেরী দেখে। এদিকে প্লেনের প্রপেলারটা ঘুরছে অনেকক্ষণ ধরে। জাপ-সেনাপতি শিদেয়ীও ঐ প্লেনের একজন যাত্রী। প্রায় দুঘণ্টা ধরে তিনি প্রতীক্ষা করছিলেন নেতাজীর জন্য। সবার অভিমত—আর দেরী করা ঠিক নয়। নেতাজী তাদের প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। বললেন, পেছনের গাড়িতে তাঁর অত্যন্ত জরুরী কাগজপত্র রয়েছে।

অবশেষে পরের গাড়িটাও এসে গেল। নেতাজী সংক্ষিপ্ত বিদায় নিলেন আমাদের কাছ থেকে। আমার হাতখানা ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন—জয় হিন্দ্ !

আবেগে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। যদিও একথা মনে করার কোন কারণ নেই, তবু কেন জানি মনে হল এই শেষ দেখা। অস্ফুট কণ্ঠে বললাম—জয় হিন্দ্ !

নেতাজী এবং হবিব সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন প্লেনের অভ্যন্তরে।

১৭ই আগস্ট, বিকেল ঠিক পাঁচটা পনেরো মিনিটে বিমানটি আকাশে উঠে আস্তে আস্তে একসময়ে মিলিয়ে গেল নেতাজীকে নিয়ে। কোথায়, ভগবান জানেন।'

সাইগন থেকে হাইতো।

কিন্তু না, তার আগেই যাত্রা-বিরতি ঘটল তুরাণ বিমান-বন্দরে। কেন, কার নির্দেশে এটা ঘটল ঠিক বোঝা গেল না।

এখন থেকে প্রত্যক্ষদর্শী বলতে মাত্র একজন। তিনি হলেন সুভাষের একান্ত বিশ্বাসভাজন কর্ণেল হবিবুর রহমান। তাঁকেই বরং এবার এগিয়ে দিই ঃ

'তুরাণে অবতরণ করার পরে নেতাজীর মালপত্র একটা গাড়িতে তোলা হল। নেতাজী, কয়েকজন জাপানী অফিসার এবং আমি একটা হোটেলে গেলাম। ওখানেই আমরা রাত্রি যাপন করি। পরদিন ভোরে বিমান-বন্দরে পেঁছে দেখি অন্যান্য সবাই সেখানে উপস্থিত আছেন।'

১৮ই আগস্ট, ১৯৪৫ সাল।

দুই-ইঞ্জিনযুক্ত স্যালি ৯৭·২ মডেলের সেই বোমারু-বিমানটি আবার আকাশে উঠল তুরাণ বিমান-বন্দর থেকে।

পরবর্তী লক্ষ্য—সেই হাইতো। কিন্তু না, এবারও হাইতো বিমান-বন্দরে অবতরণ করা হল না। খবর পাওয়া গেল, লালফৌজ ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে মাঞ্চুরিয়ার দিকে। ইতিমধ্যেই নাকি পোর্ট আর্থার বন্দর চলে গেছে তাদের দখলে। বলা বাহুল্য যে, এখানেই তারা থামবে না। হয়তো গোটা মাঞ্চুরিয়াই একদিন চলে যাবে তাদের দখলে। তার আগে যে করে হোক, মাঞ্চুরিয়ার দাইরেন বন্দরে গিয়ে পৌঁছাতেই হবে। সুতরাং হাইতো না থেমে চল এবার ফরমোসা দ্বীপের তাইহোকু বিমান-বন্দরে। ওখানে গিয়ে বিমানে তেল ভরে নিয়ে সোজা দাইরেন।

অপরাহ্ণে তাইহোকু বিমান-বন্দর।

সামনেই একটা তাঁবু। বিভিন্ন জাপ-বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের আদেশপত্র পৌঁছে দেবার জন্য সেদিনই সম্রাটের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি প্রিন্স কোনিন-এর আসার কথা ছিল তাইহোকুতে। তাঁবুটা খাটানো হয়েছিল তাঁরই প্রয়োজনে।

বিমান থেকে নেমে সবাই আশ্রয় নিলেন সেই তাঁবুর নীচে। কিছু স্যাণ্ডুইচ এবং পাকা কলাও খেয়ে নিলেন সবাই মিলে।

ততক্ষণে বিমানে তেল ভরবার কাজ শেষ। নিয়মমত বিমানটিকে পরীক্ষা করেও দেখা হয়েছে নানাভাবে। ইঞ্জিনে কি যেন একটা গোলযোগ দেখা দিয়েছিল প্রথমদিকে। পরে সব ঠিক। সুতরাং চলো এবার দাইরেন।

পরের ইতিহাস সবই জান। বহুদিন বহুভাবেই সে ইতিহাস তুমি শুনেছ। তাই কথার পুনরাবৃত্তি না করে আমি বরং কর্ণেল হবিবুর রহমানকেই এগিয়ে দিচ্ছি তোমার সামনে। ঠিক এই কথাগুলোই তিনি সবাইকে বলেছিলেন পরবর্তীকালে ঃ

'সবেমাত্র আমরা তখন রানওয়ে পার হয়ে দু-তিন শ' ফুট উঁচুতে উঠেছি। তখনো আমরা বিমান-বন্দরের সীমানার মধ্যে। মাত্র দু-এক মিনিটের মত আমরা আকাশে ছিলাম। বেলা তখন দুটো বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। কি ব্যাপার! তবে কি কোন শত্রু-বিমান আমাদের লক্ষ্য করে নির্ভুল নিশানায় গুলী ছুঁড়ছে? পাইলট এ অবস্থায় কি করবেন? তিনি কি বিমানটি নিরাপদে নীচে অবতরণ করাতে সক্ষম হবেন। বিমানটি কি বিধ্বস্ত হবে?

পরে জেনেছিলাম যে, বাঁ-দিকের ইঞ্জিনের একটা প্রপেলার ভেঙে পড়েছিল। ইঞ্জিনটি অকেজো হয়ে গিয়েছিল। বিমানটি কাঁপছিল এবং খুব তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আসছিল।

আমি নেতাজীর দিকে তাকালাম। তিনি নির্বিকার। বিমানটি যদি অনেকটা পথ উড়ে এসে নির্বিঘ্নে অবতরণ করত, তাহলেও বোধহয় তাঁকে এর চাইতে বেশি নির্বিকার দেখাত না।

...কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বিমানটি খাড়াভাবে মাটিতে পড়ে বিধ্বস্ত হল এবং আমি জ্ঞান হারালাম।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে টের পেলাম বিমানের সব মালপত্র পিঠের উপর এসে পড়েছে। পেছনের পথ বন্ধ। সামনে আগুন জ্বলছে, নেতাজী আমার দিকে ফিরতেই বললাম—আগে সে নিকালিয়ে, পিছে সে রাস্তা নেহি হ্যায়।

আগুনের মধ্য দিয়েই তিনি বেরিয়ে গেলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। বাইরে এসে দেখলাম, দশ গজ দূরে আমার উল্টোদিকে মুখ করে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। প্লেনটি ভেঙে পড়ার সময় পেট্রোল ট্যাংক থেকে এক ঝলক পেট্রোল তাঁর পোশাকে ছিটকে পড়েছিল, তাই আগুনের মধ্য দিয়ে যাবার সময় তাঁর পোশাকে আগুন ধরে গিয়েছিল।

তিনি জ্বলন্ত পোশাক খুলে ফেলবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন। আমি ছুটে গিয়ে অতিকষ্টে তাঁর বুশকোটের বেল্টটা খুলে দিলাম। তাঁর ট্রাউজারে বেশি আগুন লাগেনি, তাই ট্রাউজার খোলার প্রয়োজন হয়নি। আমি তাঁকে মাটিতে শুইয়ে দিলাম এবং লক্ষ্য করলাম, তাঁর মাথার বাঁ দিকে একটা গভীর কাটা ক্ষতচিহ্ন,—যা প্রায় চার ইঞ্চি লম্বা।

আমি রুমাল দিয়ে চেপে ধরে তাঁর ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাত বন্ধ করার চেষ্টা করতে লাগলাম। আগুনের তাপে তাঁর মুখ ও চুল ঝলসে গিয়েছিল। আমার নিজের হাত দুটোও ভীষণভাবে পুড়ে গিয়েছিল। নেতাজীকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে আমিও তাঁর পাশে শুয়ে পড়লাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মিলিটারী এ্যাম্বুলেন্স আমাদের তাইহোকুর একটি হাসপাতালে নিয়ে গেল। হাসপাতালে পৌঁছানোর পরেই নেতাজী জ্ঞান হারান। অল্পক্ষণ পরেই আবার জ্ঞান ফিরে আসে।

একবার তিনি আবিদ হাসানের নাম ধরে ডেকেছিলেন। উত্তরে আমি বলেছিলাম—হাসান এখানে নেই স্যার, আমি হবিব।'

এবার হবিবুর রহমানের বদলে জাপ-মুখপাত্রকেই বরং এগিয়ে দেয়া যাক ঃ

'হাসপাতালের চারটি জেনারেল ওয়ার্ডে প্রায় আশীজন রোগী থাকার মত ব্যবস্থা ছিল। সে সময়ে প্রধান মেডিকেল অফিসার ছিলেন ডাঃ যোশিমী। সহকারী টি. সুরুতা।

প্রথমেই একটা গাড়িতে চেপে হাসপাতালে উপস্থিত হন নেতাজী একা। দ্বিতীয় গাড়িতে একজন জাপানী অফিসার। তাছাড়া একটা লরীতে বারো-তেরোজন আহত। নেতাজী সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় ছিলেন।

নেতাজী যখন আসেন, তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি অন্য সবাইকে আগে চিকিৎসা করার জন্য অনুরোধ জানান।

পরীক্ষা করে দেখা গেল নেতাজীর দেহ ভীষণভাবে পুড়ে গেছে, তবে তাঁর দেহে আঘাতের কোন চিহ্ন ছিল না। রক্তপাতও হচ্ছিল না কোন স্থান থেকে।

পরীক্ষা করে তাঁর দেহে মলম লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দেওয়া হয়। হার্টের অবস্থা খারাপ থাকায় চারটি ভিটা ক্যাম্ফার ও দুটি ডিজিটামিন ইনজেকশন দেওয়া হয়। এছাড়াও রিংগার সলিউশন ইনজেকশন দেওয়া হয় প্রতিবারে ৫০০ সি. সি. করে। অবস্থা বিবেচনা করে শরীর থেকে ৪০০ সি. সি. রক্ত বের করে ৪০০ সি. সি. নতুন রক্ত দেওয়া হয়। রক্ত দিয়েছিলেন হাস-পাতালের একজন জাপানী সৈনিক।

দোভাষী নাকামুরাকে তাঁর শয্যা-পাশে রাখা হয়েছিল। কয়েক বারই তিনি কথা বলেছিলেন। প্রথমবার বলেছিলেন—যে-সব সঙ্গীরা পরে আসছে, তাদের যেন উপযুক্তভাবে দেখাশোনা করা হয়। পরের বার জানতে চেয়েছিলেন, জেনারেল কেমন আছেন? কিছুক্ষণ পরেই বলেন, সমস্ত রক্ত আমার মাথায় উঠে আসছে। তারপরই একসময়ে বলেন, এবার আমি ঘুমোব।

বোধহয় শেষ কথাটি তিনি বলেছিলেন কর্ণেল হবিবুর রহমানকে লক্ষ্য করে ঃ

'আমার মৃত্যু আসন্ন। সারাজীবন আমি দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে এসেছি। আজ স্বাধীনতার জন্যই আমি মৃত্যুকে বরণ করে নিলাম। ফিরে গিয়ে দেশবাসীকে বলো, তারা যেন সংগ্রাম চালিয়ে যায়। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই। অচিরেই হবে।'

রাত সাতটা-সাড়ে সাতটা নাগাদ অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকে। নাড়িও ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসে। আবার ইনজেকশন দেবার চেষ্টা করা হয়ে-ছিল, কিন্তু সেসব কোন কাজেই আসেনি। রাত আটটার কয়েক মিনিট পরেই সব শেষ। সে সময়ে তাঁর কাছে ছিলেন ডাঃ যোশিমী, দোভাষী নাকামুরা, কর্ণেল হবিবুর রহমান, একজন মেডিকেল অর্ডালি এবং জনকয়েক জাপানী সৈনিক।

হবিবুর রহমান খুবই ভেঙে পড়েছিলেন। প্রায় পাঁচ-ছ মিনিট তিনি নীরবে প্রার্থনা করেছিলেন মৃতদেহের পাশে বসে। তারপর বহুক্ষণ পর্যন্ত খোলা জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন উদাস দৃষ্টিতে। নার্সরা সবাই ভেঙে পড়েছিলেন সশব্দ কান্নায়। উপস্থিত কারো চোখই শুকনো ছিল না।

ডাঃ যোশিমী ডেথ-সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছিলেন নিজের হাতে। সার্টিফিকেটে যা যা থাকা উচিত সবই তিনি উল্লেখ করেছিলেন যথাযথভাবে। যেমন—মৃত ব্যক্তি একজন জাপানী। নাম—'কাটাকানা'। মৃত্যুর কারণ আকস্মিক দুর্ঘটনা।

বিমান-দুর্ঘনায় এই নিয়ে সুভাষের দ্বিতীয়বার মৃত্যু হল মল্লিকা। প্রথমবার মৃত্যু হয়েছিল ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে। সেবার খবরের উৎস ছিল ইঙ্গ-মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান রয়টার। বলা হয়েছিল, সুভাষ নাকি বিমান-দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন বার্লিন থেকে টোকিও যাবার পথে।

এ সম্বন্ধে সেদিন সুন্দর একটি মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দবাজার,

পত্রিকার সম্পাদকীয় কলমে। মাত্র কয়েকটি কথা ঃ 'রয়টার পরকীয় সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করিয়াছেন। আমরা শোক-লিখন লিখিব না। সুভাষচন্দ্র দীর্ঘজীবী হউন।'

[আনন্দবাজার ঃ ৩০. ৩. ৪২]

দ্বিতীয়বার মৃত্যু হল তাইহোকুর নানমুন হাসপাতালে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সুপ্রীম কম্যাণ্ডার সুভাষ বসু নন, হিজ এক্সেলেন্সী চন্দ্র বোসও নন,—মৃত্যু হল এক অজ্ঞাতনামা জাপানীর—কাটাকানা পরিচয়ে।

পাঁচদিন নীরবতার পরে ২৩শে আগস্ট সে খবর সরকারীভাবে প্রকাশ করা হল টোকিও রেডিও থেকে। তবে এবার আর কাটাকানা নয়, শূন্যস্থান পূর্ণ করেছেন আজাদ হিন্দ্ সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান নেতাজী সুভাষ বসু।

একই দিনে ডোমেই এজেন্সী পরিবেশিত সে খবর প্রকাশিত হল জাপানের বিভিন্ন সংবাদপত্রগুলিতে ঃ

'Mr. Bose, head of the Provisional Government of Azad Hind, left Singapore on August 10, by air for Tokyo for talks with the Japanese Government. He was seriously injured when his plane crashed at Taihoku air field at 2 P. M. on August 18. He was given treatment in hospital in Japan where he died at midnight.'

অর্থাৎ, আজাদ হিন্দ্ সরকারের প্রধান শ্রীযুক্ত বসু ১০ই আগস্ট বিমানযোগে সিঙ্গাপুর ত্যাগ করে জাপান সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য টোকিও অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৮ই আগস্ট বেলা দুটোর সময় তাইহোকু বিমান-বন্দরে বিমানটি ভেঙে পড়ার দরুন তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। জাপানের একটি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা করা হয়। সেখানেই মধ্যরাত্রিতে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন।

লক্ষ্য করো, ডোমেই এজেন্সী কর্তৃক প্রচারিত এই মৃত্যু-সংবাদ আগা-গোড়াই কেমন বিভ্রান্তিকর। সুভাষ সিঙ্গাপুর ত্যাগ করেছিলেন ১৫ই আগস্ট, অথচ এখানে বলা হয়েছে ১০ই আগস্ট। আর মৃত্যু হয়েছে তাইহোকুর নানমুন হাসপাতালে নয়, জাপানের একটি হাসপাতালে।

ব্রিটিশের যুদ্ধজয়ের সংবাদে ভারতবর্ষে তখন আনন্দের ঢেউ বয়ে চলেছে কোন কোন মহলে। এমনকি তিন বছর আগে যাদের দাবী ছিল 'কুইট ইণ্ডিয়া', সেই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও তার ব্যতিক্রম নন। ১৭ই আগস্ট কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ এক অভিনন্দনবার্তা পাঠালেন চীনের রাষ্ট-নায়ক চিয়াং কাই-সেকের উদ্দেশ্যে ঃ

'মিত্রশক্তির এই বিজয় উপলক্ষে আমি আপনার সহিত চীনা জন-সাধারণের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। চীনের অদম্য জন-

সাধারণ আট বৎসরব্যাপী অত্যাচারী জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়াছে এবং অশেষ দুঃখ বরণ করিয়াছে।'

[আনন্দবাজার ঃ ১৮. ৮. ৪৫]

নিশ্চয়ই তুমি একটু অবাক হয়েছ মল্লিকা। ভাবছ, যে ব্রিটিশ যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষকে পদানত করে রেখেছে, তাদের যুদ্ধজয়ে আমাদের কেন এই আনন্দ প্রকাশ ?

এর উত্তর পাবে কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের কয়েকটি কথার মধ্যে ঃ

'মোহ ভঙ্গই সব চেয়ে বড় কথা। আধুনিক ভারতে সুভাষচন্দ্র ভিন্ন আর কাহারও যে মোহ ভঙ্গ হয় নাই, ইহা অতিশয় সত্য কথা। কারণ, শেষ পর্যন্ত ইংরেজের মহত্ব ও শুভ বুদ্ধিতে বিশ্বাস কাহারও ঘুচে নাই—তাহার বিরুদ্ধে যত অভিমান ও অভিযানই করিয়া থাকুক, অন্তরে অন্তরে সেই মোহ ছিল, এখনও আছে।' [জয়তু নেতাজী]

মৌলানা আজাদের পরে পণ্ডিত জওহরলাল। তবে তাঁর ক্ষোভ প্রধানত সুভাষ এবং আজাদী বাহিনীর বিরুদ্ধে। সংবাদপত্রের ভাষায় ঃ

'...ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য ব্রহ্মদেশে এবং মালয়ে যে সমস্ত ভারতীয় তথাকথিত ভারতীয় বাহিনীতে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের কথা উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত জওহরলাল বলেন—তিন বৎসর পূর্বে আমি এইরূপ অভিমত পোষণ করিতাম এবং এখনও আমি এইরূপ অভিমত পোষণ করি যে, এই বাহিনীর নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য লোকজন বহু বিষয়ে ভ্রান্ত পথে চালিত হইয়াছিলেন এবং জাপানের সঙ্গে তাহাদের দুর্ভাগ্যজনক সহযোগিতার বৃহত্তর ফলাফল কি হইবে তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।' [আনন্দবাজার ঃ ২৩. ৮. ৪৫]

ঠিক তার পরদিনই সুভাষের মৃত্যু-সংবাদ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হল ভারতবর্ষের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ঃ

'গত ২৩শে আগস্ট বৃহস্পতিবার রয়টার লণ্ডন হইতে সংবাদ দেন—জাপানী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান অদ্য সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়—গত ১৬ই আগস্ট সুভাষচন্দ্র বিমানে সিঙ্গাপুর হইতে টোকিও যাত্রা করেন এবং ১৮ই তারিখে তাইহোকু বিমান ক্ষেত্রে তিনি যে বিমানে আরোহী ছিলেন, তাহা দুর্ঘটনায় ভগ্ন হয়। তাঁহাকে হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয়—নিশীথে তাঁহার জীবনান্ত ঘটে। সঙ্গী লেফ্‌টেন্যান্ট জেনারেল সুনামাশ সিদী ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং কর্ণেল হবিবুর রহমান ও ৪ জন জাপানী আহত হয়।'

[আনন্দবাজার ঃ ২৪. ৮. ৪৫]

শোক প্রকাশ করলেন পণ্ডিত জওহরলাল ঃ

'সুভাষবাবুর মৃত্যু-সংবাদ আমাকে মর্মাহত করিয়াছে, আবার স্বস্তিও

দিয়াছে। তাঁহার ন্যায় সাহসী সৈনিকের ভাগ্যে অনেক সময় যে দুঃখ-দুর্দশা নিহিত থাকে, তিনি তাহা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন, ইহাই আমার স্বস্তি।

...অনেক বিষয়ে আমাদের ব্যক্তিগত মতভেদ ছিল। তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া পৃথক ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু আজীবন দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি যে সংগ্রাম করিয়াছেন এ সম্পর্কে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।'

[২৪শে আগস্ট এবটাবাদের জনসভায় পণ্ডিত জওহরলালের উক্তি]

একইভাবে শোক প্রকাশ করলেন কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদঃ

'প্রবাসে যে শোচনীয় অবস্থায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ভারতবাসী মাত্রেই শোকসন্তপ্ত হইবে। তাঁহার স্বদেশপ্রেম সন্দেহের অতীত। একটা সংকটের সময় ভ্রান্তপথে পদক্ষেপ না করিলে আজ তিনি আমাদের মধ্যে থাকিতেন।'

[আনন্দবাজার ঃ ২৭. ৮. ৪৫]

আর গান্ধীজী! আশ্চর্য, কিছুতেই তিনি সম্মতি দিলেন না জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করবার প্রস্তাবে। আর সুভাষের পারলৌকিক কাজ! না, তাতেও তিনি রাজী নন।

কিন্তু কেন? ১৯৪২ সালে প্রথমবার যখন সুভাষের মৃত্যু হয়েছিল, তখন তো তিনিই সর্বাগ্রে শোকবার্তা পাঠিয়েছিলেন সুভাষ-জননী শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবীর কাছে। সে বার্তায় তিনি বলেছিলেন ঃ 'আপনার বীর সন্তানের মৃত্যুতে সমগ্র জাতি আপনারই ন্যায় শোকাতুর। আপনার এই গভীর দুঃখে আমার পূর্ণ সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান আপনাকে এই বেদনা সহ্য করিবার শক্তি দিন।'

খবর মিথ্যে প্রমাণিত হবার পরে আবার তারবার্তা। 'ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ, যাহা সত্য বলিয়া শোনা গিয়াছিল, তাহা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা এবং সেই সঙ্গে সমগ্র জাতি আপনাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।'

সেই গান্ধীজীর এবার কেন এই অর্থপূর্ণ নীরবতা? কেন তিনি এতবড় শোকাবহ ঘটনা শোনার পরেও জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করবার প্রস্তাবে রাজী নন? কেন সুভাষের পারলৌকিক কাজ না করার জন্য তাঁর এই অমোঘ নির্দেশ? কোথায় এর রহস্য?

তবে কি সুভাষের এ মৃত্যু-সংবাদের মধ্যে কিছু অসঙ্গতি ধরা পড়েছে তাঁর অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে? না কি বরাবরের মত এবারও তিনি অন্তর থেকে এমন কোন নির্দেশ পেয়েছেন যে, সুভাষের এই মৃত্যু-সংবাদ আদৌ সত্য নয়?

ঠিক তাই। তাঁর বক্তব্য ঃ সুভাষের মৃত্যু হয়নি। প্রয়োজন হলে সে যে কতবড় ত্যাগ স্বীকার করতে পারে তা আমি জানতাম। কিন্তু তার এই বিরাট আয়োজন, বিরাট এই সামরিক গুণপনা এবং সংগঠন-শক্তির পরিচয় আমি

পেয়েছি ভারত থেকে তার অন্তর্ধান করার পরে। এভাবে তার মৃত্যু হতে পারে না। আমার অন্তরের নির্দেশ তাই।

'I always knew his capacity for sacrifice. But a full knowledge of his resourcefulness, soldiership and organising ability came to me only after his escape from India.'

এবার আমি পাশাপাশি দুটি চিত্র তোমার কাছে তুলে ধরছি মল্লিকা।

একদিকে জওহরলালের বক্তব্য ঃ আমি বিশ্বাস করি সুভাষ বেঁচে নেই।

অন্যদিকে কি গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসমাবেশে, কি প্রার্থনা-সভায়, কি দমদম জেলে আবদ্ধ রাজবন্দীদের কাছে গান্ধীজীর সেই একই বক্তব্য ঃ আমি বিশ্বাস করি, সুভাষ বেঁচেই আছে। সময় হলেই সে আসবে।

'I believe Subhas is still alive. He is biding time and will come out at the right moment.'

এমনকি পরবর্তীকালে প্রত্যক্ষদর্শী স্বয়ং কর্ণেল হবিবুর রহমানের মুখ থেকে ঘটনার বিবরণ শোনা সত্ত্বেও গান্ধীজী তাঁর নিজের বিশ্বাসে তেমনি অটল, অনড়। তখনকার সময়ের প্রখ্যাত জননেতা শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর সান্যালের লেখনী থেকেই তার বিবরণ তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি ঃ

'দিল্লীর কুনইস্‌ওয়েতে আজাদ হিন্দ্ সরকারের হোমরা-চোমরা ব্যক্তিদের বৈঠক। কর্ণেল হবিবুর রহমানের সংগে মহাত্মাজীর মোলাকাতের ব্যবস্থা হয়েছে। কর্ণেল বক্তা, মহাত্মা প্রধান শ্রোতা।

কর্ণেল নিপুণভাবে বিমান দুর্ঘটনা এঁকে দিলেন। আগাগোড়া সবটা শুনে গান্ধীজী বললেন—আউর ক্যা—বাতাও!

কর্ণেল চুপচাপ। সিংহ গর্জে উঠল—আমি তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করি না—সুভাষ মরতে পারে না।

মনে হল প্রবীণ নায়ক নিজহাতে স্বাধীন ভারতের স্বর্ণমুকুট সুভাষের মাথায় পরিয়ে দিচ্ছেন। কি সে দীপ্তি! কি সে তৃপ্তি!'

[গান্ধী-স্মারক ঃ শশাঙ্কশেখর সান্যাল ঃ সাপ্তাহিক বসুমতী ঃ ১৫. ১০. ৬৯]

গোটা পৃথিবী তখন সন্দেহের দোলায় দুলছে।

তবে কি বিমান-দুর্ঘটনার খবর আদৌ সত্য নয়? তবে কি ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে এটা একটা সাজানো ব্যাপার মাত্র?

বোধহয় তাই। নইলে অত সহজে ধরা দেবার পাত্র সুভাষ নন। তাছাড়া গান্ধীজী যেখানে অত জোর দিয়ে বলেছেন, তখন তার পেছনে নিশ্চয়ই কোন যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে।

কিন্তু এভাবে কতদিন তাঁর পক্ষে আত্মগোপন করে থাকা সম্ভব? আজ হোক, কাল হোক, ধরা যে তাঁকে পড়তেই হবে। তখন! তখন কি হবে!

সুভাষকে কি তখন রক্ষা করা সম্ভব হবে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর উদ্যত থাবা থেকে?

জাতির ভাষা মূর্ত হয়ে উঠল আম্বালার কংগ্রেস নেতা লালা দুনীচাঁদের কণ্ঠে। এটা চুপ করে থাকার সময় নয়। কংগ্রেসকে আজ স্পষ্ট করে বলতে হবে যে, সুভাষ সম্বন্ধে তাদের মনোভাব কি।

সংবাদপত্র থেকেই তার বিবরণ তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি :

'শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মিত্রপক্ষ কর্তৃক বন্দী হইলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একজন প্রাক্তন সভাপতির প্রতি ভারতবর্ষ কিরূপ আচরণ কামনা করে তাহা মহাত্মা গান্ধী, কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ ও অন্যান্য শীর্ষ-স্থানীয় কংগ্রেসী নেতার এক্ষণে স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত—আম্বালার লালা দুনীচাঁদ এম. এল. এ. সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে ইহা বলিয়াছেন। লালা দুনীচাঁদ বলেন, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু শত্রুদেশে গিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিবার প্রস্তাব করিয়া যত বড় ভুলই করুন না কেন, তিনি সম্মানজনক শত্রু-রূপে গণ্য হইবার যোগ্য।' [আনন্দবাজার : ২৩. ৮. ৪৫]

জওহরলালের অভিমত ঠিক তার বিপরীত। তিনি যুদ্ধাপরাধীর প্রতি কোনরকম অনুকম্পা প্রদর্শনের পক্ষপাতী নন। সংবাদপত্রের ভাষায় :

'একজন মার্কিন সাংবাদিক পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি তাঁহার মনোভাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, বসুর প্রতি যুদ্ধাপরাধীর ন্যায় ব্যবহার করা উচিত। কারণ, তাঁহার লোকজন বহু আমেরিকানকে নিহত করিয়াছে এবং তিনি ব্রহ্মদেশ ও মালয়ে বহু দরিদ্র ব্যক্তিদের নিকট হইতে জবরদস্তি করিয়া অর্থ আদায় করিয়াছেন। উক্ত সাংবাদিক আরও বলেন, সুভাষচন্দ্র বসু সম্ভবত মারা যান নাই। জীবিতাবস্থায় সাইগনে আছেন।' [আনন্দবাজার : ২৯. ৮. ৪৫]

একই বক্তব্য বিজয়ী পক্ষের বড়কর্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। অনুকম্পার প্রশ্নে তারা তখন রীতিমত ক্ষুব্ধ। তারপরই জোর কৈফিয়ৎ তলব। আমি পড়ে শোনাচ্ছি :

'সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার জন্য কোন কোন মহল যে পণ্ডিত জওহরলালকে অনুরোধ করিয়াছেন, উহাতে আমেরিকা ক্ষুব্ধ হইয়াছে বলিয়া জনৈক মার্কিন সাংবাদিক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত মার্কিন সংবাদদাতা অন্যান্য যুদ্ধাপরাধীর মতই কেন শ্রীবসুর বিচার করিয়া তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে না, তাহা জানিতে চাহিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, জাপ-রেডিও শ্রীবসুর মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করার কয়দিন পরে তাঁহাকে সাইগনে দেখা গিয়াছে এমন প্রমাণ আছে।'

[সানডে অবজারভার : লণ্ডন : ২. ৯. ৪৫]

মল্লিকা, তখনকার সময়ে আমাদের দেশে আর কিছু না থাকলেও নির্ভীক সাংবাদিকের কোন অভাব ছিল না। আর যাই হোক, আজকের মত দলীয়

চশমা পড়ে সবকিছু বিচার করতে তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন না। তাঁদের সাংবাদিকতার অর্থই ছিল দেশের সেবা করা, দলবাজিকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়।

'স্পর্ধা দেখে এবার শক্তহাতে চাবুক হাঁকলেন সাংবাদিক-শ্রেষ্ঠ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। যে ভাষায় সেদিন তিনি এই মার্কিন ঔদ্ধত্যের জবাব দিয়েছিলেন, আজকের এই স্বাধীন দেশেও তার তুলনা মেলা ভার। খানিকটা অংশ তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি ঃ

'সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদে এদেশে শোকোচ্ছ্বাস উঠিয়াছে দেখিয়া এক মার্কিনী সংবাদ-প্রেরক খবর পাঠাইয়াছেন যে, তাঁহার দেশ হইতে অনেকে রুষ্ট হইয়া জানিতে চাহিয়াছেন যে, সুভাষ যুদ্ধকালে যে কার্যপন্থা লইয়াছিলেন সেজন্য তিনি যদি জীবিত থাকেন তবে তাঁহার দুষ্কৃতির বিচার হইবে না কেন ?

এ প্রশ্নের উত্তরে আমাদের প্রশ্ন এই যে, সে অপরাধের বিচার করিবে কে ?

এই মহাযুদ্ধের উদ্দেশ্য কি, তাহা এশিয়াবাসী এতদিনে অল্পে অল্পে বুঝিতেছে, যুদ্ধকালে মিত্রপক্ষ যে সকল ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা যদি যথার্থই সত্য হইত, তবে যুদ্ধে দুষ্কৃতির বিষয়ে এত উচ্চকণ্ঠে কেহই কথা বলিতে পারিত না।

এই যুদ্ধে কোনও দুষ্কৃতি—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে—করে নাই এমন কোন দেশ জাতি বা যদি থাকে, তবে যেন সুভাষের বিচার সে-দেশের বিচারকেই করে, অর্থাৎ বাইবেলের কথায়, যে নিষ্পাপ, সে-ই যেন প্রথম প্রস্তর নিক্ষেপ করে।

...চীন-জাপানের যুদ্ধে অস্ত্র নির্মাণের মাল-মশলা টাকার লোভে যোগাইয়াছিল কোন্ দেশ এবং সৈন্য ও মাল সরবরাহের জন্য আট লক্ষ টন জাহাজ ভাড়া দিয়াছিলই বা কোন্ দেশ ? ফিন্ল্যাণ্ডের উপর অকারণ আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছিলই বা কোন্ দেশ, বাংলার পঞ্চাশ লক্ষ অসহায় নরনারীকে 'যুদ্ধের কারণে সাহায্য অসম্ভব' বলিয়া মৃত্যুর পথে চালান দেয় বা কোন্ দেশ ? ...সর্বশেষে হিরোসিমায় লক্ষাধিক অসামরিক আবালবৃদ্ধবনিতাকে পৈশাচিকভাবে পোড়াইয়া মারার আদেশ দেওয়াটা সুকৃতি, না দুষ্কৃতি ?'

[প্রবাসী ঃ আশ্বিন, ১৩৫২ সাল]

ওদিকে তখন হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিশ্বের সেরা সেরা সব গোয়েন্দার দল। বিমান-দুর্ঘটনা না আরো কিছু ! ওসব কায়দায় এবার আর ভুললে চলবে না। যে করে হোক, খুঁজে তাঁকে বের করতেই হবে। গত পাঁচ বছরে অনেক বে-ইজ্জত হতে হয়েছে লোকটার কাছে। আর নয়।

কিন্তু কেন ? সত্যই যদি বিমান-দুর্ঘটনায় সুভাষের মৃত্যু ঘটে থাকে, তাহলে সে খবর নানাভাবে প্রচারিত হবার পরেও কেন ইঙ্গ-মার্কিন গোয়েন্দাবাহিনীর এই অহেতুক তৎপরতা ? কোথায় এই রহস্যের উৎস ?

জানি, একটা চিরন্তন প্রশ্ন তোমার মনকে তোলপাড় করে তুলেছে। সেটাই তো স্বাভাবিক। তবে এখন নয় মল্লিকা। এ সম্বন্ধে তোমাকে আমি

বলতে চেষ্টা করব আরো পরে। ততক্ষণে অন্যদিকের কথাগুলো বরং শুনে নাও।

যুদ্ধ শেষ। জার্মানী আগেই পরাজয় স্বীকার করেছে। এবার জাপান।

যে জাপানী কোনদিনও কারো কাছে মাথা নত করেনি, তারা যে এই পরাজয়টাকে সহজে মেনে নিতে পারবে না, সেকথা বলাই বাহুল্য। তাই আত্মসমর্পণের নির্দেশ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছে তাদের হারিকিরি (আত্মহত্যা) উৎসব। প্রাণ যায় যাক, তবু পরাধীন জীবনকে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

সিংগাপুর, হংকং, মালয়, টোকিও সর্বত্র সেই একই দৃশ্য। সর্বত্র হারি-কিরি উৎসব। যেন নিজের হাতে প্রাণ দেওয়া একটা খেলা মাত্র।

২রা সেপ্টেম্বর সকাল ১০-৩০ মিনিটে মার্কিন জাহাজ মিসৌরীতে আত্মসমর্পণ উৎসব অনুষ্ঠিত হল আনুষ্ঠানিকভাবে। জাপানের পক্ষে চুক্তি-পত্রে স্বাক্ষর করলেন বৈদেশিক মন্ত্রী সিগিমিৎসু এবং সম্রাটের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি ইয়োশিহিরো উমেজু। বিজয়ী পক্ষে মার্কিন সেনাপতি জেনারেল ম্যাক আর্থার।

৫ই সেপ্টেম্বর মার্কিন বাহিনী প্রথম পা দিল টোকিওতে। একই দিনে সিংগাপুর আত্মসমর্পণ করল ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে।

তার আগেই সিংগাপুরে এক ভোজসভার আয়োজন করে পাঁচশো জাপানী অফিসার প্রাণ দিলেন হারিকিরি করে। পরাধীন হয়ে বেঁচে থাকার চাইতে মৃত্যুই শ্রেয়।

হারিকিরি করলেন সমর-সচিব কোরেচিকা আনামী। তারপর সেনা-বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল সুগিয়ামা। স্বাধীনতাই যদি না রইল তাহলে বেঁচে থেকে লাভ কি?

১১ই সেপ্টেম্বর হারিকিরি করতে চেষ্টা করলেন প্রাক্তন জাপ-প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো, কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলেন না। তার আগেই তিনি আহত অবস্থায় বন্দী হয়ে গেলেন মার্কিন বাহিনীর হাতে। এ প্রসঙ্গে তখন-কার সময়ের সাময়িক পত্রিকায় কি মন্তব্য করা হয়েছিল দেখা যাক ঃ

'তোজোকে মরতে না দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হল মারবার জন্যই, কারণ, তিনি যুদ্ধাপরাধী। যুদ্ধাপরাধীদের নিজেকে মারবার অধিকার নেই—মৃত্যু সেও দেবে বিজয়ীরা যেমন খুশি তেমন করে।

পরাজিত জাতির যুদ্ধাপরাধ—নৃশংস বর্বর হত্যাকাণ্ডের চেয়েও যে বড় অপরাধ, একথা গণতান্ত্রিক আমেরিকাই পৃথিবীকে শেখালে।'

[সাপ্তাহিক দেশ ঃ ১৫ই আশ্বিন, ১৩৫২ সাল]

এত করেও কিন্তু বিজয়ী শক্তিগুলির পক্ষে তাদের লুপ্ত সাম্রাজ্য পুরো-পুরি উদ্ধার করা সম্ভব হল না মল্লিকা। কারণ, জাপানীদের কূটবুদ্ধি৷

আত্মসমর্পণের পূর্বেই নিজেদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র তারা বিলিয়ে দিল সেসব রাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী তরুণদের মধ্যে। আমরা পারিনি, তা বলে তোমরা কিছুতেই নতি স্বীকার করো না যেন। এই অস্ত্র হাতে নিয়ে বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও। মনে রেখো, এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য। এখানে শ্বেতাঙ্গদের কোনো স্থান নেই।

কাজেও তাই হল। রুখে দাঁড়ালেন ডঃ সোয়াকর্ণ, ডঃ হোতা প্রমুখ ইন্দোনেশিয়ার নেতৃবৃন্দ। খবরদার! জাহাজ থেকে নামতেই দেব না কোন ওলন্দাজ বা বিদেশী সৈন্যকে। এ দেশ আমাদের। এখানে তোমাদের কোন স্থান নেই। দূর হটো।*

একইভাবে রুখে দাঁড়ালেন মহান বিপ্লবী হো চি মিন। ইন্দোচীন আমাদের। গো হোম হোয়াইটস্। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ বিদেয় হও।

ফরাসী সরকার সেকথা শুনতে রাজী নন। তাঁদের বক্তব্য—যুদ্ধের আগে ইন্দোচীন আমাদের দখলে ছিল, এখনো তাই থাকবে। হো চি মিন যা-ই বলুক না কেন, আমাদের অধিকার আমরা কোনরকমেই ছাড়তে রাজী নই।

মল্লিকা, আর একবার প্রমাণিত হল যে, ভালবাসা দিয়ে কোন দিনও সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র পাল্টানো যায় না। একমাত্র সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারাই তা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে সেদিন আমাদের দেশের সাময়িক পত্রিকায় কি মন্তব্য করা হয়েছিল তা তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি ঃ

'বেশি দিনের কথা নয়। নাৎসী জার্মানীদের রণোন্মাদনায় ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত ফ্রান্স অসহায়ভাবে জার্মান সামরিক রথচক্রের সামনে লুটিয়ে পড়েছিল। তারপর অপরের সহায়তায় বহু কষ্টে সে আজ উঠে দাঁড়িয়েছে। অপমান ও লাঞ্ছনার ধুলো এখনও হয়তো নিঃশেষে তার গা থেকে দূর হয়নি, পরাধীনতার দুঃসহতা এখনও তার ভুলে যাওয়ার সময় হয়নি। কিন্তু উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই অপরকে শায়িত করার স্পৃহা তার মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।' [সাপ্তাহিক দেশ]

জাতভাইদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যস্তে ছুটে গেল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর দল। এবং বলাই বাহুল্য যে, সঙ্গে ভাড়াটে ভারতীয় বাহিনী। না, আমার কথা নয়। তাই লেখা রয়েছে সাময়িক পত্রিকায়। পড়ে শোনাচ্ছি ঃ

'২৪শে অক্টোবর—সাইগনের সংবাদে প্রকাশ, ইন্দোচীনে আনামীদের স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করবার জন্য মিত্রপক্ষের তৎপরতা পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ব্রিটিশ এবং ভারতীয় সৈন্যদল আনামীদের বিরুদ্ধে ফরাসীদের সহিত সহযোগিতা করিতেছে।' [দেশ ঃ ৩০. ১০. ৪৫]

---

* সোয়াকর্ণের প্রতি নেতাজীর নির্দেশ ছিল ঃ 'মুক্তিফৌজ গঠন কর। যত পার অস্ত্র সংগ্রহ কর। তারপর জাপান বা ওলন্দাজ যে পক্ষই জয়ী হোক না-কেন, সময় বুঝে রুখে দাঁড়াও।' পরবর্তীকালে সোয়াকর্ণ বার বার একথা স্বীকার করেছেন সকৃতজ্ঞ চিত্তে। বলেছেন—'নেতাজীর শিক্ষাই আমাদের শিক্ষা।'

পরবর্তীকালে এই ইন্দোচীনকে যে কিভাবে উত্তর ভিয়েতনাম, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া এবং লাওস—এই চারটি আলাদা রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়েছিল এবং সবশেষে ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সুসভ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে সেখানে কি বর্বরতার ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল, সে কাহিনী তো তুমিও জানো।

আর জেনারেল আউঙ্গসান! কমিউনিস্টদের পরামর্শে গোপনে ব্রিটিশের সংগে হাত মিলিয়ে যিনি জাপানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, বর্মার সেই বিদ্রোহী নায়কের কি হল?

কি আবার হবে! অপরিণত এবং সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিয়ে পৃথিবীকে বিচার করতে গেলে সচরাচর যা হয়ে থাকে, তাঁর বেলায়ও তাই হল। যতক্ষণ প্রয়োজন ছিল ততক্ষণই আদর, তারপর রেঙ্গুন পুনর্দখল করার সংগে সংগেই ব্রিটিশ-প্রভুদের অন্য চেহারা। অবিলম্বে তোমাদের এই বর্মী জাতীয় বাহিনী ভেঙে দিতে হবে, আর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র জমা দিতে হবে আমার কাছে।

বিদ্রোহী নেতা অবাক! বলে কি! কই, এমন তো কোন কথা ছিল না! এদিকে আমাদের সেনাবাহিনীর বেতন দেবার জন্য এক্ষুণি বিশ লক্ষ টাকা না দিলেই যে নয়!

বিশ লক্ষ টাকা! ব্রিটিশ কর্ণেল হোল্ডেন হেসেই খুন, হাজার দুয়েক টাকা পেলে যদি খুশি হও তো দিতে পারি। তার বেশি আর এক পয়সাও নয়! নেভার।

কিছুটা সদয় ব্যবহার করলেন ব্রিটিশ বাহিনীর সর্বময় কর্তা—লর্ড মাউণ্টব্যাটেন। চাও তো মিলিটারীতে একটা ব্রিগেডিয়ারের চাকরি দিতে পারি। কি, রাজী?

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন ত্রিশ বছর বয়স্ক বিদ্রোহী নেতা আউঙ্গসান। এই কি বিশ্বাসের মূল্য? এই কি ব্রিটিশের প্রতিশ্রুতি রক্ষার নমুনা? অকৃতজ্ঞ এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর দল কবে বুঝবে যে, বর্মা এখন আর সে বর্মা নেই। সদ্য-ঘুম-ভাঙা এই বর্মাকে পদানত রাখার সাধ্য শুধু ব্রিটিশ কেন, কারোরই নেই।

প্রত্যাশা মিথ্যে হয়নি। শেষ পর্যন্ত বর্মা থেকেও একদিন হাত গোটাতে হল ব্রিটিশ-প্রভুদের। তবে আউঙ্গসান কিন্তু আর বেশিদিন বাঁচেননি মল্লিকা। পরবর্তীকালে তিনি যে একদিন আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন, সে কাহিনী তো তুমিও জানো। যাক, চলো আবার আমরা ফিরে যাই সেই আগে-কার কাহিনীতে।

যুদ্ধ শেষ। তখনো সবার মনে সেই একই জিজ্ঞাসা—সুভাষ কোথায়?

ঘুম নেই বাঘা বাঘা গোয়েন্দাদের চোখে। আশ্চর্য, কোথায় যেতে পারে মানুষটা! কোথায় যাওয়া সম্ভব! গান্ধীজী কোথাও লুকিয়ে রাখেননি

তো! নিশ্চয়ই তাই। নইলে অত জোরের সঙ্গে বার বার তিনি তাঁর বেঁচে থাকার কথা বলছেন কি করে?

গান্ধীজী তখন স্বভাবত চিকিৎসা নিকেতনে। তাইহোক্ নাটকের দীর্ঘ পনেরোদিন বাদে (২রা সেপ্টেম্বর) হঠাৎ সেখানে বিরাট একদল পুলিশ গিয়ে হাজির। শিগ্‌গীর ঘিরে ফেল বাড়িটাকে। খুব সাবধান। কিছুতেই যেন পালাতে না পারে। যেমন করে হোক পয়লা নম্বর যুদ্ধাপরাধী সুভাষ বোসকে এবার ফাঁসিকাঠে ঝোলাতেই হবে।

কোথায় সুভাষ বসু, আর কোথায় বা কি! দেখা গেল সব ফাঁকা।

ইতিমধ্যে অন্যান্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা শুরু হয়েছে বিভিন্ন স্থানে। বিচার করবেন বিজয়ী পক্ষ। পরাজিত পক্ষের সেখানে কোন বক্তব্য নেই। কোন ভূমিকাও নেই। কারণ—তারা পরাজিত।

যুদ্ধ শেষে এ ধরনের বিচার-ব্যবস্থা এর আগে কোনদিনও দেখা যায়নি। কিন্তু এবার সব কিছুই আলাদা। তাই ঠিক হয়েছে, একটা আন্তর্জাতিক সামরিক আদালত গঠন করে পরাজিত জার্মানদের বিচার করা হবে নুরেম-বার্গে। জাপানীদের—টোকিওতে। আর আজাদী বাহিনীর—দিল্লীতে।

জার্মানদের মধ্যে আসামীর তালিকায় রয়েছেন মার্শাল গোয়েরিং, বৈদেশিক মন্ত্রী রিবেনট্রপ, ফিল্ড-মার্শাল কাইটেল, ফ্র্যাংক, ফ্রিক, রোজেল-বার্গ, সোকেল, জোড্‌ল প্রমুখ চব্বিশজন নাৎসী নায়ক।

টোকিওতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো, জেনারেল মাসাহারু হোমা প্রমুখ আটাশজন। তবে টোকিওর বিচার-ব্যবস্থা একটু অন্য ধরনের। আসল ক্ষমতা নিজেদের হাতে রেখে লোকদেখানো ভাবে সেখানে বিচারক নির্বাচিত করা হয়েছে ভারতসহ মোট এগারোটি দেশ থেকে। ভারত থেকে নির্বাচিত হয়েছেন প্রখ্যাত বিচারপতি ডঃ রাধাবিনোদ পাল।

আজাদ—হিন্দু ফৌজের বিচার হবে দিল্লীর লালকেল্লাতে। আসামীর সংখ্যা প্রথম কিস্তিতে মোট তিনজন। মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান, কর্ণেল সেইগল এবং মেজর ধীলন। অপরাধ—সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, নর-হত্যা এবং নরহত্যায় সহায়তা করা।

শুধু শাহনওয়াজ খান, সেইগল বা ধীলন নন, ইতিমধ্যে আরো হাজার হাজার আজাদী সৈনিক বন্দী হয়েছে বিজয়ী পক্ষের হাতে। ১৩ই আগস্ট সিংগাপুরে বন্দী হয়েছেন মেজর জেনারেল কিয়ানী। ২৬শে আগস্ট জেনা-রেল ভোঁসলে—ব্যাংককে।

মেজর জেনারেল চ্যাটার্জী, আবিদ হাসান, প্রীতম সিং এবং গুলজারা সিং—হ্যানয়ে। দেবনাথ দাস বন্দী হয়েছেন আরো অনেক পরে সেই হ্যানয়েই। আয়ার সাহেব এবং কর্ণেল হবিবুর রহমান—টোকিওতে। তারপর একে একে সবাইকে নিয়ে আসা হয়েছে দিল্লীর লালকেল্লাতে।

ঝাঁসীর রাণীবাহিনীর তিনশো মেয়েরও ঠাঁই হয়েছে সেই লালকেল্লাতে।

সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধে সবাই তারা অপরাধী। সবাইকে চরম দণ্ড মাথা পেতে নিতে হবে বিচারকের আদেশে। এখন শুধু তার জন্য অপেক্ষা মাত্র।

There is no power on earth that can keep India enslaved. India shall be free and before long.'

পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই, যা ভারতবর্ষকে পদানত করে রাখতে পারে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই। অচিরেই হবে।

সুভাষের কথা। ঠিক এই কথাগুলোই সুভাষ সেদিন (১৫ই আগস্ট) বলেছিলেন সিঙ্গাপুর থেকে বিদায় নেবার কালে।

তাই হয়নি কি? অক্ষরে অক্ষরে কি মিলে যায়নি সুভাষের এই কথা-গুলো?

অবশ্য সুভাষ নিজে দিল্লী যেতে পারেননি একথা সত্য, কিন্তু দিল্লী যাবার সমস্ত পথই কি সেদিন তিনি উন্মুক্ত করে দেননি ভারতবাসীর কাছে?

আর শুধু কি দিল্লী! এশিয়ার বহু পরাধীন জাতির উপর থেকেই কি সেদিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দৃঢ়মুষ্টি আলগা হয়ে যায়নি সুভাষের সেই অনু-সৃত নীতির ফলে?

মল্লিকা, আজ আমরা স্বাধীন, এবং এ স্বাধীনতা নাকি আমরা অর্জন করেছি সম্পূর্ণ অহিংস পন্থায়, শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং বিনা রক্তপাতে।

কথাটা কি ঠিক? ঠিক হলে বলার কিছু ছিল না। আপত্তিরও কোন প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু সত্যিই কি তাই লেখা রয়েছে সেদিনের ইতিহাসের পাতায়?

অবশ্য একথা ঠিক যে, এ স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত আমরা সংগ্রামের বিনি-ময়ে পাইনি, পেয়েছি আপস-আলোচনার মাধ্যমে। এ ব্যাপারে ইংরেজ দাতা, আমরা গ্রহীতা মাত্র। গ্রহীতা হিসাবে আজ আমরা সুবিধেমত যা-ই ব্যাখ্যা করিনে কেন, দাতা হিসেবে এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্যেরও একটা মূল্য রয়েছে বৈকি।

ইংরেজ চরিত্রের মস্তবড় একটা গুণ এই যে, যুদ্ধ শেষে শত্রুর সঙ্গে করমর্দন করতেও তাদের বাধে না। দেখা যাক, তাদের কি বক্তব্য এ সম্বন্ধে। আমি ঘটনাগুলো পরপর বলে যাচ্ছি, তারপর কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা বাস্তব সে বিচারের ভার তোমার উপর।

সেনানায়কদের মধ্যে মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান, কর্ণেল সেইগল

গ্রেপ্তারের পূর্বে দেবনাথ দাস সতর্কতা হিসেবে নেতাজীর হেড-কোয়ার্টার্সে ব্যবহৃত সেই জাতীয় পতাকাটি হো চি মিন হেড-কোয়ার্টার্সের প্রিন্স সুফানোভং-এর কাছে গচ্ছিত রাখেন। ১৯৫৪ সালে ভিয়েতনাম থেকে একটি প্রতিনিধিদল ভারতবর্ষে মৈত্রী সফরে আসেন। সঙ্গে নিয়ে আসেন সেই জাতীয় পতাকাটি। তাঁরাই তখন আবার সেই পতাকাটি তুলে দেন দেবনাথ দাসের হাতে।

এবং মেজর ধীলনের বিচারের কথা তোমাকে আগেই বলেছি। ঐতিহাসিক সেই বিচারের দিন ধার্য হয়েছে ৫ই নভেম্বর। ১৯৪৫ সালের ৫ই নভেম্বর।

বিচার!

খবর শুনে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা ভারতবর্ষ। কিসের বিচার! এ যে অভাবনীয়! অকল্পনীয়! চিন্তাই যে করা যায় না।

এতকাল ব্রিটিশ এবং তাদের বন্ধুদের মুখ থেকে কত কথাই না তারা শুনেছিল সুভাষের বিরুদ্ধে। সুভাষ ভ্রান্ত। সুভাষ দেশের শত্রু—এমনি কত কথা! সেই সুভাষ যে সবার অলক্ষ্যে এক নতুন মহাভারত সৃষ্টির তপস্যায় মগ্ন ছিলেন, তা কে জানত!

'The country was awakened from her torpor to hear a unique story of the fight for her freedom which had taken place beyond her borders and about which nothing was known until very recently.'

[The Indian National Army : Dr. K. K. Ghosh : P.—223]

বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতেই শুরু হল তীব্র প্রতিক্রিয়া। এ হয় না। হতে পারে না। আজাদী সৈনিক জাতীয় বীর। তাদের সাজা দিলে কিছুতেই আমরা মুখ বুজে থাকব না। এই আমাদের শেষ কথা।

ওদিকে সুভাষের কথাই ঠিক হল। রেঙ্গুনে আগত ব্রিটিশ-ভারতীয় বাহিনীর মধ্যেও তখন সেই একই প্রশ্ন।

ইতিমধ্যে হাজার হাজার আজাদী সৈনিক বন্দী হয়েছে তাদের হাতে। ওরা কারা? কেনই বা ওরা লড়াই করেছিল ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে? ওদের নেতাই বা কে?

উত্তর পেতে দেরী হয়নি। ওরা তাদের মত ভাড়াটে সৈনিক নয়, আজাদী সৈনিক। নেতাজী সুভাষ বোসের নেতৃত্বে ওরা লড়াই করেছিল দেশের আজাদীর জন্য। দেশের মুক্তির জন্য। দেশের স্বাধীনতার জন্য।

হিউ টয়-এর ভাষায় : ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব গড়ে উঠল। এড়াবার কোন উপায় ছিল না। এর ফলে ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হল, যা তাদের কোনদিনই ছিল না। তাদের ধারণা হল—আই. এন. এ. নিপীড়িত বীরের দল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অতিথিবৎসল এবং ইদানীং পুরোপুরিভাবে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন বেসামরিক ভারতীয়দের কাছে বসে তারা সাগ্রহে শুনত আজাদ হিন্দ্ সরকার ও সুভাষচন্দ্রের মন্ত্রিসভার গৌরব-গাথা।

'..in Rangoon, there had been widespread fraternisation. This could not be avoided..Its result was a political consciousness which the Indian Serviceman had never before possessed. He saw it as a band of oppressed heroes and

listened eagerly to the hospitable and now fully politically conscious Indian Civilians of South-East Asia, who had their own tale to tell about an independent Indian Government and the departed glories of Bose's Cabinet.'

[Hugh Toye : P.—170]

মে থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে মোট দশ হাজার আজাদী বন্দীকে নিয়ে আসা হল ভারতবর্ষে। রাখা হল লালকেল্লা এবং বিভিন্ন বন্দী-নিবাসে। ফল হল মারাত্মক। সামরিক তথ্য হিসেবে এতদিন চেপে রাখা হলেও কিছুই আর তখন গোপন রইল না ভারতবাসীর কাছে।

দেখতে দেখতে ঝড় উঠল ভারতবর্ষ জুড়ে। দুরন্ত ঝড়।

পথে-ঘাটে, হাটে-মাঠে সর্বত্র এক রব—জয় হিন্দ্! নেতাজী জিন্দাবাদ! হিন্দু-মুসলমান শিখ-খ্রীষ্টান—সবার কণ্ঠে এক দাবী—আজাদী সৈনিকদের বিচার করা চলবে না। এ আমরা সইব না।

সে দাবী আরো জোরদার করে তুলল জার্মানী থেকে আগত আজাদী বন্দীর দল। কাউকে বিচার করা চলবে না। এ বিচার আমরা মানিনে, মানব না।

বিভিন্ন সেনানিবাসগুলোতেও সেই একই চঞ্চলতা। আজাদী সৈনিকরা আমাদের ভাই। আমাদের আত্মীয়। ওদের সাজা দিলে আমরা তা মেনে নিতে পারব না। কভি নেহি।

'ভারতবর্ষে আই. এন. এ.-কে কেন্দ্র করে যে গণদাবী মাথা তুলে দাঁড়াল, ভারতীয় সেনাবাহিনীর লোকজনও আস্তে আস্তে তার প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ল।'

'Thus gradually the Indian Services came to have a certain sympathy with the popular clamour about the I.N.A., which was being raised in India..' [P.—170]

ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনী যে সেদিন আই. এন. এ.-র প্রতি কতখানি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছিল, তার সামান্য দুটি নিদর্শন আমি তুলে ধরছি মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান এবং কর্ণেল সেইগলের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে।

কলকাতা থেকে একটি রিজার্ভ কামরায় সেদিন মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খানকে বন্দী অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল দিল্লীতে। বাইরে বোর্ড ঝুলছে—'প্রবেশ নিষেধ, সাংঘাতিক বন্দী যাচ্ছে।' ভেতরে টমীগান-সহ একদল গোর্খা সৈনিক এবং তাদের সুবেদার। সবাই তটস্থ। একটু নড়লেই অমনি টমীগান।

পরদিন আস্তে আস্তে সুবেদার সাহেব জানতে চাইলেন সব কিছু। কি ব্যাপার? কেন তোমাকে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে সরকার বাহাদুর? কি অপরাধ তোমার?

শুনতে শুনতে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন সুবেদার সাহেব। তারপর! তারপর শাহনওয়াজ খান সাহেবের মুখ থেকেই শুনে নাও ঃ

'সব কথা শোনার পরে সুবেদারের মনের গতি পালটে গেল। তিনি তাঁর সৈন্যদের বন্দুক থেকে গুলী বের করে নিতে আদেশ দিলেন এবং আগের দিনের রূঢ় ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইলেন।'

এর চাইতেও মারাত্মক ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন কর্ণেল সেইগল।

'বর্মার আলামাও নামক স্থানে বন্দী হবার পরে আমাকে একটা ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পাহারায় ছিল দুজন ব্রিটিশ এন. সি. ও., একজন পাঞ্জাবী মুসলিম নায়েক এবং ১২শ ফ্রণ্টিয়ার ফোর্স রেজিমেণ্টের চারজন সিপাহী। যেতে যেতে মুসলিম নায়েকটি সব কথাই জেনে নিল আমার কাছ থেকে। বিশেষ করে সে যখন শুনল যে, আমারই একজন ব্যাটেলিয়ান কম্যাণ্ডার বাণ্টা সিং এককালে তারও ট্রেনার ছিল, তখন সে এক অদ্ভুত প্রস্তাব করল আমার কাছে। বলল—আমার নির্দেশ পেলে এই মুহূর্তে সে ঐ দুজন ব্রিটিশ এন. সি. ও.-কে হত্যা করে সিপাহীদের নিয়ে আই. এন. এ.-তে যোগ দিতে প্রস্তুত। আমি সম্মতি দিইনি। কারণ, তখন আর তার কোন সার্থকতা ছিল না।'

'When we had gone about half way, he told me that he was prepared to shoot the two British N.C.O.'s and he and his men would escape with me to join the I.N.A. Realising that such an action would serve no useful purpose I advised him against it.' [The Indian National Army : Bulletin of the Netaji Research Bureau : 1967]

পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটল নীলগঞ্জ মিলিটারী ব্যারাকে গুলী চালানোর সংবাদে।

প্রায় এক হাজার বন্দী আজাদী সৈনিককে তখন রাখা হয়েছিল কলকাতার নিকটবর্তী নীলগঞ্জ ব্যারাকে।

২৫শে সেপ্টেম্বর তাদের মধ্যে পাঁচজনকে হত্যা করা হল পৈশাচিকভাবে। আহত হল আরো অনেক বেশি।

বিক্ষোভের যে স্ফুলিঙ্গ এতদিন এখানে-ওখানে টিমটিম করে জ্বলছিল, দেখতে দেখতে এবার যেন তা দপ্ করে জ্বলে উঠল।

শুরু হল এখানে-ওখানে সেনা বিদ্রোহ আর ধর্মঘট। সেই সঙ্গে ডাক ও তার বিভাগ এবং বৈমানিক ধর্মঘট। এমন কি চিরদিনের রাজভক্ত বলে পরিচিত দেরাদুনের গোর্খা মিলিটারী বাহিনী পর্যন্ত একদিন বিদ্রোহ করে বসল সবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে। নেতাজী জিন্দাবাদ! আংরেজ দূর হটো!

কি লাভ ঐ বিদেশী সরকারের জন্য প্রাণপাত করে! আজ সারা দেশে আজাদী সৈনিকের তুলনায় তাদের মর্যাদা কতটুকু? দেশবাসী তো দূরের

কথা, অকৃতজ্ঞ ইংরেজ সরকারই কি তাদের এই রক্তদানের জন্য এতটুকু মূল্য দিয়েছে কোনদিন ?

সংখ্যার দিক থেকে শতকরা প'চাত্তর জন হওয়া সত্ত্বেও জাপানের আত্ম-সমর্পণের পরে যে বিজয়-উৎসব পালিত হয়েছিল, সেখানে একজন কালা আদমীকেও তারা প্রবেশাধিকার দিয়েছিল কি ? লণ্ডনের 'ইয়র্কশায়ার পোস্ট' পত্রিকার ভাষায় ঃ

'There is every justification for the keen dis-appointment felt by men of the Indian Army at the fact that no representative of India was invited to be present at the surrender ceremony of the Japanese abroad the American warship "Missouri" in Tokyo Bay..The Indian Army as such does not seem to have been represented at the Rangoon ceremony, either, which is especially unfortunate as Indian troops constituted nearly 75 per cent of the 14th army.'

তাহলে কেন তারা প্রাণ দেবে অকৃতজ্ঞ ঐ বিদেশী সরকারের জন্য ? না, আর নয়। লড়াই যদি করতে হয় তো আজাদীর জন্যই এখন থেকে তারা লড়াই করবে. বিদেশী সরকারকে কায়েম করার জন্য নয়।

সেদিনের সেই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি লক্ষ্য করে বিলিতি পত্রিকা 'লণ্ডন অবজারভার'-এ কি মন্তব্য করা হয়েছিল তার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নাও ঃ

'India today is a vast powder magazine with exclusive potentialities exceeding those at any period of Indo-British history since Mutiny..'

ওদিকে সুভাষের ভবিষ্যৎ-বাণীই সত্য হয়েছে।

ইতিমধ্যে ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রিসভায় অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। নির্বাচনে এতদিনকার রক্ষণশীল দলের ভরাডুবি হয়েছে। ক্ষমতায় এসেছে শ্রমিকদল। চার্চিলের পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন ক্ষমতাসীন দলের মিঃ এটলী।

সেখানেও সেই একই ভাবনা। যুদ্ধে জয়লাভ করলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে ইংল্যান্ড এখন চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। তার উপর ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতি। এতকাল সাম্রাজ্য রক্ষার সবচাইতে বড় হাতিয়ার ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। তাদের আনুগত্য সম্বন্ধে কোনদিন কোন প্রশ্নই ওঠেনি।

কিন্তু সুভাষ বোস ও তাঁর আই. এন. এ.-কে কেন্দ্র করে তাদের এতদিনকার বিশ্বস্ততার মধ্যে আজ যে একটা বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে, সে সত্যকে কোনরকমেই অস্বীকার করার উপায় নেই।

এর পরেও সাম্রাজ্য রক্ষার ব্যাপারে ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর আর নির্ভর করা চলে কি ?

প্রধানমন্ত্রী এটলী, বড়লাট লর্ড ওয়াভেল, প্রধান সেনাপতি স্যার অকিনলেকের মধ্যে ঘন ঘন বার্তা-বিনিময়ও শুরু হয়েছে এই নিয়ে। ভারতবর্ষে বিস্ফোরণ অনিবার্য। সে পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করাটা ঠিক হবে কি? তাদের বিশ্বাস করা চলে কি?

কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। সামনে তার না আছে কোন নির্দিষ্ট কর্মসূচী, না নতুন কোন পরিকল্পনা।

সত্যি বলতে কি, আগস্ট-আন্দোলনে হিংসাত্মক আচরণের জন্য জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থানকে কথায় কথায় নিন্দে করা, আর কারণে-অকারণে মুসলিম লীগ-প্রধান জিন্নাকে তোষণ করা ছাড়া তখনো পর্যন্ত কংগ্রেস এমন কিছুই করেনি, যা উল্লেখ করার মত।

অধুনা সবচাইতে বড় প্রশ্ন—নির্বাচন। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল শিগগীরই নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করেছেন। তারপরই নাকি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও দেশীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে বিবেচিত হবে ভারতবর্ষের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলীও সেই সদিচ্ছার কথা ঘোষণা করেছেন বি. বি. সি. থেকে।

কি করা যায় এখন! সামনেই নির্বাচন, অথচ ১৯৪২ সালের পর থেকে জনসংযোগ বলতে কিছুই নেই। কি করা উচিত এ পরিপ্রেক্ষিতে?

বাঁচিয়ে দিল আই. এন. এ.। বন্দী-মুক্তির দাবীতে সারা ভারতবর্ষ তখন উত্তাল। আকালী দল, হিন্দু মহাসভা, এমনকি মুসলিম লীগের কণ্ঠে পর্যন্ত সোচ্চার হয়ে উঠেছে এই একই দাবী। আই. এন. এ. বন্দীদের বিচার করা চলবে না। তাদের সাজা দিলে ভারতবাসী তা মেনে নেবে না।

পরিস্থিতি লক্ষ্য করে নিজের প্রয়োজনেই এবার এগিয়ে গেল কংগ্রেস। এ জনমতকে উপেক্ষা করলে আর কোনদিনই দলের মধ্যে সংহতি রক্ষা করা যাবে না। সুতরাং এ সুযোগ কোনরকমেই পরিত্যাগ করা চলবে না।

সুবিধাও রয়েছে। বন্দীদের তিনজন তিন সম্প্রদায়ভুক্ত। শাহনওয়াজ খান মুসলমান। সেইগল হিন্দু। ধীলন শিখ। নতুন করে জনসংযোগ করতে হলে এর চাইতে ভাল ইস্যু আর কি হতে পারে?

'The I.N.A. trials were used by Congress propagandists to glorify the right to rebel against foreign rule.'

[Last Years of British Raj : Michael Edwardes : P.—111]

প্রায় একই বক্তব্য অপর ব্রিটিশ মুখপাত্র হিউ টয়-এর।

'ভারতবর্ষে কংগ্রেসের হাতে আই. এন. এ. হয়ে দাঁড়াল মোক্ষম একটি রাজনৈতিক অস্ত্র। এই অস্ত্র হাতে পেয়ে কংগ্রেস স্বভাবতই এক ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করার সুযোগ পেয়ে গেল জনসাধারণের মধ্যে। তাও এমন একটা সময়ে, যখন ভারতীয় সেনাবাহিনীকে কাজে লাগানোর মত সাহস সরকারের নাও থাকতে পারে।'

....As a political weapon the I.N.A. had been of the greatest use to the Congress in India. It had restored to it the ability to cause widespread civil commotion, and that in circumstances where the Government might hesitate to use the Indian Army.' [Hugh Toye: P.—175]

২০শে তারিখে পণ্ডিত জওহরলাল সর্বপ্রথম এক বিবৃতি প্রচার করলেন এ সম্পর্কে ঃ

'বর্তমানে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অফিসার এবং সৈন্যদের বিরাট একটি অংশ বন্দী-জীবন যাপন করছে এবং তাদের মধ্যে কিছু-সংখ্যক লোককে অন্ততঃ ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। তাদের সঙ্গে যদি সাধারণ বিদ্রোহীর মত ব্যবহার করা হয়, তাহলে অত্যন্ত গুরুতর রকমের ভুল করা হবে এবং তার ফল হবে সুদূরপ্রসারী। তাদের দণ্ডিত করার অর্থ হবে সমগ্র ভারতবাসীকে দণ্ডিত করা।'

মল্লিকা, সেই জওহরলাল, যিনি মাত্র কয়েকদিন আগে এই বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, সুভাষের প্রতি যুদ্ধাপরাধীর ন্যায় ব্যবহার করা উচিত।

তাই হয় মল্লিকা। তাই নিয়ম। জাগ্রত জনমতের বিরুদ্ধে যাওয়ার অর্থই হল জনমানস থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া। কোন রাজনৈতিক নেতার পক্ষে সেটা যে নিছক আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ-প্রসঙ্গে সেদিনের বিখ্যাত সরকারী ভাষ্যকার ফিলিপ মেশনকে বরং এবার অনুসরণ করি।

'কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পরিস্থিতি পাল্টে গেল। স্বদেশী ভাবের জোয়ারে আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে স্বাধীনতার বীর যোদ্ধা বলে অভিনন্দিত করা হল। নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবেন এমন কোন রাজনৈতিক নেতাই নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলেন না। সবাই ছুটে এলেন নিপীড়িত বীরদের উদ্ধার করতে। আই. এন. এ. বন্দীদের সাহায্যে তহবিল খোলা হল এবং আই. এন. এ. পতাকা দিবস পালিত হল।'

'....Within a few weeks all this was changed. In a wave of nationalist emotion the I.N.A. were acclaimed heroes who had fought for the freedom of India; no political leader who valued his future could stand aloof—all must offer to defend the martyrs. There was an I.N.A. Defence Fund, I.N.A. Flag Days'. [The Springing Tiger]

গঠিত হল আই. এন. এ. ডিফেন্স কমিটি। সদস্যসংখ্যা মোট ছ'জন। ভুলাভাই দেশাই, কৈলাসনাথ কাটজু, জওহরলাল নেহরু, তেজবাহাদুর সপ্রু, রঘুনন্দন শরণ এবং আসফ আলী।

কিন্তু অহিংসা! কংগ্রেস অহিংস নীতিতে আস্থাবান। অহিংসাই তাদের সংগ্রামের একমাত্র হাতিয়ার। তাদের পক্ষে আই' এন. এ.-কে সমর্থন করা কি করে সম্ভব! তার পেছনে যুক্তিই বা কোথায়?

শেষ পর্যন্ত তারও একটা সহজ সমাধান পাওয়া গেল। পথ আলাদা হলেও লক্ষ্য দুপক্ষেরই এক, এবং একই ব্রত সাধনের জন্য তাদের লাঞ্ছনা পেতে হয়েছে।...'Its object was the same as that of the Congress itself, and its sufferings were in the same cause.'

সেদিক থেকে আই. এন. এ.-র সংগ্রাম ভারতবর্ষেরই স্বাধীনতার সংগ্রাম। সুতরাং কমিটি আশা করে যে, বন্দীদের প্রতি সুবিচার করা হবে। অন্যথায় ভারতবাসীর পক্ষে সেটা মেনে নেওয়া খুবই কষ্টকর হবে।

এমন কি কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারীর কণ্ঠেও সেদিন সুভাষের কথারই প্রতিধ্বনি:

'পরাধীন জাতির পক্ষে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অন্য কোন রাষ্ট্রের সহয়তা নেওয়াটা নতুন কিছু নয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামীরাও যে তাই করবে, তাতে আর বিচিত্র কি!'

'In all freedom fights the world over, patriots have sought outside help to free their country from the foreign yoke. ....As long as foreign rule lasts in India, patriots in desperation will be obliged to seek foreign help.'

আজ ১৯৭৪ সালের প্রান্তে দাঁড়িয়ে সেদিনকার ভারতবর্ষের কথা তুমি চিন্তাও করতে পারবে না মল্লিকা। ঠিক যেন ঝড়ের পূর্বাভাস। শুধু বিস্ফোরণের অপেক্ষা মাত্র।

হিন্দু-মুসলমান, কংগ্রেস-লীগ, সবাই যেন তখন একাত্ম হয়ে গেছে একটি মাত্র দাবী নিয়ে। আজাদী সৈনিকদের বিচার করা চলবে না। এ আমরা সইব না।

সেদিনকার ভারতবর্ষের সুন্দর একটি ছবি তুমি পাবে জওহরলালের কয়েকটি কথার মধ্যে।

'স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামী ভারতবর্ষের প্রতীক হয়ে দাঁড়াল ঐ তিনজন অফিসার এবং আই. এন. এ.। অন্যান্য সব সমস্যা চাপা পড়ে গেল। ইংল্যান্ড ভার্সাস ভারত—এটাই যেন বিচারের মধ্য দিয়ে প্রাধান্য পেল। প্রকৃতপক্ষে শুধু আদালত-কক্ষের মধ্যেই এটা সীমাবদ্ধ রইল না। তার পরিবর্তে হয়ে দাঁড়াল—ভারতের জনসাধারণের সঙ্গে শাসকমণ্ডলীর লড়াই।'

সত্যিই তাই মল্লিকা। একটি জীবন আর তাঁর জ্বলন্ত বিশ্বাস যেন আগুন জ্বালিয়ে দিল প্রতিটি মানুষের বুকে।

সুভাষ ফিরে আসেননি একথা সত্য, কিন্তু সর্বত্রই যেন তাঁর প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি বিরাজমান। তাঁকে অস্বীকার করার সাধ্য কোথায়?

আর শুধু কি ভারতবর্ষ? কি ওয়াশিংটন, কি বিলেতের লর্ডস সভা, কি পার্লিয়ামেন্ট, কি ভাইসরয় প্রাসাদ, কি লালকেল্লা—সর্বত্রই যেন সুভাষ। সব কিছুই যেন চলেছে সুভাষকে কেন্দ্র করে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এট্‌লীর ভাবনা ঃ ভারতবর্ষে আজ আমরা আগ্নেয়-গিরির উপর বসে আছি।

'We were sitting on the top of the volcano!' কখন যে বিস্ফোরণ ঘটবে কে জানে! সেই অনিবার্য দুর্যোগকে এড়ানোর উপায় কি?

একই ভাবনা বড়লাট লর্ড ওয়াভেল এবং প্রধান সেনাপতি জেনারেল আকিনলেকের মনে। সুভাষ বোস হেরেও জিতে গেল। আজ তাকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে যে ঝড় উঠেছে, তার শেষ কোথায়?

সবচাইতে বেশি ভাবনা ইস্টার্ণ কম্যাণ্ডের প্রধান সেনানায়ক জেনারেল টুকারের। সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ অনিবার্য। খবর পাওয়া গেছে, রয়েল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের বৈমানিকগণ আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের মামলা পরি-চালনার জন্য প্রকাশ্যেই প্রচুর টাকা তুলে দিয়েছে কংগ্রেসের হাতে। বোঝা যায় যে, এটা ভবিষ্যতের সূচনা মাত্র। এভাবে গোটা সেনাবাহিনীই যে আই. এন. এ.-র সমর্থনে তাদের পেছনে দাঁড়াবে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

'It was alarming for the future....The I.N.A. affair was threatening to tumble down the whole edifice of the Indian army.'

মার্কিন সেনাপতি ম্যাক আর্থারের ভাবনা অন্যরকম। সুভাষ বোস এবারও পালিয়েছে। আবার যদি কোনদিন সে ফিরে আসে তাহলে গোটা এশিয়াই সেদিন আমাদের হারাতে হবে।

'He has again escaped, if Subhas Chandra Bose comes again we will loose whole of Asia.'

আর ভারতবর্ষের তো কথাই নেই। এ যেন আর এক ভারতবর্ষ। চেনাই যায় না।

প্রতিটি মানুষের ভাবনা-চিন্তা দেহ-মন সব কিছু যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছে একটি মাত্র প্রশ্নে।

সুভাষ কোথায়! তুমি কি আর ফিরে আসবে না সুভাষ! আর মামলার ফলাফল কি হবে? ওরা কি ফাঁসি দেবে ওঁদের তিনজনকে! না কি গুলী করে হত্যা করবে?

এমন কি যে সরোজিনী নাইডু কিছুদিন আগেও হিংসাত্মক কার্যের জন্য আগস্ট-আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন তাঁর মুখেও তখন অন্য কথা।

সুভাষ! ছেলে তো নয়, যেন জ্বলন্ত তরবারি। আর আমাকে যদি তিনটি সন্তান বেছে নিতে বলা হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে আমি বেছে নেব শাহনওয়াজ, সেইগল আর ধীলনকে।

'Subhas is a flaming sword....If I were asked to choose

three sons, I would have unhesitatingly chosen Shah Nawaz, Sehgal and Dhillon.'

আর গান্ধীজী। হরিজন পত্রিকার মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তিনি দেশবাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর অন্তরের কথা। আই. এন. এ.-র সম্মোহনের মায়াজালে আমরা সবাই সম্মোহিত হয়ে গিয়েছি। 'The hypnotism of the I. N. A. has cast its spell upon us.'

সেদিনকার সেই নবজাগ্রত ভারতবর্ষকে খুঁজে পাওয়া যাবে কংগ্রেসের ইতিহাস-রচয়িতা ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়ার কয়েকটি কথার মধ্যেঃ

'আই. এন. এ.-র বন্দীরা আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দকেও মেঘাবৃত করে ফেলেছে এবং মনে হচ্ছে, গোটা কংগ্রেসকেই যেন তারা সূর্যগ্রহণের মত ঢেকে দিয়েছে। বিদেশে তাদের এই সংগ্রাম, স্বদেশে আমরা অহিংস পন্থায় যেটুকু পেয়েছি, তাকে যেন একেবারেই নিষ্প্রভ করে দিয়েছে।'

'....Overshadowed the names of national leaders. It looked as though the I.N.A. itself eclipsed the Indian National Congress and the exploits of war and violence abroad threw into obscurity the victories of non-violence at home.' [The History of the Indian National Congress :
Vol. II : P.—784]

আর আসামী-পক্ষের প্রধান আইনজীবী বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা ভুলাভাই দেশাইয়ের তো কথাই নেই। দেহ অসুস্থ। খুবই অসুস্থ। তবু ডাক্তারের নিষেধ অমান্য করে রাত-দিন তিনি ডুবে রয়েছেন আই. এন. এ.-র বিভিন্ন ফাইল ও নথীপত্রের মধ্যে।

কত দলিল। সুভাষের নিজের হাতে লেখা কত চিঠিপত্র। কত বিশেষ হুকুমনামা। কত ছবি।

একটু একটু করে কোথায় তলিয়ে যান শ্রীযুক্ত দেশাই। ডুবে যান অশ্রুসজল করুণ মধুর এক ইতিহাসের মধ্যে।

সুভাষ! সুভাষ! সুভাষ! তুমি কি সেই সুভাষ, যাকে আমি একদিন ভুল বুঝেছিলাম! দলে পড়ে লোকের কথা শুনে তোমার নিন্দে করেছিলাম!

আজ আমার চোখের পর্দা সরে গেছে। তাই আজ তোমাকে দেখছি এক সুদক্ষ রাষ্ট্রনায়ক, আজন্ম বাস্তববাদী, ঋষি-দৃষ্টিসম্পন্ন এক আদর্শবাদী মহানায়করূপে। বিপ্লবের ইতিহাসে তুমি শুধু একজন স্বাপ্নিক শিল্পীই নও, স্রষ্টাও বটে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে সংগীতমুখর আলোকস্তম্ভের মতই তুমি নেতাজীরূপে বেঁচে থাকবে চিরকাল।

'I had grown to echo what the coterie in which I moved said against him—that it was a pity he wouldn't toe the line and talk flamboyantly about violence, armed insurrection and

so on—you know the stock arguments....the scales fell from my eyes...

....a far-seeing statesman, a born realist, a strategist to his finger-tips and an idealist-cum-seer who could not halt or rest on the way because he was haunted by an irresistible —almost a mystic call he had to answer with the last drop of his freedom hungry blood....the architect and the builder of his dream edifice.

Netaji shall live for all times as a singing light-house of inspiration to posterity in this our drab age where all the rest is dumb ash.' [Netaji : Dilip Kumar Roy : Bulletin of the Netaji Research Bureau : 1965]

কমিউনিস্ট পার্টি অবশ্য এসব সস্তা উচ্ছ্বাসের মধ্যে নেই। পার্টি সেক্রেটারী পি. সি. যোশী আগেই সেকথা জানিয়ে দিয়েছেন স্পষ্ট ভাষায়। সুভাষ বোস অক্ষশক্তির সমর্থনের আশায় বাইরে গিয়েছিল। এই আকাশ-কুসুম কল্পনায় অবশ্য খুব কম লোকই বিশ্বাস করত যে, ফ্যাসিস্টদের দ্বারা আমাদের কোনরকম সাহায্য হওয়া সম্ভব। সুভাষ বোসের এই প্রচেষ্টা সার্থক হলে লাভ হত এই যে, ভারতবর্ষ ব্রিটিশের হাত থেকে জাপানের হাতে চলে যেত।

'Bose went out of India to secure the support of the Axis...only very few had the illusion that the Indian liberation could come with the aid of the Fascists...Bose's pact could not but lead to India's passing from the British to the Japanese hands.' [Hindu : 30.8.45]

নিশ্চয়ই তুমি খুব অবাক হয়েছ মল্লিকা। ভাবছ—কেন কমিউনিস্ট পার্টির এই বিপরীত মানসিকতা? কেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রশ্নে বার বার তাদের এই দ্বিধাজড়িত পদক্ষেপ? উল্লেখযোগ্য যে, কি অসহযোগ আন্দোলন, কি আগস্ট-আন্দোলন—কোনটাতেই তারা অংশ গ্রহণ করেনি সক্রিয়ভাবে। কি এর কারণ?

উত্তরে শ্রীঅমলেন্দু ঘোষের বহু-আলোচিত গ্রন্থ 'মার্কসবাদই শেষ কথা নয়' থেকে কয়েকটি লাইন আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি। তারপর বিশ্বাস করা বা না করা তোমার ইচ্ছে ঃ

'জার-এর আমলের রাশিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। ওখানকার কমিউনিস্ট পার্টিকে তাই কোন বিদেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম করতে হয়নি। শুধু নিজেদের স্বাধীন দেশের বুর্জোয়া সরকার বদলিয়ে নতুন কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁরা। তাঁদের কাছ থেকে তাই স্বাধীনতা-সংগ্রামের

কোন পাঠ নিতে পারেননি আমাদের দেশের কমিউনিস্টগণ। অনেকের মতে হয়তো এ কারণেই ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ভারতীয় কমিউনিস্টদের কাছে কোনসময়েই খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান পায়নি।' [পৃঃ ১২৯]

৫ই নভেম্বর, ১৯৪৫ সাল।

সারা ভারতের দৃষ্টি সেদিন লালকেল্লার দিকে। আজ লালকেল্লায় আজাদী বাহিনীর তিন বীর সেনানায়ক শাহনওয়াজ খান, কর্ণেল সেইগল ও মেজর ধীলনের বিচার শুরু। সেই লালকেল্লায়, যেখানে একদিন তাঁরা বিজয় উৎসব পালন করার স্বপ্ন দেখেছিলেন ব্রিটিশ শক্তিকে পরাজিত করে। ধূর্ত ব্রিটিশ তাই তাঁদের বিচারের আয়োজন করেছে সেই লালকেল্লাতে। বিচার করবে বিজয়ী শক্তির প্রতীক হিসেবে ব্রিটিশ নিজে।

এদিকে কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদের ডাকে একই দিনে পালিত হচ্ছে আই. এন. এ. দিবস। সর্বত্র সভা-সমিতি। সর্বত্র বিক্ষোভ। এ বিচার অন্যায়। আজাদী বন্দীদের সাজা দিলে তার পরিণাম হবে অত্যন্ত গুরুতর, এবং তার জন্য দায়ী হবে ব্রিটিশ সরকার।

ওদিকে লগ্ন আসন্ন। এবার বন্দীদের নিয়ে আসা হবে বিচারসভায়। শুরুতেই জনৈক ব্রিটিশ ক্যাপ্টেনের সঙ্গে এক প্রস্থ হাতাহাতি হয়ে গেল ধীলনের।

ঘটনার সূত্রপাত 'জয় হিন্দ্' এবং 'নেতাজী জিন্দাবাদ' ধ্বনি থেকে। কোর্ট থেকে আগত প্রহরী দলকে দেখেই হাজার হাজার বন্দী আজাদী সৈনিক তখন ধ্বনি তুলেছে—জয় হিন্দ্! নেতাজী জিন্দাবাদ!

প্রতিধ্বনি তুলে সাড়া দিয়েছেন মেজর ধীলন—জয় হিন্দ্! নেতাজী জিন্দাবাদ!

ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গেই প্রহরী দলের শ্বেতাঙ্গ ক্যাপ্টেন সাহেবের মেজাজ গরম। তারপরই ধীলনকে সজোরে এক ধাক্কা। একদম চুপ! আমার হুকুম।

রুষ্ট বাঘের মত ঘুরে দাঁড়ালেন মেজর ধীলন। সাবধান! ফের যদি এমন দুঃসাহস দেখাবে তো তার পরিণাম খুব খারাপ হবে বলে দিচ্ছি!

কেন, কি করবে? বলেই ক্যাপ্টেন সাহেব আবার ধাক্কা দিলেন ধীলনকে।

আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গেই বেধড়ক মার। দেখে নাও। খুব ভাল করে দেখে নাও যে, আজাদী সৈনিক পাল্টা জবাব দিতে জানে কিনা।

হেল্প! হেল্প! মার খেয়ে সমানে চীৎকার করতে লাগলেন ক্যাপ্টেন সাহেব. কিন্তু আশ্চর্য, সামনে দণ্ডায়মান তাঁরই অধীনস্থ গোর্খা সেনানীরা নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। এমন কি সঙ্গী অপর একজন শ্বেতাঙ্গ মেজর সাহেব পর্যন্ত তেমনি নিশ্চুপ। ক্যাপ্টেন সাহেব যতই চীৎকার করুন না কেন, বারুদের স্তূপে অগ্নিসংযোগ করতে কেউ রাজী নয়।

শেষ পর্যন্ত মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন কর্ণেল সেইগল। ব্যস, আর নয়। অনেক হয়েছে। এবার ওকে রেহাই দাও।

কর্ণেল সেইগলের ভাষায়ঃ

'The Gurkha guards inspite of their Captain's shouts for help looked passively on and it was only after I felt that the Captain had received sufficient punishment that I separated the two and we proceeded to the Court room.'

[Victory in Defeat: P. K. Sehgal]

এবার বিচার।

বিচারকের সংখ্যা মোট সাতজন। মেজর জেনারেল ব্ল্যাকল্যান্ড, ব্রিগেডিয়ার হার্ক, লেঃ কর্ণেল স্কট, লেঃ কর্ণেল স্টিভেনশন, লেঃ কর্ণেল নাসির আলী খাঁ, মেজর প্রীতম সিং এবং মেজর বনোয়ারীলাল। সবাই ব্রিটিশ-ভারতীয় বাহিনীর অফিসার।

আইনজীবীদের মধ্যে সরকার পক্ষে রয়েছেন এ্যাডভোকেট জেনারেল স্যার এম. পি. ইঞ্জিনীয়ার এবং মেজর ওয়ালস।

বন্দীদের পক্ষে কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত ভুলাভাই দেশাই, স্যার দিলীপ সিং, কৈলাসনাথ কাটজু, আসফ আলী, রায় বাহাদুর বদ্রীদাস, প্রশান্তকুমার সেন, রঘুনন্দন শরণ এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রমুখ মোট সতেরো জন। উল্লেখযোগ্য যে, আইনজীবী হিসেবে গত বাইশ বছরের মধ্যে গাউন পরে বিচার-সভায় হাজির হওয়া জওহরলালের পক্ষে সেই ছিল প্রথম।

সর্বপ্রথম বন্দীদের পক্ষে পর পর দুদিন সাক্ষ্য দিলেন লেঃ ডি. সি. নাগ। নির্ভীকভাবে তিনি তাঁর বক্তব্য রাখলেন আদালতের কাছে। আজাদ হিন্দ্ সরকার সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত সরকার। সেনাবাহিনী আমাদেরই নিজস্ব বাহিনী। আমরাই তাদের পরিচালিত করেছি মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে। তার সঙ্গে জাপানের কোন সম্পর্ক নেই।

পর পর দুদিন শুনানীর পর মামলা মুলতুবী রাখা হল দু সপ্তাহের জন্য। ঠিক হল—আবার আদালত বসবে ২১শে নভেম্বর লালকেল্লায়।

ততক্ষণে বিদ্রোহী ভারত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এখানে-ওখানে সর্বত্র। এ বিচার আমরা মানিনে, মানব না। গো ব্যাক ব্রিটিশ। কুইট্ ইণ্ডিয়া! জয় হিন্দ্! নেতাজী জিন্দাবাদ!

বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য মাদুরাতে দুজনকে প্রাণ দিতে হল পুলিসের গুলীতে। বোঝা গেল ঝড় আসন্ন।

১১ই নভেম্বর বিদ্রোহের ডাক শোনা গেল পণ্ডিত জওহরলালের কণ্ঠে। ভারতবর্ষের এখনই বিদ্রোহ করা উচিত। না করলে বুঝতে হবে যে, এটা একটা মৃত জাতি।

'...it was India's duty to revolt and if the country was not prepared for a revolution to free itself it was a dead nation.'

২১শে নভেম্বর আবার শুনানী শুরু হল লালকেল্লাতে।

কলকাতা-বম্বে-এলাহাবাদ-বেনারস-করাচী-পাটনা-রাওয়ালপিণ্ডি প্রভৃতি প্রতিটি স্থান তখন জ্বলছে বিক্ষোভের আগুনে। জয় হিন্দ্! নেতাজী জিন্দাবাদ! ইংরেজ দূর হটো!

কলকাতায় পুলিশের গুলীতে নিহত হল ৩২ জন। আহত দু-শ। অপরপক্ষে ব্রিটিশ ও মার্কিন মিলিটারী এবং পুলিশ আহত হল ১৮৮ জন। নিহত ১ জন। মিলিটারী আর্মাডকার ধ্বংস করা হল ৪৯টি। ক্ষতিগ্রস্ত হল আরো ৯৭টি।

ওদিকে মামলা তখন চলছে পুরোদমে। প্রধান আইনজীবী ভুলাভাই দেশাই অসুস্থ, কিন্তু সেদিকে এতটুকুও ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর।

কি হবে আমার বেঁচে থেকে! আমার প্রাণ যায় তো যাক, কিন্তু তোমরা তিনজন তো বেঁচে থাকবে। তোমাদের চাইতেও বড় কথা—নেতাজী এবং আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা। তা যদি করতে না পারি, তাহলে নেতাজী এবং আই. এন. এ.-র সম্মান রক্ষার্থে তোমাদের মৃত্যুবরণ করাই সর্বদিক থেকে শ্রেয়।

'If your lives can be saved with honour we will try and save you, otherwise it would be better for you all to die and save the honour of your leader and the organization to which you belonged.'

[Maj. Gen. Shahnawaz Khan : P.—242]

অসুস্থতা সত্ত্বেও লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে বোধহয় জীবনের শ্রেষ্ঠ সওয়াল সেদিন করেছিলেন ভুলাভাই দেশাই।

'এই বিচারশালায় যাচাই হচ্ছে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মান-মর্যাদা ও বিধি-বিধান এবং পরাধীন দেশের পক্ষে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবার নিরঙ্কুশ অধিকার।

এ যুদ্ধ নামেমাত্র সম্রাটের বিরুদ্ধে, কিন্তু আসলে এটা হল পরাধীন জাতির স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যুদ্ধ। এ অধিকার যে কোন পরাধীন জাতির আছে। এখানে সম্রাটের বিরুদ্ধে আনুগত্যের প্রশ্নটা বড় কথা নয়। তাহলে তো তাকে শুধু দাসত্বই মেনে নিতে হবে যুগ যুগ ধরে।'

'The honour and the law of the Indian National Army are on trial before this court, and the right to wage war with immunity on the part of a subject race for their liberation...

When you are nominally fighting against the King but really fighting to liberate the country, then the point is whether the question of allegiance can arise at all. Unless you sell your soul, how can you ever say that when you are fighting to liberate your own country, there is some other

allegiance which prevents you from so doing...if that happens there is nothing but permanent slavery.'

ব্রিটিশ প্রেস্টিজের খাতিরে সাজা দেওয়া হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। কিন্তু সে আদেশ কার্যকরী হল না। প্রধান সেনাপতি ফিল্ড-মার্শাল স্যার ক্লড অকিনলেকের বিশেষ আদেশে শেষ পর্যন্ত তিনজনকেই দেওয়া হল—মুক্তি।

কিন্তু কেন? সহসা বন্দীদের প্রতি প্রধান সেনাপতির এই উদারতা প্রদর্শনের কারণ কি?

এর উত্তরে পাবে প্রধান সেনাপতি ফিল্ড-মার্শাল অকিনলেকের কাছে লেখা বড়লাট লর্ড ওয়াভেল-এর একটি 'সিক্রেট' চিঠির মধ্যে। চিঠিতে তিনি লিখেছেন—আদালত যা-ই সিদ্ধান্ত নিক না কেন, প্রধান সেনাপতি ইচ্ছা করলে তাদের মুক্তি দিতে পারবেন নিজ অধিকার প্রয়োগ করে।

এ চিঠি কিসের ইঙ্গিত? কেন বন্দীদের জন্য সরকারের এত মাথা ব্যথা? কি এর কারণ?

ভয়! ভয়! ভয়! পরিস্থিতি লক্ষ্য করে ভেতরে ভেতরে তখন দারুণ ভয় ধরে গেছে মহামান্য ব্রিটিশ সরকারের। স্পষ্টই তারা বুঝতে পেরেছে যে, এবার পাততাড়ি গুটানোর সময় হয়েছে। নইলে কাউকে আর শান্তিতে ঘরে ফিরতে হবে না ভারতবর্ষ থেকে।

গান্ধীজীকে ভয় করবার কোন কারণ নেই। কারণ, হিংসাত্মক কার্যাবলীকে প্রতিহত করাই তাঁর মূল নীতি। জওহরলাল সম্বন্ধে প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, মানুষ হিসেবে তিনি অতিমাত্রায় ভদ্রলোক। ভয় ঐ সুভাষ বোসকে। ওকে বিশ্বাস নেই।

'...British had not feared Gandhi, the reducer of violence, they no longer feared Nehru, who was rapidly assuming the lineaments of civilized statesmanship...The British however, still feared Subhas Bose...' [The Last Years of British India : Michael Edwardes : P.—103-104]

এ প্রসঙ্গে আমি বড়লাট লর্ড ওয়াভেল, প্রধান সেনাপতি ফিল্ড-মার্শাল অকিনলেক এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহামান্য সেক্রেটারীর তখনকার সময়ের সিক্রেট নোট থেকে কিছু কিছু অংশ তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি মল্লিকা। লক্ষ্য করো যে, সবারই একমাত্র ভাবনা তখন সুভাষ এবং আই. এন. এ.-কে নিয়ে।

প্রথমে শোন প্রধান সেনাপতি ফিল্ড-মার্শাল অকিনলেকের কথা। এ চিঠি তিনি সেদিন লিখেছিলেন বড়লার্ট লর্ড ওয়াভেলকে ঃ

'এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, অধিকাংশ আই. এন. এ.-র লোক এবং তাদের নেতৃবৃন্দ বিশ্বাস করত যে, সুভাষ বসু একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক এবং তাঁর নেতৃত্বকে অনুসরণ করে তারা ঠিকই করেছে। যে সমস্ত

প্রমাণপত্র পাওয়া গেছে তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সুভাষ বসু তাদের উপর একটা অসম্ভব প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব খুবই বিরাট ছিল সন্দেহ নেই।'

'Subhas Chandra Bose acquired a tremendous influence over them and that his personality must have been an exceedingly strong one.'

এখানেই শেষ নয়। এর পরের অংশটুকুও তুমি শুনে নাওঃ

'দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি যে, ভারতীয় সৈন্যদের মনের কথা অনুধাবন করা মোটেই সহজসাধ্য নয়। কোন ব্রিটিশ অফিসারই আজ জানে না যে, আই. এন. এ. সম্বন্ধে তাদের সত্যিকারের মনোভাব কি?

তবে আমি যেটুকু বুঝেছি তাতে বলতে পারি যে, আই. এন. এ.-র প্রতি তাদের খুবই সহানুভূতি রয়েছে এবং ক্রমশঃ তা বেড়েই চলেছে। আই. এন. এ.-র অপরাধ সম্বন্ধেও তারা কোনরকম গুরুত্ব দিতে রাজী নয়। এ-ক্ষেত্রে আমাদের চিরাচরিত নীতি অনুসরণ করা অসম্ভব।'

'...there is a growing feeling of sympathy for the I.N.A. and an increasing tendency to disregard the brutalities committed by some of its members as well as the foreswearing by all of them of original allegiance.

It is impossible to apply our standards of ethics to this problem or to shape our policy as we would, had the I. N. A. been of our own race.'

এখানেই থামেননি ফিল্ড-মার্শাল অকিনলেক। ইতিমধ্যেই তিনি সেনাবাহিনীর সিনিয়ার ব্রিটিশ অফিসারদের কাছে একটি গোপন নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছেন অতি সঙ্গোপনে।

গতিক সুবিধের নয়। যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। খুব সতর্কভাবে ভারতীয় সেনাদের উপর নজর রাখো। তাদের আনুগত্য সম্বন্ধে গোপনে খোঁজ-খবর নাও। সাবধান, আমার এই গোপন নির্দেশের কথা কাকপক্ষীতেও যেন টের না পায়।

ফিল্ড-মার্শাল অকিনলেকের লেখা সেই গোপন নির্দেশ থেকে কিছু কিছু অংশ তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি ঃ

'আমি মনে করি—প্রতিটি ভারতবাসী আজ জাতীয়তাবাদী।...তারা যে অপরাধই করে থাকুক না কেন, দেশপ্রেমিক হিসেবেই করেছে। কাজেই তারা যদি ভুল পথেও চালিত হয়ে থাকে, তাহলে ভারতের সত্যিকারের সন্তান হিসেবে তাদের কিছুটা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতে হবে।

তাদের শাস্তিকে কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করা হলে দেশে অরাজকতার সৃষ্টি, সেনাবিদ্রোহ এবং সেনাবাহিনী ভাগাভাগি হয়ে ভেঙে যাওয়া অনিবার্য।'

'...any attempt to force the sentence would have led to chaos in the country at large and probably to mutiny and dissension in the army culminating in its dissolution...'

একই সতর্কবাণী বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের কণ্ঠে। বিলেতে অবস্থিত সেক্রেটারী অফ স্টেটস্‌কে তিনি জানিয়েও দিয়েছেন তাঁর আশঙ্কার কথা।

'ভারতীয় সৈন্যদের দিয়ে তাদের দেশবাসীকে দমন করার চেষ্টা করলে বিস্ফোরণ অনিবার্য। কারণ, যত দিন যাচ্ছে, ততই যেন ভারতীয় সেনা-বাহিনী এবং পুলিশের আনুগত্যের ব্যাপারটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

'...it would be unwise to try the Indian Army too highly in the suppression of their own people, and as time went on the loyalty of even the Indian officials, the Indian Army and the police might become problematical.'

লক্ষ্য করো মল্লিকা, যেখানে যা কিছু ঘটছে, সবই যেন একটি মাত্র মানুষ এবং আই. এন. এ.-কে কেন্দ্র করে। তাছাড়া আর সবকিছুই যেন সেদিন গৌণ হয়ে গিয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের কাছে।

এর পরেও কেন যে সেদিন মহামান্য সরকার বাহাদুর তড়িঘড়ি করে বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন, তার সদুত্তর খুঁজে পেতে খুব একটা দেরী হয় কি?

ভয়ে। স্রেফ ভয়ে। নইলে জার্মানী বা জাপানের যুদ্ধাপরাধীদের বেলায় এ হেন মহত্ব প্রদর্শন কোথায় ছিল?

জার্মানীতে গোয়েরিং, কাইটেল, রিবেনট্রপ প্রমুখ বারো জনকে দেওয়া হয়েছিল মৃত্যুদণ্ড। জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো, জেনারেল মাসাহারু হোমা প্রমুখদেরও ভাগ্যে জুটেছিল তাই। তাঁরা পরাজিত, সুতরাং তাঁদের অপরাধ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না। মৃত্যুই সেখানে একমাত্র শাস্তি।

শুধু একমত হতে পারেননি ভারতবর্ষ থেকে নির্বাচিত বিচারক স্বনাম-ধন্য ডঃ রাধাবিনোদ পাল। তাঁর মতে—এটা একটা বিচারের প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, যুদ্ধাপরাধী কে নয়? কে বলতে পারে যে, এ যুদ্ধে তারা কোনরকম অন্যায় বা নৃশংসতার আশ্রয় নেয়নি? তা হলে একা জাপান যুদ্ধাপরাধী হবে কেন?

বলাই বাহুল্য যে, ডঃ পালের সেই মতামত গৃহীত হয়নি। হবার কথাও নয়। বিজয়ীপক্ষের দম্ভের কাছে তাঁর সেই মানবিক আবেদনের মূল্য আর কতটুকু?

৪ঠা জানুয়ারি (১৯৪৬) তিনজনকে মুক্তি দেওয়া হল লালকেল্লা থেকে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কণ্ঠে রব উঠল—জয় হিন্দ্! নেতাজী জিন্দা-

বাদ! শাহনওয়াজ খান, সেইগল, ধীলন জিন্দাবাদ! তোমরা জাতীয় বীর। তোমাদের আমরা আমাদের মধ্যে বরণ করি।

ব্রিটিশ মুখপাত্র হিউ টয়-এর ভাষায়ঃ

'বিচার-পর্বের আকস্মিক পরিণতিতে বোঝা গেল, সুভাষচন্দ্রের কতখানি প্রভাব—তাঁর এত প্রভাব এর আগে কোনদিনও দেখা যায়নি। সুভাষচন্দ্রের এই বিপুল প্রভাব কংগ্রেসের খুব কাজে লেগে গেল। একথা মানতেই হবে যে, সুভাষচন্দ্রের প্রখর দূরদৃষ্টি ছিল।'

'That the greatest influence he ever exerted bay in the accidental effect of the trials, whose setting in the Red Fort, nationalist goal, symbol of alien Imperial power, and centre of the Indian world, turned so much to the advantage of the Congress, does not diminish the authenticity of his vision.' [Hugh Toye: P.—175]

কংগ্রেসের তখন জয়-জয়কার।

একদিকে সুভাষ এবং আই. এন. এ.-র ভাবমূর্তিকে সামনে রেখে নতুন করে জনসংযোগ স্থাপন, অন্যদিকে নির্বাচনে জয়লাভ, দুটোতেই কংগ্রেস উৎরে গেল চমৎকারভাবে।

নির্বাচনে কংগ্রেসের এই বিরাট জয়লাভ উপলক্ষে সেদিন সাময়িক পত্রিকায় কি মন্তব্য করা হয়েছিল শুনে নাওঃ

'কংগ্রেসের সুভাষচন্দ্রের নিকট কৃতজ্ঞতার ঋণ অপরিশোধ্য। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দেরও পূর্ব হইতে দলাদলিতে কংগ্রেস দুর্বল হইতেছিল। একদিকে যেমন তাহার সেই দৌর্বল্য বর্ধিত হইতেছিল, অপরদিকে তেমনই ভেদ-নীতি-প্রবর্তক বিদেশী শাসকদিগের রোপিত বিষবৃক্ষ সাম্প্রদায়িকতায় ফলবান হইয়া উঠিতেছিল।

...এই অবস্থায় এবার ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচনে যে কংগ্রেসের জয় অনাবিল হইয়াছে, তাঁহার একমাত্র কারণ—কংগ্রেসপন্থী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সৃষ্ট ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর—আজাদ হিন্দ্ ফৌজের আদর্শ। সেই আদর্শের প্রেরণায় দেশবাসী অনুপ্রাণিত হইয়াছে।' [সাপ্তাহিক দেশ]

কিন্তু তারপর! না থাক, সেকথা তোমাকে বলব আরো পরে। এখন বরং আগের প্রসঙ্গেই ফিরে যাই।

শাহনওয়াজ খান, সেইগল এবং ধীলনকে মুক্তি দেবার কথা তোমাকে আগেই বলেছি। মুক্তি দেওয়া হল না অন্য একটি মামলার আসামী আই. এন. এ.-র ক্যাপ্টেন রসিদ আলীকে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তাঁকে দেওয়া হল সাত বছরের কারাদণ্ড।

শুধু তাই নয়। ৭ই ফেব্রুয়ারি শোনা গেল একটি মারাত্মক খবর, যা

এতদিন চাপা ছিল ভারতবাসীর কাছে। তখনকার সময়ের সাময়িক পত্রিকা থেকেই তার বিবরণ পড়ে শোনাচ্ছি ঃ

'৭ই ফেব্রুয়ারি—কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ সংক্রান্ত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে সমর-বিভাগের সেক্রেটারী ফিলিপ মেশন বলেন যে, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অনুমান ১৯,৫০০ লোককে পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৬ হাজার লোককে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আটক করিয়া রাখা হইয়াছে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সাতাশজন সৈনিক আটক থাকার সময় মারা গিয়াছেন এবং নয়জনকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে।'

[সাপ্তাহিক দেশ ১২. ২. ৪৬]

মাত্র নয়জন! অত্যন্ত অসত্য উক্তি।

প্রকৃতপক্ষে আরো অনেক বেশি লোককে সেদিন গোপনে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন কারাগারে।

সাবমেরিণযোগে আগত সত্যেন বর্ধন, আব্দুল কাদের, এস. আনন্দম এবং ফৌজ সিং—এই চারজনকে মাদ্রাজ ফোর্টে ফাঁসি দেবার কথা তোমাকে আগেই বলেছি। ২৭শে সেপ্টেম্বর (১৯৪৩) আরো নয়জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল মাদ্রাজ ফোর্টে। এ'রা সবাই মাদ্রাজ উপকূল-রক্ষীবাহিনীর লোক। এ প্রসঙ্গে তখনকার সময়ের সাময়িক পত্রিকায় কি লেখা হয়েছিল শোন ঃ

'যুদ্ধের সময় মাদ্রাজ কেল্লায় ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর নয়জন সৈনিক জমাদার মানকুমার বসুঠাকুর, এন. কে. দে, হাবিলদার ডি. ডি. রায়চৌধুরী, হাবিলদার এস. কে. মুখার্জী, হাবিলদার এন. বড়ুয়া, নায়েক পি. চক্রবর্তী, নায়েক সি. মুখার্জী গানার কে. পি. আইচ ইহাদিগকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে।

আর গানার আবদুল রহমান, গানার আর. এন. ঘোষ ইহাদিগকে যাবজ্জীবন দণ্ডে এবং গানার এ. কে. দে-কে সাত বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে বলিয়া নয়াদিল্লী হইতে প্রাপ্ত একটি সংবাদে জানা গিয়াছে।

ইহারা সকলেই তরুণ। ইহাদের বয়স ১৭ বৎসর হইতে ২৪ বৎসরের মধ্যে। প্রকাশিত নামের তালিকা হইতে ইহাও মনে হয় ইহারা সকলেই বাঙালী। বাহির হইতে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ইহাদিগকে কোনরূপ সুযোগ প্রদান করা হয় নাই। লোকচক্ষুর অন্তরালে কারাকক্ষের মধ্যেই সবকিছু সমাধা হইয়াছে।'

এবার আজাদী বাহিনীর পরবর্তী কুড়ি জনের নামের তালিকাটির দিকে চোখ বুলিয়ে নাও। এ ছাড়াও কিছু-সংখ্যক লোককে সেদিন গোপনে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল এখানে-ওখানে, কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করেও তাদের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। যাক, শোন ঃ

নাম	প্রাণদণ্ডের তারিখ	কোথায়
১। ছত্তর সিং	২৯.৭.৪৪	দিল্লী
২। নাজির সিং	"	"
৩। ক্যাপ্টেন দুর্গামল	২৫.৮.৪৪	"

নাম	প্রাণদণ্ডের তারিখ	কোথায়
৪। হাবিলদার হাজরা সিং	২৫.১০.৪৪	লালকেল্লা
৫। সর্দার সিং (এস. এ. গ্রুপ)	২৩.৩.৪৫	কলকাতা
৬। নগীন্দর সিং (বাহাদুর গ্রুপ)	২৮.৮.৪৩	×
৭। কেশরী চাঁদ শর্মা	৩.৫.৪৫	দিল্লী
৮। চরণ সিং	২৮.৮.৪৩	মুলতান
৯। ক্যাঃ দল বাহাদুর থাপা	৩.৫.৪৫	দিল্লী
১০। ক্যাঃ দলবারা সিং	৩.৫.৪৫	"
১১। হাবিলদার ছমন সিং (বাহাদুর গ্রুপ)		
১২। হাবিলদার গুরুচরণ সিং	... ...	"
১৩। প্রীতম সিং	... ...	ফায়ারিং স্কোয়াড
১৪। টি. পি. কুমারণ	... ...	
১৫। খোদ্দের	... ...	
১৬। কর্তার সিং	৪.১২.৪৫	শিয়ালকোট
১৭। রামু থেবর (এস. এস. গ্রুপ)	৭.৭.৪৪	
১৮। রামস্বামী "	... ...	
১৯। আজইব সিং "	... ...	লালকেল্লা
২০। জহুর আমেদ	২৩.৮.৪৩	×

খবর শুনে সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল ভারতের বিদ্রোহী যৌবন। এ আমরা কিছুতেই মুখ বুজে সহ্য করব না। এর জবাব আমরা দেব।

সতর্ক-বাণী উচ্চারিত হল মার্কিন মুখপাত্র 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এর পাতায়। হুঁশিয়ার! খুব হুঁশিয়ার! আই. এন. এ. কে বিশ্বাস নেই। ওরা সব পারে।

জাপানের সাহায্যে ভারতকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পরে যদিও আই. এন. এ.-কে ভেঙে দেওয়া হয়েছে, তবু আবেগে ভরপুর এই আই. এন. এ. ইস্যুই বর্তমানে ভারতবর্ষে প্রধান এবং সহিংস ভূমিকা নেবে বলে মনে হচ্ছে।

'Although the Indian National Army has been disbanded following the futile attempt to 'liberate' India with Japanese support, it is still an explosive political issue and more emotionally surcharged than any to be found here...

...This issue...now appears certain to play a vital and perhaps violent part in Indian politics...'

[New York Times: 8.2.46]

আশঙ্কা অমূলক হল না। আই. এন. এ.-তে সংখ্যার দিক থেকে হিন্দু-মুসলমান দুই-ই প্রায় সমান সমান। তাই ক্যাপ্টেন রসিদ আলীর সাজার কথা শুনে কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগও এবার এগিয়ে এল পাল্লা দিয়ে।

১১ই ফেব্রুয়ারি 'রসিদ আলী দিবস' পালিত হল ভারতবর্ষের সর্বত্র।

সর্বত্র বিক্ষোভ। সর্বত্র প্রতিবাদ সভা। সর্বত্র পাশাপাশি উড়ছে কংগ্রেস এবং লীগের পতাকা। সর্বত্র এক দাবী। রসিদ আলীকে সাজা দেওয়া চলবে না। তাহলে আমরা বদলা নেব।

বদলা তারা সত্যিই নিয়েছিল মল্লিকা। বুকের বারুদে জ্বলে উঠে প্রাণ যেমন দিয়েছে, নিয়েছেও ঠিক তেমনিই। নীতি সেখানে একটাই। মারের বদলে মার। আঘাতের বদলে আঘাত।

কলকাতা-বম্বে-দিল্লী সর্বত্র এক চেহারা। হাতের সামনে পেলে আর রক্ষে নেই, তা ব্রিটিশ বা মার্কিন যে-ই হোক। সেই সঙ্গে সরকারী সম্পত্তি যে কত বিনষ্ট করা হল তার বোধহয় কোন গোনাগুন্তি নেই।

কলকাতায় নিহত হল ৪৫ জন। আহত ৫২৭ জন। তার মধ্যে ৮২ জনই হল পুলিশ। শেষ পর্যন্ত মার্শাল ল জারি।

আক্ষেপ শোনা গেল বড়তরফের কর্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কণ্ঠে। এ কি তাজ্জব ব্যাপার! হিন্দু-মুসলমান পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করবে, তবেই না ডিভাইড এ্যান্ড রুল-এর সার্থকতা!

আর সেই হিন্দু-মুসলমান কি না আজ বিভেদ ভুলে গিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে জাপ-সমর্থক সুভাষ বোসের নাম নিয়ে! এ যে চিন্তাও করা যায় না।

'Inspite of the uncompromising struggle between the two factions, last week, for the first time since 1921, Moslems and Hindus together staged street protests and riots against the British in Calcutta, Bombay and New Delhi.

The catalytic agent in this case was the Indian National Army, organized by a Japanese collaborator named Subhash Chandra Bose.' [New York Times : 17. 2. 46]

অবশ্য আক্ষেপের আসল কারণ রয়েছে অন্যত্র। ভারতবাসী নাকি এরি মধ্যেই সুভাষ বোসকে জর্জ ওয়াশিংটন বানাবার জন্য রাত-দিন চেষ্টা করে চলেছে। কি অন্যায় কথা!

'Indian Nationalists are working day and night to build up Bose as the 'George Washington' of India. This is particularly true of the revolutionary element in the Congress Party, which spares no efforts to eulogize Bose, create a 'Bose legend' and wrap his sayings and beliefs in sanctity.

[New York Times: 8.2.46]

পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটল সুবেদার সিঙ্গারা সিং, জমাদার ফতে খাঁ এবং জমাদার পূরণ সিং-এর বিচারকে কেন্দ্র করে।

সুবেদার সিঙ্গারা সিং এবং জমাদার ফতে খাঁকে দেওয়া হল প্রাণদণ্ড।

১৩ই মার্চ প্রধান সেনাপতি ফিল্ড-মার্শাল অকিনলেকের আদেশে শেষ পর্যন্ত ১৪ বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড। ১৮ই মার্চ জমাদার পূরণ সিংকে দেওয়া হল ৭ বছরের কারাদণ্ড।

এদিকে শুরু হল ঐতিহাসিক নৌ-বিদ্রোহ। সেই সঙ্গে রয়েল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের (আর. আই. এ. এফ.) বৈমানিক-বিদ্রোহ, জব্বলপুরের সেনা-বিদ্রোহ, দেরাদুনে অবস্থিত গুর্খা রেজিমেণ্টের বিদ্রোহ ইত্যাদি নানাবিধ বিদ্রোহের ঘটনা।

নৌ-বিদ্রোহ প্রথমে শুরু হয়েছিল বম্বেতে। তারপর একে একে করাচী, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তম, কলকাতা ইত্যাদি প্রতিটি নৌ-বন্দরে।

ব্রিটিশ মুখপাত্রের ভাষায়ঃ

'এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে নৌ-বহরে সাংঘাতিক বিদ্রোহ ও অন্যান্য দুটি বাহিনীতে ফেটে-পড়া অসন্তোষের পেছনে আই. এন. এ.-র বেশ কিছুটা প্রভাব ছিল।'

'...There can be little doubt that the serious naval mutinies and the unrest in the other two services early in 1946, owed something to its (I.N.A.) influence.' [Hugh Toye: P.—170]

একই সুর শোনা গেল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এট্‌লীর কণ্ঠে। ভারতবর্ষের সর্বত্র আজ জাতীয় ভাবধারা ছড়িয়ে পড়েছে। যে সব ভারতীয় সৈনিক যুদ্ধে আশ্চর্য কৃতিত্ব দেখিয়েছিল, তাদের মধ্যেও এর সংক্রমণ বোধ হয় কম নয়।

'...India is in a state of great tension and this is indeed a critical moment...To-day I think that the national idea has spread right through not the least perhaps among some of those soldiers who had rendered such wonderful service in the war.'

ভারত-সচিব লর্ড পেথিক লরেন্সের বক্তব্য আরো স্পষ্ট। '1946 will be a crucial year in India's history.'

নৌ-বিদ্রোহীদের দাবী-দাওয়ার মধ্যে দুটি দাবী ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। এক—সমস্ত আজাদী বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। আর—ইন্দোচীনের স্বাধীনতা হরণের উদ্দেশ্যে ফরাসীদের সাহায্য করার জন্য যে সব ভারতীয় সৈন্য পাঠানো হয়েছে, তাদের সবাইকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

প্রথমেই গ্রেপ্তার করা হল বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক রেডিও অপারেটার বলাই দত্তকে। অপরাধ—তিনি নাকি নৌ-শিক্ষাসংস্থা 'তলোয়ার'-এর এখানে-ওখানে 'জয় হিন্দ্' ধ্বনিটি লিখে রেখেছিলেন নিজের হাতে।

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহীরা সে খবর অন্যান্য জাহাজে ছড়িয়ে দিলেন বেতারের সাহায্যে। সংগ্রাম আসন্ন। সবাই প্রস্তুত হও।

বয়েসের দিক থেকে সবাই তরুণ। কারোরই বয়েস কুড়ি-বাইশের বেশি নয়। রাজনীতি সম্বন্ধেও কারোরই ধারণা খুব একটা স্পষ্ট নয়। তাদের

মধ্যেই একটি মুসলিম তরুণ এম. এস. খানকে করা হল সংগ্রাম-পরিষদের সভাপতি। সহ-সভাপতি মদন সিং।

প্রথমেই সমস্ত জাহাজ থেকে ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে তার জায়গায় তোলা হল কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা। রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভির নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখা হল—ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল নেভি। হেড-কোয়ার্টার্স করা হল সবচাইতে আধুনিক ফ্ল্যাগশিপ—নর্মদাতে।

মোট চল্লিশ হাজার বিদ্রোহী নৌ-সেনা। সবার মুখে এক কথা। কামানের জবাব আমরা কামান দিয়েই দেব। বুঝিয়ে দেব যে, এ ভারত সে ভারত নয়।

তাই দিয়েছিল মল্লিকা। বম্বে—করাচী সর্বত্রই ওরা জবাব দিয়েছিল সমানে সমানে। মরেছে। মেরেছেও।

অন্যতম নায়ক বলাই দত্তর লেখনী থেকেই তার কিছু বিবরণ তোমাকে শুনিয়ে দিই ঃ

'ডক-ইয়ার্ডে অথবা ক্যাসেল ব্যারাকে প্রবেশ করার জন্য ব্রিটিশ টমীদের সব রকম প্রচেষ্টাই প্রতিহত করা হল। যে-সব জায়গা থেকে আক্রমণের আশংকা ছিল, জাহাজ থেকে সে-সব জায়গায় বিশেষ করে ওয়ার্লিকান কামানের গোলা ছোঁড়া হল। বেলা আড়াইটা অবধি বিক্ষিপ্তভাবে ছোট আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলী-গোলা চলছিল—মাঝে মাঝে গ্রেনেড বোমাও ছোঁড়া হচ্ছিল।

সেই সময়ে গডফ্রের (নৌ-বাহিনীর সর্বোচ্চ অফিসার) গলা শোনা গেল অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে। তিনি বললেন ঃ সরকারের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা হবে বিদ্রোহ দমনে, তাতে সমস্ত নৌ-বহর ধ্বংস করতে হলেও দ্বিধা করা হবে না।' [নৌ-বিদ্রোহ ঃ বলাইচন্দ্র দত্ত ঃ পৃঃ ৬০]

ভ্রূক্ষেপও করলেন না নৌ-বিদ্রোহিগণ। মোট আটাত্তরটা জাহাজ তখন তাঁদের দখলে। ব্রিটিশের হাতে রয়েছে মাত্র দশটা। তাহলে ভাবনার কি আছে ?

'The mutiny, in fact, involved the whole navy (R.I.N.). Seventy-eight ships of various description stationed in Bombay, Karachi, Madras, Calcutta, Cochin, Vizagapatam, Mandapam, Aadamans and almost all naval shore establishments in the country joined the mutiny.

Only ten ships and two shore establishments of the R.I.N. remained unaffected.' [The Indian National Army : Dr. K. K. Ghosh : P.—232]

কিন্তু জাহাজে পানীয় জল নেই। খাবার-দাবারও যথেষ্ট নেই। এ অবস্থায় কতদিন আর লড়াই চালানো সম্ভব ? উত্তর দিয়েছিল বম্বের সাধারণ মানুষ। শ্রীযুক্ত দত্তর ভাষায় ঃ

'শহরে গুজব রটে গেল, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আমাদের অভুক্ত রাখার মতলব

করেছে। জনসাধারণ ছুটে এল আমাদের বিপদ থেকে মুক্ত করতে। সর্বস্তরের লোক এসে জড় হল সমুদ্রতীরে, কারো হাতে খাবারের প্যাকেট, কারও হাতে খাবারজল ভরা পাত্র।

রেস্তরার মালিকরা জনগণকে অনুরোধ করতে লাগল—যত খুশি খাবার তুলে নিয়ে অবরুদ্ধ বিদ্রোহীদের দিয়ে আসতে। রাস্তার ভিক্ষুকরা ক্ষুদে ক্ষুদে প্যাকেট নিয়ে পোতাশ্রয়ের সামনের দিকে এগিয়ে আসছে দেখতে পাওয়া গেল—সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য!

সমস্ত এলাকায় সশস্ত্র ভারতীয় সৈন্যেরা টহল দিয়ে ঘুরছিল। ব্রিটিশ সৈন্যরা তৈরি হয়েছিল একটু তফাতে। হাজার হাজার বম্বের নাগরিক খাবারের প্যাকেট সঙ্গে এনে সমুদ্রকূল অবরোধ করে ফেলল। কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে ভারতীয় সৈন্যরা ঐ সব খাবারের প্যাকেট, জাহাজ থেকে পাঠানো ছোট নৌকোয় তুলে দিতে সাহায্য করছিল। ব্রিটিশ সৈন্যরা অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে দেখছিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে 'তলোয়ার'-এর প্রাচীরের ওপর দিয়ে টপকে আসা এত খাবারের পার্শেল পেলাম যে, আমাদের ১,৫০০ সৈনিকের কয়েক-দিন খাবার পক্ষে যথেষ্ট।' [পৃঃ ৫৯-৬০]

সে কি ভয়ংকর অবস্থা তখন বম্বে মহানগরীতে! শুধু জাহাজেই নয় লড়াই চলছে পথে-ঘাটে, অলিতে-গলিতে সর্বত্র। একদিকে ব্রিটিশ বাহিনী, অন্যদিকে জনসাধারণ।

'ভারতীয় সৈন্যদের সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে নিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল। মেশিনগান এবং ট্যাঙ্কের সাহায্য নিয়ে টমীদের ব্যাটেলিয়ানগুলি রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। জনসাধারণের হাতে কোন অস্ত্র ছিল না। তারা রাস্তা খুঁড়ে যেমন-তেমনভাবে ব্যারিকেড তৈরি করে তার পেছন থেকে পাথর ছুঁড়ছিল।

...জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বম্বের খেটে-খাওয়া লোকগুলি সবাই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল। একটি দোকানও লুঠ করেনি। একটি ঘরও জ্বালানো হয়নি।...তারা কামানের গোলার সম্মুখীন হয়েছিল পাথর নিয়ে—তারা গুলীর আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগল। এই মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা কখনো প্রকাশ করা হয়নি। মৃত ও আহতের সংখ্যা ছিল চারশত থেকে আটশতের মধ্যে। বম্বেতে এর আগে একদিনে এত লোক প্রাণ বিসর্জন দেয়নি।'

[পৃঃ ৬৬-৬৭]

বেগতিক দেখে সাদার্ণ কম্যাণ্ডের জি. ও. সি. ভার গ্রহণ করলেন বম্বে মহানগরীর। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এট্‌লী ঘোষণা করেছেন—কোন ভয় নেই। বিলেত থেকে রয়েল নেভির জাহাজগুলো পূর্ণ গতিতে এগিয়ে আসছে বম্বের দিকে। সুতরাং মাভৈঃ!

ওদিকে তখন 'হিন্দুস্থান' জাহাজ প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে চলেছে করাচীতে।

তীরে অবস্থিত গোর্খা বাহিনী নির্বিকার। সরকার বাহাদুর যা-ই বলুক

না কেন, ওদের প্রতি পাল্টা-গোলাবর্ষণ করতে তারা রাজী নয়। ফলে তাদের সরিয়ে এবার আনা হলো ব্রিটিশ বাহিনীকে।

পরিস্থিতি লক্ষ্য করে রীতিমত ভয় পেয়ে গেল সাম্রাজ্যবাদী দল। কি ভয়ঙ্কর কথা! এতবড় নৌ-বিদ্রোহ, এ যে চিন্তাও করা যায় না। চিরদিনের শান্ত নির্বিরোধী মানুষগুলি এত শক্তি আজ কোথা থেকে পেল?

উত্তর পাওয়া গেল 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া'র পাতায়। এসবের মূলে রয়েছে আই. এন. এ.। ঐ আই. এন. এ.-ই হল যত নষ্টের শনিঠাকুর।

'As a result of the extravagant glorification of the I.N.A. following the trials in Delhi, there was released throughout India a flood of comment which had inevitable sequel in mutinies and alarming outbreaks of civil violence in Calcutta, Bombay, Delhi and elsewhere'... [Times of India: 18.2.45]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বক্তব্যও তাই। তাদের অভিমত, সব কিছুর জন্য দায়ী হল জাপ-সমর্থক সুভাষ বোস। ঐ লোকটাই হিন্দু-মুসলমানকে এক করে দিয়ে এসব গোলমাল পাকিয়ে তুলেছে।

'...stimulated by the propaganda of Chandra Bose, the pro-Japanese leader who had won followers among Moslems and Hindus alikes...' [New York Times: 18.2.46]

এদিকে তখন সংগ্রাম-পরিষদের সভাপতি এম. এস. খান এবং অন্যান্য কয়েকজন হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের কাছে। আমরা প্রস্তুত। আপনারা এগিয়ে এসে আমাদের এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দিন।

দেখা গেল, ছোট ছোট বামপন্থী দলগুলি রাজী থাকলেও বড় দলগুলির মধ্যে কেউ এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী নয়। সবাই যেন পাশ কাটিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত।

প্রথমেই তাঁরা গেলেন বিয়াল্লিশের আন্দোলনের নায়িকা শ্রীমতী অরুণা আসফ আলীর কাছে। কিন্তু জরুরী কাজের দরুন তাঁর পক্ষে বম্বে অবস্থান করা সম্ভব হল না। বলাই দত্তর ভাষায়ঃ

'এক নেতা থেকে অন্য নেতার কাছে ধাক্কা খেয়ে ঘুরতে লাগল খান এবং এন-সি-এস-সি-র কিছু সভ্য। লাভ হলো কিছু শুকনো উপদেশ।'

উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে নৌ-বিদ্রোহিগণ তখন কিছুটা দিশেহারা। কি করা যায় এ পরিস্থিতিতে। কার কাছে যাওয়া যায়?

শেষ পর্যন্ত গিয়ে হাজির হলেন কংগ্রেসের লৌহমানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কাছে। আপনি আমাদের নেতৃত্ব দিন। আমাদের সমর্থন করুন।

কি জবাব দিলেন সর্দার প্যাটেল! শ্রীযুক্ত দত্তর মুখ থেকেই সেকথা শোনা থাকঃ

'সর্দার প্যাটেল আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করলেন, যেন আমরা একদল উগ্রমস্তিষ্ক যুবক এসে জগাখিচুড়ি পাকাচ্ছি এমন সব ব্যাপারে

যাতে আমাদের নাক গলাবার কথা নয়।—Bunch of young hotheads messing with things they had no business in.'

উল্লেখযোগ্য যে, সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেউ সেদিন এতটুকু সহানুভূতি জানাননি নৌ-বিদ্রোহীদের প্রতি। কি গান্ধীজী, কি জওহরলাল—কেউ না।

নৌ-বিদ্রোহীদের সমর্থনে বম্বেতে হরতাল ডাকা হয়েছে শুনে জওহরলাল তখন রীতিমত ক্ষিপ্ত।

তাঁর বক্তব্য ঃ 'স্ট্রাইক কমিটির এভাবে ধর্মঘট ডাকার কোন অধিকার নেই। সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে অগ্রাহ্য করে কোন্ অধিকারে তারা হরতালের আবেদন জানায়?' যদিও এর আগে কারো দরজারই ধর্ণা দিতে বাকী রাখেননি সংগ্রাম পরিষদের সদস্যবৃন্দ।

নিন্দা করলেন গান্ধীজীও ঃ 'Why sholud they continue to serve, if service is humiliating for them or India.' সোজা কথায়—অসম্মানজনক মনে হলে চাকরি ছেড়ে দিলেই তো হয়?

তবে আসল কথাটি কিন্তু নৌ-বিদ্রোহীদের জানিয়ে দিতে ভোলেননি সর্দার প্যাটেল। তোমরা সবাই ফিরে গিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আত্মসমর্পণ করো। তোমাদের দাবী-দাওয়া এবং যাতে তোমাদের কারো সাজা না হয়, সেটা আমরা অবশ্যই দেখব।

কলকাতা থেকে প্রায় একই ধরনের বার্তা পাঠালেন মুসলিম লীগ-প্রধান মহম্মদ আলী জিন্না।

'আর. আই. এন.-এর লোকদের উপর যাতে ন্যায় বিচার হয়, তার জন্য আমি অকুণ্ঠভাবে লক্ষ্য রাখব। তারা যদি আইনসংগত এবং শান্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বন করে থাকে—এবং তারা যদি আমাকে জানায় কিসে তারা সন্তুষ্ট হবে, তাহলে তাদের আশ্বাস দিচ্ছি, তাদের অভিযোগ পূরণের জন্য আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আর. আই. এন.-এর লোকদের কাছে আমি আবেদন জানাচ্ছি ধর্মঘট তুলে নেবার জন্য। বিশেষ করে মুসলমানদের অনুরোধ করছি ধর্মঘট বন্ধ করতে।'

লক্ষ্য করো মল্লিকা, ভাষা খুবই সহানুভূতিপূর্ণ। আন্তরিকতারও অভাব নেই। কিন্তু ঐ শেষের লাইনটি কেন? বিশেষ করে মুসলমানদের কাছে আবেদন করার অর্থ কি? তাহলে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা এবং অবিশ্বাস সৃষ্টির জন্য দায়ী কে? সহজ সরল হিন্দু-মুসলমান, না কি তাদের নেতৃবৃন্দ?

উল্লেখযোগ্য যে, সংগ্রাম-পরিষদের সভাপতি এম. এস. খান নিজেই একজন মুসলমান। কই, তাঁর মনে বা অন্য কারো মনে এ নিয়ে তো কোন প্রশ্ন ওঠেনি!

যাক, অনিচ্ছাসত্ত্বেও আত্মসমর্পণের সেই নির্দেশ মেনে নিতে হল বিদ্রোহিগণকে। না মেনে উপায়ও ছিল না। কারণ, কংগ্রেস এবং লীগ উভয় দলেরই নির্দেশ ছিল তাই।

ঐতিহাসিক নৌ-বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ১৮ই ফেব্রুয়ারি। শেষ হল ২২শে ফেব্রুয়ারি। তার আগে জনগণের উদ্দেশে একটি বিবৃতি প্রচার করা হল সংগ্রাম-পরিষদের পক্ষ থেকে:

'কেন্দ্রীয় নৌ-ধর্মঘট কমিটি ভারতের জনগণকে—বিশেষ করে বম্বের জনগণকে জানাতে চান যে, ধর্মঘট কমিটি ধর্মঘট তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা করার পরেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি (প্যাটেল) তাঁদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, কোন প্রকারেই কোন ধর্মঘটীকে পরে যাতে শাস্তি পেতে না হয়, কংগ্রেস তা দেখবে, তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। কংগ্রেস তাদের পাশে এসে দাঁড়াবে। মিঃ জিন্নার সহানুভূতিপূর্ণ বিবৃতির পরে মুসলিম লীগের সমর্থনের নিশ্চয়তার ওপরে নির্ভর করেও কমিটি স্থির করেছে ধর্মঘট উঠিয়ে নিতে।'

কিন্তু তারপর! সে কলঙ্কিত অধ্যায় ব্যক্ত করার ভার আমি নৌ-বিদ্রোহের অপর অংশীদার শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ ভট্টাচার্যের ওপরই ছেড়ে দিলাম:

'বেতার-সঙ্কেতে সমস্ত সেণ্টারে সংবাদ দেওয়া হলো যুদ্ধ বন্ধ করতে। স্ট্রাইক কমিটির ওপরে সকলের আস্থা ছিল। তাঁরা যখন বললেন, তখন আর দ্বিধা না করে সকলেই যুদ্ধ থামালো।

জাতীয় নেতারা দায়িত্ব নিয়েছেন। বিদ্রোহীরা তো পূর্বেই তাঁদের আহ্বান করেছিল দখলিকৃত সমস্ত নৌ-বহরের দায়িত্ব নিতে। যে কারণেই হোক, প্রথমে তাঁরা আসেননি। এখন এসে যখন দায়িত্ব নিয়েছেন, তখন আর তাদের (বিদ্রোহীদের) আনন্দ ধরে না।

সবাই তখন আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছে। মিষ্টি এনে বিতরণের ব্যবস্থা হচ্ছে। সকলে কোলাকুলি করছে। অনেককে দেখা গেল স্ট্রাইক কমিটির সভাপতি মিঃ এম. এস. খানকে কাঁধে তুলে নিয়ে আনন্দে নৃত্য করছে। চতুর্দিকে আনন্দের হিল্লোল বইছে। আজ যে আনন্দের বাঁধ ভেঙেছে।

...বিকেল চারদে নাগাদ দেখা গেল, ছোট ছোট কতকগুলো যুদ্ধ-জাহাজ গোরা সৈন্য বোঝাই করে আস্তে আস্তে বিদ্রোহী জাহাজগুলোকে ঘিরে ফেলতে লাগল। ঐ জাহাজগুলোতেও শান্তির পতাকা উড্ডীন ছিল।

...প্রথমে ভুল করে সকলে মনে করল দূরে যে-সব আমাদের সমসাথী বিদ্রোহী জাহাজ ছিল তারাই এবারে শান্তির আনন্দে যোগ দেবার জন্যে তীরের দিকে এগিয়ে আসছে। তীরের দিকের সকলেই তাদের সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছিল।

হ্যাঁ, তারা বিপ্লবীদের সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করেছে ঠিকই, তবে ঐ সাদর সম্ভাষণ গ্রহণকারী জাহাজগুলো প্রীতি-সম্ভাষণ জানালো কামানের গোলা আর বড় বড় ম্যাসকেট্রির অজস্র গুলীর দ্বারা।

সবাই তো হতবাক, একি! নেতাদের কথার মূল্য কোথায়?...আশ্চর্য, এই বিপদের সময়ে কোন নেতাই এলেন না!...

মরিয়া হয়ে বিদ্রোহীরা আপ্রাণ চেষ্টা করলো তাদের পূর্ব মোহকে কাটাতে। আবার তারা গেল কামান-বন্দুকের কাছে। আবার ধরলো দূরে সরানো অস্ত্রগুলো—ভাঙা হাট জোড়া লাগাতে। কিন্তু ইতিমধ্যেই হঠাৎ আক্রমণে বিদ্রোহীদের দেড়শ' জন মারা গেলেন।

মিঃ মদন সিং ঝড়ের বেগে 'খাইবার' জাহাজের বেতার-যন্ত্রের কাছে ছুটে গিয়ে আবার যুদ্ধের কথা ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন—পেছনে দিয়ে অতর্কিতে কাপুরুষ ব্রিটিশরা আমাদের আক্রমণ করেছে। ওদের ক্ষমা নেই। শান্তির পতাকা এখন গড়াগড়ি যাচ্ছে। প্রতিটি গোরা সৈন্যকে খতম করার সঙ্কল্প নাও। ডু অর ডাই!

তারপর তিনি একদিকে দৃঢ়হস্তে 'খাইবার'-এর দূরপাল্লার বড় কামানের চাবিকাঠি হাতে নিয়ে চার্জ দিয়ে ঘন ঘন কামান দাগাতে থাকেন,—থ্রি ডিগ্রিস অব রেঞ্জ ওয়ান জিরো টু অট্-অট্—অট্ থ্রি রেড-শ্যালভো..., আবার মাইক্রোফোনে লাউড-স্পীকারে দেশের জনগণের উদ্দেশে উদাত্ত কণ্ঠে আবেদন রাখেন ঃ

'Oh my beloved countrymen! See our national leaders. They are nothing but the traitors of our motherland ; see them —see them—see them.'

[নৌ-বিদ্রোহের ইতিকথা ঃ ফণিভূষণ ভট্টাচার্য ঃ পৃঃ ১৪৫-১৪৭]

ভাবার্থ ঃ হে আমার প্রিয় দেশবাসিগণ, আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দকে তোমরা চিনে রাখো। ওরা বিশ্বাসঘাতক ছাড়া আর কিছুই নয়। ওদের তোমরা চিনে রাখো—চিনে রাখো—চিনে রাখো।

অপ্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে অবশেষে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন বিদ্রোহিগণ। পরের কাহিনী শ্রীযুক্ত বলাই দত্তর লেখনী থেকেই তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি ঃ

'কেউ কখনো জানতেও পারেনি কত হাজার জনকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল, কি ধরনের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল তাদের। এমন কি রেটিংরাও জানতে পারেনি একে অন্যের ভাগ্যে কি ঘটেছিল। আমার হিসাবমতে, দু হাজারেরও বেশি রেটিংকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল জাহাজ ও ব্যারাক থেকে—কয়েক মাস ধরে তাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল। পাঁচশতের মত লোককে কারাবাসের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। সাধারণ কয়েদীদের মত তারা ভোগ করেছিল কারাবাস। এমন কি রাজনৈতিক কয়েদীর মর্যাদা থেকেও তাদের বঞ্চিত করা হয়েছিল। সমস্ত ন্যায়সঙ্গত পাওনা থেকে বঞ্চিত করে জেল থেকে তাদের যার-যার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারা নিমজ্জিত হল বিস্মৃতির অতলে।'

কোথায় তখন কংগ্রেস বা লীগ! কোথায় তাদের প্রতিশ্রুতি! না, প্রতিশ্রুতিমত কেউ সেদিন এসে দাঁড়ায়নি এই হতভাগ্যদের পাশে। বরং ১৫ই

মার্চ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক এক প্রস্তাব গৃহীত হল এসব হিংসাত্মক কাজের নিন্দা করে।

কিন্তু কেন? সুভাষ এবং আই. এন. এ.-কে কেন্দ্র করে সেদিন ভারতবর্ষ সত্যিই যে একটা বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, সেকথা তো মিথ্যে নয়।

শুধু জনসাধারণ নয়, সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী—কেউ তার বাইরে ছিল না। স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ নিজেও স্বীকার করেছেন একথা। বলেছেন:

'A most remarkable change had in the meantime come about in all the public services...all the three branches of the Armed Forces—they Navy, the Army and the Air Force—were inspired by a new spirit of patriotism...these sentiments were wide-spread, not only among officers but also among the ranks.'

তাহলে সুভাষ এবং আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সেই অসাম্প্রদায়িক বৈপ্লবিক ভাবধারাকে কেন এমন করে প্রতিহত করা হল? যে কংগ্রেস দুদিন আগেও বন্দীমুক্তির প্রশ্নে প্রশংসনীয়ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, হঠাৎ কেন তার এই বিস্ময়কর পরিবর্তন? কি এর কারণ?

কারণ—ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এট্লী প্রদত্ত একটি রঙীন টোপ! এ টোপ ফেলা হয়েছিল আরো মাস দুয়েক আগে—ডিসেম্বর মাসে। নেপথ্যে অনুষ্ঠিত সেই নাটকটাকে বুঝতে হলে আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে হবে মল্লিকা।

বিক্ষোভের আগুনে ভারতবর্ষ তখন জ্বলছে। সর্বত্র এক রব। আজাদী বন্দীদের মুক্তি চাই। তাদের সাজা দিলে কোনরকমেই আমরা তা সহ্য করব না।

দেখে-শুনে ঘুম ছুটে গেছে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সদস্যদের। এ যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার। এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?

সবচাইতে বেশি ভাবিয়ে তুলেছে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল এবং প্রধান সেনাপতি ফিল্ড-মার্শাল অকিনলেক-প্রেরিত সিক্রেট রিপোর্টগুলি। বড়লাট স্পষ্টই জানিয়েছেন যে, পরিস্থিতি ভারতবর্ষের সর্বস্তরের মানুষের কাছে ব্রিটিশ সরকারকে অত্যন্ত অপ্রিয় করে তুলেছে।...'The changed situation in India and the growing unpopularity of the Government among all sections.'...

প্রধান সেনাপতি ফিল্ড-মার্শাল অকিনলেক-প্রেরিত রিপোর্টটি আরো মারাত্মক।

যুদ্ধের আগে সেনাবাহিনীতে ভারতীয় অফিসারের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৯৬

জন। যুদ্ধের প্রয়োজনে সে সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬,৭০৪ জনে। সৈন্যসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। অফিসার এবং সৈন্য মিলিয়ে ২২ লক্ষ ৫০ হাজার।

তাছাড়া ৫,২০০ জন রয়েছে বিমান-বাহিনীতে। নৌ-বাহিনীতে ৩৩ হাজারের চাইতেও বেশি। গোপন সমীক্ষায় জানা গেছে যে, এদের মধ্যে প্রতি ৮০ জনের ৭৬ জনই নাকি আজাদী সৈন্যদের বিচারের বিরোধী। আরো জানা গেছে যে, সেনাবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে প্রায় সবাই নাকি মত প্রকাশ করেছেন স্বাধীনতার পক্ষে। সৈন্যদের মধ্যেও শতকরা ৭৫ জন।

এই বিরাট সংখ্যা নিয়ে আজ যদি তারা সবাই রুখে দাঁড়ায়, তাহলে তাকে প্রতিহত করার মত শক্তি বিধ্বস্ত প্রায় বিটিশ বাহিনীর এখন কোথায়, ঝড়ের মুখে খড়কুটোর মত উড়ে যেতে হবে না ?

সেই অনিবার্য দুর্যোগকে এড়াতে হলে আজ হোক বা কাল হোক, শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরিত করতেই হবে।

কিন্তু কার হাতে ?

বিচার করে দেখতে হবে যে, কবে, কিভাবে, কার হাতে শাসনক্ষমতা হস্তান্তরিত করলে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ স্বার্থ অপেক্ষা-কৃত নিরাপদ। এমনভাবে এগুতে হবে, যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে। তার জন্য আপাতত চাই একটি রঙীন টোপ, যার বাইরের চাকচিক্যময় রূপ দেখে সবার যেন চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

৪ঠা ডিসেম্বর সেই রঙীন টোপটির কথা প্রচারিত হল বিলেতের হাউস অফ লর্ডস ভবন থেকে।

শিগগীরই আমরা একটি পার্লামেন্টারী ডেলিগেশন পাঠাচ্ছি ভারত-বর্ষে। তাঁরাই ওখানকার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ঠিক করবেন, ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থ-এর অংশীদার হিসেবে কিভাবে ভারতবর্ষকে আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার দেওয়া সম্ভব।

থমকে দাঁড়াল কংগ্রেস। ডেলিগেশন! পূর্ণ অধিকার! কথাটা তো শুনতে মন্দ নয়! ঠিক আছে, দেখাই যাক না!

৫ই জানুয়ারি (১৯৪৬) সেই ডেলিগেশন এসে হাজির হল রবার্ট রিচার্ডের নেতৃত্বে। বলো, তোমাদের কি চাই ? কি পেলে তোমরা খুশি হও ?

কংগ্রেসের উত্তর ঃ আমরা চাই অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা।

লীগের দাবী ঃ উঁহু, ডিভাইড এ্যাণ্ড কুইট্। আগে ভারতবর্ষকে ভাগ করে আমাদের ন্যায্য পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দাও, তারপর বিদেয় হও। কংগ্রেস যা-ই বলুক না কেন, পাকিস্তান আমরা চাই-ই।

'Pakistan is our deliverance, defence, destiny. Pakistan is our only demand and we wils have it."

অতি নায্য দাবী। সমর্থন জানাল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। লীগের এ দাবী খুবই যুক্তিসঙ্গত। আসলে ভারতব্যাপী এই অসন্তোষের জন্য

কংগ্রেসই দায়ী। কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী পি. সি. যোশীর ভাষায় ঃ

'কংগ্রেস ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চায়, লীগ চায় তাদের নিজস্ব মুসলিম দেশের স্বাধীনতা। একদিকে ব্রিটিশের কাছে স্বাধীনতা দাবী করা, অন্যদিকে আমাদেরই স্বদেশবাসীর সেই স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা অত্যন্ত অবিচার।

কংগ্রেস নেতৃত্ব ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে মুসলমানদের নিজস্ব মুসলিম রাষ্ট্রের স্বাধীনতা স্বীকার করতে অনিচ্ছুক। অখণ্ড ভারতের অজুহাতে কংগ্রেস দুটি রাজনৈতিক দলকে পৃথক করে রেখেছে। আমাদের মতে অখণ্ড ভারতের নামে মুসলমান ভাইদের সঙ্গে লড়াই করাটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়।

'The Congress stands for freedom of India, the League demand freedom for Muslim Home-lands. To demand the right of self-determination from British but to deny it to a section of our own countrymen is a plain injustice.

In the name of Indian freedom the Congress leadership is denying freedom of Muslim Home-lands. In the name of unity of India it is keeping divided India's two main political organisations...we do not consider it good sense to fight out brother Muslims in the name of Indian unity.'

অপরপক্ষে একেবারে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করলেন পণ্ডিত জওহরলাল। কংগ্রেস কিছুতেই লীগের পাকিস্তান দাবী মানবে না, এমন কি ব্রিটিশ সরকার রাজী থাকলেও না। পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, এমন কি রাষ্ট্রসংঘেরও এমন শক্তি নেই যে, জিন্নাকে তাঁর খুশি মত পাকিস্তান এনে দিতে পারে।

'The Congress is not going to agree to the League demand for Pakistan under any circumstances what so ever—even if the British Government agrees to it.

Nothing on earth, not even U.N.O. is going to bring about Pakistan that Mr. Jinnah wants.'

১০ই ফেব্রুয়ারি ডেলিগেশন ফিরে গেল নিজের দেশে। চোখে-মুখে তাদের বিজয়ীর হাসি। টোপ ফেলা সার্থক হয়েছে। দেখা যাক, এবার কোথাকার জল কোথায় গিয়ে গড়ায়।

লর্ডস্ হাউসের পরবর্তী অধিবেশনে বিস্তর সহানুভূতিপূর্ণ বাণী বর্ষিত হল ভারতবর্ষের উদ্দেশে।

আমরা তো কবে থেকেই ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবার জন্য প্রস্তুত। এখন শুধু তোমাদের নেবার অপেক্ষা মাত্র।

সেই সঙ্গে করা হল ছোট্ট একটি অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত, যার ভাবার্থ হল—বাপু হে, একটু সমঝে চলো। কি কংগ্রেস, কি মুসলিম লীগ—দুই-ই আজ

আই. এন. এ.-র সম্মোহনে প্রভাবিত। এ সময়ে একটু বুঝে-সুঝে না চললে সমস্ত ক্ষমতা যে গান্ধীজীর হাত থেকে ঐ সুভাষ-সমর্থকদের হাতে চলে যাবে, সেটা একবার ভেবে দেখেছ কি?

'...both Congress and the Muslim League are being dominated by the Indian National Army movement...

Indian situation is such that before long the initiative could pass out in the hands of Gandhi to those who believe in Bose's doctrine.' [19 February, 1946]

সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে গেল কংগ্রেস। তাই তো! কথাটা ভেবে দেখার মত। ভারতবর্ষে সুভাষ এবং আই. এন. এ.-র বৈপ্লবিক ভাবধারা যে দিনকে দিন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে একথা অনস্বীকার্য।

এদিকে স্বাধীনতা আগতপ্রায়। এ সময়ে ওদের সমর্থন জানাতে গেলে শেষে যে শাসন-ক্ষমতা হাতছাড়া হয়ে যাবে না, তা কে বলতে পারে! না, আর সুভাষ নয়। আই. এন. এ.-ও আর নয়।

তা ছাড়া দরকারই বা কি! নির্বাচন এবং জনসংযোগ—দুটোতেই কংগ্রেসের এখন জয়-জয়কার। সুতরাং—হটাও। সুভাষ, আই. এন. এ.—সবাইকে হটাও।

পরবর্তীকালে কাজেও যে তাই করা হয়েছিল সেকথা তো তুমিও জানো। প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি ব্যাপারে সেই একই প্রচেষ্টা। সুভাষকে ইতিহাসের পাতা থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। তাকে জনসাধারণের মন থেকে একেবারে মুছে ফেলতে হবে। সর্বতোভাবে তাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করতে হবে।

এমন কি সুভাষের ছবিটার উপর পর্যন্ত রাগ। তার ওপরও হরেক রকম বিধি-নিষেধ। সরকারী ক্যানটিন, কোয়ার্টার্স, রিক্রিয়েশন রুম—কোথাও সুভাষের ছবি রাখা চলবে না। হটাও।

এ আমার মনগড়া কথা নয় মল্লিকা। একটি মাত্র নজীর আমি এখানে তুলে ধরছি তোমার সামনেঃ

Confidential

M. 155211.1
H. Q. Bombay Sub-area
Colaba, Bombay-6
11th Feb. 1949

Subject—PHOTOS

It is recommended that Photos of Netaji Subhas Chandra Bose be not displayed at prominent places in Unit Line, Canteens, Quarters Guard or Recreation Rooms.

Sd|—Major General Staff.
P. N. Khanduari.
Tel. 35081 Extn. 41

P.N.K.V.L.

সুভাষ আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নাম রেখেছিলেন স্বরাজ-দ্বীপ এবং শহীদদ্বীপ। উঁহু, ও নাম চলবে না। তার চাইতে আগেকার নামই ভাল।

আর ঐ আজাদী সৈনিকের দল ?

না, ওদেরও আর সেনাবাহিনীতে ফিরিয়ে নেওয়া হবে না। কোন সরকারী চাকুরিতেও ঢুকতে দেওয়া হবে না। রাজনীতির ক্ষেত্রেও ওদের মাথা তুলতে দেওয়া হবে না। সব হটাও।

বুদ্ধি দিয়েছেন প্রধান সেনাপতি ফিল্ড-মার্শাল অকিনলেক। আজাদী সৈনিকদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে পরে কিন্তু পস্তাতে হবে। শুধু সেনা-বাহিনী নয়, রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভি, রয়েল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স—সবাইকে সামলানো তখন কষ্টকর হবে। তাঁর নিজের ভাষায়ঃ

'In this connection, it must be realized that it is not only the men of the Army who may be affected but also those of the Royal Indian Navy and the Royal Indian Air Force, neither of which Forces are for reasons, which I need not go into, as stable nor reliable as the Army.

...maintaining the discipline and reliability of the Armed Forces extremely difficult.'

পরামর্শ বৃথা যায়নি, তাই একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন পণ্ডিত জওহর-লাল। ওরা পাবলিক ওয়ার্ক করুক। গ্রাম-পঞ্চায়েতে কাজ করতেও বাধা নেই। তবে রাজনীতিতে কিছুতেই নয়। আর সেনাবাহিনীতে ফিরিয়ে নেবার তো প্রশ্নই ওঠে না।*

'He (Nehru) suggested that they would be absorded in the public works, such as industrial co-operatives and village works. He wanted them to be kept out of politics and made no hint of any possibility of their being reinstated in the Indian army before or after the transfer of power.'

[The Indian National Army: Dr. K. K. Ghosh: P.—249]

এ প্রসঙ্গে সম্প্রতি প্রকাশিত মেজর জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরীর বক্তব্যও তোমার সামনে তুলে ধরছিঃ

'আই. এন. এ.-র লোকজনকে সশস্ত্র বাহিনীতে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে পণ্ডিতজী জেনারেল চৌধুরী সমেত তিনজনের পরামর্শ চান। আমরা বলে-ছিলাম, ওদের সশস্ত্র বাহিনীতে ফেরত নিলে ফল ভাল হবে না। পণ্ডিতজী বলেন, আমি আপনাদের যুক্তির সঙ্গে একমত নই। তবে সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত।' [আনন্দবাজার ঃ ১৪. ৫. ৭৩]

---

* উল্লেখযোগ্য যে, গান্ধীজীও সেদিন আজাদী সৈনিকদের গাঁয়ে ফিরে গিয়ে চাষ-আবাদ করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন।

রেখে-ঢেকে কথা বলার মানুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল নন। পরবর্তীকালে স্পষ্টই তিনি স্বীকার করেছেন যে, হ্যাঁ, সুভাষ বোসের আই. এন. এ.-র কোন লোক যাতে সরকারী চাকরিতে ঢুকতে না পারে সে সম্বন্ধে আমি খুবই সতর্ক ছিলাম। আমার আরো লক্ষ্য ছিল, ওরা যেন কোনমতেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মাথা তুলতে না পারে।

'Sardar Patel, India's first Home-Minister, explained to me in 1950 that he had been very careful indeed not to re-instate any of the officers who had gone over to Subhas Bose's I.N.A.

He also saw to it that they did not thrive in politics.'

[Reporting India: Taya Zinkin: P.—14-15]

কিন্তু কেন? আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অপরাধ কি?

অপরাধ—তারা আনুগত্য ভঙ্গ করেছে।

কাদের প্রতি আনুগত্য ভঙ্গ করেছে?

ব্রিটিশ সরকারের প্রতি।

আর যারা আজাদ হিন্দ্ সরকারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে ব্রিটিশ-পক্ষে যোগ দিয়েছিল—তারা?

না, তাদের বেলায় সে-সব প্রশ্ন থাকবে না। চাকরির ক্ষেত্রে তাদের উন্নতিও অব্যাহত থাকবে যথারীতি। বরং যারা পালাবার উদ্দেশ্যে আজাদ হিন্দ্ ফৌজে যোগ দিয়েছিল, তাদের দিকটাই বিচার-বিবেচনা করে দেখা হবে সর্বাগ্রে। কারণ, আর যা-ই হোক, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তারা আনুগত্য ভঙ্গ করেনি।

ফিলিপ মেসন-এর ভাষায়ঃ

'It was decided that in the first place those who had joined the I.N.A. with the intention of deserting from it should be classed as white and restored to their former privileges....

মল্লিকা, মাতৃভূমির মুক্তি সাধনের জন্য যাঁরা বুকের রক্তে ইম্ফলের মাটি ভিজিয়ে দিয়েছিলেন, এমনি করেই সেদিন তাঁদের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব কিছু তলিয়ে দেওয়া হয়েছিল বিস্মৃতির অতলে। স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের প্রতি এমন হৃদয়হীন আচরণ পৃথিবীর আর কোথাও তুমি দেখছ কি? শুনেছ কি কোনদিন?

শুধু কি তাই! কি হয়েছিল সেদিন সিঙ্গাপুরে! মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান তাঁর বইতে লিখেছেনঃ

'১৯৪৬ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যখন মালয়ে যান, তখন তিনিও আজাদ হিন্দ্ ফৌজের শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভটি যেখানে ছিল, সেই স্থানটিতে পুষ্পমাল্য দিয়ে এসেছেন। পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে ছিলেন ব্রিটিশ কম্যাণ্ডার-

ইন-চীফ লর্ড মাউণ্টব্যাটেন। শোনা যায় তিনিও নাকি সেখানে পুষ্পমাল্য দিয়েছেন।'

উল্লেখযোগ্য যে, বইটির ভূমিকা লিখেছেন পণ্ডিতজী স্বয়ং। কিন্তু সত্যিই কি সেদিন এমন কোন ঘটনা ঘটেছিল সিঙ্গাপুরে! ইতিহাস কিন্তু বিপরীত কথাই বলে মল্লিকা।

মার্চ মাসে পণ্ডিতজী মালয়ে গিয়েছিলেন একথা ঠিক। সেখান থেকে বন্ধু মাউণ্টব্যাটেনের আমন্ত্রণে সিঙ্গাপুর। কিন্তু কোথায় তখন সুভাষের শেষ আকাঙ্ক্ষার নিদর্শন সেই শহীদ বেদী! না, নেই। তার আগেই মাউণ্টব্যাটেন বেদীটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন ডিনামাইট দিয়ে।

'One of the first of the British after landing in Singapore was to demolish the memorial to the war-dead of the patriotic army—a piece of vandalism without parallel in civilised warfare.' [Story of the I.N.A.: S. A. Ayer: P.—71]

শহীদ-বেদীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যে কোন সভ্য জাতির রীতি। মাউণ্টব্যাটেন যে সেই সভ্য জাতিরই একজন তাতে আর সন্দেহ কি!

কিছুই ভোলেনি সিঙ্গাপুরের মানুষ, তাই রোজই তারা সেই ধ্বংসস্তূপের উপর রাশি রাশি ফুল ছড়িয়ে দিয়ে যেত শহীদদের কথা স্মরণ করে।

দেখে-শুনে জওহরলালও চেয়েছিলেন সেই ধ্বংসস্তূপের উপর একটি মালা দিতে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

তার আগেই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁকে নিরস্ত করেছিলেন বন্ধু মাউণ্টব্যাটেন। কাজটা মোটেই সংগত হবে না। কারণ, আজাদ হিন্দ্ ফৌজ নাকি লড়াই করেছিল স্থানীয় লোকদের বিরুদ্ধে। ব্যস, সমস্ত সদিচ্ছার সেখানেই ইতি।

সেদিন খুবই খুশি হয়েছিলেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন। স্পষ্টই তিনি বুঝেছিলেন যে, জওহরলালই একমাত্র লোক, যাঁর বিচক্ষণতার উপর নির্ভর করা চলে।

'He (Mountbatten) would restrict him in no way, but requested one concession, that Nehru would forego laying a wreath on the War Memorial erected to the Indian National Army because they had fought against the local people.

It was probably the first time Nehru had a clear picture of what happened. Nehru agreed so that Mountbatten's first impression of him was that of his reasonableness.' [Panditji, A Portrait of Jaharlal Nehru: Marie Seton: P.—119]

মল্লিকা, এই একটি-দুটি মাত্র নজীর নয়, ইচ্ছে করলে এমন বহু নজীরই দেখানো যায়, যা সত্যই খুব বেদনাদায়ক।

কিন্তু কি লাভ তালিকা বাড়িয়ে! তার চাইতে আমি বরং ঠিক এর বিপরীত একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি মল্লিকা। এ ঘটনা ঘটেছিল ১৯৪৩ সালের শেষভাগে টোকিওতে অনুষ্ঠিত বৃহত্তর পূর্বএশিয়া সম্মেলনে।

সুভাষকে সংবর্ধনা জানাতে গিয়ে জাপ-প্রধানমন্ত্রী তোজো সেদিন বলেছিলেন—ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পরে হিজ এক্সেলেন্সী চন্দ্র বসুই হবেন সেখানকার রাষ্ট্রনায়ক।

সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে প্রতিবাদ করেছিলেন সুভাষ। বলেছিলেন—মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ উক্তি অত্যন্ত অসঙ্গত। নিজেকে আমি ভারতবর্ষের একজন দীনতম সেবক বলেই মনে করি। ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে কি হবে-না-হবে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার একমাত্র সেখানকার জনগণের। তাছাড়া এ ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পণ্ডিত জওহরলাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দকেই আমি যোগ্যতম লোক মনে করি।

'Premier Tojo in a speech said that Netaji would be all-in-all in Free India. Netaji at once stood up and said that it was not for General Tojo to say that, because it was only the people of India who would decide who was to be who in India.

Netaji told him that he himself was only a humble servant of his country. Mahatma Gandhi, Maulana Abul Kalam Azad and Pandit Jawaharlal Nehru were really the people who deserved to be all-in-all.'

[Maj. Gen. Chatterjee : P.—151]

মল্লিকা, এই সহজ সরল স্বীকৃতির মধ্যে কোথাও সুভাষকে একটুকু ক্ষমতালোভী বলে মনে হয় কি? আছে কি এর মধ্যে কোথাও এতটুকু ক্ষুদ্রতা বা সংকীর্ণতার পরিচয়? তাহলে কেন সুভাষকে কেন্দ্র করে এই অহেতুক সতর্কতা? কেন পদে পদে এই অকারণ ভয়? সত্যই তার কোন প্রয়োজন ছিল কি? যাক, আগেকার প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

প্রথম রঙীন টোপটির কথা তোমাকে আগেই বলেছি। এবার শোন পরবর্তী টোপটির কথা।

১৮ই ফেব্রুয়ারি নৌ-বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল বম্বেতে। ঠিক তার পরদিনই সেই টোপটি ফেলা হল বিলেতের হাউস অফ লর্ডস্ থেকে। শান্ত হও। শিগগীরই আমরা মন্ত্রিসভার তিনজন সদস্যকে পাঠাচ্ছি ভারতবর্ষে। এবার আর ডেলিগেশন নয়, মিশন। এই মিশনই ঠিক করবে ভারতবর্ষের নিজস্ব শাসনতন্ত্র কিভাবে গঠিত হবে।

এবার আরো সতর্ক হল কংগ্রেস। বোঝা যায় যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এখন আর কল্পনার বস্তু নয়। সুতরাং, এ সময়ে কোনরকম আন্দোলন নয়। বিদ্রোহও নয়। বিপ্লব তো নয়ই। ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য চাই এখন শান্তি-পূর্ণ আপস-আলোচনা।

কিন্তু ঐ নৌ-বিদ্রোহ! না, কোন প্রয়োজন নেই। এসব ঝুটঝামেলা এখন হটাও। সব হটাও।

'The Congress condemned the civilian disturbances of February, 1946 and withdrew its support from the mutiny of the ratings. This was mainly because the Congress High Command expected the transfer of power to be peaceful.'

[Dr. K. K. Ghosh: P.—237]

১৯৪৬ সাল আর ১৯৭৪ সাল এক নয় মল্লিকা।

সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে যা-ই ঘটে থাকুক না কেন, আজ ১৯৭৪ সালের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অতীতের পানে তাকাতে গেলে এ প্রশ্ন তোমার মনে নিশ্চয়ই আসতে পারে যে, যে ব্রিটিশ নিজেই তখন পালাবার জন্য ব্যস্ত, তার সঙ্গে এই আপস-আলোচনার সার্থকতা কোথায়?

আপস মানেই তো নানাবিধ শর্ত এবং শক্ত ফাঁসের বন্ধনী। সুভাষের ভাষায়ঃ 'Freedom never could be a gift, because every gift carries its obligations, its ties..'

তাহলে কেন এই আপস-আলোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ? একটু ধৈর্য ধরতে পারলে এসবের আদৌ কোন প্রয়োজন হতো কি?

পরের ইতিহাস সেই চিরন্তন আপস-আলোচনা ও দর-কষাকষির ইতিহাস। খুব সংক্ষেপে সে কাহিনী আমি তুলে ধরছি তোমার কাছে।

২৪শে মার্চ সেই মিশন এল ভারত-সচিব স্যার পেথিক লরেন্সের নেতৃত্বে। অনেক আলাপ-আলোচনার পর ঠিক হল, ভাগাভাগি নয়, অবিভক্ত ভারতবর্ষকেই স্বাধীনতা দেওয়া হবে কয়েকটি শর্তের ভিত্তিতে।

শর্তগুলো হল, আপাততঃ কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হবে। কংগ্রেস এবং লীগ—দুপক্ষই সে সরকারে যোগ দেবে সংখ্যার ভিত্তিতে।

আর ভারতবর্ষকে 'এ', 'বি' ও 'সি'—এই তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হবে। 'এ' গ্রুপে থাকবে হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠদের নিয়ে গঠিত হবে 'বি' গ্রুপ। সেখানে থাকবে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং ব্রিটিশ বেলুচিস্তান। আর 'সি' গ্রুপে থাকবে বাংলা এবং আসাম।

সবার উপরে থাকবে কেন্দ্রীয় সরকার। তার হাতে থাকবে প্রধানত—দেশরক্ষা, বৈদেশিক এবং যোগাযোগ-ব্যবস্থার দায়িত্ব।

তাই মেনে নিল কংগ্রেস এবং লীগ। ঠিক আছে, আমরা রাজী। দু-

পক্ষই আমরা যোগ দেব এই অন্তর্বর্তী সরকারে। নতুন সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত আমরাই শাসনকার্য পরিচালনা করব যৌথভাবে।

গান্ধীজী মোটামুটি খুশি। তাঁর অভিমত ঃ বর্তমান পরিস্থিতিতে এর চাইতে ভাল প্রস্তাব দেওয়া ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। অপরপক্ষে জিন্না সাহেবও কম খুশি নন। তাঁর বক্তব্য ঃ পাকিস্তান না পেলেও এ ব্যবস্থার ফলে আমরা যা পেয়েছি তা পাকিস্তানেরই প্রায় কাছাকাছি।

খুশিমনে মিশন ফিরে গেল নিজের দেশে। যাক বাপু, তবু রক্ষে। এখন পাততাড়ি গুটিয়ে যত শিগগীর সম্ভব চলে যাওয়াই সর্বদিক থেকে মঙ্গল।

সব ভেস্তে গেল নব-নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জওহরলালের একটি অসংযত উক্তির ফলে। ১০ই জুলাই এক সাংবাদিক সম্মেলন তিনি যা বললেন, তার ভাবার্থ হল—মিশন যা-ই বলুক না কেন, সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সবকিছু আমরা ইচ্ছামত পরিবর্তন করে নিতে পারব অন্তর্বর্তী সরকারে গিয়ে।

তার মানে! তবে কি কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব কংগ্রেস মেনে নেবে না?

নিশ্চয় নেবে, তবে প্রস্তাবের ব্যাখ্যা মিশন যেভাবে করেছে, সেভাবে নয়। আমরা যেভাবে করব, সেইভাবে।

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গেই জিন্না এ্যাবাউট টার্ণ। জওহরলালের কথায় কংগ্রেসের সত্যিকারের মনোভাব ব্যক্ত হয়ে পড়েছে। আসলে ওরা অ্যাসেম্বলিতে গিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে আমাদের দাবিয়ে রাখতে চায়। সুতরাং আর কংগ্রেস নয়। অন্তর্বর্তী সরকারও আর নয়। এখানেই সব কিছুর ইতি।

একটিমাত্র অসংযত উক্তির জন্য ইতিহাস পাল্টে গেল চিরদিনের মত।

পরিস্থিতি লক্ষ্য করে বেদনাহত চিত্তে বলেছেন প্রখ্যাত রাজনৈতিক ভাষ্যকর লিওনার্ড মোসলে ঃ

'নেহরু নিজেই বোধহয় বোঝেননি তিনি কি বলছেন। কোন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদের এ ধরনের কথা মোটেই শোভা পায় না। ভারতের ভাগ্য তখন দুলছে। একটু ভুলে সব তচনচ হয়ে যেতে পারে। সেই সন্ধিক্ষণে নীরবতার মধ্য দিয়ে অনেক কিছুই হয়তো লাভ করা যেত। আর নেহরু কিনা ঠিক সেই সময়টাই বেছে নিলেন অমন একটা প্ররোচনামূলক উক্তির জন্য।'

'The fortunes of India were in the balance, and one false move could upset them.

Nehru chose thsi moment to launch into what his biographer, Michael Brecher, has described as 'one of the most fiery and provocative statements in his forty years of public life' [The Last Days of the British Raj : Leonard Mosley : P.—21]

মৌলানা আবুল কালাম আজাদও কিন্তু ক্ষোভ প্রকাশ না করে পারেননি

বন্ধু জওহরলালের সেই অসংযত উক্তি শুনে। 'দুঃখের সঙ্গে একথা আমাকে বলতেই হবে যে, মাঝে মাঝেই তিনি (জওহরলাল) আবেগের জোয়ারে ভেসে যেতেন। শুধু তাই নয়, সময় সময় তত্ত্বকে বড় করে দেখতে গিয়ে বাস্তব থেকে দূরে সরে যেতেন। তাঁর ১৯৪৬ সালের এই ভুলের জন্য খুবই মূল্য দিতে হয়েছিল সন্দেহ নেই।' 'Jawaharlal's mistake in 1937 had been bad enough. The mistake of 1946 proved even most costly.'

১৮ই জুলাই বিলেত থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন স্যার পেথিক লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ প্রমুখ মিশনের সদস্যগণ। কংগ্রেস সভাপতির এ ধরনের উক্তি অত্যন্ত অসঙ্গত। মিশনের প্ল্যান পরিবর্তন করার কোন অধিকার তাঁর নেই।

তারপর ওদিক থেকে মিশনের সদস্যবৃন্দ, এদিক থেকে বড়লাট, এমন কি স্বয়ং জওহরলাল পর্যন্ত জিন্নার বাসভবনে গিয়ে কত অনুরোধ, কত সাধ্য-সাধনা, কিন্তু জিন্না সাহেবের এক কথা—না। কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে-মিশে আর কোন কাজ নয়। অনেক শিক্ষা হয়েছে। আর নয়।

বাধ্য হয়েই বড়লাট তখন আহ্বান জানালেন কংগ্রেসকে। এত করে বলা সত্ত্বেও লীগ যখন রাজী হল না, তখন কি আর করা! নাও, তোমরা একাই বরং গঠন করো অন্তর্বর্তী সরকার।

সঙ্গে সঙ্গেই সংগ্রামের আহ্বান জানালেন কায়েদ-ই আজম জিন্না।

আর কোন কথা নয়। কোন আলাপ-আলোচনাও আর নয়। এতকাল আমরা শুধু নিময়তান্ত্রিক উপায়ে আমাদের দাবী জানিয়েছি। এবার আমাদের নতুন পথে পা বাড়ানো ছাড়া কোন উপায় নেই।

'Now there is no room left for compromise. Let us march on...never have we in the whole history of the League done anything except by constitutional methods...but now we are forced into this position. This day we bid good-bye to constitutional method.'

সুতরাং চাই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। তবে এ সংগ্রাম আমাদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে নয়, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। কংগ্রেসকে তোয়াজ করতে গিয়ে ব্রিটিশ মুসলমানদের সঙ্গে বেইমানী করেছে। তার ক্ষমা নেই। 'To-day we have also forged a pistol and are in a position to use it.' আজ আমরা পিস্তল সংগ্রহ করেছি এবং কি করে তা ব্যবহার করতে হয় তাও আমরা জানি।

লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হল ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট।

কিন্তু একি! এ যে উন্মত্ত লীগ-সমর্থকদের অহেতুক নরহত্যা, লুটপাট এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছাড়া কিছুই নয়। সাময়িক পত্রিকার ভাষায়ঃ

'মুসলিম লীগ কর্তৃক ঘোষিত 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিবস ১৬ই আগস্ট শুক্রবার প্রাতঃকাল হইতে কলিকাতা ও শহরতলী অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ঘোরতর দাঙ্গা শুরু হয়। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠে। সর্বত্র বেপরোয়া লুঠতরাজ, অগ্নিকাণ্ড ও হত্যার তাণ্ডবলীলা শুরু হয়। ট্রাম, বাস এবং অন্যান্য যানবাহন বন্ধ হইয়া এবং কলিকাতা বহির্জগতের সহিত সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। গোলযোগের দরুন বি. এন. রেলওয়ে এবং ই. আর. রেলওয়ের লোকাল ট্রেন চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। বাঙলা সরকার রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্যন্ত শহরে সান্ধ্য আইন জারী করেন।

১৭ই আগস্ট শনিবার দাঙ্গার অবস্থা চরমে ওঠে। এই দিন অধিকতর ব্যাপকভাবে কলিকাতা মহানগরীর বুকের উপর দিয়া নারকীয় হত্যাকাণ্ড ও বেপরোয়া লুণ্ঠন এবং গৃহদাহের অনুষ্ঠান চলিতে থাকে। উহার ফলে যে কত লোকের জীবন বিনষ্ট হইয়াছে, তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব। ১৮ই আগস্ট রবিবার পর্যন্ত কলিকাতার অবস্থা সমভাবে ভয়াবহ ও অপরিবর্তিত থাকে।'

তৃতীয় দিনে শুরু হল পাল্টা-আক্রমণ। এবার সেনাবাহিনীকে তলব করলেন লীগ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শহীদ সুরাবর্দী সাহেব। খুব হয়েছে। এবার ক্ষান্ত দাও। ব্রিটিশ মুখপাত্রের ভাষায়ঃ

'It was only when the Hindus and Sikhs had come out in retalaition that the Chief Minister had called for military aid...' [The Last Days of the British Raj : Leonard Mosley : P.—33]

মল্লিকা, এই হল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। কতজন ব্রিটিশ সেদিন নিহত হয়েছিল প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ফলে? না, একজনও নয়। বরং তারাই ছিল সেদিন সবচাইতে নিরাপদ।

'Mr. Jinnah had called the 'Direct Action Day's demonstration against the British for their refusal to recognize Pakistan but of all the comuníties in Calcutta once the rioting began, the British were the only ones who were safe.' [The Last Days of the British Raj: Leonard Mosley: P.—31]

কোথায় তখন পণ্ডিত জওহরলাল? কায়েদ-ই-আজম জিন্না সাহেবই বা কোথায়? কেউ কি সেদিন একবারও এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন বিপন্নদের পাশে?

না, আসেনি। দুজনেই তখন ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন নিজের নিজের কাজ নিয়ে। জিন্না সাহেব তখন পরবর্তী সংগ্রামের পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত। আর জওহরলাল ব্যস্ত ছিলেন অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের ব্যাপার নিয়ে।

'But both of them were too busy for that. Mr. Jinnah was in conference with the working committee of the Muslim

League, planning new tactics in his fight with Congress. Pandit Nehru was holding the first meetings to pick the Cabinet (minus the Muslims) of the new interim Government.'

[Ibid : P.—36]

মোট কত হাজার লোককে সেদিন প্রাণ দিতে হয়েছিল সেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ?

দশ হাজার।

না, শিউরে উঠলে চলবে না মল্লিকা। সর্বনাশের খেলার এই তো সবে শুরু। এর শেষটাও তোমাকে শুনতে হবে বৈকি।

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হয়েছিল ১৬ই আগস্ট। দেখতে দেখতে একদিন সে আগুন গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল ঢাকাতে। তারপর নোয়াখালিতে। না, বেশি সময় নেব না। সামান্য একটু উদ্ধৃতি তুলে দেব মাত্র।

'নোয়াখালি জেলায় সঙ্ঘবদ্ধভাবে গুণ্ডামীর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বাঙলা সরকারের প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, উত্তেজিত জনতা মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া বিভিন্ন গ্রামে হানা দিতেছে এবং গত ১০ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার হইতে ব্যাপকভাবে খুন, অগ্নি-সংযোগ এবং লুণ্ঠন চালাইতেছে। বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা, নারীহরণ এবং ধর্মস্থান অপবিত্র করার সংবাদও পাওয়া গিয়াছে।

সদর এবং ফেনী মহকুমার দুই শতাধিক বর্গ-মাইল পরিমিত স্থানে হাঙ্গামা চলিতেছে। উপদ্রুত অঞ্চলের প্রবেশসমূহে সশস্ত্র গুণ্ডাগণ পাহারা দিতেছে। বহু লোক নিহত অথবা জীবন্ত দগ্ধ হইয়াছে—তাহাদের মধ্যে জেলা উকিলসভার সভাপতি ও তাঁহার পরিবারবর্গ এবং জেলার একজন বিশিষ্ট জমিদারও আছেন।

সমস্ত রায়গঞ্জ থানা এবং লক্ষ্মীপুর থানা, রায়পুর থানা, সেনবাগ থানা, ছাগলনাইয়া থানা, সন্দ্বীপ থানা এবং বেগমগঞ্জ থানার কিয়দংশ উপদ্রুত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। উপদ্রুত অঞ্চলে সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিশ প্রেরণ করা হইয়াছে।'

[দেশ ঃ ২১. ১০. ৪৬]

সরকারী মতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ—নোয়াখালি জেলার মোট ৪,৪৩৬টি গৃহ লুণ্ঠিত এবং ২,৫৯১টি গৃহ ভস্মীভূত। আর ত্রিপুরা জেলায় ভস্মীভূত ৬,৫২০টি গৃহ।

চট্ করে একবার পেছনের দিকে তাকাও মল্লিকা। মাত্র এক বছর আগে কি আমরা দেখেছিলাম দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়! হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই! সবাই সবার প্রিয়জন। সবাই এক ও অভিন্ন।

মুসলমান দ্বিধাহীন চিত্তে গিয়েছে হিন্দু-মন্দিরে। হিন্দু গিয়েছে মসজিদে মুসলমানদের উৎসবে যোগ দিতে। খ্রীস্টান, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ সবাই সবার উৎসবে যোগ দিয়েছে দলে দলে।

তাছাড়া একই মাটিতে দাঁড়িয়ে তারা লড়াই করেছে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।

একই লক্ষ্যের জন্য তারা প্রাণ দিয়েছে দলে দলে। সে প্রাণ তারা হিন্দুস্থান বা পাকিস্তান কায়েম করার জন্য দেয়নি। ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতা বা ভাষা-আন্দোলনের জন্যও নয়। প্রাণ দিয়েছে—অখণ্ড ভারতের জন্য। দেশের মুক্তির জন্য। আজাদীর জন্য।

লক্ষ্য করো, সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পদে সেদিন যাঁরা বহাল ছিলেন, তাঁরা সবাই প্রায় মুসলমান। মেজর জেনারেল এম. জেড. কিয়ানী, মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান, মেজর জেনারেল আজিজ আহম্মদ, কর্ণেল গিলানী, কর্ণেল ইশান কাদির, কর্ণেল হুসেন, কর্ণেল এস. এ. মালিক প্রমুখ সবাই মুসলমান।

আরো লক্ষ্য করো, বার্লিন থেকে টোকিও—এই বিপদসঙ্কুল পথে সুভাষ যাঁকে সঙ্গী হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন, সেই আবিদ হাসান মুসলমান। আবার শেষ রহস্যময় যাত্রাপথে যে একজন মাত্র সঙ্গীকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন, সেই কর্ণেল হাবিবুর রহমানও মুসলমান।

কই, সেখানে তো কে হিন্দু, কে মুসলমান এই নিয়ে কারো মনে কোন প্রশ্ন ওঠেনি! মনেই হয়নি কারো কিছু।

সেই হিন্দু-মুসলমান তাদের নিজের দেশে পরস্পরের প্রতি এমন মার-মুখী হয়ে উঠল কেন?

মাত্র এক বছর আগে ভারতের বাইরে সুভাষের নেতৃত্বে যা সম্ভব হয়েছিল, ভারতবর্ষে তা সম্ভব হল না কেন?

শুধু বাইরে কেন, ভারতবর্ষেরই বা কি ছবি আমরা দেখেছিলাম মাত্র কিছুদিন আগে।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজ, নৌ-বিদ্রোহ, সেনা-বিদ্রোহ, বৈমানিক, ডাক-তার এবং পুলিশ ধর্মঘট—কোথাও এতটুকু সাম্প্রদায়িকতা বা হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন ছিল না। হিন্দুস্থান বা পাকিস্তান প্রশ্নও নয়। থাকার কথাও নয়। কারণ, বৃহত্তর বৈপ্লবিক উত্থানের মধ্যে কোনদিনই এসব সংকীর্ণতার স্থান থাকে না।

কেন সেই উজ্জ্বল ছবিটা হঠাৎ এমন করে নিষ্প্রভ হয়ে গেল? কার অদৃশ্য ইঙ্গিত? আজ না হলেও একদিন-না-একদিন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ এ প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজে পেতে চাইবেন বৈকি। যাক, আগেকার কথায় ফিরে যাই।

নোয়াখালি তখন জ্বলছে। জ্বলছে ঢাকা, ত্রিপুরা ইত্যাদি পূর্ববঙ্গের অসংখ্য জায়গা।

খবর পেয়ে গান্ধীজী ছুটে গেলেন নোয়াখালির বিপন্নদের পাশে। দু চোখে তাঁর অপরিসীম শূন্যতা। এই কি তাঁর স্বপ্নের ভারত! ভারতবর্ষের এই বীভৎস রূপ দেখার জন্যই কি তিনি তপস্যা করেছিলেন সারা জীবন! এ দুঃখ তিনি রাখবেন কোথায়!

কেন এমন হল? কেন? কেন? কেন?

কই, সুভাষের বেলায় তো এমন হয়নি। সুভাষ অনন্য। সুভাষ অসাধারণ।

সুভাষের নেতৃত্বে লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলমান যেভাবে তাদের সাম্প্রদায়িকতা এবং আঞ্চলিক মনোভাব বিসর্জন দিয়ে একই পতাকাতলে, একজাতি-একপ্রাণ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, ভারতবর্ষে তার নজীর কোথায়?

'The greatest and the lasting act of Netaji was that he abolished all distinctions of caste and class. He was not a mere Bengalee. He was Indian first and last.

What is more he fired all under him with the same zeal so that they forget in his presence all distinctions and acted as one man.' [Mahatma Gandhi]

'সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালবাসিলাম
সে কখনো করে না বঞ্চনা।'
—রবীন্দ্রনাথ

দিনের পর দিন। রাতের পর রাত।

গান্ধীজী তখনো নোয়াখালিতে। আজ এ-গাঁয়ে। কাল ও-গাঁয়ে। পরশু হয়তো বা দূরবর্তী অন্য কোন গাঁয়ে।

সঙ্গে রয়েছেন কিছু-সংখ্যক সহকর্মী। আর রয়েছেন বেসরকারী দেহ-রক্ষী হিসেবে লালকেল্লা থেকে সদ্যমুক্ত আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কর্ণেল জীবন সিং ও তাঁর অধীনস্থ চারজন আজাদী সৈনিক।

এমনি একদিনের কথা। তখনো রাতের অন্ধকার কাটেনি। কুটিরের সবাই তখন সুপ্ত, নিদ্রামগ্ন।

সহসা কি দেখে চমকে উঠলেন জীবন সিং। আশ্চর্য, বাপুজী কুটিরে নেই! কোথায় গেলেন তিনি! কোথায়!

একটা অশান্ত চেতনায় ভয়ে আতঙ্কে নীল হয়ে গেলেন জীবন সিং। বাপুজীর কিছু হয়নি তো! তাঁর ভাল-মন্দ কিছু হলে তিনি পৃথিবীর কাছে মুখ দেখাবেন কি করে?

উন্মত্তের মত কুটিরের বাইরে ছুটে গেলেন জীবন সিং। কিন্তু না, ঐ তো বাপুজী ওখানে চুপচাপ বসে আছেন নিজের মনে। কি ব্যাপার! এত রাত্রে ওখানে বসে তিনি কি এত ভাবছেন মনে মনে!

পায়ের শব্দে ফিরে তাকালেন গান্ধীজী। তারপরই স্নিগ্ধ প্রশান্ত স্বরে বললেন—কে? জীবন সিং!

জীবন সিং স্তম্ভিত। এ কি দিবাস্বপ্ন, না কি কোন অসুস্থ চিত্তের মায়া বিভ্রম! আবার তাকালেন পরিপূর্ণভাবে। না, ভুল নয়। এত কাছে থেকে ভুল হবার কথাও নয়। বাপুজীর চোখে জল।

—বাপুজী, আপনি কাঁদছেন! নিজেরই কেমন যেন কান্না পেতে থাকে জীবন সিং-এর।

সস্নেহে জীবন সিং-এর গায়ে একখানা হাত রাখলেন গান্ধীজী। তারপর বললেন—আমার তপস্যা ব্যর্থ হয়েছে জীবন সিং। সব স্বপ্ন আমার মিথ্যে হয়ে গেছে। আজ হিন্দু-মুসলমান ভ্রাতৃ-হত্যায় মেতেছে। অস্পৃশ্যতাও তেমনি রয়ে গেছে। কেউ আমাকে বুঝল না জীবন সিং, কেউ না।

—কেউ না! জীবন সিং হতভম্ব, কেন, পণ্ডিতজী, সর্দার প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ—

—না, কেউ না। একটা তীব্র হাহাশ্বাস বেরিয়ে এল গান্ধীজীর বুক চিরে, ওরা কেউ আমাকে বোঝেনি। বুঝত শুধু একজন। আজ সেও কাছে নেই।

—কাছে নেই! জীবন সিং-এর চোখে মুখে সপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা, কার কথা বলছেন বাপুজী?

—সুভাষ!

আর কোন কথা নয়। কোন উত্তরও নয়। সব কথা, সব উত্তরই বুঝি হারিয়ে গেল মৌন রাতের অন্ধকারে।

ওদিকে তখন হৈ-চৈ পড়ে গেছে গোটা ভারতবর্ষে। অনেক সাধ্য-সাধনার পরে অবশেষে (১৩ই অক্টোবর) জিন্না সাহেব রাজী হয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিতে।

কিন্তু কেন? কি ব্যাপার? হঠাৎ কেন এই মত-পরিবর্তন?

উত্তর পাওয়া গেল তাঁর নিজের কথা থেকেই। 'কেন্দ্রীয় সরকারের পুরো শাসন-ব্যবস্থা কংগ্রেসের হাতে থাকাটা রীতিমত বিপজ্জনক। তাই আমাদের উদ্দেশ্য—নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিয়ে কংগ্রেসকে সর্বপ্রকারে বাধা দেওয়া।'

গঠিত হল মিলিত অন্তর্বর্তী সরকার, কিন্তু কোথায় শান্তি, কোথায় কি! ততদিনে নোয়াখালির আগুন ছিটকে এসে পড়েছে বিহারে।

কলকাতায় না এলেও বিহারে কিন্তু জওহরলালই ছুটে এলেন সর্বাগ্রে। সেই সঙ্গে অন্যান্য কংগ্রেসী এবং লীগ নেতৃবৃন্দ।

'Both Congress and Muslim leaders did go later—when rioting spread to Bihar.' [Mosley : P.—36]

বিহারের আগুন থামতে-না-থামতেই মারাত্মক খবর এল পাঞ্জাব থেকে। লাহোর, অমৃতসর, মুলতান, আম্বালা, রাওয়ালপিণ্ডি—প্রতিটি জায়গা ভয়াবহভাবে জ্বলছে সাম্প্রদায়িকতার আগুনে। সে বীভৎসতার কথা কল্পনাও বুঝি করা যায় না।

একদিকে অন্তর্বর্তী সরকারেও তখন প্রচণ্ড খেয়োখেয়ি শুরু হয়েছে দুপক্ষের মধ্যে। কংগ্রেস বলছে এক কথা, লীগ বলছে অন্য কথা। সত্যি

বলতে কি, একটা মেছো হাট ছাড়া আর কিছুই বুঝি বলা যায় না সেদিনের সেই অন্তর্বর্ত্তী সরকারকে।

বিরোধ চরমে উঠল অন্তর্বর্ত্তী সরকারের বাজেট নিয়ে।

অর্থমন্ত্রী লীগ নেতা লিয়াকৎ আলী খানের তখন একমাত্র লক্ষ্য এক ঢিলে দুই পাখী শিকার করা, তাই বেশ মোটা হারেই তিনি ট্যাক্স চাপিয়ে দিলেন দেশের বড় বড় ব্যবসায়ীদের উপর। তাঁর প্রস্তাব ঃ যে-সব ব্যবসায়ী বছরে সাত হাজার পাঁচ পাউণ্ডের বেশি লাভ করবে, তাদের শতকরা পঁচিশ-ভাগ ট্যাক্স দিতে হবে এখন থেকে।

বেকায়দায় পড়ে গেলেন কংগ্রেসের প্রধান সংগঠক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। এ কি ভয়ঙ্কর প্রস্তাব! ব্যবসায়ীদের এভাবে ঘায়েল করা হলে টাকা আসবে কোথা থেকে? আর টাকা না পেলে সংগঠন চলবেই বা কিসের জোরে? না, এ হয় না। হতে পারে না। এ প্রস্তাব জুলুম ছাড়া আর কিছুই নয়।

অথচ বলারও কিছু নেই। কারণ দোষ তাঁর নিজেরই। এ সম্বন্ধে বড়-লাট তাঁকে সতর্ক করেছিলেন বার বার। বলেছিলেন—কেন্দ্রীয় সরকারে স্বরাষ্ট্র-দপ্তরের চাইতে অর্থ-দপ্তর অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অর্থ-দপ্তর মঞ্জুর না করলে সামান্য একটি পিয়ন নিযুক্ত করার অধিকারও কারোর নেই। তাই এটা আপনি নিজের হাতে রেখে স্বরাষ্ট্র-দপ্তরটা বরং লীগকে ছেড়ে দিন।

পত্রপাঠ সে প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছিলেন সর্দার প্যাটেল। তাঁর এক গোঁ—না, স্বরাষ্ট্র-দপ্তর আমার চাই-ই। অন্যথায় আমি পদত্যাগ করব অন্তর্বর্ত্তী সরকার থেকে। আজ নিজের সৃষ্ট সেই জালে নিজেই তিনি আটকে পড়েছেন কঠিনভাবে। পাকে পাকে জড়ানো এই দুঃসহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় কি?

বাঁচিয়ে দিলেন সেই বড়লাট! বিবদমান দু পক্ষকেই তিনি তখনকার মত থামিয়ে দিলেন ভেটো প্রয়োগ করে। কিন্তু তা আর কতক্ষণ! দুই যন্ত্র দুই সুরে বাঁধা থাকলে এক রাগিণীতে আলাপ করা যে সত্যিই বড় কষ্টকর।

দেখে-শুনে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠলেন সর্দার প্যাটেল। না! লীগের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করা অসম্ভব। এর একটা বিহিত করা দরকার।

হ্যাঁ, এর একটা বিহিত চাই। জওহরলাল, কৃপালনী, রাজেন্দ্র প্রসাদ, রাজাগোপালাচারিয়া, সবাই এ ব্যাপারে একমত। আর অসম্ভবের পেছনে ছুটে কোন লাভ নেই। তাই চাইতে যে-যার অংশ বুঝে নিয়ে পৃথক হয়ে যাওয়াই ভাল। তবে খুব সাবধান। এগুতে হবে খুব সন্তর্পণে। আগে থেকে কেউ যেন টের না পায়।

ভয় গান্ধীজী এবং মৌলানা আজাদকে। জানতে পারলে কিছুতেই তাঁরা

সম্মতি দেবেন না এ ব্যাপারে। তাই কাজটা করতে হবে তাঁদের অগোচরে, অতি গোপনে।

সুযোগ পাওয়া গেল ১৯৪৭ সালের ৮ই মার্চ তারিখে। আর্তত্রাণের কাজে গান্ধীজী তখন বিহারে। মৌলানা আজাদ হাসপাতালে। সেই সুযোগে চমৎকার একটি প্রস্তাব ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পাশ করিয়ে নেওয়া হল দু-জনের অজ্ঞাতে।

কি সেই প্রস্তাব, যার জন্য এত গোপনীয়তা?

চমকে উঠো না যেন মল্লিকা। ওটা ছিল—পাঞ্জাব-বিভাগের প্রস্তাব। আমি তার বয়ানটা তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি:

'In view of the tragic events of the Punjab, it is necessary to find a way out which involves the least amount of compulsion. This would necessitate a division of the Punjab into two provinces, so that the predominantly Muslim part may be separated from the predominantly non-Muslim part.'

না, মাউণ্টব্যাটেনের দোহাই দিলে চলবে না। এ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ৮ই মার্চ। মাউণ্টব্যাটেন তখন কোথায়! বড়লাট হিসেবে তিনি তো ভারতবর্ষে এসেছিলেন আরো পরে, ২২শে মার্চ তারিখে।

তবে এই প্রথম নয়। পাঁচ বছর আগে ১৯৪২ সালেই সর্বপ্রথম ভারত-বিভাগের দাবী তুলেছিলেন কংগ্রেসের অন্যতম মস্তিষ্ক চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারিয়া। শুধু মুখেই নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এই মর্মে এক প্রস্তাবও তিনি পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন মাদ্রাজ কংগ্রেস বিধানমণ্ডলী পার্টির সভা থেকে। বয়ানটা শোন:

'...This party is of opinion and recommends to the All-India Congress Committee that to sacrifice the chances of formation of a National Government at this grave crisis for the doubtful advantage of maintaining a controversy over the unity of India is a most unwise policy and that it has become necessary to chose the lesser evil and acknowledge the Muslim League's claim for separation...'

মল্লিকা, এর পরেও মাউণ্টব্যাটেনের দোহাই দেওয়া চলে কি? মাউণ্ট-ব্যাটেন তো নিমিত্ত মাত্র, নইলে এদিকে ভেতরে ভেতরে সবই তো দেখছি প্রস্তুত। এখন তো শুধু মাউণ্টব্যাটেনের আসার অপেক্ষা মাত্র।

আর কমিউনিস্ট পার্টিকেও এর পরে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় কি? কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষমতা আর কতটুকু? কে শোনে তখন তাদের কথা! বিশেষ করে সুভাষের কাহিনী জানাজানি হবার পরে।

কথা ঠিক যে, কমিউনিস্ট পার্টি মুসলিম লীগের ভারত-বিভাগ প্রস্তাব

সমর্থন করেছিল। কিন্তু কংগ্রেস নিজে রাজী না হলে কি মুসলিম লীগ, কি কমিউনিস্ট পার্টি, কি মাউণ্টব্যাটেন—কারো পক্ষে ভারতভূমির অংগচ্ছেদ করা সম্ভব হতো কি ?

অথচ তখনো জনসাধারণকে বোঝানো হচ্ছে অন্য কথা। ৩রা এপ্রিল আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় ঘোষণা করলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ঃ ভারত-বিভাগ ! এ তো একটা বিরাট পরিহাস মাত্র। এমন কথা আমরা চিন্তাও করতে পারিনে।

খবর শুনে সেদিন বোধহয় জীবনের দুঃসহতম আঘাত পেয়েছিলেন গান্ধীজী। প্যাটেল, জওহরলাল, কৃপালনী, রাজাগোপাল—তাঁর সবচাইতে নিকটতম সহকর্মীরা যে তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে এমন একটা মারাত্মক ক্ষতিকর প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিতে পারে, একথা বোধহয় তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

কি বলবেন ! বলার আছেই বা কি ! বললেই বা আজ আর কে শুনবে তাঁর কথা ! না, কেউ শুনবে না। আজ তাঁরা সবাই নতুন পথের পথিক। বাপুজীকে আজ আর তাঁদের প্রয়োজন নেই।

কাছে থাকলে একজন ঠিকই শুনত। কিন্তু আজ কোথায় তাঁর সেই অবাধ্য সন্তান !

আর কারো নজর না পড়লেও এর ক্ষতিকর দিকটা কিন্তু বারেকের জন্যও তার নজর এড়ায়নি। তাই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েও এ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের উদ্দেশে সে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিল বার বার। কখনো বার্লিন থেকে, কখনো বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আজাদ হিন্দ্ রেডিও থেকে।

'আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, ভারতবর্ষ বিভক্ত হলে তার ধ্বংস অনি-বার্য। মাতৃভূমির এই বিভক্তিকরণের আমি তীব্র বিরোধিতা করি। আমাদের পবিত্র জন্মভূমি যেন দ্বিখণ্ডিত না হয়।'

'I have no doubt that if India is divided, she will be ruined. I vehemently oppose the Pakistan scheme for the vivisection of our motherland, our divine motherland shall not be cut up.'

কে শোনে তখন এসব তত্ত্বকথা ! সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, এ সময়ে এর ভয়াবহ পরিণামের কথা চিন্তা করার মত অবকাশ কোথায় ?

সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে ব্যতিক্রম শুধু গান্ধীজী, মৌলানা আজাদ সীমান্ত-গান্ধী আব্দুল গফ্ফর খান আর শরৎচন্দ্র বসু। তাছাড়া আর সবাই তো দেখছি এ ব্যাপারে মোটামুটি একমত।

অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে গান্ধীজী তখন দুটি চিঠি লিখে পাঠালেন জওহর-লাল এবং সর্দার প্যাটেলের কাছে।

'...প্রস্তাবটি পাশ করা হল কেন আমি জানতে চাই। কৃপালনী নাকি মাদ্রাজে বলেছে যে, এই নীতি বাংলাদেশের পক্ষেও প্রযোজ্য হতে পারে।...এ প্রস্তাব গ্রহণ করার পেছনে ওয়ার্কিং কমিটির কি কারণ ছিল তা আমি জানি নে। জানার সুযোগও আমার ছিল না। সাম্প্রদায়িক আর দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে ভাগ করার বিরুদ্ধে আমার নিজস্ব অভিমত কি তাই শুধু বলতে পারি। জোর করে সব কিছুই হয়তো করা যায়, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত অনুমোদন পেতে হলে যুক্তি আর হৃদয়ের কাছে আবেদন জানাতে হবে।'

বেশ কিছুদিন পরে উত্তর দিলেন সর্দার প্যাটেল ঃ

'কেন এ প্রস্তাব গ্রহণ করা হল তা বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বলা কষ্টকর। তবে এটুকু বলতে পারি যে, গভীরভাবে চিন্তা আর আলোচনা করেই এ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। ভালভাবে চিন্তা না করে তাড়াতাড়ি কিছু করা হয়নি। আপনি যে এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে. তা সংবাদপত্র থেকেই জানতে পারলাম। অবশ্য আপনি যেটাকে ঠিক বলে মনে করেন, সেটা বলার অধিকার আপনার রয়েছে, তবে পাঞ্জাবের অবস্থা বিহারের চেয়েও খারাপ। সেনাবাহিনী তলব করা হয়েছে। তার ফলে বাইরে থেকে অবস্থা কিছুটা শান্ত হয়েছে বটে, কিন্তু যে কোন মুহূর্তে আবার সেটা জ্বলে উঠতে পারে।'

প্রায় একই সুরে জবাব দিলেন জওহরলাল ঃ ...'ওয়ার্কিং কমিটির অনেকেই আমার সঙ্গে একমত যে. এখনই আমাদের পাঞ্জাব-বিভাগের উপর জোর দেওয়া উচিত। তাহলেই আমরা বাস্তব ঘটনার মুখোমুখি হতে পারব। এটাই হবে আমাদের জিন্নার পাকিস্তান দাবীর একমাত্র উত্তর।'

এ তো গেল পাঞ্জাব-বিভাগের কথা। কিন্তু নতুন কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালনী মাদ্রাজে ঐ সঙ্গে বাংলা-বিভাগের কথা বলতে গেলেন কেন ?

উত্তর পাবে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারিয়ার একটি কথার মধ্যে ঃ

'Bengal and Punjab are the two stumbling blocks to the Indian Independence.' অর্থাৎ—বাংলা এবং পাঞ্জাবই হল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ।

মল্লিকা, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলা এবং পাঞ্জাবের মত এত বেশি রক্ত অন্য কোন প্রদেশ দিয়েছে কিনা সে প্রশ্ন আমি তুলব না। কিন্তু একটা কথা ! বাংলা এবং পাঞ্জাবের মত মাদ্রাজ, বিহার বা উত্তর প্রদেশও যদি ভাগাভাগির প্রস্তব উঠত. তা হলে কি হতো ?

পারতেন কি সেদিন কেউ এতখানি উদারতা দেখাতে ? তোমার কি মনে হয় ?

বড়লাট ওয়াভেলের কার্যকাল শেষ হল। ১৯৪৭ সালের ২২শে মার্চ কার্যভার গ্রহণ করলেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন। সেই মাউণ্টব্যাটেন, যিনি সিংগাপুরের সেই শহীদস্তম্ভ ধ্বংস করেছিলেন ডিনামাইট চার্জ করে।

পরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত। সে কাহিনীকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস না বলে দেশবাসীর প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের ইতিহাস বলাই বোধহয় অধিকতর সঙ্গত।

ঘরে ফেরার জন্য ব্রিটিশের তখন বড্ড তাড়া। আগে ঠিক ছিল ১৯৪৮ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হবে, কিন্ত এখন আর ততদিন দেরী করতেও তারা রাজী নয়। তাই ১৯৪৭ সালেই তারা ভালোয়-ভালোয় ঘরে ফিরে যেতে চায় ভারতবর্ষ থেকে।

কারণ সুভাষ। অশরীরী সুভাষ নাকি হ্যামলেটের পিতার মত সুরক্ষিত লালকেল্লার অভ্যন্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁর সহসা অতিপ্রসারিত রূপ আসন্ন স্বাধীনতাপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে আয়োজিত বৈঠকগুলোকে নাকি রীতিমত ত্রাস-বিহ্বল করে তুলেছে।

'The ghost of Subhas Bose, like Hamlet's father, walked the battlements of the Red Fort, and his suddenly amplified figure over-awed the conferences that were to lead to independence.' [Last Years of British India: Michael Edwardes: P.—105]

হ্যাঁ, এটাই সত্য। গ্রহীতা হিসেবে আজ আমরা সুবিধেমত যা-ই ব্যাখ্যা কারনে কেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আজাদ হিন্দ্ ফৌজই অতি দ্রুত ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে তুলল। যুদ্ধক্ষেত্রে ভাগ্য-বিড়ম্বনার মধ্য দিয়ে নয়, বজ্র-নির্ঘোষে ভেঙে যাবার মধ্য দিয়ে। অন্তত দাতা ব্রিটিশের অভিমত তাই।

'There can thus be little doubt that the Indian National Army, not in its unhappy career on the battlefield, but in its thunderous distintegration, hastened the end of British rule in India.' [Hugh Toye: P.—175]

বুদ্ধিমান লোক মাউন্টব্যাটেন। লোক চিনতে তার দেরী হল না। তাই প্রথম দিনেই তিনি জয় করে ফেললেন জওহরলালকে। তিনঘণ্টা আলাপ করে স্পষ্টই তিনি বুঝতে পারলেন যে, জওহরলাল একটু খোসামোদপ্রিয়। তাঁকে স্বমতে আনা মোটেই কষ্টকর নয়। 'He could be flattered. He could be persuaded.' [Mosley: P.—101]

একটু সুযোগ পেলেই জওহরলাল অনর্গল কথা বলে যাবেন এবং তার মধ্যে সহকর্মীদের সম্বন্ধে নানাবিধ সমালোচনা থাকবেই। সেই কৌশলে বড়লাট প্রথম দিনেই তাঁর কাছ থেকে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সম্বন্ধে সবকিছু জেনে নিলেন এবং সেইভাবেই তাঁদের দুর্বল স্থানে ঘা দিয়ে কার্যোদ্ধারে ব্রতী হলেন। প্রকৃতপক্ষে জওহরলাল সেদিন থেকেই মাউন্টব্যাটেনের লোক হয়ে গেলেন।

'It was from Nehru that Mountbatten obtained much of the ammunition which he subsequently used upon other

Congress leaders. Nehru was completely won over and Mountbatten had the measure of his man. He was Mountbatten's man from that moment on...' [Ibid : P.—101]

কিন্তু গান্ধীজী! গান্ধীজী কোথায়? তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়াটা সে একান্ত প্রয়োজন।

গান্ধীজী তখন বিহারের দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে। আমন্ত্রণের উত্তরে সেখান থেকেই তিনি চিঠি লিখে পাঠালেন বড়লাটের উদ্দেশে:

'বিহার ছেড়ে যাওয়া বর্তমানে আমার পক্ষে কঠিন, এটা আপনি ঠিকই বুঝেছেন। বর্তমানে আমি বিহারের একটি গোলমেলে জায়গায় যাত্রা করছি। সেইজন্য ঠিক কবে আমি দিল্লীতে যেতে পারব তা এখনও জানাতে পারছি নে। আঠাশে তারিখের পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরতে পারব আশা করি।'

উত্তরে এতদিনের পুরনো সহকর্মী আচার্য কৃপালনীর কণ্ঠে শোনা গেল রীতিমত বাঁকা সুর: 'গান্ধীজী সারা ভারতের জন্য বিহারে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সমাধানের চেষ্টা করছেন, কিন্তু কি উপায়ে সেই সম্ভব হবে তা বোঝা কষ্টকর। তাঁর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে তেমন কোন নির্দিষ্ট কর্ম-সূচী নেই।'

'There was no definite steps in non-violent non-co-operation that led to his desired goal.'

৩১শে মার্চ গান্ধীজী প্রথম সাক্ষাৎ করলেন বড়লাটের সঙ্গে। পর পর দুদিন।

দ্বিতীয় দিনে তিনি একটি অভাবনীয় প্রস্তাব রাখলেন বড়লাটের কাছে। আপনি জিন্না সাহেবকে বরং সরকার গঠনের ভার দিন। সে সরকার কেবলমাত্র মুসলমান সদস্য নিয়েই গঠিত হবে, অথবা হিন্দু সদস্যও কয়েকজন থাকবেন, সে সব দায়িত্ব আপনি তাঁর উপরেই ছেড়ে দিন। আপনার ক্ষমতার তাতে কোন হেরফের হবে না।

পত্রপাঠ সে প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বিচারে। না, এসব অর্থহীন কথার কোন মানে নেই।

১২ই এপ্রিল গান্ধীজী বড়লাটকে এক চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিলেন তাঁর সিদ্ধান্তের কথা। ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে যা করার ওয়ার্কিং কমিটিই করুক, আমি আর ওসবের মধ্যে নেই।

এবার নিশ্চিন্ত মনে কাজে হাত দিলেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন। পাঞ্জাব-বিভাগের প্রস্তাব তাঁর অজানা ছিল না, তাই প্রথমেই তিনি চোখ ফেরালেন সর্দার প্যাটেলের দিকে। এবার তাহলে একটা ভাল দিনক্ষণ দেখে শুভকাজটা সেরে ফেলা যাক, কি বলেন সর্দারজী!

গোবেচারার মত মাথা নাড়লেন সর্দার প্যাটেল। যেন বড়লাটের কথাটা তাঁর মোটেই বোধগম্য হয়নি।

গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে এবার জওহরলালের দিকে তাকালেন মাউণ্ট-

ব্যাটেন। বন্ধু জওহরলাল কি তাঁর প্রত্যাশা পূর্ণ করবেন না ?

'It must be placed on record that the man in India who first fell for Lord Mountbatten's idea was Sarder Patel....

As soon Sarder Patel had been convinced, Lord Mountbatten turned his attention to Jawaharlal....' [India Wins Freedom: Moulana Abul Kalam Azad: P.—183]

প্রত্যাশা পূর্ণ হতে যে দেরী হয়নি সেকথা তো তুমিও জানো। হবার কথাও নয়। মাউণ্টব্যাটেন নিজেও জানতেন সেকথা। কারণ, সবকিছুই তো আগে থেকে প্রস্তুত। তিনি তো নিমিত্ত মাত্র।

কিন্তু গান্ধীজী! না, তাঁকে জিজ্ঞেস করার কোন প্রয়োজন নেই। তাঁর মতামতেরও কোন আবশ্যক নেই। এসব কাজে তাঁকে টেনে আনাটা মোটেই সংগত হবে না।

তবু দ্বিধা যায় না ইংরেজ রাজপুরুষ মাউণ্টব্যাটেনের। হাজার হোক, গান্ধীজী ভারতবর্ষের মুকুটহীন সম্রাট। তাঁকে না জানিয়ে, তাঁর সম্মতি না নিয়ে এতবড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কোনরকম সিদ্ধান্ত নেওয়াটা সঙ্গত হবে কি ?

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন সর্দার প্যাটেল। পাছে সব ভেস্তে যায়, তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—যে সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক না কেন, এটা ঠিক যে, গান্ধীজী নিষ্ঠার সঙ্গে তার প্রতি আনুগত্য রক্ষা করে চলবেন। 'Gandhi would abide loyally by any decision.'

বলেছেন বড়লাট মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গী প্রখ্যাত রাজনৈতিক ভাষ্যকার ক্যাম্বেল জনসন। অবশ্য সামনে উপবিষ্ট কায়েদ-ই-আজম জিন্না, লিয়াকৎ আলী প্রমুখ মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ তখন অট্টহাস্যে ভেঙে পড়েছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে তিনি কিছু উল্লেখ করেননি তাঁর বিখ্যাত বইতে।

খবর শুনে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মৌলানা আজাদ। তার পরই তিনি ছুটে গেলেন গান্ধীজীর কাছে।

—আপনিই এখন আমাদের একমাত্র ভরসা বাপুজী। আপনি যদি দেশ-বিভাগের বিরুদ্ধে দাঁড়ান, তাহলে এখনো আমরা সামলে নিতে পারি।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন গান্ধীজী। তারপর একসময়ে বললেন—দেশ-বিভাগ যদি হয়, তবে আমার মৃতদেহের উপর দিয়েই হবে। আমি যতক্ষয বেঁচে আছি. ততক্ষণ কিছুতেই দেশ-বিভাগে সম্মতি দেব না।

'India could only be partitioned over my dead body alone. So long as I am alive, I will never agree to the partition of India.'

কিন্তু বাধা দেবেনই বা কি করে ?

ভাবনার পর ভাবনা। অস্থির চঞ্চল সব ভাবনা। দিনে রাত্রে। সময়ে

অসময়ে। কিন্তু সম্মুখের পানে তাকাতে গেলে কোথাও যে আলোর রেখা চোখে পড়ে না।

কিছুই ভাবতে হতো না, যদি সেই অবাধ্য ছেলেটা এখন কাছে থাকত। হিন্দুস্থান-পাকিস্তান বা দেশ ভাগাভাগির কোন প্রশ্নই হয়তো উঠত না। কিন্তু সে যে এখন কোথায়, কে জানে?

'আজ আমি একা। সম্পূর্ণ একা। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে, আমরা ভুল পথে চলেছি। ঠিক এই মুহূর্তে হয়তো তার পরিণাম আমরা উপলব্ধি করতে পারছি না, কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে, এই মূল্যের বিনিময়ে স্বাধীনতা পেতে হলে তার ভবিষ্যৎ হবে অন্ধকার।

কি হবে না-হবে তা দেখবার জন্য আমি হয়তো বেঁচে থাকব না, কিন্তু যে অশুভ আশংকা আমি করছি, তা যদি সত্য হয় এবং ভারতের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়, উত্তরকাল জেনে রাখুক, এই বৃদ্ধটি সেকথা চিন্তা করে কি যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটিয়েছে। একথা যেন না বলা হয়, ভারত-বিভাগে গান্ধীর সম্মতি ছিল।

আজ সবাই স্বাধীনতার জন্য অধৈর্য। কংগ্রেস দেশ-বিভাগ প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। এ প্রস্তাবে তাদের হাতে একটি করে কাঠের রুটি দেওয়া হয়েছে। খেলে পেটের যন্ত্রণায় মারা যাবে। না খেলে অনাহারে শুকিয়ে মরতে হবে।'

'Let it not be said Gandhi was a party to Indian vivisection. But everyone to-day is impatient for independence. Congress practically decided to accept partition. They have handed an wooded loaf in this new plan. If they eat it, they die of colic, if they leave it, they starve.

We may not feel the full effect immediately but I can see clearly that the future of independence gained at this price is going to be dark. I pray that God may not keep me alive to witness it.'

মল্লিকা, গান্ধীজী একশ পঁচিশ বছর বাঁচতে চেয়েছিলেন এ কাহিনী তুমিও হয়তো শুনে থাকবে। শুধু একবার নয়, একাধিক বারই তিনি এ আশা ব্যক্ত করেছিলেন বিভিন্ন সমাবেশে।

সেই গান্ধীজীর কণ্ঠে সেদিন কি মর্মান্তিক খেদোক্তি! 'ভারতবর্ষ বিভক্ত হলে—তার বিষময় ফলাফল দেখার জন্য আমাকে যেন বেঁচে থাকতে না হয়।'

নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস! সংগ্রামের শেষ প্রান্তে এসে কি অভাবনীয় পরাজয়! পরাজয় বৈকি। নিজের হাতে দেশজননীর অঙ্গচ্ছেদ করার চাইতে বড় পরাজয় আর কি থাকতে পারে মানুষের জীবনে?

ক্ষমতা অর্জনের রঙীন মোহে সবাই আজ আচ্ছন্ন। কিন্তু ইতিহাস!

ইতিহাস যে কিছুই ভোলে না। কাউকে ক্ষমাও করে না। সেখানে একটি কথাই শুধু চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হয়ে থাকবে যে, শুধু লীগই নয়, দেশ-বিভাগের জন্য কংগ্রেসও সমানভাবেই দায়ী।

'History would never forgive us if we agreed to partition. The verdict would then be that India was divided as much by the Muslim League as by Congress.'

[India Wins Freedom: Abul Kalam Azad]

পরের ইতিহাস তো তুমিও জানো।

১৫ই জুন দেশ-বিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হল কংগ্রেসের অধিবেশনে এবং সে প্রস্তাব সমর্থন করলেন স্বয়ং গান্ধীজী। তাঁর বক্তব্য: 'ওয়ার্কিং কমিটি যখন দেশ-বিভাগের প্রস্তাব মেনে নিয়েছে, তখন নিখিল ভারত কংগ্রেসের পক্ষে সে প্রস্তাব গ্রহণ করাই সংগত হবে। অন্যথায় কি মনে করবে পৃথিবীর মানুষ! হয়তো দেশের নেতৃত্ব তখন নতুন লোকের হাতে গিয়ে পড়বে, তার ফলে দেশ কংগ্রেসের অভিজ্ঞ লোকদের সহায়তা থেকে বঞ্চিত হবে। সেটা কোন দিক থেকেই কাম্য নয়।'

নিশ্চয় তুমি খুব অবাক হয়েছ মল্লিকা। ভাবছ—এ কি আশ্চর্য ব্যাপার।

যে গান্ধীজী দুদিন আগেও দেশ-বিভাগের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন, এমন কি 'দেশ বিভাগ যদি হয় তো আমার মৃতদেহের উপর দিয়েই হবে' বলে ঘোষণা করেছিলেন, হঠাৎ তাঁর এ কি বিস্ময়কর পরিবর্তন! কেন তিনি দেশ-বিভাগের প্রস্তাবে সমর্থন জানালেন সেদিনের সেই অধিবেশনে? কেন প্রতিবাদ করলেন না?

প্রতিবাদের পদ্ধতি তো তাঁর অজানা নয়। যেমন—অনশন। অনশন তাঁর জীবনে নতুন কিছু নয়। নিজের দাবী আদায়ের জন্য জীবনে এমন বহুবারই তিনি অনশন করেছেন। সেদিন কেন এই অনশনের কথাটা তাঁর মনে এল না? কেন তিনি অনশনে মৃত্যুবরণ করলেন না দেশ-বিভাগের আগে?

সর্বোপরি তাঁর নিজের সেই স্মরণীয় উক্তি। সাফল্যের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বড়লাট মাউণ্টব্যাটেন সেদিন তাঁকে কটাক্ষ করে হেসে বলেছিলেন: 'আজ থেকে কংগ্রেস আর আপনার সঙ্গে নয়, আমার সঙ্গে।'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন গান্ধীজী: 'কিন্তু ভারতবর্ষ এখনো আমার সঙ্গে।'

'Mr. Gandhi, to day the Congress is with me and no longer with you.'

'But India is still with me.' [Studies in Gardhism: Nirmal Kumar Bose: P.—284]

তাই যদি হয়, তাহলে কেন এই সর্বনেশে পথ বন্ধ করার জন্য সেদিন তিনি

ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে সংগ্রামের আহ্বান জানালেন না? কেন তিনি তা না করে আত্মসমর্পণ করতে গেলেন প্যাটেল-নেহরু চক্রের কাছে?

এই কেনর কোন সঠিক উত্তর আমি তোমাকে দিতে পারব না মল্লিকা! তবে বলা যত সহজ, কাজটা বোধ হয় সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে তত সহজ ছিল না।

গান্ধীজীর দূরদৃষ্টির অভাব ছিল না। একথা তিনি ভাল করেই জানতেন যে, ১৯৪২ সাল আর ১৯৪৭ সাল এক নয়।

সেদিন সহকর্মীদের আনুগত্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু দেশ-বিভাগের প্রশ্নে বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারিয়া, কৃপালনী প্রমুখ সবাই তখন বিপক্ষ শিবিরে জোটবদ্ধ।

এমন কি একান্ত স্নেহের পাত্র সর্দার প্যাটেল এবং জওহরলাল পর্যন্ত দূরে সরে গেছে অসীম উপেক্ষায়। এ অবস্থায় কাকে তিনি বাধা দেবেন? দিলেই বা সেকথা শুনবে কে?

না, কেউ শুনবে না। ক্ষমতার লোভ বড় ভয়ংকর জিনিস। তার রঙীন স্বপ্নে বিভোর হয়ে আজ যারা তাঁর সান্নিধ্য ত্যাগ করে দূরে সরে গেছে, ইচ্ছে করলেও এখন আর তাদের ফেরানো যাবে না। হাজার ডাকলেও না। গান্ধীজীর নিজের ভাষায়ঃ

'সবাই আমার ফটোতে মালা দেয়, প্রণাম করে, কিন্তু কেউ আমাকে অনুসরণ করে না।...আজ আমি বড় একা। এমন কি সর্দার প্যাটেল এবং জওহরলাল পর্যন্ত মনে করে যে, আমার ধারণা ভুল। দেশ-বিভাগই নাকি সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়।'

'Everybody is eager to garland my photo and salute and not to follow me....To-day I find myself all alone. Even the Sardar, and Jawharlal think that my reading of the situation is wrong and peace is sure to return if partition is agreed upon....'

এ তো গেল দলের নিকটতম সহকর্মীদের কথা। অপরদিকে কংগ্রেস কর্তৃক ক্রমাগত চাপ সৃষ্টির ফলে জাতীয়তাবাদী বামপন্থী দলগুলি তখন ছত্রভংগ। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ভাবধারা নিয়ে যারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, একটার পর একটা ঘা খেয়ে খেয়ে তারাও তখন বিধ্বস্তপ্রায়। তাহলে লড়াই চালাবেন তিনি কাদের নিয়ে?

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে...'

ব্যক্তিগত জীবনে একলা চলতে হয়তো কোন অসুবিধে নেই, কিন্তু গণ-আন্দোলন চালাতে হলে যে সমষ্টি চাই। কোথায় সেই সমষ্টি? কোথায় এক-জাতি একপ্রাণের সেই মিলিত কণ্ঠ?

না, নেই। আঁকড়ে ধরার মত কেউ নেই আজ কাছে-কিনারে, কেউ নেই। সামনে এগিয়ে যাবার মত কোন সুনির্দিষ্ট পথও নেই। তাই চোখের সামনে

ভারত-বিভাগ হতে দেখলেও এক্ষেত্রে তিনি নিরুপায়। ভগবানের পায়ে আত্মনিবেদিত এক অসহায় দর্শক ছাড়া এ ব্যাপারে আর তাঁর কিছু করণীয় নেই।

কিন্তু সীমান্ত গান্ধী?

ভারত-বিভাগ প্রস্তাব মেনে নিয়ে নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদী নেতা বাদশা খানকে যেভাবে অতল সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়া হল, তার সান্ত্বনা কোথায়?

সারা জীবন কি না তিনি করেছিলেন কংগ্রেসের জন্য? কি করতে বাকী রেখেছিলেন? দুর্ধর্ষ পাঠান জাতকে অহিংস মন্ত্রে দীক্ষিত করে যেভাবে তিনি কংগ্রেসের মধ্যে টেনে এনেছিলেন, তার তুলনা কোথায়?

অথচ ভারত-বিভাগ প্রস্তাব গ্রহণের ফলে তাঁর সেই সীমান্ত প্রদেশকে কিনা ঠেলে দেওয়া হল পাকিস্তানের দিকে। তাও কিনা তাঁর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে।

বাদশা খান চিরদিনই স্বল্পভাষী। সেদিনও তিনি কোন বিতর্কের ঝড় তোলেননি এ নিয়ে। শুধু সজল নয়নে গান্ধীজীর পানে তাকিয়ে একবার মাত্র বলেছিলেন—'বাপুজী, আপনি আমাদের নেকড়ের মুখে ঠেলে দিলেন।' 'You have thrown us to the wolves.'

বাদশা খানের এই ক্ষোভ মোটেই অযৌক্তিক ছিল না মল্লিকা। এ ক্ষোভ প্রকাশের অধিকার সেদিন নিশ্চই তাঁর ছিল। এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের মুখ থেকেই বরং কিছু শোনা যাক:

'দেশ-বিভাগ বা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশে 'রেফারেণ্ডাম' ইত্যাদি গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে আমাদের সঙ্গে কোন আলোচনা হয়নি। আমরা একথা জেনে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম যে, হাই কম্যাণ্ড ঐ দুটি বিষয়ে আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।

ওয়ার্কিং কমিটিতে আমারই পাশে মৌলানা আজাদ বসে ছিলেন। আমার হতাশা লক্ষ্য করে তিনি বললেন—আপনাদের এখন উচিত মুসলিম লীগে যোগ দেওয়া।

আজাদের উক্তি শুনে আমি ব্যথিত চিত্তে ভাবলাম যে, আমাদের এই সতীর্থরা এতদিন আমরা কি বলেছি, কিসের জন্য সংগ্রাম করেছি তা কত অল্পই না বুঝেছেন। ওঁরা কি ভেবেছিলেন যে, ক্ষমতার লোভে আমরা আমাদের আদর্শ পরিত্যাগ করব?'

'It pained me to find how little these comrades of ours had understood what we had stood for and fought for all those years. Did they imagine we would compromise our principles for the sake of power?' [With the Frontier Gandhi in Kabul: Pyarelal: Statesman: 6. 10. 65]

এসব কিছুই হতো না। আক্ষেপ করে বলছেন বাদশা খান, শুধু সুভাষের সাময়িক অনুপস্থিতির জন্যই এভাবে ভারত-বিভাগ করা সম্ভব

হল। জনসাধারণকে এই বলে ধোঁকা দেওয়া হল যে, এটাই নাকি সাম্প্রদায়িক সমস্যার যথার্থ সমাধান। পাছে সুভাষ আবার ফিরে আসে, সেই ভয়েই নেহরু এবং জিন্না সেদিন তাড়াতাড়ি শাসন-ক্ষমতা হাতে তুলে নিলেন এবং দুজনেই সমানভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিলেন।

'On the basis of communal feelings once in momentary absence of Subhas, India was divided giving bluff-solution of it, to the Nation,...being so much so afraid of Netaji Subhas that he might come out one day in this subcontinent, both Mr. Nehru and Mr. Jinnah sat together on the throne and lastly they proved themselves inefficient.'

[Times of India : 6. 4. 70]

১৮ই জুলাই ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হল বিলেতের পার্লামেণ্ট ভবন থেকে। আগামী ১৫ই আগস্ট ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হবে ভারতবর্ষে।

'As from the fifteenth day of August, nineteen hundred and forty seven, two Independent Dominions shall be set up in India, to be known respectively as India and Pakistan.'

একবারও কি জিন্নাসাহেব ভাবতে পেরেছিলেন যে, তাঁর জীবদ্দশায় তিনি কোনদিন পাকিস্তানের মুখ দেখতে পাবেন ?

না, পারেননি। প্রমাণ তাঁর নিজের মুখের স্বীকৃতি ঃ 'I never thought it would happen. I never expected to see Pakistan in my life.'

লোভ এবং ক্ষমতার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে সেই পাকিস্তানই তাঁকে উপঢৌকন দেওয়া হল ভারতভূমিকে বিভক্ত করে।

কে এর জন্য দায়ী মল্লিকা! সুভাষ! আজাদ হিন্দ্ ফৌজ! মাউণ্টব্যাটেন! জিন্না! না কি আমাদের ক্ষমতাপ্রয়াসী নেতৃবৃন্দ!

ওদিকে শিয়ালকোট, গুজরানওয়ালা, শেখপুরা, লায়ালপুর, মণ্টোগোমারী, লাহোর, অমৃতসর, গুরুদাসপুর, হোসিয়ারপুর, জলন্ধর, ফিরোজপুর ইত্যাদি প্রতিটি স্থানে তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে ভয়াবহভাবে। যদিও বড়লাট দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, কোথাও কোনরকম হাঙ্গামা বরদাস্ত করা হবে না। সেনাবাহিনী তো থাকবেই, অধিকন্তু দরকার হলে ট্যাঙ্ক এবং বিমানবাহিনীও হাঙ্গামা দমনের কাজে ব্যবহার করা হবে।

কিন্তু কোথায় বিমান আর কোথায় বা ট্যাঙ্ক! রক্তের নেশায় মানুষ তখন পশুর পর্যায়ে নেমে গেছে। শুধু একমাত্র লক্ষ্য—খুন চাই। রক্ত চাই। বদলা চাই।

মোট কত লোককে সেদিন প্রাণ দিতে হয়েছিল হিংসার আগুনে?

ব্রিটিশ সরকারের মতে একমাত্র পাঞ্জাবেই ৬ লক্ষ।

কিন্তু কিভাবে?

না, খুব একটা মেহনত করতে হয়নি তার জন্য। এ পর্যন্ত কোন সভ্য দেশে যা হয়নি, তাই সেদিন সম্ভব হয়েছিল আমাদের ভারতবর্ষে।

শিশুদের শূন্যে তুলে আছাড় মেরে শেষ করে দেওয়া হয়েছিল। মেয়েদের স্তন কেটে দেওয়া হয়েছিল পাশবিক অত্যাচার করার পরে। আর গর্ভবতীদের গর্ভপাত করে দেওয়া হয়েছিল একান্ত নৃশংসভাবে।

'...6,00,000 of them were killed. But no, not just killed. If they were children, they were picked up by the feet and their heads smashed against the wall. If they were girls, they were raped and then their breasts were chopped off. And if they were pregnant, they were disembowelled.'

[Leonard Mosley : P.—279]

না, মুখ ফেরালে চলবে না মল্লিকা। পুরো তালিকাটা একবার শুনে নাও।

সরকারী হিসেবে নিহত—৬,০০,০০০ ; গৃহহারা—১,৪০,০০,০০০ ; ধর্ষিতা নারী—১,০০,০০০ ; ধর্মান্তরিত বা নীলামে যে কত মেয়েকে বিক্রি করা হয়েছিল তার কোন সঠিক হিসেব পাওয়া যায়নি।

মল্লিকা, এর পরেও যে আমরা বিনা রক্তপাতে, সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছি তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ আছে কি?

বিনা রক্তপাতেই যদি হবে, তাহলে বিপ্লববাদের অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী ইতিহাসে যে শত শত শহীদের কথা লেখা রয়েছে, ওরা কারা?

বিংশ শতাব্দীর দুঃসহ অভিশাপ থেকে দেশকে ভারমুক্ত করার জন্য এই যে ইম্ফলের রণাঙ্গনে ওদেরই উত্তরপুরুষ, হাজার হাজার স্বাধীনতাকামী তরুণ প্রাণ চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে রয়েছে, ওরাই বা কারা?

আর চরম অবিমৃষ্যকারিতার মাশুল দিতে গিয়ে এই যে পাঞ্জাবে ৬ লক্ষ লোককে প্রাণ দিতে হল, এই যে লক্ষ লক্ষ নারীকে চরম মূল্য দিতে হল—ওরাই বা কারা?

স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে ওরা কি বিগত, বিস্মৃত, মৃত কতগুলো ফসিল মাত্র?

ওরা কি সাধ করে সেদিন ঘাতকের সামনে গলা বাড়িয়ে দিয়েছিল নিহত হবার জন্য? তোষণনীতি এবং দৌর্বল্যের মাশুল দিতে গিয়েই কি সেদিন ওদের প্রাণ দিতে হয়নি এমনি করে?

ভারতব্যাপী সেই বৈপ্লবিক ভাবধারাকে এভাবে থামিয়ে না দিয়ে উপযুক্ত নেতৃত্ব দিতে পারলে কোনদিনও ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হতো কি? এমন লোমহর্ষক বীভৎস কাণ্ড কোনদিন অনুষ্ঠিত হতে পারত কি?

সর্বকিছু ছাপিয়ে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নটাই হঠাৎ এভাবে বড় হয়ে দেখা দেবার কোন সুযোগ থাকত কি ?

কি সঙ্কটময় অবস্থা তখন ব্রিটিশের ! আত্মরক্ষার তাগিদে তারা তখন রীতিমত ভীত, সন্ত্রস্ত। বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের প্রিয় সঙ্গী ক্যাম্বেল জনসনের ভাষায় ঃ

'ভারতে আমাদের অধিকার আর কিছুদিন রাখতে হলে পাঁচ লক্ষ ব্রিটিশ সৈন্য নিয়ে গঠিত একটা দখলদার বাহিনী গঠনের প্রয়োজন হতো। তাছাড়া রুশীয় পদ্ধতিতে বর্তমান ভারতের সমগ্র জাতীয়তাবাদী নেতাকে গুলী করে মেরে ফেলারও প্রয়োজন হতো। অন্য কোন ব্যবস্থায় ভারতকে আমাদের অধীনে রাখা আর সম্ভবপর হতো না।'

[ভারতে মাউণ্টব্যাটেন ঃ পৃঃ ১৯৭]

সেই চরম সঙ্কটময় মুহূর্তে একযোগে সবাই রুখে দাঁড়ালে কিছুটা রক্ত-পাত হয়তো বা ঘটত, কিন্তু তার জন্য ৬ লক্ষ লোককে অহেতুক প্রাণ দিতে হতো কি ?

গত বিশ্বযুদ্ধে প্রধান দেশগুলো বাদে ক'টা যুদ্ধরত রাষ্ট্র ৬ লক্ষ প্রাণ বলি দিয়েছে, যা আমরা দিয়েছিলাম নিজেদের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে ?

আপস-আলোচনার ফাঁদে পা না দিলে এমন নারকীয় কাণ্ড কোনদিনও অনুষ্ঠিত হতে পারত কি ? কিন্তু সে যে কিছুতেই হবার নয়। স্বাধীনতা নিশ্চয়ই চাই, কিন্তু সে স্বাধীনতা অন্য কোন পন্থায় পেলে চলবে না, পেতে হবে শান্তিপূর্ণ আপস-আলোচনার মাধ্যমে, বিনা রক্তপাতে।

'Freedom was at hand, and it needed only to be nego-tiated, not bought with blood.'

[Michael Edwards: P.—126]

তাই হয়েছে কি ? সে কাহিনীই কি লেখা রয়েছে সেদিনের ইতিহাসের পাতায় ?

বরং সে আগুন আজো ধিকি-ধিকি জ্বলছে এখানে-ওখানে। জ্বলবেই। পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষের মধ্যে যে আগুনের সৃষ্টি, তা এত সহজে নেভানো যায় না।

জাতিগত বিরূপতা থেকে আসে জাতিগত ঘৃণা। জাতিগত ঘৃণা থেকে জন্ম নেয় অন্ধ আক্রোশ ও জাতিগত বিরোধ। শুধু মুখের কথায় তাকে দূর করা যায় না। পুঞ্জীভূত অসন্তোষের মধ্যে সম্প্রীতির সেতুবন্ধন গড়ে তোলা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব, যিনি নিজে যথার্থ অন্তরের ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান।

হ্যাঁ, সে যোগ্যতা সুভাষের ছিল। বলেছেন সীমান্ত-গান্ধী বাদশা খান। সুভাষ মানুষকে ভালবাসতেন। ভালবাসতেন দরিদ্র জনসাধারণকে। একমাত্র তিনিই পারতেন ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান থেকে এই সাম্প্রদায়িকতার বিষ মুছে ফেলতে।

'Gaffar Khan voluntarily said that his heartiest congratulation only would go to the only leader Netaji Subhas for his sincere act of love towards the poor. Only Subhas could wipe out the communal feeling plague in India and Pakistan.'

[Times of India: 6. 4. 70]

ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ছিন্নমূল নরনারীর দুর্ভাগ্য —যা হতে পারত, তা হল না।

তবু হয়তো এ দুর্ভাগ্যকে এড়ানো যেত, যদি আমাদের নেতৃবৃন্দ একটু ধৈর্য ধরতে পারতেন. কিন্তু ক্ষমতার মোহে নেহরু-প্যাটেল এবং তাঁদের বন্ধুগণ নাকের ডগায় ঝুলতে-থাকা মাউণ্টব্যাটেন-প্রদত্ত গাজর খণ্ডের লোভ সংবরণ করতে পারলেন না। ওটা তাঁরা গোগ্রাসে গিলে ফেললেন।

কথাটা আমার নয় মল্লিকা, জওহরলালেরই বন্ধু. রাজনৈতিক ভাষ্যকার লিওনার্ড মোসলের ঃ

'But for Nehru and Patel and all the Congressmen yearning for the fruits of power, the carrot Mountbatten dangled in front of their noses was too delectable to be refused. They gobbled it down.'

[The Last Days of The British Raj: P.—284]

আরো বলেছেন মোসলে ঃ 'শুধু একটু ধৈর্য। একটু ধৈর্য ধরতে পারলে অনেক দুঃখ পরিহার করা যেত। পত্রপাঠ মাউণ্টব্যাটেন-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাই ছিল গান্ধীজীর উপদেশ। ভারতের দিক থেকে সেটাই হতো সঠিক পথ-নির্দেশ।'

দেশের মুখ চেয়ে আর ক'টা দিন ধৈর্য ধরলে কি এমন ক্ষতি হতো ?

পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ভাষ্যকারের এই প্রশ্নের উত্তরে বেশ খোলাখুলি-ভাবেই বলেছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল ঃ

'আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। বয়েসও হয়েছিল। আমাদের মধ্যে খুব কম লোকেরই আবার বন্দীজীবন সহ্য হতো। অথচ অবিভক্ত ভারত চাইতে গেলে ওটা ছিল অপরিহার্য।

পাঞ্জাবে দাংগা-হাংগামা লেগেই ছিল। রোজই শুনছিলাম মানুষ-হত্যার কাহিনী। এ অবস্থায় ভারত-বিভাগ পরিকল্পনা মুক্তির পথ দেখালো। আমরা তাই মেনে নিলাম।'

'The truth is that we were tired men, and we were getting on in years too. Few of us could stand the prospect of going to prison again—and if we had stood out for a united India as we wished it, prison obviously awaited us....

We saw the fires burning in the Punjab and heard

everyiay of the killings. The plan of partition offered a way out and we took it.' [Ibid : P.—285]

সহজ এবং সরল স্বীকৃতি। এ স্বীকৃতির মধ্যে কোথাও এতটুকু অস্পষ্টতা নেই। বেঁচে থাকতেই স্বাধীনতার মুখ দেখতে কার না ইচ্ছা হয় ? কার না সাধ জাগে ?

তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায়। ব্যক্তিগত সাধ আহ্লাদের চাইতে দেশের স্বার্থটাই কি বড় নয় ?

উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩৭ সালেই বাংলা দেশে ফজলুল হক সাহেবের কৃষক-প্রজা পার্টি কংগ্রেসের সংগে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। সে প্রস্তাবে রাজী হলে ভাগাভাগির কোন প্রশ্নই উঠত না। কার্যত তা হতে পারেনি জওহরলালের জন্য। তাঁর এক গোঁ, কিছুতেই কোয়ালিশন নয়। তার ফলে বাংলা দেশ সহ কয়েকটি প্রদেশে গঠিত হয় মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা, যার অনিবার্য পরিণতি এই ভারত-বিভাগ।

সুভাষ তখন ইয়োরোপে। ফিরে এসে দেশের এই শোচনীয় পরিস্থিতি লক্ষ্য করে তিনি স্তম্ভিত। সঙ্গে সংগেই তিনি ছুটে গেলেন আসামে। কারণ, সেখানেও লীগ মন্ত্রিসভা। কয়েকজন নির্দলীয় সদস্যকে দলে টেনে এনে লীগ মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়ে অচিরেই সেখানে তিনি গড়ে তোলেন কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা, যার ফলে আসাম বেঁচে গেল অল্পের জন্য।

মল্লিকা, কেউ কি আজ একথা মনে রেখেছে যে, গোটা আসাম প্রদেশকেই যে সেদিন আমাদের হারাতে হয়নি, তার সবখানি কৃতিত্ব একমাত্র সুভাষের ?

অবশেষে সুভাষের বহু-আকাঙ্ক্ষিত সেই লালকেল্লার শীর্ষে খণ্ডিত ভারতের জাতীয় পতাকা উঠল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট।

সংগ্রামের বিনিময়ে নয়। আন্দোলন, বিদ্রোহ, বিপ্লব বা গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়েও নয়। শান্তিপূর্ণ আপস-আলোচনার মাধ্যমে।

কিন্তু কি শর্তে ?

না, সেসব এখন বলা হবে না। পাছে আমরা দুঃখ পাই, তাই সেসব শর্ত প্রকাশ করা হবে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির বাহান্ন বছর বাদে—১৯৯৯ সালে। অর্থাৎ সেদিনের সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেউ যেদিন বেঁচে থাকবেন না—সেই দিন।

'Official documents dealing with the transfer of power in India will not be officially released untill 1999.'

[Leonard Mosley]

কিন্তু কেন ? আজাদী বাহিনীকে সরকারী চাকুরিতে পুনর্বহাল করা চলবে না—এটা অনুমান করা যায়। ব্রিটিশের পয়লা নম্বর শত্রু সুভাষ বসুর ভাবমূর্তি ম্লান করে দিতে হবে—এটাও বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। তাছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে, যার জন্য এতখানি সতর্কতা ?

এ প্রসংগে ছোট্ট একটি ঘটনার দিকে আমি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মল্লিকা।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। তা বলে মাউণ্টব্যাটেনকে কিন্তু তখনো আমরা ছাড়িনি। তাই তিনিই হয়েছিলেন আমাদের প্রথম গভর্ণর জেনারেল।

পরবর্তী গভর্ণর জেনারেল পাকিস্তান-প্রস্তাবের সবচাইতে বড় সমর্থক চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারিয়া। কিন্তু কি শপথ-বাক্য সেদিন তিনি পাঠ করেছিলেন স্বাধীন ভারতের গভর্ণর জেনারেল হিসেবে? তার বয়ানটা কি ছিল?

শুনেছি আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অনেক প্রকৃত ইতিহাস নাকি দিল্লির ভূগর্ভে কালাধারে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। জানিনে, স্বাধীন ভারতের গভর্ণর জেনারেলরূপে চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারিয়ার এই শপথ-বাক্যটি তার মধ্যে স্থান পেয়েছে কিনা!

উল্লেখযোগ্য যে, এ শপথ তিনি নিয়েছিলেন স্বাধীনতাপ্রাপ্তিরও অনেক পরে—১৯৪৮ সালের ২১শে জুন তারিখে। আমি তার বয়ানটা তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি ঃ

'আমি চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারিয়া যথাবিধি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ, তাঁর বংশধর এবং উত্তরাধিকারীদের প্রতি আইনানুসারে বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকব এবং আমি চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারিয়া শপথ নিচ্ছি যে, আমি গভর্ণর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত থেকে সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ, তাঁর বংশধর এবং উত্তরাধিকারীদের সুচারু ও যথাযথভাবে সেবা করব।' [ফ্রীডম অফ ইণ্ডিয়া ঃ এ হোকস]*

১৯৫০ সালে নতুন সংবিধান রচনা কালেও সেই একই কথা। সেখানেও রাজানুগত্যের প্রশ্ন সেই একইভাবে বিদ্যমান। তাতে বলা হয়েছিল ঃ

' ভারত সরকার কমনওয়েলথ-এর পূর্ণ সদস্য হিসেবে রাজাকে সদস্য-রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতার প্রতীকরূপে এবং প্রধান হিসেবে মেনে নেবার অংগীকার করছে।'

মল্লিকা, সেদিন সুভাষের ভাবধারাকে এভাবে বর্জন না করলে এসবের আদৌ কোন প্রয়োজন হতো কি? যাক, চলো আবার আমরা ফিরে যাই সেই আগেকার কাহিনীতে।

১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ সাল।

স্বাধীনতা দিবস। একদিকে ঘরে ঘরে সেদিন উৎসবের বন্যা। ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, সবাই সেদিন আনন্দে ভরপুর। সবার চোখে-মুখে নতুন

---

* ১৯৭১ সালের ৮ই মে তারিখের সাপ্তাহিক 'যুগবাণী' পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত।

আশা, নতুন দিনের স্বপন। আমরা স্বাধীন। আমরা মুক্ত। দাসত্বের অভিশাপ থেকে আজ আমরা মুক্তি পেয়েছি।

অন্যদিকে আবার বহু ঘরেই সেদিন সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলেনি। রান্নাঘর অন্ধকার। উনোনও ধরানো হয়নি।

১৯০৫ সালে হাজার চেষ্টা করেও লর্ড কার্জন যে বঙ্গভঙ্গের প্রচেষ্টাকে শেষ পর্যন্ত সার্থক করে তুলতে পারেননি, সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করে তুলেছেন ১৯৪৭ সালের জাতীয় নেতৃবৃন্দ। তার মাশুল দিতে গিয়ে কোটি কোটি ছিন্নমূল নরনারীকে আজ শ্যাওলার মত ভাসতে ভাসতে কোথায় হারিয়ে যেতে হবে কে জানে?

কোথায় তাদের আশ্রয়? কোথায় সান্ত্বনা? কে দেবে তাদের পথের নির্দেশ?

না, কেউ নেই। চোখের সামনে অন্ধকারের তরল স্রোত। তিল তিল করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে পায়ের নীচেকার মাটি। চারিদিকে অথৈ জল। কোথাও কূল নেই।

কি মর্মান্তিক পরিস্থিতি সেদিন ডিভিশনাল কম্যান্ডার এম. জেড. কিয়ানী, কর্ণেল হবিবুর রহমান, কর্ণেল আই. জে. কিয়ানী, কর্ণেল ইশান কাদির, কর্ণেল এস. এ. মালিক প্রমুখ আজাদী বাহিনীর অধিকাংশ সেনা-নায়কদের সামনে!

এদিকে আজাদী বাহিনীর জন্য সমস্ত সরকারী দরজা বন্ধ, ওদিকে জিন্না সাহেবের সাদর আহ্বান—তোমরা সবাই ঘরে ফিরে এসো, আমি তোমা-দের সেনাবাহিনীতে স্থান দেব উপযুক্ত মর্যাদা সহকারে।

কি করব আমরা এখন! কোথায় যাব! ঘটনাচক্রে আমরা সবাই সীমান্তের ওপারের অধিবাসী, তা বলে নেতাজীর নেতৃত্বে কেউ তো আমরা হিন্দুস্থান বা পাকিস্তান কায়েম করার জন্য লড়াই করিনি।

লড়াই করেছি আজাদীর জন্য। অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার জন্য। আজ ভারত কি পারে না আমাদের এখানে একটু ঠাঁই দিতে? না কি আমাদের চলে যেতে হবে নেতাজীর স্বপ্নের এই ভারতভূমি থেকে?

—ময় নেহি যাউঙ্গা! হা-হা করে কেঁদে উঠলেন ইনটেলিজেন্স বিভাগের দুর্ধর্ষ অধিনায়ক কর্ণেল এস. এ. মালিক।

হায় নেতাজী! এরি জন্যই কি তোমার নির্দেশে আমি সেদিন ইম্ফলের ময়রাং-এর মাটিতে নিজের হাতে অখণ্ড ভারতের পতাকা তুলেছিলাম! আর আজ কি না আমাকে দূরে সরে যেতে হবে তোমার এই ভারতভূমি পরিত্যাগ করে?

কিন্তু কেন? তোমরা কি পার না এখানে আমাকে যে কোন রকম একটা কাজ জোগাড় করে দিতে? মাস গেলে দেড়শো টাকা পেলেই আমার চলে যাবে। না না, অতও লাগবে না। একশো টাকাই যথেষ্ট। এটুকুও কি আমি আশা করতে পারিনে তোমাদের কাছে?

মল্লিকা, মালিক সাহেবের সেই কান্না তোমরা দেখনি। দেখলে বুঝতে যে, পাঠানের কান্না কি জিনিস। কিন্তু নিষ্ঠুর ক্ষমাহীন সংসারে কতটুকুই বা তার দাম! তাই তাঁকেও সেদিন চোখের জল ফেলে বিদায় নিতে হয়েছিল তাঁর একান্ত প্রিয় নেতাজীর এই ভারতভূমি থেকে।

দেশপ্রেমের শাস্তি! হ্যাঁ, তাই। সেদিনের সেই বঞ্চনাকে দেশপ্রেমের শাস্তি বলেই মেনে নিয়েছিলেন হতভাগ্য ঐ আজাদী যোদ্ধার দল। 'I. N. A. felt that this was a punishment for their patriotism.'*

সুভাষ সেদিন কোথায়, যাঁর একমাত্র স্বপ্ন ছিল অখণ্ড ভারত?

সকাল থেকে সেদিন বিশ্রাম ছিল না দিল্লীর আকাশবাণী প্রতিষ্ঠানের। যাঁদের নেতৃত্বের বিনিময়ে এই খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা এসেছে, তাঁদের নামে সেদিন কত প্রশস্তি! কত ঋণ-স্বীকার! কত শ্রদ্ধা নিবেদন!

একবারও কি সেদিন আকাশবাণী থেকে উচ্চারিত হয়েছিল সুভাষের নামটা?

যে সুভাষ এবং আই. এন. এ.-র গৌরবকে মূলধন করে মাত্র কিছুদিন আগে কংগ্রেস নির্বাচনে জয়ী হয়েছিল, স্বাধীনতা দিবসের পুণ্য লগ্নে সেই কংগ্রেস ভুলেও কি একবার উল্লেখ করেছিল তাঁদের কথা?

না, করেনি। ভুলে নয়, ইচ্ছা করেই করেনি। সোজা কথায়—স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কেউ যদি কিছু মূল্য দিয়ে থাকে তো আমরা, অহিংসপন্থীরাই দিয়েছি। বাদ বাকি সব তফাৎ যাও। দূর হটো।

এ তোমার-আমার কথা নয়, এ ব্যক্তব্য রেখেছেন দেশবরেণ্য ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ

'What I have not been able to forget to this day, was that the name of Subhas Chandra Bose was not mentioned even once. This, I think, was not accidental. It was sought to be conveyed that independence had been won through "non-violence" and that Netaji and the I. N. A. had not contributed anything at all to it.

অথচ ইতিহাস কিন্তু এর বিপরীতটাই প্রমাণ করে মল্লিকা।

কি শোচনীয় পরিস্থিতি ছিল সেদিন ভারতবর্ষের! একদিকে 'ভারত-ছাড়' প্রস্তাবের ফলশ্রুতি হিসেবে গান্ধীজী থেকে শুরু করে সমস্ত নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ। অন্যদিকে প্রচণ্ড দমননীতির ফলে সেই আন্দোলনও তখন স্তব্ধ।

---

* উল্লেখযোগ্য যে, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের তাম্রপত্র দিয়ে সম্মানিত করা হলেও আজাদ হিন্দ ফৌজ বা নৌবিদ্রোহী-দের কোনরকম সম্মানিত করা হয়নি।

সেই বন্ধ্যা দিনগুলিতে কেউ যদি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে থাকেন, তবে একা সুভাষই তা করেছেন। সেদিনের পরিস্থিতিতে দেশে থেকে কিছু করা সম্ভব ছিল না, তাই করেছেন দেশের বাইরে থেকে। এমনকি শত্রু ব্রিটিশ পর্যন্ত সুভাষের সেই একক সংগ্রামের কথা স্বীকার করেছেন স্পষ্ট ভাষায়ঃ

'The fight for India's freedom was now to take place outside India and the actions of one man were to have profound effect upon the future.' [Michael Edwards : P.—96]

আশ্চর্য, তবু এতটুকু স্বীকৃতি নেই। বরং অপপ্রচার করা হয়েছে প্রচুর। শুধু স্বদেশে নয়, বিদেশেও। বিশেষ করে বিভিন্ন দূতাবাসগুলোর মাধ্যমে। শুধু একটি মাত্র ঘটনার কথা বলছি।

১৯৫৩ সালের কথা। ঘটনাস্থল—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সেদিন বিশিষ্ট মার্কিন নাগরিকদের উপস্থিতিতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্বন্ধে একটি তথ্যচিত্র দেখানো হচ্ছিল ভারতীয় দূতাবাসে। মার্কিন নয়, অন্যান্য রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণও উপস্থিত ছিলেন সেদিনকার সেই অনুষ্ঠানে।

প্রথমেই দেখানো হল গান্ধীজীকে। তারপর জওহরলাল, প্যাটেল, রাজাগোপাল, রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ সবাইকে। অবশেষে আধা নেতা, সিকি নেতা, হবু নেতাদের ছবিও দেখানো হল একে একে।

কিন্তু সুভাষ! সুভাষ কোথায়! না, একেবারে বাদ দেওয়া হয়নি। শেষের দিকে এক পলকের জন্য দেখানো হয়েছিল বৈকি। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে? কোন্ পরিচয়ে?

না, 'জয় হিন্দ্' ধ্বনির উদ্গাতা হিসেবে নয়। আজকের এই স্বাধীন ভারতের প্ল্যানিং কমিশনের স্রষ্টা হিসেবেও নয়। আজাদ হিন্দ্ সরকারের প্রধান বা ফৌজের সুপ্রীম কম্যান্ডার হিসেবে তো নয়ই। শুধু বলা হল—'ইনি সেই লোক, যিনি গান্ধীজী অহিংসার মাধ্যমে যা করতে সক্ষম হয়েছেন, তা করতে পারেননি।'

...'I winced as the commentator summed him up as one who could not achieve what the Father of the Nation did by himself through non-violence, ahimsa. I felt like protesting then and there, the more so as I had heard the judicial armchair verdict...' [Dilip Kumar Roy : Bulletin of the Netaji Research Bureau, 1965]

ব্যস, এইটুকুই। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এইটুকুই শুধু সুভাষের অবদান। তাছাড়া আর কিছুই সুভাষ করেননি দেশের জন্য।

অবাক হবার কিছু নেই মল্লিকা। বরং এটাই স্বাভাবিক। কারণ, স্বাধীনতা আন্দোলন আর স্বাধীনতা সংগ্রাম এক জিনিস নয়। ভারতবর্ষে

সেদিন যা হয়েছিল, সেটা হল মূলতঃ আন্দোলন। যেমন—লবণ আন্দোলন, সত্যাগ্রহ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, আগস্ট আন্দোলন ইত্যাদি।

আর সুভাষ যা করেছিলেন, সেটা হল সংগ্রাম। সুতরাং এই দুই-এর চিন্তাধারার মধ্যে ফারাক তো কিছু থাকবেই।

তবু তর্কের খাতিরে তাই মানলাম। মানলাম যে, গান্ধীজী অহিংস পন্থায় যা করতে সক্ষম হয়েছেন, সুভাষ তা করতে পারেননি। কিন্তু যদি উল্টোটা বলা হতো?

তথ্যচিত্রে নেতৃবৃন্দের পরিচয় দিতে গিয়ে কারো কারো বেলায় এককথাই যদি বলা হতো যে, 'এঁরাই সেই স্বনামধন্য পুরুষ, যাঁরা ক্ষমতার লোভে গান্ধীজীকে অস্বীকার করে, তাঁর সম্পূর্ণ অমতে, তাঁকে গোপন করে দেশ-বিভাগের মত একটি মহৎ কাজে ব্রতী হয়েছিলেন'—তাহলে খুব ভুল বলা হতো কি?

আর সুভাষের বেলায় যদি বলা হতো, 'ইনিই সেই নির্লোভ, অগ্নিশুদ্ধ মহানায়ক, যিনি গান্ধীজীর অখণ্ড ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য শেষ পর্যন্ত আপসহীন লড়াই চালিয়েছিলেন'—তাহলে সেটাই খুব মিথ্যে বলা হতো কি?

'কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।'

কোথায় আজ গান্ধীজী! কোথায় বা তাঁর সেদিনকার সেই সহকর্মীর দল! অনেকেই বেঁচে নেই। কিন্তু ইতিহাস! মানুষ ভুলে যায়, কিন্তু ইতিহাস যে কোনকিছুই ভোলে না মল্লিকা।

আজ আমরা কথায় কথায় গান্ধীজীর নামে জয়ধ্বনি দিই, কিন্তু কতখানি মর্মান্তিক দুঃখে যে সেদিন ঐ সাতাত্তর বছরের নিঃসংগ মানুষটির চোখে জল এসেছিল, সে কথা ভাবতে পার একবার! কে তার জন্য দায়ী সুভাষ! সুভাষ তখন কোথায়!

'ওরা আমার ফটোতে মালা দেয়, কিন্তু আমাকে মানে না'—এই নির্মম খেদোক্তি যেদিন গান্ধীজীর মুখ থেকে শোনা গিয়েছিল, সেদিনই বা সুভাষ কোথায়?

নীতিগত কারণে সুভাষ গান্ধীজীর অমতে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন, একথা সত্য। কিন্তু এ বিরোধিতা তো তিনি প্রকাশ্যেই করেছিলেন। এর মধ্যে ছল-চাতুরির বা গোপনীয়তার স্থান কোথায়?

বরং অন্তর্ধানের পূর্বে নিজে থেকেই তো তিনি গান্ধীজীর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর পরিকল্পনার কথা। বলেছিলেন, 'আমি একবার বাইরে গিয়ে আঘাত হানতে চাই। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন।'

উত্তরে গান্ধীজী বলেছিলেন, 'আমার পথ আলাদা, তবু তুমি যদি কৃতকার্য হও, তাহলে আমিই সেদিন তোমাকে অভিনন্দন জানাব সবার আগে।'

মল্লিকা, আছে কি কোথাও এর মধ্যে গান্ধীজীকে অস্বীকার করবার মত সামান্যতম নজীর?

আর অহিংসা! কই, অহিংস-মন্ত্রের ঋষি স্বয়ং গান্ধীজী তো এমন দাবী কোনদিনই করেননি যে, স্বাধীনতা-সংগ্রামে যা কিছু অবদান, সবই অহিংসবাদীদের! বরং যা সত্য, যা বাস্তব, তাই তো তিনি স্বীকার করেছিলেন দ্বিধাহীন চিত্তে। বলেছিলেন:

'ভারতবর্ষে অহিংসার উপযুক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা কোনদিনই করা হয়নি। তবে আশ্চর্য এই যে, আমরা এ পর্যন্ত হিংসা-অহিংসার মিশ্রণেই এত কিছু লাভ করেছি।'

'We in India have never given non-violence the trial it deserves. The marvel is that we had attained so much even with our mixed violence.' [Harijan: 20. 4. 40]

তাহলে কার কথা আমরা বিশ্বাস করব মল্লিকা? স্বয়ং গান্ধীজীর কথা, না কি তাঁর পরবর্তী কালের ভাবশিষ্যদের মন-গড়া কথা?

তবু সেই অপপ্রচারের অন্ত নেই। বছরের পর বছর ধরে চলছে তো চলছেই। প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে একমাত্র চেষ্টা, তোমরা যেন স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে জানতে না পারো। তোমরা যেন সুভাষকে ভুলে যাও।

কিন্তু কেন? সুভাষ আজ ভাল-মন্দ, নিন্দা-প্রশংসা সব কিছুর আড়ালে। কে তাঁকে স্বীকৃতি দিল, কে দিল না, তাতে তাঁর কিছুই এসে যায় না। তাহলে কেন এই চিত্ত-দারিদ্র্য?

জানি কিছুটা অসুবিধে রয়েছে। কারণ, আজ সুভাষকে স্বীকৃতি দিতে হলে পরোক্ষভাবে একথাই স্বীকার করতে হয় যে, সুভাষ ভ্রান্ত নন, প্রকৃতপক্ষে আমরাই সেদিন ভ্রান্ত পথে চলেছিলাম দিশেহারা হয়ে।

আরো স্বীকার করতে হয় যে, ১৯৩৯ সাল থেকে আমাদের লড়াই ছিল প্রধানত সুভাষের বিরুদ্ধে, আর সুভাষ লড়াই করেছিলেন ব্রিটিশের বিরুদ্ধ। একথাও স্বীকার না করে উপায় নেই যে, হাজার বিরোধিতা সত্ত্বেও সেদিন সুভাষ একা যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, আমরা সবাই মিলেও তা পারিনি।

এ কি স্বীকার করা সম্ভব! কেউ কি তা পারে কখনো! সুতরাং চেপে যাও। সব চেপে যাও।

কিন্তু ইতিহাস! সংসারে একদল বীজ বপন করে, আর একদল সেই ফসল ঘরে তোলে—এটা নতুন কিছু নয়। তা বলে যা সত্য, যা শাশ্বত, ইচ্ছা করলেই কি সেই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে চেপে রাখা যায়?

না, যায় না। তাই স্বদেশে একদিকে যখন সুভাষ ভ্রান্ত, সুভাষ অপরিণামদর্শী এমনি হরেকরকম অপপ্রচারের কথা শুনি, ঠিক তখনই আবার অন্যদিকে বিদেশীদের কণ্ঠে শোনা যায় বিপরীত কথা।

মাত্র দু-একজনের কথা তোমাকে বলছি। প্রথমে শোন আলেকজান্দার ওয়র্থ-এর কথা:

'এমন একদিন আসবে, যেদিন নেতাজী সংগ্রামী নায়ক গ্যারিবল্ডির মতই ইতালীতে সম্মানিত হবেন, যিনি গত শতাব্দীতে অস্ট্রিয়ার হাত থেকে নিজের দেশকে স্বাধীন করার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। কম্যুনিস্ট চীনে সান-ইয়াত-সেনের মতই বিরাট বলে প্রতিপন্ন হবেন, যিনি জাপান থেকে চেষ্টা করে চীনকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন রাজবংশের অনাচার থেকে। আজ হোক বা কাল হোক ডি ভ্যালেরার মতই তিনি স্বীকৃতি পাবেন, যিনি আয়ার-ল্যান্ডকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন ব্রিটিশের হাত থেকে। এবং শেষ পর্যন্ত ইয়োরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রে তাঁকে তুলনা করা হবে ম্যাসারিকের সংগে, যিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতার জন্য লড়াই চালিয়েছিলেন ব্রিটেন থেকে।'

...'He will be honoured in future day in Italy like the great Garibaldi who tried to liberate his country from Austria during the last century. In communist China, Netaji will have the dimension of a Sun-Yet-Sen who, by operating from Japan, succeeded in freeing China from the abuses of the Chinese Imperiol Dynasty.

Netaji will sooner or later surely also be recognised as a De Valera who started to liberate Ireland from the United Kingdom. And finally Netaji will probably be estimated in most other European countries to the same degree as Massaryk who operated from Britain for the Independence of Czechoslovakia.'

[Alexander Werth: Netaji in Germany: P.—7]

একই প্রশস্তি আজ সুভাষের চিরশত্রু ব্রিটিশের কণ্ঠেঃ

'ধারণার বিশালতা, দুরন্ত উৎসাহ, যা অন্যকে আকৃষ্ট করে, ব্যক্তিগত প্রাণশক্তি—আত্মোৎসর্গকারী দেশভক্তির ঐতিহ্য—এই সব কিছু মিলিয়েই সুভাষচন্দ্র বসুর মহত্বের পরিমাপ করতে হবে। ভারতের ইতিহাসে তাঁর স্থান অনস্বীকার্য। ... তাঁর দুরন্ত সাহস, বীরত্বব্যঞ্জক চালচলন, বিপদ অগ্রাহ্য করা বেপরোয়া ভাবের জন্য সারা ভারতবর্ষের হৃদয় তিনি জয় করেছিলেন। নিজের দেশকে তিনি অনেক কিছু দিয়ে গেছেন।'

'By the magnitude of his conception, by the example of his magnetic, burning zeal, his tenacity and personal force, by the tradition he left of sacrificial patriotism, must be measured the stature of Subhas Chandra Bose.

His place in Indian history cannot be denied....his youthful daring, his 'Panache', his reckless courage cought

the imagination of India. He gave much to his country. Even after the ruin of all he built, something of substance remained.' [Hugh Toye : P.—180]

খুব সংক্ষেপে মোক্ষম কথাটি বলেছেন শত্রুপক্ষের অপর ভাষ্যকার মাইকেল এডোয়ার্ডস্ঃ ভারতবর্ষ অন্য যে কারো থেকে তাঁর কাছে অনেক বেশি ঋণী।

'India owes more to him (Subhas Chandra) than to any other man.'

আর স্বদেশে! লক্ষ্য করো মল্লিকা, অহিংসার নবীন ভাষ্যকাররা সুভাষকে যেভাবেই চিত্রিত করে থাকুন না কেন, অহিংসার উপাসক স্বয়ং গান্ধীজী কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁদের বক্তব্যের সঙ্গে মোটেই একমত নন। বরং ঐ বিদেশী-দের মতই তাঁর বক্তব্য হলঃ

'সুভাষ ইতিহাস-পুরুষ। ইতিহাসে তাঁর কথা সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল।'

'The greatest lesson that we can draw from Netaji's life is the way in which he infused the spirit of unity amongst his men so that they could rise above all religious and provincial barriers and shed together their blood for the common cause.

His unique achievement would surely immortalize him in the pages of history.'

আর সুভাষ কি ভ্রান্ত? স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাইরে গিয়ে তিনি কি কিছুমাত্র ভুল বা অন্যায় করেছিলেন?

না, সে-কথাও গান্ধীজী স্বীকার করতে রাজী নন। তাঁর অভিমতঃ 'তুলসীদাস বলেছেন, যিনি সাঁত্যকারের বীর্যবান, তিনি সব কিছু অন্যায়ের ঊর্ধ্বে। সুভাষ বীর্যবান পুরুষ। তাকে কোন অন্যায়ই কোনদিন স্পর্শ করতে পারে না।'

'I would vouch that there was no one in India to-day who would think that his escape was an act of crime.

As Tulsidas has said that no wrong attaches to the really mighty, so no blame could be ascribed to Netaji's name for his escape.'

কই, চেপে রাখা গেল না তো! যাবেও না কোনদিন। কারণ, মানুষের মৃত্যু আছে, কিন্তু ইতিহাসের মৃত্যু নেই। তাকে মুছে ফেলা যায় না। চেপে রাখা যায় না। বরং সেই চেপে রাখার ইতিহাসই পরবর্তীকালে একটা হাস্য-কর ইতিহাস হয়ে দাঁড়ায় জনসাধারণের কাছে।

তাহলে কেন এই হীন প্রচেষ্টা?

মল্লিকা, তুমি জানো, জীবনে আমি কোনদিনও রাজনীতি করিনি। কোন দলের সঙ্গেও যুক্ত ছিলাম না কোনদিন। তাই দলবাজীর কচকচির মধ্যে না গিয়ে সোজা সরলভাবে একটা প্রশ্ন রাখছি তোমার কাছে।

সুভাষের ইতিহাস জাতীয়তাবাদের ইতিহাস। তাকে বর্জন করলে আসলে কার ক্ষতি? সুভাষের, না দেশের?

আজো অনেককে বলতে শোনা যায় যে, আমাদের জাতীয় চরিত্র নাকি এখনো উপযুক্তভাবে গড়ে ওঠেনি।

দুঃখের হলেও একথা নির্মম সত্য। কিন্তু কেন? স্বাধীনতার বয়েস তো কম হয়নি! এতদিনেও কেন আমাদের জাতীয় চরিত্র উপযুক্তভাবে গড়ে ওঠার সুযোগ পেল না?

অন্যদিকে সুভাষের বালসেনাদের কথাই ধরো। কতই বা সেদিন বয়েস ছিল তাদের। কারো বয়েসই চৌদ্দ-পনের বছরের বেশি নয়। অথচ সেই অপরিণত কিশোরের দল সেদিন যে কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, তা ভাবতে গেলে স্তম্ভিত হতে হয়।

একবার সাইরেন বেজেছে কি ব্যস্। অমনি সবাই আজাদ হিন্দ্ ব্যাঙ্কের দরজায় গিয়ে হাজির। আমরা রেডি স্যার।

নিমেষে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হতো রাশি রাশি লোহার ক্যাশ বাক্স। যাও, যে যেদিকে পার ছুটে গিয়ে আশ্রয় নাও। অল্-ক্লিয়ার ধ্বনি শুনলে আবার এসে এগুলো ফিরিয়ে দিয়ে যেও ব্যাঙ্কের কাউণ্টারে।

কি থাকত ঐ সব ক্যাশ বাক্সের ভেতরে? থাকত তাল তাল সোনা আর জনসাধারণের গচ্ছিত রাশি রাশি অলংকার।

খুবই দুঃসময় চলছিল তখন আজাদী সরকারের। একটানা বোমাবর্ষণ চলছে তো চলছেই। এ সময়ে কে-কার খবর রাখে! কেউ একটা বাক্স নিয়ে গা-ঢাকা দিলেও তখন বলার কিছু ছিল না। এটাই তখন মনে করা স্বাভাবিক ছিল যে, হয়তো সে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বোমা বিস্ফোরণের ফলে!

আশ্চর্য, তা সত্ত্বেও একটা বাক্সও এদিক-ওদিক হয়নি কোনদিন। একটাও খোয়া যায়নি। একটাও হারায়নি। যদিও তারা ভাল করেই জানত যে, কি অমূল্য সম্পদ রয়েছে ঐ ক্যাশ বাক্সের অভ্যন্তরে।

এই তো জাতীয় চরিত্র। এই তো জাতীয় শিক্ষা। কিন্তু কি দেখছি আজ আমাদের স্বাধীন দেশের পানে তাকিয়ে! সর্বত্র লোভ, দুর্নীতি আর স্বার্থপরতা। সর্বত্র সুবিধাবাদের জয় জয়কার।

এই কি স্বাধীন দেশের চেহারা? এই স্বাধীনতাই কি সেদিন চেয়েছিলেন জাতির জনক গান্ধীজী? এই স্বাধীনতার জন্যই কি সেদিন সুভাষের নেতৃত্বে সাতাশ হাজার তরুণ প্রাণ দিয়েছিলেন ইম্ফলের রণাঙ্গনে?

কেন এমন হল? কেন ১৯৪৪ সালে সুভাষের নেতৃত্বে যা সম্ভব হয়েছিল আজ ১৯৭৪ সালে স্বাধীন ভারতে তা সম্ভব নয়?

কেন আজ তরুণ সমাজ বিভ্রান্ত? কেন আজ দেশের ভবিষ্যৎ ছাত্র-সমাজ দিশেহারা? জাতির এই চরম অবনতির জন্য কে দায়ী?

উত্তর পাবে পরম শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী নায়ক স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়ের কয়েকটি মূল্যবান কথার মধ্যেঃ

'এত দুর্দশায়ও কিছুমাত্র নিরাশ হবার কারণ থাকত না, যদি জাতির তরুণ-শক্তি বিভ্রান্ত ও বিপথগামী না হতো। তার গতিধারা যে মাথা খুঁড়ে মরছে প্রকাশিত হবার আবেগে। কিন্তু অন্ধ আবর্তের প্রাচীর ভেঙে ছুটে চলার আহ্বান তাকে কেউ শোনায় না। দুঃসহ সুন্দরের পথ-সংকেত তাকে কেউ দেয় না। ভুয়ো নেতৃত্ব অথবা অসৎ-এর প্রলোভন ভরা ইঙ্গিত তাকে স্বভাবচ্যুত করে ফেলেছে।

স্বাধীনতার পূর্বে পঞ্চাশ বছর ধরে এই 'মানুষ' গড়ার ভার নিয়েছিলেন বিপ্লবীরা। কাজেই তাঁদের লোক মানুষেরই মত দুর্জয় আঘাত হানতে পেরে-ছিলেন 'অন্যায় যে করে' তার বিরুদ্ধে।

কিন্তু বিপ্লবের এ শিক্ষা অহিংস কংগ্রেসীরা নিলেন না। তাঁরা হিংসার দোহাই দিয়ে বীর্যকে তাড়িয়ে দিলেন। বীরত্বকে বর্জন করে মেকী-অহিংসার পথে তাঁরা যাকে পূজা দিলেন, সে 'ক্লীব'। শৌর্যকে বধ করে 'মানুষ গড়া'র কাজ হয় না। যথার্থ অহিংসালব্ধ দুর্জয় আত্মিক-শক্তিকে বাদ দিয়ে কপট আত্ম-বিলাসে মগ্ন থেকে তরুণকে সঠিক পথ দেখানো চলে না।

বিপ্লবের যে শাশ্বত অবদান, তাকে ব্যক্তি বা জাতির জীবনে অগ্রাহ্য করতে নেই। চিরকাল জাতির যুব-শক্তির কাছে তুলে ধরতে হয় তার দেশের শৌর্যশালী ঐতিহ্যের কথা এবং বিপ্লবের বাণী। যে গুণাবলী পরাধীনকে 'স্বাধীন' করে, সেসব গুণাবলী হারিয়ে ফেললে অর্জিত স্বাধীনতাকেও হারাতে হয়।

বিপ্লবের শাশ্বত অবদান—আত্মদান, সাহসিকতা, মৃত্যুভয়শূন্যতা, এক-নিষ্ঠা, কর্মস্পৃহা, পরার্থবোধ এবং সবকিছু জড়িয়ে নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা। ...জাতির জীবনে ঐ সব গুণাবলী সাদরে বরণ না করলে তার 'যৌবন' দেউলে হয়ে যাবে এবং শুরু হবে দুর্দিন। সে দুর্দিন চরমে পৌঁছতে দেরী হবে না। তখন পুনর্বিপ্লব ঘটাবার জন্য জাতিকে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে সেই ক্ষুদিরাম-পর্ব থেকে।

কাজেই আজই তাদের বিশেষ করে শোনানো প্রয়োজন বিপ্লবের শাশ্বত বীর্যবত্তার কাহিনী, আত্মদানের কীর্তি। মৃত্যুহীন বিপ্লববাদ—বাংলা তথা ভারতের অমর ঐতিহ্য—তারা জানুক এবং বুঝুক। আপন প্রাণের তারে তারা অনুরণিত করুক সেদিনকার বিপ্লবীদের কর্মইতিহাসের শৌর্যবাণী। আজকের যাত্রী পূর্বগামীদের উদ্দেশে বলুক যে, তাঁদের তারা ভোলেনি।'

[সবার অলক্ষ্যেঃ ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়ঃ পৃঃ ২৯৭-৩০৩]

কথাগুলো খুবই সত্যি মল্লিকা। সেদিন আর কিছু না থাকলেও গর্ব

করার মত চরিত্র আমাদের ছিল। আজ কোথায় সেই চরিত্র? কোথায় বা সেই জাতীয় শিক্ষা? এর শেষই বা কোথায়?

আগামী দিনের সেই অশুভ ছবিটা চোখে পড়তে দেরি হয়নি দেশবরেণ্য বিপ্লবী নায়কের। তাই অন্তরের প্রেরণায় কণ্ঠে তাঁর ব্যাকুল আহ্বান। আর সময় নেই। ওঠো, জাগো। স্বাধীনতা-সংগ্রামে যাঁরা জীবন পণ করেছিলেন, দুঃখকে জয় করে দুঃখাতীতের মুক্তির সন্ধানে অভিযাত্রী হয়েছিলেন, তাঁদের তোমরা স্মরণ করো। স্মরণ করো নেতাজী সুভাষকে।

অবাক হবার কিছু নেই মল্লিকা। এটাই নিয়ম। ইতিহাস এমনি করেই যুগে যুগে ফিরে আসে। ফিরে আসে নিজের প্রয়োজনেই। ইতিহাসের সেই শিক্ষাকে নিষ্ঠাসহকারে গ্রহণ করতে পারলে লাভ আমাদেরই, ইতিহাসের নয়। তাই যা সুন্দর, যা শিক্ষণীয়, সেই কল্যাণকর ইতিহাসকে বার বার স্মরণ করা প্রয়োজন।

বিশেষ করে সুভাষের ইতিহাস।

শান্তি বা ভোগ-বিলাসের দিনে হয়তো তার ততটা প্রয়োজন নেই, কিন্তু যেদিন সত্যিই ঘরে-বাইরে ঝড় উঠবে, যেদিন দুর্দিনের অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠবে, চোখের সামনে ঘনিয়ে আসবে শুধু হতাশার কালো অন্ধকার, সেই কঠিন কঠোর সংগ্রামের দিনে সর্বত্যাগী ঐ রুদ্র সন্ন্যাসীর কথাই যে মানুষের মনে পড়বে বার বার।

মনে পড়বে তাঁর সেই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার কথা। মনে পড়বে তাঁর অবিস্মরণীয় সংগ্রামের কথা। মনে পড়বে সেই ঐতিহাসিক ইম্ফল রণাঙ্গনের কথা, যেখানে আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের শেষ অধ্যায় রচিত হয়েছিল রক্ত-ঝরা ১৯৪৪ সালে।

এই সেই ইম্ফল রণাঙ্গন।

আশ্চর্য, সব যেমন ছিল, তেমনিই রয়েছে। কোথাও কোন পরিবর্তন নেই। সবই চলছে আগেকার মত। সবই চলবে সংসারের অপরিবর্তনীয় নিয়মের নির্দেশে।

কাছে নেই শুধু সুভাষ। আর নেই মুক্তি-পাগল সেই হাজার হাজার আজাদী সৈনিকের দল।

কোথায় গেল ওরা! মনে হয়, কাছে-কিনারেই কোথাও হয়তো রয়েছে। এখুনি হয়তো ওরা হাজার হাজার কণ্ঠে রণধ্বনি তুলবে—চলো দিল্লী! চলো দিল্লী! চলো দিল্লী!

প্রণাম কর মল্লিকা, প্রণাম কর।

প্রণাম কর এই ইম্ফলের মাটিকে, যার প্রতিটি স্তূপের নীচে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে রয়েছে কত নাম-না-জানা মানুষ, কত চাপাকান্না, কত আকাঙ্ক্ষা, কত স্বপ্ন আর প্রাণদানের কাহিনী।

প্রণাম কর এই ইতিহাসের নায়ক মহাক্ষত্রিয় নেতাজী সুভাষকে, যিনি সেদিন রুদ্র তেজে জ্বলে উঠে বলেছিলেন. 'আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।'

প্রণাম কর হাজার হাজার উৎসর্গীকৃত-প্রাণ শহীদকে, যাঁদের অসংখ্য কঙ্কাল এখনো তুমি খুঁজে পাবে ইম্ফলের প্রান্তরে। সবাইকে প্রণাম কর।

'জেনেছ কি—
আমার প্রকাশে অনেক আছে অসমাপ্ত,
অনেক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, অনেক উপেক্ষিত ?'

—রবীন্দ্রনাথ

২৩শে জানুয়ারি, ১৯৭৪ সাল।

আজ সুভাষের জন্মদিন। ঠিক দশ বছর আগে এমনি এক ২৩শে জানুয়ারিতে তোমাকে আমি এ কাহিনী বলতে শুরু করেছিলাম মল্লিকা। আজ আবার তার সমাপ্তি-রেখা টানছি সেই ২৩শে জানুয়ারিরই পুণ্যলগ্নে।

না, তোমার সেই প্রশ্নটা আমি ভুলিনি। তবে প্রশ্নটা আজ শুধু তোমার একার নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের। তাদের সবারই সেই একই জিজ্ঞাসা—সুভাষ কি বেঁচে আছেন, না কি সত্যই তিনি নিহত হয়েছিলেন বিমান দুর্ঘটনার ফলে ?

প্রশ্নটা যত সহজ, উত্তরটা তত সহজ নয় মল্লিকা। সহজ হলে দীর্ঘ ঊনত্রিশ বছর ধরে এ প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকত না। বিশ্বের সেরা সেরা গোয়েন্দার দলকেও এভাবে পদে পদে নাজেহাল হতে হতো না।

হয়তো বলবে—কেন, অনেকেই তো বলেছেন যে, সুভাষ বেঁচে আছেন। তাঁদের কথা কি বিশ্বাসযোগ্য নয় ?

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয় মল্লিকা। সুভাষ বেঁচে থাকুন এটা সবারই কাম্য। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি সশরীরে আত্মপ্রকাশ না করবেন, ততক্ষণ কি করে এর একটা সর্বজনসম্মত মীমাংসা হতে পারে, তুমিই বলো !

মৃত্যু সম্বন্ধেও সেই একই কথা। প্রমাণ কোথায় ! না নেই। যে যা-ই বলুক না কেন, কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নেই। বরং আদৌ কোন বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছিল কিনা সে সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে যথেষ্ট।

সত্যি বলতে গেলে বিরাট এই ভারতবর্ষে 'বিমান-দুর্ঘটনায় সুভাষের মৃত্যু ঘটেছে'—একথা বিশ্বাস করেন মাত্র দুজন। এক—পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, আর মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান।

না, কথাটা ঠিক হল না। যোদ্ধা শাহনওয়াজ খান বিশ্বাস করেন না ; বিশ্বাস করেন ভারত সরকারের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী শাহনওয়াজ খান। প্রমাণ—তখনকার সময়ের সংবাদপত্র। যোদ্ধা শাহনওয়াজ খান স্পষ্টই সেদিন বলেছিলেন, আমি বিশ্বাস করি, আগামী জন্মদিনে তিনি স্বয়ং আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকবেন।'

[আনন্দবাজার ঃ ২৫. ১. ৫১]

মতটা বদলে গেল কিছুদিন বাদেই। তখন তিনি জওহরলালের একান্ত বিশ্বাসভাজন ভারত সরকারের একজন উচ্চপদস্থ পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী।

এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের আচরণ আগাগোড়াই দুর্ভাগ্যজনক। সুভাষ তাঁর পুরনো সহকর্মী। সে হিসেবে সুভাষের তদন্তের ব্যাপারে নিজে থেকে তিনি উদ্যোগী হবেন—এটাই তো সেদিন সবাই আশা করেছিল তাঁর কাছে থেকে।

খুবই দুঃখের কথা যে, কার্যত তা হয়নি। বরং তদন্তের প্রস্তাবে বিরোধিতাই তিনি করেছিলেন বার বার। তাঁর এক কথা—সুভাষ বেঁচে নেই, সুতরাং তদন্ত নিষ্প্রয়োজন।

আবার দাবী, আবার বিরোধিতা। যুক্তিঃ এ দায়িত্ব আমাদের নয়, জাপানের। তারা যদি তদন্ত করতে চায় তো করতে পারে। আমরা তখন চেষ্টা করব তাদের সাহায্য করতে।

চমৎকার যুক্তি! সুভাষ সম্বন্ধে আমাদের কোন দায়িত্ব নেই, সে দায়িত্ব কিনা জাপানের! যেন সুভাষ ভারতবাসী নন, একজন জাপানী মাত্র।

অনেক টালবাহানার পরে অবশেষে কমিটি গঠনে সম্মতি জ্ঞাপন এবং শেষপর্যন্ত কমিটির অন্যতম সদস্য সুভাষের অগ্রজ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু একমত হতে না পারলেও বাকি দুজন যে তাঁদের রায়ে জওহরলালের বক্তব্যই সমর্থন করেছিলেন, সে কাহিনী তো তুমিও জানো। অর্থাৎ—সুভাষ বেঁচে নেই। তাঁর মৃত্যু সন্দেহাতীতভাবেই প্রমাণিত হয়েছে।

অতি উত্তম কথা। কিন্তু একটি প্রশ্ন! তদন্ত কমিটি যা-ই রায় দিক না কেন, জওহরলাল নিজে একথা বিশ্বাস করতেন কি? পেরেছিলেন কি এ সম্বন্ধে তিনি কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দাখিল করতে?

না, পারেননি। বরং পরবর্তীকালে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসুর জিজ্ঞাসার জবাবে এক চিঠি দিয়ে স্পষ্টই তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, এ সম্বন্ধে তাঁর কাছে কোন প্রত্যক্ষ ও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই।

আর কমিটির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান! তিনিই কি পেরেছেন এ সম্বন্ধে কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ দাখিল করতে?

তাঁর ধারণা—তিনি পেরেছেন। দুর্ভাগ্য, একমাত্র জওহরলাল ছাড়া দেশের আর একটি মানুষও তাঁর এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নয়। তাদের ধারণাঃ কমিটির এই সিদ্ধান্ত আসলে হিজ মাস্টারস্ ভয়েস ছাড়া আর কিছুই নয়।

জনসাধারণের এই ধারণা কি খুবই অযৌক্তিক?

শুরুতে হরেক রকম টালবাহানা। তারপর তদন্ত কমিটি গঠন। অবশেষে রায়। না, সুভাষ বেঁচে নেই।

সবশেষে আবার প্রধানমন্ত্রী জানালেন কিনা—এ ব্যাপারে কোন প্রত্যক্ষ ও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। এসব পরস্পর-বিরোধী উক্তির ফলে কমিটির প্রতি আস্থাহীনতার জন্য জনসাধারণকে খুব একটা দোষ দেওয়া চলে কি?

প্রত্যক্ষ এবং সুনির্দিষ্ট প্রমাণ যদি না-ই থাকে, তাহলে কমিটি এতবড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিসের উপর ভিত্তি করে? কোন্ যুক্তিতে?

ঠিক একইভাবে পাল্লা দিয়ে চলেছেন আমাদের সরকার পক্ষ। সত্যি বলতে কি, সরকার পক্ষের রহস্যময় কার্যকলাপও এ ব্যাপারে কম ইন্ধন জোগায়নি দেশবাসীর মনে।

শৌলমারির সাধুর কথাই ধরা যাক। তাঁকে নিয়েও একদিন কম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়নি দেশবাসীর মনে। কে এই শৌলমারীর সাধু সারদানন্দ? কি তাঁর প্রাক্-সন্ন্যাসী জীবনের পরিচয়?

অন্তরঙ্গ সহকর্মী মেজর সত্য গুপ্তর বক্তব্যঃ ইনি নেতাজী ছাড়া আর

কেউ নন। এমন কি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এই একই কথা বলে গেছেন বার বার। 'I am convinced that I met Netaji in the guise of Srimat Saradanandaji at Shaulmari Ashram.'

[9. 2. 62]

কেউ বিশ্বাস করেছেন। কেউ বা করেননি। বলা বাহুল্য যে, সরকার পক্ষও করেননি। তাঁদের অভিমত : শৌলমারীর সাধু আসলে কুমিল্লার জিতেন চক্রবর্তী ছাড়া আর কেউ নন। [আনন্দবাজার : ১. ৪. ৬২]

প্রতিবাদ করেছেন তাঁর ভাইপো বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। না, আমার জেঠা-মশাই অনেকদিন আগেই গত হয়েছেন বোলপুরে।

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে সরকার পক্ষ চুপ। বোধহয় বোবার কোন শত্রু নেই বলেই।

এদিকে জনসাধারণের মনে তখনো সেই একই জিজ্ঞাসা। তাহলে কে এই শৌলমারীর সাধু? তিনি কি ভারতবাসী নন? ভারতীয় সংবিধান কি তাঁর সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়? নইলে কি করে তিনি অস্বীকার করতে পারলেন আদা-লতের সমনকে? কোথায় তাঁর এই শক্তির উৎস?

না, এ জিজ্ঞাসার আজো কোন সঠিক উত্তর পায়নি সাধারণ মানুষ।

তারপর ধরো, জওহরলালের মৃতদেহের পাশে দণ্ডায়মান সেই রহস্যময় মানুষটির কথা, যাঁর সঙ্গে সুভাষের চেহারার সাদৃশ্য কোনরকমেই অস্বীকার করার উপায় নেই। সিনেমার নিউজ রিলে তুমিও তাঁকে দেখেছ। অথচ দুদিন বাদেই দেখা গেল, সে অংশটি কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে সরকারী নির্দেশে।

কিন্তু কেন? এভাবে কেটে দেবার অর্থ কি জনসাধারণের সন্দেহকে আরো ঘনীভূত করে তোলা নয়?

প্রত্যক্ষদর্শী বলে বর্ণিত সাক্ষীদের সম্বন্ধেও সেই একই কথা। আগা-গোড়া বিভ্রান্তি। আগাগোড়া অসঙ্গতি। আগাগোড়া পরস্পর-বিরোধী উক্তি, যা কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে মেনে নেওয়া কোনরকমেই সম্ভব নয়।

এ সম্বন্ধে বিস্তর আলাপ-আলোচনা হয়েছে বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকায়। যুক্তি-তর্কও দেখানো হয়েছে প্রচুর। সে সবই তুমি জানো। সবই তুমি পড়েছ বিভিন্ন সময়ে। তাই নতুন করে সেসব বাদানুবাদের মধ্যে না গিয়ে আমি শুধু প্রধান প্রধান কয়েকটি অসঙ্গতির কথাই তুলে ধরছি তোমার কাছে। তারপর বিশ্বাস করা, বা না করা, তোমার অভিরুচি।

মারা গেলেন আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সুপ্রীম কম্যাণ্ডার এবং রাষ্ট্রপ্রধান নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু—অথচ ডেথ-সার্টিফিকেটে নাম লেখা হল—কাটাকানা।

একবছর বাদে সাংবাদিক হারিনশা ঘটনাস্থলে গিয়ে যে সব রেকর্ড এবং ফটোস্ট্যাট কপি সঙ্গে করে নিয়ে এলেন তা আরো বিভ্রান্তিকর।

দেখা গেল, হাসপাতালের রেকর্ডে ঐ তারিখে কাটাকানা বলে কোন মৃত ব্যক্তির নামই নেই। কাটাকানা নাম পাল্টে করা হয়েছে 'ওকারা ইচিরো'। তারিখটা পাল্টে গেছে। ১৮ই আগস্টের জায়গায় করা হয়েছে ১৯শে আগস্ট।

আর ডাক্তার! সেখানেও গলদ। আগের বার ডেথ-সার্টিফিকেট লিখে-ছিলেন—ডাঃ যোশিমী। এবার—ডাঃ ছুলকা তোয়েজী।

ডাঃ যোশিমী-প্রদত্ত সেই ডেথ-সার্টিফিকেট তাহলে কোথায় গেল? নামটাই বা পাল্টে গেল কি করে? তারিখটাই বা মিলছে না কেন? সুভাষের আসল নাম বাদ দিয়ে কতগুলো মনগড়া নাম লেখার পেছনে উদ্দেশ্যটাই বা কি?

গোপনীয়তা! অতি হাস্যকর যুক্তি। অত বোকা জাপানীরা নয়। দুদিন বাদেই যে বিজয়ী শক্তির কাছে সুভাষ সম্বন্ধে তাদের অনেক রকম জবাবদিহি করতে হবে, সেকথা অজানা নয়। সেই অবস্থায় সুভাষের মৃত্যু হলে, গোপন না করে উল্টে আরো সে খবর তারা জোর গলায় প্রচার করতো—যাতে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি একথা বলার সুযোগ না পায় যে, তাদের পয়লা নম্বর শত্রু সুভাষ বোসকে তারা আত্মগোপনের সুযোগ করে দিয়েছে।

তাছাড়া সত্যতা প্রমাণের জন্য মৃতদেহের বিভিন্ন ধরনের ফটো তুলে রাখতো। সেটাই সবচাইতে বড় প্রমাণ হতো সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু কোথায় সেই বিশ্বাসযোগ্য ফটোগ্রাফ?

আরো কত কি অসঙ্গতি দেখো। আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী কোন রাষ্ট্রপ্রধানকে স্বাগত জানাতে হলে সেখানকার ভারপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারকে উপস্থিত থাকতে হয় শিষ্টাচার হিসেবে। সুভাষের বেলায়ও তাঁরা তাই করে-ছেন বরাবর।

যতবার সুভাষ ঐ পথ দিয়ে যাতায়াত করেছেন, ততবারই ফরমোসা সেনাবাহিনীর চীফ অফ জেনারেল স্টাফ জেনারেল ইশামায়া শিষ্টাচার প্রদর্শন করেছেন নিজে বিমান-বন্দরে উপস্থিত থেকে।

তথাকথিত ঐ ১৮ই আগস্ট তারিখে উপস্থিত ছিলেন কি? না, ছিলেন না। কিন্তু কেন?

উল্লেখযোগ্য যে, টোকিওর সেই বিচার-সভায় যতবার সুভাষের নাম উচ্চা-রিত হয়েছে, ততবারই প্রাক্তন জাপ-প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো এবং অন্যান্য সামরিক অফিসারবৃন্দ হিজ-এক্সেলেন্সী চন্দ্র বসুর প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করেছিলেন দণ্ডায়মান হয়ে।

সেই জাপান শুধুমাত্র বিশেষ একটি দিনে শিষ্টাচার প্রদর্শন করতে ভুলে যাবে, একথা কি বিশ্বাসযোগ্য? তাহলে কেন সেদিন জেনারেল ইশামায়া অনুপস্থিত ছিলেন বিমান-বন্দরে? কার নির্দেশে? কোন্ রহস্যময় কারণে?

তারপর তদন্ত। দুর্ঘটনা ঘটেছে জেনারেল ইশামায়ার এলাকায়। সে দুর্ঘটনায় শুধু সুভাষই মারা যাননি, মারা গেছেন আরো কয়েকজন। বিখ্যাত জাপ-সেনাপতি জেনারেল সিদেয়ী তাঁদের অন্যতম। আঞ্চলিক সেনা-বাহিনীর প্রধান হিসেবে জেনারেল ইশামায়া এ সম্বন্ধে কোনরকম তদন্তের ব্যবস্থা করেছিলেন কি?

—হ্যাঁ, করেছিলাম। এ সম্বন্ধে আমি আমার অধীনস্থ অফিসার লেঃ কর্ণেল শিবুয়াকে একটি রিপোর্ট তৈরি করে জাপ-ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেড-কোয়ার্টার্সে পাঠিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলাম।

স্রেফ অস্বীকার করেছেন অধীনস্থ অফিসার লেঃ কর্ণেল শিবুয়া। না, এমন কোন নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়নি, তাই রিপোর্ট পাঠানোর কোন প্রশ্নই ওঠে না।

এবার সুভাষের একমাত্র সঙ্গী প্রত্যক্ষদর্শী কর্ণেল হবিবুর রহমানের কথায় আসা যাক। হবিবুর রহমান বরাবরই ধীর স্থির এবং শক্ত স্বভাবের মানুষ। তুচ্ছ ভাবাবেগে ভেঙে পড়ার মত মানুষ কোনদিনই তিনি নন।

অথচ পরবর্তীকালে সেদিনের কথা বলতে গিয়ে এই শক্ত মানুষটিই কিন্তু খেই হারিয়ে ফেলেছেন বার বার। যেমন—নেতাজীর মাথায় চার ইঞ্চি পরিমাণ একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল। রক্ত বন্ধ করার জন্য আমি রুমাল দিয়ে ক্ষতস্থানটা চেপে ধরেছিলাম।

ঠিক তার বিপরীত কথা বলেছেন হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ যোশিমী। না, তাঁর মাথায় কোন ক্ষতচিহ্ন ছিল না। থাকলে নিশ্চয়ই আমার নজরে পড়তো। আমিই তো সেদিন চিকিৎসা করেছিলাম তাঁর। আমি কয়েকটি ইনজেকশন দিয়েছিলাম মাত্র।

—ইনজেকশন! সব ভেস্তে গেল নার্স সিস্টার ছান পি সা-এর জবানবন্দীতে। ওসব বাজে কথা। তাঁর দেহ এমনভাবে পুড়ে গিয়েছিল যে, ইনজেকশন দেবার মত কোন জায়গাই ছিল না।

শবদাহের তারিখ নিয়েও কিন্তু কম বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেননি কর্ণেল সাহেব। কখনো বলেছেন—১৯শে আগস্ট, কখনো ২০শে, আবার ২১শে আগস্টও একবার বলে ফেলেছিলেন ভুল করে। অথচ এ ব্যাপারে তিনিই ছিলেন একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী।

অসঙ্গতির এখানেই শেষ নয়। আরো আছে। দুর্ঘটনার পূর্বে সুভাষের হাতে ছিল একটি গোলাকার ঘড়ি।

সাইগন বিমান-বন্দরে তোলা ফটোতেও তাই দেখা যাচ্ছে। অথচ কর্ণেল হবিবুর রহমান নেতাজীর ঘড়ি বলে যেটা দাখিল করেছেন, সেটা চতুষ্কোণ। ডাঃ যোশিমী নাকি ওটা তাঁকে দিয়েছিলেন নেতাজীর ঘড়ি বলে।

—কক্ষণো না। প্রতিবাদ করেছেন ডাঃ যোশিমী। আমি কোনদিনই কোন ঘড়ি দিইনি কর্ণেল হবিবুর রহমানকে।

রহস্যের পর রহস্য! সে রহস্য আরো ঘনীভূত হয়েছে ফরমোসা সেনা-দপ্তরে পাওয়া চারটি টেলিগ্রামকে কেন্দ্র করে।

প্রথমটি এসেছে টোকিওর জাপ-ইম্পিরিয়াল হেড-কোয়ার্টার্স থেকে। তাতে স্থানীয় সেনাদপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—শবদেহ টোকিওতে পাঠিয়ে দাও। পরেরটি তারই উত্তর ঃ বিমানে করে শবদেহ পাঠিয়ে দেওয়া

হয়েছে। তৃতীয়টি আবার টোকিও থেকে। না, থাক। তাইহোকুতেই দাহকার্য সম্পন্ন করো।

কি এর মানে! তবে কি শবদেহ একবার পাঠিয়ে দিয়ে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছিল সুদূর টোকিও থেকে? নইলে কি উদ্দেশ্য এই রহস্যময় টেলিগ্রাম-গুলোর?

উদ্দেশ্য—ব্রিটিশ বাহিনীকে বিভ্রান্ত করা। রায় দিয়েছেন মার্কিন মিলি-টারী ইনটেলিজেন্স বিভাগ। 'ইচ্ছে করেই ওগুলো ওখানে এমনভাবে রেখে দেওয়া হয়েছিল, যাতে ব্রিটিশরা সহজেই খুঁজে পায়। বোস যে এখনো বেঁচে আছে, এ সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ফাইলে রক্ষিত চারটি টেলিগ্রামের মধ্যে ছিল একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা থেকে স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে, কিভাবে তাঁর পালাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, আর কিভাবেই বা সে কাহিনী প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।'

'This file of telegrams along with numerous other documents must have been purposely left for the British to find them. Although at this stage one cannot rule out the possibility of Bose being still alive.

This file of telegrams contains four and the most important one, which gives an idea of the plan to allow to escape and to publish a false story regarding his death is as follows....' [Main File No. 10. Misc., I. N. A. 273]

আর কর্ণেল হবিবুর রহমান! না, মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ তাঁকেও বিশ্বাস করতে রাজী নয়। এ সম্বন্ধে তারা তাদের সদরদপ্তরে কি রিপোর্ট পাঠিয়েছিল দেখা যাক ঃ

'Habibur Rahaman's report is unsatisfactory....you will understand our pressing anxiety to get the truth of whether Bose is actually and permanently dead....Our examination so far only permits us to unless there was a very cleverly contrived and executed deception plot, involving a very few of the highest Japanese officers, Bose is almost certainly dead.' [No. C-5, Intelligence Bureau]

অর্থাৎ—হবিবুর রহমানের বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য নয়। বোস সত্যই চির-তরে মারা গেছে কিনা সেকথা জানবার জন্য আমরা যে কতখানি উৎসুক, তা নিশ্চয়ই আপনি উপলব্ধি করতে পারছেন।...এ পর্যন্ত যতটুকু পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে তাতে এটুকুই শুধু বলতে পারি যে, বোস যদি উচ্চপদস্থ কয়েক-জন জাপানী অফিসারের সাহায্যে তার ধূর্ত পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে না পেরে থাকে, তাহলে এবার সত্য-সত্যই মরেছে।

না, হল না। আবার সেই বিভ্রান্তি। আবার সেই তালগোল পাকানো ব্যাপার। গোয়েন্দা বিভাগের মেজর ইয়ং-এর ভাষায় ঃ

'এই সিদ্ধান্ত নির্ভুল যে, বোস শেষ পর্যন্ত একটি বিশেষ বিমানে সাইগন থেকে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিলেন এবং খুব সম্ভবত তাইহোকুতে একটি বিমান-দুর্ঘটনাও ঘটেছিল। কিন্তু এটা এমন কিছু অসম্ভব নয় যে, বোস সেই বিমান থেকে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসেন এবং হয় নিজের চেষ্টায় আত্মগোপন করেন, আর নয়তো স্থানীয় জাপানীরা তাঁকে আত্মগোপন করতে সহায়তা করে। এ ছাড়া অন্য কোন কিছু আমি চিন্তা করতে পারছি নে এবং এ নিয়ে অন্য কোন পথে তদন্ত চালানোও নিরর্থক।' [No. SLO|CS|I]

বড়লাট লর্ড ওয়াভেলও নিঃসন্দেহ নন। ঘটনার ছয়দিন পরে—২৪শে আগস্ট তিনি তাঁর জার্ণালে কি লিখেছিলেন দেখা যাক :

'I wonder if the Japanese announcement of Subhas Chandra Bose's death in an aircrash is true. I suspect it very much, it is just what would be given out if he meant to go underground....

If it is true, it will be a great relief. His disposal would have presented a most difficult problem.' [P.—164]

অর্থাৎ আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, জাপানীরা সুভাষ বসুর মৃত্যু সম্পর্কে যা ঘোষণা করেছে, তা সত্য কিনা! বোস আত্মগোপন করতে চাইলে এ ধরনের খবর রটনা করাই স্বাভাবিক।...যদি এ খবর সত্য হয়, তাহলে খুবই স্বস্তির কথা। নইলে তাকে নিয়ে একটা কঠিন সমস্যা দেখা দিত।

২১শে সেপ্টেম্বর। প্রায় এক মাস পরের কথা। তখনও বড়লাটের মনে সেই একই সংশয়।

'According to the Japs at Singapore S. C. Bose definitely is dead, but I shall be sceptical till further confirmation.' [P.—174]

অর্থাৎ সিংগাপুরে অবস্থিত জাপানীদের মতে সুভাষ বোস মৃত। তবে আরো প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ নই।

হার মানলেন বিশ্বের বাঘা বাঘা গোয়েন্দার দল। না, কিছুই জানা গেল না। কিছুই বোঝা গেল না।

ঘটনাস্থলে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি সম্ভাব্য স্থান তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখা হয়েছে, তবু রহস্যের দ্বার এতটুকুও উন্মুক্ত হল না। তবে ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে মৃত্যুর চাইতে বেঁচে থাকার সম্ভাবনাটাই যেন স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এ নিয়ে শুধু শুধু তদন্ত চালিয়ে আর কোন লাভ নেই।

হার মানলেন না আমাদের তদন্ত কমিটি। তাই ঘটনাস্থল থেকে শত সহস্র মাইল দূরে থেকেও তাঁরা বুঝে ফেলেছেন যে, সুভাষ বেঁচে নেই। যত অসংগতিই থাক না কেন, কাটাকানা, ওকারা ইচিরো এবং সুভাষ আসলে একই লোক।

আশ্চর্য, তদন্ত কমিটির এ হেন সিদ্ধান্তের পরেও কিনা মার্কিন গোয়েন্দার মুখে সেই একই কথা।

'The Government and people of U. S. A. do not believe the so called death of Chandra Bose in that reported plane crash. Moreover, some people have seen him after the incident including a field nurse. There is every possibility that Bose is alive.' [National Republic: Sept., 1956]

অর্থাৎ—মার্কিন সরকার বা ওখানকার জনসাধারণ কেউ বিশ্বাস করে না যে, তথাকথিত ঐ বিমান-দুর্ঘটনায় চন্দ্র বোসের মৃত্যু হয়েছে। পরবর্তীকালে জনৈক ফিল্ড নার্স এবং আরো কিছু-সংখ্যক লোক তাঁকে দেখেছেন। সম্ভবতঃ তিনি বেঁচেই আছেন।

মল্লিকা, আমরা সাধারণ মানুষ। রাজনীতি থেকে শত হস্ত দূরে থাকতেই আমরা অভ্যস্ত। তুমিই বল, আগাগোড়া এই বিভ্রান্তি সত্ত্বেও কমিটি যেভাবে সুভাষকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন, সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে তাকে মেনে নেওয়া যায় কি? তুমি নিজে একথা বিশ্বাস করো কি? আর কেউ করে কি?

না, করে না। তা যদি করতো, তাহলে এতদিন বাদে আবার নতুন করে তদন্তের প্রয়োজন হতো না। কিন্তু তাতেও কোন সহজ সমাধান হবে বলে মনে হয় না। কারণ, একবার মানুষের মনে সন্দেহের বীজ অংকুরিত হলে এত সহজে তাকে দূর করা যায় না।

তাহলে সবই কি মিথ্যে? সবটাই কি সাজানো ব্যাপার?

না, তা নয়। নেপথ্যে কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটেছিল! কিন্তু কি ঘটেছিল?

কে এই প্রশ্নের জবাব দেবে? প্রত্যক্ষদর্শী কর্ণেল হবিবুর রহমান! অসম্ভব। তিনি আজাদী সৈনিক। আজাদী সৈনিকের পক্ষে কোনদিনও কর্তব্যভ্রষ্ট হওয়া সম্ভব নয়।

প্রমাণ! প্রমাণ তো তুমি আগেই পেয়েছ। এমন কি গান্ধীজীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পর্যন্ত কর্ণেল তাঁর নিজের প্রতিজ্ঞায় অটল, অনড়।

তারপর ভুলাভাই দেশাই। সেই দেশবরেণ্য আইনজীবী ভুলাভাই দেশাই তখন মৃত্যুশয্যায়। সেই অন্তিম মুহূর্তে কর্ণেলকে লক্ষ্য করে একটিমাত্র কাতরোক্তিই তাঁর ঝরে পড়েছিল বার বার। একবার বলো কর্ণেল, বলো যে সুভাষ বেঁচেই আছেন।

মৃত্যুপথযাত্রীর সেই ব্যাকুলতার জবাবে কি উত্তর সেদিন দিয়েছিলেন কর্ণেল হবিবুর রহমান! বলেছিলেন, 'আমি সৈনিক, আমাকে আদেশ মেনে চলতে হয়।'

হ্যাঁ, এই তো সত্যিকারের সৈনিকের কথা। সৈনিক-জীবন অতি কঠিন কঠোর। তুচ্ছ ভাবালুতার সেখানের কোন স্থান নেই। তাই হাজার চেষ্টা

করলেও যে কর্ণেল সাহেব তাঁর সৈনিক-জীবনের আদর্শ থেকে এতটুকুও বিচ্যুত হবেন না, সে তো বলাই বাহুল্য।

তাহলে কি ঘটেছিল? সবার অলক্ষ্যে কি নাটক সেদিন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাইহোকু বিমান-বন্দরে?

সবটাই অনুমানের ব্যাপার। সেই অনুমানের কথাটাই তোমাকে বলছি। হয়তো তাই ঘটেছিল। আবার অন্য কিছু ঘটাও বিচিত্র নয়। তোমাকে যে এর সঙ্গে একমত হতেই হবে তার কোন মানে নেই।

১৬ই আগস্ট হাজার মানুষের চোখের ওপর দিয়ে সুভাষ সিংগাপুর ত্যাগ করেছিলেন—একথা সত্য। ব্যাংকক থেকে সাইগন—এটাও মিথ্যে নয়। তারপরই সুরু হয়েছিল আসল নাটক, যার সূত্রপাত হয়েছিল সিংগাপুরে।

এ নাটকে অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রধানতঃ জাপ-ভারত সাহায্য সংস্থা হিকারী কিকান-এর প্রধান কর্মকর্তা জেনারেল ইসোদা, রাষ্ট্রদূত হাচাইয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাপ সেনা-বাহিনীর প্রধান কাউণ্ট তেরাউচির নির্দেশে তাঁর একজন স্টাফ অফিসার, কিছুটা আংশিকভাবে কর্ণেল হবিবুর রহমান এবং সুভাষ স্বয়ং।

সাইগনে সুভাষের সেই ব্যস্ততার কথা নিশ্চয়ই তোমার স্মরণ আছে। নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য অবিলম্বে একটি বিমান চাই। সহকর্মীদের জন্যও কয়েকটি আসন চাই।

এই নিয়ে জেনারেল ইসোদা, রাষ্ট্রদূত হাচাইয়া এবং কাউণ্টতেরাউচির একজন স্টাফ অফিসারের সঙ্গে রুদ্ধদ্বারকক্ষে আলাপ-আলোচনাও হল কয়েক দফা।

শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল দুটি মাত্র আসন। একটি নিজের, অন্যটি বিশ্বস্ত সহচর কর্ণেল হবিবুর রহমানের জন্য। অগত্যা তাই সুভাষকে মেনে নিতে হল নিরুপায় হয়ে।

কিন্তু কেন? আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কোন বিমান ছিল না একথা সত্য, কিন্তু তার সুপ্রীম কম্যাণ্ডার নেতাজী বসুর তো ছিল। বৎসরাধিক কাল পূর্বে জাপ-সরকারই তো 'আজাদ হিন্দ্' নামে তাঁকে একটি বিমান উপহার দিয়েছিলেন প্রীতির নিদর্শন হিসেবে।

হ্যাঁ, একথা সত্য। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষ্যকারই একথা স্বীকার করেছেন যে, ১৯৪৪ সালের মে মাসে জাপ-সরকার তাঁকে একটি এগারো আসনযুক্ত বিমান দিয়েছিলেন উপহার হিসেবে।

'...he (Bose could fly almost as quickly from there (Rangoon) in the eleven-seater aircraft, 'Azad Hind' which the Japanese had just given him.' [Hugh Toye: P.—111]

একই বক্তব্য রেখেছেন জাপ-ভাষ্যকার হায়াসিদা। এ সময়ে জাপ-সরকারের পক্ষ থেকে নেতাজীকে একখানি বিমান উপহার দেওয়া হয়। 'It was at this time that Japan presented Netaji with an aeroplane. [P.—88]

দূরবর্তী কোথাও যেতে হলে সুভাষ যে মাঝে মাঝেই সেই এগারো আসনযুক্ত নিজস্ব বিমানটি ব্যবহার করতেন, তারও প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর অভাব নেই। ২৯শ জাপানী ডিভিশনের চীফ অফ স্টাফ মেজর জেনারেল মাসুজু ফুজিমুরা তাঁদেরই একজন। সেদিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন ঃ

...'in October 1944, Mr. Subhas Chandra Bose, alighting from his private plane, visited the 29th Division Headquarters, where I was assigned.' [Ibid: P.—174]

অর্থাৎ—১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে সুভাষচন্দ্র বসু যখন তাঁর ব্যক্তিগত বিমানে করে ২৯শ জাপ-ডিভিশনের হেড-কোয়ার্টার্স পরিদর্শন করতে এসেছিলেন, তখন আমি সেখানে কর্মরত ছিলাম।

ব্যক্তিগত সেই বিমানটি কি শত্রু-আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল? না, তারও কোন প্রমাণ নেই। তেমন কিছু ঘটে থাকলে নিশ্চয়ই কারো না-কারো রিপোর্টে সেকথা উল্লেখ থাকতো।

তবে কি উপহার দেওয়া সেই বিমানটি জাপ-সরকার আবার ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন? অতি হাস্যকর যুক্তি। একথা চিন্তাই করা যায় না।

তাহলে নিজস্ব একটি বিমান থাকা সত্ত্বেও এই চরম মুহূর্তে সুভাষ বার বার জাপ-কর্তৃপক্ষের কাছে বিমানের জন্য আবেদন জানাতে গেলেন কেন? নিজস্ব বিমানটি তাহলে কোথায় গেল? তাকে এমন সন্তর্পণে আড়াল করে রাখার উদ্দেশ্য কি?

উদ্দেশ্য—সবাইকে বিভ্রান্ত করে তথাকথিত ঐ বিমান-দুর্ঘটনাকে বিশ্বাস-যোগ্য করে তোলা, যা একান্তই অপরিহার্য ছিল সেদিনের পরিস্থিতিতে।

এবার চট করে একবার সাইগন বিমান-বন্দরের সেই ছবিটার দিকে চোখ বুলিয়ে নাও।

বিকেল পাঁচটা। আয়ার সাহেব, দেবনাথ দাস, গুলজারা সিং, আবিদ হাসান প্রমুখ সঙ্গীরা এসেছেন সুভাষকে শেষ বিদায় জানাতে।

ঠিক পাঁচটা পনেরো মিনিটে 97.2 স্যালী বম্বারটি আকাশে মিলিয়ে গেল সুভাষ এবং তাঁর বিশ্বস্ত সহচর কর্ণেল হবিবুর রহমানকে নিয়ে। সঙ্গীরা সবাই শহরে ফিরে গেলেন ভারাক্রান্ত মনে।

কিন্তু তারপর! পরিকল্পনা মত সেই 97.2 স্যালী বম্বারটি যে সবার অগোচরে কিছুক্ষণ বাদেই আবার সাইগন বিমান-বন্দরে ফিরে আসেনি তা কে বলতে পারে!

হয়তো হাজার সতর্কতা সত্ত্বেও এই ফিরে আসার ব্যাপারটা কারো কারো চোখে পড়ে থাকবে। সেটাই স্বাভাবিক। ঐ ভুবন-ভোলানো পৌরুষদীপ্ত রূপ তো মানুষের ভীড়ে হারিয়ে যাবার মত নয়। তারই প্রকাশ হয়তো তখন দেখা গেছে বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকায়।

যেমন—জনৈক মার্কিন সংবাদদাতা। যেমন—লণ্ডনের 'সানডে অবজার-

ভার' পত্রিকা। তাদের খবর, সুভাষকে নাকি সাইগনে দেখা গেছে পরবর্তী-কালে।

একই বক্তব্য রেখেছেন সাইগনের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী রমণী গোঁসাই। দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি কমিটির কাছে বলেছেন—হ্যাঁ, নেতাজীকে আমি দেখেছি। মাত্র দুজন জাপানী অফিসার-সহ তিনি বাংলোতে এসেছিলেন। খুব তাড়া-তাড়ি ভোজন-পর্ব শেষ করে আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা চলে গিয়ে-ছিলেন।

সাইগন থেকে তাইহোকু। এবার আর সেই 97.2 স্যালী বম্বার নয়, নিজস্ব বিমান।

অন্যতম সাক্ষী তাইহোকু বিমান-বন্দরের বম্বার মেকানিক সাতো কাজো-কে এবার বরং এগিয়ে দেওয়া যাক। কমিটি অবশ্য তাঁকে উপেক্ষা করেছেন, কিন্তু তিনিও যে একজন প্রত্যক্ষদর্শী। সুবিধামত তাঁকে এড়িয়ে যেতে চাইলে চলবে কেন?

তথাকথিত এই বিমান-দুর্ঘটনা ঘটেছিল অপরাহ্ন দুটো বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিটে, অথচ সাতো কাজো বলেছেন অন্য কথা। তাঁর বক্তব্য: ওদিন সকাল সাতটায় আমি একটি বিমানে জনৈক জাপানী জঙ্গী অফিসার এবং একজন অ-জাপানীকে দেখেছিলাম যাত্রী হিসেবে। শেষোক্ত ব্যক্তি দেখতে ছিল অবিকল চন্দ্র বোসের মত। পরে আমি জেনেছিলাম যে, তিনিই চন্দ্র বোস।

ঠিক এর পাশাপাশি একটি চিঠি আমি তুলে ধরছি তোমার সামনে। সুভাষের নিজের হাতে লেখা চিঠি। দুর্ঘটনার আগের দিন (১৭ই আগস্ট) এ চিঠি তিনি লিখেছিলেন লীগের ভাইস চেয়ারম্যান জন এ. থিবিকে। আমি পড়ে শোনাচ্ছি:

'আমি বিমানে সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে চলেছি। তাই আপনাকে এই চিঠি লিখছি। কে বলবে আমি দুর্ঘটনায় পড়ব না!'

মল্লিকা, তুমিই বলো যে, এ চিঠির মানে কি! কিসের ইঙ্গিত রয়েছে সুভাষের নিজের হাতে লেখা ঐ চিঠিখানির মধ্যে।

লক্ষ্য করো যে, আগেও নয়, পরেও নয়, এই বিমান-দুর্ঘটনা ঘটেছিল ঠিক তখনই, যখন সুভাষের পক্ষে আত্মগোপন করা ছিল একান্তই প্রয়োজন।

ঠিক সেই মুহূর্তে এই বিমান-দুর্ঘটনার ব্যাপারটাকে পূর্বপরিকল্পিত ঘটনা ছাড়া আর কিছু মনে করা যায় কি!

হয়তো প্রশ্ন করবে—তাহলে সুভাষ কোথায়? সেই রহস্যময় নিজস্ব বিমানটি কোথায় গেল সুভাষকে নিয়ে?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন মাত্র একজন। তিনি হলেন স্বয়ং সুভাষ। না, আর কারো পক্ষেই এ প্রশ্নের সঠিক কোন উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। দিলেও সবার পক্ষে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যে যতই রায় দিক না কেন, জনগণের বদ্ধমূল ধারণার তাতে এতটুকুও পরিবর্তন হবে না।

ফলে প্রশ্নটা সেদিন যেমন ছিল, আজ ঊনত্রিশ বছর বাদেও তেমনিই রয়ে

গেছে মানুষের মনে। তাই আজো কোটি কোটি ভারতবাসী খুঁজে বেড়ায় সুভাষকে। সুভাষ কোথায়! কবে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন নিজের জন্মভূমিতে? তাঁর রাত্রির তপস্যা কি এখনো শেষ হয়নি? সংবাদপত্রের ভাষায়ঃ

'বাঙলাদেশে একদিন স্বদেশ প্রেমের বন্যা দুকূল ছাপাইয়া ফুলিয়া উঠিল। জাতির বিশীর্ণ প্রাণধারায় আনিল চলার চঞ্চল আবেগ। অচলায়তন সমাজ নাড়া খাইয়া চোখ মেলিয়া দেখিল; তাহার ঘরে নবযুগের নূতন মানুষ দেখা দিয়াছে।

ভীরুতা অপবাদে কলঙ্কিত শান্তশিষ্ট বাঙালীর নিশ্চেষ্ট জীবনের কোমল সমতল ক্ষেত্রে সহসা অগ্নিগিরির বিস্ফোরণে শাসক ও শাসিত দুই-ই চমকাইয়া উঠিল। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য এমন অকুতোভয় আত্মোৎসর্গ এক কল্পনাতীত ব্যাপার। আদর্শবাদী স্বাধীনতাকামী তরুণ শক্তির সহিত রাজশক্তির প্রচণ্ড দমননীতির আঘাত সংঘাতে আলোড়িত মথিত বাঙালী সমাজের জঠর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন সুভাষচন্দ্র।

...স্বদেশের স্বাধীনতা-যজ্ঞাগ্নিতে পূর্ণাহুতি দিয়া আপ্তকাম সাধক অন্তর্হিত হইলেন। বর্তমান ভারতের সেবকগণ আজিও তাঁহাকে খুঁজিতেছেন, তাঁহার কথা ধ্যান করিতেছেন, বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিতেছেন—স্বীয় অমর জীবনের বরমাল্য দেশজননীর কণ্ঠে পরাইয়া দিয়া তিনি কোথায় আত্মগোপন করিলেন?

[আনন্দবাজার ২৩. ১. ৫৪]

এইখানেই তো সুভাষের সত্যিকারের জয়। কোথায় আজ সুভাষের সমকালীন সেই সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ! একটু একটু করে ঝাপ্সা হতে হতে তাঁদের অনেকের ভাবমূর্তিই আজ বিলুপ্তপ্রায়। কিন্তু সুভাষের স্মৃতি আজো জনমানসে তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি অম্লান, তেমনিই মধুময়।

তাই লক্ষ লক্ষ প্রাণের তারে সেই আজো একই জিজ্ঞাসা—সুভাষ কোথায়! সুভাষ কোথায়! সুভাষ কোথায়!

শুধু আজ বলে নয়। দুর্ভাগ্য যখন আরো চরম হবে, অন্ধকার যখন হয়ে উঠবে আরো সূচীভেদ্য, চোখের সামনে সমস্ত আলো যখন এক এক করে নিবে যাবে, তখন আরো বেশি করে সোচ্চার হয়ে উঠবে এই একই ব্যাকুলতা।

সুভাষ কোথায়! সুভাষ কোথায়! সুভাষ কোথায়! কবে তুমি ফিরে আসবে আমাদের মাঝে? কবে?

জীবন আজ দুর্বহ। প্রাণ ধারণের গ্লানি অসহ্য। ফিরে এসে এই দুঃসহ জীবন-যন্ত্রণা থেকে তুমি আমাদের মুক্তি দাও। আমাদের বাঁচতে দাও।

মল্লিকা, এই যদি মৃত্যুর নিদর্শন হয়, তাহলে বেঁচে থাকা কাকে বলে বলতে পারো?

অবশ্য সুভাষ এখনো আত্মপ্রকাশ করেননি একথা সত্য। তা বলে নিরাশ হবার মত কিছু নেই। বিপ্লবী সংগ্রাম করে। কখনো জেতে কখনো বা

হারে। তবু হার মানে না। তবু নিঃশেষ হয় না। অন্যায়ের সঙ্গে আপসও করে না। বিশেষ করে সুভাষ তো নয়ই। তাঁর নিজের কথায়ঃ

'I am a born optimist. I shall not admit defeat under any circumstances.'—আমি আজন্ম আশাবাদী। কোন অবস্থাতেই আমি হার মানতে রাজী নই।

তাই কে বলতে পারে যে, আবার একদিন তাঁর আবির্ভাব ঘটবে না জনতার মাঝে? কে বলতে পারে যে, আবার একদিন তাঁর বজ্রহুঙ্কার শোনা যাবে না শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে?

ইতিমধ্যে বহুদিন কেটে গেছে। পৃথিবীর রূপও অনেকখানি পাল্টেছে। তাই এবার হয়তো তাঁর আবির্ভাব ঘটবে নতুন রূপে, নতুন ভাবে, নতুন আলোকে।

সেই নতুন দিনের ভোরে আগলভাঙা পথিকের কণ্ঠে আবার হয়তো শোনা যাবে সেই পৌরুষদীপ্ত উক্তি—'আমি কারো প্রতিচ্ছবি নই, প্রতিধ্বনিও নই. I am myself.'

সেই দিন, সেই শুভলগ্ন কবে আসবে! কবে!

ধৈর্য ধরো, রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত করবেন—স্বয়ং মহাকাল।

॥ জয়তু সুভাষ ॥

আমি সুভাষ বলছি

শৈলেশ দে